সচিত্র শিশির

দ্বিতীয় বর্ষ—প্রথম খণ্ড

১৩৩১—১৩৩২

অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ

সম্পাদক—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ

প্রকাশক—

শিশির পাবলিশিং হাউস্

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

সচিত্র শিশির

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২২শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩১ সাল। [১ম সপ্তাহ

শতবর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার সমাজ

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, ভাগবতরত্ন]

বাঙ্গলার ইতিহাসে ষোড়শ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় স্মরণীয় যুগ আর নাই। বাঙ্গালী এই দুই যুগে তাহার গতানুগতিক চিন্তাধারা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিভাকে নব নব সত্যের উদ্ঘাটনে নিয়োজিত করিয়াছে। ষোড়শ-

শতাব্দীতে বাঙ্গলায় রঘুনাথের নব্যন্যায়, রঘুনন্দনের স্মৃতি, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্র ও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মান্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গমণীষার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছিল। ন্যায় স্মৃতি ও তন্ত্রে বাঙ্গালী একটা বিশিষ্ট সুর লাগাইয়া ভারতীয় জ্ঞান-পিপাসুগণকে বাঙ্গলার সহিত যুক্ত করিয়াছিল। আর শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্মের মধ্যে ভারতের সমস্ত জাতিকে একতা বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলা যুক্ত হইতে চাহিয়াছিল সমগ্র ভারতের মিশিতে চাহে নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা বিদেশী সভ্যতার বন্যায় যেন ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ বন্যা একদিনে অজয়ের বন্যার ন্যায় আসে নাই—আবার একদিনে মায়া-মরীচিকার ন্যায় মিলাইয়াও যায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর যখন প্রথম পাদ, তখনকার কলিকাতার সমাজের গোটাকয়েক চিত্র দিয়া আমরা দেখাইব যে ঠিক একশো বছর আগেও বাঙ্গালীর ভাবনদীতে বিলাতীর বাণ ডাকে নাই।

সেকালের বিচার

সঙ্গে—এবং এ আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়াছিল নবদ্বীপ। আর উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা ব্যাকুল হইয়াছিল সমগ্র বিশ্বের সহিত মিশিবার—এ নব আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা।

কিন্তু তুলনার এই জায়গাতেই শেষ। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলা তাহার নিজের সত্ত্বাকে ডুবাইয়া দিয়া অপরের সহিত

আমি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের দুইখানি বই হইতে একথা প্রমাণ করিব। একখানি বিদুষী ইংরাজমহিলা Fanny Parkes এর রোজনামচা—নাম "Wanderings of a Pilgrim in the search of the picturesqne" লেখিকা ১৮২৩ সালে কলিকাতায় ছিলেন। এই প্রবন্ধের সহিত প্রদত্ত চিত্র কয়খানি ঐ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। আর একখানি অতি প্রাচীন

ছাপা বাংলা বই—নাম "কলিকাতার কমলালয়।" এখানি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছে—এখানি এত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের Historical Records Exhibition এ এখানি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহার বর্ণিতব্য বিষয় অতি অপূর্ব্ব। কলিকাতা তখন ইংরাজের নূতন রাজধানী—ক্রমে তাহা বাঙ্গলার কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং কলিকাতার আদব কায়দা নূতন রকম। দেশবাসীকে সর্ব্বদা কলিকাতা আসিতে হয়। তাহাই লেখক মহাশয় কলিকাতার এটিকেট্ বা সামাজিক কায়দা-কানুন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এমন বই বাঙ্গলায় আর বাহির হয় নাই।

পাই যে সে কালের সাহেবরা বাঙ্গালীদের জীবনযাত্রা প্রণালী বুঝিয়া তাহাদের কিছু কিছু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছিলেন। "সেকালের বিচার" শীর্ষক চিত্রখানির দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে "বিচারপতি সাহেব" মহাশয় গড়গড়ায় করিয়া তামাক খাইতেছেন। তাঁহার বেশ-ভূষাও সে-যুগের ইংলণ্ডের কেতাদুরস্ত নহে—বরং আমাদের গরম দেশে বাস করিতে হইলে যেমনটী করা উচিত তেমনি। এই যে তামাক খাওয়া ও আমাদের মতন অনেকটা বেশ পরিধান করা—ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর সহিত মিশিবার একটা আকাঙ্খা ছিল। তখনকার সাহেব ও বাঙ্গালীদের মধ্যে এখন-

বাঙ্গালীর তুলসীভক্তি।
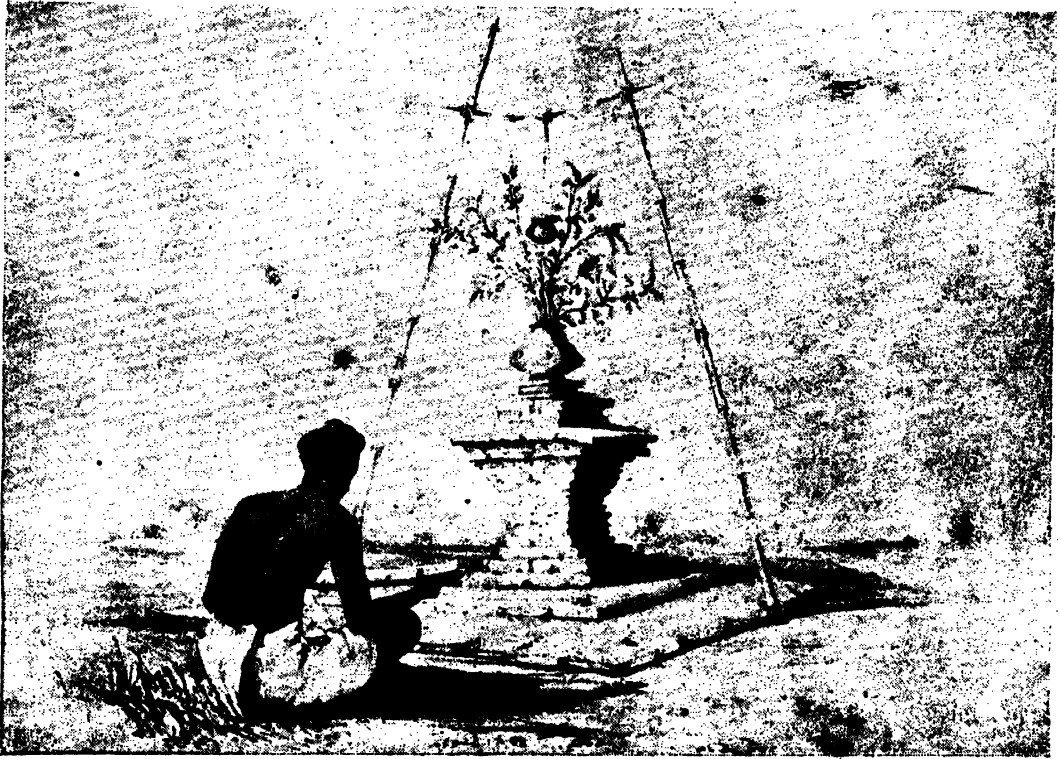
১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একেবারে কোন বাঙ্গালী ইংরাজের বিন্দুমাত্র অনুকরণ করেন নাই একথা বলিলে ভুল হইবে। তবে তখন অনুকরণ সংক্রামক বা মারাত্মক হইয়া সমস্ত জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। অপরদিকে আমরা দেখিতে

কার মতন একটা সামাজিক প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গালীর সামাজিক উৎসবে সাহেবেরা আনন্দের সহিত যোগ দিতেন। সেকালের পুরাতন কলিকাতা গেজেট খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম যে অনেক সাহেব বাঙ্গালী ধনীদের বাড়ী

আসিয়া শারদীয়া উৎসবে যোগ দিতেন। সেখানে নাচ গান হইত—সাহেবেরা বাঙ্গালী বাইদের নাচ খুব পছন্দ করিতেন। পূজার সময় ছাড়াও বিবাহাদি উৎসবেও সাহেবেরা যোগ দিয়াছেন—এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে।

বাঙ্গালী যে তখন তাহার নিঃস্ব ভাবকে বিসর্জন দেয় নাই, তাহার আর একটী প্রমাণ তখনকার সমাজে ওতপ্রোত-ভাবে পরিব্যাপ্ত—ধর্ম্মভাব। ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিলে বোধহয় ভুল হইবে না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দেও বাঙ্গালী

পণ্ডিত মণ্ডলী করি সকলেতে হরি হরি
এই বাণী বলিতে বলিতে অশ্রু পাত।
ধীর কিবা মন্দ মতি ভারত শ্রবণে অতি
শ্রদ্ধাযুত হইয়া করে নিতি যাতায়াত॥

এইরূপ শত শত স্থানেতে কহিব কত
হইতেছে পুরাণাদি পাঠ নিরন্তর।
পাঠা পাঠ বিবেচনা ক'রে অর্থ আলোচনা
সদস্ত হইয়া বসি বিজ্ঞ বহুতর॥
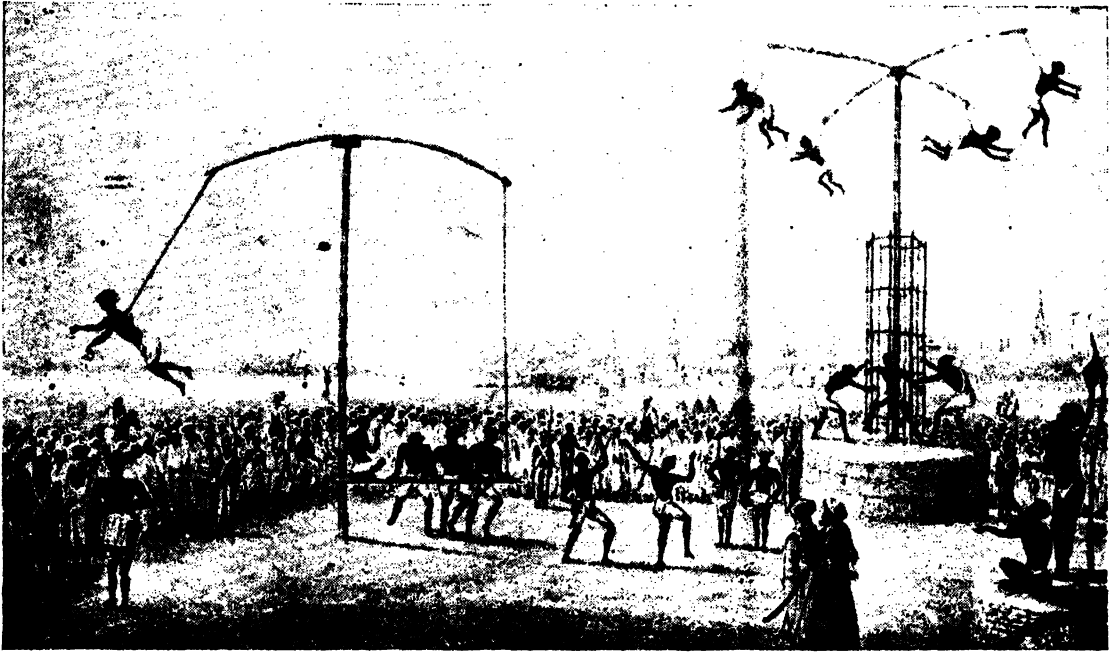
চড়ক পূজা।

তাহারা যুগ যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞান রাশির কেমন সশ্রদ্ধ আলোচনা করিতেন, তাহা "কলিকাতার কমলালয়" হইতে উদ্ধার করিয়া উপহার দিতেছি। কলিকাতার পদস্থ ব্যক্তির বাড়ীতে কথকতা হইতেছে—

হয়ে বিষ্ণু পরায়ণ সবে করি একমন
পুরাণ শ্রবনে করেন স্থির তর মতি।
ভারতাদি ইতিহাস শ্রবণেতে অভিলাষ
সদা অনুরক্ত তাহে একান্ত ভকতি॥

কলিকাতার মতন নগরীতে শত শত স্থানে পুরাণকথা পাঠ হইত একথা কল্পনাতেও আজকাল মনে আনা কঠিন। আর এ পাঠ ঠিক আজকালকার কদাচিৎ দৃষ্ট গোস্বামী-ঠাকুরের পাঠ নহে—ইহাতে রীতিমত আলোচনা হইত। পুঁথির পাঠে ভুল বা পাঠান্তর থাকিলে তাহা লইয়া শ্রোতারা বিশেষ গবেষণা করিতেন। আবার শ্লোকাদির অর্থসম্বন্ধে কথক ঠাকুরের মন্তব্যই সকলে বেদবাক্যবৎ অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। বিজ্ঞজনেরা নিজেদের অভিপ্রেত অর্থও

প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা বলেন ইংরাজী শিক্ষার বহুল বিস্তারের পূর্ব্বে, আমাদের দেশে কোনরূপ culture ছিল না—তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত পয়ার কয়টীর অর্থ ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

সে যুগে সমাজের মধ্যে যে একটা ধর্ম্ম ভাব ছিল, তাহা বিদেশীরও চোখে পড়িত। Fanny Parkes বাঙ্গলার এত দ্রষ্টব্য থাকিতে, **বাঙ্গালীর তুলসীভক্তির** চিত্রটী কেন আঁকিলেন? চিত্রটীর দিকে একবার তাকাইয়া দেখুন, ইংরাজ মহিলার অনভ্যস্ত চক্ষু হইতেও বাঙ্গালীর প্রাণের ভক্তির নিবেদনটুকু লুকায় নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দেও বাঙ্গালী যে তাহার পূর্ব্বপুরুষের সনাতন ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিত তাহা এই চিত্রটী স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। তখনও বাঙ্গলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা হইত সে লক্ষ্মী কড়ির মধ্যে ঢাকা লাল চেলীর টুকরা পরা নহে—তাঁহার মূর্ত্তি কি সুন্দর, পরিকল্পনা কি উদার!

তখনকার দিনে বাঙ্গালীর আমোদ অহ্লাদের মধ্যেও একটা নিজস্বভাব ছিল। বাঙ্গালী ফুটবল টেনিস হকি খেলায় উন্মত্ত হয় নাই। চড়ক পূজা সে যুগের একটা বড় আমোদ ছিল। Fanny Parkes এই **চড়ক পূজার** একখানি চিত্র আঁকিয়াছিলেন। তাহা পাঠককে উপহার দিলাম। আজও কালীঘাটে চড়ক পূজা হয়, কিন্তু চিত্রখানির দর্শকদের মুখের ভাবের সহিত আপনাদের অন্তর মিলাইয়া বলুন দেখি আজও তেমনি আনন্দ সেখানে হয় কি না?

হস্তিযুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করা তখনও আমাদের দেশে একটা বড় আমোদ ছিল। বাঙ্গলা হাতীর জন্য চিরদিন প্রসিদ্ধ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটীল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বাঙ্গলার হাতীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন আর বাঙ্গালীর হাতীর দাঁতের কারু কার্য্য ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একথাও বলিয়াছেন। সে তো আজ আড়াই হাজার বৎসরের কথা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও বীরভুমে বিস্তর হাতী ছিল তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কেমন করিয়া **হাতীর লড়াই** হইত, তাহা চিত্রখানি হইতে দেখুন।

ফলকথা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার একটা নিজস্ব ভাব ছিল—ক্রমে সেটা লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল কিন্তু বাঙ্গালী আবার আত্মস্থ হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

হাতীর লড়াই।
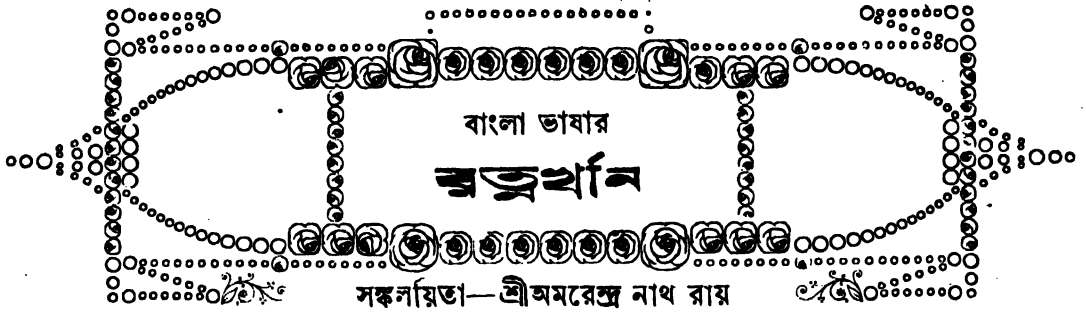
রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-চিন্তা

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ:—

যে সকল বাঙ্গালি-পুস্তক আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে জীব গোস্বামীর "করচাই" সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহা এক্ষণে ৩২৫ বৎসর পুরাতন। তাহার রচনা প্রণালী চৈতন্যচরিতামৃতের সদৃশ। কথিত আছে "ত্রিপুরা রাজাবলী" নামক পুস্তক ইহা অপেক্ষা অনেক প্রাক্তন; কিন্তু যে পুস্তক আসিয়াটিক সোসাইটী নাম্নী সভাতে আনীত হইয়াছিল, তাহার রচনাদৃষ্টে তাহাকে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না; অতএব জীব গোস্বামীর করচাকেই সর্ব্বপ্রাক্‌কালীন বাঙ্গালি পুস্তক বলিতে হইবেক। পরন্তু তাহাতে বাঙ্গালি ভাষার সর্ব্ব প্রাচীন রচনা বলিয়া তাহাকে বর্ণন করা যাইতে পারে না, কারণ চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালিপদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ক-একটি পদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; ঐ পদই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রাক্তন আদর্শ বলিতে হইবেক। তাহার পাঠে বোধ হয় বঙ্গদেশে প্রথমতঃ একপ্রকার হিন্দী ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহার অপভ্রংশে গৌড় বা বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই বাক্য স্থির হইলে ইহা অনায়াসেই কহা যাইতে পারে যে ঐ হিন্দী-ভাষা মাগধীর অপভ্রংশ; কারণ ষোড়শ শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে সংস্কৃত ও মাগধী প্রচলিত ছিল, এমত প্রমাণ ফাহিয়ান্ নামক চীনদেশীয় ভ্রমণ কর্ত্তার গ্রন্থে উপলব্ধ হইতেছে; এবং এ পর্য্যন্ত ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষায় মাগধীর নিয়মানুসারে বর্গের চতুর্থ অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। পরন্তু সে প্রমাণ অগ্রাহ্য হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালি ও হিন্দীর সাদৃশ্য সংস্থাপনার্থে অপর এক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের যে সকল রচনা অধুনা 'প্রাচীন পদাবলী' গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহার ধাতু বিভক্তি ও শব্দবিন্যাসের নিয়ম অনেকাংশে হিন্দীর তুল্য; তাহার পরে উৎপন্ন কবিদিগের রচনায় সেই সাদৃশ্যের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া কৃত্তিবাসের সময় তাহার লোপ হয়; তদবধি বাঙ্গালি রচনায় হিন্দীর ধারা আর দৃষ্ট হয় না। কোন সময় প্রাচীন বঙ্গভাষা হিন্দীর সহিত ঐক্য না থাকিলে উক্ত সাদৃশ্য সম্ভবিত না; সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালী ও হিন্দীর এককালে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল; এবং তাহা মানিলেই তৎপূর্ব্বে তাহারা এক ছিল মানিতে হইবে। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ যে প্রকার বঙ্গভাষাতে রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত 'পদ্যাবলী'র রচনার তুলনা করিলে পদ্যাবলীর রচনা চরিতামৃতের রচনাপেক্ষায় অধিক হিন্দীবিশিষ্ট বোধ হয়। পরন্তু চরিতামৃতে হিন্দীর প্রণালী অনেক আছে; অতএব তাহা আমাদিগের বাক্যের বিরুদ্ধ হইবেক না। চরিতামৃতের সহিত কবিকঙ্কনের তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত সুচারু-সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল; তাঁহার পক্ষে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার করা বিকর্ষণ ক্রিয়া অপেক্ষা সহজ বোধ হইত; অপর তাঁহার শ্রোতার মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত ছিলেন; অতএব তাঁহার পুস্তকে বিকর্ষিত শব্দের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ সংযুক্ত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য অনায়াসে সম্ভবে।

কবিকঙ্কণ (১৪৬৬ শকে) ঐ ব্যবহারের বৃদ্ধি করেন। তাঁহার পর কৃত্তিবাস ও কাশীদাস ক্রিয়ার প্রয়োগ বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত করেন; শব্দের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহাদিগের পর ১৬৭৪ শকে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থে পদ্য-রচনা ও ভাষার পরিশুদ্ধি বিষয়ে যে সন্নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহা অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে; কেহই তাহার পরিবর্ত্তনে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। পরন্তু গদ্য রচনায় তাঁহার সময়াবধি এ পর্য্যন্ত অনেক অন্যথা হইয়াছে। গদ্যগ্রন্থ রচনায় ক্রমাপ্রাপ্ত কালের নির্দ্দেশ করিতে হইলে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রাচীন বলিতে হইবে। তাহার পর পঞ্চাশৎ বৎসর হইল মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রবোধ চন্দ্রিকা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় প্রচুর শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করার প্রণালী সংস্থাপিত করেন। তদবধি সাধু গৌড়ীয় ভাষায় বিকর্ষিত শব্দ প্রয়োগের নিয়ম রহিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের কিঞ্চিৎ পরে পণ্ডিতপ্রবর মৃত রামমোহন রায় মহাশয় বাঙ্গালী গদ্যের অনেক পরিশোধন করত ব্যাকরণাদি রচনা দ্বারা ভাষার পরিশুদ্ধি ও স্থায়িত্ব সংস্থাপিত করেন। তদবধি অনেকেই তাঁহার দৃষ্টান্তগামি হইয়াছেন তাঁহার সময়ের পর বঙ্গভাষার যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা সংস্কৃত নিয়মের সংরক্ষনার্থেই হইয়াছে বলিতে হইবেক; এবং তাহা সর্ব্বসিদ্ধও মানিতে হইবে; যেহেতু বঙ্গদেশের সকলস্থানে তাহার সমতা দেখা যায়। ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, কোচবেহার, রঙ্গপুর, মুর্সিদাবাদ, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানের লিখিত ভাষা এক প্রকার, কুত্রাপি কোন উৎকট প্রভেদ নাই। পরন্তু ঐ বিভিন্ন স্থানে কথিত ভাষার সমতা দৃষ্ট হয় না।

বাণিজ্যের বাহুল্যে দ্রুত বাক্য কহা বিশেষ প্রয়োজনীয় হওয়াতে অধুনা সকলেই 'হইয়া' 'করিয়া' 'এইটুকু' প্রভৃতি শব্দের স্থানে 'হয়ে' 'করে' 'এটু' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। অপর ইংরাজ মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংশ্রবে অনেক বিজাতীয় শব্দ বঙ্গভাষার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাতে কলিকাতার কথিত ভাষা বঙ্গদেশের লিখিত ভাষা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা করে তাহার পক্ষে কলিকাতার চলিত কথিত ভাষা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। কথিত ও লিখিত ভাষায় এ প্রকার ভেদ অন্যান্য দেশেও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতায় ঐ পার্থক্য যে প্রকার অতিরিক্ত বোধ হয়, অন্য কোন ভাষায় তাদৃশ বোধ হয় না। ঐ ভাষা যে পল্লীগ্রামে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। অতএব সমস্ত বঙ্গদেশের নিমিত্ত কোন পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইলে কলিকাতার ভাষাপেক্ষায় দেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ভাষায় ব্যবহার করাই বিধেয় বোধে পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহারই অবলম্বন করেন। ইহার অন্যথায় বাচনিক ভাষায় পুস্তক লিখিলে ত্বরায় এমত এক স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা যাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র অবোধ্য হইবে। অপর বঙ্গদেশের লোকেরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া আপন আপন পল্লীর বাচনিক ভাষায় পুস্তক রচিত করিলে বঙ্গদেশে যত জেলা আছে তত সংখ্যক নূতন ভাষা প্রস্তুত হইবে।

মহাত্মা গান্ধী

কতকাল পরে—আজ কতকাল পরে বাঙ্গালার বুকে আবার জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্ব্বোত্তম মনুষ্য, দেবচরিত্র মহাত্মার পদধূলি পড়িল! অনেককাল পরে বাঙ্গালী সেই পবিত্র পদরজঃ মণ্ডিত পুণ্য পথের ধূলি দেহে মাখিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্যলাভ করিল।

আজ রাজ-শক্তির রোষে বাঙ্গলার আকাশ অন্ধকার—বাঙ্গলার অন্ধকার ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীকে প্রতিমুহূর্ত্তে শঙ্কিত ও কম্পান্বিত করিয়া তুলিয়াছে—বাঙ্গালার মাথার উপরে বজ্র উদ্যত হইয়া রহিয়াছে—বাঙ্গালী সে বজ্রের আঘাত কিভাবে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এ সময়ে তাহাকে শক্তি দিতে, বুদ্ধি দিতে, তাহাকে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়া ধীরভাবে চলিবার পরামর্শ দিতে, অন্ধকার-ঘেরা পথে পথ দেখাইতে—ভারতের রাষ্ট্রগুরু, সত্যাগ্রহী বীর মহাত্মা গান্ধী আজ বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাঙ্গালী প্রাণভরা ভক্তি, অকপট দেশাত্মবোধের পুষ্পাঞ্জলী লইয়া সেই পুরুষোত্তমকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে। দিকভ্রান্ত বাঙ্গালী পথিকের সম্মুখে আজ যে কৃত্তিবাস পরিহিত দেব-মানব আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভক্তিপ্রবণ বাঙ্গালী চিরদিনের মত আজও তাঁহার চরণতলে মাথা নত করিতেছে। আজ নতশিরে ভক্তিনত-চিত্তে বাঙ্গালী মহাত্মাকে ডাকিয়া বলিতেছে হে মহাত্মা, হে গান্ধী, হে বীর, হে দেশপ্রেমিক! তোমার শুভ্রবুদ্ধি ও সত্য অনুভূতি লইয়া আমাদের মধ্যে এসো; আমাদিগকে সত্যের পথ দেখাও, মুক্তির পথ দেখাও, কল্যাণের পথ দেখাও! আজ আমাদের মনুষ্যত্ব পরপদদলিত, আমাদের গৃহে-গৃহে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত, হে মূর্ত্তিমান মনুষ্যত্ব, হে শান্তির দেবতা, আজ তোমাকেই আমাদের বড় দরকার, আজ তোমাকেই আমরা আমাদের মধ্যে চাহি!

তুমি আসিয়াছ! ভগ্ন-স্বাস্থ্য বলহীন দেহ, তবু তুমি বাঙ্গালার বিপদের দিনে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। আজ বাঙ্গালী তাহার লাঞ্ছনাহত শির লুটাইয়া দিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতেছে—হে মহান্, হে ধীর, হে সৌম্য, হে বীর, হে শান্ত, হে সাধক-শ্রেষ্ঠ! স্বাগত, দেব, সুস্বাগত!

দেওয়ানা মদিনা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(১)

বালিয়াচঙ্গের সোনাকর দেওয়ানের স্ত্রী শেষ-শয্যায় স্বামীকে একটী গল্প বলিলেন—দেখ দেওয়ান দিঘীর দক্ষিণ পাড়ের হিজল গাছের কোটরে এক কবুতর আর এক কবুতরী সুখে থাকিত; দুটী ডিম রাখিয়া হঠাৎ কবুতরী মরিয়া গেল। কবুতর বড় কাতর হইল এবং বড় মুস্কিলে পড়িল। বাসা খালি রাখিয়া আহার আনিতে বাহিরে যাইতে পায় না অনিদ্রায় ও অনাহারে ডিম দুটীতে 'তা' দেয়। দুটী ডিমে দুইটী সুন্দর বাচ্ছা হইল। এখন কে কোটরে থাকে কে বাচ্ছাদের আহার আনে? কবুতর নিরুপায় হইয়া এক কবুতরীকে সঙ্গিনী করিল। তাহাকে বলিল এসো আমরা ছানাদুটীকে যত্ন করিয়া বাঁচাই পরে আমাদের সুখের দিন আসিবে।

চারাগাছ পাণি দিয়া আগে বড় করে
বড় হইলে মিঠা ফল সুখে খাইবা পরে।

কবুতরী মনে মনে ভাবিল সতীন আমার জন্য বালাই রাখিয়া গিয়াছে, এরা আমার বাচ্ছার দুষমন হইবে, আমি দুধ দিয়া সাপ পুষিব কেন? ইহাদিগকে মারিয়া নিষ্কণ্টক হইব। একদিন কবুতরের অনুপস্থিতিতে কবুতরী ছোট বাচ্ছাদুটীর গলা টিপিয়া মারিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। যখন কবুতর আধার লইয়া ফিরিয়া আসিল তখন কবুতরীর ক্রন্দনে গৃহ উতরোল, স্বামীকে বলিল এক ভীষণ গৃধিনী আসিয়া বাচ্ছাদুটী মারিয়া ফেলিয়াছে। কবুতর আছাড়ি বিছাড়ি কাঁদিতে লাগিল। কবুতরী বালাই জয় করিয়া মনে মনে হাসিল। গল্পটী বলিয়া সাধ্বী বলিলেন আমার সময় আগত, আমার নয়ন মণি আলাল দুলালকে তোমার হাতে সঁপিয়া যাইতেছি শপথ কর আমি মরিলে তুমি আর বিবাহ করিবে না। বাছাদিগকে আমার সতীনের হাতে যেন প'ড়িতে না হয়, কবুতরের গল্প শুনিলে ত—

সত্য কর প্রাণপতি সত্য কর রইয়া
আমি নারী মরে গেলে না করিবা বিয়া।
ঘরে রইল আলাল দুলাল তারা দুটী ভাই
অভাগী মায়ের আর কোনো লক্ষ্য নাই।
শুন শুন ওগো দেওয়ান কইয়া বুঝাই আমি
দুধের বাছা দুইনা পুতে সঁপলাম অভাগিনী।
সাক্ষী থাক চন্দ্র সুরয আর দুই নয়নের আঁখি
তার হাতে সঁপে গেলাম আমার পোষা পাখী।

(২)

সাধ্বী স্ত্রী মারা যাওয়ায় দেওয়ান পাগল হইলেন আলাল দুলালের মুখ দেখিয়া তাঁর শোক দ্বিগুণ বাড়ে—

মায়ে জানে পুত্রের বেদন অন্যে জানব কি
মায়ের বুকের লহু লও পুত্র আর ঝি।

ধন দৌলত সব বৃথা, দুনিয়ায় আজ দেওয়ানের মত দুঃখী কে আছে। দরবার বিচার কিছুই চলে না। উজীর নাজির সকলে দেওয়ানকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিল। সকল সৎমাই রাক্ষসী নয়

সত্যই সকল সাহেব না হয় সমান
সতীন পুতের ল্যাগা কেউ দেয় জান পরাণ

সময়ে দুঃখ অনেক ভুলাইয়া দেয় দেওয়ান ভাবিল—সত্যই ত—

আমার বুকের ধন রাখবাম যতন করে
কি সাধ্য সতাই লয় তাহাদের কেড়ে।

অবশেষে সোনাকর সাদি করিলেন।

(৩)

বিবাহ করিয়া দেওয়ান ছেলেদুটীকে নিজের কাছে কাছে রাখেন, সতাইএর কাছে তাহাদিগকে যাইতে দেন না। স্বামী

সর্ব্বদা আলাল দুলালকে আদর করে দেখে নূতন স্ত্রী কোপান্বিতা হইলেন এবং মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন।

দেওয়ান অন্দরে আসিলে বিবি ক্রন্দন জুড়িলেন কারণ জিজ্ঞাসিলে বলিলেন—আমি অভাগিনী সৎমা বলিয়া বুকের ধন আলাল দুলাল আমার কাছে আসে না। আলাল দুলাল আমার কলিজার জৌ, কি খায় না খায় দেখিতে পাই না, বুক ভরিয়া খাওয়াইতে পাই না, আমাকে এ লজ্জা এ অপমান দিবার জন্যই কি বিবাহ করিয়াছেন ?

দেওয়ানের হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি কাল হইতে ছেলে-দিগকে পাঠাইব বলিয়া পাণ খাইয়া চলিয়া গেলেন।

বিবি অন্দর সাজাইতে লাগিলেন, নানা খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন—

'এই যত নানাবিধ খাদ্য সাজাইয়া
সতীন পুতের লাগি রহিল বসিয়া।
বগা যেমন চৌখ বুজ্যা পগারের ধারে
সাধু হইয়া বস্যা থাকে পুঁটী মাছ তরে।'

পুত্রেরা আসিলে বুকে ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। তাঁর যত্নে ছেলেরা মায়ের দুঃখ ভুলিল।

(৪)

এইমতে তাহারা সুখে দিনাতিপাত করে, বিবির যত্নে দেওয়ান মোহিত হইলেন, তিনি বিবির হস্তে আলাল দুলালকে সঁপিয়া দরবারের কার্য্য নিশ্চিন্তমনে করিতে লাগিলেন।

শ্রাবনিয়া বর্ষায় চারিদিক জলে থই থই করিতেছে। নূতন জলে অসংখ্য পান্সির বাচ খেলা হইবে সে শোভা দেখার আনন্দ কি শিশু ত্যাগ করিতে পারে ? বিবি মনে মনে ফন্দী করিলেন সুন্দর ময়ূরপঙ্খী নায়ে করিয়া আলাল দুলালকে সে বাচ দেখিতে পাঠাইবেন, এবং জল্লাদকে বিশ-পূড়া জমির লোভ দেখাইয়া সেই নায়ের কাণ্ডারী হইতে বলিলেন।

দুইভাই নানা আভরণ পরিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে নায়ে উঠিল। বাহিতে বাহিতে নাও বাহির দরিয়ায় পড়িল। জল্লাদ কুমারদিগকে আল্লার নাম স্মরণ করিতে বলিল 'তোমাদের যম নিকট, সতাইএর বজ্জাতি বুঝিতে পার নাই তোমাদিগকে প্রাণে মারিলে আমি বিবির নিকট বকসিস পাইব।

যদি মায়ের বইন আরে মাসি হইত
পরাণ দিয়া বইন পুতে পাল্যা রাখিত।
যদি বাপের বইন ফুপা হইত
টান দিয়া ভাইএর পুত কোলে লইত
এযে সতাই, তোমরা তাহার দুষমন।
আলাল কহিল—জল্লাদ তোমার পায়ে ধরি
আমারে মারিয়া দেও দুলালকে ছাড়ি।
দুলাল কয় শুন জল্লাদ রাখ মোর কথা,
ভায়েরে রাখিয়া মোরে মার দিয়া ব্যথা।
জল্লাদ কুলিয়া কয় এই কি যন্ত্রণা
দুজনে মারিব নাহি শুনবাম মন্ত্রণা।

এমন সময় এক সদাগরের ডিঙ্গী ধান কিনিবারে উজান বাহিয়া যাইতেছিল, জল্লাদ মনে ভাবিল বিনাদোষে ইহাদিগকে মারিয়া কেন পাপ করি, ওই ডিঙ্গায় তুলিয়া দিই কোন দেশে চলিয়া যাইবে আর ফিরিবে না। বিবিকে ইহাদের হত্যার খবর দিব।

ধনুয়া নদীর ধারে কাজলকান্দা গ্রাম সেখানে হীরাধর ব্যাপারী বাস করে, সাধু তাহার বাড়ী ধান কিনিয়া দুই ভাইকে দাম ধরিয়া বদল দিল। আলাল দুলাল সেইবাড়ীতে ভৃত্যের কার্য্য করে। কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে একদিন আলাল কোথায় পলাইয়া গেল।

(৫)

ধনুক নদীর পারে দেওয়ান সেকেন্দার বাস করেন। দেওয়ানের পক্ষী শীকারে বড়ই নেশা। একদিন এক বৃক্ষতলে আলালকে দেখিতে পাইয়া নিজের বাড়ীতে আনিলেন।

দেওয়ান ভাবে এ কোনো ভালা বাপের বেটা
চিনা নাই যে দেয় এই হইল বড় নেটা।

ছেলে নানা কার্য্য করে অথচ মাহিনা নেয় না। মাহিনা দিতে গেলে বলে

"নিবাম মাহিনা আমি একেবারে।"

দেওয়ান আলালের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া আপনার

কন্যার সহিত সাদী দিতে চাহিলেন, আলাল বলিল আমি গৃহস্থের ছেলে বড়ঘরে বিবাহ করিব না। দেওয়ান পুন পরিচয় না পাইয়া মুস্কিলে পড়িলেন।

বারবছর পরে আলাল মাহিনা চাহিল দুইশত ফৌজ এবং পাঁচশত মোহর। সে বাল্যাচঙ্গ কিনিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। দেওয়ান সম্মত হইলেন।

এদিকে বাল্যাচঙ্গে দেওয়ান সোনাকর আলাল দুলালের শোকে প্রাণত্যাগ করিল। দুষ্টা বিবির এক পুত্র এখন সেখানকার দেওয়ান, বিবির মনের মত লোক এখন উজির নাজীর, পুরাতন কর্ম্মচারী দূরীভুত হইয়াছে।

এমন সময় পাঁচশত মজুর লাগাইয়া আলাল বাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিল, উজীর নাজীর আসিয়া খাজনা দাবী করিল, আলাল বলিল আমি বাপের জায়গাতে বাড়ী করি, খাজনার ধার ধারিনে। উভয় পক্ষের ফৌজে ভীষণ লড়াই হইল, আলাল যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাপের বাড়ী অধিকার করিয়া দেওয়ান হইল। সেকেন্দর সাহেব সংবাদ শুনিয়া কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ করিতে বালাচঙ্গ গেলেন। আলাল বলিল আমার আর এক ভাই আছে তাহার সন্ধান পাইলে দুইভায়ে আপনার দুইকন্যা বিবাহ করিব, এখন নয়। আলাল ভাইএর তল্লাসে বাহির হইল।

(৬)

আলাল দরিদ্রের বেশে বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল একদিন এক 'হাওরে' এক বটগাছতলায় রাখালগণকে গান গাহিতে শুনিল। সে গীতের এই অর্থ এক দেওয়ানের দুই বেটা ছিল, তাদের মা মরিলে দেওয়ান ফের সাদি করে। সৎমা তাহাদিগকে মারিবার জন্য জলে পাঠায়, আল্লার কৃপায় তাহারা প্রাণে বাঁচিল, ছোটভাই এক গৃহস্থের বাড়ী গরু চরায় বড়ভাই কোথায় গেল সেই বলিয়া সে রাতদিন কান্দে। এই গীত শুনিয়া আলালের চক্ষে ঝরঝর অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রাখালদের কাছে ভাইএর সন্ধান পাইল—

এই গান যে শিখাইল আমা সবাকারে
সে আইজ না আসিল গরু রাখিবারে।
সেই না থাকয়ে এই গৃহস্থ বাড়ীতে
তার কাছে গেলে তুমি যাও এই পথে।

দুইভায়ে সাক্ষাৎ হইলে আলাল বলিল—

শুন পরাণের ভাই
দেওয়ান গিরি করি গিয়া চল বাড়ী যাই।

আমাদের সাদীর দিনস্থির হইয়াছে দুইভাই সেকেন্দর দেওয়ানের দুই কন্যাকে বিবাহ করিব।

শুনিয়া দুলাল বলিল আমি গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, সুরুজ জামাল নামে একটী ছাওয়াল হইয়াছে। গৃহস্থ জমি জমা দিয়া গিয়াছে

মদিনা পরাণের স্ত্রী তাহারে ছাড়িয়া
কেমনে যাইবাম আমি অধর্ম্ম করিয়া।

আলাল বলিল—তালাক নামা লিখে গেলে অধর্ম্ম কিছু নাই। 'জাতি নাই যে থাকে আর এখানে থাকিলে' এ সকল কথা শুনিয়া মদিনার ভাইকে ডাকিয়া একখানা তালাক-নামা লিখিয়া আলালের সঙ্গে দুলাল বালিয়াচঙ্গ যাত্রা করিল, মদিনার সহিত একবার দেখাও করিল না।

সেখানে সেকেন্দর দেওয়ানের দুইকন্যা মদিনা ও আমিনার সঙ্গে আলাল দুলালের বিবাহ হইল।

(৭)

মদিনা সুন্দরী যখন তালাকনামা পাইল, কথা বিশ্বাস না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। ভাবিল—

'চালাকী করিল মোরে পরখ করিতে'
আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া
মদিনা সুন্দরী দিন দিন গোয়াইয়া,
আইজ বানায় তালের পিঠা কাইল বানায় খৈ
ছিকাতে তুলিয়া রাখে গামছা বান্ধা দৈ।

এইমতে ছয়মাস গেল, মদিনা ভাইএর সাথে পুত্র সুরুজ জামালকে বালিয়াচঙ্গ পাঠাইল—

সুখে থাকুক দুখে থাকুক মোরে না ভুলিব
সময় পাইলে মোরে নিশ্চয় কাছে নিব।

হা অদৃষ্ট, সেখানে সুখে জামালের সঙ্গে দুলাল গোপনে দেখা করিল এবং বলিল, এখানে তুমি আসিও না তাহা হইলে আমার অসম্মান হইবে! ক্ষেতে যাহা আছে তাহাতে তোমাদের দিন চলিবে। তোমরা শীঘ্র পালাও, লোকে

জানিলে আমার লজ্জার সীমা থাকিবে না। পুত্র ফিরিয়া আসিয়া অবনত নয়নে ম্লানমুখে জননীকে সকল সংবাদ জানাইল—মদিনা মরমে মরিয়া গেল—

আমার মতন নাইরে কেহ আর অভাগিনী
ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুনি ?
কোন না পরানে আমি থাকবাম বাঁচিয়া
মনপংখী উড়া গেছে আছে কেবল কায়া।

ভাবিয়া ভাবিয়া বিবি দেওয়ান (পাগল) হইল। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে, 'সোনার অঙ্গ মৈলান হইল' তারপর স্বর্গের পরী স্বর্গে চলিয়া গেল, বিরহের দারুণ বেদনা পারিল না।

দুধের বাছা সুরুজ জামাল অনাথ হইল।

(৮)

এদিকে পুত্রকে বিদায় দিয়া দুলাল দুঃখে পাগলের ন্যায় হইল। মদিনা সুন্দরী তাহার দারুণ কথা শুনিয়া কি বলিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। দুঃখের দিনে তাহার পিতা আশ্রয় দিয়াছিল সেই মদিনার মনে এমন দাগা দেওয়া বড় নিদারুণ কাণ্ড হইল। দুলাল স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে আর ঘরে থাকিতে পারিল না, কাহাকেও না বলিয়া মদিনার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবার জন্য একাকী গৃহত্যাগ করিল।

পথে নানা অলক্ষণ দেখিতে লাগিল, যাইতে যাইতে বাড়ীর কাছে গিয়া দেখে মদিনার আদরের গাই পথে পড়িয়া আছে ঘাস পানি পায় নাই, ঘন ঘন ডাকিতেছে। মনে পড়িল বৈশাখে যে বুলবুলের বাচ্ছা মদিনার কথায় দুলাল ধরিয়া রাখিয়া দুইজনে পিঞ্জরে পালিয়াছিল—

শূন্য সে পিঞ্জর ওই উঠানেতে পড়ি
ছোট কালের বুলবুল কান্দে ঘরের চালে চড়ি।
হায় রে বুলবুল পংখী কাঁদ কি কারণে
আমার মদিনা বিবি গিয়াছে কোনখানে ?

ঘরে কান্দে পালা বিড়াল গোয়ালে কাঁদে গাই
সকলি ত আছে আমার প্রাণের দোসর নাই।

মিঞা বারবার ডাকেন—সুরয জামাল বাহির আসিল—

দুলাল জিগায় সুরয মদিনা কোথায় ?
চোখে হাত দিয়া সুরজ কবর দেখায়।

কবরের উপর পড়িয়া দুলাল কাঁদিতে লাগিল—

বুকের কলিজা আমার কেবা লইল কাটি
জমিনের গাছনড়া আসমানের তারা
আমার কাছেতে হইল রাইতের আন্ধারা
দরিয়া শুকায়ে যায় পাথর হইল পাণি
কোথা গেলে পাইবাম আমি দোসর পরাণি।

তালাকনামা নাই যে দিতাম না করিতাম বিয়া,
তবে ত আমার মদিনা না যাইত ছাড়িয়া।

দেওয়ান গিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি
জমিনের ধুনার লোভে ছাড়লাম হীরা মতি।

এই মতে কান্দিয়া কান্দিয়া দুলাল দিন কাটাইতে লাগিল। মদিনার কবরের উপর এক পর্ণকুটীর তুলিল। বালিয়াচঙ্গে আর ফিরিল না। দেওয়ানি গিরি ছাড়িয়া ফকিরী লইল।

মদিনার লাগি আমার বুক হইল চির
ফকীর ছিলাম আগে হইলাম ফকির।
আর নাহি গেল মিঞা বালাচঙ্গের সরে
আখের গণিয়া দেখে করবর উপরে।

---

* এই আখ্যায়িকাটিও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুরের মৈমনসিং গীতিকা হইতে গৃহীত। এমন অমৃত রত্ন মাণিক্যের সমাবেশ ঐ গীতিকায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এমন মধুর এমন অপূর্ব্ব জিনিষ যে কোনো ভাষাতেই দুর্লভ।

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১২)

ব্যাধিগ্রস্থ স্বামী যখন দীপিকার নিকটেই শুশ্রূষার জন্ম আসিল তখন দীপিকা পূর্ব্বের অপমান মনে করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিল না, তাহাকে গ্রহণ করিল, শুশ্রূষার ভার লইল।

আজ এই দুঃসময়ে রাধিকানাথকে দেখিতে কেহই ছিল না, দুশ্চরিত্রতার জন্ম তাহার হাতে একটী পয়সাও ছিল না, মাথা রাখিবার বাড়ীখানি পর্য্যন্ত ছিল না, ইহার পর নানা প্রকার জটিল রোগ, দুশ্চরিত্রতার ফল স্বরূপ তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। এই দুঃসময়ে তাহার মনে পড়িল স্ত্রীর কথা, যাহার অনিন্দ্যচরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল সে, তেজস্বিনী নারী তাহা সহিতে না পারিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে যাহার নিকটে গিয়াছিল সেই তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিল, আশ্রয় তো দূরের কথা, কেহ একটা পয়সা দিয়া তাহাকে সাহায্য করে নাই।

বিন্দুবাসিনী দীপিকার পানে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন মাত্র। সুখের সময় সে অংশ পায় নাই, এখন দুঃখের অংশ তাহাকে পূর্ণমাত্রায় লইতেই হইবে, কারণ সে স্ত্রী।

দীপিকা একটু হাসিয়া বলিল "আমি মাসীমা, দুঃখভোগ করতেই জগতে এসেছি, দুঃখের বার্ত্তা আমি যত বুঝি এত আর কেউ বোঝে না। সত্যি আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করি তাই; দুঃখের সময় আমি যেন দুঃখ বইতে পারি, দুঃখের মধ্যে দিয়ে জগতের সঙ্গে আমায় পরিচয় হোক, সুখ আমি চাই নে, কোনও দিন চাইবও না!"

রাধিকানাথ সত্যই অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, নিজের অতীত কাজের কথা ভাবিয়া সে মোটেই শান্তি পাইতেছিল না।

একদিন দুপুরে সে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ইহাই ভাবিতেছিল। তাহার উঠিবার ক্ষমতা মোটেই ছিল না, দীপিকা তাহাকে উঠিতেও দিত না। ডাক্তার বলিয়াছিলেন সে যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে হঠাৎ হার্টফেল করাও সম্ভব। দীপিকা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত, সে উঠিতে চাহিলেও উঠিতে দিত না।

রাধিকানাথ ভাবিতেছিল, দীপিকার এ সেবা লইতেছে সে কোন্ মুখে, সেবা লইবার উপযুক্ত কাজ সে কোনদিন করিয়াছে কি? সে দীপিকাকে বিবাহ করিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহাকে সুখী করিতে পারিয়াছে কি? স্বামীর নিকট স্ত্রী যে স্নেহ যত্ন প্রেম লাভ করে, কই, সে তো কোনওদিনই তাহাকে তাহা দেয় নাই। দীপিকাকে সে প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিরা রাখিয়াছে, আজ নিজের প্রাপ্য সে কেন পূর্ণ-মাত্রায় আদায় করিয়া লইতেছে। এই তো হৃদয়হীন পুরুষের কাজ, সে কিছু দিবে না কিন্তু আদায় করিয়া লইবে। সে দীপিকাকে স্বচ্ছন্দে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছিল, দীপিকা নারী বলিয়াই তাহার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে, আবার তাহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নারী ক্ষমাময়ী কারণ সে স্নেহময়ী; এই স্নেহের জন্যই সে হারিয়া যায়, কিছুতেই কঠিন হইতে পারে না।

দুধের বাটী লইয়া দীপিকা প্রবেশ করিল, সেই শান্ত শ্রীমণ্ডিত করুণ মুখখানার পানে চাহিয়া রাধিকানাথের দুইটী চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে বালিশের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া পড়িয়া রহিল।

দুধ তখনও গরম ছিল তাই দীপিকা বাটীটা টেবিলের উপর রাখিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার

ললাটে হাত দিল, জামার বোতাম খুলিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আজ গা বেশীরকম গরম হইয়া উঠিয়াছে।

সে থার্ম্মোমিটর লইয়া উত্তাপ লইতে যাইতেছিল, রাধিকানাথ মুখ না তুলিয়াই রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "মাপ কর দীপিকা, আর তাপ নিতে হবে না।"

দীপিকা স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিল "তাপ নিতে হবে বই কি, বিকেলে ডাক্তার আসবেন, যখন শুনবেন জ্বর আজ বেশী হয়েছে তখন বকবেন, বলবেন কেন তাপ নেওয়া হয় নি।"

বালিশ হইতে মুখ তুলিয়া অশ্রুসিক্ত রক্তাভ চোখ দুইটী তাহার মুখের উপর রাখিয়া বিকৃতকণ্ঠে রাধিকানাথ বলিল "অনর্থক কেন এই খরচপত্র করছো দীপিকা, আমি বাঁচব না, এ তোমার পণ্ডশ্রমই হচ্ছে মাত্র। নিজের এত সম্পত্তি, মায় বাড়ীখানা শুদ্ধ ঘুচিয়েছি, আমার স্ত্রী তুমি, নিজে এই স্কুলে কাজ নিয়ে কোনওক্রমে নিজের ভরণপোষণ করছো, সেই সামান্য বেতন হতে—"

সে কথা আর শেষ করিতে পারিল না, উদ্বেলিত অশ্রু-ধারা তাহাকে মূক করিয়া ফেলিল।

নিজের অঞ্চলে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিতে দিতে একটু হাসিয়া দীপিকা বলিল "এর জন্যে তুমি ভাবছ? ছিঃ, পুরুষ মানুষের কাঁদতে নেই, বড্ড বেশী দুর্ব্বলতা এটা। খরচের জন্যে তোমার কিছুমাত্র ভাবনা নেই। আমি ওদিকে প্রায় বছরখানেক মাসে ষাট সত্তর টাকা উপার্জ্জন করেছি, তারপর এই দেড়বছর স্কুলে কাজ নিয়ে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাই, এদিকে সন্ধ্যেবেলা গান শিখিয়েও চল্লিশ টাকা পাই, আমাদের দুটি মানুষের খেতে পরতে আর কত লাগে। টাকা যথেষ্ট আছে তার জন্যে তোমার একটুও ভাবতে হবে না। তুমি ভাল হয়ে ওঠো, তারপর তুমিও উপার্জ্জন করো, আমি এদিকে যেমন করছি তেমনিই করব, দুজনের উপার্জ্জনে সংসার আবার ভরে উঠবে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাধিকানাথ বলিল "না দীপিকা, তুমি যাই বল, আমি বাঁচব না। অনেক পাপ করেছি, দেখছো কতগুলো কুৎসিত ব্যায়রামে আমায় ঘিরেছে। জ্বরটা ও আবার বেশী হলো, আমি বেশ বুঝছি আমার আর রক্ষা নেই। কাল ডাক্তার বলছিলেন জ্বরটা আর যদি না বাড়ে তা হলে আমি বাঁচব, জ্বর বাড়লে আমি বাঁচব না। আজ আমার জ্বর এখনও বাড়ছে, আমি তা বেশ বুঝছি। দীপিকা আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে, তোমার সব যত্ন, সব অর্থব্যয় ব্যর্থ করে আমায় যেতেই হবে, আমি বাঁচব না।"

তাহার চোখ দিয়া আবার দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। দীপিকা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "জ্বর বাড়লেই বাঁচবে না এ কি একটা কথা? ডাক্তারেরা ওরকম ঢের কথা বলে থাকেন, সব কথা সত্যি হয় কখনও? কত রোগীকে ডাক্তারে জবাব দিয়ে চলে যায়, আবার সে রোগী বেঁচে ও ওঠে। আর ডাক্তার বাবু এমন কিছু ঠিক কথা বলেন নি, বলেছেন সম্ভব হতে পারে, সে কথায় বিশ্বাস করে তুমি এতটা আশা ছেড়ে দিচ্ছো কেন, এত ভয় পাচ্ছো কেন?"

"ভয়?" রাধিকানাথের মুখে একটু হাসি নিমেষে ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল—"ভয়? না দীপিকা মরবার ভয় আমার তত নেই, কারণ মরলেই আমি সকল যন্ত্রণার হাত এড়াতে পারি। উঃ, রোগের কি যন্ত্রণা, তা তুমি জানছো কি দীপিকা, পলে পলে এ রকম কারে দগ্ধে মরার চেয়ে একেবারে মরা ভাল। ভয় পাচ্ছি মরার পরে শুনেছি আর একটা দেশে যেতে হয়; ভয় পাচ্ছি, সেখানে গিয়ে সেই বিচারপতির কাছে আমি কি বলব? যখন তিনি বলবেন—তোমায় যে কাজের জন্যে অমন স্বাস্থ্য, মনুষ্য দেহ, জ্ঞান দিয়ে পাঠালুম তুমি কি কাজ করে এলে, তখন আমি কি জবাব দেব দীপিকা, কেমন করে বলব আমি কিছু করি নি, সব নষ্ট করে ফেলেছি? আমার সেই অটুট স্বাস্থ্যের অবস্থা এই, আমার জ্ঞান আমায় কুপথেই চালিত করেছে, মাত্র ত্রিশ একত্রিশ বছর বয়সে আমার বার্দ্ধক্য এসেছে, এখনই আমি সংসারের খেলা সমাপ্ত করে চলে যেতে বসেছি। আমি কি জবাব দেব, হয় তো আর ও কত সাজা আমার ভোগ করতে হবে তার ঠিক কি।"

দীপিকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, হায় রে, মানুষ আগে এ কথা বুঝে না, আগে ভাবে না একজন সর্ব্বদর্শী বিচারপতি আছেন যিনি এখানকার প্রত্যেক কাজ লক্ষ্য করেন, মাপ কাঠিতে তাহার পাপপুণ্যের পরিমাণ মাপেন। মানুষ বুঝে

একেবারে শেষ সময়ে, মৃত্যু আসিয়া যখন প্রস্তুত হয় লইয়া যাইবার জন্য—তখন।

তাপ লইয়া সে দুধের বাটীটা আনিয়া রাধিকানাথের মুখের কাছে ধরিল "অল্প গরম আছে এই সময়ে খেয়ে ফেল, দেরী করলে একেবারে জুড়িয়ে যাবে।"

রাধিকানাথ আর দ্বিরুক্তি করিল না, দীপিকাকে বেদনা দিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, সে দুধ খাইয়া ফেলিল। শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল "আর ও একটা কথা ভেবে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি দীপিকা, বিয়ে করে তোমায় একটা দিনের জন্যে সুখী করতে পারলুম না, একটা দিন তোমায় ভাল কথা বলি নি। তোমায় কেবল বেদনা দিয়ে এসেছি আমার মারের দাগ তোমার গায়ে এখনও রয়েছে। তোমার কর্ত্তব্যের জন্য তুমি সব কথা জোর করে ভুলে যাচ্ছো, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারছি নে, আমার মনে সেই কথা উঠছে আমি তাই—"

"তুমি তাই ভাবছ, তাই কাঁদছে? ওগো না, তোমার কাছে আমি যথেষ্ট পেয়েছি।—তুমি আমার গুরু সংসারের অনেকটা চিনিয়ে দিয়েছ তুমি, তুমি আমায় অবহেলা করেছ আমায় অপমান করেছ, তোমার সেই অবহেলা, সেই অপমান আমার ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, আমি মানুষ হতে পেরেছি, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছি, যদি আমায় অবহেলা না করতে, অনাদর না করতে, আমার ভিতরকার শক্তি জাগত না, এ দেশের আর দশটা মেয়ে যেমন সংসারে খায় শোয় কাজ করে, তেমনি নিয়মে আমিও চলতুম। তুমি আমায় বেশ করেছ, তুমি আমায় মানুষ করেছ, একটীর মধ্যে আমায় সমাবদ্ধ করে না রেখে আমায় দশের মাঝে ছড়িয়ে দেছ। ওগো, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য, কয়টী মেয়ে এমন বাস্তবিক সত্য জীবন লাভ করেছে শুনি? আগুনে না পুড়ালে খাঁটি সোণা চেনা যায় না, ভগবান তোমাদেরই হাত দিয়ে আমায় পুড়িয়ে খাঁটী করে নিচ্ছেন। আমি তোমায় প্রণাম করি, স্বামী বলে নয়, কারণ একটা রাত্রের সম্পর্ক ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নেই, গুরু বলে তোমায় প্রণাম করি, তুমি আমায় শিক্ষা দিয়েছ তাই আমার শিক্ষাদাতাও তুমি।"

দীপিকা সত্যই রাধিকানাথের পায়ের ধূলা মাথায় দিল— তুমি আমায় কিছু দাওনি, আমি চাইনি বলেই দাওনি। আমি যদি চাইতুম তোমায় দিতেই হতো যে। তুমি এর জন্যে অনুতপ্ত হচ্ছো কেন, তোমার অনুতপ্ত হওয়ার মত এতে তো কিছুই নেই।"

ডাক্তার বৈকালে আসিয়া রোগী দেখিয়া মুখখানা বিকৃত করিলেন। রোগীর শরীরের তাপ তখন পাঁচডিগ্রি উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ, সে ভুল বকিতেছে, মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেছে।

মাথায় আইসব্যাগ দিবার কথা বলিয়া যথা যোগ্য উপদেশ দিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন রাত্রি আটটায় তিনি আর একবার আসিবেন। ইহার মধ্যে যদি কোন ও খারাপ লক্ষণ বোধ হয় তাঁহাকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

সেই রাত্রে এগারটার সময় জ্বর ছাড়িবার মুখে রাধিকানাথের নাড়ি ছাড়িয়া গেল। ডাক্তার একেবারেই বিদায় লইয়া গেলেন। নামে কেবল বিবাহ করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য দীপিকাকে বৈধব্যে নিক্ষেপ করিয়া রাধিকানাথের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(১৩)

দীপিকা স্কুল হইতে ফিরিয়া তখন বিশ্রাম লইতে ছিল। আজ সে সন্ধ্যায় তাহার ছাত্রীকে গান শিখাইতে যাইবে না, একাদশীর দিন তাহার ছুটি।

এই নির্জ্জলা একাদশী-ব্যাপারটাকে বর্জ্জন করিবার জন্য বিন্দুবাসিনী অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে লোকটা কেবলমাত্র বিবাহই করিয়াছিল, আয়ুষ্মতীর যে সুখ শান্তি তাহা যে দেয় নাই, তাহার আত্মার শান্তির জন্য দীপিকার একাদশী করা তিনি পছন্দ করেন নাই। কিন্তু দীপিকা বলিয়াছিল আমি শুধু তার আত্মার জন্যেই একাদশী করি তা যদি মনে কর মাসিমা, তবে ভুল করেছ। তবু আমার মনে হয়—এ একাদশী করার জন্যে যদি তার আত্মা শান্তি পায় তাই পাক, কারণ যথার্থই সে বড় হতভাগা ছিল মাসীমা। আমার মনে হয় তার মত দুঃখ খুব কম লোকেই পায়।

তার না ছিল কি? অতুল সম্পত্তি, যশ, মান, আত্মীয়-স্বজন কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু সে কিছুই রাখতে পারলে না, সব হারিয়ে ফেললে, আর সেই হারানোটাও এমনি নিঃশেষে যে তার কথা ভাবলে আমি সত্যই চোখের জল রাখতে পারিনে। আমি তাকে কোনদিনই ভালবাসিনি, বরাবর ঘৃণাই করে এসেছি, কিন্তু এখন তার দুঃখের পরিণাম ভেবে আর ঘৃণা করতে পারছি নে। তাকে আমার ভক্তি ভালবাসা দিতে পারব না, কিন্তু ঘৃণাও আর করতে পারব না, কারণ সত্যিই সে হতভাগা। আমায় বিয়ে করেছিল, সে আমায় কিছু দিতে পারে নি, আর ঠিক দেওয়ার জন্যেই যে বিয়ে করেছিল তা নয়। মাতাল দুশ্চরিত্র হলেও তার মধ্যে সত্যিকার একটা প্রাণ ছিল. আমার বাবার কষ্টে সেই প্রাণটায় ব্যথা লেগেছিল সেই জন্যেই সে আমার বাবাকে দেনা ও কন্যাদায় হতে উদ্ধার করেছিল। তার সত্যিরূপ সেইদিন দেখেছিলুম, আর দেখেছিলুম এই রোগ-শয্যায়। আমার ঘৃণা গলে গেছে মাসীমা, তাকে আমি যথার্থই দয়ার চক্ষে দেখেছি আমার একাদশীতে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সত্যি যদি তার আত্মা সান্ত্বনা পায়, তাই পাক। আর আমার নিজের জন্যেও এই রকম মাঝে মাঝে উপোস করা দরকার। আমি অনেকদিন আগেই যখন একাদশী করবার কথা বলেছিলুম তুমি তখন আমার মুখ চেপে ধরেছিলে। কিন্তু আমি জানি মাঝে মাঝে উপোস দিলে তাতে আমারই উপকার হবে, আমার দুর্দ্দান্ত রিপুগুলো বশে থাকবে। স্বামীর আত্মা যে তৃপ্ত হবে সে কথা আমি মানি নি কোনদিন, আজও মানি নে, তবু আমি একাদশী করব কেন না এতে আমারই ভাল। দেশের বিধবাদের জন্যে একাদশীর ব্যবস্থা যে তাদের শারীরিক কষ্টকে আয়ত্বে আনবার জন্যে আমি তাই জানি। আমায় তুমি বাধা দিয়ো না মাসীমা, আমি এতে উপকারই পাবো।"

বিন্দুবাসিনী তাহার জেদ বুঝিয়া তাহাকে আর কোনও দিন বাধা দেন নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া দীপিকা বিন্দুবাসিনীকে দেখিতে পায় নাই, রমা তাহাকে বলিয়া দিল তিনি অনৈক পরিচিতা রমণীর সহিত কোথায় গিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিবেন।

রমা দীপিকাকে মা বলিয়া ডাকিত, দীপিকা তাহাকে খুব ভালবাসিত, বিন্দুবাসিনীও এই অনাথা মেয়েটাকে স্নেহের চোখে দেখিতেন।

বারাণ্ডায় একটা মাদুর বিছাইয়া একটা বালিস লইয়া দীপিকা শুইয়া পড়িয়াছিল, রমা তাহার পা টিপিয়া দিতেছিল।

প্রাঙ্গনে জুতার শব্দ পাইয়া দীপিকা মুখ তুলিল, শিরীষকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল, ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বহুকাল—আজ পূর্ণ দুই বৎসর পরে শিরীষের সহিত তাহার দেখা। এই দুই বৎসরের মধ্যে শিরীষ তাহার খোঁজ লইয়াছে কিনা তাহা সে জানে না, সে কোন খোঁজ লয় নাই, প্রাণপণ যত্নে তাহার ছায়া পর্য্যন্ত এড়াইয়া গিয়াছে।

শিরীষ আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না বিধবা বেশ-ধারিণী দীপিকাকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, এ যেন তাহার স্বপ্নের অতীত; সে কখনও যাহা ভাবে নাই আজ তাহাই সত্য হইয়া গেল।

দীপিকা মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ডাকল "আসুন শিরীষ দা—" রমার পানে চাহিয়া বলিল—একখানা আসন দিয়ে যা রমা।"

রমা একখানা আসন পাতিয়া দিল। কম্পিত বক্ষে কম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া শিরীষ আসনে বসিল।

দীপিকা জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা সব ভাল আছেন শিরীষ দা, সন্ধ্যা ভাল আছে?"

শিরীষ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল "আমরা ভাল আছি। মাসখানেক আগে ভেবেছিলুম তোমায় খবর দেব, কিন্তু তারপর অনেক ভেবে তোমায় পত্র দিই নি। আমরা এখানে ছিলুম না—পুরীতে ছিলুম।"

দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল "কবে গিয়েছিলেন?"

শিরীষ বলিল "আজ ঠিক দু'বছর দীপিকা, এই দুই বছরের মধ্যে বাংলার মাটীতে পা দেই নি। ভেবেছিলুম আর আসব না, ওখানেই থাকব, কিন্তু পারলুম না, বিষয় সম্পত্তি গুলোর ব্যবস্থা করবার জন্যে কাল এসেছি।"

(ক্রমশঃ)

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মজুমদার এক্ষণে বরিশাল সদরের প্রথম মুন্সেফ্। কিন্তু বার বৎসর পূর্ব্বে তিনি মুন্সেফ ছিলেন না। তখন তিনি ময়মনসিং সদরে একজন মক্কেলহীন অর্থহীন উকিল ছিলেন। তখন অত্যন্ত দারিদ্র্য-ভারে তিনি নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। তখন তিনি রিক্তহস্তে ও শূন্য পকেটে আদালত হইতে ফিরিলে তাঁহার প্রথম পক্ষের শ্যামা, শান্তা, এবং অশেষ কষ্টসহিষ্ণু স্ত্রী তাহার প্রত্যুৎগমন করিয়া হাসিমুখে তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে শান্তি ছড়াইয়া দিতেন।

কিন্তু তাঁহার এই শ্যামা, শান্তা স্ত্রী অধিকদিন জীবিতা ছিলেন না। একটি কন্যা প্রসবের পর হইতে তিনি কঠিন সূতিকা রোগে আক্রান্ত হ'ন; এবং প্রায় তিনমাস কাল অকথ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

অখিলবাবু অর্থাভাবে পত্নীর ভালরূপ চিকিৎসা করাইতে পারেন নাই। কেবল প্রাণপণ শুশ্রূষার দ্বারা, এবং সর্ব্বদা মিষ্ট কথা কহিয়া, চিকিৎসার অভাবটা কতক পরিমাণে পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

মিষ্টভাষী সেবাপরায়ণ স্বামীকে সর্ব্বদা আপন রোগ-শয্যার পার্শ্বে দেখিয়া সেই পত্নী অন্তর মধ্যে পুলকানুভব করিতেন; কিন্তু স্বামী তাঁহার জন্য কষ্টভোগ করায়, তিনি সর্ব্বদা অতিশয় লজ্জিত হইতেন; বলিতেন, 'তুমি আমাকে এত যত্ন কর কেন? আমার বড় লজ্জা হয়। আর সমস্ত দিন আমার কাছে শুক্‌নো মুখে বসে থেক না; সমস্তদিন এ রোগীর কাছে বসে থাক্‌লে তোমারও যে অসুখ করবে। তুমি এক একবার বাইরে বেড়াতে যেও।'

অখিলবাবু রুগ্না পত্নীর অঙ্কশায়িনী কন্যাকে সযত্নে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার নবনীত তুল্য গণ্ড, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা মৃদুভাবে টিপিলেন; এবং কহিলেন 'তোমার অসুখ আগে ভাল হ'ক; তারপর বেড়াতে যাব।'

পত্নী তাঁহার জীর্ণ মুখ ম্লান করিয়া, একটু ম্লান হাসি হাসিলেন। সে হাসির অর্থ এই যে, তাঁহার আর আরোগ্য-লাভ করিবার কোন আশাই নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু চিন্তা করিয়া স্বামী পাছে মনোকষ্ট পান এজন্য সেকথা মুখে আনিলেন না; মুখে বলিলেন, 'আমার ভাল হইবার এখনও দেরী আছে; মেয়েকে আমার কাছে রেখে তুমি আজ একবার বেড়াতে যাও।'

অখিলবাবু বেড়াইতে গেলেন না; কন্যাকেও তাহার মাতার কাছে দিলেন না। কহিলেন, 'কেন, খুকী ত আমার কোলে বেশ আছে।'

অখিলবাবুর পত্নী আবার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'আমি আশীর্ব্বাদ করছি, ও যেন তোমার কোলেই বেশ থাকে; আর মাঝে মাঝে তোমার আশীর্ব্বাদ পায়। তা হ'লেই ও আর কিছু চাইবে না।'

অখিলবাবু পত্নীর বাক্যের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; কেবল সজলনয়নে কন্যার সুকুমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর নয়ন জল নয়নেই বিশুষ্ক হইল, পত্নীর দিকে চাহিয়া, তাঁহার রোগতপ্ত মস্তকে নিজের শীতল হস্ত বুলাইয়া দিলেন। পত্নী স্বামী সেবায় ধন্য হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

এইরূপ সেবা ও যত্ন দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। তবুত সে যত্নের ধনকে অখিলবাবু ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; তবু সেই আদরের ধন, আদরদাতা স্বামীকে ছাড়িয়া, আদরিনী কন্যাকে ছাড়িয়া, কোন অজানা দেশের উদ্দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

অখিলবাবুর বৃদ্ধা মাতা তখনও জীবিত ছিলেন ; তিনি বধূর মৃত্যুর পর মাতৃহীন কন্যাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইলেন ; এবং তাহাকে অতি যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি মাঝে মাঝে নিজের বার্দ্ধক্যের ওজর করিয়া, কন্যার প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিবার জন্য, পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিতে অখিলবাবুকে জেদ করিয়া বলিতেন।

মৃতা পত্নীর স্বর্গস্থা মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া অখিলবাবু বলিতেন, 'মা, একথা আর বল না ; আমি কখনই আর বিয়ে কর্ত্তে পারব না।'

কিন্তু এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে, তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা মাতার উপর, কন্যার প্রতিপালনের ভার আর চাপাইয়া রাখা ভাল দেখায় না ; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধত্ব বশতঃ আদরিনী কন্যার যথেষ্ট যত্ন লইতে পারেন না। বিবাহ না করিলে. এই অসুবিধা কিছুতেই নিবারণ করা যাইবে না। অতএব তিনি পুনরায় এক বয়স্থা সুন্দরীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে তোমরা তাঁহার দোষ দিও না ; তিনিত নিজের সুখের জন্য বিবাহ করেন নাই।—তাঁহার প্রিয়তমা প্রথমা পত্নীর আদরিনী কন্যার পালনভার গ্রহণ করিবার জন্যই, তিনি হৃদয়হীন অপ্রেমিকের ন্যায়, দ্বিতীয়া পত্নীকে ঘরে আনিয়াছিলেন।

বাস্তবিক এই বিবাহ না করিলে, তিনি অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িতেন। কারণ এই বিবাহের দুইমাস পরেই, তাঁহার বৃদ্ধামাতা তাঁহার জীর্ণ হৃদয় ত্যাগ করিলেন। বোধ হয় বিধাতা অখিলবাবুর কন্যাকে প্রতিপালন করিবার জন্যই বৃদ্ধাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে অন্যা সক্ষমা স্ত্রীকে সমাগতা দেখিয়া অনাবশ্যক বোধ তিনি স্থবিরাকে সরাইয়া লইলেন।

অখিলবাবুর এই দ্বিতীয়া পরিণীতার নাম প্রমদা। অনতিকাল মধ্যে অখিলবাবু বুঝিলেন যে প্রমদা মনোমোহিনী সুন্দরী। আরও কিছুদিন গত হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন যে প্রমদা অত্যন্ত কার্য্যকুশলা ;—সে এখনও বালিকা হইলেও, একাই সেই সংসারের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সে যেমন তাঁহার আদরিনী কন্যার যত্ন লইত, তেমন যত্ন সে কখনও পায় নাই এবং যে কন্যাকে এ যাবত সকলে খুকী সম্বোধন করিত, সে ভালসিয়া তাহাকে আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—কল্যাণী ; এখন তাহাকে সকলে কল্যাণী বলিয়াই ডাকে। অখিলবাবু আরও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে প্রমদার মত সুলক্ষণা রমণী সমস্ত ধরণী খুঁজিলেও পাওয়া যায় না ; তাহাকে বিবাহ করিবার ছয়মাসের মধ্যেই তাহার সুলক্ষণের কল্যাণে, তিনি মুন্সেফী পাইয়াছেন, তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখ ঘুচিয়াছে।

এক্ষণে তিনি বরিশাল সদরে, প্রমদারই কল্যাণে, প্রথম মুন্সেফ্। এক্ষণে প্রমদার গর্ভে তাহার আর একটি কন্যা হইয়াছে ; তাহার বয়স আট বৎসর। তাহার নাম ঈশানী। আমরা শুনিয়াছি, যে দুর্গা প্রতিমার ন্যায় সুন্দরী দেখিয়া, বুদ্ধিমতী প্রমদা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—ঈশানী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কল্যানীর বিবাহ।

কল্যানী এক্ষণে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। ঘটকের নির্দ্দেশ মত, বরপক্ষীয়েরা তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু তাহার শ্যামবর্ণ দেখিয়া ; এবং পাঁচশত টাকা বেতনের এক মুন্সেফের অর্থের অপ্রতুলতার কথা, তাঁহারই নিকট, অবগত হইয়া, কেহই তাহাকে পছন্দ করিল না। কল্যানীর বিবাহের ক্রমে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল ; অখিল বাবু চিন্তিত হইলেন।

বুদ্ধিমতী প্রমদা অখিল বাবুকে বুদ্ধি দিলেন ; কহিলেন, 'অত বি,এ,—এম,এ, খুঁজলে, তুমিত, ও কাল মেয়ের বর, এ পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাবে না। বুঝতাম, তোমার দশ বিশ হাজার টাকা আছে ; তাহ'লে ঐ টাকা খরচ করে, মেয়ের কাল রঙের গুনগারি দিতে বলতাম। কিন্তু তোমার কি আছে, না আছে তাত আমি বেশ জানি ; তার উপর আরও একটা মেয়ে তোমার গলায় ঝুলছে। আমি যা' বলি, তাই কর। অত পাশ টাশ দেখ না। তুমিত দেখতে পাচ্ছ, এখন আর, সেকালের মত, পাশ টাশের তত আদর নেই।

একটা ব্যবসাদার দেখে, তারই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও।'

অখিলবাবু প্রজ্ঞা, সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্তা, কান্তা প্রমদার বুদ্ধি দ্বারা চিরদিন চালিত হইতেন; এখনও তাঁহারই বুদ্ধি গ্রহণ করিলেন; এবং ঘটককেও তদনুরূপ উপদেশ দিলেন।

সিরাজগঞ্জের এক ব্যবসায়ী বরিশাল হইতে, ব্যবসার জন্য, নারিকেল লইতে আসিয়াছিলেন। ঘটক তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত; এবং তাঁহার কুল শীল ইত্যাদি বিষয় সমস্ত অবগত ছিল। হঠাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ঘটক, অখিল বাবুর উপদেশের কথা স্মরণ করিল। সে ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে কহিল, 'আপনার একটি পুত্র সন্তান আছে না?":

ব্যবসায়ী উত্তর করিলেন, 'হাঁ, আছে। ঐ একটিই অবশিষ্ট আছে। আমি তার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। আপনি আমাদের সকল পরিচয়ইত জানেন। আপনি তার জন্য একটি সৎবংশজাত কন্যা দেখে দিতে পারেন?'

ঘটক বলিল, 'শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মজুমদার অতি মহাশয় ব্যক্তি, এখানকার প্রথম মুন্সেফ্। তার একটি কন্যা আছে।

ব্যবসায়ী বলিল, 'ও বাবা! আমরা গরীব লোক। আমরা হাকিম টাকিমের কাছে ঘেঁসতে পারব কেন?'

ঘটক বলিল, 'কিন্তু ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গেই তিনি কন্যার বিবাহ দিতে চান।'

অতঃপর ব্যবসায়ী ব্যক্তি কল্যাণীকে দেখিয়া, তাহার মুখশ্রীর প্রশংসা করিলেন; কোন প্রকার যৌতুক চাহিলেন না এবং বিবাহের শুভদিন স্থির করিলেন।

ঐ শুভদিনে, ঐ ব্যবসায়ীর অসিতবর্ণ ও অশিক্ষিত পুত্রের সহিত কল্যাণীর শুভ-বিবাহ হইয়া গেল: এই বিবাহোপলক্ষে প্রতিবেশী দুই চারি ব্যক্তি আহারে আহূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অখিলবাবু তাঁহার হাকিম বা উকিল বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেন নাই। বুদ্ধিমতী প্রমদা তাঁহাকে বুদ্ধি দিয়াছিলেন যে, বরের এই কৃষ্ণ মূর্ত্তি কাহাকেও দেখাইবার নহে; অধিকন্তু, কতকগুলা লোককে নিমন্ত্রণ করে', অকারণ কতকগুলা টাকা খরচ করিবার কোনও আবশ্যক নাই।

বাটীর সকল লোকই বরকে কাল বলিলেও, কল্যাণী কিন্তু সেই কাল বরকে কাল দেখিল না। দেখিল, তাহার শ্যাম সুগঠিত দেহ মহাবলের আশ্রয়; কিছু কাল হইলেও, সুমার্জ্জিত লৌহের মত, তাহাতে বলের চাকচিক্য আছে। অশিক্ষিত হইলেও, কল্যাণী দেখিল, বরের রেখাশূন্য প্রসন্ন ললাটে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। কল্যাণী মুগ্ধ নেত্রে বরের অধরোষ্ঠ নিরীক্ষণ করিল; দেখিল, তাহাতে চির-চিত্ততুষ্টির মিষ্ট হাসি, পল্লবাচ্ছাদিত পুষ্পের ন্যায় লুকাইত আছে।

এই কাল বরের নাম যদুপতি ঘোষ। যদুপতির পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন। যদুপতির পাঠে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ঠিক যে বৎসর যদুপতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই বৎসর যদুপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আই, এ, পরীক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া, পীড়িত, হইয়া পড়িল; এবং এই পীড়া অল্প দিন মধ্যে এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। ইহাতে যদুপতির পিতার অধ্যয়নের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। তিনি পাঠরত যদুপতির দিকে অশ্রু-আকুল লোচনে চাহিয়া, কহিলেন, 'বাবা' তোমার - আর পড়তে হবে না; তুমি লেখা পড়া ছেড়ে দাও। লেখাপড়া শিখে বাবুগিরি করা আমাদের অদৃষ্টেনেই। তুমি কাল থেকে আমার সঙ্গে দোকানে যেও; দোকানের কাজ কর্ম্ম শিখিয়ে দেব।'

সুতরাং যদুপতি পিতৃ আদেশে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল; মূর্খ হইল; দোকানদার হইল; দাঁড়কাকের ন্যায় ময়ূর পুচ্ছ পরিয়া, সাহেবী বা গোলামী করিবার অবসর পাইল না। কিন্তু সে মূর্খ হউক, সাহেব না সাজুক, সে পিতৃ-আদেশ পালন করিয়াছিল! পিতার আদেশ পালনে যদি পুণ্য থাকে, তবে নিশ্চয় সে সেই পুণ্য লাভ করিবে; এবং ভগবান তাহার সেই পুণ্যের পুরস্কার দিবেন।

প্রায় চারবৎসর যদুপতি পিতার নিকট দোকানের কাজ শিখিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে, যদুপতির মাতার হৃদয়ে যে মহাশেল বিঁধিয়াছিল; তাহার ব্যথা মাতৃহৃদয় হইতে কখনও অপনীত হইল না। তাহাতে তিনি দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিলেন।

তাহা দেখিয়া যদুপতির পিতা, তাঁহার সেবা ও সাংসারের

ভার গ্রহণ করিয়া একটি পুত্রবধুকে গৃহে আনিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈবযোগ বরিশালে ঘটকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ হইল। তিনি যদুপতির বিবাহ দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতা পিতৃহীন।

বিবাহের অল্পদিন পরেই যদুপতির পিতা যদুপতিকে আদেশ করিলেন, 'বৌমা বড় হয়েছেন, তাঁর আর বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকা ভাল দেখায় না।'

পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া যদুপতি বরিশালে আসিয়া কয়েকদিন বাস করিল; এবং কিশোরী পত্নীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে চাহিল।

অখিলবাবু বুদ্ধিমতী প্রমদার পরামর্শ শিরধার্য্য করিয়া, ইহাতে কোনও আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

কল্যাণী স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে আসিয়া, পূজনীয় শ্বশুর ও পূজ্যা শ্বশ্রূর পদে প্রণতা হইল; এবং তাঁহাদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করিল।

শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী দারুণ পুত্রশোকে ভগ্ন পঞ্জর লইয়া আর গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। কল্যাণী আসিয়া, সেই অল্প বয়সেই, গৃহস্থালীর অনেক ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিল। তাহার বিমাতা, বিমাতা হইলেও, তাহাকে বাল্যকাল হইতেই অনেক কাজ শিখাইয়াছিলেন, এবং কখনও তাহাকে অলস হইবার অবসর দেন নাই; তাহাকে সর্ব্বদা সকল কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া, এবং সর্ব্বদা শাসন করিয়া, তাহাকে বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম করিয়া দিয়াছিলেন ও বুদ্ধিমতী বিমাতার মহা শাসনে সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং গল্পপ্রিয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংযম শিক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে শ্বশুরালয়ে আসিয়া, সেই বুদ্ধিমতী বিমাতার শিক্ষানুযায়ী, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া, নিদ্রায় কখন কাতর না হইয়া, অত্যন্ত নীরবে শোকাতুরা শ্বশ্রূর সেবা করিতে লাগিল; এবং তাহার অসীম কার্য্যানুরাগ দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। তাহার শ্বশুর মহাশয় তাহাকে সর্ব্বদা আগ্রহভরে এবং হাসিমুখে কার্য্য করিতে দেখিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং বলিলেন, 'বড় ঘরের—হাকিমের মেয়ে না হ'লে কি এমন সুশৃঙ্খলায়, এমন মুখ বুজে কাজ করতে পারে?' শ্বশুর মহাশয়ের আদরপূর্ণ সুখ্যাতিতে কল্যাণীর ক্ষুদ্র বক্ষে আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইত।

শ্রমশীলা সদানন্দময়ীদিগের নিকট পৃথিবী বড় আনন্দের স্থান!—তাহাদের আনন্দপূর্ণ চক্ষে জগতের প্রত্যেক জিনিষটি সুন্দর হইয়া যায়; তাহাদের বক্ষে অনন্ত প্রীতি, চির বসন্তের ন্যায়, চিরদিন বিরাজ করে।

কল্যাণী এই চক্ষু লইয়া ও এ বক্ষ লইয়া যতবার তাহার স্বামীকে নিরীক্ষণ করিত, ততবার তাহার চক্ষু সার্থক হইত, ততবার তাহার বক্ষ মহাপ্রেমে ভরিয়া উঠিত। সে বুঝিত, তাহার কাল স্বামীর রূপে জগত আলোকিত হয়; তাহার গুণে দেবতারাও পরাভব মানে। স্বামীর অনাবিল প্রেমে সে আপনার জীবনকে ধন্য করিল; এবং সোহাগের নির্ম্মল রসে স্বামীকে অহরহঃ স্নাত করাইয়া তাহাকেও ধন্য করিল।

যদুপতিও কল্যাণীকে বড় ভালবাসিত। দোকান হইতে সে প্রত্যহ বাটী ফিরিয়া প্রণয়িণীর প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া সে ধন্য হইত; তাহার মিষ্ট হস্তের প্রস্তুত আহার সামগ্রী তাহার কত মিষ্ট লাগিত,—তাহা খাইতে খাইতে মহা তৃপ্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত; তাহার হাতের দেওয়া জলটি, তাহার কত স্নিগ্ধ ও শীতল বোধ হইত;—তাহাতেও যেন প্রেমময়ী পত্নীর স্নিগ্ধ প্রেম মিশ্রিত থাকিত।

প্রেমিক-প্রেমিকার বড় সুখেই তাহাদের প্রেমময় জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। কল্যাণী এখন ষোড়শ বৎসর বয়োক্রম অতিক্রম করিয়াছিল;—যেন সে যৌবনের ডালি সাজাইয়া স্বামীকে পূজা করিতে বসিয়াছিল। যদুপতি তাহাকে আকুল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, মনে মনে বলিত—কি সুখ, কি সুখ!

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিমবাবুর চিঠি

বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রখানি স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। 'সহবাস-সম্মতি-আইন' সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর কি অভিমত ছিল, তাহা এই পত্র-পাঠে জানা যায়। পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য আমরা সেই পত্রখানি 'ব্লক' করিয়া 'সচিত্র শিশিরে'র মারফতে প্রকাশ করিলাম। ঠাকুরদাস বাবুর পুত্রেরা আমাকে এই পত্রখানি যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন।

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট সুপরিচিত, এবং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যতদুর জানি; এ দেশীয়া বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের

পুর্ব্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না। এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড বড় বিরল। সুতরাং এ বিষয়ের কোন আইনের প্রয়োজন আছে, বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে, ইহাও বক্তব্য, যে দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার পুর্ব্বে বালিকাদিগের স্বামিসংসর্গ অবিধেয়, এবং ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতি বিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য, যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজ-নিয়ম প্রাচীন দেশাচার-বিরুদ্ধ হইবে না,

কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইন-মতে সম্মতিদানের দশ বৎসর; দশ বৎসরের স্থানে বার বৎসর হয়, ইহা আমার অনভিমত নহে। কিন্তু বার বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমেই উচিৎ নহে।

বাল্য-বিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্য-বিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিৎ সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।

কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই

ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" ইত্যাদি মনু বাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি, অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না, দেখা যায়। রক্ষা করিতে গেলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ী যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি এক্ষণে সমাজগৃহীত নয়, তাহার জন্য গণ্ডগোল করা বৃথা।

আমার মতে, আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

ইতি তাং ২৯ আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা

পূজার ছুটী

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

এ পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষই ছুটী প্রিয়। এই ছুটীকে লক্ষ্য করিয়াই তাহারা প্রবল উৎসাহে কার্য্যাদি করিয়া থাকে। ছুটীর বক্ষের ভিতর এমন কতকগুলি মানুষের মধুর সুখ স্মৃতি লুকাইয়া থাকে যাহার কমনীয় কল্পনা কর্ম্ম ক্লান্ত জীবন ধারার মধ্যে মন্দাকিনীর পবিত্র স্রোতে মত্ত অনুক্ষণ অনুভূত হইতে থাকে। এই ছুটীর আশায় মানুষ অকাতরে নির্ব্বিবাদে সকল ক্লেশ, সকল অভাব সমস্ত অভিযোগ অনায়াসে সহিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য থাকে সেই ছুটীর দিনগুলির প্রতি। প্রবাসী প্রিয়জনের আগমন যেমন মধুর যেমন সুখপ্রদ; যেমন আনন্দকর এই অনুক্ষণ অনুরাগ আকাঙ্খিত ছুটীর দিনগুলিও তেমনি তৃপ্তিকর। পরম আত্মীয় আশীর্ব্বাদকারীর মত মঙ্গলময়।

ছুটীর দিন বলিতে যদি আমরা বিশ্রামের দিন মনে করি তাহা হইলে আমার মনে হয় আমাদের তেমন মনে করার মধ্যে কিঞ্চিৎ গলদ রহিয়া যায়। কারণ যে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে ছুটীর দিনগুলি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সে গুলি তাহাদের নিজস্ব নয়। সকল জাতি ও সকল দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই ছুটীর দিনের জন্ম হইয়াছে। পর্ব্ব দিনগুলিকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিবার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষকে একত্রিত হইতে হয় তখন কর্ম্মময়-জীবন হইতে কয়েকদিনের ছুটী প্রয়োজন হইয়া পড়ে নতুবা প্রবাসী, আত্মীয়-স্বজনের মিলন অসম্ভব হইয়া পড়ে নাকি? অনেক জাতির এমন কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, যাহা স্বামী-স্ত্রীতে একত্রিত না হইলে সমাধা হয় না! এমন কতকগুলি পূজা অর্চ্চনা আছে—যাহাতে সমস্ত পরিবারটীর উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন। এই সকল কারণকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদেশে মনে হয় ছুটীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পঞ্জিকা ও Holidays list দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—সুতরাং ছুটী বলিতে বিশ্রাম বোঝায় না। ছুটি বলিতে এই কথাই বুঝিতে হয় যে সংযত চিত্তে এমন একটী শক্তির উদ্দেশ্য আরাধনা বা পূজা-অর্চনা করার "নির্দ্দিষ্ট সময়"—যাহা কেবল শুইয়া বসিয়া বা ঘুমাইয়া গত করিয়া কাটাইবার জন্য নয়। দেশকাল পাত্র ভেদে দেশের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, শিক্ষা দীক্ষা যেমনি ভিন্ন ভিন্ন রুচির দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছে এবং তাহাদের নিজস্ব খুঁজিয়া বাহির করা শ্রমসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বর্ত্তমান সময় আমাদের ছুটীর দিনগুলিও সেইরূপ তাহাদের উদ্দেশ্য দর্শাইয়া একটী নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে। এখন ছুটির মূল উদ্দেশ্য হইয়াছে—রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুত্থান করা; কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বিশ্রাম করা, একটু "ভাল মন্দ" আহার নিঃসঙ্কোচে করা। মুক্ত আকাশের তলে নিরুপদ্রব স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করা। সত্যই এখন ছুটীর দিন বলিতে বিশ্রামের দিন হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রায় লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—একটা দিন ছুটী আসিতেছে "জিরিয়ে বাঁচা" যাবে। এখন বিশ্রাম করিতে পারিলেই যেন এই কর্ম্মবিমুখ পরমুখাপেক্ষী জাতিটা কোন রকমে বাঁচিয়া যায়।

সমস্ত দেশের ছুটীর দিনগুলির পূর্ব্বে একটী কল্পিয়া বিশেষণ সংযুক্ত হইয়া আছে যথা মহালয়ার ছুটী "পূজার ছুটি" ইত্যাদি। এই ছুটীর নিজের কোন বিশেষত্ব নাই—পূজার নিমিত্ত তাহার সম্মান ও আহ্বান। কিন্তু পূজা সকলে না করিলেও বিশ্বজননীর পূজায় সমগ্র বঙ্গবাসী একত্রে যোগদান করে বলিয়া এই ছুটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

এই পূজার সময় যে যেখানেই থাকুন না কেন দেশে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। শরতের মেঘলেশহীন সুনীল আকাশ,—সোনালী রৌদ্র উদ্ভাসিত ধান্য-ক্ষেত্র,

বর্ষান্তে সৌভাগ্যস্পর্শ পরিপূর্ণ বক্ষ সরসীরূপ মৃদু পবন সঞ্চালিত তরল মালায় সুন্দরী যুবতীগণ অলক্তরাগরঞ্জিত চরণ যুগল লজ্জাভার নিপীড়িত ধীর ও মন্থর গতি নববধূগণের অনুচ্চ হাস্ত-রোল, অনুরাগ রঞ্জিত রক্তবৃন্ত সেফালির তরুতলে অভিমান শয্যা, সহসা বসন্তের আগমনে কুসুম মেলার মত ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের আনন্দ কলহে মুখরিত পল্লী গ্রামগুলি এই সময় যে বঙ্গবাসীর মনে কি অনমুভূতা আনন্দ-স্পর্শ আনিয়া দেয় তাহা বোধ হয় ভাষায় বোঝান যায় না।

তাহা হইলে বেশ দেখা যাইতেছে যখন যে পর্ব্বকে অবলম্বন করিয়া আমরা ছুটীর সাক্ষাৎ পাই, তখন কিন্তু বুকে হাত দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—সেই পর্ব্বের কোন সম্মান আমরা কোনদিন রক্ষা করি না—এ অভিযোগ অবশ্য সকলের পক্ষে না খাটিলেও অনেকের পক্ষে যে বিশেষ ভাবে খাটে তাহা বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই অস্বীকার করিতে পারিব না।

ধরুন পূজার ছুটীর পূর্ব্বে অগ্রদূত হিসাবে মহালয়ার ছুটী আসিয়া দেখা দেয়। এই ছুটী যে কি কারণে হয় তাহা আজকালের শিক্ষিত ছেলেপুলেদের ভিতর অনেকে জানে না, কিন্তু ৫ বৎসরের ছেলে যে কেহ স্কুলের সম্পর্কে আপনাকে ধরা দিয়েছে, সে বেশ বোঝে অমুকদিন "মহালয়ার ছুটী" ; সে জানে এই ছুটীর দিন তাহাদের খেলার মাত্রা অন্যদিন অপেক্ষা চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইবে। নয় ঐদিন তাহাদের কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর বা জু দেখিতে যাওয়া হইবে ; নয় ত থিয়েটারে সমস্ত রাত্রি জাগিলে পরদিন স্কুল ও আফিস যাইবার ভয় নাই কারণ "মহালয়ার ছুটী" আছে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন অনেকের ভিতর এইভাব দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে কি না। এই ছুটি উপলক্ষে আমি জানি অনেক যুবক বৃদ্ধ বাগান বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কয়জনের মনে পড়ে যে বৎসরান্তে এই একটা দিন পিতৃপুরুষের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিতে হয়। পুত্রের ইহা অপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য আর কি আছে? আমাদের ক্ষুধার সময় আহার ও জল না পাইলে কি কষ্ট হয় তাহা অবশ্য কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না, পিতৃলোকের আমাদের এক বৎসরে তাঁহাদের একদিন হয় – তাঁহারা পৃথিবীতে যে সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন ; যাঁহারা তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য নিরুপদ্রবভাবে ভোগ করিতেছেন, সেই পূর্ব্ব পুরুষগণকে এক গণ্ডুস জল দান করিবার অবসর তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না, যদি ও এই কার্য্য করিবার জন্যই মহালয়ার ছুটীর ব্যবস্থা, বিদেশী রাজাও অনুমোদন করিয়াছেন। এই ছুটী তাহা হইলে কোনদিক দিয়াই বিশ্রাম আনিয়া দেয় না—সারাদিন পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তাঁহাদের স্মরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা—সেই অজানা দেশের সহিত একটী শ্রদ্ধা ও ভক্তিসূত্রে অপূর্ব্ব বন্ধন সৃজন করা হয়। এমনি করিয়া যত ছুটী আছে সবগুলি নিজ নিজ কাজ লইয়া আসে। মুসলমানদের মহরম বলুন আর খৃষ্টানদের X'mas বলুন সবগুলি একটী উৎসব ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বাধীন দেশে একটী বীরের কবির, রাজার, দেশনায়কের বিশিষ্ট কার্য্যাবলীকে স্মরণীয় করিবার জন্যই ছুটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

অনেকে বলিতে পারেন যে প্রকৃতির নিকট হইতে জীব যেমন সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছে সেইরূপ ছুটীর দৃষ্টান্তও প্রকৃতির মনে যথেষ্ট দেখা যায়।

ঐ যে প্রতিদিন পূর্ব্বাকাশে সুবর্ণ তোরণ দ্বারমুক্ত করিয়া তরুণ অরুণ বিশ্ববাসীর উপর আলোকরশ্মি সম্পাতে আনন্দ, উৎসাহ কর্ম্মশক্তি জাগরিত করিয়া দেন তিনি ত দিনান্তে ছুটী লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান, ঐ যে সুধাংশু নির্ম্মল গগন জ্যোৎস্না জুয়ারে প্লাবিত করিয়া ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সুধা ধারা বর্ষণ করিয়া সুশীতল প্রভাত সমীর স্নানে ছুটী লইয়া ফিরিয়া যান, ঐ যে পর্ব্বত নির্ঝরিণী বর্ষাবারি বক্ষে বহিয়া, সারা বিশ্বময় তরঙ্গ-ভঙ্গ ছুটাইয়া শরতের শ্যামময় শোভা অবলোকন করিয়া ছুটী লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান—ঐ যে কয়েক দিনের জন্য ঋতুধারা বসন্ত তার ফুলডার সম্ভার লইয়া বিশ্ববাসীর আনন্দ দরবার খুলিয়া কোথায় ছুটী লইয়া চলিয়া যান, তাহা কি তাহারা বিশ্রামের জন্য ছুটী লন না? এই অবকাশ আমাদের চক্ষে অবসর হইলেও প্রকৃতি বলিতেছেন, ইহাতে অবসর নয়

এক স্থানের কর্ম্ম সমাপন করিয়া অন্য স্থানে আবির্ভাব। কর্ম্মময় জগতে—কর্ম্মময় জীব—তবে ছুটী কোথায়? একঘেয়ে কাজের অবকাশকেও আমরা ছুটী নামে অভিহিত করিয়া থাকি। তাই পদে পদে মনে হয় মানুষেরও কল্পনা মানুষকেই উপহাস করিতেছে। মুক্ত জীব নিজ হইতে কর্ম্ম বন্ধনের ফাঁসে জড়াইয়া ছুটীর অনুসন্ধান সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। এই ছুটীর আকাঙ্খা মানুষের খুব স্বাভাবিক কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিতর ক্রমোন্নতি আপনা হইতে নিয়ত চলিতেছে, এবং এই চলার মধ্যে কোথাও বিরাম বা শেষ বা দাঁড়ি নাই। অবশ্য একথা উঠিতে পারে সকল কাজের যেমন একটা শেষ আছে; সকল রচনার যেমন একটা পূর্ণতা আছে এবং মাঝে মাঝে একটা ছেদ আছে তেমনি করিয়া ভ্রাম্যমান জীবনের মধ্যে এক একটা বিশ্রামের দাঁড়ির প্রয়োজন আছে। একথা অতীব সত্য কিন্তু সে বিশ্রাম বলিতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা নয়; নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের স্রোতের পরিবর্ত্তন, এবং এমন পরিবর্ত্তন যাহাতে আনন্দ আছে উৎসাহ আছে; প্রবল বাসনা আছে। বাড়ীতে রোজ যদি একরকম আহারের মেনু হয়, এবং সেই মেনু যদি পোলাও, কালিয়া কোর্ম্মা কাবাব ক্ষীর, দই, মিঠাই সন্দেশ রাবড়ী হয় তবে তাহাতে যেমন আপনা হইতেই অরুচি হইয়া আসে তখন লাউয়ের চিংড়ি, মোচার ঘণ্ট, মুলোর ডাল্না, সুক্তা, ইত্যাদি সামান্য হইলেও এগুলির যেন নিত্য আহার কার্য্যের ছুটী বলিয়া মনে হয় সত্য কিন্তু আহার ঠিক যেমন চলে তেমনি চলে কিন্তু উদরের বিশ্রাম হইল কৈ?

"পূজার-ছুটী" অনেকদিন হইতে আমরা খুব মানিতাম, কিন্তু মা মহামায়া আমাদের সে মানার মধ্যে যথেষ্ট না মানার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধুনা তিনি কৈলাশ ছাড়িয়া সন্তানের পূজা লইতে বাঙ্গলায় আসিতে ক্রমেই নারাজ হইয়া পড়িতেছেন। জানি না কোন অন্যায়ের জন্য এ জাতি অভিশপ্তের মত দিন দিন কেবল দরিদ্র দীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া, আর তেমন করিয়া মায়ের পূজা করিয়া প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে না—

বাহুতে তুমি, মা, শক্তি
হৃদয়ে তুমি, মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

সত্যসত্যই প্রাণের কাতরতার সহিত বাঙালী-জাতি বুঝি আর মাকে জানাইতে পারে না—

অনাথস্য-দীনস্য-তৃষ্ণাতুরস্য-ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্যজন্তোঃ
ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তারদাত্রী নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।

তাই বুঝি মা শঙ্করঘরণী আর বাঙ্গালার পল্লিতে পল্লিতে গ্রামে গ্রামে সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করিতে, আদর করিতে আর তেমন করিয়া আসেন না। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ম্যালেরিয়ার উৎকট অত্যাচারে অসহ্য হইয়া অনেকে প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ভীষণ জঙ্গলপূর্ণ পল্লীগ্রামগুলি শূন্য দালান বক্ষে করিয়া শ্মশানের পরিচয় দিতেছে, সেখানে দিবালোকে প্রবেশ করিতেও প্রাণের ভিতর আশঙ্কার উদ্রেক হয়। যেখানে মা নাই সেখানে সন্তান কি করিতে যাইবে? যেখানে আনন্দ নাই সেখানে কাঁদিতে কে যাইতে চায়? তাই বুঝি মায়ের পূজার ছুটীর দিনগুলি নূতন পথ আবিষ্কার না করিয়া অন্য গত্যান্তর খুঁজিয়া পায় নাই? তাই বুঝি বাংলার মা পূজার সময় তার পীঠস্থানগুলিতে ছুটিয়া আসেন? তাই কি? তবে একথা খুব সত্য যে সারা বৎসর ধরিয়া কত আশার কত আকাঙ্খা, কত দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়াও এই পূজার ছুটীকে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকি। আশাপথ চাহিয়া থাকি কেন না, মা আসিবেন, সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া দিন কয়েকের জন্য একটু আনন্দ উপভোগ করিব; আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত অপরিচিতের সহিত মিলিবার মিশিবার একটা সুযোগ পাইব। যেদিক দিয়াই হোক সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই কিছু না কিছু ধর্ম্মজীবন লাভের আস্বাদ পাওয়া যাইবেই। ধর্ম্মজীবনে সৎসঙ্গের অত্যন্ত প্রয়োজন, এই সঙ্গ দুই প্রকার হইতে পারে। কোন পরলোকগত মহাত্মার জীবনী পাঠে ও কার্য্যকলাপ দ্বারা মনের গতি পর্য্যালোচনা করা বা কোন স্বাস্থ্যকর তীর্থস্থানে বাস করা অথবা কোন জীবিত মহাত্মার সেবা ও উপদেশ শ্রবণ করা। দেখা যাইতেছে যাহারা "দেওঘরে" পূজার ছুটীতে বেড়াইতে

আসেন তাঁহাদের অনেকেরই এখানে এইসকল বিষয় বেশ সুবিধাজনক। এখানে কারানীবাদে দুইজন মহাত্মার সহিত বেশ সদালাপ ও সৎসঙ্গ করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল, এখন যে নাই তাহা বলিতেছি না, তবে তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা শ্রীশ্রীনারদবাবা দেহ রাখিয়াছেন। তাঁহার সহিত যাঁহার একবার পরিচয় হইয়াছে তিনিই তাঁহার সদালাপ ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা মনে পড়িলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। কোন ধর্ম্ম বিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব কোনদিন দেখা যায় নাই। অথচ তাঁহার সরল ব্যবহার ও ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমান স্নেহ ও যত্নের কথা ভাবিতে নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইয়া আসিতেছে। অনেকে এই পূজার ছুটীতে তাঁহার চরণ দর্শন আকাঙ্খায় সপরিবারে দেওঘরে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গ তাঁহার অমিয়ময় বাণী কর্ম্মক্লান্ত দুর্ব্বিসহ জীবন ভারাক্রান্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধুময় প্রবাহ বহাইয়া দিত যে প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গ না করিতে পারিলে যেন সমস্ত দিনটাই বৃথা নষ্ট হইল এমন একটা উপলব্ধি মনের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া তুলিত। তাঁহার আকর্ষণ, দেওঘরে পূজার ছুটীটা কাটাইবার একটী বড় মধুর প্রলোভন ছিল। দেওঘরে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের অনেকেই যেন পূজার ছুটীকে তাঁহার দর্শনের লোভে আনন্দের সহিত এক করিয়া আনিত। আজ তিনি আর কারাণীবাদে নাই, থাকিলে আমাদের অনেকের আনন্দ রাখিবার সীমা থাকিত না। তিনি নাই কিন্তু তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, দেবোপম চরিত্র পরদুঃখকাতর অন্তর সকলকে আপন করিবার মন্ত্র আজও যেন আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। দেওঘর পুস্তকাগারের দেওয়ালের গাত্রে মর্ম্মর প্রস্তরে ঐযে তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত জহরমল জালান তাঁহার পবিত্র নাম নিত্য আমাদের স্মরণে আনিয়া দিতেছেন। কারানীবাদে যে বাড়ীতে নারদ বাবা অবস্থান করিতেন তাহার সম্মুখে জহরমল বাবু নারদ সরোবর নামে সাধারণের উপকারার্থে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। এই পুষ্করিণীর বৃহৎ ঘাট বাঁধাইয়া ও চাঁদনী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

নারদবাবা যদিও কোনওরূপ আশ্রম বা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ সকলের মনের মধ্যে যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে তাহা যুগ যুগান্ত ধরিয়া বর্ত্তমান থাকিবে সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। খৃষ্টানদিগের ভিতর ছয়দিন পরিশ্রম করিবার পর একদিন—রবিবার—ছুটীর দিন নির্দ্ধারিত আছে। এই ছুটীর দিনটি যে কেবল ঘুমাইয়া কাটাইবার দিন নয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ দিন গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিবার জন্য বিশিষ্ট দিন। কেবল উপাসনায় সমস্ত দিনটী অতিবাহিত করেন না, প্রতিদিনের কর্ম্ম হইতে বিভিন্ন কার্য্য করিবার জন্যই যেন রবিবারের ছুটী হইয়াছে। মুসলমানগণ প্রতি শুক্রবার দিন ঐরূপ আরাধনা করিয়া থাকেন। শুক্রবার তাহাদের ছুটীর দিন বলিয়া তাঁহারা অলসের মত সময় যাপন করেন না। মসজিদে গিয়া উপাসনা করেন। ছুটী শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে কার্য্যের পরিবর্ত্তন।

আমাদের ছুটীর দিনগুলি কিন্তু অন্যরকমে কাটিয়া যায়, আমরা ঠিক ইহাকে মনের মত করিয়া আয়ত্ত করিতে শিখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার বেশ স্মরণ আছে একবার পূজার ছুটী উপলক্ষ্যে আমার কয়েকজন পরিচিত যুবক লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ করিতে যান। তাঁহারা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্ণৌয়ে কি কি দেখিয়া আসিলেন? তাঁহারা উত্তর করিলেন--লক্ষ্ণৌ এ তেমন কিছু দেখিবার আছে নাকি? ভদ্রলোক উত্তর শুনিয়া ত অবাক্। বলিলেন—বলেন কি? তাঁহারা বলিলেন—"বাবা! ছুটীর কটা দিন সেখানে খালি খাওয়া দাওয়া সারিয়া আর বড় সময় পাওয়া যাইত না—একটু বিশ্রাম করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত এইরকমে পূজার ছুটীর দিনগুলি ফুরাইয়া গেল।" তাহারা না দেখিল দেশে মার পূজা, আর না দেখিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ সহর যাহার বক্ষে অতীতের অনন্ত কাহিনী নানাস্থানে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। বেশীরভাগ লোকের পূজার ছুটী এমনি করিয়া অকারণ অনর্থক অতিবাহিত হইয়া যায়।

ছুটীর অবকাশের ভিতর দিয়া আমাদের অনেক বিষয়

দেখিবার ও শিখিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে যদি আমরা ছুটীকে কেবল আলস্যের দিন বলিয়া মনে না করি।

দেওঘরে আসিয়া যে অনেকের ভাগ্যে এমন অবস্থা না ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। তাহাদের মধ্যে অনেকে ঘরে বসিয়া কেবল পশু পক্ষীকুলের ভীতি উৎপাদন যে না করেন তাহাও অবিশ্বাস করা যায় না। কারণ সেদিন ত্রিকুট বেড়াইতে গিয়া শুনিলাম সেখানে পাঁটা ও পক্ষী বিশেষগণের একটা বৃহতী বৈঠক বসিয়াছিল। অনেকগুলি resolution হইয়া ছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই একটী হইতেছে—পাঠারা বলেন "বাঙ্গলা মুল্লুকে মা বিশ্বজননী আসেন এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য পালে পালে মায়ের নিকট বলিদান দেওয়া হয়—তার যেন একটা কৈফিয়ত তাহারা দেন কিন্তু সেই আশঙ্কায় সাঁওতাল পরগনার মত অনেকটা স্বাধীন স্থানে বাংলার হাত এড়াইয়া এখানে পলাইয়া আসিলাম। কিন্তু মার সন্তানগণ মা পূজায় যোগদান না করিলেও এখানে আমাদের উদ্ধার চেষ্টা যে রহিত করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। সকলের ছুটী আছে এইসময় আমাদের একটা ছুটীর বন্দোবস্ত করিলে বড় ভাল হয়। ভীল সাঁওতালের মধ্যে আসিয়াও আমাদের নিস্তার নাই, বাবার রাজ্যে মায়ের যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে সুতরাং শীঘ্রই তাহারা এই দেশ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন বাস করিবে যদি ইহার কোনরূপ প্রতিকার না হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতেছে পক্ষীকুল বলিল—আমরা মধুর সঙ্গীতে প্রভাতী গান গাহিয়া সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করিলে কি হয়, আমরা নাকি ছুটীর বাজারের প্রধান পূজার উপকরণ হইয়া পড়িয়াছি আমাদের মূল্য ও গুণ নাকি দিন দিন অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব আমাদের জাতির যাহাতে বংশলোপ না হয় সেইজন্য ছাগল ভ্রাতার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করা সমীচিন বলিয়াই মনে হয়। পূজার ছুটী আসিলেই আমাদের সংসারে একটা ভীষণ আতঙ্ক বাড়িয়া উঠে। মা মহামায়া যদিও তেমন ভিড় করিয়া এদেশে আসেন না, তথাপি বাবা ও মা একসঙ্গে এখানে অবস্থান করায় মার সন্তানগণের ভিড় লাগিয়াই থাকে।

বাজে কথায় আর আপনাদের অধিক সময় পূজার ছুটী শেষে নষ্ট করিব না। দেওঘরের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি স্থান যে দেখিবার মত নহে তাহা নয়। দেওঘর সহর হইবার পূর্ব্বে এখান হইতে ৩ মাইল দূরে রোহিনী বলিয়া একটী সহর ছিল। এই রোহিনীর সহিত ভ্রমরের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা যে পুরাতনের একটা স্মৃতি বিজড়িত তাহা জানিবার ও দেখিবার মত। রোহিনী ভাঙ্গিয়া দেওঘর সদর হইয়াছে পূর্ব্বে রোহিনী হইতে দেওঘর বাসীকে বাজার করিয়া আনিতে হইত। দেওঘরে সকলেই সেই রোহিনীর প্রজা কিন্তু তাহার সহিত বোধ হয় অনেকেরই সাক্ষাত সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আজ রোহিনীর হাট হইয়াছে—রোহিনীতে হাট হইয়া থাকে। এখানে অনেক গুলি হাট হয় যথা সরমার হাট, মোহনপুরের হাট, রোহিনীর হাট, রিশিয়া হাট। দেওঘরের আস পাশে বেড়াইলে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়, নদী, সাঁওতাল দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আপনাদের কর্ম্মক্লান্ত সহর জীবনের উপর একটী শান্তির ও আনন্দের ছবি আঁকিয়া দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শেষে কবির ভাষায় বলিতেছি আমাদের এই মিলন যেন—

উষার কনক মেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব্ব পর্ব্বতের
শুভ্রশিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভা খানি করি বিকশিত,

তেমনি আমরা পূজার ছুটীর পর স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইলে ও যেন স্মৃতির মধুর প্রীতি কণাটুকু মনের এক কোণে পড়িয়া থাকে।

উন্মাদ

(চিত্র)

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

অনেক দিন ইচ্ছে ছিল যে ললিতের শিল্পাগার দেখ্‌তে যাব। তা' এদিন সেদিন করে যাওয়া আর ঘটে উঠেছিল না। হঠাৎ কি এক মাথায় খেয়াল চাপ্‌ল—তখনি গায়ে একটা পাঞ্জাবী দিয়ে ললিতের বাসার দিকে চল্‌তে লাগলাম।

ললিতের বাসার সামনে এসে পৌঁছুতেই, হঠাৎ ললিতের দেখা পেলাম। সে আমাকে স্নেহভরে দুইটি হাতে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "শেখর, কোথায় যাচ্ছ ভাই ?"

ললিতের স্নেহ-সম্ভাষণে আমি বড় মুগ্ধ হোয়ে গিয়ে বল্লেম, "তোমার বাসায় আস্‌ছিলাম—তোমায় দেখ্‌তে।"

এই কথা শুনে সে সরল হাসি হেসে বল্লে "তবে চল আমার বাসার ভিতর।"

ললিত তার শিল্পাগারে আমাকে বসিয়ে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বল্লে, "শেখর, কি মনে করে ভাই ?"

মৃদু হেসে বল্লেম, "এমনি—তোমায় দেখ্‌তে !"

এবারেও সে শিশুর মতন হেসে বল্লে, "বড় সুখী হলেম শেখর আজ তোমায় পেয়ে।"

এই বলে সে হঠাৎ দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কিছুকাল পরে ললিত ফিরে এসে একটি ছবির আবরণ খুলে গাঢ়-কণ্ঠে বল্লে, "শেখর, কে বোল্‌তে পার ?"

আমি এক দৃষ্টে সেই অস্পষ্ট ছবির দিকে চেয়ে রইলাম কিন্তু তার একটি রেখাও বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

আমাকে অতি মনোযোগের সঙ্গে ছবির দিকে চেয়ে থাক্‌তে দেখে, ললিত সবিস্ময়ে বল্লে, "শেখর কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ?"

ললিতের কথায় আমি আরো নিবিষ্ট চিত্তে ছবির দিকে চেয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

হঠাৎ ললিত বলে উঠ্‌ল, "এটা আমার স্ত্রীর মূর্ত্তি—এখন কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে ?"

ললিতের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেম, "কার—তোমার স্ত্রীর—কই, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ? তোমার স্ত্রীর মূর্ত্তি কোথায়—এ ত কতকগুলি রেখার সমষ্টি মাত্র ?"

ললিত আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তারপর ছবির দিকে গাঢ়-দৃষ্টি দিয়ে বল্লে, "এই যে দেখ্‌তে পাচ্ছ—কয়েকটি রেখার মৃদু টান—এই আমার স্ত্রীর মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ—কেমন, এবার বুঝ্‌তে পার্‌লে ?"

আমি ললিতের ব্যাখ্যায় মৌন হয়ে রইলাম।

ললিত অতি সন্তর্পণে সেই ছবিখানির উপর একটি শুভ্র বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদন করে ইজেলের উপর রেখে দিলে। বল্লে, শেখর, শিল্প নিয়ে বড় ব্যস্ত, তাকে দেখবার যে সুযোগ পাই নি ভাই! শুধু রেখা ক'টা দেখিছি, মনে গেঁথে গিয়েছে! তার বেশী আর কোথায় পাব—ভাই! সে যে আমার চলে গেছে!

কিছুকাল পরে তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—ললিত কি উন্মাদ হয়ে গেছে ?

রঙ্গালয়

সম্প্রতি ষ্টার থিয়েটার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক "প্রফুল্ল" অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথাকালে অভিনয়ের সমালোচনা সচিত্র শিশিরের অঙ্কে করিয়াছিলেন। "প্রফুল্লের" প্রফুল্ল ও রমেশের চিত্র দুইখানি আমরা

রমেশ—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।

এতৎসহ মুদ্রিত করিলাম। শ্রেষ্ঠ অংশের অভিনেতা নাট্যাচার্য্য সুরেন্দ্র নাথের একাধিক চিত্র আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত করিব।

* * *

বাঙ্গালার রঙ্গক্ষেত্রে এখন দুইটি দল বর্ত্তমান আছে। একটি নূতন, একটি পুরাতন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র, নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর এই পুরাতন দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের জীবনকালে এই পুরাতন দলই বাঙ্গালায় পূর্ণ গৌরবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; তাঁহাদের সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ মঞ্চের যে শ্রী, যে সৌন্দর্য্য, যে ঐশ্বর্য্য ছিল, তাঁহাদের তিরোধানের পর হইতে ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে-পাইতে বর্ত্তমানে তাহারই একটা জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র খাড়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। পুরাতন-দলের শেষ গৌরব-চিহ্ন-স্বরূপ একমাত্র নাট্যাচার্য্য সুরেন্দ্র নাথই এখনও কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই; আচার্য্য অমৃতলাল জীবিত আছেন কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র

বহুকাল পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছেন। পুরাতন-দলের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয়, নট, নাট্যকার, নাট্য শিক্ষকের অভাবে পুরাতন-দল যখন মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই নূতন দল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

* * *

বাঙ্গালার দর্শক সাধারণ যখন নূতন কিছু চাহিতেছিল, একঘেয়ে চর্ব্বিত চর্ব্বণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, রঙ্গালয়ের উপরই যখন অশ্রদ্ধা অভক্তির ভাব জাগিতেছিল—ঠিক সেই মানসিক বিবর্ত্তন ও অবসাদের সময়েই নূতন দল বঙ্গ-রঙ্গক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্-এ, নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি এই নূতন দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি বাঙ্গালার রঙ্গ-জগতকে নূতন রূপ দিয়াছে, নূতন শ্রী দিয়াছে, নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে। তাঁহাদের মত ভদ্র ও উচ্চ বংশজ, শিক্ষিত সম্প্রদায় রঙ্গক্ষেত্রে না আসিলে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের কদর্য্যতা—যাহা পুরাতন-দলের প্রতিষ্ঠাতাগণের তিরোভাবের সঙ্গেই ঘেরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল,—কখনই ঘুচিত না। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল সময়েই তাঁহারা রঙ্গক্ষেত্রের হৃত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—নাট্যামোদীমাত্রেই তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

* * *

প্রফুল্ল—শ্রীমতী নীহারবালা।

পুরাতন-দলের একমাত্র শক্তিমান নট সুরেন্দ্রনাথ আজ নূতন-শক্তির সঙ্গেই আত্মশক্তির মিলন ঘটাইয়াছেন। যতদিন তিনি জীবিত আছেন, বাঙ্গালার পুরাতন-দলের শক্তির বিকাশ দেখা যাইবে, পুরাতনের নাম শোনা যাইবে, তাঁহার অবসানে পুরাতনের নাম বোধ হয়, বাঙ্গালার পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। স্বয়ং নটনাথও তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। ঈশ্বর দানীবাবুকে দীর্ঘায়ু করুন!
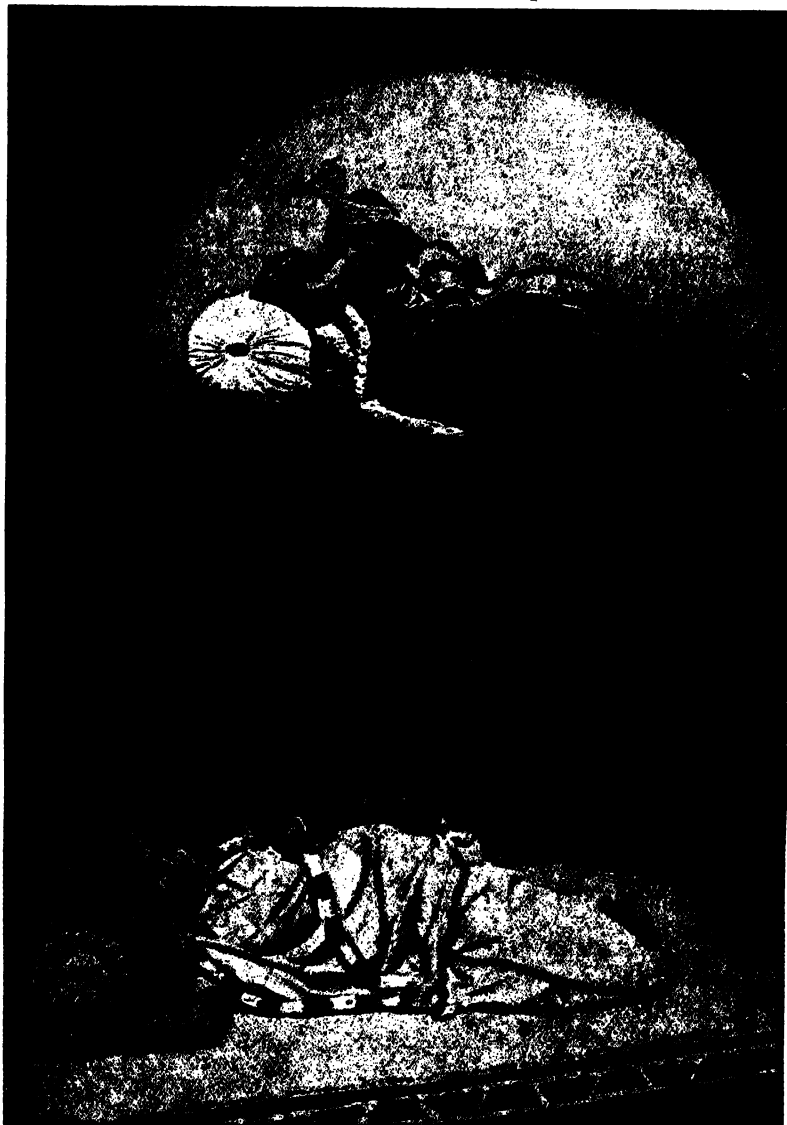
পিঙ্গল বরণ বসনখানি
মুখখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে ॥

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২৯শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩১ সাল। [২য় সপ্তাহ

বড় বাবু

বড় বাবু

আপিসের চাপরাশীর সম্মুখে।

বড় বাবু

অধীনস্থ কেরাণীর সম্মুখে।
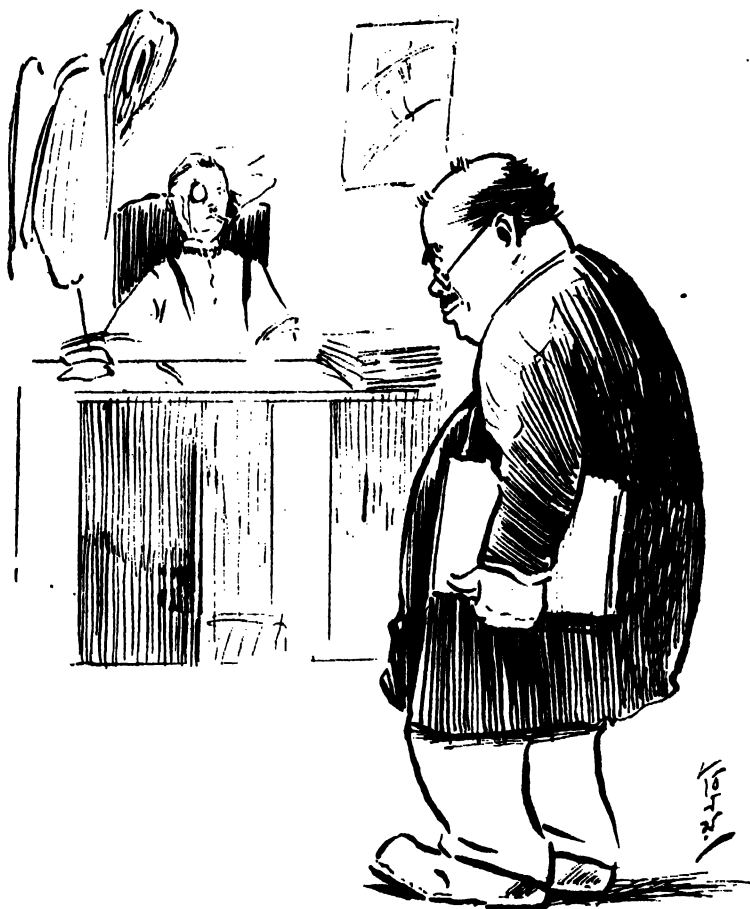
বড় বাবু

(মস্তক ঈষৎ নমিত)

ছোট সাহেবের সম্মুখে।

বড় বাবু

মেজো সাহেবের সম্মুখে।

(দর্শক মস্তকের দিকে লক্ষ্য করুন)
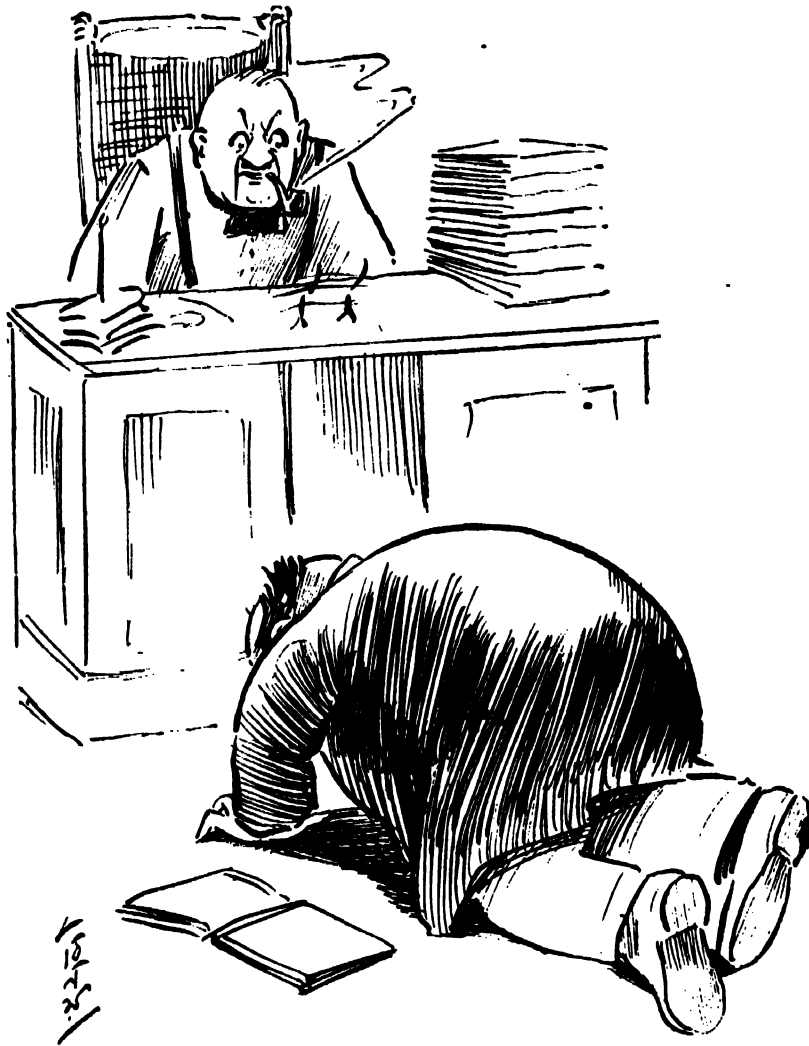
বড় বাবু

বড় সাহেবের সম্মুখে।

গোরার পায়ের মাটী

সাদরে লইনু চাটি।

(মাথাটা আছে ত ?)

বড় বাবু

গৃহে—ভৃত্য সকাশে।

বড় বাবু

গৃহে—গৃহিণী-সমক্ষে ; সজল-চক্ষে।

(অপরাধ—ভৃত্যকে প্রহার)

বড় বাবু

গৃহে—গৃহিণীর পুত্র-সকাশে—(স্কন্ধে)

(শাস্তি—সারা বিকাল ও সারা সন্ধ্যা সহিতে হইবে)।

স্বাধীন বাঙ্গলার শিক্ষা ও সমাজ

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ ভাগবতরত্ন]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী তাহার শিক্ষা ও সমাজের সকল সমস্যার সমাধান নিজেই করিত। দেশে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য বা সমাজ হইতে দুর্নীতি বিদূরিত করিবার জন্য বাঙ্গালী তখন আবেদন নিবেদনের ঝুড়ি লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইত না। বাঙ্গলা ছিল তখন স্বাধীন। এই স্বাধীন যুগে বাঙ্গালী কেমন করিয়া সমাজকে পরিচালনা করিত, সে সমাজের সংগঠনই বা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় বড় কম। তথাপি মন চায় দেশের সেই অতীতের কথা আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানের জটিল সমস্যাগুলির কিছু মীমাংসা করা যায় কিনা তাহাই বিবেচনা করিতে। সেইজন্য বহুস্থান হইতে সংবাদের টুকরা সংগ্রহ করিয়া অতীত বাঙ্গলার শিক্ষা ও সমাজের একটী চিত্র আঁকিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

অতীতের ঘন যবনিকা ভেদ করিয়া বাঙ্গলা যখন তাহার রূপ আমাদের সামনে প্রকাশ করেন, তখন এটাতে আর্য্যগণ বসবাস আরম্ভ করেন নাই। ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১) হইতে বাঙ্গলার প্রাচীনতম সমাজের কথা একটু জানা যায়। বেদের ঋষিরা অনার্য্যদের আচার ব্যবহারকে ভাল চোখে দেখিতেন না। তাই বাঙ্গলার সেকালের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহারা কদর্য্য খাদ্য ভক্ষণ করে। আর সেকালের বাঙ্গলীরা বোধ হয় কামপ্রবণ ছিলেন—তাই বেদের ঋষি তাহাদিগকে কাক ও চটক সদৃশ বলিয়াছেন।

তারপর বহু যুগ অতীত হইয়া গেল। আর্য্যগণ বাঙ্গলাদেশের সহিত অল্পে অল্পে পরিচিত হইতে লাগিলেন। বাঙ্গলাদেশেও যে তীর্থ থাকিতে পারে একথা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইলেন। সেই তীর্থ পরিদর্শনের জন্য যাঁহারা বাঙ্গলা দেশে আসিতেন, তাঁহাদের কোন দোষ হইত না। কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র বেড়াইবার জন্য বাঙ্গলায় আসিতেন, আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতেন। ইহা হইতে আমরা এই বুঝি যে সভ্যতার সেই প্রথম প্রত্যুষেও বাঙ্গলার সুজলা সুফলা ভূমির এমনই একটা আকর্ষণ ছিল, যে অনেক আর্য্য বংশধর সামাজিক বাধাকে অবহেলা করিয়াও এদেশে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। ব্যাপারটা এরূপ না হইলে মনুসংহিতাকার ঐরূপ নিয়ম করার প্রয়োজন বুঝিতেন না। বৌধায়ন নামে আর একজন সূত্রকার বলিয়াছেন যে যদি কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরীর দেশে আগমন করেন, তবে তাঁহাকে একটী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। (১।১।১২)

এই সময়ের মধ্যে আর্য্যগণ যে বাঙ্গলা দেশের সহিত অনেকটা পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য আমরা পাই জৈনদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র হইতে। খৃষ্টের জন্মিবার প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামী আবির্ভূত হ'ন। তিনি আমাদের বাঙ্গলা দেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া ঐ গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তিনি "রাঢ়দেশে" "বজ্জভূমি" ও "সুব্ভভূমির" মধ্যে অতিকষ্টে বার বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রাঢ়দেশ হইতেছে রাঢ় আর বজ্জভূমি বোধ হয় বীরভূমির নামান্তর। যাহা হউক জৈন গ্রন্থকার বলেন যে বজ্জভূমিতে সে সময়ে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড হাতে করিয়া বেড়াইতেন। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে বাঙ্গলা তখনও ভাল করিয়া আর্য্যভূমিতে পরিণত হয় নাই। তবে জৈনদিগের চতুর্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রে আর্য্য বা পুণ্যভূমির মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।

যাহা হউক খৃষ্টের জন্মিবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গলাদেশ আর্য্যভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কেননা মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর্য্যদেশ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

বাঙ্গলাদেশে কোনদিনই আদিম অধিবাসীদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করা হয় নাই। আর্য্য ও অনার্য্য পাশাপাশি ভাইয়ের মতন বাস করিয়াছে। বোধহয় উভয় জাতির মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যও চলিয়াছে। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে একদিকে যেমন শিক্ষা ও আচার দিয়া সভ্য করিয়া তুলিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অনার্য্যের সহিত রক্তমিশ্রনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনেক আচার ব্যবহার দেবদেবীকেও স্বীকার করিয়া লইতেছিলেন। ব্যাপারটা এরূপ না হইলে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর চেহারার মধ্যে এতখানি বৈচিত্র্য দেখা যাইত না। আর আমাদের আধুনিক সমাজের আচার ব্যবহারও বৈদিক ও পৌরাণিক আচার ব্যবহারের সহিত এতটা তফাৎ হইত না। সকলেই জানেন বাঙ্গলার অনেক আচার তাহার নিজস্ব—ভারতের কোথাও আর তাহা নাই। এ নিজস্বত্ব বাঙ্গালী পাইল কোথা হইতে? আমার মনে হয় এ সকল জিনিষ বাঙ্গালী তাহার অনার্য্য পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

বাঙ্গালীর রক্তের মধ্যে যে অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণ আছে, ইহা যদি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় স্থির হইয়াই যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর অপমান বোধ করিবার কিছু নাই। বাঙ্গলার culture বা শিক্ষা—সভ্যতার চৌদ্দ আনা বোধ হয় আর্য্য। এ কথার প্রমাণ আমরা বাঙ্গলার পরের যুগের সমাজের কথা আলোচনা করিলেই পাইব।

সাধারণের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বাঙ্গলাদেশে বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনা ছিল না। আদিশূর নামে একজন রাজা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলদেশে পাঁচজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন বিশুদ্ধ কায়স্থ আনিয়া বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন ও বঙ্গদেশে বৈদিক আলোচনার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই আদিশূর রাজা কে তাহা ঐতিহাসিক ভাবে আজও আমরা জানিতে পারি নাই। আদিশূর উপাধি বাঙ্গলার অনেক ছোট বড় রাজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বলিতেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আদিশূর রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের মত সম্প্রতি খণ্ডিত হইয়াছে। তবে আটবৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দামোদরপুর নামক গ্রামে যে পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীরও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন ও তাঁহারা যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য রাজ সরকার হইতে অনুগ্রহ পাইতেন। এই পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে এক অভিনব আলোক সম্পাত করিয়াছেন। এই তাম্রশাসন পাঠ করিলে আর কাহারও বলিবার উপায় থাকিবে না যে বাঙ্গলাদেশে অনার্য্যসভ্যতা ছিল; বহুপরে এদেশে আর্যসভ্যতা আগমন করিয়াছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ যুগে এই তাম্রশাসনগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার একখানি ৪৮৮খৃষ্টাব্দের। সেই খানিতে আছে যে একজন ব্রাহ্মণ "পঞ্চহোত্র যাগীয়" অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞাদি করিবার জন্য কয়েকখানি গ্রাম গুপ্তসম্রাটদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির কোটিবর্দ্ধন—বিষয়ের অধিবাসী। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে আর্য্যসমাজানুমোদিত চাতুর্বণ্য সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা দামোদরপুরের তাম্রশাসনে কায়স্থ, বণিক প্রভৃতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সকল জাতির আবার নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘ বা সভা ছিল। সেগুলি হইতে একজন প্রধান নির্ব্বাচিত হইয়া রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য মহকুমায় প্রেরিত হইতেন।

প্রাচীন বাঙ্গলার সমাজের সহিত রাষ্ট্রের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙ্গলার জাতিগুলি তখন ছত্রভঙ্গ ছিল না। রাজা তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেন। তাই উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে রাজকর্ম্মচারী কায়স্থ, বণিক প্রভৃতির প্রতিনিধিদের পরামর্শ লইয়া কার্য্যাদি করিবেন।

বাঙ্গলার সমাজ একাগ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের উপাসনা বহুদিন করে নাই। বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব আসিয়া বাঙ্গলার সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং দেশের অনেক লোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম জাতি ধর্ম্ম বা চাতুবর্ণ্য সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল একথা বলিলে ইতিহাসকে ঠিক বুঝা হইবে না। আমরা

পালরাজাদিগের প্রশস্তি, দানপত্র প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে তাঁহারা আইন করিয়া কোনদিন জাতিবিভাগ উঠাইয়া দেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই জাতিত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই অনেক বৌদ্ধ জাতি রাখিয়াই ধর্ম্মগ্রহণ করিতেন ইহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন। পালবংশের গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মপালদের "বর্ণান্ স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাতা" অর্থাৎ যে যে জাতির লোক, তাহাকে সেই সেই জাতিতেই স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশধর ঘোষণা করিয়াছেন। পালরাজাদের যে মন্ত্রীবংশ তিনপুরুষ ধরিয়া মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা কেবল রাজনীতির চর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন না—আর্য্যশাস্ত্র সমূহে তাঁহারা অশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলাকে একেবারে জাতিচ্যুত করে নাই।

তবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গলার তথাকথিত অনুন্নত জাতিদের সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কৈবর্ত্তজাতির আজকাল বাঙ্গলাদেশে তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ইঁহাদের প্রতাপে প্রবল পরাক্রান্ত পালসম্রাটগণ একেবারে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। একবার তো তাঁহারা পালরাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। যে পালসাম্রাজ্য একদিন কনোজকে পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল, সেই পালসাম্রাজ্য কৈবর্ত্তশক্তির প্রতাপে কিছুকালের জন্য ধ্বংস হইয়া গেল। "কলিকালের বাল্মিকী" সান্ধ্যকর নন্দী তাঁহার "রামচরিত" নামক ঐতিহাসিক কাব্যে কৈবর্ত্তশক্তির হস্তে রামপালের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাড়ী ডোম প্রভৃতি জাতিও বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্মজগতের অনেকখানি অধিকার লাভ করিল। বাঙ্গলাদেশে আজ ও অনেক স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। এ পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নহে—ডোম। তাহারাই এ ধর্ম্মের সর্ব্বেসর্ব্বা। এ অধিকার তাহারা পালযুগেই লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সকল আধুনিক অনুন্নত জাতির মধ্যে সে যুগে অনেক বিদ্বান লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত পদ ও গাথা আজও নেপালে গীত হইয়া থাকে।

পালরাজাদের সময়ে বাঙ্গলাদেশের সমাজে আর একটী বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিবার বিষয়। পালরাজারা বাঙ্গলার বাহিরে বিবাহ করিতেন। কয়েকজন পালসাম্রাজ্ঞী রাষ্ট্রকূটবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুলজীগ্রন্থে আস্থাস্থাপন করিলে বলিতে হয় যে পালরাজাদের সময়ে সুবর্ণবণিকেরা বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করেন। তাঁহাদের হাতে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল। আধুনিক কালের ন্যায় সেকালেও তাঁহারা বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় capitalist বা ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন।

পালরাজাদের পর সেনরাজগণের অভ্যুদয় হয়। নেপলিয়ন যে জন্য গণতন্ত্রমূলক ফরাসী সমাজে আবার আভিজাত্য সৃষ্টি করেন, সেনরাজগণও বোধ হয় সেই কারণেই কৌলীন্য স্থাপন করিয়া বাঙ্গলার সমাজে এক নবনীতি প্রবর্ত্তন করেন। বাঙ্গলাদেশের বুদ্ধিমান জাতিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠবংশগুলির সাহায্য রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য হয়তো দরকার হইয়াছিল। সেই জন্যই বল্লাল কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন। তবে এজায়গায় একটু গলদ আছে। সেনরাজাদের প্রায় শতাধিক লিপি আবিস্কৃত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে একখানিতেও তাঁহারা আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়াছেন একথার কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে আমাদের দেশে শত শত কুলগ্রন্থ বল্লালী কৌলীন্যের উল্লেখ করিয়াছে। এক্ষেত্রে আমরা সেগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির মধ্যে সেনরাজগণ কিরূপে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র উচ্চ জাতিগুলির মধ্যে নূতন নিয়ম করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই। আজ যে আমরা কথায় কথায় নবশাখ জাতির উল্লেখ করি, এ নবশাখজাতি বল্লালী সৃষ্টি বলিয়াই কুলগ্রন্থগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। নবশাখের শুদ্ধ নাম নবশায়ক – সেগুলি এই—

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুমারঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

অর্থাৎ—তিলী মালী তাম্বুলী, গোপ নাপিত গোছালী
কামার কুমার পুঁটুলী, এই নব শাখাবলী ॥

ইংরাজরাজারা যেমন মধ্যযুগের Capitalist য়িহুদী-দিগের উপর অত্যান্ত অত্যাচার করিতেন, তেমনি বল্লালসেন সুবর্ণবণিকদিগের উপর যারপরনাই অবিচার করিয়া গিয়াছেন। সুবর্ণবণিকেরাই বৈশ্য ছিলেন কিন্তু বল্লালকে একবার অনেক টাকা ধার দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগকে একেবারে জল অচল শ্রেণীতে নামাইয়া দেন। আমাদের দেশের সমাজের সুদৃঢ় বন্ধন যে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল তাহা স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রণোদিত রাজার এইরূপ ব্যবহার হইতেই জানিতে পারি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগের ন্যায় সমাজ যদি এ যুগেও প্রবল থাকিত, তাহা হইলে রাজা এরূপ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম উঠাইয়া না দিলেও, সমাজের শক্তির অনেক হ্রাস করিয়াছিল, তাই সমাজের মেরুদণ্ড এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাই।

বাঙ্গলাদেশের প্রজারা রাজার হাতে একেবারে খেলার পুতুল ছিল না। তাহারা উপযুক্ত রাজাকে প্রাণ দিয়া সেবা করিত, আবার অনুপযুক্ত রাজাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে পারিত। গুপ্তযুগে কেমন করিয়া রাজ সরকার কায়স্থ বণিক প্রভৃতির প্রতিনিধিদের মত লইয়া কাজ করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তারপর বাঙ্গলাদেশে যখন ক্রমাগত কামরূপী, কাশ্মিরী, গুর্জ্জর প্রতিহারদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন প্রজারা সকলে তাহাদের বিরোধ ভুলিয়া সমবেত হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। গোপালের অধীনে বাঙ্গলার প্রজাশক্তি সাগর পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের সীমা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাঙ্গলার জনশক্তি বঙ্গদেশকে "বৃহদ্ বঙ্গে" পরিণত করিয়া ছিল। আবার কৈবর্ত্ত আক্রমণে পালসাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে, বাঙ্গলার প্রজার সাহায্য ও সহানুভূতি লইয়াই রামপাল হৃত পিতৃসিংহাসন পুনরায় পাইয়াছিলেন।

প্রাচীন সমাজে বাঙ্গলার নারী সম্বন্ধে এইবার কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। একজন ফরাসী মহিলা পৃথিবীর প্রাচীন বীরাঙ্গনাদের নাম ও বিবরণী প্রকাশ করিয়া নারীর অধিকার স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। আপনারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে তাহার মধ্যে আমাদের দেশের ময়নামতীর বীরত্ব কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই ময়নামতীর কথা আমাদের দেশের কয়জন লোক জানে? অথচ বিদেশের নারী তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিয়াছেন। ময়নামতীর কথা গোবিন্দচন্দ্রের গীতে সবিশেষ বর্ণিত আছে। কাঠ পাথরের সাক্ষ্য তাঁহার সম্বন্ধে না পাওয়া গেলেও তিনি যে সত্যই বীর মহিলা ছিলেন, তাহা রঙ্গপুরে তাঁহার নামের সহিত জড়িত অনেকগুলি স্থান সাক্ষ্য দিতেছে। যে সমাজে ময়নামতীর ন্যায় বীরমহিলার উদ্ভব হইয়াছিল, যে সমাজে ময়নামতী সমস্ত রাজ্যপরিচালনা করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, সে সমাজে নারীকে কেবলমাত্র উপভোগের জন্য দাসী করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে বাঙ্গলার মেয়েদের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন বাঙ্গলার মেয়েরা নিজের দোষ ঢাকিতে বড় পটু—পরের সামান্য একটু ত্রুটী দেখিলে হাসিয়া লুটপাট হয়—তাহারা সর্ব্বংসহা অর্থাৎ কোন দুঃখেই তাঁহারা বিচলিত হয়েন না। তবে বাৎস্যায়ন ও কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্র পড়িলে অনুমান হয় যে নারীকে তখনও অবরোধের মধ্যে বাস করিতে হইত। অবরোধ মুসলমান যুগের নূতন আমদানী নহে। কিন্তু এ অবরোধ মুসলমানদের জেনানার মতন কঠোর নহে। বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ যুগের কবি ধোয়ী তাঁহার "পবনদূতে" বাঙ্গলার নারীর প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে সেকালে বাঙ্গলার মেয়েরা তালপত্রের গহনা কাণে দুলের মতন করিয়া পরিতেন।

স্বাধীন বাঙ্গলার সমাজে আমোদ প্রমোদের অভাব ছিল না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন বঙ্গের গৌরবের মধ্যে থিয়েটারের উল্লেখ করিয়াছেন। থিয়েটারকে আমাদের দেশে প্রেক্ষাগৃহ বলিত। ভরত তাঁহার "নাট্যশাস্ত্রে" নাটকের চারিপ্রকার ভেদ করিয়াছেন—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্র মাগধী। এই শেষোক্ত প্রকারের নাটক পূর্ব্বদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ওড্র-মাগধী প্রণালীর নাটক বঙ্গদেশেই বিশেষ খ্যাতি লাভ

করিয়াছিল। ভরতমুণি বলেন যে বঙ্গদেশ হইতে মলচ, মল্ল, বর্দ্ধক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। "এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে ইহারা প্রহসন ভালবাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, পূর্ব্ববঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালবাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান বাজনা নাচ—এসব ভালবাসিত না।" পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে "খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নহে।"

খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভরতমুণি বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী নাটকের মধ্যে নাচগান ভালবাসিত না। কিন্তু খৃষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে যে বাঙ্গালী নৃত্যকলায় সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা "রাজতরঙ্গিনী" হইতে পাই। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে কাশ্মীরের রাজকুমার জয়ন্ত ছদ্মবেশে বঙ্গদেশে আসিয়া কমলা নাম্নী নর্ত্তকীর অভিনব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেকালের নর্ত্তকীরা ভদ্র ব্যবহারে ও সামাজিক আদব কায়দায় সকলের মনোহরণ করিত। রাজকুমার জয়ন্ত কমলার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু খৃষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের সময়ে বাঙ্গালী বোধহয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আমোদ প্রমোদে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। ধোয়ী কবি তাঁহার "পবনদূতে" বলিয়াছেন যে বিজয়পুরের অর্থাৎ সেন রাজাদের তদানীন্তন রাজধানীতে প্রকাশ্য রাজপথে তরুণী নর্ত্তকীরা মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া নূপুর নিক্বণে রাজপথ মুখরিত করিত। সুরসিক নাগরিকবৃন্দ তাহাদের সেই নৃত্যের সহিত যোগ দিত।

কিন্তু সেন রাজাদের যুগে বাঙ্গলার শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশ চিরদিনই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে জ্ঞান প্রচারের জন্য শিক্ষাগুরু প্রেরণ করিয়াছে। হুয়েন সাং যখন আমাদের দেশ পরিদর্শন করিতে আসেন তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বাঙ্গালী অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তাঁহার নাম শীলভদ্র। তিনি সমতটে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হুয়েনসাং স্বয়ং প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া তিনি বহু পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইতে পারেন নাই। নলেন্দায় যাইয়া শীলভদ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি সেগুলি সুন্দরভাবে হুয়েনসাংকে বুঝাইয়া দেন। হুয়েনসাং মুগ্ধ হইয়া এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের পদতলে বসিয়া পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষালাভ করেন।

শীলভদ্রের পরে শান্তরক্ষিত অতীশ দীপাঙ্কর প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত সমগ্র ভারতের মধ্যে জ্ঞানের খ্যাতি লাভ করিয়া সুদূর তিব্বতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তিব্বতে যাইয়া বাঙ্গলার শিক্ষা ও সভ্যতা তথায় প্রচার করেন। ইঁহাদের পরে লুই সিদ্ধাচার্য্য, বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতি নেপালে বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন।

বাঙ্গলার রাজা নয়পাল বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানে বাঙ্গালী দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশের মধ্যেই একটী বিশ্ববিদ্যালয় পাল রাজাগণ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নাম জগদ্দল মহা-বিহার। "রামচরিত" হইতে জানা যায় যে এটী গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরে অবস্থিত ছিল। এখানে বাঙ্গলার একটী শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন। বিভূতিচন্দ্র ও দানশীল নামক জগদ্দল বিহারের ভিক্ষুদ্বয়ের অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয়গণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে বাঙ্গলার বৈদিক আলোচনা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাল রাজাদের মন্ত্রীরা বেদ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন একথা তাঁহাদের লিপি হইতেই জানা যায়।

বৈদিক শিক্ষা সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে

বিশেষভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যেটুকু ক্ষতি করিয়াছিল, তাহা সারিবার জন্য সেন রাজাদের যুগে স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। মনুসংহিতার টীকাকার গোবিন্দরাজ "স্মৃতিমঞ্জরী" নামে একখানি সুবৃহৎ স্মৃতির নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি ও জীমূতবাহন, তাঁহাদের অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভাবলে দায়ভাগে বাঙ্গলার একটা নিজস্ব মত স্থাপন করেন। সম্পত্তি বাঙ্গলা-দেশে ও ভারতের বংশগত ছিল। কিন্তু ইঁহারা সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত করিলেন। বাঙ্গলা চিরদিনই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তাই বাঙ্গলার স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সেনরাজাদের যুগে বাঙ্গলাদেশে কাব্য শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা নিজে গ্রন্থরচনা করিতেন। তাঁহাদের রাজসভায় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবিগণ পূজার্ঘ্য পাইতেন। জয়দেব, তাঁহার "গীত গোবিন্দে" ধোয়ী, উমাপতিধর, প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ধোয়ী কবির পবনদূত কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্বাধীন বাঙ্গলার শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই মনে হয় যে এ একটা জীবন্ত সমাজ। যেটুকু পরিচয় আমরা স্বাধীন বাঙ্গলার পাই, তাহাতেই ইহার শক্তি ও সুদৃঢ়বন্ধনের কথা জানিতে পারি। বাঙ্গলার সমাজ যতদিন সজীব স্বাধীন ছিল, দেশও ততদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

"রাণী মুদিনীর গলি"
যোগেশ—নাট্যাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
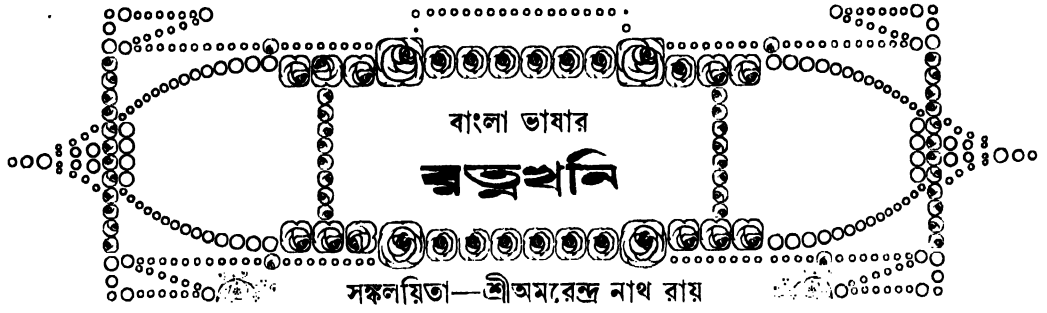
রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-চিন্তা

সাহিত্য :—

অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে ; প্রথমতঃ 'ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য বাক্য' অর্থাৎ মনোগত ভাব প্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য। দ্বিতীয়, 'উদ্দেশ্য বাক্য' অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের উদ্দেশ্যে প্রোক্ত বাক্য। এবং যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য সকলের সুশৃঙ্খলায় প্রয়োগ বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে, তাহার নাম সাহিত্য,--অর্থাৎ বাক্য-বিষয়ক হিতকারি শাস্ত্র।

বাক্য-কৌশল :—

কবিদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে সদ্ভাবকে উজ্জ্বল ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেন। ঐ ভঙ্গী সিদ্ধ করিতে কদাপি অর্থের কৌশল এবং কদাপি শব্দের কৌশল অবলম্বিত হয়। সাহিত্য-কারেরা এই কৌশলদ্বয়কে অলঙ্কার শব্দে অভিধান করেন ; সুতরাং অলঙ্কার দুই প্রকার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কবিরা অর্থালঙ্কারকেই শ্রেষ্ঠ মানিতেন ; এবং তাহার প্রয়োগেও তাঁহারা বিশিষ্ট নিপুণ ছিলেন। আধুনিক কবিরা তাহার বিনিময়ে শব্দালঙ্কারের অনুরাগী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রাস-যমকের সাহায্যে মনের পরিবর্ত্তে কর্ণের বিনোদ অধিক হয়। ইহা উল্লিখিত করা বাহুল্য যে শব্দালঙ্কার সাবধানে স্থানবিশেষে প্রযুক্ত হইলে অতীব রমণীয় বোধ হয় ; পরন্তু মনুষ্য দেহের স্থানে স্থানে সন্ধিস্থলীতে অলঙ্কার না দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আভরণে আচ্ছাদিত করিলে যেরূপ সৌন্দর্য্যের হানি হয়, সেইরূপ অবিবেচনায় কবিতার সর্ব্বত্র যমকের আবরন হইলে রসের একান্ত ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

ছন্দ প্রয়োগ :—

ছন্দোময় লিখিত প্রবৃত্ত হইয়া স্থলবিশেষে কি প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করিলে কাব্য উত্তম হইতে পারে, ইহা কবির নিরূপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারাই কবির কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইবে যে যেখানে বীররস বিষয়ক কাব্য বলিতে হইবেক, সেই স্থলে তদুপযুক্ত বীর্য্য বিশিষ্ট ছন্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আদিরস বিষয়ক বর্ণনা করিতে হইলে বীররসের ছন্দ তথায় প্রয়োগ করা কোনমতেই পারিপাট্য হয় না। স্ত্রীলোকের কথোপ-কথন স্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দ প্রয়োগ করা যথার্থ কবির লক্ষণ নহে। তাহা হইলে কাব্যের অপকর্ষ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। আমরা ভবভূতিকে একজন মহাকবি বলিয়া জানি। যে ব্যক্তি তাঁহার উত্তর চরিত, বীর চরিত, মালতী মাধব পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার কবিত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহাকবিরও অনেক স্থলে আমরা নিন্দা করিয়া থাকি। তিনি মালতী-মাধব মধ্যে স্ত্রীলোক-দিগের মুখ হইতে এমনই সমস্ত পদ ও কঠিন কঠিন শব্দ

বিনির্গত করাইয়াছেন, যে বড় বড় বিদ্বান লোকের মুখ হইতেও সে প্রকার শব্দ ও পদ নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। শ্রীহর্ষ এ বিষয়ে ভবভূতি অপেক্ষা প্রশংসনীয়। তিনি আপন রত্নাবলীর প্রাকৃতে তাহার বিশেষ নিদর্শন দিয়াছেন। তথায় স্ত্রীলোকের মুখ হইতে যে প্রকার কোমল মধুর শব্দ নির্গত হওয়া উচিত, কবি তদ্বিষয়ে যতদূর করিতে পারেন করিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন রত্নাবলী বিলাপ করিয়া আপনার দুঃখ আপনাকে জানাইতেছেন, সেই সময়ে কবি, শব্দ-প্রয়োগ-বিষয়ে, যে প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সংস্কৃতাভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তির তাহা অবিদিত আছে? কালিদাসের এ বিষয়ে কথাই নাই। বিলাপের সময় কি প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়া সকলে বিলাপ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার অজ-বিলাপ আর রতি-বিলাপেই দেদীপ্যমান। পরন্তু কালিদাস প্রভৃতির কথায় প্রয়োজন কি? আমাদের ভারতচন্দ্র-চন্দঃ-প্রয়োগ-বিষয়ে সামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার দক্ষ যজ্ঞ-নাশ ও রতি-বিলাপ এই দুই স্থলের ছন্দ পাঠ করিলে বোধ হয় যেন প্রকৃত কেহ সেই সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি তিনি রতি-বিলাপের সে প্রকার ছন্দ প্রয়োগ না করিয়া দক্ষযজ্ঞ-নাশের ছন্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই তাহার প্রশংসা করিতাম না।

নাটকে পদ্য রচনা :—

কৌতুক ব্যঙ্গ বা অদ্ভুতের বর্ণনস্থলে পদ্য-রচনায় হানি নাই; তত্তদ্স্থানে কাব্য সম্ভবপর বটে। ফলতঃ নাট্যশালায় পয়ারাদিতে বীর রসাশ্রিত নাটকের অভিনয় করিলে মাদৃশ অকিঞ্চিৎকরদিগের বিবেচনায় সমুদায়ই পাঁচালির অনুকরণ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে অন্যান্য দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষায় কবিগণ এতাদৃশ নাটকে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন; পরন্তু তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে সংস্কৃত কবিতা আমাদের পয়ারের তুল্য নহে, সুতরাং উভয়ের তুলনা হইতে পারে না। ইংরাজী লাটিন ও গ্রীক্ কবিতা সকল মাত্রাছন্দে রচিত হয়। তাহাতে প্রতিপদের শেষ অক্ষরে অনুপ্রাসের প্রয়োজন রাখে না। এই প্রযুক্ত তৎ পাঠে গাম্ভীর্য্য রসের প্রকাশ পায়। সংস্কৃতও অনুপ্রাসের দাস নহে। অতএব, তৎপাঠেও পয়ারের ন্যায় প্রতিকথায় ঠনন্ ঠনন্ ঘণ্টা ধ্বনি হয় না, সুতরাং তাহাও অনুশ্রাব্য নহে। এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় মাত্রাছন্দে পদ্য প্রায় প্রচলিত নাই; অপর তদ্রূপ পদ্য রচনা করিলেও গদ্যের ন্যায় বোধ হয়।
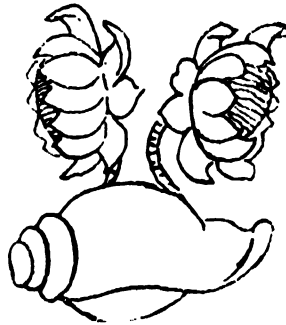
মৃত্যুর রূপ

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

দখিনা বাতাস মৌন মূক অতীতের নন্দন কানন থেকে পারিজাতের সুরভি বহে' আনছিল। সন্ধ্যারাণীর হাওয়ায় দোলা আঁচলখানির পুলক পরশ আমার মনে প্রাণে অপূর্ব্ব শিহরণ জাগিয়ে দিতেছিল।

যমুনা বহে চলেছিল। আজ আর তার সে রূপ ছিল না, সে উচ্ছ্বাস ছিলনা, সে প্রবাহ ছিল না! চাঁদের আলোয় তার বুকের জলে রাধা শ্যামের সোণার তরী ভেসে চলত না! তার কিনারায় রাখাল বালক কদম্বের ডালে বসে বিশ্বমাতান আকুল-করা গান বাঁশীর সুরে ধ্বনিয়ে তুলে ডাকত না,—"কে আছ কোথায়! জাগ! ছুটে এস! মোহনিদ্রা দূরে ফেল, আমার আনন্দ, আমার রূপ, আমার গানের সুরে তোমরা জাগ!"

হায় যমুনে! কী দিনই তোমার গেছে! এখন একথা ভাবতেও সন্দেহ হয়—

"যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী!
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীল কান্ত মণি!"

আর কি আসবে না—আর কি ফিরবে না সেই দিন—যা চলে গেছে?

সহসা চমকে উঠে শুন্‌লুম—

"ফিরবে না? ফিরবে না? না—না—অমন কথা বল না! আমি যে কত আশা করে বসে আছি আবার ফিরবে, আবার তারা জাগবে! ভুলে যাওয়া বীণা আবার বেজে উঠ্‌বে! চলে যাওয়া পথের বুকে চির পরিচিতের রাঙা পায়ের চিহ্ন আঁকা রবে! ফিরবে না? সেই ত যমুনার তীর—সেই ত মেঘে ছাওয়া অসীম আকাশ—সেই ত বনের মাঝে পাখীর কাকলী। বল, বল তুমি, আশ্বাস দাও, আবার তাদের পাব—?"

জিজ্ঞাসা করলুম "কে তুমি মা? কাদের কথা বলছ? তুমিই কি যমুনা—?"

"না রে বাছা—! আমি কেউ নই! যেন সব ভুলে গেছি! যেন কিছু ছিল না!—আমার স্বামী—পুত্র—পুত্রবধূ কেউ ছিল না! স্বপ্ন - না, তা ত নয়! ছিল, সব ছিল! যমুনার বুকে তারা ডুবে মায়ারাজ্য দেখতে গেছে! এখনও আসছে না কেন, বলতে পার তুমি? তুমি কি তাদের দেখেছ? দে'খনি? শুনবে তাদের কথা? আচ্ছা বলছি শোন—

"সেই যে ওখানে দেখছ খানিকটা মাটীর স্তূপ পড়ে রয়েছে—ওইখানে আমাদের রাধামাধবের মন্দির ছিল। আমরা কুঁড়ে ঘরে থাকতুম। অবস্থা আমাদের নিতান্ত খারাপ ছিল না; কোনও রকমে দিন যাপন হত! আমার ছেলে সত্য সব পড়া সাঙ্গ করে ঘরে ফিরে এসেছিল, তাই বড় আনন্দে সেদিন ঠাকুরের পূজা সাঙ্গ করে পাঁচ ব্যঞ্জন রেঁধে একজন অতিথি ব্রাহ্মণকে খাওয়াব সঙ্কল্প করেছিলুম। স্বামী বড় নিষ্ঠাবান ও ভক্তপুরুষ ছিলেন। হৃষীকেশের চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সংসারের বিশেষ কোন কথায় মনোযোগ দিতেন না। তিনি বললেন "আমরা কারুকে ডেকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব না। মাধবের কৃপা থাকলে অতিথি আপনি আমাদের বাড়ীতে আসবেন।"

তাঁর কথামত আমরা সকলে উপবাস করে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। সেদিন ছিল দ্বাদশী। দুপুর হয়ে গিয়েছিল। আমি ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। আরও এক প্রহর কেটে গেল। এমন সময় শুন্‌তে পেলুম কে বাইরের দরজার কাছে এসে ডাকলেন "গৃহস্থের জয় হোক।"

স্বামীর মুখ রক্ষা করেছেন বলে ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করলুম। সত্য তাড়াতাড়ি অতিথিকে সমাদর করে ঘরে ডেকে নিয়ে এল। সৌম্য শান্তমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ—সঙ্গে তাঁর বছর বার তেরর একটী মেয়ে। স্বামী তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য আসন ও হাত পা ধোবার জল রেখে দিলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ আমাদের সকলকার দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে শেষে বললেন "আমার একটা কথা রাখতে যদি স্বীকার পাও তবেই তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করব। নইলে বল আমরা অন্যত্র আশ্রয় দেখি।

স্বামী বললেন "সে কি কথা বলুন, আমাদের সাধ্য হলে, নিশ্চয়ই আপনার আজ্ঞা পালন করতে ক্রটী করব না।"

আগন্তুক বললেন "আমার বড় ইচ্ছা নির্জ্জন পাহাড়ে বসে সাধনা করব। কিন্তু মেয়েটীর কোনও উপায় না করে যেতে পারছি না। লক্ষ্মী দুবছর বয়সে মাতৃহারা হয়। সেই থেকে আমি তাকে মাধবের গুণ-গান শিখিয়ে এত বড় করেছি। তার শিক্ষা শেষ হয়েছে। তুমি যদি মেয়েটীর ভার নাও ও তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দাও আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি।

আমি বললুম "মেয়েটীর নাম লক্ষ্মী—স্বভাব ও বড় লক্ষ্মী! মনে হচ্ছে রাধামাধব নিজেই আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। গোলকের লক্ষ্মী নিজে এসে আমাদের কুঁড়েয় ধরা দিয়েছেন। দেখছ না কি মমতা মাখানো শান্ত মুখখানা? আমাদের অমত করবার কোন কারণই নেই।"

স্বামীও বললেন "রাধামাধবের তাই যদি ইচ্ছা হয় নিশ্চয়ই সত্যর সঙ্গে মেয়েটীর বিবাহ দেব।"

অজ্ঞাত কুলশীল হলেও বিধাতার দান বুঝে আমরা আনন্দিত মনে লক্ষ্মীকে বরণ করে নিলুম।

লক্ষ্মী মেয়েটীর সঙ্গে আমাদের যতই নিবিড়তর পরিচয় হতে লাগল ততই তার গুণে মুগ্ধ হয়ে পড়লুম। সংসারের কাজ, ঠাকুরের সেবা কোন বিষয়েই তার ক্লান্তি ছিল না। 'মা' 'মা' করে আমার কাছটীতে এসে বসত; রামায়ণ মহাভারতের কতকাহিনী মুখে মুখে বর্ণনা করত; তার রাঙা অধরে মিষ্ট হাসি সদাই লেগেছিল। কিন্তু যখন একেলাটী সে কোথাও বসে থাকত দেখতুম উন্মনা হয়ে সে যেন কি ভাবত! জানিনা কোন সুদূরের ছবি জেগে তাকে চঞ্চল করে তুলত! ছেলেবেলাকার কথা——তার বাপের কথা— তার খেলার সাথীদের কথা ভেবে হয়ত সে ব্যাকুল হয়েছিল! যেন বোধ হত এ জগতের সে কেউ নয়! কালের স্রোতে সে যেন ভেসে চলেছে——কোন অজানা লক্ষ্যের পথে, তার ঠিকানা নেই! তাকে স্নেহের বাঁধনে ভুলিয়ে রাখতে চাই তবু যেন কিসের অভাব তার মনে জাগে। কি চায় তার ব্যাকুল মন?

সত্যর চতুষ্পাঠীতে নানাদেশ থেকে অনেকগুলি ছাত্র এসে ভর্ত্তি হয়েছিল। সে সারাদিন অধ্যয়ণ আর অধ্যাপনাতে এমনি ভুলে থাকত যে জগৎ সংসারের কোন খবরই তার কাণে পৌছাত না। চিরকাল বই নিয়ে কাটিয়ে এসে আর কিছুতে সে মনোযোগ দিতে পারে নি। লক্ষ্মী তার সামনে কাজ করে বেড়ায়——একবার সত্য ভাবে তাকে কাছে ডেকে একটা আদরের কথা বলে, তার সুখ দুঃখের সংবাদ নেয়।—আবার কি ভেবে ডাকতে গিয়ে থেমে যায়! কাব্যের বসন্ত সেনা শকুন্তলা তার কাছে বেশী বাস্তব! সে আর কিছু জানে না! কোথায় কার ব্যাকুল তৃষিত আঁখি তার দিকে চেয়ে চেয়ে ফিরে যায় সে কিছু সন্ধানও রাখে না।

একদিন সত্যর অসুখ হল! আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তিন চারিদিনের মধ্যে ক্রমশঃ বড় বাড়াবাড়ি হল। রাত্রি দিন ছেলের শিয়রে বসে নারায়ণের কাছে প্রার্থনা জানালুম। এত বিপদেও আমার স্বামী কিন্তু নির্ব্বিকার! তিনি বললেন "মাধব যখন ব্যথা দেন তিনিই নিরাময় করেন। তাঁকে ডাক, কোন ভয় থাকবে না। আমরা ভেবে কি করতে পারি?" কিন্তু মায়ের প্রাণ,— প্রবোধ মানে কি করে বল? ব্যাকুল হয়ে ছটফট করে ছুটে বেড়াতে লাগলুম।

লক্ষ্মীর সেই শরতের প্রভাতের মত অম্লান হাসিমাখা মুখখানা ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ছিল। ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। লক্ষ্মীর অক্লান্ত প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে সত্যকে হারাবার ব্যথা আমাদের সইতে হয় নি! মরণের দোর থেকে সত্য ফিরে এল। এবার তার মুখেও এক ভাবান্তর দেখলুম। লক্ষ্মীকে সে চিনেছে। সে বুঝি স্বর্গেরই দেবী! পথ ভুলে এখানে এসেছে। অনাদরের ব্যথা পেয়ে যাতে না চলে যায় এই তার ভাবনা হল, আজ থেকে।

লক্ষ্মী যেন আর ভাল করে কথা কয় না! সদাই অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। তার বুকের মধ্যে

কিসের এক ঝড় চল্‌ছে বুঝতে পেরেছিলুম। তাকে দেখে কেবলই আমার ভয় হচ্ছিল, বুঝি এইবার তাকে হারাতে হবে! বনের পাখী স্নেহের কারাগারে বদ্ধ থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কি? জানি না!

সেদিন ভোরের বেলা, একটা কাক কদম গাছের মাথায় বসে, সদ্য ঘুম থেকে জেগে, কা কা করে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। তুলসী মঞ্চের প্রদীপটা সারা রাত জ্বলে নেববার আগে শেষ একবার দপ করে উঠ্‌ল। লক্ষ্মী তখন উঠান ঝাঁট দিতেছিল। হঠাৎ কি একটা মর্ম্মান্তিক ব্যথা কাতর আর্ত্তধ্বনি শুনতে পেয়ে চমকে উঠ্‌লুম। লক্ষ্মী ঝাঁটা ফেলে সামনের দরজায় দিয়ে দাঁড়াল। আর দেখলুম একটা মাতাল ছুটতে ছুটতে এসে তারই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে কাতরস্বরে কাঁদতে লাগল, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।" তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠ্‌ছিল। শেষ মুহূর্ত্তে, প্রদীপটারই মত একবার যেন উগ্র হয়ে, উঠে বসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। দেখলুম লক্ষ্মীও কেঁদে ফেলে পথের উপর বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলে। একবার ভাবলুম, এ আমারই দৃষ্টি ভ্রম! কিন্তু না—তা ত নয়। গৃহস্থের বধূ সে—এ কি তার আচরণ? যা সত্যি বলে জানতুম,—যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম সমস্তই কি তার ভান? আজ যা দেখছি এইটাই সত্যি? লোকটা কি তারই পুরাতন পরিচিত কোনও বন্ধু? সে কি তার অনুগৃহীত? ছিঃ ছিঃ এত খল সে! এ যে বিশ্বাস হয় না,—নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না,—দেবতার মত যাকে ভেবে এসেছি—সে এত নীচ! এ কি হতে পারে?

ডাকলুম "লক্ষ্মী!"

সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে এসে যেন আত্ম-বিস্মৃতের মত বল্লে "উঃ, এত নিষ্ঠুর, ভাবতেও পারি নি!"

আবার বললুম "লক্ষ্মী! বল তুমি, কে ও লোকটা!—কি তার পরিচয়—আর কেনই বা তার জন্যে তুমি এ রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছ?"

লক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "জিজ্ঞাসা কর না মা! তোমার পায়ে পড়ি! আমি কিছু বলতে পারব না।"

আমার স্বামীকে সব কথা খুলে বললুম। তিনি শুনে হাসতে লাগলেন। বললেন "কাকে সন্দেহ করছ মহামায়া? মাধব যাকে পাঠিয়েছেন—মাধবের নাম নিয়ে যাকে আমাদের কুঁড়ের ভেতর প্রতিষ্ঠা করেছি—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর অংশে যার জন্ম—তাকে চিনতে পারছ না?"

শেষে একদিন স্বামী নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ বয়সের রোগ, সকলেই বুঝতে পারলুম আয়ু তাঁর ফুরিয়ে এসেছে। লক্ষ্মীর ব্যবহারও ক্রমশঃই রহস্যজনক হয়ে উঠ্‌ছে। হয় সে পাগল, না হয় অসতী নিশ্চয়! কিম্বা হয়ত সে পিশাচীদেরই একজন কেউ হবে। মুমূর্ষু শ্বশুরের সামনে গঙ্গাজল আসন পেতে বিড়বিড় করে কাদের যেন বসতে অনুরোধ করত। কখনো বা হাততালি দিয়ে হাসত! ব্যাপার কি? সে কি লোকচক্ষুর অন্তরালে উপদেবতাদের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছে? অথবা এ পাগলের ভাণ? হাজার হোক শ্বশুর ত! মরতে বসেছেন। আর সে তাই দেখে হাসে আর উপভোগ করে?

সেই মাতালটাকে মরতে দেখে সে কেঁদেছিল, আর শ্বশুরের মৃত্যুতে সে আনন্দে অধীর হয়েছে!!

নিশ্চয় সে অসতী!

আর সইতে না পেরে সত্যকে বল্লুম, এর একটা প্রতীকার কর। সত্যও সব দেখে ও শুনে, ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "এ সবের অর্থ কি? এ কি রকম আচরণ তোমার?"

লক্ষ্মীর মুখখানা মুহূর্ত্তের মধ্যে পাংশু হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে অশ্রুরুদ্ধস্বরে বললে "একথা বললে আমি মরে যাব! তবু—তুমিও যখন আমায় অবিশ্বাস করছ—আমি সব ভেঙে বলব। কাল যমুনার জলে দাঁড়িয়ে আমি সমস্তই স্বীকার করব।"

প্রভাত না হতেই ঘাটে অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। কত লোক কত কথা কয়! সামনেই স্বামীর চিতা-অগ্নি তখনো ধূ ধূ করে জ্বলছিল। আমার এখন মনের যা অবস্থা, তাতে সেখানে দাঁড়াতে পাচ্ছিলুম না। তবু, ঘরের বধূ, সে যদিই বা কোন সঙ্গত কারণ দেখিয়ে তার আপনার বিসদৃশ ব্যবহারের সমর্থন করতে পারে, তাই শোনবার জন্য কোনও রকমে মাথা খাড়া করে রেখেছিলুম। নারায়ণ করুন, লোকের

সামনে সে নিষ্কলঙ্ক বলেই আপনাকে প্রমাণ করতে পারে। যদিও তার ব্যবহারে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ছিল তবুও এক একবার মনে হত, যাকে চিরদিন অম্লান কুসুমের মত পবিত্র বলে জেনে এসেছি সে কখনও অত নীচ নয়। অবশ্যই তার ব্যবহারের অন্তরালে কিছু রহস্য আছে যা না জেনে আমরা গোলে পড়েছি।

লক্ষ্মী সত্যকে অনুরোধ করলে তাকে ধরে রাখতে, কেননা সে যখন মরবে—স্বামীর বুকে মাথা রেখে মরতে পারবে! সত্য একথা অমান্য করে নি!

লক্ষ্মী বলতে লাগল, "হে সুন্দর প্রভাত আমি তোমায় নমস্কার করি। হে আমার মাতৃভুমি, প্রণাম করি! হে আমার দেশের লোক সব, আমি তোমাদের প্রণাম করি!—আমার স্বামী,—আমার পরমারাধ্য পরলোকগত শ্বশুর—আমার স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতা—আমি সকলকে প্রণাম করি।—

আজ আমি আমার জীবনের সব গোপন কাহিনী বলব ভেবেছি। আমি যা বলব তা সমস্তই সত্য ; তোমরা বিশ্বাস কর।

আমি কে, কোথায় জন্ম, আমার জাতি কি ও ধর্ম্ম কি এ সবের কথা বিশেষ করে বলিতে পারি না। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে যাঁর সঙ্গে আমার আমার পরিচয় জন্মে, ও যাঁর অমিত স্নেহে আমার প্রাণ বাঁচে তাঁহারই বা স্বরূপ কি, জানি না। আমরা এক কুটিরে থাকতুম, পিতা আপন মনে ধ্যান ও পূজাদিতে দিন কাটাতেন, তারির মধ্যে যেটুকু সময় পেতেন আমার কাছে শাস্ত্র কথা ব্যক্ত করতেন। তারপর একদিন আপনার সমস্ত পরিচয়টুকু, জগতের সকল লোকের চোখ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় যে পালালেন তাও জানি না। আমি, স্বামী শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতার আশ্রয়ে নূতন জীবন পেয়ে, তাঁর অভাব ভুলতে চেষ্টা করলুম।

এমনি করে দিন কাটে। শেষে একদিন স্বামী অসুস্থ হলেন। সে রাত্রিতে গভীর আশঙ্কায় আমি ভয় পেয়েছিলুম। সেদিন যেন কে আমাকে কেবলি শাসিয়ে বলছিল, "ওরে অভাগী। আর কতদিন তুই লজ্জার বশে দূরে থাকবি? এখনো কি চিনতে পারিস নি কে তোর আপন? এখনো কি বুঝতে পারিসনি ব্যাকুল মন তোর কি চায়! আজও সময় থাকতে লুটিয়ে পড় তাঁর পায়ের তলায়। অভিমান সুখ দুঃখ সমস্ত ভাসিয়ে দে নয়নের বারি ধারায়। নইলে হয়ত কাল আর সময় পাবি না।

ভাবলুম, মানুষ এত দুর্ব্বল? এত অক্ষম? অথবা বাইরে অদৃশ্য থেকে কেউ তাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজের ইচ্ছামত কখনো সুখ কখনো দুঃখের মাঝে ফেলে খেলিয়ে আমোদ করছে! কি তাঁর উদ্দেশ্য?

স্বামী অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তখন বলছিলেন "বড় তেষ্টা—একটু জল—একটু জল দাও।" তিনদিনের কষ্টে মা সে সময়টা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বাবাও জেগে ছিলেন না। পুত্রের চীৎকার তাঁরা কেউ শুনতে পেলেন না।

স্বামী আবার চেঁচিয়ে বললেন "বাড়ীতে যে আছ—একটু জল দিয়ে আমায় বাঁচাও।"

উঠে বসলুম। এই ত অবসর। মান অভিমান লজ্জা সমস্ত ভুলে গিয়ে আজ আমার বাঞ্ছিতের চরণে লুটিয়ে পড়ব।

মা-এর ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছা হল না। মৃদুস্বরে বললুম, "একটু অপেক্ষা কর জল আমি এনে দিচ্ছি।"

দেখলুম কলসী একেবারে শূন্য। তখন আমি একটা ঘটী নিয়ে যমুনার ঘাটে গেলুম। জল নিয়ে উপরে উঠছি, এমন সময় দেখলুম এক ভীষণ মূর্ত্তি পুরুষ একবার এদিকে একবার ওদিকে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। ভয় পেয়ে মিনতি করে তাঁকে বললুম "পথ ছেড়ে দাও আমায়। আমার স্বামী জল অভাবে মারা যায়।—দয়া করে পথ ছেড়ে দাও—"

কিন্তু লোকটী তা শুনলেন না। বরং আরও সামনে এগিয়ে এলেন! বললেন "স্বামী তোমার মর্চ্ছে—মরুক! কি যায় আসে তাতে? কি ভয় আমাদের? কেউ দেখছে না—নির্জ্জন নিস্তব্ধ এ স্থান—"

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। চেঁচিয়ে ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না। লোকটী আরও এগিয়ে এলেন। আমি অগত্যা পেছিয়ে একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। ভাবলুম ডুবে মরে তার হাত থেকে উদ্ধার পাব। কিন্তু মনে পড়ে গেল স্বামীর আর্ত্তধ্বনি। ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন—জল দাও—কে কোথায় আছ—একটু জল দাও। আমি যে স্বামীকে আশ্বাস

দিয়ে এসেছি এখনি জল এনে দেব। মর্ম্মান্তিক ব্যথায় আমার প্রাণ গুমরে কেঁদে উঠ্‌ল। আমার কাতর ক্রন্দনে লোকটী উপহাস করে হেসে উঠলেন। মুক্তির কোন উপায় না দেখে মনে মনে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করে বল্লুম "স্বামীর ভার তোমার হাতেই দিলুম প্রভু—তুমিই ভরসা—"তারপর ঝাঁপ দিয়ে জলে লাফিয়ে পড়লুম।

কিন্তু তার পূর্ব্বেই লোকটী দৌড়িয়ে গিয়ে আমাকে ধরে ফেললেন। আর বললেন "ভয় নেই মা। আমি মৃত্যুর দেবতা। তোমার স্বামীর আয়ু পূর্ণ হয়েছিল। তাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছিলুম। কিন্তু এসে দেখলুম তুমি তোমার বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়ালে। আমি চেষ্টা করেছিলুম তোমাকে নিরস্ত্র করতে। সতী তুমি। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও—আমি তা পূর্ণ করব।"

বললুম "আমায় আশীর্ব্বাদ করুন পিতা! যাতে আমার স্বামী রোগমুক্ত হন—"

মৃত্যু বললেন "সে বর ত তুমি না চাইতেই পেয়েছ মা। তোমার এই জলের স্পর্শে তোমার স্বামীর সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর হবে। তুমি অন্য বর চাও।"

আমি বললুম "পিতা। যদি তুমি সন্তুষ্ট হও আমায় এই বর দাও, মানুষ যখন মরে, মৃত্যুর রূপ আমি যেন বুঝতে পারি।"

মৃত্যু বললেন "তথাস্তু।—কিন্তু একটা কথা, আমাদের এই সাক্ষাতের কোন কথা তৃতীয় ব্যক্তি না জানতে পারে। কেননা তাহলেই তুমি প্রাণ হারাবে।"

তার কতদিন পরে ভোর বেলা উঠানে ঝাঁট দিতেছিলুম এমন সময় গভীর কাতরোক্তি শুনে চমকে উঠে দেখলুম, একটা মাতাল গলদঘর্ম্ম হয়ে ছুটে আসছে। বলিদানের পশুর মত সে ত্রাহি ত্রাহি করে চীৎকার করছে। আর তার পেছনে এক ভীষণকায় লোক খড়্গ হাতে করে দৌড়ে আসছে। কে তিনি? সেই অমানিশায় ঘাটে দেখা মৃত্যুর দেবতা? উঃ কি ভীষণ! কি ভীষণ এই মৃত্যু। কি নিষ্ঠুর এ অত্যাচার! কে বলেছিল মৃত্যু সুন্দর—কে বলেছিল মৃত্যু-ক্লান্ত ব্যথিত আঁখির সামনে কালো যবনিকার মত নেমে এসে ঢেকে ফেলে!

তাই দেখেই আমি কেঁদেছিলুম।

সেই থেকে মৃত্যুকে ভীষণ বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর সময় হতে আমার সে ধারণা ঘুচে গেল। আমি দেখতে পেলুম—মহাদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু সবাই এসে তাঁকে ঘিরে কদিন থেকে হরিনাম গান—ও খোল বাজিয়ে কীর্ত্তন করেন। আমি তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য আসন দিতুম। তাঁরা তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করতেন। শেষের দিন দেখলুম পুষ্পক রথে করে নেমে এসে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন।"

সব শুনে শ্রোত্রীদের দুনয়ন দিয়ে জল ঝরেছিল। তার প্রত্যেক কথা আমাদের প্রাণে বেজেছিল। এই লক্ষ্মীকে আমরা অবিশ্বাস করেছিলুম!—

তার শেষ কথা আকাশে না মিলিয়ে যেতে তার মাথা নুয়ে পড়ল সত্যর বুকে। সে তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। তখন একটা উঁচু ঢেউ এসে তাদের দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না।—

আমরা হতভাগ্য, তাই তার দোষ দেখেছিলুম।— গোলোকের লক্ষ্মীই বটে!"

কতক্ষণ সেই ঘাটের ধারে বসে ছিলুম, মনে পড়ে না। জ্ঞান হলে দেখ্‌লুম, আশে পাশে আর কেউ নেই। সকলেই চলে গেছে। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ সকলকে হারিয়ে শ্মশান ঘাটে বসে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলুম;—নীরবতার মাঝে আমার ক্ষীণ স্বর ডুবে গেল। সেই থেকে, কত দিন, কত বছর, কত যুগ চলে গেছে। এই ঘাটের ধারটীতে বসে আমি কাঁদি, আর ভাবি, তাঁরা কি এত নিষ্ঠুর হবেন যে আমার কথা একেবারেই ভুলে যাবেন? না—তা নয়—আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে—এ'জন্মে হোক, অথবা জন্মান্তরে,আবার তাঁদের আমি ফিরে পাব। যমুনা কাঁদে, আমিও তার ব্যথার সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদি! বলতে পার কি পথিক, কবে, কত যুগ পরে আবার সেই সুখদিন আসবে—?"……

শূন্য আকাশে প্রতিধ্বনি জেগে বলল— "আসবে?"

স্তব্ধ পৃথিবী কেঁদে বলল—"আসবে?"

কি উত্তর দেব আমি? কি বলে সান্ত্বনা দেব? যমুনার দিকে চেয়ে নির্ব্বাক হয়ে বসে রইলুম। ব্যথিত পরাণ কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল--আস্‌বে?……আস্‌বে?"

হায়, নিষ্ঠুর কাল মুখ ফিরিয়ে আপন পথে চলে যায়! উত্তর দেবে কে?

———

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন সুখ প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। কে জানে, দয়াময় বিধাতা কেন তাহা ইচ্ছা করেন না? হয় ত সুখের ন্যায়, দুঃখও জগতের মঙ্গলদায়ক।

যদুপতি যখন পত্নীর প্রেমসাগরে মহাসুখে ভাসিতেছিল, তখন একদিন হঠাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায়, তাহার মাথায় দুঃখের বোঝা আসিয়া পড়িল। যদুপতির পুত্র-শোকাতুরা মাতার হঠাৎ একদিন বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল; এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইয়া যদুপতির পিতা পত্নীর মৃতদেহের নিকট ছুটিয়া আসিতেছিলেন, চৌকাটে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, তিনিও মেঝেতে আছড়াইয়া পতিত হইলেন এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া গেলেন।

যদুপতি তখন দোকানে ছিল। কল্যাণী তাহাকে অতি সত্বর সংবাদ দিল; এবং শ্বশুর ও শ্বশ্রূর ভূপতিত মস্তক উপাধানের উপর রাখিয়া, ললাটে শীতল জলের প্রলেপ দিয়া, বীজন করিয়া, তাঁহাদের চেতনা উৎপাদনের চেষ্টা করিল; এবং চেষ্টায় সফলকাম না হইয়া কাঁদিল।

যদুপতি একেবারে একজন চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে বাটী ফিরিয়া মাতাপিতার ভূপতিত বিবশ দেহ অবলোকন করিল; তাহার পর, ক্রন্দনমানা পত্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাহাকার রবে কাঁদিয়া উঠিল। মাতাপিতার চরণ তলে মস্তক রাখিয়া, তাহা অশ্রুধারায় বিধৌত করিয়া ডাকিল, 'বাবা গো! মাগো!' কিন্তু তাঁহারা ত একমাত্র কাতর আহ্বানে কোন উত্তর দিলেন না!

চিকিৎসক দুইজনের দেহই উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া জীবনের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সংবাদ পাইয়া, প্রতিবেশীগণ আসিয়া যদুপতিকে সান্ত্বনা দান করিতে চেষ্টা করিল। প্রতিবেশিনীগণ সমবেতা হইয়া, কেহ দুঃখ করিল, কেহ রোরুদ্যমানা কল্যাণীকে ধরিয়া তুলিল, কেহ মৃতদের দেহের দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া শোকার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "আহা! যদি মরতে হয়, লোকের যেন এমনই মরণ হয়।"

প্রতিবেশীদিগের সহায়তায় যদুপতি যখন এক চিতায় মাতাপিতার শবদাহন করিয়া শ্মশানঘাট হইতে মাতা-পিতৃহীন গৃহে ফিরিল, তখন কল্যাণী স্বামীর সেই শোকাচ্ছন্ন শুষ্কমূর্ত্তি দেখিয়া যেরূপ কান্না কাঁদিয়াছিল, সেইরূপ কান্না সে শ্বশ্রূ শ্বশুরের বিয়োগ-ব্যথায়ও কাঁদে নাই; স্বামীর সেই অবসাদময় মুখের দিকে চাহিয়া তাহার লোচন হইতে যে অশ্রুপ্রবাহ বহিয়াছিল কে জানে কতদিনে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিত্রালয়-যাত্রা।

পৃথিবীর লোক শোককে চিরস্থায়ী করিবার অবসর প্রদান করে না; চিতার আগুন নিভিতে না নিভিতে উৎসব-আলোক জ্বালিয়া দেয়; শোকের অশ্রুজল শুকাইতে না শুকাইতে, সেখানে হর্ষের কুসুম ফুটাইয়া দেয়; জীবনস্রোতে, ভাগীরথী প্রবাহের ন্যায়, যে স্থান দিয়া চিতাভস্ম প্রবাহিত হয়, সেই স্থান দিয়াই ক্ষণপরে পূজার পুষ্প ভাসিয়া যায়।

সেই মহাশোকজনক ঘটনার দুই মাস পরেই, অখিলবাবু বরিশাল হইতে পত্র লিখিয়া জামাতাকে জানাইলেন যে,

আর পক্ষ কাল মধ্যেই, তাঁহার দ্বিতীয়া কন্তা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ঈশানী দাসীর শুভবিবাহ হইবে; এই বিবাহোৎসবে যোগ দিবার জন্ত তাঁহাদের, বরিশালের বাটীতে উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি আরও সংবাদ দিয়াছেন যে, বরটি বড়ই ভাল পাওয়া গিগাছে; সে দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী, সে ঢাকা কলেজে বি, এ, পড়ে, এবং তাহার নাম শ্রীমান শরৎ কুমার বসু। শরৎ কুমার ঢাকার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শিখরলাল বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। মাননীয় শ্রীযুক্ত শিখরবাবুর, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বেতনের আয় ছাড়া, জমীদারীরও বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয় আছে; এবং সম্প্রতি তিনি ঢাকা বুড়ী গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর বাটী প্রস্তুত করাইয়াছেন।

পিতার পত্রে এই সকল সংবাদ শুনিয়া, এবং বহুদিন পরে পিত্রালয় যাইবার প্রত্যাশায় কল্যাণী আহ্লাদিতা হইল। কিন্তু পিতৃমাতৃহীন স্বামীর মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'বাবা আমাদের যেতে লিখেছেন বটে, আর আমারও কিছুদিনের জন্ত যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে বটে, কিন্তু আমরা, এসময়, বাড়ী আর দোকান ছেড়ে কি রকম করে যাই?'

যদুপতি বলিল, 'আমার যাওয়া হ'বে না; কেন না, এসময়, এই বিয়ের মরশুমে, দোকানের বিক্রি বেশী হতে পারে। কিন্তু বোনের বিয়েতে তোমার না যাওয়া ভাল দেখাবে না; তোমার যেতেই হবে।'

কল্যাণী আবার স্বামীর মলিন মুখের দিকে চাহিল; এবং কিছু দৃঢ় স্বরে কহিল, 'তোমাকে এ অবস্থায় একলা ফেলে, আমি কোথায় যাব না।'

যদুপতি কল্যাণীর বাক্যে প্রীত হইয়া, তাহাকে আদর করিয়া কহিল, 'তুমি আমার কাছে থাক্‌বে, আমার অনেক আরাম আর সুখ হবে বটে; কিন্তু বিয়েতে তুমি না গেলে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হবেন।'

কল্যাণী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিল, 'তাঁদের দুঃখ হবে, আমোদের অভাবে; তোমার দুঃখ হ'বে যথার্থ কষ্টে; তোমার খাবার রাঁধবার, তোমার সেবা করবার লোক থাকবে না। তুমি আমার স্বামী—আমার ইহকাল, পরকাল; তোমাকে কষ্টে ফেলে, আমার কি আমোদ করতে যাওয়া উচিত? সে আমোদ কি আমার ভাল লাগবে?

যদুপতি কহিল, 'আচ্ছা, আমাকে একদিন ভেবে দেখতে দাও। যদি দোকান খোলা রাখবার কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারি, তাহ'লে তুমি আমি দু'জনেই যাব।'

কল্যাণী কহিল, 'তাই ভাল; যদি দোকানের কোন ক্ষতি না হয়, তা'হলে তুমি আমি দু'জনেই যাব। আমার মনে হয়, একবার ঠাঁই নাড়া হ'লে, তোমার মনটাও একটু ভাল হ'বে।'

পরদিন দোকান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যদুপতি পত্নীকে কহিল, কল্যাণী, বোধ হয়, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো।'

কল্যাণী বলিল, 'না যেতে পার, আমি এক পা নড়বো না,—তাড়িয়ে দিলেও নয়; আমি তোমার কাছে খুব সুখে থাকতে পারবো।'

যদুপতি বলিল, 'শোন না, বলি। দোকানের সরকার বল্লে, সে দিন পনেরোর জন্তে দোকানের সকল ভার নিতে পরেবে। শুনলাম, বাবাও নাকি তারই উপর ভারদিয়ে, দূরদেশে জিনিষ কিনতে যেতেন।'

কল্যাণী কহিল, 'হাঁ, তাত আমিও জানি। আমার বিয়ের বছরই ত বরিশালে নারকেল কিন্‌তে গিয়েছিলেন।'

যদুপতি কহিল, 'ভাগ্যিস্ গিয়েছিলেন, তাইত তোমাকে পেলাম।'

কল্যাণী কহিল, 'তা কেন? কি বলছিলে, বল না। বাড়ী ঘর দোরের কি বন্দোবস্ত করবে।'

যদুপতি কহিল, 'দোকানের দুজন চাকর আছে, তার একজন রাত্রে বাড়ীতে এসে শোবে; আর গয়লা আর ঝি ত আছেই। তারা রোজ দোকান থেকে সিধে এনে, রেঁধেবেড়ে খাবে।'

কল্যাণী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে, আমি তোমার আর আমার কাপড় চোপড় গুছিয়ে নি?'

যদুপতি কহিল 'হাঁ। আর কিছু টাকা সঙ্গে নিও।'

কল্যাণী কহিল, 'টাকায় কি হবে?'

যদুপতি বলিল, 'তুমি বাপের বাড়ী যাচ্ছ ; যদিও সেখানে তোমার টাকা কড়ির কিছুই দরকার হ'বে না। কিন্তু অনেক দূরের পথ যাচ্ছি ; রাস্তায় কখন কি দরকার হয় বলা যায় না। কিছু টাকা সঙ্গে থাকা ভাল।'

দোকানের লভ্যাংশের বেশীর ভাগ দোকানেরই পুষ্টিসাধন জন্য ব্যয়িত হইত। যদুপতির পিতা অতি অল্প অর্থই বাটীতে লইয়া আসিতেন। ইদানিং তিনি তাহা লক্ষ্মীস্বরূপিনী বধূমাতার নিকটই জমা রাখিতেন ; কখনও কোনও ব্যয় জন্য আবশ্যক হইলে, তিনি বধূমাতার নিকট চাহিয়া লইতেন। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর, যদুপতিও, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, দোকান হইতে কখনও কখনও টাকা আনিয়া কল্যাণীর নিকট গচ্ছিত রাখিত।

এই অর্থ হইতে কল্যাণী আড়াই শত টাকা লইয়া, আপন পেটক মধ্যে গুছাইয়া রাখিল।

যদুপতি যাত্রার শুভদিন স্থির করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিল।

বাটীর ও দোকানের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, ঐ শুভদিনে, যদুপতি আদরিণী পত্নীকে লইয়া বরিশাল যাত্রা করিল। পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত যমুনানদী সিরাজগঞ্জের পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত ; সিরাজগঞ্জের ঘাটে প্রত্যূষে ষ্টীমারে চড়িয়া বৃহৎ নদীর জললীলা দেখিতে দেখিতে তাহারা সেই দিন সন্ধ্যাকালে গোয়ালন্দ আসিয়া পৌছিল। পরদিন ভোরে আবার ষ্টীমার ছাড়িল ; ষ্টীমারের ক্যাবিনে ব'সয়া এইবার বিপুলা পদ্মা ও মেঘনা নদীর তরঙ্গভঙ্গিমা ও আবর্ত্তলীলা এবং দূরে গগনপ্রান্তে তীরস্থ বৃক্ষরাজির কৃষ্ণরেখা অবলোকন করিতে করিতে, তাহারা চাঁদপুর হইয়া বরিশাল নদীতে প্রবেশ করিল ; এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা বরিশাল নগরের ঘাটে আসিয়া পৌছিল। যখন তাহারা বরিশালে পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নদীজলের শীকরসিক্ত বায়ু সেবন করিয়া নদীসৈকতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, এবং এক্ষণে নগরীর আলোক মালা অবলোকন করিয়া তাহাদের মন হইতে শোকের অবসাদ সমস্তই বিলীন হইয়াছিল ; এবং তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মনের এই প্রফুল্লতা লইয়া তাহারা উৎসব গৃহে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিতার আদর

উৎসব বাটীতে প্রবেশ করিয়া কল্যাণী দেখিল, তাহার সেই নির্জন ও নিরব পিতৃগৃহ কত গুলি পরিচিত ও অপরিচিত লোক সমাগমে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কিছু কষ্টে সে এক নিভৃত কক্ষে পিতাকে খুঁজিয়া পাইল। চারি বৎসর সে তাহার পিতাকে দেখে নাই ; চারি বৎসরে তিনি কত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

কন্যা কল্যাণীর দৈহিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া অখিলবাবুও অবাক হইয়া গেলেন।—তাঁহার সেই কাল মেয়ে, চারি বৎসর শ্বশুরবাটীতে বাস করিয়া এমন সুন্দরী হইল কিরূপে ?—তাহার কালরঙ আর কাল নাই ; নবদূর্ব্বাদলের মত, শ্বেতাভ শ্যাম হইয়াছে। তাহার নয়নদ্বয় চিরদিনই বৃহৎ ছিল ; কিন্তু এখন যেন তাহা প্রফুল্ল প্রভাত নলিনীর ন্যায় ভাসিতেছিল। তাহার রক্তাভ গণ্ডে যেন স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সুপুষ্ট সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছিল। কন্যার এই কমনীয় কান্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় যেন স্নেহরসে ভরিয়া গেল। কতদিন পরে কাহার শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

কল্যাণী পিতৃপদে প্রণতা হইলে, অখিলবাবু কহিলেন, 'মা, তোমার লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত মূর্ত্তি দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, তুমি শ্বশুর বাড়ীতে এ কয়বছর বেশ সুখেই কাটিয়েছ। তোমার গর্ভধারিণী মৃত্যুকালে আমাকে বলেছিলেন যে, তুমি আর কিছু চাও না কেবল আমার আশীর্ব্বাদ চাও। তুমি তখন কথা কইতে পারতে না। তবু আমার মনে হয়, তিনি তোমার মনের কথাই বলেছিলেন। আমি তোমার বিয়েতে কিছু দিতে পারি নি বলে, কই তুমি ত একটুও দুঃখ কর নি ! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি মা, তোমার কখনও যেন দুঃখ করতে না হয় ; তুমি যেন চিরদিন এমনই ভালই থাক।'

বুদ্ধিমতী প্রমদা সে সময় নিকটে ছিলেন না। থাকিলে বুদ্ধিহীন স্বামীর, কন্যার সহিত আলাপের এই আতিশয্য সহ্য করিতে পারিতেন না; আর—প্রমদা উপস্থিত থাকিলে, কি বলিতেন জানি না - আমরা বলিব, অখিলবাবু যে এতদিন তাহার কৃষ্ণা কন্যার গর্ভধারিণীর একটি তুচ্ছ কথা বুকে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহার পক্ষে,—সুন্দরী প্রেমময়ী দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিবাহকারীর পক্ষে, সুসঙ্গত হইয়াছিল? বর্ত্তমানের নিকট, প্রেম ও প্রতপ্ত যৌবন উপহার পাইয়াও কোন অর্ব্বাচীন প্রেমহীনার, যৌবন-হীনার, সৌন্দর্য্য-হীনার স্মৃতি বক্ষে পুরিয়া রাখে? ছিঃ! প্রমদা এমন স্বামীকে বুদ্ধিহীন বলিয়া ন্যায় সঙ্গত কার্য্যই করিত।

কিন্তু পিতার আদর ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে কল্যাণীর কমনীয় লোচনদ্বয় সহসা অশ্রুভারাক্রান্ত হইল; কণ্ঠ সহসা বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। সে কিয়ৎকাল পিতার নিকটে দাঁড়াইয়া, মাতার সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া গেল। যাইবার সময়, সে স্বামীকে পিতার কক্ষদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

যদুপতি কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে শ্বশুরকে প্রণাম করিল।

অখিলবাবু তাহাকে বিবাহকালে যেমন কদর্য্য দেখিয়াছিলেন, এই চারি বৎসর পরে, তাহাকে আর তেমন দেখিলেন না। তাহার পরিচ্ছদে বিশেষ কোনও প্রকার পারিপাট্য না থাকিলেও, তাহার উন্নত ও বলশালী দেহ তিনি মুগ্ধনেত্রে অবলোকন করিলেন। তিনি আদর পূর্ব্বক আপন পার্শ্বে বসাইয়া, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং তাহার মৃত পিতামাতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তিনি তাহাকে মুখ হাত ধুইয়া, কিছু জলযোগ করিবার জন্য বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

যদুপতি কথাবার্ত্তায় শ্বশুর মহাশয়কে পরিতুষ্ট করিয়া, এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় পাইয়া মুখ হাত ধুইল। পরে জলখাবার খাইবার জন্য সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে ত জলখাবার খুঁজিল না! সেই অপরিচিত পুরীতে একখানি চিরপ্রিয় পরিচিত মুখ দেখিবার জন্য, তাহার নয়নদ্বয়, পদ্মানুসন্ধানী মধুপের ন্যায়, চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিমাতার অভ্যর্থনা।

সমাগতা এবং সমবেতা কতকগুলি কলকলময়মানা কুটুম্বিনীদ্বারা পরিবৃতা হইয়া বুদ্ধিমতী প্রমদা যেস্থানে বসিয়া আপন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেইস্থানে কল্যাণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

সপত্নী কন্যাকে দেখিয়া প্রমদার হৃদয়ে স্নেহরস উছলাইয়া উঠিল কি-না, আমরা তাহা অবগত নহি; তাহা অবগত হইবার আমাদের উপায় নাই।—প্রমদা স্ত্রীলোক, এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক; বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকেরা কখনও আপন হৃদয়তত্ত্ব অন্যকে অবগত হইবার অবসর দেন না। তাঁহার জটিল হৃদয়তত্ত্ব আমাদিগকে না জানাইয়া, তিনি কেবলমাত্র একটু হাসিলেন। কিন্তু সেটা হাসি বা দন্তের আংশিক বিকাশ, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। সেই বিকশিত দন্তা কহিলেন, "ওমা! তুই কখন এলি, কল্যাণী? ওমা! তুই কতবড় হয়েছিস্! একেবারে যেন সাতছেলের মা হয়ে দাঁড়িয়েছিস! তোকে আর চেনবার যো নেই। বোস্, বোস্, তোর শ্বশুরবাড়ীর সব কথা বল।'

কল্যাণী বিমাতার পদধূলি গ্রহণ করিল; এবং তাঁহার নিকটে বসিল। কিন্তু শ্বশুরবাটীর কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহা বলিতে হইলে, প্রথমেই ত স্বামীর অগাধ অপরিমেয় ভালবাসার কথা বলিতে হয়; যে হৃদয় স্বামীর নিরবিচ্ছিন্ন আদরে ভরিয়া আছে, তাহাতে ত আর কোনও কথার স্থান নাই। কিন্তু সেই আদরের কথা, সেই ভালবাসার কথা কি গুরুজনের নিকট মুখ ফুটিয়া বলা যায়? ছি!—কল্যাণী নীরবে বসিয়া, অপরিচিতা কুটুম্বিনীদিগের, নানা ভঙ্গিমাময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিকটস্থা এক অপরিচিতা কুটুম্বিনী—বোধ হয়, সে প্রমদার পিত্রালয়ের লোক হইবে—ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটি কে?'

প্রমদা কহিলেন, 'আমার বড় মেয়ে। তুমি ওকে কখনও দেখনি বুঝি? ওকে নিয়ে আমিও কখন বাপের বাড়ী যাই নি।'

কুটুম্বিনী তথাপি প্রশ্নপূর্ণ নয়নে প্রমদার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহা দেখিয়া প্রমদা অবর্ণনীয় ভ্রূভঙ্গিমা করিয়া, এবং যে তাম্বুল-রঞ্জিত বিম্বাধর দেখিলে, এখনও তাহা পান করিবার লালসা অখিলবাবুর হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিত, তাহা প্রস্ফুটিত রক্তপুষ্পের মত স্ফুরিত করিয়া, অর্থপূর্ণদৃষ্টি কুটুম্বিনীর দিকে নিক্ষেপ করিল।

সেই ভ্রূভঙ্গিমায় ও অধর স্ফুরণে আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইয়া, কুটুম্বিনীও প্রমদার প্রকরণের অনুকরণ করিল। এবং কল্যাণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার শ্বশুর-বাড়ী কোথা বাছা?'

কল্যাণী তাহার স্মের মুখমণ্ডল দিনান্তের পদ্মের মত, অবনত করিয়া কহিল, 'সিরাজগঞ্জে।'

কুটম্বিনী সিরাজগঞ্জের ভৌগলিক তথ্য অবগত ছিল না। সে আবার প্রশ্ন করিল, 'সে কোন দেশে বাছা? কোন দিকে? কত দূর?'

কল্যাণী উত্তর করিল, 'সে এখান হইতে উত্তর দিকে; ষ্টীমারে দু'দিনের রাস্তা।'

কুটম্বিনী বিস্মিত হইয়া কহিল, 'বাবা, এতদূরে?'

বুদ্ধিমতী প্রমদা বুঝিলেন, এইবার তাঁহার কথা কহা প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি কুটম্বিনীকে কহিলেন, 'দূর বই কি, দিদি! আমাদের কায়েতের ঘরে কি কাছে বর পাওয়া যায়? কাল মেয়ে বলে, এ অঞ্চলে কেউ ওকে নিতে নিতে চাইলে না। শেষে, কত কষ্টে, ঐ দূর দেশে একটি বর পাওয়া গেল।—তাও কি বরের মত বর!'

বিমাতার নিকট স্বামীর এই অযথা নিন্দা শুনিয়া কল্যাণী হৃদয়মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিল; ভাবিল, তাহার প্রেমময় স্বামীর ত নিন্দার কিছু নাই; তাহার সর্ব্বগুণ-শালী স্বামীর আর কি গুণ থাকিলে বিমাতার মনোমত হইত?

কুটম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'বর কি চাকুরী করে?'

প্রমদা আবার ভ্রূভঙ্গিমা করিয়া কহিল, "চাকুরী! তেমন গুণপণা, বিদ্যেবুদ্ধি থাকলে ত? আমাদের বাবু এত বড় হাকিম; উনি কত লোককে চাকুরী করে দিয়েছেন; আর নিজের জামাই-এর একটা কুড়ি পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকুরী করে দিতে পারতেন না!

কল্যাণী বুঝিল, বিমাতা কাহাকে বিদ্যাবুদ্ধি আর গুণপণা বলেন। হায়, হায়। এই দেশে চাকুরীই কিম্বা চাকুরীর উপযোগী হীনবিদ্যাই কি চিরদিন মানুষের একমাত্র গুণপণা থাকিবে! কতকাল এই অক্ষম অকর্ম্মণ্য জাতি চাকুরীকেই গৌরবের জিনিষ মনে করিবে? কতকাল বেতনের গুরুত্বই মানুষের মহত্বের পরিমাপক হইবে? কতকাল এই জাতির হেয় চাকুরীই একমাত্র সম্মানসূচক উপজীবিকা থাকিবে? আমরা কি বিধাতার এই দারুণ অভিসম্পাত অনন্তকাল আমাদের মস্তকের মুকুট করিয়া রাখিব!

যেস্থানে স্বামীর নিন্দা হয়, সেস্থানে সতীরা অবস্থান করেন না। স্বামীর নিন্দা শুনিয়া, এবং তাহার অনিন্দিত নামে আরও কলঙ্ক লেপনের আশঙ্কা করিয়া কল্যাণী আর মাতৃ সন্নিধানে তিষ্ঠিতে পারিল না; নীরবে ভগিনী ঈশানীর সন্ধানে অন্যত্র উঠিয়া গেল।

কল্যাণীর গমনশীল অবয়বের দিকে চাহিয়া,প্রমদা কুটম্বিনীর সহিত কটাক্ষ বিনিময় করিলেন। আমার পাঠিকাগণের ভিতর যদি কেহ প্রমদার মত বুদ্ধিমতী থাকেন, তবে তিনিই সে কটাক্ষের গভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। এই কটাক্ষ বিনিময়ের পর প্রমদা ও কুটম্বিনী আরও অনেক কথা বলিলেন; কিন্তু সে সকল কথা তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই।

রাত্র এক প্রহরের সময়, প্রমদা স্বামীর পদসেবা করিবার জন্য স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অখিলবাবু পত্নীকে নিভৃতে পাইয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদুপতি আর কল্যাণীর দু'দিন রাস্তায় বড় কষ্ট হ'য়েছে। ওদের খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে ত?'

বুদ্ধিমতী প্রমদা বুদ্ধিহীন স্বামীর প্রশ্নটা একবারেই পছন্দ করিলেন না। কারণ এই প্রশ্নে তাঁহার প্রথমার দিকে অযথা টান, এবং প্রমদার, যদুপতি ও কল্যাণীর দিকে, অযথা অযত্নই প্রকাশ করিয়া দিতেছিল;—প্রমদা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীকে আপন মনের কথা জানিতে দিলেন না; স্বামীর নিকট মনের কথা গোপন করাই বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম। তিনি কেবল স্বামীর দিকে ঘূর্ণিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "সে বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না; তারা খেয়েছে, শুয়েছে, ঘুমিয়েছে।'

আবার অখিলবাবু আপন বুদ্ধিহীনতার পরিচয় প্রদান করিলেন; কহিলেন, "কল্যাণীর কেমন শ্রী হয়েছে, দেখেছ?"

প্রমদা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "যৌবনকালে অমন সবারই একটু হয়। আবার দুই একটা ছেলে হলে, যে পেত্নী, সেই পেত্নী।"

অখিলবাবু আপনাকে সামলাইয়া কহিলেন, "ঈশানীরও আরও অনেক বেশী শ্রী হ'ত। কিন্তু মেয়েটাকে রোগে রোগেই পেলে।"

প্রমদা বলিলেন, 'ষাট! অমন অলক্ষুণে কথা বল না। তখন দেখবে; বয়সকালে ওর রূপ ধরবে না, ঠিকরে পড়বে।"

মাতার এই ভবিষ্যত বাণী কিরূপ সফল হইয়াছিল আমরা তাহা পরে দেখিব। আপাততঃ অখিলবাবু, পত্নীর বাক্যের প্রতিবাদ করা সমাচীন মনে করিলেন না। (ক্রমশঃ)

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া দীপিকা বলিল আর বাংলায় থাকবেন না ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিরীষ বলিল "না, বাংলার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে, বাংলায় আর থাকব না। জীবনের আর বাকি যে ক'টা দিন আছে এই রকম করে দেশে দেশে ঘুরেই কাটিয়ে দেব। একাকী, নিঃসঙ্গ জীবন এমনই করে ভবঘুরে অবস্থাতেই কেটে যাক্ ."

"একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কি রকম শিরীষ দা, সন্ধ্যা, —"

তাহার মুখের উপর মলিন চোখের দৃষ্টি রাখিয়া শিরীষ বলিল "সে এ জগতে নেই দীপিকা, সে তার সকল বেদনা জুড়াতে, সকল জ্বালা ভুলতে পরলোকে চলে গেছে।"

সন্ধ্যা নাই! দীপিকা বজ্রাহতার ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার মানসে ফুটিয়া উঠিল, সন্ধ্যার সেই সরলতা-মাখা মুখখানি, বালিকার চপলতা, খিল খিল হাসি; সেই অশান্ত-পদে দৌড়াদৌড়ি, সারা বাড়ীখানাময় চঞ্চলতা বিস্তার সকলকে মারিয়া ধরিয়া আবার ক্ষমা চাওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া সেই যে দিদিমণি ডাকটি—কি মিষ্টই ছিল। দীপিকার প্রাণে অতীত যদি কিছু সান্ত্বনা দিতে পারে সে এই বালিকাটিকে লইয়া; তাহার স্মৃতিই তাহাকে খানিকক্ষণের জন্যও আনন্দ প্রদান করিত।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দীপিকা ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "সন্ধ্যা কবে মারা গেছে ?"

"আজ তিনমাস মাত্র দীপিকা।"

শিরীষ অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল "জুড়িয়েছে সে, বেঁচেছে। আমায় নিয়ে কম জ্বালাটা ভুগেছে সে, আমি কতদূর নৃশংস স্বামী তা জানো না দীপিকা আমি তাকে তিলে তিলে হত্যা করেছি। আমার অধঃপতন বলব কাকে, এ সব কথা বলতে গেলে বুক আজ ফেটে যায় কিন্তু সেদিন ফাটে নি। তাকে সব বলেছিলুম, সে আমায় ক্ষমা করেছিল। এখানে থাকলে যদি আবার প্রলোভনে পড়ি, আবার মদ খাই তাই সে আমার পায়ে ধরে আমায় পুরী নিয়ে গেল। সেখানে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখতে পারলুম না, আমার পৈশাচিক লীলা বেড়েই চললো; এখানে থাকতে যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, সেখানে তাও রইল না। মনে পড়ে সেদিনের কথা—যেদিন মদ খেয়ে সন্ধ্যাকে মেরেছিলুম—না, চমকে উঠ না তুমি, মনে করছ সন্ধ্যার সেই ননীর মত কোমল দেহখানার কথা, আমারও আজ মনে পড়ছে উঃ,কি করে মেরেছিলুম। সন্ধ্যা মাটীতে পড়ে গেছল,আমি তবু তাকে মেরেছিলুম, তারপর চলে গিয়েছিলুম। তিনদিন বাদে বাড়ীতে ফিরলুম—হোঃ হোঃ, ডাকলুম সন্ধ্যা—বাতাস কেঁদে গেল,—"

কোথায় রে, কে কোথায়, কে উত্তর দেবে ? সন্ধ্যা যে আর নেই, অভিমানিনী সন্ধ্যা আর সে ধরাশয্যা ছেড়ে ওঠে নি, সেইখানে পড়েই সে প্রাণত্যাগ করেছে, তার সৎকার হয়ে গেছে। মা ছিলেন আমি তাই বেঁচে গেলুম, তিনি ডাক্তারকে ঘুস দিয়ে পুলিশকে টাকা দিয়ে আমায় বাঁচালেন, নইলে সন্ধ্যাকে হত্যা করার অপরাধে আমার কি দণ্ড হতো জানো ? অমন করে তাকিয়ে আছ যে দীপিকা, নারী হত্যাকারীকে দেখছ ? হ্যাঁ, তা দেখ, দেখবে বৈকি ? আমি সন্ধ্যাকে খুন করেছি, সে আমায় বড় ভালবাসত তাই আমার হাতেই প্রাণ দিলে।"

তাহার বিস্ফারিত চোখ, বিস্ফারিত মুখের পানে চাহিয়া দীপিকা ভয় পাইয়াছিল। সে আশঙ্কা করিতেছিল শিরীষের মস্তিষ্ক বোধ হয় কিছু বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সে ডাকিল "শিরীষ দা—"

শিরীষ তাহার দিকে ফিরিল, একটু হাসিয়া বলিল "দেখ, লোকে বলছে আমার মাথা নাকি খারাপ হয়ে গ্যাছে, যা তা বলি, কিন্তু তুমিও কি তাই ভাববে দীপিকা? দেখ আমার জ্ঞান যেমন তেমনিই আছে, আমার কিছু হয় নি, কিন্তু সন্ধ্যার কথা যখন ভাবি—"

শিরীষ একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল "যদি তোমাদের মতন কাঁদতে পারতুম তা হ'লে আমি বাঁচতুম। কাঁদবার জন্যে এত চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই পারি নি, শুধু বুকের মধ্যে জ্বলে যায়, মাথার মধ্যে জ্বলে যায়। দীপিকা তুমি বড্ড ভালবাসতে সন্ধ্যাকে, তাই তোমায় বলতে এসেছি সন্ধ্যা নেই। সন্ধ্যা কেমন করে—কেন মরেছে তা তুমি কোনকালেই জানতে পারবে না তাই তোমায় সত্যি কথাটাই জানাতে এসেছি। আর দেখ তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে—"

"বলুন—"

শিরীষ বলিল "জীবনে আমি কাউকেই সুখী করতে পারলুম না; নিজেও সুখী হতে পারলুম না। জগতে আমার আর কেউ নেই, মা দেশের বাড়ী ছেড়ে এখানে থাকবেন না, আমার এখানকার বাড়ীতে বাস করতে কেউ নেই। তোমায় আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হবে। ভয় নেই, আমি আর তোমার সামনে আসব না। তোমাকে আমার বাড়ী একেবারে দান করে যাচ্ছি, ওতে আমার কোনও অধিকার থাকবে না। বল, নেবে তুমি?

তাহার কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া দীপিকার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সে মাথা নাড়িয়া বলিল "তা কি করে হতে পারে বলুন?"

শিরীষ জোর করিয়া বলিল "কেন হবে না?"

দীপিকা বলিল—তুমি দিলেই আমি নেব এমন কোনও কথা নেই।

উত্তেজিত হইয়া শিরীষ বলিল "নিশ্চয়ই আছে, তোমায় নিতে হবেই। তুমি নেব না বললেই আমি ছেড়ে দেব না দীপিকা, তোমায় দিয়ে তবে আমি কলকাতা ছাড়ব, তবে আমার কাজ শেষ হবে জানব।"

তাহাকে আর উত্যক্ত করা উচিৎ নয় জানিয়া দীপিকা বলিল "আমি নিয়ে কি করব?"

রুদ্ধকণ্ঠে শিরীষ বলিল "তুমি নিয়ে কি করবে তা আমি জানি নে, তোমার যা খুসি তাই করো। আচ্ছা, আমি চললুম, এই কথা রইল, মনে থাকে যেন।"

হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

দীপিকার সম্বন্ধে একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিল না। দীপিকার সধবা থাকা আর বিধবা হওয়া দুইই তাহার চোখে এক, সমান।

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধ মোটরচালক বাহিরে আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। শিরীষ মোটরে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া এক জায়গায় থামিয়া পড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একবার বলিয়াছিল এখানে আসিবে, তাই সে জানিতে আসিয়াছে তাহার প্রভু এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন কি-না।

দীপিকা তাহাকে জানাইল বৈকালে সে আসিয়া খানিক পরে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা সে জানে না!

শিরীষের কথা ভাবিয়া দীপিকা অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। হায় রে অভাগা।

(১৪)

কয়েকদিন শিরীষের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না, দীপিকা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে লোক পাঠাইল, কিন্তু শিরীষের খবর কেহ বলিতে পারিল না।

মাসখানেক বাদে শিরীষের একখানা পত্র পাওয়া গেল, সে পুরী হইতে পত্রখানা লিখিয়াছে।

দীপিকা—

কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ চলে এসেছি। খবর পেলুম তুমি কয়েকদিন আমার খোঁজ নিয়েছিলে এ আমার সৌভাগ্য বলতে হবে; বুঝেছি এতে যে তুমি আমায়—এই নারী অবমাননাকারীকে যথার্থই মার্জ্জনা করেছ।

বড় অশান্তি প্রাণে দীপিকা, এ আর সহ্য করতে পারি নে। মদ খাচ্ছি, কেবল মদ খাচ্ছি; লোকে বলছে মাথা

খারাপ হয়েছে, একেবারেই পাগল হয়ে যাব। হাঁ, তাই তো আমি চাই, বিস্মৃতি, বিস্মৃতি, সব ভুলে যাব তাতে, তাই ত চাই।

কি করলুম আমি তাই ভাবি। আমি কোথায় এসে পড়েছি, এই ভীষণ স্থান হতে আমার উদ্ধারের আশা আর নেই। আমি ডুবব, আমি মরব।

আমার বিষয় সম্পত্তি, আমার বাড়ী ঘর সব তোমার নামে দিলুম, এ সব তোমার। তোমায় বরাবর ভালবেসে এসেছি, এখনও ভালবাসি, তাই তোমায় দিয়ে প্রাণে বড় তৃপ্তি পেলুম। ফিরিয়ে দিয়ো না। তোমার ভক্তের দান এ।

আমি মরব, আমার জন্যে দুঃখ করো না, মনে করো আমি নারী হত্যাকারী, আমায় ঘৃণা করো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কোরো মরার পরে আমার আত্মা যেন শান্তি পায়, আর আমার এ জনমের বাসনা—যদি পরজন্ম থাকে সে জন্মে যেন সফল হয়।"

হতভাগ্য শিরীষ।"

পত্রখানা মুড়িয়া হাতের মধ্যে লইয়া দীপিকা খানিক শূন্য নয়নে গগন পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বিন্দু-বাসিনীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পুরী যাবে মাসীমা?"

মাসীমা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন "পুরী যাব কেন? এ সময়ে—হঠাৎ—"

বাধা দিয়া দীপিকা বলিল "তীর্থস্থান যাবার সময় অসময় কিছু নেই মাসীমা, চল না দিনকত বেড়িয়ে আসা যাক। জগন্নাথ দেখে আসাও হবে, সমুদ্রের বাতাসে শরীরটাও ভাল হবে।"

তাহার জেদে মাসীমা আর "না" বলিতে পারিলেন না। ক্ষিপ্রহস্তে আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইয়া দীপিকা বিন্দুবাসিনী ও রমাকে লইয়া রওনা হইল। বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় গিয়ে উঠব দীপিকা, পাণ্ডা করতে হবে তো?"

দীপিকা সংক্ষেপে বলিল "চল তো, দেখা যাবে।"

পুরী পৌঁছাইয়া সে একখানা গাড়ী করিল, পাণ্ডা করিল না। বিন্দুবাসিনী বিস্মিতা হইলেন, তিনি জানিতেন না শিরীষের এখানে বাড়ী আছে। দীপিকা সেসব কথা তাঁহাকে জানায় নাই।

উপরের একটা গৃহে মাতাল শিরীষ পড়িয়াছিল। সে এখন দিনরাতই মদ খাইয়া পড়িয়া থাকে, মদ খাইয়া সে সকল ব্যথা ভুলিয়া থাকিতে চায়, একদণ্ড মদ না হইলে তাহার চলে না। মা ছেলের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাকে সংযত রাখিতে আর কেহ নাই। মা থাকিতে যেটুকু সংযমতা তাহার ছিল যেটুকু চক্ষুলজ্জা তাহার ছিল, আজ সেটুকুও নাই।

সে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল, অনুভব করিল কে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। চাহিবার চেষ্টা করিয়াও সে চাহিতে পারিল না, জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কে বাবা—তুমি?"

দীপিকা উত্তর দিল না, স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, শিরীষের অবস্থা।

এ সেই শিরীষ; চরিত্রে অতুলনীয়, বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, সম্পদে, মহান, এক কথায় লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র, এ সেই শিরীষ। শিরীষের সেই বিলাসিতা আজ কোথায়? আজ সে পড়িয়া আছে শূন্য মেঝের উপর, একটা মলিন উপাধান তাহার মাথায়, ঘরটায় কতকালের জঞ্জাল জমিয়া, বাড়ীতে দাসী চাকর থাকিতেও এ ঘরটায় ঝেঁটা যে কখনও পড়ে তাহা বোধ হয় না; পরনে ছিন্ন ময়লা একখানা কাপড়, গায়ে জামা নাই। মুখের দুই পাশ দিয়া লাল গড়াইয়া পড়িতেছে, কতক গুলা মাছি মুখের উপর বসিতেছে উড়িতেছে। মাতালের যে দুরবস্থা তাহা স্পষ্ট তাহাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দীপিকার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সে শিরীষের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল "শিরীষ দা!"

এ কি ওপারের আহ্বান না এ পারেরই? অতিকষ্টে শিরীষ চোখ মেলিল, তাই তো, তাহার পার্শ্বে এ কে বসিয়া? ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল, বিহ্বল দৃষ্টিতে দীপিকার পানে চাহিয়া সে আছড়াইয়া পড়িল।

মৃদু কণ্ঠে দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল—একি হচ্ছে শিরীষ দা?"

মৃদুস্বরে শিরীষ বলিল "আমার মৃত্যুশয্যা তৈরী করছি দীপিকা, দুদিন বাদে এখানে আমায় শুতে হবে যে।"

"না শিরীষ দা, আমি তোমায় শুতে দেব না, আমি তোমায় উদ্ধার করতে এসেছি, তোমায় এমন করে নিজের জীবন নষ্ট করতে দেব না শিরীষ দা। নিজে যা দূর করে ফেলেছি, এখন তাই কুড়িয়ে নিতে এসেছি, তোমার পাশে থাকতে এসেছি। এমন একটা মহৎ জীবন একটী নারীর অবহেলায় এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ভগবানের এ অভিপ্রেত নয়। ওঠো শিরীষ দা, তুমি আমায় যা দান করেছ আমি সব এনেছি, আমাকে সুদ্ধ এনেছি। নাও, তোমার যা জিনিষ তুমিই তাই নাও।"

শিরীষ উঠিয়া বসিল, তাহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, দীপিকার মুখে এ কি কথা! সেই দীপিকা যে চির কালের মত বিদায় লইয়া গেল, সে আজ স্বেচ্ছায় ধরা দিতে আসিয়াছে? "সত্যি দীপিকা সত্যি—তুমি এসেছ?"

"হ্যাঁ, শিরীষ দা, সত্যি আমি এসেছি। তোমার পাশে দাঁড়াতে এসেছি, তোমায় এ পাপ পঙ্ক হতে টেনে তুলব বলে এসেছি। ভাবছ আমার মুখে এ কি কথা, কিন্তু, এই-ই সত্যি কথা। বুঝিনি তুমি এমনি করে সত্যিই নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে যাবে, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেবে; আজ বুঝেছি তাই এসেছি। আমাকে তোমার পাশে স্থান দিয়ো, মনে রেখো আমি তোমার, তোমায় উদ্ধার করতে এসেছি।"

শিরীষ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কিন্তু"—

দীপিকা বলিল, আর কিন্তু নয় শিরীষ দা। দেহ দিয়ে তোমার পূজো করব না, মন দিয়ে তোমার পূজো করব। পরের কাছে উৎসর্গ হয়ে গেছে এ দেহ, তোমায় আর দিতে পারব না, তুমি ও তা চাইবে না। যদি তোমায় উদ্ধার করতে পারি তবে আমার এই মনের আকর্ষণ দিয়েই পারব। পারব না কি শিরীষ দা, যদি অভয় দাও, তবে চেষ্টা দেখি।"

শিরীষ বলিল—পারবে বই কি দীপিকা। আমিও আজ নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম, তুমি আমায় এখন ফেরাও, সৎপথে নিয়ে চল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি তোমার বাসনা পূর্ণ হোক।

দীপিকার হাতখানা সে নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল "এইটুকু অধিকার আমায় শুধু দিয়ো, আর কিছু চাই নে। শুধু এইটুকু স্পর্শ পাওয়ার লোভে আমি আবার সৎ হব। তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয় নি এখন ও, যাও, খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে। আমি আজ আর এ মুখ মাসীমার কাছে বার করবনা, কাল বার হব।"

দীপিকা নিঃশব্দে চোখ মুছিল।

সম্পূর্ণ

মহাত্মা গান্ধী ও রোঁম্যা রোলাঁ

'বোম্বে ক্রণিকেল' পত্রের প্যারীস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—প্যারী নগরীর জনৈক পুস্তক-ব্যবসায়ী শীঘ্রই, মহাত্মা জেলে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র জন্ত যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ফরাসী ভাষায় তৎসমুদয়ের অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবেন। বইখানির নাম "ইয়ং ইণ্ডিয়া" এবং ইহা মূল ইংরাজীর ফরাসী অনুবাদ।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী সাহিত্যিক রোঁম্যা রোলাঁ এই বইখানির একটী অতি সুন্দর প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মহাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর হইতে তিনি অতি মনযোগের সহিত ভারতের ঘটনা পরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। রোঁম্যা রোঁলার বইখানি ইয়োরোপের সুধীমণ্ডলীর নিকট একটা নূতন অভিব্যক্তি বিশেষ; ইহা হইতেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম মহাত্মার 'অহিংসা' মন্ত্রের সার্ব্বভৌমত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।' সাহিত্যিক হিসাবে রোঁম্যা রোলাঁার জগৎ-জোড়া খ্যাতি ও তাঁহার চিন্তাশক্তির সাধুতা অহিংসা অসহযোগ ও ইহার প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে তাঁহার মতামতকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে সমর্থ হইয়াছে। বলিতে গেলে রোঁম্যা রোঁলার বইখানি এংগ্লোস্যাক্সন সাম্রাজ্যবাদকে পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজের চক্ষে উপহাসাস্পদ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই আলোচ্য বইখানি কতিপয় ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং ইহার একটা আমেরিকান সংস্করণও বাহির হইয়াছে। এইরূপে রোঁম্যা রোঁলার লেখার মধ্য দিয়া ব্রিটিশ-গণ্ডী ছাড়াইয়া মহাত্মার বাণী যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জগতের নীতি ও চিন্তারাশির মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে।

"ইয়ং ইণ্ডিয়া" বইখানি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রোঁম্যা রোঁলা বহু ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং স্বয়ং মহাত্মার সহিতও তাঁহার পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল।

উচ্চতম সাহিত্যকলার নিদর্শন

প্রবন্ধগুলির ভাষায় কোন প্রকার লিপিচাতুর্য্য বা বাক্যচ্ছটা পাওয়া যাইবে না। গান্ধী ইহার মূল্য জানেন। সাহিত্যকলাই, অন্ততঃ আমরা সাধারণতঃ ইহার যে সঙ্কীর্ণ অর্থ করি, প্রবন্ধগুলির বড় কথা নহে। উহাদের মধ্যে মহা ক্ষমতাশালী ও অভিনবতম কর্ম্মশক্তি নিহিত রহিয়াছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতের ন্যায় কর্ম্মশক্তিকে অতি সুকঠিন ও গৌরবময় উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাওয়া যদি কলাকৌশলের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে গান্ধীর প্রবন্ধগুলিও অতি উচ্চতম সাহিত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিতে হইবে। ইহা একখানি পুস্তক নহে, ইহা মধ্যযুগের সর্ব্বশেষ ধর্ম্ম-বীরের তরবারির ঝলকের ন্যায় বীর-হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

মধ্যযুগের বীরগণের সহিত এই উপমা হইতেই রোঁম্যা রোঁলার ক্ষুদ্র প্রস্তাবনার অন্তর্নিহিত অর্থ বেশ বুঝা যায়। মহাত্মা যে একজন শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী মাত্র, তিনি প্রস্তাবনায় এই অতি সহজ-সাধারণ ধারণা নিরাকরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই প্রবল কর্ম্মশক্তিকে জগতের মেষপ্রতীম জড়-প্রকৃতি বিশিষ্ট শান্তিকামীদলের সহিত তুলনা করা কি নির্ব্বুদ্ধিতা! গান্ধীর মধ্যে বিন্দুমাত্র জড়তা বা নিষ্ক্রিয়ভাব নাই। তাঁহার সমস্ত জীবনই একটা প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি। গান্ধীকে জড়বৎ-শান্তিকামীদের সহিত তুলনা করিয়া যে বিষম ভুল করা হয়, আমি তাহা এই প্রস্তাবনায় অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি যীশুখৃষ্ট 'শান্তির রাজা' হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গান্ধীও এই মধুর ও মনোরম আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু তাঁহারা দুইজনেই যে শান্তি-আনয়ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সক্রিয় ভালবাসা ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, বীরোচিত-ভাবে ধর্ম্মমত-বিশেষে অবিশ্বাসী ও নির্ব্বিচারে গড্ডালিকাপ্রবাহবৎ উদাসীন বিশ্বাসীদের মধ্যে যতটা পার্থক্য বিদ্যমান, মহাত্মার অহিংস-নীতি ও তাঁহার ঘোরশত্রু বিপ্লববাদীদের হিংসানীতির মধ্যে ততটাও পার্থক্য নাই। কিন্তু এই তথাকথিত অনন্তকালের জড় বিশ্বাসীরাই জগতে অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম করিতেছে এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধন দৃঢ় করিতেছে।

মহাত্মার গুণাবলী সম্বন্ধে তিনি বলেন,—এই আনুষ্ঠানিক আদর্শবাদী মহাপুরুষের প্রতিভামণ্ডিত স্বরচিত পুস্তকাবলী পাঠে, তাঁহার অলৌকিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। আবেগময় আদর্শবাদীদের মধ্যে যে গুণ অতি বিরল, মহাত্মার মধ্যে অপরের চিন্তারাশি বুঝিবার সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন মানসিক অবস্থাসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্নভাবে তাঁহাকে বুঝিয়া থাকে এবং যাহার যতদূর ক্ষমতা সে সেইভাবেই অনুপ্রাণিত হয়। এই অনন্যসাধারণ মানসিক গুণ মহাত্মায় বিশেষভাবে বিদ্যমান। তর্কস্থলে তাঁহার লেখার মোলায়েম, শান্তভাব ও সম্পূর্ণ ভদ্রোচিত ভাষা-প্রয়োগ এবং সরল বিশ্বাস জন্মাইবার শক্তির আশ্চর্য্য সমাবেশ বড়ই মধুর।

গান্ধী বিশ্বাস করেন যে, অতি উচ্চ ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে একটী জাতিকে কঠোর আত্মত্যাগে ব্রতী করান যায়; তিনি দেশবাসীকে বড় রকমের

নৈতিক শিক্ষা দিতেছেন; এই নৈতিক শিক্ষার অভাবই বর্ত্তমান যুগের বিপ্লববাদী সৈন্যদলের প্রধান ত্রুটী; এবং এই শিক্ষাতেই আবার অতীতের বিপ্লববাদীদের পরম শক্তি নিহিত ছিল। ক্রমওয়েলের সৈন্যগণ মহাত্মার বাণীর ন্যায় নৈতিক শিক্ষার বাণী শুনিয়াছিল। তাহাদিগকে শিষ্টাচার, দৈহিক ও নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে হইত, মদ্যপান তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, সত্যমিথ্যার সংমিশ্রণ, গোপন আচরণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ছিল। মহা-প্রতিভাবান্ ক্রমওয়েল জানিতেন; এবং মহাত্মাও মনুষ্যের অন্তর্নিহিত অনন্ত ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন।

আত্মার সংগ্রাম

তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন যে, "উহা আত্মার সংগ্রাম।" ফরাসী ও অন্যান্য দেশের শাসক সম্প্রদায়ের দৈহিক বল লইয়া অতি বাগুতার তীব্র নিন্দা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন- "আমরা উপরিউক্ত শাসক সম্প্রদায়ের সম্মুখে দ্বিতীয় প্রকার সংগ্রামের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছি, উহা কালে ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে। তাঁহাদের যদি ইহাকে পিষিয়া মারিতে ইচ্ছা হয়, মারুন: ইহাকে অবমাননা করিবার শক্তি থাকিলে তাঁহারা তাই করুন. রোমও একদিন যীশুখ্রীষ্টের প্রতি এতাদৃশ ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু এমন দিনও আসিয়াছিল, যখন মহাশক্তিশালী রোমকেও বাধ্য হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত রফা করিতে হইয়াছিল। "এই প্রতীক সাহায্যেই তোমরা জয়যুক্ত হইবে।"

'ইয়ংইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকের প্রস্তাবনার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন,— "আমি নিজে ঐতিহাসিক; সময়ের স্রোতে ঘটনা পরম্পরার গতিবিধি লক্ষ্য করাই আমার কাজ। প্রাচ্যে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, আমি তাহ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি: ইয়োরোপকে প্লাবিত করিয়া তবে ইহা প্রতিনিবৃত্ত হইবে।"
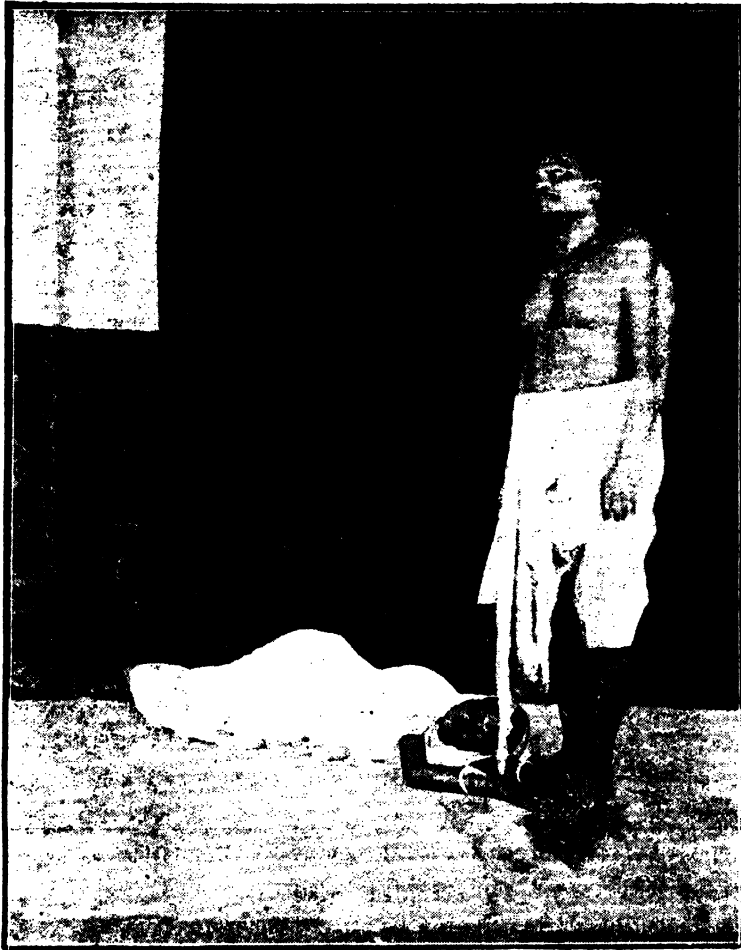
"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।"

—প্রফুল্ল

" * * * সাজাই আগে
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে।"
এত কহি মালা পরায় গলে
বদন চুম্বন করিল ছলে।

* * * *

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩১ সাল। [৩য় সপ্তাহ

স্বপ্নাদ্য মাদুলী (বিশেষ ফলপ্রদ)

স্ত্রী। দেগ ভুগে-ভুগে ত সারা হলে ! অষুধ পত্তরও কিছু আর বাকী রইল না। আমার বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীর নন্দ-দাদা বলেন, তাঁর জানা একটি খুব ভাল স্বপ্নাদ্য মাদুলী আছে। একবার দেখ্‌বে ?

পথে।

নন্দ-দাদা। একদিনে, দাদা, একদিনে একদম 'কিওর!' রাত্রে হাতে মাদুলাটি বেঁধে ঘুমুবে, সকালে উঠে দেখ্‌বে, তুমি একদম নতুন লোক! তোমার ঠেঙ্গে কি আর নোব? তবে কি জান অমনি ধারণ করলে তেমন ফল হয় না!—তা গোটা দশেক টাকা দিও। সঙ্গে আছে নাকি?

গৃহে।

স্ত্রী। ঘুমুবার সময় বেশ করে' বাবাকে ডেকে শুয়ো! বাবা একদিনে রোগ সারিয়ে দেবেন। দশ টাকা গেছে বলে ভেবো না; অষুধ-পত্তরে অমন কত দশই ত গেছে!
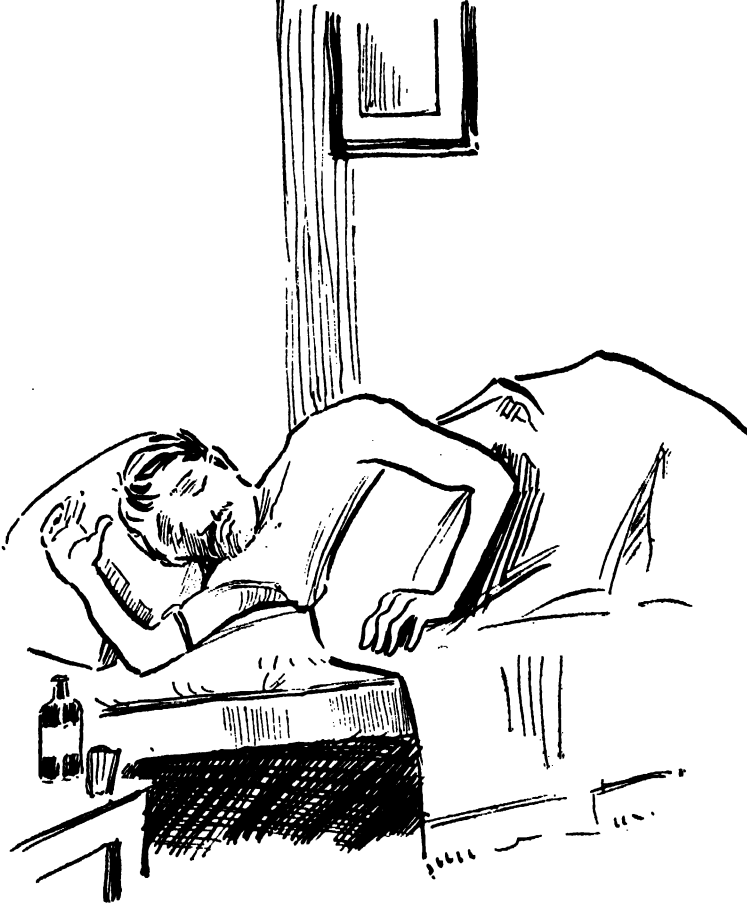
রাত্রে।

বাবাকে ডাকিয়া শয়ন করিলেন ও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রে।

(গৃহিণীর নন্দ দাদার স্বপ্নাদ্য মাদুলীর এমনই মাহাত্ম্য [illegible]
বাবার সঙ্গে স-শরীরে সাক্ষাৎ হইয়া গেল।)

বাবা। তেরা ভালা হোগা বেটা।

(ক্রমশঃ)

'ভারত মাতা'

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্]

নাট্যশালা কেবল আনন্দ প্রদানের জন্য নহে। উহাদ্বারা জনসাধারণকে উচ্চতম শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে। শত শত বক্তৃতা বা উপদেশে মানব হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত, সমাজোন্নতি প্রবৃত্তি বলবতী বা দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা যায় না, উচ্চশ্রেণীর অভিনয় দ্বারা সেই সকল ভাব উদ্দীপ্ত করা অসম্ভব নহে। 'স্বদেশী'র যুগে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রভৃতি প্রতিভাশালী নাট্যকারগণ দেশ প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্য অনেকগুলি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক রচনা করিয়া ও তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর জীবন স্রোত নূতন পথে পরিচালিত করিতে যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহা একবারে বিফল হয় নাই, একথা বলা বাহুল্য।

এদেশে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়দ্বারা স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা আমাদের প্রথম সাধারণ নাট্যশালার সৃষ্টিকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রথম সাধারণ নাঠ্যশালা 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে ৺ কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের* "ভারতমাতা" নামক একাঙ্ক নাট্যলীলার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন এমন লোক এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহারা বিশেষরূপেই জানেন যে আমাদের নাট্যশালা প্রথম হইতেই স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল,—কেবল খানিক আনন্দ-প্রদানের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে 'ভারতমাতা' পুস্তিকাখানিতে কিরণবাবুর নাম সংযোগ থাকিলেও উহা অন্যের রচিত, কারণ সেকালে উঁহারা একজন গ্রন্থ লিখিয়া অপর এক বন্ধুর নাম দিয়া ছাপাইতেন, তাহাতে কেহই আপত্তি করিতেন না। যাহা হউক উহা যখন কিরণবাবুর নামেই ছাপা হইয়াছিল তখন উহা কিরণবাবুর বহি বলাই সঙ্গত। 'ভারতমাতা' পুস্তিকাখানি এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্য আমরা এইস্থানে উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলে আশা করি, আধুনিক পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

সেকালের প্রথামত নাটিকার প্রথমেই সূত্রধারের প্রবেশ। তাঁহার মুখে দুইটী গীত প্রদত্ত হইয়াছে, একটি ঈশ্বরবিষয়ক, অপরটি দেশপ্রেমোদ্দীপক; শেষোক্ত গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখনা চাহিয়ে।
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে॥
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্ব্বনাশ,
ভুগিছ অশেষ ভোগ, লোভ কূপে পড়িয়ে।
হিংসা-রূপা পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী,
মজনা মজনা হায় তার প্রেমে ভুলিয়ে॥

এই গীতদ্বয় গীত হইলে সূত্রধার অভিনয়ের উদ্দেশ্য এইরূপে ব্যক্ত করেন :—

"ভারত-ভূমির ও ভারত সন্তানগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শনই 'ভারত মাতা'র উদ্দেশ্য। যদ্যাপি সমাগত সুধীমণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারত মাতার দুঃখ দূর কোর্‌তে একদিনও যত্ন পান, তাহা হলেই আমার ও গ্রন্থকর্ত্তার শ্রম সফল।"

এই নাট্যলীলার একটি মাত্র দৃশ্য—'হিমালয় পর্ব্বত'। তথায় চিন্তামগ্না আলুলায়িত-কেশা ভারতমাতা আসীন। সম্মুখে ভারতসন্তানগণ নিদ্রিত। প্রথমেই ভারতলক্ষ্মীর প্রবেশ। তাঁহার মুখেও দুইটী গীত প্রদত্ত হইয়াছে। একটি পূজনীয় শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ সঙ্গীত—"মলিন মুখ চন্দ্র মা ভারত তোমারি।" অপরটি 'ভারতমাতা'র আদর্শে বহুদিন পরে রচিত নটরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের 'নবজীবন' শীর্ষক নাট্যলীলায় দেবেন্দ্র নাথ

---

* ইনি 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারের' অন্যতম ডিরেক্টর ৺ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা।

বন্দোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গানটি এই :—

রাগিনী পাহাড়ী—তাল একতালা।

দেখগো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান॥
সবে বলবীর্য্য হীন, অন্ন বিনা তনুক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদারিয়ে যায় প্রাণ।
মরি এদশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এস্থান॥

শেষ পংক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে গাইয়া ভারতলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। নাট্যকারের নির্দ্দেশমত ভারতলক্ষ্মী প্রবেশ করিলে লাল আলো জ্বালান হইত এবং প্রস্থান করিলে পর এককালীন সব আলো নিভাইয়া ঘোর অন্ধকার করা হইত।

ভারতলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলে ভারতমাতা ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার মোহাচ্ছন্ন সন্তানগণকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন কিন্তু আলস্য বশতঃ কেহই উঠিল না। ভারতমাতা পুনরায় কাতরভাবে সন্তানগণের নিকট অনুযোগ করিলেন। তাঁহার মুখে প্রদত্ত একটি গীত নিম্নে উদ্ধার করিতেছি :—

রাগিনী বেহাগ—তাল একতালা।

মম ধর বচন।
ত্যজ অভিমান, ইন্দ্রিয় দমন, করিবারে বাছা কররে যতন॥
হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মান, অভিমান, স্বাধীনতা পদে দাও বলিদান,
দেখরে সবারে ভায়ের সমান, অজ্ঞান পিশাচ কর দমন।
স্বাধীনতা-অসি হেসে করে ধর, পরাধীন-গ্রন্থি কাটরে সত্বর,
যতনে রতন, স্বাধীনতা ধন, লভিবারে যাদু কর প্রাণপণ;
যে ধন বিহনে তোদের জননী,এই দেখ যাদু পথের ভিখারিণী,
বিহীন ভূষণ, বিহীন বসন, চেষ্টা কর পেতে সেই মহাধন॥

ভারতসন্তানগণ হতাশভাবে বলিল, তাহারা নিরুপায়,— 'আমরাতো এখন মানুষ নই, আমরা একটী একটী ভূত যে মা!' ভারতমাতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যে আক্ষেপোক্তি করিলেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শিনী :—

"বাবা, তোরা কি তারাই রে? হায়, হায়, হায়, কি ছিলেম কি হলেম, একদা আমার পুত্রগণের যশঃ সৌরভে এই ভারতভূমি চিরপরিপূর্ণ ছিল, বাহুবলে সসাগরা, সদ্বীপ ধরিত্রীর একাধিপত্য করেছিল, দ্বাদশবর্ষীয় বালকগণও অকুতোভয়ে সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কালান্তক কাল সদৃশ বৈরিদলকে মুহূর্ত্ত মধ্যে শমন সদনে প্রেরণ কোর্‌তো, রমণীগণও স্বীয় অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্যাদির দ্বারা বন্দী স্বামীগণকে উদ্ধার কোর্‌তো, কালে তাহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোর্‌চে, সহাস্যবদনে দাসবৃত্তি অবলম্বন কোর্‌চে, ব্যাঘ্রবোধে সাহসের সহবাস পর্য্যন্তও পরিত্যাগ কোরেচে।"

সন্তানগণ কেবল উদ্যমবিহীন হইয়া পড়িয়া রহিল না, ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া খাদ্যের জন্য মাতাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। ভারতমাতা কহিলেন :—

"বাবা, মায়েতে কি দুধ আছে, যে তোদের খেতে দোবো, বাছা শরীরে কি রক্ত আছে? সব চুসে খেয়েছে। বাবা, তোরা আর কেন এমন করে পড়ে থাকিস্, তোরা আপনার আপনার কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখ্।"

প্রথম সন্তান বলিল :—"মা, আমাদের চারিদিক্ বন্ধ, কোন্‌দিকে, যাই মা? আমাদের চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি কোর্‌বো মা? কেমন করে খাব মা?

দ্বিতীয় সন্তান বলিল :—"মা, ইচ্ছে হয় যে মহারাণীর জন্য যুদ্ধ করেও প্রতিপালিত হই, মা তাও হতে দেয় না মা।"

অপর এক সন্তান কহিল :—"মা আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু নুন পর্য্যন্তও খেতে পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের তাঁত গুলি পর্য্যন্ত বন্ধ। কি করি, কোথায় যাই মা কার কাছে গেলে দুটি খেতে পাব মা?"

এইরূপ কথোপকথনের পর ভারতমাতা ইংলণ্ডেশ্বরীর করুণাভিক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সন্তানগণের করুণ চীৎকারে উত্যক্ত হইয়া একজন সাহেব আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন "রে দুরাশয় দুর্ব্বৃত্তগণ, এই জন্যই কি আমরা তোদের জ্ঞানদান কচ্ছি। রে নরাধম রাজবিদ্রোহীগণ, মহারাণীকে ডাক্‌তে তোদের মনে অনুমাত্রও ভয় সঞ্চার হোলনা? ওঃ এমন জান্‌লে কে তোদের লেখা পড়া শেখাত

ভারতমাতার সুসন্তান

'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাগ্মী রাম গোপাল ঘোষ

রাজা রামমোহন রায়

কে তোদের প্রতি স্নেহমমতা কোর্‌তো? নরাধম তোদের মুখদর্শন কোর্‌লে পাপ হয়।" * * * সর্ব্বশেষে "তোরা যেমন নরাধম, কৃতঘ্ন, তেমনি তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছি" বলিয়া পদাঘাত করিলেন। সন্তানগণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিলে, ভারতমাতাও নিম্নোক্ত মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ভগবানকে এবং তাঁহার পরলোকগত সুসন্তান "হিন্দুপেট্রিয়ট"—সম্পাদক স্বদেশবৎসল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথমসম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা রাজা রামমোহনরায় ও বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষকে সাশ্রুনয়নে ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছা গেলেন—"ঈশ্বর, তুমি কোথায়? হতবিধে তোর মনে কি এই ছিল, উঃ, বাবা তোরাই কি আমার তারারে? আমার সেই একদিন আর এই একদিন। কোথায় **হরিশ**, কোথায় **গিরিশ**, কোথা **রামমোহন**, কোথায় **রামগোপাল**।"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে যে মর্ম্মস্পর্শী করুণস্বরে ভারত-মাতা তাঁহার আক্ষেপোক্তি উচ্চারিত করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

ইহার পর অপর এক উদার-হৃদয় সাহেব প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাহেবকে পদাঘাত করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং ভারত-মাতার সমীপে গিয়া কহিলেন :—

"মা, আর কেঁদনা মা, তোমার দুঃখ দেখ্‌লে পাষাণও দ্রব হয়, ঐ পশুর ন্যায় কতকগুলি দুর্ব্বৃত্তের নিমিত্তই তোমার এত কষ্ট। নরাধমরা তোমার সব কোর্‌তে পারে। মা, ইংরাজ জাতি কখন এমন নীচ-প্রকৃতি নয়। তোমাদের অশ্রুপাতে অশ্রুপাত না করে, ভদ্র ইংরাজগণ মধ্যে অতীব বিরল। মা, এইরূপ কতকগুলি অসভ্য দস্যুর নিমিত্তই আমাদের ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হচ্ছে। * * মা, কিছু দুঃখ করো না, তোমাদের দুঃখ-রজনী শীঘ্রই অবসান হবে। * *"

অতঃপর একে একে রঙ্গমঞ্চে ধৈর্য্য, সাহস ও একতা আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইলেন। ধৈর্য্য বলিলেন :—

"জাতি-হিংসা, অভিমান, লোভ, অপমান।
ত্যজরে এদের সবে, হয়ে সাবধান॥
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর সবে।
অবশ্য তোদের ভাই বাসনা পুরিবে॥"

সাহস বলিলেন,—

"ভেবনা ভেবনা,
অবিলম্বে দুঃখ নিশি হবে অবসান,
ভারতের সুখ-রবি উদিবে গগনে।
কায়মনে প্রাণপণে কর রে যতন।
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'।"

একতা বলিলেন,—

"ভ্রাতৃগণ, অনৈক্য, আত্মাভিমান, ও স্বজাতি-হিংসাই, তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হতে এ সকল ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনোবাক্যে জননীর দুঃখনাশ-ব্রতে ব্রতী হও।

'কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
'যতোধর্ম্ম স্ততো জয়'
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?"

এইস্থানে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

এই নাট্যলীলার অভিনয় এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে সুধীবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-সৌরমণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, একাধারে কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভিনয় দর্শনান্তে যে মনোহর কবিতায় স্বীয় মনোভাব অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমরা তাহা পাঠকগণকে উপহার দিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব :—

ভারত মাতা

[জাতীয় নাট্যশালা]

১

বামকরে বাম কপোল স্থাপিত,
গম্ভীর মূরতি বিষাদে জড়িত;
মেঘাবৃত-পূর্ণ সুধাকর-সম,
মলিন মুখশ্রী নিরুপম রম;
রুক্ষ কেশপাশ আলুলায়িত;
দৃষ্টিহীন চক্ষু, শূন্য বাহ্যজ্ঞান;

ম্লান জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ;
হস্তে দুইগাছি লৌহের বলয় ;
দুঃখিনী দুর্ব্বলা বসি নিরাশ্রয়,
মূর্ত্তিমতী চিন্তা যেন শোভিত।

২

সন্তান কয়টী নিকটে ঘুমায়,
বিছানা বিহনে পড়িয়া ধূলায়,
অস্থিচর্ম্ম সার সবারি দেহ,
ম্লান পরিশুষ্ক বিবর্ণ বদন,
পরিধান মাত্র মলিন বসন,
জাগায় যে কাছে নাহিক কেহ।

৩

সহসা আকাশে চপলা চমকে,
ভাসে দশদিক্ আলোকে পলকে ;
সে আলোক মাঝে রাজে কমলিনী,
কমল চরণা কমল মালিনী ;
কমল যুগল কমল করে,
দুঃখিনীর মুখপানে চাহিয়া,
দৃক্পাত নাই দেখি কাঁদিয়া,
কহিতে লাগিলা কাতর স্বরে।

৪

"ম্লান মুখচন্দ্র ভারতি তোমারি,
হেরি দিবানিশি ঝরে নেত্রবারি,
নিয়ত যে কান্তি, বরষিত শান্তি,
আজি তা কেমনে এমন নেহারি ;
দুখ-পারাবারে, নিরখি তোমারি,
হৃদয়ে ধৈরজ ধরিতে না পারি।"

৫

মধুর বচন করিয়া শ্রবণ,
চকিতা দুঃখিনী ফিরায় নয়ন,
অমৃত ভাষিণী তরুণী পানে ;
অদৃষ্টের ফের, হায়, দৃষ্টিহারা
পূর্ব্ব তেজস্বিনী নয়নের তারা ;
কিছু না হইল জ্ঞানের উদয় ;
পুনঃ কমলিনী ভাষ সুধাময়
বর্ষিলা মধুর মধুর তানে।

৬

দেখ গো ভারতী তোমারি সন্তান,
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হতজ্ঞান ;
বলবীর্য্য-হীন, অন্ন বিনা ক্ষীণ,
দেখিয়া দুর্দ্দশা, বিদরে যে প্রাণ,
হেরিতে না পারি এ দশা তোমার,
দেশের সুখের মুখে দিয়া ছার,
হইয়া অপার জলনিধি পার,
চলিলাম আজি ত্যজি এই স্থান।"

৭

দুখিনী আবার চাহিলা চকিতে,
কিন্তু সংজ্ঞা তাহে না হইল চিতে ;
দেখিয়া চপলা অদৃশ্য হইল,
অমনি আলোক মালিকা নিভিল।

৮

কতক্ষণ পরে আর্ত্তনাদ করি
উঠিলা দুখিনী, যেন চোরে হরি
লয়ে গেছে তাঁর মাথার মণি ;
সন্তানগণেরে চান জাগাইতে
আলস্যে কেহই না চাহে উঠিতে,
যে জাগে সে পুনঃ চায় ঘুমাইতে,
করেন জননী রোদন ধ্বনি।

৯

অবশেষে জাগি উঠিল সকলে,
'কি খাব মা খাব' ক্ষুধাভরে বলে,
কহেন জননী কি বলিব হায়,
গিয়াছেন লক্ষ্মী ছাড়িয়া আমায় ;
অন্ন আর কোথা পাইব এবে,
কমলা এখন সাগরের পারে;
বিরাজেন মহারাণীর আকারে,
অন্ন কর বাছা তাঁহায় সেবে।'

১০

"জয় মহারাণী জয় জয় জয়,
বিপদ সময় দেহ মা আশ্রয়,"
হৃদয় ভরিয়া, উৎসাহ করিয়া,
কহিল কাতরে তনয়-নিচয়।

১১

হেনকালে শ্বেতকান্তি মহাবীর,
জলদাগ্নি কোপে কম্পিত শরীর,
বিদ্রোহী বলিয়া, ভর্ৎসিয়া গর্জ্জিয়া,
পদাঘাত করে, নিষ্ঠুর অন্তরে,
সন্তানগণের গায়।
দেখিয়া দুখিনী জাহুলস্তভূমি,
বলে "ওহে বিধি, কোথা আছ তুমি ?
ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে,
কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে ?
কোথায় হাস্তরশ কোথায় গিরিশ,
কোথা ফেলি গেলি মায়।"

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কল্যাণীর মনোব্যথা।

কল্যাণী ক্রমে শুনিল যে, বরের পিতা তাহাদের তুলনায় ধনী হইলেও, তাহাদের নিকট হইতে, পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে, দশ সহস্র রজত মুদ্রা যৌতুক লইবেন। সে বরপক্ষকে যতটা গৌরবান্বিত ও মহৎ মনে করিয়াছিল, এই সংবাদে, তাহার সেই ধারণা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া গেল। সে বুঝিল, ঈশানীর শ্বশুর, তাহার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের ন্যায়, মহৎ-অন্তঃকরণ হইবেন না। তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলে, তাহার পিতা, যখন তাহার শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে কত টাকা যৌতুক দিতে হইবে, তখন তিনি যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা কল্যাণী আজও ভুলে নাই এবং কখন ভুলিবে না। তাহার শ্বশুর মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'মশাই, আমরা সামান্য লোক; আমাদের অভাবও সামান্য; আমরা টাকা নিয়ে কি করবো। আর অলঙ্কারও বেশী দেবার আবশ্যক নেই। আমাদের গরীবের বাড়ীতে বৌত আর বসে থাকতে পারবে না।' কি বিনয়পূর্ণ, সরল ও মহৎ উক্তি! তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া, কল্যাণী তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল; এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, শ্বশুর বাড়ীগিয়া সে কখনও পরিশ্রমে আলস্য করিবে না। সে তখনও বুঝিয়াছিল যে, পরিচ্ছদের পারিপাট্য বা পরিচ্ছন্নতা এবং দেহের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য মানুষকে মহৎ করিতে পারি না; একমাত্র আন্তরিক গুণই মানুষকে মহৎ করে, দেবতা করে!—অর্থলোলুপের অন্তরমধ্যে কোনও গুণ থাকিতে পারে না।

ইহা ভাবিয়া কল্যাণী ঈশানীর ভাবী শ্বশুরকে পছন্দ করিতে পারিল না; এবং তাঁহার পুত্রের সহিত, দশহাজার টাকা খরচ করিয়া, ঈশানীর বিবাহ দেওয়া একটা অপকর্ম্ম এবং একটা অপব্যয় মনে করিল।

আর একটা বিষয়ে কল্যাণী বড় ব্যথিতা হইয়াছিল। সে যখন, চারিবৎসর পূর্ব্বে পিতৃবাস ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিল, তখন সে তাহার ছোট ভগ্নী ঈশানীকে কেমন হৃষ্টপুষ্টা দেখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন সে তাহাকে কত রুগ্না দেখিল; এই চারিবৎসর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার দেহ ও সৌন্দর্য্য কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই; বিবাহের আনন্দ, তাহার মনকে স্পর্শ করিলেও, তাহার দেহকে কিছু মাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার লোচন পার্শ্বে এখনও কৃষ্ণবর্ণ দাগ লুকাইয়া ছিল; তাহার কণ্ঠ পার্শ্বে, অস্থিদ্বয় প্রসারিত হইয়া, যেন দুইবাহু পাশে, রোগকে আগুলাইয়া রাখিয়াছিল। যে কন্যার বিবাহের জন্য দশ হাজার টাকা খরচ কর হইতেছিল, কল্যাণী মনে করিল, অগ্রে তাহার স্বাস্থ্যের জন্য কিঞ্চিত ব্যয় করা উচিত ছিল; এবং আরোগ্য হইলে পর, তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ছিল। কল্যাণী আপন মনোব্যথা তাহার বিমাতাকে জানাইল।

বুদ্ধিমতী প্রমদা, ইহার মধ্যে, সপত্নীর কন্যার কিছু হিংসা দেখিতে পাইলেন, মনে করিলেন, তাহার কৃষ্ণবর্ণ মূর্খস্বামী অপেক্ষা, ঈশানীরস্বামী অনেক ভাল হইবে বুঝিয়াই হিংসা-পরায়ণা কল্যাণী কৌশলে এই বিবাহ স্থগিত করিতে চায়। তাহার হিংসা প্রসূত কথা, তিনি গ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনের কথা গোপন রাখিয়া, প্রকাশ্যে বলিলেন, 'ঈশানী একটু রোগা হয়েছে বটে, কিন্তু গায়ে বিয়ের জল পড়লে, আর একটু জোরাল' অষুধ খেলে, দু'দিনে মোটা হয়ে উঠবে। ও একেত খুবই সুন্দর; তারওপর একটু মোটা হলে, শ্রী আর ধরেবে না। আপততঃ এ বর হাত হাড়া হয়ে গেলে,

তেমন বর সমস্ত পৃথিবী খুজলেও আর পাওয়া যাবে না। উনি নিজে গিয়ে বরকে দেখে এসেছেন ; উনি বলেন, বরের যেমন রূপ তেমনই গুণ।'

ইহার পর, কল্যাণী আর কোন কথা বলিতে পারিল না। বাস্তবিক, সে বুঝিল, যে তখন আর যুক্তি দেখাইয়া বিবাহ বন্ধ করিবার উপায় ছিল না। সে আরও দেখিল যে, এই বিবাহে ঈশানী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছে ; তাহার এই আনন্দ ভঙ্গ করিতে কল্যাণী ইচ্ছা করিল না।

কিন্তু এই বিবাহ স্থগিত রাখিতে পারিলেই ভাল হইত। এ কথা, দুই বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে, বুদ্ধিমতী প্রমদা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সে কথা পরে যথা সময়ে বিবৃত করিব।

এখন, তোমরা এস, মহা হর্ষে এস ; আসিয়া ঈশানীর দশ সহস্র টাকা মূল্যের মহা বিবাহে মহা হর্ষে যোগদান কর। তাহা না করিলে, বুদ্ধিমতী প্রমদা তোমাদের উপর রাগ করিবেন ; সে রাগকে প্রথম মুন্সেফবাবু ভয় করিতেন, তোমরাও করিও।

কুটম্ব কুটম্বিনীগণের, অতিথি অভ্যাগতের শুভাগমনে শান্তিপ্রিয় অখিল বাবুর শান্ত গৃহ, মৎস্য বিপনির ন্যায়, মুখর হইয়া উঠিল ; মধুর ভাষিনী, কোকিল-গঞ্জনী, মৃগচক্ষু সনী-দিগের হাস্য ও বাক্যের কোলাহল, আকাশের বজ্র-নির্ঘোষকেও পরাভূত করিল। প্রমদার হাসিমুখে হাসি আর ধরিল না ; তিনি সকলের কাছে কথায় কথায় নিজের অগাধ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্রকায় মানব শিশুগণ, তাহাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠ হইতে বিপুল ধ্বনি উত্থিত করিয়া, কেহ কাঁদিল, কেহ গল্পে নিবিষ্টচিত্তা মাতার শ্রবণ-বিবর ভেদ করিয়া সজোরে মধুর 'মা,মা' ধ্বনি করিতে লাগিল, কেহ কেবলমাত্র চিৎকার করিল। এইরূপে শ্রীমতী ঈশানীর শুভ বিবাহোৎসব চলিতে লাগিল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিরাভরণা।

আজ ঈশানীর গাত্রহরিদ্রা। এই গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে, পল্লীর আহূতা প্রতিবেশিনীগণ এবং সমাবেতা কুটুম্বিনীগণ সন্তানগণকে মনের সাধে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করাইলেন ; এবং আপনারা আপনাদের স্থিতিস্থাপক উদরের উপর কোন মমতা না রাখিয়া মৎস্য আহার করিলেন। আজ বুদ্ধিমতী প্রমদা ভুলিয়া গেলেন যে তিনি মুন্সেফের পত্নী মাত্র ; আজ তিনি অভ্যাগতগণকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কালে মনে করিলেন, যেন তিনি ত্রিভুবন পালনকর্ত্রী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হইয়াছেন ; মুন্সেফবাবু নহেন, স্বয়ং কুবের তাঁহার ধনাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সকলেই প্রমদার অন্নদানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই নিয়মাতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়া অখিলবাবু অতিকষ্টে কিঞ্চিত সাহস সংগ্রহ করিয়া, প্রিয়তমা পত্নীকে নিভৃতে ডাকিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন।

প্রমদা, প্রেমে কিম্বা ক্রোধে, নয়নতারা বিঘূর্ণিত করিয়া স্বামীর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন ; এবং কহিলেন, 'তুমি যেমন দৃষ্টিকৃপণ, তাতে এসকল ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি না দেওয়াই ভাল। লোকের কাছে একটু সুখ্যাত পেতে হলে একটু খরচ করতে হবে বই কি ? আর তোমার এই শেষ কাজ ; এই এখনই যা' খরচ হবে ; এরপর, আর কোন খরচ করতে হবে না। আমার পেটে যদি সাতটা মেয়ে হ'ত, তা'হলে তোমাকে খরচ করতে বলতাম না। আমার ঐ একটা মেয়ের বিয়েতে একটু খরচ করতে হচ্ছে বলে, তোমার বুক টন্‌টন্ করছে।'

কল্যাণীর বিবাহের সময়, ব্যয় সম্বন্ধে, প্রমদা যে সকল মতামত পোষন করিতেন, এখনকার মতামত তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও, এবং উপরোক্ত যুক্তি সকলের অর্থ তাঁহার বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও, অখিলবাবু প্রমদার কথার কোন প্রতিবাদ করিলেন না ;—প্রতিবাদ করিবার উপায়ও ছিল না। সুতরাং বিবাহের দিনের ব্যয় জন্য তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে গাত্রহরিদ্রার অতিরিক্ত খরচ প্রায় দেড়শ টাকা দিতে হইল। ইহাতে অখিলবাবু অতিশয় চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন, যদি বিবাহের দিনও এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহা হইলে, আর টাকা তিনি কোথায় পাইবেন ?

তিনি চিন্তিত হইলেও, দণ্ডের পর দণ্ড অতিক্রম করিয়া, বিবাহ দিনের প্রভাত হইল।

ঐদিন দ্বিপ্রহরে, আহারাদির পরে, মহিলাগণ বড়ঘরে একত্রিত হইয়া, পুত্রকন্যাদের এবং আপনাদের বস্ত্রালঙ্কার নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন।—কি অলঙ্কার, কি বস্ত্র পরিধান করিয়া বরকে বরণ করিতে হইবে; কোন উজ্জ্বল অলঙ্কার, এবং শোভা-উদ্গীরণকারী সাটী পরিধান করিয়া বাসরঘরের ঔজ্জ্বল্য ও শোভা বর্দ্ধন করিবেন; কোন পুত্র, কি পরিচ্ছদ পরিয়া বর দেখিতে যাইবে; কোন কন্যা কি অলঙ্কার পরিধান করিলে, তাহাদিগের কমনীয় দেহ আরও কমনীয় হইবে ? --ইত্যাদি গুরুতর বিষয় তাঁহারা বহু গবেষণার পর মীমাংসা করিলেন। যে যে সীমন্তিনী কবরী-রচনায় পার-দর্শিনী, তাঁহারা বালিকাগণের, এবং বালিকাগণের মাতা-গণের মোহিনী বেণী বন্ধনে নিযুক্তা হইলেন। তৎকালে, সেই কক্ষমধ্যে সেই বরবর্ণিনীদিগের স্থান সংকুলান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের মৃদু ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের স্থান হয় নাই;—তাহা যেন কক্ষের ছাদ ও প্রাচীর চুর্ণ করিয়া সমস্ত ব্যোমপথে আপনার স্থান করিয়া লইতেছিল।

প্রমদা কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর পরবার মত কাপড় আছে ত ?'

কল্যাণী বলিল, 'আছে।'

তাঁহার গুরু-প্রশ্নের এমন একটু ছোট উত্তর প্রমদা পছন্দ করিলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তা পরবার উপযুক্ত ত ? নিয়ে আয়, আমি দেখবো।'

কল্যাণী বলিল, 'সে কাপড় ছেঁড়া নয়, আর বেশ ফরসা। তা' আমি তোমাকে এনে দেখাচ্ছি।' এই বলিয়া কল্যাণী বাক্স হইতে কাপড় বাহির করিয়া আনিবার জন্য উঠিল।

প্রমদা গমনমানা কন্যাকে আদেশ করিলেন, 'আর তোর বাক্সে কি কি গহনা আছে, অমনি বের করে আনিস।'

কল্যাণী গমনে বিরতা হইয়া, মাতার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'বাক্সে ত আমার আর কোনও গহনা নেই; সকল গহনা ত আমার গায়েই আছে।'

প্রমদা কহিলেন, 'ওমা! গায়ে আর তোর কি ছাই আছেরে। সেই আমাদের দেওয়া বালা, চুড়ী আর হার। কেন, এই চার বছরে, তোর শ্বশুররা কি একরত্তি সোনা দিতে পারে নি ? বৌকে মুখে শুধু আদর করলেই হয় না, দু' একখানা গহনাও দিতে হয়।'

বিমাতা শ্বশুরবাটীর নিন্দা করাতে, কল্যাণীর হাস্যদীপ্ত মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছিল; সে ম্লানমুখে কহিল, 'তাঁরা ত আমাকে গহনা দিয়েছেন। এই অনন্ত দিয়েছেন, মাথার এই ফুল আর কাঁটা দিয়েছেন, আর আমি একটা আংটী চেয়েছিলাম, তাও গড়িয়ে দিয়েছেন।'

প্রমদা নিকটস্থা, পূর্ব্ববর্ণিতা কুটুম্বিনীর প্রতি অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া, তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক একটু হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'ওঃ! ঢের দিয়েছেন; একবারে নেহাল করে দিয়েছেন। ভাগ্যিস, ওর সঙ্গে একটা মাদুলী গড়িয়ে দেন নি।'

কল্যাণী মাতার বিদ্রূপে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর চেয়ে বেশী গহনা নিয়ে আমি কি করবো মা ?'

প্রমদা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, 'ধোঁয়া দিবি। গহনা নিয়ে আর মানুষ কি করে ? থাকলে আজ এই ঈশানীর বিয়েতে পরতিস্।'

কল্যাণী কহিল, 'মা, আমরা বাড়ীর লোক। ঈশানীর বিয়েতে আমাদের গহনা পরে বসে থাকলে ত চলবে না। আমাদের কাজ করতে হবে।'

কল্যাণীর মৃদুবাক্যে একটা দৃঢ়তা মিশ্রিত ছিল। তাহা শুনিয়া, প্রমদা সপত্নীর কন্যার সহিত, আর এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহা সুবিধাজনক মনে করিলেন না। কেবল বলিলেন, 'তোরা এখন বড় হয়েছিস, যা ভাল বুঝবি তাই করবি। কিন্তু তোর এ গহনা পরে বাসরঘরে যাওয়া হবে না।'

কল্যাণী, আপন হৃদয়মধ্যে বাসরঘরে যাইবার কোন ইচ্ছাই পোষণ করে নাই। কিন্তু বিমাতাকে অসন্তুষ্ট করিবার আশঙ্কায় সে তাঁহার বাক্যের কোনও উত্তরই প্রদান করিল না। কিয়ৎকাল নীরবে তাহার নিকট দাঁড়াইয়া, সে তথা হইতে অন্যস্থানে গিয়া, বরযাত্রীদিগের জলখাবার সাজাইবার জন্য আপনাকে নিযুক্ত রাখিল।

——

(ক্রমশঃ)

কলেজের ছেলে ?—না !

"গত মঙ্গলবার ২৩ শে কার্ত্তিক, পরেশনাথ দেবের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য আমরা (বিডন ষ্ট্রীটের ধারের) খড়খড়িতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমরা আসিয়া দাঁড়াইবার পর হইতে ঠিক্ আমাদের সম্মুখের ফুটপাত হইতে (অর্থাৎ অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঔষধালয়ের বারান্দার নিম্নদেশ হইতে) বহুসংখ্যক কলেজের ছাত্র একজোট হইয়া অসৎবৃদ্ধিতে আমাদের দিকে তাকাইতে থাকে। তাহার পর ক্রমশঃ তাহারা "হো" "হা" "চো" "চো" ইত্যাদি স্বরে চীৎকার আরম্ভ করে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা "রবারের ফানুষ" কিনিয়া ও তাহার সহিত সূতা বাঁধিয়া উড়াইতে থাকে ও আমাদের দিকে চাহিয়া বিশ্রী হাস্যরব করিতে থাকে।

আমাদের Head Mistress মহাশয়া আসিয়া আমাদের জানালা বন্ধ করিতে বলেন। আমরা তাঁহার আদেশানুসারে জানালা বন্ধ করিয়া মাত্র খড়খড়ির দু-একটী "পাখী" তুলিয়া Procession দেখিতে থাকি।

যুবকগণ এবার Binocular ও অন্যান্য যন্ত্র সাহায্যে পাখীর মধ্য দিয়া আমাদের দেখিতে থাকে ও পূর্ব্বের মত অভদ্র চীৎকার করিতে থাকে। সম্মুখ দিয়া তখন Procession গমন করিতেছে, কিন্তু তাহার দিকে উহাদের লক্ষ্যই ছিল না।

হায় !

আমাদের ভদ্রঘরের সন্তানেরা যে, গোপনে গোপনে হীনতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম।... ছিঃ ! ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতের যুবক হইয়া, যাহারা নারী-মর্য্যাদা রাখিতে পারে না তাহাদের আর কি বলিব ? ধিক্ তাহাদের ! একবার নয়, শতবার ধিক্ ! তাহারা মনুষ্য নামের অযোগ্য।

	ইতি
কলিকাতা বেথুন কলেজ	হসিতা, রিনা, ধরিত্রী, নলিনী, মিহিকা ও ত্রণিমা"

বেথুন-কলেজের কয়েকটি ছাত্রীর-লিখিত ঐ পত্রখানি পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। আজকালকার কলেজের ছেলেদের মধ্যে এমন নীচতা যে থাকা সম্ভব, তাহাও ভাবিতে কষ্ট হয়। আমরা এই কদাচারী যুবকগণকে স্কুল কলেজের ছাত্র বলিয়া কল্পনা করিতেও পারিতেছি না; আমাদের মনে হইতেছে, ইহারা পিতৃ-মাতৃ-বর্জিত সখের থিয়েটার যাত্রার অকাল কুষ্মাণ্ডের দলভুক্ত ! কিন্তু তারাও যে এমন জঘন্য চরিত্রের হইবে, তারই বা অর্থ কি ! ইহারা কোন দলেরই নয়, ইহারা নিজেরাই একটি দল এবং সে দলটির নাম দুর্বৃত্ত দল ! রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলের দুর্বৃত্ত মুসলমান যাহারা পথে ঘাটে নারী হরণ করিতেছে, আমরা ভাবিতে বিস্মিত হইতেছি যে সেই সকল অশিক্ষিত বর্বর সদৃশ দুর্বৃত্তদের অপেক্ষা কলেজের এই ছাত্রদল কম ঘৃণ্য কিসে ? আমি ত সেই শিক্ষাহীন, জ্ঞানহীন মূর্খদের চেয়ে ইহাদিগের দোষই বেশী দেখিতেছি। তাহারা শিক্ষা পায় নাই, সভ্যতা শিখে নাই, নারীর মর্য্যাদা রাখিতে শিখে নাই, এককথায় এই বিংশশতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশেও তাহারা বর্বর ও পশুবৎ জাতি রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহারা—যাহারা ভাল জুতাটি পরিয়া সুচিক্কণ বস্ত্রাভরণে দেহ সজ্জিত করিয়া, চক্ষে চশমা আটিয়া, মাথায় তেড়ীর লহর বহাইয়া বহি হাতে কলেজ স্কুলে পড়িতে যায় আসে, তাহারা ? রঙ্গপুরের দুর্বৃত্তগণ যদি বিচারে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে ইহাদের যাবজ্জীবনের জন্য কারাদণ্ড দেওয়াই উচিৎ !

আজ আমাদের দেশের 'যুবকসম্প্রদায়' বলিতে গর্বে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠে। আমরা যুবকদের কতদিকে কত উচ্চহৃদয়তার, কত মহাপ্রাণতার কত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি; কত সংখ্যাহীন যুবক দেশের জন্য, জাতির জন্য, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য কত কষ্ট সহিতেছেন, দেখিতেছি আর সগর্বে বলিতেছি, তাঁহারাই আমাদের দেশের, জাতির সমাজের আশা, ভরসা, সম্পদ ! আর এই দুর্বৃত্তগণ তাহাদের হীন-কলুষিত চরিত্রের দূষিত বায়ু ছড়াইয়া দেশের যুবক সম্প্রদায়ের গায়ে কলঙ্ক লেপিয়া দিতেছে ! ছিঃ ছিঃ !

বড় কাজ সকলেই করিতে পারে না জানি; বড়ও সবাই হইতে পারে না জানি; তাই বলিয়া হীন কার্য্য কেন করিব ? নীচ কেন হইব ? আমাদের বিশ্বাস, সেদিন যাঁহারা এই গর্হিত কর্ম করিয়াছেন, পরে তাঁহারা তাঁহাদের অপরাধ বুঝিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন; ভরসা করি সেই অনুতাপই ভবিষ্যতে নারীর মর্য্যাদা সগৌরবে রক্ষা করিতে তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তুলিবে !

লোকান্তরে গৌরহরি

[মানসী ও মর্ম্মবাণীতে শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, বি-এল্ লিখিত নিবন্ধ হইতে সঙ্কলিত স: স-শি]

গত ১৫ই কার্ত্তিক সর্ব্বজনপ্রিয় গৌরহরি সেন মহাশয় ৫৫বৎসর বয়সে বিধবা জননীকে ও আত্মীয়বান্ধবগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে লোকোত্তর ধামে গমন করিয়াছেন। কর্ম্মবীর কর্ম্মের অবসানে শক্তিলাভ করিয়াছেন--নশ্বর জগতে চর্ম্মচক্ষু দিয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না—তাঁহার অমিয় মধুর উপদেশাবলী, সদালাপীর রসভাষণ শুনিতে পাইব না; কিন্তু তাঁহার চারিত্র্য-মাধুর্য্য, চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ়তা, আবার বালসুলভ কোমলতা— এবং দীন-দুঃখীর দুঃখ মোচনপ্রবণতা ও সহানুভূতি চিরদিনই আমাদের নিকট আদর্শ-স্বরূপ থাকিবে। সৌম্য, শান্ত, জ্ঞানী গৌরহরি অজাতশত্রু ছিলেন। দুঃখে কোন দিন তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে—অধীর হইতে মুহ্যমান হইতে—দেখিতে পাই নাই, আবার সুখেও তাঁহাকে কোন দিন হর্ষোৎফুল্লও দেখি নাই। তিনি নির্ব্বাত নিষ্কম্প অচঞ্চল প্রশান্তমহাসাগরের ন্যায় ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন।

৺গৌরহরি সেন। (মানসীর সৌজন্যে)

গৌরহরি রিডন ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক্-কুলতিলক ধর্ম্মভীরু বিশ্বম্ভর সেন মহাশয়ের পুত্র। বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ পিতামাতার তিনি একমাত্র পুত্রসন্তান। অকৃতদার গৌরহরির নির্ম্মল দেবোপম চরিত্র, আদর্শস্থানীয় ছিল। পিতামাতার সমস্ত সদ্গুণ তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছিল। নির্ভীক সত্যসন্ধ গৌরহরি সত্যের পথ হইতে কোন দিনও বিচলিত হন নাই। হৃদয়ে যে সত্য তিনি অনুভব করিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে কোনদিনই তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া ২০বৎসর বয়সের সময় কলেজের পড়া ছাড়িয়া দেন। কলেজের পড়ায় ইস্তাফা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পড়াশুনায় কখনও তিনি ইস্তফা দেন নাই—তাঁহার ন্যায় অধ্যয়নশীল ছাত্র বড় বিরল। পুস্তক-পাঠনস্পৃহা তাঁহার এত অধিক ছিল যে প্রত্যহ তিনি সান্ধ্য ভ্রমণের সময় দোকান হইতে নবপ্রকাশিত পুস্তক চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্য খরিদ করিতেন ও সর্ব্বাগ্রে নিজে পড়িতেন। তাঁহার সহিত যাঁহাদের সাহিত্য-বিষয়ে কোন দিন আলোচনা হইয়াছে তাঁহাদিগকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞানের পরিধি তাঁহার কত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

এইবার আমরা কর্ম্মবীরের কর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভের একটু আলোচনা করিব—সেটী চৈতন্য লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা। এ সম্বন্ধে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সাহিত্য সমাজে পঠিত প্রবন্ধে তিনি

যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর অনুকরণে, ৺গজানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে, টমরি সাহেবের নেতৃত্বে, বিডনষ্ট্রীটের ৮৩নং বাটীতে, ১৮৮৯সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্টিত হয়।"

জগতের বড় বড় প্রতিষ্ঠান গুলির উন্নতি এইরূপ একনিষ্ট সাধকের ঐকান্তিক কামনা ও সাধনাবলেই সাধিত হয়। বাস্তবিক গৌরহরি বাবুকে তন্ময়ভাবে আমরা চৈতন্য লাইব্রেরীর কার্য্য করিতে দেখিয়া অনেক সময় মনে করিয়াছি তিনি যেন জগতের অস্তিত্বই ভুলিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী তাঁহার এতদূর প্রিয় ছিল যে ইহার সকল কার্য্য তিনি স্বয়ং না করিলে বা দেখিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। আমাদের দেশের বালবিধবারা যেরূপ গৃহদেবতা শ্রীবিগ্রহ গোপালের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, গৌরহরিবাবুও চৈতন্য লাইব্রেরীর কার্য্যে ঠিক সেইভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন, সে কথাটা এখানে তুলিয়া দিলাম—"লাইব্রেরীর বিস্তর সভ্য কেবলমাত্র গল্পের বই পড়েন; ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। ক্রমাগত উপন্যাস পড়িয়া দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের রস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা যে মানসিক হিসাবে আত্মহত্যা তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাও বলা আবশ্যক যে নাটক নভেল ছুঁইব না এই জিদও বোকামীর নামান্তর মাত্র।"—এ বিষয়ে আমি বঙ্গীয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই।

গৌরহরি বাবু মানুষ কি রকম ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার জন্ম দুইচারি কথা বলিলাম। তাঁহার জীবনের কাহিনী অত অল্পের ভিতর বলিয়া শেষ করা যায় না—বিষণ্ণ হৃদয়ে সে সকল কথার আলোচনা করিবার মত মনপ্রাণও আমার এখন নাই। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার জীবনবৃত্তির আংশিক চিত্র দিলাম। জীবনে তাঁহার প্রধান গুণ ছিল নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সংযম। ঘড়ির কাঁটার মত তিনি নিয়মবশে জীবন পরিচালন করিতেন। আহারে ভ্রমণে কথাবার্ত্তায় লেখনীধারণে সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতাম—সংযমী গৌরহরি।

তাঁহার ন্যায় আদর্শ পুরুষকে হারাইয়া আমরা আজ শোকসন্তপ্ত। তাঁহার শোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ভাষায় তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবান্ তাঁহাকে শান্তি দিন।

সম্মুখে :—ওদিক হইতে—ড্রাইভার শ্রীরাধাবিনোদ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীননীগোপাল বসু।
পিছনে :—এদিক হইতে—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার বসু ও প্রবন্ধ লেখক।

কৈফিয়ৎ—

এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে যে "মধুপুর ভ্রমণ" লিখিতে বসিলে পাঠক-পাঠিকারা ত হাসিবেনই, উপরন্তু লেখকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহ তাঁহাদের জন্মিবে ; কারণ যত মধুই ঐ নামে থাক, সে ত ঘর বাড়ীরই সামিল হইয়া গিয়াছে। রেলপথে মধুপুর মাত্র ১৮৩ মাইল দূর ; ডাক গাড়ীতে চড়িলে ছয় ঘণ্টাতেই সেই মধুর দেশে পৌছিতে পারা যায়। গুটি তিনচার ষ্টেশনে গাড়ী থামে, চা, পান-সিগারেটের কলরব উঠে, আর গাড়ী মধুপুর পৌছাইয়া যায়। —তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেই পারে না। আমরা তাই পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, ভ্রমণবৃত্তান্ত যখন লিখিতেই হইবে, তখন ভ্রমণ-টা না করিয়া লেখা সমীচীন হইবে না ;—আমরা মোটরে মধুপুর যাত্রা করিলাম।

যাত্রা—

উদ্যোগ আয়োজনটা বেশ-কিছু-দিন ধরিয়াই করা যাইতেছিল। গাড়ী সোজা মধুপুর যাইতে পারিবে কি-না, পথ আছে কি-না, পথে কিরূপ পাহাড় ও নদ নদী আছে—এ সকল তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতেছিল, কিন্তু ঠিক খবর কেহ-ই দিতে পারেন নাই। অনেকেই বলিলেন, পথের মাঝে নদী আছে, নদীতে ভীষণ জল-স্রোত, গাড়ী যাইবে না। কেহ কেহ একটু অভয়-ও দিলেন, নদীতে জল কম, কেবল বালি আছে, গাড়ী ঠেলিয়া যাওয়া যাইতে পারিবে! বলা প্রয়োজন, বুদ্ধিদাতারা কেহই প্রত্যক্ষদর্শী নহেন। নিরুৎসাহ হইলেও ইচ্ছা দমন করিতে পারা গেল না। আমরা একদিন সদলবলে Automobile Association of Bengal মোটর সভার দ্বারস্থ হইলাম। একটি বাবু তাঁহাদের পুঁথি-পত্র বিস্তর ঘাঁটিয়া দেখিলেন ; তাহাতেও কিছু হদিস পাওয়া গেল না। তবে এইটুকু ভরসা দিলেন যে আমরা যদি পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হই, তিনি সভার কাগজ-পত্র হইতে একটি ম্যাপ, একটি প্ল্যান করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা তাহাতেই সম্মত। সম্মত না হইয়া করি কি! আমাদের আগে যদি কেহ এই সভার অনুমোদিত পথে সোজা মধুপুর যাইত, তবে তাহাদের পথ-বিবরণের একটি নকল সভায় থাকিতই, এবং আমরাও বিনা-আয়াসে মহাজনগণের পথের বিবরণ-লিপি পাইতে পারিতাম ; তাহা যখন

নাই, তখন খরচ করিয়া আমরা একটা বিবরণলিপি করাইয়া লইয়া ভবিষ্যৎ-ভ্রমণকারীদিগের সম্মুখে "মহাজন" হইয়া না থাকিব কেন বলুন!

পরদিন সন্ধ্যাকালে সভায় গিয়া ম্যাপ ও প্ল্যান সংগ্রহ করা হইল। ভোঁস সাহেবের (শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু—যাঁহার মূল্য মাত্র ৫ পয়সা ; অর্থাৎ যিনি এক পয়সার 'শিশিরে'র সম্পাদক বলিয়া খ্যাত) স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর, কোথায় কি রাখেন, তখনই ভুলিয়া যান, অনেক সময় ডান হাতে অভীপ্সিত দ্রব্য রাখিয়া তিনি সারা গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাই প্ল্যান ও ম্যাপখানি সুধাংশু বাবু (শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়— এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, স্বর্গীয় গুরুদাস চটোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র) তাঁহার হেফাজতে রক্ষা করিলেন। রাস্তার বিবরণ যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন যাত্রার উদ্যোগ করিতে আর কাহারও দ্বিধা থাকিল না। Automobile Associatio i—মহামান্য সাহেবগণ পরিচালিত সভা, কাজেই আমরা নির্ভয়ও কতকটা হইলাম।

বাজালী যতক্ষণ না শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা করিতে পারিতেছে ততক্ষণ 'যাইতেছি' বলে না ; অন্ততঃ এ অভাজন ত বলেই না ; ততক্ষণ বলিতে হয়, যাইবার কথা আছে, বোধ হয়, সম্ভবতঃ ইত্যাদি। অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া ঠকিয়া এই অভিজ্ঞতাটুকু আমি সঞ্চয় করিয়াছি। শুক্রবার (পঞ্চমী) মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে সকল আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব বাচনিক অথবা টেলিফোনিক সংবাদ লইয়াছেন, তাঁহাদেরই বলিয়াছি, যাইবার কথা আছে বটে। সহযাত্রীদের কাছেও মন খুলিয়া 'হাঁ' বলিতে পারি নাই। তাহার একটা কারণও ছিল। আমার একটি পুত্র তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে শয্যাগত ছিল। অপরাহ্নে আমার গৃহ-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-বি মহাশয় আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া আমার যাওয়া হইতে পারে কি-না, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবেন, কথা ছিল ; হঠাৎ জরুরী তলবে তাঁহাকে দূরে চলিয়া যাইতে হওয়ায় তিনি আসিতে পারিলেন না। চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া। শ্রীমতী তাঁহার রায় দিলেন, ডাক্তারের বিনা আদেশে যাওয়া হইতে পারে না। অনেকখানি দমিয়া গেলাম। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে কেহ-কেহ দুই তিন দিন হইতে গৃহস্থ "উপরওয়ালা"র নিকট আবেদন-পত্র পেশ করিয়া অতি কষ্টে ছুটি মঞ্জুর করাইতে পারিয়াছেন ; অকস্মাৎ আমার জন্য যদি তাঁহাদের যাওয়া স্থগিত রাখিতে হয়, ঘরে পরে তাঁহাদের লাঞ্ছনার চিত্র ভাবিয়াই মনটা বড় দমিয়া গেল। আমার বাড়ীতে বিপদ আরও একটু হইয়াছিল! সেই দিনই সন্ধ্যায় শুনি যে আমার অন্য দুই ভ্রাতাও পূজাবকাশ যাপন করিতে স্ব-স্ব "মধুপুরে" যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ; এমতাবস্থায় রুগ্ন পুত্রকে ফেলিয়া যাইতে মনও সরে না। সহযাত্রীদের সংবাদ দিলাম। বারুদ স্তূপে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইল। ভোঁস সাহেব তাঁহার বিশাল বিপুল-বপু দুলাইয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিলেন ; সুধাংশুশেখর 'সুরেন্দ্র বন্দ্যো' হইয়া বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলেন ; ননি ছল-ছল চোখে চাহিয়া বসিয়া রহিল ; ড্রাইভার রাধাবিনোদের অবস্থাটা অতীব করুণ হইয়া উঠিল,—বেচারা কাঁদে আর কি! আমাদের সান্ধ্য-সভায় তখন আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান কালীপ্রসাদ ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বয়সে তরুণ, অসংসারী এবং বিজ্ঞানভক্ত (M. Sc ছাত্র) হইলেও একটু স্থবির স্বভাব! প্রথমাবধি তিনি এই দূরপথ-মোটর অভিযানের বিরুদ্ধেই কথা বলিয়া আসিতেছিলেন ; শেষাশেষি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি যো পাইলেন। পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া, অসুস্থ পুত্রকে ফেলিয়া গেলে কি হইতে পারে না পারে, তাহারই একটা জীবন্ত চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহার এত শ্রম, এত যত্ন, সকলই বৃথা হইল। "মোটরে-মধুপুরের" ভবীরা ইহাতেও ভুলিল না। সুধাংশুশেখর স্পষ্টতঃ কহিলেন এত সাজ-গোজের পর যদি যাওয়া না হয় তবে তাঁহাকে নিঃসংশয়ে গঞ্জনা সহিতে হইবে। "সেজে গুজে রইলাম বসে, যাওয়া হল না—" এ ব্যঙ্গ-প্রবচন সহিবার মত সহিষ্ণুতা তাঁহার নাই ; অথচ আমি না গেলে তিনিও যে যাইবেন না, ইহাও সুনিশ্চিত। ভোঁস সাহেবেরও সেই অবস্থা। তাঁহার বিশ্বাস, তিন মণ তিন সের দৈহিক ওজন সত্ত্বেও তিনি ছেলেমানুষ, নাবালক মুরুব্বি-ছাড়া হইয়া তিনি পথে পা দিতে অ-প্রস্তুত।

শুভগ্রহ বলিতে হইবে আমার ছোট ভাই বিদেশযাত্রা স্থগিত রাখিয়া আমাকে "ভ্রমণ-কাহিনী" লিখিবার

উপকরণ সংগ্রহ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আবার সকলের মুখে হাসি ফুটিল।

রাত্রি তিনটায় আমার গৃহদ্বারে পরিচিত মোটরের বাঁশী ফুটিয়া উঠিল। ছেলেরা অঘোরে ঘুমাইতেছে, তাহাদের জননী জামা কাপড়গুলি নিঃশব্দে আগাইয়া দিলেন। বরাবর দেখিয়াছি, যখনই কোথাও গিয়াছি, বিদায়কালে কোন দিনই তিনি কথা কহা পছন্দ করেন না। আমিও সেটা সুলক্ষণ বলিয়াই মনে করি। কারণ যাত্রাকালে কন্যাই হৌন (যদিও আমার সে-রত্নের অভাব আছে) আর কন্যার মাতাই হৌন, বৈবিক ছন্দে যদি কহিয়া বসেন, 'যেতে নাহি দিব'—অবস্থা গুরুতরই হইয়া দাঁড়ায়।

ভোঁস সাহেব সন্ধ্যা হইতে কম করিয়া বিশ পাঁচশবার বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা সকলেই যে রকম Solomon the Slow—কুড়ে সলোমন জাতীয় জীব, তাহাতে তাঁহাকে সারারাত্রি জাগিয়া থাকিয়া যাত্রার তদ্বির করিতে হইবে। ভোর রাত্রে শিশির-অফিসে ঢুকিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা ভোঁস সাহেবেরই উপযুক্ত বটে। সচিত্র শিশিরের সম্পাদকের সোফাখানিতে "বিশাল শাল্মলী তরুটী" পতিত, যেন সমূলে উৎপাটিত—জীবনের সাড়া একমাত্র নাসিকাগর্জন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ননি রাত্রে দুই তিনবার ভোঁস সাহেবের চৈতন্য উৎপাদনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, হতাশভাবে শুইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে আমি, ননি ও ড্রাইভার রাধাবিনোদ একসঙ্গে সোরগোল করিয়া ভোঁস সাহেবকে জাগাইয়া তুলিলাম। সন্ধ্যায় ভোঁস সাহেবের যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আমাদের জন্য দেখিয়াছিলাম, এখনও সেই উদ্বেগ, সেই উৎকণ্ঠা-ই দেখিলাম বটে, তবে তাহা আমাদের জন্য নয়, তাঁহার নিজের জন্য। তিনি নিদ্রার কৈফিয়ৎ স্বরূপ, আপনা হইতেই, বলিলেন, তাঁহার শরীরটি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে...ইত্যাদি। তাঁহার মত বিরাট পুরুষের অসুস্থতা যে নিশ্চিহ্নে ও নিরুপদ্রবে প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহা আমরা জানিতাম, তাই সেদিকে মনোযোগ না দিয়া শিশির অফিসের দোর তাড়াবন্ধ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকের দোকানের ত্রিতল-চৌতলে সুধাংশুশেখর সপরিবারে অবস্থান করেন। মোটর অট্টালিকার নিম্নে আসিয়া বংশীধ্বনি করিতেই, কক্ষে-কক্ষে বাতি জ্বলিয়া উঠিত পাখা ঘুরিতে লাগিল, এককথায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সুধাংশু-শেখর প্রস্তুত ছিলেন, অলিন্দে দর্শন দিয়া পাঁচমিনিট সময় চাহিলেন। এ-সময়ের এ ভিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়া আপত্তি করিবার ইচ্ছাও কাহার হইল না। পাঁচ মিনিট কাটিল, সুধাংশুবাবু গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই অলিন্দে অলিন্দে ছোট বড় অনেকগুলি মূর্ত্তি প্রকটিত হইল।

আমরা এইবার সত্য-সত্যই "মধুপুর" যাত্রা করিলাম। সেদিন মহাষষ্ঠী, প্রভাত হইতে অল্পই বিলম্ব আছে, বাঙ্গলা ভরিয়া আগমনীর গান ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, শারদ আকাশ অতি সুন্দর, সমীরণ ধীর, সুমিষ্ট, রাস্তা তখনও জন-শূন্য—আমাদের মোটরখানি দ্রুতবেগে হাওড়াভিমুখে ছুটিল, সকলেরই দৃষ্টি মণি-বন্ধবদ্ধ ঘটিকাগুলির উপর। সাড়ে চারিটায় হাওড়ার পুল খুলিবার কথা, তাহার পূর্ব্বে পার না হইলে ২টি ঘণ্টা এপারে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

ওপারে গিয়া নিঃশ্বাস ফেলা গেল - ৪-১৭ মিনিট!

পথে—প্রথম প্রভাত

গাড়ীখানি "ফোর্ড"; নম্বর ১১৬৫৯, স্বত্বাধিকারী "শিশির" স্বয়ং। তিনি তখন মধুপুরে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই আমন্ত্রণ দিয়া এবং তাঁহার অজর অমর এই মোটর খানিকে দিয়া আমাদের "মোটরে মধুপুর" যাত্রার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। দুই-দশদিন সেখানে থাকাও হইবে, সুতরাং পথে অত্যাবশ্যকীয় এবং বিদেশে ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্তর আমাদের সঙ্গে নিতান্ত অল্প ছিল না। ভোঁস সাহেবের দেহের অনুরূপ তাঁহার একটি ব্যাগ, সুধাংশুবাবু সশরীরে বাহিত হইতে পারেন, তদ্রূপ তাঁহার একটি ব্যাগ—গাড়ীর দুইদিকে ঝুলাইয়া বাঁধা। ননি যদিও বারংবার আশ্বাস দিয়াছিল যে, তাহার সঙ্গে সামান্য জামা-কাপড়, সে একটি ছোট্ট ব্যাগে ভরিয়া লইবে, কার্য্যকালে সে যে বস্তুটি বাহির করিল, দেখিয়াই আমাদের চক্ষুঃস্থির হইয়া গিয়াছিল। আমাদের কাহারও ব্যাগে আমাদের জামা-কাপড়ের সঙ্গে তাহার "জামা-কাপড়" মিশিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও সে যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না,

কিন্তু তাহার ছোট্ট "পেগি" * ব্যাগটির আয়তন দেখিয়া কোথায় তাহাকে রক্ষা করা যায়, তাহা লইয়া দস্তুরমত গবেষণা উপস্থিত হইয়াছিল। ননি আশ্বাস দিলেন, তিনি সেটিকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবেন। ক্রোড়ে ধারণ ও বাহন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না জানিয়া আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। পা রাখিবার স্থান পেট্রোলের টিনে ভরিয়া গিয়াছে, তা ছাড়া ভোঁস-সাহেব চ্যাঙারী করিয়া ভীমনাগের দোকানের ভাল সন্দেশও কিছু লইয়াছেন, স্থান যে সঙ্কীর্ণ তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। ইহার মধ্যে জলের কুঁজাটি কোথায় রক্ষিত হইয়াছে সন্ধান করিতে গিয়া জানা গেল, কুঁজা আনা হয় নাই। প্রখর মেধা-সম্পন্ন ভোঁস সাহেবের উপর কুঁজা লইবার ভার ছিল, সুতরাং কুঁজার অদর্শনে বিরক্ত হইলেও আমরা বিস্মিত হই নাই।

গঙ্গার ধারে-ধারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চলিয়াছে; রাস্তা অধিকাংশ স্থলেই বেশ ভাল নয়, এবড়ো খেবড়ো, অসংস্কৃত। সেওড়া-ফুলির পর রাস্তাটা ভালই মিলিল, সেওড়াফুলিতে সূর্য্যোদয় হইল। বন্ধু-বান্ধবগণ বহুকাল পরে সূর্য্যোদয় দেখিয়া, উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। উৎফুল্ল হইবারই কথা বটে। আমরা সহরবাসী, খাঁচার জীব, এমন মুক্ত-প্রান্তরে সূর্য্যোদয়-শোভা দেখিবার সৌভাগ্য পাই কবে! ৬টার সময় আমরা চন্দননগর পৌছিলাম। চন্দননগর ষ্ট্রাণ্ডে কয়েকটি বিদেশীয় হোটেল আছে, ইতিপূর্বে আমরা কয়েকবার সেখানে খাইয়া গিয়াছি,—সেইখানে গিয়া প্রাতঃকালীন চা পানের পরামর্শ করা গেল। ভোঁস-সাহেব চা-এর বড় ভক্ত নন্, কাজেই তিনি সময় অপব্যয়িত হইতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু দলে আমরা ভারী, ভোটে ভোঁস হারিয়া গিয়া হোটেলে আসিয়া ক্ষতি পূরণ করিলেন, কয়েক বাটী চা মাখন ও খান তিনেক রুটির দ্বারা।

আমরা গল্প গুজবের সঙ্গে সঙ্গে চা-পান করিতেছি, মৈনাক-সদৃশ এক ট্যাঁস সাহেব আসিয়া সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিলেন। আমাদের ভোঁস-সাহেব তখনই আগন্তুককে চিনিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—সাহেব তুমি ত বেটী? সাহেবের মুখ-চোখ হঠাৎ শুকাইয়া উঠিল; তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে যেন পৈতৃক নামটা অস্বীকার করিতেই চাহিতেছিল, নেহাৎ পিতৃ পুরুষের মর্য্যাদা রক্ষার্থই সেটা করিল না। বলিল, হ্যাঁ। ভোঁস জিজ্ঞাসিলেন—তুমি ওবেসোথিন বাহির করিয়াছিলে না? সাহেব স্বীকার করিল, করিয়াছিল। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বোধ করি ওবেসোথিনের (Obesothin) নাম শুনিয়াছেন। বেটি (Bettie) নামে এক সাহেব এই মহৌষধটির প্রবর্ত্তক। মোটা লোককে রোগা করার পক্ষে এই বস্তুটি নাকি ধন্বন্তরী। ধন্বন্তরীই বটে, অবশ্য-ফল-প্রদও নিশ্চয়, নতুবা স্বয়ং প্রবর্ত্তক এমন বিভীষণ-দেহ থাকিবেন কেন? Trial begins at home—সাহেব কি তাহা জানিত না? অবশ্যই জানিত; তবে সে হয় ত ইহাও জানিত, তাহার মহৌষধ ঘরের জন্য প্রস্তুত নহে, কারণ ঘর পয়সা দিবে না, পয়সা দিবে, পর! হয় ত সেই জন্যই সে নিজে ব্যবহার করে নাই! সে যা হোক, ভোঁস ও বেটি—দুই স্থূলকায় বন্ধুর মধ্যে বচসা চলিতে লাগিল। ভোঁস সাহেব চা-আদির দাম দিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলেন। সাহেব-বংস, দাম না দিয়া যাইতে পারিবে না, বলিল। আবার উভয়েই সপ্তমে চড়িল। আমরা খাঁটী মাতৃভাষায় ভোঁস্‌কে চন্দননগরের সুবিখ্যাত তুড়ুং ঠোকার কথাটী স্মরণ করাইয়া দিতেই ভোঁস গুট্ গুট্ করিয়া দাম মিটাইয়া দিলেন। একথাও বলা আবশ্যক, রাগের মাথায় সাহেব দামটা বেশী করিয়া ধরিল এবং ভোঁসের অপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া, তাহা আদায়ও করিয়া লইল।

৬-৩৫ মিনিটে আমরা চন্দন-নগর ত্যাগ করিলাম। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল পথ ধরিয়া আমাদের মোটর হু হু শব্দে ছুটিতেছে। ব্যাণ্ডেলের পর রাস্তাও অপেক্ষাকৃত ভাল। মোটরের গতিও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যেখানে দুই তিনটা রাস্তা আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্রই কোন্‌টি কোন্ দিকের রাস্তা কাষ্ঠ-ফলকে তাহা খোদিত আছে। পথিকের যে ইহাতে কত সুবিধা হয় তাহা বলিবার নয়। ব্যাণ্ডেলের বহু পুরাতন পর্ত্তুগীজ গীর্জাটি দক্ষিণে পড়িয়া রহিল। আমরা যে সহর ফেলিয়া বাঙ্গালার পল্লীর ভিতর দিয়া চলিয়াছি, তাহা যে-দিকে চাহ বুঝিতে পারি। কোথাও ঘন বন, কোথাও দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল ক্ষেত্র, কোথাও খাল, নদী, বিল, জলা। রাখাল গরু লইয়া মাঠের পথে

* যাহা মেম অথবা মেমভাবাপন্না মেয়েরা হাতে ঝুলাইয়া বেড়ান, তাহাকেই পেগি ব্যাগ বলে।—লেখক।

চলিয়াছে ; গ্রাম্য নরনারী বেসাতী ভরিয়া লইয়া বাজারের পথে হাঁটিতেছে, গরু-মেষ-কুকুর মোটরের শব্দে ছুটিয়া তাল ঠুকিতে আসিতেছে, আবার তখনি পুচ্ছ উচ্চ করিয়া পৃষ্ঠদেশ-দেখহ করিতেছে ! ধানের অবস্থা খুব ভাল না হইলেও ভাল। তখনও শীষ বাহির হয় নাই, সবুজ গাছগুলি মাঠের আইল ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, ধানের উপর বাতাসের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে—দৃশ্যে কবি কেন—অকবির বুকও ভরিয়া উঠে।

বাঙ্গালায় একটা কথা চলিত আছে, বরে-বরে নাকি দেখা হইতে নাই ; সত্য-মিথ্যা জানি না, কথাটা ছেলেবেলা

প্রথমবার টায়ার বদলান হইল।

হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এখন দেখিলাম, দূর-পথে মোটরে-মোটরে দেখা হইতে নাই, হইলে বিপদ ঘটে। ৮-১৫ মিনিটের সময় ৫০—৫৫ মাইলের ভিতর ৮৫৩৬ নং গাড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। আর দুইটা মিনিট না কাটিতেই দুম্ ফটাস্, টিউব ফাটিল। ভোঁস-সাহেবের আবার এই-খানেই তৃষ্ণার উদ্রেক। তাঁহার স্মরণ-শক্তির গুণেই কুঁজা আসে নাই, তাঁহারই জল-তৃষ্ণা, আমরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ধান-ক্ষেত্রের দিকে টানিয়া লইয়া ধেনো জল (?) খাইবার পরামর্শ দিলাম। রাধাবিনোদ জ্যাকে তুলিয়া টায়ার খুলিয়া ফেলিল। দেখা গেল, রাস্তায় নিক্ষিপ্ত একটি পেরেক ফুটিয়া টিউবটিকে অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে। টায়ার বদলাইয়া ৮-৪১ মিনিটে আবার গাড়ী চালান গেল। ৯ টায় মেমারি ত্যাগ করিয়া—আমরা বর্দ্ধমানের সীমায় পৌছিলাম, বেলা ৯-৫০ মিনিটে।

ভোঁস-সাহেবের মামা-শ্বশুর বাড়ীতে আমরা আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিব, বন্দোবস্ত এইরূপ ছিল। বর্দ্ধমান-সীমান্তে পৌছিবার বহু পূর্বে ভোঁস-সাহেবের নিকট তাঁহার মামা-শ্বশুরের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করা গেল। ভোঁস-সাহেব মামা-শ্বশুরের নাম বিস্মৃত, ধামও তথৈবচ কহিলেন ; তবে তাঁহার যে মামা-শ্বশুর কলিকাতায় থাকেন, তাঁহার নাম তিনি জানেন, বলিলেন, হংসেশ্বর দত্ত। হংসেশ্বর বাবুর ভ্রাতা বর্দ্ধমানে থাকেন। অনুমানে হংসেশ্বরের ভ্রাতার যে যে নাম হইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কংসেশ্বর, বংশেশ্বর, লঙ্কেশ্বর আরও অনেক 'শ্বর' আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু ভোঁস-সাহেব কোনটিই অনুমোদন করিলেন না। আমি তাঁহার মামা-শ্বশুর কি করেন জানিতে চাহিলে, বলিলেন—তিনি রাজ-বাড়ীর দাওয়ান, কোষাধ্যক্ষ বা ঐরূপ একটা কিছু।

অনেকদিন আগে একবার রাজ-বাড়ীতে আতিথ্য

গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই সময় রায় বাহাদুর জলধর দাদা রাজসরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন 'শ্রীপতি দত্তের' কথা আমার বেশ মনে ছিল। ভোঁস যখন 'ঘরে' আবদ্ধ, আমি শ্রীপতি বাবুর নাম করিলাম; 'হোই হোই' (ঐ-ঐ) উল্লাসে ভোঁস-সাহেব প্রায় নৃত্য করিয়া উঠিলেন। শ্রীপতি বাবুদের বাড়ী খোস্‌-বাগানে। ৯-৫৫ মিনিটের সময় শ্রীপতিবাবুদের ফটকে গাড়ী ঢুকিল। শ্রীপতিবাবু স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। ভোঁসের শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া ছিল। শ্রীপতি

ধরিয়া আসানসোল অভিমুখে ছুটিল। গলশীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ৩-১০ মিনিটের সময়, গাড়ীর পশ্চাদ্দিকের যে টায়ারের টিউবটি আজই সকালে একবার ফাটিয়াছিল, সেইটিই আবার ফাটিল। তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে রৌদ্র, অল্পদূরে একটা শ্মশান ধূ-ধূ করিতেছে; তাহারই ওধারে একটি পুষ্করিণী। কি আর করা যায়—রৌদ্রেই রাস্তার ধারে বসিয়া পড়া গেল, সুধাংশুশেখর কল-কব্জা খাটাইয়া ছবি তুলিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একই দিকের একটি টায়ারের টিউব দুইবার ফাটিতে দেখিয়া আমরা কিছ বিস্মিত, কিছু চিন্তিত

—আবার আবার সেই কামান গর্জন—

বাবুরা বনিয়াদী গৃহস্থ। আদর-আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটীও করিলেন না। চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় করিয়া আমরা ১-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। বর্দ্ধমানের রাণীগঞ্জের বাজারে পেট্রোল খরিদ করিতে যাওয়া গেল। পাশাপাশি দুইটি দোকানে পেট্রোল ছিল, দাম চাহিল ৩।৹ টাকা। পূর্ব রাত্রে আমরা কলিকাতায় ১২ টিন পেট্রোল ২৸৵ দরে খরিদ করিয়াছি, এক টিন মাত্র পেট্রোল কিনিয়া গাড়ীতে ঢালিয়া লওয়া গেল। এই খানেই একটা কুঁজা কিনিয়া জল ভরিয়া লইলাম। ২-২৫ মিনিটে গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের পার্শ্বের রাস্তা

হইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে কারণও আবিষ্কার করিয়া ফেলা গেল। আমাদের সূক্ষ্মদেহ শ্রীমান্ ভোঁস সেই-দিকেই এতাবৎ বসিয়া আসিতেছিলেন। আমরা সদলে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম যে, তাঁহাকে স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভোঁস প্রথমটা খুবই আপত্তি করিলেন, কিন্তু চালক রাধাবিনোদ যখন ইহাই সমীচীন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, তখন অগত্যা ননিকে আমার ও সুধাংশুর মাঝখানে পাঠাইয়া, তিনি ননির পেগি ব্যাগটি কোলে লইয়া ড্রাইভারের পার্শ্বেই উপবিষ্ট হইলেন, এবং স্থান-পরিবর্ত্তন-জনিত পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ ভীমনাগের

ভাল সন্দেশের ঝুড়িটা একাই প্রায় উজাড় করিলেন; কুঁজায় জল ছিল, রুদ্ধপ্রায় বদ্ধগলায় উপর কুঁজা কাৎ করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

একটা টায়ার পরাইয়া আর একটা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিয়া আমরা ৩-৪২ মিনিটে আবার গাড়ী চালাইলাম। মানকরের পর হইতে যে রাস্তায় (G. T.) গাড়ী চলিল, তাহা আমাদের সহরের উত্তরাঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান রাজপথ সেণ্ট্রাল এভেনিউকেও হার মানায়। ৪'২৭ মিনিটের সময় ১০০ মাইল খোদিত প্রস্তর-ফলকটি দক্ষিণে পরিয়া রহিল। 'কর্ণার্জ্জুনের' শততম অভিনয়োৎ-সবের অনুকরণে যেন মনে হইতেছে, আমরাও একটা

১০০ মাইল উৎসব এইখানেই সম্পন্ন হইয়াছিল

কিছু উৎসব গোছের—এইখানে করিয়াছিলাম! উৎসবটা সম্ভবতঃ ভোজন-সংক্রান্ত! এইখানেই একটা ছোট সেতু ছিল, নিচে ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বিনী! সুধাংশুশেখর তাহার একটি ছবি তুলিলেন।

১২২ মাইলের পর অণ্ডাল ষ্টেশন রোড পাওয়া গেল। অটোমোবাইল এসোসিয়েশন চার টাকার বিনিময়ে আমাদের যে পথ-বিবরণ দিয়াছিল, তদনুযায়ী চলিতে হইলে অণ্ডালে অন্য রাস্তা ধরিতে হয়। কিন্তু আমরা আসানসোল যাওয়াই স্থির করিলাম, গাড়ী সোজা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ধরিয়া ছুটিতে লাগিল। আমাদের চা তৃষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে গিয়া চা খাওয়া যাইবে স্থির করিলাম। রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে যাইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ছাড়িয়া অন্য একটি রাস্তা ধরিতে হয়। সেই রাস্তায় মাইল আড়াই চলিয়া ষ্টেশনে ৬'২৫ মিনিটে পৌছান গেল। মধ্যে মিনিট দশেক বাজারে থামিয়া দুই টিন পেট্রোল ৩।৵০ দরে কিনিয়া গাড়ীতে ঢালিয়া লওয়া হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে ৯টিন পেট্রোল ছিল, তাহা আমরা পথে খরচ করিতে রাজী ছিলাম না, কি জানি, মধুপুরে যদি পেট্রোল না পাওয়া যায়।

এইখানেই সন্ধ্যা হইল,—আমাদের গাড়ীর ইলেক্‌ট্রিক বাতীর যথেষ্ট জোর নয় বলিয়া আমরা একটি গ্যাসালোক কিনিয়া গাড়ীর সামনে বসাইয়া লইয়াছিলাম,—কার্য্যকালে সেটির দ্বারা ততখানি কার্য্য আমরা পাইলাম না, যতখানি নিশ্চিত পাইব বলিয়া বিক্রেতা দোকানদার আমাদের আশা ভরসা দিয়াছিলেন। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। পথও তাই! গাড়ী জোর চালাইতে আর ভরসা হইল না, সামান্য মাইল দুই পথ চলিতেই অনেকখানি সময় লাগিয়া গেল। রাণীগঞ্জের নাম-ডাক যে কারণেই হোক, খুব। নাম-ডাকের অনুযায়ী ষ্টেশন হইবে আমরা এইরূপ আশাই করিয়াছিলাম। ট্রেণে যাতায়াত বহুবার করিলেও রাণীগঞ্জ ষ্টেশন দেখিবার সৌভাগ্য কোনদিন হয় নাই; আজ নিতান্ত চা তৃষ্ণাতুর হওয়ায় সুবিখ্যাত রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। আরে ছিঃ! পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিল হে। একটা অন্ধকার ষ্টেশন, না আছে আলো, না আছে লোকসমাগম। বাহিরে এ্যাসিটেলিন গ্যাস জ্বালাইয়া একটা লোক চা-পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে, ক্রেতার অত্যন্ত অসদ্ভাব; তাহার কাছে চা খাইবার প্রবৃত্তি আমাদের হইল না, আমরা ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে ঢুকিয়া চায়ের দোকানের সন্ধান করিতেছি, রেলের আলো হাতে এক সাহেব পাশ দিয়া যাইতেছিল. তাহাকেই 'কেলনারের' কথা জিজ্ঞাসা করা গেল। সেখানে কেলনার নাই, একজন মুসলমান চা'এর দোকান চালায়, সাহেব

অঙ্গুলি নিদেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। চা ভাল, ইহাও তাহার কাছে শুনিলাম। সত্যই ভাল চা। 'কেলনার' মার্কা বয়, এ চা সার্ভ (serve) করিলে অন্ততঃ চারি আনা পয়সা পেয়ালাপিছু আদায় করিয়া ছাড়িত। ইহার মার্কাও নাই, লেজও নাই, লেজুড়ও নাই, এক আনা হিসাবে পেয়ালার দাম লইয়াই সে সন্তুষ্ট।

রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে যাইতে যতটা পথ আমরা উজান গিয়াছিলাম, সেইটুকু ফিরিয়া আসিতেই জ্যোৎস্না উঠিল। জ্যোৎস্না-রাতে মাঠের, নদ-নদীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাইব ভাবিয়া যতটা উৎফুল্ল হইয়াছিলাম কার্য্যতঃ তাহার সিকির সিকি ভাগ আমোদও পাওয়া গেল না। মোটরচালক শ্রীমান্ রাধাবিনোদ বোধ হয় তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন-কালের মধ্যে পর্বত দর্শন করেন নাই, জ্যোৎস্নাঘেরা পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া মেঘোদয়ে তাঁহার মনরূপ শিখীটি নর্ত্তন জুড়িয়া দিল ; হস্ত পদও বোধ হয় কর্মে অক্ষম হইয়া পড়িল—হঠাৎ গাড়ী পথ ছাড়িয়া বেপথে পড়িয়া একটা শাল গাছে ধাক্কা খাইবার উপক্রম করিল। আমি কিছু অন্যমনস্ক ছিলাম, বন্ধুবর সুধাংশুশেখর বরাবর একটু Over-Cautious—অধিক মাত্রায় সাবধানী ; তিনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। পর্বত-স্বপ্ন-মগ্ন রাধাবিনোদের নিদ্রা ভাঙ্গিল, গাড়ী আবার পথে উঠিল। শ্রীমান্ ভোঁস ভীষণ গর্জন করিলেন, পর্বতগাত্রে লাগিয়া 'সে ধ্বনি মূরছি' পড়িল ধ্বনী' পর!' ননি তর্জন করিলেন, তাঁহার মৃদুকণ্ঠের শব্দ উঠিল ও পড়িল মাত্র, কি বলিলেন—কিছু বুঝা গেল না। তবে এটা বেশ বুঝিলাম, তিনি খুব সন্ত্রস্ত হইয়া সুধাংশুশেখরের পার্শ্বে আড়ষ্টভাবে সামনে চক্ষু রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্না রাতের মায়া আমাদের কাছে বিভীষিকা হইয়া উঠিল। অতঃপর রাধাবিনোদ যাহাতে পাহাড় না দেখে, তাহা দেখিবার জন্য ভোঁস সুতীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা করিলেন।

আবার মোটরে মোটরে দেখা! একখানা মোটর খুব জোর আলো ফেলিয়া সেই পথেই যাইতেছিল ; আমরা তাহার পিছু লইলাম। ভাবিয়াছিলাম অচিন-পথে তাহার আলোর সাহায্যে আমরা নির্বিঘ্নে এইটুকু পথ অতিক্রম করিতে পারিব। হঠাৎ গাড়ীখানা ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে থামিয়া পড়িয়া আমাদের জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিল। আমরাও গাড়ীখানা পিছনে পিছনে আসিলে উহার আলোর সম্পূর্ণ 'সুযোগ' পাইবার আশায় অগ্রগামী হইলাম। কিন্তু যে কারণই হৌক, সাহেব আমাদের অধিকক্ষণ সুবিধা ভোগ করিতে দিল না, পিছন হইতে ক্রমাগত হর্ণ দিতে লাগিল, আমরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম। সাহেব পার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—তোমাদের কি আলো খারাপ হইল? এই শ্বেত জাতির বাহ্যিক শিষ্টাচার ও ভদ্রতার উপর আমার-অন্ততঃ অনেকখানি আস্থা ছিল, সেই ভরসাতেই আমি হাঁ বলিতেছিলাম, কিন্তু নিমিষেই ভরসা চূর্ণ হইয়া গেল। সস্ত্রীক (?) সাহেব একরাশ ধোঁয়া ও ধূলা ছাড়িয়া আমাদের অন্ধ ও বধির করিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটাইয়া পলায়ন করিল। কোন বাঙ্গালী যদি পথের মাঝে কোন বিপন্নকে দেখিত, যতবড় হৃদয়হীন পাষণ্ড সে হৌক, এমন অভদ্র ইতর ভাবে কখনই পালাইতে পারিত না, এ কথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। ইহারা নাকি চরম সভ্য বলিয়া বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাই ইহারা এ কার্য্য করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করিল না। যা হৌক, ধূঁয়া ও ধূলা মিনিট পাঁচেক পরেই পরিষ্কার হইয়া গেল, আমরা আবার গাড়ী চালাইয়া দিলাম। আমাদের হাতঘড়িতে তখন আট-টা—দূরে আলোকোজ্জ্বল আসানসোল খেতে পাওয়াদ গেল ; রাত্রের মত বিশ্রাম করিতে পারা যাইবে ভাবিয়া মনটা অনেকখানি সুস্থ হইল। ৮-৫ মিনিটের সময় আমরা আসানসোলে পৌছিলাম। সেখানকার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিকের বাড়ীতে আতিথ্যগ্রহণ করার ঠিক ছিল। তাঁহার বাড়ীতে পৌছিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না।

চা পানাদির পর আমারা পাঁচুবাবুর কাছে মধুপুরের রাস্তার কথা পাড়িলাম। পাঁচুবাবু সাফ জবাব দিলেন, ভীষণ এক নদী অন্তরায়, কারমাটারের পরে মোটর যাইবার আর পথ নাই! তাঁহার কথায় আমরা যে মনোভঙ্গ হইয়া পড়িলাম, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। সারা পথ দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়াছি, এখন খেয়াঘাটে আসিয়া গড়াগড়ি দিতে প্রাণ কি চায়? পাঁচু বাবু একজন বাঙ্গালী মোটর চালককে ডাকাইয়া আনাইলেন। লোকটা আমাদের প্রস্তাব শুনিয়াই যে ভাবে জিহ্বা কর্ত্তন করিল, তাহাতে 'মরমে মরা' ছাড়া আর উপায় রহিল না। সে বলিল, মাত্র একদিন পূর্বে সে মধুপুর-যাত্রী এক পরিবারের ভাড়া পাইয়াছিল। তাহারা কেবলমাত্র যাওয়ার ভাড়াই ৮০৲ দিতে রাজী

ছিলেন, সে লয় নাই। ব্যাপার যে গুরুতর তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব রহিল না। আমরা মধুপুর যাওয়ার আশা তন্মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিলাম। কিন্তু কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়? কেহ বলিলেন, দিল্লী, কেহ লক্ষ্ণৌ, কেহ পেশোয়ার - মুখে মুখে অনেকদূর বেড়াইয়া ফেলিলেন। আমাকেও ত কিছু বলিতে হয়; আমি বলিলাম, কাশী। কাশীতে পূজা দেখিব, বিজয়া দেখিব; বন্ধুগণ সোল্লাসে আমার প্রস্তাবই অনুমোদন করিলেন। পেট্রোল যাহা আছে, তাহাতে কাশী পৌঁছান যাইবে, গাড়ীর রসদের জন্ম ভাবনা নাই; আমাদের রসদের জন্মও তত ভাবি না, পথে কিছু-না কিছু মিলিবেই। সুধাংশুবাবু অল্পাহারী, ননি—কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কিছু অসুস্থ ছিলেন; গা বমি-বমি ও শরীর ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে বলিয়া আহারাদি পথে নাম মাত্রই করিয়াছিলেন। আসানসোলে পাঁচুবাবুর গৃহে হঠাৎ ব্যাধিমুক্ত হইয়া—সুস্থতা লাভ করিলেন এবং বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে লইয়া আমাদের যে একটু দুর্ভাবনা ছিল, তাহা সাফ হইয়া গেল। তিনিও বাঁচিলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি আমাদিগকে একটু অতি মাত্রায় নিশ্চিন্ত করিতে সেইদিন হইতে আহারের মাত্রাও অতি করিয়া ফেলিলেন; (অতঃপর আর তাঁহাকে অল্পাহারী বলা চলে না) আমি মধ্যম গোছের—অর্থাৎ খুব বেশীও পারি না; কমও না! ভয় এবং ভাবনা, ভোঁসকে লইয়া। তাঁহার জন্ম কিছু রসদ সেইখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইবে ঠিক করিয়া আমরা কাশীর পথের সন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইলাম। ওঃ হরি! অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়! আমাদের বরাতে বরাকর ব্রিজ ভাঙ্গা, রাস্তা নাই। বাবা বিশ্বেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কাশীর বাসনাও ত্যাগ করিতে হইল। বহু গবেষণা করিয়াও যখন স্থির কিছু হইল না, তখন নিদ্রা যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। যতক্ষণ ঘুম না আসিল, কাশী, দিল্লী, কাশ্মীর, পেশোয়ারের জাগ্রত মধুর স্বপ্নগুলি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিবস

প্রভাতে স্বপ্ন-কথাই মনে রহিল মাত্র, সে উত্তেজনা আর নাই। তখন সকলেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে মোটর রেলে তুলিয়া দিয়া মধুপুর যাওয়াই শ্রেয়। মোটর বুক (book) করিবার উদ্দেশ্যে ষ্টেশনে যাওয়া গেল; কোন সুবিধা হইল না, রেলের চাকর, সহজে ও বিনাপয়সায় আমল দিতে চায় না। আমরা তাহাদের ছাড়িয়া কর্ত্তাদের শরণাপন্ন হইলাম। আসানসোল ডিষ্ট্রিক্টের বড় কর্ত্তা (District Cahraffic Superintendent)র বাঙ্‌লোয় গিয়া হাজির। সাহেব বাঙ্‌লোর বাগান পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, হাসিমুখেই আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। আমরা প্রার্থনা জানাইলাম, আমরা কলিকাতা হইতে সোজা মোটরে আসিতেছি, কারমাটার পর্য্যন্ত মোটরে যাইয়া যাহাতে কারমাটারে একখানি ট্রাক পাই ও মোটরখানি সন্ধ্যার পরেই কোন যাত্রী-গাড়ীতে মধুপুর পৌঁছিয়া যায়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলাম। সে সময় পূজার ভিড়, ট্রাক্ মিলিতে পাঁচ সাতদিন দেরী হইতেছে, ইহা আমরা ষ্টেশনে শুনিয়া ও কাগজে কলমে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলাম। ডি, টি, এস্, ইউল্ সাহেব (Mr. M. C. Yule) আমাদের ইংরাজী শিশিরের গ্রাহক ও পাঠক, পরিচয় পাইয়া প্রীতই হইলেন এবং আমাদের জন্ম কি করিতে পারেন তাহাই দেখিবার জন্ম টেলিফোঁর কল তুলিয়া লইলেন। দুই তিন স্থানে টেলিফোঁ করিয়া সাহেব বলিলেন—হইয়াছে, আজ ৩টার গাড়ীতে একখানি ট্রাক্ কারমাটারে আপনাদের জন্ম পাঠাইবার হুকুম দিয়াছি, কারমাটারের ষ্টেশন মাষ্টারকে একখানি চিঠিও দিতেছি, তিনি আপনাদের প্রয়োজন মত সমস্ত সাহায্যই করিবেন। ইউল সাহেব তখনি করেক ছত্র লিখিয়া আমাদের হাতে দিলেন; আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া মোটরে উঠিলাম।

আহারাদি করিয়া আমরা ১২-৪৩ মিনিটে আসানসোল ত্যাগ করিলাম;—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়াই গাড়ী ছুটিতেছে, ছুটিতে ছুটিতে বরাকর ব্রিজের মুখে গাড়ী থামিয়া পড়িল। ব্রিজ ভাঙ্গা—গাড়ী ঘুরাইয়া লওয়া গেল। একদিকে কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের কল, অন্যদিকে ক্ষীণকায়া এক নদী, মধ্যের পার্বত্য পথ দিয়া আমাদের গাড়ী অন্যূন ২০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। কয়লার খাদের কলের দুই

চারিটি চিমনি ও তদুত্থিত ধুঁয়াও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঘণ্টা দেড়েকের পর আমরা যে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদের সুগঠিত কৃষ্ণ দেহ, তাহাদের শিশুসম সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সাঁওতাল পুরুষদের অধিকাংশই দেখিলাম, বড় অলস—ঘরের বাহিরে খাটিয়া ফেলিয়া যুবকেরা স্তিমিতনেত্রে ঝিমাইতেছে, আর তাহাদেরই মেয়েরা দুপুর রৌদ্রে মাঠে গরু চরাইতেছে, কাঠ ভাঙ্গিতেছে, শস্যক্ষেত্র আগলাইতেছে, বাজারে পণ্য লইয়া চলিয়াছে। মেয়েরা এত পরিশ্রমী বলিয়াই তাহাদের শরীর দৃঢ়, সবল; পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কৃশ। সাঁওতাল-ভামিনীদের দেহ-গঠন দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরা হিংসা না করিয়া পারিবেন না। ২-১৩ মিনিটে আমরা রূপনারায়ণপুর ষ্টেশনের পার্শ্বে এক মহুয়া-বাগানের ছায়ায় গাড়ী থামাইলাম। সঙ্গে আহার্য্য কিছু ছিল না, অথচ আমাদের মিঃ ভোঁসের উদর-দেবতা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, সন্তুষ্ট না করিলেই নয়। চারিদিক খুঁজিয়া নিকটে গোটাকতক হরিতকী ও বয়ড়া গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল"—আমরা মিঃ ভোঁসকে গোটা কতক অপক্ক হরিতকী ভোজন করিবার সুপরামর্শ দিলাম।

দশ মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িল;—আড়াইটায় আমরা মিহিজাম পার হইলাম। গন্তব্যস্থান কাছে আসিতেছে—ইহাতে আনন্দই হইবার কথা, তা না হইয়া আমাদের সকলেরই মনে একটা নিরানন্দের ভাব জাগিয়া উঠিল। সেটা বোধ হয় 'ভ্রমণ'টা স্বেচ্ছাসম্পন্ন হইবে না, এই ভাবনাতেই। আমাদের মনের গতির সঙ্গে মোটরের গতির কোন সম্পর্ক ছিল না, সে নিজ বেগেই ছুটিয়া চলিল এবং ৩টা ৯ মিনিটের সময় জামতাড়ায় আনিয়া হাজির করিল।

আমাদের সুধাংশুশেখরের চা'এর সময় তিনটা। সময়ে চা না পাইলে তাঁহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। একে ত ১ মণ ৯ সেরের শরীর, তায় আবার শিরঃপীড়া, সে ব্যাপারটা যে কি ভীষণ হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিতেও শঙ্কা হয়। আমরা বন্ধুবরকে শান্ত করিতে চা'এর সন্ধানে গাড়ী থামাইলাম। কিন্তু চা?—কোথায় চা? ষ্টেশনের চেহারা দেখিয়াই চা-সম্বন্ধে হতাশ হইলাম। সামনে কোন বাঙ্গালীর বাড়ী থাকিলেও না-হয় 'অপরিচিত অতিথি' হইয়া চা সংগ্রহ করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালীও দৃষ্টি চক্রের মধ্যে পড়িল না। চা খুঁজিতে গিয়া দেবীদর্শন মিলিয়া গেল। আজ সপ্তমী পূজা, হিন্দু বাঙ্গালীর কাছে মহামহোৎসব। বঙ্গের বাহিরে এই সুদূর সাঁওতাল পরগণার মধ্যে যে আমরা জগজ্জননী মা'কে দেখিতে পাইব সে আশা করি নাই! একস্থান হইতে কাঁসির শব্দ আসিতেছিল, কাছে গিয়া দেখি, আটচালা আলো করিয়া মা-আমার বিরাজ করিতেছেন। শুনা গেল, বাজারের দোকানদারগণ চাঁদা করিয়া বারোয়ারি পূজা করিতেছে, ফি-বছরই করিয়া থাকে। পূজার সময়, আমরা দার্জিলিঙ্গে গিয়াও মা'কে দেখিয়াছি। সুদূর মীরাটেও মা'কে দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। বাঙ্গালী যেখানে থাকে, বৎসরান্তে তিনদিন মা'র পূজা করিয়া থাকে। ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুর পক্ষে ইহা সুলক্ষণ বলিয়াই আমি মনে করি। হয় ত তবে ধ্বংসের বিলম্ব আছে।

এক ময়রার দোকানে গিয়া চা-এর আব্দার ধরা গেল; তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান ও চার্ত্তকে চা-দানের তুল্য পুণ্য যে শাস্ত্রে লিখিত নাই, তাহা বুঝাইয়া দিতে সে ঘটি করিয়া জল চড়াইয়া দিল; চা-চিনি-দুধ সংগ্রহ করিল; বাড়ী হইতে একটি পেয়ালা-পিরিচ আনিল। অধিক মাত্রায় পুণ্যলাভাশায় চা'য়ে দুধ চিনির মাত্রাটা খুব বাড়াইয়া দিল, আমরা সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলাম। ৩টা ৩৭ মিনিটে মোটর ছাড়া হইল। এইখান হইতে কিছু খারাপ রাস্তার নমুনা পাওয়া গেল; তবে তাহাতে 'শঙ্কিত নহে মোদের হৃদয়'। ৪-২৩ মিনিটে কারমাটার ষ্টেশনের ফটকে গাড়ী থামিল। মোটর থামিলে এ সব দেশে রথ-দোল পড়িয়া যায়। রাস্তাতেও বরাবর দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি, মোটরের শব্দে বধূ জলের কলস ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কৃষক লাঙ্গল ফেলিয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সংসার ফেলিয়া আসিয়াছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ত কথাই নাই। কারমাটারে গাড়ী থামিতেই পঙ্গপালের মত লোক আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল। আমরা ঘড়ি দেখিলাম, যে

গাড়ীর সঙ্গে আমাদের ট্রাক্ আসিবার কথা, তাহার আসিবার তখনও অনেক দেরী। অথচ যে নদীর ভয়ে কাপুরুষের মত মোটর-বিহারীদের রেলগাড়ীর আশ্রয় লইতে হইতেছে সেই নদীটি দেখিবার লোভও বড় অল্প ছিল না। সেই রথ-যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, নদী এখান হইতে মাত্র ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। মোটরে ছয় মাইল—সে ত কিছুই নয়, অর্দ্ধ ঘণ্টা সময়ও লাগিবার কথা নহে; ট্রাকও এখন পর্য্যন্ত আসে নাই, সন্ধ্যা হইতেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব রহিয়াছে —নদীটা দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা অল্প-বিস্তর সকলেরই মনে জাগিল। কিন্তু বিজ্ঞজন বলিয়াছেন, মনে আসিলেই কথা প্রকাশ করিবে না, সকলেই মনের কথা মনেই রক্ষা করিলেন, কেবল ভোঁস অত বিধিনিয়মের ধার ধারেন না, মুখ ফুটিয়া তিনিই বলিয়া ফেলিলেন--নদীটা দেখিয়া আসা যাক্। মৌনং সম্মতি লক্ষণং—যদিও এ কথা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু আমাদের মৌনাবস্থাও মিঃ ভোঁসকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল,—তিনি চালককে গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিয়দ্দূর পথ বেশ স্ফূর্ত্তিতেই যাওয়া গেল;—তারপর?

তারপর 'আগে কে জানিত বল, এত বিষ প্রেমে ছিল?'—প্রাণ যায় রে লক্ষ্মণ! পথ ত নাই-ই, উপরন্তু যে পথ তৈরী করিয়া যাওয়া হইতেছে, তাহাও এমন ভীষণ, যে তাহার ঝাঁকানিতে ৬ ঘণ্টা আগের খাওয়া ভাতও পেটের মধ্যে চাল হইতে লাগিয়া গিয়াছিল (অবশ্য চাল হইতে আমরা দেখি নাই, তবে সকলের মুখেই এই একই কথা শুনিয়া প্রত্যয় জন্মিয়াছে)। এক একটা ঝাঁকুনি লাগে, আর কাণ মাথা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে। ছোট-ছোট নালাগুলা ত মোটর লাফাইয়া পার হইয়া গেল—ঘণ্টা খানেক এই ভাবে চলার পর— "নদী, নদী," শব্দ উঠিল। শব্দটা অবশ্য আমাদের গাড়ী হইতেই উঠিয়াছিল,তাহার কারণও ছিল—সে নদীটা দেখিয়া বাস্তবিক আমাদের আনন্দই হইয়াছিল। ঐটুকু নদী পার হইতে এমন কি কষ্ট! হাট বাজার করিয়া এক সাঁওতাল দম্পতী সেই পথে গৃহে ফিরিতে ছিল, পুরুষটিকে আমরা আহ্বান দিলাম। বাঙ্গালী গৃহিণীর মত এই সাঁওতাল যুবতীও স্বামীকে কাছ ছাড়া করিতে প্রস্তুত ছিল না, তবে আমরাও ছিলাম নাছোড়বান্দা —তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিলাম। স্ত্রী-লোকটি আমাদের অবোধ্য ভাষায় চীৎকার করিয়া কতকগুলা কি ইণ্ডিল বাণ্ডিল বকিল। বালির চড়া ভেদ করিয়া গাড়ী জলের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না, লোকাভাবে আমাদিগকেও গাড়ী ঠেলিতে হইল। সুধাংশুশেখর ষ্টিয়ারিংএ বসিলেন, রাধাবিনোদ ও আমরা দুই জনে, গাড়ী ঠেলিয়া জলে ফেলিলাম; গাড়ী জল অতিক্রম করিয়া পাড়ে উঠিবার সময় ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া গেল। রাধাবিনোদ ষ্টার্ট দেয়, ষ্টার্ট আর হয় না; সাধারণতঃ অর্দ্ধ প্যাচ দিতেই ইঞ্জিন চলিতে থাকে, পাঁচ সাত দশ প্যাচ হইয়া গেল, ইঞ্জিন তবু অচল। আনন্দ মাথায়

কিঞ্চিৎ সুখানুভূতি

এবং চক্ষু কপালে উত্থিত হইল। মিলিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়িল গিয়া শ্রীমান ভোঁসের উপর! তাহারই প্রস্তাবানুযায়ী এই নদী দর্শনে আসা হইয়াছে, তাহারই দুর্বুদ্ধির ফলে আমাদের এই দুর্গতি! সুধাংশুশেখর ভোঁসকে রীতিমত তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। ভোঁস সাহেবের প্রচণ্ড সহিষ্ণুতা! কি আহার, কি তিরস্কার, কি গালা-গাল, তিনি নির্বিকারে ও নিরুপদ্রবে অনেক খানিই সহিতে পারেন।

রাধাবিনোদ ইঞ্জিন চালাইবার অন্য সর্ববিধ উপায় নিঃশেষ

করিয়া পেট্রোল-ট্যাঙ্কে মন দিলেন। পেট্রোল—বোধ হয় বিশ পঁচিশ মিনিট পূর্বে একটিন ঢালা হইয়াছিল; কাজেই তৈলাভাবে যে ইঞ্জিন অচল হইয়াছে, ইহা সম্ভব হইতেই পারে না; কিন্তু ট্যাঙ্ক খুলিতে দেখা গেল, তৈল থাকিলেও তাহা কারবুরেটারে পৌছিতেছিল না। কারণ গাড়ীর পিছন দিক জলে বালুর মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, সামনের দিকটা ছিল উচ্চে। আবার এক টিন তৈল ঢালা হইল। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৫-২০ হাতের বেশী হইবে না, জলও গোড়ালীর বেশী নয়—কিন্তু এই ক্ষুদ্র নদীটুকুই পার হইতে ১০ মিনিটের অধিক সময় লাগিয়া গেল। এ পারে আসিয়া ধীরে সুস্থে গাড়ীর কলকব্জা পরীক্ষা করা গেল।

—আরও কিঞ্চিৎ

নদী পার হওয়া গিয়াছে, উল্লাস দেখে কে! আমাদের ভোঁস সাহেবের মধ্যে সঙ্গীতের 'স' আছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস ছিল না, সেই গাঢ় গম্ভময় মিঃ ভোঁসও এই সময়ে সঙ্গীত সুরু করিয়া দিলেন। নদী হইতে কিয়দ্দূরে একটি কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া গেল। যাক্, তবে লোকালয় পাওয়া গিয়াছে! বড় স্ফূর্ত্তি হইল। এইখানে একটি—ক্ষুদ্র হইলেও—কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটিয়া গেল। পথের মধ্যে একটি কর্দ্দম পরিপূর্ণ নালা ছিল, তাহার মধ্যে গাড়ীর চাকা আটকাইয়া গেল। সেই কর্দ্দম নালা পার হইতে গাড়ী ছাড়িয়া আমাদের নামিতে হইল, ঠেলাঠেলিতে কুঁজা উলটাইয়া জিনিষপত্র ভিজিয়া নষ্ট হইল। সুধাংশুশেখরের আনন্দ হইল, ছবি তুলিবার উপকরণ মিলিয়াছে—তিনি এই দুরবস্থার—একখানি ছবি তুলিয়া লইলেন। সেইখান হইতে পদ-চিহ্নও মধ্যে মধ্যে লোপ পাইয়াছে; পথ দেখাইয়া দিবার জন্য আমরা এক শ্মশ্রুসম্বল ষষ্টি আকৃতি মুসলমানকে গাড়ীর পাদানে তুলিয়া লইলাম; ভোঁস তাহাকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া রহিলেন। এই লোকটাই আমাদের মিলিত উল্লাসের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া ঘোষণা করিল যে অদূরে জয়ন্তী নদী—পার হইতে হইবে! একেই বলে bolt from the blue—বিনামেঘে বজ্রাঘাত! একা নদী—বিশ ক্রোশ, তাহা ত এইমাত্র পার হইয়া আসিলাম; আবার নদী কিরে বাবা!

সন্ধ্যা হইতে আর দেরী নাই, সূর্য্য পাটে বসিয়াছেন। সামনে নদী, পিছনে নবাগত অন্ধকার—মানসিক অবস্থার কথা অবর্ণনীয়। আমরা নির্ব্বাক্ মৃতকল্পের মত গাড়ীর মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম—দেখিতে দেখিতে জয়ন্তী আত্মপ্রকাশ করিল।

এ নদী দেখিয়া আর কাহার মুখে কথা সরিল না। একটা নদী পার হইয়া যে উল্লাস স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা নিমেষে গাঢ় বিষাদে পরিণত হইল। সে নদীটা পার হইয়া "ভাবিলাম—এ জল খেলা, মধুর বহিবে বায়ু 'চলে' যাব রঙ্গে!"—হরি হে! মধুসূদন! তখন ফিরিবারও উপায় নাই, সম্মুখে বিস্তৃতা জয়ন্তী, পশ্চাতে অন্ধকারময় সেই পথশূন্য পার্বত্য পথ! 'To go or not to go'—এ চিন্তার অবসরও নাই; যা থাকে বরাতে, অগ্রসর হইতেই হইবে! হাঁক ডাক করিতে পঁচিশ ত্রিশ জন সাঁওতাল-বাউড়ী জুটিয়া গেল; রাধাবিনোদ আর এক টিন তৈল ঢালিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বসিলেন, ননি এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন; ভোঁস সাহেব হেঁইয়ো মারি শব্দে সাঁওতালদের উৎসাহিত করিতে লাগিলেন—গাড়ী ধীরে ধীরে উচ্চ পাড় হইতে বালু স্তর ভেদ করিয়া জলে নামিল, নামিতেই আবার ইঞ্জিন বন্ধ হইল। এ

নদীর চড়ার বালুও যেমন বেশী, জলও তেমনি, গোড়ালি ছাড়াইয়া হাঁটু স্পর্শ করিল,—নদী শেষ আর হয় না। সেইখনে দাঁড়াইয়া সুধাংশুশেখর প্রগাঢ় ভক্তিভরে মনে মনে আহ্নিককৃত্য করিতে লাগিলেন। আমার হাত ভাঙ্গা, বলপ্রকাশের বা ভোঁসের মত নৃত্য-ভঙ্গী প্রকাশের সামর্থ্য নাই—আমি গাড়ীর পাশে পাশে চলিতে লাগিলাম; ননি অনুযোগ করিতে লাগিলেন, আমি ফাঁকি দিতেছি। নীচ যদি উচ্চ ভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে—এই সর্বজন-আদৃত নীতি পালন করাই আমি সমীচীন বোধ করিলাম। আমার দুর্ভাগ্য এই 'মোটর অভিযানটি' পূর্ণাঙ্গ করিতে আমি একটা বৈচিত্র্য

"সুখের নাহিক ওর !"

কামনা করিয়াছিলাম। অন্ধকারের সামনে গাড়ী যখন নদীর মাঝে জাঁকিয়া বসিল, তখন সুধাংশুশেখর ও ননি আমাকে লইয়া পড়িলেন। পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে কি না জানিতে চাহিলেন। সত্য কথা বলিতে কি 'পূর্ণাঙ্গের' সখ আর আমার মনের কোণেও ছিল না; কিন্তু সে কথা ত আর বলা যায় না; বলিলাম, আগে মধুপুর পৌঁছাই, তখন হিসাব করিয়া বলিতে পারিব, পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে কি-না!

ভোঁস সাহেবের মস্তিষ্কের ঠিক ছিল না, এই কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি সুধাংশুশেখরের ব্যাগের হাতলটি ছিঁড়িয়াছেন; এক্ষণে মোটরখানাকে লইয়া এমন ঠেলাঠেলি করিতে আরম্ভ করিলেন যে, নেহাৎ নূতন ও পরমায়ু ছিল বলিয়াই গাড়ীখানা সে যাত্রা পরলোকযাত্রা করিল না।

অতি-কষ্টে অর্দ্ধ ঘণ্টার ধস্তাধস্তিতে নদী ত পার হওয়া গেল। এখন মধুপুর কোথায়? কতদূরে? রাত্রির অন্ধকার বিশ্বগ্রাস করিয়াছে—পথ নাই, স্থান অচেনা। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দূর বেশী নয়, ক্রোশ দুই' হইবে। এ দিকের ক্রোশ বলিতে আমাদের বাঙ্গালার ক্রোশ নয়,—এখানে বোধ হয় বাঙ্গালার চার ক্রোশে এক ক্রোশ হয়। সাঁওতালদের মধ্যে দুইটা লোককে আমরা গাইড করিয়া যথেষ্ট বখ্‌শিশের লোভ দেখাইয়া গাড়ীর দুই পার্শ্বে তুলিয়া লইলাম। এখন আমাদের মনে নূতন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিল। এক ত চেহারাগুলা ঠিক বাঙ্গালীর-ধাতে সওয়া চেহারা নয়, তার উপর তাহারাই পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে; কে জানে আমাদের গন্তব্য স্থানে না লইয়া গিয়া যদি তাহাদেরই কোন 'গোপন স্থানে' হাজির করিয়া বসে। বন্ধুবর সুধাংশুশেখরের হাতে হীরার আংটি, গলায় হীরার বোতাম, রাত্রের অন্ধকারে ঝকমক করিতেছে; ভয় তাঁহারই কিছু বেশী। ননির ভয়ও কিছু অল্প নয়। —'বেঘোরে বেহারে আঁধারে চলিনু পথ!' সকলেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল! কিন্তু তখন মুখ শুকাইয়াও কোন উপায় নাই, সেই অপরিচিত পথ-প্রদর্শকের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতেই হইল। এই দুই ক্রোশ পথ যে কিরূপে, কি ভাবে গিয়াছি—তাহা বলিতেও কষ্ট হয়। মানুষের পায়ে গতি আছে, মোটর তাহা অপেক্ষা মন্দগতিতে চালাইতে হইল; কোথাও কোথাও গাড়ী উঠিতে পারে না, আমাদের নামিয়া চলিতে হয়! মাঠের মাঝে ইঞ্জিন ভীষণ গরম হইয়া উঠিল। জল, জল! জল চাই! কিন্তু কোথায় জল! কুঁজার জল ইতিপূর্বেই মানুষে শেষ করিয়াছে, মোটরের পিপাসার কথা কেহ ভাবে নাই। রাধাবিনোদ মাঠের মাঝে

জল খুঁজিতে গেলেন ; অদৃষ্ট ভাল, জল পাওয়া গেল।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, মধুপুর লালগড়ের লাল রাস্তায় গাড়ী উঠিল—রাধাবিনোদ সোল্লাসে বৈদ্যুতি-বাঁশী বাজাইয়া মধুপুর-বাসীকে আমাদের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। লালগড়েই সুহৃদ্বর শিশিরকুমার মিত্রের বাসা,—বাড়ীটির নাম কমলাশ্রম,—শান্তিকুঞ্জ রোডে অবস্থিত। তাহার সম্মুখে গাড়ী থামিতে আমরা যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমাদের পথশ্রম উপশম ত হইলই না—বরং ম্যালেরিয়া জ্বরের উত্তাপের মত হু হু করিয়া বাড়িয়াই গেল। জ্যোৎস্নালোকিত বারান্দায় মিত্রজা ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্যাঘ্র-বধে নিযুক্ত। কৈফিয়ৎ দিলেন এই যে বহু বন-বাদাড় অতিক্রম করিয়া এই মনুষ্য কয়টিকে (অর্থাৎ আমাদিগকে) আসিতে হইতেছে—এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব কিছু বেশী তাই তাঁহারা চা, তাস-পাশা ও হাসি-গল্পের দ্বারা তাবৎ ব্যাঘ্র বধে মনোনিবেশ করিয়াছেন। আমরা এই টাইগার কিলার্সদের কটূক্তি করি নাই ; করি নাই,—কেবল আমরা অতিথি ও তাঁহারা আশ্রয়দাতা বলিয়া ! অন্যথা—থাক্ !

দেখিলাম, মিত্র-গৃহিণীই একমাত্র আমাদের কষ্ট বুঝিয়াছেন। গরম চা ও মিষ্ট জলখাবারে পরিতুষ্ট হইয়া আমরা টাইগার কিলার্সদের লইয়া পড়িলাম।

ইতি "মোটরে মধুপুর" সমাপ্ত। *

* আমরা মোটরেই মধুপুর হইতে ফিরিয়াছি। আসিবার কালে আমরা একদিনেই কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। সকাল ৬॥০ টায় ছাড়িয়া আমরা রাত্রি ৮।২০ মিনিটের সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ গুরুদাস লাইব্রেরীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছি। পথে রূপনারায়ণপুরের জঙ্গলে একবার ৪০ মিনিটের জন্য ; আসানসোলে (১১।৪৫এ ৩৫ মিনিট ও বর্দ্ধমানে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের জন্য (২'৫০ হইতে ৪টা অপরাহ্ণ) গাড়ীর রসদ ও যাত্রী-রসদের জন্য থামিতে হইয়াছে।

মধুপুর হইতে কারমাটার এই পথে যাইবার সময় আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলাম। ফিরিবার সময় দিনের আলোয় ততটা কষ্ট পাইতে হয় নাই ; আর পূর্ববারে আমাদের রাস্তারও গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। যখন ঐ পথে যাই, কারমাটার ষ্টেশন ছাড়িয়া অল্পদূর অগ্রসর হইবার পরই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথটি আমাদের দৃষ্টিচক্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছিল ; ফিরিবার সময় যে রাস্তায় আসিয়াছি, রেলপথটি বরাবর আমাদের বামদিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। যদি কেহ ভবিষ্যতে মোটর অভিযান করেন, তিনি রেলপথটির দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অনেক কষ্টের লাঘব হইবে ; পথের দুরত্ব বন্ধুরত্ব দুই-ই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে ; অবশ্য নদী সেই দুইটাই অতিক্রম করিতে হইবে, দিনের আলোয় নদী পার হওয়া খুব কঠিন নয় ; সাহায্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

যাইবার সময় আমাদের ৯টিন পেট্রোল খরচ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় পাঁচটিনের বেশী লাগে নাই ; দূরত্ব ও বন্ধুরত্ব হ্রাসই সম্ভবতঃ ইহার কারণ।

আর একটা বিষয়ে আমি ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই। অনেকেই জানেন, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত বরাকর নদীর সেতুটি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে—মধুপুর যাইবার সময় এই সেতুর মুখ হইতে ফিরিয়া আমরা বামদিকের রাস্তা ধরিয়া গিয়াছি। সময় হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এদিকের দুরত্ব অধিক। ফিরিবার সময় আমরা রূপনারায়ণপুরের পর হইতে কয়লার খাদের পাশ দিয়া সুন্দর সমতল পথ ধরিয়া—সীতারামপুরের ভিতর দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড়ে আসিয়া পড়িলাম। এই রাস্তাটি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ১৪৪ মাইলের নিকট আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ভ্রমণকারীগণ যদি মোটর অভিযান করেন তবে ১৪৩$\frac{১}{২}$ মাইলের নিকট যে রাস্তাটি তাঁহাদের ডানদিকে চলিয়া গিয়াছে দেখিবেন, সেইটি ধরিয়া যাইলে সুবিধা হইবে। ১৭৪ নং নালাটি এই রাস্তার অতি নিকটেই অবস্থিত।—লেখক (ভারতবর্ষ)
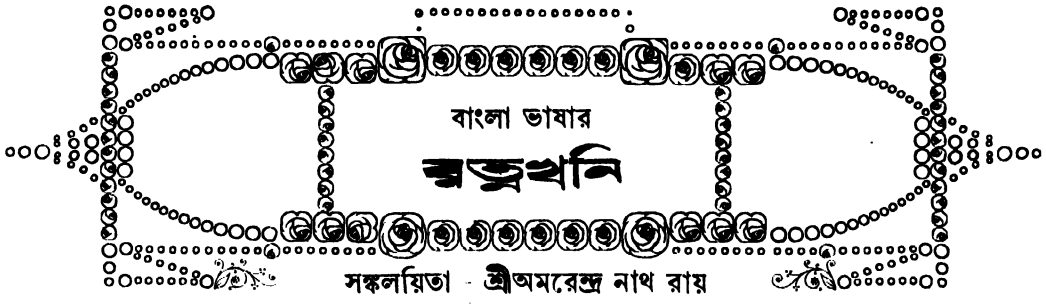
রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-চিন্তা

কাব্য-কথাঃ—

সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্যসকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবদ্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে রচনাকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদ বা চরণে বিভক্ত করিয়া ঐ চরণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ ভাষা ও পাঠকদিগের রুচিভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে ছন্দের বর্ণ মাত্রা ও যতির পরিবর্ত্তন করা হয়; সুতরাং বর্ণ যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলঙ্কার স্বরূপে কোন কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুলপিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হ'ন। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এইসকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, তাহা কোনমতে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য বটে যে বঙ্গভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাস বিশিষ্ট; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার সাব্যস্থ হইতে পারে না, যেহেতু বাঙ্গালীর ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে, তাহার সম্পূরণার্থে সর্ব্বদা নূতন ছন্দ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দসকল গ্রহণ করা হইতেছে; অতএব দত্তবাবু (মাইকেল) বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে; পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বরে অর্থের বিকাশ হয়, অধিকদূর অবধি বাক্যের আসক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, যাহারা গদ্য রচনা অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারে তাহাদিগের পক্ষেও অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগত ভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নসকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে, পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর অনেক সহৃদয় ব্যক্তিরা দীর্ঘ-কাব্য-পাঠে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণ সুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বর-সমানতা-প্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন, কোন কোন বাঙ্গালী কবি ঐ স্বর সাম্যত্বের নিরাকরণার্থে এক কাব্যে নানা ছন্দ ব্যবহৃত করেন; তদন্যথায় সংস্কৃত, ইংরাজী লাটিন ও গ্রীক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি

করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনা শক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারে না, উজ্জ্বলভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন; যেস্থানে ইচ্ছা সেইস্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন; কদাপি পাদপূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয়তা শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না।

অপর ঐ নিগড় সত্ত্বে কবিতার ওজোগুণের সংবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে বাঙ্গালী কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত কবিতার লালিত্য অনুবৃদ্ধি করিতে পারিতেন, এমত আর কোন কবি পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌরব অতি চমৎকৃত-রূপে সমাহিত করিয়া রাগদ্বেষাদি-প্রকাশ-করণ সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর কর্কশ ভয়ানক শব্দ ও কোমল ভাবের জ্ঞাপনার্থে, সুমধুর কোমল মৃদু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙ্গালী কবি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা সময়ের বিবরণ মধ্যে শব্দার্থের সমন্বয়-বিষয়ক একটী অপরূপ উদাহরণ আছে তাহার পাঠে আমাদিগের অভিপ্রেত অনায়াসে পাঠকদিগের বোধগম্য হইবে। ঐ বর্ণনায় সতীর দেহত্যাগ সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভূত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে আগমন করিয়া কি কহিতেছেন তদ্বিষয়ে লিখিত আছে—

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে।"

এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপ জ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দের সামঞ্জস্য সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু পয়ার কি অন্য কোন বাঙ্গালীছন্দে তাহার সমাধা হয় না; ভারত সদৃশ কবিও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। দেখুন বিদ্যা কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার করণ-সময়ে ছন্দের অনুরোধে—

"শুনগো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥"

ইত্যাদি বাক্যে কি প্রকার শব্দ ও ভাবের বিরোধ করিয়াছেন, বিদ্যা 'মায়ের আগে' ক্রন্দন করিয়া মালিনীর নামে অভিযোগ করণ সময়ে এরূপ বাক্য কহিলে হানি ছিল না; তিরস্কারের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত অপ্রযোগ্য—মধুরভাষিনী কামিনীর উক্তি বলিলেও ইহার দোষ খণ্ডিত হয় না। পরন্তু ইহা যে কেবল ছন্দ ও অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে এ দোষ কদাপি হইত না। এই অনুরোধেও অমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে।

ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে অন্ত্যযমক থাকিলে কবিতা যেরূপ অনায়াসে বোধগম্য হয়, অন্ত্যযমক বিরহে সেরূপ সুখবোধ্য হইতে পারে না, সুতরাং অন্ত্যানুপ্রাস বিশিষ্ট কবিতা যেরূপ অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকটে সমাদৃত হয়, অন্ত্যানুপ্রাস-বিহীন কাব্য তাদৃশ হইবেক না। কথিত হইয়াছে যে অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিলে কবি যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্যের সমাপ্তি করিতে পারেন, ইহাতে আশু বোধ হইতে পারে, এবং কোন কোন সম্পাদকের বোধ হইয়াছে, যে অমিত্রাক্ষর কবিতার যতির ভেদ নাই; কিন্তু তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা বৃত্তি ও যতি; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি। পরন্তু যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্য শেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাক্য শেষ করিলে যতি-ভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥

*   *   *   *

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩১ সাল। [৪র্থ সপ্তাহ

স্বপ্নাদ্য মাদুলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(বিশেষ ফলপ্রদ)

রাত্রে

গৃহিণীর নন্দ-দার স্বপ্নাপ্ত ঔষধের বলে বাবার বর-প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তিভরে বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। এদিকে কাক-কোকিল ও মুরগী ডাকিতে লাগিল।

সকালে

"তাই ত! আমি কি সেই আমি!"

সকালে
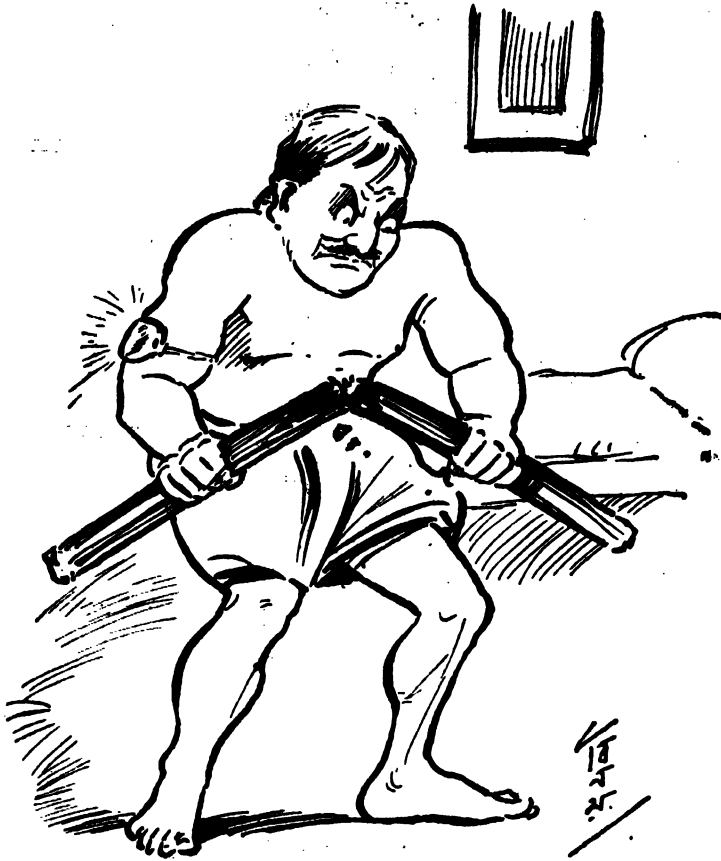
নূতন মনুষ্য

গৃহিণী উনান ধরাইবেন, কাঠ চেলা করিতে হইবে ;

বাবু ধরিলেন ; আর কাষ্ঠ-খণ্ড মটাং !

অপরাহ্নে

নূতন মনুষ্য

"কেহ লড়িতে প্রস্তুত আছ কি ?"

টেলিফোণ
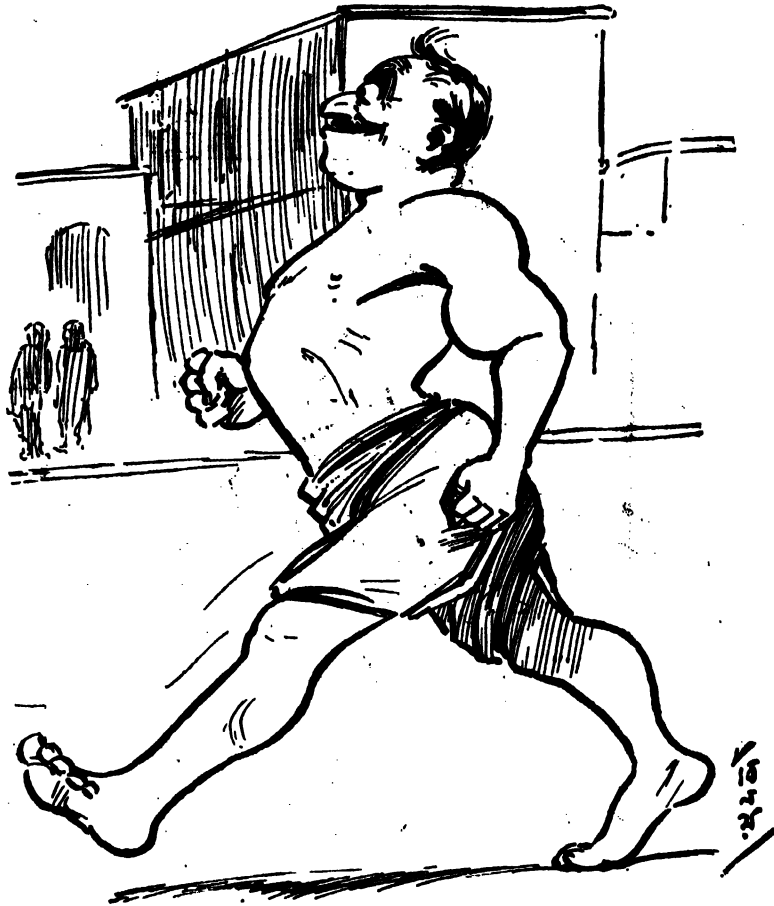
[মিসেস্ নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

গল্পের টেলিফোণ নাম দেখিয়া তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ যে হয় আমি টেলিফোণ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিতে নয় তাহার উদ্ভাবন কর্ত্তার শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছি। যদি এরূপ মনে করিয়া থাক তবে পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখিতেছি—হতাশ হইবে।

ডাক্তারীর পশার একটু বাড়িতেই ঘরে টেলিফোণ লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, সেই গল্পই আজ বলিতে বসিয়াছি—বিজ্ঞানের বা জীবনীর আলোচনা করিতে বসি নাই; সুতরাং আশ্বস্ত হও।

ডাক্তারী পাশ করার পর বহুদিন অর্দ্ধাহারে কাটাইয়া যখন ভাগ্যলক্ষ্মী একটু প্রসন্ন হইলেন তখন একটা ভদ্র রকমের বাড়ী ভাড়া লইয়া সস্ত্রীক বাস করিতে আরম্ভ করিলাম,; এতদিন স্ত্রী দেশেই থাকিতেন। আপনি খাইতে পাইতাম না, শঙ্করাকে ডাকিব কি করিয়া? গৃহিণীই রান্নাবান্না করিতেন, পাচক রাখিবার মত সঙ্গতি বা দিল্ তখনও হয় নাই; বাসন মাজিবার জন্য একজন ঝি এবং বাহিরের জন্য একজন চাকর মাত্র ছিল। টেলিফোণটা সেইজন্য বসাইয়াছিলাম রান্নাঘর এবং শয়নঘরের মাঝামাঝি একটা স্থানে—যাহাতে টেলিফোণের ঘণ্টা বাজিলে ঝি, চাকর এমন কি গৃহিণীও টেলিফোণ ধরিতে পারেন। আমি বাটীতে উপস্থিত না থাকিলে বৈঠকখানা ঘরটী বন্ধই থাকিত কারণ ঝি এবং চাকরটাকে কাজ-কর্ম্মের জন্য সর্ব্বদাই ভিতর বাটিতে থাকিতে হইত। এইজন্যই বৈঠকখানা ঘরে টেলিফোণ লওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুবিধাই বল আর অসুবিধাই বল—টেলিফোণে মানুষ দেখা যায় না, কেবল কথাই শোনা যায় তাও আবার খোণাসুরে সুতরাং কথা শুনিয়াও সহজে বোঝা যায় না কে টেলিফোণ ধরিয়াছে। আমার বাড়ীতেও টেলিফোণ ধরিত হয় চাকরটা না-হয় গৃহিণী। ঝিমাগীও সর-অবসরে ধরিত কিন্তু বড়ই বিরক্তির সহিত। কেন না টেলিফোণের অপরিহার্য্য ভাষা "হ্যালো" কথাটাকে সে বেশ আয়ত্ত করিতে না পারায় উচ্চারণে কুণ্ঠিত হইত। একদিন আমি এবং গৃহিণী তাহার "হ্যালো" উচ্চারণ শুনিয়া কোনমতেই হাসি চাপিতে পারি নাই বলিয়া তাহার কুণ্ঠা আরও বাড়িয়াছিল এবং শেষে আমরা কেহ উপস্থিত থাকিতে প্রাণান্তেও সে টেলিফোণ ধরিত না। বেশীরভাগ হয় চাকরটা নয় গৃহিণী টেলিফোণ ধরিত। ঝি-মাগী টেলিফোণের সময় অসময়ের ঘণ্টাধ্বনিতে বিরক্ত হইয়া, জানিনা কোন সাদৃশ্যে, ঐ যন্ত্রটার নাম দিয়াছিল "গুপিযন্ত্র।" একদিন ঘর হইতে শুনিলাম ঝি-মাগী চাকরটাকে বলিতেছে "কে জানে বাবু, কি গুপিযন্ত্রই বাবু ঘরে নিয়েছে, সময় নাই, অসময় নাই, কেবল খড়ং খড়ং, একদণ্ড যে নিশ্চিন্দি হয়ে কোন কাজ করব কি একটু গা গড়াবো তার উপায় নাই; অমনি খড়ং। অমনি ছোট সেই গুপিযন্ত্রের কাছে আর গিয়ে "হুলো হুলো" কর্। ভ্যালা আপদ! এক এক সময় আবার কাণে জল ঢোকার মত এমন ফড়্ ফড়্ করে যে মনে হয়, আমারই কাণে বুঝি জল ঢুকেছে, কাণে আর রাখা যায় না।"

টেলিফোণে যে সমস্ত 'কল' আসিত গৃহিণী তাহা একটী স্লেটে টুকিয়া রাখিতেন; আমি বাড়ী ফিরিয়া তাহা দেখিয়া যেখানে যাইবার যাইতাম।

(২)

ভালমন্দ দুইরকম বন্ধুই আমার ছিল কারণ আমি ভাল-মন্দ দুই কাজেই লিপ্ত ছিলাম। হাঁসপাতালের উন্নতির জন্য চাঁদা তুলিতেও আমি যেমন মজবুত, স্থান বিশেষে তবলা বাজাইতেও তেমনি মজবুত। রমেশ ছিল আমার স্থান বিশেষের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিজের ঐশ্বর্য্য বৎসর কয়েকের মধ্যে ফুঁকিয়া দিয়া এখন কেবল বাহিরে কোনমতে

তাহার ঠাট্‌টা বজায় রাখিয়াছে। তাহার একটা কম্পাস গাড়ী ছিল; বাগানে যাইবার সময় প্রায়ই অন্যলোকের ঘাড়ে চাপিয়া যাইত কিন্তু ফিরিবার সময়, আনন্দে সঙ্গত সময় অতিক্রান্ত হইত বলিয়া, গৃহিণীর নথনাড়ার ভয়ে কেহই কাহাকেও বাড়ী পৌছাইয়া দিতে পারিত না; সকলেই তখন যত সত্বরে পারে বাড়ী পৌছিবার জন্য ব্যস্ত। কাজেই ফিরিবার সময় সকলকেই আপন আপন যানের ব্যবস্থা করিতে হইত। পার্টির শেষের দিকে যখন একে একে সকলের গাড়ী আসিতে থাকিত তখন রমেশের কম্পাস গাড়ীটি আসিলে এবং বিবিরা কাছাকাছি কোথাও থাকিলে রমেশ কোচম্যানকে ধমকাইয়া বলিত, "এই ছোট কোচম্যান, জুড়ীল্যাণ্ডো কাহে নেহি লে আয়া? সাম্‌কা ওয়াক্‌ৎ বন্দ্‌ গাড়ীমে যায়েগা ক্যায়সে!" কোচম্যানও তৈরী, সে পূর্ব্ব শিক্ষামত উত্তর দিত "হুজুর, ল্যাণ্ডোমে চৌঘুড়ি জোৎকে বড় কোচম্যান বিরেক্ করণে গিয়া, ড্রাইভার ভিকো বোথার আ গিয়া; ওসি ওয়াস্তে হাম পাল্কী গাড়ী লে আয়া।" প্রত্যহই এই এক কৈফিয়ৎ তলব হইত এবং প্রত্যহই এই একই উত্তর ছোট কোচম্যান দিত। বলা বাহুল্য ছোটই হউক আর বড়ই হউক—কোচম্যান ঐ একই। আমরা তাহার কয়টা গাড়ী কয়টা মোটর ছিল তাহা অবশ্যই জানিতাম কিন্তু এককালে ঐশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তির এই ঐশ্বর্য্যের ছলনায় আঘাত করিয়া তাহার ফাকা সম্মান ভূমিস্মাৎ করিয়া দিতে প্রাণ চাহিত না বিশেষতঃ বিবিগণের নিকট তাহার একটু পসার বৃদ্ধি ব্যতীত আমাদের কোন ক্ষতি ছিল না। সেও জানিত—আমরা তাহার উপস্থিত অবস্থার কথা জানি কিন্তু জানিয়াও আমাদেরই সম্মুখে সে ঐশ্বর্য্যের এই ছলনা করিত। যদিও খোলাখুলি কখনও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই তথাচ তাহার পূর্ণ-বিশ্বাস ছিল যে আমরা কখনই এই মিথ্যা ভড়ং ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিব না।

একদিন সকালে কলে যাইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় টেলিফোণের ঘণ্টা বাজিল। যদিও যন্ত্রে, তবুও এই পাল্লু-ডাকায় কোন অজানিত অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু না গেলেও তো নয়। ভাবিলাম আগে ফোণের ডাক attend করি তারপর একটু বসিয়া, একটান তামাক খাইয়া, যাত্রাটা পাল্টাইয়া লইয়া বাহির হইব। টেলিফোণ ধরিলাম; রমেশ ফোণ করিতেছে আমি বাড়ীতে আছি কি না এবং কতক্ষণ থাকিব; বিশেষ কি প্রয়োজনীয় কথা আছে। উত্তরে আমি জানাইলাম—বাড়ীতে আছি বটে কিন্তু এখনই বাহির হইব এবং আন্দাজ দুই ঘণ্টা পরে ফিরিব।

কিন্তু রমেশের কথা আর শুনিতে পাইলাম না; তাহার পরিবর্ত্তে দুই মাড়োয়ারীর কথোপকথন কাণে আসিতে লাগিল। বুঝিলাম মাড়োয়ারীদের সহিত cross হইয়া গিয়াছে। এখন সময় নাই যে ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া পুনরায় এক্সচেঞ্জকে ডাকিয়া রমেশের সহিত কথা শেষ করি। বিরক্ত হইয়া রিসিভার নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলাম। বসিয়া, তামাক টানিয়া যাত্রা পাল্টাইবার কথা আর মনেই পড়িল না। পথে ভাবিলাম বাড়ী ফিরিবার পথে রমেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মৌখিকই 'প্রয়োজনীয় কথাটা' জানিয়া আসিলেই চলিবে।

(৩)

বেলা যখন সাড়ে দশটা তখন রমেশের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় শুনিলাম - রমেশ কাহাকে টেলিফোণ করিয়া আজ দ্বিপ্রহরে বাগান—পার্টির কথা জানাইতেছে।

যখন ঘরে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে দেখিয়া রমেশের হাত হইতে টেলিফোণের রিসিভারটা পড়িয়া গেল।

আমি হাসিয়া কহিলাম "কিহে, ভূত দেখিলে নাকি?"

রমেশের মুখ কিন্তু সত্যই ভূতদেখার মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সে বলিল "তুমি এখানে? তবে তোমার বাড়ী হইতে কে আমার সঙ্গে কথা কইছে?"

"তুমি কি আমাকে টেলিফোণ করছিলে নাকি?"

"হাঁ; আজ দুপুরে বাগান; তাই—"

"এই সর্ব্বনাশ করেছ; কি কি বলেছ?"

"সবই;-কথা তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কার বাগান, কোন কোন মেয়েমানুষ আসবে, কয় বোতল—"

"এই সেরেছে; আমার মাথাটী খেয়েছ! গিন্নি যদি টেলিফোঁণ ধরে থাকে, কি হবে বল দেখি?"

রমেশ বলিল "হাতের তীর তো বেরিয়ে গেছে; এখন শীগ্‌গীর বাড়ী যাও, গিয়ে দেখ কে টেলিফোঁণ ধরেছিল।"

"ভগবান করেন, যদি ঝি কি চাকরটা ধরে থাকে তবু কতকটা রক্ষা হয়।"

"আমার তো তা মনে হয় না, কোন্ কোন্ মেয়েমানুষ আসবে, কয় বোতল মদ আসবে—যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল তাতে আমার তখনই একটু সন্দেহ হয়েছিল। তুমি তো অত আগ্রহ করে কখনও জানতে চাও না।"

"তাহ'লে তো কাজ চুকিয়ে গেছে। যা' সামান্য একটু ক্ষীণ আশা ছিল' তাও তো দেখছি গেল। এখন বাড়ী ঢুকবো কি করে? আমাকে যে গিন্নি সাধু বলেই জানে। আগেকার যত সব মিছে কৈফিয়ৎ যে আজকেই সব ধরা পড়ে যাবে।"

"কি করব ভাই; টেলিফোনে তো মানুষ দেখা যায় না। কেমন করে বুঝব তোমার স্ত্রী কথা কইছেন? জিজ্ঞাসা করলুম—কে ডাক্তার নাকি? উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

আমি আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

বাড়ী গিয়া স্ত্রীর নিকট যে সমস্ত মধুর সম্ভাষণ শুনিলাম তাহা আহ্লাদ করিয়া পাঁচজনকে শুনাইবার মত নয়। সুতরাং সে কথা আমার মনেই থাক। তোমরা অনুমান করিয়া যতটা বুঝিতে পার—বুঝিয়া লইও, তাহাতে—আমার আপত্তি নাই।

সেকাল ও একাল

[শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী]

"হাসি? হায় সখা, এত স্বর্গপুরী নয়,
পুষ্পেকীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে,—বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ফিরে ..
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়?
(কচ ও দেবযানী—রবীন্দ্রনাথ)

পেয়েছিলে দশশোবছর দেবযানী,
তবু তোমার মিটল নাকো তৃষ্ণা?
দশটী নিশি পেলেই মোরা ঢের মানি,—
তোমার ছিল লক্ষ মধুনিশা!

লক্ষ দিবস নিশি ছিলে তোমার বঁধুর সঙ্গেতে
বিরহহীন বক্ষে মিলে লক্ষ মধুর রঙ্গেতে!
লক্ষদিনে সখ্য-নীড়ে বন্ধুটীরে পাও নি কি?
লক্ষনিশি বক্ষে মিশি লক্ষ চুমু খাওনি কি?

লক্ষচুমুর তুল্য কি?
লক্ষচুমুর মূল্য কি?
এক জীবনে মিল্‌লো যাদের
লাখ্ জীবনে ভুল্‌লো কি?

পাইনে মোরা দশশোবছর—চাইনেও।
সয়না মোদের দশটীরাতের ঘুমহানি!
ছুনিয়া আমার স্বর্গ আমার তাই দেবো—
দাওগো মোরে দশপলকের চুমুখানি!

তৃষ্ণা জলে মর্ম্মতলে—তৃষ্ণা-জলেই সান্ত্বনা!
কাঁদতে গিয়ে আমরা হাসি দেবযানী তা জান্‌তোনা!
কীটতো ভালো ফুলে,—মোদের শুধুই কাঁটা তাই বাজে,
দশটী নিশির অশ্রু দিয়েও একটী চুমু পাইনা যে!

একটী চুমুর তুল্য কি?
একটী চুমুর মূল্য কি?
এই জীবনে মিল্‌লো যাদের
অর-জীবনে ভুল্‌লো কি?

দু'মিনিট

[সবজান্তা]

দিগম্বরবাবু নামজাদা "মরোলিষ্ট।" সেদিন এক কাণ্ড করে বসেছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন জগৎটা সাকার না নিরাকার। এমন সময়ে ফাজিল কলেজে পড়ুয়া বসন্ত এসে বল্লে "মশাই ষ্টার থিয়েটারটা কোথায় বলতে পারেন?" দিগম্বরবাবু মহা বিপদে পড়ে গেলেন। ছোড়াটাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভাল করে দেখে বল্লেন "নাহে ছোকরা আমি জানি না।" ছেলেটা কোন কথা না বলে চলে যায় দেখে তাকে আবার ডাক দিয়ে বল্লেন "জানি তবে তোমাকে বলব না।" বসন্ত কিছু বুঝতে না পেরে বল্লে "কেন মশাই জেনেও বলবেন না—এর মানে কি?" "তার মানে এইযে কুপথের সংবাদ তোমায় দিতে পারি না। ওতে পাপ আছে।"

* * *

সেদিন জেমস্ ফিনলে কোম্পানীর কেরাণী সতীশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ছিল বিয়ের নেমন্তন। শ্যামবাজার ট্রামে যেতে হবে একেবারে সস্ত্রীক। ট্রামে উঠতেই চেকার দুখানা টিকেট দিলে দিগম্বরবাবুর হাতে। নেবার সময় তিনি তত খেয়াল করেন নাই। হঠাৎ পড়ে দেখেন টিকেটের এককোণায় লেখা আছে "not to be transfered" মহা বিপদ আর কি! এখন উপায়। ব্যাটারা এত সব লিখে রাখে। দেবার সময় কিছু বলেও দেবে না। তাই তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে হাঁকতে লাগলেন "ওহে চেকার দেখে যাও। তুমি আমাকে পাপের পথে নিয়ে যাবে নাকি? দেখত ওতে কি লেখা আছে। বলে দাও কোনটা আমার আর কোনটা ওঁর।" চেকার হতভম্ব হয়ে গেল। বুড়া কি পাগল? মরোলিষ্ট-পত্নী, চেকার ও স্বামীর কাণ্ড কারখানা দেখে একটু চটে গিয়ে বল্লেন "ওগো তোমার এসব পাগলামো বাড়ীতে নাহয় রিজার্ভ রাখ। রাস্তায় শেষে লোক হাসাবে নাকি?" আর কোন উচ্চবাচ্য না করে বিয়ের বাড়ী এলেন। কন্যাকর্ত্তা একটু ভুল করে বসেছিলেন। দিগম্বরবাবু নিরামিষ ভোজী। তা তাঁর মনে ছিল না। তিনি খাসী পাঁঠার কালীয়া কোর্ম্মা তৈরী করেছিলেন। দিগম্বরবাবু শুধু ডাল খেয়েই হাত তুলে বসেছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা সবাইকে জোড়হাত করে বলতে লাগলেন "দেখুন মশাই গরীবের বাড়ীতে যদি দয়া করে এসেছেন তা'হলে কোন প্রকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করবেন।" এমনি করে দিগম্বর বাবুকেও বলতে লাগলেন। দিগম্বরবাবুর দিক্ হতে কোন জবাব নেই। কর্ম্মকর্ত্তা তিনবার বল্লে পর দিগম্বরবাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন "বারবারই ত বলছি যে আমার পেট ভরে নাই। কত আর মিথ্যে কথা বলব।" কর্ম্মকর্ত্তা আর কি বলবেন। একেবাকে "থ" হয়ে গেলেন।

গরীব

শ্রীনির্ম্মলাবালা সেন

(সচিত্র শিশির গল্প-প্রতিযোগিতায় আশ্বিনের পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

কোন এক ক্ষুদ্র সহরের এক কোনে একটী জীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে স্তিমিত প্রদীপে একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা একখানা কাঁথা শেলাই করিতেছিল ; নিকটে ছিন্ন-মাতুরে বসিয়া একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক স্কুলপাঠ্য পড়িতেছিল। দরিদ্রতার করালমূর্ত্তি যেন গৃহখানাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে ; দীনতা যেন সহস্রমুখী হইয়া দেখা যাইতেছে। এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসবাবের মধ্যে যাহা না হইলেই নয়, তাহাই মাত্র আছে।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া বালক বলিল "দিদি, কাল আমার স্কুলের মাইনে দিতে হবে।" বালিকা নলিনী কিছুই বলিল না ; নীরবে কাঁথা সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। একটু পরে নরেন আবার বলিল "টাকা আছে দিদি ?" দৃষ্টি না তুলিয়া নলিনী বলিল "নেই, কিন্তু কাল দেব।"

ঘরের চারিদিকে সক্ষোভ দৃষ্টিপাত করিয়া নরেন বলিল "ঘরে ত আর কিছুই নেই দিদি, কি দিয়ে যোগাড় করবে ?" নলিনী সস্নেহে বলিল "থাক ভাই, ওসব কথায় তোর দরকার নেই ? মন দিয়ে লেখাপড়া কর্, সব দুঃখ দূর হবে। একদিন যদি আগের অবস্থা ফিরে আসে, তবে সে তোর কল্যাণেই ফিরবে, নরেন।" নলিনীর স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। আবার বহুক্ষণ নীরবে কাটিল। প্রদীপের আলো মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে চলিল, নলিনী উঠিয়া বলিল "চল নরেন খাবি" নরেন ঘরের অপর পার্শ্বে গিয়া বসিল, ভাত বাড়িয়া দিয়া নলিনী আবার শেলাই করিতে লাগিল, নরেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তুমি খাবে না দিদি ? আর ভাত নেই ?" "আমি খাব না, তুই খা"—নলিনীর দৃঢ়স্বরে নরেনের আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পরে নলিনী আপনা আপনিই হতাশভাবে বলিল "আলোটা নিভে যাচ্ছে, আজকে আর শেষ হল না ; কালকের মধ্যে শেষ না করলে ত তোর মাইনেটা দিতে পারব না।" আধ-ঘণ্টা পরে আলো নিভিয়া গেল ; ভ্রাতা ভগ্নী শয্যা গ্রহণ করিল। নরেন ঘুমাইয়া পড়িল কিন্তু নলিনী ঘুমাইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল কাল নরেনের মাহিনা কেমন করিয়া দিবে ? বেতনের জন্য এতদিন এত ভাবিতে হয় নাই কিন্তু এখন কেমন করিয়া চলিবে, পূর্ব্বের যে আসবাব ছিল তাহাতে ত এতদিন চলিল ; এখন আর চলিবার কোনই উপায় নাই। এটা সেটা শেলাই করিয়া সে যাহা পায় তাহাতে ত খোরাকী খরচই চলে না, চাল ডাল ঘরে কিছুই নাই তাহাও কাল আনিতে হইবে। কেমন করিয়া কি হইবে নলিনী ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না ; অস্থির হইয়া মনে মনে বলিল "তবে কি ভাইটি এই বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবে ?" ব্যাকুল প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল "না তাহা হইতে পারে না, সুকুমার বালক কি শুধু দুঃখে কষ্টে আজীবন শুধু কাঁদিয়াই কাটাইবে ? বড় তুমি, একটি ভাইয়ের ভার কি তুমি লইতে পার না ? পিতা না তোমারি হাতে তাহাকে দিয়া গিয়াছেন ?" বাল্যকালে পিতামাতার ক্রোড়ে কি সুখেই না কাটিয়াছে ! সচ্ছল অবস্থা হইতে আজ একি দারিদ্রতা ! পিতামাতার প্রাণোপম নলিনী নরেনের আজ একি অবস্থা ! একি শুধু

পিতামাতার অপরিণামদর্শিতার জন্যই নয় ? নলিনী তাঁদের দোষ দিল না, নিজেদের অদৃষ্ট ভাবিয়া বিনিদ্র রজনী কাঁদিয়া কাটাইল। পরদিন প্রাতে মাতার শেষ-চিহ্ন একটী আংটী বন্ধক রাখিয়া নলিনী দশটী টাকা আনিল। ঐ টাকা হইতে স্কুলের বেতন দিয়া অন্য মাসের জন্য তাহা রাখিয়া দিল ; কাঁথাখানি শেলাই করিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা পাইল তাহাতেই কোনমতে আহার কার্য্য চালাইল।

কোনরূপ ক্লেশ নরেনকে সহ্য করিতে না হইলেও সে যথাসাধ্য দিদির কষ্টের লাঘব করিতে চেষ্টা পাইত কিন্তু সংসার অনভিজ্ঞ ক্ষুদ্র বালক কি করিবে ? কয়েক মাস এই-রূপে বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিল ; কিন্তু আর ত চলে না ; আজকাল শেলাইও বড় কেহ দেয় না, বেতন দিবারও আর টাকার উপায় নাই। এমন কিছু নাই যাহা বিক্রয় বা বন্ধক রাখিয়া দুই একটা টাকাও পাওয়া যাইতে পারে। নলিনী অতি উৎকৃষ্ট শেলাই জানিত ; ভাবিল,পাড়ায় যদি দু'একটী মেয়েকে শেলাই শেখান যায়, তবে কিছু পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জোগাড় করিয়া দেয় কে ? উপযাচিকা হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার মন সরিল না। ঘরে বসিয়া শেলাই করিয়া বিক্রয় করিবারও সামর্থ্য নাই। সকলের কৃপাপাত্রী হইয়া মুহূর্ত্ত সে বাঁচিয়া থাকিতে চায় না ;—একথা নলিনী ভাবিতেও পারিল না। কিন্তু এখন এত ভাবিতে গেলেও চলিবে না, শীঘ্রই একটা উপায় যে করিতেই হইবে।

রবিবার দিন নরেনকে ঘরে রাখিয়া নলিনী পাড়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপিয়া নলিনী দুইহাতে মুখ ঢাকিল। এমন দীন-হীন মলিনবেশে সেত আর কখনও পাড়ায় যায় নাই। বড়লোকের মেয়ে বলিয়া একদিন নলিনী সকলের নিকট পরিচিতা ছিল ; কিন্তু আজ একি অবস্থা ! তাহার অস্তিত্ব সে লোককে যথাসাধ্য গোপন রাখিয়াই চলিতে চেষ্টা পাইত। উঃ ! অদৃষ্টের একি পরিহাস ! যৌবনের জলন্ত রূপশিখা নলিনী এতদিন লোকচক্ষুর অগোচরে নিভৃতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এখন পদে পদে বিপদে জড়াইয়াই দিন কাটাইতে হইবে ! ত্রাসিত প্রাণ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল "না" কিন্তু উপায় নাই ! অসার অবসন্ন মন লইয়া নলিনী চলিয়া গেল।

শ্রান্তপদে ক্লান্তমনে নলিনী ঘরে ফিরিয়া আসিলে নরেন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল ; সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া নলিনী বলিল "হাঁ, চারটী মেয়েকে ঠিক করে এসেছি, ছোট একটী মেয়েকে পড়াতেও হবে মাসে ছ টাকা হিসাবে পাব।" এইভাবে দিনগুলি একরকম কাটিতে লাগিল।

একদিন স্কুল হইতে আসিয়া হাসিমুখে নরেন বলিল "দিদি আজ একটী ভদ্রলোক আমাকে সন্দেশ খাইয়েছেন।"

মুহূর্ত্তে নলিনীর প্রশান্ত বদনে ক্রোধের ছায়া পড়িল, বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল "কোথায় খেয়েছিস্ ?" ভীতিপূর্ণ স্বরে নরেন বলিল "আমি স্কুল থেকে বেরুতেই সেই ভদ্রলোকটী আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন ; সত্যি দিদি, আমি যেতেও চাইনি, খেতেও চাইনি।" "লক্ষ্মীছাড়া, তুই বরাবর স্কুল থেকে চলে আসতে পারিস্ নি ? ঘরে যার খাবার নেই,—তার পরের কাছে গিয়ে খাওয়া কেন রে হতভাগা ?" নিরপরাধ অভিমান-ক্ষুব্ধ বালক কাঁদিয়া ফেলিল। নিজের উদ্ভ্রান্তস্বরে নলিনী নিজেই চমকিয়া উঠিয়াছিল, এখন নরেনের চোখে জল দেখিয়া আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না, তাহাকে কোলের নিকট টানিয়া লইয়া লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে নলিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। কান্নার বেগ কিছু প্রশমিত হইলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নলিনী বলিতে লাগিল—"আমরা যে ভাই বড় কাঙ্গাল, কারু সঙ্গে মেলামেশা, কারও বাড়ীতে খাওয়া এ যে লোকে কেবল অনুগ্রহ বলেই ধরে থাকে ; সমানভাবে যেদিন চলতে পারবি সেদিনের জন্য অপেক্ষা কর নরেন, নিজের অবস্থা বুঝে চলতে শেখ ভাই। যদিও আমাদের পক্ষে লোকের এ অযাচিত দয়া ঠিক তবুও যে এত দয়া এত কৃপা আমি সইতে পারি না ; আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতেও যে লজ্জা পাই নরেন।"

স্বাভাবিক সুকণ্ঠে নরেন বলিল "না দিদি, আমি যেতে চাইনি, তিনি জোর করে নিয়ে গেলেন, আমাদের কথা সব জিজ্ঞেস করলেন ; আরও বল্লেন আসবেন তিনি একদিন এখানে।" উত্তেজিতভাবে নলিনী বলিল—"না, না, কেন আসবেন তিনি এখানে ? কি দরকার তাঁর, তুই চিনতিস্

তাঁকে ?" ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে নরেন বলিল "না চিনি না আমি তাঁকে।" নলিনী কি ভাবিতে লাগিল এ সম্বন্ধে সেদিন আর কোন কথা হইল না।

পরদিন স্কুলে ছুটীর ঘণ্টা পড়িয়াছে ; অন্যান্য বালকগণের সঙ্গে নরেনও বাহির হইয়া আসিল ; গেটের সম্মুখে আসিতেই একটী সুবেশ সুন্দর যুবক হাস্যদীপ্ত মুখে বলিলেন "চল নরেন আমার বাসায় যাই।"

ব্যস্তভাবেই নরেন বলিল "না, না, আর একদিন যাব, আজ ঘরে যাই।" হাসিয়া যুবক পরেশবাবু বলিলেন "আমার বাসায়ও ত ঘর আছে নরেন" লজ্জিতভাবে নরেন মাথা হেঁট করিল। পরেশবাবু নরেনকে লইয়া তাঁহার বাসায় আসিলেন। একটু বিশ্রামের পর একটী বালক ভৃত্য জল-খাবার ও চা আনিয়া দিল।

জ্ঞান হইয়া অবধি নরেন অতি অল্পলোকের নিকটই স্নেহ-ভালবাসা পাইয়াছিল, তাই, পরেশবাবুর নিকট এই অযাচিত স্নেহ পাইয়া তাঁহাক দু-দিনেই আপনার করিয়া লইয়াছিল ; কিন্তু তবুও খাবারের কথা শুনিয়া তাহার সুন্দর প্রফুল্ল মুখখানি বিষন্ন হইয়া গেল। পরেশবাবু তাহার ভাব দেখিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "নরেন ; কাল তোমার দিদি বকেছিলেন বুঝি ?" সহানুভূতির বেদনায় নরেনের চোখে জল আসিল।

ব্যথিত পরেশবাবু অশ্রু মুছাইয়া দিয়া সাদরে বলিলেন "তুমি ভেব না ; আজ তোমায় সঙ্গে করে দিয়ে আসব।" নরেন কোন উত্তর দিল না। খাওয়া শেষ হইলে নরেন যাইবার জন্য উঠিল, পরেশবাবুও উঠিয়া বলিলেন "চল, আমিও যাচ্ছি।" ব্যাকুলভাবে নরেন বলিল, "না, না, আপনাকে যেতে হবে না।" পরেশবাবু কি ভাবিয়া বলিলেন "আচ্ছা, থাক্ তবে।"

এরপর কয়েকদিন নরেন আসিল না, খোঁজ লইয়া শুনিল সে একটু আগেই চলিয়া গিয়াছে। দু'একদিন অপেক্ষা করিয়া পরেশবাবু একদিন তাহার বাসার উদ্দেশে চলিলেন, একটু খোঁজের পর একেবারে তাহাদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "নরেন" নরেন সবে মাত্র স্কুল হইতে আসিয়া মুড়কি খাইতেছিল, নলিনী তখনও কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসে নাই। পরেশবাবুর স্বর শুনিয়া নরেন চিনিতে পারিল। একটু আহ্লাদও হইল ; কিন্তু দিদির কথা মনে হইতেই বিমর্ষ হইয়া পড়িল, কিন্তু সে উপস্থিত বুদ্ধি হারাইবার বালক নয়। বাহির হইয়া পরেশবাবুকে প্রফুল্লভাবে সম্ভাষণ করিল ; একটু ভাবিয়া বলিল "দিদি এখন বাড়ীতে নেই, আপনি ভিতরে আসুন, পরেশবাবুকে বারান্দায় বসিবার জন্য একখানা চৌকি দিল। কিছুক্ষণ বেশ গল্প চলিল। নলিনীর আসিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া নরেন মনে মনে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। একটু পরেই নলিনী আসিল, যেন বসন্তের নির্ম্মল আকাশে সন্ধ্যাদেবীর মতই নামিয়া আসিল। পরেশবাবু একটু চমকিত হইলেন, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনীও চমকিয়া উঠিয়াছিল, নরেনের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দ্রুত ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

পরেশবাবু একটু পরে সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন "আমি এখানে নরেনের পড়ার বিষয় জানতে এসেছি ; তাকে আপনি কি পর্য্যন্ত পড়াতে চান, সেই বা কি পর্য্যন্ত পড়বে এসব জেনে আমি তার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিতে চাই। এখানের স্কুলও ভাল না, পড়াও রীতিমত হয় না।"

সংযত ধীরস্বরে নলিনী ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল— নরেন কতটুকু পর্য্যন্ত পড়বে তা আগেই ঠিক বলা যায় না ; তার যে রকম অবস্থা, আর কতটুকুই বা পড়বে ! তবে সম্প্রতি তার খরচের অসুবিধা নেই, যেমন করেই হক চলতে থাকবে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

পরেশবাবু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন "না, এ আর কষ্ট কি, তবে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে নরেনের পড়ার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দি ; কিন্তু আপনার যখন অমত তখন আর কি করব ! আমার বাসায় যেতে ওকে বাধা দেবেন না ; মাঝে মাঝে গেলে খুব সুখী হব।" কি জানি কেন নলিনী কোন উত্তর দিল না ; দৃঢ়স্বরে বলিতে পারিল না যে "না।" মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া পরেশবাবু বলিলেন "তুমি যেও নরেন, আমি এখন যাই।" পরেশবাবু চলিয়া গেলেন।

দিদি পছন্দ করে না ভাবিয়া নরেনও আর স্বচ্ছন্দ মনে যাইতে পারে না।

হঠাৎ দু'চারদিন পর একদিন পরেশবাবুর বাড়ীর ঝি আসিয়া বলিল "দিদি, পরেশবাবুর মা তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন, কখন যাবে তুমি ?" নলিনী কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "পরেশবাবুর মা ! আমাকে !" নরেন নিকটে ছিল সহর্ষে বলিল "হাঁ দিদি, কাল যখন আমি তাঁদের বাড়ী ছিলুম তখন পরেশবাবুর মা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নাকি তোমায় চেনেন, একদিন নিতে পাঠাবেন, একথা তোমায় বলতে ভুলেই গিয়েছি ছাই"—বিস্মিতভাবে নলিনী বলিল "আমাকে জানেন তিনি ?" ঝি নরেনের ভাব দেখিয়া একটু হাসি চাপিয়া বলিল "তুমি কখন যাবে ? বিকেলবেলা আসব ?" মাথা হেলাইয়া নলিনী জানাইল "হ্যাঁ" । ঝি চলিয়া গেল। নলিনী ভাবিতে লাগিল তিনি কে ? এতদিন পরে তার এ ডাক কেন ? আমি ত তাঁহাকে চিনিনা, তবে তিনি কে ? সে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিল না। সেদিন পরেশ-বাবুকে দেখিয়া ধনীর দুলাল বলিয়াই মনে হইল। দীন-হীন বেশে সে কেমন করিয়া ধনী গৃহে যাইবে ? ঝিকে আসিতে বলিয়া দিয়াছে, না গেলেও ত চলিবে না ; হায় ! আজ একি অবস্থা ! বিকালবেলা ঝিয়ের সঙ্গে নলিনী পরেশবাবুর বাড়ীতে গেল। পরেশবাবুর মা প্রীতিপ্রফুল্লমুখে সাদরে মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিয়া সযত্নে তাহাকে বসিতে দিলেন। নলিনীর সুন্দর মুখখানি ব্যাপিয়া দরিদ্রতা জনিত একটু ক্লেশের ছায়া পড়িয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধা দুঃখিতভাবে বলিলেন "তোমার মা আমার ছোটবেলার খেলার সাথী ছিল, তার ছেলে মেয়ে তোমরা ; আমার কত আদরের। অনেকদিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, নইলে আমরা থাকতে তোমরা এমন অনাথভাবে একা থাকবে কেন ? আজকাল নরেন মাঝে মাঝে আসে, আমি তাকে দেখেই চিনেছি। আর এতদিন আমরা এখানে ছিলাম না, এই মাসেককাল হল এসেছি ; এখন আমার ইচ্ছা যে, তোমরা ভাইবোন দুটী আমার কাছেই থাক, এতে আপত্তি করনা মা, কি বল তুমি ?" নলিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিল এখন ত আমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না, কিছু অভাব অনাটন হ'লে আপনাদের কাছেই আসব। আর আমাদের এখন কোন অভাবও নেই, একরকম চলে যাচ্ছে।" ক্ষুণ্ণভাবে বৃদ্ধা বলিলেন "তোমার এই আপত্তির কথা সেদিন পরেশের কাছে শুনেছি, ভেবেছিলাম আমি বল্লে আর আপত্তি করবে না, তোমার মত যখন আর হল না, তখন আমি জোর করেই আর কি করি।"

নলিনী নতমস্তকে চুপ করিয়া রহিল। কোন উত্তর না পাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "তোমার মা থাকতে একদিন আমি বলেছিলাম যে অন্য কাকেও না দিয়ে আমিই তোমাকে ঘরের লক্ষ্মী করে রাখব, তিনি স্বীকার করেছিলেন। এখন সে নাই কিন্তু কথা ত যায় নি, মা, গৃহ-লক্ষ্মী হয়ে চিরদিন তুমি আমার ঘরে থাক, এই আমার ইচ্ছা।" কথার ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াও নলিনীর কোন ভাবান্তর লক্ষ্যিত হইল না। কোন উত্তর দিল না। একটুপরে নরেনকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

নলিনী সহজে নিজেদের অবস্থা লোককে জানিতে দিত না, যথাসম্ভব গোপন রাখিবারই প্রয়াস পাইত, অন্যের বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইতেও সে কুণ্ঠিত, তাই সেদিন পরেশ বাবুদের এত অনুরোধও সে রাখিতে পারিল না। নলিনী যেকথা এতদিন মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে পারে নাই, তাহারই একটা দাগ লইয়া নলিনী সেদিন পরেশবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। সেই কথাটা সে একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতেও চাহিল না, মনে মনে ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল "এ অদৃষ্টেও এত ?"

সেই মুহূর্ত্তে কোন নিষ্ঠুর দেবতা যেন অলক্ষ্যে বলিলেন "ঠিক।"

বর্ষার উন্মত্ত প্রবাহ যেমন হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলিয়া যায় ঠিক তেমনভাবেই এই ক্ষুদ্র সহরটী ডুবাইয়া মহামারীর প্রবল স্রোত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও নলিনী যেদিন, বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া অবসন্নভাবে লুটাইয়া পড়িয়া পরেশবাবুর মার পায়ে ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল "মা, তোমার নরেনকে রক্ষা করো" সেদিন পূর্ব্বের বিরক্তিটুকু মুছিয়া ফেলিয়া ভাবী বধূভাবে আন্তরিক স্নেহেই তিনি নলিনীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

এত যত্ন এত শুশ্রূষায়ও নলিনী বাঁচিল না। জীবনের

সকল সাধ আকাঙ্খা অপূর্ণ রাখিয়া প্রাণাধিক নরেনকে ছাড়িয়া পিতামাতার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান করিয়া লইল।

অশ্রুসজলনেত্রে পরেশবাবু যখন নলিনীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন নিভিবার আগে প্রদীপ যেমন একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ঠিক তেমনই মুহূর্ত্তের জন্য নলিনীর পূর্ব্বসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া রোরুদ্যমান নরেনকে নিকটে টানিয়া তাহার একখানি হাত পরেশবাবুর হাতে দিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল "আপনার নরেনকে আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম; ওকে আপনি ভালবাসেন, দেখবেন।

পরেশবাবু সজলনেত্রে বলিলেন "আমি যে তোমাকেও ভালবাসি, নলিনী!

নলিনীর মৃত্যু-ম্লান দৃষ্টি সহসা একমুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার তখনি মলিন হইয়া গেল।

পরেশবাবু তাহার হাত ধরিলেন।

নলিনী বলিল "আমি জানি। কিন্তু আমি যে বড় গরীব!"

পরেশবাবু বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি গরীব!—তাতে কি যায় আসে নলিনী?"

নলিনীর কণ্ঠ জড়াইয়া গিয়াছিল; সে অতিকষ্টে বলিল "তা ত আগে জান্তাম না! কিন্তু এজন্মে ত আর হবে না! পরজন্ম যদি থাকে" ..

*　　*　　*　　*

মরণের মুহূর্ত্তে নলিনী যে পরেশবাবুকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এই সান্ত্বনাটুকুই অবলম্বন করিয়া পরেশবাবু জীবন কাটাইয়া দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; জীবনে তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

২
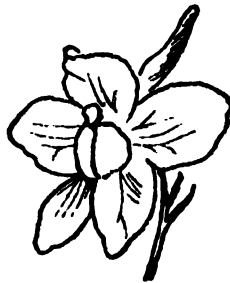
কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

নবম পরিচ্ছেদ

বর আসিল।

আমরা বলিয়াছি, ঈশানীর বরের নাম, শরৎকুমার বসু। শরৎকুমারের পিতার নাম, শ্রীযুক্ত শিখরলাল বসু। তিনি ঢাকা সদরের একজন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ঢাকায়, সে সময়, যে কয়েকজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ সবজজ প্রভৃতি দেশীয় হাকিম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের চেয়ে শিখর বাবুর বেতন বেশী না হইলেও, তাঁহার পাঁচ-হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের জমীদারী ছিল বলিয়া, তিনি আপনাকে অধিক ধনবান, পরন্তু অভিজাত কুলোদ্ভব মনে করিতেন। এজন্য, তিনি আপনাকে অধিক গৌরবান্বিত ভাবিতেন; এবং এই গৌরবের অনুরূপ দাসদাসী, গাড়ী-ঘোড়া, পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহ ও গৃহসজ্জা রাখিতেন। তিনি যেমন পোষাক পরিয়া, যেমন গাড়ীতে চড়িয়া, যেমন মহাগৌরবে চাকুরী করিতে যাইতেন, অন্য হাকিমেরা তেমন কেহই পারিতেন না; অন্য হাকিমেরা যেন নীচ ও হীন চাকুরী করিতে যাইতেন। তিনি বেতনভোগী চাকর হইলেও গৌরবান্বিত জমিদারের ন্যায়, পদস্থ হাকিমের ন্যায়, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে চাকুরী করিতে যাইতেন।

এহেন জমীদারের, হাকিমের, এবং গৌরবান্বিত ব্যক্তির এক মাত্র পুত্রের শুভবিবাহ কিরূপ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার।

শ্রীযুক্ত শিখরবাবু, পুত্রের বিবাহে, ঢাকা হইতে বরিশালে আগমন করিবার জন্য এক খানি বড় ষ্টীমার ভাড়া করিয়া-ছিলেন। ষ্টীমার খানি, বহু বিচিত্র কেতনে এবং পুষ্পপল্লবে সজ্জিত করা হইয়াছিল; এবং পরদিন সন্ধ্যাকালে বরিশাল পৌঁছিবার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক আলোকমালায় তাহা বিভূষিত করিবার ব্যবস্থা ছিল, পূর্ব্বদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর, রওনা হইয়া, পরদিন সন্ধ্যাকালে ষ্টীমারখানি প্রায় শতযাত্রী বক্ষে বহিয়া বরিশাল নদীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। ষ্টীমারখানি দীপমালায় সুসজ্জিত থাকায়, রাজকুমারীর বহু অলঙ্কার ভূষিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হইতেছিল; সুসজ্জিত মরালের মতই তাহা তরঙ্গতাড়নে ঈষৎ নাচিতেছিল; প্রমদা যেমন প্রিয়তমের প্রতিকৃতি বক্ষে ধরিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠে, নদী-হৃদয়ও, মরালের ন্যায় সেই পোতের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বক্ষে পাইয়া তেমনই আনন্দিত হইয়াছিল; নদীজল, আলোকমালার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া স্বর্ণময় হইয়াছিল।

ষ্টীমারখানি ঘাটে আসিয়া লাগিবা মাত্র, কয়েক জন ভৃত্য, পূর্ব্ব উপদেশ অনুযায়ী ঘাটে নামিয়া, লাটের আগমনের অনুকরণে, পঞ্চদশটি বোম ফুটাইয়া, পনেরটি তোপ ধ্বনি করিল। তাহা শুনিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝিল যে, বরিশালে লাট সাহেব আসিয়াছেন। তাহার দূরাগত ক্ষীণ শব্দ শুনিয়া, দূরস্থ শিক্ষিত ব্যক্তি ভাবিলেন যে, ইহা বরিশাল-নদী গর্ভস্থ সেই চিরপ্রসিদ্ধ অদ্ভুত শব্দ। তাহা শুনিয়া, অখিল বাবু বুঝিলেন যে, বরের ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে।

পূর্ব্ব হইতেই বরিশাল নদীর ঘাটে, উজ্জ্বল আলোক ও বালকগণকে লইয়া, লোকজন, ও যানবাহন প্রভৃতি বরকে বাটীতে, বৃহৎ চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র আসরে, লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিল। এক্ষণে বোমধ্বনি শুনিয়া অখিলবাবু, বরকে এবং বরের মহামান্য পিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য, তাড়াতাড়ী ষ্টীমার ঘাটে ছুটিলেন। শঙ্খহস্তা পুরাঙ্গনাগণ উৎগ্রীব হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন।

কৃত্রিম পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা সুসজ্জিত এবং আলোকমালার দ্বারা বিভূষিত এক বিচিত্র ও বৃহৎ তক্তনামায় চড়াইয়া, ধ্বজা, আলোক ও কৃত্রিম ফুলছড়ির শোভা যাত্রা করিয়া, নানা প্রকার কর্ণপটাহ বিদরণকারী বাদ্যধ্বনি মধ্যে, বরকে, বংশরচিত, প্রশস্ত এবং পল্লবপুষ্পে অলঙ্কৃত আসর মধ্যে লইয়া আসা হইল। বরযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ অশ্বযানে চড়িয়া, কেহ পদব্রজে বরের অনুসরণ করিলেন।

যে সকল মাননীয়া মহিলা আপন আপন সুমার্জ্জিত দেহের বিপুল মহিমা প্রকটিত করিয়া দ্বারপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদেহা যে সকল যুবতীগণ তাহাদের কলেবর গৌরবে নিষ্পেষ্ট হইতেছিলেন, তথাপি স্থানচ্যুত হন নাই, বর এবং বরযাত্রীগণ সভাস্থ হইবামাত্র, তাঁহারা, আপন আপন পারদর্শিতা অনুযায়ী কেহ শঙ্খধ্বনি করিলেন, কেহ, প্রয়োজনানুরূপ তাম্বূলরক্ত-রসনা-লীলা দ্বারা হুলুধ্বনি করিলেন। তাহার পর, সকলেই একাগ্রনয়নে বরকে নিরীক্ষণ করিলেন; এবং অনেকেই বরের সহিত শিখি-বিহীন শিখিবাহনের তুলনা করিলেন। প্রমদা বরকে বিহ্বলনেত্রে অবলোকন করিয়া, তাহার মুখচন্দ্রের সহিত পূর্ণচন্দ্রের তুলনা করিলেন। একজন বয়স্থা বিরহিনী কহিলেন, "হাঁ, যদি জামাই করতে হয়, তাহলে এম্নিই কর্ত্তে হয়; দেখে যেন চোখ ফিরাতে ইচ্ছে করছে না।" শুনিয়া এক মুখরা রসিকা বলিলেন, 'এই রকম বর ঘরে থাকলে, আর বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না।' কেহ কেহ আবার তরুণ বরকে অবলোকনযোগ্য মনে না করিয়া, গোপন কটাক্ষ পাত করিয়া, বরযাত্রীদিগের মধ্যে বাঞ্ছিত মুখের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

বাদ্যোদ্যম থামিলে, সুসজ্জিত আসর মধ্যে উপযুক্ত আসন পরিগ্রহণ করিয়া বরের গৌরবান্বিত পিতা মান্যবর শ্রীযুক্ত শিখরলাল বসু মহাশয়, অখিলবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বেয়াই মশাই, একটু বসুন, আলাপ পরিচয় করা যাক।

অখিলবাবু কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহার মস্তক কণ্ডুয়নের অবকাশ ছিল না। তথাপি তিনি বরের মহামান্য জনকের কথা অবহেলা করিতে পারিলেন না। ভবিষ্যত বৈবাহিকের সুসজ্জিত ও উজ্জল কলেবর পাশে, নিতান্ত হীন-ভাবে উপবেশন করিলেন;—তাহাতে, স্ফটিক বিরচিত, নাম জ্ঞাপক-রৌপ্যপদক-পরিহিত আলোকোজ্জল ব্রাণ্ডির বোতলের পাশে, কুইনিন মিকশ্চারের ক্ষুদ্র শিশি রাখিলে যেমন দেখায়, তাঁহাকেও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

'চা'।

সমীপোবিষ্ট অখিলবাবুকে আদর পূর্ব্বক, নিজের গৌরব অব্যাহত রাখিয়া, শ্রীযুক্ত শিখরবাবু আপন হস্তস্থিত আল-বোলার স্বর্ণ নির্ম্মিত নল অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিলেন, 'বেয়াই মশাই, তামাক ইচ্ছা করুন।'

অখিলবাবু তামাক খাইতে অভ্যস্ত ছিলেন না; একথা একটু সঙ্কুচিত ভাবে তাহার গৌরবান্বিত ভাবী বৈবাহিককে জ্ঞাপন করিলেন।

শিখরবাবু বলিলেন, 'বাঃ, very good boy! একটা মস্ত খরচের item বাঁচিয়েছেন। আমার তামাকের খরচই মাসে একশ টাকা যায়।

তাম্রকুট সেবনের এত অধিক খরচ শুনিয়া, অখিলবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'য়্যাঁ, তামাকের খরচ একশ টাকা?'

শিখরবাবু কহিলেন, 'বেয়াই, কখনও ত খান নাই, চিরকালই ও রসে বঞ্চিত; তা বুঝবেন কি করে? এই আমার ঠেঙ্গে হিসেব নিন। ধরুন, আমি খাই দিনান্তে আট ছিলিম, আর অভ্যাগত প্রভৃতির জন্যেও সাজতে হয়, আর ষোল কল্কে। এই চব্বিশ কল্কে। প্রত্যেক কল্কেতে যদি আধ পোয়া সাজা হয়, তাহলে চব্বিশ কল্কের তিন সের হয়;—হয় কি না?'

অখিলবাবু ভয়ে ভয়ে কহিলেন, 'নিশ্চয়ই হয়।'

শিখরবাবু আরও গর্ব্বের সহিত বলিলেন, 'ঢাকায় হারু মিঞাকে আপনি চেনেন? ঢাকা জেলায় হারু মিঞাকে না চেনে, এমন লোক নেই; নবাবের নীচেই তার খাতির সব চেয়ে বেশী। তার তামাকের দোকান আছে। তিন রকম তামাক তা'র দোকানে পাওয়া যায়। এক রকম

ছ'আনা সেরের; গরীব লোকে খায়। এক রকম বার আনা সেরের; আমাদের মত মধ্যবিৎ লোক খায়। আর এক রকম রাজা রুজ্‌ড়ী লোকে খায়, তার দেড় টাকা সের। আমি ওই বার আনা সেরের তামাক কিনি; তাতে মাসে সাতষট্টি টাকা পড়ে। তারপর, ওই তামাকের ব্যাপারেই একটা চাকর রাখতে হয়; তার মাহিনা, আর খোরাক পোষাক প্রায় কুড়ি বাইশ টাকা পড়ে। এই হ'ল নব্বই টাকা। তারপর, টিকে, গুল, কল্‌কে মিছরীর কুঁদোর কলসী ইত্যাদিতে দশ বার টাকার বেশী পড়ে যায়।'

তামাকু-তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ অখিলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিছরীর কলসীতে কি হয়?'

শিখরবাবু বৈবাহিকের অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'হাঃ হাঃ হাঃ! মিছরীর কলসী নয়; মিছরীর কুঁদোর কলসী, যে কলসীতে মিছরীর কুঁদো তৈরী করে। মিছরী তৈরী হ'য়ে যাবার পর, কলসী ভেঙ্গে কুঁদো বার করে; তারপর ঐ ভাঙ্গা কলসী বিক্রি করে; তাতে খুব ভাল তাওয়া তৈরী হয়। এই তাওয়া দিয়ে হারু মিঞার তামাক সেজে খেলে, আর পৃথিবীতে আছি মনে হয় না,— মনে হয়, যেন স্বর্গে বসে অপ্সরার হাতে অমৃত খাচ্ছি।'

নব বৈবাহিকের কথার মধুর মহিমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অখিলবাবু প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাস্তায় তামাক খেতে পেয়েছিলেন ত? আর মশায়ের কোনও রকম কষ্ট হয়নি ত?'

শিখরবাবু কহিলেন, 'কষ্ট আর কি? বরং খাওয়া দাওয়া আর ধূমপানের ব্যবস্থা ভালই হ'য়েছিল। বাড়ী থেকে, চাল ডাল, ঘি ময়দা, আলু কুমড়া, চা চিনি সকলই আনা হ'য়েছিল; কেবল, কাঁচকলা আর বড়ী অযাত্রা বলে, গিন্নী সঙ্গে নিতে দেননি। আর হারু মিঞার দোকান থেকে দশ সের তামাকও নিয়ে এসেছিলাম; ছেলেদের ত সিগারেট ছিলই। আর রাস্তায় জেলেদের কাছ থেকে সস্তাদরে অনেক মাছ কিনেছিলাম। ষ্টীমারের ডেকের উপর, পুরু করে মাটী দিয়ে একটা রাঁধবার জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেই খানে রান্না, আর গরম খাওয়া, আর হরবকৎ গুড়ুক ত আছেই;—না, না, খাওয়ার কোন কষ্ট হয়নি। তবে রাত্রে ছেলেপিলেদের গান বাজনার জ্বালায়, আর পাশ বালিশের অভাবে, ভাল ঘুমুতে পারিনি।'

পার্শ্ব উপাধানের কথায় যে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল, তাহাতে অখিলবাবুও 'হা, হা' শব্দে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার হাস্যধ্বনি যতই উচ্চ হউক না কেন, তথাপি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, উহা কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ ব্যক্তির হাসি; যাহারা অর্থলাভ করে, তাহাদের সেরূপ হাসি সম্ভবপর নহে; যাহারা কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই কেবল অখিল বাবুর ন্যায় হাসে।

শিখরবাবুও একটু গৌরবান্বিত হাসি হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'ভাল ঘুম হয়নি বলে শরীরটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করছে। তা' এক পেয়ালা চা খেলেই সেরে যাবে — চায়ের যোগাড় আছে ত? ছেলেপিলেরা চা আর সিগারেট না পেলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না।'

অখিলবাবুর কাষ্ঠহাসি মুখেই শুকাইয়া গেল। তিনি মহা চিন্তিত হইলেন। তিনি দেশীয় জল খাবার এবং ডাব সরবত প্রভৃতি পানীয়ের উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু চায়ের ত কোন উদ্যোগই করেন নাই; তিনি নিজে কখনই চা পান করিতেন না; এজন্য, এই ভ্রম হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এক্ষণে এই ভ্রম সংশোধের কোন উপায় আছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য, তিনি, গৌরবান্বিত বৈবাহিক মহাশয়ের মধুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বলিলেন, 'যাই, চায়ের যোগাড় হ'য়েছে কিনা দেখে আসি।'

শিখরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'না, না, আপনার এখন যাওয়া হবে না; আপনার সঙ্গে বিশেষ একটু কথা আছে। চায়ের জন্য আপনি অপর কাউকে পাঠিয়ে দিন।'

অখিলবাবু বলিলেন, 'আমি এখনই আস্‌ছি। চায়ের বন্দোবস্ত করে, আমি মশায়ের কাছেই ফেরৎ আসবো।' এই বলিয়া, তিনি অতি সত্বর পদে বুদ্ধিমতী পত্নীর নিকট, চা প্রস্তুত সম্বন্ধে সৎপরামর্শ গ্রহণ জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু কোথায় প্রমদা? সেই কল্লোলময় কুটম্বিনী ও নিমন্ত্রিতাগণের মহা সাগরমধ্যে ক্ষীণতনুর ভেলা ভাসাইয়া তিনি কোথায় তাঁহাকে খুঁজিবেন? সেই আলোক—

অন্ধকার মধ্যে তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি লইয়া কিরূপে তাহাকে চিনিয়া লইতেন? সেই সাবল-ভেদ্য জমাট কোলাহলে, কে তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বান শুনিবে? চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ তাঁহার মতিভ্রম হওয়ায়, অখিলবাবু, প্রমদা-ভ্রমে, অন্যা অভ্যাগতাকে নিকটে পাইয়া, সাদরে সম্বোধন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা তাম্বুল-রাগ-রক্ত অধর ভঙ্গিমা করিয়া, অপাঙ্গে চাহিয়া, চকিতে আপন আপন বদন চন্দ্র অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া, তাঁহাকে বিমুখ করিয়া চলিয়া গেল।

অখিলবাবু বার বার অপ্রস্তুত হইয়া, অবশেষে যেখানে বরযাত্রীদিগের জলখাবার সজ্জিত হইতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কন্যা কল্যাণীর সাক্ষাৎ পাইলেন।

কল্যাণী পিতার অনুসন্ধানময় লোচন দেখিয়া, কর্ম্মে বিরত হইয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, মাকে ডেকে দেবো?'

অখিলবাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, বলিলেন, 'আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি, মা! বরযাত্রীরা যে চা খাবেন; তার ত কোনও উদ্যোগ করা হয়নি। কি হবে, মা?'

কল্যাণী শান্ত স্বরে বলিল, 'তার জন্যে আপনি ভাববেন না বাবা। আমাদের সিরাজগঞ্জে, আমি একজনদের বাড়ীতে নেমতন্ন খেতে গিয়ে দেখেছিলাম যে, বরযাত্রীরা আসরে বসে চা খাচ্ছেন। আমি সেই পর্য্যন্ত শিখে রেখেছি যে, বরযাত্রীদের আসরে বসে চা খাওয়াই আজকালকার নিয়ম হয়েছে। এখানে চায়ের কোন উদ্যোগ ছিলনা দেখে, ডেপুটী বাবু, হেড মাষ্টার বাবু, আর সেরেস্তাদার বাবুর বাড়ী থেকে আমি কতক গুলা পেয়ালা পিরিচ আর চারটা চা দানি আনিয়েছি। আর বাজার থেকে দু'বাক্স চা আনিয়েছি; আর দুধ চিনিত বাড়ীতেই আছে। জল গরম হয়েছে, আমি এখনই চা তৈরী করে আপনার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি কেবল খালি পেয়ালা গুলো একটু শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবেন; আমি সে গুলা ধুয়ে, আবার চা ভর্ত্তি করে পাঠিয়ে দেব। আর, বোধ হয়, দু'বার দিলেই সকলকার হয়ে যাবে।

অখিলবাবুর জীবনহীন হৃদয় মধ্যে যেন আবার জীবন সঞ্চারিত হইল। সেই জীবন স্নেহরসে অত্যন্ত মধুর হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বার বার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং মুখে বলিলেন, 'মা, তুমি আমাকে আজ বড় লজ্জা থেকে রক্ষা করলে। আমার আশীর্ব্বাদে, তুমিও যেন চিরকাল সকল লজ্জা থেকে রক্ষা পাও।'

অতঃপর, কল্যাণী আর কোনও কথা কহিল না। কেবল সধূম চায়ের পেয়ালা গুলির একটী বৃহৎ সালবোট সজ্জিত করিয়া এক জন ভৃত্যের হস্তে দিল; সে তাহা লইয়া, বিবাহের সুসজ্জিত আসরে অখিলবাবুর অনুগমন করিল।

চা-পায়ী ভদ্রমহোদয়গণ চা পাইয়া ধন্য হইলেন; এবং মুখে বলিলেন, 'চা বড় ভাল তৈরী হ'য়েছে।' তাহার পর, আবার চায়ের জন্য ডাক পড়িল; আবার চা আসিল; আবার চা তৈরীর প্রশংসা হইল। এইরূপ প্রশংসা বার বার চলিতে লাগিল; প্রশংসায় সভাতল নিনাদিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই প্রশংসার এতটুকু চা প্রস্তুত-কারিণী, কর্ম্মরতা কল্যাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল না। তা' না করুক, তাহার হৃদয় তখন পিতৃস্নেহে পূর্ণ ছিল।

(ক্রমশঃ)

নূতন উপন্যাস
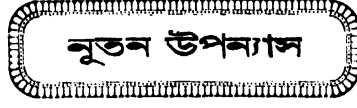
রূপ-হীনা

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(১)

"দিদি, এখনো তুমি শুয়ে রয়েছ; আজ কে আসবে তা' বুঝি জান না ?"

সস্নেহে ছোট বোনটীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে আসবে বেনু ? আমিতো জানিনা !"

"সত্যি জান না, দিদি; মা তোমায় কিছু বলেন নি !"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলাম, "মা আমায় বল্‌বেন কি ? বল্লে তো তুই শুন্‌তেই পেতিস ! আজ কে আসবে রে ?"

"তোমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সেই আজ তোমায় দেখতে আসবে দিদি। বাবা দুপুর বেলা খেতে বসে মার কাছে বলছিলেন। তুমি তখন পান সাজতে গিয়েছিলে; আমি সব শুনেছি।"

"কি শুনেছিস রে, আমায় তা বলবি না ?"

"মা গো দিদির যে কথা ! 'বলবো না' আবার কখন বল্লুম ? বাবা বলছিলেন, 'আজ মতিলাল কনককে দেখতে আসবে। কালো মেয়ে বিয়ে করতে তার নাকি আপত্তি নেই। হ'লে মন্দ হবে না। আমিই বলে কয়ে পাটের অফিসে মতিলালকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ছেলেটী আমার বড় অনুগত।' মা বল্লেন—"বলিতে বলিতে আমার মুখপানে চাহিয়াই বেনু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"দিদি, তুমি সব জানো, তাই আমার কথা শুনে হাসি হচ্ছে। জেনে শুনে আমার কাছে মিছে কথা বলা হ'লো কেন ! আমি আর কখ্‌খনো তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।" রাঙ্গা ঠোঁট দুটী ফুলাইয়া বেণী দুলাইয়া বেনু রাগের ভরে উঠিয়া গেল।

বেনুকে শান্ত করিবার জন্য আমাকেও উঠিতে হইল। কারণ মা'র নিকটে গিয়া দিদির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার অভ্যাসটী বেনুর বিলক্ষণরূপেই ছিল। আজিকার অভিযোগ নিত্যকার চেয়ে একটু স্বতন্ত্র হইবে, সেইটা আশঙ্কা করিয়া আমি বেনুর অনুসরণ করিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ বেনু মার কাছে না যাইয়া খেলা ঘরে জল-কাদা লইয়া খেলিতে বসিল।

মা ভাঁড়ারে কি যেন গুছাইতেছিলেন; আমাকে দেখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "তোদের চুল বেঁধে দিই আয় কনক, চিরুণীখানা এখানেই নিয়ে আয়।"

বলিলাম, "আমার কাজ সারা হয় নি, মা; ঝাঁট দিয়ে বিছানা পেতে তার পরে আমি চুল বাঁধবো; বেনুকে আগে বেঁধে দাও।"

চুল বাঁধিবার প্রসঙ্গে বেনু খেলাঘর হইতেই উত্তর করিল, "আমি আগে চুল বাঁধতে পারবো না, দিদি, আমার নতুন পুতুলের আজ পাকা দেখা——আমি এখন চন্দ্রপুলী তৈরী করছি।"

মা সহাস্যে বলিলেন, "চন্দ্রপুলী রেখে আগে উঠে আয় বেনু; বেলা গেছে, উনি হয়তো এক্ষুণি এসে তাড়াহুড়ো করবেন। কনকের চুল পরেই আঁচড়ে দেব। আজ ওর চুল বাঁধতে হবে না।"

"দিদির আজ চুল বাঁধতে হবে না—কেন মা ? দিদির যখন বাঁধতে হবে না, আমারি বা হবে কেন ?" বলিয়া বেনু কাদামাখা হাতে উৎসুক নয়ন দুটী মার মুখের উপর মেলিয়া দিল।

মা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বেনুর পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "তোর দিদিকে যে আজ দেখতে আসবে বেনু, চুল বেঁধে দিলে অমন সুন্দর চুলগুলো তো দেখা হবে না, দিদির সঙ্গে তোর কি সব সমান হয় রে; উঠে আয় লক্ষ্মী, চুল বেঁধে যা।"

মা'র আদেশে বেনুকে খেলা ফেলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু তাহার চুল বাঁধা হইল না। বাহিরে বাবার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চঞ্চল পদক্ষেপে বেনু ছুটিয়া চলিল। মা প্রসন্ন নয়নে ঘন ঘন পথের পানে চাহিতে লাগিলেন। আমি শুধু সেদিকে চাহিতে পারিলাম না। কোন অজানা ভাবের স্পর্শে আমার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। লজ্জার আবেশে চক্ষু যেন মুদ্রিত হইয়া আসিল। যিনি আজ আসিলেন, আমি জীবনে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই; কিন্তু আমার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে বহুদিন পূর্ব্বেই আমার ভাবী দয়িতের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। শৈশবের পুতুল খেলা কৈশোর সুখ কল্পনার মধ্য দিয়া যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজ যৌবনের প্রারম্ভে সেই অঙ্কুর শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি দরিদ্রের কন্যা সে কথা বিস্মৃত হইয়া, আমি রূপহীনা সে কথা ভুলিয়া গিয়া একটী অপরিচিত চিরসুন্দরের চন্দনচর্চ্চিত তরুণ মূর্ত্তিকে আমার হৃদয়-অর্ঘ্য-দান করিয়াছিলাম। ভয় হইতেছিল যিনি আসিতেছেন, তাঁহার সহিত আমার মানস প্রিয়তমের সাদৃশ্য যদি খুঁজিয়া না পাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহারই কণ্ঠে প্রীতির পুষ্পমাল্য আমি অর্পণ করিব!

আমার বার বৎসর বয়স হইতে বিবাহের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়া সুদীর্ঘ চারিটী বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজিও আমার কুমারীত্বের শেষ হয় নাই। কত পাত্রের পিতা, ভ্রাতা, মাতুল প্রভৃতি আমাদের দীন কুটীরে শুভাগমন করিয়া আমার রূপ ও বাবার অর্থবল যাচাই করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বিবাহার্থী যুবকের এই প্রথম শুভাগমন। সেই জন্যই বুঝি আমার অন্তরের মধ্যে এমন পুলক মিশ্রিত শঙ্কা ও অদম্য কৌতূহলের প্রবাহ উচ্ছল গতিতে বহিয়া যাইতেছিল। আমি ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেলাম।

কিয়ৎকাল পরে বাবা আসিয়া মাকে বলিলেন, "মতিলালকে নিয়ে এসেছি। তোমার সব ঠিকঠাক হয়েছে তো? শীগ্‌গীর করে কনককে সাজিয়ে দাও, বেশী দেরী করো না।" "না দেরী আর হবে কিসে? জলখাবার গুছিয়ে রেখেছি। কনকের মাথাটা আঁচড়ে কাপড়টা বদ্‌লে দিলেই হয়। মতিলাল তো বাইরে বসেছে; তুমি চট্ করে মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খেয়ে নাও না।"

বাবা বলিলেন, "আমার খাবার জন্য ব্যস্ত কি, আমি পরে খাবো; মতিলালের আর জিতুর খাবার পান সব ঠিক করে রাখো।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন "জিতুও কি এসেছে?" "হ্যাঁ, রাস্তা থেকে তাকেও ডেকে আনলুম। মতিলাল নিজেই দেখতে এসেছে। আমি সামনে থাকলে হয় তো লজ্জিত হবে। জিতুই কনককে দেখাবে শোনাবে।"

মা কহিলেন, "সেই ভালো। জিতুই থাকবে'খন; তুমি আড়ালে থেকো।" বলিতে বলিতে মা শয়নকক্ষে ঢুকিয়া বাক্স হইতে তাঁহার বধূজীবনের আঁচলাদার ফুলকাটা ঢাকাই শাড়ীখানি বাহির করিয়া আনিলেন। সযত্নে সস্নেহে আমার মুখ মুছাইয়া শাড়ী পরাইয়া চুলগুলি পিঠের উপর দিয়া সাজাইয়া দিলেন। কপালে সিন্দূরের টিপ কাটিয়া দিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্নেহভরা নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে মা আমার পানে চাহিয়া বারান্দায় পাটী বিছাইলেন। পাটীর অদূরে দুইখানি আসন পাতিয়া আসনের সম্মুখে খাবার ধরিয়া দিয়া বাবাকে কহিলেন, "সব হয়ে গেছে, জিতুদের পাঠিয়ে দাও।

(২)

জিতুদা আমার মাথায় নাড়া দিয়া সহাস্যে বলিল, "বড্ড যে লজ্জা দেখ্‌ছি কনী, আমাকে দেখেও মুখ ফেরান হ'লো।" জিতুদাদার কথায় একটীও উত্তর দিতে পারিলাম না; নত-মুখে কোণের দিকে আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। এযে কেবল আমার লজ্জার জড়তা নয়, ইহা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব। সঙ্কোচে সংশয়ে, আনন্দে আজ যে আমার হৃদয় কম্পিত সশঙ্কিত। নহিলে জিতুদাদাকে আবার লজ্জা করে কে? জিতুদাদা দূর সম্পর্কে আমার জ্যেঠ্‌তুত্‌ ভাই হইলেও তাহার বোন নীহারের জন্য সে আমার আপনার সহোদরের আসন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। নীহার আমার বাল্যসখী। এই একটী ভ্রাতার অমল-স্নেহ, অসীম বাৎসল্য সমভাবে উপভোগ করিয়া আমরা আবাল্য বর্দ্ধিত হইয়াছি। কত তর্ক-বিতর্কে, মধুর কলহে দুইটী ভগিনী

জিতুদাদাকে পরাস্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। তাহার কাছে আমার সঙ্কোচ নাই ; কিন্তু সে যে আজ প্রজাপতির দূত হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে ; এখন কি মুখরার মত বাদানুবাদ শোভা পায় !

আমাকে মৌন দেখিয়া জিতুদা আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "কোণে লুকিয়ে থাকলেই চলবে না বাপু, মতিবাবু একলা বসে রয়েছেন ; চল্ কনী, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আয়।"

আমি রাগের ভাণ করিয়া হাতটা টানিয়া লইয়া কহিলাম, "অমন করে বল্লে আমি কখ্খনো যাবো না।"

"ইস্ যাবে না! এমনি না যাস্ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি ; ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে শুধু শুধু দেরী করা, কি অভদ্র মেয়ে রে -"

মা মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "জিতুর সঙ্গে যা কনক, দেরী করিস নে।" আর দেরী করিতে পারিলাম না। জিতুদার পশ্চাতে ধীরে ধীরে নতমস্তকে বারান্দায় উপনীত হইলাম। জিতুদা আমাকে ধরিয়া আগন্তুকের সম্মুখে বসাইয়া দিলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত নীরবে কাটিয়া গেল। তারপর মিহিস্বরে প্রশ্ন হইল, "তোমার নাম কি ?"

স্নেহজড়িতকণ্ঠে জিতুদা বলিল, "নাম বল কনী।" ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলাম, শ্রীমতী কনকলতা দেবী।"

হাস্যমিশ্রিত পরিহাসের স্বরে উত্তর হইল, "নাম কনকলতা! আচ্ছা জিতেনবাবু, এর কনকলতা নামটা কে রেখেছিল বলুন তো ? আমাদের পোড়াদেশে নাম রাখারও একটা আইডিয়া নেই। চেহারার সঙ্গে মিল করে নাম রাখলে নামের যে কত সার্থকতা হয়, সেটা কেউ বুঝতে পারে না।"

উত্তেজিত হইয়া জিতুদা কহিল, "কেবল বাইরের মূর্ত্তিটার উপরই নাম নির্ভর করে না মতিবাবু, নামের সঙ্গে চরিত্রের সৌন্দর্য্যও প্রকাশ হওয়া চাই। ওর কনকলতা নাম আমাদের ঠাকুরমার দেওয়া।—আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে ?"

"আছে বৈকি ; শুনেছিলাম মেয়েটি শিক্ষিতা, তাই কালো জেনেও দেখতে এসেছিলাম,—" বাধা দিয়া জিতুদা বলিল, "এখন কি অশিক্ষিতা দেখছেন ? কাকা দরিদ্র পোষ্টমাষ্টার, তাঁর মেয়ের যতটা শিক্ষা সম্ভব কনকের তা বাকী নেই ! আজকালকার এম-এ, বি-এ পাশকরা ছেলের স্ত্রী হবার যোগ্যতা কনকের যথেষ্টই আছে।"

শেষের কথাটা জিতুদা একটু জোরের সঙ্গেই কহিল। কেন যে কহিল তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আজ যিনি আমার পরীক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যা যে প্রবেশিকা পর্য্যন্তও গড়ায় নাই, ইহা জিতুদার অজানা ছিল না। খোঁচা খাইয়া ভদ্রলোকের মুখ কেমন হইয়াছিল, তাহা জানি না ; কিন্তু কণ্ঠস্বর তিক্ততায় ভরিয়া গেল। জিতুদার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া মতিবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কতদূর পড়েছ ? ইংলিস্ ক'খানা বই পড়া হয়েছে ?"

আমি মুখ তুলিয়া উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কণ্ঠ নীরব হইয়াই রহিল। সে যেন ছিন্ন-তার বীণাধ্বনির মত ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিল না। জিতুদা আমার হইয়া উত্তর করিল, "বাংলা সংস্কৃত কনক ভাল করেই শিখেচে ; ইংরেজি বেশী না শিখলেও কাজ চালিয়ে নিতে পারে। শিক্ষার বিষয়ে কনকের খুব উৎসাহ ; শিখিয়ে নিলে ও ঢের শিখতে পারবে।"

"এখন কি আর এত বয়সে শিক্ষার সময় আছে ? এর বয়স কত ?"

জিতুদা রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "মেয়ে যদি আপনার পছন্দ হ'য়ে থাকে, বিয়ের সময় বয়সের হিসাব নেবেন মশায় দয়া করে। এখন কি কনক যেতে পারে ?"

"–না, ভাল করে দেখাই হ'লো না ; এত তাড়াতাড়ি কেন ?" বলিয়া মতিবাবু ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিটা বোধ হয় আমারই মুখের উপর প্রসারিত হইয়াছিল ; সেটা অনুমান করিয়া আমার কালো মুখ রাঙা না হইলেও হৃদয়টি যেন নববধূর সরমে নুইয়া পড়িল। মতিবাবুর প্রশ্নে, বলিবার ভঙ্গিতে আমার মনের কৌতুকের উচ্ছ্বাস বহুক্ষণ পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। এখন তাঁহার সম্মুখে অচল স্তূপের মত বসিয়া থাকিতে আমি মরমে মরিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু উঠিবারও যে উপায় ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে মতিবাবু গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "একবার আমার দিকে চাইতে বলুন দেখি জিতেনবাবু, অনেক মেয়েরই চোখের মণি কটা হয়—"

"সেটা ফর্সা মেয়েদেরই বেশী; কালো মেয়েদের হয় না! রবিবাবুর কবিতায় পড়েন নি, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ!" বলিতে বলিতে জিতুদা আমার নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। সহসা আমার চোখের সহিত অপরিচিত যুবকের চোখোচোখি হইয়া গেল; লজ্জায় ধিক্কারে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। আমার আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; কল্পনার অভ্রভেদী মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি মনে মনে যে মায়ারাজ্য গড়িয়া আমার জীবন দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, ইহার সহিত তাহার কোথায়ও সাদৃশ্য দেখিলাম না। মতিবাবু আরও বহুক্ষণ বহুবিধরূপে আমার পরীক্ষা লইয়া অবশেষে আমাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

আমি উঠিয়া আসিলে জিতুদা বলিল, "তা হ'লে মেয়ে আপনার পছন্দ হ'য়েছে মতিবাবু? বিয়ের দিন ঠিক করা যাক্?"

"না, পাকা কথা এখুনি আমি দিতে পারছি না; পছন্দের কথাও এখন বলতে পারবো না। ভেবে দেখে পরে জানাবো।" কহিয়া মতিবাবু প্রস্থান করিলেন।

এই অভিভাবকহীন যুবকের প্রতি বাবা অনেকটা আশা করিয়াছিলেন। ছেলেটিও আকার ইঙ্গিতে বাবার আশালতার মূলে সলিল সিঞ্চন করিয়াছিল। পাটের আফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া বাবাই মতিবাবুর কাজ করিয়া দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কথায় বার্ত্তায় মতিবাবু ভ্রমেও বাবার নিকটে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই। আজ তাহার ভাবিয়া দেখার কথায়, বাবা ও মার প্রসন্নবদনে অকাল-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

কবি-তীর্থে (২) *

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

সে আজ অনেকদিনের কথা। অতি সঙ্কুচিত পদে, অত্যোধিক শঙ্কিত মনে আমি আমার এক প্রতিবাসী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বাগবাজার, বসুপাড়া লেনের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকিয়াছিলাম। কৈশোর অতিক্রম করিয়া সবে মাত্র করিতেছি, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দু'একদিন রঙ্গমঞ্চে দেখা ছাড়া গিরিশচন্দ্রকে দেখিবার সৌভাগ্য কোন দিন হয় নাই; তবে তাঁহার নাটকে তাঁহার চিত্র দেখিতাম, আর ভাবিতাম, গম্ভীর বলিয়া মনে হইলেও ইঁহাকে তো তেমন

নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র।

যৌবনে পা দিতেছি, বালসুলভ চঞ্চলতা হ্রাস পাইলেও, একেবারে বিদূরিত হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটক পাঠ করিয়া, সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া, গিরিশচন্দ্রকে অন্তরের সর্বোচ্চ আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধা ভক্তির অঞ্জলি দিয়া পূজা 'ভীষণ' লোক বলিয়া মনে হয় না! একদিন গিয়া দেখিয়া আসিব না কি? তাঁহার নাটকেই ঠিকানা পাইলাম, তের নম্বর বসুপাড়া লেন; বাগবাজার। একলা বাগবাজারে গিয়া, বসুপাড়া লেন খুঁজিয়া লওয়া খুব সহজ সাধ্য ছিল না,

* কবিতীর্থে (১) ১ম বর্ষের ৩৯ ও ৪০শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ডাকিলাম। বন্ধুটি উদ্দেশ্য, কারণ কিছুই জানিতে চাহিলেন না ; বিনাবাক্যব্যয়ে সঙ্গী হইলেন। মনে আছে, মধ্যাহ্ন কাল। অনেক খানি হাঁটিয়া বাগবাজার ষ্ট্রীটে পড়িয়া, পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া বসুপাড়া লেনের সন্ধান করিয়া লইলাম। সেখান হইতে ১৩ নম্বর অধিক দূর ছিল না, সরু গলিটার মুখে আসিয়াই দেখিলাম, লেখা রহিয়াছে—13 ; আজও মনে পড়ে হৃদয় মধ্যে একটা অপূর্ব স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল ; এক পা অগ্রসর হইবার শক্তি আর চরণের নাই ; মন আরও অবসন্ন! যেন একটা উদ্বেগ, আশঙ্কা মনের ভিতর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে! অথচ সেই গলিটুকু অতিক্রম করিয়া, সেই বাড়ীটিতে ঢুকিবার সে কি অদম্য আকাঙ্খা ; গৃহস্বামীকে দেখিবার, তাঁহার চরণপ্রান্তে নতি করিবার সে কি উদ্দাম আকুলতা!

বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় এতটুকু দুর্বলতাও বুঝিতে পারি নাই। তা যদি বুঝিতাম, তবে বাহির হইতাম কি-না সন্দেহ! তখন মনে এই ভাবটিই বেশী জাগিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালী, আমিও বাঙ্গালী, তিনি প্রভু রামকৃষ্ণের শিষ্য, আমার কাছে রামকৃষ্ণ দেবতা! তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব, ইহাতে সঙ্কোচ আসিবার কারণ কি থাকিতে পারে? তাই সোল্লাসে সর্ব কর্ম ফেলিয়া ছুটিয়াছিলাম। এখন, সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল, গ্রীষ্মে নয়, আতঙ্কে ; পা যেন যেখান হইতে আসিয়াছে, সেই খানেই টানিয়া লইয়া যাইতে চায়, অবসাদে নয়,—শঙ্কায়।

বন্ধুটি তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইতে বলিলেন, এবং আমি যদি নম্বর না-জানিয়া আসিয়া থাকি, তবে কাহার বাড়ী, গৃহস্বামীর নাম, তাঁহার কি পেশা, বয়স কত ইত্যাদি বলিয়া নিকটস্থ কোন গৃহবাসীর নিকট জানিয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। তথাপি আমাকে নীরব ও নিশ্চল দেখিয়া বন্ধু ক্রমশঃই বিরক্ত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল।

আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম—চলুন ; কাজ হইয়া গিয়াছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন এ-কথায় তাঁহার বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল। তিনি ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, বাড়ী চলুন, বাড়ী গিয়া বলিব, সে অনেক কথা।

ফিরিলাম। কিন্তু আমার অন্তরবাসী যিনি, তিনি জানেন, মনকে আমার ফিরাইতে পারিলাম না। অদৃশ্য স্থানে, অলক্ষ্যে থাকিয়া সে কেবলই অনুযোগ করিতে লাগিল, সুন্দর বনেও আস নাই, বাঘ-ভাল্লুকও সেখানে থাকে না ; গিয়াছিলে যদি তবে সাহসে ভর করিয়া আর-একটু অগ্রসর হইতে পারিলে না!—মূঢ়! চল, এখনও ফিরিয়া চল! হয়ত, আজ না হইলে মনস্কামনা কোন দিনই পূর্ণ হইবে না, জীবন-ভোর একটা মহা ক্ষোভ থাকিয়া যাইবে। চল, ফিরিয়া চল!

ইহার পূর্বে আর কোন দিন মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন আমাকে হইতে হয় নাই। মন যথাসাধ্য শক্তিতে পিছনের দিকে টানিতেছে ; লজ্জা, সঙ্কোচ, বন্ধুর রহস্য ভীতি অতি ধীরে, মন্থর গতিতে গৃহাভিমুখে চালিত করিতেছে। এক একবার অভিলাস জাগে, ফিরি ; বন্ধুকে বিদায় দিয়া একাই একবার যাই!—আবার সেই সঙ্কোচ জাগিয়া নিরুৎসাহ করিয়া দেয়! সঙ্গে সঙ্গেই মন শাসায়, সুযোগ, সুবিধা বার বার আসে না ; মনে থাকে যেন।

সঙ্কোচই জয়ী হইল। ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া বন্ধু বলিলেন, ব্যাপার কি বল ত? ও গলিতে তোমার কে থাকে?……সে অনেক প্রশ্ন! সে সব বাজে কথা!

ইহার দুই চারিদিন পরেই আমি আমার এক মাতুলালয়—মুঙ্গেরে চ লয়া যাই। জামালপুরের একটা বা দুইটা ষ্টেশন এ-দিকে খরকপুর নামে এক গ্রাম আছে। আমার এক মামা বাঙ্গালার বাস উঠাইয়া সেই খানে জমিদারি আদি কিনিয়া সুখে বসবাস বরিতেছিলেন। স্থানটি অতি মনোরম, পাহাড়, হ্রদ, খাল থাকার দরুণ স্থানটি সুদৃশ্যও ছিল। আমি অনেক সময়ে খরকপুরে গিয়া থাকিতাম। আমার মামাত-ভাই-বোনগুলির জন্য ছেলেবেলায় খরকপুর আমার কাছে বড় প্রিয় ছিল। আমার ক্ষুদ্র জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র গ্রামটি বিজড়িত হইয়া আছে।

কলিকাতার দুই তিনখানি ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদপত্র মাতুল মহাশয়ের জন্য আসিত। আমরা, দ্বিপ্রহরে মাতুল

নিদ্রিত হইলে, কাগজগুলি লইয়া আমাদের বৈঠকখানায় ঢুকিতাম। একদিন, বোধ হয় ১০ই এপ্রিল—কাগজ খুলিতেই দেখি, গিরিশচন্দ্র আর নাই! ৮ই এপ্রিল, দেড়টার সময় তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের তিরোধানে আমাদের নাট্য সাহিত্যের যে কি ভীষণ ক্ষতি হইল, আমাদের বাঙ্গালাদেশের রঙ্গমঞ্চের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার কি দুর্দশা ঘটিল, এ-সকল চিন্তা আমার মনে জাগিয়াছিল কি-না সন্দেহ! গিরিশের অভাব পারিলেই, জীবনের একটা মস্ত সাধ পূর্ণ হইত! হেলায় সে সুযোগ হারাইয়াছি, জীবনে আর তাহাকে পাইলাম না। জীবিত গিরিশচন্দ্রকে দেখিবার সাধ আমার চিরতরে অপূর্ণই রহিয়া গেল। বঙ্গ রঙ্গ-মঞ্চ-স্রষ্ঠা, নাট্যজগতের অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্ক, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের পদে এক অজ্ঞাত, অখ্যাত নাট্যানুরাগী কিশোরের পূজার বাসনা অনন্তে লীন হইয়া গেল!

তারপর কত দিন কাটিয়া গিয়াছে; কত দীর্ঘ বরষ অতীত
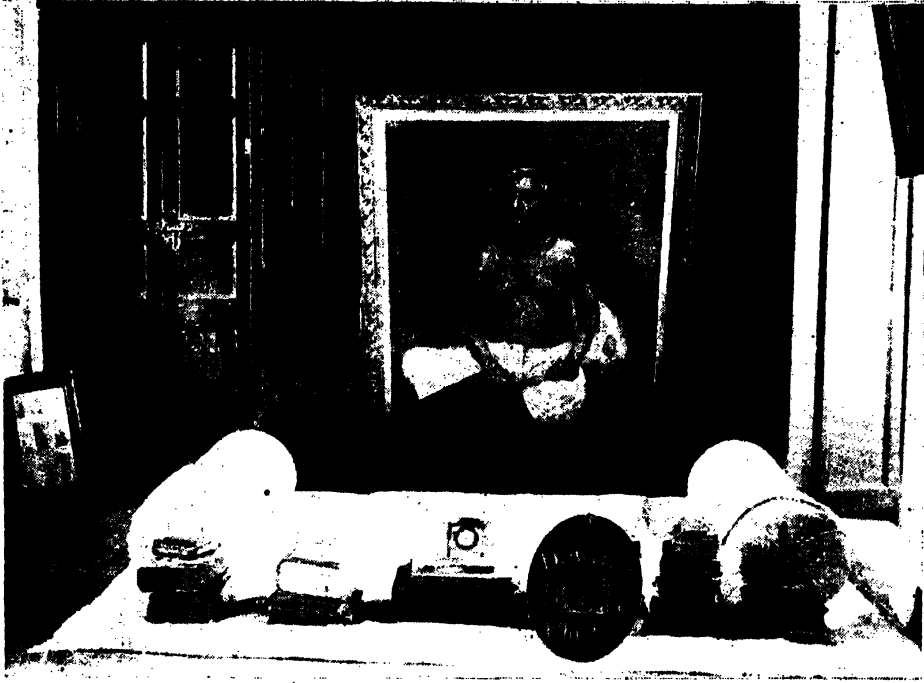
গিরিশচন্দ্র এই ঘরে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ করিতেন।

কবে, কত শত বর্ষ পরে পূরিবে, অথবা কস্মিন কালেও পূরিবে না, এ-সকল চিন্তাও আমার মনে জাগে নাই। তাঁহার বিয়োগে দেশের ক্ষতির পরিমাপ করিবার শক্তি-সামর্থ্য আমার ছিল না। বলিতে লজ্জা নাই, দেশের লাভ ক্ষতির হিসাবের ধারও বড় একটা ধারিতাম না। আমি ভাবিতে লাগিলাম আমার মনস্কামনা সত্য সত্যই চিরতরে অপূর্ণ রহিয়া গেল। সেদিন,আমার মন সত্য কথাই বলিয়াছিল,সুযোগ সুবিধা বার বার আসে না! সত্যই ত! সেই দিন সে সুযোগ আসিয়াছিল; একটু ধৈর্য্য, একটু সাহস ধরিতে হইয়াছে। কিশোর—যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত; বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ট হইয়াছে; নাট্য সাহিত্যের রসাস্বাদন করিবার সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; গিরিশ প্রতিভার প্রতি বহুগুণ শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িয়াছে কিন্তু স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্যের বাসভূমির নিকটে যাইবার ইচ্ছা—একটি দিনের তরেও আর অনুভূত হয় নাই।

একদিন যাইতে হইল, কার্য্যব্যপদেশে একদিন বাগবাজার বসুপাড়া লেনে সেই ১৩ নম্বর বাড়ীতেই আমাকে যাইতে হইল। স্বর্গীয় নাট্য-সম্রাটের অনুক্ষণের সঙ্গী প্রিয় সহচর

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া দ্বিতলের একটি হলে বসাইলেন। সম্মুখেই একখানি বৃহৎ তৈল-চিত্র, গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের প্রতিকৃতি,— সমালোচকের বা চিত্র পরীক্ষকের দৃষ্টি লইয়া আমি সে কক্ষে প্রবেশ করি নাই,- মনে হইল কি সুন্দর চিত্রখানি! যেন সজীব। চিত্র নিম্নে, কক্ষতলে, ফরাসটি এমনভাবে সজ্জিত যে দেখিলেই মনে হইবে, এ স্থানের যিনি মালিক, তিনি বুঝি এই মাত্র কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিয়া বসিবেন। লেখাপড়ার কার্য্য করিতেন! পার্শ্বের কক্ষটিতে রাত্রে শয়ন করিতেন।

পার্শ্বের কক্ষে দেখি, খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রস্তুত; খাটের শেষ প্রান্তে টুলের উপর জলের গ্লাস, একটি ডাবর রক্ষিত; উপাধান পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র পিকদানী, তাহাতে গুটী কতক খড়কে। একটি কাঠের আলনায় গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত চোগা, সার্ট, পাঞ্জাবী, সামলা, লাঠি, ধুতি, গামছা, চটি, জুতা সজ্জিত রহিয়াছে। অবিনাশ বাবুর মুখে শুনিলাম,

গিরিশচন্দ্রের শয়ন-কক্ষ।

কলমটি, পেন্সিলটি, ছুরিখানি, লিখিবার খাতা, অভিধান, পঞ্জিকা, দাসরথি রায়ের পাঁচালী,* পানের ডিবা, থুথু ফেলিবার ডাবর, জলের গ্লাস, তাকিয়া—সব সুবিন্যস্ত! দিন-পঞ্জী-ফলকে ৮ই এপ্রিল, ১৯১২—নির্দেশ করিতেছে, ঘড়িটা ১টা বাজিয়া কয়েক মিনিটে বন্ধ হইয়াছে।

অবিনাশবাবু বলিলেন, গিরিশচন্দ্র এই খানে বসিয়া গিরিশচন্দ্রের জীবনকালে ঘর যেরূপ ভাবে সজ্জিত থাকিত, আজও তিনি সমস্ত জিনিষ ঠিক সেই ভাবেই সাজাইয়া রাখিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নাট্যাচার্য্য দানীবাবুর মুখে শুনিয়াছি, অবিনাশবাবু নিত্য ফুলজল দিয়া নাট্যাচার্য্যের ছবিখানি, লেখনীটি, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য গুলির পূজা করিয়া থাকেন।

গিরিশচন্দ্রের ভক্ত দেশে বিদেশে বহু আছেন কিন্তু এমন গিরিশ-ধ্যান-জ্ঞান ধারণা করিয়া আছেন, এমন একটি

* সুহৃদ্বর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের মুখে শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র দাসরথী রায়ের পাঁচালী বড় ভালবাসিতেন।

লোককেই আমি দেখিয়াছি; তিনি অবিনাশ বাবু! ব্রাহ্মণ হইয়াও তিনি কায়স্থ গিরিশচন্দ্রের পূজা করেন শুনিয়া হয়ত অনেক বর্ণাশ্রয়ী মনকষ্ট পাইবেন কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ করিতে হইবে এ পূজা ব্রাহ্মণের ও শূদ্রের নয়; এ পূজা প্রতিভার ও ভক্তের! সূর্য্যকে দেখিবার, বন্দনা করিবার অধিকার যেমন সকলের আছে,—প্রতিভার পূজা করিবার অধিকার তেমনি সকলের আছে। সরস্বতীর ধনভাণ্ডারের কুবের গিরিশচন্দ্রের অনুক্ষণের সঙ্গী হইয়া অবিনাশবাবু জীবনে যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার যে তুলনা নাই!

অবিনাশবাবু আমাকে হল-ঘরে বসাইয়া, দানীবাবুকে খবর দিতে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমি একা সেই পূত-পবিত্র স্মৃতি-বিমণ্ডিত কক্ষের মধ্যস্থলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এ ঘরের ধূলা, বায়ু সমস্তই আমার কাছে পবিত্রতম! এই ঘরে বসিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকাবলী রচনা করিতেন! এই সেই স্থান, যেস্থান হইতে বাঙ্গলার অনূঢ়া কন্যা ও তাহাদের দায়ে দায়গ্রস্থ পিতামাতার করুণ আর্ত্তনাদ গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মবিদ্ধ করিয়াছিল; এই সেই পুণ্যময় গৃহ, যেখানে বসিয়া গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যের লীলা দর্শন করিয়াছিলেন; এই সেই মহাতীর্থ যেখানে বসিয়া সাধক গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলের সাধনা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন;

গিরিশচন্দ্রের জামা-কাপড়-জুতা-সহ আলনাটি!

এই সেই দেবস্থান, যেখানে বসিয়া গিরিশচন্দ্র লীলাময় শঙ্করাচার্য্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এইখানেই সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই খান হইতেই বাঙ্গলার মাটীতে গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের বীজ বপণ করিয়াছিলেন, আজ সে বৃক্ষ বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছেন; আজ তাহারই স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াতলে কত পান্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কত লোক তাহারই তলে জীবিকা অর্জন করিতেছে! বাঙ্গালী-নাট্যামোদীর সেই মহাতীর্থে বসিয়া, তীর্থ-রেণু অঙ্গে ধরিয়া আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম।

বিলাতী পুস্তকে পড়িয়াছি, ছবি দেখিয়াছি, সে-দেশের কবিদিগের বাস-ভূমি গুলি সে দেশবাসীর নিকট পুণ্য তীর্থ হইয়া আছে; বৎসরের প্রায় সকল সময়েই দলে দলে দর্শক, তীর্থ যাত্রী সেই সকল তীর্থে গিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আসে। কবির বসিবার চেয়ারখানি, লিখিবার টেবিলটি, লেখনীটি স্পর্শ করিতে পাইলে সৌভাগ্য মনে করে। এক-একজন কবির নামে এক-একটা উৎসব-তিথি নির্দ্ধারিত হইয়া গেছে, সেই সেই দিনে সেখানে মেলা বসে—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সকলে মেলায় গিয়া মৃত মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই-রকম উৎসবের বৃত্তান্তও সংবাদ-পত্রের মারফতে আমরা পড়িবার সুযোগ পাইয়া থাকি। আমরা অনেক বিষয়ে ইয়োরোপীয় জাতির আদর্শ

গিরিশচন্দ্রের বাটীর সম্মুখ—প্রবেশদ্বার।

গ্রহণ করিয়া চলিতেছি, কি শিক্ষায়, কি রাজনৈতিক আন্দোলনে, কি দেশ-হিতৈষণায়—ইয়োরোপীয়গণ আমাদের আদর্শ। কেন যে দেশের গৌরব-স্বরূপ মৃত মহাত্মাদের সম্মান রক্ষা-কার্য্যে আমরা ইয়োরোপীয়কে আদর্শ করি নাই, তাই ভাবি!

গিরিশ্চন্দ্র যদি বাঙ্গালায় না জন্মিয়া, ইয়োরোপের কোন নিভৃততম পল্লীতেও জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে সেই পল্লীও আজ একটা মহাতীর্থে পরিণত হইতে পারিত। পুস্তকে, সাময়িক পত্রে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া ও চিত্র দেখিয়া পাইয়াছে? হেমচন্দ্রের ব্যবহৃত কোন্ বস্তু দেখিয়া বাঙ্গালী গর্ব করিতে পারে? অবিনাশবাবু না থাকিলে এই বারো বছর পরেই গিরিশচন্দ্রের লিখিবার ঘরের কি যে অবস্থা হইত-কে বলিতে পারে। সুখের বিষয় দানীবাবুও তাঁহার 'বাপির' জিনিষপত্রগুলির যত্ন লইতে উদাসীন নহেন। কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? নাট্যামোদী বলিয়া আমরা আত্মপরিচয় দিই, আমাদের মধ্যেই অনেকে রঙ্গালয় জীবিকা করিয়াছেন, রঙ্গালয়ের দৌলতে নাম করিয়াছেন, অর্থ করিয়াছেন, প্রতিপত্তি পাইয়াছেন—কিন্তু গিরিশের স্মৃতির

নাট্যাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।

আমাদেরও কতজনের মনে সেই কবি-তীর্থ দর্শনের সাধ জাগিয়া উঠিত কিন্তু হায়! বাঙ্গালার গিরিশচন্দ্রের বাসস্থান আজ কয়জন বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত? আদৃত? সম্মানিত? কয়জন জানে যে গিরিশচন্দ্র কোথায় বাস করিতেন? আমি অকুতোভয়ে বলিতে পারি অবিনাশবাবুর মত একজন একনিষ্ঠ গিরিশ ভক্ত যদি সেই গৃহে বাস না করিতেন, আজ গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম আসবাব-পত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার কোনটাই দেখা যাইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিবার ঘরে বঙ্কিমের কয়টা জিনিষ আছে? মধুসূদনের কোন্ জিনিষটা বাঙ্গালী দেখিতে জন্য কে কি করিয়াছেন? অধিক কথা কি, গিরিশচন্দ্রের বাটীর দ্বারদেশে একখানি প্রস্তর-ফলক আছে, সেখানি কে বা কাহারা দিয়াছে জানেন?—বাঙ্গালী নয়, আমরা নই, কয়জন আমেরিকান পর্য্যটনকারী সেখানা আঁটিয়া দিয়া গিয়াছিল! আমরা যদি বাস্তবিক নাট্যামোদী হই, নাট্যানুরাগী হই, নাট্যকলাবিদ হই, তবে আসুন সকলে, গিরিশচন্দ্রের বাস ভবনে আসিয়া অন্ততঃ বৎসরের একটা দিনও মিলিত হোন একদিনের জন্য সে স্থানকে তীর্থ-গৌরব দান করিয়া জাতির জীবনের পরিচয় দিন্! আর সে দিন হোক, প্রতিবছরের সেই—

শ্রীযুক্ত কে, ভি, পাল কর্ত্তৃক আলোক চিত্র হইতে } ৮ই এপ্রিল

প্রিয়ার পিত্রালয়*

[৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

(১)

নাইক মোর সেথায় কেহ
আপন জনা তেমনতর,
তবু প্রিয়ার পিত্রালয়
আমার কাছে মধুর বড় !

(২)

অষ্টাদশ বসন্তেরি
মলয় বুঝি যাচ্ছে বয়ে,
প্রিয়া আমার জন্ম নিল
এখানেরই স্নেহালয়ে !

(৩)

নববর্ষের প্রথম দিনে
ফুট্‌ল তার মোহন হাসি,
সারা জনম পাগল করে
প্রাণে আমার বাজ্‌তে বাঁশী !

(৪)

মায়ের কোলে সোনার শৈশব
কাট্‌ল তার হেথায় সুখে,
মধু বুঝি ভরতি হ'ল
পদ্মকুঁড়ির কচি বুকে !

(৫)

ছেলেবেলার ছুটাছুটি
হাজার রকম হাসিখেলা,
প্রিয়ার মোর এখানেই যে
বসিয়ে গেছে পুলক-মেলা !

(৬)

প্রিয়া আমার ওই পুকুরে
দিত সাঁতার সখীর সনে.
লহর-রাণী বাড়িয়ে পাণি
বাঁধ্‌তে চেত আলিঙ্গনে !

(৭)

ওই যে তীরে রসাল তরু
ছায়ায় বসি' তাহারি তলে,
কুরুবকের মাল্য গেঁথে
পরত প্রিয়া আপন গলে !

(৮)

ওই যে পাহাড় যাচ্ছে দেখা
ভরা বস্তপেয়ারা গাছে,
শুনেছি প্রিয়া ছুট্‌ত সেথা
প্রজাপতির পাছে পাছে !

(৯)

এই পথেই প্রিয়া আমার
করৃত সদা যাওয়া-আসা,
তাই কি প্রতি ধূলিকণায়
কর্‌ছে দাবী ভালবাসা !

(১০)

"খরতি ছরা" পুণ্য-নদী
যাচ্ছে বয়ে পাহাড় পাশে,
এখানেই প্রিয়া আমার
আস্‌ত মেলা দেখার আশে !

(১১)

একটী পয়সার বাঁশী কিনে
কি আনন্দই হ'ত চিত্তে,
ঢেউটি তার আজকে বুঝি
ঘের্‌ল আমার চারি ভিতে !

(১২)

হেথাকারি বায়ুর মত
বাঁধনহারা মুক্ত স্বাধীন
পল্লীমায়ের পল্লীবালা
প্রিয়া যে ছিল একটী দিন !

(১৩)

তাহার সকল ব্রতের মাঝে
তাহার সব স্বপ্ন-ধ্যানে,
জন্মান্তরের স্মৃতি সম
কভু কি দেখা দিতাম প্রাণে ?

(১৪)

এখানেরই তরুলতায়
ফুলে ফুলে পাখীর গানে,
কেন গো তবে আমায় চায়
ভাসিয়ে নিতে মায়ার বানে !

(১৫)

প্রিয়ার মোর পিত্রালয়
বাল্যেরি তার বৃন্দাবন,
তাইতে বুঝি আজকে মোরে
কর্‌ছে এমন আকর্ষণ !

(১৬)

আমার প্রেম-মথুরারি
হোক্ না প্রিয়া আজকে রাণী,
কিশোর-লীলার উৎসে ভরা
বৃন্দাবনই ধন্য মানি !

---

* স্বর্গীয়-কবির রচিত এই অপ্রকাশিত কবিতাটি শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি।—সং পি, স।

"কলেজের ছেলে ?—নাঃ"

গত সপ্তাহে প্রকাশিত বেথুন কলেজের কয়েকটি ছাত্রী-লিখিত পত্রখানি আমাদের যুবক সমাজে একটা চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছে। ঐ সম্বন্ধে বহু কলেজের ছাত্রগণের স্বাক্ষরিত বহু পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সংখ্যায় সেগুলি এতই অধিক যে আমরা খুব ছোট অক্ষরে ছাপিলেও এক সপ্তাহের সচিত্র শিশিরে শেষ করিতে পারিব না, দুই তিন সপ্তাহের পত্রের সম্পূর্ণ কলেবর সেই পত্রগুলির দ্বারাই আবৃত হইতে পারে। সুখের বিষয়, অধিকাংশ পত্র লেখকই 'সেই সকল কদাচারী কলেজের ছাত্রগণের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন' লিখিয়াছেন। তাহারা যে 'কলেজের ছাত্র-কলঙ্ক' এবং 'তাহাদের কৃত আচরণের দ্বারা সমস্ত ছাত্র সমাজের গায়ে মসী লেপিয়া দিয়াছে, ইহাও অকপটে স্বীকার করিতে' তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। কোন একটি সুপরিচালিত কলেজের কয়েকজন ছাত্র ছাত্রবৃন্দের মুখপাত্র হইয়া ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন। আমরাও ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাহাদের আচরণ যে কেহই—সমর্থন করিবে না, ইহা আমরা জানিতাম; এই পত্রগুলি পড়িয়া আমাদের খুবই আশা হইয়াছে যে আমাদের ছাত্র-সমাজ এখনও ততটা নীচে নামেন নাই; ততটা হীন কার্য্য করিতে পারেন না। আমরা এইসকল পত্র লেখকগণের সাধুবাদ করিতেছি।

কোন কোন পত্র লেখক—সংখ্যায় দুই তিন খানির বেশী হইবে না—ছাত্রী কয়টির উপরে একটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন; এই পত্র-সম্পাদকের উপরেও পক্ষপাত দোষের বোঝা চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের বক্তব্য যে, 'সেই যুবকগণ যখন ছাত্রীদিগের প্রতি জঘন্য দৃষ্টিপাত ও হাস্য-কলরব করিতেছিল, তখন মেয়েরা সেখান হইতে সরিয়া যাইলেই পারিতেন; প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়ার আদেশমত জানালা বন্ধ করিয়াও, পর্দা খুলিয়া পথের পানে চাহিয়া না থাকিলেই পারিতেন; ছোকরারা রাস্তা হইতে হাস্যরব করিতেছিল অথবা ফানুষ উড়াইতেছিল, তাঁহাদের দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র শোভাযাত্রার দিকেই থাকিত, তবে তাঁহাদের দৃষ্টিতে যুবকগণ কখনই পড়িত না'। এ সকল অসার যুক্তি যে কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের মনে উঠিতে পারে, ইহাই মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জৈনদিগের পরেশনাথ শোভাযাত্রার আকর্ষণ সহরবাসীদিগের মধ্যে নিতান্ত অল্প নহে, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও কত সংখ্যাহীন যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যে এই ধুমধামের শোভাযাত্রা মিছিল, কত পয়সা খরচ করিয়া, গাড়ীভাড়া করিয়া দেখিতে যান্, তা বলা যায় না। যে-যে পথে শোভাযাত্রাটি যায়, সেই সেই পথের ধারের গৃহস্থের গৃহগুলি সেদিন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই হিসাবে বেথুন কলেজের মেয়েরা যে এই শোভাযাত্রার শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে উদগ্রীব হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি! ছাত্রগণের (?) কুব্যবহারের পর তাঁহারা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু শোভা-যাত্রার আকর্ষণই 'পাখী' তুলিয়া দাঁড়াইতে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল; ইহাতেও তাঁহারা কিছু অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া আমরা ভাবিতে পারিতেছি না। পত্র-লেখকগণের শেষ বক্তব্য যে 'মেয়েদের দৃষ্টি যদি শোভাযাত্রায় নিবদ্ধ থাকিত, তাঁহারা কখনই ছাত্রগণের কার্য্য-কলাপ দেখিতে পাইতেন না'। ইহাও যুক্তিহীন। রাস্তার অপর ফুটপাথে অত বড় একটা জঘন্য কাণ্ড হইতেছে, শোভাযাত্রা যত বড় আর যত সুন্দরই হৌক, দৃষ্টি পড়িতেই হইবে।

তাঁহারা পত্র-সম্পাদকের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ-আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ তিনি 'একপক্ষের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই পত্রস্থ করিয়াছেন। তাহারা সত্যই কলেজের ছাত্র কি-না সম্পাদকের সে সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত ছিল। হাতে বহি থাকিলেই কলেজের ছাত্র হয় না।' আমাদের নিবেদন এই যে সম্পাদক গতবারই তাঁহার মন্তব্যে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সম্পাদক যুবক, তাঁহার সহিত অনেক কলেজের ছাত্রের আলাপ আছে, বন্ধুত্ব আছে। অনেককে তিনি খুব ভাল রকমই জানেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন নীচতার স্থান নাই, কলেজের ছাত্রগণ সম্বন্ধে এই পত্র সম্পাদকের ইহাই ধারণা। সম্পাদক অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা গতবারে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত মন্তব্যটি আর একবার পড়িয়া দেখিবেন।

একজন প্রশ্ন করিয়াছেন যে মেয়েরা জানিলেন কিরূপে (ভাষা অত্যন্ত অসম্মান সূচক) যে তাহারা কলেজের ছাত্র? ছাত্রের গায়ে কি ছাপ মারা থাকে?—তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ছাপ-মারা না থাকিলেও স্কুল বা কলেজের ছাত্র চিনিতে বড় দেরী হয় না। তাহাদের বেশভূষায় চলনে ভঙ্গীমায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকে যাহা অতি সহজেই তাহাদিগকে বেকার, যাত্রা-থিয়েটারের বা আফিসের লোকের নিকট হইতে তফাৎ করিয়া দেয়। লক্ষ করিলে এই বৈশিষ্ট্য সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। ইহাকে আমি নিন্দার কথা বলি না; বিশেষত্ব থাকা দরকার।

ঠিক মনে নাই, বোধহয় দুইচারি বৎসরের মধ্যেই এই পরেশনাথ শোভা যাত্রার দিনেই নিকটবর্ত্তী কোন কলেজের জনকয় ছাত্র এই বেথুন কলেজের মেয়েদের গায়ে ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাসের রশ্মি ফেলিয়া নিজেদের অসৎ প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল; ইহাও স্মরণ হইতেছে যে ঐ বৎসর হইতে বেথুন কলেজে পরেশনাথ শোভাযাত্রার দিন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়। সম্পাদক তাঁহার কলেজের বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে সেই সকল ছাত্রের কয়েক-জনের নাম ধামও জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই কয়েকটি যুবক যে ছাত্র-সমাজের গায়ে কলঙ্ক লেপিতেছে, তখনও তিনি এই কথাই তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট বলিয়াছিলেন: আজও তাঁহার অন্য বক্তব্য নাই। তবে এক, দুই বা দশের জন্য ছাত্র-সমাজ কলঙ্কিত হইবে কি-না, এ প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগিতে পারে। আমাদের মতে তাহারও মীমাংসা আছে। একা রাবণের পাপে লঙ্কার রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়াছিল, এক দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহারে কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল এই সকল ছাত্র-কলঙ্কের জন্য আমাদের কলেজের ছেলেরাও যে নিন্দিত হইতেছেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! তবে আমাদের বিশ্বাস, কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাদের সহপাঠিদিগের মধ্যে দুষ্কৃতাচারী কেহ থাকিলে তাহাকে বর্জন করিয়া আপনাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।
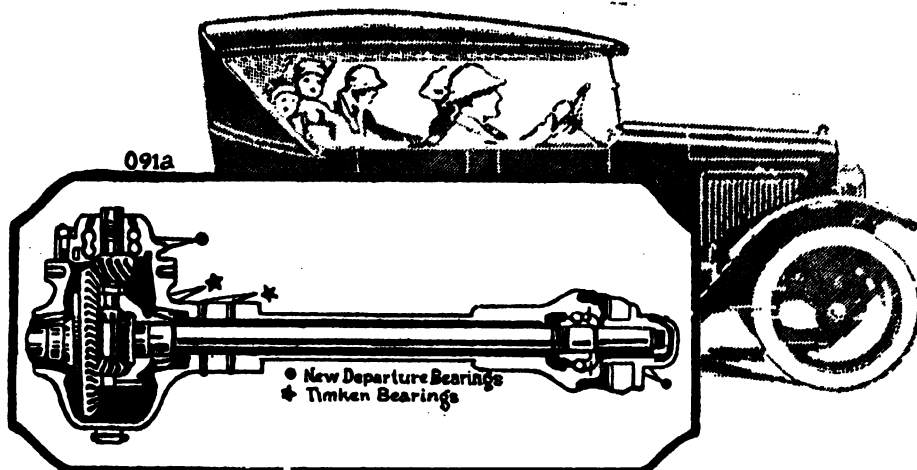
বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য—ব্যাধি

শিল্পী - শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

The Sturdy Rear Axle

An Overland Feature

OVERLAND has the strongest rear axle of any car sold to-day at or near the Overland price. An axle built to stand more abuse than the stresses of service will give it. The oversize axle shafts are forged of tough Mo-lyb-den-um steel, fortified at every vital point with genuine Timken and New Departure Bearings. Road conditions mean nothing in the life of *this* axle! Millions of miles by thousands of owners have not brought to light a single engineering defect in this new Overland rear axle.

Overland 91

Touring with full equipment including such extras as 5 cord tyres, bulb horn, electric side lamps and cushion covers. Hire-purchase terms can be arranged.

OVERLAND TOURING 2900 FOR PORT OF ENTRY

G. McKENZIE & Co. (1919) LTD.

UNDER NEW MANAGEMENT

Calcutta Cawnpore Delhi Lahore and Rawalpindi

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩১ সাল। [৫ম সপ্তাহ

স্বপ্নাদ্য মাদুলী

(বিশেষ ফলপ্রদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
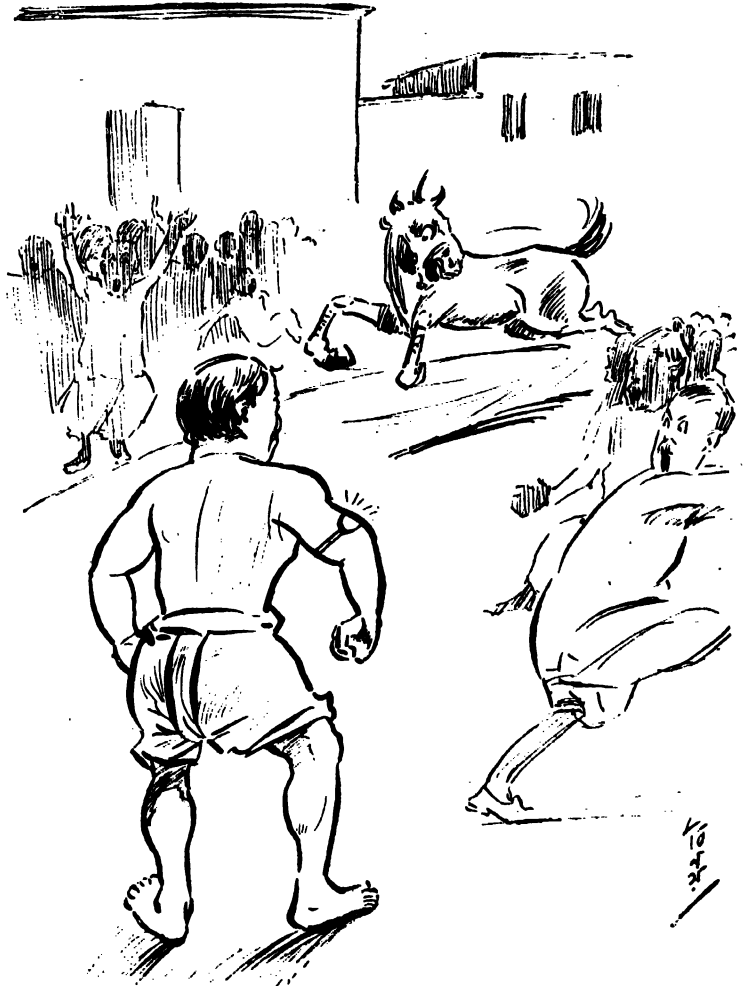
গৃহিণীর নন্দ-দাদার স্বপ্নাদ্য মাদুলীর গুণে—

"ঘোড়া ক্ষেপেছে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।"

"আর ক্ষেপবে বাছাধন ? ঠেলাটা বোঝ ।"
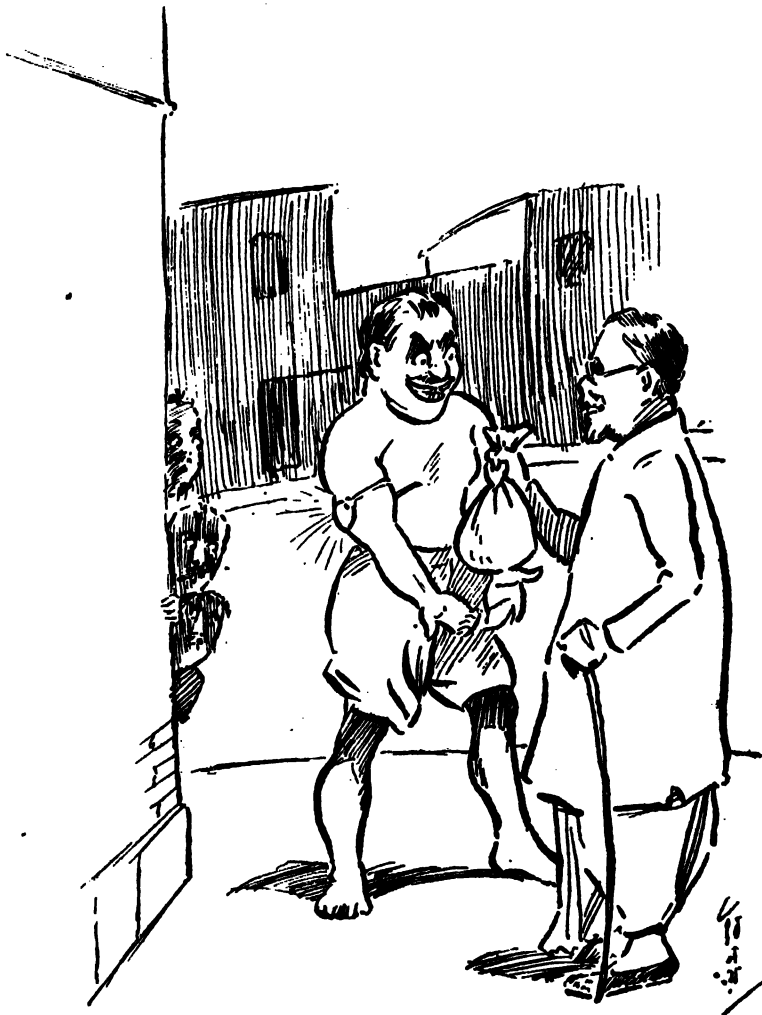
ধনী ব্যক্তি।—মশাই, আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমারই গাড়ীর ঘোড়া,—বোম্ ভেঙ্গে ক্ষেপে বেরিয়েছিল।……এই নিন্ মশাই, এই হাজার টাকার তোড়াটি——

গুণ্ডা আক্রমণ করিল।

গুণ্ডা। ওরে আমার তুমি রে! আমি ধরলুম ঘোড়া আর
তুমি নেবে টাকার তোড়া! বটে?

গৃহিণীর নন্দ-দাদার স্বপ্নাদ্য-মাদুলীর জোরে।—

"এই নাও!—তবে তোড়া নয় থোড়া!"

(গুণ্ডার অবস্থা অবলোকন করুন)

[পরে আরও আছে]

সাধন-গুরু

[স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ]

[সুবিখ্যাত নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আজীবন সাহিত্য ও নাট্যানুরাগী ছিলেন। যখন তিনি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, সমস্ত "গিরিশ-গ্রন্থাবলী" মুখস্থ বলিতে পারিতেন। অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের দূর সম্পর্কে ভাগিনেয় ছিলেন। যখন তিনি সাধারণ থিয়েটারের সংসর্গে আসেন নাই, তখন হইতেই গিরিশচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং নাট সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিতেন। ভক্তিশ্রদ্ধানত, মিষ্টভাষী, দিব্যকান্তি যুবক অমরেন্দ্রনাথকে গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট স্নেহও করিতেন।

১৩০২ সাল, শ্রাবণ মাসে অমরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করিয়া "সৌরভ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা ২। ৭ নং শোভাবাজার রাজবাটী হইতে প্রকাশ করেন। কএক সংখ্যা বাহির হইয়া পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের কএকটী কবিতা, প্রবন্ধ এবং কালোয়ার-দুহিতা নামক উপন্যাসের কিয়দংশ বাহির হয়। বহুকাল-সংগৃহীত 'সৌরভ' হইতে 'সাধন-গুরু' নামক একটী প্রবন্ধ অদ্য আমরা "সচিত্র শিশিরে" প্রকাশিত করিলাম। বলাবাহুল্য, এ পর্য্যন্ত গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে এ প্রবন্ধটী বাহির হয় নাই। বোধ হয় প্রুফ দেখিবার অসাবধানতায় প্রবন্ধটীর কএকস্থান দুর্ব্বোধ ও জটিল হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় এবং পরম স্নেহাস্পদ, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অতি যত্ন সহকারে প্রবন্ধটীর সেই স্থানগুলি সরল করিয়া দিয়াছেন।
—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।]

বৈজ্ঞানিক যখন কোন সত্য বর্ণনা করেন, তাঁহার ভাব অতি দীন, অতি সাবধানে কথা প্রয়োগ, অতি বিনীতভাবে প্রকাশ করেন যে,—উপস্থিত আমরা এইরূপ দেখিয়াছি, শ্রোতারাও সেইরূপ দেখিবেন। যথা,—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত করিলে জল হয়, আপাততঃ স্বভাবের যেরূপ অবস্থা আছে, তাহাতে উক্ত দুই বাষ্প একত্র করিলে জল হইবে। যদি কেহ সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করেন যে কোন অদৃশ্য বাষ্পের অস্তিত্ব কি সম্ভব নাই—যে বাষ্পের সহিত উক্ত বাষ্পদ্বয় মিলিত হইয়া জলরূপে পরিণত হয়? তিনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিবেন, "আছে কি-না জানি না" সলিলে এই দুই বাষ্পের প্রমাণ হয়। পরে যদি কেহ সেই অদৃশ্য বাষ্পের আবিষ্কার করিতে পারেন, আমরা তাহা স্বীকার পাইব। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে অক্সিজেন কি স্বয়ং স্বতন্ত্র পদার্থ বা অপর কোন পদার্থে মিলিত হইয়া অক্সিজেন হইয়াছে,—তাহাতেও সেই বিনীত উত্তর; বলিতে পারি না, কালে প্রকাশ পাইলেও পাইতে পারে, যে দুই বাষ্পের সংযোগে অক্সিজেন হইয়াছে; কিন্তু আপাততঃ তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এইরূপ বিনীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন, শুনিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে; সে দীনভাব নাই; যিনি পূর্ব্বে একটী বালকের অমূলক প্রশ্ন, অক্সিজেন দুইটী গ্যাস কি-না, বা হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলিয়া পরশু জল হইবে কি না সন্দিগ্ধচিত্তে সাবধানে উত্তর করেন; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, বিষয়ে আর তাঁহার সে সন্দেহ দেখা যায় না। "নেবুলি"* অর্থাৎ (অতি বাষ্পীয় জড় অবস্থা) হইতে সৃষ্টি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'ন না। কাহার পর কি জীব সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুমানেও সঙ্কুচিত ন'ন। পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে, অনায়াসেই কল্পনা করেন, যদিচ স্পষ্টাক্ষরে বলেন না, পূর্ব্বমত সকল মিথ্যা। কিন্তু তাঁহাদের প্রবন্ধ পাঠে একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহা সমুদয় অমূলক। কোন বৈজ্ঞানিক মত পাঠে একথায় প্রতীয়মান হইবে। হাক্সলি, স্পেন্সার, টিণ্ডেল, প্রক্টর প্রভৃতি সতর্কভাষায় সদর্পে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর বিষয়ে এ পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা যাহা জানিয়াছেন, সকলই ভ্রান্তি, সৃষ্টি বিষয়েও তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সকল মহাত্মার (নিউটন ফেরেডে, ডারবিন ইত্যাদির) বহু শ্রমসম্ভূত আবিষ্কার লইয়া তাঁহারা (হাক্সলি ইত্যাদি) বেদবিরোধী হন, ঐ সকল

---

* বর্ত্তমান ইহা 'নীহারিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহাত্মারা প্রায়ই ঈশ্বরবাদী, এবং সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে কিছু নিরাকরণ করিয়াছেন, এরূপ অভিমান রাখেন না। আবার যেমন সূর্য্য তাপে উত্তপ্ত বালুকাসকল সূর্য্য হইতে ক্লেশপ্রদ হয়, সেইরূপ যাঁহারা ঐ সকল সন্দিগ্ধ মত পাঠ করিয়া বেদ ও হিন্দু দর্শন বিরোধী হ'ন, তাঁহাদের বাক্য-যন্ত্রণা অতি তীব্র হইয়া উঠে। রসায়নের দুই পাত পাঠ করিয়া সদর্পে বলেন, "পঞ্চভূত কোথায়? পঁচাত্তরটী ভূত বিরাজমান,—এখনও বসিয়া দেখ, আরও কত ভূত হয়।" আরও যে কতকগুলি ভূত হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, দার্শনিকেরা কি নিমিত্ত পঞ্চভূত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা হয় না। দার্শনিকেরা রাসায়নিক নহেন, তাঁহারা রাসায়নিক পুঁথি লেখেন না। যখন পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তাহাদের অর্থ এই যে, জড়ের তিন অবস্থা—বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন—যথা ক্ষিতি অপ, মরুত। এই সকল জড়ের অবস্থানের স্থান চাই, তাহাকে ব্যোম বলেন এবং তেজ অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা গঠন হয়, ইহাই কল্পনা করিয়া থাকেন। আমরা বৈজ্ঞানিকের মতাবলম্বী হইয়া তেজকে ক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিলাম। কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, জীব ও উদ্ভিদ দেহে জড়ের এই তিন অবস্থা বিরাজমান। উক্ত দেহে পরমাণুর সংযোগ মধ্যে ব্যোম আছে, এবং ব্যোম মধ্যে উক্ত দেহ আছে, অতএব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোমে সে দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ এলিমেণ্ট (Element) যাহা ভূত নামে অনুবাদিত হয়, আবিষ্কৃত হইলেও পঞ্চভৌতিক নির্ম্মাণ বিরোধী হইতে পারে না।* দর্শন ও রসায়নে প্রভেদ না জানিয়া যেরূপ বিতণ্ডা হয়, সাধন ও অনুমানের অর্থ না জানিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধেও বিতণ্ডা। বৈজ্ঞানিকবর স্পেন্সার সাহেব বলেন, যে,—মনুষ্য ঈশ্বরকে জানিতে পারে না, ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য যাহা বলেন, তাহা সমুদায় ভ্রান্তি। একটী দৃষ্টান্ত দেন, যে—যদি ঘড়ির চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে সে যদি টিক্ টিক্ করিয়া বলিত, "আমাকে যে নির্ম্মাণ করিয়াছে—সে অতি বৃহৎ চক্রাকার; তাহার মিনিট ও ঘণ্টা নির্ণয়ক হস্তদ্বয় অতি বৃহৎ ও টিক্ টিক্ না করিয়া টক্ টক্ করিয়া চলে," তাহা কি সত্য হইত? এই দৃষ্টান্ত দিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, তাহা সাব্যস্ত করিয়া দম্ভে বলেন যে, যাক্—এ-সকল উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। "মে মাসের (১৮৯৫ খৃঃ) কনটেমপোরারি রিভিউয়ে ফগেজেরো প্রণীত একটী প্রবন্ধে স্পেন্সার সাহেবের সহিত কিছু বিরোধ দেখা যায়। ফগেজেরো সাহেব বলিতেছেন, "হয়ত দস্তা ও সাধারণ রৌপ্য নির্ম্মিত ঘড়ি, বিদ্যা-বুদ্ধির অভাবে বলিতে পারে যে, কোন সর্ব্বশক্তিমান বৃহৎ ঘড়ি, সকল ঘড়ির জনক। কিন্তু স্বর্ণ-নির্ম্মিত, হীরক খচিত ঘড়ি বলিবে যে, চক্ চক্ কর ও টক্ টক্ কর—ব্যস্। হয়তো ক্রনোমিটার ঘড়ি আসিয়া বলিবে, কারণ তাহার কল-কব্জা অতীব সুন্দর, সুতরাং তাহার বুদ্ধিও সুন্দর, ক্রনোমিটার বলিবে যে, একেবারে কখনও ঘড়ি সৃষ্টি হয় নাই। কারণ এই যে আমাতে বড় চাকাটী ও ছোট চাকাটী পৃথক ছিল, ক্রমে একত্র মিলিত করা হইয়াছে, তবে ত আমি হইয়াছি। তোমার মতে তাহার সৃষ্টির কারণ পূর্ব্বে কতকগুলি সামগ্রী ছিল, সেই সামগ্রী লইয়া কোন এক চেতন পদার্থ তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং সেই ঘড়িতে যে চৈতন্য বিরাজিত,

* আমরা দার্শনিক "ভূত" কথাটী যে অর্থে ব্যবহার করিলাম, তাহাতে কাহারও কাহারও আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, এ অর্থ স্বকপোল কল্পিত, আভিধানিক অর্থ ইহা নয়; এবং বিনা আপত্তিতে সংস্কৃত ভূতের আভিধানিক অর্থ ইংরাজী "এলিমেণ্ট" বলেন। এক ভাষার অর্থ অপর ভাষায় দিয়া তাহাকে আভিধানিক বলা সঙ্গত নয় বলিলে বড় অধিক বলা হয় না। ইংরাজী এলিমেণ্টের অর্থ—অমিশ্রিত কোন পদার্থ—যাহা বিভাগ করা যায় না, এবং কাহা হইতে নয়। কিন্তু সংস্কৃত ভূততত্ত্ব অন্যরূপ—যথা আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি এক মৌলিক ভূত হইতে পর পর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে ইংরাজেরা এলিমেণ্ট বলিবেন না। তাঁহারা বলেন, অক্সিজেন মধ্যে তড়িৎ স্রোত গমনে অক্সিজেন পরমাণু সকল এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, তাহার নাম আর অক্সিজেন থাকে না, তাকে "ওজন (Ozone)" বলে। যদি ওজন রাসায়নিক মতে এলিমেণ্ট না হয়, তাহা হইলে বায়ু, জল, তেজ, ক্ষিতি প্রভৃতি যখন এক বস্তু হইতে অপর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে এলিমেণ্ট নাম দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব যাহারা ভূত শব্দের আভিধানিক অর্থ এলিমেণ্ট বলিয়া দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের মত তাঁহাদের কাছেই সঙ্গত।

তাহা নির্ম্মাতার চৈতন্যের অংশ মাত্র। কিন্তু স্রষ্টা কিরূপ, তাহার আকার কেমন, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এখানে ফগেজেরো সাহেব নিশ্চিন্ত। যদিচ তাঁহার স্পেন্সার সাহেবের মত খণ্ডন করিবার বাসনা নাই, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কতক জানা যায়, তাহা তিনি অতি সুযুক্তি সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন; যুক্তির যতদূর বিস্তার, তাহার সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা বলেন ও স্পেন্সার ও অপরাপর সাহেবেরাও বলিয়া থাকেন, যে ঈশ্বর মনোবুদ্ধির অগম্য। তন্মধ্যে হিন্দুর বিশেষত্ব এই যে, ঈশ্বর জড় মনোবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধি তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে। শুদ্ধ মনোবুদ্ধি সাধন-সাক্ষেপ। সাধন কাহাকে বল? যাহা না জানি তাহা শিখিতে হয়, যে জানে তাহার কাছে যাইতে হয়। এখানে একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে; কেন পণ্ডশ্রম করিব? বড় বড় সাহেব বলেন, জানা যায় না; যিনি বলেন জানা যায়, তিনি প্রমাণ করিয়া দিলে, আমরা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিব। অবশ্য কোন সাহেব যখন বলিয়াছিলেন, যে বৈদ্যুতিক শক্তির স্পর্শ ব্যতীত সূচিকা সঞ্চালিত হয়, তখন আমরা ভাঁড়, এসিড ও কার্ব্বন প্রভৃতি আনিতে কোন আপত্তি করি নাই। বলি নাই যে ছুঁচ নাড়িবে, তবে এ সকল কেন? তবে যদি এখন বলেন, পুষ্প চন্দনাদি সংগ্রহ কর, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ কর, আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এই কথাগুলি উচ্চারণ কর; আমরা হাস্যসহকারে বলিব, আমাদিগকে বাতুল পাইয়াছ? কি ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিকড়ি কাণের গোড়ায় বলিলে তাহা জপ করিব, না মাটির উপর ফুল চাপাইব? এত আহম্মক নহি; তাহা অপেক্ষা এই উনবিংশতি শতাব্দীতে মরণ ভাল।

সাধন-শিক্ষক বলেন যে বাপু! কখন মিথা কথা কহিতে শুনিয়াছ? তোমার ঈশ্বর প্রাপ্তি হইলে, আমার কি কিছু লাভ হইবে? দেখ আমি কাম-কাঞ্চন ত্যাগী আমার কিছুই প্রয়োজন নাই, তোমার নিকট কিছুই চাহি না, তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত হইতেছ,তোমার দুঃখ নিবারণ হয় এই আমার বাসনা। দিবারাত্রি আমার সহিত থাকিয়া দেখ, ইচ্ছা হয় বর্ষাবধি থাক, আমার কোন অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি আছে কিনা অনুসন্ধান কর,—তোমায় ঠকাইতে চাই কিনা দেখ,—অমনি মনে মনে আন্দোলন করিব, আশ্চর্য্য করিয়াছে, সত্য এ ব্যক্তি সত্যবাদী বটে, কাঞ্চনত্যাগী, কেননা কাঞ্চন স্পর্শে ইহার শ্বাসরোধ হইয়া যায় দেখিয়াছি। অতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেও কোন ছল ধরিতে পারে নাই। কামিনীকটাক্ষ অন্তরে বিদ্ধ হয় না, বালকের ন্যায় সকলকেই মাতৃসম্বোধন করে, একি মিথ্যাকথা কহিতেছে? না, উহার ভ্রম হইয়াছে; অতি সরল প্রকৃতি বটে, কিন্তু ভ্রম, ভ্রম, বিদ্যাহীন বিজ্ঞান পাঠ করে নাই, সুতরাং অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ। সাধনগুণ আবার অতি দীনভাবে বলিতে লাগিল তুমি মনে মনে এই সকল কথা আন্দোলন করিতেছ, আমার ভ্রম নয় বাপু! আমার ভ্রম নয়। এখনও সেই জগৎ-ব্রহ্মময়ী মাতাকে আমি সম্মুখে দেখিতেছি, ঊর্দ্ধ, অধো মধ্যে—পূর্ণ দেখিতেছি, আমার বড় সাধ তোমায় দেখাই, আমার কথা শুন, যাহাতে দেখিতে পাও, তাহার উপায় কর,—বলিতে বলিতে অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল।

কি আশ্চর্য্য, আমার মনোভাব কিরূপে জানিল; এ ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, অনুমানে ধরিয়াছে। ভাল, আমার জন্য কাঁদে কেন? অশ্রুধারার আবার রকম আছে, আমাদের অশ্রু নাসিকার পাশ দিয়া বহে, ইহার অশ্রু চক্ষুর অপর পার্শ্ব দিয়া পড়িতেছে, ইহার কারণ কি? আমার ভালর নিমিত্ত ইহার এত গরজ কেন? যাহা হউক, দেখা যাক্ ঈশ্বর দেখিয়াছি, বলিতেছে, একটা প্রশ্ন করিলেই বিদ্যাবুদ্ধি বোঝা যাইবে, দেখা যাক্। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাক, যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সৃষ্টি কিরূপ হইয়াছে, অবশ্যই বলিতে পারিবেন। ভাল, যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, বলুন দেখি, সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে? সুচতুর বৈজ্ঞানিক মনে মনে ভাবিতেছেন—কেমন প্রশ্ন করিয়াছি, একেবারে নীরব। এ মূর্খ কোথা হইতে জানিবে, যে বিকাশই সৃষ্টির কারণ। গুগলি, সামুক, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, জন্তু, বানর ক্রম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য হইয়াছে, তাহা কি উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা? বিসমেল্লায় গলদ, সৃষ্টি কেহ করে নাই, অতি ক্ষুদ্র চেতনাধার হইতে জীব সৃষ্টি হইয়াছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন, তবে আর তাহার

অন্যথা কি? কুভিয়ার লামার্ক (Couvier Lamork) যাহা পেন্সিলে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ডারউইন (Darwin) সাহেব বিংশতি বৎসর পরিশ্রম সহকারে চিত্র করিয়া সংশয় দূর করিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন না, যে কোটী কোটী বাইবেল-বিরোধী মত স্থাপিত হইলেও হিন্দুদর্শনে আঘাত লাগিবে না।

ভূগর্ভে সময়ে প্রস্তরিকৃত বাদুড়ের অস্থি প্রথমেই হউক কিম্বা পরেই হউক, স্থলজীব মধ্য সময়েই হউক, কিম্বা শেষেই হউক, জলজীব প্রথমেই হউক, মধ্যেই হউক, শেষেই হউক, ভূগর্ভ খননে বৈজ্ঞানিক যাহাই নিরূপণ করুন, হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী হন না। সঙ্কোচ ও বিকাশ যাহাই প্রচলিত মত হউক, বাইবেল খণ্ডন করিতে পারিলে পারিতে পারেন, কিন্তু বেদমূলক হিন্দুদর্শন অখণ্ডনীয়। অতি বাষ্পীয় সৃষ্টিমতে অত্যুপ্ত পৃথিবী ধূমপুঞ্জ বিনির্গত করিয়া মেঘ সৃষ্টি করিয়াছিল —(যেরূপ এক্ষণে শনিগ্রহ করিতেছে), এবং ঐ প্রচুর ধূমপুঞ্জ মেঘে পরিণত হইয়া অনবরত বারিধারা বর্ষণ পূর্ব্বক (যেমন এক্ষণে বৃহস্পতিতে হইতেছে), বারিধারা বরিষণে পৃথিবী জলময়ী হইয়াছিলেন, মহাপ্রলয়ে যেরূপ বর্ণিত কালের সৃষ্টি (অহং বহুস্যামি), এক প্রবল ইচ্ছা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টি করিতেছে। বিকাশবাদীরা বিকাশ হইয়াছে, সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু কি শক্তি দ্বারা পরমাণু হইতে জগৎ বিকাশ হইয়াছে, কি শক্তিদ্বারা পরমাণুতে বিকাশ শক্তি নিহিত, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই। হিকেল সাহেব জগতে চৈতন্য দ্বারা দৃষ্টি করেন না। ডারউইন সাহেব বিকাশ মতের নেতা হইয়াও ঈশ্বরবাদী ছিলেন। ডারউইনের ঈশ্বরবাদের বিরোধী হইয়া হিকেল সাহেব জড় পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ-শক্তি দ্বারা বিকাশ-কার্য্য সম্পাদন করেন, কিন্তু কি শক্তি এই সংযোগ বিয়োগ-শক্তির মূল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কেবল একজাতীয় বাষ্পের অপর জাতীয় বাষ্পের সহিত আসক্তি ও বিরক্তি ইহার কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু অজ্ঞাত কোন গতির হাত কোন কৌশলে এড়াইতে পারেন না। উপরোক্ত পণ্ডিতবর ফগেজেরো সাহেব অতি সুযুক্তি সহকারে বলিতেছেন, "শক্তি কল্পিত হউক না কেন, যথা স্বভাব-সম্ভূত নির্ব্বাচন (Natural Selection) * আসক্তি-সম্ভূত নির্ব্বাচন (Sexual Selection),+ তাহাতে কোন অজানিত শক্তি সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। অতএব যিনি বলেন যে একমাত্র শক্তি জগতের সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, ঐ শক্তির দ্বারাই অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হইতেছে, ক্রমে উন্নতির দিকে ধাইতেছে, মানব চৈতন্যে তাহা দৃষ্ট হইতেছে, সে শক্তি অচেতন কল্পনা করা তাঁহার নিজমত নিজে খণ্ডন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কারণ, দিন দিন উন্নতি সাধন কিরূপে করিবে? দশটা ভাঙ্গিয়া গড়িতেছে, কিন্তু দশটাই ভাঙ্গুক, আর লক্ষ কোটাই ভাঙ্গুক, ভাঙ্গিয়া ক্রমে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিতেছে। যদি তুমি বিকাশ-শক্তিতে ঈশ্বর না দেখিয়া থাক, যে অজানিত শক্তি, বিকাশ-শক্তিতে যোগ প্রদানে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা চেতন নয় বলিতে পার না।" "অহং বহুস্যামি" এ ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতে পার না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বতে এইরূপ হউক, এদিকে সাধন-গুরু অচেতন, কাষ্ঠবৎ সংজ্ঞাহীন, চক্ষু স্পন্দহীন, মুখমণ্ডলে এক বিচিত্রভাবাপন্ন জ্যোতি নির্গত হইতেছে; একি মৃত না কি? না না, ক্রমে ক্রমে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখি। এই যে চৈতন্য হইয়াছে, কিছু না, "মূর্চ্ছাগত বাই আছে,"—মহাশয়, অমন অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন কেন? সাধন-গুরুর উত্তর, সৃষ্টির

* স্বভাব-সম্ভূত নির্ব্বাচন যে সকল জীব স্বাভাবিক অবস্থার উপযোগী, সেই সকল জীবই জীবিত থাকে, এই নিমিত্ত বলিষ্ঠের অবস্থান ও দুর্ব্বলের পতন ক্রিয়া স্বভাব-সম্ভূত নির্ব্বাচন' বলিয়া, ডারউইন সাহেব নির্ণয় করেন।

+ আসক্তি-সম্ভূত নির্ব্বাচন দেখিতে পাওয়া যায়, পশু পরস্পর পরস্পরের স্বর-সৌন্দর্য্যে ও রূপ-সৌন্দর্য্যে আকর্ষিত হয়; এই আকর্ষণ-সম্ভূত উৎপত্তিকে ডারউইন সাহেব আসক্তি-সম্ভূত নির্ব্বাচন নির্ণয় করেন।

প্রকরণ জিজ্ঞাসা করায় আমি ব্রহ্মযোনি দর্শনে অভিভূত হইয়াছিলাম, দেখিলাম :—

"এক রূপ অরূপ নাম বরণ
অতীত আগামী কালহীন
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতিনেতি বিরাম যথায়,
তথা হ'তে বহে কারণ ধারা—
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজরা
গরজি গরজি উঠে তার বারি
অহং অহং ইতি সর্ব্বক্ষণ ॥

কোটী চন্দ্র, কোটী তপন,
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক জ্যোতি মগন ॥
তাহে বহে কত জড়-জীব প্রাণ
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ—
সেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥" *

* এই বেদান্ত-গীতটী স্বামী-বিবেকানন্দ বিরচিত। রাগিনী খাম্বাজ—চৌতালে গেয়।

দু'মিনিট

[সব্‌জান্তা]

নব বিবাহিত তরুণ অধ্যাপক দস্তুর সাঁঝের বেলায় জানালার পাশে বসে গাইছিলেন "ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে এমনি সময় আমার প্রিয়া যেত ছোট কলসীটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।" তারপরই আবার গাইতে লাগলেন—

"ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে তটিনীর
শ্যামল কুলে
দিয়েছি সে স্বর্ণ লতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে ;

পাশের কামরা হতে তরুণী অধ্যাপক পত্নী প্রিয়তমের বিরহ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে অধ্যাপক সাহেবকে বল্লেন "অত বিরহ কিসের শুনি ? তোমার সে স্বর্ণ লতাটির পরিচয় জানতে পারি কি ? ছিঃ ছিঃ পুরুষ জাতটা বড়ই নিমকহারাম।—বিশ্বাস করতে নেই কখনও।" দস্তুর সাহেবের গান একেবারে দমে গেল। মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য, ফেঁকসা হয়ে গেল ; আমতা আমতা করে বল্লেন "কৈ শুধু ত গানই গাইছি। বিরহ আবার কি।" স্ত্রী বল্লেন—"বিরহ নয় যদি, তবে যে বলা হচ্ছে, ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে" অধ্যাপক হেসে বল্লেন - দিয়েছি সে স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে! এই না ? তা— সে আমার প্রিয়া নয়, কবির প্রিয়া! যিনি গান বেঁধেছেন।" স্ত্রী বল্লেন—"তা হোক, ও গান গাইতে হবে না।" অধ্যাপক থ। একটু পরে বল্লেন—গানও গাইতে দেবে না শেষে! কি ঝকমারি করেছি বাবা! বিয়ে না ত—একেবারে দাসখৎ দেখছি।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

একাদশ পরিচ্ছেদ

হীরা নহে পোখরাজ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত শিখরবাবু চা পান করিতে করিতে নিকটোপবিষ্ট সন্ত্রাসিত অখিলবাবুকে কিঞ্চিৎ গৌরবান্বিত কণ্ঠে কহিলেন, 'আমাদের বহু পুরাতন বংশে কতকগুলা কুলপ্রথা আছে; সেগুলা অবশ্য কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যখনই আমরা সে গুলাকে ভাঙবার চেষ্টা করেছি তখনই একটা না একটা অমঙ্গল ঘটেছে। কাজেই প্রাণের দায়ে, সেই কুলপ্রথা গুলা নিতান্ত কুসংস্কার হ'লেও মেনে চলতে হয়।'

অখিলবাবু এই কুলপ্রথার উল্লেখে মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইলে মুখে সেই কন্যাদায়গ্রস্তের কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'অবশ্য, অবশ্য, কুলপ্রথা ত মেনে চলতেই হবে! শুভকার্য্যে একটা অমঙ্গল হওয়া ভাল নয়।'

শিখরবাবু চাপান সমাধা করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। বরযাত্রীদিগের সহিত আগত, সমীপবর্ত্তী অন্য একটী প্রবীণ ব্যক্তি, অখিলবাবুর সহিত গম্ভীরস্বরে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'আমাদের মতে কুলপ্রথা শাস্ত্রের আদেশের চেয়ে বড়। আমাদের শিখরবাবু, যে পূজনীয় পিতৃপিতামহদের বিষয় ভোগ করছেন, আজ তাঁরা স্বর্গস্থ বলে তাদের প্রচলিত প্রথা কোন মতেই অমান্য করতে পারেন না।'

অখিলবাবু আরও বেশী আশঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'আর তা' করা উচিতও নয়।'

প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন; হাজার হ'ক হাকিম ত! শিখর বাবুদের কুলপ্রথা হচ্ছে এই যে, তাঁর ছেলের বিয়েতে আপনি যা যা যৌতুক দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন, তা' সমস্তই এই বিবাহের পূর্ব্বে, এই আসরে নিয়ে এসে, বরের বাপকে অর্থাৎ শিখরবাবুকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর শিখরবাবুর বাড়ী থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্বে যে যে সামগ্রী এসেছিল, তা' সকলই কন্যাকে দেওয়া হয়েছিল; তা' সমস্তই কন্যারই জিনিষ মনে করে, তা কন্যারই সঙ্গে ফেরত দিতে হ'বে।

অখিলবাবু কহিলেন, 'তা'ত দিতেই হ'বে। তা'ত সকলেই জানে।'

শিখরবাবু বলিলেন, 'শুধু ফেরত দেওয়া নয়। গিন্নী বলে দিয়েছেন, যেন একখানি খুরী পর্য্যন্ত ভুল না হয়। আবার খুরী ভুল হ'লে, বেয়াই-এর নেজ কেটে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন।' এই বলিয়া শিখরবাবু হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন!

কথিত আছে, বরের বাপের সাতখুন মাপ। তাই শিখরবাবুর কদর্য্য রসিকতা শুনিয়া, নিকটস্থ সকলে, তাঁহার হাসির সহিত হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। অখিলবাবুও সেই হাস্যাভিনয়ে সভয়ে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন।

হাসিতে হাসিতে প্রবীণব্যক্তি ঘোষণা করিলেন, 'তাহলে অখিলবাবু, আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করে গাত্রোত্থান করুন, নগদ পাঁচহাজার টাকা, আর কন্যাভরণ বরাভরণ প্রভৃতি যা' যা' দেবার কথা আছে, এইখানে নিয়ে আসুন।'

অখিলবাবু বহির্বাটীতেই তাঁহার ক্যাসবাক্সের মধ্যে, হাজার টাকার পাঁচখানি নোট আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ শিখরবাবুকে আনিয়া দিলেন।

শিখরবাবু তাহা প্রবীণ ব্যক্তির হস্তে দিলেন।

প্রবীণ ব্যক্তি তাহা গণিয়া এবং নম্বর মিলাইয়া, এবং আলোকের সম্মুখে ধরিয়া তাহার জললেখা পরীক্ষা করিলেন; এবং আবার পরীক্ষা করিয়া, আবার নম্বর মিলাইয়া ও আবার গণিয়া তাহা শিখরবাবুকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

অখিলবাবু যখন টাকা আনিবার জন্ম বহির্বাটীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন শিখরবাবু একটী ক্যাসবাক্স আনাইয়া নিজের পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন। এখন বাক্সটি খুলিয়া, নোট কয়খানি আবার গণিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিলেন; এবং বাক্সটি আবার চাবি বন্ধ করিলেন, এবং উহার ডালা টানিয়া দেখিলেন যে, উহা প্রকৃত চাবি বন্ধ হইয়াছে কি-না?

প্রবীণ ব্যক্তি বাক্সের ডালা আবার একবার পরীক্ষা করিয়া, অখিলবাবুকে বলিলেন, 'এইবার কন্যার গহনা গুলা আর বরাভরণ নিয়ে আসুন। আর রূপার দান সামগ্রী কটা।'

অখিলবাবু পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবার সহজেই বুদ্ধিমতী প্রমদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি সস্নেহে পত্নীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, 'দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

প্রমদা ব্যস্ততা সহকারে, স্বামীধৃত হস্তখানি ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, 'এখন আমার একটুও অবকাশ নেই; এখন আমি দাঁড়াতে পারব না; এখন আমি ঈশানীকে গহনা পরাতে যাচ্ছি। আর একটু বাদে এস, তোমার কি কথা আছে শুনবো।' এই বলিয়া, প্রমদা সত্বর প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

অখিলবাবু পলায়নমানা প্রমদার অঞ্চল ধরিলেন।

প্রমদা প্রবল বেগে অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া, এবং স্বামীর দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'ছি, ছি! বুড়ো বয়সে লজ্জাও করে না। চারি দিকে লোক ঘুরছে, আর তাদের চোখও আছে। আমার আঁচল ধরে টানাটানি করছো, তারা দেখলে কি বলবে, বল দেখি?'

অখিল বাবুর এখনও ঠিক বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু তিনি বৃদ্ধেরই ন্যায় কণ্ঠস্বরে বলিলেন, 'বলুক গে। এখন মেয়েকে গহনা পরানো হ'বে না। গহনাগুলা সব, আর মেয়ের গায়ে যা' আছে তা'ও খুলে, আমার হাতে দাও।'

প্রমদা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি স্বামীর দিকে আরক্ত ও ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ওমা, মেয়ের গা থেকে গহনা খুলে নেব কি! কি অলক্ষুণে কথা! আজ এই শুভদিনে, কোন্ মুখে, তুমি এমন কথা মুখে দিয়ে বার করলে?'

আরও তীব্র ভৎর্সনার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া অখিল বাবু বলিলেন, রাগ করনা; আমি ইচ্ছে করে, মেয়ের গহনা খুলে নিতে বলিনি। বেয়াই মশায়, দেখতে চাচ্ছেন; তাই নিতে এসেছি। বিয়ের আগে গহনা গুলা দেখে নেওয়াই নাকি তাঁদের কুলপ্রথা।

জলৌকার বদনে সৈন্ধব পতিত হইলে, সে যেমন রক্ত-শোষণ কার্য্যে বিরত হয়, বুদ্ধিমতী প্রমদা, সভার ঔজ্জ্বল্য-বিধায়ক বৈবাহিকের নাম শুনিয়া, তেমনই শঙ্কিত স্বামীকে ভৎর্সনা করিতে সহসা বিরতা হইলেন; তাঁহার মন এক-বারে কচুর মত নরম হইয়া গেল। তিনি মধুর স্বরে কহিলেন, 'বেয়াই দেখতে চাচ্ছেন? একথা আগে বল্লেইত হ'ত; গহনা গুলা এনে দিতাম। তুমি একটুখানি এই খানে দাঁড়াও; আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।'

অখিল বাবু কহিলেন, 'অম্নি, ওই সঙ্গে বরের ঘড়ী, চেন আংটী, চশমা, বোতাম নিয়ে এস। তাও শিখর বাবুকে দেখাতে হবে। একটু শীগ্‌গির এস; ঐ সব জিনিষ না পেলে, বরকে বিয়ের জায়গায় যেতে দেওয়া তাঁদের কুলপ্রথা নয়।'

বুদ্ধিমতী প্রমদা অঞ্চল বিলম্বিত গুঞ্জিকাগুচ্ছ দোলাইয়া, এবং তাহার সহিত কোন গুরুভার অঙ্গ দোলাইয়া, চঞ্চল পদে, স্বামীর—থুড়ি—বৈবাহিক মহাশয়ের আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলেন; এবং ক্ষণকাল মধ্যে অলঙ্কার সকল ক্ষুদ্র পেটক মধ্যে বন্ধ করিয়া অখিল বাবুকে আনিয়া দিলেন; এবং অলঙ্কারের বাক্সের চাবিটিও তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, 'দেখ, চাবিটা যেন হারিয়ে ফেল না।'

অখিলবাবু বলিলেন, 'না, হারিয়ে ফেলব না। রূপার

দান সামগ্রীগুলাও দেখাতে হবে। তুমি সে গুলা গুছিয়ে রেখ। আমি গহনা গুলা দিয়ে এসে, সেগুলা নিয়ে যাব।'

এই বলিয়া অলঙ্কার লইয়া, অখিল বাবু সত্বর পদে, ধূমপানরত, আসরসমাসীন উপাধান-রক্ষিত-পৃষ্ঠভার বৈবাহিকের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শিখর বাবু ধূমপানে, ক্ষণকালের জন্য বিরত হইয়া, অলঙ্কারের পেটকটি আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং প্রাপ্ত চাবিদ্বারা উহা উদ্ঘাটিত করিয়া, অলঙ্কার সকল একে একে বাহির করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ ব্যক্তির হস্তে দিলেন।

প্রবীণ ব্যক্তি, একটী ফর্দ্দ, একটি তুলাদণ্ড ও একটি নিকষ প্রস্তর বাহির করিয়া, অলঙ্কারগুলি প্রথমে ফর্দ্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন; পরে সেগুলি একে একে ওজন করিয়া, ও নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। এবং ফর্দ্দ অপেক্ষা কয়েক তোলা স্বর্ণ অধিক আছে জানিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

শিখর বাবুর অন্তঃকরণ আকাশের ন্যায় উদার; তিনি অলঙ্কারগুলি আপন পেটকমধ্যে তুলিয়া রাখিলেন না; তাহা সমস্তই অখিল বাবুকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, 'যান এ গুলা মেয়েকে পরিয়ে দিতে বলে আসুন। আমরা ততক্ষণ বরের জিনিষ গুলা বরের পছন্দসই হ'ল কিনা দেখি।'

অখিল বাবু কন্যার অলঙ্কারগুলি দিবার জন্য, এবং রৌপ্যের দানসামগ্রী আনিবার জন্য বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রবীণ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বরের অলঙ্কার গুলি লইয়া বরের কাছে গেলেন।

বর অভিজাত কুলোদ্ভব! গৌরবের সহিত আভরণগুলির প্রতি একবার মাত্র নেত্রপাত করিয়া কহিল, 'বেশ হয়েছে।'

প্রবীণ ব্যক্তি প্রবীণতার সহিত বলিলেন, 'সব তোমার মনোমত হ'য়েছে?'

বর আবার আভরণ সকলের উপর তাহার অভিজাত কুলসম্ভব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কহিল, 'দেখি, দেখি, আংটীটা দেখি।'

প্রবীণ ব্যক্তি আংটীটি বরের হস্তে প্রদান করিলেন।

বর তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওটাত হীরে নয়,—পোখরাজ। পোখরাজের আংটী আমি পরতে পারব না।'

দ্বাদশ পরিচ্ছে

বুদ্ধিমতী প্রমদার বুদ্ধি।

প্রবীণ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত শিখর বাবুর নিকট যাইয়া কহিলেন, 'শরতকুমার বাবাজী বলছিল যে পোখরাজের আংটী সে পরতে পারবে না।'

শুনিয়া শ্রীযুক্ত শিখর বাবু ভয়চকিত অখিল বাবুর দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'পোখরাজ? হীরের আংটীই ত দেবার কথা ছিল।'

মান্য বৈবাহিকের সেই বিস্ফারিত দৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, অখিল বাবু নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন, 'পোখরাজ কি জানিনে, মশাই। আমি ত হীরের আংটীই কলকাতা থেকে আনিয়েছি। পরম চাঁদ গণেশীলালের দোকানের ছাপান রসিদ আমার কাছে আছে।'

শ্রীযুক্ত শিখর বাবু হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'মশাই ঠকেছেন। হীরের আংটী বলে রসিদ দিয়ে কেউ বুঝি পোখরাজের আংটী দিতে পারে না?—কলকাতায় এমন অনেক জোচ্চোর দোকানদার আছে। আমার ছেলের ভুল হ'তে পারে না; ও ছেলে বেলা থেকে অনেক হীরে মুক্তো নাড়াচাড়া করেছে;—হীরে কাকে বলে তা' ও খুব জানে। ও যখন বলছে, তখন ওটা পোখরাজই বটে।'

অখিল বাবু কাতর হইয়া বলিলেন, 'তা'ত বটে। কিন্তু এখন উপায়? বরিশালে ত হীরের আংটী কিনতে পাওয়া যাবে না।'

শিখর বাবু বলিলেন, 'না, এখানে পাওয়া না। কিন্তু ঢাকায় পাওয়া যাবে।'

অখিল বাবু কহিলেন, 'কিন্তু তাত এই রাত্রের মধ্যে হয় না।'

শিখর বাবু আশ্বাস দিয়া দিয়া বলিলেন, এর জন্যে আপনি একটুও ভাববেন না। আপনি এক কাজ করুন, তাহলেই সকল গোল মিটে যাবে।'

অখিল বাবু কতকটা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কাজ করবো ?'

শিখর বাবু বলিলেন, 'আপনি ঐ আংটীটা আপনার কাছে রেখে দিন ; এর পরে, বিয়ের হাঙ্গামা চুকে গেলে, সেই জোচ্চোর ব্যাটাকে ফেরত দিয়ে, দাম আদায় করলেই চলবে। এখন, আংটী কেনবার জন্যে ফর্দ্দে যে চারশ' টাকা ধরা ছিল, সেই টাকাটা আমাদের নগদ দিন। ঢাকায় ফেরত গিয়ে শরত নিজের পছন্দ মত, একটা হীরের আংটী কিনে নেবে।'

অখিল বাবু বলিতে বাধ্য হইলেন, 'তাই ভাল।'

এক মহালজ্জা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অখিলবাবু নগদ টাকা দিতে রাজি হইলেন বটে, কিন্তু সেই রাত্রে, কোথা হইতে নগদ চারিশত টাকা সংগ্রহ করিবেন ? নগদ পঞ্চসহস্র মুদ্রা বৈবাহিককে পণস্বরূপ প্রদান করায়, এবং অলঙ্কারাদির মূল্য নগদ পরিশোধ করায়, এবং কোনও কোনও উৎসব দ্রব্য নগদ খরিদ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার ক্যাস বাক্সে অল্প অর্থ মাত্র অবশিষ্ট ছিল ! যদি গাত্র হরিদ্রা উপলক্ষে তাঁহার প্রায় সার্দ্ধ একশত মুদ্রা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে না হইত, তাহা হইলে, তিনি দেয় চারি শত টাকা অন্ততঃ কতকাংশ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন ত আর ঐ সকল ব্যয় ফিরাইয়া লইবার উপায় ছিল না। এখন তিনি কি করিবেন ? কিরূপে নূতন কুটম্বের কাছে মান ইজ্জৎ বজায় রাখিবেন ? তাহার পর টাকা না পাইলে, যদি বরপক্ষরা, কুলপ্রথার আজুহতে, বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হ'ন ! তাঁহার অন্তরমধ্যে ভয় এবং ভাবনা তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাটীর মধ্যে বুদ্ধিমতী পত্নী প্রমদার নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে করিলেন, প্রেমময়ী ও তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী পত্নী, এই বিপদে তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন ; এবং নিকটে অর্থ থাকিলে তাঁহাকে অর্থ তিনি সাহায্যও করিবেন।—মরুভূমি তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেমন বিটপছায়া সমাকুল বিমল বারিপূর্ণ বিপুল বাপী দেখিয়া, পিপাসা নিবারণার্থ, এবং শীতল ছায়ার আশ্রয় লাভ করিবার জন্য, তাহার নিকট ছুটিয়া আসে, অখিলবাবু তেমনই উপদেশ ও সাহায্য পাইবার জন্য বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী পত্নীর নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু পাইয়াছিলেন কি ? হায় হায়, তিনি ত জানিতেন না যে, প্রেমময়ী প্রমদার প্রেম, পিপাসিতের পানীয়ও নহে, তপন-তপ্তের শীতল ছায়াও নহে। তাহা বিকৃত মস্তিষ্ক পিপাসিতের ভ্রান্তিপ্রণোদিতা তপ্তা মরীচিকা মাত্র।

প্রমদার হাতে অর্থ ছিল ; কিন্তু প্রমদা বুদ্ধিমতী। দুই একজন নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক স্বামীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপন সঞ্চিত স্ত্রীধন ব্যয় করিলেও, বুদ্ধিমতী রমণীরা স্বামীর জন্য, আপনাদের সংগৃহীত অর্থ কখনও কিছু ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। বরং শুনিয়াছি যে, যদি কোন বুদ্ধিহীনা নারী স্বামীর দুঃখে কাতর হইয়া আপনাদের গুপ্তধন বাহির করিয়া দেন, মহা বুদ্ধিশালিনী পতিব্রতাগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া বোকা আখ্যা দিয়া থাকেন। বুদ্ধিশালিনীগণ বিচার করিয়া কহিয়া থাকেন, হ্যাঁগা যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের মধ্যে কে সধবা থাকিতে পারে ? বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিদিগের প্রতি শাস্ত্রকারদিগের অযথা অত্যাচারে, অবলাগণ বয়োজ্যেষ্ঠগণকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হয় ; বিধাতার নিয়মে বুড়োরা ত আগে মরিবেই। পাপিষ্ঠ ভর্ত্তারা কেবল মাত্র মরিয়াই পরিবার প্রতিপালনের দায় হইতে চিরকালের জন্য উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তখনও আমাদের উদর থাকে ; এবং সে উদরে বিলক্ষণ ক্ষুধাও থাকে। তখন অসহ্য বিরহ জ্বালার উপর, আমাদের উদরের জ্বালা নিবারণ করিবে কে ? সেই দুর্দ্দিনের জন্য, যে পাপিষ্ঠা কামিনীগণ পূর্ব্ব হইতে 'বিধবার পুঁজি' গুছাইয়া না রাখে, তাহাদের হয় বিধবা বিয়ের মতলব আছে নয় তাহারা বোকা !

প্রমদা বোকা নহে ; মহা বুদ্ধিমতী। সে স্বামীর নিকট হইতেই সংগৃহীত আপন অর্থ, বিপদগ্রস্ত স্বামীকে দিল না। সব শুনিয়া সে বুদ্ধিমতীরই মত উত্তর দিল, 'আমি কি করবো ? অমন জোচ্চোরের কাছ থেকে আংটী কিনতে গিছলে কেন ? বোকামীর যা' সাজা, তা, তুমি ভোগ করবে না-ত আমি করবো নাকি ? এখন সর, আমার বাপের বাড়ী থেকে আইবুড় ভাত নিয়ে লোক এসেছে, আমি তাদের খাওয়াতে যাচ্ছি ; আমার তোমার সঙ্গে বড় বড় করে বকবার সময় নেই।'

(ক্রমশঃ)

রূপ-হীনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৩)

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বেন্নুকে 'মহাভারতের' গল্প শুনাইয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। মা কখন নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা জানিতেও পারি নাই। বেন্নুর কলকণ্ঠস্বরে নিদ্রাভঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখি নির্ম্মল নীলাকাশে প্রভাতের প্রথম আলোকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী, সদ্য জাগ্রত ধরণী মৃদুস্বরা তটিনী স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত। গগনে, পবনে, জলে-স্থলে একটা স্নিগ্ধশান্তি যেন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। নব শোভায় শোভমান নবীন আলোকে উদ্ভাসিত বিশ্ব নির্ব্বাক মুগ্ধ দৃষ্টিদ্বারা আজিকার হাসিভরা মধুর প্রভাতটিকে যেন বরণ করিয়া লইতেছে।

মা ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া স্নানে যাইতেছিলেন, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তোর কি অসুখ করেছে, কনক, মুখখানা শুক্‌নো শুক্‌নো দেখচি! আমি দোরটা ভেজিয়ে রেখেছিলাম; বেন্নু বুঝি তোকে ডেকে তুলেছে?"

মা'র উদ্বেগে লজ্জিত হইয়া কহিলাম, "অসুখ হয়নি, মা; আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমায় না ডেকে তুমি এত কাজ সেরেছ কেন?"

"তাতে কি হয়েছে, কনক? সব কাজ তো তুই-ই রোজ করিস্। আমি না হয় একদিন করলুম। তুই 'না' কর্‌ছিস, আমার মনে হচ্ছে তোর বুঝি অসুখই করেছে।" বলিতে বলিতে মা আমার শরীরের উত্তাপ হস্তদ্বারা পরীক্ষা করিলেন। গোয়ালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাবা মঙ্গলা গাভীটিকে আদর করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। মার ব্যাকুলতায় ঘাড় ফিরাইয়া কহিলেন, "কনকের গা গরম হ'য়েছে নাকি? সাম্‌নে বর্ষা আসছে, এখন জ্বর হওয়াটা ভাল নয়! আয় দেখি কনক, কাছে আয়।"

বেন্নু এক সাজি বকুল ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে বসিয়াছিল। মালা ফেলিয়া সে দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া অপরাধীর মত ম্লানমুখে বলিল, তোমার অসুখ করেছে, দিদি, আমায় তো তা বলনি; বল্লে কি আমি তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিই!" বাবা ও মার স্নেহসেচনে, ছোট বোনটির প্রীতিপ্রবাহে হৃদয় আমার অভিসিক্ত হইল। যিনি এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ প্রভাতটিকে আমাদের দ্বারে পাঠাইয়া দিয়াছেন, বাবার অন্তরে স্নেহ, মার অন্তরে ভালবাসা দিয়াছেন, সেই করুণাময় ভগবানকে মনে মনে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমি মুখ ধুইয়া বাসি কাপড় কাচিয়া পূজার ঘরে মার শিবপূজার ফুল বেলপাতা সাজাইতে ছিলাম, এমন সময়ে একটী প্রবীণব্যক্তি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া বাবাকে ডাকিলেন, "দয়াল বাড়ী আছ?" বাবা বারান্দায় বসিয়া কিসের একটা হিসাব লিখিতেছিলেন। সসব্যস্তে উঠিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, কে, চৌধুরী মশায়, আসুন; বেন্নু কোথায় রে, চৌধুরী মশাইকে বসতে মোড়াটা দিয়ে যা।"

বেন্নু চৌদলের সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাহার নাড়ুগোপালকে মালা পরাইতেছিল। আরব্ধ কাজ হইতে মুখ না তুলিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, আমার গোপালকে মালাটা যে পরানো হ'লো না, দিদি! তুমি গিয়ে মোড়াটা দিয়ে এসো না লক্ষ্মী। আমি ততক্ষণ মালাটা পরিয়ে রাখি।"

বলিলাম,"এসেই মালা পরিয়ো, বাবা যে তোমাকেই

ডাকছেন, বেন্থু ; কোথাকার কে এল, আমি এখন বার হই কেমন করে বল ? যাও উঠে যাও।"

"কোথাকার কে আবার, দিদি মাঝের পাড়ার চৌধুরী মশাই এসেছেন, তা কি দেখতে পাচ্ছ না ? কাল যে চৌধুরী ঠাকরুণের শ্রাদ্ধ, তাই আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। তুমিই বসতে দিয়ে এসো, দিদি ; আমি এখন যেতে পারবো না।"

বেন্থুর কথায় এতক্ষণে চৌধুরী মহাশয়ের আগমনের কারণটা বুঝিতে পারিলাম। চৌধুরী মহাশয় আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রধান দলপতি ; তাঁহার অঙ্গুলি হেলনে সমাজের ছোট বড় নানাবিধ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। তিনি যাহাকে উর্দ্ধে তুলেন, শত ত্রুটী শত ছিদ্র থাকা সত্ত্বেও গ্রামবাসী কেহ তাহাকে নির্ব্বাসন দিতে সাহসী হয় না। আবার যাহারা তাঁহার বিরাগের পাত্র তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও কাহারো নাই। তিনি শুধু দলপতি নয়, মহাজনও বটে ; বিপন্নের হাজার টাকার সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অধিক সুদে দুই একশত টাকা ধার দিতে তিনি যেমন অগ্রগণ্য, আবার সুদের সুদ কষিয়া লোকের ভিটামাটি উৎসন্ন করিতে তাঁহার মত মানুষ অতি বিরল। তিনি গ্রামের সাধারণের হৃদয়ে ভক্তির আসন না পাতিয়া ভয়ের আসনটাই অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাই তাঁহার অকস্মাৎ আগমনে আমি একটা অজানা আতঙ্কে ভীত হইয়াছিলাম। কারণটি জানিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

ত্রস্তে, বেতের মোড়াটা বারান্দায় রাখিয়া সরিয়া আসিতে বাবা কহিলেন, "চৌধুরী মশাইকে প্রণাম করে যাও, কনক ; আমার বাড়ীতে তো ওঁর পায়ের ধূলো সচরাচর পড়ে না!"

বাবার কথা সত্য ; দুই তিন বছরের মধ্যে চৌধুরী মহাশয়কে ভ্রমেও আমাদের গৃহে, এমন কি আমাদের পাড়ায় আসিতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হইল না। আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহার বাড়ী বহুদূরে অবস্থিত ; বিশেষ কাজ না পড়িলে আমাদেরও চৌধুরী পাড়া যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। সেই জন্যই তিনি পরিচিত হইলেও আমি প্রথমে তাঁহাকে চিনিতেই পারি নাই।

আমি প্রণাম করিতেই চৌধুরী মহাশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সুবৃহৎ টাক-বিশিষ্ট মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি বুঝি বড় মেয়ে! তা বিয়ে থাওয়ার কি করছো ? মেয়েটি তো বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে দেখছি।" বাবা একটু কুণ্ঠিতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হ্যাঁ বড় হয়েছে বৈকি! বিজনপুরের হরিশ মৈত্রের ছেলের সঙ্গে কথা উপস্থিত করেছি, মতিলাল দেখেও গেছে ; কিন্তু এখনও পাকা কথা দেয় নি।"

"পাকা কথা দিতেই কি ছ'মাস লাগে বাপু, ছেলে ছোক্‌রার গুমোরই বেশী। তবু মেয়ের বাপ্‌রা ছোক্‌রা বলেই পাগল ; আজকালকার ছোকরার না আছে পেটে ভাত, না আছে পরণে কাপড় ; পাঁচ বছরেই চোখে চশমা ; অজীর্ণ রোগেই কঙ্কালমূর্ত্তি, ফুলের ঘায়েই বাবুর দল মূর্চ্ছা যান। ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে, তবু মেয়ের বাপদের ছোকরা জামাইটিই চাই। গেল বছর দাঁত বাঁ—না, এই বেড়াতে গিয়ে, কলকাতার থিয়েটারে ছোকরাদের কেচ্ছা শুনে এলাম। বল্লে প্রত্যয় করবে না দয়াল, সেখানে গানই হচ্ছিল, "যত সব ফচকে ছোঁড়া মুচকে হেঁসে ওপর বাগে চায়।" তোমার ছোকরা দিয়ে কাজ কি হে দয়াল ? যেমন শক্তি, তেমন ভক্তি ; ঘরে খাবার আছে পরবার আছে এমনি একটি দোজবরে টোজবরে দেখে মেয়েটিকে দাও। মেয়েটাও সুখে থাকবে, তুমিও নিশ্চিন্ত হবে।"

বাবা এতক্ষণ নীরবে বৃদ্ধের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতাস্রোত শ্রবণ করিতেছিলেন। এখন কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "অল্প বয়সের দোজবরে দিতে আমার আপত্তি নেই চৌধুরী মশাই ; কিন্তু তেমন দোজবরে পাই কোথায় ?"

বাবার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সোৎসাহে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "তুমি যদি দাও, তাহ'লে কি পাত্রের অভাব হবে দয়াল। মেয়েটি তোমার কালো হ'লেও বেশ ছিরি আছে ; আর দিব্যি ডাগরটিও হয়েছে ; অমন মেয়ে কি পড়তে পায়!" বলিয়া চৌধুরী মহাশয় পূজার ঘরের পানে একটি কটাক্ষ করিলেন।

আমি দ্বারের কাছে বসিয়া চন্দন ঘষিতেছিলাম ; বৃদ্ধের

চঞ্চল দৃষ্টিপাতে সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; সঙ্কোচের সহিত অন্তরালে সরিয়া গেলাম।

বাবা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া চিন্তাক্লিষ্টকণ্ঠে কহিলেন, মতিলাল রাজি হ'লে তো কোন কথাই নেই; নইলে ভাল দোজবরের সন্ধান পেলে আপনি দয়া করে আমায় খবর দেবেন।"

"হ্যাঁ তা দেব বৈকি! তোমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা নেই দয়াল। কাল তোমার মেয়েদের আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও। কাল তোমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ রইল। আর একটা কথা,—কাল কিন্তু বউমার গিয়ে রাঁধতে হবে। খুব ভোরে যেন যা'ন। বীরেন, হীরেনের বউ কখ্‌খনো তো যজ্ঞের রান্না রাঁধে নি; বউদের পিত্যেশ না রেখে গিন্নীই বরাবর ওসব করতেন।" বলিয়া বৃদ্ধ বিরসবদনে জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বাবা কহিলেন, "তা বেশ এখান থেকেই কাল গিয়ে রান্না করবে। এই কথা বলতে আপনি নিজে এত কষ্ট করে এসেছেন; কাউকে দিয়ে বলে পাঠালেই চলতো।"

"বহুকাল তোমাদের পাড়ায় আসি নাই, দেখতেও ইচ্ছে হয়; তাই একবার দেখে শুনে গেলাম। কাল তো বউমা রাঁধ্‌তে যাবেন; মেয়েরাও যেন যায়। গাঁ শুদ্ধ লোক খাবে, অথচ কাজের লোকেরই অভাব। মেয়েরা গেলে পান সাজা, তরকারী কোটা এগুলো তো করতে পারবে।"

"আচ্ছা কনক বেনুও যাবে; পানটান সাজা ওরাই করবে। আপনার মেয়েরা সব এসেছে; দু'টী পুত্রবধূ আছে। এরাও সব যাবে। কাজ আটকে থাকবে না।"

"কাজ হবে বটে; কিন্তু সে যেমনভাবে করতো তেমন কি আর হবে! থাক্ মেয়েরা, থাক্ ছেলে বউ; কিন্তু ঘর-সংসার যে আমার একেবারে আঁধার হয়ে গেছে দয়াল; এ শূন্য ঘর আবার পূর্ণ করতে পারবো কি? ছেলেরা চাকরী করতে যাবে, বৌরা তাদের সঙ্গে যাবে। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি; যার যার আপনার ঘরে সে সে চলে যাবে। আমি বেটা যে কোন্ মাঠে পড়ে মরবো তাকি কেউ ভেবে দেখবে? কেউ তা দেখবে না।" চৌধুরী মহাশয়ের চক্ষের জল সহসা অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ চাদরের প্রান্তে ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

পুরুষের বিশেষতঃ বৃদ্ধের এই ক্রন্দনে বেনু থাকিতে পারিল না। চাপা হাসির মধুর ঝঙ্কারে কক্ষখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

(৪)

পরদিন প্রত্যুষে স্নান করিয়া মা চৌধুরী বাড়ীতে রান্না করিতে গেলেন। গ্রামের মধ্যে আমার মায়ের মত পাকা রাঁধুনী দুই একটীর বেশী ছিল না। কাজেই পাড়া প্রতিবেশী-দিগের কাজকর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে মায়েরই ডাক পড়িত। মা প্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রসন্ন-বদনে সকলেরই কার্য্যভার মাথা পাতিয়া লইতেন। আপনার দায়ের ন্যায় সকলেরই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেন। পরগৃহে রান্না করিতে মা কেন গ্রামের কোন রমণীই অপমান বোধ করিতেন না। অন্নপূর্ণার আসনটি পল্লী রমণীর নিকট গৌরবের আসন বলিয়া বিবেচিত হইত।

প্রতিদিন বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি করিয়া বাবাকে পোষ্টাফিসে যাইতে হইত। কাজকর্ম্ম শেষে সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। আজ সকলের নিমন্ত্রণ, গৃহে রান্নাবান্নার হাঙ্গাম নাই। সামান্য একটুকু জলযোগ করিয়া মোটা চাদরখানি স্কন্ধে ফেলিয়া জুতা পায়ে দিতে দিতে বাবা আমার পানে চোখ তুলিয়া কহিলেন, "আমি যাবার সময় তোদের চৌধুরী বাড়ী দিয়ে যাচ্ছি কনক, তোরা আমার সঙ্গে আয়।

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলাম, "আমার না গেলে হয় না বাবা, বেনুকে নিয়ে যান, আমি বাড়ীতেই থাকি।"

"সেটা কি ভাল হয় কনক? কাজকর্ম্মের জন্যেই তোদের যাবার কথা। চৌধুরী মশায় নিজে এসে বারবার করে বলে গেছেন; না গেলে তিনি হয় তো ক্ষুণ্ণ হবেন; সেখানে তোর মা রয়েছে, পাড়ার কত মেয়েরা গেছে, এতে লজ্জা কি?"

লজ্জা যে কিসের তাহা বাবাকে কেমন করিয়া জানাইব।

পাড়ার মেয়েদের সহিত আমার প্রভেদ কতখানি, কেমন করিয়াই বা সেকথা বাবার নিকটে ব্যক্ত করিব। আর কাহারো সহিত কি আমার তুলনা হয়? আমি যে অরক্ষণীয়া, প্রতিবেশীদের উপহাসাস্পদ, লোকের করুণার পাত্রী। নদীর ঘাটে, নিভৃত খিড়্‌কি পুকুরে আজকাল একাধিক রমণীর কণ্ঠে যে আমার বিবাহের আলোচনায়, আমার কালোরূপের বর্ণনায় গুঞ্জরিত। ওগো তাই আমি জনসমাজে যাইতে ভীত, কুণ্ঠিত। আমি যেন ভাবি সকলে আমাকে ভুলিয়া থাকুক, আমার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলুক। কিন্তু ভোলা কি সহজ কথা!

আমাকে নীরব দেখিয়া বাবা বলিলেন, "চুপ করে রইলি কেন কনক; আমার বেলা হচ্ছে, শীগ্‌গির চল। সেখানে ভালো না লাগে একটু পরে বেনুকে নিয়ে ফিরে আসিস। কিন্তু না যাওয়াটা ভাল দেখাবে না মা।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে বাবার অনুসরণ করিলাম।

চৌধুরী বাড়ী গিয়া দেখি আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ীটি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। লোকের চীৎকার, বালক বালিকার কোলাহল, দাস দাসীদের ছুটাছুটিতে গৃহাঙ্গন মুখরিত। মা কোমরে কাপড় জড়াইয়া আটটি উনুন প্রজ্বলিত করিয়া রান্না করিতেছেন। চৌধুরীদের দুইবোন রান্নার জোগাড় দিতেছে। ভারীতে কলসী কলসী জল আনিতেছে, পরিচারিকারা কেহ মশলা বাটিতেছে, কেহ মাছ কুটিতেছে, কেহ বা চাল ধুইতে লইয়া কাকের সহিত ঝগড়া বাধাইয়াছে। সকলেই ব্যস্ত সমস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে।

এত লোকের মধ্যে সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া বেনুর হাত ধরিয়া আমি রান্নাঘরের কোণে আশ্রয় লইলাম।

মা স্নেহভরা কণ্ঠে কহিলেন," এ গরমের ভেতর কেন কনক, ওই বড় ঘরে সকলে পান সাজছে সেখানে গিয়ে পান সাজ গে।"

পান সাজিবার নিমিত্ত মায়ের নির্দ্দেশমত গৃহদ্বারে যাইতেই চৌধুরী মহাশয় অকস্মাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিয়ৎকাল আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে হাস্যতরলকণ্ঠে কহিলেন, "এতক্ষণে সময় হ'লো নাকি? চল আমার ঘরে বসবে চল।" বেনু বলিল, "আমরা এখন পান সাজবো, মা বলে দিলেন। পান সাজা হ'লে আপনার ঘর দেখবো!"

"পান সাজার লোকের দুঃখ নেই; ইচ্ছে হয় তুমি সাজ গে; ততক্ষণ তোমার দিদিকে আমার ঘরটি দেখিয়ে আনি।"

"আপনার ঘর বুঝি খুব সাজানো; অনেক দেশের ছবি আছে? দিদি ছবি দেখতে বড্ড ভালবাসে, আমিও ভালবাসি। এসো দিদি, আগে ছবিই দেখে আসি।"

ক্রমশঃ
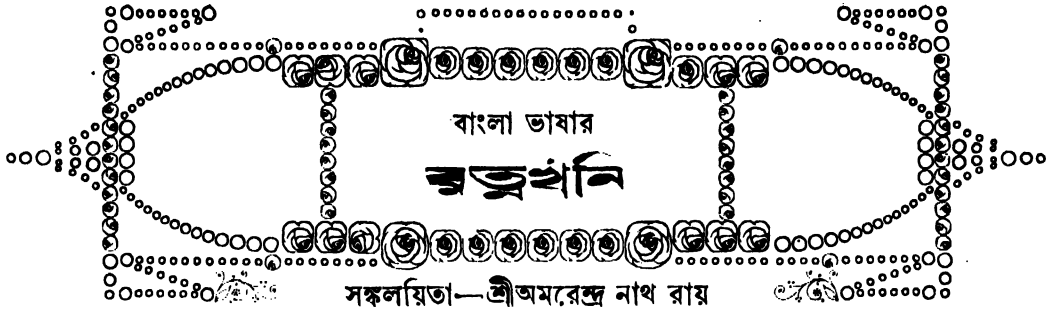
রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-চিন্তা

আখ্যায়িকা :—

গদ্যময় কাব্যকে আখ্যায়িকা বলে। হর্ষ উৎপাদন করিয়া সদ্‌-গুণ সমূহের প্রশংসা করাই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কিরূপ বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়, এবং পুণ্য কর্ম্মের আচরণ করিলেই বা পরিণামে কিরূপ সুখভাগী ও সকলের আদর ভাজন হওয়া যায়, পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া সম্যগরূপে সেই বিষয় প্রদর্শন করাই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অনেকগুলি উপাদানের আবশ্যক। গল্পটী অতিশয় মনোহর হওয়া উচিত। নায়কের কার্য্য সমুদয় বলিবার সময় এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করা উচিত, যেন নায়কের সহিত পাঠকের ভেদ জ্ঞান না থাকে। যে সকল ব্যক্তি গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত হইবে, তাহাদের স্বভাবের কিরূপ বৈলক্ষণ্য তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ইত্যাকার বহুবিধ উপাদান সামগ্রীদ্বারা আখ্যায়িকা গ্রথিত না হইলে, আখ্যায়িকা নীরস হয়, সুতরাং কাহারও হৃদয় গ্রাহিণী হয় না।......গল্প মনোরম করিতে হইলে যাহাতে পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তি না হয় সর্ব্বতোভাবে ঐরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক। কৌতুহল সংবর্দ্ধিত করিতে না পারিলে ভাবনা শক্তি যত কেন তেজস্বিনী হউক না, শব্দ বিন্যাস যেমন কেন মধুর হউক না, আখ্যায়িকা পাঠকের মনোহরণ করিতে অসমর্থ হয়। পরে কি হইবে, তাহা যদি অগ্রেই পাঠক বুঝিতে পারেন তাহা হইলে আগ্রহ হইয়া আদ্যোপান্ত তাহা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, গল্পের মধ্যস্থলেই নিদ্রাকর্ষণ হয়।

প্রহসন প্রসঙ্গ :—

প্রহসনের দুই অভিপ্রায় ;—এক, অভিনয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন ; দ্বিতীয়, পাপানুরাগ, দুষ্কৃতি, অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি মন্দের তিরস্কার দ্বারা অপনোদন। এতদুভয়ের একীকরণ সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ হইলে প্রহসন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হয় ; তদভাবে তাহার অভীষ্টের কথঞ্চিৎ হানি থাকে।

প্রচ্ছন্ন বর্ণনে দেশের রাজার নামেও প্রহসন প্রস্তুত হইতে পারে, এবং সাধারণ সমীপে তাহা অভিনীত হইলে ঐ রাজার অপরাধ এরূপ স্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে, যে রাজাও ব্যথিত চিত্তে সে দোষের পুনরনুষ্ঠানে শঙ্কিত হন। নানা প্রকার সামাজিক দোষও এই উপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। প্রহসনের এই উপকারই প্রধান ; এবং তন্নিমিত্তই ইহার বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। পরন্তু স্মর্ত্তব্য যে প্রহসনের প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কদাপি সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলে যে প্রহসন যত হাস্যদ্যোতক ও আমোদজনক হইবে সে ততই শাস্তা ও নীতি-প্রদর্শক হইবে। হাস্যদ্যোতনের ব্যাঘাত হইলে নীতি-উপদেশেরও

বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়। এ বিষয়ে বরং প্রহসন নীতি-প্রদর্শক না হইয়া কেবল প্রমোদদ্যোতক অনায়াসে হইতে পারে, কিন্তু প্রমোদকর না হইয়া কেবল নীতি-প্রদর্শক কদাপি হইতে পারে না। প্রহসনের এই উভয় উদ্দেশ্যের পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ না রাখিলে প্রহসনের দোষ গুণ কদাপি সমালোচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন যে কোন ব্যক্তির গুপ্ত দোষ লইয়া আমোদ করায় ভদ্রতার ব্যাঘাত হয়। পরন্তু তাঁহাদের স্মর্তব্য যে প্রহসনের লক্ষ্য দোষ; সেই দোষই লোকে হাস্যরূপ অস্ত্রে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; মনুষ্য তাহার উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং প্রহসনে কোন ব্যক্তির গুপ্ত কথা লইয়া আমোদ করা সিদ্ধ হয় না। অপর একাধারে বহুদোষ সর্ব্বদা একত্র থাকে না; আর একটি মাত্র দোষের উল্লেখে প্রহসন প্রাঞ্জল করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এই হেতু বিভিন্ন আচারের বিভিন্ন দোষ একত্র করিয়া বর্ণন করার রীতি আছে। ফলে কবিমাত্রেই এই নিয়মের অনুগামী; এবং প্রায় সকলেই আপন আপন নায়ককে বিভিন্ন গুণ বা দোষের আধার করিয়া থাকেন। এই কৌশলের অবলম্বনে প্রহসনকারেরা অনেকে কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা কল্পনার সহকারে আপন আপন নায়কের সৃষ্টি করিয়াছেন—কোন বিশেষ ব্যক্তির আদর্শে তাহার চিত্র করেন নাই। পরন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সে কথা কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে সকল প্রহসন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহার নায়ক প্রায়ই জন-সমাজ হইতে গৃহীত; কেবল গ্রন্থকারের চাতুর্য্যে বা অক্ষমতা দোষে তাহার কোন কোন অঙ্গ প্রপঞ্চিত, অধিকীকৃত, পরিবর্ত্তিত বা খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। সাধারণের এরূপ জ্ঞান না থাকিলেও প্রহসনের দোষ গুণ বিচার সময়ে তাঁহার যে নায়ককে আপন পরিচিত বা জ্ঞাত কোন ব্যক্তির সদৃশ বোধ করেন, তাহাই উত্তম হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন, এবং যাহা জ্ঞাত ব্যক্তির অসদৃশ বোধ করেন, তাহা খণ্ডিত বা অপ্রশংসনীয় বোধ করেন এই ভাবের প্রত্যাহারে গ্রন্থকারেরা কহেন যে নায়ক স্বভাবসিদ্ধ হইলেই প্রশস্ত, তদন্যথায় বিকৃত হয়।

পদ্যের অঙ্গ :—

পদ্যের প্রধান অঙ্গ তিন—মাত্রা, বৃত্ত ও যতি। লঘু গুরুর ভেদকে মাত্রা কহে, এবং নিরূপিত ক-একটি গুরু ও লঘু বা কেবল গুরুবর্ণ বা কেবল লঘু কিম্বা অনিরূপিত লঘু গুরু শব্দ একত্র মিলাইয়া দুই তিন চারি বা ততোধিক চরণ বিন্যাস্ত করার নাম বৃত্ত। তথা ঐ পদ-মধ্যে যে বিশ্রাম স্থান থাকে, তাহাকে যতি কহে। এই তিন পদ্যের শরীর প্রাণ ও আত্মা। এতদ্ভিন্ন কদাপি পদ্য হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে বাঙ্গালীতে মাত্রা নাই; কেবল বৃত্ত এবং যতি আছে, এবং তদ্দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পয়ার দর্শাইয়া থাকেন, কারণ তাহাতে চতুর্দ্দশ অক্ষরে পদ, এবং অষ্টম অক্ষরে যতির নিয়ম আছে, কুত্রাপি মাত্রার নিয়ম নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীত হয় যে পয়ারের নিমিত্ত অক্ষর সংখ্যা ও যতি যেরূপ প্রয়োজনীয়, মাত্রাও সেইরূপ আবশ্যক; তদভাবে কদাপি পয়ার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কেবল বাঙ্গালীতে গুরু-লঘু উচ্চারণের তাদৃশ সাবধানতা না থাকায় গুরু স্থানে লঘু ও লঘু স্থানে গুরু করিয়া পড়াতে অনেক মাত্রাবিহীন পদের মাত্রার অভাব অনুভব করা যায় না। পরন্তু তাহাতে সে আপত্তি অক্ষর গণনার সম্বন্ধেও কহা যাইতে পারে, যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অনেক প্রাচীন পয়ারে চতুর্দ্দশের অতিরিক্ত পঞ্চদশ বা যোড়শ অক্ষর আছে, তাহা কেবল দ্রুত উচ্চারণ দ্বারা চতুর্দ্দশ সংখ্যা মাপ্য করা যায়। ঐ অতিরিক্ত বর্ণ দৃষ্টে যেমন পয়ারের বর্ণ-সংখ্যার অস্থিরতা আছে বলা যায় না, সেইরূপ লঘু গুরুর অপলাপ করিয়া পয়ারের মাত্রা সিদ্ধ করা যায় বলিয়া পয়ারের মাত্রা নাই বলা উপযুক্ত নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য যে আমাদিগের কবিরা কেহ অদ্যাপি পরিশ্রম করিয়া পয়ারের মাত্রার প্রকৃত লক্ষণ নিরূপিত করেন নাই, কিন্তু তাহাতে পয়ারে মাত্রার আবশ্যক নাই বলা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে পয়ারের মাত্রা ভ্রষ্ট করিলে তাহা আর পদ্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহাদের অগোচর নাই যে সম সংখ্যক অক্ষর রাখিয়া কেবল মাত্রার ভেদে অতি বিভিন্ন প্রকার পদ্য প্রস্তুত হইতে পারে, সেই পদ্য সকলের এ প্রকার বিভিন্নতা বোধ হয় যে তাহা এক সমসংখ্যক বর্ণে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা অঙ্গুলির পর্ব্বে গণনা না করিলে বিশ্বাস হয় না। ঐ সকল পদ্যের সুশ্রাব্যতা ও চমৎকারিতা ও লাবণ্য যেরূপ অপূর্ব্ব হইয়া থাকে, প্রচলিত বাঙ্গালী পদ্যে তাহা কদাপি লক্ষ হয় না। অপর বাঙ্গালী পদ্য মাত্রের প্রত্যেক চরণের শেষে অনুপ্রাস থাকাতে তাহা অনেক সহৃদয় মহাশয়দিগের পক্ষে যাতনা-জনক বোধ হয়। ঐ দোষের অপহরণার্থে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তিলোত্তমাদি কাব্যে অমিত্রাক্ষর পয়ারের প্রচার করিয়াছেন; তাহা অনেকের পক্ষে অতি রম্য বোধ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মাত্রার বিশেষ নিয়ম না থাকায়, তথা তাহার প্রাচীনত্বাভাব প্রযুক্ত কেহ কেহ তাহার অনুরাগী হয়েন নাই। তাঁহাদিগের অনুমোদনার্থে তথা বঙ্গভাষায় সংস্কৃত-ছন্দঃ সকলের প্রচার-করণার্থে ভুবনমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্ত-রত্নাবলী গ্রন্থ, তাহার ভাষানুবাদ ও ভাষায় ঐ সকল ছন্দের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দৃষ্টান্তগুলিই নূতন পদার্থ; কারণ এতৎপূর্ব্বে কেহ তোটক প্রভৃতি তিন চারিটা ছন্দ ভিন্ন অন্য কোন ছন্দের বাঙ্গালী অনুবাদ করিয়া সিদ্ধকাম হয়েন নাই। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সমস্ত সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দ ও মাত্রা ছন্দ বাঙ্গালীতে রচিত হইতে পারে, এবং লঘু ও গুরুর প্রকৃত উচ্চারণ করিলে তাহাতে তাহাদের কান্তির হানি হয় না! অধিকন্তু যাঁহারা কহেন যে মিত্রাক্ষর ভিন্ন বাঙ্গালীতে ছন্দ হয় না, তাঁহারা স্পষ্ট দেখিবেন যে ছন্দের অনন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ মিত্রাক্ষর নহে; তাহা অলঙ্কার মাত্র, এবং তাহার ত্যাগে ছন্দের কিছুমাত্র হানি হয়-না।

আমাদিগের এই বাক্য সপ্রমাণার্থে আমরা এস্থলে চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে দুই চারিটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। আমাদিগের প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপে বসন্ত-তিলক ছন্দঃ গৃহীত হইল, কারণ ইহার প্রত্যেক পাদে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকে, এবং তাহার অষ্টম ও চতুর্দ্দশ অক্ষরে যতি থাকে; সুতরাং ইহা আমাদিগের পয়ারের প্রতিরূপ বলিলে বলা যায়। বোধহয় এই বসন্ত-তিলকের অপভ্রংশেই পয়ার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—

কুঞ্জে বিহার বিপিনে যত গোপবালা,
আশান্বিতা সচকিতা ছিল বাসব সজ্জা।

যত্নে নিশীথ সময়ে　হরি দর্শনার্থে,
জাগে সুদীর্ঘ রজনী　বঁধুবাক্য লক্ষ্যে॥

এই পদ্যের সহিত আমরা প্রহরণ-কালিকা নামক ছন্দের তুলনা করিতে মানস করি, যেহেতু ঐ ছন্দে বসন্ত-তিলকের ন্যায় চতুর্দ্দশটি অক্ষর আছে, কিন্তু সপ্তম ও শেষ ভিন্ন অপর সকল বর্ণ লঘু হওয়াতে তথা সপ্তম ও চতুর্দ্দশ বর্ণে যতি রাখাতে তাহা বসন্ত তিলকের অতি বিপরীত বোধ হয়, এবং তদ্দৃষ্টে মাত্রা ও যতি ভেদে যে ছন্দের কি পর্য্যন্ত ভেদ হয়, তাহা পাঠকবৃন্দের মনে বিশিষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারিবে।

"মুদিত কুমুদিনী　বিকশিত নলিনী,
অলিকুল বিহরে　পিকবর কুহরে।

মলয়জ পবনে　মৃদু মৃদু বহিছে,
সুকুসুম সুরভি　প্রচরিত বিপিনে॥"

কবিকুল-তিলক কালিদাসের ভুবন-বিখ্যাত মেঘদূত মন্দাক্রান্তা নামক ছন্দে রচিত। তাহা অতি চমৎকার লালিত্য-রসে পরিপূর্ণ। তাহার অক্ষর সংখ্যা সপ্তদশ, তন্মধ্যে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১২ এবং ১৫ অক্ষর লঘু, অপর সকল গুরু। এবং চতুর্থ ও দশম অক্ষরে যতি। চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে বাঙ্গালীতে এই ছন্দের অবিকল অনুকরণ হইয়াছে। তদ্যথা,—

"কামে ক্রোধে মদ কি মমতা বাসনা লোভ মোহে,
এ সংসারে ছয় রিপু বশে যাতনা লোক সর্ব্বে॥
কামোৎসাহে বিষম বিষয় ধ্যান চিন্তা প্রভাবে,
একাভ্যাসে অপর জনমে সঙ্গ কামাদি বৈরী॥

সামান্যে সম্পদ-পরিজনে নাহি কিঞ্চিৎ সুখাশা,
মিথ্যা লোকে হরষিত রহে নশ্বরে নিত্য বোধে।
নাশে শেষে জড়মতি হয়ে সর্ব্বদা শোক দুঃখে,
হাহা শব্দে কলরব করে কান্দয়ে উচ্চনাদে॥"

পরন্তু এতদপেক্ষা গীতিকা বাঙ্গালী ভাষায় অধিক সুমধুর হয়। তদ্যথা,—

"যদি চিত্ত পঙ্কজকেশরে মকরন্দ ভক্তি সদা রহে,
হয় মুগ্ধ সে রস ভুঞ্জিতে হরি ভৃঙ্গ আকৃতি ধারণে।
কভু না করে গতি বিভ্রমে হরিভক্তি বর্জ্জিত মানসে
শুভদৃশ্য চম্পক তাদৃশী অলি সঙ্গমে রস-বঞ্চিতা॥"

ইহার অক্ষর সংখ্যা ২০; যতিস্থান ১০ ও ১৬ অক্ষর হইলে গুরু অক্ষর ৩, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৮ এবং ২০; অপর সকল লঘু।

সংস্কৃতে স্রগ্ধরা অতি বিখ্যাত ছন্দ; তাহার প্রত্যেক চরণ আমাদিগের ত্রিপদীর ন্যায় তিন পদে বিভক্ত, এবং ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬ এবং ১৯ অক্ষর লঘু, অপর গুরু। তদ্যথা,—

"ক্ষৌণী রক্ষার্থ ধাতা সৃজিল উপলক্ষে পূর্ব্বকালে সুযত্নে
ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবে করিল নিবসতি স্থান শৈবের শৃঙ্গে
পৃথ্বীভারে ধরে সে দৃঢ়তর হৃদয়ে রত্ন-মাণিক্য রাখে
যৎ সাহায্যে প্রযত্নে জলনিধি মথনে শ্রীলভে সর্ব্ব লোকে॥"

অতিকৃতি পঞ্চবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি; তাহার ৫, ১০, ১৮ এবং ২৫ অক্ষরে যতি, তদ্যথা,—

"নাগর কৃষ্ণে না কর নিন্দা তিনি নিখিল ভুবন
পতি গতি চরমে,
ভক্ত সমাজে পাগল জন্যে জনম লভিল নরবপু
ধরি জগতে।
যাদৃশ ভাবে ভাবুক ভাবে প্রণয় ভকতি রিপু মতি
যুত ভজনে
তাদৃশ বেশে মাধব তারে হিতকর হয় ভবজল-
নিধি তরণে॥"

অভাগী

(গল্প)
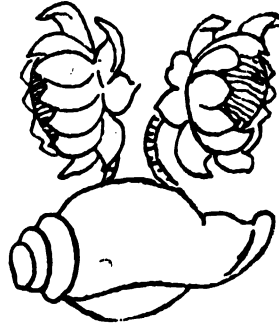
[শ্রীমায়া দেবী (বসু)]

স্বামীর সঙ্গে প্রথম তাঁর কর্ম্মস্থলে যাত্রা করে ছিলাম। আরা পর্য্যন্ত একলা আসবার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, দেখি একটী আঠার উনিশ বছরের যুবতী প্রায় ছুটে এসে আমার কামরায় উঠল। কিছু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কোথায় যাবেন ?

মেয়েটী হিন্দুস্থানী ;—উত্তর দিলে, জানিনা,—যেখানে দু চক্ষু যায়।

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার সঙ্গে কি কেউ নেই ?

মেয়েটী বোধহয় কাঁদছিল, ধরা গলায় উত্তর দিলে, না। তখন আমি তার কাছে বসে তার কাছে থেকে একটী একটী করে কথা জেনে নিলুম—তার নাম লছমী, কোন বিশেষ কারণে সে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে অনির্দ্দেশের পথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে আশ্রয় হীনা! তার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারলুম না, এমনই একটী সরলতা মাখা ভাব তার মুখে ফুটে উঠেছিল। ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, বিদেশে কোথায় থাকবে ? চোখ মুছে সে বললে, ঈশ্বর জানেন।—কোন ভদ্র ঘরে দাসীবৃত্তি করব।

ভদ্রঘরের মেয়ে দাসবৃত্তি করবে! ভাবতেও আমার চোখে জল এল, বললুম, যদি দোষ না ভাব তাহলে বলি,—তুমি ত পরের আশ্রয়েই থাকবে, আমার কাছে থাকবে কি ? আমিও এই জীবনের মধ্যে প্রথম বিদেশে একলা যাচ্ছি তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

লছমী অনেকক্ষণ ভেবে উত্তর দিলে, যাব কিন্তু সাধ্য-পক্ষে কোন পুরুষের সামনে বেরুব না।

আমি সম্মত হয়ে তাকে নিয়ে আগ্রায় পৌঁছলুম। কয়েক দিন পরে স্বামীর ভোজন সমাধা হয়ে গেলে, লছমীর ঘরে ঢুকে দেখি সে জানালার কাছে বসে বৃষ্টির পানে চেয়ে গুণ গুণ করে গাইছে,—"শাওন বরষে ভাঙ্গে গরজে বীণা পিয়াকে দরশন হোত অধীরা—এ—হোত অধীরা" ;—

আমি পাশে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠে আমার পানে চেয়ে দেখলে,—দেখি, সে কাঁদছে।

সমবেদনায় আমার প্রাণ গলে গেল ; কাছে বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললুম, যদি তুমি বিরক্ত না হও তাহলে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি !—

লছমী চোখ মুছে বললে, রাগ করব কেন ভাই ? আমি বললুম, কি দুঃখ তুমি বুকে চেপে রেখেছ আমায় বলবে না ?

সে উদাস ভাবে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে "শুনে কি করবে ভাই ! আকাশে যেমন কাল মেঘ ছেয়ে আছে ঠিক ঐ রকম ঘন অন্ধকার আমার বুকও ছেয়ে আছে।—আমার দুঃখ শুনে তুমি কি ক'রবে ?" তার দু'চোখ দিয়ে টস টস করে জল ঝরে পড়ল।

আমি আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে বললুম, তাহোক ভাই ! দুঃখের নিয়মই এই যে, সেটা কারুর কাছে ব্যক্ত করলে বেদনা লাঘব হয়।

লছমী অনেকক্ষণ পরে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তবে শোন ;—আরায় আমার বাপ একজন বিখ্যাত বড়লোক,—আমি তাঁর একটী মেয়ে, আমার আরও চারটী ভাই আছেন, দুটী বড়, দুটী ছোট ! আমাদের বাড়ীর পিছনে বাগান, তার ওপাশে একটী বৃদ্ধা তাঁর দুটী ছেলে মেয়ে ; মোতিয়া ও ওঙ্কারনাথ বাস করেন ! এই ওঙ্কারকে বাবা লেখাপড়া শেখাতেন, এ বছর তিনি এম এ, পাশ করেছেন। যদিও আমরা কায়স্থ কিন্তু বাবা অবরোধ প্রথা পছন্দ করেন না বলে আজও তাঁর আমাদের বাড়ীতে অবাধগতি আছে।

"ছোটবেলা থেকে তাঁর সঙ্গে খেলা করে এসেছি – বড় হয়েও সঙ্কোচ বোধ হতনা ; ছেলে বেলার সেই ভাল-বাসা ক্রমে প্রণয়ে রূপান্তরিত হ'ল।" লছমী নীরব হ'ল।

একটু থেমে বললে, "নূতন প্রেমের তীব্র নেশায় দুজনেই

মাতাল হয়ে পড়লুম। কিন্তু আমাদের এ ভাব পরিবর্ত্তন কারুর চোখেই পড়েনি কারণ চিরদিন আমরা এই ভাবেই আলাপ করে এসেছি। অবশ্য আমরা দুজনেই জানতুম আমাদের এ সুখের স্বপ্ন একদিন ভাঙবেই,—আমার পিতা কখনই দরিদ্র, পরান্নে পালিত ওঙ্কারের হাতে আমায় সম্প্রদান করবেন না, তাকে তিনি ছেলের মত স্নেহ করেন কিন্তু জামাই হবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন না,—সে যে দরিদ্র কুটীরবাসী,"—লছমী এতটুকু বলে আবার একটু থামল।

নারী প্রকৃতি দমন করতে পারলুম না, জিজ্ঞাসা করলুম, ওঙ্কারনাথ বাবু কি খুব সুন্দর? লছমী বাহিরের দিকে চেয়েছিল; মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলে, না, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী চমৎকার কিন্তু সুন্দর বলা চলে না। কিন্তু রূপ-টাই ত সব নয় বন্ধু! বাইরের চেয়ে যার অন্তর সুন্দর সেইত প্রকৃত সুন্দর ভাই! তুমিত লেখাপড়া জান, কিউ-পিডও যে অন্ধ তাত জান ভাই!" মনে মনে লজ্জিত হলুম, লছমীর কথাটা কথার মত বটে। বুঝলুম, শিক্ষায় সে আমার চেয়ে কম নয়।

লছমী বললে "যাক যা বলছিলুম বলি,—আমাদের কায়েতের ঘরে বর পাওয়া কঠিন, তার উপর বাবা চান পাত্র অর্থশালী, সুন্দর, বিদ্বান আর তার বাপ মা থাকবে। কাজেই সে রকম বর পাওয়া ভার হল;—তাই আজও আমি অনূঢ়া। —তারপর বম্বায়ে বর পাওয়া গেল, পাত্রের বাপ মা আছেন, বেশ উন্নত অবস্থা, পাত্র দেখতে সুন্দর, এণ্ট্রান্স পড়ছে, আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়! সকলেই খুব আনন্দিত হলেন। কেবল বড় ভাই অমত করে বললেন, ছেলেটীর বয়সও অল্প আর সামান্য লেখাপড়া জানা, তার সঙ্গে লছমীর বিয়ে না দিয়ে ওঙ্কারের সঙ্গে দিন। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি এত নির্ব্বোধ নই যে চাল-চুলো হীন ওঙ্কারকে মেয়ে সম্প্রদান করব! যদি আমি লছমীকে ওঙ্কারকে দান করি তা'হলে দেশের লোকে আমার গায়ে থুথু দেবে। লছমী আমার একটী মেয়ে, তাকে আমার সমান ঘরেই দিতে হবে; তোমরা মিছে অমত কোর না।" বড় ভাই চুপ করে রইলেন, আমি জানি না তিনি নিজের মতই প্রকাশ করেছিলেন বা তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন।

"আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল,—শেষে কি দ্বিচারিণী হব!"

বিপদের উপর বিপদ! তিনিও আসা বন্ধ করলেন, আমি অকূল সাগরে ভাসতে লাগলুম। মোতিয়া সকল কথা জানত, সে আমার চিন্তার অংশ নিলে। কোন উপায় না পেয়ে আমি তাকে দিয়ে মাকে এ কথা বলাতে চাইলুম। মোতিয়া দু'টি কারণে, বলতে অস্বীকার করলে, প্রথম, তারা আমাদের আশ্রিতা; দ্বিতীয় তিনি যে তারই সহোদর এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে সে কি করে তাঁর কথা তুলবে! কিন্তু আমার কাতরতা দেখে শেষে তার এক দূর সম্পর্কের পিসিকে দিয়ে বলাতে স্বীকৃত হল। মা তখন অনেক-গুলি স্ত্রীলোকের মাঝে বসেছিলেন, মোতিয়ার পিসিরও সোজা সে কথা পাড়তে সাহস হ'ল না; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, তুমি আবার হেথা হোথা বর খুঁজতে গেলে কেন? বর ত তোমার ঘরেই ছিল, ওঙ্কারনাথ ছেলে ভাল, লেখাপড়াও যথেষ্ট শিখেছে ওর সঙ্গে লছমীর—তাঁর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই মা হেসে উঠলেন, হাঁসি আর থামে না; শেষে বললেন, ওঙ্কারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব—মেয়ে খাবে কি? শোবে কোথায়? ওঙ্কারের কুঁড়েয় ঢুকলে আমার মেয়ের অপমান হবে তা সে বাড়ীর বউ হওয়া ত অনেক দূরের কথা! ও যদি আমার অবস্থার হত আমি নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে বিয়ে দিতুম। আমি লছমীকে পনের হাজার টাকার গহনা দেব, দশহাজার টাকার অন্য জিনিস পত্র দেব, সে সব কি ওঙ্কারের মা মাথায় করে বসে থাকবে? বলে মা আবার হো হো করে হাসতে লাগলেন। মায়ের হাসির শব্দ আমার বুকে ঠিক তীক্ষ্ণধার তীরের মতই বিঁধল, ভাবলুম, কেন আমি গরীবের ঘরে জন্মাই নি!

সেদিকে কিছু হলনা দেখে মোতিয়াকে বললুম, আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

বাড়ীতে কাজকর্ম্ম হলে মোতিয়ার মা সর্ব্বদাই থাকতেন; এ সময়েও ছিলেন, আমি মোতিয়াকে বললুম, তুই একবার ডেকে আনতে পারবি ভাই?

মোতিয়া একটু চিন্তা করে বল্লে, এখানে অনেক লোক-জন, কে কোথা থেকে কি দেখতে পাবে সে বড় গোলযোগ হবে, তার চেয়ে আমাদের বাড়ীতে চল।"

বাগানের ভিতর দিয়ে পথ ছিল মোতির সঙ্গে আমি অক্লেশে তাদের বাড়ী গেলুম।

"তিনি একখানা মাদুরের উপর বসেছিলেন, আমি তাঁকে দেখে শিউরে উঠলুম এত আমার হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য-দেবতার মূর্ত্তি নয় এ যেন আংশিকরূপে তাঁর আকৃতি চুরী করে কোন প্রেত আমার চোখের সামনে বসে আছে। আমি চুপ করে বসে পড়লুম, একি পরিবর্ত্তন! তিনি শুষ্কস্বরে বললেন, এখানে কেন লছমী? আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে কেঁদে উঠলুম। তিনি কিন্তু আমায় কাছে টেনে নিলেন না বরং ধীরে ধীরে এ পৃথিবীর মাঝে আমার এক মাত্র সম্বল, সকল বিপদের মাঝে ভরসা, তাঁর পা দুখানিকেই আমার আলিঙ্গন মুক্ত করে নিলেন।

আমি চোখের জলে ভেসে বললুম, আমার কি উপায় করলে?

তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন, কিছু স্থির করতে পারলুম না লছমী! তোমার বাপ মা যা বলেছেন শুনেছ?" আমার চোখের পাতা আপনিই নত হয়ে এল। মাথা নেড়ে জানালুম শুনেছি।

তিনি বল্লেন, তবে আর কি উপায় আছে বল? ধর্ম্মপথে আর উপায় নেই, অধর্ম্ম পথে আছে; তুমি কি তাই চাও লছমী? সমাজ, ধর্ম্ম আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে ঘৃণিত জীবন-যাপন করবে—সেটাই কি শ্লাঘ্য! ছিঃ ছিঃ তা পারব না। তার চেয়ে সব কষ্ট সহ্য কর; মানুষের জীবন ক্ষণভঙ্গুর; হয় ত এ বিচ্ছেদ জ্বালা বেশীদিন সহ্য করতে হবে না। পরমেশ্বর মঙ্গলময়, তাঁর পায়ে ভক্তি রাখ, তাঁর সুমহৎ কাজের দোষগুণের বিচারক আমরা নই। নারী সহ্যের আদর্শ; বুকের ভিতর আগুনের রাশি চাপা দিয়ে তরো নিজেদের কর্ত্তব্য হাসিমুখে করে যায়, তুমি সেই নারী, আশা করি তুমিও সেইভাবে জীবন কাটাতে পারবে। আমরা জন্মান্তর মানি, কি-জানি পরজন্মে তুমি আমার হবে কি না! আমার জন্যে ভেবনা, এত বড় বিশাল জগতে কত অভাগার স্থান হয় আমারও হবে। তাঁর স্বর কাঁপছিল, গলা ঝেড়ে বললেন, বাড়ী ফিরে যাও তোমাদের না দেখতে পেলে সকলে খুঁজবে। যত শীঘ্র আমায় ভুলতে পার ততই মঙ্গল, তাতেই আমি সুখী হব; ঈশ্বরকে প্রাণভরে ডাক তিনি শান্তিদাতা, মনে যথেষ্ট শান্তি পাবে। মনে রেখ—তিনি আমার চেয়েও বড়, আমার চেয়েও মহান্, আমার চেয়েও স্নেহময়!

আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন, "ভাবছ আমি কি বুকে পাথর চাপা দিয়েছি; হাঁ দিয়েছি বৈকি আমার উপর যে অনেক কর্ত্তব্য আছে, নইলে এতক্ষণে কি করতুম তা নিজেই সঠিক বলতে পাচ্ছি না। আমিও রক্তমাংসের জীব, পাথর নই। তুমি পরস্ত্রী একথা ভাবতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে কিন্তু আর নয়; কথা কইলেই কথা বাড়বে তুমি বাড়ী ফিরে যাও লছমী।" আমি সেইখানেই মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে আমার সমস্ত সুখ দুঃখ তাঁর পায়ে নিবেদন করে প্রণাম করে বাইরে এসে দেখি—মোতিয়াও কাঁদছে।

"বিবাহের দুদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হয়েছিল, আমি বললুম, তুমি কোন উপায় করতে পার নি কিন্তু আমি করেছি।"

"তিনি চমকে উঠে বললেন, কি উপায়? আত্মহত্যা নাকি?" তারপর সকাতরে বললেন, "না লছমী তা কোর না! এখন তবু আমরা এক জগতের মাঝেই আছি এখান থেকে বিদায় নিলে তুমি বড় দূরে চলে যাবে! সে যে বড় অজানা বড় অচেনা! আমার এতদিনের ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ তুমি আমায় এই কথা দাও যে তুমি প্রাণ নষ্ট করবে না!

"আমি উত্তর দিলুম, তোমার কাছে শুনেছি আত্মহত্যা মহাপাপ; আমি তা করব না।

"তিনি আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, তবে কি করবে?"

"আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললুম, সময়ে দেখতে পাবে। আমার সঙ্গে তোমার এই শেষ দেখা; আশীর্ব্বাদ করো যেন আমার সঙ্কল্প পূর্ণ করতে পারি।

"সেইরাত্রেই আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে গাড়ীতে উঠি; তারপর ত তুমি সবই জান বহুজী!—মানুষ তাই বেঁচে আছি ভাই, পাথর হ'লে ফেটে যেতুম; তোমার আশ্রয়ে আছি,—হয়ত তুমি আমার চরিত্রে সন্দেহ করতে শুধু এই জন্যেই আমি আমার গোপনীয় কথা তোমায় জানালুম। সব থাকতেও আমি সবেতেই বঞ্চিত; আমার মত অভাগী কে আছে ভাই?

রাত্রি এক প্রহর অতীত হয়ে গেছল; বারান্দায় বসে'—স্বামী মহাশয় আহারাদির পর খোস মেজাজে সুর ধরে-ছিলেন;—

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি কত আশা করে বসে আছি পাব,—
জীবনে না হয় মরণে!"

—

একটা আইন পাশ করা দরকার

[সফিয়া খাতুন বি-এ]

পড়েই যেন আপনারা হেসে ফেলবেন না যদিও বিষয়টি সত্যি হাসবার—কিন্তু এযে শুধু সত্যি নয় তিন সত্যির কথা। আইনটি হচ্ছে আমদের দেশের বিয়ে পাগলা বুড়োদের বিরুদ্ধে। হুগলী জেল হতে আমাকে একটি ছেলে লিখেছেন "আমার দাদামশাই (অর্থাৎ মায়ের কাকা) মাসখানেক হ'ল নাকি এক বিবাহ করেছেন। আমি বাইরে থাকতে বুড়ো আমার জন্যে বিয়ে করতে পারেন নাই। দীন দরিদ্রকে কন্যাদায় হতে রক্ষা করবার জন্য নাকি এ কর্ম্ম করেছেন। আমার নবীনা দিদিমার বয়স ১৪ বৎসর। দাম হয়েছে ৫২৫৲ টাকা। কেমন সুন্দর মেয়ে বিক্রি। বাড়ীতে ছোট মাসী (অর্থাৎ বৃদ্ধের মেয়ে) বাল বিধবা। ছোটমাসী আমার সমবয়সী। ***

বলতে গেলে দাদামশাই আমার "রাইভ্যল।" তাঁর টাকার জোর আছে, আমার টাকা নেই। ভাবুন টাকার জন্যে মানুষ কি না করতে পারে! আমি জেলে বসে শুধু কাঁদছি সেই হতভাগিনীর জন্যে; সে যে দুদিন পরে বিধবা হ'য়ে যাবে। আমার ছোট বোনরাও তার চাইতে বয়সে অনেক বড়।"

সহৃদয় পাঠক! একবার ভেবে দেখুন এই হতভাগা হাবাতে বুড়—যার সাড়ে তিনকাল চলে গেছে এখন যার শুধু মালা টপ্‌কাবার কথা, তার কাণ্ড কারখানা দেখুন। এদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে লিখে বা ব্যঙ্গচিত্র এঁকে কি কোন লাভ আছে? তারা খবরের কাগজের নামও জানে না। কাজেই এদের এই কুপ্রবৃত্তি দুর করবার একমাত্র উপায়—এমন একটা আইন পাশ করা যাতে ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের কোন বৃদ্ধ বিয়ে না করতে পারেন। যদি বিয়ে করেন তা'হলে অন্ততঃ আমার মতে তাঁদেরে কম পক্ষে একটী বৎসর জেল দেওয়া উচিত এবং সেটা যাতে কোনদিনই বিনাশ্রম না হয়ে সশ্রম, এমন কি বিশেষ করে ঘানির কাজ করতে হয় সে রকম বন্দোবস্ত করলেও যেন মন্দ হয় না। আর একটা সংবাদ বলা বোধ হয় ভাল। উক্ত ভদ্রলোকটি তাঁর দাদা মশাইর সামাজিক বিচারে অনেকদিন হতেই সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হয়ে আছেন। তার কারণ তিনি মুচী মুদ্দফরাস ও মুসলমানের হাতে তৈরী খাবার খেতে ঘৃণা বোধ করেন না। তিনি অসহযোগী; জাত বিচার মানেন না। এই তার অপরাধ। বাংলার পল্লীগুলির অবস্থা সত্য কি ভাববার বিষয় নয়? বাল-বিধবা কন্যাকে একাদশীর উপবাস করতে উপদেশ দিয়ে নিজে নাত্‌নীর বয়সী তরুণী ভার্য্যা নিয়ে বিলাস ব্যসনে দিন কাটানো যদি নারী নির্য্যাতন না হয় তবে এ পোড়া দেশের মেয়েদের নির্য্যাতনের মাপ কাঠিটা যে কত বড় তা'ত ভেবে পাচ্ছি না। যারা এখনও সমগ্র নারী-জাতিকে নির্য্যাতিতা মনে করেন না তাদের চোখ এসব দেখে খুলবে কি? সহরে বসে শিক্ষিত সমাজের বিরুদ্ধে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিলে আর শিক্ষিত মেয়েদের বিরুদ্ধে দু'কলম লিখে বাক্যবীর সাজবার কোন দরকার আছে কি?

একটা হাফেজী কথা আছে। "যে দোষ দেখিয়ে কর অন্যে তিরস্কার, সংশোধন কর আগে সে দোষ তোমার।" নিজের ঘরে কত আবর্জ্জনা আছে তা পরিষ্কার না করে অন্যের দোষ দেখান কি বড় ভাল?

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রথাটা আমাদের সমাজে বন্ধ আছে। তার কারণ বুড়র জন্য অনেক বুড়ীও তৈরী হয়ে থাকেন। এটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বড় মন্দ নয়। তবে শিক্ষিত পরিবারে এসব ঘটতে বড় দেখা যায় না। তবে বিয়ের উপযুক্ত যুবক পুত্রকে অবিবাহিত রেখে পিতা দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যায়। নিরুপমা বর্ষস্মৃতির ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় সমালোচক মহাশয় জলধর বাবুর গল্পের প্লট বাস্তব জীবনে সম্ভবপর নয় বলেছেন কিন্তু আমি অসম্ভব বলতেও মোটেই প্রস্তুত নই। বাংলার

তরুণ ঔপন্যাসিকদের কোন একজনের পিতা এমনি করে বিয়ে করেছেন। জানি না শ্রদ্ধেয় জলধরবাবু সে যুবককেই লক্ষ্য করে লিখেছেন কি না। কারণ জলধর বাবুর গল্পের একটা নাম আছে যে তাঁর প্রায় গল্পই বাস্তব মানব জীবনের ভিত্তির উপরে অবস্থিত।

বৃদ্ধেরা যদিই এত সংযমহীন ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে নারাজ হয়ে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ না'তি ও নাতনীকে বিয়ের প্রহসন দেখিয়ে হাসাবার জন্য নেহাৎই যদি এত উতলা হয়ে পড়েন তবে তাদের কাছে নিবেদন এই যে অনেক বাল বিধবা আছেন তাদের উদ্ধারের বন্দোবস্ত করলেই ত পারেন! এই কচি খুকীদেরে নিয়ে প্রহসনের দরকার কি বাপু? বিয়ে পাগলা বুড়োদের কাছে জিজ্ঞাস্য এই যে নিজের বেলায় যে সংযমটা একেবারে কচুপাতার জল, মেয়েদের বেলায় এত আইন কেন? তারা কি আর এক ধাতু দিয়ে তৈরী?

দু'মিনিট

[সব্‌জান্তা]

হোষ্টেল সুপারেণ্টেণ্ডেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে সুরেশ প্রত্যেক দিনই শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। এদিকে দুই হপ্তা পরেই তার পরীক্ষা। এমনি করে একদিন সে সাজ-পোষাক করে চুপি চুপি জানালা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। লম্বা কোল বালিশটাকে লেপ চাপা দিয়ে তার উপর মশারীটা ফেলে দিয়ে দিব্বি ভদ্রলোকের মতই চলে যাচ্ছিল। সেদিন তার রাশির গেরো ছিল। হঠাৎ সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর চোখে পড়ে গেল। এখন উপায়? সুপারেণ্টেণ্ডেণ্টবাবু জিজ্ঞেস করলেন "কিহে সুরেশ! সাজ পোষাক করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?" সুরেশ আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে "আজ্ঞে এই—" সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট চটে মটে বল্লেন "আজ্ঞে হাঁ-ত বুঝেছি। শ্বশুরের মেয়ে কি তোমার পরীক্ষা পাশ দিয়ে দেবে?"

"তা নয় তবে কি জানেন এই পরীক্ষা পাশ দেবার অনেক সময়ই পাব। বছরের পর বছর ত আসবেই কিন্তু এই sweet sixteen চলে গেলে যে আর ফিরে পাব না?"

তোমারি ফোঁপানি

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি এ]

[সুর—তোমারি রাগিনী জীবন কুঞ্জে ইত্যাদি]

তোমারি 'ফোঁপানি' শ্রবণ যুগ্মে
পশে যেন সদা পশে গো।
তোমারি শাসন সোদর বর্গে
চষে যেন সদা চষে গো!

তব ক্রন্দন— মন্দ মন্দ্রিত
শুনি কণ্টক শয়নে।
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
রসে যেন সদা রসে গো!

গৃহ বিচ্ছেদ আসে যেন ত্বরা
তব বিদ্বেষ মন্ত্রে
তরাসে শাশুড়ী আলয়ে বাহিরে
তব রাঙা পদ বন্দে!

তব নির্ম্মল নীরব হাস্যে
ওঠে অন্তর কাঁপিয়া—
তব হুঙ্কারে অস্থি চর্ম্ম—
খসে যেন সদা খসে গো।

সমজদার

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

ওগো পুরবাসী উলাইয়া লও
কর' নাক দেরী আর,
দয়া করে আহা দুয়ারে এসেছে
সরেস সমজদার।

লাল গোলাপের পাঁপড়ি চাখিয়া
বলে 'হেলেঞ্চা' ভাল
শালগমে করে মাল্য রচনা
কুসুম লাজেতে মলো।

তৈলের জোরে চন্দন চেয়ে
হলো এড়ণ্ড দামী,
কোদালের সাথে চলিতে লেখনী
কোপ দেখে গেছে থামি।

ফলের মধ্যে তাল জিতিয়াছে
যেহেতু বৃহৎ আঁটি
কমলা আঙ্গুর পাত্তা পেলে না
রসালের ফল মাটী।

অশ্বত্থ বট নেহাৎ অসৎ
যেহেতু নাহিক কাঁটা
মেটের জোরেতে পশুরাজ হ'ল
অতীতের বোকা পাঁটা।

ভেড়ার শৃঙ্গ পরখ করিয়া
বলেছে হীরকে মেকী।
বাণীর বীণারে গীতের গমকে
হারাইয়া দেছে ঢেঁকী।

মুদ্গর কাছে 'মোহ মুদ্গর'
একদম গেছে কেঁদে।
বেউর বংশ 'রঘুবংশকে'
ঘুরালো টিকিতে বেঁধে।

আরশোলা দেছে হারায়ে আতরে
দাপটে কাঁপায়ে মহী।
যন্ত্রের মাঝে দেখছি হ'ল যে
হামানদিস্তা জয়ী।

আসিয়াছে ভাই নিরেট জহুরী
বলিহারী গুণপণা
নিজে চর্ম্মের 'চামুটীতে' ঘসে
কসিয়া দেখিছে সোণা

চিবায়ে মুক্তা হাসিয়া বলিছে
ভুট্টার চেয়ে কড়া।
শুভ্র চামর 'ঢেঁরায় পাকায়ে
ভাজিছে গরুর দড়া।

মহল দারের তুল দাঁড়ি নিয়ে
ছুটিয়া বেড়ায় খেপা।
বোঝেনা অবোধ হন্দর দিয়ে
প্রতিভা যায় না মাপা।

গান বাজাইয়া তান শিখিয়াছে
তাহাতেই 'বাঁয়া' বাঁধে।
সুমুখে বসিয়া পাকা পাখোয়াজী
গালে হাত দিয়া কাঁদে।

পুস্তক-পরিচয়

ভদ্রা—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ২৲ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি ঠিক গার্হস্থ্য উপন্যাস নয়, তবে ঘরের অনেক কথা ইহাতে আছে। প্রথমাংশ রোমান্সের মত হৃদয়গ্রাহী; শেষাংশ গার্হস্থ্য চিত্রের ন্যায় করুণ, মর্ম্মস্পর্শী। লেখক নাট্যকার হিসাবে যথেষ্ট যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার নাটকগুলি সুখ্যাতির সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, পাঠ্য হিসাবেও সেগুলির যথেষ্ট প্রচার। বোধহয় ভদ্রাই তাঁহার প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসেরও অনেকস্থানে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; মূল আখ্যান ভাগকে গ্রন্থকার সুনিপুণ শিল্পীর মত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। তবে এই টানা—dragging নহে, ইহা চুম্বকের মত পাঠককে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া যায়। একটি নিরাশ জীবনের, ব্যর্থ হৃদয়ের করুণ আর্ত্তধ্বনি পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। গ্রন্থকারের ভাষা বা রচনা পারিপাট্যের পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

আমার কথা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ১৷৹ শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। একখানি সামাজিক উপন্যাস। ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও কয়খানি উপন্যাস লিখিয়া যশোধিকারিণী হইয়াছেন। আখ্যান সুন্দর। লেখিকার রচনাকৌশলও সুন্দর। তবুও অনর্থক বড় করিতে গিয়া গল্পটিকে লেখিকা সর্ব্বথা 'রক্ষা' করিতে পারেন নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না। স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। লেখিকার নিজস্ব ছাপ অনেক যায়গায় আছে, সে-সব স্থানগুলি অতীব মধুর।

কালাজ্বর চিকিৎসা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-বি প্রণীত। বহিখানি অতি অল্পদিন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আমরা চিকিৎসক নহি, চিকিৎসা শাস্ত্রে কিছুমাত্র অধিকার নাই, তবুও সাগ্রহে বহিখানি পাঠ করিয়াছি। দু'একজন চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে কালাজ্বর চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ ডাক্তার অরুণ বাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু কালাজ্বর দমনের একটা বিশেষরূপ সহায়তা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারাই বলিয়াছেন এই গ্রন্থখানি সমস্ত চিকিৎসকের পাঠ করিয়া দেখা উচিৎ; যাঁহারা পল্লীগ্রামে চিকিৎসা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। কলিকাতা, গুরুদাস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

অশ্বমেধা।—বেজগাঁও রাজমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত! এই বহিখানি প্রকাশ না করিলেই প্রকাশকগণ সুবুদ্ধির কার্য্য করিতেন।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার বাঙ্গালী সম্মিলনী।—বাঙ্গলার বাহিরে অনেক স্থানেই বহু-বাঙ্গালী আছেন; অনেকে আবার বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এমন লোকও আছেন। মধ্যপ্রদেশে তেমন বাঙ্গালীর অসদ্ভাব নাই। এই পুস্তিকাখানিতে মধ্যপ্রদেশের বাঙ্গালী-সম্মিলনের একটি বিবরণী ও নেতৃবৃন্দের অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি পাঠযোগ্য। রায়পুর বাঙ্গালী-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিক্রয়ার্থ কি-না লেখা নাই।

রুদ্ধ আবেগ- শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত। মূল্য ১৷৹ শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বহিখানি উপন্যাস। লেখক অল্পবয়স্ক, অভিজ্ঞতা কিঞ্চিৎ কম। তবুও আখ্যানে নূতনত্ব আছে, রচনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; পড়িতে আনন্দ পাওয়া যায়; ভাষায় কবিত্বও যথেষ্ট আছে। লেখক কালে উন্নতি করিবেন এ আশা দুরাশা নয়।

শ।

কলেজের ছেলে ?—না—

কলেজ হস্টেল, বাঁকুড়া

মাননীয় 'সচিত্র শিশির' সম্পাদক

মহাশয়, সমীপেষু।

মহাশয় !

আপনার পত্রিকাতে কতকগুলি বেথুন কলেজের ছাত্রী যে কতকগুলি কলেজের ছাত্রদের দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমাদের ছাত্রেরা যে অধঃপতনের পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা মনে করিলে স্বতঃই মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ছাত্রদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই তবে সেই ভদ্র মহিলাদিগকে আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যেন তাঁহারা এই কয়েকজনের কাপুরুষোচিত ব্যবহারে মনে না করেন যে সমস্ত ছাত্র-সমাজই এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে এখনও ছাত্র-সমাজে এমন অনেকজনই আছেন যাঁহারা তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও যাঁহারা তাঁহাদিগকে (ছাত্রীদিগকে) আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখেন।

পরিশেষে শুধু আমরা একটী সামান্য কথা আমাদের সুজনকেই বলিতে চাই। সমস্ত সমাজ বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা, এই বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীরা, যদি পরস্পরের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার ভাব পোষণ না করি তাহা হইলে আমাদের শেষ পরিণতি কি হইবে তাহা জানি না। অতএব আমাদের সেই ভদ্র মহিলাদের প্রতি এই অনুরোধ যে তাঁহারা সেই অবোধ ছাত্রদিগকে মার্জ্জনা করেন, যাহারা এখনও তাহাদিগের নিজেদের শুভাশুভ বুঝিতে পারে না।

ইতি— শ্রীগুরুপদ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীত্রিলোকেশ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীঅরুণ প্রকাশ ঘোষ।
" নির্ম্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।
" হরগোবিন্দ গাঙ্গুলি।
" শচীন্দ্র কিশোর ঘোষ।
" জয়চাঁদ সরকার।

(বাঁকুড়া ওয়েস্‌লিয়েন্ কলেজের কতিপয় ছাত্র)

[এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই কাগজে বাহির হইবে না। উপরি লিখিত ছাত্রগণের মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। এক ভদ্রলোক একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে হসিতা স্নিনা ইত্যাদি নামে কোন মেয়ে বেথুন কলেজে পড়ে না। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য যে মেয়েদের যে নাম ছাপায় বাহির হইয়াছে তাহা আসল নাম না-ও হইতে পারে; তবে ঘটনাটি যে সত্য সম্পাদক তাহা সন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন।

সঃ, স-শি।]

"আমি সারা সকালটি বসে বসে সাধের মালাটি গেঁথেছি"—

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

শিল্পি—শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩১ সাল। [৬ষ্ঠ সপ্তাহ

স্বপ্নাদ্য মাদুলী

(বিশেষ ফলপ্রদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হাতে মাথা কাটার কথা শুনিয়াছেন ত,

গৃহিণীর নন্দ-দাদার স্বপ্নাদ্য মাদুলী'র বলে—

ঐ দেখুন ! এক চড়ে মুণ্ড কোথায়—

আর ধড় কোথায় ! !
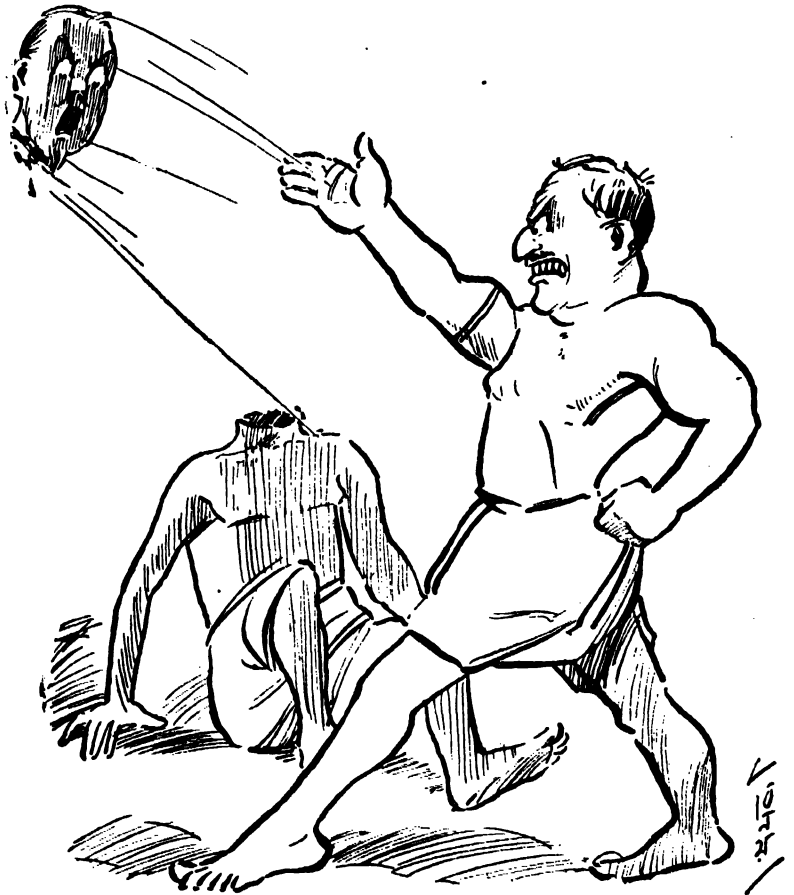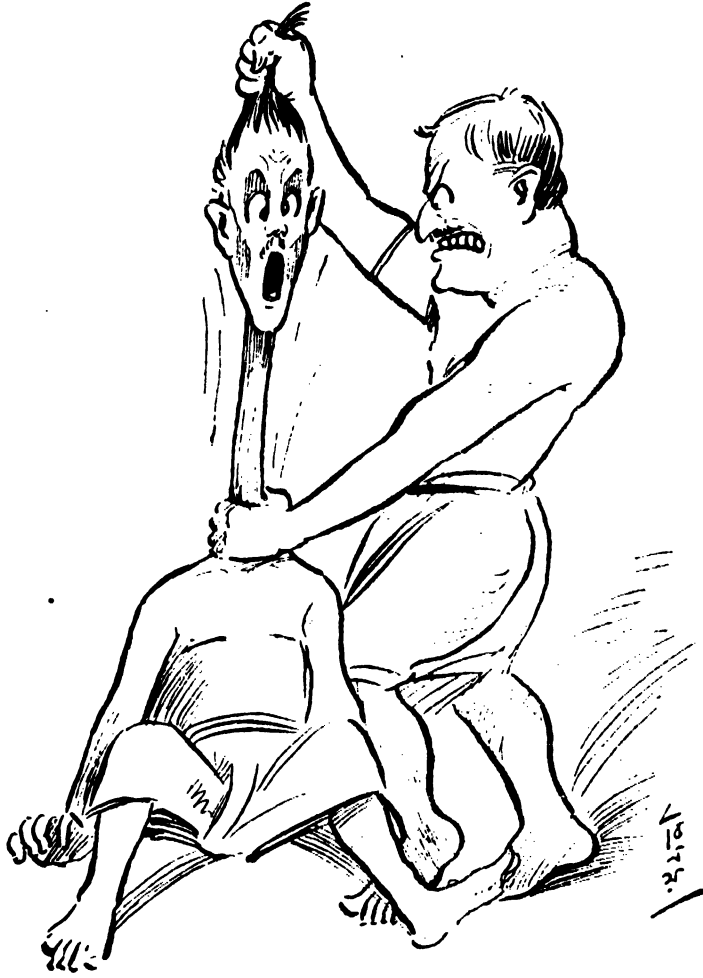
চুলের মুঠি ধরিয়া এক টান ও——

গলাটি তিন হাত লম্বা হইয়া গেল।

গৃহিনী। কি সর্ব্বনাশঃ হলো গো! নন্দ-দা কি ছাই পাশ ওষুধ দিলে গো—কর্ত্তা যে খেপে গেল। আমারই চুল ধরে টান্‌ছে গো!

"গিন্নি, তা'হলে সব স্বপ্ন ?"

"তা আমি কি জানি ! ওষুধটা খাও দিকি !"

"দাও !"

শেষ ।

এ একটা গল্প
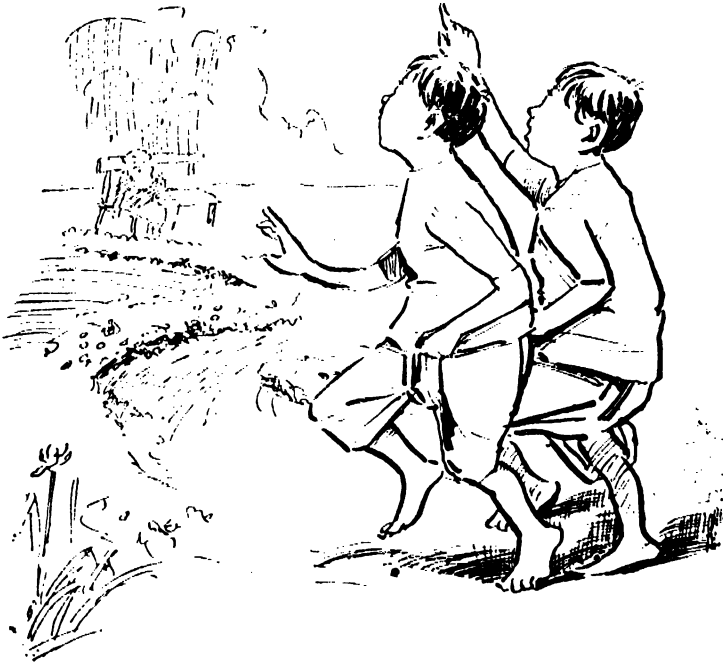
বালকদ্বয়।—কি সুন্দর প্রজাপতিটা! ধরে কাঁচের বোতলে তুলে রাখব।
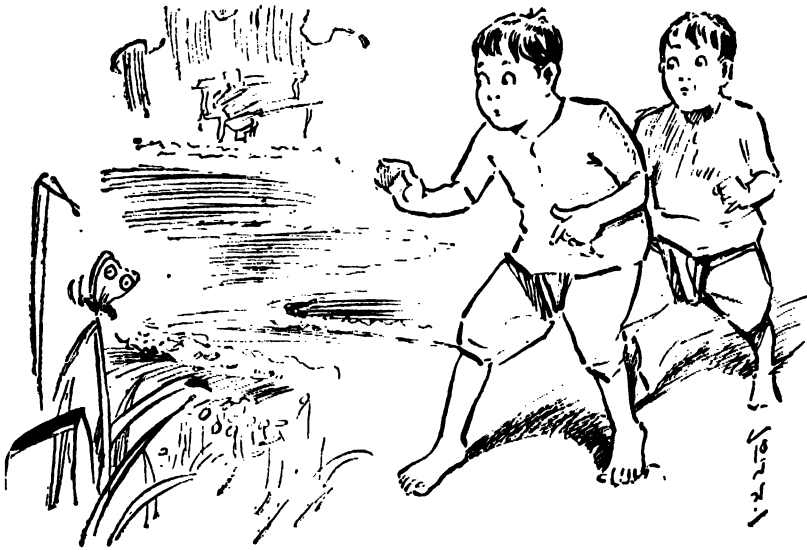
ঐ যা, উড়ে গেল ! চ' চ'—

বুড়োর দাড়ী—কম্বলের ওপোর গিয়ে শুলো যে রে ভাই!
এক কাজ কর—তুই একদিকে ধর, আমি একদিকে ধরি, তা'হলেই
প্রজাপতিটা আটকা পড়ে যাবে'খন। কি বলিস? ধর!
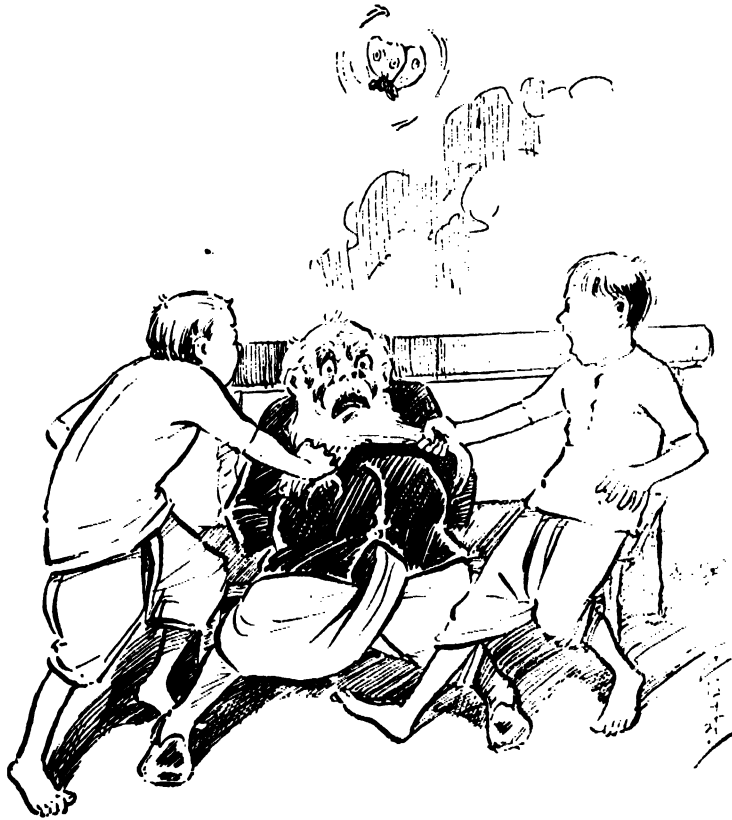
—ধরিছিস ?—মার টান—

যেন পালায় না, জোরে—

"ওরে পাষণ্ড !"

রঙ্গমঞ্চে আর্টের কদর

[সফিয়া খাতুন বি-এ]

এ জিনিষটি বিলেতি আমদানী। অনেকে বলতে পারেন তবে কি আমাদের দেশে মান্ধাতার আমলে সঙ্গীত বা নৃত্য-কলার আদর ছিল না? আমিও বলি হাঁ ছিল, তবে ঠিক এমনি ধরণের নয়। আমাদের দেশে নৃত্যকলার যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তার সমজদার লোকও যথেষ্ট ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রিভুবন বিখ্যাত নাচ্‌নেওয়ালী উর্ব্বশী যে এ যুগের মেরী পিক্‌ফোর্ড, নরমা থেলমেজ, কি রোথরোলেও প্রভৃতির চাইতে নৃত্যকলায় কম খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা বলতে পারি না। তবে তাঁর সমজদার ছিলেন দেবতারা। জানিনা দেবতাদের আমলে খবরের কাগজ ছিল কি না। থাকলে হয়ত তখনকার কাগজগুলিতে শ্রীমতী উর্ব্বশীর অনেক স্তুতিগান বের হয়ে থাকবে। বড় আপ্‌সোষের বিষয় যে মর্ত্তের দেবতারা তার খবর পান নাই; পেলে হয়ত শ্রীমতী উর্ব্বশীর নৃত্যকলার সমালোচনাটাও অন্ততঃ পড়তে পারা যেত।

কিন্তু এ যুগে উর্ব্বশীর দৌহিত্রীদের নিয়ে আমাদের দেশের কতকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক বেজায় তোলপাড় সুরু করে দিয়েছেন। বিষয়টা এত গড়িয়েছে যে কতকগুলি নট ও নটির বাহবা বা তাদের শ্রীচরণে পূজার ডালী দেবার জন্য নিজস্ব পত্রিকাও সৃষ্ট হয়ে গেছে। পূর্ব্বে জানতাম কোন রাজনৈতিক দলের এমনি করে এক একটী মুখপত্র থাকত। যেমন অসহযোগের মুখপত্র "সার্ভেন্ট" আর স্বরাজ্যদলের মুখপত্র "ফরওয়ার্ড।" বিষয়টা কিন্তু একেবারে ফেলে দেবার নয়। কারণ এমন পত্রিকা আছে যাঁরা শুধু— নাচ্‌-গান ভিন্ন অন্য কোন দেশের খবর ছাপেন না। তাঁদের কাগজগুলিও বেশ চলছে। তা না'হলে পত্রিকার মালিকরা কি ঘর থেকে টাকা এনে খরচ করছেন? এত দরদী বাংলায় আজও জন্মান নি। হয়ত কোন জন্মে হতে পারে।

কিন্তু যাঁরা নট্‌ নটীদের পূজারী তাদের নিকট আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। জানি না তাঁরা দয়া করে তার সদুত্তর দিবেন কি না। সকলেই বোধ হয় জানেন যে আমাদের দেশের লোক সাহেব সাজতে গিয়ে সাহেবদের যেটুকু ভাল সেটুকু না নিয়ে কি করে সাহেবী কায়দায় হাসতে, নাচতে, গাইতে আর মদ খেতে পারা যায় তা শিখে আসেন। বর্ত্তমানের নৃত্যকলার পূজারীদেরও দেখছি ঠিক তাই। যেহেতু সাহেবরা খবরের কাগজে নট নটীদের হাব ভাবের বা উলঙ্গ নৃত্যের ছবি ছেপে তাদের স্তুতিগান করে বাহবা দিয়ে থাকে আমরা বাঙ্গালী! আমাদের তা না করলে কি আর চলে? কিন্তু সাহেবরা শুধু এখানে দমে যায় না। তারা শুধু মুখে মুখে বাহবা দিতে জানে না। যে বাহবা দিয়ে থাকে তা তাঁদের অন্তর হতে। তাই দেখতে পাই সে সব দেশের অনেক রাজা রাজুড়াদের ছেলে মেয়েরা সে সব নট নটীদেরে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে যান। জিজ্ঞেস করি হে নৃত্যকলার পূজারী? ষ্টার, মিনার্ভা কি মনোমোহন প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের কোন অভিনেত্রীকে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি? জবাব, মোটেই না। তার কারণ হাওড়া ব্রীজ যিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল তা দেখবার দরকার কি? এতবড় নজীর থাকতে বিয়ে করতে যাব কেন? অভিনেত্রীর গান শুনেছি, তার গানকে বাহবা দিয়েছি। মানলুম কথাটা সত্যি। স্বীকারও করি। কিন্তু এটা কি একবার ভেবে দেখেছ যে এমনি রং বিলাসের প্রশ্রয় দিয়ে সমস্ত ভারতের কি সর্ব্বনাশ করছ? কতকগুলি হতভাগিনীকে তাদের পৈশাচিক বৃত্তির প্রশ্রয় দিচ্ছ। তাদের নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করবার সময় দিচ্ছ কি?

আর একটা কথা, হাওড়া ব্রিজের উপমাটা যদি সত্য হয় তা'হলে নট মহাশয়েরা কোন পুণ্যবলে নির্দ্দোষী হয়ে গেলেন? তাদের সমাজে চলাফেরা করতে ত সমাজপতিরা কোন বাধা দিতে দেখি না? তাদের সবাই রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা নাকি? না পুরুষ বলে সাতখুন মাপ এই বেদবাক্যের কৃপায় বেঁচে যান। মা বোনের জাতকে নিয়ে এমনি খেলা খেলতে কি বাঙ্গালীর লজ্জার বিষয় হয় না?

আসল কথা হচ্ছে নট নটীদের অভিনয় কলার মাহাত্ম্য

ইউরোপের লোক যে ভাবে দেখিয়ে থাকে আমরা সে ভাবে দেখাতে পারি না। কারণ ইউরোপে অনেক ভদ্র ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে মেয়েরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী হয়ে থাকেন। কাজেই সে সব দেশের একটি অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সম্মান একটি কবির চাইতে কম নয়। তাই সারা ইউরোপ চার্লী চেপ্লিকে পূজা দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বিষয়টি অন্য রকম। অভিনেত্রী হয় তারা, যারা সমাজের কাছে, দেশের কাছে অতি ঘৃণ্য ও পাপিয়সী, যারা দেহ বিক্রি করে পেটের অন্ন যোগাচ্ছে। সেই পতিতা হতভাগিনীরা এবং নটদের বেশীর ভাগই সে সব হতভাগিনীদের দেহ টাকা দিয়ে ক্রয় করে থাকেন। অনেক অভিনেতার জীবনীতে পাওয়া যায় যে অভিনেতা সেজে তাদের স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র পরিবার ছেড়ে অভিনেত্রী রক্ষিতাদের নিয়েই কালযাপন করে। কাজেই সে সব অভিনেতাদের সামাজিক হিসাবে একটী পতিতার উপরে স্থান দেওয়া যায় না। তাদের পুরুষ বেশ্যা বল্লে মানায় ভাল। সব নটই ত আর গিরীশ ঘোষ হতে পারে না? কাজেই বলি সে সব শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তাদেরে নিয়ে এতদূর বাড়াবাড়ি করা কি বড় ভাল দেখায়? একটা হাসির কথা বলছি। একদিন খবরের কাগজে দেখলাম কোন থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে মিস্ অমুক, অমুকের ভূমিকায়। তারপর শুনতে পেলাম সে মিস্‌টি নাকি মস্ত বড় গায়িকা এবং কোন নামজাদা অভিনেতার রক্ষিতা। মিস্ মহাশয়ের নাকি অনেকগুলি পুত্র কন্যাও আছেন। আবার অনেক কাগজে দেখি শ্রীমতী অমুক ইত্যাদি। বলি বাংলা ভাষার শ্রীমতী কথার অর্থটা কি ঠিক তাই?

কথা হচ্ছে ওদের শ্রীমান শ্রীমতী বা শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্তা বলতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাদের ঠিক তেমনি তৈরী করে নেওয়া উচিত। তাদের এই পাপ পঙ্কিলময় পথ হতে টেনে তুলে নিয়ে সত্যিকার মানুষের মত মানুষ করে লওয়া উচিত। তাদের ধর্ম্মপ্রাণ করে সমাজে স্থান দেওয়া উচিত। তবেই বুঝব যে তাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখান হয়েছে। তা না'হলে সে সম্মান সিমুল ফুলের মত হয়ে যায়।

আজকাল আবার কেহ কেহ বলছেন যে দেশের যুবকদের স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্য নাকি পতিতার দেহের বেশাতি থাকা ভাল। এ সব উক্তি শুনে বড় লজ্জা হয়। নারী জাতটাকে আম কাঁঠালের মত ভোগের জিনিষ মনে না করলে এ সব কথা কোন দিনই বলা যায় না। ছেলেদের ব্যভিচারকে যে শুধু প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে তা নয়—তারা স্বাস্থ্যরক্ষার্থে বেশ্যালয়ে গমন করে থাকে এই নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর কথাকে সমর্থন করে ছেলেরা যে তাতে কোন পাপ করছে না—তারও ইসারা দেওয়া হয়েছে। এ পোড়া দেশ না'হলে এমন সুব্যবস্থা হবে কেন? দেশের পুরুষগুলি বাঁচলেই ত হ'ল! মেয়ে দিয়ে কি কোন কাজ আছে? ওদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে তাদের দেহকে অপবিত্র করে নানাপ্রকারের অকথ্য ও জঘন্য রোগের আবাস করে, সারাটা জীবন ভরে তাদের মাথায় দুঃখের বোঝা চেপে দিয়ে তবু দেশের যুবকদের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হবে। একেই বলে জোর যার মুল্লুক তার। বলা বাহুল্য যে অনেকে আবার খবরের কাগজে সেই সব মেয়েদের উলঙ্গ নাচ গান ও হাসির ভেতর হতে অশ্রুতপূর্ব্ব তত্ত্বাবলী নির্দ্ধারণ করে থাকেন। যাঁরা বালবিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা বা বহু বিবাহ নিবারণে দু'কথা লিখে থাকেন, তাদের মুণ্ডচ্ছেদনে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েন। তাঁদের কাগজ কলম নিয়ে এমনি করে বসে পড়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। সেটা হচ্ছে এই যে যদি মেয়েরা লেখাপড়া শিখে এমনি করে নিজ নিজ স্বাধীন মত প্রকাশ করতে সাহস পায়—তা'হলে পুরুষ যে এমনি করে "কুচ্ পরোয়া নেই" করে বিলাস ব্যসনে ও স্বেচ্ছাচারি হয়ে দিন কাটাতে পারবে না। তাদের এ সকল কুপ্রবৃত্তিগুলিকে যে সংযত করতে হবে সেই সব ভয়েই এঁরা হা-হুতাশী হয়ে পড়েন। হায় ভারতমাতা! তোমার আরও কত লীলা দেখতে হবে মা! শুধু তাই ভাবছি। এ দেশের লোকের চোখ মেলিয়ে দে মা! তা নইলে যে আর উপায় দেখছি না। এ তাণ্ডব লীলা যে আর সহ্য হয় না মা। তোর নারীত্বকে জাগিয়ে তুলে দেখিয়ে দে যে তুই সুপ্ত ন'স্—এখনও জাগ্রত। আবার তোর সেই শ্রী দেখিয়ে দে মা!

অলমিতি বিস্তরেন—

স্বাধীন বাঙ্গলার ধর্ম্মমত

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম, এ,ভাগবতরত্ন]

জগতে ধর্ম্মের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, এত আর কিছুর জন্যই হয় নাই। প্রাচীনকালের লোক সত্যকে অতি সঙ্কীর্ণভাবে উপলব্ধি করিত। তাই নিজের সম্প্রদায়ের কাছে সত্যের যে রূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিত। অন্য সম্প্রদায় যদি সত্যের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইতেন, তখনই ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যাইত।

কিন্তু ভারতবর্ষ এই সাধারণ নিয়মের বাহিরে। এখানে মুনিঋষিরা বনে বনে তপস্যা করিতেন। তপোপ্রভাবে আধ্যাত্মিক জগতের নানা সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইতেন। তাঁহাদের অমানুষিক মনীষা-প্রভাবে দর্শনশাস্ত্রের নূতন নূতন মতবাদ বাহির হইত। কথায় বলে যে মুনির একটা নূতন মত নাই, তিনি মুনিই নন। ভারতে অসংখ্য পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এমন এক প্রকার আশ্চর্য্য উদারতা ছিল, যে তাহারা একই নগরে পাশাপাশি বসবাস করিত। ধর্ম্মের নামে ভারতবর্ষে কদাচিত রক্তপাত হইয়াছে।

স্বাধীন বাঙ্গলায় ভারতের এই উদার ধর্ম্মভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এখানে অনেক মতবাদ উঠিয়াছে আবার কাল প্রভাবে তাহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন দিন এখানে ধর্ম্ম বিরোধ বলিতে ইউরোপে যাহা বুঝায় তাহা ছিল না। বরং বাঙ্গলা-দেশ সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে সকল ধর্ম্মই কিছু কিছু দান করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বাঙ্গলাদেশ প্রথমে অনার্য্যের দেশ ছিল। অনার্য্যদের ধর্ম্মমত ও আচার ব্যবহার আমা-দের হিন্দু সমাজে কতখানি মিশিয়াছে তাহা এখনও ভাল করিয়া নির্ণিত হয় নাই। তবে একথা সত্য যে আর্য্যেরা অনার্য্যদের নিকট হইতে অনেক দেবদেবী নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে শিবঠাকুরের প্রভাব অসামান্য—তাঁহার উপাসক অনেক। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে শিব বৈদিক দেবতা নহেন। তিনি যযাবর সম্প্রদায়ের দেবতা। পরবর্ত্তীকালে আর্য্য দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় কালী উপাসনাও অনার্য্যদের নিকট হইতে লওয়া। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীর বিবাহ প্রথা—ভাসুর শশুরের সামনে বধূদের লজ্জা করা—প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নহে। সুতরাং বাঙ্গালার পারিবারিক আচার ব্যবহারের মধ্যেও অনেক আশ্চর্য্য ভাব আছে। আর্য্য অনার্য্য এককালে খুবই যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যখন আর্য্যেরা বাঙ্গলায় অনার্য্যদের মধ্যে বসবাস আরম্ভ করিলেন তখন উভয়জাতির মধ্যে ভাব ও রক্তের আদান প্রদান আরম্ভ হইল।

কিন্তু প্রধানতঃ বাঙ্গলাদেশ বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিল। তথাকথিত রাজা আদিশূরের পূর্ব্বেও যে বাঙ্গলা-দেশের বৈদিক আলোচনা প্রবল ছিল, তাহা আমরা দামোদরপুরের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য গুপ্তসম্রাটগণের নিকট হইতে ভূমিদান পাইয়াছিলেন। ঐ দানপত্রে মহাভারত ও পুরাণাদির শ্লোক উদ্ধৃত আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে কেমন করিয়া বৈদিক সভ্যতা ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার উহাই প্রমাণ।

কিন্তু বাঙ্গলাদেশ কেবলমাত্র বৈদিক ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে নাই। বাঙ্গলার মনে ধর্ম্মের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছিল। বুদ্ধ ও মহাবীরের মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, বাঙ্গলাদেশও তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্য বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ও জৈন মত রীতিমত সমাদর পাইয়াছিল! জৈনধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা মহাবীর স্বামী

দ্বাদশ বৎসরকাল রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশকে সাধনার প্রকৃষ্ট স্থান মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই এস্থানে বহুকষ্টে অত দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাঁ'গরই নাম অনুসারে বর্দ্ধমান জেলার নাম করণ হইয়াছে। জৈনদিগের সর্ব্বসমেত ২৪ জন তীর্থঙ্কর আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ২৩ জনের সহিত বঙ্গদেশ অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট।

জৈনগুরু নেমিনাথ অঙ্গবঙ্গ প্রভৃতি দেশে জৈনধর্ম্মপ্রচার করেন বলিয়া জানা যায়। পার্শ্বনাথ বলিয়া আর একজন জৈন প্রচারক বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্ম বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে আদৃত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে জৈনধর্ম্ম হিন্দুদের অনেক দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জৈনদিগের মধ্যে জাতিভেদ আছে। এই সকল কারণে হিন্দুদের মধ্যে জৈনধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করা বিশেষ কষ্টকর হয় নাই।

জৈনদিগের মধ্যে দুইটী প্রধান সম্প্রদায় আছে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। বাঙ্গলাদেশে দিগম্বর সম্প্রদায়েরই অধিকতর প্রভাব ছিল। কেননা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন হুয়েনসাং আমাদের দেশ পরিভ্রমণ করিতে আসেন, তখন এখানে বহুতর দিগম্বর নিগ্রন্থ জৈন উপাসক দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও হিন্দুরা বাস করিতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা হইত কিন্তু কখনও বিবাদ হইত না।

জৈনধর্ম্মের যেখানে একদিন এতদূর প্রভাব ছিল, আজ সেখানে জৈন-কীর্ত্তির নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করিয়া বাহির করিতে হয়। তবে জৈনধর্ম্ম একেবারে দেশ হইতে লোপ পায় নাই। আজও বাঁকুড়া জেলায় অনেক শ্রাবক উপাধিধারী বাঙ্গালী জৈন বাস করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের ধর্ম্মমত এতকাল এদেশে বাস করিয়া অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইঁহারা বিশুদ্ধ জৈনমতের সর্ব্বথা অনুকরণ করেন না। বাঙ্গলা দেশে ঠিক কোন সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে অনুমান হয় যে প্রিয়দর্শী অশোকের সময় এদেশ যখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন নিশ্চয়ই সম্রাট এখানে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তিতে বা তমলুকে একটী অশোক লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসনের একটী সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইয়াছে। অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যের সকল স্থানেই ধর্ম্মমহাপাত্র উপাধিধারী কর্ম্মচারীদিগকে প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা প্রজাদিগকে সাধু ধর্ম্মপথে লইয়া আসিতেন। কোন প্রজা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে, তাহাকে মৃদু শাস্তি পর্য্যন্ত দিতেন। অশোক জানিতেন ধর্ম্মই জাতির প্রাণ। তাই সেই পুণ্যশ্লোক সম্রাট প্রজার হিতার্থে এতাদৃশ যত্নবান হইয়াছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের দেশে মাথা লুকাইয়া ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই বাঙ্গলাদেশেই শীলভদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পুণ্যকীর্ত্তি পণ্ডিত আর তখন ভারতবর্ষে ছিল না। তাই তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। পাণিণির ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। তাঁহার জীবনে আমরা বাঙ্গলার বৌদ্ধ ও হিন্দু শিক্ষার পূর্ণ সমন্বয় দেখিতে পাই। তিনি স্বয়ং মহাযান বাদী ছিলেন।

বাঙ্গলায় মহাযান বাদেরই প্রসার হওয়া অধিকতর সম্ভব। মহাযান ধর্ম্মে বুদ্ধকে ভগবান রূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। হীনযানে বুদ্ধ কেবলমাত্র ত্রাতা Saviour ছিলেন। হীনযানে বুদ্ধের মূর্ত্তি পূজা করা এমন কি নির্ম্মাণ করাও দূষনীয় ছিল। তাই কোনস্থানে বুদ্ধের স্মরণ চিহ্ন স্থাপন করিতে হইলে মাত্র দুইখানি পা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু কনিষ্কের সময় হইতে যে মহাযান বাদের উৎপত্তি হইল, তাহাতে বুদ্ধের সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিই দিন দিন আমদানী হইতে লাগিল। আজ দিন কয়েক হইল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র বরোদা লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় Bhuddhist

Conography নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অসংখ্য বুদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি চোখে পড়িবে।

বাঙ্গলাদেশ চিরদিনই রূপের উপাসক। বাঙ্গলার জলে বাতাসে যে—সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গলার প্রাণে যে সুষমা আছে, তাহা দেবতার সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত মিশাইয়া পূজা করিতে বাঙ্গালী বড় ভালবাসে। তাই বোধ হয় এখানে মহাযান বাদের এতদূর প্রসার হইয়াছিল।

কিন্তু যে সময়ে শীলভদ্র নালন্দায় অধ্যক্ষতা করিতেন, ঠিক সেই সময়েই শশাঙ্ক কর্ণ সুবর্ণে রাজত্ব করিতেন। ইনি স্বয়ং শৈব ছিলেন, তাই বৌদ্ধধর্ম্মকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। কথিত আছে যে শশাঙ্ক গয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। মূল উৎপাটন করিয়া তাহার তলায় মধু ঢালিয়া দিয়াছিলেন—পিপীলিকারা সেই মধু খাইতে যাইয়া মূলের যাহা কিছু বাকী ছিল তাহাও খাইয়া ফেলিয়াছিল। শশাঙ্কের সহিত থানেশ্বর ও কনোজের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের বিবাদ ছিল। সুতরাং হর্ষবর্দ্ধনের দলের লেখক শশাঙ্ক সম্বন্ধে যাহাই বলিবেন, তাহাই যে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ঐতিহাসিকগণ আজকাল সন্দেহ করিতেছেন যে শশাঙ্ক সত্যসত্যই খুব বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন কি না।

যাহা হউক শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধদের নির্য্যাতনও করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন নাই। পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিশুদ্ধতার মধ্যেও অনেক গলদ ঢুকিয়াছিল। যাহা হউক তিব্বত প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নামে তখন অনেক ব্যভিচার ও বীভৎস কাণ্ড চলিত। তাই তিব্বতের অধিবাসীরা বাঙ্গলাদেশ হইতে পণ্ডিত লইয়া যাইয়া ধর্ম্ম-সংস্কার করাইতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শান্তরক্ষিত প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া সেখানে বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যাইয়া অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের যে বাদ বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল তাহার নাম কালচক্রযান। মৃত্যু হইতে এই যান অবলম্বন করিলে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম কালচক্রযান। ইহার মধ্যে তান্ত্রিক আচার অত্যন্ত বেশী।

এই সময়ে বাঙ্গলার বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে প্রাপ্ত বাঙ্গলা বৌদ্ধগান ও দোঁহার হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভূমিকা হইতে খানিকটা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

"দোঁহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটি দোঁহার বলিয়াছে গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিতেন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুপাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয় বজ্রের টীকায় ষড়দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ লোকায়ত ও সাঙ্খ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল, যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয় ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক, যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তাহাও পড়ুক। আর তারা পড়েও তো, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে। আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্যলোকে দিক্ না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ববেদের সত্ত্বাই নাই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে। সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ ত আর পরমার্থ, নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না—বেদ কেবল বাজে বকে।"

এ সময়ে বৌদ্ধগণ সহজধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, সহজবাদ হইতেই পরে বৈষ্ণব সহজিয়াদের উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গলার একটা বিশিষ্ট মত সহজিয়দের মধ্যে ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এককালে রাজা রাজ্যপাট ছাড়িয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। Monastic Life বা সন্ন্যাস জীবনের উপর অত্যধিক দৃষ্টি দেওয়াতে বাঙ্গলার ধর্ম্মের অনেকটা অধঃপতন ঘটিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে দেখা যায় যে রাজা রাজ্যপাট ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার রাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—

না ছাড়ও না ছাড়ও মোরে বঙ্গের গোসাঞি,
তোমাবিনা উতুলা থাকিবে কোন্ ঠাঞি॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া ভবাণী তার সঙ্গ॥

যে ধর্ম্মে এমন প্রেমিকা পতিব্রতা রমণীকে ছাড়িয়া বনে চলিয়া যাইতে উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্ম হইতে যে দেশের বিশেষ উপকার হইতে পারে, তাহা বোধ হয় না।

বাঙ্গলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আরও অনেক ছাপ রহিয়া গিয়াছে। শূন্যবাদ বাঙ্গলার মর্ম্মে মর্ম্মে একদিন প্রবেশ করিয়াছিল। রাণী ময়নামতী প্রশ্ন করিতেছেন—

কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার।
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার॥
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ।
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ॥

যোগী তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রকাশ॥

এরূপ উত্তর যেন অনেকটা নাস্তিকের মতন।

বাঙ্গলা ভাষায় শূন্যবাদ লইয়া একখানি পুরাণই রচিত হইয়াছিল। তাহার নাম শূন্য পুরাণ। এখানিতে সৃষ্টি তত্ত্ব বড় অদ্ভুত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখক বলিতেছেন—

নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সনা নাহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল, ন ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর না ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥

এ ভাবটী আমরা উপনিষদেও অনেকটা পাই। কিন্তু যখনই শূন্য পুরাণ বলিতেছেন!

চৌদ্দজুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উর্দ্ধ নিশ্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই॥

এবং এই উল্লুক পক্ষী হইতেই সৃষ্টি হইল, তখন হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম আজ বাঙ্গলাদেশে অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু হাজার বছর আগে ঠিক্ ইহার উল্টা ছিল। তখন অধিকাংশ লোকই ছিলেন বৌদ্ধ। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম কোনদিনই হিন্দু ধর্ম্মকে কোনঠাসা করিয়া দিতে পারে নাই। পাল সম্রাটগণের সময়েও যে হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা ও জাতিভেদ প্রথা ছিল, তাহা প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। হুয়েন সাং যখন আমাদের দেশে বেড়াইতে আসেন তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মই প্রবল ছিল। কেননা তিনি মাত্র ৩০টীর অধিক সংঘারাম এখানে দেখিতে পাইয়াছিলেন—এ গুলিতে ২০০০এর অধিক বৌদ্ধ স্থবির বাস করিতেন। কিন্তু তিনি শতাধিক দেবমন্দির দেখিতে পাইয়াছিলেন। পাল রাজাদের সময়ই বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলায় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন ধর্ম্ম ভাবুকের পূজায় বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি চিহ্ন দেখা যায়। এ পূজার পুরোহিত হাড়ী ডোম। বীরভূম বাঁকুড়া অঞ্চলে ধর্ম্মঠাকুরের খুব প্রভাব। বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েই এদেশে বেশ প্রবল ছিল। পরে অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু দেবদেবীরূপে পূজিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়েন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় শিববাড়ীর একটী বুদ্ধ মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—এ মূর্ত্তিটী আজও শিবমূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতেছেন। এইরূপে কত বৌদ্ধমূর্ত্তি বাঙ্গলার হিন্দু দেবদেবী রূপে পূজিত হইতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

বাঙ্গলা দেশে এককালে নাথধর্ম্মের খুব প্রচার ছিল। আজও অনেক যুগী নাথধর্ম্মাবলম্বী। এই নাথের ধর্ম্মের উৎপত্তি বাঙ্গলার স্বাধীনতার যুগেই হইয়াছিল। গোরক্ষনাথ বাঙ্গলার নাথধর্ম্ম প্রচার করেন। ইঁহারা নিরঞ্জন আত্মার স্বরূপ দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রাণায়ামদ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া উপাসনা করিতেন। স্থানের স্থান অনুসারে নাথসিদ্ধগণ হাড়পা, কালিফা প্রভৃতি নাম পাইতেন। নাথধর্ম্মের গোরক্ষনাথকে লইয়া আমাদের ময়নামতীর গান রচিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে একটি ধর্ম্ম কোন দিন অপ্রতিহত প্রভাবে প্রচলিত হয় নাই। বিভিন্ন ধর্ম্ম একই সময়ে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সেগুলির প্রতি সমান ভাবে উদারতা প্রদর্শন করিত।

পরলোকে সুব্রহ্মণ্য আয়ার

মাদ্রাজের মুকুট-মণি খসিয়া পড়িল। গত শুক্রবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় ভারতপূজ্য সুব্রহ্মণ্য আয়ার বিরাশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের স্মৃতি বাঙ্গালী সকৃতজ্ঞচিত্তে চিরদিন স্মরণ করিবে; কেননা, বাঙ্গলার গৌরব স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন অপরিচিত সন্ন্যাসী বেশে মাদ্রাজ নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন সেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিশিখা যাঁহারা চিনিতে পারিয়াছিলেন, সুব্রহ্মণ্য আয়ার তাঁহাদের অন্যতম। যে কয়েকটী মাদ্রাজী যুবকবন্ধু স্বামিজীকে আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, জজ সুব্রহ্মণ্য তাঁহাদেরই একজন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজের 'আমার সমরনীতি' নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—'* * * * আমি মাদ্রাজের কয়েকটী বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় পৌঁছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন—কেবল একজনকে অনুপস্থিত দেখিতেছি—জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ার। আর আমি এই ক্ষেত্রে উক্ত ভদ্রমহোদয়ের প্রতি আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাতে প্রতিভাশালী পুরুষের অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান এবং এ জীবনে ইঁহার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু আমি পাই নাই;—তিনি ভারতমাতার একজন যথার্থ সুসন্তান!"

সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

যাপন করিয়াছেন। কি সরকারী কার্য্যে, কি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসী রাষ্ট্রক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র তাঁহার জীবন্ত মনুষ্যত্ব জাতিকে উন্নতি পথের প্রেরণা যোগাইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরকালে সার্থক হইয়াছিল।

শ্রীমতী বেশান্ত অন্তরীণে আবদ্ধ হইলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লোকমান্য তিলক ও গান্ধীর সহিত যোগ দিয়া বৃদ্ধ সুব্রহ্মণ্য 'হোমরুল' আন্দোলনের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় গোপনে লোক মারফৎ তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনের নিকট ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও আমেরিকা আলোড়িত হইয়াছিল। কর্ত্তাদের ধাপ্পাবাজী এমন করিয়া নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতে তিনি কোন দ্বিধা সংশয় অনুভব করেন নাই। পার্লামেণ্টে এই প্রসঙ্গ লইয়া মণ্টেগু আয়ার মহাশয়কে যে অসম্মানসূচক কথা বলেন, তাহার ফলে তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। 'রিফর্ম্ম' অনুসন্ধানকালে, লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের—ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তার রক্তচক্ষু দেখিয়া তিনি ভীত হন নাই। তেজস্বী বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ লাট সাহেবের উদ্ধত কণ্ঠস্বরের মেঘমন্দ্রে জবাব দিয়াছিলেন। এমন সাহস, এমন বীর্য্য—খুব কম ভারতসন্তানই দেখাইয়াছেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের হিংসামূলক সিপাহী-বিদ্রোহও এই মহাপুরুষ দেখিয়াছেন, আবার ১৯২১এর অহিংস আইন অমান্যের আন্দোলনও তিনি দেখিয়াছেন। সেই হিংসামূলক বিপ্লবের কাল হইতে অহিংসমূলক সত্যাগ্রহের যুগ পর্য্যন্ত এই ভারতমাতার যথার্থ সুসন্তান সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব প্রচেষ্টায় দেশের সেবা, জাতীয় হিতসাধনকে ধ্রুবতারা করিয়া সুদীর্ঘ জীবন বার্দ্ধক্যে, জরায় তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও একান্তে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া দেশের কল্যাণ-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন—সেই সাধনার মঙ্গলাশীষ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারত আজ হাহাকার করিয়া উঠিবে। ভারতমাতা তাঁহার একজন যথার্থ সুসন্তান হারাইয়া দরিদ্র হইলেন। বাণপ্রস্থাবলম্বী সাধক ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা অবিধেয়;—ভগবান তাঁহার আত্মার সদগতি বিধান করুন। আনন্দবাজার

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

অর্থ কিম্বা উপদেশ বুদ্ধিমতী অর্দ্ধাঙ্গিনীর নিকট লাভ করিতে না পারিয়া, অখিলবাবু বিষণ্ণ মুখে আবার বহির্বাটীতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; ভাবিতেছিলেন যে, সেখানে যদি কোনও পরিচিত ভদ্রলোকের নিকট কেবল সাতদিনের জন্য দুইশত টাকা ঋণ পান, তাহা হইলে তিনি এই কঠিন সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন; নতুবা নূতন কুটম্বের কাছে মহা অপমান স্বীকার করিয়া আংটীর মূল্য পরিশোধ জন্য সপ্তাহ কাল সময় চাহিতে হইবে। সাতদিন পরে তিনি বেতন পাইবেন; পাইলেই আংটী ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাকে বহির্বাটীতে যাইতে হইল না।

বড় বারান্দায় বরযাত্রীদিগের জলযোগের জন্য আসন সজ্জিত হইতেছিল! চায়ের বন্দোবস্ত সমাধা করিয়া কর্ম্মতৎপরা কল্যাণী সেখানে অন্যান্য লোকের সহিত পানীয়, ফলমূল এবং মিষ্টান্ন আদি বহন করিয়া আনিতেছিল। এবং কদলীপত্রে সজ্জিত করিয়া আরও খাদ্যদ্রব্য আনিবার জন্য সে অগ্রসর হইয়াছিল। পথে সে পিতাকে বিষণ্ণমুখে বহির্বাটীর দিকে যাইতে দেখিল। পিতার সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সে হৃদয়মধ্যে দারুণ বেদনা অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল 'বাবা, সমস্ত দিন উপোস করে থেকে তোমার কি কোনও কষ্ট বোধ হচ্ছে? আমি একটু সরবত এনে দিই খাও, কোন দোষ হবে না।

কন্যাকে সম্প্রদান করিবার জন্য অখিলবাবু পত্নীর নির্দ্দেশানুযায়ী উপবাস করিয়াছিলেন; প্রমদাও উপবাস করিয়াছিলেন।—প্রমদার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন যে, কন্যার বিবাহে কন্যার পিতামাতা উপবাস করিয়া না শুকাইলে, কন্যা উত্তরকালে সুখিনী হইতে পারে না। কিন্তু এই উপবাসের অর্থ অভিধানের অর্থের সহিত মিলে না; কিন্তু দুইজন লোকের অর্থও একরূপ হয় না। মুসলমানদিগের রোজার উপবাসের অর্থ দিনমানে কিছু না খাইয়া রাত্রিকালে খাওয়া; প্রমদার পক্ষে এই উপবাসের অর্থ,--'একরত্তি' ক্ষীরের সঙ্গে 'গোটা পাঁচ ছয়' মুগের ডাল ভিজান, এবং তাহা মিষ্ট করিবার জন্য 'এতটুকু' চারিটা সন্দেশ, 'ছোট্ট' দুইটী মর্ত্তমান রম্ভা, এবং এক মালা 'মাত্র' নারিকেল কোরা, এবং জল পান করিবার পূর্ব্বে, মুখটা একটু মিষ্টি করিবার জন্য আটটি রসগোল্লা,—এবং—কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। বহুমূত্র রোগী অখিলবাবুর পক্ষে এই উপবাসের অর্থ,—স্বামীর রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনায় শঙ্কিতা, বুদ্ধিমতী ও শ্রীমতী প্রমদার সযত্নে এবং স্বহস্তে কাটিয়া দেওয়া কয়েক খণ্ড পাকা পেঁপে, এবং একবাটী গরম বলকা দুধ। কিন্তু এই উপবাসে এক প্রহর রাত্রি হইলেও অখিল বাবুর কোনও কষ্ট হয় নাই। তিনি কল্যাণীকে কহিলেন, 'না মা, ভাত না খাওয়াতে আমার কোন কষ্ট হয় নি। কিন্তু আমি একটা বড় মুস্কিলে পড়েছি। বরের আংটীটা বরের পছন্দ হচ্ছে না।

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'তাতে আর মুস্কিল কি? এর পর একটা পছন্দসই আংটী কিনে দিলেই হ'বে।'

অখিল বাবু বলিলেন, 'তাঁরা বলছেন আংটীর দামটা বিয়ের আগেই নগদ তা'দের হাতে দিতে হ'বে '

কল্যাণী কহিল, 'এত ভদ্রলোকের মত কথা নয় বাবা!'

অখিলবাবু কহিলেন, 'তোমার শ্বশুরের মত ভদ্রলোক এই পৃথিবীতে ক'টা আছে মা? চাকুরী করে করে আমাদের সকলের মনটা গোলামের মতই ছোট হ'য়ে যায়। তিনি স্বাধীন ব্যবসা করতেন, তাঁর মত অন্তঃকরণ কোথায় পাব মা? আমি আগে বুঝতে পারতাম না; এখন বুঝেছি, চাকুরীতে মানুষকে কত হীন করে, আর স্বাধীন ব্যবসাতে—সে ব্যবসা যতই ছোট হ'ক—মানুষকে কত উন্নত, কত মহৎ করে।'

মাতার নিকট যে শ্বশুরের নিন্দা শুনিয়া কাতর হইয়াছিল, পিতার নিকট সেই শ্বশুরের সুখ্যাতি শুনিয়া কি মহানন্দে কল্যাণীর হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব না; চেষ্টা করিলেও সফল হইব না। আহ্লাদিতা তনয়া পিতাকে বলিল, 'তাঁরা যদি না শোনেন, তা'হলে কাজেই আমাদের আংটীর দামটা নগদই দিতে হবে। বরপক্ষের সঙ্গে এই নিয়ে একটা ঝগড়া করা ভাল দেখাবে না।'

অখিলবাবু বলিলেন, 'না, ঝগড়া আমি সাধ্যমত হ'তে দেব না। কিন্তু আংটীর দাম চারশ' টাকা ত এখন আমার বাক্সে নেই।'

কল্যাণী সরলা বালিকার ন্যায় বলিল, 'তুমি এ-কথা বরের বাপকে খুলে বল না কেন? আর তুমি যদি ছ'চার দিন সময় চাও, তিনি তা কি দেবেন না?'

অখিলবাবু কাতরকণ্ঠে কহিলেন, 'উপায় নেই মা, তাঁদের সময় দেবার কোনও উপায় নেই। তাঁদের চিরকালের কুলপ্রথা এই যে বিয়ের আগে বিয়ের সমস্ত যৌতুকটা বুঝে নেবেন।'

কল্যাণী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পাইল। বৃদ্ধ পেস্কার মহাশয় সত্বরপদে বহির্বাটী হইতে আসিয়া অখিল বাবুকে সংবাদ দিল যে পুরোহিত মহাশয় বলিতেছেন যে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অঙ্গুরীয়ের মূল্য এ পর্য্যন্ত না দেওয়ায় বরকর্ত্তা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন; তাঁহাকে খুঁজিতেছেন; বিবাহের জন্য বরকে উঠিবার অনুমতি দিতে পারিতেছেন না।

অখিলবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা যা'ন। বলুন গে আমি এখনই আসছি।' এই বলিয়া অখিলবাবু বৃদ্ধ পেস্কারকে বিদায় করিলেন। তাহার পর বিষণ্ণমুখ কন্যার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, 'আমার বাক্সে বোধ হয় ছ'শ টাকা আছে; তাই নিয়ে গিয়ে একটা কোন রকম রফা করবার চেষ্টা দেখিগে। কিন্তু তাঁরা কোন রফায় যে রাজি হবেন, এমন মনে হয় না। নূতন কুটুম্বের কাছে, একটা অপমান সহ্য করতে হবে। তা'তেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই বিয়েটার একটা গোলযোগ বাধবার সম্ভব; তাই হ'য়েছে মহা ভাবনা। —পঙ্গু হয়ে, চাঁদ ধরতে যাওয়ার ঐ ফল।

কল্যাণী মনে করিল, ভাগ্যিস তাহার বুদ্ধিমান স্বামী টাকা লইয়া আসিবার বুদ্ধিটা দিয়াছিলেন, তাই ত আজ সে তাহার পিতাকে সাহায্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে। গমনশীল পিতার দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'বাবা যেও না। আমার বাক্সে যে ক'টা টাকা আছে, এনে দিচ্ছি, তা' নিয়ে যাও।' এই বলিয়া সেই কল্যাণীয়া কন্যা কল্যাণী দ্রুতপদে যাইয়া, পেটক মধ্যে স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী যে অর্থসংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, তাহা সমস্তই পিতাকে আনিয়া দিল। তাহা প্রদান করিয়া কল্যাণী ধন্য হইল; মনে করিল, স্বামীর অর্থের এমন সদ্ব্যবহার, বুঝি কখন করে নাই।

তাহা পাইয়া অখিলবাবুর চক্ষে জল আসিল। সেই অশ্রুবিন্দুতে, যুগপৎ, অপার আনন্দ, স্নেহময় আশীর্ব্বাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অপার্থিব মহারত্ন সমূহের ন্যায় জল জল করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রমদার ক্রোধ।

তোমরা আমাদের উপর বিলক্ষণ বিরক্ত হইতেছ। পুরোহিত ঠাকুরের মধুমাখা মন্ত্রোচ্চারণ গুলি আমরা লিপিবদ্ধ না করিলেও, তোমরা এই দীর্ঘ বিবাহ বিবরণ পছন্দ করিতেছ না; না করিবারই কথা;—বিবাহ যুবক-যুবতীর মিলনের অন্তরায়, এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি না থাকিলেই ভাল হইত, যদি থাকিল, চট্ করিয়া হইয়া যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তোমাদের একটু বিবেচনা করিতে হইবে। বিবেচনা করিতে

হইবে যে, এটা পাঁচসিকার বিবাহ নয়, ইহা দশ সহস্র টাকা মূল্যের বিবাহ; তাহার উপর, এটা পাঁচী, খুকী, খেঁদীর বিয়েও নয়, ইহা মুন্সেফ-পত্নী বুদ্ধিমতী প্রমদার রূপবতী ও ভাগ্যবতী কন্তার বিবাহ। তোমরা অবগত আছ যে, একটা সামান্ত বিবাহ ব্যাপারও লক্ষ কথার কমে সমাধা হয় না, তবে আমরা এই মহা-বিবাহ কিরূপে অল্প কথায় শেষ করিব? তবু আমরা লক্ষ কথা ত ব্যবহার করিই নাই; তাহার এক চতুর্থাংশের এক চতুর্থাংশ কথাও ব্যবহার করি নাই। তাই আমরা আমাদের অপরাধটা তত বেশী মনে করি না; তাই আমরা এখনও দুই চারি কথা বলিব।

পুরোহিত মন্ত্রপাঠ সমাধা করিলে, স্ত্রীগণ, হুলু হুলুধ্বনিতে ও শঙ্খ নিনাদে ব্যোমপথ নিনাদিত করিয়া, বরকে এবং কন্তাকে স্ত্রী-আচার জন্ত আচ্ছাদন তলে লইয়া গেলেন। আচ্ছাদন তলায় শুভদৃষ্টির সময়, বর কন্যাকে আকুল নয়নে দেখিল; কন্তাও বরকে দেখিয়া মুগ্ধা হইল। আবার তাহারা পুরোহিত মহাশয়ের নিকট আনীত হইলে, পুরোহিত মহাশয় আর কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গাঁইটছটা-বন্ধন করিয়া দিলেন। এইরূপে বিবাহ হইয়া গেল; এইরূপে ললনা চিরতরে গাঁইটছটার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পরাধীনা হইল!

বর, বধূর সহিত আলোকোজ্জল বাসর ঘরে প্রবেশ করিল। ভগবান কি তাহাদের বিবাহিত জীবন এই বাসর-ঘরের মতই আলোকোজ্জ্বল করিবেন না? তাঁহার মনে কি আছে, তাহা তিনি ছাড়া আর কাহারও জানিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি চিরদিনই আমাদিগের উত্তরীয় প্রান্তে বাধা আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিত; যদি আমাদের দুইটী মিলিত হৃদয় চিরদিনের জন্ত মিলিত থাকিত; যদি আমরা এই শুভদৃষ্টির নয়নে চিরদিনই আমাদের দয়িতদের দেখিতে পারিতাম; যদি সহধর্ম্মিণীগণ কখন সতন্ত্রা বা স্বাধীনা হইতে চাহিতেন না; তাহা হইলে, সংসার পথ কখন অশ্রুজলসিক্ত বা কর্দ্দমাক্ত হইত না; তাহা হইলে, আমাদের আধিব্যাধিময় পার্থিব জীবন, তপনালোকিত আকাশের মত নির্ম্মল ও আনন্দময় হইত। কিন্তু মানুষকে এত সুখ প্রদান করা বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়। তাই তাঁহার সৃষ্ট মানব ও মানবীগণ, স্ত্রী-স্বাধীনতার ধূয়া তুলিয়া, স্ত্রী-পুরুষের এই সুসঙ্গত মিলনকে ছিন্ন করিয়া, এবং তৎসহ আপনাদেরও হৃদয় ছিন্ন ও ব্যথিত করিয়া সতন্ত্র ও স্বাধীন হইবার উপদেশ প্রদান করে।

বধূর সহিত বর বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়া, শুভ্র ও পুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিল। শশকে অঙ্কে ধরিয়া, শশাঙ্ক গগনের সুনীল ও সুন্দর আসনে উপবেশন করিলে তারা দল যেমন তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আপনাদের রূপের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তেমনই রমণীগণ চাঁদের মত, বর ও বধূকে বেষ্ঠন করিয়া আপনাদের অলঙ্কার সম্বলিত রূপের কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

অতঃপর, পূজ্যা পুরোমহিলাগণ একে একে সেই বাঞ্ছনীয় কক্ষে সমাগতা হইয়া বরকে নির্নিমেশ নয়নে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বোপবিষ্টা যুবতীগণের নিকট তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া, বর, আসন ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া, এবং মর্য্যাদানুরূপ প্রণামী দিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে লাগিল। তাঁহারাও সেই প্রণামীর অর্থ বরকে পুনার্পণ করিয়া, এবং তাহার সহিত আরও কিছু অর্থ ও ধানদূর্ব্বা দিয়া এবং বরের একশত আশী বৎসর পরমায়ু কামনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

প্রমদা বরের নিকটবর্ত্তিনী হইলে, এক রসিকা, তাঁহার এইরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন, 'ইনিই তোমার সাতরাজার ধন—এক মাণিকের গর্ভধারিণী; প্রণাম কর।'

যুবতীর রসিকতা শুনিয়া, পার্শ্বোপবিষ্ট মাণিক ঘোমটার ভিতর একটু হাসিল। বর উঠিয়া একটি গিনি দিয়া শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর পাদ বন্দনা করিল। বুদ্ধিমতী প্রমদা সেই গিনিটির উপর আর একটি গিনি দিয়া জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গিনির গৌরবে আশীর্ব্বাদটা, বোধ হয় সকলের চেয়ে অধিক গৌরবান্বিত হইল।

কল্যাণী বর অপেক্ষা বয়ো কনিষ্ট হইলেও, ঈশানীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী হওয়ায়, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সে গুরুজন স্থানীয়,—এবং তজ্জন্য নমস্য। কল্যাণী এ যাবৎ বাসর ঘরে আসিয়া বরের প্রণাম গ্রহণ, এবং বরকে আশীর্ব্বাদ করিল না, দেখিয়া প্রমদা অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া আমার মেয়ে জামাই একশ' আশীবছর বেঁচে থাকুক।

ওর আশীর্ব্বাদে কিছুই হ'বে না; তবু সেই অনাবশ্যক আশীর্ব্বাদটাও দিতে চায় না; এমনি ওর হিংসা।—নরকে পচে মরতে হবে।' প্রমদা অধৈর্য্য হইয়া একজন বরদর্শন-নিরতা দাসীকে আদেশ করিলেন, 'তোর বড় দিদিমণি কোথায় গেল রে? এত যে বয়স হ'ল, তার তবু একটুও আক্কেল হ'ল না। শীগ্‌গীর তাকে ডেকে নিয়ে আয় ত। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, ওই একটা তোর বোন, তার বিয়েতে একটু হুঁস্ করে, বরকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে তোর আসতে হয় না।' প্রমদা মহা আক্রোশভরে দলিত-ফণা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জাইতে লাগিলেন।

দাসী তাহার বড়দিদিমণিকে খুঁজিতে গেল। কিন্তু সেই লোক সমারোহ মধ্যে কোন স্থানে তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রভুপত্নীকে সেই সংবাদ দিলে তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া আবার খুঁজিতে পাঠাইবেন, বিবেচনা করিয়া, সে কিছু বিলম্ব করিয়া প্রভুপত্নীকে সংবাদ দিল।

শুনিয়া প্রমদার ক্রোধের সীমা রহিল না।

কিন্তু বিমাতার এই ক্রোধ সেই হিংসুকা ও আক্কেলহীনা কল্যাণীকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সে যে সিদ্ধ ছাওয়ায় অবস্থিতি করিতেছিল, সেখানে ক্রোধের আগুন পৌছে না; সে তখন যে কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল, তাহার মত চিত্ত প্রাসাদের কার্য্য পতিরতা রমণীগণের আর কিছু নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যদুপতির আহার।

বর বাসর ঘরে আনীত হইলে, ও পুরোমহিলাগণ বর দেখিবার জন্ম মহা কলরবে বাসরঘর অভিমুখে ধাবিতা হইলে, কল্যাণী একটু নিরাবিল দেখিয়া, যদুপতিকে খুঁজিয়া বাহির করিল; এবং তাহাকে এক নিভৃত ও নির্জ্জন কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার পরিবেষণের কাজ শেষ হ'ল?'

যদুপতি হাঁস্যমুখে কহিল, 'হাঁ। কেন?'

কল্যাণী কহিল, 'তা'হলে হাতমুখ ধুয়ে আর কাপড় খানা ছেড়ে শীগ্‌গীর এই ঘরে এসে একবার দেখা কর।'

যদুপতি বলিল, 'কেন বল দেখি?'

কল্যাণী কহিল, 'আমার বড্ড দরকার আছে; তুমি আগে হাত মুখ ধুয়ে এস, তারপর কি দরকার বলবো। আমি এইখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। শীগ্‌গীর এসো কিন্তু।'

যদুপতি চিন্তিত মনে পরিবেষণের মলিন বসন ত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া, এবং একটী নূতন পরিধেয় ও উত্তরীয় হস্তে লইয়া, নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

তাহার হস্তে নূতন ধুতি ও চাদর দেখিয়া কল্যাণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'একি? হাতে ধুতি চাদর কেন?'

যদুপতি কহিল, 'জামাই বরণের ধুতি চাদর পেয়েছিলাম। তোমার বাক্সে তুলে রাখবার জন্যে, তোমায় দিতে এসেছি।'

কল্যাণী বলিল, 'কেন, পরবে না?'

যদুপতি হাসিল; কহিল, 'আমার মত দোকানদারকে ঐ মিহি কাপড় মানাবে কেন?'

কল্যাণী কহিল, 'তবু প'রো; আমি দেখবো!'

যদুপতি কহিল, 'কেন, এই মোটা কাপড়ে তুমি তোমার স্বামীকে দেখো না? আর খুবই ভাল দেখ না?'

কল্যাণী বুঝিল সে কথা কত সত্য। জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে এ কাপড়ে কি হ'বে?'

যদুপতি বলিল, 'এরপর কাউকে দিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু ও কথা থাক। তুমি আমায় কি দরকারে ডেকেছিলে বল।'

মেঝের উপর একস্থানে আসন বিস্তৃত ছিল; আসন সম্মুখে কদলীপত্রে লুচি, কালিয়া ও সামান্য কিছু মিষ্টান্ন সজ্জিত ছিল। কল্যাণী তাহা যদুপতিকে দেখাইয়া বলিল, 'তুমি খেতে বসো। আমি তারপর বলবো।'

যদুপতি এতক্ষণ আর কিছুই দেখে নাই, কেবল কল্যাণীকেই দেখিতেছিল; আর ভাবিতেছিল, আহা এমন সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি? এক্ষণে পত্নীর

নির্দ্দেশ মত খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া বলিল, 'বাঃ! তুমি কেমন করে বুঝলে যে আমার ক্ষিধে পেয়েছে?'

কল্যাণী কহিল, 'তুমি কখন খাও, তাত আমি জানি। আজ বিয়ের গোলমালে পাছে ওরা তোমার খাবার দিতে দেরী করে ফেলে, তাই আজ আমি এনেছি।'

যদুপতি পত্নীর সহিত আর কোন প্রেমালাপ না করিয়া ত্বরিত খাইতে বসিল। কিন্তু খাইতে খাইতে প্রেমাকুল লোচনে বারবার মনোমোহিনী প্রিয়তমার দিকে চাহিতে লাগিল। এবং অন্যমনস্ক হইয়া অল্পকাল মধ্যে কদলীপত্র-খানি খাদ্য শূন্য করিয়া বলিল, 'ঐ যা। তোমার জন্যে প্রসাদ রাখতে ভুলে গেলাম।'

কল্যাণী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া বলিল, 'তা হ'ক। তোমায় আর কিছু এনে দেব?'

যদুপতি কহিল, 'আমার জন্যে আর কিছু আনতে হ'বে না; খুব পেট ভরেছে।'

কল্যাণী বলিল, 'বাইরে আঁচাবার জল রেখেছি; আঁচিয়ে এস।'

স্বামী বাহিরে আচমন করিতে যাইলে কল্যাণী পশ্চাৎ ফিরিয়া কদলীপত্র খুঁটীয়া অল্প খাদ্যদ্রব্য লইয়া মুখে দিল; এবং সেই এঁটো কদলীপত্রখানি উঠাইয়া, হিন্দুর 'হিন্দুয়ানী' না মানিয়া একবার তাহাতে আপন মস্তক স্পর্শ করিয়া, উহা কি জানি কি উদ্দেশ্যে বাহিরের এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া আসিল। এবং ভোজন স্থান পরিষ্কৃত করিয়া স্বামীকে তাম্বুল প্রদান করিল।

যদুপতি পত্নীকে প্রেমপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, 'তুমি নিজে হাতে ক'রে পানটা আমায় খাইয়ে দেবে না?'

কল্যাণী সলজ্জ নয়নে স্বামীকে অবলোকন করিয়া কহিল, 'ও সাধ এখানে কেন? কেউ যদি দেখে?'

যদুপতি পত্নীর যৌবন-পুষ্ট কোমল হস্ত আকর্ষণ করিয়া তাহাকে আপনার নিকটে টানিয়া লইয়া কহিল, 'না, না, কেউ দেখতে পাবে না। লক্ষ্মীটি দাও; এই আমি কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছি।'

কল্যাণী স্বামীর প্রেমপূর্ণ আকর্ষণে বিহ্বলা হইয়া স্বহস্তে স্বামীর মুখে তাম্বুল দিল; তাহার এই কার্য্যের জন্য, সে কোন পুরস্কার পাইল না কি? আমরা কি করিয়া বলিব? আমাদের দুর্ভাগ্য যে দারুময় দ্বারফলক স্বচ্ছ নহে; তাহার অন্তরালে কল্যাণী আপন কৃতকর্ম্মের কি পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের চক্ষুগোচর হয় নাই। কিন্তু কিছুপরে আমরা যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার তখন পক্কবিম্ব সদৃশ অধর সরস ও তাম্বুল রাগরঞ্জিত হইয়াছিল; তাহার তখন স্বাস্থ্যপুষ্ট কপোলদেশ লজ্জায় কোকনদ আভা ধারণ করিয়াছিল।

আহারে, ভক্তিতে ও প্রেমে পরিতুষ্ট করিয়া কল্যাণী স্বামীকে বিদায় দিল। এবং স্বামীর বস্ত্র আপন পেটক মধ্যে রাখিতে গেল।

(ক্রমশঃ)

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

বেণু তাহার ক্ষুদ্র বাহুর বেষ্টনে আমাকে সবলে আকর্ষণ করিল। লোকের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। অগত্যা বৃদ্ধের সঙ্গে চলিলাম।

নির্জ্জন কক্ষে একখানি চৌকী দেখাইয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "তোমরা ব'সো, কনক। আমার কাছে তোমার লজ্জা করবার কিছুই নাই, বুঝেছ? এতো তোমার আপনার বাড়ী ঘর; যখন যে অভাব হবে, এসে জানাবে। ভগবান তো টাকা কড়ির অভাব আমার রাখেনি; সেদিন ও গিন্নীকে এক বাক্স ভরে নতুন করে গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলুম; সব পড়ে রয়েছে। কে বা তা ভোগ করবে, কেবা তা দখল করবে।"

বৃদ্ধের শোকোচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠিল। এই শোকার্ত্তের আকুলতা আমার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়া হৃদয়টা ব্যথিত করিয়া তুলিল। ইনি আমার পিতামহ তুল্য; ইঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতাও তেমন কিছু নাই। পরিচয়ের সঙ্কোচই আমি কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই; এ অবস্থার সান্ত্বনার কথা কি আমার মুখে শোভা পায়? কিন্তু কিছু না বলিলেও যে নিতান্তই অভদ্রতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কি করিব, নিরুপায় হইয়া নতদৃষ্টিটা তাঁহার দিকে তুলিয়া তখনই মুখ অবনত করিতে বাধ্য হইলাম।

তাঁহার চোখে কি দেখিলাম? সে তো বিয়োগ বিধুরের মর্ম্মভেদী বেদনার অশ্রু নহে; শোকের নির্ব্বাক কাতরতার দৃষ্টিও নহে। সেই কোটরগত চক্ষু দুটি কিসের উত্তাপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ কক্ষে তাঁহার সম্মুখে মুখোমুখী হইয়া বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। অথচ বাহিরে যাইবারও উপায় ছিল না। কারণ চৌধুরী মহাশয় দ্বারপথে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপুল শরীর দ্বারা গমনাগমনের রাস্তাটা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি কম্পিত বক্ষে ধীরে ধীরে গৃহের পশ্চাদ্ভাগের মুক্ত গবাক্ষের নিকটে উপনীতা হইলাম। গৃহসংলগ্ন একটী পল্লবিত কদম গাছ নববর্ষা সমাগমে মুকুলিত হইয়া মন্দ সমীরণে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল। কদম্বের ছায়াচ্ছন্ন শাখায় বসিয়া একটি চাতক রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল নদীটির পানে চাহিয়া করুণ কোমলস্বরে ডাকিতেছিল, 'ফটিক জল', 'ফটিক জল'। গ্রাম্য বধূগণ অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া অপ্রশস্ত বনপথ দিয়া কেহ বা স্নানার্থে যাইতেছিল। কেহ বা স্নান শেষে সিক্ত বসনে সিক্ত চরণে কলসী কক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মৃদু কণ্ঠস্বর, হাসির মূর্চ্ছনা ক্ষণকালের নিমিত্ত আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আমি মুগ্ধ আঁখি মেলিয়া রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল বিহগের সঙ্গীত ঝঙ্কারে মুখের শান্ত শীতল পথটির পানে চাহিয়া রহিলাম।

কিয়ৎকাল পর চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল। চৌধুরী মহাশয় আমার অতি কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "কনক, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? এস তোমাকে গিন্নীর গয়না গুলো, শাড়ী গুলো দেখাচ্ছি। দেখলে বুঝতে পারবে কি জিনিষের মত জিনিষ তাকে দিয়েছিলাম।

আমি কোনমতে রুদ্ধকণ্ঠটা পরিষ্কার করিয়া আস্তে কহিলাম, "আমি ওসব দেখে কি করবো বলুন?"

"তোমাকেই দেখ্‌তে হবে, কনক, ওসব তোমারই। লোকের মুখে শুনি তুমি বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, বড় সুশীলা। তুমি অবশ্যই মতিলাল ও আমাতে প্রভেদ কতটা তা বুঝ্‌তে

পারো। আর স্পষ্ট কথা বলতে কি তোমায় আমি বড্ড ভালবেসে ফেলেছি। তাই মনে করেছি—"বৃদ্ধ সহসা, আমার দক্ষিণ বাহুটী মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিলেন।

বেন্থু চৌকীর উপর বসিয়া আপন মনে বই-এর পাতা উল্টাইতেছিল। গৃহের অপর প্রান্তের ঘটনা গুলি তাহার নয়নপথে পতিত হইল না। আমি বৃদ্ধের হস্তের মধ্য হইতে হাত খানা মুক্ত করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ছুটিলাম। বেন্থু আমার সঙ্গী হইল। কিন্তু আমার মুখের পানে চাহিয়া সে আমায় একটী প্রশ্নও করিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিয়া মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে ফিরে এলি কেন, কনক? তারা ডাকতে এসেছিল, তবু খেতে গেলিনে, কি হয়েছে রে?"

হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা, নিদারুণ অপমান হৃদয়ে লুকাইয়া মাকে মিথ্যা করিয়া বলিলাম, "অত লোকের ভেতর থাকতে ভালো লাগছিল না, মা, তাই চলে এসেছিলাম। শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে খেতেও গেলাম না।"

মা, উত্তর করিলেন, "শুনেছিলাম চৌধুরী মশাই তোদের ডেকে নিয়ে কি সব জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাই বুঝি লজ্জায় তুই চলে এসেছিলি? তিনি গ্রাম সম্পর্কে তোদের ঠাকুর্দ্দা হন, বুড়ো মানুষ যদি একটা ঠাট্টাই করে থাকেন তাই বুঝি চলে আস্তে হয়! বোকা মেয়ে কোথাকার!"

মার প্রশ্নে আমার চক্ষে জল আসিল। হৃদয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ যেন একটি তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কিন্তু চঞ্চলতা আমি দমন করিলাম। ওষ্ঠে দন্ত চাপিয়া ক্রন্দনোচ্ছ্বাস প্রশমিত করিয়া মনে মনে বলিলাম, "মা গো তোমার বাবার বয়সের বৃদ্ধের সেই কুটিল কটাক্ষ কপট হাসি, নির্লজ্জের উক্তি তোমাদের নিকটে প্রকাশ ক'রে তোমাদের দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাইনি। আমার ব্যথা আমার বক্ষেই লুকান থাকুক! আমি দরিদ্রের কন্যা, আমি অরক্ষণীয়া, এ অপমানে আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে না। কিন্তু তোমাদের অযথা আঘাত দেবো কেন?

(৫)

বাবা মা একান্ত মনে আশা করিয়াছিলেন, মতিবাবু মুখে ভাবিয়া দেখার কথা বলিলেও বিবাহে অসম্মত হইতে পারিবেন না। অভিভাবক শূন্য একালের ছেলে—সব সময় তাহাদের মতিগতি বুঝিয়া ওঠা ভার; হয়তো হঠাৎ একদিন আসিয়া বলিয়া বসিবে, সাতদিনের মধ্যেই বিবাহের গোলমাল মিটাইয়া ফেলিতে হইবে; আমার বিলম্ব করিবার অবকাশ নাই।" কাজেই সকলের অলক্ষ্যে গোপনে গোপনে বাড়ীতে একটু আধটু বিবাহের আয়োজন চলিতেছিল। বাবা মা আশার স্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া খুঁটিনাটি দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিলেন।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় হাট হইতে অনেক মশলা আসিয়াছিল। অপরাহ্নে মা বারান্দায় বসিয়া সেই মশলাগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া মাটির হাঁড়িতে তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন; আমি মার কাছে বসিয়া মায়ের আদেশমত সুপারী কাটিতেছিলাম।

আকাশে নববর্ষার-শুভ্রস্ফীত মেঘ বাতাসে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছিল। অপরাহ্নের অবসন্ন প্রায় আলোক বৃক্ষশিরে শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর জলে বর্ষাস্নাত প্রকৃতির অঙ্গে ঝিক্‌মিক করিতে লাগিল। কৃষকদের আউষধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে; ক্ষেত হইতে তাহাদের ক্লান্ত সকরুণ স্বরের গ্রাম্য সঙ্গীত রহিয়া রহিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই অতি ম্লান অতি স্নিগ্ধালোকে সেই আপন ভোলা খেয়ালি সুর আমার প্রাণে কিসের ব্যথা যেন জাগাইয়া তুলিতেছিল! সে যে কিসের ব্যথা তাহা আমি জানি না, সে ব্যথা প্রকাশাতীত, অব্যক্ত! আমি ক্ষণকালের জন্য হাতের কাজ বন্ধ করিয়া ছায়াচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে স্বর্ণবর্ণের ক্ষেতটির পানে চাহিয়া রহিলাম।

কিয়ৎকাল পরে পদশব্দে সচকিত হইয়া দেখি জিতুদা আসিতেছে। জিতুদার মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর, গতি মন্থর। মা সস্নেহে জিতুদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোর শরীর তো ভালো আছে জিতু? মুখখানা যেন ভার ভার দেখছি! কনক, জিতুকে বসতে দে।" আমি ঘর হইতে একখানা আসন আনিয়া বারান্দায় বিছাইয়া দিলাম। জিতুদা আসনে না বসিয়া মার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া উত্তর করিল,

"আমি ভালই আছি কাকীমা কোন অসুখ করেনি। আর এক চামারের কাণ্ডটা শুনেছ ?"

সহসা মার হাস্যোজ্জল মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল ; হাত হইতে কতকগুলি মশলা মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। মা প্রশ্ন করিতে পারিলেন না; ভীত ব্যাকুল নয়নে জিতুদার দিকে চাহিলেন। আমারও বক্ষের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া উঠিল। আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। জিতুদা আশ্বাসের স্বরে কহিলেন," এত ভয় পাচ্ছো কেন, কাকীমা ? আমি মতিলালের কথা বল্‌ছি। হতভাগা বল্লে কি না হাজার টাকার কমে আমি বিয়ে করতে পারবো না ; আমারও খরচপত্র আছে। কাকার বসে কাজ নেই ওই—বেটা ছোট-লোকের অত উপকার করলেন ; সে তার খুব প্রতিদান দিলে।"

মা অনেকক্ষণ মৌণ থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "তাকে মিথ্যে গাল দিয়ে কি হবে, জিতু ; বিনি পয়সায় কেউ যে নিতে চায় না। সকলেরই পয়সার ওপর রোক্। তুই কখন মতিলালের কাছে গিয়েছিলি ?"

দুপুর বেলা গিয়েছিলাম, কাকীমা, সেখান থেকে পোষ্টাফিস হ'য়ে এখানে এসেছি। শুধু আজ তার কাছে যাইনি ; ক'দিন হ'লো ঘুরছি। দেখা হ'লে হতভাগা বলে কিনা, 'এখনো ভেবে দেখিনি, এখনও স্থির করিনি।' আজও তাই বলে বিদায় কর্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু আমার তো আর সময় নাই ; কালই কল্‌কাতা যেতে হবে শুনে বল্লে, 'এক হাজার পেলে আমার বিয়ে করতে আপত্তি নেই।' আমি হাতে ধরে বল্লাম কাকার এক'শ টাকা দেবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই, আমি তোমাকে যেমন করে হোক্ খরচ পত্র বলে তিনশ' টাকা দেবো ! তুমি বিয়ের দিন ঠিক করতে অনুমতি দাও !' কিন্তু হাজারের কম কিছুতেই তাকে রাজী করা গেল না।

"পোষ্টাফিসে তাঁর সঙ্গে কি তোর দেখা হ'লো জিতু ? মতিলালের কথা তাঁকে বলে এসেছিস ?"

"বলেছি, শুনে কাকা বড় মুষ্‌ড়ে গেলেন ; একটু বেশীরকম নির্ভর করেছিলেন কি না !"

"নির্ভর বলে নির্ভর ; এ কয়েকমাস ওর ভরসাতে আর কোথায়ও খবরটা পর্য্যন্ত করেন নি ; এখন যেমন করে হোক্ পূজোর আগেই কনকের বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান ওর অদৃষ্টে কি লিখে রেখেছেন, তা তিনিই জানেন।" মার চক্ষু সজল হইল। মা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

আজ অকস্মাৎ যে জিতুদা আসিয়া মার সহিত আমার বিবাহের আলোচনা করিবে ইহা আমার জানা ছিল না। পূর্ব্বে আমি সাবধান হইয়া সরিয়া যাইতে পারি নাই। অথচ কথাবার্ত্তার গতি ক্রমশঃ যেরূপ ধারণ করিতেছিল তাহাতে বসিয়া থাকাও আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু বসিয়া থাকা অপেক্ষা উঠিয়া যাইতেই বেশী লজ্জাবোধ হইতেছিল। উঠি উঠি করিয়া আমি উঠিতে পারিলাম না। মাথা নীচু করিয়া সুপারী কাটিতে লাগিলাম। জিতুদা একটু ভাবিয়া শান্তস্বরে বলিল, "ভগবান্ কনীর কপালে মন্দ কিছু লেখে নি। তার প্রমাণ এত অনুরোধেও মতিলাল স্বীকার হ'লো না। এতক্ষণ আমার বড্ড দুঃখ হচ্ছিল কাকীমা। এখন মনে হচ্ছে ও অকাট মূর্খের বদলে বিধাতা কনীকে উপযুক্ত বর মিলিয়ে দেবেন বলেই মতিলাল রাজী হ'লো না। তোমরা একটুও উতলা হ'য়ো না ; না হয় আর দু'বছর কনী ঘরেই থেকে আর একটু বড় হবে। মা ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কনকের বড় হওয়ার আর কি বাকী আছে জিতু ? আমি অর্থহীন, আমার সামর্থ্য নেই, তা বলে সমাজ মানতে যে চায় না ; সমাজে থাকতে হ'লে তার শাসনকে মাথা পেতে নিতে হয়। কনকের বয়সের কোন মেয়ে তো কারু ঘরে নেই জিতু ; সকলের যদি না থাকে তবে আমার থাকলেই বা চলবে কেমন করে ? ভাল হোক মন্দ হোক যেমন করে হোক, আমারও যে সামাজিক নিয়ম পালন করতে হবে।"

সমাজের উল্লেখে জিতুদা জলিয়া কহিল, "তোমরা সমাজ সমাজ করে ভয়ে সাড়া হও কাকীমা ; কত বুজরুক ভণ্ড যে টাকার জোরে সমাজের বুকে আবর্জ্জনা ঢেলে দিচ্ছে, তা তো কেউ দেখবে না ; যত মহাপাতক মেয়ে বড় হ'লে, মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে। বিয়ের সময় বাপের ভিটে মাটী যদি উচ্ছন্ন হয়, সমাজ তা দেখবে না ; বিনাপরাধে স্বামী যদি

মেয়েটাকে পরিত্যাগ করে, সমাজ তার প্রতিকার করবে না। ছেলে চোর হোক, লম্পট হোক, তবু সে সমাজের জীব; আর মেয়েটার দশ বছরে বিয়ে না দিতে পারলেই যত অধর্ম্ম। অমন সমাজ চুলোয় যাক।"

উত্তেজনায় জিতুদার মুখখানি রক্তিম আভা ধারণ করিল। বিশাল চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জিতুদা একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "নীহারের দশা দেখে কারও মেয়ের বিয়ের কথা আমি শুনতে পারি না। চরিত্রহীন মাতালের হাতে পড়ে নীহারের কি কষ্টে যে দিন যাচ্ছে, সে যে কি কষ্ট কাকীমা তা বলতে পারি না। প্রহারে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, সেদিনকার সেই নীহার যে আজ অপমানে অত্যাচারে জর্জ্জরিতা, শরীরে বল নাই, মনে শান্তি নাই, মুখে হাসি নাই; যে পাষণ্ডের জন্য তার এত লাঞ্ছনা, তার স্থান এখনও সমাজের উচ্চাসনে। আমার বড় ভালবাসার দুটি বোন, নীহার আর কনী, একটি তো নদীর জলে ভেসেছে; আর একটিকে বানের জলে ভাসিয়ো না কাকীমা।" জিতুদার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। সমবেদনার অশ্রুজলে মা'র চোখ ভরিয়া গেল। মা নিঃশব্দে গভীর স্নেহের সহিত জিতুদার মাথাটি কোলের ওপর টানিয়া লইলেন। আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া নীহারের কথা ভাবিতে লাগিলাম। মনে পড়িল বাল্যের হাস্য-কৌতুক, কত আশা, কত আশ্বাস, ক্ষণিকের বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় কত ব্যাকুলতা! তারপর সেই কিশোরের মধুর কল্পনায় ঝিল্লি মুখরিত সন্ধ্যা, অলস মধ্যাহ্ন অতিবাহিত। হায় সেদিন আজ কোথায়, কোন সুদূরে চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই সলিল বিপুলা নদী সৈকত, সেই ছায়া সুনিবিড় আম্র কানন, সেই সুন্দর নীলাম্বরতল, আজও তো তেমনি রহিয়াছে; বিহগের সঙ্গীত ঝঙ্কার, বেণু বনে রাখালের বাঁশী, আজও তো তেমনি ধ্বনিতেছে। সেই দুটি বাল্যসখী আজও আমরা রহিয়াছি; সে অসীম স্নেহ, সে গভীর ভালবাসা কিছুরই হ্রাস হয় নাই; কিন্তু সেদিন আর নাই, মায়া নিদ্রা টুটিয়া গিয়াছে, সুখের স্বপ্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। কল্পনার উপবন আজ তৃণ শূন্য বারি—শূন্য বালুকাময় মরুভূমি। আশার ক্ষীণ প্রদীপ শিখাটি এখনও আমার সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই; অন্ধকার হৃদয়ে আলো বিকীর্ণ না করিলেও মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। আর নীহার?—আশা-হারা, স্বপ্ন-হারা লাঞ্ছিতা, দুঃখিনী আমার। নীহারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু উপহার দিয়া মা'র পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। মা বলিলেন, "এসব গুলো আমি তুলে রাখছি কনক; তুই জিতুকে দুটো চিড়ে ভাজা আর নারকেল নাড়ু এনে দে; বেণুর জন্যে চারটি বাটিতে করে বের করে রাখ, সে এক্ষুণি এসে চাইবে।" জিতুদা হাতের উল্টা দিকে চোখ মুছিতে মুছিতে মৃদুস্বরে বলিল, "এখন কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, কাকীমা; কাল সকালবেলা খেলে হবে না?"

"না জিতু, এক্ষুণি খেতে হবে; তুই ভালোবাসিস বলে আমি যে তোর জন্যেই করে রেখেছি; কাল আর খাবার সময় কখন, যাবার গোলামালে হয় তো খাবার সময় পাবি না।"

জিতুদা হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি খাবার সময় না পেলেও তোমাদের দেবার সময়ের অভাব হবে না কাকীমা। দেরে কনী, কি খেতে দিবি নিয়ে আয়।"

চিড়াভাজা খাইয়া মুখ ধুইয়া জিতুদা মা'র নিকটে বিদায় লইয়া বলিল, "এখন উঠি কাকীমা, কনীর বিয়ের জন্যে বেশী উতলা হ'য়ে তোমরা যার তার হাতে কিন্তু ওকে ফেলে দিও না। যারা নিন্দে রটায়, সমাজের ভয় দেখায়, মনে রেখো মেয়ে তাদের নয়, তোমারি। আজ বড় হয়েছে বলে এক ভাবনা ভাবছো, বিয়ে দিয়ে আবার শত ভাবনা যেন ভাবতে না হয়।"

মা জিতুদার বাহুটী ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, "আমি তো তেমনি একটি ছেলে চাই জিতু, যার হাতে নিশ্চিন্তমনে কনককে দিতে পারি; তুই কলেজের ছেলেদের মধ্যে একটু চেষ্টা করে দেখিস্, বাবা; অনেক পরোপকারী দয়ালু ছেলেও আছে; কেউ যদি মহত্ত্ব দেখিয়ে——"

"সে চেষ্টা আমি অনেকবার করেছি। অনেক মহৎ আছে, দয়ালু আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখে, পরের বেলায়। সকলেই সভা করতে পারে, বক্তৃতা দিতে পারে, সমালোচনায় বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেয়; কিন্তু কারুর মধ্যে

প্রাণ নেই, কাকীমা ; এবার গিয়েও আ.ম বিশেষ চেষ্টা করবো ; তোমাদের বল্‌তে হবে না।"

জিতুদা চলিয়া গেল। মা উদাস দৃষ্টিটা জিতুদার গমন পথের পানে মেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। কাননকুন্তলা বনশ্রেণীর মাথার উপর দিয়া ম্লানচন্দ্র এক একবার উঁকি মারিয়া মেঘের মধ্যে লুকাইতে লাগিল। তাহা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মলিনমুখী নক্ষত্রগুলি ছু'টি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিল। বাগানের মধ্যে কোথায় যেন ভুঁইচাপা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল ; সেই স্নিগ্ধ পরিমলটুকু গায়ে মাখিয়া সান্ধ্য পবন ধীরে অতি ধীরে কাহাকে যেন বীজন করিতে লাগিল। ডোবার মধ্য হইতে ভেকেরা সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল ; ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া শৃগাল তান ধরিল। বৃক্ষপত্রে দূর্ব্বাদলে খদ্যোতিকা লক্ষ হীরকের হার গাঁথিতে লাগিল। মাঠের পথে গাভীর করুণ হাম্বাধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল।

আমি গৃহে গৃহে প্রদীপ দেখাইয়া তুলসীমঞ্চের দিকে যাইতেই মা আমার হস্ত হইতে প্রদীপ লইয়া তুলসীমঞ্চে দিতে চলিলেন। গলায় অঞ্চল দিয়া হাত জোড় করিয়া বারংবার তুলসী বেদী প্রণাম করিতে লাগিলেন। মার চোখের প্রান্ত বহিয়া ছুটি জলধারা নামিয়া আসিল। আশাভঙ্গের বেদনা এতক্ষণ লুকাইয়া রাখিলেও দেবতার সন্নিধানে সেই বিপুল ব্যথার ভার আর লুকান রহিল না। প্রার্থনার পূত অশ্রুজলে দেবতার পাদপীঠ অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ওই টুকু ছাড়া যে মার গতি ছিল না, সম্বলও ছিল না। কিন্তু এই নীরব নিবেদন প্রাণের পূজা অন্তর্যামী গ্রহণ করিলেন কি না জানি না!

(ক্রমশঃ)

ঈঙ্গ-বঙ্গ

(চিত্র)

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্ত্তি হয়েই বরেন ইডেন স্কুলের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায়। গরীবের ছেলে সে, শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিতা কুমারী তার পক্ষে আস্‌মানের তারা, এটা জেনে সে লোভ তাকে সংযত করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে তার সৌভাগ্যক্রমে এক খৃষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল তিনি কোন একটি বুদ্ধিমান ছেলেকে বিলেত পাঠাবার খরচ দেবার জন্যে খুঁজছিলেন। আলাপটা হল আকস্মিক, বুড়ীগঙ্গার মাঝামাঝি গিয়ে তাঁর মোটরবোটের কল খারাপ হয়ে যেতে তিনি চীৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছিলেন, বরেন তাই দেখে অন্য নৌকা নিয়ে গিয়ে তাঁরে উদ্ধার করে আনে।

ইণ্টারমিডিয়েট দিয়ে বরেন আই, সি, এস, হবার জন্যে বিলেত যাত্রা করলে, এবং বছর তিনেক পরে এক দাঁতের ডাক্তার হয়ে ফিরে এল। ঢাকায় দাঁতের ডাক্তারির তেমন সুবিধা হবেনা বুঝে কলকাতায় কোন্ পাড়ায় বস্‌বে, ঠিক করতে লাগল। তার ব্যারিষ্টার বন্ধুরা পরামর্শ দিলে, পার্ক ষ্ট্রীট কিংবা থিয়েটার রোডে এসো, নেহাৎপক্ষে ভবানীপুর বকুলবাগান সাইডে ;—ছকু-খানসামা কিংবা পাঁচু-মুদীর গলি খুঁজলে হবে না।

হাতে নগদ বিশেষ কিছু ছিল না, আর সাহায্য করবার মতনও তিনকুলে কেউ নেই, তবু বরেন সাহস করে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে দোকান আর থিয়েটার রোডে বাড়ী জাঁকিয়ে বস্‌ল।

মাস তিনেক পরে যখন একখানা মাইক্রুম-কারও যোগাড় হয়ে গেল, তখন তার ভোঁ ভোঁ শব্দে বিশিষ্ট পাড়াপ্রতিবেশী তার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার বোধ করলে।

তারপর যখন একদিন বিকালে মিষ্টার ডাট্‌এর বাড়ী থেকে তার চা-য়ের নিমন্ত্রণ এল, তখন রাস্তার ও ফুটপাথে দত্তদার বাগানওলা বাড়ীটার দিকে চেয়ে সে একটু তৃপ্তির হাসি হাস্‌লে।

চায়ের নিমন্ত্রণটা কিছু নয় বিষম ফাঁকি, এক কাপ চা, ছোট দুখানা কেক, চারখানা বিস্কুট। এতে পেটুক বরেনের পেট মোটেই ভর্‌ল না, কিন্তু পরিবেশনকারিণী লীলা ওরফে বেবসির মুখের দিকে চেয়ে তার মনখানি ভ'রে গেল।

চারধারের সিজন ফ্লাওয়ার গুলির দিকে চেয়ে বরেন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, কলকাতায় বসে এম, এস, সি, বি, এল, হলেও এসব পরিবারে ঢোকা যায় না, কিন্তু কালাপানির ওপারে দাদার দেশের এমনি মহিমা—যাহোক একটা ছাপ দিয়ে দিলেই পাস-পোর্ট। কত সহজে কত বড় এক ইঞ্জিনিয়ারের ড্রয়িংরুমের শিক্ষিত সমাজে তার জায়গা হয়ে গেল, এই দেখে সে আশ্চর্য্য হল।

সেই থেকে, সব টেবিলে—তা সে বিলিয়ার্ডের হোক, ব্রীজেরই হোক, কি ছোট হাজরির হোক, লীলাকে বরেন সব সময়ে সঙ্গী পেত।

মোটর নিয়ে এসে জু কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নাম ক'রে একটা ডাক দিলে, লীলাও যেমনি ব্যস্ত হয়ে নেমে আসত তার মা তেমনি অপ্রস্তুত, হবার ভয়ে বেয়ারা পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজেও খানিকটা ছুটোছুটি করে নিতেন। মিষ্টার দত্তও বরেনকে ভারী ঠাণ্ডা ছেলে বলে জানতেন, রোজ সন্ধ্যেবেলা নিজের পড়বার ঘরে তাকে ডেকে নিয়ে খবরের কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর মুখে পাইপ, আচার বিচার ভীষণ সাহেবী, কিন্তু 'ইংরেজ' কথাটা ব্যবহার করলেই তার সঙ্গে তিনি একটা 'বেটারা' যোগ করতেন। খবরটা সরকারের জানা

থাকলে তিনি কখনোই সি, আই, ই হতেন না এ আমরা নিশ্চয় বলতে পারি।

টুঙ্-টুঙ্-টাং—লীলা পিয়ানো বাজাচ্ছিল, তার বাবা তার সঙ্গে একটা বেস্থরে গান জুড়ে দিয়ে সকলকে বিরক্ত করছিলেন। সবুজ আলো দেওয়ালের সবুজ রংকে সুন্দরতর করে তুলেছিল, বরেন একখানা ছবির দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসেছিল—তার নাম শুক্ল রজনী; জ্যোৎস্নায় পার্ব্বত্যপ্রকৃতি ভরে গেছে, ছোট একটি নদীর তীরে যুবা যুবতী—সাহেব মেম। হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে—দশটা। বরেন আস্তে আস্তে লীলার কাছে উঠে এসে পিঠে হাত চাপড়ে বললে—আজ একটু রাস্তায় বেড়াতে যাবে ?

চলুন, লীলা উঠল।

এধার ওধার করে তারা অনেকটা ঘুরল। শর্ট ষ্ট্রীট, হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট, ল্যান্সডাউন রোড, নিস্তব্ধ নির্জ্জন। মাঝে মাঝে সাহেবদের বাড়ীর জানলার পর্দ্দার আড়াল দিয়ে আলো এসে বাগানে পড়েছে, মাঝে মাঝে মেমদের কল-হাস্য শোনা যাচ্ছে।

বরেন লীলার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলে, তারপর বললে, এইসব জায়গা দেখলে লণ্ডনের বাহিরে এক একটা রাস্তা কিছু কিছু মনে পড়ে।

লীলা বললে, বাস্তবিক, এমন বেড়াবার সুবিধা রয়েছে অথচ আমরা কেনযে বেরইনা ! এবার রোজ আসব আপনার সঙ্গে।

এক জায়গায় লতাপাতার আড়ালে পথটা বেশ অন্ধকার হয়ে রয়েছে, সামনে এক সাহেবের বাড়ী, দরজায় ভিজিটিং কার্ডের বাক্স টাঙানো রয়েছে।

লীলা বললে, এটা কার বাড়ী ?

একটা দেশলাই জ্বেলে বরেন পড়লে মিস কুপার।

কাঠিটা। নিব্‌তেই একটা প্রকাণ্ড কুকুর ফটকের কাছে এসে চীৎকার জুড়ে দিলে। বনেন লীলার হাতটা টেনে বললে, ছোট !

লীলা ছুটল না, কিন্তু বীর পুঙ্গব দৌড় দিলেন।

বরেনের মতলবটা ছিল, একটু ভালবাসা জানানো, কিন্তু সমস্ত রাস্তায় সেদিন তেমন সুযোগ পাওয়া গেল না।

দিনকতক পরে সাহেব বেশী বরেন এসে লীলাকে বললে, চল আজ হোটেলে খেয়ে আসা যাক।

কেন, হঠাৎ ?

আজ যে রাজার জন্মদিন।

এ সব বিষয়ে লীলার উৎসাহ বড় কম ছিল না, সে পোষাক পরে তৈরী হয়ে এল।

মোটরে উঠে বরেন বললে, কোথায় যাবে, ফির্পো, না পেলেটি, না গ্রেটইষ্টার্ণ ?

আমি যাব হোটেল ডি বেঙ্গল।

সে কোথায় ?

শ্যামবাজারে।

আরে-রাম। খোসের হাতে নয়ত থুতু দিয়ে তারা কেক তৈরী করে। এম্নি নোংরা।

আর সাহেবের হোটেলে খানসামারা কি করে, আপনি দেখতে গেছেন ?

বরেন জবাব দিলে না, সোফারকে ইসারা ক'রে দিলে কন্টিনেণ্ট্যাল হোটেলের সামনে গাড়ী দাঁড়াল।

জোড়া জোড়া সাহেব মেম অজস্র এসেছে। একধারে চেয়ার টেবিল টেনে নিয়ে বরেন লীলা বস্‌ল।

বয়'কে চুপি চুপি কি বলে দিয়ে বরেন বললে আজ তোমায় এমন একটা জিনিষ খাওয়াব যা কখনো খাও নি।

কারি কোর্ম্মা, চপ কাটলেট ছাড়া আরো কত বেনামী জিনিসের হরেক রকম ডিস এল। তারমধ্যে একটা বস্তু বাস্তবিক তার খুব ভালো লাগল, বরেন খানসামাকে আরো খানিকটা আনতে বললে।

খেতে খেতে বরেন বললে, ওটি কি খেলে, জানো ?

মুখটা অল্প তুলে লীলা বললে কি ?

ভগবতী !

চেয়ার সরিয়ে সশব্দে দাঁড়িয়ে লীলা বললে, কেন আপনি এ কাজ করলেন ! যা খাবার নাম করলে পাপ হয়, তাই আপনি আমাকে খাওয়ালেন ?

ও রকম সংস্কার তোমার আছে ?

থাকবে না ? একশোবার থাকবে, আমি যে হিন্দু।

হিন্দু তুমি ?

চোখে আগুন ছড়িয়ে লীলা বললে, নই ?

বরেনেরও মনে পড়ল, ধর্ম্মে সে হিন্দু ছাড়া আর ত কিছুই নয়। তবু ক্রচপাটা শাড়ী আর হিলওলা সাদা জুতোর দিকে চেয়ে তার খট্‌কা লাগল—এর মধ্যেও এতখানি হিন্দুত্ব ছিল !

কিন্তু তখনো—আমি হিন্দু—দীপ্ত এই কথাটা অতবড় হলের চারধারে প্রতিধ্বনি তুলছিল, যতদূর দেখা যায় সাহেব মেম ফিরে ফিরে সেই দিকে চেয়ে আছে ! কাছাকাছি যারা ছিল তাদের ব্যাপারটাও বুঝতেও দেরী হয়নি।

লীলা উঠে পড়ল, সমস্ত শরীর তার কেমন কচ্ছিল। মোটরে একটি কথা হলনা। বাড়ীতে এসে গলায় আঙ্গুল দিয়ে সে সমস্ত বমি করে ফেললে। লীলার পায়ে হাত দিয়ে বরেন বললে, আমায় মাপ করো, আর বাড়ীর কাউকে কথাটা জানিয়ো না।

লীলা কথা রাখলে, কিন্তু তিন দিন তার সঙ্গে কথা কইলে না।

হঠাৎ একদিন সকাল বেলা বরেন এসে বললে, আজ ষ্টারে চলো।

কি আছে ?

কাগজটা উল্টে দেখে বরেন বললে, ইরাণের রাণী।

আমার দিদিরা যাবে বলছিল, তাদের ফোন ক'রে দিই।

শান্তি আর গীতা সন্ধ্যের আগে এসে হাজির হল।

বৌবাজার পেরিয়ে লীলা বললে, মাগো এধারটা কি ধোঁয়া ! কি বিশ্রী রাস্তা লোকে থাকে কি করে ?

দুই বোন হেসে উঠল।

রিজার্ভ করা বক্সে চারজন এসে বসল। থিয়েটার আরম্ভ হয়ে গেছে।

পাশের বক্সে চারজন কলেজের বন্ধুদের দেখে বরেন খুব জোরে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে মুখের সামনেটা অন্ধকার করে দিলে, তারপর ওধারে মুখ ফিরিয়ে নিলে, লীলা বেশ দেখতে পাচ্ছ ?

একটা দৃশ্য হয়ে যেতে একজন বন্ধু ডাকলে, বরেন বাবু চিনতে পারেন ?

বরেন ফিরে দেখলে না, সিগারেট হাতে ষ্টেজের দিকে চেয়ে রইল।

একজন বললে, ওহে সতীশ, আর ডেকোনা।

সতীশ তখন চটে গেছে, চুপি চুপি বললে কি চাল হয়েছে দেখেছিস ?

তারপর ফিস্‌ফাস্ পরামর্শ স্থুরু হল, সতীশ বললে, দাঁড়া ওর সব কথা আমি বেফাঁস করে দোব, প্রথম অঙ্কটা হয়ে যাক।

ইতিমধ্যে খানসামা দুচারবার লেমনেড বরফ কাঁচের গেলাস করে এনে মহিলাদের হাতে দিয়ে গেল। লীলা মুখটা অসম্ভব গম্ভীর করে বসে রইল।

হঠাৎ সতীশ আরম্ভ করলে, আমার এক বন্ধু ছিল, জানিস ? সে বিলেত থেকে এক ঘোড়ার ডাক্তার হয়ে এসে আমাদের আর চিন্‌তে পারে না। মটর কিনেছে ধারে, হ্যারিসন হ্যাথওয়ের কাছে পোষাক করিয়েছে, বছরখানেক হল, এখনো টাকা শোধ করেনি. হোটেলে এত দেনা করে ফেলেছে যে তারা নালিশ করবার ভয় দেখাচ্ছে। এক বছরের মধ্যে তার যাটহাজার টাকা ধার হয়েছে। অথচ···

লীলা স্থির হয়ে শুন্‌ছিল, বরেন বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

অথচ কি হল ? বন্ধুরা সুর তুললে।

অথচ তার এখনো এমনি ষ্টাইল, যে অনেক বড় বড় লোক তাকে মেয়ে দেবার জন্যে পাগল। আবার একটি মহৎ গুণ আছে, এক্স্‌'শ' নম্বর টু সোডা দিয়ে অমন দশবারো গ্লাস খেলেও তার কিছু হয় না।

একজন বললে, এত খবর তুমি কি করে জান্‌লে ?

তার পেয়ারের বন্ধু সাম্‌শিস্ আমাদের আপিসে কাজ করে কিনা, সেই সব বলে। খবর নিয়েও জেনেছি, একটাও মিথ্যে নয়। এমনি সময়ে বরেন আবার ফিরে এল।

সতীশ বললে, এই সব দাঁড়কাকগুলোর শাস্তি কি জান, চাবুক আর জলবিছুটি।

একজন বললে, ছিঃ সতীশ, ঐ দেখ দাদা বলছে, শাস্তি দেবার মালিক ভগবান্।

কথাটা শুনে সতীশের রাগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এল,

কিন্তু লীলার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল—বরেন এমনি, না আর কার কথা বলছে।

সব সন্দেহ মিটে গেল, একজন জিগেস্ করলে, লোকটার নাম কি ?

সতীশ বললে, তাকে তোমরা সবাই জানো, সে সকলেরই বন্ধু। ধর তার নাম বরেন চৌধুরী।

বরেন চৌধুরী ফিরে দেখেই টুপিটা মাথায় লাগিয়ে নিলে। লীলার দিকে ফিরে বললে, এবার চল, শেষটা বিয়োগান্ত ভাল লাগবে না।

সকলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের অট্টহাসিতে সমস্ত থিয়েটারের লোক একবার চম্‌কে উঠল।

সকাল বেলা উঠে লীলা চারদিকে খোঁজ নিতে লোক পাঠালে। দশটার পর নিজে একবার টেলিফোন করে মোটরের দোকানে খবর নিলে—মিষ্টার বি চৌধুরীর গাড়ীর টাকা শোধ হয়েছে! জবাব এল, শোধ হয় নি, এবং আর তারা অপেক্ষা করবে না।

লীলা খস্‌খস্ করে একখানা চিঠি লিখে দরওয়ানের হাতে দিয়ে বলে দিলে চৌধুরী সাহেব এলে যেন দেওয়া হয়।

বিকেল বেলা ফটকের কাছে এসেই বরেন কাগজখানা পেলে। খুলে পড়লে, বাটহাজার টাকা দেনা শোধ করে তারপর এলে বাধিত হব।

বরেন বুঝল কাল সেই শা—য়া সব ফাঁস করে দিয়েছে, এখন চাপা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। লীলার সঙ্গে একটা বিপুল সম্পত্তি পাবার আশাও আজ ধূলিসাৎ হল। নিঃশব্দে বরেন ফিরে গেল, জানলার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে নেই।

নিজের বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে তার আপনার দেশের ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠল। সেই ধলেশ্বরী, শীতলাক্ষা, তাজপুর, বীরতারা, পূর্ব্ববঙ্গের প্রিয়তম শৈশবস্মৃতিগুলি হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

মনে হল অমনি কোন দূরগ্রামের নদীতীরে একখানি ছোট ডিঙি যদি তার সম্বল হত, তাহলে থিয়েটার রোড়ের বাড়ীর সামনে মটরকার সে কখন চাইত না। সেই ভালো, না এই ভালো? সেই ভালো, সেই ভালো, লাখোবার ভালো!

ঘরে ঢুকে বালিশে মুখ গুঁজে বরেন বললে, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাবেন, আমাকে আজ ক্ষমা করুন।

* * * *

দিনকতক পরে দেখা গেল, বরেনের পায়ে কট্‌কী জুতো আর গায়ে চড়চড়ে খদ্দর উঠেছে, লীলার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়, আর খদ্দরের রুমাল দিয়ে চশমা পরিষ্কার করবার ধুম পড়ে যায়। এবং সেই পৌরুষ উপেক্ষার সৌন্দর্য্যে সুশিক্ষিতা কুমারীর মুগ্ধনয়নে প্রশংসা ফুটে ওঠে।

শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] বড়দিন, ১৯২৪ সাল [৭ম সপ্তাহ

গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য এবং বংশীবাদক স্বর্গীয় অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) মহাশয়, রাজসাহা, তালন্দের জমীদার স্বর্গীয় ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নে তাঁহার রামপুর বোয়ালিয়ার প্রাসাদতুল্য ভবনে মধ্যে মধ্যে গিয়া অবস্থান করিতেন। ললিতমোহন বাবু যেরূপ সাতিশয় গীতবাদ্য প্রিয় ছিলেন,—সেইরূপ নাট্য-কলানুশীলনেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালার ন্যায় রামপুর বোয়ালিয়ায় একটী সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে তিনি বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। ১৩০৪ সালে কলিকাতায় যে বৎসর প্রথম প্লেগ দেখা দিয়াছিল, এবং ভয়-বিহ্বল নর-নারীগণ কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল—ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল,—সেই সময়ে ললিতমোহন বাবু সুযোগ বুঝিয়া, হাবুবাবুর সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালা হইতে স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ(দানীবাবু) প্রভৃতি অভিনেতা এবং স্বর্গীয়া ভূষণকুমারী দাসী, স্বর্গীয়া সুশীলাসুন্দরী দাসী প্রভৃতি অভিনেত্রী লইয়া গিয়া রামপুর বোয়ালিয়ায় একটী রঙ্গালয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক অভিনয় ঘোষণা করেন। গিরিশবাবু এই সময়ে ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ললিতমোহন বাবু তাঁহাকে নগদ তিন সহস্র টাকা সম্মান স্বরূপ দিয়া ও যথেষ্ট পারিশ্রমিক প্রদানে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকেও রামপুর বোয়ালিয়ায় লইয়া যান; এবং তাঁহার উপর থিয়েটার পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। থিয়েটারের নামকরণ হয় "মার্ভাল (Marval) থিয়েটার।" প্রথম রাত্রে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত একটী কবিতা পঠিত হয়।

খ্যাতনামা অভিনেতৃগণ সম্মিলনে অভিনয়ও যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল—দর্শকগণের ভিড়ও সেইরূপ অসম্ভব দইয়াছিল। সমস্ত দেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। যাহাই হউক ললিতমোহন বাবুকে বেশীদিন থিয়েটার করিতে হয় নাই। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর একান্ত প্রার্থনায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট অতি অল্পদিনের মধ্যেই থিয়েটার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বহুকাল হইতে সযত্নে রক্ষিত উক্ত কবিতাটী অদ্য আমরা "সচিত্র শিশিরের" পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম। কবিতাটা এই :—

ইতিহাস করে গান, রাজসাহী রাজস্থান
সুজলা সুফলা শ্যামা সুন্দরী প্রদেশ;
নব রস-বশ-চিত, সুধীবৃন্দ 'বর জিত
মরালস্বভাব-গুণ-আকর অশেষ!

বিকাশ নটের প্রাণ, সহৃদয় বিদ্যমান
অমানীর মানদাতা সম্মান-পয়োধি;
উত্তেজিত নব আশে, অন্তর পুলকে ভাসে,
উৎসাহ পাইব—ত্রুটি হয় শত যদি।

দুর্দ্দান্ত দুর্দ্দিনোদয়, আসিয়াছি পেয়ে ভয়,
উচ্চাশ্রয়ে অভয়ে গাইব হরিনাম;
এই ক্ষুদ্র রঙ্গালয়, তব দৃশ্য যোগ্য নয়—
ত্যাজি দোষ, গুণ ধর—ওহে গুণধাম!

কর যদি তিরস্কার, মানি লব পুরস্কার
বহু মানে শির পাতি করিব গ্রহণ;
সবিনয়ে নিবেদন, জানায় হে আকিঞ্চন—
বহু আশে আসিয়াছি—করোনা বঞ্চন!

———

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি অপ্রকাশিত কবিতা

[তাঁহার পুরাণো ছিন্ন খাতা হইতে

...শ্রীদিলীপকুমার রায়]

(১)

নিশার ঘন আঁধার টুটি,
উষার আলো উঠিছে ফুটি।
কত দৈন্যে কত না দুখে,
কতই স্নেহে ধরিয়া বুকে,
অশ্রুধারে বিজনে জাগি—
উপবাসিনী যাহার লাগি,
কতই ভয় ভাবনা কত,
সহিতেছিল মায়ের মত,
সেই সে উষা জাগিয়া উঠি—
মেলিছে তার নয়ন দুটি।

(২)

অবিচলিত সে উষারাণী
তুলিয়া তার আননখানি
প্রেমভরিত নবীন প্রাণে
শুদ্ধ চাহে শূন্য পানে
শুদ্ধ মৃদু মধুর হাসি
বিকাশে তার কিরণরাশি,
খর শত সহস্র ধারে
বিদ্ধ করি অন্ধকারে ;
কি যেন এক মন্ত্রবলে
মুগ্ধ সব গগনতলে
অমনি মেঘ কিরণ মাখি,
যে যেখানে সে সেখানে থাকি

জানু পাতিয়া ভক্তিভরে

সকর যোড়ে নমিয়া পড়ে।

(৩)

আসিছে ঐ মোহন উষা,

পড়িয়া নব মোহন ভূষা ;

তরুণ রবি মুকুট শিরে—

জ্বলিছে মেঘ অঙ্গ ঘিরে।

চরণে আভা ঘেরিয়া তাযে

বিহগ গীত নূপুর বাজে ;

ধরণী পরে আঁচল লুঠে

গন্ধবহ জাগিয়া উঠে

অরুণ হাসি মুখেতে, তায়

মুক্তাগুলি ছড়ায়ে যায়।

(৪)

কোথায় ছিল এ উষারাণী

রাত্রে ঢাকা ? এ মুখখানি ?

এই প্রতিভা এ রূপরাশি,

কোথা ছিল এ মধুর হাসি ?

এ উৎসব এ কোলাহল

এ মৃদু বায় এ পরিমল

এত কুসুম এত যে গান,

জীবন-ভরা নবীন প্রাণ ?

নিশার সেই পক্ষতলে

আঁধারে সেই পলে ও পলে

নিশার কত নয়ন-নীরে

বাড়িল উষা ধীরে ও ধীরে।

——

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নটনীতি

[শ্রীঅমৃতলাল বসু]

(১)

না রবে নিজের মুখ, আপনার দুঃখ-সুখ,
কেশ বেশ নাম দেশ ভাষা অপরের।
স্পষ্ট মিষ্ট উচ্চ স্বর, কথা ক'বে কলেবর,
প্রতি অঙ্গ প্রকাশিবে ভাব ভিতরের ॥

শুধু না হাঁসিবে দাঁত, চোখ-মুখ তার সাথ,
নিঙাড়ি আঁতের হাঁসি করিবে বিকাশ।
তব চক্ষে জল ঝরে. তবে তো কাঁদিবে পরে,
কাঁপালে গলার স্বরে ফোটে না নিরাশ ॥

কিবা দৃশ্য কিবা শ্রাব্য, পড়িবে বিবিধ কাব্য,
পাত্রের ব্যথায় ব্যথা করিবে অভ্যাস।
যদি হ'তে চাও কৃতী, জাগ্রত রাখিবে স্মৃতি,
হেলায় আবৃত্তি হবে বচনবিন্যাস ॥

কারো পানে নাহি চাবে, তারে দেখ ভাব সবে,
সহযোগী সনে রবে নয়নে নয়ন।
তবু যেন দেখে' আঁখি, কি করিছে মনপাখী,
বুঝিয়া বিমুগ্ধ হয় দর্শকের মন ॥

(২)

রঙ্গমঞ্চে যতক্ষণ, তুমি নও ততক্ষণ,
রহিবে বিভোর ভাবে রবে কি নীরবে।
করুণা জাগাতে হ'লে ভেসে যাবে আঁখিজলে,
আপন হৃদয় দলে' গলাইবে সবে ॥

ফ্‌কারি 'জানকী' নাম, সত্য না কাঁদিলে 'রাম'
হবে ভ্যাবাগঙ্গারাম লোকে উপহাস।
আবেগ কাঁপাবে স্বর, দুর্‌দুর্‌ হৃদিঘর,
রোদনে বদন বক্র করে রসনাশ ॥

(৩)

বীরসাজে বীরকাজে, চোয়াড়ী গোঁয়ারী ঝাঁজে,
লম্ফে-ঝম্ফে হুহুঙ্কারে ফাটায়ো না গলা।
দেখ সাক্ষ্য বহুমান, এমন যে হনুমান,
রণকালে মনে মনে খেলে মনকলা ॥

লক্ষ্মণ অর্জ্জুন ভীষ্ম, রণ্‌জিৎ গোবিন্দশিষ্য,
প্রতাপ কি পৃথ্বীরাজ রাজপুতগণ।
বাবর বা আকবর, রোস্তম কি সেকেন্দর,
সিংহপ্রাণ সে রিচার্ড বোনা নেল্‌সন্‌ ॥

বলে না তো ইতিহাসে, ফুস্‌ফুস্‌ ফাঁসানো ভাষে,
বিজয়-অর্জ্জন আশে করেছে গর্জ্জন।
তবে কেন নটকুল, গলা করে চুল্‌বুল্‌,
পারিবে না হুলুস্থূল করিতে বর্জ্জন ॥

খাড়া হ'য়ে অষ্টাবক্র, একেবারে ভীম চক্র,
খামাটি মারিয়া দাঁত দেখায় না 'ফেস্‌'।
অঙ্গুলি-হেলনে তাঁর, দেখি লক্ষ্য খড়গধার,
বচনে গাম্ভীর্য্যবীর্য্য আঁখিতে আদেশ ॥

(৪)

প্রণয়ের পূর্ব্বরাগে, কেঁদে ফেলে' আগেভাগে,
আদিরসে করিবে না শ্মশানের সৃষ্টি।
প্রফুল্ল প্রেমিকবরে নারী উপাসনা করে,
প্যান্‌পেনে পুরুষের করে না সে দৃষ্টি ॥

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

তরল নয়নে চাবে, মধুভাষে গুণ গাবে,
হাঁসিয়ে বিষাদশ্বাস লুকাইতে যাবে।
অকস্মাৎ আলিঙ্গন, অপ্রস্তুত পরক্ষণ,
অধর অধার তবু চুমো নাহি খাবে ॥

আদিরস-অভিনয়, সুকঠিন অতিশয়
বঙ্গের সমাজরীতি নাশি করি ভঙ্গ।
গেছে কালিদাস-কাল, কবির রসের জাল,
মানা পুন ইংরাজের লীলাভঙ্গিরঙ্গ ॥

(৫)

বাগ্মিতার পরিচয়, ভীষণ নিনাদ নয়,
বদন ব্যাদানি' কোসে কর্কশ চীৎকার।
জিহ্বায় তুলিয়া ঝড়, বক্‌বক্ হড়্ বড়্,
ফোলা গালে নোলা নেড়ে 'গাঁগাঁ'র ফুৎকার ॥

বক্ষের কক্ষের বলে, কথা ক'বে কণ্ঠনলে,
যাবে স্বর দূরে চলে' মধুর হিল্লোলে।
ভাবের সংনতে ভাষা, নেচে-খেলে' যাওয়া-আসা,
করিবে উপরে-নীচে গভীর কল্লোলে ॥

দেখ কাড়া বেজে রোখে, তাড়ায় বাড়ীর লোকে,
পাড়ার বাহিরে কিন্তু না যায় আওয়াজ।
আর সানায়ের সুর, কাছে বসে' সুমধুর,
শোনা যায় কতদূর তার মিহিকাজ ॥

(৬)

বধিতে মিষ্টির গুষ্টি, চক্ষু ভাঁটা বদ্ধ মুষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অঙ্গভঙ্গি করে কত নট।
ভুলে যায় হায় হায়, প্রাণ দিতে সুষমায়,
অঙ্গখানি তার মাত্র চারু চিত্রপট ॥

নটীমাঝে কেউ কেউ, বুক ঠেকে' তুলে' ঢেউ,
ঢু'করে কোপান্ কোসে নিরীহ বাতাসে।
কাহারো হাতের চেটো, ঠিক যেন পাড়ে এঁটো,
সুন্দর অঙ্গুলিগুলি শিঁট্‌কায়ে টাঁসে॥

(৭)

রসিক সুজন যেই, কাছা খুলে' ধেই-ধেই,
নাচে না আসরে সেই চূনীকালি মেখে।
সুনট মর্কট নয়, ভাষা তার রসময়,
প্রকৃতি রেখেছে হাঁসি চোখে-মুখে এঁকে॥

সে-পাত্র প্রবেশমাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
হাঁসাইলে সারারাত্র হাঁসি না ফুরায়।
রঙ্গশেষে বাসে আসি, খেতে-শুতে আসে হাঁসি,
মাতাল করিয়া দেয় কৌতুক-সুরায়॥

(৮)

সুস্থদেহে রবে বল, ফুল্লমুখ ঢলঢল,
সৌষ্ঠবে সর্ব্বাঙ্গে যেন বিরচিত পদ্য।
ক্ষীণোদর ক্ষীণকটি, নাহি হ'লে নটনটী,
রঙ্গভঙ্গি-পরিপাটী মাটি হয় সদ্য॥

লঘু অঙ্গ পূতগন্ধ, প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপে ছন্দ,
পরিচ্ছন্ন কেশ-বেশ আনন্দদর্শন।
না হবে কপট খল, পরিষ্কার অন্তস্থল,
শিষ্টসনে মিষ্টালাপে অমৃত বর্ষণ॥

মানীরে দানীবে মান, কখন নেবে না দান,
তব মান নাহি যথা ত্যজিবে সে স্থান।
স্বাধীন উদারচেতা, পরহিতে সদা নেতা,
বিদ্যায় হইতে জেতা রবে অভিমান॥

কুসঙ্গ কুকথা ত্যজি, কলার আলাপে মজি,
আমোদে মাধুরী দিতে করিবে যতন।
প্রমোদে প্রমদা সনে, মর্য্যাদা রাখিবে মনে,
পশুকর্ম্ম হ'লে নর্ম্ম তখনি পতন॥

আলস্যে প্রশ্রয় নয়, সুরাপানে স্বাস্থ্যক্ষয়,
সখ্যপ্রেমবিনিময় রঙ্গসঙ্গী সনে।
নিজভাগ্যে রবে তুষ্ট, নিন্দায় না হবে রুষ্ট,
ভগবানে দেবে ভার দুষ্টের দমনে॥

করতালি এন্‌কোর, হয়েছে গর্ব্বের গোর,
কত অভিনেতা তায় হইয়াছে মাটি।
যার-তার স্তুতিজোরে, মাথা যেন নাহি ঘোরে,
নিন্দুকে ধরিলে দোষ ধোরো না হে লাঠি॥

(৯)

মায়াবী বঞ্চক ভণ্ড, দুর্দ্দান্ত দাম্ভিক যণ্ড,
রঙ্গমঞ্চে কর্ম্মপণ্ডতরে অবতার।
লোভী দাস দুরাশার, অত্যাচারী অনাচার,
মিত্রঘাতী পক্ষপাতী শত্রু এ বিদ্যার॥

মিথ্যা হিংসা রোষ ঋণ, স্বার্থচিন্তা চিত্ত ক্ষীণ,
কলার আলাপে যার বিষম বিকার।
নাটকঘরের পাশে, এরা যেন নাহি আসে,
আছে মুক্ত উপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দ্বার॥

(১০)

নটনটী মধ্যে চাই, পুত্র পুত্রী ভগ্নী ভাই,
আনন্দ সম্বন্ধ এই যতনে রক্ষণ।
অধিক এগুলে আর, সুখশান্তি ছারখার,
দোঁহে করে দোঁহাকার মস্তকভক্ষণ॥

নাট্যশাস্ত্রে আছে সূত্র, ভারতে ভরতপুত্র,
রাজার সমান হবে গম্ভীর উদার।
রাজার সমান তার, শাসন-পালন-ভার,
সেকেলের সূত্রধর আজ ম্যানেজার॥

ভাবভঙ্গি আচরণে, রাজারে রাখিয়া মনে,
স্থির করে' লবে নট নিজ ব্যবহার।
নৃত্যগীতবাদ্যদক্ষ, বেশভূষাকর্ম্মাধ্যক্ষ,
সুরসিক বিচারক কলা-কবিতার॥

লক্ষ লক্ষ নারীনরে, যে বিদগ্ধ মুগ্ধ করে,
সে কেন না নরবরে করিবে আদর্শ।
অভিজ্ঞতা শাস্ত্রদীক্ষা, আমারে যা দিল শিক্ষা,
নটনটী-শুভলক্ষ্যে দিনু পরামর্শ॥

পত্রিকা ও নাট্যশালা

[শ্রীঅমৃতলাল বসু]

সে আজ কত কালের কথা যখন এ দেশে আমরা প্রথম প্রকাশ্য নাট্যশালা খুলি, তখন এ সহরে যে কয়খানি সংবাদপত্র ছিল, তাহার সম্পাদকেরা যথা ৺শিশির ঘোষ মনোমোহন বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাদের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, রিহার্সালে আসিতেন, ষ্টেজের ভিতরেও যাইতেন, সুপরামর্শ দিতেন, এমন কি ইংরেজের কাগজ ইংলিশ-ম্যানে তখনকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকগণ সাধারণ ভাবে বাঙ্গালীর মতের পোষকতা না করিলেও নাট্য-শালার কার্য্যসম্বন্ধে আমাদের অনেক সাহায্য করিতেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহারা রীতিমত শিষ্টাচার সম্পন্ন ভদ্রলোক ছিলেন।

মধ্যে একটা সময় যায় যখন বাঙ্গালা পত্রের সম্পাদকেরা সময় সময় নাট্যশালার কথা বা অভিনয় সমালোচনা করিলেও একটু বেশী মুরুব্বি ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বভাবতঃ নটেরা একটু আদুরে গোপাল হয়, আদরে গলিয়া যায়, স্নেহের ভাবে শিক্ষা দিলে মাথা পাতিয়া শোনে, কিন্তু গোফ মুচ্‌ড়ে জ্যাঠাম করিলে তাদের গায়ের পাতলা চামড়া চিড়্‌চিড় করিয়া উঠে; তাহা ছাড়া তাঁদের কি প্রশংসা কি নিন্দায় আমরা কি যে সুখ্যাতি কি যে দোষ দেগানটা খুঁজি তাহা না পাওয়ায় —কে কি লিখিলেন কি না লিখিলেন তাহার দিকে বড় নজরও দিতাম না।

কিন্তু দুঃখ হইত যখন বিলাতী কাগজ পড়িতাম আর দেখিতাম তাঁহারা কি ভাবে অভিনয়ের সমালোচনা করেন। আমাদের এখানকার—লেখকেরা সে সব আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা যেমন মনে করেন যে পাণ্ডিত্যে তাঁহাদের জন্মগত অধিকার তেমনি কোন কোন তরুণ সম্পাদক মনে করিতেন যে যখন সম্পাদক হইয়া বসা গিয়াছে তখন লর্ড রবার্টসকে সৈন্য সংস্থাপন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতে জন লরেন্স টুলকে রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত সকল অধিকারই আপনা আপনি জন্মিয়া গিয়াছে।

ইদানিং এই অজ্ঞাতবাস যেমন একদিকে বর্ত্তমানের অভিনেতাদের কলাবিদ্যার উন্নতি চেষ্টা, শিক্ষিত সমাজে নাট্যশালার প্রতি বিশেষ আস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে তেমনি অপরদিকে কয়েকখানি বাঙ্গলা কাগজের ও বাঙ্গালী পরিচালিত ইংরাজি কাগজেরও স্তম্ভে দেশীয় নাট্যশালার বিস্তৃত আলোচনা দেখিয়া আমার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

এরূপ কয়েকখানি পত্রের পরিচালকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাগজ আমাকে পাঠাইয়া দেন এবং আমি প্রায়ই সেগুলি যত্ন সহকারে পড়ি, এবং তাহাতে দেখিতে পাই যে তাঁহারা কেবল সাফ নিজের বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির উপর নির্ভরে ফাঁকা আওয়াজ না করিয়া মনোযোগের সহিত সংস্কৃত ও ইউরোপীয় নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করেন।

তবে এ সম্বন্ধে আমার দুই চারিটা কথা বলিবার আছে, আমি যা বলিব তা আমার নিজের মত, আমি এমন আশা বা ইচ্ছাও করি না যে অন্যের সঙ্গে বিশেষতঃ এখনকার সুশিক্ষিত তরুণদের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য হবে, বা আমার বাণীকে dogma বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। আমার মতের প্রতিবাদ করিলে আমি তা পড়িব, শুনিব, কিন্তু উত্তর দিব না।

প্রথম কথা এই যে দেখিতে পাই সময়ে সময়ে যেন অভিনেতা বিশেষের প্রতিপত্তি বর্দ্ধন লইয়া পত্রে পত্রে লৌহাগ্র লেখনি-যুদ্ধ সংঘটন হয়;—এটা না হওয়াই ভাল।

আমার মনে হয় অভিনয় কালে অভিনেতার ব্যক্তিত্ব যত লুপ্ত থাকে ততই অভিনয়ের উৎকর্ষতা সাধিত হয়।

কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, অভিনেতা প্রভৃতি কলাবিদ্‌গণ মনুষ্য, সুতরাং তাদের ক্ষুধা, পিপাসা, শীতাতপ বোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্‌। একসময়ে বিশিষ্ট কলাবিদ্‌গণের প্রতিপালনের ভার রাজা বা তাঁহার সান্নিধ্যে

ষ্ঠিত পদস্থ ব্যক্তিগণ লইতেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজসম্মান তাঁহাদিগকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সম্মানিত করিত, কিন্তু সেদিন এখন আর নাই। অথচ কলাবিদ্‌গণ প্রায়ই কেহ যোগী সন্ন্যাসী নহেন। সংসারও তাঁহাদের আছে, কাজেই তাঁহাদিগকে লোকের দ্বারস্থ হইতে হয়। কলার প্রতিপোষকগণও কারিকুরির নামডাকের তারতম্যে নিজ নিজ বেটুয়ার মুখ সঙ্কীর্ণ বা প্রসারিত করেন, এই কারণেই পাশ্চাত্য থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পত্রে নটনটীর নাম প্রকাশের ব্যবস্থা প্রথমে হয়। এই নাম ছাপা লইয়া সেখানে সময়ে সময়ে অনেক হাঙ্গামা হইয়া থাকে; বোধ হয় বছর চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই যখন আমি কাগজে পড়িয়াছিলাম যে বিলাতের একজন অভিনেত্রী তাঁর নাম আর একজন "ষ্টারের" নামের চাইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার ম্যানেজারের নামে চারি অক্ষর বিশিষ্ট সংখ্যা পাউণ্ডের ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার অল্প আগেই কলিকাতায় প্রথম ব্যবসায়ী বিলাতী নট সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের কাছে সুলতানা বোলে একজন মার্কিন মদ বিক্রেতা একটা কাঠ করগেট মিশ্রিত Pavillion তৈয়ারী করিয়া দেন, আর অষ্ট্রেলিয়া হইতে Louis দম্পতী স্বদলে আসিয়া শীতকালে সেখানে অভিনয় করিতেন। তখন আমরা ছোকরা, সখের থিয়েটার করি, মাঝে মাঝে ইংরাজদের থিয়েটার দেখিতে যাইতাম, আর সেই কাঠের বাড়ীটিকে ড্রুরি লেন Covent gardenএর প্রতিবিম্ব মনে করিতাম, তখনকার অভিনেতা হাউই এলেন, মিসেস্ লুইস্, মিস্ ক্যারি জর্জ্জ প্রভৃতিকে কীন, কেম্বল, গ্যারিক, মিসেস্ সিডনস্, মিসেস্ জর্ডনদিগের প্রতিনিধি বলিয়া ভাবিতাম; সুতরাং এখন একটু লজ্জা বোধই হউক বা যাই হউক, আমরা যে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের সময়ে সকল বিষয়েই ঐ ইংরাজী থিয়েটারটিকে আদর্শ রাখিয়া, তাহাদের যথা সম্ভব ও যথাসাধ্য অনুকরণ করবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এ অপরাধ স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল একটি বিষয়ে একেবারে অনুকরণ করিব না ঠিক করিয়াছিলাম, সেটি হইতেছে বিজ্ঞাপনে অভিনেতাদের নাম প্রকাশ করা; তখনকার প্রথম ও গুরুতর কারণ ছিল যে আমরা সবাই ছিলাম Amateur, তাহার উপর একে থিয়েটার করিতেছি, তার উপর টিকিট বেচিয়া (কেবল ষ্টেজ ও অভিনয় খরচ চালাইবার জন্য) সুতরাং বাড়ীর লোক ও আত্মীয় স্বজনের কাছে এ 'দুষ্কর্ম্মটার' সংবাদ যতটা পারি পৌছাইবার সম্ভাবনা হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করা যাইত। তারপরে গিরিশবাবু ও আমি উভয়েই নাম ছাপার বিরোধী ছিলাম। কতকটা শেষাশেষী এ প্রথার একটু আধটু ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বটে, তাহার কারণও ছিল। গিরিশবাবু যখন প্রতি রাত্রি অভিনয় করা বন্ধ করিয়া মাঝে মাঝে কোন একটা বিশিষ্ট ভূমিকা লইয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন তখন সেই রাত্রে তাঁহার নামটা দেওয়া হইত, অথবা অমৃত মিত্রের মতন কোন প্রসিদ্ধ অভিনেতা শারীরিক পীড়া বা অন্য কোন কারণে রঙ্গমঞ্চ হইতে সাময়িক অবসর লইতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহাদের পুনরায় কার্য্যে যোগ দেওয়ার সংবাদটা বিজ্ঞাপনে দেওয়া হইত।

আমাদের বিশ্বাস ছিল ও আমার এখনও আছে যে অভিনেতা তাঁর আপনাকে যতই অধিক অন্তরালে রাখিতে পারিবেন বহুরূপী বিদ্যার বলে বহিরাঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া ভূমিকা-গত চরিত্রের ধ্যানে নিজের ভাবকে যতই ডুবাইয়া দিতে পারিবেন, ততই তাঁহার অভিনয় সমধিক সফলতা লাভ করিবে। আমার ইচ্ছা হইত যে অভিনেতাগণ নিজের মূর্ত্তি লইয়া পথে ঘাটে বাজারে নিমন্ত্রণে যতই কম উপস্থিত হ'ন, রঙ্গমঞ্চের সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। এইজন্যই হাতী বাগানে বাটী নির্ম্মাণের সময় অভিনেতাদের গমানাগমনের জন্য পূর্ব্বদিকের গলির উপর একটি দরজা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু অনেকটা আমারই দোষে আমার কামনা পূর্ণ হয় নাই; আমি একটু রাস্তা দেখিতে ভালবাসি, আর লোকজনও আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন বলিয়া সকালে বিকালে বাহিরের দিকে বসিতাম, স্বভাবতঃই দুই দশ জন আসিয়া সেখানে সঙ্গী হইতেন।

এক্ষণে ষ্টার থিয়েটার যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা ঐ দ্বারটির সদ্ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত।

ইংরাজেরা, আমার চক্ষে ফরাসী জার্ম্মাণ মার্কিণ ইটালিয়ান রুষ প্রভৃতি হ্যাটকোটধারী শ্বেতজাতি মাত্রই ভয়াবহ শাসক ও নমস্ত বলিয়া প্রতীয়মান, ইংরাজেরা বহুদিন হইতেই এই Art of make up বা বহুরূপী বিদ্যা যতটা উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন এবং প্রকৃতি তাঁহাদের চর্ম্মে খড়িমাটি কোটিং মাত্র দিয়া বর্ণ বিন্যাস বাঁকি রাখায় আকৃতি ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিবার যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তাহার প্রথমটির সীমা পর্য্যন্ত এখনও আমরা পৌছাইতে পারি নাই, আর দ্বিতীয়টির জন্য অনেকে অনেক Pears খরচ করিয়াও স্বভাবদত্ত পাকা রং চটাইতে পারেন না। Gladstone, Wellington, Nelson, বিশিলু, নেপোলিওন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্র বিখ্যাত চিত্রকর অঙ্কিত পটের সহিত মুখ মিলাইয়া ইঁহারা হুবহু তাঁহাদের মতন সাজিতে পারেন। পরিচ্ছদে সমস্ত অঙ্গ ও প্রায় আধখানা মুখ দাড়ি গোঁফের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকায় ইঁহাদের দেহ পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হইয়া উঠে।

আমাদের ঠিক ঠিক সাজিতে গেলে দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্র নগ্নদেহেই সাজিতে হয়। এইরূপে আকৃতিতে আত্মগোপনের চেষ্টা আমরা সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে প্রায়ই সক্ষম হই না। অভিনয়ে ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে এক সময়ে ইউরোপের সমালোচকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দুই বিভিন্ন মত ছিল। এক সম্প্রদায় বলিতেন অভিনয়কালে অভিনেতার সুখ দুঃখ, আনন্দ, হর্ষ প্রভৃতি প্রকাশ সকলি আঙ্গিক ব্যাপার; করুণাভিনয়ে অভিনেতার চক্ষু অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে বটে কিন্তু তাঁহার মনকে কাঁদাইবার কোন প্রয়োজন নাই; হাস্যরসের অভিনয়ে তাঁহার হস্তপদাদি অঙ্গ চঞ্চল হইতে পারে অধরও হাঁসিতে পারে কিন্তু দন্তের অন্তরালে সে হাসির ঢেউ না পৌছায়। অন্য সম্প্রদায় বলিতেন অন্তর হইতে হাস্যের উচ্ছ্বাস উচ্ছলিত করিয়া অভিনেতা তাহা চোখে মুখে অধরে অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশ করিবে; অভিনেতা যখন বলিবেন "I must weep, but they are cruel tears" তখন টিয়ারের বিন্দুগুলি যেন তাঁহার হৃদয় টিয়ার করিয়া চক্ষু দিয়া বাহির হয়; "ফুকারি জানকি নাম, নিজে না কাঁদিলে রাম, হবে ভ্যাবাগঙ্গারাম লোকে উপহাস।" প্রথমোক্ত সম্প্রদায় বলিতেন যে ভাল অভিনেতারা কখনই অভিনয়কালে একেবারে ভাবের সাগরে ডুবিয়া যায় না, তাহা যদি হইত তবে কেমন করিয়া তাহারা ষ্টেজে চখের জলে বুক ভাসাইয়া প্রস্থানের পর মুহূর্ত্তেই পক্ষ-পট পার্শ্বস্থিত কোন বন্ধুকে দেখিয়া "Hail fellow, well met" বলিয়া তাঁহার সহিত হাসিতে হাসিতে shake hand করে ? "I loved Ophelia forty thousand brothers could not with all their love added togetherএর" মতন হৃদয় নিষ্পেষণকারী করুণার বাণী গদগদভাবে বলিতে বলিতে ষ্টেজম্যানেজারের অসাবধানতা বশতঃ বেদীপীঠস্থ কোন বিসদৃশ বস্তুর সংস্থাপন নিজ পদের সাহায্যে সরাইয়া দেন ?

এইখানেই অভিনেতার বিদ্যার বিশেষত্ব। কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি অভিনীত চরিত্রের ভাবে তন্ময় হইয়া যাইবেন বটে কিন্তু ধ্যানস্থ যোগীর ন্যায় একেবারে আত্মহারা হইতে পারিবেন না। নিজের আকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে হ্যামলেটের কল্পিত মূর্ত্তির সহিত পরিবর্ত্তিত করিয়া, ভাবে, ভাষায়, স্বরে, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি ফর্ব্বস্ রবার্টসন্।

শব্দালঙ্কারে সজ্জিত ভাব-বৈচিত্র্যে বিভূষিত দীর্ঘ-ভাষী ভূমিকা লইয়া তিনি রাজাই সাজুন আর সেনাপতিই সাজুন; প্রতি কথায় হাসিয়া হীরক টুক্‌রা ছড়াইবার জন্য তিনি বিদূষকই সাজুন অথবা একটি সামান্য প্রহরী সাজিয়া নীরবে অভিবাদন করিয়া একখানি পত্র মাত্র মন্ত্রীর হস্তে প্রদান করিয়াই প্রস্থান করুন, তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বাচিত ভূমিকায় সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা হইতে হইবে; second class অভিনেতার স্থান কোন রঙ্গালয়েই থাকিতে পারে না। ইহা অসম্ভব নয় যে দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে বা আকস্মিক প্রয়োজনাধিক্যে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা অভিনয় করিতে চাহিলে আর্ভিনও পঞ্চম শ্রেণীর অভিনেতা হইয়া পড়িতেন। যে মশলায় হ্যামলেট তৈয়ার হয়, গ্রেভ্‌ডিগার সে মশলায় প্রস্তুত হয় না। স্বয়ং ভীমনাগও বোধ হয় আমাদের পাড়ার শুকদেবের মতন ফুলুরি ভাজিতে পারিতেন না।

কোন কোন অভিনেতা ভূমিকা বিশেষ অভিনয়কালে দর্শকের মনে এমন একটা ভাব মুদ্রিত করি দিয়াছেন যে সেই

চরিত্রের কথা মনে পড়িলে ঐ অভিনেতার চিত্রই যেন চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সধবার একাদশীতে নিমাই দত্তকে আকৃতি, বেশ, অঙ্গভঙ্গি ও বাচনিক অভিনয়ে গিরিশবাবু এমন একটা বাস্তবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ বাবু যদি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের খ্যাতি লাভ করিতেন তবে লোকে বলিত যে দীনবন্ধু বাবু গিরিশবাবুকে দেখিয়াই নিমাই দত্ত লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে আমিও নিমাই দত্ত সাজিয়াছি, বিশেষ অখ্যাতিও হয় নাই, তবুও আমার নিজের মনে কেবলই খটকা লাগিত যে আমায় ঠিক মানাইতেছে না। মৃণালিনীর পশুপতিও যেন অনেকটা গিরিশবাবুর মত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু অতুল নাট্যপ্রতিভা যখন ঐ গিরিশবাবুর ব্যক্তিত্বকে যশের রবিকিরণে সমুজ্জল করিয়া তুলিল তখন গিরিশবাবু যে যে চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন তাহার অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয়ের মধ্য দিয়াও গিরিশাভার আলোকাপাত প্রকাশ হইয়া পড়িত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়, বরং আরও অধিক; কেননা অভিনয়কালে gag (বাহিরের কথা) ব্যবহার করিলে বা কোন বিসদৃশ ক্রিয়া (business) দেখাইলে অত্যধিক জনপ্রিয় অর্দ্ধেন্দুর ব্যাকরণ দোষও লোকের উপভোগ্য হইত। গিরিশবাবুর সে দোষ কখন ছিল না, তিনি অত্যন্ত সাবধানে চলিতেন, পোষাক পরিলে তিনি আর কবি আচার্য্য নট-নক্ষত্র কিছুই নয়, একেবারে সাধারণ নটের ন্যায় সঙ্কুচিত।

দুর্গেশ-নন্দিনীর জগতসিংহ কি ওসমানকে মনে পড়িলে আমি চক্ষে দেখি বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎবাবু ও হরি বোষ্টমকে। "বুড় শালীকের ঘাড়ে রো" কর্ত্তা যেন প্যায়ারী বোষ্টম ছাড়া আর কোন লোক হইতে পারে না। কপাল কুণ্ডলার মনোরমা ও নবীন তপস্বিনীর কামিনী যেন সেই আদিকালের খেতু গাঙ্গুলী বই আর কেহ নয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের কত দারুমূর্ত্তি কত চিত্রপট দেখিয়াছি কিন্তু মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করিতে গেলেই আমি বিনোদিনীকে ধ্যান চক্ষে দেখি। অকালমৃতা কিরণকে দেখিয়া তারক গাঙ্গুলী মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছিলেন "অমৃতবাবু অই-ই আমার সরলা।" খাসদখলের গিরিবালা যেই সাজুক সুশীলাই ছিল গিরিবালা আর কুঞ্জই আমার কল্পনার ঠাকুরদাদা। এইরূপ অনেক চরিত্র চিত্রই আমার মানসপটে চিত্রিত আছে, বাহুল্য ভয়ে বর্ণনা করিলাম না।

সমালোচক ও পাঠকগণ যদি প্রাচীনের প্রগলভতা ক্ষমা করেন, তবে অভিজ্ঞতালব্ধ একটা কথা এখানে বলিয়া যাই। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে অভিনেতারা মনুষ্য মাত্র। পূজা ও স্তুতিতে একটু মাদকতা আছে, মাদক অল্পমাত্র সেবন করিলে চিত্তে স্ফূর্ত্তি আসে, কার্য্যে উৎসাহ বাড়ে, পরের প্রমোদের জন্য আপনাকেও বিসর্জ্জন দিতে প্রবৃত্তি জন্মায়, কিন্তু বোতল গর্ভস্থ সুরার ন্যায় স্তুতিগত তরল উত্তেজক দু'গ্লাস বেশী পেটে পড়িলে পা টলে, তারপর আর এক গ্লাস—আর একেবারে নর্দ্দামাসই। speedy rise mean speedly fall ইংরাজী বাক্যটিও একেবারে নিরর্থক নয়। ধূলা মাখা আধো আধো কথা কওয়া ল্যাংটা ছেলে আজ বড় হইয়া পোষাক আষাক পরিয়া ডেপুটী উকিল ডাক্তারাদি হইয়া লোকের নিকট যশোপার্জ্জন করিতেছে শুনিলে বুড়ো বাপ খুড়োর মনে যেমন আমোদ ও গর্ব্ব হয়, এখনকার বর্ত্তমানের অভিনেতাদের বহু খ্যাতি ও সুনাম শুনিয়া আমারও তাই হয়। তাই দু'কথা ব'ললাম! উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা বা বিদ্যা এ দীনের নাই।

যে সকল পত্রিকা অভিনেতাদের মঙ্গলামঙ্গল লইয়া আলোচনা করেন, তাহার লেখকগণকে আমি পরমাত্মীয়ের ন্যায় স্নেহ করি, কুলভট্টের মত সম্মান করি, তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যে বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি সাধিত হউক ইহাই আমার হৃদয়ের কামনা।

বাঙ্গলা নাটকের উন্নতি-অবনতি

[শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়]

"বঙ্কিম-যুগের পর বাঙ্গলা উপন্যাস এবং কাব্যের উন্নতি হইয়াছে কিন্তু নাটকের হয় নাই"—শুনিলাম, এই কথা নাকি অপরেশ বাবুর ইরাণের রাণীর পঞ্চাশৎ অভিনয় রজনীর সভায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আমার মনে যে সংশয়ের উদয় হইয়াছে, তাহারই নিরসনের জন্য এই নীরস ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বাঙ্গলা দেশে থিয়েটারের সৃষ্টি হওয়ার পর যতদূর জানি, স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৺মাইকেল মধুহৃদন দত্ত, এবং স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের কয়েকটী নাটক অভিনীত হয়। ইহার পর বোধ হয় স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটী উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করেন; পরে নিজেই নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। গিরিশচন্দ্রের সময়েই শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

গিরিশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বলা চলে না কারণ তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পরেই হইয়াছে। তাহা ব্যতীত এই দুই মহাকবিকে বঙ্কিম-মণ্ডলীর মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য করিতে কখনও শুনি নাই সুতরাং ইহাদিগকে বঙ্কিম-যুগের পরবর্ত্তী নাট্যকার বলিয়া ধরাই কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন এই যে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতির নাটক হইতে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রভৃতির নাটকাবলী কি উন্নতি লাভ করে নাই?

কি কি গুণ থাকিলে তাহাকে ভাল নাটক বলা চলে তাহা আমার জানা নাই; মোটামুটি এই মাত্র জানি যে, যে নাটক অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের ভাল লাগে তাহাই ভাল নাটক। আমি এই ভাললাগার দিক দিয়াই নাটকের উন্নতি অবনতির কথা পাড়িয়াছি। আমার তো সে যুগের নাটক অপেক্ষা এ যুগের নাটক পড়িতে এবং দেখিতে ভাল লাগে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সকলেরই তাহাই লাগে।

ইহাতে কেহ যেন এমন মনে না করেন যে আমি আগেকার নাটকগুলির নিন্দা করিতেছি। ঐ নাটকগুলিও ভাল লাগে তবে তুলনায় এখনকার নাটকগুলি বেশী ভাল লাগে—ইহাই মাত্র আমার বক্তব্য।

সকল কিছু লেখা অপেক্ষা নাটক লেখাই আমার কঠিন মনে হয়। কারণ নাটকে খোলা হাত থাকে না। নাট্যকারের নিজের কোন কথা বলা চলে না;—যাহা বক্তব্য তাহা পাত্রাপাত্রীর মুখ দিয়াই বলাইতে হইবে। আবার ঘাত প্রতিঘাতের উপর দিয়া বক্তব্য বলিতে না পারিলে নাটক নীরস হইয়া পড়ে। কাজটা কঠিন তাই অকৃতকার্য্যতাও বেশী। ঔপন্যাসিক হিসাবে যত লোকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, নাট্যকার হিসাবে ততলোকের প্রতিষ্ঠা, সেইজন্যই বোধহয় হয় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে বঙ্কিম-যুগের পর নাটকের আদৌ উন্নতি হয় নাই,—এ কথা, শ্রদ্ধেয় শরৎবাবুর মুখে শুনিয়াও, বিশ্বাস করিতে মন চাহে না।

আর একটা ব্যাপার আমার বেশ একটু আশ্চর্য্য মনে হয়। যাঁহারা ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা কেহই—একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত—নাটক লেখায় অগ্রসর হ'ন না কেন? কাজটা কঠিন, পাছে অকৃতকার্য্য হ'ন, পাছে প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন হয় এই আশঙ্কায় কি? আমার কিন্তু বিশ্বাস, তাঁহাদের মত সত্য প্রতিভাশালী লোক নাটক লিখিলে নাট্যসাহিত্য নিশ্চয়ই অধিকতর উন্নত হইবে। রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিয়াছেন বটে কিন্তু থিয়েটারের জন্য লেখেন নাই। সেইজন্য তাঁহার নাটকগুলি অভিনয়ে তেমন জমে না অথচ পড়িতে অতি সুন্দর। পড়িতেও সুন্দর অথচ অভিনয়েও জমে—এমন নাটকই আজকাল আমরা চাই। পরম শ্রদ্ধেয় এবং প্রভূত প্রতিভাশালী শরৎবাবুর দৃষ্টি যখন এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন এ আশা করা কি অনুচিত হইবে যে তিনি নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি বিধানে অতঃপর সচেষ্ট হইয়া, বাঙ্গালীর এই দীনতা মোচন করিবেন?

সঠিক জানি না তবে লোক পরম্পরায় শুনিতেছি তিনি নাকি একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সংবাদ যদি সত্য হয় তবে সত্যই বড় আনন্দ এবং সৌভাগ্যের কথা। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তখন বুঝিতে পারিব, "বঙ্কিম-যুগের পর নাটকের উন্নতি হয় নাই"—এ কথা তিনি কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

মায়া

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার জন্ম-বৃত্তান্ত

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

প্রাচীন ইতিহাস

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেরাসিম লেবেডেফ নামক জনৈক রুষিয়া নিবাসী পর্য্যটক কলিকাতায় আসিয়া বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। গোলকনাথ দাস নামক একজন ভাষাবিদের নিকট তিনি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া "The Disguise" এবং "Love is the best Doctor" নামক দুইখানি ইংরাজী নাটকের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন। গোলকবাবুর সাহায্যে তিনি বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক ১৮৯৫ ও ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, ২৫নং ডোমতলায় পুরাতন চিনাবাজার মধ্যস্থ একটী গলিতে "বেঙ্গলী থিয়েটার" নামে একটী রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করেন এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া দুইরাত্রি "Disguise" নাটকের অভিনয় পর্য্যন্ত করাইয়াছিলেন। ইহাই হইল বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাচীন ইতিহাস।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লেবেডেফের এই বাঙ্গলা থিয়েটারের সংবাদ বাক্ল্যাণ্ডের Dictionary of Indian Biography হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলা কাগজে প্রথম প্রকাশ করেন। ১৩২৮ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার তারিখে 'বাসন্তী' নাম্নী সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'পুরাতন প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে—"বাঙ্গলার আদি নাট্যকার—" বলিয়া এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তৎপরে "Calcutta Review" মাসিক পত্রে পণ্ডিত G. A. Grierson, প্রফেসর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধে এতদ্ সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচিত হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও প্রফেসর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া লেবেডেফের থিয়েটারের বহু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক বঙ্গরঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়াই বাঙ্গালীরা রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দৃশ্য-পটাদি সংযোগে থিয়েটার করিতে শিখেন। "মাইকেল জীবন চরিত" লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন,—"ইংরাজেরা প্রথমে "চৌরাঙ্গি থিয়েটার" নামক একটী থিয়েটার স্থাপন করেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় দুই একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর কদাচ কখন গমন ব্যতীত সাধারণ বাঙ্গালী-দর্শক তথায় যাইতেন না।" ক্রমশঃ ইংরাজের রাজ্য বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে বহুসংখ্যক ইংরাজের এদেশে আগমনে,—তাঁহাদের নাট্যশালারও সংখ্যা এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ইংরাজদের "সাঁ-সুছি" (Saus-Soci) নামক থিয়েটারটী সে সময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ বাঙ্গালীরা এ সকল থিয়েটারে না যাইলেও অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী যাইতেন। এতাবৎ তাঁহারা যাত্রা, পাঁচালি, কবির লড়াই প্রভৃতি লইয়াই আমোদ উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন,—অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য পট পরিবর্ত্তন কখনো দেখেন নাই। ইংরাজি থিয়েটারের এই নূতনত্ব দর্শন করিয়া দেশীয় নাটকের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনেকে উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী নবীন চন্দ্র বসু নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বিস্তর অর্থ ব্যয়ে তাঁহার বাটীতে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর কাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করাইয়া অভিনয় আয়োজন করেন। তৎকালীন-ইংরাজি থিয়েটার বা আধুনিক নাট্য-শালার ন্যায় অঙ্কিত দৃশ্যপটাদি ব্যবহার না হইলেও এই অভিনয়ে বিশেষ নূতনত্ব ছিল। নাট্যোল্লিখিত দৃশ্যগুলি সেই বৃহৎ ভবনে নানা স্থানে সজ্জিত হইয়াছিল। একস্থানে

—বীরসিংহ রায়ের রাজসভা ; একস্থানে—সুন্দরের বসিবার জন্ম বকুল তলা ; একস্থানে—মালিনীর গৃহ ; বাটীর শেষ ভাগে মশান,—এইরূপ সজ্জিত হইত এবং প্রত্যেক দৃশ্যের সম্মুখে আসনের ব্যবস্থা থাকিত। দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য দৃশ্যের সম্মুখস্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিতে হইত। এই অভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকাগুলি বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনে সাধারণে মুগ্ধ হইলেও ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা এবং বেশ্যা লইয়া অভিনয় সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে আন্দোলন করেন।

পর বৎসর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর উইলসন সাহেব কর্ত্তৃক "উত্তর রাম চরিতের" ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার শুঁড়োর বাগানে অভিনয় করান। স্বয়ং উইলসন সাহেবের শিক্ষকতায় সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন।

ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ইংরাজী অভিনয় সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় সেই সেই সময় হিন্দুকলেজ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি এই দুইটী বিদ্যালয়ই বিখ্যাত ছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব হিন্দু কলেজে এবং হার্মাম জেফ্রে নামক জনৈক ফরাসী ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে সে সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ইঁহারা উভয়েই নাট্য-কলাবিদ ছিলেন। ইঁহাদেরই উৎসাহ ও যত্নে ছাত্রগণের হৃদয়ে অভিনয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের আদর্শে কয়েক বৎসর ধরিয়া নানাস্থানে ইংরাজিতে সেক্সপীয়ারের নাটকগুলি অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অভিনয় হওয়ায় জনসাধারণ নাটকীয় রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইত। অনেকেই এই অভাব বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী সে সময় বাঙ্গলা নাটকও ছিল না। বিল্বমঙ্গল ও ভদ্রার্জ্জুন নামক দুই একখানি নাটক ছিল, তাহাতে আবার দৃশ্য বিভাগ বা প্রবেশ প্রস্থানও লিখিত ছিল না, ভাষাও মার্জ্জিত নহে। পাশ্চাত্য নাটক সমূহের রসাস্বাদ করিয়া শিক্ষিত-গণের তাহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় কলিকাতায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ নিজ গৃহে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করাইতে লাগিলেন।

ধনাঢ্য ভবনে সখের থিয়েটার।

শুভক্ষণে সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণের নিকট এই নাটক-খানি অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটা, চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের বাটিতে উক্ত নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। অভিনয় সর্ব্ব-সাধারণের এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, ধনাঢ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ভবনে ইংরাজী নাটকাভিনয়ের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

উক্ত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতার বহু ধনাঢ্য ভবনে বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য—(১) সিমলায় ছাতুবাবুর বাটীতে 'শকুন্তলা' অভিনয়, (২) মহাভারত অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে 'বেণীসংহার' অভিনয়, (৩) পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগেছিয়া উদ্যান ভবনে 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয়, (৪) সিন্দুরিয়া পটীর ৺গোপাল লাল মল্লিকের বাটীতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'বিধবাবিবাহ' অভিনয়, (৫) মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে মালবিকাগ্নি মিত্র, বিদ্যাসুন্দর, মালতী-মাধব, রুক্মিণী-হরণ, বুঝ্‌লে কি না? প্রভৃতি, (৬) যোড়াসাঁকো ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে নব নাটক, (৭) শোভাবাজার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকুমারী, (৮) বটতলার জয়মিত্রের পুত্র পাঁচকড়ি মিত্রের উদ্যোগে তাঁহাদের অপার চীৎপুর রোডস্থ

পুরাতন বাড়ীতে পদ্মাবতী, (৯) কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট) শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'কিছু কিছু বুঝি।'

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়, নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ নাট্যকলাবিদ্গণের সাহায্যে তৎসম্পাদিত 'অনুশীলন' নামক মাসিক পত্রে, শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাটীতে 'বিদ্যাসুন্দরের' অভিনয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার ধনাঢ্য ভবনে অভিনয়ের ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। ১৩০৭ সাল, ২২শে অগ্রহায়ণ, মিনার্ভা থিয়েটারে বাঙ্গলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার একটী বার্ষিক উৎসব হয়, সেই সভায় তিনি বঙ্গ-নাট্যশালার শৈশব ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শৈশব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার উৎপত্তি সুস্পষ্টরূপ প্রস্ফুটিত হইবে না, এই নিমিত্তই আমরা পূর্ব্বোক্ত ইতিবৃত্ত অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ করিলাম।

উল্লিখিত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভবনে নাটকাভিনয়ে দৃশ্যপট এবং পোষাক পরিচ্ছদ বহু ব্যয়েই প্রস্তুত হইত এবং শিক্ষিত অভিনেতারও অভাব হইত না। সুতরাং তাঁহাদের অভিনয় দেখিবার জন্য সাধারণের যে বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বড়লোকের বাটীতে থিয়েটার,—অধিক জনতায় পাছে অভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটে, এ নিমিত্ত স্থানোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ফ্রি টিকিট বিতরিত হইত—তাহার অধিকাংশই তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং উচ্চপদস্থ মান্য-গণ্য ব্যক্তিদের দিতেই ব্যয়িত হইত; সুতরাং নাট্যামোদী গৃহস্থ ভদ্রলোকের অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আত্ম-সম্ভ্রম-জ্ঞানহীন যদি কোনও ব্যক্তি বিনা টিকিটে রঙ্গভবনে প্রবেশের চেষ্টা করিত, দ্বারবান কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া বহিষ্কৃত হইত। গিরিশচন্দ্রের মুখে গল্প শুনিয়াছি, তাঁহার পল্লিবাসী জনৈক ভদ্রলোক, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে থিয়েটার দেখিবার একখানি টিকিট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি মহা আড়ম্বর ও অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত সেই টিকিটখানি প্রত্যেক লোককে দেখাইয়া বেড়াইতেন এবং কিরূপ যোগাড় যন্ত্র করিয়া, কত লোকের সুপারিশ লইয়া, কিরূপ বুদ্ধি-কৌশলে টিকিটখানি যোগাড় করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস বলিয়া, বসুপাড়ার লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিতেন।

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার

'সধবার একাদশী' নাটকাভিনয়।

(সাধারণ বঙ্গ নাট্যশালার বীজ বপন)

যুবক গিরিশচন্দ্রের মনে ঐ প্রকারে অভিনয় দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে, এইরূপ যদি একটী থিয়েটার করিতে পারেন, সেই বাসনাই মনে প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান—এত অর্থ কোথায় পাইবেন? মনের আশা মনেই থাকিত। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রতিবাসী স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ বাটীতে একটী কনসার্টের দল বসাইয়াছিলেন। গিরিশবাবু মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন। সেই সময়ে কলিকাতায় যেমন স্থানে স্থানে থিয়েটার হইতেছিল, সেইরূপ আবার স্থানে স্থানে সখের যাত্রাও হইতেছিল। গৃহস্থ যুবকগণের যাত্রা করাই সুবিধা ছিল, কারণ থিয়েটার অপেক্ষা খরচ অনেকটা কম পড়িত। গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, রাধামাধব কর, ধর্ম্মদাস সুর, উমেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলিত হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারে একটী সখের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ার্থে নির্ব্বাচিত হয়। যাত্রার উপযোগী কতকগুলি গান প্রিয়মাধব বসু মল্লিক মহাশয়ের বাঁধিয়া দিতে অযথা বিলম্ব

হওয়ায় গিরিশবাবু বিরক্ত হইয়া স্বয়ং কতকগুলি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, বাকী কএকখানি সম্প্রদায়স্থ উমেশচন্দ্র চৌধুরী বাধেন। গিরিশবাবুর রচনার সহিত সাধারণের এই প্রথম পরিচয়। 'শর্ম্মিষ্ঠার' অভিনয় দর্শনে পল্লিবাসীগণ প্রীতিলাভ করায় গিরিশচন্দ্রের মনোরথ সিদ্ধির উপায় হইল। তিনি, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজার, মুখুজ্যে পাড়ায় অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে উক্ত যাত্রা সম্প্রদায় হইতে মনোনীত অভিনেতাগণ লইয়া 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' নাম দিয়া একটী থিয়েটারের দল বসাইলেন।

বেলগেছিয়া, পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি ধনবানদিগের বাটীতে বহু ব্যয়ে পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত, ইঁহাদের সে শক্তি নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু বাবুর 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। সামাজিক নাটক—পোষাক পরিচ্ছদের হাঙ্গামা নাই। কেবল খানকতক দৃশ্যপট, সেটা কি আর সকলে মিলিয়া খাড়া করিতে পারিবে না? নগেন বাবু প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ সকলেই আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে গিরিশ বাবুর এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মহা উৎসাহে রিহারস্তাল আরম্ভ হইল। আজ আমোদের জন্য এই কয়েকজন যুবক মিলিয়া যে নাট্য-বীজ বপন করিলেন, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষুদ্র তরু হইতে বিরাট মহীরুহরূপে ইহার শাখাপল্লব বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ—দীনবন্ধু বাবুর 'সধবার একাদশী' নাটকই সাধারণ বঙ্গনাট্যশালা সংস্থাপনের ভিত্তি সূচিত করিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার "শাস্তি কি শান্তি?" নাটক দীনবন্ধুবাবুর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"* * যে সময়ে "সধবার একাদশী" অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিত নাটকাভিনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাসন্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি। * *"

যৎকালে উক্ত সম্প্রদায় নবোৎসাহে অভিনয় খুলিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে নাট্যাচার্য্য ও নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি মহাশয় আসিয়া যোগদান করিলেন। সম্প্রদায় মধ্যে আনন্দের তুফান উঠিল—গৌরাঙ্গের সহিত নিত্যানন্দ আসিয়া মিলিত হইল। অর্দ্ধেন্দু বাবু ইতি পূর্ব্বে পাথুরিয়া ঘাটা রাজবাটীতে অভিনীত "বুঝলে কি না?" প্রহসনের উত্তরস্বরূপ কয়লা-হাটায় "কিছু কিছু বুঝি" বলিয়া যে প্রহসন অভিনীত হয়, তাহাতে তিনি এবং ধর্ম্মদাস বাবু উভয়ে অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে "সধবার একাদশী"—বাগবাজার, মুখুজ্যোপাড়ায় ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাটীতে প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম :—

নিমচাঁদ ... স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
কেনারাম ... „ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
অটল ... „ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
জীবনচন্দ্র ... „ ঈশানচন্দ্র নিয়োগী।
রাম মাণিক্য ... „ রাধামাধব কর।
সৌদামিনী ... „ মহেন্দ্রনাথ দাস।
কাঞ্চন ... „ নন্দলাল ঘোষ।
নকুড় ... „ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কুমুদিনী ... „ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
নটী ... „ নগেন্দ্রনাথ পাল।

"সধবার একাদশী" নানাস্থানে সুখ্যাতির সহিত সাতবার অভিনীত হইয়াছিল। চতুর্থাভিনয় শ্যামবাজারে দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে হয়। এই অভিনয় সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা দীনবন্ধু বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ, শোভাবাজারের বিজু বাহাদুর, কলিকাতা

মিউনিসিপ্যাল অফিসের ভাইস চেয়ারম্যান গোপাললাল মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাদাস কর প্রভৃতি গণ্যমাণ্য ব্যক্তিগণ দর্শকরূপে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সেদিন আর একটী প্রতিভাবান যুবক এই নাট্যামোদ উপভোগ করিতেছিলেন, যিনি পরে হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম বিচার নৈপুণ্যে দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন—তিনি পণ্ডিত সারদাচরণ মিত্র। উক্ত দিবস অভিনয় দর্শনে তিনি কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ১৩২১ সাল, অগ্রহায়ণ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' তল্লিখিত 'দীনবন্ধু মিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করিলাম।

"* * ১৮৭০ সালের, ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার রাত্রে, কলিকাতার শ্যামবাজারে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি 'সধবার একাদশী' অভিনয় প্রথম দেখি। * * বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালার নব্য ধরণের নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা ;—সেদিন কবিবর 'গিরিশ' স্বয়ং —নিমচাঁদ। 'সধবার একাদশী' পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ 'নিমচাঁদের' অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধি বশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, * * কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখন ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল, অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। * * গিরিশ বাবু এখন আমার শ্রদ্ধেয় পরম বন্ধু।"

অভিনয়ান্তে গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু মুগ্ধ হইয়া গিরিশ বাবুকে বলেন, "তুমি না থাকিলে এ নাটক অভিনীত হইত না! নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।" অর্দ্ধেন্দু বাবুকে বলেন,—"জীবনের অটলকে লাথি মারিয়া যাওয়া (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) Improvement on the author." অদ্য বিশেষ কারণে অর্দ্ধেন্দুবাবু জীবনচন্দ্রের এবং অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনারামের ভূমিকাভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চের মুখপটের উপর লিখিত হইয়াছিল, "He holds the mirror up to nature."

ন্যাসান্যাল থিয়েটার

'লীলাবতী' নাটকাভিনয়

(সাধারণ নাট্যশালার অঙ্কুরোদ্‌গম)

'সধবার একাদশী' অভিনয়ের পর সম্প্রদায় পরমোৎসাহে দীনবন্ধু বাবুর 'লীলাবতী' নাটকের রিহারস্যাল দিতে থাকেন। এই 'লীলাবতী' সম্প্রদায় কাহারও বাটীতে অভিনয় করেন নাই। শ্যামবাজারে ৺রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মান করিয়া লীলাবতীর অভিনয় হয়। সুবিখ্যাত ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর এই রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৩০৭ সালে দেশবিখ্যাত অভিনেতা এবং ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত "রঙ্গালয়" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত প্রধানতঃ ধর্ম্মদাস বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সম্বন্ধে 'রঙ্গালয়ে' একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেন।

১৩১০ সালে গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত এবং সুপরিচিত গীতগুলি একত্র করিয়া 'গিরিশ গীতাবলী' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলাম,—তাহার শেষভাগে গিরিশচন্দ্রের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করি, তাহাতে বঙ্গনাট্যশালার আংশিক ইতিহাস প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৩১১ সালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক

সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ অভিধানে সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় লিখিত রঙ্গালয় সম্বন্ধে আর একটু বিস্তৃত ইতিহাস বাহির হয়। এই সকল প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহু উপাদান সংগৃহিত হইল। 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার বীজ বপন এবং 'লীলাবতী' অভিনয়ে তাহার অঙ্কুরোদগম হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত 'লীলাবতী'র কিছু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ লীলাবতী নাটক লইয়াই 'ন্যাসাগ্যাল থিয়েটারের' সূচনা হয়।

'সধবার একাদশী'র রিহারসাল, বাগবাজার হরলাল মিত্রের লেনে অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে হয়। উক্ত গলিতেই শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোকের শ্বশুর বাটী ছিল। তিনি উদার হৃদয় এবং নাট্যামোদ ছিলেন। তাঁহারই আগ্রহ এবং সাহায্যে তাঁহার শ্বশুরালয়ের বৈঠকখানায় লীলাবতীর রিহারস্তাল আরম্ভ হয়। 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ের অভিনেতাগণ ব্যতীত ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বাবু এবং ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল প্রভৃতি নাট্যামোদী যুবকগণ নূতন নূতন অভিনেতারূপে যোগদান করেন। বেলগেছিয়া ও পাথুরিয়া ঘাটার রাজাদের ন্যায় একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া স্বেচ্ছামত অভিনয় মানসে বাগবাজার সম্প্রদায় চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু চাঁদার খাতা হস্তে নানা-স্থানে যাতায়াত করিয়া সেরূপ সুবিধা করিতে পারেন নাই, দুই একটী ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে গিয়া বরং লাঞ্ছিতই হন। অবশেষে পাড়া প্রতিবাসী এবং বন্ধুবান্ধবগণ মধ্যে চাঁদা তুলিয়া সামান্য যাহা হইয়াছিল, গোবর্দ্ধন পোটো রাজপথের একখানি 'সিন' আঁকিয়া দিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া দেয়। সম্প্রদায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণে তাঁহাদের একটী বিশেষ সুবিধা হইল।

"সধবার একাদশী"র দ্বিতীয়াভিনয় শ্যামপুকুর নিবাসী, গিরিশ বাবুর জ্যেষ্ঠ শ্যালক, নাট্যামোদীগণের বিশেষ পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ নরেন্দ্রকৃষ্ণ (নন্তি বাবু), চুনীলাল ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা ব্রজনাথ দেব মহাশয়ের বাটীতে হয়। এই সময় হইতে ব্রজনাথ বাবু পাথুরিয়া ঘাটা ঠাকুরবাড়ীর ন্যায় একটী স্থায়ীভাবে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া নিয়মিতভাবে অভিনয় চালাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এই ব্যয় সাধ্য কার্য্য সাধনের জন্য কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিবেন, তদ্বিষয়ে গিরিশ বাবুর সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন। উভয়ে সেই সময়ে জন এট্‌কিনসন এণ্ড কোম্পানীর অফিসে কার্য্য করিতেন। ব্রজবাবু উক্ত অফিসের বুক কিপার এবং গিরিশ বাবু সহকারী বুককিপার ছিলেন। যাহা হউক উভয়ে পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির করেন ;—প্রত্যেক অফিসেই দালালেরা বড় বাবুদের নানা বাবদে টাকা দিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রজবাবু তাহা লইতেন না। এখন হইতে তিনি স্থির করিলেন, স্থায়ী রঙ্গালয় নির্ম্মাণের জন্য দালালদের নিকট চাঁদা তুলিয়া কতকটা টাকা যোগাড় করিবেন। ব্রজ বাবু কৃতী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য অনেকটা সফলও হইয়াছিল।

শ্যামপুকুরে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ ৺গোপীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। গিরিশ বাবুর অনুরোধে ধর্ম্মদাস বাবুও গিয়া উক্ত রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণে সাহায্য করিতেন। কিন্তু পাটাতন পর্য্যন্ত হইলে ব্রজবাবু সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন ; নির্ম্মাণ কার্য্যও বন্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া ব্রজনাথ বাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীর উঠানে কাঠ-কাঠরাগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া গিরিশ বাবু ব্রজ বাবুর ভ্রাতা দ্বারকানাথ দেবের অনুমতি লইয়া, সেগুলি বাগবাজার সম্প্রদায়কে লইয়া যাইতে বলেন। ধর্ম্মদাস বাবু কাষ্ঠগুলি লইয়া গিয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটে, তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটে খানিকটা মাঠ ঘিরিয়া লইয়া রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ এবং দৃশ্য অঙ্কণে যত্নবান হইলেন। ব্রজ বাবুর এই চেষ্টার্জ্জিত কাঠ-কাঠরাগুলি ন্যাসন্যাল থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপনে যে প্রথম স্বর্ণ ইষ্টক স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল, মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রজবাবুর মৃত্যুর পর চিত্ত-চাঞ্চল্য বশতঃ গিরিশ বাবু লীলাবতীর রিহারস্যালে বিশেষরূপ মনঃসংযোগ

করিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে লীলাবতীর রিহারস্যাল কার্য্য চলিতেছিল। কিন্তু এমন একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে এই মন্থরগামী লীলাবতী সম্প্রদায় প্রবল উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

"অমৃতবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়—সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্য-রথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের শিক্ষা বিধানে এবং অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' নাটকাভিনয় হইতেছে। বঙ্কিমবাবু 'লীলাবতী' নাটকের কিছু কিছু বাদ দিয়া ও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। অমৃতবাজারে ইহার সুখ্যাতি বাহির হয়। এই সংবাদ পাঠে নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু ও গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশবাবুর বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে বলেন,—"চুঁচুড়ার দলের নিকট হেরে যাব, তুমি কি বসে দেখবে?" গিরিশবাবু বন্ধুগণের অনুযোগে উত্তেজিত হইয়া বলেন,—"আমাদের নাটককারের একটী কথাও বাদ না দিয়া অভিনয় করিতে হইবে এবং শুধু অভিনয় নয়, চুঁচুড়ার দলকে অভিনয়ে হারাইতে হইবে।"

দ্বিগুণ উৎসাহে গিরিশবাবু লীলাবতীর রিহারস্যাল দিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মদাসবাবু দিবারাত্রি খাটিয়া দৃশ্যপট ও রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয় সংলগ্ন Prepratory Schoolএ শিক্ষকতা করিতেন। ধর্ম্মদাসবাবুকে কেবল এই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য অর্দ্ধেন্দুবাবু এবং সুবিখ্যাত নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার হইয়া বিদ্যালয়ে পড়াইয়া আসিতেন। অমৃতলালবাবু কাশীধামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন, কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য তিনি কলিকাতায় থাকায় তাঁহার "শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়ের" সহপাঠী অর্দ্ধেন্দুবাবু তাঁহাকে তাঁহাদের আখড়ায় ধরিয়া লইয়া আসিতেন। নাট্যানুরাগ বশতঃ প্রায়ই তিনি ধর্ম্মদাসবাবুর 'সিন' আঁকা দেখিতে আসিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু অমৃতবাবুকে 'যোগজীবনের' ভূমিকাভিনয়ে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি প্রস্তুত হইতে না হইতেই সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রেয় কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় কাশীধামে লইয়া যাইলেন। ইঁহারই সহকারী ও শিষ্যরূপে থাকিয়া অমৃতবাবু কাশীধামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন।

রিহারস্যাল সমাপ্ত হইলে শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের লেন, রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত করিয়া ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৭১ জুলাই) মহা সমারোহে 'লীলাবতী' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। "হিন্দু মেলা" প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সময় 'লীলাবতী' সম্প্রদায়ে যাতায়াত করিতেন। ইনি "National Paper" এর সম্পাদক ছিলেন। "National Magazine" নামে একখানি মাসিক পত্রও বাহির করিয়াছিলেন। "National" (ন্যাসন্যাল) কথাটা চালাইবার ইনি বিশেষরূপ পক্ষপাতী হওয়ায় ইঁহাকে সকলে "ন্যাসন্যাল নবগোপাল" বলিয়া ডাকিত। ইঁহারই প্রস্তাবে থিয়েটারের নাম "Bagh-bazar Amature Theatre" বদলাইয়া "The Calcutta National Theatre" দেওয়া হয়। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুরের প্রস্তাবে "Calcutta" টুকু বাদ দিয়া "National Theatre" ন্যাসন্যাল থিয়েটার নামকরণ হয়।

ন্যাসন্যাল থিয়েটারের এই প্রথমাভিনয় রজনী বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চির স্মরণীয়। কারণ ভবিষ্যতে এই "ন্যাসন্যাল থিয়েটার" নাম গ্রহণ করিয়া এবং এই থিয়েটারেরই অধিকাংশ অভিনেতা লইয়া "সাধারণ বঙ্গ নাট্যশালা" প্রতিষ্ঠিত হয়। "লীলাবতী" নাটকের ভূমিকা লইয়া নিম্নলিখিত অভিনেতাগণ প্রথম ন্যাসন্যাল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :—

ললিত—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
হরবিলাস ও ঝি—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
হেমচাঁদ—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নদেরচাঁদ—যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।
ভোলানাথ—মহেন্দ্রলাল বসু।
মেজো খুড়ো—মতিলাল সুর।
ক্ষীরোদবাসিনী—রাধামাধব কর

রাজলক্ষ্মী—ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

যোগজীবন—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীনাথ—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লীলাবতী—সুরেশচন্দ্র মিত্র।

সারদাসুন্দরী—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)

রঘু উড়ে—হিঙ্গুল খাঁ (হেমবাবু)

গিরিশবাবুর "ললিতের" ভূমিকাভিনয় দর্শনে দীনবন্ধুবাবু এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে অভিনয়ান্তে অতি ব্যস্ততার সহিত ষ্টেজের মধ্যে আসিয়াই বলেন,—"এবার চিঠি লিখবো—ছুয়ো বঙ্কিম!" গিরিশবাবুকে বলেন, আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায়, তাহা আমি জানিতাম না। "Take this compliment at least." বস্তুতঃ দীনবন্ধুবাবুর দীর্ঘ কবিতা সমূহ গিরিশবাবুর সুনিপুণ অভিনয়-কৌশলে ও রস-বৈচিত্র্যে monotonous হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর দর্শকগণের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবুর হরবিলাসের ভূমিকা অতি স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার "ঝিএর" ভূমিকাভিনয়ে দর্শকগণ হাসিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। দীনবন্ধুবাবুর নাটকে এ দেশীয় ভাষায় ঝিয়ের কথা ছিল,—অর্দ্ধেন্দুবাবু মেদিনীপুরের ভাষায় 'ঝিয়ের' ভূমিকাভিনয় করায় দর্শকগণ বিশেষ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল বসু "ভোলানাথ চৌধুরীর" ভূমিকাভিনয়ে পাড়াগেঁয়ে ছ্যাবলা জমীদারের এমন একটী ছবি দেখাইয়াছিলেন যে, সেইদিন হইতে দীনবন্ধুবাবু আজীবন তাঁহাকে "ভোলানাথ চৌধুরী" বলিয়া ডাকিতেন। যোগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র "নদের চাঁদ" ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাবু বলিয়াছিলেন, "যখনই দেখলুম, নদের চাঁদ কোঁচার কাপড় গলায় দিয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হইল, তখনই জেনেছি মেরে দিয়েছি।" চুঁচুড়ায় অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়াই দীনবন্ধু বাবু একথা বলিয়াছিলেন। চরিত্রোপযোগী বেশভূষার প্রতি এই ন্যাসন্যাল সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রায় পাঁচ রাত্রি অভিনয়ের পর প্রবল বর্ষায় থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়।

লীলাবতীর অভিনয় দর্শনার্থে এত অধিক দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইত যে, স্থানাভাবে শতশত ব্যক্তি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। এ নিমিত্ত সম্প্রদায় "ফ্রি টিকিট" বিতরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু টিকিটের নিমিত্ত এরূপ জনতা ও এত অধিক চিঠি আসিতে আরম্ভ হইল যে, সম্প্রদায় নিয়ম করিল, যে-সে লোককে টিকিট দেওয়া হইবে না, যাঁহারা অভিনয় বুঝিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকেই টিকিট দেওয়া হইবে। তাহাতে অনেকে আপনাপন উপযুক্ততার সার্টিফিকেট লইয়া, অভিনয়রাত্রের তিনচারি দিন পূর্ব্ব হইতে দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিতেন।

ভাবাভিব্যক্তি
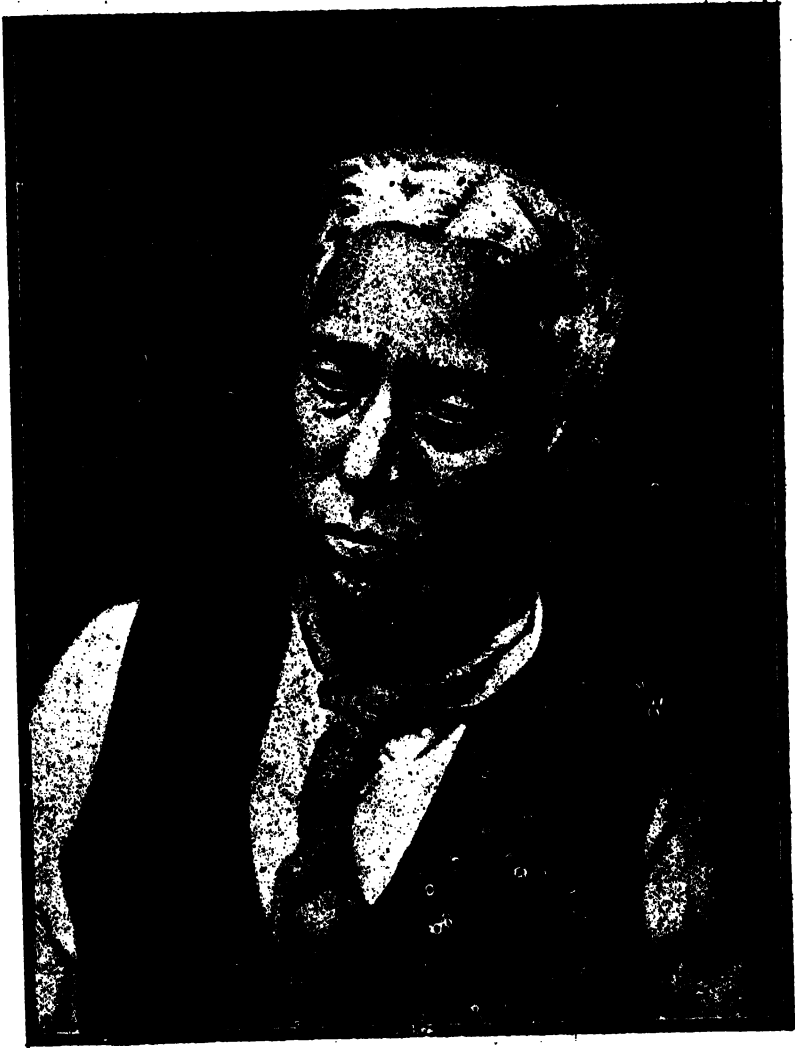
ভাবাভিনয়ে অৰ্দ্ধেন্দুশেখর—একাগ্রতা।

ভাবাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর—ডায়ার্ড।

ভাবাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর—আহ্লাদে আটখানা।
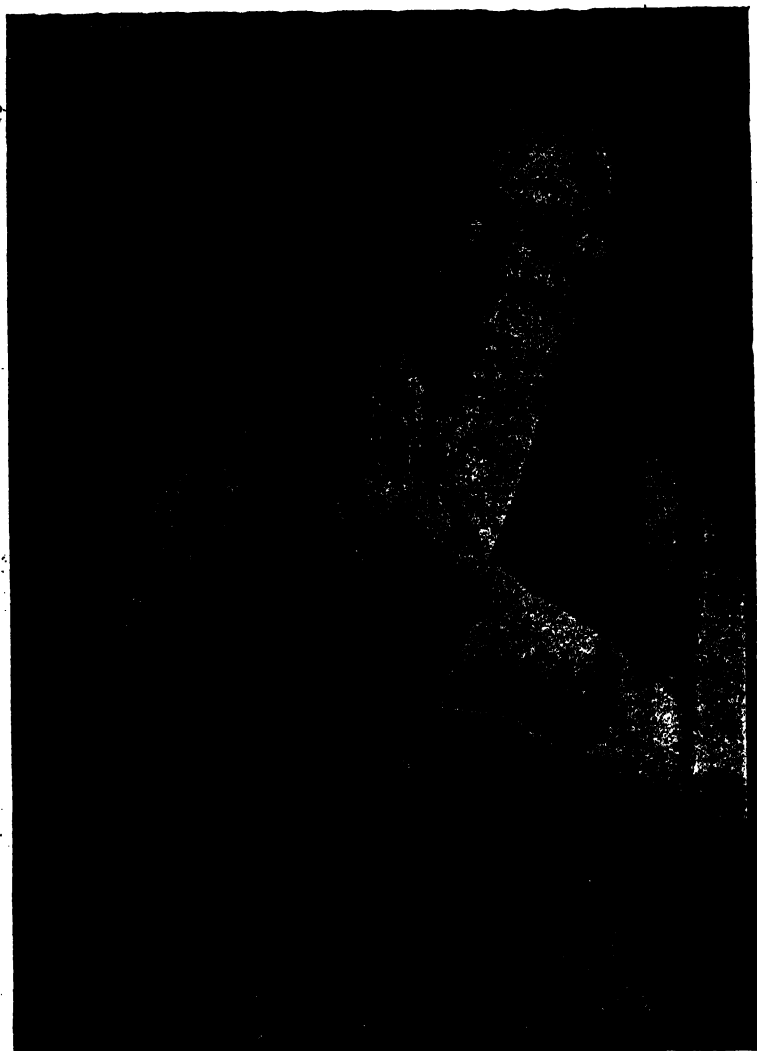
অর্দ্ধেন্দুশেখর ও তাঁহার পুত্রদ্বয় —

দক্ষিণে ব্যোমকেশ। বামে ভুবনেশ।

অর্দ্ধেন্দুশেখর—যৌবনে।

অৰ্দ্ধেন্দুশেখর—প্রৌঢ়ে।

অৰ্দ্ধেন্দুশেখর—বার্দ্ধক্যে।
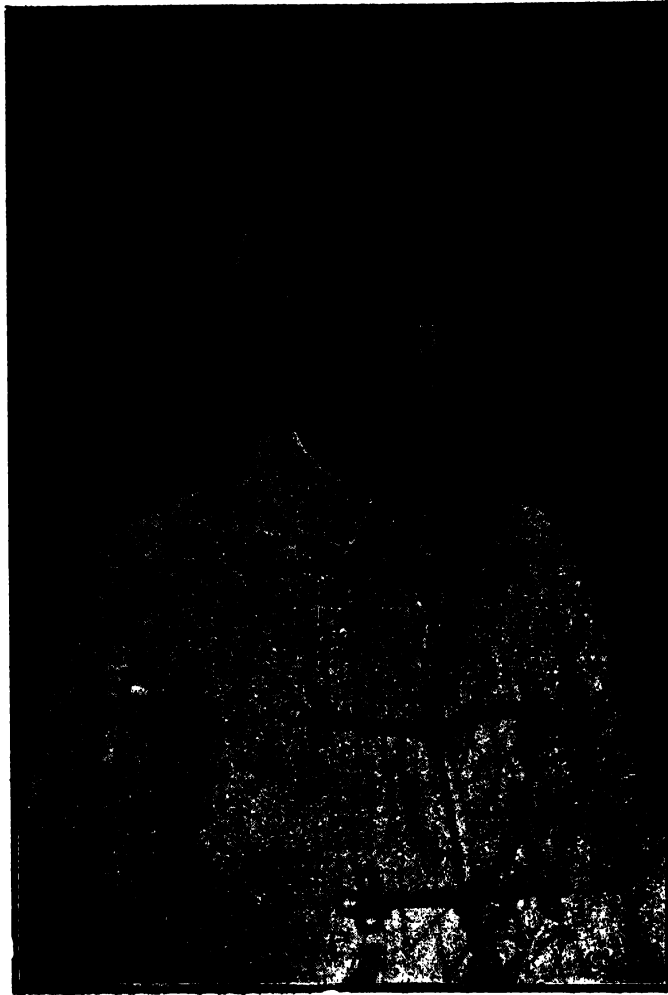
(অৰ্দ্ধেন্দু নাট্যপাঠাগারের সম্পাদক শ্রদ্ধেয়—
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-দাদার সৌজন্যে)

'নীলদর্পণ' নাটকের রিহারস্যাল।

(টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রস্তাবে সম্প্রদায় মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ)

"ন্যাসন্যাল থিয়েটার" তৎপরে দ্বিগুণ উৎসাহে দীনবন্ধু বাবুর "নীলদর্পণ" নাটকাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। রিহারস্যাল আরম্ভ হইল। দৃশ্যপট, রিহারস্যাল ইত্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সম্প্রদায় পাড়াপ্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে
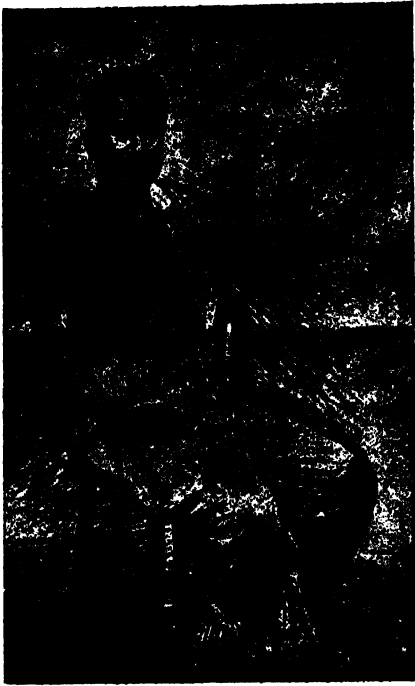
নাট্যকার পণ্ডিত—রামনারায়ণ তর্করত্ন।

বাগবাজার নিবাসী বিখ্যাত জমিদার ৺রসিক মোহন নিয়োগীর মধ্যম পৌত্র শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের সহিত ইঁহাদের পরিচয় হয়। ধর্ম্মদাস বাবু ভুবনমোহন বাবুর প্রতিবেশী, ইনিই এই মিলন সংঘটন করিয়াছিলেন। ভুবন বাবু এই সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। চাঁদা প্রদান ব্যতিত, নীলদর্পণ নাটকের উত্তমরূপ রিহারস্যাল দিবার নিমিত্ত তাঁহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার, অন্নপূর্ণা ঘাটের চাঁদনীর উপর বার দ্বারী বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রদায় ভাড়াটিয়া আখড়া ঘর ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গার উপর এই মনোরম স্থানে নীলদর্পণের দ্বিগুণ উৎসাহে 'মহলা' দিতে লাগিলেন। উপস্থিত সে বাটীর নিম্নতলার কিছু চিহ্ন আছে, অবশিষ্ট অংশ 'পোর্টট্রষ্ট' লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, নাটকের রিহারস্যাল সমাপ্ত হইলে, সম্প্রদায়স্থ কতকগুলি অভিনেতা পূর্ব্ব হইতেই দর্শকগণের আগ্রহাতিশয় দর্শনে এবং প্রত্যেক নূতন নাটক খুলিবার সময় দৃশ্যপটাদির জন্য চাঁদা সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর ইত্যাদি নানা কথা তুলিয়া টিকিট বিক্রয় পূর্ব্বক "নীলদর্পণ" অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। গিরিশ বাবু এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। তিনি বলেন, "আমাদের রঙ্গমঞ্চ দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এখনও এরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে "ন্যাসন্যাল থিয়েটার" নাম করণ পূর্ব্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়। ন্যাসন্যাল থিয়েটার নাম শুনিয়া অনেকেই বুঝিবেন, এই থিয়েটার দেশের সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমবেত চেষ্টার ফল—ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু কতকগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সাজসরঞ্জামে ন্যাসন্যাল থিয়েটার করিতেছে ইহা বড় বিসদৃশ হইবে।" টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটারের তিনি বিরোধী ছিলেন না; তবে সামান্য সরঞ্জাম লইয়া টিকিট বিক্রয়ে তিনি অসম্মত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হন যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রধান পরিচালকের কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশ বাবু তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংশ্রব ত্যাগ করিলেন।

টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটার করিতে সম্মত নহেন, এরূপ আরও কয়েকজন অভিনেতা সুরেশচন্দ্র মিত্র ('লীলাবতী' অভিনয়ের লীলাবতী), রাধামাধব কর ('সধবার একাদশী'র রামমাণিক্য ও লীলাবতীর' ক্ষীরোদ বাসিনী),

নির্ব্বাসিতা

শিল্পী—শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ('লীলাবতীর' নদের চাঁদ), নন্দলাল ঘোষ ('সধবার একাদশীর' কাঞ্চন) মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('সধবার একাদশীর' নকুড়) প্রভৃতি কয়েকজন গিরিশ বাবুর ন্যায় ন্যাসন্যাল থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাধামাধব বাবু নীলদর্পণ নাটকে 'সৈরিন্ধ্রীর' ভূমিকাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় অর্দ্ধেন্দু বাবু প্রভৃতি অমৃত বাবুকে 'সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকাগ্রহণে বিশেষ অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি অসম্মত হন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধ ও 'চাপাচাপিতে' শেষে স্বীকৃত হন। নাট্যশালার সহিত ইহাই তাঁহার প্রথম এবং প্রকাশ্য যোগদান।

স্বর্গীয় ব্রজনাথ দেব

যাহাই হউক, ন্যাসন্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় সন্ধান করিয়া কলিকাতা যোড়াসাঁকো অপার চিৎপুর রোডের উপর মধুসূদন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীর (উপস্থিত যথায় ঘড়ীওয়ালা মল্লিকদের বাড়ী হইয়াছে) মাসিক চল্লিশটাকায় উঠান ভাড়া লইয়া ষ্টেজ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর এবং আর্ট স্কুলের ছাত্র ও ন্যাসন্যাল থিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্তবাবু ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ষ্টেজ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এদিকে রাত্রে ভুবনমোহন বাবুর গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় 'নীলদর্পণের' রিহারস্তাল চলিতে লাগিল। গিরিশবাবুর স্থলে বেণীমাধব মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করা হইল।

এই সময়ে বাগবাজারে একটী যাত্রা দলের সৃষ্টি হয়। গিরিশবাবু তাহাদের একটী সংয়ের পালা বাঁধিয়া দেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও সুগায়ক রাধামাধব কর প্রহসনের একটী ভূমিকা লইয়া সুকণ্ঠে নিম্নলিখিত গীতটী গাহিতেন। গানটী প্রয়াগের লুপ্তবেণী ত্রিধারা ভাগীরথীর বর্ণনাত্মক। গানটীতে 'নীলদর্পণ' সম্প্রদায়স্থ তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা ও উৎসাহদাতাগণের নাম অতি সুকৌশলে গ্রথিত হইয়াছে। গীতটী শ্লেষাত্মক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষই বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন।

গীত

(কবির সুরে গেয়)

লুপ্তবেণী (১) বইছে তেরোধার (২)।
তাতে পূর্ণ (৩) অর্দ্ধইন্দু (৪) কিরণ (৫)
সিন্দুর মাখা মতির ৬ হার॥
নগ ৭ হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণাকায় ৮,
বিবিধ বিগ্রহ ৯ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব ১০ শম্ভুসুত ১১ মহেন্দ্রাদি ১২ যদুপতি ১৩ অবতার॥
কিবা ধর্ম্ম ১৪ ক্ষেত্র ১৫ স্থান,
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু ১৬ করে গান,
অবিনাশী ১৭ মুনি ঋষি কর্‌ছে ব'সে ধ্যান;
সবাই মিলে ডেকে বলে, 'দীনবন্ধু' ১৮ কর' পার॥
কিবা বালুময় বেলা ১৯,
পালে পাল ২০ রেতের বেলা ২১,
ভুবনমোহন ২২ চরে ২৩ করে গোপালে ২৪ খেলা।
মিছে করে আশা, যত চাষা ২৫,

নীলের গোড়ায় ২৬ দিচ্ছে সার ২৭ ॥

কর্ম্মকত্ত শশি ২৮ হবে, অমৃত ২৯ বরবে,

জ্ঞান হয় বা দিনের গৌরব এত দিনে খসে,

স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ৩০ ॥

চিহ্নিত মাত্রার অর্থ :—

(১) দলের প্রেসিডেণ্ট—৺বেণীমাধব মিত্র। ইনি অভিনয় করিতেন না; গিরিশবাবু সম্প্রদায় পরিত্যাগ করি-

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী

বার পর তাঁহার স্থলে বেণীবাবুর উপর কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পিত হয়। ইহার নাম অপ্রকাশ থাকায় "লুপ্ত" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অপরপক্ষে গঙ্গা যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গ।

(২) তেরোধার—ত্রিধারা।

(৩) পূর্ণচন্দ্র মিত্র—অভিনেতা।

(৪) অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি নাট্যাচার্য্য ও অভিনেতা।

(৫) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতা।

(৬) মতিলাল সুর—অভিনেতা।

(৭) নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিনেতা ও প্রধান পরিচালক।

(৮) সরস্বতী ক্ষীণাকায়—অল্পবিদ্যা অর্থাৎ মূর্খ।

(৯) ত্রিধারা—সঙ্গমে দেবমূর্ত্তি। অপর পক্ষে কুৎসিৎ গালি।

(১০) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা।

(১১) কার্ত্তিকচন্দ্র পাল—সম্প্রদায়ের উৎসাহদাতা

(১২) মহেন্দ্রলাল বসু—অভিনেতা।

(১৩) যদুনাথ ভট্টাচার্য্য—অভিনেতা।

(১৪) ধর্ম্মদাস সুর—ষ্টেজ ম্যানেজার।

(১৫) ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অভিনেতা ও সহকারী ষ্টেজ-ম্যানেজার।

(১৬) ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন।

(১৭) অবিনাশচন্দ্র কর—অভিনেতা।

(১৮) নীলদর্পণ প্রণেতা সুবিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

(১৯) অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)—অভিনেতা।

(২০) রাজেন্দ্রলাল পাল প্রভৃতি পালবংশীয় কএক জন।

(২১) রেতেরবেলা—অর্থাৎ রাত্রিকালে রিহারস্যাল হইত।

(২২) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী।

(২৩) চরে অর্থাৎ বেড়ায়; ভুবন বাবুর কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না। অপর পক্ষে ভুবন মোহন চরে অর্থাৎ গঙ্গাতীরস্থ ভুবনমোহন বাবুর বৈঠকখানায়।

(২৪) গোপালচন্দ্র দাস—অভিনেতা।

(২৫) সদ্গোপ জাতীয় অনেক এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

(২৬) 'নীলদর্পণ' নাটক।

(২৭) সার—বিষ্ঠা। এস্থলে কার্য্যনিপুণতার অভাব বুঝাইতেছে।

(২৮) শশিভূষণ দাস—অভিনেতা।

(২৯) নাট্যাচার্য্য ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

(৩০) সম্প্রদায় বৈতনিক হওয়ায় কাহারও আর প্রবেশ নিষেধ রহিল না,—"অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার।"

— —

সান্যাল ভবনে ন্যাশন্যাল থিয়েটার

(সাধারণ নাট্যশালার বিকাশ)

১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ, ৭ই ডিসেম্বর) শনিবার 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের দিন স্থির করা হইল। রাজেন্দ্র বাবু (যাঁহার বাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া প্রথম 'লীলাবতী' অভিনীত হয়) গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং এ কার্য্য করিতেন, তিনি ষ্টানহোপ প্রেস হইতে ইংরাজিতে প্লাকার্ড ছাপাইয়া আনেন। ইহা দেখিতে ঠিক পুলিসের ইস্তাহারের মত হইয়াছিল। (পর সপ্তাহ হইতে বড় বড় অক্ষরে ইংলিসম্যান অফিসের ইরান্সম্যাস গোল্ড বা জোন্স কোম্পানির ছাপাখানা হইতে দস্তুরমত প্লাকার্ড ছাপান হইত থাকে।) প্লাকার্ড ব্যতিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়াছিলেন। ইঁহার নামেই সান্যাল ভবনের উঠান ভাড়া লেখাপড়া হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনের নিম্নে "অনারারি সেক্রেটারী" বলিয়া নাম ছাপা হইত। সম্প্রদায়স্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মহা উৎসাহে এক এক জন বেহারা লইয়া সহরের চারিদিকে প্লাকার্ড লাগান এবং হ্যাণ্ডবিল বিতরণের কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাস্তায় প্লাকার্ড মারা বা হ্যাণ্ডবিল বিতরণের তেমন একটা প্রচলন ছিল না; এ নিমিত্ত বেহারারা একা যাইতে সাহস করিত না। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সেই দিনের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার 'অমৃত মদিরা' নামক কবিতা পুস্তকে লিখিয়াছেন—

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"নিজ পরিবার মাঝে বিরক্তি কারণ।
কুটুম্ব সমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন ॥

দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাসি।
সয়ে' গেছে বান্ধব সব তাচ্ছিল্য প্রকাশি ॥

পাইকপাড়ার
রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

রাজার সাহায্য নাই, নাহি নিজ ধন।
মূলধন মনোবল শরীর পাতন ॥

উত্তম ছিল না কিছু বিলাতি আদর্শ।
প্রতিভা প্রতিমা পদে শিক্ষা-পরামর্শ ॥

এইরূপে যুবা ক'টী সহায় বিহীন।
মাটী হ'য়ে খাটিয়াছি কত নিশিদিন॥

হেলায় হাসিছে ছেড়ে ধন-পদ-লোভ।
শিক্ষিত স্বাধীন পেশা ত্যজি' বিনা ক্ষোভ॥

তবে বঙ্গে নাট্যশালা হ'য়েছে স্থাপন।
অলি গলি দেখ এবে যার বিজ্ঞাপন॥

আজি পঞ্চ রঙ্গালয় (১) কলিকাতা ধামে।
বিচিত্র বাহারে শোভে বড় বড় নামে॥

গেছে দিন পাই-হীন ছিনু ক'টি ভাই।
পুষিতে বিরাট পুত্র ঘরে দুধ নাই॥

একটি কাঠের কপি এক আনা মূল্য।
অভাবে ভেবেছি তারে সুবর্ণের তুল্য॥

সাণ্ডেল-দালানে উচ্চ পড় পড় কড়ি।
ঝুল-ঢাকা ছিল তাতে ঝাড় ঝোলা দড়ি॥

আমি আর ধর্ম্মদাস নিশীথ আঁধারে।
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে॥

সেকালে ছিল না বেশী কুলি কি চাকর।
যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ডর॥

তাই দেখিয়াছে লোক লাল দীঘি ধারে।
প্রাকার্ড ম'য়েতে উঠে 'ভুনিবাবু' মারে॥

এখন হুকুমে কার্য্য হয় সমাধান।
ছোঁড়ারা বাঁধিতে পারে অপেরার গান॥"

"দর্শকগণের বসিবার জন্য চেয়ার ভাড়া করিয়া আনা হয়। দুই টাকা, এক টাকা, আট আনা এবং চারি আনা মূল্যের চারি প্রকার আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের সম্মুখস্থ উঠানে যে চেয়ারগুলি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহাই হইয়াছিল প্রথম শ্রেণী—মূল্য এক টাকা। রিজার্ভ চেয়ার গুলির (২০খানি) মূল্য দুই টাকা, ইহা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইত। তৎপশ্চাৎ বেঞ্চের মূল্য আট আনা—ইহার নাম হইয়াছিল দ্বিতীয় শ্রেণী। তৎপশ্চাৎ দালানের দাম চারি আনা করা হইয়াছিল (২)। সুপ্রসিদ্ধ গৌরমোহন ধর কোম্পানী গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম কয়েক রাত্রি তিনি তজ্জন্য অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

পাইকপাড়ার
রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

সেদিন বেলা ২টার সময় হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয়। যখন বেলা ৪টা তখনও ধর্ম্মদাসবাবু তুলি ধরিয়া 'উইংস' আঁকিতেছেন। সাতটার সময় সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। নাট্যামোদী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব হইতেই

(১) যে সময়ে এই কবিতা রচিত হয়, সে সময়ে কলিকাতায় ষ্টার, বেঙ্গল, বীণা, এমারেল্ড ও মিনার্ভা থিয়েটার বিরাজিত ছিল।

(২) নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন,—"চারি আনা দামের টিকিট হইয়াছিল কিনা, আমার স্মরণ হয় না।"

রিজার্ভ সিটের টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন। সেকালের কলিকাতার বড়লোকগণ যেরূপ পোষাক পরিধানে নাচের মজলিসে যাইতেন, সেইরূপ শালের পাগড়ী, শালের চোগা, শাল, দোশালায় সজ্জিত হইয়া তাঁহারা থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। যথা সময়ে কন্‌সার্ট বাজিল। সেদিন বাগবাজার বসুপাড়ার বিখ্যাত রাজাবাবু, নিতাই ওস্তাদজী ও গৌরদাস বাবাজী বেহালা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী কালীদাস সান্ন্যাল মহাশয় হারমোনিয়ম এবং শ্যামপুকুর নিবাসী প্রথিতনামা যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কানা যোগী নামে) সুপরিচিত ঢোল বাজাইয়াছিলেন। বহু গুণগ্রাহী এবং সঙ্গীতজ্ঞ দর্শকের একত্র সমাবেশ দর্শনে ইঁহারা প্রবল উৎসাহে এরূপ চটকে বাজাইতে লাগিলেন যে, দর্শক মণ্ডলীর "বাহবা" ধ্বনিতে সান্ন্যাল ভবন মুখরিত হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে কন্‌সার্ট থামাইয়া অভিনয় আরম্ভ হইল।

"নীলদর্পণ" নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতাগণ—

গোলক বসু, উড সাহেব, জনৈক রাইয়ত ও সাবিত্রী—
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

নবীনমাধব—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিন্দুমাধব—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোরাপ, রাইচরণ, গোপ ও নীলকরদিগের মোক্তার—
মতিলাল সুর।

সাধুচরণ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পদী ময়রাণী—মহেন্দ্রলাল বসু।

সৈরিন্ধ্রী—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

রোগ সাহেব ও খুঁতনী—অবিনাশচন্দ্র কর।

গোপীনাথ দেওয়ান—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নবীনমাধবের মোক্তার ও আদুরী—গোপালচন্দ্র দাস।

কবিরাজ—শশীলাল দাস।

সরলতা—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

রেবতী—তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

লাঠিয়াল—পূর্ণচন্দ্র মিত্র।

রাখাল—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

খালাসী—গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রত্যেক অভিনেতা তাঁহাদের ভূমিকা বিশেষ নিপুণতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় দর্শনে দর্শক মণ্ডলী পরম প্রীতিলাভ করেন। কেবল দীনবন্ধুবাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (serious part) Actor যোগদান করেন নাই।" গিরিশ-চন্দ্রের উড সাহেবের ভূমিকা ছিল।

বাগবাজারে স্থাপিত যে 'ন্যাসন্যাল থিয়েটার' এ পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে টিকিট বিতরণে অভিনয় করিয়া প্রাইভেট থিয়েটার রূপে অভিহিত হইয়া আসিতেছিল,—টিকিট বিক্রয়ে সর্ব্বসাধারণ দর্শকবৃন্দকে অভিনয় দর্শনার্থে আহ্বান করিয়া অদ্য তাহা পাবলিক থিয়েটার অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয় নাম ধারণ করিল।

১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ইং ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর—সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার জন্মদিন বলিয়া যেরূপ চির স্মরণীয় হইয়া রহিল,—সেইরূপ যোড়াসাঁকো ৩৬৫নং অপার চীৎপুর রোডস্থ ৺মধুসূদন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীও বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাসে চির জাগরূক হইয়া থাকিবে, কারণ এই সান্ন্যাল ভবনেই বঙ্গ-নাট্যশালা সর্ব্ব সাধারণের নিমিত্ত প্রথম উন্মুক্ত হইল। সুবিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের "সধবার একাদশী" নাটক লইয়াই ন্যাশন্যাল থিয়েটারের বীজ রোপিত, "লীলাবতীতে" তাহা অঙ্কুরিত এবং "নীলদর্পণে" তাহা বিকশিত,—এ নিমিত্ত বঙ্গ-নাট্যশালার অস্তিত্বের সহিত তাঁহার নামও চির সংযোজিত থাকিবে।

সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু

জলপদ্ম ও স্থলপদ্ম

শিল্পি—শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ

সত্য ও মিথ্যা

(রঙ্গনাট্য)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত]

——*:*:*——

পাত্রপাত্রীগণ।

মিষ্টার লাটিমপ্রসাদ ঘুঘু নাট্য-বিভীষণ	... ...	মেট্রোপলিটান থিয়েটারের অধ্যক্ষ।
নিদ্রাবিলাস	... ...	ঐ ঐ সহকারী অধ্যক্ষ।
,, টীকারাম তামাকুপ্রসাদ	... ...	উকীল,—লাটিমপ্রসাদের বন্ধু।
মনোরথ } কুমার	... ...	সঞ্জীবনীপুর-নিবাসীদ্বয়।
শ্রীমতী রসগোল্লামন্নী	... ...	মেট্রোপলিটান থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী (লাটিমপ্রসাদের অনুগৃহিতা)।
জ্যোতিঃ } কুহেলী	... ...	সঞ্জীবনীপুর-নিবাসিনীদ্বয়।

———

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মানস-সরোবর তীরে সঞ্জীবনীপুর—

চন্দন বন।

চন্দন বনের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কৃত শষ্পাবৃত স্থান। সঞ্জীবনীপুরবাসী পুরুষ ও স্ত্রীগণ নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বা আড় হইয়া পড়িয়া আছে।

গীত।

সকলে।

একি চির নূতন বহে গগনে অমিয়া ধারা!
পুলকে পাগল প্রাণ করে গান আপনহারা।
নেমে আসে নীলিমার পরপার হতে কত গন্ধ-গান-সুখবারতা!
ফলে ফুলে ভরা পরিমল,—প্রাণে প্রাণে কত স্নেহমমতা!
কতহাসি, কত বাঁশী, সারাটী জীবন ভরা!

জ্যোতিঃ। জীবনটা যেন একটা অফুরন্ত হাসির ঢেউ, একটা চিরনূতন সোনার স্বপ্ন, একটা গানের সুর, তার আরম্ভও নাই শেষও নাই।

কতিপয়। ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেছ তার আরম্ভও নাই শেষও নাই।

(কুহেলীর প্রবেশ)

কুহেলী। নূতন সংবাদ! নূতন সংবাদ!—কিন্তু—(বিমর্ষভাবে শির নত করিল)।

সকলে। কি সংবাদ? কি সংবাদ?

মনোরথ। কি সংবাদ কুহেলী?

কুহেলী। কিন্তু—

মনোরথ। কিন্তু কি কুহেলী?

জ্যোতিঃ। কুহেলীর ঐ রকম—সবতাতেই একটা 'কিন্তু' চাই। আচ্ছা বোন; তোমার কি হাসতে সাধ যায় না, শুধু কিন্তু কিন্তু আর কিন্তু?

কুমার। তাইতো কুহেলী, চারিধারে হাসির লহর গানের সুর, তার মাঝখানে তুমি কেন শুধু ভাব। আমরা তো কৈ ভাবি না।

মনোরথ। না না, ভুল তোমাদের। কুহেলীও হাসে —কিন্তু সে হাসি আমাদের মত নয়—সে যেন বাদল ভাঙ্গা রৌদ্রের রেখার মত, উষার প্রথম সিন্দুররাগের মত,—বড় সুন্দর বড় মধুর। বল কুহেলী, কিন্তু কি বলছিলে?

কুহেলী। শোন, আমাদের বিহঙ্গম ফিরে এসেছে।

জ্যোতিঃ। ফিরে এসেছে! হাঃ হাঃ কি মজা! কি মজা! তারপর তারপর?

১মা। কখন এলো? কখন এলো?

২য়া। কতদূর গেছলো সে? কি দেখে এলো সে? শীগ্‌গির বল।

কুমার। চল সবাই মিলে গান গেয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি।

মনোরথ। একটু স্থির হও ভাই। তারপর কুহেলী?

কুহেলী। সে যেতে যেতে অনেকদূরে গিয়ে পড়েছিল—ততদূর এদেশের কেউ কখনো যায় নি—সে একটা নূতন স্থান—

জ্যোতিঃ। কি, আর একটা সঞ্জীবনীপুর!

কুহেলী। না, সে সঞ্জীবনীপুরের মত মোটেই নয়—সে অতি কদর্য্য স্থান—সে স্থানের নাম কলিকাতা।

জ্যোতিঃ। উঃ কি বিকট নাম!

কুমার। কেমন সে স্থান? সেখানে এরকম সূর্য্য ওঠে না? পাখী গান গায় না?

কুহেলী। সে অতি কদর্য্য স্থান—বর্ণনার অতীত।

মনোরথ। তবু?

কুহেলী। সেখানে মাটী নাই, পাথরও নাই শুধু কাঁকর, কর্দ্দম, আবর্জ্জনা আর দুর্গন্ধ। আবর্জ্জনায়ই যেন তারা সুখে থাকে তাই শুধু উপরে নয়, নীচেও আবর্জ্জনার নল বসিয়ে দিয়েছে—তাতে সব জমে থাকে আর মাঝে মাঝে তারা সেগুলো তুলে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে পরমানন্দ অনুভব করে। সেখানে দিবারাত্রি এত গোলমাল ঝগড়া বিবাদ, এত রকম বিকট শব্দ যে, আমরা বোধ হয় সেখানে থাকলে মুহূর্ত্তের মধ্যে পাগল হয়ে যাই।

কতিপয়। কি বীভৎস!

কুহেলী। সেখানে সব রাক্ষসদের বাস, তারা আমাদের মত ফলমূল খেয়ে তৃপ্ত হয় না, পশুপক্ষীগুলোকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে, জলের মাছ পর্য্যন্ত বাদ দেয় না। তারা সব পেটের জ্বালায় পাগল, দিবারাত্রি শুধু খাবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।

কতিপয়। উঃ কি নিষ্ঠুর!

কুহেলী। এত তাদের ক্ষিদে যে পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। বরকর্ত্তা নামে একশ্রেণীর রাক্ষস কন্যাকর্ত্তা নামে আর একশ্রেণীর রাক্ষসকে আস্ত গ্রাস করে। জমিদার নামে বলবান রাক্ষস প্রজা নামে দুর্ব্বল রাক্ষসকে নিত্য বিবিধ প্রকারে পেষণ করে। মহাজন নামে রাক্ষস খাতক নামে রাক্ষসের রক্তশোষণ করে।—কত আর বলব, তা'দের মধ্যে পরস্পরে দেখা হলে 'নমস্কার মশায়' বলে কে কার টুঁটী টিপে ধরবে সেই চেষ্টা করে। ট্রাম এবং মটর নামে দুইটা পদার্থ তারা সৃষ্টি করেছে যাকে তারা বলে বাহন, বস্তুতঃ তা যারা শুধু তারা পরস্পরকে বধ করে। তাতেও নিস্তার নাই তারপর তাকে মেডিকেল কলেজ নামক একটা স্থানে নিয়ে গিয়ে টুকরা টুকরা করে কেটে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করে। অথচ কি আশ্চর্য্য, যার ক্ষুধা বেশী তার মান তত বেশী—সে না কি তত বড়লোক, অর্থাৎ বড় রাক্ষস!

জ্যোতিঃ। তারা কি পরস্পরকে ভালবাসে না?

কুহেলী। ভালবাসা প্রেম সরলতা বলে কোন জিনিষ তাদের মধ্যে নাই। তারা সোজা পথে কখনো চলে না, শুধু বাঁকা পথ খুঁজে বেড়ায়। তারা কখনো হাসে না, গান গায় না, শুধু পেটের জ্বালায় বিকট চিৎকার করে শুধু দাঁত বের করে মুখভঙ্গি করে—কত আর বলব, এত হীন বর্ব্বর তারা যে সোজা সরল সত্যকথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না।

মনোরথ। হায় অতি হতভাগ্য তারা!

জ্যোতিঃ। সত্যকথা বলে না তো কি বলে? ভাষা সত্য ছাড়া আর কি হতে পারে?

কুহেলী। সে যে কি তা আমি ভাল বুঝতে পার্‌লেম না—আমাদের বিহঙ্গমও ভাল বুঝতে পারে নি—তবে এইটুকু বুঝেছে যে তারা সত্যের পরিবর্ত্তে অন্য একটা কিছু বলে যা

সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত—অথচ তাই তা'দের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বিশেষ সুবিধাজনক—তার নাম—(সভয়ে)—মিথ্যা।

সকলে। (কর্ণে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক সভয়ে) মিথ্যা! মিথ্যা! কি ভয়ানক! (সকলে মুহূর্ত্তকাল মৌন হইয়া রহিল)।

কুমার। যেতে দাও ওসব কথা। হোক না তারা রাক্ষস—আমাদের তাতে কি? আমরা যা আছি তাই। সময় বয়ে যায়—চল ফল আহরণে যাই। গো দোহন করবার সময় হয়ে এলো—গাভীগণ হয় ত এতক্ষণ আমাদের প্রতীক্ষা কচ্ছে।

মনোরথ। দাঁড়াও। দেখ দেখি আকাশে ওই কৃষ্ণ-বিন্দুটা কি?

জ্যোতিঃ। একটু একটু করে বড় হচ্ছে। কোন পাখী কি?

কুহেলী। না পাখী বলে তো বোধ হচ্ছে না। উঃ দেখতে দেখতে কত বড়টা হয়ে উঠলো!

(নেপথ্যে দূরে এরোপ্লেনের শব্দ—ক্রমশঃ নিকট হইতে লাগিল)

মনোরম। এ শব্দ কোথা হতে আসছে? কি কর্কশ!

কুমার। উঃ কান যে বধির হয়ে গেল!

জ্যোতিঃ। দেখ দেখ ও একটা কি ভীষণ জীব—কি বৃহৎ—যেন আমাদের গ্রাস কর্ত্তে আসছে।

১মা স্ত্রী। আর তো এখানে থাকা যায় না—ভয়ে যে প্রাণ কাঁপছে।

মনোরথ। আমার মনে হচ্ছে কি জানি কি অমঙ্গল কি পাপ আমাদের সুখশান্তি ধ্বংস কর্ত্তে ওর সঙ্গে নেমে আসছে। চল আমরা পালিয়ে যাই।

সকলে। (সভয়ে) চল পালাই।

(সকলের বেগে পলায়ন—অদূরে এরোপ্লেন ভাঙ্গিবার শব্দ—একটা দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে লাটিমপ্রসাদের পতন)

লাটিম। (বারকয়েক গড়াইয়া কোনপ্রকারে উঠিয়া দাঁড়াইল)—উঃ কি পড়াই পড়েছি! বাপ! ছেলেবেলায় ব্যাকরণে পড়েছিলেম পৎ ধাতু অর্থে পতন,পড়া—তা যে এমন পড়া তা কে জানতো? এ কিন্তু বৈজ্ঞে মূর্চ্ছা ও পতনের চেয়ে ঢের বেশী শক্ত, বরঞ্চ পতন ও মূর্চ্ছা বল্লে কথঞ্চিৎ ঠিক হয়। শুনেছি এডাম এবং ঈভ্ গার্ডেন অফ্ ইডেন থেকে পড়েছিলেন—তা তাঁরা যে দয়া করে কোথায় পড়েছিলেন তা কিন্তু থ্যাকারের ডিরেক্টরীতে লেখে না। আর আমি যে এ কোথায় এসে পড়লেম তাওতো ভাল ঠাহর হচ্ছে না। এ যে দেখছি সত্যিকার গার্ডেন অফ্ ইডেন।

(মনোরথ ও জ্যোতির প্রবেশ)

উভয়ে। হে অতিথি স্বাগত!

লাটিম। ও বাবা! এ যে দেখছি, একজোড়া এডাম এবং ঈভ্! (পরিচ্ছদ দৃষ্টে) কিন্তু কি কুরুচি! তবে Artist's model হিসেবে মন্দ হয় না!

(অন্যান্য স্ত্রী পুরুষগণের প্রবেশ)

সকলে। হে অতিথি স্বাগত!

লাটিম। ও বাবা, এ যে দেখছি এক দঙ্গল! আমাদের কোরাসের চেয়েও বেশী। সবাইকার এক রকম পোষাক। এদের কি ছাই শীতও নাই! আমার তো হাড় অবধি কন্‌-কন্ করে উঠছে। ওঃ হো বুঝেছি, এরা নিশ্চয় কোন থিয়েটারের য়্যাক্‌টার য়্যাকট্রেস্—ড্রেস্ রিহার্সেল হতে হতে চলে এসেছে। ড্রেসটী কিন্তু খুব attractive,—ডিজাইনটা বেশ করে মনে করে নিতে হবে। Good Morning to you all—I am very glad to meet you ladies and gentlemen বিশেষতঃ I belong to the same profession—আমি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান থিয়েটারের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। তা দেখুন বলতে পারেন এ আমি কোথায় এসেছি? এ স্থানের নাম কি?

মনোরথ। সঞ্জীবনীপুর।

লাটিম। সঞ্জীবনী! ওঃ হোঃ আমি আপনাদের সাপ্তাহিক কাগজ পড়েছি কিন্তু তা যে এখান থেকে বেরোয়, তা আমার জানা ছিলনা। যাক, সে কথা,আমি আপাততঃ বড় ক্লান্ত, পেটের ভিতর খিদে বাগান্ত কচ্ছে—তা ছাড়া The accident has shaken my nerves—যদি দয়া করে এখানকার কোন হোটেল-আলাকে introduce করে দেন তবে I shal be greatly obliged.

মনোরথ। ভাই সব আমরা এর কথা বুঝি না। কিন্তু

তাতে কি এসে যায় ? এ আমাদের অতিথি, এস আমরা এর পরিচর্য্যা করি।

সকলে। ঠিক ঠিক, এসো আমরা এর পরিচর্য্যা করি।

মনোরথ। অতিথি! এসে এইখানে এই শিলাতলে উপবেশন কর।

লাটিম। কি বলে ?

বালিকাগণ। (লাটিমকে ঘিরিয়া) এলো ভাই দাঁড়িয়ে কেন ? বোস বোস। (সকলে টানাটানি করিয়া বসাইয়া দিল)।

লাটিম। তাইতো, ব্যাপারটা তো ভাল বোধগম্য হচ্ছে না। আমাদের থিয়েটারের ফিমেলরা কিন্তু ঘরের ভেতর না পেলে কাউকে এ রকম টান পাড়াপাড়ি করে না।

মনোরথ। কুমার, কুহেলী, তোমরা যাও অতিথির জন্ম খাদ্য নিয়ে এসো।

কতিপয়। চল আমরাও যাই।

(কুমার, কুহেলী ও অন্যান্য কতিপয়ের প্রস্থান)

গীত।

সকলে।

এসো হে পথিক সুজন শ্যামল পত্রছায়,
মোদের নব-কুসুমিত কুঞ্জকুটীরে গন্ধ-গীত-শোভায়
বিছায়ে দিব হে কিশলয় দল,
ফুলে ফুলে আছে মধু পরিমল,
সরসীর বুকে স্বচ্ছবারি, গাছে গাছে কত ফল ;—
মলয়ানিল করিছে বীজন, বিহগকণ্ঠে ওঠে বন্দন,
তোমারি হে প্রিয় এ বন ভবন বিলায়ে দিয়েছি আজি তোমায়।

লাটিম। Very nice ! (Encore please)

(কুমার কুহেলী ও অন্যান্যের প্রবেশ কাহারও হাতে ফল কাহারও হাতে মৃৎ-পাত্রে দুগ্ধ ইত্যাদি)

তাইতো চুপ করে রইল যে ! ভারি অভদ্র তো ! যাক গে আমি বড় ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণাও বড় কম নয়—তা যদি কোন হোটেলে—

জ্যোতিঃ। আহা ! তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে ! এই আমাদের নির্ঝরিণীর শীতল জল পান কর।

লাটিম। জল ! বাপ ! নিদেন এক কাপ গরম চাও নয় !

কুহেলী। তুমি কি তৃষ্ণা পেলে জল পান কর না ?

লাটিম। তা করি বই কি মাঝে মাঝে, তবে সে সাদা নয়, লাল।

১মা স্ত্রী। তুমি লাল জল পান কর ?

লাটিম। পরের খর্চ্চায় পেলেই করি।

মনোরথ। জলপান না কর এই নাও ফুলের মধু এইমাত্র ফুলেরা আমাদের পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছে ; পান করে তুমি সুখী হবে।

লাটিম। ওরে বাপ, একে তো অম্বলের ধাত, তাতে ডায়েবিটিস ও আছে—মারা যাব যে ! যাকৃগে, পানীয় দরকার নাই ; কিছু খাদ্য পেলে যে বেঁচে যাই।

কুহেলী। এই নাও তোমার জন্ম বেছে বেছে ফল নিয়ে এসেছি।

লাটিম। মন্দ নয় তবে something hot এই ধর mntton chop—

মনোরথ। ভাই তোমার কথা আমরা বুঝতে পারি না—

লাটিম। আহা মাটন মাটন—তোমরা কি ইংরাজী জান না নাকি ?—এই নেটিভ ভাষায় যাকে বলে ভেড়া অর্থাৎ মেষ—

জ্যোতিঃ। মেষ ! তুমি খাবে ?

কুহেলী। আহা নিরীহ মেষ শাবকেরা মনের আনন্দে পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্য করে বেড়ায়, তাদের কত মনের কথা নিত্য আমাদের বলে যায়। তুমি তাদের খেতে চাও।

১মা স্ত্রী। একটা আস্ত মেষ তোমার গলার ভিতর দিয়ে যাবে ? বিশ্বাস হয় না। হাঁ করত দেখি।

লাটিম। অবাক করলে ! ভেড়া মনের কথা কয় ! আচ্ছা বলতে পার, বহরমপুর তোমাদের এখান থেকে কতদূর ?

মনোরথ। বুঝলেম না।

লাটিম। আহা সব কথা নাইবা বুঝলে ! যাক মটন না হয়, নিদেন একটা রামপাখীও কি জুটবে না ?

জ্যোতিঃ। পাখী ! ও তুমি কি নিষ্ঠুর ! পাখীরা

নীলিমার কোলে গান গেয়ে যায়, আমাদের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। তারা নিত্য নূতন দেশের কাহিনী আমাদের বলে যায়, তাদের তুমি খাবে ?

কুমার। একটা আস্ত পাখীইবা তুমি গিলবে কি করে ?

লাটিম। আস্ত কি আর গিলব, অমনি টুকরো টুকরো করে কামড়ে খাব।

জ্যোতিঃ। কামড়াবে ? আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি তোমায় কামড়ে দি।

লাটিম। দাও না, দাও না, এখুনি এইখানটায় (মুখ বাড়াইয়া দিল)।

মনোরথ। ভাই আমার বোধ হয় এ রাক্ষস।

সকলে। (সভয়ে) রাক্ষস ! রাক্ষস !

লাটিম। রাক্ষস ! I like that দেখ মেসার্স টাকারাম তামাকুপ্রসাদ Solicitors আমার বিশেষ বন্ধু, হপ্তায় চার পাঁচ খানা করে পাশ আমি তাদের দিয়ে থাকি। মামলা কর্ত্তে আমার পয়সা লাগে না। তোমরা যদি ফের ওকথা উচ্চারণ কর তবে আমি তোমাদের নামে লাইবেলের সুট আনব।

কুহেলী। তুমি রাক্ষস নও ?

লাটিম। ওঃ হোঃ বুঝেছি ; আমার এই বিদঘুটে এরো-প্লেন সুট দেখে এরা ভয় পেয়েছে। ওঃ দেখাতে পার্ত্তুম এদের একবার ষ্টেজে মহাবীর বদহজম খাঁ বেশে আমাকে কেমন মানায়—

মনোরম। তুমি তবে কি ? তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছ ?

লাটিম। I am comming from Calcutta I am Mr লাটিম প্রসাদ ঘুঘু নাট্য-বিভীষণ Managiug Derector of the Metropolitan Theatre. Here is my card—(কার্ড প্রদান)।

মনোরথ। তুমি—তুমি—কলিকাতা হতে—তুমি—

সকলে। (সভয়) রাক্ষস ! রাক্ষস !

কুহেলী। ভয় কি ভাই—হ'লইবা রাক্ষস—এযে অতিথি ! আচ্ছা আমি কথা কইছি। হ্যাঁ ভাই তুমি আর কি বল্লে ?

লাটিম। Metropolitan Theatre—

কুহেলী। সে কি ?

লাটিম। থিয়েটার—থিয়েটার—তোমরা থিয়েটার জান না ?—

সকলে। না। থিয়েটার কি ?—

লাটিম। Oh what a pity !—থিয়েটার হচ্ছে—ইয়ে তোমার গে—রঙ্গালয় অর্থাৎ কলা-মন্দির—যেখানে রাসিরাসি কলার আবাদ হয়—মর্ত্তমান কাঁঠালী চাঁপা—কাঁচা, ডাঁসা, পাকা, যত ইচ্ছা খাও—যদি প্রাণ চায় তো কলার পাতা, থোড় এমন কি মূল পর্য্যন্ত খেতে পার, কেউ আপত্তি করবে না ; যেখানে পুরাতন গ্রন্থকারদের আদ্যশ্রাদ্ধ হয় নূতন গ্রন্থকারদের ধরে চাবুক মারলেও কেউ কোন কথা কয় না ; যেখানে লোকে পয়সা দিয়ে ছারপোকার কামড় খেতে আসে আর সফেদা-সিন্দুর-রঞ্জিত আমাবস্যা সুন্দরীদের Hysteric হাতপা নাড়া ও মুখভঙ্গি দেখে তাদের বেসুরো চিৎকার শুনে বাহবা দেয় ; যেখানে কোন কোন কোকেনখোর বীরের র‍্যাকটিং এর ঠ্যালায় মা স্বরস্বতী দাঁত বের করে মূর্চ্ছা যান। তাকেই বলে থিয়েটার।

কুহেলী। আমরা তো কিছুই বুঝলেম না।

লাটিম। তোমরা থিয়েটার বোঝ না ! আচ্ছা, তবে তোমরা তোমাদের টাকাপয়সা নিয়ে কি কর ?

জ্যোতিঃ। টাকা কি ?—

লাটিম। টাকা কি ! ভারি আশ্চর্য্য তো ! আচ্ছা আমি তোমাদের টাকা দেখাচ্ছি। (পকেট হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া কয়েক জনের হাতে দিল)—এই দেখ টাকা।

(কেহ কেহ উহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ বা দাঁত দিয়া চিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল)

লাটিম। ও জিনিস বেশীক্ষণ হাতে রাখতে নাই ; বেশীক্ষণ থাকলে হাতের সঙ্গে জড়িয়ে যায় আর খসতে চায় না, ওই ওর দোষ।

সকলে। (টাকা ভূমিতলে ছুঁড়িয়া ফেলিল) এই নাও।

লাটিম। আহা মাটীতে ফেলতে নাই (কুড়াইতে লাগিল) আমার বেনিফিট নাইটে কেউ একখানা প্যালা-

স্ত্রীর টিকেট কিনে আমাকে patronise কর্লে না আর এখন এত কাপ্তেনী কেন বল দেখি ?

কুমার। চল ভাই আমরা যাই—এখনো আমাদের ফল আহরণ গো-দোহন বাকী আছে।

কতিপয়। চল চল, আর সময় নাই।

(মনোরথ জ্যোতিঃ কুহেলী ও লাটিমপ্রসাদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মনোরথ। জ্যোতিঃ, তুমি এইখানে থেকে অতিথির পরিচর্য্যা কর, আমরা এঁর জন্ত কিছু ফুল আর চন্দন-সার নিয়ে আসি।

(মনোরথ, কুহেলীর প্রস্থান)

লাটিম। আমারই ভুল হয়েছে—এ সত্যিকার গার্ডেন অফ্ ইডেন আর এরা সব এডাম ঈভের গোষ্ঠী। কিন্তু আমি ভাবছি কি—এখান থেকে গুটিকত ফিমেল ভাজিয়ে নিতে পার্লে বেশ হত। এইটাই সব চেয়ে Good looking (সুন্দরী) আপাততঃ এইটাকেই চেষ্টা করি দেখি। ওগো তুমি এইখানে আমার পাশে বোস।

(উভয়ে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিল। লাটীম জ্যোতিঃর হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল)

আহা তোমার হাতখানি কি সুন্দর! তোমার মুখ খানি মরি মরি! এমন সুন্দর মুখ আমি কখনো দেখি নাই।

জ্যোতিঃ। ঠিক তো, আমি জানি আমি সুন্দরী।

লাটিম। এতটা অহঙ্কার তো ভাল নয়। আচ্ছা কে বল্লে ?

জ্যোতিঃ। কেন মনোরথ বলেছে আর আমি নিজেও ওই সরোবরে আমার প্রতিবিম্ব দেখেছি।

লাটিম। তা হলে দেখছি এই রথ বাবাজী আগে থেকেই [illegible] পেট্রোল মর্দ্দন করে আসছেন।

জ্যোতিঃ। কিন্তু তুমি কি কুৎসিৎ! তোমার মাথায় চুল নাই অথচ মুখে কত চুল।

লাটিম। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া)—হো হো: আমার এই টাক এবং দাড়িই তো আমার বিউটী। আমার হচ্ছে একটু Phychologic—appreciate কর্ত্তে কিছু সময় দরকার। আমাদের Prima Donna মিস রসগোল্লাময়ী এই টাক এবং দাড়ির জন্যে মরে আছেন। যাক আচ্ছা বল দেখি এরকম ফুরফুরে কাপড় পরে তোমরা থাক কি করে ? তোমাদের ঠাণ্ডা লাগে না ? লোকেও কিছু বলে না ? obscene বলে পুলিশ ও আপত্তি করে না ?

জ্যোতিঃ। তোমাদের দেশের মেয়েরা কি রকম কাপড় পরে ?

লাটিম। তারা পা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। কেউ কেউ বা মুখখানি পর্য্যন্ত ঘোমটার ভিতর লুকিয়ে রাখে।

জ্যোতিঃ। তাদের দেহ তাহলে নিশ্চয় অত্যন্ত গরম।

লাটিম। Beg your Pardon—কি বল্লে ?

জ্যোতিঃ। তাদের দেহ তাহলে নিশ্চয় অত্যন্ত গরম।

লাটিম। Certainly—কারু কারু দেহ এতগরম যে সিগারেট ধরাতে দেশলাই দরকার হয় না। never mind এখন বল দেখি তুমি love at first sight প্রথম দর্শনে প্রেম বিশ্বাস কর ? আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই প্রেমে পড়ে গেছি।

জ্যোতিঃ। কেন বিশ্বাস করব না ? আমরা তো সবাই পরস্পরকে ভালবাসি। মনোরথ আমাকে কত ভাল বাসে।

লাটিম। নাঃ এ শালা ট্রাম গাড়ীই দেখছি সব মাটী কর্লে। না বাবা এখন থেকেই এর গোড়া মেরে রাখতে হচ্ছে।—তুমি বুঝি ভেবেছ মনোরথ তোমাকে ভালবাসে ? সে বুঝি তোমাকে তাই বলেছে ?

জ্যোতিঃ। হুঁ।

লাটিম। আমাকে কিন্তু সে বল্লেছে অন্যরূপ। সে তোমায় ভালবাসে না সে ভালবাসে ওই আর একটি মেয়েকে। দেখলে না সে তাকে নিয়ে সরে পড়ল।

জ্যোতিঃ। (ব্যস্তভাবে) মনোরথ আমাকে ভালবাসে না ? সে তোমায় বলেছে ? মনোরথ আমায় ভালবাসে না ? আমার সব অন্ধকার হয়ে আসছে।—কেন সে আমাকে ভালবাসবে না ? আমি তো সবাইকে ভালবাসি তবে সে কেন আমায় ভাল বাসবে না ? আমার বুকের ভিতরটা

কেমন কচ্ছে।—এ জীবন শুধু দুঃখের বোঝা,—এখুনি ওই সরোবর-জলে তা নামাব।

লাটিম। আচ্ছা, এ সামান্য কথায় অত upset হলে চলবে কেন? মনোরথ না ভালবাসে, ভালবাসবার লোকের অভাব কি? আমিই তো হাজির আছি। তুমি বস।

জ্যোতিঃ। মনোরথ আমায় ভাল বাসে না! মনোরথ আমায় ভালবাসে না!—মনোরথ! মনোরথ!—

লাটিম। নাঃ সব মাটী কর্লে।

(ব্যস্তভাবে মনোরথ ও কুহেলীর প্রবেশ)

মনোরথ, কুহেলী } কি জ্যোতিঃ কি হয়েছে? তুমি অমন কচ্ছ কেন?

জ্যোতিঃ। মনোরথ, তুমি আমায় ভালবাস না? কুহেলী, তুমি বুঝি মনোরথকে ভালবাসতে বারণ করে দিয়েছ। উঃ তোমরা কি নিষ্ঠুর! আমি আর এ প্রাণ রাখব না। এখুনি ওই মানস সরোবরে এ বোঝা নামাব।

মনোরথ। ছি জ্যোতিঃ, তুমি কি জ্ঞান হারালে? আমি তোমায় ভালবাসি না? কে বলেছে? যদি কেউ এমন অসম্ভব কথা বলে থাকে, তবে সে যা বলেছে তা সত্য নয়—সত্যের বিপরীত—(অস্ফুটস্বরে)—মিথ্যা।

জ্যোতিঃ। (লাটিমকে নির্দ্দেশ করিয়া) তবে এ মিথ্যা বলেছে।

কুহেলী। (সক্রোধে) ওঃ রাক্ষস!

মনোরথ, জ্যোতিঃ, কুহেলী } তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি মিথ্যা বলেছ।

লাটিম। I plead guilty—কিন্তু তাই বলে এর জন্যে একটা গান বেঁধে ফেলবার কোন দরকার দেখি না।

(কুমার ও অন্যান্য স্ত্রী পুরুষগণের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে ভাই, কি হয়েছে? হঠাৎ জ্যোতিঃর জন্য আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠলো কেন?

মনোরথ, জ্যোতিঃ } মিথ্যা—মিথ্যা—এ মিথ্যা বলেছে।

সকলে। (সভয়ে) মিথ্যা—মিথ্যা—এ মিথ্যা বলেছে?

মনোরথ। ভাই সব আমরা একে নিয়ে কি করব?

কুমার। চিন্তা কি ভাই, সম্মুখে ওই মানস সরোবর, যা মানস করব তাই পাব। এসো আমরা একে এই কামনা করে সরোবরে নিক্ষেপ করি যেন এর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে ফিরে আসে।

সকলে। সরোবরে নিক্ষেপ কর। সরোবরে নিক্ষেপ কর।

লাটিম। সরোবরে নিক্ষেপ কর—সরোবরে নিক্ষেপ কর—কর্লেই অম্নি হ'ল আর কি, মগের মুল্লুক কিনা।

মনোরথ। সবাই একে ধর—

লাটিম। খবরদার!—(ইতস্ততঃ পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া সরোবরের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল, সে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল)—ওরে ফেলিস না, ফেলিস না, ডুবে মরব—আমি সাঁতার জানি না। এই শীতে জমে যাব রে—ওরে দোহাই তোদের—হায় হায় রে!—ওরে আঁটকুড়ীর বেটী রসগোল্লাময়ী এ সময় তুই কোথায়?—তোর লাটিমপ্রসাদের দফা নিকেশ হল রে!—

(সকলে ধরিয়া তাহাকে মানস সরোবরে নিক্ষেপ করিল)

লাটিম। (সরোবরের মধ্য হইতে চিৎকার) ওরে আমার চুলদাড়ি ধরে টানাটানি করছে—ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—আহা হাঃ সর্ব্বনাশ হ'ল—আমার চুল গেল দাড়ি গেল—ওরে কাপড় ছাড়—কাপড় চোপড় কেড়ে নিচ্ছে ওরে ছেড়ে দে ছেড়ে দে—তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি।

(নবযুবক বেশে সঞ্জীবনীপুর নিবাসীদের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উঠিয়া আসিল)

তাই তো আমার কি রকম ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে নাঃ এ পোষাকে তো কোথাও যাওয়া চলে না—কিন্তু কৈ শীত করছে না তো।

(বালকের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল)

মনোরথ। তোমার নবজীবন লাভ হয়েছে। আজ হতে তুমি আমাদের মত চিরযৌবন সম্পন্ন হ'লে। আজ হতে তোমার নাম হোক নবজীবন। কিন্তু সাবধান আর কখনো

মিথ্যা উচ্চারণ করো না। করলেই কিন্তু তোমার পূর্ব্বের কুৎসিৎ আকৃতি আবার ফিরে আসবে।

লাটিম। তাইতো! আমি এ অবস্থায় আর তো সেখানে ফিরে যেতে পারবো না। আজ হতে তা'হলে আমিও তোমাদেরই একজন হলেম। আমি বরাবর এখানেই থাকব—আর আমার সেই বৃদ্ধা রসগোল্লাময়ীর কাছে ফিরে যাব না।

মনোরথ। না না, তোমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। জ্যোতিঃ এবং কুহেলীও তোমার সঙ্গে যাবে। তোমরা গিয়ে সেখানে সত্যের মহিমা প্রচার করবে, তাদের আমাদের মত করে তুলবে।

লাটিম। প্রচার করবো! না বাবা মিশনারী সেজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা আমার পোষাবে না।

জ্যোতিঃ। আমরা গান গেয়ে তাদের মনের মলিনতা দূর করব, তাদের ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করব।

লাটিম। না বাবা বড় সুবিধা বোধ হচ্ছে না।

মনোরথ। চল, কাল-বিলম্বে ফল নাই।

জ্যোতিঃ। এসো।

লাটিম। চল, যা থাকে কপালে, আর যা করেন মা গোঁসাঞি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা মেট্রোপোলিটান থিয়েটারের সম্মুখস্থ পার্ক।

নবীন চাকরীজীবিগণ—

গীত।

আমরা চাকরী করি সরকারে।
গুঁজে দুটা নাকেমুখে চাদরখানি বেঁধে বুকে
সকাল সকাল চলেছি তাই দপ্তরে।
আমরা সব [illegible] আহাজ, দেখছ নাকো কাঁজ?
যদিও [illegible] সবাই [illegible] বড় সাহেবের সমাদরে।
মোদের মাথায় দিব্বি টাক, চশমা হইছে নাক,
এদিকে হাঁড়ি চিচিং ফাঁক—কিন্তু বুঝবে কে তা
জামাজুতার বাহারে।
আর বাকি্য লম্বা চওড়া, বক্তৃতায় নিই মওড়া,
চা খানায় সব কেষ্ট বিষ্ণু গ্রাহ্য করি কাহারে?
মোরা ভাঁজি নিত্য ডম্বল, যদিও পেটে পিলে অম্বল,
সাহেবের শ্রীচরণটী সম্বল, মরি আহা আহা রে!

(প্রস্থান)

(রসগোল্লাময়ীর প্রবেশ)

রস। হতভাগাকে পেতুম একবার, ভাল করে বুঝিয়ে দিতুম কত ধানে কত চাল হয়। আমার সঙ্গে চালাকী। আচ্ছা ক'দিন আর? অবিলম্বে এসে এই শ্রীচরণে শরণ নিতেই হবে।

(টিকারাম তামাকুপ্রসাদের প্রবেশ)

টিকা। এই যে মিস রসগোল্লাময়ী—এ সময় এখানে হঠাৎ?

রস। এই এসেছিলাম ভাই একবার লাটিমপ্রসাদের বাড়ীর খবরটা নিতে। তারপর বাড়ীর সব ভাল তো?—

টিকা। অল্‌রাইট সব। তা মিষ্টার লাটিমপ্রসাদ কি আজও ফেরেন নি?

রসগোল্লা। কৈ আর ফিরল? জানেন তো তার স্বভাব—রোজ নূতন আমোদ চাই—তা আমাকে নিয়ে তার মন উঠবে কেন? কোথায় পড়ে আছে কার আস্তাকুঁড়ে।

টীকা। না না, তাও কি সম্ভব? সে আপনাকে ছেড়ে আর ক'দিন থাকবে? আসতেই হবে তাকে খুব শীগ্‌গির। আপনি ভাববেন না।

রস। ভেবেই আর করছি কি? একি! আকাশে হঠাৎ মেঘ [illegible] উঠলো যে! এখুনি জল হবে বোধ হচ্ছে।

(সহসা মেঘগর্জ্জন—চারিদিক অন্ধকার হইল)

টিকা। উঃ তাইতো একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল যে! চলুন ওই shedএর নীচে গিয়ে দাঁড়াই।

(তথাকরণ)

(সহসা লাটিমপ্রসাদ জ্যোতিঃ ও কুহেলীর আবির্ভাব আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল)

লাটিম। তাইতো এ কোথায় এসে পড়লুম! এযে দেখছি আমাদের থিয়েটার বাড়ীর সম্মুখ! সর্ব্বনাশ করেছে— এখুনি রসগোল্লা দেখতে পেলে চাবুকের চোটে ভূত ছাড়িয়ে দেবে।

(টিকারাম ও রসগোল্লা সেডএর নীচ হইতে বাহির হইয়া আসিল)

টিকা। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, চলুন যাওয়া যাক।

রস। চলুন। তাই তো, এরা কারা? কি সুন্দর চেহারা! মানুষ এত সুন্দর হয়?

লাটিম (রসগোল্লাকে দেখিয়া) ওরে বাবা! যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই রাত হয়। (টিকারামের পশ্চাতে গমন)

টিকা। তাই তো! অদ্ভুত! কিন্তু মানুষের মতনই তো—

লাটিম। তবে কি মহাশয়ের ইচ্ছা যে একটা আরশুলা কিম্বা টিকটিকির মত হোক? শুনুন—আমরা সঞ্জীবনী-পুরবাসী আপনাদের কাছে সত্যের বাণী প্রচার করতে এসেছি। সত্য সত্য অহো! আমরা সব সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারি।

টিকা। ওঃ হোঃ স্যালভেসান আর্মি! তাই বল। আমি বলি কি! তা দেখ বাপু আমি হচ্ছি উকিল আর ইনি এ্যাকট্রেস - আমাদের কাছে বড় সুবিধে হবে না, অন্য কোথাও দেখ।

রস। বাঃ কি সুন্দর ছেলেটী! ওহে ছোকরা শোন শোন— আঃ এধারে এসো না—

লাটিম। ছোকরা! ওঃ হোঃ হোঃ রসগোল্লা আমাকে চিনতে পারে নি, কিন্তু—না বাবা বড় সহজে ধরা [illegible] হবে না।

(রসগোল্লা তাহাকে ধরিবার জন্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল সেও চতুরতার সহিত তাহার হাত এড়াইতে লাগিল)

জ্যোতিঃ। তুমি কেন বৃথা আমাদের নবজীবনের পশ্চাদ্ধাবন করছ? শোন, আমরা সঞ্জীবনীপুর হতে এসেছি। তোমাদেরই জন্ত এসেছি। আমাদের কথা শোন তোমাদের নবজীবন লাভ হবে, তোমরা আমাদের মত চিরযৌবন প্রাপ্ত হবে।

রস। আমর, ছুঁড়ীর যৌবনের গুমরে মাটীতে পা পড়ে না! (টীকারামের প্রতি)—দেখ আমার বোধ হয় এরা স্যালভেসান আর্মি নয় এরা নিশ্চয় কোন ম্যালেরিয়ার অষুদের বিজ্ঞাপন।

লাটীম। আচ্ছা কেন বল দেখি তুমি অমন যা তা বলছ? দেখছ না আমরা সঞ্জীবনীপুর নিবাসী, আমরা তোমাদের কাছে সত্যের বাণী প্রচার কর্ত্তে এসেছি।

টীকা। আমার আপিসের বেলা হল। আমি আসি।

(প্রস্থান)

রস। আচ্ছা প্রচার কর দেখি—

লাটীম। (সুর করিয়া) সত্য হে! তুমি কোথায় হে! আহারে! মরিরে!—

গীত।

জ্যোতিঃ }
কুহেলী }

মোরা এনেছি নূতন বারতা।
এনেছি নূতন জীবন মুছাতে যত দুঃখ ব্যথা।
যাবে ভ্রান্তি, পাবে শান্তি, ঘুচিবে যত মলিনতা।
এসো কে আছ তৃষিত ক্ষুধিত,—
কে আছ ব্যথিত পীড়িত,—
লহ দান, কর পান, অমিয়া—সত্য-প্রেম-সরলতা।

রস। চমৎকার। চমৎকার! তোমাদের উত্তম নিশ্চয় সফল হবে। তা দেখ, তোমরা রাস্তায় গিয়ে খানিকক্ষণ প্রচার কর, ততক্ষণ আমি তোমাদের বন্ধু এই নবজীবনবাবুর কাছে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করি।

জ্যোতিঃ। বেশ!

জ্যোতিঃ ও কুহেলীর গীত।

মোরা এনেছি নূতন বারতা,
এনেছি নূতন জীবন মুছাতে যত দুঃখ ব্যথা।—

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

রস। দেখ একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। তোমাকে দেখে তোমার কথা শুনে আমার কেবলই মনে হচ্ছে তুমি যেন কতকালের চেনা লোক।

লাটিম। হুঁ চেনা লোকই তো। (জিভ কাটিল)

রস। কি বল্লে?—

লাটিম। বলছি এই তুমি কি সুন্দর।

রস। (সহাস্তে) সতি বলছ?

লাটিম। নিশ্চয়। আচ্ছা আর কি মনে হচ্ছে?

রস। আর মনে হচ্ছে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা।

লাটিম। (স্বগতঃ) হুঁ। আমারই কপালে তেঁতুল গুলেছ বুঝি? (প্রকাশ্যে) সে বন্ধুটীর নাম হচ্ছে কি?

রস। তিনি হচ্ছেন আমাদের মেট্রোপলিটান থিয়েটারের ম্যানেজিং ডিরেক্টার,—মিষ্টার লাটিমপ্রসাদ ঘুঘু নাট্য-বিভীষণ।

লাটিম। (স্বগতঃ) যাক, একটা দুর্ভাবনা দূর হ'ল। (প্রকাশ্যে)—তা হবে।

রস। কিন্তু তার টাক এবং দাড়ী ছিল আর বয়সও তোমার চেয়ে ঢের বেশী।

লাটিম। তা বেশ তো! এখন বল দেখি আপাততঃ আমাকে নিয়ে পড়া হ'ল কেন?

রস। কি জানি তোমাকে দেখেই আমার মনটা কেমন করে উঠলো। বোধ হয় তুমি খুব সুন্দর, তাই! আহা তোমার নামটী কি মিষ্টি! নবজীবন! নবজীবনই বটে! তুমি আমার নবজীবন। আচ্ছা দেখ ওই সুন্দরী দুটীর মধ্যে মিসেস্ নবজীবন কোনটী?

লাটিম। আমাদের সঞ্জীবনীপুরে মিসেস বলে কোন পদার্থ নাই।

রস। বাঃ তা'হলে তো চমৎকার! কোন আপদ বালাই নাই! তা দেখ তোমরা তো এখানে নতুন এসে পড়েছ, চেনাশুনা কেউ নাই, চল না আমার বাড়ীতে—সেখানেই তোমরা থাকবে।

লাটিম। আমার সঙ্গিনীরা যদি রাজী না হয়?

রস। তুমি তাদের রাজী করে নাও।

লাটিম। পারি, যদি তুমি একটা বিষয়ে রাজী হও। আমার মাথায় একটা মতলব আছে, যদি তুমি সাহায্য কর। বাঃ কি সুন্দর!

রস। কি সুন্দর?

লাটিম। তোমার এই সাড়ীখানি। নতুন দেখছি যে, এতো আমি আগে কখনো দেখি নি।

রস। কি করে দেখবে? তুমি এর আগে আমাকেই কখনো দেখ নি।—

লাটিম। ঠিক ঠিক। তা বোধ হয় তোমার বন্ধু মিষ্টার লাটিমপ্রসাদও কখনও দেখেন নি।

রস। দেখেন নি বটে, তবে দাম তিনিই দিয়েছেন।

লাটিম। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ভারি মজা তো! কি রকম?

রস। সাড়ীখানি তিনি আমাদের থিয়েটারের অন্য একটা ছুঁড়ীর সঙ্গে ভাব করে তাকে উপহার দেবার জন্য অর্ডার দিয়েছিলেন। আমি গিয়ে তার নাম করে দোকান থেকে নিয়ে এসেছি। হাঃ হাঃ হাঃ।

লাটিম। হাঃ হাঃ হাঃ—সে নিশ্চয় বিভা। (স্বগতঃ) কিন্তু কি বদমায়েস!

রস। না সে ঊষা।

লাটিম। আমি বলছি বিভা।

রস। আমি বলছি বিভা নয় ঊষা।

লাটিম। উঁহু—

রস। তা সে যেই হোক না, তুমি কি করে জানলে?

লাটিম। (সুর করিয়া) সত্য হে!—কোথায় আছ হে!—এখন কি বুদ্ধি হে!—যাক গে, তুমি কিন্তু ভারি সুন্দর সত্যি।

রস। হাঃ হাঃ হাঃ তুমি নিজে সুন্দর তাই পৃথিবীশুদ্ধ সব সুন্দর দেখ। যাক কি মতলবটা বল দেখি।

লাটিম। আমি ভাবছিলাম যদি কোন গতিকে আমার এই সঙ্গিনী দুটীকে কোন থিয়েটারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে

নাবিয়ে দেওয়া যায় তবে কয়েকদিনের মধ্যে মবলগ পয়সা পিটে নেওয়া যায়।

রস। চমৎকার! চমৎকার। আমার এতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গিনীরা রাজী হবে কি?

লাটিম। সে আমি করে নেব। তুমি তাদের কিছু বলো না, যা বলবার আমিই বলব।

(জ্যোতিঃ ও কুহেলীর পুনঃ প্রবেশ)

জ্যোতিঃ। ভাই নবজীবন, আমাদের কথা তো কেউ শুনছে না। কেউ হাসছে, কেউ মুখভঙ্গি করছে, আর কেউ বা এমন কিছু বলছে যা আমরা বুঝতে পারি না।

লাটিম। তা আমি পূর্ব্বেই জানতেম। ও রকম করে কাজ হবে না, সেই জন্য আমি তার বন্দোবস্তও করে ফেলেছি। আমরা নাট্যশালায় আমাদের প্রচারের কেন্দ্র করব। সেখানে দাঁড়িয়ে যখন আমরা আমাদের মহামন্ত্র প্রচার করব, তখন কার সাধ্য তা উপেক্ষা করে। আমাদের এই বন্ধু শ্রীমতী রসগোল্লাময়ী আমাদের সাহায্য কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আর ভয় নাই।

(জ্যোতিঃ ও কুহেলী পর পর রসগোল্লাময়ীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল)

জ্যোতিঃ। ভগ্নি রসগোল্লাময়ী তোমার কৃপায় অবশ্যই আমাদের মহান উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হবে। বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন।

রস। এখন চলুন আপাততঃ দীনার কুটীরে গিয়ে বিশ্রাম লাভ করবেন, পরে কর্ত্তব্য স্থির করে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে।

জ্যোতিঃ। উত্তম তাই চলুন।

রস। (যাইতে যাইতে লাটিমের প্রতি) আচ্ছা বল দেখি, তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

লাটিম। এই রে সেরেছে! (কাশিয়া) তোমাকে দেখেই কি জানি কেন ওই নামটা আমার মনে পড়ল।

রস। নাঃ তোমার শুধু দাড়ি আর টাক নাই, বয়সও অনেকটা কম, নইলে তুমি সব রকমে ঠিক যেন আমার লাটিমপ্রসাদ। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

রঙ্গিনীগন— গীত।

সত্য ভাল, প্রেমও ভাল, সরলতাও বেশ।
কিন্তু কেমন করে দিন চলে ভাই
নিয়ে সয় কেতাবী উপদেশ।
দোকানদারে করবে না দর, গয়লা দুধে জল দেবেনা,
স্যাক্‌রা হবে ধর্ম্মপুত্তুর, বেচবে উকিল শামলা থানা,
আর ডাক্তার বাবু হবেন কাবু—
বলতে জরো রোগীকে 'ভাই খারাপ তোমার Case'
এসব কবে হবে? ধরা স্বর্গ নামবে কবে?
যদিও হয় এ যুগে নয়—এটা যে ভাই মাটীর দেশ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

ইডেন উদ্যান, ঝিলের ধার।

একখানি বেঞ্চের উপর গালে হাত দিয়া রসগোল্লাময়ী বসিয়া আছে। নিদ্রাবিলাস পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

নিদ্রা। আপনি অত মুস্‌ড়ে পড়লে চলবে কেন? স্থির হোন, মনকে দৃঢ় করুন, এ অন্যায় মিথ্যাচরণের প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হোন। আমি নিশ্চয় বলছি ইনিই আমার মুনিব মিষ্টার লাটিম প্রসাদ ঘুঘু নাট্য-বিভীষণ, এতে কোন সন্দেহ নাই।

রস। আমারও গোড়া থেকেই ঐ সন্দেহ। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব তাওতো বুঝতে পার্চ্ছি না। তার তুলনায় এতো নাবালক, তা ছাড়া তার দাড়ি এবং টাক—

নিদ্রা। ওসব পার্থক্য কিছুই নয়! আমার বোধ হয় ঐ কুহকিনী বেটীরা কোন উপায়ে তাঁর চেহারার পরিবর্ত্তন করে দিয়েছে। নইলে এই বা কি করে সম্ভব? আজ কি ঘটেছে জানেন? থিয়েটারের পুরোণো হিসাবের খাতাখানা

নাড়া-চাড়া করছিলেন—দেখতে দেখতে বল্লেন 'একি, আমি আমি না আমোদিনীর পোনের দিনের মাইনে কাটতে বলেছিলেম—তাকে পুরো মাসের মাইনে দেওয়া হল কেন? গণেশকে ডিস্‌মিস্ করেছিলেম—তাকেইবা পুনরায় কাজে বহাল করা হল কেন?' অথচ এসব আদেশ তিনি দিয়েছিলেন এরোপ্লেনে বেড়াতে যাবার আগে।

রস। নিদ্রারে! তবে আর কোন সন্দেহ নাই, এ আমারই সেই মুখপোড়া। হায় হায় কি লজ্জার কথা, আমি কিনা শেষটা তারই প্রেমে পড়ে গেলাম! সেই পাপিষ্ঠ কিনা আমায় এমন করে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে! আবার আমারই চোখের সুমুখে আমারই বাড়ীতে বসে ওই কুহকিনী ছুঁড়ীদের সঙ্গে দেদার প্রেম কচ্ছে। আমি কিছু বলতে গেলেই চক্ষু বুজে দাঁত বের করে বলছে—'সত্য! প্রেম! সরলতা!'

নিদ্রা। ওসব ভণ্ডামি। আপনি দৃঢ় হোন কিছুতেই আর এসব বরদাস্ত করবেন না। সাফ বলে দিন এসব চলবে না।

রস। তা তো বলতে পারি, কিন্তু ওই ছুঁড়ী ছুটোকে থিয়েটারে নিয়ে অবধি যে বিক্রীটা হচ্ছে দেখেছ তো। সহরময় একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে চারদিক থেকে লোক যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তা যে বন্ধ হয়ে যাবে তাই শুধু ভাবছি।

(টাকারামের প্রবেশ)

টাকা। এই যে আপনি এখানে! আমি এই মাত্র আপনার বাড়ী থেকে আসছি।

রস। কেন বলুন দেখি?

টাকা। আপনার সেই নূতন বন্ধু নবজীবনটী কোথায়? আমি তার নামে ক্রিমিনাল কেস করে এসেছি। পুলিস তাকে খুজছে।

রস। (ব্যস্তভাবে)—কেন সে কি করেছে?

টাকা। তা খুব ভাল কাজই করেছে। এমন ভাল কাজ করেছে, যে তাকে পেলে আমিই প্রথমে ঘা কতক দিয়ে তার সম্বর্দ্ধনা করে নিই, তারপর অন্য কথা।

রস। ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না।

টাকা। বলব কি আমার মাথা আর মুণ্ড,—লাটিমপ্রসাদের সেই যে ব্যাঙ্কে প্রায় লাখটাকা Current accountএ জমা ছিল না? আর সে যাবার সময় Business ও Finan e সম্পর্কীয় যা কিছু আমায়ই দেখতে শুনতে বলে power দিয়ে যায়। সেই অবধি আমিই তার হয়ে চেক-টেক সই করছি। আজ ব্যাঙ্ক থেকে খবর পেলুম সে নিজের নামে তেত্রিশ হাজার টাকা ড্র করেছে। লাটিম তো এখানে নাই। অনুসন্ধানে যা জানলুম তাতে আপনার বন্ধু নবজীবনই যে নাম জাল করে এই কীর্ত্তি করেছে তাতে আর সন্দেহ নাই। আর কেনই বা করবে না? সারা রাত হোটেলে হোটেলে ঘুরে মদ ওড়াবে মেয়েদের নিয়ে ইয়ার্কি দেবে, তাতে তো খরচ আছে।

নিদ্রা। কেমন বুঝছেন তো।

রস। হায় হায়! আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি জলে ডুবে মরি, কি লোটা কম্বল নিয়ে একদিকে চলে যাই। নাঃ আসুক সে আজ একবার, আমি তার জিরকুটী ভাংছি।

(জ্যোতিঃ ও কুহেলীর প্রবেশ)

জ্যোতিঃ। আমাদের নবজীবন কোথায়? আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি।

টাকা। নবজীবনই বটে। দেখ বাছারা তোমরা বুঝতে পারছ না—ওই নবজীবন তোমাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এই সহরের মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছে তোমাদের সত্যধর্ম্মের জন্য নয়, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তোমাদের বোকা বুঝিয়ে থিয়েটারে নামিয়ে দিয়ে দেদার পয়সা পিটে নিচ্ছে। তোমরা মরছ মেহনৎ করে, আর সেই পয়সায় সে নবাবী করছে।

জ্যোতিঃ ও কুহেলী। পয়সা! পয়সা কেন? আমরা তো সত্যপ্রচারের জন্য নাট্যশালায় গান গাই—

টাকা। তোমার গুষ্ঠীর পিণ্ডির জন্যে গান গাও।

কুহেলী। বোন, এ বোধ হয় ঠিকই বলছে। এখানে এসে অবধি নবজীবনের ব্যবহার আমার কাছে কেমন দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সে যে কি করে কোথায় যায় কাদের সঙ্গে ভ্রমণ করে কিছুই বুঝতে পারি না আমাকে বলেছে তোমরা সত্য প্রচার কর আমি প্রেম নিয়ে রইলেম। এমন প্রেম করব

যে লোকে সেই দৃষ্টান্ত দেখে মুগ্ধ হবে বুঝবে প্রেম করা কাকে বলে।

রস। হায় হায় রে, মুখপোড়া আমার কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে রে!

জ্যোতিঃ। বেশ, চল আমরা ফিরে যাই। আমার বোধ হচ্ছে আমাদের উদ্যম নিষ্ফল হয়েছে। এখানে আমাদের কথা কেউ শোনে না, কেউ বোঝে না। এরা রাক্ষস রাক্ষসই থাকবে, কিছুতেই আমাদের মত হবে না।

নিদ্রা। একটা কথা খোলসা করে বল তো চাঁদ—তোমাদের এই নবজীবনটী কে? কোথায় তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

জ্যোতিঃ। কে তা আমরা জানি না—সে একটা প্রকাণ্ড পাখীর পিঠে চড়ে আমাদের দেশে গিয়েছিল। বল্লে সে কলিকাতা থেকে এসেছে—তখন তার কি কদর্য্য চেহারা ছিল—তার মাথায় চুল ছিল না—মুখ ময় চুল ছিল—

রস। ওরে এ সেই টাক আর দাড়ী! নিদ্রা রে! এ আমারই সেই হনুমান।

নিদ্রা। তারপর তার এ রকম চেহারা হ'ল কি করে?

জ্যোতিঃ। সে মিথ্যা বলেছিল, তাই আমরা তাকে মানস সরোবরে নিক্ষেপ করে কামনা করেছিলুম, তার আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে আমাদের মত হোক।

টীকা। This is all very strange!

রস। ওঃ পেতুম তাকে একবার এই সময়!—আচ্ছা সে এখানকার কথা কিছু বলেছিল?

কুহেলী। অনেক কথা বলেছিল, আমরা কিন্তু কিছু বুঝতে পারি নি।

রস। কোন স্ত্রীলোকের কথা কিছু বলেছিল?

জ্যোতিঃ। এক বৃদ্ধার কথা বলেছিল—কিন্তু—

রস। বৃদ্ধা! অ্যাঁ বৃদ্ধা! পাজীকে পেলে হ'ত একবার, তার ঘাড় মটকে রক্ত খেতুম।

(মাতাল অবস্থায় চিৎকার করিতে করিতে লাটিমপ্রসাদের প্রবেশ)

লাটিম। সত্য হে! প্রেম হে! তোমরা কোথায় আছ হে। আমার পিণ্ডি চটকাও হে!—

রস। এই যে পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছি—

জ্যোতিঃ। নবজীবন! নবজীবন!—

লাটিম। চুপ কর, কথা কয়ো না আমার প্রেমের উদ্রেক হয়েছে।

রস। (গলা টিপিয়া ধরিয়া) তবে রে মুখপোড়া বাঁদর বহুরূপী সেজে বুজরুকী দেখাবার আর জায়গা পাও নি! আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।

টীকা। পাহারাওলা! পাহারাওলা!——পুলিস! পুলিস!—

নিদ্রা। আহা কি করেন—একটু সবুর করুন না—আচ্ছা নবজীবনবাবু আপনার টাক আর দাড়ী কি হ'ল?

রস। ঠিক বলেছ নিদ্রাবিলাস—দিয়ে আয় মুখপোড়া তোর টাক আর দাড়ী—নইলে একটা বাঁ পায়ের লাথীতে তোর পিলে ফাটিয়ে দেব।

লাটিম। টাক আর দাড়ী? আমি সঞ্জীবনীপুরবাসী আমার কোন কালে টাক আর দাড়ী ছিল না। ওঃ হোঃ আমি মিথ্যা কথা বলেছি—আমি মিথ্যা কথা বলেছি।

(ঝিলের জলে ঝম্পপ্রদান করিল)

জ্যোতিঃ। চল বোন আমরাও বিদায় হই।

(জ্যোতিঃ ও কুহেলী ঝিলের জলে ঝম্পপ্রদান করিল)

টীকা। তাই তো এরা সব জলে ডুবে মলো না কি? পাহারাওলা। পুলিস! fire brigade!—High Court of judicature at Fort William in Bengal!

নিদ্রা। আহা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দেখুন না কি হয়! ওই দেখুন জলটা আবার নড়ে উঠলো—

(লাটিমপ্রসাদ নিজের পুরাতন আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জল হইতে উঠিয়া আসিল)

টীকা। Hallo! What is this!

লাটিম। এই যে প্রেয়সী রসগোল্লাময়ী and my friend Mr টিকারাম, আমি আমার দাড়ি এবং টাক নিয়ে ফিরে এসেছি। আমি নবজীবন চিরযৌবন হারিয়েছি বটে কিন্তু নিজেকে এবং তোমাকে যে ফিরে পেয়েছি এই আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি।

যবনিকা

নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভাবাভিব্যক্তি

জনৈক লোক। ওহে একটা পয়সা দাও না!—দৃশ্য

(প্রফুল্ল)

(ডি, রতন এণ্ড কোং-র সৌজন্যে।)
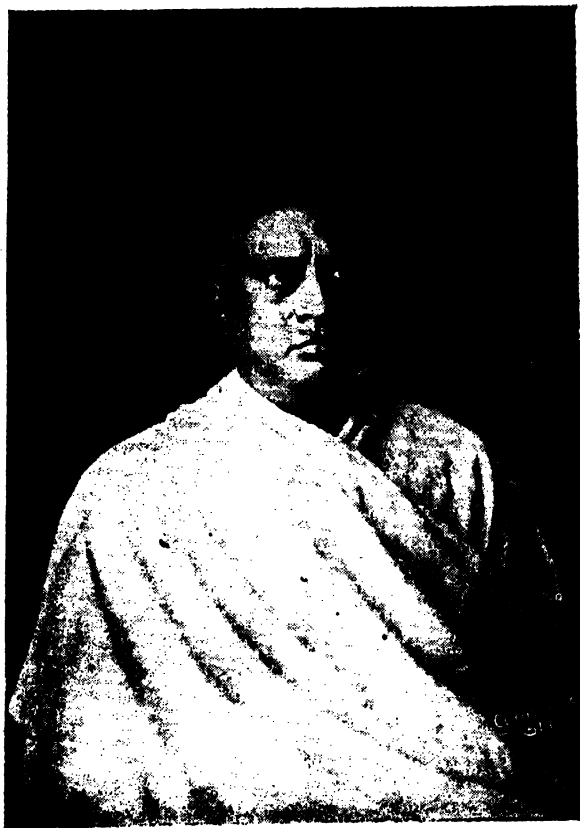
রসাবতার—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।

(হাস্য-রসাভিনয়ে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে ইঁহার সমকক্ষ অভিনেতা নাই বলিলেও চলে)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দে।

নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
(নৃত্য-শিক্ষায় ইনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন)

শ্রীমতী শশিমুখী।

(উদীয়মানা অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনি অন্যতমা)

প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

(ইনি বহুদিন হইতে বহু অভিনয়ে অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইতেছেন)

খ্যাতনাম্নী শ্রীমতী প্রকাশমণি।

(ইঁহার অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন)

নয়ন-মোহন

স্কুল বয়

ইস্কুলেতে পড়ি বটে
চালাই মোটর গাড়ী,
ক'দিন পরে এরোপ্লেনে
দিব সাগর পাড়ি।

টেকো চশ্‌মা

যাহো'ক একটা নতুন কিছু
করাই যখন চাই—
চৌকো চশমা এঁটে এবার
গড়ের মাঠে যাই।

প্রেমেশ বাবু

প্রেমেশ বাবুর নয়ন বেয়ে
বহে প্রেমের ধারা,
চশমা এঁটে কস্‌মেটিকে
গোঁফেতে দেন চাড়া।

কেরামতি গ্লাস

আরে আরে হো হো
কিয়া মজাদার,
বিল্‌কুল্ মাৎ কিয়া বড়দিনের বাজার!

সর্ট-লং কমবাইণ্ড্

পর্দ্দানশিন্

ঘোমটা পড়পড় — আধেক খোলা
বিদুষী বিলাসবতী বিলাত যাবেন,
নয়ন ঢুলু ঢুলু—মরি কি মিঠা,
অধুনা এহেন বিবি বহুৎ পাবেন।

রূপ-তপনের তীব্র তেজে
চোখ চাওয়া যে দায়,
পর্দ্দা এঁটে দিইছি এবার
চশমা দুটীর গায়।
দেখব এখন যত খুসী আর কে মোরে পায়!

লেডিশিপ্

নবশিক্ষার আলোক পড়েছে মোদের নয়নে বয়ানে,
গিরিধি কিম্বা মধুপুর যাই ছুটি হ'লে মধুচয়নে।
মোরা ছনিয়ার ধারি নাকো ধার
কাল্চার করি স্ত্রীস্বাধীনতার
বিশ্বকবির কাব্য পড়িয়া ঝরে ধারা ছুই নয়নে।

আত্মরক্ষা-চশ্‌মা

আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—তাই বেঁধেছি ঠুলি,
চক্ষুরত্ন মহারত্ন—আর কি চশ্‌মা খুলি ?

অ্যাংলো-ব্যাংলো

নাকের' উপর চশমাটাকে বসিয়ে রাখায়-দায়
এমনিভাবে দূর করেছি—ফ্যাসান্ বল্‌ছ তায় ?

অর্দ্ধচন্দ্র চশ্‌মা

অর্দ্ধমুদিত নেত্রে পত্র করিতে পাঠ
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চশমা পরিবে পত্রপাঠ ।

বৈজ্ঞানিক
মাইক্রো-চশমা

মাইক্রোস্কোপিক্ চশমা আমার অতি সায়েন্টিফিক্,
আমায় দেখে ভয় পেয়ো না—আমি বৈজ্ঞানিক !

চিপ্ কোয়ালিটি চশ্মা

সস্তা দামের চশমা পরে রাস্তা দিয়ে যাই,
জীবন-যুদ্ধে হার মেনেছি—এবার মুক্তি চাই ।

হুতুম পেঁচা
বা
সার্চ লাইট্ চশমা

অমানিশার অন্ধকারে
হুঁতুম পেঁচা হুঁমকি মারে।

চিংড়ী চক্ষু চশমা

চিংড়ী মাছের চোখ দেখেছ ? - এটা সেই প্যাটার্ণ,
এটা হচ্ছে up to date, এটা most modern.

এক-চক্ষু হরিণ

—ফাষ্ট বুকে পড়েছিলে
এক-চক্ষুর কথা—

লবদ্বীপ

—লবদ্বীপের লম্ভ আর
চশমা বাঁধা মাথা।

মিনার্ভার-জোর বরাত।

জাঁদরেল এ্যাক্টার পটলচাঁদ এ্যাক্টো করিয়েছেন।

পটলচাঁদ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

জোর বরাতের ঘটক সাহেবের ভূমিকায়—

রসাবতার—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।
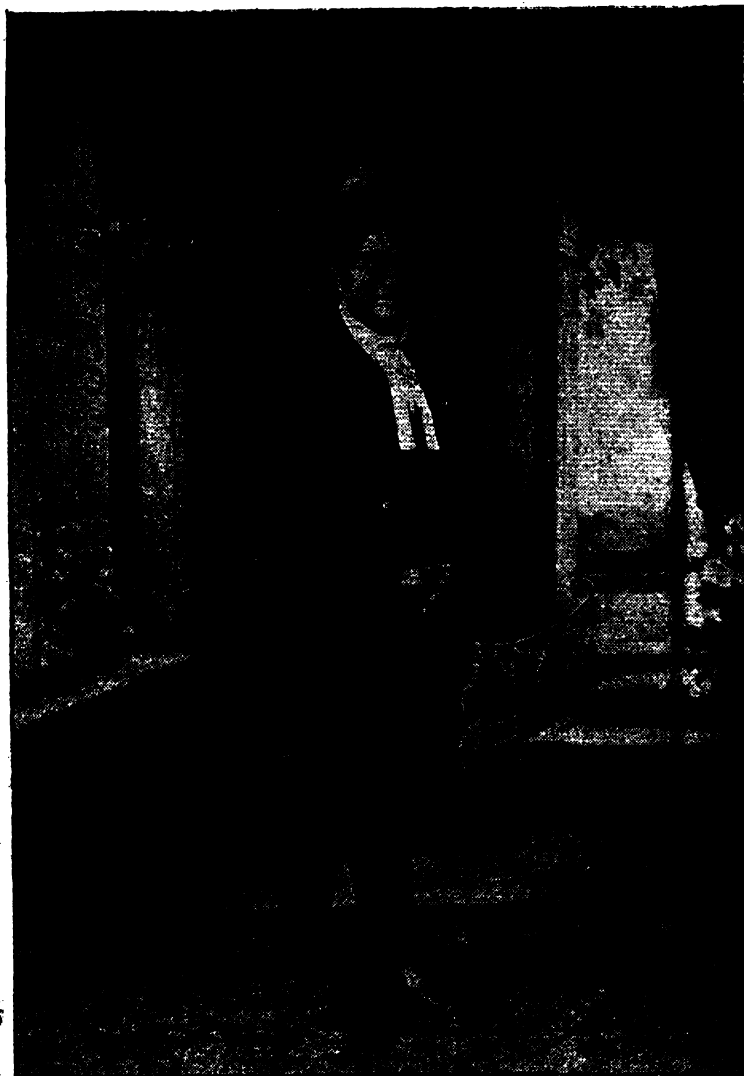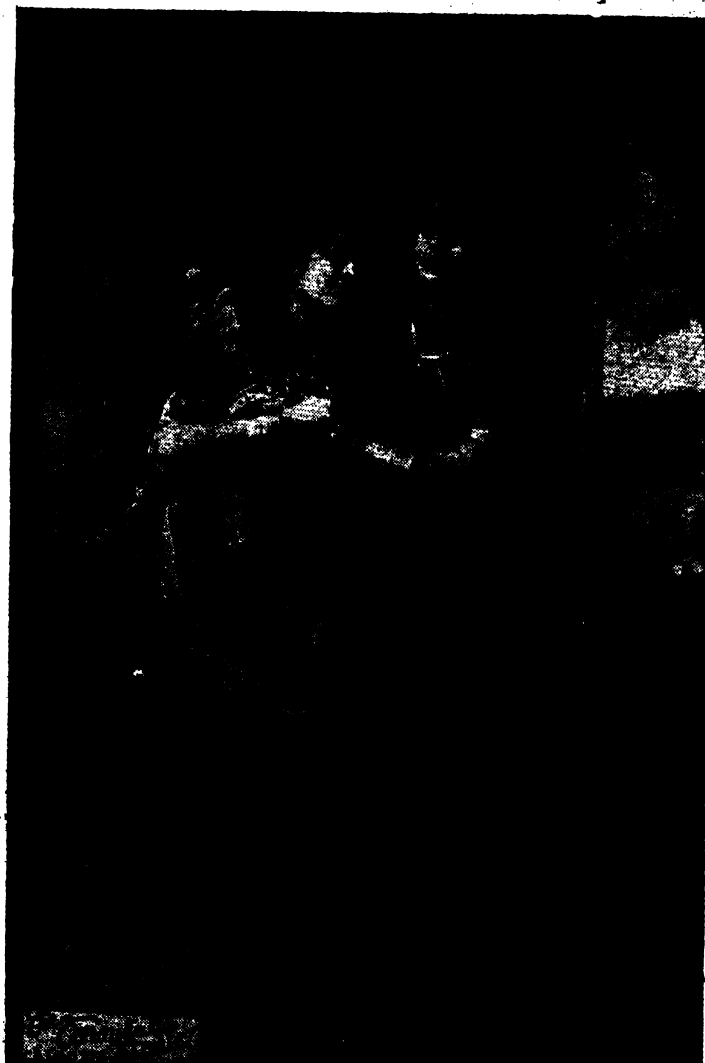
(দনুজদলনী ও প্রভা)

দনুজদলনী—শ্রীমতী শশিমুখী।

প্রভা—শ্রীমতী ননীবালা।

বর্ত্তমান ষ্টারের নট-নটী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ [দানীবাবু]

শ্রীমতী নীহারবালা

শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরাকাঙ্ক্ষা *
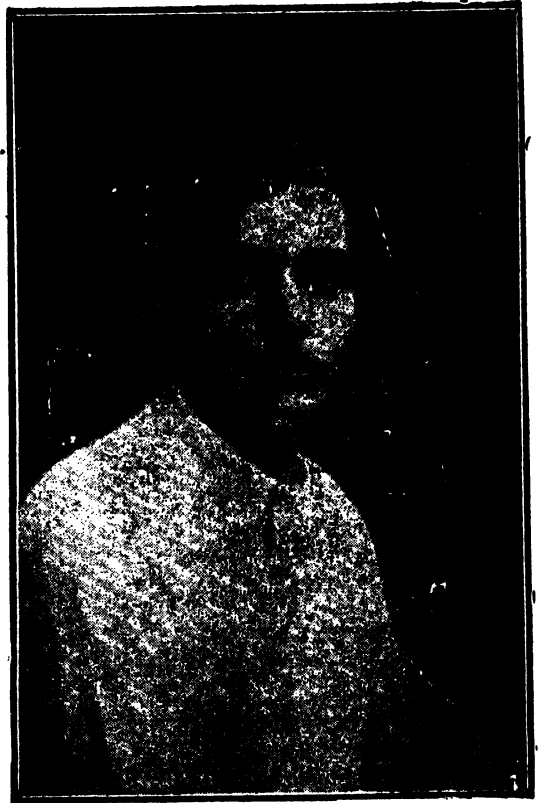
[লেখক ও শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন]

১ম পর্ব্ব —

বর্ষাকাল; সন্ধ্যে হয় হয়। সেদিন আড্ডা প্রায় ফাঁকা; আমরা মাত্র তিনজন;—শচীন হাঁটু দুলিয়ে, হাতে তুড়িতে তাল রেখে, খুব গলা খেলিয়ে অথচ গুণ-গুণ করে গাইচে,—

"আয়ে ঘনপত্তি, আয়ে মল্লারো
দুনিয়া বাহারো।"

কুমুদ সরকার খবরের কাগজ পড়চে, আর মাঝে মাঝে শচীনকে জিজ্ঞাসা করচে,—"ওহে 'সুরটা' কাওয়ালী, না ঢিমে তেতালা?" আমি ফরাসে সটান্ চিৎ হয়ে শুয়ে কড়ি-বরগা গুণচি, আর শচীনকে গানের বাকী লাইনগুলো মনে করিয়ে দিচ্চি; এমন সময় বন্ধু জীবনকৃষ্ণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"ওহে মণিরায় আছে?" আমি তার ভাব-গতিক দেখে তড়াক্ করে উঠে বসে জিজ্ঞাসা কল্লুম—"কেন হে, ব্যাপার কি?"

জীবনকৃষ্ণের মুখে সেই এক কথা,—"মণিরায় কোথায়, শিগ্‌গির বল, এর পরে সব বলব।"

অনেক জেরা করেও যখন দেখলুম, 'মণিরায় কোথায়?' ছাড়া আর কোন কথাই তার কাছ থেকে বার করা যায় না, তখন বল্লুম—"হয় বাড়ীতে নয় কারখানায়।"

জীবনকৃষ্ণ—"না, বাড়ীতে খুঁজেচি, সে নেই, আর কোথাও গেছে জান কি?" আমি—"তা বলতে পারিনে।" এই কথা শুনে জীবনকৃষ্ণ আর তিলমাত্রও দাঁড়াল না; বোধ হল সে মণিরায়ের কারখানার দিকেই যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময়েই জোরে বৃষ্টি এল। তার সঙ্গে ছাতা নেই দেখে বল্লুম—"বন্ধু বৃষ্টিতে ভিজে যেয়ো না, আমার ছাতাটা নিয়ে যাও।"

ছাতা নিয়ে যাবার কথা বলাতে, জীবনকৃষ্ণ ত চটেই লাল; মুখ ভেঙিয়ে বল্লে—"যাবার সময় পেছু ডাকলে, আর সময় পেলে না ডাকবার। এখন এক কোশ পথ হেঁটে গিয়ে মণিরায়ের দেখা পেলে হয়।" তারপর তক্ত-পোষের ওপর মিনিট-দুই চুপ করে বসে পেছন ডাকার দোষটা কাটিয়ে নিয়ে হঠাৎ উঠেই কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

"মুখ ভেঙিয়ে বল্লে——"

শচীনের গান বন্ধ হয়ে গেছল। আমি, কুমুদ ও শচীন বলাবলি করতে লাগলুম, মণিরায়ের সঙ্গে এর এমন কি দরকার থাকতে পারে? মণিরায় Automobile Engineer; জীবনকৃষ্ণের মোটর গাড়ীর ওপর কোনদিন সখ নেই। মোটর কেনবার ইচ্ছেও কখনও দেখা যায় নি। তার কথার ভাবে বোধ হ'ল, মোটর-সংক্রান্ত কোনও গোপনীয় ব্যাপারে সে মণিরায়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

যাহোক, মণিরায়ের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত যখন কিছুই বোঝা যাবে না,তখন আর কল্পনা-জল্পনা করাই মিথ্যে।

মণির একটু পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার। সে বিলেত থেকে Motor Engineering শিখে এসে এখানে কারখানা খুলেচে। বিলেতে অনেক দিন থাকলেও সে সাহেব হয়ে যায়নি। এখানে এসে পাঞ্জাবী পরে, ধুতিও পরে, ডাল-ভাতও খায়। তবে কতকগুলো বিলিতি অভ্যাস তার থেকে গেছে, যেমন—কোনও কিছুতে আশ্চর্য্য হলে শিশ দেয়, কথায় কথায় Ghosh, Rate, Blinking idiot ইত্যাদি বলে ওঠে; কোনও কথা জোর করে বলতে হলে, তক্তপোষ, টেবিল বা নিজের হাতের চেটোর উপর জোরে ঘুষি মারে। এ-ছাড়া আর কোন রকম প্রকাশ্য বিলিতি অভ্যেস তার বড় একটা দেখা যায় না।

২য় পর্ব্ব—

জীবনকৃষ্ণ কারখানায় পৌঁছে শুন্‌লে মণিরায় বাড়ী চলে গেছে। এতে প্রথমে একটু নিরাশ হল, তারপর পুনরুদ্যমে মণির বাড়ীর দিকে দৌড়ল। সে যখন মণির বাড়ীতে এসে হাজির, মণি তখন একটা বেতের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে সিগরেট ফুঁকচে, আর মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের Spark Plug তৈরী করবার মতলব ঠাওরাচ্চে।

জীবনকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ঢুকেই এক-নিঃশ্বাসে বলে গেল—"ভাই মণি, বড্ড দরকারে তোমার কাছে এসেচি; তোমার কারখানায় গিয়ে শুন্‌লুম, তুমি বাড়ী চলে গেছ, তাই সেখান থেকে আবার তোমার বাড়ীতে এলুম, তুমি ছাড়া আমার আর গতি নেই। উঃ! কি বিষ্টিটাই মাথার উপর দিয়ে গেছে।"

তার জলে-ভেজা খোড়ো-কাকের মত চেহারা দেখে মণি লাফিয়ে উঠে বল্লে;—"Your দরকার be hanged, আগে ভিজে কাপড়-জামা ছাড়, তারপর সব কথা হবে।"

জীবনকৃষ্ণ—আর কাপড়-জামা ছাড়া! তোমার কাছে Car-owners' list আছে?

মণি—Rot! Don't be a silly ass, কাপড়-জামা ছাড় আগে, একটু চা খাও, তারপর তোমার দরকারের কথা হবে।

জীবন—উঃ না, আর চা খাব না, জলে ভিজে মাথাটা বরং একটু ঠাণ্ডা হয়েচে, চা খেলে আবার এখনি গরম হয়ে উঠবে।

মণি—Queer! you are behaving like a raving maniac! কি হে, তোমার হয়েচে কি?

জীবন—আর হায়চে কি! যাক্, তুমি যখন ছাড়বে না, তখন দাও না হয় জামা-কাপড়।

জীবনকৃষ্ণ জামা-কাপড় ছেড়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে উঠল—"আমার ভিজে জামা, ভিজে জামা কই; ওর পকেটে যে আমার অন্ধের নড়ি আছে। কোথায় গেল জামা, চাকরটা নিয়ে গেছে বোধ হয়? এখনি আনিয়ে দাও।"

চাকরটা জামা নিয়ে এলে জীবন তার বুক পকেট থেকে রুমালে-বাঁধা এক টুক্‌রো কাগজ খুলে নিয়ে বল্লে—"এরজন্যেই আজ এই জল-বৃষ্টি মাথায় করে তোমার কাছে আসা।"

মণি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে তার ভাব-ভঙ্গী দেখছিল; এইবার সেই কাগজের টুকরোটা দেখে বলে উঠল—"Rummy!"

জীবনকৃষ্ণ—রামিই বল আর বামীই বল, এখন দয়া করে আমার একটু উপকার কর।

মণি—এই আধঘণ্টা ধরে কেবল দরকারের কথাই বলচ, এখন খোলসা করে বলে ফেল ত—কি দরকার?

জীবন—এতক্ষণ সবই বলতুম, তুমিই যে কেবল দেরী করিয়ে দিলে।

মণি বেতের চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে ডান পা-টা লম্বা করে ছড়িয়ে, চসমাটা নাকের উপর ভাল করে বসিয়ে বল্লে—"Bosh, now out with it man."

জীবন—তোমার কাছে Car-owners' list আছে?

মণি—আছে, কেন? Harping on the old cord still?

জীবন—আর কর্ত্ত! কর্ত্ত এখন গলায় ফাঁসী হয়ে বসেচে।

মণি সেলফের ওপর থেকে Car-owners' list টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস কল্লে—"কই, দেখি তোমার কাগজ?" জীবনকৃষ্ণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাগজখানি একবার ভাল করে দেখে, মণিরায়ের দিকে বাড়ীয়ে দিয়ে অত্যন্ত মিনতি করে বল্লে—"ভাই, এতে যে গাড়ীর নম্বরটা লেখা আছে, দেখ ত সেই গাড়ীখানা কার?"

মণি—গাড়ীর নম্বর! গাড়ীর নম্বরে কি দরকার? Going to purchase a car? কই, এ কথা ত শুনিনি! দাঁও মারলে কিসে? তা, অন্য জায়গা থেকে Second-hand car কিনবে কেন? আমার Workshop-এ কখানা ভাল ভাল গাড়ী বিক্রীর জন্যে রয়েচে। এই, একখানা Hudson Super six, run only 2,007 miles engine in splendid condition, very sparingly used; এ গাড়ী না পছন্দ কর Cole Aero-Eight নাও, luxuriously upholstered, plenty of leg room, car-এর conditionও বেশ ভাল, that's a fine car to buy, তবে এটা latest type নয়, এ car না কিনতে চাও, একখানা Seven passenger বিউইক টুরিং-কার আছে, comfortable, roomy গাড়ী; soundless, tenacious on the road—আর Buick-এর যে এঞ্জিন, that's a piece of Art; দামও বেশী নয়; কিন্তু এ সব হচ্ছে American Car. আমি ক'দিন হল একটা Wolsely কার-এর ছাশে বেশ সুবিধে দরে কিনেচি, যদি বল, তা হলে এই chassis-তে body build করে দি—sedan, cabriolet, limousine বা touring যে রকম বলবে, সেই রকম বডি তৈরী করে দোবো। বিলিতির চেয়ে কোন অংশে খারাপ হবে না, আমার work-shopএ trained মিস্তিরি আছে, দামেও বেশ—

জীবনকৃষ্ণ, মণিরায়ের এই গাড়ীর বর্ণনায় ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছিল; শেষে আর থাকতে না পেরে বাধা দিয়ে বলে উঠল—বিলেত থেকে একটি আস্ত গাধা হয়ে এসেচ। কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব দেখচি। আমার হাঁড়ির খবর তুমি জান, আমি মোটর কিনব, এ ধারণা তোমার কিসে হল? আর গাড়ীই যদি কিনব, তবে একখানা গাড়ীর নম্বর নিয়েই বা তোমার কাছে আসব কেন?

মণি—I beg your pardon, তা হলে বোধ হয় car repair এর জন্যে তুমি আমার কাছে এসেচ—engine overhaul? Valve grinding? Magneto repair? দেখ, এই Delco systemটা এখানে মাত্র দু'তিনজন আমরা বুঝি—

জীবন—চুলোয় যাক তোমার 'দেলকো সিসটেম' আর ম্যাগনিটো; আমি এলুম তোমার কাছে—

মণি—With a car number, ওঃ! আমি এতক্ষণে সব বুঝতে পেরেচি। A case of car-smash or run over, ay?

জীবন—'রাণ ওভারই' বটে। গাড়ী-চাপা আর কে পড়বে, আমিই পড়েচি, এখন যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

মণি—Dear me! তুমি এ সব কথা আগে আমায় কিছু বলনি ত, badly injured? ফ্র্যাকচার ট্র্যাকচার কোথাও হয়েচে না কি? তা হলে এখানে বসে না থেকে এখুনি একজন bone-setter'এর কাছে গিয়ে ভাল করে দেখান উচিত। আর, গাড়ীর নম্বর যখন পাওয়া গেছে, তখন ভাবনা কি; পুলিস-কেশ করলেই ওর সঙ্গে একটা damage suit খাড়া করতে হবে; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—রাস্তার wrong side-এ ছিলে না ত? Was the chap driving rashly?

জীবন—আর ড্রাইভিং! একেবারে মর্ম্মভেদ করে বুকের হাড় ভেঙে গাড়ীর চারখানা চাকাই নিঃশব্দে আমার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

মণি—Holy snakes! বুকের হাড় ভাঙা, মর্ম্মভেদ, এ সব কি বলচ? Are you as bad as that? You are joking perhaps. কই, তোমাকে দেখে সে রকম কিছু হয়েছে বলে ত মনে হচ্ছে না; তবে এটা বেশ বুঝতে পাচ্চি you are not your old-self, তোমার চেহারাটা যেন কেমন বদলে গেছে। দেখ, I am a repairer of cars, not of human limbs and parts, যদিই কিছু

দুরাকাঙ্ক্ষা

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

হয়ে থাকে; তোমার এখুনি একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত—look here, if it's a case of accident, তাহলে ডাক্তারের c rtificate-এর ওপর তোমার damage-এর দাবী নির্ভর করচে। একেবারে হাজার ছয়েক টাকা damageএর দাবীতে আদায় করে নাও, তারপর if you don't mind, তা হলে আমি বলি, ঐ টাকায় আমার কাছ থেকে একখানা car কিনে চড়ে বেড়াও, বাকীটা না হয় instalmentএ সুবিধে মত দিও।

জীবন—ডাক্তারের কাছে আমার চেয়ে তোমার যাওয়াই বেশী দরকার বলে মনে কচ্চি। না, তোমার কাছে আসাই মিথ্যে হল। ঐ নম্বরের গাড়ীখানা কার, জানবার জন্তে আমি এর আগেও, আরও দু'এক জায়গায় গেছলুম; কিন্তু তারা এমন বিশ্রী সন্দেহ করতে লাগল যে, অগত্যা তোমার কাছে আসতে হল। এখানে আসবার আমার বড় একটা ইচ্ছে ছিল না, কেন না, তোমার পেটে কথা থাকে না, আর এই ব্যাপারটা আমি আজ্ঞার কাউকে বলতেও চাই না, শুধু প্রাণের দায়েই তোমার কাছে এসেচি। একথা ঘুণাক্ষরেও কোন থার্ড্ পার্সনকে জানিও না। যাক, এখন তোমাকে কালীর দিব্যি করতে হচ্ছে ভাই।

মণি—'কালীর দিব্যি?' Rubbish!

জীবন—তা, তুমি যাই বল, তোমাকে দিব্যি গাল্‌তেই হবে। যদি বিলেত থেকে এসে ও-দিব্যিটা না মান, তবে সেখানকার সায়েবদেরই একটা দিব্যি না হয় গাল। ঐ যে তুমি নিজেই কথায় কথায় Honor bright দিব্যি কর, তাও যদি বলতে না চাও, 'আপন গড্' বল, তা হলেই হবে।

মণি—bally rot! আচ্ছা Honor bright.

জীবন—তা হলে দয়া করে ঐ নম্বরের গাড়ীখানা কা'র, বলে দাও।

মণিরায় car-owners' list খুলে ছ' হাজারের কোট থেকে আঙুল নাবিয়ে আনতে আরম্ভ করলে। জীবনকৃষ্ণ সন্দেহ, আশা, ভয়, এই তিনের মেশান ভাবে মুখখানা অদ্ভুত করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বই-এর দিকে চেয়ে বসে রইল। মিনিট-খানেক পরেই মণি বলে উঠল—"Here you are."

জীবনকৃষ্ণ অত্যন্ত আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—"অ্যাঁ, অ্যাঁ, পেয়েচ পেয়েচ, কই দেখি!" মণি, বইখানা জীবনকৃষ্ণের হাতে না দিয়ে মুড়ে রেখে বল্লে—That's an Armstrong Siddley."

জীবনকৃষ্ণ চেঁচিয়ে বলে উঠল—"গাড়ীর নাম আমি চাই না, গাড়ীখানা কা'র, তার নাম ও ঠিকানা বলে দাও, সে-সব ঐ বইয়েতে নিশ্চয়ই লেখা আছে। নেই কি মণি?"

মণি বল্লে—"আছে বই কি, এই ত্তাখ।"

জীবনকৃষ্ণ মণির হাত থেকে বইখানা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে লাগল, তারপর সেই নম্বর-লেখা কাগজখানার সঙ্গে বারবার মিলিয়ে সেই পাতাখানা ছিড়ে নিতে গেল। মণি বাধা দিয়ে বলে উঠল—"Ho'd on, don't spoil the book. টেবিলের ওপর কাগজ পেন্‌সিল রয়েচে, যা লিখে নেবার লিখে নাও, বইখানার পাতা ছিঁড় না—আমি আজ তোমার রকম-সকম কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।"

জীবনকৃষ্ণ সে কথা কাণে না তুলে কাগজ-পেন্‌সিল নিয়ে কাঁপা-হাতে, প্রতি কথাটি বারবার বানান করে লিখে, অনেকবার ভাল করে মিলিয়ে দেখে বইখানা রেখে দিয়ে বল্লে—"ঐ যে গাড়ীর নাম করলে, ওর দাম কত?"

মণি—Armstrong Siddley গাড়ী Post-war model, six-cylinder engine, saloon double phaeton body—R. A. C. rating 29·5 horse-power, Treasury tax £ ". 8. o. আগে ছিল Siddley Deasy Motor Car Co Limited. এখন হয়েচে Armstrong Siddley, এঞ্জিন সম্বন্ধে আমার ভাল জানা—

জীবনকৃষ্ণ অতিষ্ঠ হয়ে বলে উঠল—"আঃ, আবার সেই গাড়ীর বর্ণনা আরম্ভ করলে, এই বুদ্ধি নিয়েই তুমি ব্যবসা করবে?"

মণি—Why, what's up now?

জীবন—তোমার ও 'আপ ডাউন' রেখে দিয়ে এখন গাড়ীর দামটা একবার বল, শুনে চলে যাই, আমি আর এখানে বসতে পাচ্ছি না, আমার প্রাণ যেন কি রকম করচে।

মণি—Oh, price? I am afraid it's a high-priced car. আপের দাম equipped with Lucas

engine-starter, 5 lamps, 4 wheels, spare rim, 4 tyres, all wings and dash-board—সাত-শ কুড়ি পাউণ্ড—

জীবন - সাত-শ কুড়ি পাউণ্ড বিলিতি দাম, অ্যাঁ!

মণি—ও ত শুধু শ্যাশের দাম, গাড়ী complete with body—ডবল ফেটন্‌ সেলুন, ১৯২০ সালের দাম হচ্চে বিলেতে ১,০০০ পাউণ্ড, এখানে আরও বেশী packing, insurance, freight, dealer's profit, high exchange, এসব নিয়ে ওর দাম এখানে দাঁড়ায় প্রায় কুড়ি বাইশ হাজার টাকা।

আশা থাকত। কি সর্ব্বনেশে গাড়ীর নাম বল্‌লে তুমি মণিরায়—ও; !"

মণি, জীবনকৃষ্ণের ঐ কথা শুনে বলে উঠল -"Excuse me, let me correct you, ঐ নামের গাড়ীগুলোর একখানাও ওভারল্যাণ্ড ফোর্ড নয় ওর নাম উইলিস্‌ ওভারল্যাণ্ড নম্বর ফোর মডেল, আর ওটা চাবুরল্যাট নয়, —'সেভ্‌রলে'। তোমার আজ কি হয়েছে বলতে পার?"

মণিরায়ের কোন কথাই জীবনকৃষ্ণের কাণে গেল বলে মনে হল না; সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর "এক

"ওটা চাবুরল্যাট্‌ নয়—'সেভ্‌রলে'"

জীবনকৃষ্ণ শুনে চমকে উঠল, আর ভয়ানক নিরাশ হয়ে কেবলই বলতে লাগল—"হাজার পাউণ্ড-এক পাউণ্ডে পনেরো টাকা. খুব বড়লোক না হলে, এ গাড়ী কেউ কিনতে পারে না। "হায়! ঐ নম্বরের গাড়ীখানা যদি ফোর্ড বা ওভারল্যাণ্ড ফোর্ড, নিদেন পক্ষে চাবুরল্যাট হতো, তা হলেও

হাজার পাউণ্ড, এক পাউণ্ডে পনেরো টাকা," কেবলি বিড় বিড় করে এই কথা বলতে বলতে মাতালের মত টলতে টলতে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। মণির অনেক ডাকাডাকিতেও ফিরে এল না।

মণি হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তার কথা ভাবলে, তারপর

—"I love a lassie, a bonnie bonnie lassie"—শিশ দিতে দিতে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

৩য় পর্ব্ব—

মণির সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের দেখা হবার পরে, জীবন প্রায় এক হপ্তা আমাদের আড্ডায় আসেনি। সে নিয়মিত আড্ডাধারী হঠাৎ এমনভাবে ডুব মারাতে আমরা ক্রমাগত তার খোঁজ নিতে লাগলুম; কিন্তু বাড়ীতে গেলেই শুনতুম সে বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না, শুধু দিনে খাবার সময় থাকে ও রাত্তিরে এসে শোয়। মণি রোজই আডডায় আসত, তাকে জীবনকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলত—"জীবনকৃষ্ণের কাছে আমি promise-bound, তার কথা তোমাদের কিছুই বলতে পারব না।" জীবন ও মণির ব্যাপারটা আমাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকতে লাগল!

কয়েকদিন এমনি ভাবেই গেল। একদিন পুরো দমে আডডা চলচে, এমন সময় হঠাৎ জীবনকৃষ্ণ এসে হাজির। আমরা সকলে মিলে তাকে ধরে বসলুম। আমাদের হাত থেকে তার ছাড়ানছোড়ন নেই জেনে, সে সেদিন যা বল্লে তা এই,—

"প্রায় দিন-পনের আগে শ্যামবাজারের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্চি, এমন সময় দেখতে পেলুম, একটি মেয়ে দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় কি দেখচে। তাকে দেখেই মনে হল—'রূপ লাগ গেই হৃদয় হামারি।'

"সেই রাস্তা দিয়েই বরাবর যাই, কিন্তু মেয়েটিকে ত আর কখন দেখিনি। এ কার মেয়ে? কাপড়-চোপড় হাল-ফ্যাসানের মেয়েদের মত; ভাল করে আবার চেয়ে দেখলুম—তাকে কুমারী বলে মনে হল, আর সেই সঙ্গে মনে হঠাৎ একটা আশা জেগে উঠল। এইখানে আমার আগেকার কথা একটু বলে রাখি,—তোমরা বোধ হয় জান না, এক জায়গায় আমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে আছে। মা ও বাবার ইচ্ছে আমি সেইখানেই বিয়ে করি। কিন্তু মা-বাপের কথাতেই মত দিয়ে, মা-দেখে-শুনে এ রকম বিয়ে করা আমার মোটেই ইচ্ছে নয়—"

কৃষ্ণশেখর এইখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল—"তাতে দোষ কি? রামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্যে চোদ্দ বচ্ছর বনে ছিলেন।" জীবনকৃষ্ণ এই কথাতে চটে গিয়ে বল্লে—"তেমনি কষ্টও পেয়েছিলেন, সীতাকে রাবণ ধরে নিয়ে গেল, রাক্ষসদের সঙ্গে লড়াই। যাক, এসব তর্ক আর একদিন হবে।

"দশ বছরের প্যানপ্যানে ঘ্যানঘ্যানে নোলক নাকে কচি খুকীকে বিয়ে করে আনা, আর একটা টেয়াপাখী ধরে তাকে পোষ মানিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করতে যাওয়া একই কথা।

"রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় কি দেখ্‌চে"

বিয়ের এই সেকেলে প্রথাটা আমাদের দেশ থেকে উঠে যাওয়া উচিত। আগে লাভ না হয়ে বিয়ে হওয়া বিয়েই নয়। আমার বিয়েতে রোম্যান্স থাকবে, এই আমি চাই।"

এই কথা শুনে শচীন টিপ্পনী কাটলে—"তুমি গন্ধর্ব্ব বিয়ে না করে ছাড়বে না।" মণিরায় ঠোঁটে সিগারেট চেপে বলে উঠল—"Blinking idiot"! জীবনকৃষ্ণ শুনে বললে,—"তা যাই বল, তোমরা আমাকে সব কথা খোলসা করে বলতে বলেচ, তাই বলচি।"

গল্পের প্রথমেই বাধা পড়তে স্বরপতি চটে গিয়ে বল্লে— "তোমাদের ওসব কথা এখন থাক, তারপর ব্যাপারটা কতদূর গড়াল শুনি।"

জীবনকৃষ্ণ আবার আরম্ভ করলে—

"যে পাড়ায় মেয়েটিকে দেখলুম, সেখানে আমার জানা কোন লোকই ছিল না। তাকে বারবার দেখবার ইচ্ছে হলেও, ভদ্রতার খাতিরে বেশী বার দেখতে পারলুম না। প্রাণটাকে সেই বাড়ীর বারান্দায় ফেলে রেখে শুধু দেহটাকে নিয়ে পথ চলতে লাগলুম ; ভাবলুম রাত্তিরে ফেরবার সময় বাড়ীটার খোঁজ করে যাবো, কিন্তু মন মানলে না, ফিরতে হল। ফিরে এসে বাড়ীর দরজায় দেখলুম একটি Letter box টাঙ্গান রয়েচে ; তাতে লেখা, কি বাঁড়ুযো, গোড়ার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের বাড়ী দেখে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল—আমরা কায়স্থ, আর সে যে ব্রাহ্মণের মেয়ে। হায়! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল। ভয়ানক হতাশ হয়ে আবার পথ চলতে লাগলুম, এমন সময় আমার এক ব্রাদার-অফিসার দামুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—'কিহে, রাম বাড়ুয্যের বাড়ীর দরজায় কি দেখছিলে ?'

আমি—তুমি কি করে জানলে, এ কা'র বাড়ী ?

দামু—আরে আগে বলই না ছাই কি দেখছিলে, আমার কাজই হল এদিকে, আমি আর জানিনা ও কার বাড়ী ?

আমি—না, তা, এ, এমন কিছু নয়, ওঁরা কি ব্রাহ্ম ?

দামু—ব্রাহ্ম কেন হতে যাবে, ব্রাহ্মণ,—কেন হে মতলব কি ?

আমি—একটি মেয়ে ছিল জানলায়—

দামু—জানলায় মেয়ে ? ও-বাড়ীতে তিনজন ৪০।৫০ বছরের বুড়ী ছাড়া আর কোনও মেয়েই ত নেই।

আমি—এই যে আমি দেখলুম।

দামু—কাকে যে কোথায় দেখেচ তা বলতে পারলুম না, কিন্তু ও-বাড়ীতে কম বয়েসের কোন মেয়েই নেই— ওঃ হয়েচে রামবাবুর এক বন্ধুর বাড়ীর মেয়েরা প্রায়ই ওঁদের বাড়ীতে আসেন, তাঁদেরই কাউকে দেখেচ বোধ হয়।

আমি—তাঁরা কি, বলতে পার ? এই, এই কায়স্থ কি ?

দামু—অতশত খোঁজ রাখি না, সন্ধান করে দেখনা তাঁরা কি—

এই বলে একটু মুচকে হেসে সে চলে গেল। আমি আবার আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে পথ চলতে লাগলুম, আর ভাবতে লাগলুম, কা'র কাছে এঁদের খোঁজ পাওয়া যায় ? রাম বাঁড়ুয্যেকেই বা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি কি করে ? এটা বোধ হয় ভদ্রতাসঙ্গত কাজ হবে না। তারপর রোজ সকাল-সন্ধ্যে ঐ রাস্তা দিয়ে আনাগোনা করতে লাগলুম, আশা – যদি সেই মেয়েটিকে আর একবার দেখতে পাই। শেষে আর থাকতে না পেরে,—যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে - একটু সেজেগুজে, একদিন দুকুরবেলা রাম বাঁড়ুয্যের বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। কড়া নাড়ব কি কাউকে ডাকব—এই কথা ভাবচি, এমন সময় ঘাড়ে-গর্দানে-এক, ভাঁটার মত গোল, এক মেদিনীপুরী ঝি, সেই বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে, আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল— 'ছঁড়া কে গো,চোর হবে বা বটেক,পুলুষ ডাকব না কি গো।'

আমি তার সেই কথা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম ; সেখান থেকে পালাব কি থাকব, ঠিক করতে না পেরে, ভাবলুম টাকার লোভ দেখালে বোধ হয় কাজ হতে পারে। বল্লুম, 'ওগো ঝি, আমি চোর-টোর নই, রাম-বাবুর ছেলের একজন বন্ধু, একটু দরকারে এসেচি, তোমাকে একটা টাকা—'

আমার কথা শেষ হতে পেলে না। ঝি-টি দরজায় দাঁড়িয়ে বার কতক যেন নেচে নিলে, তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল—'কেশবা রাউলের ম্যাইয়াকে টাকা দেখাও বটেক ? পনর বছরে রামবাবুর ছেলিয়া দেখলুম নি, আর আজ হল ছেলিয়া! বাবু হয়ে আসচ বটেক, পাক্যা বদমাস! এ দাম্যো! দাম্যো!

ঝি-এর এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখে সেখানে দাঁড়ান আমি মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে করলুম না। দেখলুম সে আমাকে চোর বলে ঠাউরেচে। আর ঐ টাকার কথায় আরও কিছু যে ভেবেচে, এতেও কোনও সন্দেহ নেই। তার চেঁচামেচিতে

"কেশবা রাউলের ম্যাইয়াকে টাক্কা দেখাও বটেক ?"

রাস্তায় দু' একজন লোকও দাঁড়িয়ে গেছে। আমি তারি বে-গতিক দেখে, ফ্যাসাদে পড়বার ভয়ে সেখান থেকে সরবার উপক্রম করচি, এমন সময় সেই তেলের কুপোর মতন দেহ থেকে বিকট চীৎকার উঠল 'আরে এ দামো! দামো! ত্যাকরা ছঁড়া যে পালাতে নাগল প্রায়, এ পুলুষ, পুলুষ,—'

আমি আর কিছু শোনবার অপেক্ষা না করে একেবারে চোঁচোঁ দৌড় মারলুম।

রামবাবুর বাড়ীর পথ ত বন্ধ হল, এখন কি করি? অথচ মেয়েটির খোঁজ নেবার কোন বুদ্ধিই আর মাথায় এল না। এমনি করে আরও কয়েক দিন গেল। একদিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে যাচ্চি, দেখি প্রায় হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস্ দূরে

একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী যাচ্ছে, তার মধ্যে সেই মেয়েটি বসে- সে যেন আমার চোক ঝলসে দিয়ে চলে গেল। গাড়ীখানা, আর তার সাজসজ্জা দেখে আমার ত একেবারে বুদ্ধিলোপ হল। কিন্তু, আর একটি আশা এল, গাড়ীখানা ঐ মেয়েটির না-ও হতে পারে, এমন কতলোকের গাড়ীতে কত লোক বসে যায়। হায়! হায়! যদি গাড়ীখানার নম্বর আছে। তা না হলে যার নামধাম জাত জানা নেই, তাকেই বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠো?"

যতীনের কবিতা আওড়ান একটা রোগ। সে এই ফাঁকে একটা গানের কলি, রসান দিয়ে জীবনকৃষ্ণকে শুনিয়ে দিলে,—

"আমি একটা হস্তী-মূর্খ"

দেখে নিতুম, তা হলে সব খোঁজই পেতুম, এ বুদ্ধি তখন আমার ঘটে এল না, মনে মনে ভাবলুম—আমি একটা হস্তীমূর্খ!"

সুরপতি ঠোক্কর মারলে—"তা ত চিরকালই জানা

কি জাতি কি নাম ধরে,
কোথায় বসতি করে,
আমি ত চিনিনে তারে
চেনে মোর দুনয়ন!"

জীবন মনে কত কথাই আসতে লাগল, মনকে বোঝাবারও চেষ্টা করলুম দেখলুম মন অবুঝ। সে কেবলই বলে, 'ও স্বজাত, স্বজাত, ধনীর মেয়ে নয়, ও-গাড়ীও ওর নয়, ওকে পাবে, পাবে!' এই সব নানারকম কথা ভাবতে ভাবতে চলেচি, এমন সময় কে বলে উঠল – 'এ বাবু, তেরে মনমে কিসিকা খ্যাল লগা হুয় '

ফিরে দেখি, ফুটপাথের ওপর একজন গণৎকার বসে ঐ কথা বলচে! গণৎকারের কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। ঠিকই ত বলেচ, আমি ঐ মেয়েটির কথাই ত ভাবতে ভাবতে চলেচি। তার ওপর বড়ই ভক্তি হল। কাছে যেতেই সে বল্লে—'দেখে বাবু তেরা হাত?'

আমি তৎক্ষণাৎ তাকে পাঁচ সিকে দিয়ে বললুম—'ভাগ্য প্রসন্ন হবে ত?'

গণৎকার—

'হোলী কি রাতকি জাগার বিদ্যা
নয়না যোগিন, কামচ্ছা দেবী,

হোবে বাবু, ঠিক হোবে, দেখে তেরা বায়াঁ হাত?'

আমি বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলুম, সে দেখে বলতে লাগল—'কুছ্ অঘ্টন্ সে সাদী হোগা, স্ত্রীভাগসে বহুৎ ধন মিলেগা, ওয়াহ্ ওয়াহ্ য়্যাসা হাত মে কিসিকা নহি দেখা।'

তারপর সে যে কি বলে গেল, তা আমার কাণেই গেল

"অঘটন্ সে সাদী হোগা"

আমি বসে হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম। সে অনেকক্ষণ দেখে বললে—'তেরা গ্রহ অভি প্রসন নহি হয়, শান্তি করনে সে ভাগ প্রসন হোগা, বাবা বৈজনাথকে পূজা কে লিয়ে বিশ গণ্ডা দে দেও, হাম্ গ্রহ শান্তি করেঙ্গে, যিস্ সে তেরা ভাগ খুল যায়গা মনোকামনা সিধ হোগা।'

না, আমি কেবলই ভাবতে লাগলুম—'অঘ্টন সে সাদী হোগা।'

হাত গোণাবার দিন-কয়েক পরে, আমি মামার বাড়ীতে পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম সেই গাড়ীখানা আমার কাছ থেকে প্রায় হানড্রেড ইয়ার্ডস্ দূরে এসে থেমেচে

আর তার মধ্যে থেকে সেই মেয়েটি নাবচে। আমি তন্ময় হয়ে মেয়েটাকে দেখতে লাগলুম। মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলে যেতেই আমার চমক ভাঙ্গল। তারপর দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, গাড়ীর নম্বরটা নিয়েই আডডায় মণিরায়ের সন্ধানে আসি। এখানে না পেয়ে কারখানায় যাই, সেখানে সে নেই দেখে তার বাড়ীতে গিয়ে তার কাছ থেকে গাড়ীখানা কার জানতে পারি। সেই দিনই এক রকম নিরাশ হয়েছিলুম। তবুও শেষ আশায় নির্ভর করে, গাড়ীখানা যার, তার বাড়ীটা অনেক খুঁজে বার করি। তারা খুব বড়লোক, আমাদের স্বজাতিও বটে, কিন্তু আমার মতন অবস্থার লোকের সে বাড়ীর মেয়েকে বিয়ে করবার কল্পনা করাও দুরাশা।" এই বলে জীবনকৃষ্ণ চুপ করলে। তখন রাত্রি ন'টা বেজে গেছে। সবাই উঠে বাড়ী চলে গেল, আমিও উঠে পড়লুম। জীবনকৃষ্ণ তক্তাপোষ থেকে নাবতে নাবতে হঠাৎ বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে বলে উঠল—'এত দিনে আমার সব আশা নির্মুল হল।'

আমি অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিলুম। এই ঘটনাটি ঘটে প্রায় এক বছর আগে। জীবনকৃষ্ণ এখন মোটর গাড়ীর নামে হাড়ে চটা। সে যদিও মুখে বলে—'আমি সব আশা এখন একেবারে ত্যাগ করেছি,' কিন্তু আমারা গোপন অনুসন্ধানে জেনেছি প্রকাশ্য-ভাবে আশা ত্যাগ করলেও, সে মনে মনে একেবারে আশা

"সব আশা নির্মুল হ'ল"

ছাড়ে নি। সে এখন ভয়ানক 'রেস্' খেলতে আরম্ভ করেচে, ইচ্ছেটা এই,—রেসে তার অদৃষ্ট ফিরিয়ে তারপর সেই মেয়েটার দিকে হাত বাড়ানো। হায় দুরাকাঙ্ক্ষা!

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

মাইকেল মধুসূদন

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
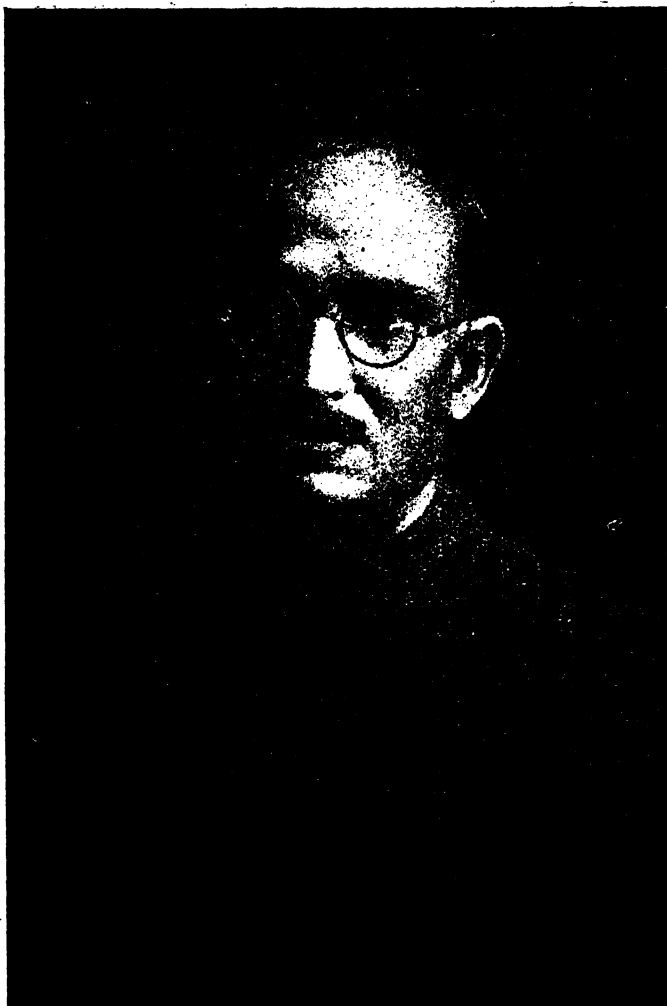
শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দোপাধ্যায়

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

৺রাজকৃষ্ণ রায়

খিচুড়ী ভ্রমণ

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

আপনারা হিমালয়-ভ্রমণ পড়িয়াছেন, দিল্লী-লক্ষ্ণৌ-কানপুর-ভ্রমণ পড়িয়াছেন; বিলাত-ভ্রমণ পড়িয়াছেন, ইয়ুরোপ ভ্রমণ পড়িয়াছেন, এমন কি আমার মোটরে মধুপুর ভ্রমণটাও কুইনিন খাওয়ার মত করিয়া পড়িয়াছেন—কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আপনারা খিচুড়ী ভ্রমণ কখনও পড়েন নাই। ইহাও আমি জানি যে খিচুড়ী প্রদেশটির অবস্থান সম্বন্ধেও আপনাদের কোন জ্ঞান নাই—সত্য কথা ভ্রমণ কাহিনীতেও কতকগুলা উপাদেয় (?) সংবাদ আছে, তদ্ধেতু আমিও ইহার নাম করণ করিয়াছি খিচুড়ী-ভ্রমণ। অনেকগুলা স্থান একচোটে দেখিয়া ফেলা গিয়াছে, মস্তিষ্কে সকলগুলি মিলিয়া মিশিয়া সিদ্ধ হইয়া খিচুড়ী-বৎ অবস্থায় উপনীত সুতরাং উহার অন্য নামকরণা করা অনুচিত। আপনারা মার্জনা করিবেন।

"মোটরে মধুপুর" গিয়া কয়েকদিন পরে আমি ও সুহৃদ্বর

খিচুড়ী ভ্রমণকারীগণ।

বলি শুনুন, মহাশয় এবং মহাশয়গণ, ঐ প্রদেশটির বিষয়ে আমি আপনাদের অপেক্ষাও অধিক অজ্ঞ। আমি ঐ নামে একটি খাদ্য-দ্রব্যের সহিত পরিচিত; চাল, ডাল, ঘৃত, লবণ, আলু, ডিম্ব, কপি (শীতকালে ও বর্ষাকালেই উপাদেয়) সহযোগে সেই দ্রব্যের উৎপত্তি; বোধ করি অনেকগুলা জিনিষ মিশাইয়া লইতে হয় বলিয়া সেই উপাদেয় পদার্থের ঐ কদর্য্য নাম হইয়াছে। আমার এই সুধাংশুশেখর ট্রেণে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলাম। দিন পাঁচেক পরে আমরা দু'জন ত পুনর্যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম-ই, ভাগ্যক্রমে আমাদের শ্রীমান ভোঁসও ট্রেণে আসিয়া আমাদের সঙ্গেই আবার যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন! আরও দুইটি সঙ্গী এবার পাওয়া গেল। তন্মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী; ইনি মধুপুর যাইতেছিলেন রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের কর্ণার্জ্জুন অভিনয়ের শিক্ষক হইয়া,

আমাদের সঙ্গী হইয়া পড়িলেন। অপরজন আমাদের অনুজ-স্থানীয় "বাবু"—ইনি শিশিরকুমারের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। বাবু বয়সে বালক হইলেও সবদিকে হুঁসিয়ার বলিয়া তাহাকে আমরা 'গার্জেন' বলিতাম। এ খেতাবটা গত বছর দার্জিলিঙে তাহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের জামার বোতাম ছিঁড়িয়াছে—'বাবু'! কাপড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—'বাবু'; কোন্ দিকে বেড়াইতে যাওয়া যায়, ডাকো বাবুকে!

কে-পি রেস্তোঁরা আমাদের জন্ম কিছু স্যাণ্ডউইচ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা ট্রেণে উঠিয়াই ভোঁদ-সাহেবের জালিয়া কদাপি শয়ন করিবে না। তিনি ডাক্তারের আদেশ লঙ্ঘন করিতে অক্ষম।

যদিও এ-খানি রেলওয়ে ট্রেণ তথাপি ইহাকে গাধাবোট বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত! যদি বা অতি কষ্টে পাঁচ সাত মিনিট লেট্ করিয়া হাওড়ার মায়া ছাড়িল, লিলুয়ায় আসিয়া ধকাস; আবার কঁপা চলিয়া ধকাস্; আবার—আবার! এ-রকম ট্রেণে ঘুম হওয়া একরূপ অসম্ভব। আমি এ কথা বিশেষরূপে প্রমাণ লইয়াই বলিতেছি, রেল কোম্পানী চটেন, নাচার! এই দেখুন-না আমাদের ভোঁদ, ভোজনে যিনি ভীম, নিদ্রায় যিনি কুম্ভকর্ণ—তিনিই জাগিয়া রহিলেন। গার্জেন

বরাকর নদীর সন্নিকটে।

লোলুপদৃষ্টি (!) হইতে সেগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ম আমাদের গার্জেনের কাছে জিম্বা দিয়া, রাত্রির মত যে-যার বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম। অহীন্দ্র চৌধুরী আজকালকার দিনের একজন নামজাদা অভিনেতা; তিনি খানকতক বহি বাহির করিয়া মাথার কাছে রাখিয়া, পড়িবার উদ্যোগ করিতেই কর্মনাশা ভোঁদ নিঃশব্দে উঠিয়া বাতী বুতাইয়া দিলেন। অহীন্দ্র বাবু অনেক অনুযোগ করিলেন, সকলই বৃথা হইল। ভোঁদ বলিলেন, তাঁহার ডাক্তারের আদেশ আছে, আলো ছেলেমানুষ, মাথার পাশে পাখা খোলা পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নাসিকাগর্জনের শব্দ পাইয়া ভোঁদের দুষ্টবুদ্ধি জাগিল—আর একটা জিনিষ বোধহয় আগেই অন্তত্র জাগিয়াছিল;—তিনি আলো জালিয়া স্যাণ্ডউইচের বাণ্ডিলটি নামাইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়াই ভক্ষণ করিতে সুরু করিয়া দিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে তিনি এই অধীনের কুটীর হইতে খুদকুঁড়া সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন, সকলেই তাহা অবগত ছিলেন,তাই তারস্বরে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু তিনি আমাদের সদাশয় রাজসরকার! প্রতিবাদ কর, চেঁচাইয়া মর, হামারা 'রস্তা!' তখন প্রতিবাদে গলা ভাঙ্গিয়া সময় নষ্ট করিতে কাহারই প্রবৃত্তি হইল না, সকলেই 'যদ্যপি কিঞ্চিৎ মিলে' করিয়া অগ্রসর হইলেন। তিন চতুর্থাংশ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; এক চতুর্থাংশ ছিল, তাহাও কাড়াকাড়ি করিয়া লইতে হইল। বরফ লেমনেড খাইতে খাইতে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়া নজর পড়িল, নিদ্রিত গার্জেনের প্রতি! ভোঁস ত আধহাত জিহ্বা বহিষ্কৃত করিয়া মা কালী হইলেন; সুধাংশু বাবু চাদর-তলে; আমি আর অহীন্দ্র বাবু ভোঁসকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া গার্জেনের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভোঁস আমাদের মতলবটা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন বোধহয়, ভোর হইতেই গার্জেনকে' ডাকিয়া উঠাইলেন এবং ফার্ষ্ট ব্রেক করিবার জন্য স্যাণ্ডউইচের বাণ্ডিলটি চাহিয়া বসিলেন। ভোঁস কাগজের মোড়কটিকে সুবিন্যস্ত করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন, গার্জেন মোড়কটিকে লইয়া ভোঁসের হাতে দিলেন ও বাঙ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া বসিলেন। গম্ভীরভাবে মোড়কটি খুলিয়া ভোঁস তাঁহার দিকে চাহিতেই তাঁহার মুখের যে অবস্থা হইয়া গেল, লিখিয়া বুঝাইবার মত শক্তি আমার নাই; সুধাংশুশেখর একখানা ফোটো যদি তুলিয়া লইতেন, তবেই বুঝান যাইতে পারিত। গার্জেন অ-কৃত অপরাধ স্খালনের বহু চেষ্টা করিলেন, শেষা-শেষি কাঁদ কাঁদও হইলেন কিন্তু তাহাতেও ভোঁসের দয়া হইল না। সেদিন আবার গাধাবোটখানি তিনঘণ্টার উপর দেরী করিয়া গড়িমাসি করিয়া চলিতেছেন, সময়টা ত কর্ত্তন করিতে হইবে, আমরা ভোঁসকে সমর্থনই করিয়া চলিলাম। 'গার্জেন' রাগ করিল, চা খাইবে না, রুটী-ডিম-কলা কিছুই সে খাইবে না, উপবাস করিয়া থাকিবে, বলিল। ভোঁস বলিলেন, দুই তিন ডজন স্যাণ্ডউইচ একলা খাইলে দুই চারি দিন উপবাস দিতেই হয়! কাজেই গার্জেন সামান্য-কিছু খাইলেন,তাহাতেও নিস্তার নাই; 'দু'চারখানা খাইলেই পারিতে, ছেলে মানুষ, অত সহ্য করিতে পারিবে কেন?' অতঃপর কলা-আতা গার্জেন কিছু অধিকমাত্রাতেই খাইল। বেচারী উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছিল, যেদিকে যায়—The wolf ঐ নেকড়ে!

সাড়ে দশটায় গর্দ্দভ-তরণী খানি মধুপুর পৌছিল, ষ্টেশনে শিশিরকুমার ও ধীরেন্দ্র পাণ্ডে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী আসিতেছেন, রেলকর্ম্মচারীমহলে তাহা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে থিয়েটার করার সখ যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা ষ্টেশনে হাজির ছিলেন। একটা খুব সোর-গোল পড়িয়া গেল। সময়ান্তরে তাঁহাদের থিয়েটা-রের আখড়ায় আসিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়া চৌধুরী মহাশয় আমাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। খিচুড়ী ভ্রমণের প্রথম প্রস্থ শেষ।

দিন দুই তিন চর্বচুষ্য ভোজন ও চব্বিশঘণ্টা শয়ন করিয়া কাটিল; তারপর হঠাৎ একদিন 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' হইয়া গেল। সব মিলিটারী! এই করিতেই কি দল বাঁধিয়া আসা গিয়াছে? কোথায় মোটরে হাজারীবাগ, রাঁচী বেড়ান হইবে, হুড্রু দেখা হইবে, উশ্রী দেখা হইবে, পরেশ নাথ পাহাড়ে উঠা হইবে, তা নয়, আহার এবং নিদ্রা! যে সব কার্য্য করার জন্য মনুষ্য পশু হইতে কিছুমাত্র 'credit'—গৌরব—পাইতেই পারে না! আপনারা 'মোটরে মধুপুর'-এ পড়িয়াছেন যে কমলাশ্রমে শিশিরবাবুর আস্তানায় অনেকগুলি ব্যাঘ্র-হন্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। 'মোটা তাকিয়ায় দিয়ে ঠেশ, স্বাধীন করিতে দেশ' তাঁহারা যেমন উদ্যোগী, বাড়ীর বাহিরে শ্রীচরণ না-বাড়াইতেও তাঁহাদের তেমনই ঐকান্তিক যত্ন! অথচ মুখে তাঁহারা 'হোতে পার্ত্তাম' গোছের ভীষণ বীর!

কেহ কেহ প্রত্যহ মুরগী খাইলে স্বাস্থ্য কিরূপ সুস্থ থাকে, দিবা নিদ্রায় শরীরে কি চমৎকার সুফল পাওয়া যায়, বৈকালের দিকে হার্লটাঁরে অথবা পাথর চাপটীর দিকে মোটরে একটু হাওয়া খাইয়া আসিলেই যথেষ্ট বেড়ান হইয়া যায়—ইত্যাদি বিষয়ক বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় উত্তেজনাটা জাগাইয়া দিয়াছিলেন মাত্র; জাগিয়া উঠিলেন শ্রীযুক্ত সুধাংশু চট্টো! চট্ করিয়া চটিয়া উঠিয়া হাঁকিলেন—'আবার তোরা মানুষ হ!' যাওয়া চাই-ই! অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সানায়ের মত বাজিতে লাগিলেন—না, না যাইতে হইবে বৈ-কি! অহীন্দ্রবাবু আমাকে দলে টানিয়া 'পুষ্ট' হইবার চেষ্টা করিলেন; আমি

বলিলাম, আমি ছু'য়েতেই আছি ভাই ; যাও—যাব ; না যাও, খাও ঘুমাও, বাঘ-মার, আমি তোমা ছাড়া নই ! ভোঁস নির্বাক, নিশ্চল। তাঁর অবস্থা 'খিদে পেলেই খাই, আর ঘুমটি এলেই বাঁচি'—গোছের! তবে তাঁহার মতের কোন মূল্যই আমরা কোনদিন ধরি নাই ; কারণ আমাদের সঙ্গ ছাড়া একদণ্ড থাকিবার যো তাঁর ছিল না, থাকিতে পারিতেনও না। মুখে যাই বলুক আর যাই করুক, যথাকালে সচল পর্বতটি ঠিক মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবেই ! আমাদের গার্জেন গৃহ-রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন, আমরা আপাততঃ পরেশনাথ দর্শন করিতে মনস্থ মিলে নাই ! তাঁহাকে তখন 'উপর' হইতে নামান এক অতি নির্দয় কার্য্য, ডাক দিয়া পাপ সঞ্চয় এবং দুর্নামের ভাগী হইতে আমরা চাহিলাম না ; অহীন্দ্র চৌধুরী থিয়েটারের অভিনেতা, সু-নাম ত তাঁহার থাকিতেই পারেনা—(আগেকার কালে শুনি, থিয়েটারের অভিনেতাদের জাত ছিল না, ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়া দুঃসাধ্য ছিল) তিনিই নাক-কাণ বুজিয়া ডাকাডাকি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মিত্রজা-মহাশয় ননির মত (মোটরে মধুপুরের) একটি পেগি ব্যাগ (ননিরই ভগ্নীপতি তিনি) বাহাদুরের ঘাড়ে চাপাইয়া দর্শন দিলেন। বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিলেন, তিনি পথে প্রয়োজনীয় পাঁওরুটী, ডিম, চা, মাখন ইত্যাদি

সীতা নালায়।

করিলাম। বেলা তখন ১টা, যখন রেজোলিউসন্ পাশ হইল ; তখনও আহারাদি বাকী। কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে! মন যখন চলে, তখন কোন বাধাই বাধা নয়! খাওয়া দাওয়া সারিয়া, ছোট খাট এক ঘুম দিয়া ক্ষৌর কার্য্য করিয়া লইয়া জামা-কাপড়ে সজ্জিত হইয়া রাধাবিনোদকে মোটর বাহির করিতে বলিয়া আমার চারজন (সুধাংশু, ভোঁস, অহীন্দ্র ও অধীন) মিত্র মহাশয়কে ডাকাডাকি করিতে লাগিলাম। মিত্রজা তখন 'উপুরে।' দেরী দেখিয়া শঙ্কা হইল, বুঝি 'অনুমতি' গুছাইয়া লইতেছিলেন। সাধু, সাধু! বাহাদুর সঙ্গে যাইতেছে সুতরাং একটা কুঁজা-গ্লাস, একটা বড় গ্যাসের আলো লইয়া খিচুড়ী ভ্রমণকারীগণ মোটরে উঠিলেন।

মধুপুর ষ্টেশনে আসিয়া মোটর ছাড়িয়া ট্রেণ ধরা গেল। এই ট্রেণে গিরিধি গিয়া আজ রাত্রিটা কোথাও নিশিপালন করিয়া কাল পরেশ নাথ পর্বত যাত্রা করা যাইবে স্থির হইল। কিন্তু নিশিপালনটা করা যাইবে কাহার আশ্রমে? গিরিধি পৌঁছিবার পূর্বেই ত নিশা আসিয়া পড়িবে, তখন 'দিশা'

পাওয়া যাইবে—ত? গিরিধিতে আমার সাহিত্যিক-ভগ্নী সরসীবালার বাড়ী আছে, কয়েকবার তিনিও আহ্বান দিয়াছিলেন কিন্তু আজ হঠাৎ রাত্রিকালে এতগুলি অযাচিত অতিথি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করা উচিত কি? কি জানি কেন, এরকম ভাবে অতিথি হওয়াটা নিজেরই মনঃপূত হইল না, অন্যের নিকট বলি কেমন করিয়া? চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, গিরিধিতে শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্রের অভ্রের কারখানা আছে; তৎসংলগ্ন অতিথি আবাস ইত্যাদিও আছে তবে কুমারবাবু ইয়োরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, 'এই যা!' কথাটা প্রায় সেই রকম হইল না যে, সর্ব্বস্ব তোমার, চাবি কাটিটা শুধু আমার! আছে সবই, কেবল কুমার বাবুই নাই! অহীন্দ্র বাবুর বুদ্ধির তারিফ করা গেল! আছে, তন্মধ্যে চেয়ার টেবিল আছে, তাহাতে ছারপোকা আছে; দোকানে খাবার আছে, চর্বিমিশ্রিত ঘৃতপক্ক নানাবিধ সুখাদ্যও আছে ইত্যাদি! চিন্তা করিতে করিতে মহেশমুণ্ড আসিয়া পড়িল। শুনা ছিল—মহেশমুণ্ডার জল নাকি ভারী হজমী! হাজরাবাবু রেল-কর্ম্মচারী, আমাদের সঙ্গে ইনি গিরিধি পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন,—আমাদের কুঁজার জল ফেলিয়া দিয়া মহেশমুণ্ডার হজমী-জল ভরিয়া আনিলেন। বৃথা! হজমী জল কতকগুলা খাইয়া কি শেষে স্ব-স্ব নাড়ীভুঁড়ীই হজম করিতে হইবে? চৌধুরী মহাশয় কুঁজা কাৎ করিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া প্রায় অর্দ্ধকুঁজা শেষ করিলেন। আমাদেরও জল খাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; আমরা জল না-খাইবার মূল কারণটি ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া সে কি প্রচণ্ড

সীতানালার শীত।

হ্যাঁ—তখন ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সমস্যাটাও ভীষণ জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং ভোঁসের মত বৃহদকায় ও সুধাংশুশেখরের মত ক্ষীণকায় ব্যক্তি (উভয়েই দুর্বল) সঙ্গে—এ সময় রঙ্গ-রহস্য কি ভাল লাগে ছাইভস্ম! কিন্তু চৌধুরী মহাশয় এই সময়েই রঙ্গ-রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। ষ্টেশনে ওয়েটিং রুম্ হাস্যরোল! 'আরে সেই হইয়া যাইবে'খন, পথ ত এখন সাফ করিয়া রাখ!' 'কি রকম হইবে আগে শুনি, তারপর জল খাইব।' তখন অহীন্দ্রবাবু সরল হইলেন। কহিলেন, তিনকড়িদা'র (শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী—ইনিও একজন উঁচুদরের অভিনেতা) ভগিনীপতি বিপিনবাবু গিরিধিতে থাকেন; কুমারকৃষ্ণ বাবুরই অংশীদার; তিনকড়ি দা'

তাঁকে বলে দিয়েছেন, We are quite welcome!' সে জল সে জল! ভোঁস্ সানন্দে সিকি কুঁজা জল গলাধঃকরণ করিলেন; ভুক্তাবশিষ্ট যাহা রহিল, আমরা কয়জনে 'চরণামৃত' করিয়া ফেলিলাম।

আমরা কলিকাতা সহরে থাকি; হঠাৎ কোনদিন রাত্রে যদি পাঁচজন অতিথি বিনা সংবাদে আসিয়া হাজির হয়, কলিকাতাতেও আমাদের যে কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপিনবাবুকে কিছুমাত্র অসুবিধায় পড়িতে দেখিলাম না। দেড়ঘণ্টার মধ্যে এমন সুচারু আহার্য্যের সামনে আমাদের বসাইয়া দিলেন যে বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। শুধু যে রাত্রির খাবারই খাওয়াইলেন তা নয়; পরদিন পরেশনাথ পাহাড়ে খাইবার মত খাবারও প্রস্তুত রাখিয়াছেন জানাইলেন। বিপিনবাবু লোকটি ব্রাহ্ম, সুপণ্ডিত; উন্নতমনা, সঙ্কীর্ণতা আদৌ নাই, সদাশিব লোক। নন্তবাবু তাঁহাদের ম্যানেজার ও আত্মীয়; ইনিও খুব সদালাপী আর সাহিত্য-রসিক। ইঁহাদের মোটর গাড়ীখানি তখনই আমাদের বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। আমরা গিরিধি সহরের চারিধার একবার নৈশভ্রমণ করিয়া আসিলাম। মুখার্জী কোম্পানীর অংশীদার মিঃ চ্যাং (আশা করি চ্যাংবাবু আমাকে মাপ করিবেন, তাঁর পোষাকী নামটি জানিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই) তিনকড়িবাবুর পুরাতন বন্ধু; তিনকড়ি বাবুর চিঠি থাকার জন্য নাম মাত্র ভাড়ায় (১২৲) গাড়ী দিতে সম্মত হইলেন। গাড়ীখানা যাহাতে আমরা খুব ভোরে পাই, তাহার চেষ্টা করিতে বলা গেল; চ্যাং বাবু বলিলেন—৭টার আগে গাড়ী পাওয়া যাইবে না; ড্রাইভাররা ৭টায় আসে; আসিয়াই গাড়ী লইয়া যাইবে। অগত্যা—তাই!

বিপিনবাবুর দুইটি ছেলে, বড়টি বড় শান্ত, লাজুক; ছোট-টি একটি রত্ন-বিশেষ। সে দুদণ্ডেই আমাদের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়া, আমাদিগকে পরম সহিষ্ণু ও রসজ্ঞ দর্শক পাইয়া তাহার অভিনয়-কলা প্রদর্শন করিতে লাগিল। নরাণাং মাতুলক্রম! তিনকড়ি বাবুর ভাগিনেয় ত! শিশু অভিনেতাটি বাঙ্গালার থিয়েটারের ছোট বড় অনেক অভিনেতার অনুকরণে অভিনয় করিয়া দেখাইল। স্পষ্টতঃ স্বীকার করিল, তাহার মাতুলকে ধ্রুবতারা জ্ঞানে সে তাহার জীবন গঠন করিয়া চলিতেছে; তাহার চরম-লক্ষ্য—রঙ্গালয়, সে নিতান্ত শিশু তাই রক্ষা, নহিলে ব্রাহ্ম-সমাজের কঠোর আইনে (?) তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইত! তাহার অচল বিশ্বাস, অভিনেতার যাবতীয় গুণ আয়ত্ত করিয়াই সে ধরাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তাহার শিশু-মনে এই ধারণা যে বাঙ্গালায় দুইজন বড় অভিনেতা আছেন, দানীবাবু ও শিশিরবাবু। দানীবাবুর অভিনয় সে দেখিয়াছে, শিশিরবাবুর অভিনয় দেখে নাই; তা সত্ত্বেও শিশিরবাবুর অভিনয়ের খুব ভক্ত—তা'ও বলিল! তাহার মামা ও অহীন্দ্রবাবুর স্থান যে তাঁহাদের ঠিক নীচেই, তাহাও গিরিধিতে বসিয়া এই বাঙ্গালী 'কুগানটী' স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। আমার সঙ্গে তাহার একটু বেশী জমিয়াছিল। হঠাৎ সে আমার মত জানিতে চাহিয়া বসিল। আমিও তাহার সঙ্গে একমত বলায়, সে আমাকে একেবারে পাইয়া বসিল। আজ ঠিক স্মরণ নাই, তাহার নাম মনে হয়, সু! ছেলেটি বড় রুগ্ন!

আমাদের ভোঁস এই ছেলেটির প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, ছেলেটি তাঁহার মুখের উপরই তাঁহার মৈনাক-সদৃশ দেহের প্রচুর নিন্দা করিয়াছিল। নির্ভীক বালক বলিল, ভোঁসকে প্রথম দেখিয়াই সে ভড়কাইয়া গিয়াছিল পরে অনেক চেষ্টা করিয়াও স্ব-মত সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহার বিশ্বাস ভোঁস কোনদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে না। আর যদিই বা তাহাকে কোন 'পার্ট' দিয়া ষ্টেজে নামান হয়, তবে দর্শক হাসিয়া লুটাপুটি খাইবে; অভিনয় কেহ দেখিবে না। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস যে ব্যক্তি অভিনয়ের যোগ্য নয়, গুণবান ব্যক্তি আখ্যা পাইবারও সে অযোগ্য!

সকালে—৭টা, ৭॥০টা বাজিল, চ্যাং বাবুর গাড়ীর দেখা নাই। বিপিনবাবু দরওয়ান পাঠাইলেন; চাকর পাঠাইলেন; তারপর 'আর্দালীর' ডাক বসাইলেন, কাকস্য পরিবেদনা! খানিক পরে খবর আসিল, গাড়ীতে তেল ঢালিতেছে। আশা হইল ইত্যবসরে মিত্র কোম্পানীর Mica Fa tory অভ্রের কারখানাটা দেখিয়া লওয়া গেল। অভ্রের বড় বড় মোটা মোটা থানগুলিকে কাটিয়া, ছুলিয়া, চাঁচিয়া ফরাস-

ভাজার কাপড়ের জমির মত পাতলা করা হইতেছে। আজকাল জাহাজের আর বৈদ্যুতী কাজের জন্যই অভ্রের ব্যবসা চলিতেছে শুনা গেল। প্রায় ৫০।৬০ জন পুরুষ ও নারী কারখানায় কাজ করিতেছে। আগে দুই তিন শত লোক কাজ করিত, এখন বাজার মন্দা, কাঁচি চালাইয়া, লোক ছাটিতে হইয়াছে, শুনিলাম।

ফ্যাক্টরী দেখিতে দেখিতে সাড়ে আট-টা বাজিয়া গেল; আমরা অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলাম—চ্যাং বাবুর মোটরের দেখা নাই! সেই ঘণ্টাখানেক আগে খবর আসিয়াছিল, গাড়ীতে তৈল ঢালিতেছে, সে তেল ঢালা কি আর শেষ

মিনিট পনেরো পরে গাড়ী আসিয়া পড়িল; একখানা ভাঙা ঝরঝড়ে ফোর্ড—তাহার আবার বনেট ভাঙা, দেখিয়া আমাদের হরিভক্তি উড়িয়া গেল; বাস্তবিক পাড়াগাঁয়ে মিউনিসিপ্যালিটির ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী দেখিলে মনে যেমন দুঃখ হয়,এই গাড়ীখানি দেখিয়াও আমাদের তেমনি দুঃখ উপজিল। ড্রাইভার বলিল, ইহার বর্হিসৌন্দর্য্য নাই বটে কিন্তু অন্তর-সৌন্দর্য্য ইহার চমৎকার; এমন পাওয়ারফুল ইঞ্জিন ফোর্ডের প্রায়ই হয় না। কতকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। বেলা ঠিক ন'টা --আমরা পরেশনাথ যাত্রা করিলাম। বাহাদুর বিপিন বাবুদের প্রদত্ত খাবারের ঝোড়া, মিত্র

উশ্রীস্রোতে স্নান।
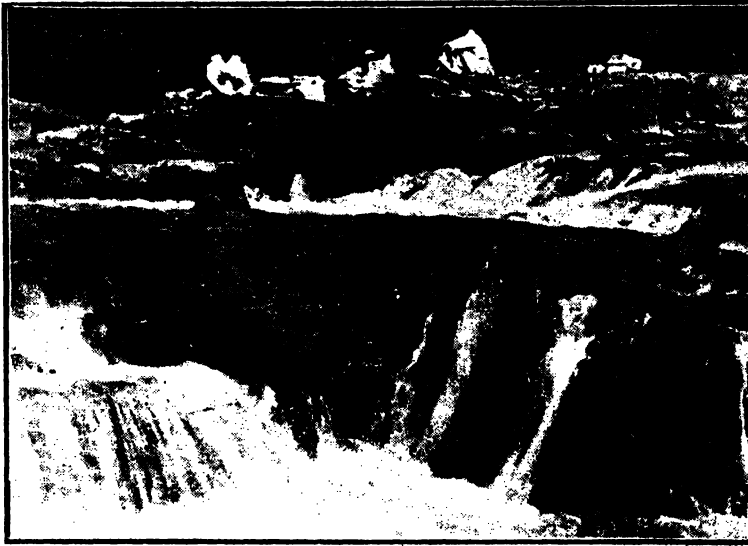
"আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর সৌজন্যে।"

হইল না? ফাঁসীর আসামীকে ভয়ানক খাওয়াইয়া লয় শুনা গিয়াছে,এগাড়ী খানিও কি ফাঁসী যাইবে যে তাহার তেল ঢালা আর শেষ হইতেছে না! বিপিন বাবু তাঁহাদের সোফেয়ারকে ডাকিয়া মোটর-গ্যারেজে গিয়া সংবাদ আনিতে বলিলেন; এ কথাও বলিলেন যে সে গাড়ী যদিই না আসে,তবে তাঁহাদের কাজের যা-হক বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের গাড়ীখানিই আমাদের ছাড়িয়া দিবেন; আমরা তাঁহাকে মনে মনে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম।

মহাশয়ের ব্যাগ, একটি আসিটেলিন মোটর বাতি, কুঁজা ইত্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, নিজে পা দানে উঠিয়া দাঁড়াইল। নেপালী বলিয়াই বোধ হয় এতখানি পথ সেই ঝর্ঝরে গাড়ীর ঝাঁকানিতেও সে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিল!

সাড়ে তের মাইল পথ আসিয়া, চ্যাংবাবুর ড্রাইভার-কথিত পাওয়ারফুল এঞ্জিন-বিশিষ্ট গাড়ীর টিউব ফাটিল! একে বেলা যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার এই রকম

বাধায় আমরা যে সন্তুষ্ট হইলাম না, তাহা বলা বাহুল্য। যাই হক, নামিয়া পড়িলাম। ও হরি! ড্রাইভার মহাশয় ফাটা টিউবটি সলিউসন সাহায্যে জুড়িতে বসিলেন; সুধাংশুবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; এখনই জুড়িয়া দু'পা না চলিতেই টিউবটি আবার ফাটিবে, তাহাও বলিলেন। ড্রাইভার আশ্বাস দিল যে, না, সেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই! সুধাংশুবাবু বলিলেন, দেখা যাক্—ফাটে কি-না!" তিনি গাড়ীর কাছেই রহিলেন, আমরা কয়জনে দুই পা চলিয়া পিটট াঁড় ইন্‌স্পেকসান বাঙলোর বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রস্থানের অবস্থান করিতে হইয়াছিল; উদ্যোগ করিতেই একখানি বিল আসিয়া দেখা দিয়াছিল। এখানেও বিল-সন্দর্শনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে এবং অনর্থক অর্থ ব্যয়ে কোন লাভ নাই বলায় মিত্র মহাশয় আমার সঙ্গেই ডাক-বাঙলো পরিত্যাগ করিলেন। "কোন ভয় নাই"—বলিয়া ভোঁস অহীন্দ্রবাবুকে আটকাইয়া রাখিল। আমরা একটা খাবারের খালি ঝুড়ি নাড়াচাড়া করিতেছি—দেখিয়া ভোঁস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন। গাড়ীর টিউবও সারা হইয়া গিয়াছিল, গাড়ীতে উঠিয়া বসা গেল। ব্রাহ্মণের বাক্য

উশ্রী জলপ্রপাতের একাংশ।

"আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর সৌজন্যে।"

বাঙলোর রক্ষক আমাদের অফিসার টফিসার ভাবিয়াছিল কি-না জানি-না (ভোঁস-সাহেবের বিশ্বাস, তাঁহাকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু নিদেন ভীম-টীম কিছু নিঃসন্দেহে ভাবিয়াছিল) তৎ-ক্ষণাৎ ঘর দ্বার সাফ করিতে লাগিয়া গেল। আমরা কতকগুলি চেয়ার দখল করিয়া বসিলাম। কোথায় ঠিক মনে নাই, একবার একটি ডাক্ বাঙলোয় আমাকে দশ-পনেরো মিনিট মাত্র ফলিতেও ফলে। সুধাংশুশেখর সেই যে বলিয়াছিলেন, আবার টিউব ফাটিবে, পাঁচ সাত মিনিট না চলিতেই আবার টিউব ফাটিল। বেলা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে, ধৈর্য্য রক্ষা করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। নিকটেই 'বরাকর নদী'—পায়চারি করিয়া বেড়াইতে মন দেওয়া গেল। মিঃ চ্যাং উপস্থিত ছিলেন না, তাই রক্ষা; নতুবা তাঁহার

কাঁচা মাথাটির যে কি অবস্থা হইত, তাহা এখন বলা দায়!

বেলা ১০টার সময় পরেশনাথ পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া গাড়ী থামিল। আমাদের একজন কুলীর দরকার ছিল; ফাঁড়ীর চৌকীদারকে ডাকিয়া সে-কথা বলায় সে 'কাছারীতে' খবর দিতে ছুটিল। তাহার বিলম্ব দেখিয়া আমরাই কাছারীর দিকে চলিলাম। ফটকের কাছে গিয়া দেখি, লঙ-কোট পরিহিত এক খঞ্জ মাড়োয়ারী কাঁচি সিগারেট ও দেশলাই হাতে হস্ত-তস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। চৌকীদার বলিল, ইনিই কাছারীর গোমস্তা; আমাদের যাহা দরকার, ইহাঁকে বলিতে হইবে। আমরা আবেদন পেশ করিলাম। খঞ্জ মাড়োয়ারী চৌকিদারকে জিজ্ঞাসিল—ম্যাজিষ্টার কাঁহা হায়? তারপর লোকটি আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—আপলোক আয়া হায়? আমাদের উত্তর শুনিয়া লোকটা হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া, রক্তচক্ষে চাহিয়া চৌকীদারের পিতা-মাতাকে অখাদ্য খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা ব্যাপারটা কি বুঝিয়া বলিলাম—চৌকীদার বোধ হয় আমাদের কাহাকেও ম্যাজিষ্টার ভুল করিয়াছিল। যা'হক আমরা ম্যাজিষ্টর নহি; পরেশনাথ পাহাড়ে উঠিব, একজন কুলী পাইলেই বাধিত হই। লোকটী আমাদের কথা শুনিল কিন্তু হাঁ না কিছুই না বলিয়া গোঁজ গোঁজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। চৌকীদার বলিল—ও কিছু করিবে না বাবু; আমি বাহির হইতে কুলী দেখিয়া আনিতেছি। সে চলিয়া গেল, একটা বাঁধাবট-নিম্নে আমরা চুপ-চাপ বসিয়া রহিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমরা জৈন মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। পরেশনাথ তাঁহাদের দেবতা, নীচে তাঁহাদের অতবড় জমিদারী সেরেস্তা, এত লোকজন খাটিতেছে, যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিলে বোধ হয় কোনই ক্ষতি হয় না; উপরন্তু তাঁহাদের সুনাম প্রচারিত হয়। জৈনদিগের আতিথ্য সংকার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা আছে এবং এখানে তাহার কদর্য্য ব্যতিক্রম দেখিয়াছি বলিয়াই কথা কয়টা বলিলাম।

আধঘণ্টা-টাক পরে চৌকীদার একটি কৃষ্ণকায় যুবককে ধরিয়া আনিল; এক টাকা পারিশ্রমিক ধার্য্য করিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অহীন্দ্রবাবু আর একবার কবে পাহাড়ে উঠিয়াছেন, অভিজ্ঞতায় তিনি আমাদের 'মাষ্টার মহাশয়' হইলেন। প্রথমেই আদেশ হইল, সব জুতা খুলিয়া রাখুন; জুতা পায়ে পাহাড়ে উঠিতে পারিবেন না।' আমরা সকলেই—কেবল মিত্র মহাশয় ছাড়া—জুতা খুলিয়া গাড়ীতে রাখিয়া দিলাম। মাথায় পাগড়ী বাঁধা হইল; ছড়ি হাতে (পথে বাঁশের লাঠি পাওয়া যাইবে জানিয়াও) পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা।

মাইল খানেক না উঠিতেই—পা আর চলে না। ভোঁস হাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কাঁকরের উপর শুইয়া পড়িয়া, আর কদূর জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এইখানেই সুধাংশু বাবুর পায়ে কাঁকড় ফুটিয়া গেল; আইডিন লাগাইয়া, পটী বাঁধিয়া তিনি খোঁড়াইতে সুরু করিলেন। মিত্র মহাশয় তাঁহার অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া, নিজের জুতাটি খুলিয়া দিলেন, সুধাংশুবাবুর ধড়ে প্রাণ আসিল।

আরও মাইল খানেক উঠা গেল,—ভোঁস দস্তুরমত বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। বলেন আর উঠিলে তাঁহার অপমৃত্যু অনিবার্য্য! ডাক্তার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার heart অত্যন্ত দুর্ব্বল; পর্ব্বতারোহণ নিষিদ্ধ। তাঁহার রাগ অহীন্দ্র বাবুর উপরেই কিছু বেশী। তিনি জানিয়া শুনিয়া কেন এমন দুর্গম পর্বতে তাঁহাকে টানিয়া আনিলেন! অহীন্দ্র বাবু বলিলেন, তাঁহার হৃদয় দৌর্ব্বল্যের সংবাদ তিনি এইমাত্র শুনিলেন, পূর্বে এ সংবাদ জানা থাকিলে তিনি ভোঁস সাহেবকে এ দুষ্কর কার্য্যে কখনই অগ্রসর হইতে দিতেন না।

এইখানে এক মাড়োয়ারির সঙ্গে দেখা। সে পূজা দিয়া নামিয়া আসিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া আমাদের ভারি আনন্দ হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে উৎসাহিত করিয়া বলিল—মজামে চলা যাইয়ে! অর্থাৎ দিব্য চলিয়া যাও! সে নিজে ভোরে উঠিয়াছিল, পূজাদি শেষ করিয়া এখন নামিয়া আসিতেছে। আমাদের যে সবাই উল্টা! বেলা ১টা বাজে, আমরা দুই মাইল পথ মাত্র উঠিয়াছি, এখনও সাড়ে পাঁচ মাইল বাকী। পায়ের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আর যে কতটুকু যাইতে পারা যাইবে, তদ্বিষয় যথেষ্ট

সন্দেহ সকলের মনেই জাগিতেছে। কি উঠিবার সময় কি নামিবার সময়—আর কোন লোককে আমরা দেখিতে পাই নাই।

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, ক্ষুধা অনুভব করিবার শক্তি নাই, মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র, ক্বচিৎ কোথায় ছায়া পাওয়া যাইতেছে, কুঁজার জল ফুরাইয়া গিয়াছে, ভোঁসের আর্ত্তনাদ আরও বিফল করিয়া দিতেছে, তিনি পথের ধারে শুইয়া পড়িয়া 'জল জল' শব্দে পাহাড় ফাটাইতেছেন ; কখনও বা চন্দ্রগুপ্ত নাটকের বাচালের অনুকরণে 'এখানে মরিলে স্ত্রীর বৈধব্য দেখিতে পাইবেন না' - বলিয়া খেদোক্তি করিতেছেন ; ভাবিয়া পাইলাম না। অনাবৃত দেহ, মাথায় শালের পাগড়ী, হাতে দীর্ঘবংশ-দণ্ড,তাহারই উপর ভর দিয়া তিনি ধুঁকিতেছেন।

কাল রাত্রে বিপিন বাবু গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, তাঁহার কোন এক আত্মীয় এই পাহাড়ে উঠার ফলে জন্মের মত কাণ দু'টি হারাইয়া বধির হইয়া গিয়াছেন। ভোঁস তখন সেটাকে গল্প বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন ; আজ দুঃখ করিতে লাগিলেন—হায় হায়, বিপিন বাবু প্রাচীন লোক, তাঁহার কথা ঠেলিয়া আসিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি! বিপিন বাবু বিশেষ করিয়া ভোঁসকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন—আপনি উঠিতে পারিবেন না। ভোঁস তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী বিফল

অপরাংশ।

"আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর সৌজন্যে।"

ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইয়া গিয়াছে, হাত পা নাড়িতে পারিতেছেন না, বাস্তবিক তাঁহার অবস্থা দর্শনে আমাদের বিচলিত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল! অহীন্দ্রবাবু বীর-পুরুষ, তিনি কিছুমাত্র দমেন নাই। ভোঁসকে উত্তেজিত করিতেছেন আর কিছু-দূর যাইতে পারিলেই শীতল জল-পূর্ণ ঝর্ণা পাওয়া যাইবে ; স্রোতে স্নান করিলে নবজীবনের সঞ্চার হইবে, উঠুন, চলুন।

ভোঁস উঠিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব, করিতেই, সোৎসাহে যাত্রা করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বীকার করিলেন—বিপিন বাবু মহাশয় ব্যক্তি, তাঁহার কথা লঙ্ঘন করা উচিৎ হয় না।

গন্ধর্বনালা একটি ঝর্ণা! জল শীতল, আসে পাশে বসিবার স্থানটুকুও বেশ ; ভোঁস জমি লইলেন ; আর উঠিবেন না। সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতে হইবে আমরা যদিও চুপ চাপ থাকিয়া আরও দূরে, উচ্চে যাইতে প্রস্তুত

এই ভাব দেখাইতেছি, অন্তরে আর উঠিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। আমরা দেখিতেছি ভোঁস যদি আর না যান, তবে তাঁহার অছিলায় আমরাও ফিরিতে পারি; আর [illegible]ন যান, আমরাও যাইব। অহীন্দ্রবাবু ভোঁসের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। এবং দশপনোরা মিনিটের মধ্যেই ভোঁসকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। বেশীদূর নয়, সীতা নালা পর্য্যন্ত। সাড়ে তিন মাইল উঠিয়া, আরও কিছু দূরে গিয়া সীতা-নালা পাওয়া গেল। এখানে দস্তুরমত শীত, জলে হাত দেয় কাহার সাধ্য! আমরা সীতা-নালায় স্নান করিয়া [illegible] করিতে করিতেই আসি[illegible]। পাঁচজন, বাহাদুর ভৃত্য ও সেই কুলিটা সকলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইয়াও শেষ করিতে পারিলাম না। সুধাংশুশেখর অনেকক্ষণ ছবি তুলিতে পান্ নাই, এইখানে অনেকগুলি ছবি তুলিয়া লইলেন। তিনি ও মিত্রজা মহাশয় জামা, শাল, মোজা (গ্লাভ্‌স দেখি নাই: বোধ হয় তাহাও ছিল) বাহির করিয়া শ্রী অঙ্গে চড়াইলেন; ভোঁস সাহেব সিল্কের চাদরখানি গায়ে জড়াইলেন; আমার খদ্দরই যথেষ্ট, অহীন্দ্র বাবু বোধ হয় মেরজাইর উপরে উঠেন নাই। বেলা তখন সাড়ে তিনটা। এবা[illegible] [illegible]রের দিকে নামাই যুক্তিযুক্ত বো[illegible] [illegible]রা গেল। ভোঁস আশা করিয়াছিলেন যে নামিবার

উশ্রী নদীর উৎপত্তি স্থল।

"আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাত কিরণ বসুর সৌজন্যে"

সময় আর কষ্ট হইবে না; কিয়দ্দূর নামিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান অমূলক। দুই পা নামেন, আর চীৎকার করেন, ওরে বাবারে! গিয়াছি! গিয়াছি! অহীন্দ্র বাবু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে তিনি যান নাই; এবং যাইতেও অনেক বিলম্ব আছে।

সীতা-নালার জলের শৈত্য অনুভব করিবার মনের বাসনা রৈল মনে!

ভিজা গামছায় মাথা মুছিয়া ও মুখহাত ধুইয়া ফেলিয়া আমরা আহারে মন দিলাম। মিসেস চক্রবর্ত্তী (বিপিন বাবুর স্ত্রী) এত খাবার দিয়াছিলেন যে আমরা

এদিকে অপরাহ্ণ শেষ হইয়া আসিতেছে, ভোঁসের জন্য জোরে চলিবার উপায় নাই, আর আমাদের পাও ত তথৈবচ, তাই ধীর মন্থর গতিতে চলিতে হইতেছে। বাহাদুর ও কুলিটা আমাদের সঙ্গেই চলিয়াছে। একবার অহীন্দ্র বাবু ও আমি কথা কহিতে কহিতে একটু আগাইয়া আসিয়াছি, হঠাৎ মর্ম্মভেদীকণ্ঠে চীৎকার উঠিল—আমার দম বন্ধ হয়ে গেছে! আমার দম বন্ধ হয়ে গেছে।'—আর্ত্তনাদ ভোঁসের। ছুটিয়া গিয়া দেখি, তিনি একখণ্ড শিলার উপর দু'হাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া কাৎরাইতেছেন! মুখে-চোখে দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভোঁস আমাদের রসিক পুরুষ, জিজ্ঞাসিলেন ক্যামেরা কৈ? এ সময়ের একটা ছবি আমার তুলিয়া লও, অনেক শিল্পির কাজে লাগিবে।" আমরা বলিলাম, স-কেমেরা সুধাংশু বাবু ও শিশিরবাবু বীর পুরুষের মত জোরে হাটিয়া নামিয়া গিয়াছেন, তাহারা এখন অনেক দূরে, সুতরাং ছবি তুলিবার উপায় নাই।" "তবে আর কি হইবে চল।" ভোঁস আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে গরু তাড়াইয়া একটি সাঁওতাল যুবক গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল, আমরা তাহাকে ডাকিয়া তাহাদের ঘর বাড়ীর, আচার-নীতির তথ্য জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘর-বাড়ী পাহাড়েই, অন্য পাহাড়ের চা-বাগানে তাহারা কর্ম্ম করে, বলিল। বিবাহিত কি-না জিজ্ঞাসা করায় বলিল—বিবাহিত। তাহাদের বিবাহের রীতি-নীতি আমাদের মত কি-না জানিতে কৌতুহল হওয়ায় আমি ঠারে-ঠোরে তাহাকে বুঝাইয়া প্রশ্ন করিলাম—তাহাদের বিবাহের পদ্ধতি কিরূপ? নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করে না, বাপ-মা দেয়। "বাপ-মা দেয়, তাহারা বিরাহের আগে কনেকে দেখিতে পায় না।" অহীন্দ্রবাবু বলিলেন—আমাদেরও ঐ নিয়ম বটে তবে আমরা অনেক সময় লুকাইয়া-চুরাইয়া, নাম গোপন করিয়া ও বন্ধু সাজিয়া কনেকে দেখিতে পাই।" পাহাড়ী যুবক একমুখ হাসিয়া বলিল—ও "ঘুস্-ঘাস্" হয়! অর্থাৎ লুকাচুরির প্রচলন সকল দেশে ও সকল সমাজেই আছে। খুব হাসি পড়িয়া গেল। ঐ "ঘুস্" কথাটা সকলেরই মনঃপূত হইল। অতঃপর ইহাই আমাদের Catch word হইয়া দাঁড়াইল। পাল্কী বেহারারা যেমন 'হুম-বড়ো' করিয়া কষ্টের লাঘব করে; রাজ-মজুররা যেমন একটা শব্দ তুলিয়া ছাদ পিটে, আমরাও পথ চলি আর বলি ঘুস্! ভোঁস শুইয়া পড়িয়াছেন, শব্দ হইল ঘুস্!—উঠাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ যেন "মৃতদেহে হ'লো 'তাঁর' জীবন সঞ্চার।"

সন্ধ্যা হইয়া গেল। Reliance প্রদত্ত গ্যাসালোকটি জ্বালিতে গিয়া দেখা গেল, জ্বলে না। তখন অন্ধকারেই পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে সাতটার সময় নীচে নামা গেল। চট্টো-মিত্র বহুক্ষণ নীচে আসিয়া বসিয়া আছেন।

সে রাত্রে গিরিধিতেই অবস্থান করা গেল। পরদিন বিপিনবাবু তাঁহাদের মোটর দিলেন, সকালে সহর ভ্রমণ করা গেল ও অপরাহ্ণে উস্ত্রী ঝর্ণা দেখিতে যাওয়া গেল। উস্ত্রীর বর্ণনা ছবিতেই দেখা যাইবে।

দেখিলাম, অনেকগুলি বাঙ্গালী যুবক স্রোতে নামিয়া স্নান করিতেছেন; আমরা জলের উপর দিয়া পাথর টপকাইয়া টপকাইয়া অনেক দূর বেড়াইয়া আসিলাম। একখানা পাথরে কয়েকটী বাঙ্গালীর নাম কাল কালিতে (বোধহয় আলকাৎরা) লেখা রহিয়াছে দেখা গেল। তন্মধ্যে শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু নামটি পরিচিত। শ্রীমানেরা অমর হইবার সুলভ ও সহজ পন্থা নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া সুখী হওয়া গেল।

প্রায় দেড় মাইল বন-পথ হাঁটিয়া উস্ত্রী যাইতে হয়। এইখানেই আমাদের মোটর ছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল একটা গাছের তলায় বসিয়া কয়েকটি যুবক গ্যাশ ষ্টোভ জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতেছেন। নির্লজ্জের মত, আমি 'কিঞ্চিৎ চা' পাওয়া যাইতে পারে কি-না জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা সাদরে আহ্বান দিলেন।

সেইদিনই রাত্রে মধুপুর ফিরিলাম। ঠিক মনে নাই সেই দিনেই কি-না শ্রীযুক্তা শক্তিদেবী মধুপুরের শক্তিধামের অধিষ্ঠাত্রী এবং বন্ধু ধীরেন্দ্র পাণ্ডের সহধর্ম্মিনী—বিতরিত শক্তির কচুরী' খাইয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়া গেল।

সুখের কথা, অদ্যাপি কাহার কাণ যায় নাই, বিপিনবাবুর কথা এখনো ফলে নাই; পরে কি হইবে কে বলিতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্রে স্বর্গ ও নরক

[শ্রীমতী সফিয়া খাতুন বি-এ]

ঋকবেদ পাঠে জানা যায় যে ভারতীয় আর্য্য জাতির মাতৃভূমি ভারত কিন্তু সেটা পিতৃভূমি নহে। কারণ ঋক্‌বেদে (১০।১০।৪ মন্ত্রে) লিখিত আছে—

দৌনঃ পিতা জনিতা নাভিরত্রবন্ধনং
মাতা পৃথিবী মহীয়ম্

ঋকবেদ আরও বলেছেন যে পিতৃভূমি নাকি ভারতের উত্তরে, হিমালয় পর্ব্বতের অপর পারে। অর্থাৎ বর্ত্তমান তিব্বত, তাতার, মঙ্গোলিয়া ও সাইবিরিয়া। এসব জায়গায় নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করতেন, পরে তাঁরা বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন। মঙ্গোলিয়াই নাকি মুখ্য পিতৃলোক। তাই বোধহয় বেদ বলেছেন তিস্রো মাতৃণ, ত্রিণ পিতৃণ বিভ্রদেক।" বৈদিক যুগের প্রারম্ভে এই সকল স্থানকে নাকি দেবলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক ইত্যাদি অনেক রকমারি নাম দেওয়া হত। ইহাই নাকি স্বর্গের প্রথম স্তর। সে স্থানটার সীমানা নাকি দক্ষিণে তিব্বত, উত্তরে উত্তর কুরুবর্ষ বা উত্তর সাইবিরিয়া। তার পরই উত্তর সমুদ্র! তার প্রমাণও অথর্ব্ববেদের সরল ভাষ্যে পাওয়া যায়। তাতে লিখা আছে "হিমবচ্ছিরঃ প্রদেশ এব স্বর্গ ভূমিরিতি প্রসিদ্ধিঃ।"

বায়ু পুরান বলেন—

"উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে
কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং নিষেবিতম্।"

মহাভারতের মহা প্রস্থানিক পর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদব্রজে স্বর্গে ও ব্রহ্মলোকে যাবার কথা লিখা আছে যে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব মহা হিমগিরি অর্থাৎ হিমালয় পার হয়ে মহা বালুকার্ণব অর্থাৎ মধ্য এসিয়াস্থ গবীনামক ভীষণ মরুদেশ পার হন। তারপর মেরু পর্ব্বতে উঠতে থাকেন। সে সময়ে যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর সবাই দেহত্যাগ করেন। বায়ু পুরানে এই স্থানটিকে ইলাবৃত বলেছেন (মেরুমধ্যমিলাবৃতম্) এই ইলাবৃত বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়ায়। মঙ্গোলিয়ার প্রাচীন নাম "ইলা স্থায়ী"। এই ইলাস্থায়ীকেই আমরা আল্টাই বলে আখ্যা দিয়েছি। এটা কিন্তু সুমেরু কি কুমেরু নহে। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই মেরু পর্ব্বত পার হয়ে ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন। কাজেই এ অনুমান theory) যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হয় যে বর্ত্তমান উত্তর সাইবিরিয়াই এখনকার দিনের স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক। কিন্তু একটা কথা আছে। মহাভারত বলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রহ্মলোকে যেয়ে তথায় দেবতা ও যোগী ঋষিদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সেখানে গঙ্গা স্নান করেন। তাহলেই তিনি সেখানে গঙ্গাকে পেলেন কি করে? এ কোন গঙ্গা? আমরা ত জানি গঙ্গা গোমুখ নিঃসৃতা, ভারত প্রবাহিতা, বঙ্গসাগর সঙ্গতা। এটা আবার কোন নূতন গঙ্গা তাহলে? কোন ভয় নাই। শিরোমণি ভুবন কোষাধ্যায় আমাদের সে ভয় দূর করেছেন। তিনি বলেন—

"উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা
তস্যাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যথাঃ।
বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাৎ পতিতা মেরৌচতুর্দ্ধাস্যাং
বিষ্কুম্ভাচল মস্তকান্তসরঃ সংগতা গত বিয়তা
সীতাখ্যা ভদ্রাশ্ব সালকনন্দাচ ভারতবর্ষম্।
চক্ষুশ্চ চোওমালং ভদ্রাখ্যা কেওয়াণ্ কুরুনযাতা।"

অর্থাৎ যে মেরুর (আল্টাই পর্ব্বৎ) দক্ষিণে "বিষ্ণুপদ" নামক স্থানে বিষ্কুম্ভ অচলস্থ সরোবর হতে গঙ্গা'বের হয়ে -বার ভাগে বারটি মূলস্রোতে বিভক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতের নাম অলকনন্দা। কেতু মালবর্ষ (জলবাহুল হেতু মালবর্ষ না বলে অপরাস্থান বলা হয়) যাকে আমরা বর্ত্তমানে আফগানিস্থান বলি, সেস্থান দিয়ে

প্রবাহিত স্রোতের নাম চক্ষু, বর্ত্তমান অক্ষস্। ভদ্রাশ্ববর্ষ (চীনদেশ) প্রবাহিত স্রোতের নাম সীতা, বর্ত্তমান ইয়াং সিকিয়াং এবং উত্তর কুরু, উত্তর সাইবিরিয়া বা ব্রহ্মলোক প্রবাহিত স্রোতের নাম ভদ্রা। এই ভদ্রা নামক গঙ্গায় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নান করেছিলেন, আর বিষ্ণুপদী নামক স্থান হতে গঙ্গা বেরিয়ে ছিলেন বলে গঙ্গাকে বিষ্ণুপদী বলে। পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী এইসব তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করে বলেছেন যে বিষ্ণুদেবতার পদ নিঃসৃত ধর্ম্মজাত বলে বিষ্ণু পদ নহে বা হতে পারে না। তবে এখানে এ কথা বলা দরকার যে মন্দাকিনী বা অলকানন্দ গঙ্গার মূলস্রোত হিমালয়ের ১৯ হাজার ফিট উচ্চ গোমুখে (গবাকৃত স্থানে) ফুটিয়ে বের হয়েছে। তাই আমরা বলে থাকি যে গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখ হতে বেরিয়েছে। ইহার একটী স্রোত বদরি নারায়ণের নিম্ন দিয়ে বেরিয়েছে। সে স্রোতের নাম মন্দাকিনী এবং আর একটী কেদারনাথের নিম্ন দিয়ে (বর্ত্তমান গাড়োয়াল জেলা) অলকনন্দা নামে প্রবাহিত হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে উত্তর সাইবিরিয়া যে ব্রহ্মলোক তার প্রমাণ কি? ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে রামায়ণে লিখা আছে যে সীতাকে খুঁজে বের করবার সময় সুগ্রীব, শতবল প্রভৃতি বানর দূতকে বলেছিলেন যে, যে স্থানে বৈল্যান সাগর (বর্ত্তমান বলকান হ্রদ) আছে, সে দেশ পার হয়ে শৈলদা নদী যে দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেই নদীর পর পারেই উত্তর কুরুপ্রদেশ এবং এর পরেই উত্তর সমুদ্র। এই উত্তর কুরুপ্রদেশেই ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রহ্মা বাস করে থাকেন। তাই এ জায়গার নাম ব্রহ্মলোক। এই ব্রহ্মলোকে নাকি ছয় মাস সূর্য্য উদয় হয় না, এবং ছয়মাস অস্ত যায় না। তাই ব্রহ্মার একদিন ও এক রাতে ভারতবাসীর এক বৎসর। (১)

ইহাকেই আমরা আরোরা বর্কেলিস (Aurora Borcalis) বলে থাকি। এখন ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা ও তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত বলা দরকার। বেদ বলেন "ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং পুষ্কার সংস্থজে" অর্থাৎ ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়েছেন। মনু স্মৃতিতে তিনজন ব্রহ্মার কথা উল্লেখ আছে। স্বয়ম্ভু বা আত্মভু ব্রহ্মা, স্রষ্ঠা বা পিতামহ ব্রহ্মা, ও কশ্যপ পুত্র সুরজ্যেষ্ঠ ধাতা ব্রহ্মা। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে বেদে বিশুদ্ধ চৈতন্য বা ভূমা পুরুষ বলে বর্ণনা করেছেন। ইনি অজ ও শাশ্বত অর্থাৎ সদা বর্ত্তমান। তাই বোধ হয় বান্ পুরাণে এঁর বিষয় "নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভুরিতি-চোচ্যতে।" বলা হয়েছে। এখন পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে এই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কি করে স্রষ্টা ব্রহ্মা রূপে প্রতীয়মান হ'য়ে জগৎ পিতামহ হলেন।—তা কে জানে? অথচ বেদও বলেন "কোদদর্শ প্রথমং জায়মান" অর্থাৎ সেই প্রথম মানুষকে কে জন্মিতে দেখেছে? তবে ঐতরেয় উপনিষদে লেখা আছে যে কোন একজন ঋষি স্বীয় চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করে আনন্দাপ্লুত হয়ে বলেছিলেন "অহং ঋতস্য প্রথমজা" অর্থাৎ আমি পরম ব্রহ্মের (স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার) জ্যেষ্ঠ পুত্র। এ কথা হতে এই বুঝা যায় যে প্রবুদ্ধ হয়ে স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করলে, দেহান্দ্রিয়াদির জ্ঞান হলে প্রবোধ স্মৃতি বলে স্বয়ং স্রষ্টারূপে স্বীয় দেহান্দ্রিয়াদির বা নামরূপ জগতের আবির্ভাব, তিরোভাব, রূপ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় অনুভূত হয়ে থাকে, অন্যথা নহে। এখন কথা হতে পারে যে মানুষ ত আর প্রবুদ্ধ হয়ে জন্ম নেয় না। জন্ম নেবার সময় বদ্ধ বা অজ্ঞানই থাকে তখন সে নিজের সৃষ্টির প্রারম্ভ জানবে কি করে। এ সব কথা অতীব গূঢ়। বুদ্ধ কি চীন দেশের কন্‌ফিসিয়াস্ প্রভৃতি সৃষ্টিতত্ত্বের যোগাবতাররা—কোন কথাই বলেন নাই। কন্‌ফিসিয়াস বলেছেন—"When one does not yet know what life is, how should one know what death is." এখন ব্রহ্মলোকের কথা বলছি। প্রথম ব্রহ্মলোক মেরু পর্ব্বতের উপরে মঙ্গলিয়ার বা ইলাবৃত বর্ষে। ইহা পিতৃলোক নামে খ্যাত। সুরজ্যেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক কশ্যপ পুত্ররূপে সৃষ্ট হয়ে সর্ব্ব প্রথমে এইস্থানে বাস করেন। কতদিন পরে ব্রহ্মা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুরদিগের

(১) ন বৈ তত্র নম্লোচ নোদিয়াচ কদাচন।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি।
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)
তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদানাম নিম্নগা।
উভয়া কুরবস্তত্র কৃতপুণ্য প্রতিশ্রয়াঃ
সহু দেশ বিহ্যাহপি তত্র ভাসা প্রকাশতে।
সভাস্করময়ভাং ন জানীমস্ততঃপরম্। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৪৩ সর্গ

দ্বারা তাড়িত হয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্বোপদ্বীপে যেয়ে বাস করেন। সেস্থান তাঁহারই নামে ব্রহ্মলোক হয়। বর্ত্তমানে তাকে আমরা ব্রহ্মদেশ বা বর্ম্মা নামে আখ্যা দিয়েছি। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর প্রবল পরাক্রমে দানবেরা পরাজিত, এবং স্বর্গ হতে তাড়িত হলে ব্রহ্মা আবার স্বর্গের ব্রহ্মলোক অধিকার করেন ; শেষে ভ্রাতা ইন্দ্রের হাতে রাজ্য দিয়ে স্বয়ং উত্তর কুরু বা উত্তর সাইবিরিয়াতে যেয়ে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাই তৃতীয় ব্রহ্মলোক। উত্তর কুরু নামে খ্যাত।

স্বর্গ সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে থাকেন। অনেক সময় ঈশ্বর বিষয়েও আকাশের দিকে হাত তুলে বলে থাকেন "উপরওয়ালা জানে।" এ সব ধারণা হতেই অনেকে মনে করেন স্বর্গ হয়ত আকাশে কি ব্যোমে। অবশ্য বেদে স্বর্গকে আকাশ, ব্যোম, দিব, দ্যো, পুষ্কর, যজ্ঞ, প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ সব আকাশ, ব্যোম, দিবস দ্যো প্রভৃতি স্থান বিশেষ নয়। তার প্রমাণ দিচ্ছি। ব্রহ্মার আর এক নাম "পরমেষ্ঠি" অর্থাৎ পরমে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠি। তার মানে যিনি পরম বা উৎকৃষ্ট ব্যোমে বা আকাশে বা স্বর্গে বাস করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন যে তিব্বত হতে উত্তর সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত স্থানগুলি পাঁচটী অমৃত ভূমি। অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলে অমৃত ভূমি বলা হ'ত। সে সব স্থানের রাজা ছিলেন অগ্ন্যাদি মানুষ দেবতাগণ। প্রথম অমৃত ভূমি বর্ত্তমান তিব্বত। তার রাজা ছিলেন অগ্নি, অপর চারটি যথাক্রমে তাতার, মঙ্গলিয়া, দক্ষিণ সাইবিরিয়া ও উত্তর কুরু বা উত্তর সাইবিরিয়া। এ সবের রাজা ছিলেন সুরজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আদিত্য ব্রহ্মা। কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে লেখা আছে যে গার্গ্য-পুত্র বিত্র যজ্ঞ করবার জন্ম একটী স্বাস্থ্যকর গুপ্তস্থানের পরিচয় দিতে ঋষি আরুণি ও তাহার পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে কোন সদুত্তর না পেয়ে তিনি স্বয়ং ভ্রমণ করে ব্রহ্ম-লোককে মনোনীত করে ব্রহ্মলোকের পথের যে বর্ণনা করেছিলেন তা নিয়ে দেওয়া গেল। "এতং দেবযানং পন্থাতামাপত্যাগ্নি লোকমাগচ্ছসি স বায়ুলোকাৎ স বরুণ লোকাৎ স আদিত্যলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং তস্যহ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্যাইবাহ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিরজা নদী ল্যো বৃক্ষঃ।" এই বর্ণনায় যে "আর" হ্রদ ও বিরজা নদীর কথা লেখা হয়েছে, এই "আর" হ্রদই বর্ত্তমানে আরল হ্রদ এবং বিরজা নদী এখনও সেই প্রাচীন নামে কথিত হয়ে থাকে। উত্তর সাইবিরিয়ায় যাঁরা ভ্রমণে গিয়াছেন তাঁরা এ সব নদী ও হ্রদ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এখানেই ইন্দ্র প্রজাপতি ও চন্দ্র দ্বারপালের কাজ করিতেন। এখন ইন্দ্রপুরী ও বৈকুণ্ঠপুরীর কথা বলব। ঋকবেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে কশ্যপ পুত্র মানুষ-দেবতা বিষ্ণু ব্রহ্মলোকের দ্বারপাল ছিলেন। বিদ্যার্থী যতি সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দেবযান পথে তপোলোকের ভিতর দিয়া ব্রহ্মলোক যেতে হত। কাজেই বিষ্ণুর রাজ্য তপোলোক ব্রহ্মলোকের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। তাই বিষ্ণু বেদে দ্বারপাল নামে খ্যাত। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিত্যের তপোলোক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই তপোলোক বা আদিত্যলোককে বিষ্ণুর সময়ে "গোলক" বা বৈকুণ্ঠ আখ্যা দেওয়া হয়। এই বিষ্ণুই খাট বলে পুরাণে বামন বিষ্ণু বা হরি নামে অভিহিত। যজুর্ব্বেদে লেখা আছে যে, এই বিষ্ণু তিনবার নরলোকে ভারতে বা পৃথিবীতে এসেছিলেন। মহারাজ বেবাপুত্র পৃথুরাজার সময়ে ভারতের নাম পৃথিবী ছিল (১) পৃথিবীতে বিষ্ণুর আগমনের তিনটি কারণ ছিল, প্রথমতঃ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দানবদিগের দ্বারা স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে। দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতষ্পুত্র মনুকে ভারতে ঔপনিবিষ্ট করবার জন্ম। তৃতীয়তঃ সিন্ধু নদ তীরস্থ দানবরাজ বলীকে দমন করবার জন্ম। দানবরাজ বলী

---

(১) পৃথিবী মধ্য রেখা চ নর্ম্মদা পরিকীর্ত্তিতা

(চেৎব্যূহ টীকা)

পৃথিবী অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে রেখা নর্ম্মদা নদী, ইহা ভারতবর্ষকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এই ভারতবর্ষ ত্রিকোণ বলে কোন কোন স্থানে পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলা হয়েছে। যথা পৃথ্বী তাবৎ ত্রিকোণা (রসমঞ্জরী)।

এখানে পৃথিবী অর্থ—world নয়।

বিতাড়িত হয়ে পাতালে যান। এই পাতালই বর্ত্তমান দক্ষিণ আমেরিকা। খুল্লতাত বন্ধুর সাহায্যে মনু অযোধ্যা নগরী স্থাপন করেন। রামায়ণে লেখা আছে "অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোক বিশ্রুতঃ মনুনা মানবেন্দ্রেন যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্।" মনু বিবস্বানের অর্থাৎ সূর্য্য পুত্রের বলে তাহার বংশধরগণকে সূর্য্যবংশী বলা হয় এবং স্বর্গ হতে বিতাড়িত ভারত প্রবাসী এই মানুষ দেবতাদিগের দ্বারাই এই অযোধ্যা নগরী নির্ম্মিতা হয়েছিল বলে অথর্ব্ব বেদে "দেবানাং পুরযোধ্যা" অর্থাৎ অযোধ্যাপুরীকে "দেবপুরী" বলা হয়েছে। আর চন্দ্র সূর্য্য যে আকাশের জড় সূর্য্য ও চন্দ্র ছিলেন না তা বোধ হয় আজকালকার দিনে কাহাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার পড়বে না। এরাও মানুষ ছিলেন। আবার দানবদের মধ্যেও দুইজন চন্দ্র ও সূর্য্য ছিলেন।

এখানে আর একটা কথা বলবার আছে। ঋগাদি বেদপাঠে জানা যায় যে সমস্ত ভূমণ্ডল এক সময়ে জলাকার ছিল। সেই অতল জলরাশি হতে মেরু বা বর্ত্তমানের আল্টাই পর্ব্বতও হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্ব প্রথমে ভেসে উঠে। আল্টাই পর্ব্বতের সানু প্রদেশ মঙ্গ বা মঙ্গোলিয়া (বৈদিক "দ্যো" বা "দ্যাবা") এবং হিমালয়ের পাদদেশে বৈদিক পৃথিবী বা ভারতবর্ষ সর্ব্ব প্রথমে ভেসে উঠে। তাই বোধ হয় বেদে এই দুটি জনপদের বিষয় লেখা আছে "মহীদ্যাবা পৃথিবী জ্যেষ্ঠে।" ঋকবেদের আর এক স্থানে লেখা আছে "দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেবঃ একঃ" তার মানে দ্যাবা এবং ভূমি বা মঙ্গোলিয়া এবং ভূলোক বা ভারতবর্ষ সেই অদ্বিতীয় দেবই উৎপন্ন করেছেন। এখন অন্তরীক্ষের কথা বলব। আমরা সাধারণতঃ অন্তরীক্ষ কথায় বুঝি শূন্য। কিন্তু বৈদিক অন্তরীক্ষের অর্থ ঠিক তা নয়। যথা ভুব ইতি অন্তরীক্ষম্। অর্থাৎ পশ্চিম মহা সমুদ্র হতে ভুবলোক বা অন্তরীক্ষ লোকের উৎপত্তি হয়। আবার তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণ বলেন "অন্তরীক্ষস্চ যাঃ প্রজা গন্ধর্ব্বোপ্সরশ্চ যে সর্ব্বস্তাঃ" তাই কট শ্রুতিতে এই গন্ধর্ব্বদিগকে "অন্তরীক্ষাৎ" বলা হয়েছে। অন্তরীক্ষ শব্দ যে শুধু শূন্য অর্থ হয় না, তা যে জনপদ বিশেষ, এ বিষয়ে মহাভারত বলেন "অন্তরীক্ষস্য বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্ব্বিধাঃ।" এখানে "বিষয়" শব্দে জনপদ বুঝায়। যথা "বিষয় স্যাৎ ইন্দ্রিয়ার্থে দেশে জনপদধ্বনি" অর্থাৎ অন্তরীক্ষ জনপদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের প্রজার ন্যায়। আচার্য্য সায়ন্ বলেন "অন্তরীক্ষে দ্যাবা পৃথিব্যো মধ্যবর্ত্তি লোকে" অর্থাৎ যাহা দ্যাবা বা মঙ্গোলিয়া এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের মধ্য ভাগ তাহাই অন্তরীক্ষ। পাঠক বলতে পারেন যে দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে ত তিব্বত ও তাতার। একথা ঠিক সত্য কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রথমে দ্যাবা পৃথিবীর উৎপত্তি হয় তারপর তিব্বত ও তাতার সমুদ্র গর্ভ হতে ভেসে উঠে। তাই অন্তরীক্ষকে দ্যাবা পৃথিবীর মধ্য ভাগ বলা হয়। ঋক্‌বেদ বলেন "সমুদ্রিয়া অপ্সরসঃ" অর্থাৎ সমুদ্র বা অন্তরীক্ষবাসী লোকেরা অপ্সর জাতীয়। এবং সমুদ্র শব্দ এখানে অন্তরীক্ষেরই পর্য্যায়ক শব্দ। এখানে, কখনও জলরাশি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এই সমুদ্রাখ্য অন্তরীক্ষ জনপদেই দেব বরুণের বাড়ী ছিল। কস্মিন কালেও জল রাশিতে নয়। এই বৈদিক অন্তরীক্ষ লোক ও পৌরানিক গান্ধার দেশ যে একই স্থানে তাই বলছি। রামায়ণ বলেন যে মহারাজ ভরত গন্ধর্ব্ব দিগের আবাস ভূমি গান্ধার দেশ জয় করে তথায় তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নামক নগরদ্বয় স্থাপন করে তক্ষ ও পুষ্কল নামক তা'র দুই পুত্রকে সেখানে রাজা করেন। বর্ত্তমানের পেশোয়ার পর্য্যন্ত পৌরানিক গান্ধার দেশ বিস্তৃত ছিল। কাজেই পাঠক হয়ত বুঝতে পারছেন যে বৈদিক অন্তরীক্ষ আর বর্ত্তমানের আফগানিস্থান একই। যেমন পিতৃভূমি মঙ্গোলিয়া,তাতার ও তিব্বত, মাতৃভূমি আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তেমনি অন্তরীক্ষও তিনটি, যথা—আফগানিস্থান, তুরস্ক, এবং পারস্য। এখন ইন্দ্রের স্বর্গপুরীর কথা বলব। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের হাতে ত্রিলোকের শাসনভার দিয়ে নিজে উত্তর সাইবিরিয়াতে রাজ্য স্থাপন করেন। এই স্থানের নামই "দিব" বা "উত্তরকুরু।" এই মানুষ-দেবতা ইন্দ্র কশ্যপের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। মাতা দেবজাময়। বেদে লিখা আছে "ইলপাতির্মঘবা" অর্থাৎ হে ইন্দ্র, তুমি ইল অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষের শাসন কর্ত্তা। বিষ্ণুপুরানে লিখা আছে "মানসোত্তর শৈলে তু পূর্ব্বতো বাসবপুরী" অর্থাৎ হে ইন্দ্র, মানস সরোবরের উত্তরস্থ নিষধ পর্ব্বতের পূর্ব্ব

দিকে তোমার রাজধানী বাসবপুরী। এই ইন্দ্রের নিকটই —অর্জ্জুন অস্ত্র শিক্ষার্থে গমন করেছিলেন। সে সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও যে স্বর্গলোকের সঙ্গে অপরাপর লোকের সংযোগ ছিল; আজকাল ভারতীয় দেশী রাজ্য-সমূহে যেমনি ছাড়পত্র নিয়ে যেতে হয় বা জিনিষের জন্য রাজস্ব দিতে হয় (ছোটনাগপুর ও রায়পুরার কয়েকটী Native Estate এ রপ্তানি মালের উপর খাজনা দেওয়া হতে দেখেছি) তেমনি বৈদিক যুগেও কর না দিলেও আবেদন পত্র দিতে হত। তার প্রমাণ অথর্ব্ববেদে লিখা আছে "ইন্দ্রমহং বাণিজং বোদয়ামি, মুদনং অরাতিং পরিপন্থিনং মৃগম্। স ঈশানো ধনদা অস্ত মহ্যম্।" ভারতীয় কোন বণিক তার বাণিজ্য দ্রব্য হিমালয়ের পরপারে মানস মাশকাদি (তিব্বতাদি) দেশে বিক্রয়ার্থে নিয়ে যাবার সময় মহারাজ ইন্দ্রকে প্রার্থনা করে বলছে "হে ইন্দ্র, তুমি প্রধান ব্যক্তি, তুমি পথস্থ দস্যু এবং হিংস্র জন্তু সকলের হাত হতে রক্ষাকরে আমার ধনাগমের সুবিধা করে দাও।" কাজেই ইন্দ্রের স্বর্গপুরী শূন্যে নয়। আর ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব "কায়েমি" নহে—একটা উপাধি বিশেষ। আমেরিকার Presidentship এরই মত। বৈদিক যুগে প্রভুত পরাক্রমশালী বিদ্বান পুরুষকে এই উপাধি দেওয়া হত। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে লিখা আছে "ক্ষত্রং হীন্দ্র" ইন্দ্ররাজন্য ইত্যাদি। এখন কথা হচ্ছে স্বর্গের খবরটা যখন নেওয়া গেল, তাহলে আর নরক বা যমের বাড়ীর খবর নেওয়াটা বাকী থাকে কেন? সেটা কি রকম তা দেখা যাক্ না। শাস্ত্রে লিখা আছে মহর্ষি কশ্যপের এক পুত্রের নাম ছিল বিবস্বান। এই বিবস্বানের তুই পুত্র ছিল। একজনের নাম মনু ও অপরটির নাম—যা আমরা কেহই শুনতে ভালবাসি না সেই যমরাজা। মনুর বিষয় ত পূর্ব্বেই বলেছি। যম হলেন সেই অযোধ্যাপুরী স্থাপয়িতা মানুষ, মনুর ছোট ভাই। কাজেই যমও একজন মানুষ বিশেষ। হিন্দুদের বিশ্বাস মানুষ মরলে যমের বাড়ী যায়। কিন্তু যমও মানুষ, তিনিও মরণশীল। এখন যম মরে কোন যমের বাড়ী যাবেন বা গিয়াছেন? কারণ অথর্ব্ব বেদে লিখা আছে "যো মমার প্রথমো মর্ত্ত্যানাং যঃ প্রেয়াচ প্রথমো লোকমেতম্। বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং· যমং রাজানঃ।"

কৃষ্ণ যজু বলেন যে পিতৃলোকবাসী দেবগণ যমকে রাজপদে বরণ করবার জন্য মন্ত্রণা করলেন "তস্মাৎ যম পিতৃণাং রাজা," অর্থাৎ এই হেতু যম পিতৃলোক বা মঙ্গোলিয়ার রাজা হয়েছিলেন। এদিকে মঙ্গোলিয়া বা পিতৃলোক সারা বিশ্বের প্রাণীর উৎপত্তিস্থান! এ বিষয়ে ঋক্‌বেদ বলেন "দৌ নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্রবন্ধনং।" বায়ুপুরাণ বলেন "ভুবনৈ ভূতভাবনঃ" অর্থাৎ ভুবনস্থ মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদির উৎপত্তি স্থান। জীবিত বা মৃত পিতৃগণ তথায় বাস করেন বলে তাহা পিতৃলোক নহে। তা হলে পিতৃলোক প্রেতলোক নয়। মানুষ-দেবতা যম প্রথমে এই পিতৃলোকেরই রাজা ছিলেন। কাজেই যম যে শুধু মৃত্যু-রাজ্যের রাজা তা নয়। তিনি জন্ম রাজ্যেরও রাজা ছিলেন। এবং দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুরদের দ্বারা স্বর্গতাড়িত হয়ে যে স্থানে বাস করেন সে স্থান বিষয়ে সিদ্ধান্ত শিরোমণি বলেন "বসন্তি মেরৌসুরসিদ্ধ সংঘ্যা ঔর্ব্বেচ সর্ব্বে নরকা সেদৈত্যাঃ" এই স্থানগুলি মানস সরোবরের উত্তর এবং দক্ষিণে বাড়বানল যুক্ত সমুদ্রময় জলাভূমিরই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল এবং তাকেই "নরক" বলা হত। পূর্ব্ব মন্ত্রে ঔর্ব্ব .শব্দেরই বৈদিক অর্থ বাড়বানল। এ বিষয়ে ঔর্ব্বঋষির একটী পৌরানিক আখ্যা আছে তা লিখে প্রবন্ধের কলেবর বাড়াতে গেলে সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে উঠবেন। যাক্, এখন হতে অসুর ত্যক্ত এই নরক মঙ্গোলিয়ার রাজা মানুষ দেবতা যমরাজেরই হাতে আসে। বৈদিক প্রাথমিক যুগে এই স্থানকে ভৌম নরক বলা হত। এই স্থান অতি অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ছিল বলে নরক নাম দেওয়া হয়। এই নরক ভূমিতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হেতু যমরাজ তথায় একটী কারাগার তৈরী করেছিলেন। এবিষয়ে ঋক্‌বেদ বলেন "যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্র অবরোধনং দিবঃ।" আর এক কথা, গুরুতর অপরাধীদের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা যম ও শিব দিতেন। তাই বেদে এই উভয়কেই "মৃত্যু" বলা হয়। তাই বেদে দেখতে পাওয়া যায় "সোমরাজা বরুণোরাজা মহাদেব উতমৃত্যুরিন্দ্র।" যম যে মানুষ ছিলেন, তিনিও যে মানুষ মরলে কোথায় যায় তা জানতেন না সে বিষয়ে "যম—নচিকেত সংবাদ" পাঠে জানা যায় যে নচিকেত ভারত হতে দেবযান পথে যমের বাড়ী গিয়ে

অতিথি হয়ে যমরাজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন (১) "আচ্ছা বলুন ত মানুষ মরে কোথায় যায় ?" যম বল্লেন "এ অতীব গুহ্য বিষয়, আমি নিজেই তা জানি না। কেবল আমি কেন ? পরম যোগী শিব এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও জানেন না। অন্যের কথা আর কি বলব।"

সহৃদয় পাঠক ! একবার দয়া করে ভেবে দেখুন যে যমকে আপনারা যমালয়ের রাজা বলেন তিনিই জানেন না মানুষ মরে কোথায় যায় ! যম যে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন তা হতেই আজ প্রবাদবাক্য হয়ে গেছে মানুষ মরলে যমের বাড়ী যায়। এখনই স্বর্গপুরীতে যাবার রাস্তাটা বলা ভাল মনে করি। একজন বৈদিক ঋষি বলছেন—

"দ্বেস্মৃতী অশৃন্বম্ পিতৃনামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরম্ মাতরঞ্চ॥"

অর্থাৎ আমি শুনেছি যে, পিতৃলোকবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাদি দেবগণ, এবং মর্ত্ত্যলোকবাসী বা ভারতবাসী মনুষ্যগণ সকলেই এই ইন্দ্রাদি স্বর্গলোকে প্রধান দুটী পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে থাকেন। সে রাস্তা দুটির মধ্যে একটীর নাম দেবযান বা সুরবর্ত্ম এবং অপরটীর নাম পিতৃযান।

"চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতা।"

বায়ু পুরাণের এই বচনানুসারে জানা যায় যে ভারত হইতে স্বর্গ গমনের সাধারণতঃ চারিটী দেবযান পথ ব্রহ্মা সূর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হয়েছিল। একটী বোলান পাশ এবং অপরটী খাইবার পাশ দিয়ে; উভয়েই অপগস্থান বা আফগানিস্থানের সীমান্ত প্রদেশে। বেদপাঠে জানা যায় যে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ এই পথ দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তৃতেয় পথ বদরিকাশ্রম হয়ে; মহারাজ যুধিষ্ঠির এই পথ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন এবং বামন বিষ্ণু বা হরি এ পথ দিয়ে এসেছিলেন-তাই ইহা "হরিদ্বার" বা "স্বর্গদ্বার" নামে খ্যাত। চতুর্থ পথটি দার্জ্জিলিং হতে কালিংপো গ্যাটং প্রভৃতি স্থান হয়ে জালাপ নামক স্থানে ১৫ হাজার ফিট উচ্চে হিমালয়ের বরফাবৃত স্থান উল্লঙ্ঘন করে পরে ইয়াটুং এ যেতে হয় এবং সেখান হতে চাম্বা উপত্যকা পার হয়ে তিব্বত, স্বর্গ বা প্রথম অমৃত স্থান। ঋকবেদ বলেন যে, সবিতা-নির্ম্মিত যে সকল প্রাচীন পথ বোলান পাশ ও খাইবার পাশ দিয়ে অন্তরীক্ষলোক বা আফগানিস্থান হয়ে স্বর্গে গিয়েছে তার সব পথই সুগম, ধূলিশূন্য এবং সুন্দর। যথা

ভবিষ্যতে স্বর্গ ও নরক বিষয়ে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম কি বলেন তা বলবার আশা রইল। *

---

(১) যে যং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে—ইত্যাস্তাঃ
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা নহি সুজ্ঞেয় মনুরেষ ধর্ম্মঃ।
(কঠোপনিষদ)

* এই প্রবন্ধে আমার নিজস্ব কিছুই নাই। সবই চোরাই মাল। পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত "জীবতত্ত্ব বিবেক" গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

চতুর্ব্বিংশঃ।

চঞ্চলা

(গল্প)

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে প্রথম যেদিন জানান হয়েছিল যে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভার আজ থেকে তাঁর হাতে পড়েছে সেদিন তাঁর মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা জানিনা, কিন্তু এই ভারতের একপ্রান্তে বাংলাদেশের কোনো এক সহরে বাঙালী পরিবারের নিভৃত অন্দরে থেকে যেদিন জানতে পেরেছিলুম একটী পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে সেদিন আমার ভাবনা চিন্তার আর অন্ত ছিল না। বালিকা বয়সে মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করা কঠিন ব্যাপার হ'লেও বাংলাদেশের বালিকা-বধূগণ তাহাকে সহজ করে এনেছে বটে এবং যদিবা সৌভাগ্যফলে আমাকে সেদিকে বীরত্ব দেখাতে হয়নি কিন্তু বিধাতার নির্দ্দেশে আমার মস্তকে যে নূতন দায়িত্বভার চাপিয়ে দেওয়া হ'ল আমি সংসারে অনভিজ্ঞা, পরনির্ভরশীলা, স্বল্পবুদ্ধি রমণী হয়ে কেমন করে তা বহন করব সে কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠ্‌লুম। চৌদ্দবছরের ভিতর যাদের জন্মেও কখন দেখিনি, একদিন শাঁখা সিঁদুর পরে সেই একান্ত অপরিচিতদের ভিতরে এসে দুবছরের ভিতরই তাঁদের কেমন করে যে এতটা আপন করে ফেলেছি তা ভেবে আজ আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই, কিন্তু এই সংসারটা আমার কাছে চিরকালই অপরিচিত রয়ে গেল, অথচ যেদিন সেই সংসারের ভারই আমার হাতে তুলে দিয়ে শ্বাশুড়ী চিরবিদায় গ্রহণ করলেন সেদিন আমার চিন্তার আর অবধি রইল না।

সুখের বিষয় এই--সংসারে সুখ দুঃখ, চিন্তা ভাবনা, রোগ শোক কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। যে চিন্তার অকুল-সাগরে পড়ে আমি "যাই যাই" করছিলুম, একদিন সকাল বেলা চেয়ে দেখলুম একটী রমণীমূর্ত্তি আমায় উদ্ধার করতে যেন আমারি দুয়ারে এসে অপেক্ষা করছে। মুখে তার বেদনার ছাপ, চোখে ভরে করুণার জল ছল ছল করছে। বুঝ্‌লুম সে কৃপা ভিখারিণী—একান্ত দুঃখ তাকে এমন ভাবে পথে বার করেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যিনি থাকলে রমণীর পৃথিবীতে সব থাকে সেই স্বামী তা'র জীবিত আছেন বটে কিন্তু তবু সে কেন পরের কৃপার ভিখারী হ'য়ে পথে বেরিয়েছে সে প্রশ্ন করবামাত্র দেখলুম তার দুচোখ ছলছলিয়ে উঠে কয়েকফোটা জল ঝরে পড়ল। ব্যথাটা যে কোথায় তা টের পেয়ে তা'কে বল্লুম—"গেরস্তের বৌ, তোমাকে রাঁধ্‌তে ছাড়া আর কি কাজ করতে বল্‌তে পারি? তুমি রাঁধবে, খাবে থাক্‌বে—আমার এখানে তোমার কোন কষ্টই হবে না।" সেই হ'তে সে আমার এখানেই আছে—আমি তা'র হাতে খুঁটিনাটি সমস্ত কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি।

পাঁচ মাস পরের কথা। লোকে বলে বটে মেয়েমানুষের কৌতুহল অত্যন্ত বেশী—তারই ফলে নাকি মানব সমাজে আজ এত দুঃখদুর্গতি, কেননা আদি রমণী ইভ্ কুতুহলাক্রান্তা হয়েই জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। লোকে যাই বলুক না কেন—চঞ্চলা এসেছে অবধি তা'র জীবনেতিহাসটুকু জান্‌বার ইচ্ছা হ'লেও আমি এই পাঁচ মাস ধরে সে ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রেখেছি। মনে আছে সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা—বসন্তের হাওয়ায় মনটা আপনি যেন কেমন উদাস করে দিচ্ছিল। সন্ধ্যার আকাশে প্রকাণ্ড রূপার থালার মত চাঁদটী এমন সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আমাকে আকুল করে তুলছিল—আমি কিছুতেই সেদিন আর ঘরে বসে থাক্‌তে পারছিলুম না—তাড়াতাড়ি ছাতে চলে গেলুম। কতক্ষণ যে তন্ময় বিহ্বল হয়ে সেই অপরূপ চাঁদের পানে চেয়েছিলুম তা মনে নেই—হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি—চঞ্চলা আমারই পাশে নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিন আর কিছুতেই আমি আমার কৌতুহল দমিয়ে রাখতে পারলুম না কাছে ডেকে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"চঞ্চলা, কি চমৎকার জ্যোৎস্নাই আজ উঠেছে; আজ ইচ্ছা করছে এই চাঁদের আলোতে, ফাল্গুনের হাওয়ায় ঐ খোলা আকাশের-নীল-সায়রে ভেসে বেড়াই। আজ আমার কি যে হয়েছে—কিছুই ভাল লাগছে না। তুমি আজ একটা গল্প বল চঞ্চলা।" চাঁদের পানে মুখ ঘুরিয়ে চঞ্চলা হেসে বল্‌ল—"আমি আবার কি গল্প বল্‌ব? আমি কি গল্প জানি?" সেই চাঁদের আলোতে তা'র মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌লাম তার ছোট্ট ললাটে একটা কিসের দাগ—জ্যোৎস্নায় সেটা আরো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার নজরে পড়বামাত্র আমি তাকে প্রশ্ন করলুম—"চঞ্চলা, তোমার কপালে এই দাগটা কি করে পড়ল? কেটে গিয়েছিল কি? কেমন ক'রে কাট্‌ল?" আমার এত প্রশ্ন শুনে হঠাৎ তার হাসিমাখা মুখখানা বিষাদম্লান হয়ে গেল, চোখ দুটী নত হয়ে এল, বুকটা কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল; ধীরে ধীরে সে বল্‌ল—"কি আর বল্‌ব—সে বড় দুঃখের কাহিনী, কি হবে তা শুনে?" আমি জোর করে ধরে বস্‌লুম—"না, তোমাকে বলতেই হবে—আমি শুনব।" চঞ্চলা নিরুপায় হয়ে বলতে লাগল—"আমার এক ভাসুর আছেন—তিনি মদ ছাড়া একদিন থাক্‌তে পারেন না। আমাদের একঅন্নের পরিবার—দেখাদেখি আমার স্বামীরও সে অভ্যাস হ'ল। দুদিনেই তাঁরা আমার শ্বশুরের ভিটায় ঘুঘু চরাবার যোগাড় করে তুল্‌লেন। শ্বশুর বেশী কিছু সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তবু যা ছিল, যতটুকু ছিল আমাদের মত গরীবের পক্ষে তাই ছিল ঢের, কিন্তু দুভাই মিলে দুদিনেই সে সব সাবাড় করে উড়িয়ে দিলেন। আমাদের কষ্টের আর সীমা রইল না। দুঃখ যখন আসে তখন আর

একা আসে না। আমার স্বামী এক সওদাগরের অফিসে কাজ করতেন, পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে পেতেন, তাতেই আমাদের ছোট সংসার কোন রকমে চলে যেত। কিন্তু সে ত যাবার নয়; একদিন নেশার ঘোরে অফিসে গিয়ে তিনি সাহেব-ম্যানেজারকে কি এক অন্যায় অপরাধে দুটো ঘুষি মেরে-ছিলেন। সেদিন থেকেই তাঁর জবাব হ'ল।

চাকরী গেল কিন্তু সংসারের একটী কাজও কমল না, বরঞ্চ বেকার বসে থেকে মদের নেশা আরো বেড়ে চল্‌ল। এমনি করে ঘরের টাকা স্রোতের মত বেরিয়ে যেতে লাগল—বাকি রইল শুধু আমার সামান্য কয়েকখানা অলঙ্কারমাত্র। নিষ্ঠুর বিধাতার বুঝি তা'ও সইল না আমার স্বামীর ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'ল। ডাক্তারের দর্শনী ও ওষুধ পথ্যের জোগান দিতেই দুতিন শত টাকা সাবাড় হয়ে গেল। তবু ভাল—শুধু টাকার উপর দিয়েই বিধাতার উদ্যতকৃপাণ আঘাত করে ক্ষান্ত হ'ল—স্বামী আমার যমদুয়ার থেকে যেন ফিরে এলেন।

এই সময় সুযোগ বুঝে ভাসুর পৃথক হ'য়ে গেলেন।

আমার বড় মেয়ের বয়স তখন তেরো বছর। একে গরীব—তাতে আবার মাতালের মেয়ে—কাজেই বিয়ে দিতে পারলুম না। কিন্তু মেয়ের বয়স সে কথা মান্‌ল না—মেয়ে আমার চঞ্চল গতিতে দিনের দিন বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমার তখন চিন্তায় চোখে ঘুম নেই—মুখে অরুচ ধরে গেছে। মেয়ে আমার মনের কথা টের পেয়ে লজ্জায় দুঃখে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হ'তে লাগল। কি কর্‌বে সে—তা'র নিজের কোন দোষ নেই—কিছু করবার উপায়ও তার নেই যে! অথচ সমাজ তা'কে রক্ত চোখে শাসনের ভয় দেখাতে কসুর করছে না। এমনি করে এক বছর কেটে গেল। এমন সময় বিধাতার আশীর্বাদের মত ভাসুরের পরিচিত ফণী ডাক্তার এসে বল্‌ল—"বর আমি জুটিয়ে দিচ্ছি—নগদ এক পয়সা তোমাকে দিতে হবে না, শুধু মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে।" বিশ্বাস হ'ল না আমার। এমন সৌভাগ্য আমার হবে? এতখানি মনুষ্যত্ব বাংলাদেশে কোনো পুরুষের ভিতর আছে বলেত মনে হল না। দুদিন পরেই দেখি ফণী ডাক্তার একটী পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কি সুন্দর তা'র চেহারা—দেখেই যেন আপন করে নিতে ইচ্ছা হয়! ফুট্‌ফুটে রং, মিশমিশে চুল, টানা টানা চোখ, আর ঠোটের পাশেই দুটী একটী গোঁপ উঠি উঠি কর্‌ছে! ফণী ডাক্তার ভিতরে এসে বল্‌ল—"কেমন পছন্দ হয়? খাসা ছেলে মাইরি! বাপ ব্যারিষ্টার, ছেলেও দেখ্‌তে যেন কার্ত্তিক, কলেজে পড়ে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়েতে এক পয়সাও পণ সে নেবে না। আমি সুযোগ বুঝে তোমার প্রভার কথা পেড়ে বেশ বক্তৃতা ঝেড়ে দিয়েছি—তারই ফলে আজ সে প্রভাকে দেখে যেতে এসেছে। যাও, প্রভাকে দিয়ে পান পাঠিয়ে দাও।"

আনন্দে আমার বুকটা নেচে কেঁপে উঠল। প্রভাকে দিয়ে পান পাঠিয়ে দিয়ে একমনে আমি ভগবানকে ডাক্‌তে লাগলুম।

ছেলেটীর নাম হিমাদ্রীশেখর। প্রভাকে দেখে খুসী হ'য়ে যাবার সময় তা'র হাতে সে একটী হীরার আংটী পরিয়ে দিয়ে গেল। আমি মনে মনে শিউরে উঠে ভাবলুম দীনদরিদ্রের ভাগ্যে এ আতিশয্য সইলে হয়! তারপর একদিন আষাঢ়ের গাঢ় সন্ধ্যায় যখন সত্যি সত্যি সে এসে আমার প্রভাকে শব্দের ঝড় এবং আলোর ঢেউ তুলে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সেদিন আমার বুকের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা জগদ্দল পাথরের চাপ যেন নেমে গেল।

মেয়ে পার হ'ল বটে কিন্তু সেই ত শুধু একমাত্র মেয়ে নয়—ঘরে যে আরো একটী কন্যারত্ন আমাকে পথে বসাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। স্বামীকে বললুম—এমন ভোলানাথের মত সব ভুলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না; একটীকে পার করেছ, আরেকটী যে গলায় ঝুলে রয়েছে—সেটিকে ও ত পার কর্‌তে হবে। তুমি আমি দুচার বছর না হয় অপেক্ষা করতে পারি কিন্তু মেয়ের বয়স ত তা করবে না তা ছাড়া সমাজও যে রয়েছেন। ঘরের ধন ত ফুরিয়ে এল—একটা কিছুর উপায় দেখ—চাকরীর চেষ্টা কর।

কিছুদিন পর এক মাষ্টারী নিয়ে তিনি রাণীগঞ্জ চলে গেলেন। মনে হ'ল ভাগ্য বুঝি ফিরেছে—আর হয়তো অভাবের ভারে ডুবে মরতে হবে না। প্রথম ক'মাস চিঠিও লিখ্‌লেন, টাকাও পাঠালেন, কিন্তু তার পর সব বন্ধ। মাঝে একদিন এক চিঠি লিখে জানালেন—"আমি মাষ্টারী ছেড়ে অন্য চাকরীর চেষ্টায় আছি—তোমরা আমার চিঠি না পেলে চিন্তা কোরো না—যখন সুবিধা হবে টাকা পাঠাব।" কিন্তু সে সুবিধা জীবনে আর হ'ল না।

এদিকে আমার সংসার দিনের দিন অচল হ'য়ে আসতে লাগ্‌ল। কি করি—কোথায় যাই—সংসারে আমার কে আছে যে একটা পয়সা দিয়ে আমায় সাহায্য কর্‌বে? ভাসুর আমার থেকেও নেই। এমন স্বার্থপর ব্যভিচারী আত্মীয়ের নিকট সাহায্য চাওয়া—মরে গেলেও তা আমি পারব না। ভাসুরও ঠিক তেমনি আদ্‌মী—ঘরের পাশে মা ও মেয়ে দুটী প্রাণী না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছি, তবু তাঁর পাষাণ প্রাণে একবার ইচ্ছা হ'ল না যে দেখে আসি। কিন্তু ভাল মন্দ যাই হোক্—ফণী ডাক্তার দুঃখের সময় উদার হৃদয় এবং মুক্তহস্তের পরিচয় দিয়ে মরণোন্মুখ মা ও মেয়েকে রক্ষা করেছিল। রক্ষা ত করেছিল কিন্তু রক্ষণের নাম করে যে ভক্ষণের আয়োজন করে তুল্‌বে তা ত মনেও কর্‌তে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি সবই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ভাসুরের কারসাজী ছাড়া আর কিছু নয়। তিনিই ফণী ডাক্তারকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন; প্রভার সর্বনাশ তিনিই করেছেন, কেমন

হিমাদ্রীশেখরও তাঁরই লোক—সে ত ব্যারিষ্টারের ছেলে নয় - কোথাকার কোন এক জমিদারের আদুরে দুলাল অশিক্ষিত, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, লম্পট। পূর্ব্বেই সে এক বিবাহ করেছিল কিন্তু সে কথা গোপন রেখে আমার প্রভাকে তার রক্ষিতা করবার জন্যই মিথ্যাচরণ করে নিয়ে গিয়েছিল।

অভাবের সময় ফণী ডাক্তার সুহৃদের ন্যায় যখন সকল রকমে সাহায্য করতে এল তখন ত তাহাকে সন্দেহ করবার মত কোন ত্রুটীই দেখ্‌তে পাইনি—তাই সরল ভাবেই তার সকল দান, সকল সাহায্য গ্রহণ করতে পেরেছিলুম। শেষে একদিন একথা সেকথা, আবোল তাবোল বহু বকুনির পর সে একখানা সোনার হার আমার হাতে তুলে দিল। তা'র লোভটা যে কোথায় তা টের পেয়ে তক্ষুণি ঝেঁটিয়ে তা'কে দূর করে সদর দরজা বন্ধ করে দিলুম। ঘরে এসে হারখানা তুলে দেখি—এ যে আমারই হার! প্রভাকে আমি বিয়ের সময় আশীর্ব্বাদ করেছিলুম এই হার দিয়ে!

আড়াই বছর পরে স্বামী ফিরে এলেন। এলেন বটে কিন্তু না আন্‌লেন আড়াইটি পয়সাও সঙ্গে করে। তবে যেচে এসেছিল একজন—তার নাম ম্যালেরিয়া এবং তারই সঙ্গে পেটভরা পিলে ও মাথা জোড়া টাক! শুধু হাড় ক'খানা নিয়ে কঙ্কালসার মূর্ত্তিতে যখন তিনি সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন—ভয়ে দুঃখে বুকটা আমার কেঁপে উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লুম মাষ্টারী ছেড়ে এক কয়লার খনির আফিসে ত্রিশটাকার এক কেরাণীর কাজ নিয়েছিলেন—আশা ছিল সেই কোম্পানীর লাভের সামান্য অংশ তাঁকে দেওয়া হবে কিন্তু দুনিয়াটা এমনি মিথ্যায় এবং স্বার্থে, হিংসা ও প্রবঞ্চনায় ভরপুর যে দেহের রক্ত জল করে পাবার বেলা পেয়েছেন শুধু ভগ্নস্বাস্থ্য ও মনস্তাপ—আর কিছু নয়।

এদিকে স্বামীর জীবন সংশয়—ওদিকে ছোট মেয়ে ইন্দুর বিবাহ না দিলেও নয়। একদিকে জীবন মরণ সমস্যা—অন্য দিকে সংসার ও সমাজের ভ্রূকুটি কুটিল অট্টহাস! আমি নারী—একা কি উপায় করব? আমাদের বাড়ী একচুড়ি-ওয়ালী প্রায়ই চুড়ি নিয়ে আস্‌ত—তা'র কাছে আমার সুখ দুঃখের সকল কথাই বলে প্রাণে যেন একটু শান্তি অনুভব করতুম। হঠাৎ একদিন একটী মহিলা এসে বল্‌লেন তিনি আমার মেয়ের ঘটকালী করতে এসেছেন—খবর পেয়েছেন সেই চুড়ীওয়ালীর কাছে। খুসী হয়ে তাঁকে বস্‌তে দিলুম। বরের খবর নিয়ে জান্‌লুম—"মোটে পাঁচবার তিনি বিয়ে করেছেন কিন্তু আজ অবধি একটী সন্তানেরও মুখ তিনি দেখ্‌তে পেলেন না—তাই তাঁর বড় দুঃখ। সবগুলি স্ত্রীই তাঁর এমনি অকৃতজ্ঞ যে একেকজন পাঁচছ'বছর করে তাঁর অন্ন ধ্বংশ করে নিমতলাঘাটে মারা গেল কিন্তু সন্তান রেখে গেল না একটীও! বয়স তাঁর খুব যে বেশী তা নয়—এই ধরুন তিন কুড়ি সাতের ঘরের কাছাকাছি—তার বেশী হবে না। তা ছাড়া কোথাকার কোন্ এক গণৎকার হাত দেখে বলেছে, ষষ্ঠপত্নী পুত্রবতী হবে—দ্বিজগণৎকারের বাক্য নিস্ফল হ'তে পারে না। তা ছাড়া পোষ্টাফিসের চাকরী আছে—পয়ত্রিশ টাকা মাস! পেন্সন দু'এক বছরের ভিতরই হবার কথা—তাহ'লে ত আর কথাই নেই—ঘরে বসেই টাকা পাওয়া যাবে। আমি বলি কি - এমন সুযোগ ছাড়তে নেই—এমন সুপাত্র হাতছাড়া করতে নেই—শেষে কিন্তু পস্তাতে হবে।" সবই বুঝলুম্—পস্তাতে ত আমাকেই হবে—আমারই যে কন্যাদায়! জিজ্ঞাসা করলুম—এর পরেও কি যৌতুক চাই? ঘটকী বল্‌ল—"না না, তা আবার কেন? তবে—এই—একপাটি দাঁত বাঁধিয়ে দিতে হবে—কেন না মাংসটা তিনি একটু বেশী ভালবাসেন, আর এই একটী রূপার হুঁকো এবং অতি সাধারণ এক জোড়া চশমা আর কিছু নয়। চোখে তিনি দেখেন ভালই, তবে কি না পোষ্টাফিসের কাজ—কেবলি লেখাপড়া—চশ্‌মাটা চোখে দিলে ঝাপ্‌সাটা একটু কম ঠেকে!"

আমি তাতেই রাজী হলুম। চোখের জলে আশীর্ব্বাদ করে মেয়েকে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিলুম।

সমাজের মুখ বন্ধ করে ঘরে ফিরে দেখি স্বামীর যা অবস্থা ডাক্তার না দেখালেই নয়, অথচ বিনি পয়সার ডাক্তার ফণীকেই বা ডাকি কি করে। অন্য ডাক্তারও যে আনব—ঘরে পয়সা কোথায়? শেষে মান সরম বিসর্জ্জন দিয়ে ভাসুরের পা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়লুম—অর্থ ভিক্ষা চাইলুম। কিন্তু হায়! মানুষের ভিতর যে এতবড় নরপিশাচও থাকৃতে পারে জান্‌তুম না—সেদিন প্রত্যক্ষ করলুম। তিনি একটা মদের বোতল দেখিয়ে আমায় বল্‌লেন—"ঘরের ডাক্তার তাড়িয়েছ, এখন যাও, ঐ বোতল ভরে জল নিয়ে খেতে দাও—ওষুধ দিয়ে কি হবে?" স্বামীকে এসে বললুম—কি উপায় হবে? তিনি নিজেই তাঁর দুর্ব্বলদেহ কোনমতে টেনে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে দাদার ঘরে গেলেন এবং তাঁর বৌদির পায় পড়ে কিছু টাকা ঋণ স্বরূপ চাইলেন। দিদি আমার অর্থসাহায্য চুলোয় যাক্—চীৎকার করে উঠলেন—"ও কি কর ঠাকুরপো! আমার গায় হাত .... !" সে প্রলয়ঙ্করী আর্ত্তনাদে আমার ভাসুর বেরিয়ে এসে তাঁর মরণোন্মুখ ভাইকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিলেন!

সেই যে অপমান—তা'র চেয়ে মৃত্যুও ছিল ভাল। দুঃখ, অপমানে, অভাব ও ব্যাধিযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সেদিন রাত্রেই তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে বাধা দিয়ে মরতে দিই নি। পরদিন সকাল থেকে তাঁকে আর পাওয়া গেল না। কি হ'ল—কোথায় গেলেন—জানি না। দু'মাস পর হঠাৎ এক অন্ধকার রাত্রে দেখি মদের বোতল হাতে করে তিনি ফিরে এসেছেন! আলো জেলে দেখি সঙ্গে আমার ছোট কন্যা ইন্দুনিভা! হায়—এরই ভিতর

তার এয়োতির বেশ ঘুচে গেছে! কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই তিনি এগিয়ে এসে জোর করে আমাকে মদ খাওয়াতে চাইলেন—আমি মুখ ফিরিয়ে নিতেই মদের বোতলটা আমার কপালের দিকে ছুঁড়ে মেরে তিনি হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কপালের দাগটা তাঁরই—দেওয়া বিদায়ের-শেষ-চিহ্ন। সেই যে গেছেন আজ পর্য্যন্তও তাঁর কোন খোঁজ পাইনি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তিনি চলে যাওয়ার পর তুমি কোথায় কি ভাবে ছিলে?" চঞ্চলা বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমি এতদিন আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে ভাসুরের আশ্রয়েই ছিলুম। মেয়ের বসন্ত হ'লে তা'কে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে ভাসুর আমায় এসে বল্লেন—"তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে ত আমি খাওয়াতে পারব না—তোমাকে এ ঘরের ভাড়া দিতে হবে এবং আমার বাড়ীর কাজ কর্ম্ম যা কিছু সব তোমাকেই কর্‌তে হবে।" কাজ ত করেই আস্‌ছি—কিন্তু ঘরভাড়া আমি কোথা থেকে সংগ্রহ করব? ভাসুর বললেন—"তোমাকে বলেই মাত্র এক টাকায় ছেড়ে দিচ্ছি—বাইরের লোককে ভাড়া দিলে এই ঘর থেকে আমি পাঁচ টাকা পেতে পারি জান?" ঠিক সে দিনই সন্ধ্যায় খবর এল হাঁসপাতালে ইন্দু আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে মুক্তি লাভ করেছে। সারা-রাত কেঁদে কেঁদে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় কে যেন আমার মাথাটা মাটি থেকে বালিসের উপর তুলে দিল। চোখ চেয়েই দেখি—সম্মুখে ফণীডাক্তার! বাঘের মুখে পড়লে মানুষের যে অবস্থা হয় আমার প্রথম সেই দশা হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই কোথা হ'তে যেন সিংহের বল পেয়ে লাফিয়ে উঠে বললুম—"ফের্ তুমি এয়েছ আমায় জ্বালিয়ে মার্‌তে? নির্লজ্জ কাপুরুষ! বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।"

ফণী বল্‌ল—"যাব, কিন্তু যাবার আগে জানিয়ে যাব তোমার স্বামী যা'কে খুন করতে চেয়েছিল সেই ফণী ডাক্তার এসেছিল তোমাকে উদ্ধার করতে।"

"বটে, তুমি এয়েছ উদ্ধার করতে—আমাকে? আচ্ছা, রোসো—" বলেই খাঁ করে ঝাঁটাটা তা'র পিঠে বসিয়ে দিয়ে আমি ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। রক্ষা এই—ফণী আর আমায় তাড়া করে আসেনি। সে দিনই সকাল বেলা ঘুরে ঘুরে তোমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি।"

চঞ্চলার জীবনেতিহাস আমাকে একেবারে অবশ করে দিয়েছিল। বসন্তের সেই জ্যোৎস্না রাতটা যদি শ্রাবণের অজস্র ধারায় পৃথিবীকে কান্নার সুরে নিবিড় করে তুল্‌ত তবেই ছিল ভাল। কেন আমি তা'কে প্রশ্ন করেছিলুম?

এমনি ভাবে পরিচয় পেয়ে পরদিন থেকে আমার কেমন যেন লজ্জা হ'তে লাগ্‌ল। একটী ভদ্র গৃহস্থের বৌ, তা'কে আমি কেমন করে মনিবের আসনে বসে হুকুম দিয়ে বলি—এটা কর, ওটা কর? মানুষ অদৃষ্টের হাতের ক্রিড়নক মাত্র—নইলে একজন প্রাসাদে রাজপুত্ররূপে এবং আরেকজন পর্ণ কুটীরে দরিদ্র কৃষাণের ঘরে জন্ম নিতে যাবে কেন? এই যে চঞ্চলা—যা'কে আমি আজ দাসীর ন্যায় খাটিয়ে দুটো ক্ষুধার অন্ন দান করে নিজেকে বড় ভেবে অহঙ্কার করছি—এ চঞ্চলা চিরকাল ত অন্নের কাঙাল ছিল না—সেও ত আমারই ন্যায় একদিন গিন্নির আসনে বসে তা'র নিজের ক্ষুদ্র সংসারটীকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দিনের দিন এই যে তার দুর্গতির একশেষ হয়ে গেল—এই যে সে আমার দ্বারে কৃপার ভিখারী হয়ে রয়েছে জীবনের উপর দিয়ে দুঃখ শোকের কত ঝড় ঝঞ্ঝা যে বয়ে গেল—তা'র নিজের দোষ ত কোথাও দেখ্‌তে পাই না—তবু কেন এমন হয়? কেন তা'র এত দুর্গতি—এত লাঞ্ছনা? কে এ প্রশ্নের জবাব দিবে? কোনো মীমাংসা এর নেই—তাই বল্‌তে ইচ্ছা করে—

অদৃষ্টে রয়েছে যাহা জীবনে ঘটিবে তাহা।

চঞ্চলাকে কোনো কাজ দিতেই আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠে। রসুই ঘরে যাওয়া তা'র একেবারে বন্ধ করে দিলুম। তখন গ্রীষ্মকাল। বেজায় গরম পড়েছে। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি একদিন বিকাল বেলা দোতলায় বসে আমি চুল বাঁধছি—চঞ্চলা আমার চুলের জটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে ও গল্প করছে। এমন সময় নীচে বাইরের আঙিনায় কে যেন ভারি জোর গলায় বলে উঠল—"দে, দে, এক গ্লাস জল দে—বড় তৃষ্ণা—বুক ফেটে যাচ্ছে।"

উনি তখন বৈঠকখানা ঘরে ওস্তাদের নিকট সেতার শিখছিলেন। চেঁচামেচি শুনে চাকরকে এক গ্লাস জল দিয়ে লোকটাকে বিদায় করে দিতে বললেন। জল খেয়ে সে যাবে দূরে থাক্ ঘরে ঢুকে একেবারে ইজি চেয়ারটায় সটান শুয়ে পড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—"Trailing clouds of glory we have come—হাঁ, দেখুন মশাই—অনাহূত ঘরে ঢুকে আপনাকে disturb করছি—বেয়াদপি মাপ করবেন।" উনি ঠাট্টা করে বললেন—"হাঁ হাঁ, তা ত করতেই হবে—যেহেতু দয়া করে পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন। আচ্ছা—মশাইর নাম?"

"আরে—নাম জেনে কি হবে?

মানুষ বলি সেই জনারে
নাম থাকে যা'র ভবে।

দেখুন মশাই, এই কল্‌কাতা সহরটা ঘুরে দেখলাম—বাংলার অনেক জায়গা ঘুরে এসেছি কিন্তু একটা মানুষের মত মানুষ চোখে পড়ল না। বিদ্যাসাগর গেল, বিবেকানন্দ গেল—যেমনটি যায় তেমনটি আর আসে না। যায়—যায়—ওই যায়! ওই যায়! ওই যায়! সব যায় রে—সব যায়! আচ্ছা, কেন এমন হয়? হাঁ, দেখুন মশাই. সবাই বলে আমি পাগল! We are all but born lunatics. পাগল নয় কে? কেউ বেশী, কেউ কম এই

যা তফাৎ। আপনি আমায় পাগল ঠাওরাবেন না। আমি কথা কিছু বেশী বলে থাকি এই যা দোষ। কি করব, উপায় নেই। মাথায় কত কি চিন্তা অহরহ ঘুরপাক্ খাচ্ছে কত দুঃখ, কত শোক, কত ঝড়, কত বজ্রপাত! উঃ ইচ্ছা করে ভূমিকম্পের মত একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে পৃথিবীটা তোলপাড় করে তুলি। এত প্রবঞ্চনা, এত স্বার্থপরতা! দুনিয়াতে এত অপমান লাঞ্ছনা এত অবিচার অত্যাচার? কেন—কেন এ বিড়ম্বনা? এত দুঃখ সয়ে কেউ আজ পর্য্যন্ত বেঁচে নেই পৃথিবীতে—এক আমরা ছাড়া। আমরা নিজেকে নিজে hypnotise করে রেখেছি। জন্মাবধি আমরা শুন্‌ছি যে আমাদের মত মূর্খ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাপন্ন ঘৃণ্য জাত দুনিয়াতে আর কোথাও নেই। We are born slaves, —we are downtrodden beasts—we are white man's burden! হায় রে হায়! এর চেয়ে লজ্জা আর কি হ'তে পারে? এই সেদিনও যারা উলঙ্গ ছিল বনের পশু মেরে কাঁচা মাংস খেয়ে যারা জীবন ধারণ করত তা'রা কি না আজ এই সভ্যতায় প্রাচীনতম জাতকে বলে whiteman's burden! ওরা যখন অসভ্য বর্ব্বর তখন আমাদের মুনি-ঋষিগণ অধ্যাত্ম জগতে যে সত্যাবিষ্কার করে বলেছিলেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আবিরাবর্ম্মএধি, একমেবাদ্বিতীয়ম্—যাদের অধ্যাত্ম বিদ্যার কাছে জগৎ এখনো শিক্ষা পেতে পারে তা'দের আজ এ দুর্গতি কেন?"

"উনি প্রশ্ন করলেন আপনার বয়স কত?"

"সে খবর নিয়ে কি হবে বাপু? বয়স যা'র যতই থাক্—বুদ্ধি নিয়ে হচ্ছে কারবার।"

"কোথায় থাকেন?"

"পথে ঘাটে, হাটে মাঠে। The sky my roof, the grass my bed and food what chance may bring."

ঠিক এই সময়ে দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করে' ছটা বেজে উঠ্‌ল। পাগল অমনি লাফিয়ে উঠে বলল—Just the thing! ঠিক বলেছিস্ ঘড়ি—ঠিক বলেছিস্—টং টং—টং টং—টং টং—They take, they take, they take! নিয়ে যায়! নিয়ে যায়! সব নিয়ে গেল রে—সব—একেবারে সব।"

প্রশ্ন—"কোথায়—কে নিয়ে গেল? কি নিয়ে গেল? আবোল্ তাবোল্ কি যে সব বক্‌ছেন—এমন করলে কেন লোকে আপনাকে পাগল বল্‌বে না?"

"হাঁ, তাত বল্‌বেই। উচিৎ কথা বললে পাগল বল্‌বে পাগল বল্‌বে না শুধু—আরো কিছু দক্ষিণা দিয়ে তবে ছাড়বে। আরে মূর্খের দল! বুঝ্‌তে পারছ না ঘরের অন্ন বিলিয়ে দিয়ে অন্নাভাবে মরতে কে কবে শুনেছে? গোলা ভরা শস্য যা'র—যা'র ঘরে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ—যা'র ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাক্‌তো—আজ বারোমাস তারই দুয়ার আগ্‌লে বসে আছে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী—একি মিথ্যা কথা? অথচ মুখ ফুটে মনের কথা গুলো বল্‌ব তা'র পর্য্যন্ত উপায় নেই—উঃ কি অত্যাচার! কি horrible, in human barbarity! অথচ এরই নাম! Law! Civilisation!"

প্রশ্ন—"আপনি বিলাত গিয়েছিলেন?" "না।"

"আপনি কি কংগ্রেসের লোক?"

"তা কেন হ'তে যাব?"

"আপনি কি অবধি পড়েছিলেন?"

"বি. এ.—আরে দূর ছাই! আমার কান ঝালাপালা করে দিলে। শেষটায় পাগল করে তুল্‌বে দেখ্‌ছি। না মশাই, আর নয়, নমস্কার। অনেক বিরক্ত করলুম—ক্ষমা করবেন এবারে পালাই।"

কথা শেষ করে' দুহাতে সকলকে নমস্কার করে' পাগল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উনি তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"বিরক্ত যখন করেছেন তখন আরো কয়েক ঘণ্টা করে যান কোনো আপত্তিই কর্‌ব না। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌ব ভাবছি—বসুন। একটু তামাক ইচ্ছে হবে কি?—ওরে নাথু, ভাল করে এক ছিলিম্ তামাক সেজে নিয়ে আয়। আচ্ছা শুনুন্, আপ্‌নি এভাবে ঘুরে বেড়ান কেন? আর যে ভাবে কথা বার্ত্তা বলে থাকেন—কোন্ দিন পুলিসের"—"Damn your পুলিশ। কোনো ব্যাটারও আমি তোয়াক্কা রাখিনে।" "মাঝে মাঝে ত বেশ বুদ্ধিমানের মত ভাল ভাল কথা বলে সুবুদ্ধির পরিচয়ই দিয়ে থাকেন—তবে হঠাৎ আবার অসংলগ্ন কথা কেন যে এসে পড়ে! ঐটুকুই যা দোষ। আপনি ভাল ডাক্তার দেখিয়েছেন কি?"

হাঁ—ডাক্তার—the devil of a doctor! ডাক্তার দেখাব কি? মেরে খুন করে ভূত্ বানিয়েছি যে! ওঃ—সয়তান! the most notorious Satan of the soil. আমারি পেছনে ব্যাটা ভূত হ'য়ে রাতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই! ওই যে! ওই যায়! ওই যায়! ওই যায়! নাঃ, চল্লুম্।"

পাগল ছুটে দরজার দিকে গেল। ঘরে বিস্তর লোক জমে গিয়েছিল—সবাই তা'কে আগ্‌লে দাঁড়াল। উনি নরম গলায় ডেকে বল্‌লেন "যাবেন না দয়া করে। হঠাৎ উঠেই রওনা দিচ্ছেন—ভদ্রলোকের পক্ষে যে এটা নিতান্ত অশোভন—out of etiquette—আপনি ঠাণ্ডা হয়ে বসুন।" পাগল আবার চেয়ারে বসল। ভিড়ের ভিতর থেকে একজন প্রশ্ন করলেন—"হাঁ মশাই—আপনি ডাক্তারকে মেরে খুন করেছিলেন কেন?"

"আবার কেন ? করব না ? এক শ বার করব। এমন হারামজাদা সয়তানকে যে ছেড়ে দেয় he comits a crime !" "আচ্ছা মেরেছেন ভালই করেছেন, লোকের কাছে তা বলে বেড়াবেন না ফাঁসী যেতে হবে। ঠাণ্ডা মেজাজে কয়েকটা কথার জবাব দিন ত। বিয়ে করেছিলেন কি ? "

হাঁ।"

"স্ত্রী কোথায় ?"

"কে জানে কোন্ চুলোয় !"

"আপনার ছেলে মেয়ে ক'টী ?"

"অত খোঁজ নেবার দরকার ? ছেলে ত নেইই, মেয়েদুটোকেও পার করেছি—ঘট্‌কালী আর করতে হবে না।"

"ঘটকালী করতে যাব কেন ? তবে খোঁজ নিচ্ছি—কেননা আপনি নিজ থেকে এসেই এখানে এত কথা বলতে সুরু করেছেন কেউ ডেকে ত আনে নি আপনাকে।"

"ওঃ তাই ! There I am ! Never mind" ঘড়ির দিকে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে নিজেই বলতে লাগল—Yes, quite right—Tick tick - tick, the clock says tick tick tick, they take, they take, all they take away ওই—ওই যায় ! ওই যায় ! ওই যায় !—"

প্রশ্ন—"আপনি কোথাও কোন চাকরী করতেন কি ?"

"হাঁ, করতুম—অনেকখানেই করেছি।"

"চাকরী ছাড়লেন কেন ? অসুখ না আর কোন কারণ ছিল ?"

"কারণ ছিল অনেক—সে ইতিহাস—অতীত স্মৃতি—বড় মর্ম্মান্তিক !

"আচ্ছা দয়া করে যদি আমাদের একটু সংক্ষেপে আপনার জীবনী বলতে পারেন তা হ'লে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হব।"

"আচ্ছা শুনুন—খাঁ করে আমি বলে যাব। এই ধরুন—আমার জন্ম হ'ল, হাতে খড়ি হ'ল, ইস্কুল ছেড়ে কলেজ, কলেজ ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী—হাঁ, বি এ অবধি পড়েছিলাম—তার পরেই বিয়ে—"বিয়ের পরেই দুটি কন্যা এলেন যেন প্রবল বন্যা।" এই সময় দাদার কয়েক ইয়ার বন্ধু মিলে আমায় ধরিয়ে দিলেন হুইস্কি। ঘরে নাই পয়সা, ওদিকে অভ্যাস হল নেশার; দু'চারটে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে যদি friendship থাকত তবু এক কথা ছিল, তাও যে ছিল না। তা ছাড়া কোন ব্যাটা দোকানদারই বিনিপয়সায় হুইস্কি ব্রাণ্ডি বিলিয়ে দেবার দায়ে দোকান খুলে বসে নি। কি আর করা যায়—চুরি বাটপারিটাও যে শেখা হয় নি ! কাজেই চাকরীর চেষ্টা—সওদাগর অফিসে কাজ—বেদম ঘুসী বাবা—বেদম ঘুসী ! একেবারে সাহেব ম্যানেজারের নাকে ! আর যাবে কোথা—একদম ডিস্‌মিস্ !

ওদিকে মেয়ে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল—কিন্তু মাতালের মেয়ে বিয়ে করে কে ? শেষে টাকা গেল, হাজার টাকার গয়না গেল—বিয়ে হ'ল এক লক্ষ্মীছাড়া জালিয়াতের সঙ্গে। আবার চাকরী—রাণীগঞ্জে এ কিছুদিন মাষ্টারী, কিছুদিন কেরাণীগিরি। তারপর ম্যালেরিয়ায় জীবন সংশয়। বাড়ী ফিরে দেখি ছোটকন্যাও বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। তা'কে দিলুম এক গঙ্গাযাত্রীর গলায় ঝুলিয়ে। দুমাসের ভিতরই তার স্বামীর-ঘর-করা চিরকালের জন্য ঘুচে গেল। মেয়েটাকে নিয়ে ঘরে ফিরেছি তখন রাত অনেক—হাতে ছিল মদের বোতল—স্ত্রীকে বল্লুম 'খাবে এস'—সে জোর করে ফিরিয়ে দিতেই বোতলা ছুঁড়ে মারলুম চটাং করে কপালটা ফেটে রক্তের ধারা বেরিয়ে এল। চীৎকার করে সে আমার পায়ের উপর ছুটে পড়তেই মনে হ'ল—খুন করেছি—আমি খুন করে ফেলেছি ! দুপায়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে বাইরে এসে দেখি—দাঁড়িয়ে আছে সেই রাস্কেল্—that notorious rogue—the devil of a doctor—সেই সয়তান ফণী ডাক্তার ! হাতের লাঠিটা তুলে একঘায়ে তাকেও ধরাশায়ী করলুম। খুনের উপর খুন্ ! ওঃ—সেই থেকে ব্যাটা আমারই পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে !—ওই—ওই ! ওই যে !—ওই যায় ! ওই যায় !

হাঁ—হয়েছে—

আমি এবারে পালাই—"

চুল বাঁধা আমার অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু চঞ্চলা আমার পাশ থেকে কখন যে চলে গেছে তা টেরও পাই নি। পাগলের গল্পবলা শেষ হ'তে না হ'তেই চঞ্চলা ছুটে গিয়ে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে। আগুণে পা পড়লে মানুষ যেমন ধারা লাফিয়ে উঠে—পাগলও ঠিক তেমনি ভাবে লাফিয়ে উঠে বলল—"আরে যাঃ যাঃ, সেই মায়াবিনী—কুহকিনীর জাত—দূর হ, দূর হ।" কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ভিড় ঠেলে পাগল রাস্তায় বেরিয়ে গেল এবং তার পেছনে চঞ্চলাও ছুটে ছুটে কোন্ গলিতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ঝড়ে-উড়ে-আসা পাতার মত চঞ্চলা একদিন আমার এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, আজ আবার হঠাৎ ঝড়েরই হাওয়ায় সে কোথায় উড়ে গেল তা কে জানে ?

বুদ্ধদেব—জরা সন্দর্শনে

শিল্পী— শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ১৯শে পৌষ শনিবার, ১৩৩১। [৮ম সপ্তাহ

শিল্প প্রদর্শনী

[কলিকাতা ফাইন আর্ট সোসাইটি]

আমাদের দেশে শিল্পের আদর বাড়িতেছে। আজকাল অনেকেই শিল্প সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন; নানাভাবে শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইতেছেন; শিল্পীরাও উৎসাহিত হইয়া শিল্প সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ললিত-কলা শুধু ধনী ও সম্পত্তিপন্ন লোকেরই বিলাস-উপকরণ নহে, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের নিকটও তাহার মূল্য আছে, তাহাতে তাঁহাদেরও অধিকার আছে। সাহিত্য ও শিল্প ব্যতিরেকে জাতির পরিচয় পরিস্ফুট হয় না। এ দেশে শিল্প চর্চ্চা যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না যে ইহাও স্থায়ী আসন পাইবে। এবং বঙ্গ সাহিত্যের মত বঙ্গ-শিল্পও বিশ্বের দরবারে আদর পাইবে। সুখের কথা সন্দেহ নাই যে আমাদের দেশের একাধিক শিল্পীর চিত্র বিদেশে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছে, এখনও পাইতেছে।

গত কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে বড়দিনের সময়ে একটি করিয়া শিল্প প্রদর্শনী বসিয়া থাকে। শুধু বাঙ্গালার নয়, ভারতের শিল্পীগণ এই প্রদর্শনীতে চিত্র পাঠাইয়া থাকেন। আমরাও বৎসরান্তে একবার শিল্পীদের শিল্প-চর্চ্চার নিদর্শন দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি।

এ বৎসরের শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত চিত্রের কয়েকখানির প্রতিকৃতি আমরা এতৎসহ মুদ্রিত করিলাম। প্রদর্শিত সমস্ত চিত্রের অথবা সমস্ত উল্লেখযোগ্য চিত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া সম্ভবপর নহে।

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত ঠাকুর সিংএর চিত্রগুলি এবার প্রদর্শনীতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শিল্পী বর্ণ সম্পাতে ও তুলিকা বিন্যাসে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার "শিল্পী" চিত্রখানির প্রতিচিত্র নিয়ে দিলাম।

আমাদের দেশের নারীরা এককালে শিল্পচর্চ্চায় যথেষ্ট উন্নত ছিলেন। শিল্পী তেমনই কোন একটি শিল্প-চর্চ্চারত

নারীকে চিত্রিত করিয়াছেন। শিল্পীর একাগ্রতা তন্ময়তার সঙ্গে তাহার আত্মপ্রসাদের ভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঠাকুর সিংএর "সৌন্দর্য্য" চিত্রখানিও মনমুগ্ধকর। স্নানান্তে কবরী-বন্ধন দেখানই শিল্পীর উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকতায় চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে।

ঐ শিল্পীরই "তুলসী সেবা" আর একখানি সুন্দর চিত্র। রমণী স্নানান্তে তুলসী গাছে জল দিতেছেন। রমণীর সিক্ত বসন চিত্রখানিকে যেমন স্বাভাবিক ভাব সম্পন্ন করিয়াছে, মুখ-চোখের ভাবটিও ভক্তিপূর্ণ হইয়া চিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে;

শ্রীযুক্ত পুলিন কুণ্ডুর "অন্বেষণ" (in scarch of a butterfly) চিত্রখানির নামের সঙ্গে বিষয় বস্তুর তেমন মিল না থাকিলেও, চিত্রখানি প্রশংসার্হ। বনের মধ্যে একটি আধুনিক ধরণে সজ্জিতা মেয়েকে শিল্পী এই চিত্রে দেখাইয়াছেন। তাহার চক্ষে একটা ব্যাকুলতার ভাব ফুটিয়া আছে, সেটা দেখিয়া আমাদের মনে হইল এই সহরের মেয়েটি হঠাৎ কোন পাড়াগাঁয়ের বনে গিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে এই ভাবই যেন অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন অঙ্কিত "উষা" একখানি সুন্দর চিত্র। রাত্রির নীরব অন্ধকার ভেদিয়া উষা যেমন রূপ সৌন্দর্য্য সঙ্গীত লইয়া আগমন করেন, শিল্পী চিত্র খানিতে সেই ভাবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উষাসুন্দরীর মুখে মধুর মধুর হাসি গমন ভঙ্গীতে সঙ্গীতের ছন্দ—চিত্র খানিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীযুক্ত জে, গোস্বামীর "পল্লীবালা" একখানি সুন্দর চিত্র। বেশ একটি ব্রীড়া নম্রভাব চিত্রটিতে ফুটিয়া আছে।

শ্রীযুক্ত কে, এল মল্লিকের "নিদ্রিত বালক" ছবিখানি বেশ। বালকটি পড়িতে পড়িতে, খোলা বহির উপর মাথা রাখিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছেলেদের স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি বলিয়াই চিত্রখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বি; সি, মুখার্জীর "কাশুণ্ডার রাজপুত্র" ছবিখানি বেশ। একটি শিশু, একটি প্রকাণ্ড ফুটবল স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, বলটিকে স্বাধিকারে পাইয়াই সে নিশ্চিন্ত। বলের যে অন্তরূপ ব্যবহার আছে তাহা হয়ত সে জানে না; অথবা জানিলেও, সে ভাবে সেটি ব্যবহার করা তাহার সাধ্যাতীত, তাই সে সেটিকে দু'হাতে আগুলিয়া রাখিয়াই সুখী।

শ্রীযুক্ত পি, বি, স্যান্যালের "দেবর্ষি নারদ" চিত্রখানিও দেখিবার যোগ্য।

ভাস্কর্য্যে শ্রীযুক্ত কারমাকারের কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহার "জীবন-সায়াহ্নে" দেখিলে যদিও 'শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা'ই মনে পড়িয়া যায়, তবুও আনন্দ হয়। শিল্পী অসামান্য ক্ষমতাবলে সেই ভয়ঙ্কর দিনকে একেবারে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালায় "তিন-মাথা-এক" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে—দেহ যখন বার্দ্ধক্যে ভগ্ন, জরায় জীর্ণ, তখন অনেক বৃদ্ধকে দুইটি হাঁটু একত্র করিয়া তাহারই উপর মাথার ভার রাখিয়া বসিয়া থাকাকে "তিন-মাথা-এক" বলে। এই মূর্ত্তিটিতেও বৃদ্ধ তিন মাথা এক করিয়া বসিয়া আছে। তাহার বার্দ্ধক্য রেখাঙ্কিত ললাট, মাংসশূন্য দেহ আর করাল ছায়াঙ্কিত আনন—শিল্পীর নৈপুণ্যের নিদর্শন।

উক্ত শিল্পীর "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" ভাস্কর্য্যের একটি নিদর্শন। দেশবন্ধু বাঙ্গালার-ভারতের আদর্শ দেশপ্রেমিক; শ্রীযুক্ত কারমাকার তাঁহার চিত্র খোদাই করিয়া তুলিয়া ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এম, এন, গুপ্তের "বেহুলা"ও সুন্দর হইয়াছে। মৃত পতি-ক্রোড়ে বেহুলা চিত্রের প্রদর্শনীয় বস্তু।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকের "পরিত্যক্তা" চিত্রখানি সুন্দর, করুণ। আমরা ইতিপূর্ব্বে সচিত্র শিশিরে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর কতকগুলি শিল্পের প্রতিচিত্র মুদ্রিত করিয়াছিলাম। প্রমথ বাবু উদীয়মান শিল্পী, আশা আছে ভাস্কর্য্যে তিনি একদিন যথেষ্ট উন্নতি করিবেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু আর একখানি চিত্র "ভাব"। শিল্পী শিল্পীর আদর্শ-স্বরূপিনী একটি নারীমূর্ত্তি খোদিত করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এবার বাঙ্গালার নামজাদা শিল্পীগণের শিল্প প্রদর্শনীতে দেখা গেল না। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রকুমার সেন, যামিনীরঞ্জন রায়—ইহারা সকলেই অনুপস্থিত। কাজেই নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে প্রদর্শনীর একটা দিক এবার একেবারে অন্ধকার।

শিল্পী

সৌন্দর্য্য

তুলসী সেবা

অন্বেষণ

উষা

পল্লীবালা

নিদ্রিত বালক

কাশ্মণ্ডার রাজপুত্র

দেবর্ষি নারদ

জীবন-সায়াহ্নে

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন"

বেহুলা

পরিত্যক্তা

ভাব
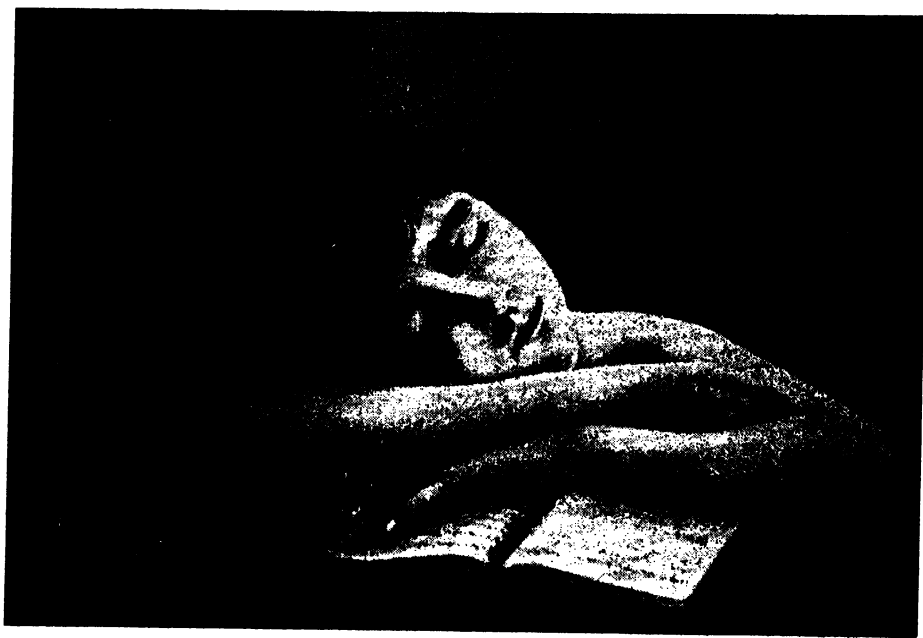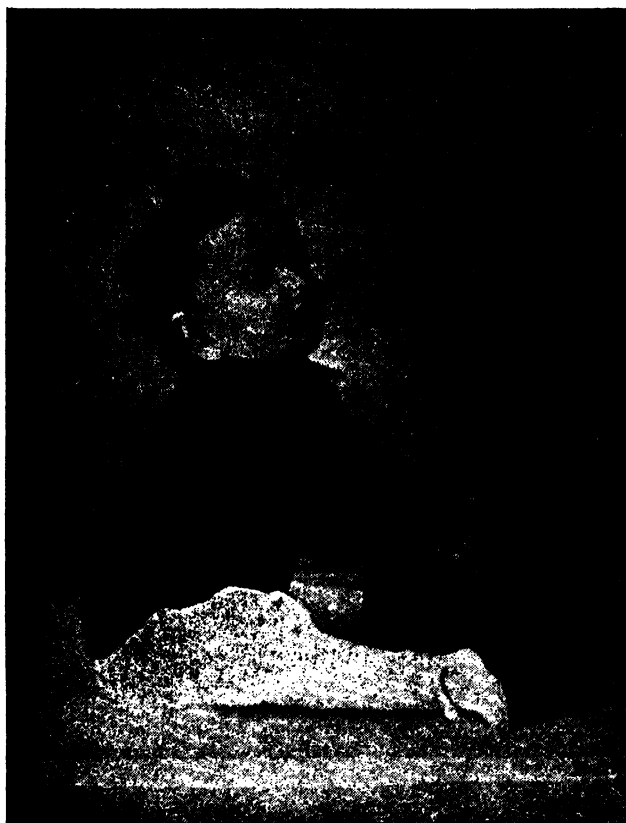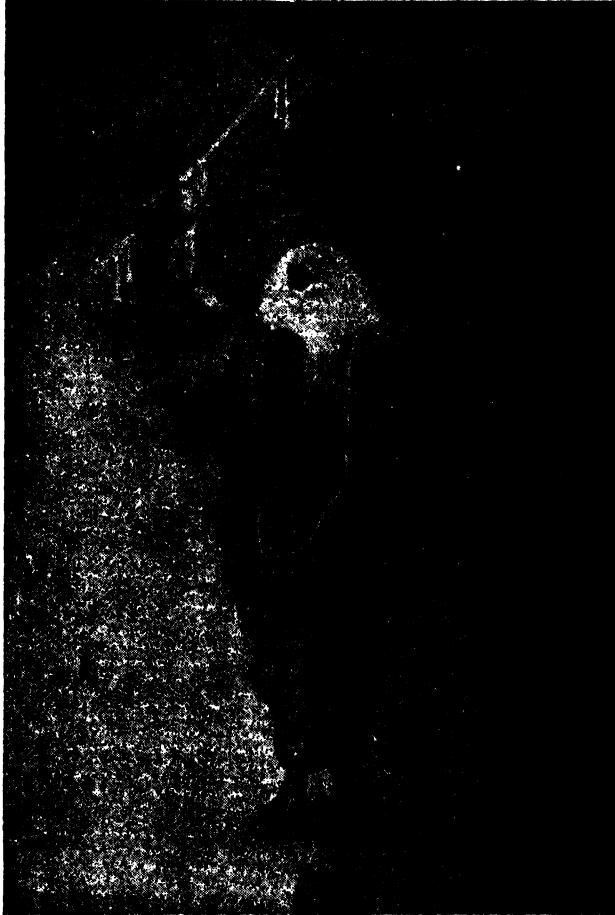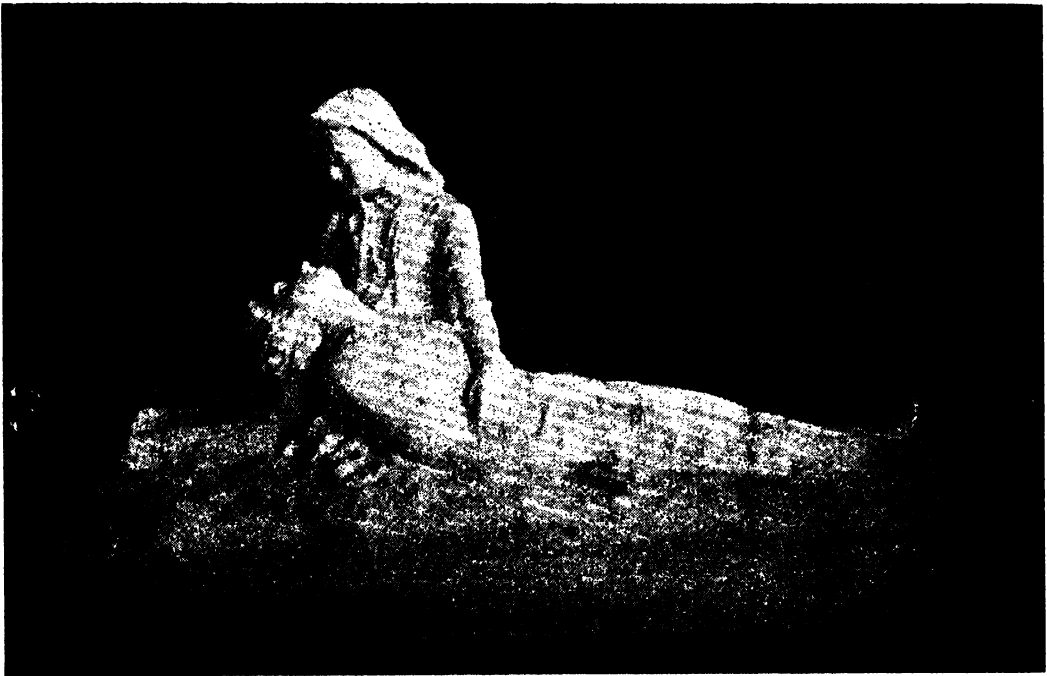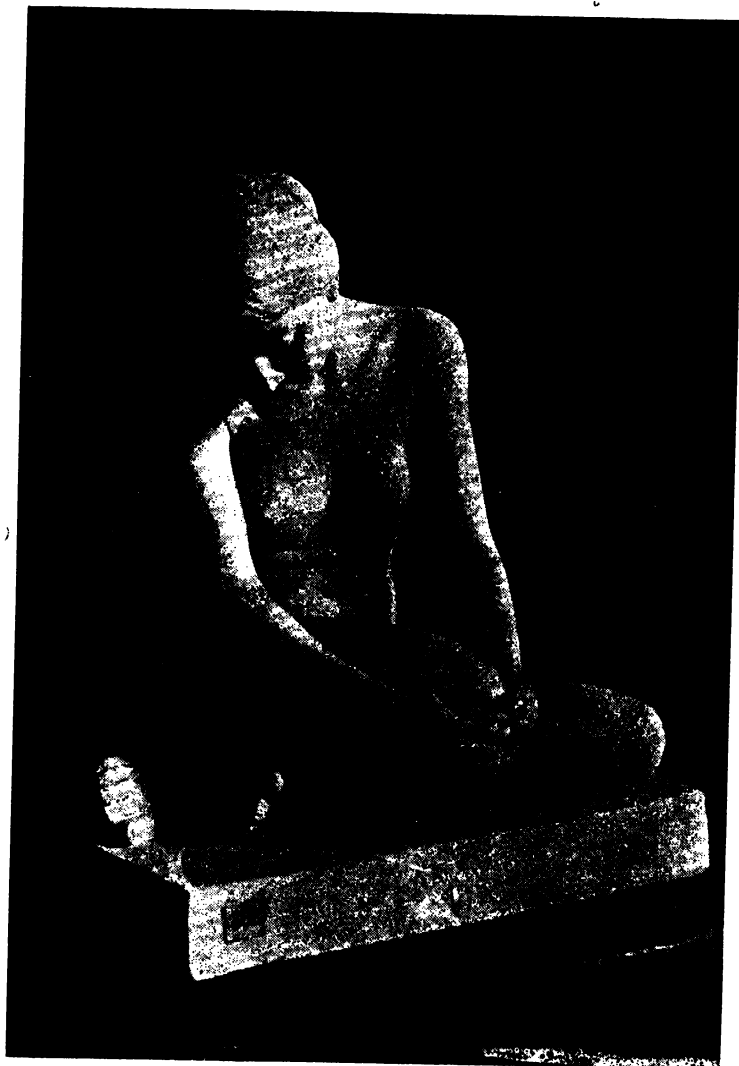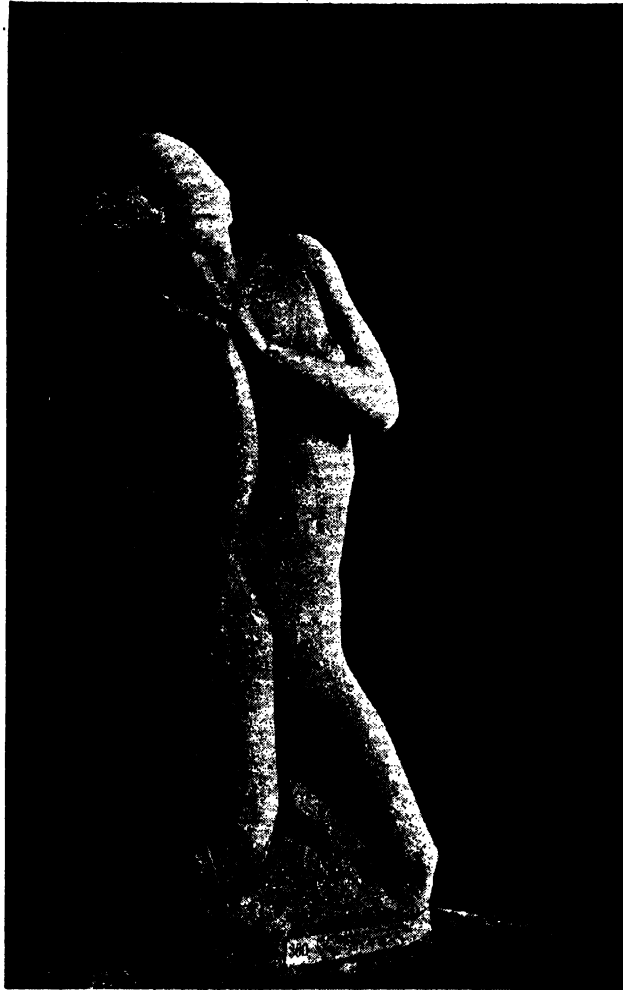
স্বাধীন বাঙ্গলার শিল্পকলা

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম এ, ভাগবতরত্ন]

যে জাতির অন্তরে আনন্দের সুর বাজে, সেই জাতিই শিল্পকলার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করে। মনের আনন্দকে বাহিরে রূপ দিয়া ফুটাইয়া তুলার নামই শিল্পকলা। পরাধীন জাতির মন অবসাদগ্রস্ত, দেহ দাসত্বের গুরুভারে ক্লান্ত ও প্রপীড়িত। সেই জন্যই স্বাধীন জাতিদের মধ্যে শিল্প বিষয়ে যে উন্নতি দেখা যায় পরাধীন জাতির মধ্যে তাহা কোন ক্রমেই পরিলক্ষিত হয় না। এই নিয়মের উদাহরণ খুঁজিতে আমাদের বেশী দূর যাইতে হইবে না। বাঙ্গলা দেশে যখন স্বাধীনতা ছিল তখন বাঙ্গালী জাতি তাহার প্রতিভাকে কত বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল তাহা আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে পরাধীন বাঙ্গলার শিল্পচর্চ্চায় কতদূর অবনতি হইয়াছে।

বাঙ্গালী জাতি চিরদিন সুন্দরের উপাসক। আমাদের সোনার বাংলার জলে স্থলে প্রকৃতি দেবী যে তাঁহার রূপ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তাই বাংলার রূপদক্ষেরা কাঠ পাথরের মধ্য দিয়াও অন্তর-বাহিরের সৌন্দর্য্যকে নিপুণভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। বাংলার ভাস্করেরা বাংলার একটা সর্ব্বপ্রধান গৌরবের বস্তু। তাঁহাদের সুন্দরের সাধনার কাহিনী আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে কত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। সেই গুলিকে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গলার শিল্প কলা সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যায় যে আমাদের দেশ ভাস্কর্য্য শিল্পে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিল।

বাঙ্গলার ভাস্কর্য্য শিল্পে দেবদেবীর মূর্ত্তিনির্ম্মাণেই ব্যাপৃত ছিল। প্রাচীন গ্রীসেও দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্য দিয়া নানা প্রকার ভাব ফুটাইয়া তুলা হইত। আমাদের দেশের এক এক দেবদেবীরই নানা ভাবের মূর্ত্তি পূজা করা হইত। তন্ত্রে এক দেবতারই রৌদ্র শান্ত করুণ প্রভৃতি নানা ভাবে পূজা বিহিত আছে। বাঙ্গলার শিল্পীরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঐ সকল ভাবের মূর্ত্তি পাথরে খোদাই করিয়া তৈয়ারী করিত। এই রকম মূর্ত্তি এখানে এত বেশী পাওয়া যায় যে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন মূর্ত্তি সম্বন্ধে যদি কোন গবেষণা করিতে হয়, তবে তাহার প্রকৃষ্ট স্থান বাঙ্গলাদেশে।

বাঙ্গলার শিল্পীদের তৈয়ারী মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত সুন্দর হইত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্ত্তি গড়িয়া দিত তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।" ধ্যানের ভাব পাথরের মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত ছিল। খুলনা জেলার বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী শিববাড়ীতে যে বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, তাহা দেখিলেই একথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তি এক ফুটের অধিক উচ্চ। এই মূর্ত্তিটী সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"বুদ্ধ যোগাসনে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানস্থ। বহুযুগবর্ষী মালিন্য মণ্ডিত প্রস্তর মূর্ত্তির বদনমণ্ডল হইতে এখনও দিব্যজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া পড়িতেছে। যে যুগে শিল্পী পাথরকে কথা বলিবার মত ভঙ্গি দিতে জানিতেন, এ সেই যুগের উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে শান্ত সৌম্য দেবভাব এমন সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহা দেখিলে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। এই বড় মূর্ত্তিটি একটি চৈত্যের মধ্যে স্থাপিত। চৈত্যের দুইটী গোলাকার স্তম্ভ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে লম্বমান। এই চৈত্যের উপর বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের এক অনুকৃতি রহিয়াছে। তাহার মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্রা-কৃতি ধ্যানী বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত। উপরিস্থ মন্দির এবং নিম্নস্থ চৈত্য এই উভয়ের মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটি বিদ্যাধর

কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারা চৈত্যের খিলান এবং মন্দিরের তলদেশ উভয়কে হস্তদ্বারা রক্ষা করিতেছে। বড় মূর্ত্তিটির বামভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদিকে গিয়া পরে আবার হইয়াছে।" এই মূর্ত্তিটীর কারুকার্য্য দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এক যোগে অতগুলি সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কণ করিয়া, প্রত্যেকটীর মুখেই ভাবব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র করা বড় কম কৃতিত্বের

শিববাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি।
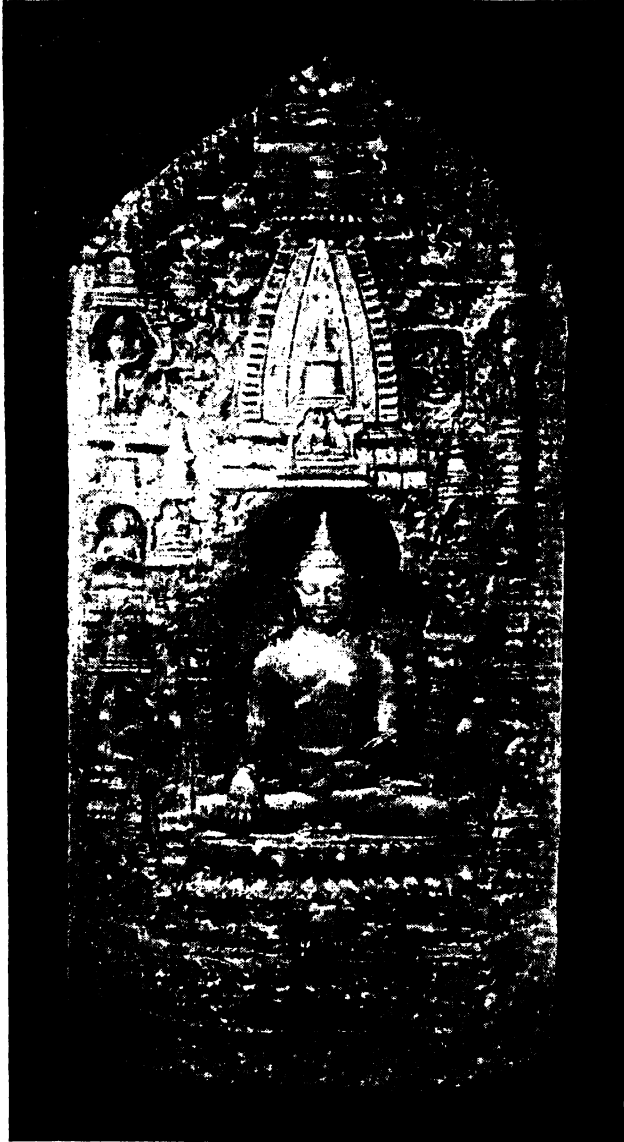
উপর মুখে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত অসংখ্য ছোট ছোট মূর্ত্তি দেখা যায়, উহাদ্বারা বুদ্ধদেবের জীবন লীলা পর্য্যায়ক্রমে প্রকটিত কথা নহে। বাঙ্গলাদেশে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল, এ মূর্ত্তি সেই যুগেরই অঙ্কিত।

পাল রাজারা যখন এদেশে রাজত্ব করিতেন, তখন বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলস্রোত প্রবাহিত ছিল। সেই সময়ে বাঙ্গলার মূর্ত্তি শিল্পের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় শিববাড়ীর বৌদ্ধ মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি অঙ্কণ সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশে ধীমান ও বীতপাল নামক দুইজন প্রসিদ্ধ শিল্পীর আবির্ভাব হয়। বীতপাল ধীমানের পুত্র। তাঁহার অঙ্কিত মূর্ত্তি গুলি ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন যে "মগধে তাঁহার চিত্রাঙ্কণপদ্ধতির বহু ছাত্র ছিল বলিয়া তিনি পরবর্ত্তী কালে মধ্যদেশের প্রধান চিত্রকর এবং তাঁহার পিতা পূর্ব্ব দেশের চিত্রকরগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া খ্যাত হইতেন" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এক সময়ে বাঙ্গলাদেশ ভারতবর্ষে তাহার নিজস্ব শিল্প পদ্ধতির প্রচার করিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে তো পাথর পাওয়া যায় না—তবে বাঙ্গলায় এত পাথরের মূর্ত্তি আসিল কোথা হইতে?

মৌড়েশ্বরে প্রাপ্ত লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্ত্তি।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে প্রস্তর আনীত হইত। সেই পাথরের উপর খোদাই করিয়া বাঙ্গালী এতদূর বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল যে ভারতীয় শিল্পের মধ্যে বাঙ্গলার মূর্ত্তি শিল্পের পদ্ধতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

রাখালবাবু বাঙ্গলার এই স্বতন্ত্র ধারাকে Bengal School of Sculpture নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বাঙ্গলার মূর্ত্তি-শিল্পের মধ্যে ভাবের প্রকাশই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বক্রেশ্বরের হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তির কথা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম। কয়েক মাস

বক্রেশ্বরে প্রাপ্ত হরগৌরীর যুগল-মূর্ত্তি।

পূর্ব্বে এই প্রাচীন যুগল মূর্ত্তির অপূর্ব্ব ভাব ব্যঞ্জনা দেখিয়া সেই অজ্ঞাত নামা শিল্পীর প্রতি মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসিতেছিল। মহাদেব পার্ব্বতীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছেন, পার্ব্বতী মহাদেবের গলাটি মৃণালভুজে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। উভয়ের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ। সে দৃষ্টির মধ্যে যে কি গভীর প্রেম, কি নিবিড় আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না। কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শিল্পীর অঙ্কিত এই প্রেমিক যুগলের প্রেমস্বপ্ন আজও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মানবের ক্ষণস্থায়ী মধুর প্রণয়ের দৃষ্টিটিকে যিনি এমন করিয়া অনন্তের সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রাণে না জানি কত গভীর প্রেমই জাগিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় প্রভৃতি ঐতিহাসিক-বৃন্দ এই মূর্ত্তিটীকে হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে করেন। মূর্ত্তিটীর একটী হাত কোন পাষণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া

দিয়াছে। এ মূর্ত্তির এখন আর কেহ আদর করে না। বটতলার সুনিবিড় ছায়ার তলে হরগৌরী তাঁহাদের প্রেমস্বপ্নে বিভোর। এইরূপ আর একটী লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্ত্তি গৌড়েশ্বরে পাওয়া গিয়াছে। রাঢ়ের শিল্পীরা প্রেমের ছবি কি বাটালীতে কি লেখনীতে আঁকিয়া তুলিতে চিরদিনই মজবুত।

অট্টহাসের চামুণ্ডা বা মহানন্দা।

কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী।

বাঙ্গলার শিল্পীগণ বৃদ্ধার মুখের ভঙ্গিমা আঁকিতেও কিছু কম কৃতিত্ব দেখান নাই। বর্দ্ধমান জেলার অট্টহাস গ্রামে এইরূপ প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মূর্ত্তিটী পদ্মাসনে উপবিষ্টা জরাজীর্ণা শীর্ণা নারীমূর্ত্তি। ইহা কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা আজও স্থির করিয়া বলা যায় না। ইহার পাদপীঠে কয়েকটী উপাসক উপাসিকার মূর্ত্তি, আর একটী পশুমূর্ত্তি আছে, সেটী গর্দ্দভ কি অশ্ব তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু মূর্ত্তিটীকে এমনি সাধারণ মানবীরূপে দেখিলে ইহার অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। দেবীর কটিদেশে একখানি বস্ত্র, দেহের উর্দ্ধভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত। যেরূপ

কৌশলের সহিত জীর্ণদেহের পঞ্জর গুলি এবং শীর্ণ স্তনদ্বয় খোদিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই বোধহয় যেন দেবীর শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহার শীর্ণ অধরপ্রান্তে সুন্দর হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবীর কণ্ঠে সূত্র হারে লম্বিত কবচ এবং মণিবন্ধে সামান্য বলয় ব্যতীত অন্য কোন অলঙ্কারই নাই, তথাপি ইহার মধ্য হইতে যেন এক অপূর্ব্ব প্রভা, আনন্দের এক অভাবনীয় বিকাশ প্রকটিত হইতেছে। পণ্ডিতবর

বারাগ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার বলেন "এই জাতীয় মূর্ত্তি, এমন অপূর্ব্ব শিল্পনিদর্শন, ইতিপূর্ব্বে গৌড়ে, বঙ্গে, রাঢ়ে অথবা মগধে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

বাঙ্গলার মূর্ত্তিশিল্প আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে এদেশে বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল—এখন আর সে সকল দেবতা পূজা পান না। সূর্য্য উপাসনা ইহার মধ্যে অন্যতম। রাঢ়ে সূর্য্যের বহু প্রস্তর মূর্ত্তি আছে; মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার একখানির চিত্র প্রদত্ত হইল। সূর্য্যের পায়ে প্রকাণ্ড বুটজুতা, শরীর সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত। তিনি শীতপ্রধান দেশের লোক বলিয়াই ঐরূপ পোষাক। প্রস্তরের চালচিত্রে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সূর্য্যের মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ঔদার্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বহুলাক্ষী দেবীর উপাসনাও আজকাল দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু বর্দ্ধমানের কেতু-

নন্দীগ্রামে প্রাপ্ত গণেশজননী মূর্ত্তি।

গ্রামে এইরূপ একটী মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি পদ্মের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার চারি খানি হাত দিয়া কাঁকই, বর, অভয়, ও দর্পণ ধরিয়া আছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে কার্ত্তিক ও গণেশ মূর্ত্তিটীর মধ্যে বেশ শিল্পকলা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীরভূমে নন্দীগ্রামে যে গণেশ জননীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মাতৃভাব সুন্দর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। দেবীর দেবীত্ব ও মাতৃত্বের সমাবেশে মূর্ত্তিটী বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য। এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন দেবদেবীর

কত মূর্ত্তি যে আমাদের সোনার বাঙ্গলায় লুকাইয়া আছে, তাহা বলিবার নহে। আর কেবল মাত্র পাথরেই যে বাঙ্গলার শিল্পীগণ মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাম্র রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুতেও অঙ্কণে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বাঙ্গলার শিল্পীগণ স্থাপত্য বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। কোন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে তাহার সভ্যতার সকল অঙ্গের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বাঙ্গালী কি আজ নূতন করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে হর্ম্ম্য প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে শিখিল? না, পাঠানদের নিকট এজন্য আমরা ঋণী? সত্য সত্য ববেচনা করিতে গেলে পাথরের স্তম্ভ ব্যবহার করিতেন। হ্যাভেল সাহেব বলেন ঐ স্তম্ভগুলি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। গৌড়দেশেই বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইত।

পালনরপতিগণ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করিতেন। ইঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের জন্য অনেক বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল "শৈলগন্ধ কুটী" নামে এক মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" নামক সমসাময়িক কাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে রামপাল গঙ্গা এবং করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

কলেশ্বরের কারুকার্য্যযুক্ত ইষ্টক।

আমরা দেখিতে পাই যে বাঙ্গালী যখন স্বাধীন ছিল, তখনই স্থাপত্যবিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পালরাজাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গলায় অনেক উৎকৃষ্ট বৌদ্ধ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে পাথর পাওয়া সহজ নহে। মূর্ত্তিগঠনের জন্য অবশ্য দুচারি খানি ভাল পাথর জোগাড় করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির বা সৌধ নির্ম্মাণের জন্য পাথর কোথায় পাওয়া যাইবে? সেই জন্য এখানে ইষ্টকের দ্বারাই এ সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ফাগুসন বলেন গৌড়ীয় নরপতিগণ তাঁহাদের মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য একপ্রকার কাল মার্ব্বেল

কবি রামাবতীর সৌন্দর্য্য দর্শনে বিভোর হইয়া তাহাকে "অমরাবতী সমান" বলিয়াছেন। এই নগরে "বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত কর্ব্বুরময় মন্দির" প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি পূজিত হইতেন। কর্ব্বুরময় অর্থে বিচিত্রবর্ণের বুঝায়। গৌড়ে ও রাঢ়ে এরূপ ইষ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ মন্দির এইরূপ বিবিধ বর্ণের ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়া এরূপ শোভান্বিত হইয়াছিল, যে কবি তাহাকে বিশ্বকর্ম্মার শিল্প-নৈপুণ্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

সেনরাজগণও স্থপতিগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। বল্লালসেনের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত অধুনা বাঘপাড়া নামে

পরিচিত স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নগর সুরম্য সৌধমালায় বিভূষিত ছিল। রাজ প্রাসাদের অদূরে অর্দ্ধগৌরীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজ করিত। এখন ঐ সকল মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন সৌধগুলির কারুকার্য্য কি সুন্দর ছিল তাহা দেখাইবার জন্য "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি" কর্ত্তৃক বারাগ্রামে আবিস্কৃত একটী সৌধাংশের চিত্র দিলাম। এটী পাথরের নির্ম্মিত। কিন্তু গৃহনির্ম্মাণের জন্যও বাঙ্গালী কি অপূর্ব্ব যত্ন লইত তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। কত কারুকার্য্য পাথরে সে ফুটাইয়া তুলিত। সৌন্দর্য্যের উপাসক বাঙ্গালী ইষ্টকে পর্য্যন্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই ইষ্টকদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত। এরূপ কয়েকখানি ইষ্টকের চিত্র দিলাম।

বাঙ্গালী চারুশিল্পে যেমন উন্নতি করিয়াছিল, তেমনি কারুশিল্পেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় অতি সুন্দর সুন্দর রেশমের কাপড় তৈয়ারী হইত। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমে নির্ম্মিত কাপড়ের নাম পত্রোর্ণ। সেই পত্রোর্ণ পৌণ্ড্রদেশে পাওয়া যায়—পৌণ্ড্রদেশ বরেন্দ্র ভূমিতে। বাঙ্গলার এই সময়ে ক্ষৌম বা বাকলের কাপড়ও নির্ম্মিত হইত। কৌটিল্য বলেন যে বঙ্গের ক্ষৌমবস্ত্র বা দুকূল শ্বেত ও স্নিগ্ধ হইত তাহা দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। আর পৌণ্ড্রে যে দুকূল হইত; তাহা শ্যামবর্ণ ও মণির মতন উজ্জ্বল ছিল। পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গলায় ঢাকার মসলিন হইত। বাঙ্গলার জাহাজ নির্ম্মাণেও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য প্রদর্শিত হইত। এই সকল শিল্প এখন দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

বারাগ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারদেশের একাংশ।

বাঙ্গলার শিল্পকলা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে স্বাধীনতার বুকে বাঙ্গালী মনের আনন্দকে বাহিরের রূপ দিয়া নানাভাবে প্রকাশ করিত। এখন সে স্বাধীনতাও নাই, জাতির মনের সে আনন্দ ভাবও নাই।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৬)

পত্নীর শ্রাদ্ধদিনে একটী দরিদ্র গৃহের কুমারীকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া মৌখিক দুইটা প্রেমালাপ করিয়াই চৌধুরী মহাশয় নিবৃত্ত হইলেন না। দেশে প্রেমের প্লাবন দেখিয়া প্রেমের গল্প পড়িয়া মরণ পথের যাত্রীটির শুষ্ক মগজের মধ্যে হঠাৎ প্রেমের বন্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল; তাই পুত্র কন্যা নাতি নাতনী বেষ্টিত বৃদ্ধ নূতন উদ্যমে প্রেমাভিনয় আরম্ভ করিলেন। আমাদের বাড়ীর নিম্নে বহুদিন হইল রাস্তার উপর ঝাড়চ্যুত কয়েকটী বাঁশগাছ হেলিয়া পড়িয়াছিল; ঝাড়টি চৌধুরী মহাশয়ের সম্পত্তি বলিয়া কেহ তাহাতে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতেও সাহসী হয় নাই। অকস্মাৎ চৌধুরী মহাশয় বাঁশ কাটাইয়া রাস্তা পরিস্কার করাইয়া পল্লী সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন।

ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে প্রয়োজন বিনা কেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, সেটা নিতান্তই রুচিবিরুদ্ধ এবং ভদ্রতা বিরুদ্ধও বটে। কিন্তু যাহার ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইবার সাধ আছে তাহার উপলক্ষ্য খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। এ ক্ষেত্রেও কাজের অভাব হইল না। ছলনার আবরণ পরিয়া প্রতিবেশীদিগকে বিস্মিত করিয়া বৃদ্ধ পল্লীর অগণিত বনপথ রাখিয়া আমাদের গমনাগমন পথটির প্রতি সহসা অতি-শয় মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। পথ পার্শ্বে বৃষ্টির জল বহিবার একটী নালা কাটান হইল। কোথায়ও বা দুই টুকরী মাটী ফেলিয়া উচ্চভূমির সহিত সমতল ভূমি করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার হইয়া গেল—গ্রামের পথঘাট মেরামত করাইয়া দীনদুঃখীদিগকে নিস্কর ভূমি দান করিয়া চৌধুরী মহাশয় কাশীবাসী হইবেন। সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, আসক্তি নাই; পত্নীর মৃত্যুর সহিত তাঁহার মায়াবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এখন তাঁহার কাম্য, একমাত্র মোক্ষ। যাহারা বৃদ্ধকে পূর্ব্বে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, তাহারাও তাঁহার এই পরিবর্ত্তনে বিগলিত হৃদয়ে বলিতে লাগিল, "আহা সব ফেলে রেখে চলে যাবেন; মনটি যে এত সাদা আগে ত তা বোঝা যেত না। এ জীবনে হয় তো আর কারুর সঙ্গে দেখাই হবে না" ইত্যাদি। বৃদ্ধের এ ফাঁকিতে সকলেই ভুলিল আমি কিন্তু ভুলিতে পারিলাম না। আমার অদৃষ্ট চিত্রকর আমার মনের উপর বৃদ্ধের একটী জীবন্তচিত্র আঁকিয়া দিয়া ছিলেন। সেই নির্জ্জন কক্ষ, চারিদেকে মধ্যাহ্নের দীপ্তিজ্বালা তাহার মধ্যে প্রলয়ের বিষান ধ্বনির মত, আষাঢ়ের মেঘ গর্জ্জনের মত সেই অতি ঘৃণ্য, অতি কঠোর—"তোমাকে ভালোবাসি"—শব্দটী আমার প্রাণে চির জাগ্রত, চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল! আমি চেষ্টা করিয়াও সেদিনকার সেই তুচ্ছ স্মৃতিটুকু মনের কোণ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না। সেদিনকার সেই অসম্পূর্ণ অভিনয় পুনরভিনয়ের আশাতেই যে বৃদ্ধের এ অভিযান, এ উদ্যম, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় রহিল না। বৃদ্ধের লালসাভরা তীক্ষ্ণদৃষ্টির অন্তরালে আমি নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম।

সেদিন রন্ধনশালার পশ্চাতে ডোবায় স্নান করিয়া দড়ির উপর ভিজা কাপড়-খানা শুকাইতে দিতেছিলাম। বাবা আহারে বসিয়াছিলেন; মা কাছে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে করিতে হঠাৎ আমার পানে চক্ষু তুলিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আজও ডোবায় চান করলি, কনক, অসুখ না করে কিছুতেই তুই ছাড়বি না দেখছি। নদীর এমন সুন্দর জল, এত কাছে; তবু তোদের ডোবায় স্নান করতে কেন যে এত সাধ যায় তা ত বুঝতেই পারিনে।"

বাবা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ডোবায় স্নান

করলে গা ? ওই ঘাস পচা সেওলাভরা জল ম্যালেরিয়ার বিষে ভর্ত্তি হ'য়ে আছে, ও জলে কেউ না কি সাধ করে স্নান করে !"

"কে আবার করবে, তোমার কনক করেছে। শুধু আজ নয়, তিন চারদিন উপরি উপরি কনক ঐ ডোবাতেই স্নান করছে ; মানা করছি এত তা কানেও তুলবে না ; এক ত সংসারের সমস্ত কাজ করতে মেয়ের আলস্য নেই, নদীতে নাইতে যেতেই যত আলস্য।"

বাবা সশঙ্কিত হইয়া কহিলেন, "কনকের বড় অন্যায়, ভারী অন্যায় ; ডোবায় স্নান, এক্ষুণি হয় তো জ্বর আসবে ; ওকে আজ ভাত খেতে দিও না। কনক কোথায় গেল ? ডাক দিকিন, আমি তাকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

আশু ব্যারামের সম্ভাবনায় আহারের বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া বাবার চিরকালের অভ্যাস। এই অভ্যাসের জন্য বহুলোকের নিকটে বহুবার হাস্যাস্পদ হইয়াও বাবা এ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

আমি হাসিমুখে বাবার কাছে যাইতেই বাবা আহার বন্ধ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ডোবায় স্নান করে নিশ্চয় তোমার অসুখ হ'য়েছে কনক ; তুমি আজ কিছু খেয়ো না। নদীর ভাল জল থাকতে পচা জলে স্নান করা কেন ? আগে নদীতে যাবার রাস্তাটা খারাপ ছিল, চৌধুরী মশায় দাঁড়িয়ে থেকে এখন কেমন সুন্দর রাস্তাটি করেছেন, তবু তোমাদের এত আলস্য, এ ত ভাল নয়।"

উনুনের মুখ হইতে গরম দুধের বাটীটা বাবার পাতের কাছে ধরিয়া দিয়া মা স্মিতমুখে বলিলেন, "শুনছি, গাঁয়ের সবগুলো রাস্তা সেরে দিয়েই নাকি চৌধুরী মশায় কাশী রওনা হবেন। দাসেদের পুকুরটারও নাকি পঙ্কোদ্ধার করে ঘাট বেঁধে দেবেন ?"

বাবা দুধের বাটিতে ভাত তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "কবে কাশী রওনা হবেন তাতো জানি না ; জিজ্ঞাসা করবো। আজ সন্ধ্যার পর চৌধুরী মশায় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে আমায় বলে দিয়েছেন !"

মা বিস্মিতের মত ক্ষণকাল বাবার পানে চাহিয়া পরে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় কনকের বিয়ের সম্বন্ধ কোনখান থেকে এসেছে, তাই বলতেই তোমাকে ডেকেছেন। একদিন উনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, তোমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা কি ? হাজার হ'লেও ওঁরা মান্যগণ্য ব্যক্তি ; কাউকে যদি অনুরোধ করেন, তারা কি না শুনে পারবে ? ওঁদের কত আত্মীয়, কত কুটুম্ব ! সেদিন শ্রাদ্ধে ওঁর বড় মেয়ের দেওর এসেছিল, ঠিক যেন রাজপুত্রের মত ; চেহারা দেখে—" মা কথাটা শেষ না করিয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। আমি রন্ধনশালা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে শুনিলাম, বাবা বলিতেছেন, বোধ হয় কোন ভাল সম্বন্ধের খবর দেবেন বলেই যেতে বলেছেন। সত্যি কথা বলেছ ; ওঁর অনুরোধ কারুর অমান্য করবার উপায় নাই। আগে ওঁর সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকের একটা খারাপ ধারণা ছিল ; এখন চৌধুরী মশায়ের উদারতা সকলেই বুঝতে পারছে। মানুষের কখন যে কেমন করে পরিবর্ত্তন হয় তা বোঝা যায় না।"

আমি নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একি আমার মিথ্যা ভুল, মিথ্যা সন্দেহ ! ছিঃ ছিঃ আমি এত নীচ ! আমার অন্তঃকরণ এত ক্ষুদ্র ! কাহাকে অযথা সন্দেহ করিয়া চক্ষে নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছি ? যাঁহার কেশ শুভ্র হইয়াছে, দন্ত স্খলিত হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আজ অনন্ত পথের যাত্রী তাঁহাকে, সেই পিতামহ তুল্য বৃদ্ধের সরল উপহাসে, নির্ভীক দৃষ্টিপাতে, আমি মনের মধ্যে কি বিষ সঞ্চিত করিয়াছি ? পিতার অভিজ্ঞতা, মাতার দূরদর্শিতা অপেক্ষা নিজের অল্পবুদ্ধিতেই পরিচালিত হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের নয়ন পথ হইতে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছি ! ভগবান আমার মনের এ পাপ কি কখনও ক্ষমা করিবেন ? যাহার প্রতি আমার এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ তিনি আমারই মঙ্গলের নিমিত্ত আমার মাতা-পিতার বক্ষের পাষাণভার উত্তোলনের নিমিত্ত এত যত্নবান, এত উদ্যমশীল ! মুহূর্ত্তে আমার অন্তর শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল ; সেদিনের সেই প্রণয় নিবেদন, কুটিল কটাক্ষ, অভাবনীয় স্পর্শ, আমি বিস্মৃত হইলাম। একটা ক্ষমাহীন ধিক্কারে নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল।

(৭)

চৌধুরী বাড়ী হইতে বাবা যখন ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আষাঢ়ের সজল শ্যামল মেঘে বর্ষণ-ক্ষান্ত আকাশটি আচ্ছন্ন। কোথাও চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, দীপ্তি নাই—কেবল মেঘের পর মেঘেরই লীলা আর গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জন।

বৃষ্টি ধৌত শ্যামল বনানী অন্ধকার আকাশতলে শতশাখা বিস্তার করিয়া নির্ব্বাক দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; আসন্ন-বর্ষণ সম্ভাবনায় বাতাস স্তব্ধ, গতিহীন। প্রতিবেশী গৃহ আলোশূন্য, শব্দশূন্য, বৃষ্টির সম্ভাবনায় সকলেই তাড়াতাড়ি গৃহকাজ সারিয়া আহারান্তে বিশ্রামসুখে মগ্ন। কেবল থাকিয়া থাকিয়া ভরা-নদীর তটভাঙ্গার শব্দের সহিত প্রান্তস্থিত কৃষকপল্লী হইতে "ডুগ্‌ডুগীর" করুণস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল।

মা প্রদীপের নিকটে বসিয়া বেনুর ছিন্ন বস্ত্রখানি সযত্নে সেলাই করিতেছিলেন। আমি বিছানায় শুইয়া বেনুকে তেপান্তরের রাজপুত্রের গল্প বলিতে বলিতে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিলাম তাহা জানিনা; বাবার আগমনে আমার সুখ-নিদ্রা ছুটিয়া গেল কিন্তু চক্ষু দুটি ঘুমের জড়িমায় জড়াইয়া রহিল। আমি উঠিতে পারিলাম না, ঘুমন্ত বেনুর পাশে নিমীলিত নয়নে পড়িয়া রহিলাম।

মা ব্যাকুল হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত দেরী হল কেন তোমার? চৌধুরী মশায় কি বল্লেন কোন ভাল ছেলের খবর জানতে পারলে কি?"

ঘরের মৃদু আলোকের জন্যই হউক অথবা অন্যমনস্ক বশতঃ বাবা আমাকে প্রথমে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে সব কথা পরে বলচি—কনক কোথায়, তাকে দেখছিনে কেন?"

"কনক ঐ তো ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে কি ডেকে দেবো? কনককে তোমার কি দরকার?"

বাবার প্রশ্নে, মার উত্তরে একবার ভাবিলাম, সাড়া দিয়া বলি "আমি ঘুমাই নাই, জেগেই আছি।" কিন্তু মনের মধ্যে একটা কৌতুকের উজ্জ্বল প্রবাহ বহিয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় আমার বিবাহ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন—বাবা সে বিষয়ে কি মন্তব্য প্রকাশ করেন, ঘুমের ভাণ করিয়া তাহা শুনিবার দুনির্ব্বার লোভটুকু কিছুতেই আমি সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

জাগ্রত অবস্থায় কর্ণযুগল সজাগ করিয়া নিদ্রিতের মত তেমনি পড়িয়া রহিলাম। বাবা ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিলেন "না কনককে আর ডাকতে হবে না, আমার কিছু দরকার নেই—আহা ঘুমাক, ঘুমাতে দাও।" বাবার স্বর স্নেহকরুণ বেদনায় আর্দ্র। নিস্তব্ধ নিশীথে বাবার বেদনা কাতর ব্যথাভরা সেই কণ্ঠস্বর আমাকে পীড়া দিতে লাগিল; একবার সাধ হইল—বাবার কাছে বসিয়া স্নেহভরা মমতাভরা মুখের পানে চাহিয়া বলি "আজ অকস্মাৎ আপনার হৃদয় তন্ত্রীতে কিসের আঘাত লাগিয়াছে বাবা, কণ্ঠ আপনার এত বেদনাজড়িত কেন? মুখ আপনার এত বিষন্ন কেন? এত আনমনা গম্ভীর হইয়া আরতো কখনো আপনাকে গৃহে ফিরিতে দেখি নাই।" সাধ হইলেও সেটা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

মা'র পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ প্রশ্নে বাবা আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন "চৌধুরী কেন আমায় ডেকেছে তা শুন্‌লে তোমার মনস্তাপ বাড়বে ছাড়া কম্‌বে না। সে কনককে—বিয়ে কোরতে চায়। আমাকে ডেকে বল্লে 'আমি শীগ্‌গীর কাশী যাচ্ছি; খরচ পত্র দিয়ে যাব—ক'দিন পর তোমরা সেখানে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এস। এখানে বিয়ে করতে গেলে—ছেলেরা হয় তো বাধা দেবে; সেইটে বিবেচনা ক'রে কাশীতে বিয়ে ঠিক করেছি। আমার বড় দুটি তালুক তোমার মেয়ের নামে লিখে দেব। গিন্নী'র যা কিছু আছে সব তোমার মেয়েরি হবে; তা ছাড়া বিয়ের খরচপত্র সব আমিই দেব।"

মা সবিষাদে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, ওগো, এমন অনাসৃষ্টি কথা আর আমি শুনতে চাই না। তুমি তাকে কি বল্লে সেই কথাটা আগে আমায় বল। এ সর্ব্বনেশে কথা শুনে বুক যে আমার দুর্ দুর করছে। তাকে দেখে বাছা আমার আতঙ্কে সারা; পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আমি কি জানি বুড়োর পেটে পেটে এত বিদ্যে! কোন মুখে এ কথা উচ্চারণ কল্লে গা; কনক যে ওর নাত্‌নীর বয়সী।"

"আমার মেয়ে, গরীবের মেয়ে বলেই উচ্চারণ করতে পেরেছে। আর আমি গরীব ব'লেই"—

মা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "কি বল্লে? গরীব হয়েছ বলে মেয়ে বিক্রি করে এলে? বুড়োর প্রস্তাবে রাজী হলে? ওর হাতে পড়ে কনক মরে যাবে, ককখনো বাঁচবে না।"

বাবা বলিলেন "আমি গরীব হলেও সন্তানের পিতা; কনক কেবল তোমার স্নেহের নয়, সে আমার ও আদরের ধন। তুমি শান্ত হও, উতলা হ'য়ো না, আমি মেয়ে বেচি নি।

চৌধুরীকে বলে এসেছি—'নদীর বুকে কনককে ভাসিয়ে দিলেও আপনার হাতে দেব না। বিয়ে দিতে না পাল্লেও জন্মদুঃখিনী কোরবো না। আপনাদের শাক ভাতের অংশ দিয়ে আজীবন ঘরে রাখবো।"

মা লজ্জিত হইয়া বলিলেন "সব ভাল করে না শুনে আমি তোমায় অন্যায় সন্দেহ করেচি; তুমি আমায় মাপ কর। তোমার কথার উত্তরে চৌধুরী কি বল্লে গা?"

"যা বলতে হয়, তাই বল্লে—আমার ধোবা, নাপিত বন্ধ করবে; সমাজে একঘরে ক'রবে। যাতে আমি গাঁয়ে না টিকতে পারি সে চেষ্টা করবে। আমিও বলে এসেছি—'সচ্ছন্দে করবেন; আপনি ধনী; আপনি সমাজপতি, আপনার প্রবল প্রতাপ। আমি গরীব হলে ও সন্তান বেচার ব্যবসা করি না। লোকের নিন্দা, অপমান, তাড়নার চেয়ে কনক আমার কাছে অনেক বড়।" শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে বাবার স্বর যেন বন্ধ হইয়া আসিল। আমি চকিতে চাহিয়া দেখিলাম, বাবার চক্ষু অশ্রু সমাগমে ছল ছল করিতেছে। এবার আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রু বাধা মানিল না। ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আমি অধম, আমি অযোগ্য, পিতা মাতার কোমল বুকে কঠিন পাষাণ ভার। শান্তির আকাশে অশান্তির ধূমকেতু; সুখের হাটে দুঃখের দাবানল; তবু আমার প্রতি বাবার এত স্নেহ, মা'র এত ভালবাসা! হায়, এ স্বর্গীয় স্নেহের প্রতিদান আমি কেমন করিয়া দিব? আমার কি সম্বল আছে?

হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে আমার শিয়রের জানালাটা খুলিয়া গেল। বায়ুস্পর্শে ক্ষীণ দীপ শিখাটি কয়েকবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিবিয়া গেল।—বাহিরে তেমনি নিস্তব্ধ নীরব প্রকৃতি, গগন পট তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। এতক্ষণ পর স্থির অরণ্যানী বর্ষণোন্মুখ সমীরণে ঈষৎ সঞ্চালিত হইয়া মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে লাগিল। বর্ষার নব যৌবনা উন্মাদিনী তটিনী কলোচ্ছ্বাসে পাড় ভাঙ্গার ঝুপ ঝুপ শব্দ, কৃষকের ডুগ ডুগীর সহিত গ্রাম্য গাথা বিশ্বের বুকে যেন রণিয়া রণিয়া উঠিতে লাগিল। বর্ষণ সিক্ত বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তস্বর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি নিদ্রাহীন নির্ণিমেষ নেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীর পানে চাহিয়া রহিলাম!

(৮)

জলে বাস করিতে গেলে যেমন কুমীরের সহিত বিবাদ করা পোষায় না; তেমনি দলপতিকে অসন্তুষ্ট করিয়া গ্রামে বাস করা সম্ভব নয়। তাহাতে পদে পদে বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

চৌধুরী মহাশয়ের রোষাগ্নি যে কত প্রবল এবং তাহার দাহিকা শক্তি যে কতখানি প্রখর সেটা হৃদয়ঙ্গম করিতে বাবার বেশী বিলম্ব হইল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের ধোবা, নাপিত বন্ধ হইল। আমরা সমাজে 'একঘরে' হইলাম। চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার মত সাহসী ব্যক্তি আমাদের গ্রামে একটিও ছিল না। বিশেষতঃ যাহাতে নিজের ইষ্ট ছাড়া অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে—তেমন কাজে দরিদ্র গ্রামবাসীদের অগ্রসর হইতে কখনো দেখা যাইত না। এ ক্ষেত্রেও কেহ দন্তস্ফুট করিলেন না। সমাজচ্যুত করিবার —অপরাধের সন্ধান লইলেন না। চৌধুরীর আদেশ—ব্যস্ ইহাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ আর কি হইতে পারে? চৌধুরীই যে গ্রামবাসীর একাধারে সমাজ-সংস্কারক, আশ্রয় এবং ঋণদাতা। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক তাঁহার খেয়ালকে সকলেরই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রবলের নিকটে দুর্ব্বল চিরদিনই নিস্তেজ, চিরদিনই আজ্ঞাবহ; ইহাই নাকি বিধির বিধি।

বিধির বিধি যাহাই হোক্ কেহ আমাদের বাড়ী আসিয়া প্রশ্নে প্রশ্নে মাকে অতিষ্ঠ করিবে না। আনন্দ উৎসব দিনে অনিচ্ছার সহিত আমারও কাহার গৃহে যাইতে হইবে না—ভাবিয়া আমি অনেক শান্তি অনুভব করিলাম।

কিন্তু আমার শান্তিই ত যথেষ্ট নহে—যাহারা আশৈশব সঙ্গী প্রতিবেশী পরিবৃত হইয়া মধ্যাহ্ন জীবনে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অকস্মাৎ একক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বড়ই কষ্টকর। আমি যেন ভাবিলাম—আমি কাহারো গৃহে যাইব না; কেহ আমাদের গৃহে আসিবে না। নির্জ্জন গৃহে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের মত আমার ব্যর্থ অভিশপ্ত জীবনটি এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কাটিল না; বাবার হাস্যানন দিন দিন গম্ভীর হইতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাবার যে পোষ্টাফিসের কাজ ফুরাইত না এখন বেলা এক প্রহর থাকিতেই সে কাজ সমাধা হইয়া যায়। কারণ এখন আর কাহাকে সংবাদ পত্র পড়িয়া শুনাইতে হয় না। কাহারো সহিত সুখ দুঃখের আলোচনা করিয়া নিরানন্দ সন্ধ্যা—আনন্দময় হয় না। প্রতিবেশীরা বাবার সান্নিধ্য হইতে সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। যাঁহারা নিতান্ত অন্তরঙ্গ তাঁহাদের কাজ কর্ম্ম অসুখ বিসুখ অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত বাধ্য হইয়া বাবার নিকটে আসিতে পারেন না। সংসারে নিজের টুকু লইয়াই সকলে ব্যস্ত; পরের সুখ দুঃখের পরের হাসি অশ্রুর খবর লইতে কাহার মাথা ব্যথা হয়? এখানে হৃদয় নাই; মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য নাই। দীনকে দীনতম করিয়া—পথের ধূলায় দলিত করাই বুঝি মানুষের ধর্ম্ম!

আমাদের 'একঘরে' করিয়াই চৌধুরী মহাশয় ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার তূণে যতগুলি অস্ত্র ছিল একটীর পর একটী করিয়া অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা ছিল অত্যাচারে, অবিচারে নিরুপায় হইয়া বাবা অবশেষে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।

আড়তদার যদুমণ্ডলের দোকান হইতে আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের চাল্ ডাল নুন তৈল, যাবতীয় দ্রব্য আসিত। আয় মাত্র কুড়িটি টাকা, কাজেই কোন মাসে যদুর ধার সম্পূর্ণ শোধ হইয়া উঠিত না। পূর্ব্বমাসের বাকী পরিশোধে পরের মাস আবার বাকীতেই চলিত। বহুকাল হইতে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছিল; এ নিয়মে যদু কোন দিন আপত্তি করে নাই।

সন্ধ্যাবেলা বাবা বেনুকে লইয়া নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, আমি মার রন্ধনের তরকারী কুটিতেছিলাম। মা দুধ জ্বাল দিয়া রান্নার যোগাড় করিতেছিলেন—"কেবলা" প্রাঙ্গন হইতে ডাকিল "মা ঠাকুরুণ"। "কেবল" আমাদের বড় অনুগত। শিশু ক্যাবলাকে লইয়া সহায় সম্পদহীনা আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিতা স্বামীহারা কৈবর্ত্তবৌ যেদিন অকূলে ভাসিয়াছিল, সেদিন জাতীয় অভিমান ভুলিয়া, উচ্চনীচ ভেদ ভুলিয়া মা কৈবর্ত্ত বৌকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন, নিজের দুঃখের অন্নের অংশ দিয়া মাতাপুত্রকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মার করুণার ও স্নেহের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কৈবর্ত্তবৌ আপনার কর্ম্মজীবন বাছিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল। ধর্ম্মপথে থাকিয়া কৈবর্ত্তবৌ এখন নিজের প্রতি নিজে নির্ভরশীল; সেদিনকার সেই অসহায় শিশু এখন কিশোর বয়সে উপনীত হইয়াছে। মাতা পুত্রের উপার্জ্জনে এখন তাহারা আর পরমুখাপেক্ষী নহে, কিন্তু সেদিনের সেই অযাচিত করুণা, অপ্রত্যাশিত মমতা বর্ণজ্ঞানহীনা অশিক্ষিতা কৈবর্ত্তবৌ বিস্মৃত হয় নাই; ছেলেকে বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। স্বেচ্ছায় সানন্দে আমাদের হাটবাজার সংসারের খুঁটিনাটি কাজ ক্যাবলাই সমাধা করিয়া দিত, দরকার হইলে কৈবর্ত্তবৌ আসিয়া সাহায্য করিয়া যাইত।

মা ভাতের হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া দিয়া দ্বারের দিকে আগাইয়া গিয়া কহিলেন "আমি রান্নাঘরে আছি, ক্যাবলা এখানে আয়। যদু মণ্ডলকে বলে এবার তো ভাল তেল এনেছিস? আরবারে যে তেল এনেছিলি সেটা মোটেই ভাল ছিল না—ভারী বিশ্রী গন্ধ! মটরের ডালটাও বড্ড দেরীতে সেদ্ধ হত।"

ক্যাবলা শূন্য ধামাটি মার কাছে নামাইয়া প্রত্যুত্তর করিল "কিছু আনা হয় নি মা ঠাকুরুণ, যদুমণ্ডল বলে

সে আপনাদের সওদা নিতে পারবে না, চৌধুরী ঠাকুর তারে মানা ক'রে দেছেন। যদুমণ্ডল চৌধুরী ঠাকুরের মাটীতে বাস করে, কথা না শুনলে চৌধুরী ঠাকুর তারে নিজের এলাকা থেকে উঠিয়ে দেবেন বলেছেন। আপনাদের কাছ থেকে যদু মণ্ডল পনের টাকা পাবে। তা চেয়ে পাঠিয়েছে, দুতিনদিনের মধ্যে টাকা না দিলে সে নাকি অনর্থ বাধাবে।"

মা প্রস্তর প্রতিমার মত বিস্ফারিত নয়নে ক্যাবলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে পলক পড়িল না, মুখে একটি বাক্য স্ফুরণ হইল না। কাবলা কয়েক মুহূর্ত্ত নতশিরে দাঁড়াইয়া শেষে বাড়ীর পথ ধরিল।

আমি ভীত হইয়া ধীরে মাকে স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম "মা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, কাবলা যে চলে গেল। ঘরে তো চাল ডাল নেই; যদু আর দেবে না, আমাদের কি হবে মা?"

মা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার ললাটে বিস্রস্ত কেশগুলি সরাইয়া দিয়া আশ্বাসের স্বরে কহিলেন "ভয় কি কনক! যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার জুটিয়ে দেবেন —মানুষ তো উপলক্ষ্য মাত্র। এতদিন যেমন করে চলেছে তেমনি করে চলবে মা। যদুমণ্ডল যে সব কথা বলেছে একথা কিন্তু ওঁকে ঘুনাক্ষরে জানিয়ো না, ওঁর এমনি অনেক ভাবনা ভাবতে হয়, তারপর খাওয়ার ভাবনা ভাবতে গেলে বাঁচবেন কেমন করে! আমি আছি, তোদের চিন্তা নেই কনক।"

(ক্রমশঃ)

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বরের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস।

পথে পরিচারিকা তাহাকে সংবাদ দিল, 'বড়দিদিমণি, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? বাসরঘরে মা তোমায় বড় খুঁজেছেন ; তুমি বরকে আশীর্ব্বাদ করতে যাওনি বলে কত রাগ করেছেন। শীগ্‌গির চল ; আশীর্ব্বাদ করবে।'

যে হৃদয় স্বামীর হৃদয়ভরা আদরে তখনও স্পন্দিত হইতেছিল, তাহাতে বিমাতার বিরাগের সংবাদ স্থান লাভ করিতে পারিল না। তথাপি তাহার আর হস্তস্থিত বস্ত্র ও উত্তরীয় পেটক মধ্যে রাখা হইল না তাহা হস্তে করিয়াই সে দ্রুত পদে বাসর ঘরে মাতার নিকট আসিল।

প্রমদা কল্যাণীকে উপস্থিতা দেখিয়া, অত্যন্ত রুষ্ট স্বরে কহিলেন, তোমাকে ডেকে আমরা যে খুন হ'লাম। বরকে আশীর্ব্বাদ করবার সময়, কোথায় লুকিয়েছিলে ? ইচ্ছে না থাক্‌লেও, অন্ততঃ লোক দেখাবার জন্তেও ত একটা মৌখিক আশীর্ব্বাদ করতে হয়।'

হাস্যময়ী প্রেমময়ী কল্যাণীর অন্তর মধ্যে মাতার তিরস্কার প্রবেশ করিল না। রবর-রচিত গোলকের ন্যায়, প্রতিহত হইয়া, প্রমদার বক্ষে পড়িয়া, সেখানে আরও রোষ বহ্নির সৃষ্টি করিল। অনাহুতা কল্যাণী বরের দিকে মন্থর গমনে অগ্রসর হইল। তাহার পরিধেয় বসন কামিনীগণের কামনা অনুরূপ না হইলেও, তাহার কর্ম্মঠ. স্বাস্থ্যময়, সুগঠিত অঙ্গ অনাবশ্যক অলঙ্কার বর্জ্জিত হইলেও, তাহাতে নারী সৌন্দর্য্যের এমন সহজ ম হমা প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর, তাহার শিরায় শিরায় স্বামীর আদরের সুখ প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ায়, তাহাকে এমন কমনীয় দেখাইতেছিল, সর্ব্বোপরি কক্ষের উজ্জ্বল আলোক সকল তাহার যৌবনদীপ্ত গমনশীল দেহের উপর পতিত হওয়ায় তাহার শ্যাম অবয়বকে এমন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, যে কক্ষস্থ কোনও রমণীই তাহাকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধা না হইয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু মনোমোহিনী কল্যাণীর যৌবনশ্রী দেখিয়া সব চেয়ে অধিক মুগ্ধ হইয়াছিল, যুবক বর।

পার্শ্বস্থা যুবতী বরের নিকট কল্যাণীর পরিচয় প্রদান করিল।

বর, বরপ্রাপ্তির আশায় ভক্ত যেমন অভিষ্টা দেবীর মুখের দিকে একাগ্র নয়নে চাহিয়া থাকে, তেমনই কল্যাণীর মোহিনী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিয়া, এক রসিকা কহিল, 'ওগো, ও তোমার আদরিনী গিন্নীর বড় বোন। ওকে গিলে খাবে নাকি ?'

বর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তোমাকে হ'লে গিল্‌তাম। কিন্তু ওকে দেখলে গিল্‌তে ইচ্ছে যায় না ; কেবল ভক্তি কর্ত্তে ইচ্ছে যায়।'

বুদ্ধিমতী প্রমদা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি রসিকার প্রশ্নে বা বরের উত্তরে প্রসন্না হইতে পারিলেন না। ভাবিলেন, কেন, ছুড়ী ওই কাল কৃষ্ণ কদাকারা কল্যাণীর ভিতর কি মিষ্ট দেখিতে পাইল যে তাহা ঈশানীর বরের পক্ষেও গিলিয়া খাইবার সামগ্রী হইল। আর জামায়েরও, এত পক্বকেশ বৃদ্ধা কক্ষমধ্যে উপস্থিতা থাকিতে, শ্যালীকে অমন ভক্তি দেখান উচিত হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধিমতী আপন মনের ভাবনা আপনার মনের মধ্যেই গোপন রাখিলেন ; বাহিরে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

ইত্যবসরে, বর উঠিয়া, আগমনমানা কল্যাণীর সম্মান প্রদর্শন করিল; এবং আটটি টাকা দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ পশ্চাদপদ হইয়া বরকে তাহার পদ স্পর্শ করিতে দিল না। বর প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে, সে কিছু চিন্তিত হইল।—তাহার বাক্সে যে অর্থ ছিল, তাহাত সমস্তই সে পিতাকে দিয়া ফেলিয়াছে; এই আশীর্ব্বাদের কথা তাহার মনে উদিত না হওয়ায়, সে স্বামীর নিকট হইতে কিছু চাহিয়া, রাখে নাই; তবে সে কি দিয়া ভগিনীপতিকে আশীর্ব্বাদ করিবে? শুধু প্রণামী টাকা ফেরত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, বিমাতার নিকট তিরস্কৃত হইতে হইবে; বুঝি স্বামীরও নিন্দা শুনিতে হইবে। কিন্তু বিধাতা সাধ্বীকে পতিনিন্দা শোনান না; যাহাতে এই মহাপাপ হইতে পতিব্রতা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, দয়াময় আগেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি তাহার মস্তকে আবির্ভূত হইয়া তাহা তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। হস্তস্থিত ধুতি ও উত্তরীয় হঠাৎ তাহার দৃষ্টিতে পতিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রের সহিত প্রাণামী টাকা ফেরত দিল; এবং পাত্র হইতে ধান দূর্ব্বা লইয়া বরকে আশীর্ব্বাদ করিল।

সেই আশীর্ব্বাদের মৃদু স্পর্শ মস্তকে অনুভব করিয়া বর, কি জানি কেন, আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; এবং কহিল, 'এমন কাপড় দিয়ে আশীর্ব্বাদ আমাকে কেউ করেন।'

বরের এই উক্তি শুনিয়া প্রমদা দারুণ অন্তর্দাহে জ্বলিয়া গেলেন। এই অন্তরদাহ নিবারণ করিবার জন্য পরে তিনি অখিল বাবুকে বলিয়াছিলেন, 'অমন জালের মত এক খানা কাপড় দেওয়া কেন?' হায়, কাপড়ের এই নিন্দার সময়, তিনি ত জানিতেন না যে, ঐ বস্ত্র দিয়া, তিনিই কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে, যদুপতিকে বরণ করিয়াছিলেন। দুই এক দিন পরে কিন্তু অখিলবাবুর ও প্রমদা উভয়েই বস্ত্রের যথার্থ ইতিহাস জানিতে পারিয়াছিলেন। জানিয়া অখিলবাবু মনে মনে হাসিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী প্রমদা ঐ বস্ত্র সম্বন্ধে আর কখনও কোনও উচ্চবাক্য করেন নাই।

ক্রমশঃ

২

ভারতবর্ষ

মহাত্মা গান্ধী

দেশবন্ধু-পরিবার

The Sturdy Rear Axle

An Overland Feature

OVERLAND has the strongest rear axle of any car sold to-day at or near the Overland price. An axle built to stand more abuse than the stresses of service will give it. The oversize axle shafts are forged of tough Mo-lyb-den-um steel, fortified at every vital point with genuine Timken and New Departure Bearings. Road conditions mean nothing in the life of *this* axle! Millions of miles by thousands of owners have not brought to light a single engineering defect in this new Overland rear axle.

Touring with full equipment including such extras as 5 cord tyres, bulb horn, electric side lamps and cushion covers. Hire-purchase terms can be arranged.

OVERLAND TOURING Rs. 2900 F. O. R. PORT OF ENTRY

G. McKENZIE & Co. (1919) LTD.

UNDER NEW MANAGEMENT

Calcutta Cawnpore Delhi Lahore and Rawalpindi

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২৬শে পৌষ শনিবার, ১৩৩১। [৯ম সপ্তাহ

কংগ্রেস

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে নাট্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, ১৯২৪ সালের বেলগাঁ কংগ্রেসে সেই নাট্যের যবনিকাপাত হইল। বেলগাঁ কংগ্রেসে শ্রীমতী বেসান্ত আসিয়া যোগ দিলেন, মহাত্মা গান্ধী মিলনের গীতি গাহিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন, তথাপি আমরা এ নাট্যকে মিলনান্ত নাটক বলিতে পারিব না। কেননা জাতীয় জীবন ও মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত জীবনের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বেলগাঁ কংগ্রেস একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি।

লোকমান্য তিলক।

তথাপি এই কংগ্রেস নব্য ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; কেহ বলেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পূর্ণ রকম নূতনপন্থা অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু আমরা বলি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের Organisation বা গঠনে যে মহা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় পূর্ব্বপূর্ব্ব

কংগ্রেস অধিবেশনের পরিবর্ত্তন বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে হয় না।

মহামতি হিউমের অনুপ্রেরণায় যখন দাদা ভাই নৌরজী ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কংগ্রেসের সূত্রপাত করেন, তখন কংগ্রেস হইতে করা হইত। তাহার পর বাঙ্গলায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কংগ্রেসের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য আন্তরিক চেষ্টা আরম্ভ হয়। তখন হইতে কংগ্রেস আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কেন্দ্র-স্বরূপ হয়।

স্যার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কংগ্রেসের হস্তে একমাত্র অস্ত্র ছিল—সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের পসরা মাথায় করিয়া উপস্থিত হওয়া। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ যদি কোন ঘোরতর অন্যায় কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাহারও প্রতিবাদ

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নরমদল ও গরমদল সকল যুগে সকল দেশেই দেখা যায়। সুতরাং কংগ্রেস যখন একটি শক্তিরূপে পরিণত হইল, তখন তাহাতেও যে দুইটী দলের আবির্ভাব হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! নরম ও গরম দল এই স্বদেশী

আন্দোলনের যুগ হইতে কংগ্রেসকে নিজের দলের অধিকারে আনিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। লোকমান্য তিলক মহারাজের প্রচেষ্টায় কংগ্রেসে জাতীয় দল গঠিত হয়। তিলকের ন্যায় অলোকসামান্য প্রতিভাবান্ ও শক্তিশালী নেতার পরিচালনায় কংগ্রেস জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও আদরের সামগ্রী হইয়া উঠে।

প্রভৃতির সঙ্গে দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসও সমিতি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি আর কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। যে চিত্তরঞ্জন সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছিলেন, আজ সেই চিত্তরঞ্জনেরই মতবাদ কংগ্রেস গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯০৬ সালে ঐ উভয় প্রস্তাব

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বয়কট ও স্বরাজ প্রস্তাব লইয়া নরম ও গরমদল তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেন। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে এই উভয় প্রস্তাবের বিচারের সময় জাতীয় দল সমিতি পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আইসেন। তিলক

কংগ্রেসে গৃহীত হইলেও ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তখনও নরমদলের প্রভাব সমধিক! তাই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় সুরাট কংগ্রেসে জাতীয় দল বাধ্য হইয়া কংগ্রেস হইতে চলিয়া আইসেন।

তারপর আবার সাত বৎসর কাল ধরিয়া ফিরোজ শাহ মেহাতার নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস নরমপন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—জাতির উন্নতি সাধনের জন্য যাঁহারা বুঝিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। এইরূপে জাতীয় দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায়, নরমদল সাত বৎসর কাল ধরিয়া কংগ্রেসে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী তখন কংগ্রেসকে "মেহতা মজলিস্" বলিয়া বিদ্রূপ করিত।

লালা লাজপত রায়।

বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে লোকমান্য তিলক ও লাজপৎ রায় রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলেন—আর বাঙ্গলার নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচারীতে সাধনা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও সময় সুবিধা নয়

কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এক নবযুগের সূচনা হইল। লোকমাণ্য তিলক নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মহাত্মা গান্ধী আফ্রিকা হইতে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া দেশে আসিলেন। আর শ্রীমতী বেশান্ত হোমরুলের

দাবী লইয়া ভারতবাসীকে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন। ইঁহাদের সমবেত পরিচালনায় কংগ্রেসের মধ্যে নূতন প্রাণের এক চাঞ্চল্য দেখা দিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ন্যায়ই মিলনের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে জাতীয় দল ও নরম দল একযোগে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও তখন যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রত্যাশী হইয়া ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন দিবেনই—প্রতিশ্রুত হয়েন।

কিন্তু এ মিলন স্থায়ী হইল না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীমতী বেশান্ত সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হয়েন—নরমপন্থী ইহাতে বিরক্ত হইয়া লিবারেল ফেডারেশন নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ।

নরমপন্থীরা চলিয়া গেলেও গরম দল বেশ জোরের সহিতই কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার ও শাসনসংস্কারে অসন্তোষ এই দলকে দিন দিন পরিপুষ্ট করিতে লাগিল।

মহাত্মা গান্ধী দেখিলেন ভারতের মুক্তির একমাত্র উপায় অসহযোগ আন্দোলন। আধ্যাত্মিকভাবে সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। চারি বৎসর কাল ধরিয়া মহাত্মাজী তাঁহার সুমহান্ আদর্শ জাতি কতকটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, তাহাই দেখিবেন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আজ বেলগাঁ কংগ্রেসে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলিল না। যে অসহযোগ আন্দোলন দেশে ধীরে ধীরে পলে পলে মৃত্যুলাভ করিতেছিল, মহাত্মাজী বেলগাঁয় স্বহস্তে তাহাকে সমাহিত করিলেন। যে ঋষি অসহযোগ আন্দোলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তিনিই স্বহস্তে তাহাকে বিসর্জন দিলেন। বেলগাঁ কংগ্রেসের ট্র্যাজেডি এইখানেই।

—স্বরাজ-সাধনায় ভারতনারী।

কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে

জাতি কংগ্রেসের মধ্যদিয়া উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যখনই আন্দোলন আরম্ভ করে তখনই তাহার প্রতিক্রিয়া আইসে। স্বদেশী আন্দোলনের পর নরম দলের সুদীর্ঘ আধিপত্য; আবার হোমরুল ও অসহযোগ আন্দোলনের পর বেলগাঁ কংগ্রেসে জাতীয় অক্ষমতা স্বীকার। কে জানে দিয়াছিলেন দেশ তাহা গ্রহণ করিল না বা করিতে পারিল না। এক্ষেত্রে মহাত্মা সাধারণ নেতা হইলে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু মহাত্মা আদর্শ বাদী হইলেও Visionary বা কল্পনা-লোকের অধিবাসী নহেন। যখন অসহযোগ আন্দোলন চলিল না, তখন তাহা লইয়া বৃথা
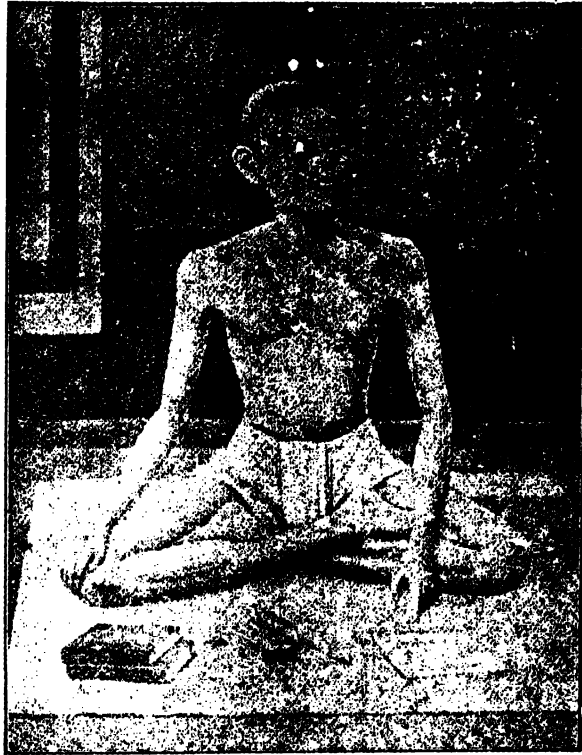
ত্যাগীশ্রেষ্ঠ মহাত্মাজী।

এই অক্ষমতা স্বীকারের ফলে জাতির উন্নতি আগাইয়া যাইবে কি পিছাইয়া যাইবে?

বেলগাঁ কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া সর্ব্ব প্রথমেই একটি কথা মনে জাগে—সেটী হইতেছে মহাত্মাজীর আত্মত্যাগ। মহাত্মা অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ আর আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া লাভ কি? আর দেশ তাঁহার উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিল না বলিয়াই কি, তিনি দেশের প্রতি বিমুখ হইয়া ঔদাস্য অবলম্বন করিবেন? মহাত্মার প্রকৃতি সেরূপ নহে। নিত্যানন্দ যেমন মার খাইয়াও প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, মহাত্মাও তেমনি

দেশের অনাদর ঔদাসীন্য অবহেলা করিয়া, তাহার মুক্তি কামনায় জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। মহাত্মাজীর মনে যদি দেশের উন্নতি ছাড়া অহংজ্ঞান এক বিন্দুও থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিজে অসহযোগ আন্দোলনকে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন না।

মহাত্মাজী বিভিন্নদলের মধ্যে মিলনের প্রয়াসী হইয়া দল না হইলেও, শক্তিশালী দল বটে। এ দলকে কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দিলে, ঐ দলের কার্য্যকরী ক্ষমতা কমিয়া যাইবে ও কংগ্রেস দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে মনে করিয়া মহাত্মাজী স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের মধ্যে আনয়ন করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে ঐ দলকে আনিতে যাইয়া, তাঁহাকে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখিতে হইল। পরিবর্ত্তন

মৌলানা মহম্মদ আলি—মহাত্মাজীর দক্ষিণ হস্ত—

জাতির পক্ষে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন।—তিনি যে অসহযোগে শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন তাহা নহে—ব্যক্তিগতভাবে তিনি এখনও অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করিয়া চলিবেন। কিন্তু জাতির কল্যাণের জন্য—তিনি উহা স্থগিত রাখিলেন। স্বরাজ্য দল দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরোধী অসহযোগীগণ মহাত্মাজীর প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধা-বশতঃ এই মিলনের কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না।

কিন্তু মিলন কি এইরূপে হইবে? শ্রীমতী বেশান্ত অবশ্য চারি বৎসর পরে আবার আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু লিবারেলগণ কি কংগ্রেসের মধ্যে আসিতে পারিবেন?

লক্ষ্ণৌয়ের অধিবেশনে লিবারেলগণ ডাঃ পরাঞ্জপের মুখ দিয়া ইহার উত্তর দিয়াছেন। কংগ্রেস যতদিন সাম্রাজ্যের মধ্যেই স্বরাজ লাভ বা সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইয়া স্বরাজ লাভ এই নীতি রাখিবেন ততদিন লিবারেলগণ কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন না। তাঁহারা একান্ত ভাবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই স্বরাজ লাভ করিতে চাহেন। এরূপ মত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিলন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। স্বরাজ দল গবর্ণমেণ্টের সকল কাজে বাধা দিবেন, আর লিবারেল দল কেবল মাত্র প্রয়োজন হইলে বাধা দিবেন—

বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তন বিরোধীদলের নেতা দেশপ্রেমিক শ্যামসুন্দর।

তবে উভয়ের মিলন হইবে কি প্রকারে? আর কংগ্রেসে ঐ সকল দল যদি বিভিন্ন বিভিন্ন মত পোষন করিয়াও যোগ দেন, তবে কংগ্রেসের কার্য্যের ঐক্য থাকিবে কি করিয়া, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন।

অথচ মহাত্মাজী যে মিলনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখিলেও তাহার মূল নীতিগুলিকে স্থগিত রাখেন নাই। অহিংস ভাবে এখনও সকল কার্য্য করিতে হইবে। চরকা কাটিয়া দেশকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। প্রত্যেককে খদ্দর পরিধান করিতে হইতে। হিন্দু মুসলমানের একতা আনিতেই হইবে। আর হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দোষ বিদূরিত করিতে হইবে। শিক্ষাকেন্দ্র গুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া দেশের বালক বালিকাকে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। এই চারিটী কার্য্য শুনিতে ছোট হইলেও করা সহজ নহে। ইহার উপর যে ভারতবর্ষের জীবন মরণ সমস্যা নির্ভর করিতেছে, তাহা সকলেই মানিয়া লইবেন। এই সমস্যাগুলি সমাধান করিবার জন্য সকল দলের মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। মহাত্মা দেশের এই প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য সকল দলকে আহ্বান করিয়াছেন। যদি বিভিন্ন দল তাঁহাদের মত বৈষম্য ভুলিয়া মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পথে কাজ করিতে

হজরত মোহানী।

পারেন, তবে দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাঁহারা মিলিত হইতে পারিবেন কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৯২৪এর কংগ্রেসে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তন অসহযোগ আন্দোলনের পরিবর্জ্জনে নহে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যাহা প্রাণ স্বরূপ সেই চরকা চালনা গ্রহণে। কংগ্রেস এতদিন রাষ্ট্রীয় মতবাদীদের সম্মিলনক্ষেত্র ছিল—মহাত্মাজী এবার কংগ্রেসকে জাতীয় কর্ম্মীদের মিলন-ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। যিনি দুই সহস্র গজ সুতী প্রতি মাসে কাটিতে পারিবেন না, তিনি কংগ্রেসের কোনরূপ সংশ্রবে আসিতে পারিবেন না। এই নীতি যদি সকলে গ্রহণ করিয়া চলিতে পারেন, তবে কংগ্রেস কেবল মাত্র দেশের কর্ম্মীগণের প্রতিষ্ঠান হইবে—বাক্‌সর্ব্বস্ব নেতার আর সেখানে স্থান

হইবে না। মৌলনা হজরত মেহানী মহাত্মাজীর খদ্দর প্রস্তাব স্বীকার করিতে না পারিয়া কংগ্রেসের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

মহাত্মাজী বর্ত্তমানে কাজ করিবার জন্য বারটি উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) যাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিবেন, তাঁহারা কায়িক পরিশ্রম করিবেন। বুদ্ধি বা অর্থবলে কংগ্রেসের দ্বার কাহারও নিকট উন্মুক্ত হইবে না।

(২) ভারতের সামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) বিচার কার্য্যের ব্যয়ও হ্রাস করা প্রয়োজন। সালিসী পঞ্চায়েৎ দ্বারা মোকদ্দামাদির নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ইংরাজী আইনের অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করিয়া ন্যায় বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বিচার করিতে হইবে।

(৪) মাদক দ্রব্য হইতে কোন রাজস্ব গ্রহণ যাহাতে না করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে।

(৫) কর্ম্মচারীদের বেতন দেশের অবস্থা অনুসারে কমাইতে হইবে।

(৬) ভাষার বিভিন্নতা অনুসারে প্রদেশ পুনর্গঠন করিয়া প্রত্যেক প্রদেশকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দিতে হইবে।

(৭) বিদেশীগণের একচেটিয়া অধিকার অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিশন বসাইতে হইবে ও ন্যায্য দাবী পূরণ করিয়া একচেটিয়া অধিকার বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৮) দেশীয় রাজাদিগকে তাঁহাদের অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়াইতে হইবে।

(৯) স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১০) উচ্চতম পদ সমূহে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দ্বারা লোক হইতে হইবে।

(১১) ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

(১২) রাজকীয় ভাষাকে জাতীয় করিতে হইবে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

মহাত্মাজীর অভিভাষণ বক্তৃতা ও দেশবন্ধু এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বক্তৃতার ফলে কলিকাতা প্যাক্ট কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোহাট সমস্যা সম্বন্ধে লালা লজপত রায় ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন সম্বন্ধে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রস্তাব উত্থাপনা করেন। উভয় প্রস্তাবই কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

বেলগাঁ কংগ্রেসের অকৃতকার্য্যতা নিষ্ফলতা সম্বন্ধে যাঁহারা এখনই বড় বড় মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা ধীরতার সহিত কার্য্য করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। জাতি এবারও মহাত্মাজীর মিলনের আহ্বান গ্রহণ করে কি না সে জন্য আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

বন্দে মাতরম্

—বন্দে মাতরম মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—

গীতার ব্যাখ্যা

(গল্প)

[শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা]

(১)

মণিভূষণ সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করিয়াছে শুনিয়া মা অন্নপূর্ণা স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া বিরলে চোখের জল মুছিলেন। পিতৃহারা শিশুপুত্র দু'টির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। ছেলে দু'টির মুখ চাহিয়াই তিনি বৈধব্যের অপরিসীম দুঃখ বুকে চাপিয়া রাখিয়া এতদিন জমিদারী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীর সম্পত্তি সুরক্ষিত, পুত্র কৃতবিদ্য, কিন্তু তিনি আজ কোথায়! মণি প্রফুল্ল মুখে আসিয়া মাকে প্রণাম করিলে মা হাসিমুখে বলিলেন, "এতকাল আমি বিষয় আসয় দেখা শুনা করেছি, এখন তোমার কাজ তুমি বুঝে সুঝে নাও।

মণি সহাস্যে জবাব দিল, "আমার আবার কাজ কি মা? এতদিন পরীক্ষার ভাবনায় রাত জাগতে জাগতে, আর ঠাকুরের রান্না খেতে খেতে আমার কি হাল হয়েছে দেখছ তো! এখন রোজ তোমার হাতের নিরিমিষ রান্না খাওয়া আর তোমার কোলের কাছে ঘুমিয়ে থাকাই হচ্ছে আমার কাজ।"

ছেলের কথায় মায়ের মন মমতায় বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছেলের সর্ব্বাঙ্গে স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন. "হাঁ মণি, তোর শরীরটা বড্ড খারাপই হয়ে গেছেরে; তা এখন কিছুদিন জিরিয়ে নে। তারপর কাজকর্ম্ম দেখবি। আর কিছুদিন দার্জ্জিলিং থাকলে হ'তো।"

পরীক্ষা অন্তেই মণি দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিল, আজ বাড়ী ফিরিয়াছে।

সে হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি যতখানি বলছ, শরীরটা আমার ততখানি খারাপ হয় নি কিন্তু।"

"সে আমি জানি, তোকে আর বলতে হবে না। যাই, তোর জন্যে মাংসটা আমিই রাঁধিগে আজ" বলিয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলেন।

আচার নিষ্ঠাপরায়ণা মা যে আমিষ রান্না করিতেন, মণি ইহা সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু মাও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ছেলেদের না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। এই কাজটি হইতে তাঁহাকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাইত না। ঠাকুরের রান্নার কথা না বলিলে মা হয় তো এখনই রান্না করিতে যাইতেন না ভাবিয়া মণি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিল।

মণি বেড়াইয়া আসিয়া অন্দরে ঢুকিয়া মায়ের সন্ধান করিল। মাকে তাঁহার ঘরে দেখিতে না পাইয়া সে রান্না ঘরের দিকে গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে চন্দ্রপুলি পিঠা করিতে ছিলেন, দ্বারের দিকে পিঠ রাখিয়া একটি মেয়ে বসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। মেয়েটীর মুখ তো দেখাই যাইতেছিল না, পিঠও এলো চুলে ঢাকা ছিল। মণি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইঙ্গিতে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তোর হয়েছে কি মণি? তুই যমুনাকে চিনতে পাচ্ছিস্ নে?"

যমুনা মণির কর্ম্মচারী শিবনাথের মাতৃহীনা কন্যা। ঘরে অন্য স্ত্রীলোক না থাকায় শিবনাথ যমুনাকে অন্নপূর্ণার কাছে আনিয়া রাখিয়াছে। বছর তিনেক হয় যমুনা এখানেই আছে।

মণি বলিল, "ওমা! যমুনা নাকি? চিনব কেমন করে বল মা? মুখ তো দেখতেই পাই নি, পিঠও চুলে ঢাকা। এক বছরে অনেকখানি বড়ও হয়েছে।"

যমুনা ঘাড় গুঁজিয়া কোন রকমে হাতের কাজ করিতে লাগিল। তাহার লজ্জা অনুভব করিয়া অন্নপূর্ণা ছেলেকে বলিলেন, "কি যে বলিস তুই! যমুনা তো তেমন কিছুই বড় হয়নি।"

"ওর বড় হওয়া কেন তুমি অস্বীকার করছ, তা আমি বলতে পারি।"

"বল দেখি।"

"যমুনা কিনা খুব শুচি হয়ে তোমার পুজোর সব কাজ করে দেয়, আর কেউ করলে তো তোমার মন মত হয় না, তাই তুমি ওর বিয়ে দিতে দেরী করতে চাও।"

মা স্নেহ হাস্যে বলিলেন, "খুব বুঝেছিস! এখন বাজে না বকে খেয়ে দেখ দেখি পিঠে কেমন হয়েছে।"

"সেই ভাল মা, দাও, দাও।" বলিয়া মণি একখানা পিঁড়ি লইয়া মায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। যমুনা সসঙ্কোচে উঠিয়া দাঁড়াইল। মণি বলিল, "যমুনা উঠলে কেন? তুমিও আমার কাছে বসে খাও।"

যমুনা সলজ্জ হাসিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিঠে কেমন হয়েছে রে?"

মণি বলিল, "খুব ভাল, মা, যেমন তোমার পিঠে হয়ে থাকে। কিন্তু মা, যমুনার এত লজ্জা হয়েছে কেন?"

"এক বছর পরে তোর সঙ্গে দেখা, তাই বুঝি একটুখানি লজ্জা করছে।"

"যমুনার বিয়েটা বোধ হয় তোমাকেই দিতে হবে। ওর বাপকে তো পরম নিশ্চিন্ত বলেই মনে হয়।"

"যমুনার বিয়ের ভার কি আমি শিবনাথকে দিতে পারি? এখন তোর পড়া শেষ হয়েছে, একটা ভাল পাত্রের খোঁজ করিস্।"

"আমার একটি বন্ধু আছে, সে ছেলে খুব ভাল। কিন্তু এম্, এ, পাশ না করে বিয়ে করবে না। তুমি কি দু'বছর দেরী করতে পারবে?"

"ছেলে যদি ভাল হয়, আর যদি কথা দেয়, তবে দু'বছর দেরী করতে পারি।"

(২)

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মণির বাল্যবন্ধু রসিক আসিয়া বলিল, "মণি, তুমি কখনো রামতনু ভাগবতরত্নের গীতার ব্যাখ্যা শুনেছ?" মণি ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "না! লোকটা কে?" রসিক বলিল, "ভাগবতরত্নের বাড়ী বোধহয় নবদ্বীপে। ইনি যেমন পণ্ডিত, তেমন সুবক্তা। এখানকার 'আর্য্যধর্ম্ম রক্ষিণী সভার' নিমন্ত্রণে ইনি এখানে এসেছেন। আজ হতে সাত দিন ইনি 'আর্য্যধর্ম্ম রক্ষিণী সভায়' শ্রীমদ্ ভগবদগীতার ব্যাখ্যা করবেন। শুনতে যাবে?"

"তা যেতে পারি।"

সন্ধ্যার পর দুই বন্ধু সাজিয়া গুজিয়া 'আর্য্যধর্ম্ম রক্ষিণী সভাগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামের কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় কয়েক বৎসর হয় সভাটি স্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে সভায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আজ ভাগবতরত্নের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সভাগৃহে বহুলোক সমাগত হইয়াছে। ব্যাখ্যাতার জন্য টেবিল চেয়ার নাই। সভার মধ্যস্থলে ভাগবতরত্ন একখানি পশমের আসনে আসীন। তাঁহার সম্মুখে ঈষৎ উচ্চ শুভ্র রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত পুষ্প মণ্ডিত কাষ্ঠাসনে গীতা রক্ষিত। ভাগবত-রত্নের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁহার সুগৌর সুঠাম দেহ, প্রশস্ত ললাট এবং শান্ত সৌম্য মুখশ্রী দর্শকের শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিতেছিল। তাঁহার পদদ্বয় নগ্ন, পরিধানে খদ্দর এবং খদ্দরের একখানি উত্তরীয় বক্ষ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। দুইটি ছোট ছেলে সুমিষ্ট স্বরে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র গাহিল। গানটি শেষ হইলে ভাগবতরত্ন বলিলেন, "আপনারা সাদরে এই অযোগ্য অকিঞ্চনকে ডেকে এনে যে কতদূর গৌরব দান করেছেন, তা আমার হৃদয় উপলব্ধি করছে, মুখে বলবার নয়। শ্রীমদ ভগবদগীতা খৃষ্টের জন্মের কত বছর আগে বা পরে রচিত হয়েছে, কে রচনা করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অর্জ্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাখানা শোনানো সম্ভব কিনা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে গীতার কোন খানে কোথাও যোগ আছে কিনা, সে সব বিচার বিতর্ক আমি করব না; সেটা পণ্ডিতদের কাজ, আমার নয়। গীতার অপূর্ব্ব উদার ধর্ম্মমত এবং অমৃতময়ী বাণী আমি যেমন করে বুঝেছি, তেমন করেই আপনাদের কাছে বলতে চেষ্টা করব। আমার কাছে বেশী রকম কিছু আশা করে আপনারা পাছে যেন ক্ষুব্ধ না হন।"

এই বলিয়া ভাগবতরত্ন গীতার প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গি, পাণ্ডিত্য এবং কণ্ঠের মিষ্টতায় শ্রোতারা পুলকিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রকাশের ভাষা এত সহজ এবং সরস যে নিরক্ষরের ও বুঝিতে অসুবিধা হইতেছিল না।

তিন ঘণ্টা ব্যাখ্যা চলিল। তারপর ভাগবতরত্ন সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে, তিনি শ্রোতাদের ধৈর্য্যের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় দশটা, এখন সকলেরই বিশ্রামের প্রয়োজন।

ভাগবতরত্ন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সভা ভঙ্গ হইল।

চলিতে চলিতে রসিক জিজ্ঞাসা করিল, "মণি, কেমন শুনলে ?"

মণি বলিল, "বেশ। সময়ের বাজে খরচ হয় নাই।"

রসিক বলিল, "শুনেছি, উনি খুব বিদ্বান।"

"ওঁর বলবার ভঙ্গিটিও চমৎকার।"

"কাল যাবে ?"

"যাব বৈ কি। ডেকে নিয়ে যেও ভাই।"

মণি তিনচারদিন গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়া একদিন রসিককে বলিল "ভাগবত রত্নের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?"

রসিক বলিল, "আছে।"

"আমাকেও আলাপ করিয়ে দেবে চল।"

"আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, চল।"

আর্য্যধর্ম্ম রক্ষিণী সভাগৃহের কাছে একটা বাড়ীতে ভাগবত রত্নকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। মণি ও রসিক যখন সেখানে পৌছিল, তখন ভাগবতরত্ন সবেমাত্র পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার পরিধানে গরদ, ললাট চন্দন চর্চ্চিত। ভৃত্যের মুখে রসিকের আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি সেই অবস্থাতেই বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মণির মনে হইল,সে যেন প্রাচীন যুগের কোন এক ঋষির আশ্রমে আসিয়াছে। রসিকের দেখাদেখি সেও তাঁহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। রসিক বলিল,"ইনি আমাদের গ্রামের জমিদার মণিভূষণ বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

ভাগবতরত্ন বলিলেন, "সে আমার পরম সৌভাগ্য।" তারপর মণির পানে চাহিয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "কিন্তু বাবু, গরীব বামুনের কাছে এসেছেন। এখানে কম্বল কুশাসন ছাড়া বসবার তো কিছু নেই।" মণি বলিল, "তা ছাড়া আর কিছু এখানে পেলে আমি খুসী হতাম না। আমি—আমি—এসেছি—" মণি সহসা থামিয়া গেলে রসিক মৃদু হাসিয়া বলিল. "আপনার আশীর্ব্বাদ পেলেই মণি কৃতার্থ হবে। আপনার গীতা পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে মণি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।"

মণির মনের কথাটা টানিয়া গুছাইয়া বলিতে পারায় সে রসিকের প্রতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিল।

ধীরে ধীরে আলাপ জমিয়া উঠিতে লাগিল। রসিক গীতার দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা পাড়িল। ভাগবতরত্ন সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। রসিক কখন প্রশ্ন, কখন প্রতিবাদ করিতেছিল। ভাগবতরত্ন স্মিতমুখে অনুত্তেজিত শান্তকণ্ঠে উত্তর দান ও তাহার মত খণ্ডণ করিতে লাগিলেন। মণি স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। সে বুঝিল, শুধু ভারতীয় দর্শন নয়, পাশ্চাত্য দর্শন সমূহও তাঁহার উত্তম রূপে পড়া আছে।

এক সময়ে রসিক মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মণি, বারোটা বাজে।" মণি হঠাৎ সচেতন হইয়া ঈষৎ অনুতপ্তস্বরে বলিল, "আপনাকে আজ ভারি কষ্ট দিলাম।"

ভাগবতরত্ন বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "কি রকম কষ্ট মণিবাবু ?" মণি কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "রসিক বলেছে, আপনি স্বপাক খান। এত বেলায় নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া—"

"তাতে আমার কোন অসুবিধা নেই। অনেকেই অনুগ্রহ করে আমায় ডেকে পাঠান। বছরে ছ'মাস আমাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। স্বপাক খাই বটে, আমিষের হাঙ্গামা তো নেই ; ডাল তরকারীও বড় খাইনে ; প্রায়ই ভাতে ভাত খাই। কাজেই সময় বেশী লাগে না। এইটুকু সময় আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পেয়েছি।

আনন্দ মনের খোরাক, সে ভাতের চেয়ে ছোট নয়।"

"একদিন আমার বাড়ী পায়ের ধূলো দেবেন? মা বলেছেন ”

"কাল চারটার সময়ে আমি মা'র সঙ্গে দেখা করব।"

মণি ও রসিক ভাগবতরত্নকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ভাগবতরত্ন সদর রাস্তা পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

(৩)

সপ্তাহ পরে ভাগবতরত্ন চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার খানিকটা প্রতিনিধিত্ব যেন মণির মধ্যে রাখিয়া গেলেন। মণি সুদৃশ্য মূল্যবান পরিচ্ছদগুলা ছোটভাই বিনয়ের জন্য তুলিয়া রাখিয়া খদ্দরের ধুতি চাদর পরিয়া প্রায় খালি পায়ে থাকিত। কদাচিত ঘাসের চটি অথবা হরিণের চামড়ার জুতা ব্যবহার করিত। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ে খদ্দরের প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগ ইতিমধ্যে মন্দীভূত বা সুপ্ত হওয়ায় পরিচিতেরা সেটা বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিক অবস্থা জানিয়া আশ্চর্য্য হয় নাই। কিন্তু সেই অনুরাগ অকস্মাৎ জাগ্রত দেখিয়া তাহারা বিস্ময় অনুভব না করিয়া পারিল না। শুধু সৌখিন পোষাক নয়, মণি আমিষ আহারও ত্যাগ করিল। সে প্রাতঃস্নান করিয়া ঘণ্টা দুই বসিয়া গীতা পাঠ করিত। বৈষয়িক কাজেও তাহার মনোযোগ দেখা যাইত না। ধনীর দুলালের ভোগ বিলাসে আকস্মিক অনাসক্তি দেখিয়া বৃদ্ধ দেওয়ান অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "মা, মণি এসব কি করছে? তাকে বারণ করেন না কেন?"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে জবাব দিলেন, "খারাপ তো কিছু করছে না। এ বয়সে ছেলেরা নতুন কিছু করতে চায়, এতে বাধা দেওয়ায় কোন লাভ নেই। আপনি ভয় পাবেন না।"

দেওয়ান অন্নপূর্ণাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিতেন। আজ তাঁহার বুদ্ধির তারিফ করিতে না পারিয়া নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এমনি করিয়া ছয়মাস গেল।

একদিন অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মণি, বাঁশডাঙ্গার প্রজারা নায়েবের সঙ্গে ভারি গোলমাল বাধিয়েছে। মামলা মোকদ্দমা না করে তুই নিজে যেয়ে মিটমাটের চেষ্টা কর না।"

জমিদারী ঠাট পুরা মাত্রায় বজায় রাখিয়াই জমিদারকে মফঃস্বলে যাইতে হয়। তাই মায়ের প্রস্তাবটা মণির প্রীতিকর হইল না। মণির বর্ত্তমান আচার ব্যবহারে বাধা না দেওয়ায় সে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞই ছিল। সে সেই কৃতজ্ঞতার খাতিরেই বোধ হয় বলিল, "আচ্ছা মা, যাব।"

অন্নপূর্ণা দু'চার দিনের মধ্যেই ছেলেকে রওনা করিয়া দিলেন। মণি বাঁশডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া প্রজাদের সমস্ত আবেদন আবদারে রাজি হইয়া বিবাদ মিটাইল। সেখানকার নায়েব অবাধ্য প্রজাদিগকে শাস্তি দিতে না পারিয়া প্রভুর আচরণে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া গোপনে দেওয়ানকে লিখিল, "বাবুর যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে জমিদার রক্ষা হওয়া কঠিন।" চিঠি পাইয়া প্রভুভক্ত দেওয়ান মনে ভাগবতরত্নের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন।

একপক্ষ পরে মণি ফিরিয়া আসিয়া শিবনাথের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল। সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি যমুনার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। যমুনা তাহার সঙ্গে একটি কথাও বলিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। তাহার শোকশীর্ণ দেহটি দুর্নিবার আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

মণি রাত্রে খাইতে বসিয়া মা'কে বলিল, "যমুনা শোকে বড্ড কাতর হয়েছে।"

মা সমবেদনাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "হবে না? ওর আপনার বলতে শুধু বাপই তো ছিল।"

"ওকে রোজ গীতা পড়ে শোনালে বোধ হয় একটু সান্ত্বনা পাবে।"

"তা তুই যখন গীতা পড়িস, তখন যমুনাকে ডেকে নিস্।"

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া মণি ডাকিল, "যমুনা গীতা পাঠ শুনবে এস।"

যমুনা যেন কথাটা বুঝিতে পারিল না, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে মণির মুখপানে চাহিয়া রহিল। মণি সস্নেহে যমুনার মাথায়

হাত রাখিয়া বলিল, "ভাল কথা শুনলে মন ভাল থাকবে। এস আমার সঙ্গে।"

যমুনা নীরবে মণির অনুসরণ করিল।

শয়ন কক্ষ লগ্ন একটি ছোট কক্ষ ছিল মণির গীতা পাঠ কক্ষ। কক্ষের মেঝেটি মার্বেল মণ্ডিত, দেয়ালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকখানা ছবি। কোন ছবিতে তিনি গোবর্দ্ধন ধারী, কোন ছবিতে কালীয় দমন, কোন ছবিতে অর্জ্জুন-সারথী বেশে গীতা প্রবক্তা। কক্ষের মধ্যস্থলে কারুকার্য্য খচিত মখমল মণ্ডিত রজত আসনে গীতা সংস্থাপিত। ফুল, চন্দন ও ধূপের মিশ্র গন্ধে কক্ষটি ভরিয়া গিয়াছিল। মণি একখানা আসনে বসিয়া গীতা পড়িতে লাগিল। অদূরে যমুনা মূর্ত্তিমতী বেদনার মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মণি কয়েকটা শ্লোকের বাঙ্গলা অর্থ যমুনাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিল, "শুনলে যমুনা? আত্মার বিনাশ নেই।" যমুনা এবার কথা কহিল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আত্মা ভালবেসে আমাদের কাছে আসে না কেন?"

মণি একটু ভাবিয়া বলিল, "আত্মা ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়। ভগবানকে ভক্তি করতে পারলেই তাঁর ভেতরেই মৃত প্রিয়জনকে আমরা দেখতে পাই।"

"তবে আমাকে ভক্তি শিখিয়ে দাও। আমি তো বাবার দুঃখ সইতে পারছিনে" বলিয়াই যমুনা কাঁদিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার গায় হাত বুলাইয়া মণি বলিল, "ভক্তি কি কেউ শিখিয়ে দিতে পারে? ভগবানের দয়া না হলে ভক্তির উদয় হয় না। তাঁকে ডাক, তা'হলে ভক্তি পাবে।"

তিন চারদিন পরে যমুনাকে আর গীতা শুনাইবার জন্য ডাকিতে হইল না। সেও স্নান করিয়া মণির আগেই আপনি আসিয়া বসিয়া থাকিত। ক্রমে ক্রমে সে সে ঘরের ধূপ জ্বালান, ফুল সাজান, চন্দন ঘষা প্রভৃতি কাজগুলা স্বেচ্ছায় সাগ্রহে করিতে লাগিল। মণি ইহা দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিল। সে প্রত্যহ যে অমৃত আস্বাদন করিয়া আনন্দের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, তাহারই অংশ দান করিয়া আর একজনকে শোকে শান্তি দিতে পারিতেছে; ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

একদিন মণি যমুনার হাতে একখানা গীতা দিয়া বলিল, "দুপুরবেলা একটু একটু প'ড়ো, শ্লোকের নীচে বাঙ্গলা মানে আছে। রোজ একটি ক'রে শ্লোক মুখস্থ করতে পারবে?"

যমুনা লজ্জিতস্বরে বলিল, "সংস্কৃত শ্লোকগুলা তো তোমার মত করে পড়তে পারি নে। উচ্চারণই হয় না ঠিক।"

মণি আপন মনে বলিল, "একটু সংস্কৃত জানলে ঠিক হতো।"

যমুনা বলিল, "চেষ্টা করলে কি আমি শিখতে পারি না? কি বল?"

মণি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "শিখবে! চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারবে। কাল থেকেই তোমাকে পড়াতে আরম্ভ করব।"

অবিলম্বে বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা এবং ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ আনীত হইল। তৎপর গুরু শিষ্যার অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন প্রচুর উৎসাহ ও মনোযোগের সহিতই চলিতে লাগিল। মণি নিজে বেশ যত্ন করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিল। শুধু নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-সাগর পাড়ি দেয় নাই। সকালবেলা গীতা এবং বৈকালবেলা সংস্কৃত শিক্ষা দান ব্যাপার লইয়া মণি যমুনার সাহচর্য্যে প্রত্যহ চার পাঁচ ঘণ্টা কাটাইতে লাগিল। একদিন রসিক বলিল, "মণি, আজকাল তোমার টিকিটিও দেখা যায় না। তুমি এমন সুদূর ও সুদুর্লভ হ'লে কেন? তোমার হ'লো কি? অবশেষে যমুনার সঙ্গে লাভে পড়লে নাকি?"

মণি হাসিয়া বলিল, "Love! যমুনার সঙ্গে! ঠাট্টা করবার কি আর কোন কথা পেলে না? স্ত্রী পুরুষের একটুখানি ঘনিষ্ঠতা দেখলেই তোমাদের প্রেমের কথা মনে হয় কেন? পৃথিবীতে নায়ক নায়িকা ছাড়া আর কি কিছু থাকতে নেই?"

"থাকলেই ভাল" বলিয়া একটু বক্র হাসিয়া রসিক চলিয়া গেল।

রাত্রে শয়ন করিয়া মণি বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিল, রসিক অমন কথা বলিল কেন? মা-হারা যমুনাকে দেখিয়া প্রথমে মণির মনে যে স্নেহ-মিশ্রিত করুণার সঞ্চার হইয়াছিল, আজ তাহা দ্বিগুণ হইয়াই পিতৃশোকাতুরা যমুনাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে উন্মুখ হইয়া আছে; সে স্নেহের কোন

ব্যতিক্রম হয় নাই। কোন নারীর প্রেমে সে কোনদিনই পড়িবে না। প্রেম বলিয়া যদি তাহার হৃদয়ে কিছু থাকে, তবে তাহা শ্রীকৃষ্ণের জন্য তোলা রহিল।

(৪)

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার উদ্দীপ্ত উৎসাহ ও আকাঙ্খার ভিতর দিয়া যে দেড়টি বছর গড়াইয়া চলিয়া গেল, শিক্ষক বা ছাত্রীর সে সম্বন্ধে কোন হুঁস ছিল না। একদিন অন্নপূর্ণা তাহাদিগকে হঠাৎ সচেতন করিয়া দিলেন। তিনি মণিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে মণি, এম্. এ. পরীক্ষা তো হয়ে গেল। তোর বন্ধু সমীরকে চিঠি লিখেছিস ?"

মণি গভীর বিস্ময়ে বলিল, "তাকে চিঠি লেখবার কথা বলছ কেন ?"

"ভাল ছেলে যা হোক! বলি, তার সঙ্গে না যমুনার বিয়ের কথা বলেছিলি ? আমি তো সেই আশায়ই এতদিন চুপ করে বসে আছি। আর তুই একদম সব ভুলে বসে আছিস! যমুনা পনের পার হয়ে গেল, এখন তো তাকে আর রাখা যায় না! আর লোকেই বা বলবে কি ?"

সমীরের কাছে মণি মাঝে মাঝে চিঠি লেখে বটে, কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব তো কোনদিন করে নাই। কি আশ্চর্য্য বিস্মৃতি তাহার! সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল "আজই সমীরকে চিঠি লিখব মা।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "শুধু যমুনার কথা লিখলেই হবে না। আমার নাম করে তোমার জন্যে একটি ভাল মেয়ে খুঁজতে তাকে লিখো। পড়াশুনার খাটুনির পর দু'বছর তোমাকে বিশ্রাম করতে দিয়েছি; আর দেরী করতে পারব না। যমুনাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে আমি একলাই বা থাকব কেমন করে ?"

"আমি এখন—আমি এখন—সে এখন থাক্ মা, আগে যমুনার বিয়ে দাও না।"

"এখনো তোর বিয়ে থাকবে কেন রে ?"

"কোনদিনই আমার বিয়ের কথা বলো না মা, আমরা মা ও ছেলে যেমন আছি, তেমনি থাকব চিরকাল। বৌ দেখবার সাধ হলে বিন্নুর বিয়ে দাও।"

"পাগলা ছেলে! বিন্নু তোর আগে বিয়ে করবে!"

"আমি বলছি, তাতে কোন দোষ নেই। আমার বিয়ের কথা আর কখনো বলতে পাবে না মা" বলিয়া মণি ছোট ছেলের মত আবদারে মাকে জড়াইয়া ধরিল। মা ছেলের ললাট চুম্বন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তবে যমুনা ও বিন্নুর বিয়ে দিয়ে তোমাতে আমাতে কাশী বাস করব নাকি ?"

"সেই ভাল মা, সেই ভাল। এখনি আমি বিন্নুর জন্যে একটি মেয়ে দেখতে সমীরকে লিখে দিচ্ছি" বলিয়া মণি আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিল। মা চেঁচাইয়া বলিলেন, "এখন বিন্নুর কথা কিছু লিখিস নে।"

মণি নিজের ঘরে যাইয়া সমীরকে চিঠি লিখিল। তারপর যমুনার কাছে গেল। যমুনা তখন টেবিলের কাছে চৌকিতে বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া নূতন পড়াটা আয়ত্ত করিতেছিল। মণি আর একটা চৌকি টানিয়া তাহার কাছে বসিয়া পড়িল দেখিয়া সে বলিল, "গল্প করতে বসলে নাকি এখন ?"

মণি জবাব দিল, "তাই যদি হয় তো দোষ কি ?"

যমুনা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, ওঠ তুমি। নইলে আমার পড়া শেখা হবে না।"

এই তরুণ তরুণীর স্নেহ করুণা এবং সম্ভ্রম কৃতজ্ঞতা ঘনিষ্ট সাহচর্য্যে সখ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

মণি মুখে গাম্ভীর্য্য টানিয়া আনিয়া বলিল, "বল যদি তো উঠি; কিন্তু আমি তোমার জন্যে একটা সুখবর এনেছিলাম যমুনা।"

যমুনা ঔৎসুক্যের সহিত সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "কি খবর ? বাঃ! চুপ করে রইলে কেন ? বল।"

"না, থাক্ এখন, আগে তোমার পড়া শেখা হোক্।"

"না, না, এখনি তোমাকে বলতে হবে, বল" বলিতে বলিতে যমুনা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া মণির হাত ধরিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িল।

মণি বলিবে না, যমুনাও এখনই না শুনিয়া ছাড়িবে না। এই ভাবে কিছু সময় কাটাইয়া যমুনাকে একচোট সাধাসাধি করাইয়া মণি বলিল, "মা বললেন, শীগগিরই তোমার বিয়ে।"

যমুনা মণির হাত ছাড়িয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া

উঠিল। বলিল, "বি-বা-হ! ঘটকঠাকুর, তোমার সংবাদ ভাল!"

মণিও সহাস্যে বলিল, "তবে আমায় পুরস্কৃত করবার আজ্ঞা হোক।"

"তা হবে" বলিয়া যমুনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

বৈকালে মণি যমুনাকে পড়াইতে আসিলে যমুনা এক রেকাবী সন্দেশ তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"সকালের সুখবরের পুরস্কার।"

মণি বলিল, "সারা দিন বসে বুঝি বিয়ের কথাই ভেবেছ? এতদিন বসে গীতা পড়লে, তবু মনটা পার্থিব বিষয়েই বদ্ধ হয়ে রইল!"

কথাটা রহস্যের সুরে উচ্চারিত হইলেও ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার অনুভব করিয়া যমুনা মনে মনে অভিমান-ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি মুখেই বলিল, "গুরুর মন যদি পৃথিবী ছেড়ে উর্দ্ধে কোথাও চলে যায়, তবে ছাত্রীর মনও পৃথিবী আঁকড়ে পড়ে থাকবে না; সেও তার অনুবর্ত্তন করবে! আমি কত কষ্ট করে নিজের হাতে সন্দেশ করেছি, তুমি খাও। আজ পড়াও খুব ভাল করে শিখেছি, দেখবে এখন।"

মণি সন্দেশ খাইয়া পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল, যমুনার কথা মিথ্যা নহে। এই মেধাবিনী মেয়েটি চিরদিনের মত আজও পড়া শিখিয়াছে।

মণি সন্ধ্যার নির্জ্জন বাগানে পায়চারী করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগিয়াছে। তাহার মত যমুনাও কেন বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিল না? কিন্তু তাও কি সম্ভব? প্রথমতঃ সে হিন্দুর মেয়ে, দ্বিতীয়তঃ অন্নপূর্ণা তাহাকে যতই স্নেহ করুন না কেন, সে যে পরের আশ্রিতা, সে কথা তো সে ভুলিতে পারে না। যমুনার বিবাহের পরের কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণার সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেহ আর তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মে এখন সহায়তা করে না। মণির পাঠ-কক্ষ গীতা-কক্ষ এবং শয়ন কক্ষের কাজগুলা এখন দাসদাসীতে করিতেছে, কিন্তু তাহা যেন শ্রীহীন, আগ্রহ শূন্য। সে গীতা পাঠ করে, কিন্তু তাহার নিবিষ্ট চিত্তা ও শ্রদ্ধা সমন্বিতা শ্রোত্রীর আসন খানি খালি পড়িয়া আছে। এমন আরও কত কি তাহার মনে জাগিতে লাগিল। কিন্তু এই চিন্তা বা কল্পনা আদৌ প্রীতিদায়িনী হইতেছিল না। একি! তাহার মন এই তুচ্ছ বিষয়ে ক্ষোভচঞ্চল হওয়ার উপক্রম করিতেছে কেন? শেষে 'দুর্নিগ্রহ' হইয়া উঠিবে না তো?

মণি তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকিয়া শঙ্করাচার্য্য কৃত গীতাভাষ্য লইয়া পড়িতে বসিল। ঘণ্টা দুই পরে যমুনা আসিয়া যে বলিয়া গেল, "শোবার ঘরে তোমার খাবার ঢেকে রেখে গেলাম। বেশী রাত করোনা, লুচি গুলো খারাপ হয়ে যাবে" তাহা সে শুনিয়াও শুনিল না। পড়িতে পড়িতে তাহার মন ভাষ্যমধ্যে তলাইয়া গেল। যখন সে বই বন্ধ করিয়া উঠিল, তখন তাহার শান্তি পূর্ণ চিত্তে সান্ধ্যকল্পনার ছায়াও ছিল না।

(৫)

আর্য্যধর্ম্ম রক্ষিণী সভার উৎসব উপলক্ষে এবারেও ভাগবত রত্ন আহুত হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আজ ভাগবতরত্ন তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন। মণি যমুনা ভক্তি সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনিয়া বসাইল। অন্নপূর্ণা তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যুক্তকর ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মা, ছেলেকে অপরাধী করবেন না।"

যথারীতি কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, গীতার দুইটি শ্লোকের অর্থ আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন।"

ভাগবতরত্ন সাগ্রহে বলিলেন, "বলুন মা, কোন দু'টি শ্লোক?"

অন্নপূর্ণা ধীর কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বলিলেন,

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্ন শীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাব বোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

ভাগবতরত্ন ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত অন্নপূর্ণার পানে চাহি-

লেন। তারপর তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট মণি ও যমুনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু বুজিয়া ধীরে ধীরে শ্লোক দু'টি আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার শান্ত মধুর কণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠিতে লাগিল। অসামান্য দক্ষতায় তাঁহার প্রত্যেকটি বাক্য শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেছিল। ব্যাখ্যা শেষে তিনি অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "মা, গীতায় কর্ম্মত্যাগ নিন্দনীয়। শুদ্ধ সংযত চিত্তে সমস্ত কর্ম্মই করতে হবে। কোন কর্ম্ম ত্যাগ করে জীবনকে অপূর্ণ রাখা বোধ হয় গীতা প্রবক্তার অভিপ্রেত নয়; তাই 'যুক্তাহার বিহারস্য' 'যুক্ত স্বপ্নাব বোধস্য' ইত্যাদি বলেছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় করে রেখে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় চিন্তাকারীকে গীতা 'মিথ্যাচার' বলে গাল দিয়েছেন। শরীরি হয়ে শারীর-ধর্ম্ম উচ্ছেদ করা দুঃসাধ্য, কখনো বা অসাধ্য। সেই অসাধ্য সাধনের নিস্ফল চেষ্টা না করে, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলি সম্পাদন করে কর্ম্মফল ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করাই গীতার উপদেশ। আমরা খারাপ জিনিস কখনো ভগবানকে দিতে পারিনে। কর্ম্মফল ভগবানকে দিতে হবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে কর্ম্ম করতে গেলে কর্ম্ম উদার, মহৎ, কল্যাণ-প্রসূ না হয়েই পারে না। আজ উঠি মা, আর যদি কখনো এখানে আমার আসা হয়, তবে এ সম্বন্ধে যা বুঝেছি, তা আপনাকে বলব।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আপনি ক'দিন আছেন এখানে?"

"আজই চলে যাচ্ছি মা, আমার স্ত্রীর অসুখের খবর পেয়েছি।"

মণি চমকিয়া উঠিল। ভাগবতরত্নের স্ত্রী! সে যে তাঁহাকে অবিবাহিত ভাবিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা ভাগবতরত্নকে সযত্নে বিবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল দ্বারা জল যোগ করাইয়া বিদায় দিলেন।

ভাগবতরত্ন চলিয়া গেলে মণি অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ভাগবতরত্ন ও বিবাহিত!"

কথাটা অন্নপূর্ণার কাণে গেল। তিনি বলিলেন, "বিয়ে করা তো খারাপ কাজ নয় মণি। জগতে কোন জিনিসই খারাপ নয়। মানুষের বিচার হীন ব্যবহার অথবা অসংযত উদ্দাম মনই জিনিসগুলা খারাপ করে ফেলে বাবা।"

মণি আর কোন কথা বলিল না।

(৬)

সাত আট দিন পরে মণি সমীরের চিঠি পাইল। অন্নপূর্ণার হাতে গড়া এবং মণির ছাত্রী বলিয়া যমুনাকে বিবাহ করিতে সমীরের কোন আপত্তি নাই জানিতে পারিয়াও মণি হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, অথবা সেবা পরায়ণা স্নেহময়ী সখীটির আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কায় দুঃখিতও হইল না। মনের এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সে কৃতজ্ঞ চিত্তে গীতাকক্ষে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্রতলে প্রণত হইল। তারপর সমীরের চিঠি মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া সে যমুনার কাছে যাইয়া বলিল, "যমুনা, সমীরকে কবে আসতে লিখব?"

যমুনা সবিস্ময়ে বলিল,—"তার আমি কি জানি?"

মণি প্রশান্ত ভাবে বলিল, "তোমাকে দেখতে আসবে, তুমিও তাকে দেখবে; তোমার জানা উচিত বৈকি।"

"আমাকে দেখতে আসবার দরকার কি?"

"বাঃ, যাকে বিয়ে করবে, তাকে দেখবে না?"

"আমি তো বিয়ে করব না।"

"সে কি! কেন?"

"কেন আবার কি? ইচ্ছা নেই আমার। ছেলেরা যদি বিয়ে না করে থাকতে পারে, তবে আমরাই বা পারব না কেন? তুমিই তো বলেছ, ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার।"

মণি ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল; তারপর কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "যমুনা, ছেলে মেয়ের অধিকার সমান হওয়া উচিত, কিন্তু যা হওয়া উচিত, তা সব সময়ে হয় না। মা কি তোমার কথায় রাজী হবেন?"

"সে তুমি জান, আমি জানিনে। কিন্তু বিয়ে আমি করব না।" বলিয়া যমুনা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

মণি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কথায় কথায় সে কবে বলিয়া ফেলিয়াছে, যমুনা যদি তাহাই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বসিয়া এখন বিবাহে আপত্তি করে, তবে মা কি মনে করিবেন? তাহারই শিক্ষায় যমুনা বিগড়াইয়া গিয়াছে, ইহা নিশ্চিত মনে করিয়া মা যে কতখানি দুঃখিত ও বিরক্ত হইবেন, তাহা ভাবিয়া মণির শঙ্কা বাড়িয়াই চলিল। কিন্তু যমুনা যে তাহারই আদর্শে অবিবাহিত থাকিতে চায়, এই চিন্তাটাও তাহাকে

আনন্দিত করিয়া তুলিল। হর্ষ ও ভয় যুগপৎ তাহাকে চঞ্চল করিয়া দিল।

পরদিন সে আবার যমুনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যমুনা তাহার জেদ ছাড়িল না। অবশেষে যমুনা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি যদি তোমাদের এমনি গলগ্রহ হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে মাসীর বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তবেই তো তোমাদের আপদ চুকে যায়।"

ইহার উপর আর কোন কথা বলা চলে না। মণি সদা-হাস্যমুখী যমুনার বিষণ্ণ মুখ ও সহ্য করিতে পারিল না। বহুক্ষণ বসিয়া হাসি-গল্প ও রহস্যে যমুনাকে প্রফুল্ল করিয়া সে তৃপ্তচিত্তে উঠিয়া গেল।

এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। মণির আর চুপ করিয়া থাকা চলিল না। অন্নপূর্ণা তাগিদ দিয়া বলিলেন, "মণি, সমীরকে আসতে লিখলি নে?"

"লিখব মা" বলিয়া মণি পাশ কাটিয়া যমুনার কক্ষে চলিয়া গেল। যমুনা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এস।"

মণি বলিল, "যমুনা, মা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছেন না, বারবার সমীরকে চিঠি লিখতে বলছেন।"

পলকে যমুনার মুখের হাসি নিবিয়া গেল দেখিয়া সে স্নেহভরা অনুনয়ের স্বরে বলিল, "অমত করে মা'র কাছে আমাকে অপরাধী ক'রোনা লক্ষীটি!"

যমুনা বলিল, "তুমি কি নিজের জন্যে মা'র কাছে অপরাধী হওনি তবে?"

"আমার কথা আলাদা। আমি ছেলে, তুমি মেয়ে। মা যে ছেলে-মেয়ের কথা সমান করে ভাববেন না। আচ্ছা, আমি যদি পরে বিয়ে করি?"

"তা হলেও আমি পারব না—পারব না, কিছুতেই পারব না।"

যমুনার কণ্ঠ মণিকে স্তব্ধ করিয়া রাখিল। বহুক্ষণ পরে মণি যমুনার মুখপানে পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "কেন পারবে না বল দেখি?"

সেই দৃষ্টির সহিত যমুনার দৃষ্টি মিলিত হইতেই অকস্মাৎ তাহার দু'টি কপোলে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। সে চকিতে মণির পায়ের উপর পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "এমন করে আমায় তাড়িয়ে দিও না। আমি এখান ছেড়ে আর কোথাও থাকতে পারব না। তোমার ঘরে আমার মত আর তো কত অনাথা আছে, আমিও তেমনি থাকব। কেন আমায় তাড়াতে চাও? আমি তো তোমার অনিষ্ট করছি নে কিছু।"

যমুনার তপ্ত অশ্রু মণির পা আর্দ্র করিয়া তুলিল। সে ত্রস্তে যমুনাকে তুলিয়া একখানা চৌকিতে বসাইয়া দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যমুনার এতদিনের প্রচ্ছন্ন মনোভাব আজ অনাবৃত স্বচ্ছ হইয়া যাওয়ায় সে যেন ভয় পাইয়াই ছুটিয়া পলাইল।

মণি তাহার গীতাকক্ষে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে বসিল। কিন্তু চিত্ত তাহার কিছুতেই স্থির হইতে চাহিল না। ভগবান, একি রহস্য তোমার! একি তোমারি মায়া? তোমারি প্রকৃতির কারসাজি? যদি তাই হয়, তবে তুমি ইহা রোধ কর। দুর্ব্বল চিত্তে বল দাও প্রভু।

সমস্ত রাত্রি মণি ঘুমাইতে পারিল না। সকল বিরোধী চিন্তা সবলে ঠেলিয়া দিয়া তাহার মনে জাগিতে লাগিল, যমুনার আর্ত্তস্বর এবং তপ্ত অশ্রু। কোন ব্যথাতুর কণ্ঠে যে বীণা বেণুর ঝঙ্কার থাকিতে পারে, অশ্রু যে এমন সুন্দর মধুর হইতে পারে, তাহা তো সে জানিত না। তবে কি সে এতদিন মনের গোপন কোণে বসিয়া নিজের অজ্ঞাতে ইহাই কামনা করিতেছিল? নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষ মধ্যেও সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

এক রাত্রিতেই মণির মানসিক বিপ্লবের শেষ হইল না। তিন চার দিনেও তাহার মন ভাবনার অতল সমুদ্রে কূল কিনারা দেখিতে পাইল না। ভাগবতরত্নের শেষ দিনের গীতা ব্যাখ্যার কথা মনে পড়িতে লাগিল। বাহিরে ক্রিয়া-হীন থাকিয়াও অন্তরে কামনা বাঁচাইয়া রাখিলে 'মিথ্যাচার' হইতে হইবে। না, ভিতরে বাহিরে কোথাও সে 'মিথ্যাচার' হইতে পারিবে না। সে যমুনার সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। তার কান্নাই তো গোল বাঁধাইয়াছে। সাধে কি সাধু মহাজনেরা মায়াময়ী নারীকে সাধন পথের মহাবিঘ্ন বলিয়াছেন? চার পাঁচদিনে যমুনা তাহার কাছে ঘেঁসিল না দেখিয়া সে মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিল।

সেদিন অন্নপূর্ণা তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া বলিলেন, "চার দিনেও যমুনার জ্বর ছাড়ল না, সহর থেকে ডাক্তার আনাতে হবে।"

মণি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "যমুনার জ্বর! আমি তো জানিনা!"

অন্নপূর্ণা সবিস্ময়ে বলিলেন, "অবাক্ করলি! যমুনার জ্বর তা জানিস নে?"

মণি সে কথার জবাব না দিয়া বাহিরে যাইয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের জন্য লোক পাঠাইল। ডাক্তার আসিলে সে ডাক্তারের সঙ্গেই যমুনাকে দেখিতে গেল। তাহারই নিষ্ঠুর আচরণে যমুনা পীড়িত হইয়াছে, এই ভাবনা কাঁটার মত তাহাকে বিঁধিতে লাগিল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে মণি যমুনার শিয়রে বসিয়া তাহার এক গোছা রুক্ষ চুল লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে করিতে বলিল, "জ্বরের কথাটাও কি আমাকে জানাতে হয় না?"

যমুনা উদাসীনের মত বলিল, "জানালে কি হবে? তুমি তো আমাকে তাড়াবার জন্যেই ব্যস্ত রয়েছ।"

"তোমাকে তাড়ানর সাধ্য কারু নেই। কেন ও-কথা বলে ব্যথা দাও?"

"সত্যি বলছ তাড়াবে না?"

"সত্যিই বলছি যমুনা।"

রাত্রি শেষে প্রভাত আকাশের মত যমুনার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উচ্ছল আনন্দে বলিল, "আঃ, তাহলে কি মজাই হয়! দু'জনে মিলে শুধু গীতা পড়ব, আর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করব!"

"কেন, বিয়ে করতে দোষ কি? কোন দিকে জীবন অপূর্ণ রাখা গীতা প্রবক্তার অভিপ্রেত নয়, একথা ভাগবতরত্নই বলেছেন।"

"বেশ তো, তুমি বিয়ে ক'রো, নইলে মা দুঃখিত হবেন। আমার কথা মা'কে বুঝিয়ে বলো। তোমার বিয়ে হলেও কিন্তু আমাকে রোজ গীতা পড়ে শোনাতে হবে।"

মণি হাসিল। বলিল, "তোমার এ ব্যবস্থায় মা রাজী হবেন না। কুমারী ক'রে তোমাকে ঘরে রাখবেন না, তবে বৌ করে রাখতে পারেন!"

যমুনার মুখ সিন্দুরের মত লাল হইয়া উঠিল। সে "যাও" বলিয়া মণিকে ঠেলা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মণি জোর করিয়া তাহাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া স্থির স্বরে বলিল, "শোন, মাকে একথা বলতেই হবে। ঠাট্টা নয়, সত্যি কথা।"

"ছি! ছি! মা'কে তুমি কিছু বলতে পাবে না। শুনলে তিনি ভয়ানক বিরক্ত হবেন। না, না, এ হ'তেই পারে না। আমি তোমাদের কর্ম্মচারীর মেয়ে, তা জান না? আর এমন লোভ কখনো আমার হয় নি।" বলিয়া যমুনা বালিসের আড়ালে মুখ লুকাইল।

মণি দুই হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার না হোক, আমার তো লোভ হতে পারে; তুমি ভয় পেওনা। মাকে তুমি জান, তিনি হৃদয়ের আদর করতে জানেন। তুমি মত দাও।"

যমুনা কথা কহিল না। কিন্তু তাহার মনের কথা তাহার চোখে পাঠ করিয়া মণি বলিল, "শীগ্গিরই তো তুমি কর্ত্রী হবে, আজও ছাত্রী আছ। গুরু দক্ষিণাটা এখনি আদায় করা ভাল।"

এই বলিয়া নত হইয়া মণি যমুনার মুখে একটি চুম্বন আঁকিয়া দিল।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৯)

মা আশ্বাস দিলেন বটে কিন্তু আমি বেবু নই. চিন্তাশূন্য দুঃখশূন্য শুভ্র সুন্দর সারল্যেভরা সেই মধুর দিনগুলি আমার যে অতীতের গর্ভে বহুদিন বিলীন হইয়া গিয়াছে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে, বয়সের সঙ্গে বয়স্কের সহিত আলাপ আলোচনায় বুদ্ধির একটু বিকাশ ঘটেই। ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তি শ্রদ্ধার মধ্যে নির্ম্মল সরলতাটুকু থাকে না। যেখানে অনেক কথা, অনেক তর্ক সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া যায়।

মা'র কথায় আমি নির্ভর করিতে পারিলাম না, মা কপর্দ্দক বিহীনা অন্তঃপুরের জীব, কোথায় যাইবেন? কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? যাহাদের প্রতি ভগবান বিমুখ, তাহাদের প্রতি কে প্রসন্ন হইবে? হাটের মধ্যে যদুমণ্ডল যে অপমান সূচক বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়াছিল তাহার সুতীব্র বিষটুকু রহিয়া রহিয়া আমার অন্তরে জ্বালা দিতে লাগিল। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জিতুদাকে একখানি চিঠি লিখিলাম। তাহার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোনই উপায়ান্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। জিতুদা সমাজের বশুতা স্বীকার করিতে চাহে না—দুর্নীতি পদদলিত করিয়া উন্নত মস্তকে তাহার মন্তব্য প্রচার করিয়া মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে, চৌধুরীর হৃদয়হীনতার, প্রতি-বেশীর বিমুখতার প্রতিবাদ করিবার মত শক্তি একমাত্র জিতুদারই আছে। সেই স্পষ্টবাদী, শান্তিময়, স্নেহময় জিতুদাকে আহ্বান না করিয়া এ সময়ে আমি কি থাকিতে পারি?

চিঠিখানি গোপনে লিখিয়া গোপনে ডাকঘরে ফেলি-বার সঙ্কল্প থাকিলেও মার নিকট ধরা পড়িতে হইল। মা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকে চিঠি লিখ্‌ছিস্‌ কনক, নীহারকে না জিতুকে?" আমি ঘাড় নাড়াইয়া জানাইলাম, জিতুদাকে লিখিয়াছি।

মার মুখ গম্ভীর হইল; তিনি আমার হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া পড়িয়া কহিলেন "বাছাকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন কনক? সে আমাদের ভালবাসে, মঙ্গল কামনা করে, এটা কি তার বড় অপরাধ? আমরা একঘরে হয়েছি, আমরা বিপদে পড়েছি, তার ভেতর তাকে জড়িয়ে কি হবে? বিশেষতঃ তার এবার পরীক্ষার বছর, তার ভাল ও তো আমাদের দেখ্‌তে হয়।"

আমি লজ্জিত হইয়া কহিলাম "জিতুদা একটিবার এলেই কি তার মন্দ হবে মা? সে ছাড়া এ সময় আমাদের কে আর উপকার করবে? আমাদের কেউ যে নেই।"

"সকলের ওপর, সকলের বড়, আমাদের ভগবান আছেন কনক, তিনিই আমাদের সহায়, তিনিই সম্বল, তিনি এতদিন যেমন রক্ষা করেচেন এখনও তেমনি করবেন। একটুকুতে এত উতলা হলে চলে না।"

আমি ক্ষোভের সহিত বলিলাম "ভগবান আছেন না —আছেন, থাক্‌লে আমাদের এ দশা হতো না। ভগবান আছেন এটা মানুষের মিথ্যা ধারণা।"

মার শান্ত মুখখানি নিমেষের মধ্যে কঠিন হইয়া গেল, মা আহত হইয়া বলিলেন "কনক, এই কি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি? এই কি তোমার শিক্ষা! ছিঃ ছিঃ ভগবানে অবিশ্বাস! এই বয়সে বিশ্বাস হারালে সমস্ত জীবন ভরে কি করবে, কি নিয়ে থাকবে? আর কখ্‌খনো এমন কথা যেন তোমার মুখে না শুন্‌তে হয়।"

আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মা রান্নাঘরের

দিকে চলিয়া গেলেন। আমি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। চিন্তার পর চিন্তাতরঙ্গে আমার হৃদয় সমুদ্র আন্দোলিত হইতে লাগিল। মার মত পূর্ণ বিশ্বাসে আমি ভগবানের অস্তিত্ব নিজের মনের মধ্যে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। যাহার করুণার একটু নিদর্শন পাইতেছি না, যাহার ভালবাসার কোন অনুভূতি অনুভব করিতে পারিতেছি না আজ কেমন করিয়া বলিব তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ব কর্ম্মের মঙ্গল স্বরূপ, করুণাময়? তিনি যদি সত্যই থাকেন, সত্যই যদি দয়াময় হন তাহা হইলে আমাদের প্রতি এত কঠোর, এত নিষ্করুণ হইবার কারণ কি? আমার স্নেহময় জনক, পুণ্য হৃদয়া জননী তাঁহার চরণে এমন কি অপরাধে অপরাধী, যাহার জন্য তাঁহাদের অবর্ণনীয় উদ্বেগ, অপরিসীম অভাব অনাটন তিরোহিত হইতেছে না?

কেবল দরিদ্রের নিকটেই কি বিধির বিধান? কৈ—ধনীর প্রতি তো তাঁহার একটুকু বিদ্বেষ, একটুকু বিরাগ প্রকাশ পায় না। তারা তো দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করিয়া, দরিদ্রকে পদদলিত করিয়া দিব্য আরামে হাসিয়া খেলিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছে। আমাদের গৃহে অন্ন নাই, হৃদয়ে বল নাই, প্রাণে আশা নাই, আমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত। মঙ্গল-ময়ের এ কেমন বিধান!

যে চৌধুরী আমার বিপন্ন পিতাকে আরও বিপন্ন করিয়া জন সমাজে ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছে তাহার গৃহে নিত্য হাসি, নিত্য উৎসব বিরাজিত! আর আমাদের এ বেলার আহার জুটিলে ও বেলার ব্যবস্থা অনাহার। জানি বাবা আহার্য্য অভাবে মরিবেন, বেনু অন্ন বিনা নিদাঘে দগ্ধ ফুলটির মত ঝরিয়া পড়িবে, মা জীবন সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া একদিন অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন—ইহাই আমার দেখিতে হইবে।

"বড় দিদি!" চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই কৈবর্ত্ত বৌকে দেখিলাম। অঞ্চল ঢাকা একটি ধামা কাঁখে লইয়া নিঃশব্দে কৈবর্ত্ত বৌ যে কখন আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আমি তাহা জানিতে পারি নাই।

মুখে জোর করিয়া একটু হাসি টানিয়া বলিলাম "কোথায় যাচ্ছ, কেবলার মা? তোমার ধামার ভিতর কি রয়েছে?"

কৈবর্ত্ত বৌ আমার কাছে বসিয়া ধামার ঢাকা খুলিতে খুলিতে বলিল "তোমাদের কাছেই এসেছি বড়দিদি, ধামায় চাট্টি চাল ডাল রয়েছে। আমি ধান ভেনে, ডাল ভেঙ্গেই খাই, এবার থেকে তোমরা চাল ডাল আমার কাছ থেকেই নিয়ো। কাজ কি মুদীর দোকানে গিয়ে, এক তেল নুন মশ্‌লা পাতি— তা আমিই অন্যখান থেকে এনে দেব।"

"কেবলা বুঝি যদু মণ্ডলের সব কথা তোমায় বলেছে? পনেরটা টাকার জন্যে হাটের মধ্যে সকলের সামনে যদু কি বলেছে শুনেছ বৌ?"

"সব শুনেছি দিদি, কলিকালে মানুষ নেই, যদু আমাদের কর্ত্তা বাবাকে দিয়ে কত উপকার পেয়েছে, এখন সে সব ভুলে গিয়ে চৌধুরী ঠাকুরের কথায় এমনি ধারা করচে। কর্ত্তাবাবার টাকা না থাকলেও এ গাঁয়ে ওনার মত বড়নোক একটিও নেই দিদি। টাকায় মানুষ বড় হয় না, টাকা তো চোর ডাকাতের ঘরেও থাকে। এমন যে মনিষ্যি কর্ত্তাবাবা, যদু তাঁরেও চিনলো না।"

বাবার প্রসঙ্গে নিজের দুঃখময় অনাথ জীবনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া কৈবর্ত্ত বৌয়ের চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে নীরবে ডালের ডালাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ডাল বাছিতে লাগিল।

মা কৈবর্ত্ত বৌয়ের সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন "যদু মণ্ডলের কথা কি বলছিস বৌ, তার সাথে কি তোর দেখা হয়েছিল?"

"না মা দেখা হয় নি, ক্যাবলার কাছেই সব শুনেছি। এখন থেকে আমি তোমাদের নিত্যকার চাল ডাল দেব মা—আমারও কিছু জমা করা দরকার। গা'য়ে পোয়ে যা রোজগার করি সব পেটে দিলে কি চলে, দুদিন পরে ভাল করে একখানা ঘর তুলতে হবে; ক্যাবলার বিয়ে দিতে হবে, সে টাকাটা তো আমাদের জমা করতে হবে।"

মা সাগ্রহে কহিলেন "আমাকে চাল ডাল দিলে তোর টাকা জমবে কেমন করে বৌ?"

"আমি তো তোমার কাছ থেকে নগদ দাম নেব না মা,

তোমাকে যা দেব তুমি তার দাম পরেই দিও, সেটা তোমার ঠাঁই জমবে। আমার যা জমেছিল তাও তোমার কাছে রেখে যাই মা, চারদিকে চোর ডাকাতের ভয়, ভাঙ্গা ঘরে বাস করি—সাবধান হওয়া ভাল।" বলিয়া বৌ অঞ্চলের প্রান্ত হইতে পনেরটি টাকা মা'র পায়ের কাছে রাখিল।

মা কহিলেন "আমার অভাব জেনে তুমি কি আমার সাহায্য করতে এসেছ বৌ? তোমার টাকা জমেছে তাতো কখ্‌খনো আমায় জানাও নি, এ টাকা বোধ হয় তোমার নয়, ধার করে এনেছ? টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে না।"

কৈবর্ত্ত বৌ জিভ কাটিয়া মা'র পায়ে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। পরে হাত দুটি জোড় করিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিল "অমন করে বলো না মা, ওকথা শুনলে আমার পাপ হয়। যার দয়ায় আমরা মা ব্যাটায় বেঁচে আছি, সে ধার কি শোধ হয় মা—না শোধ দেওয়ার যুগ্যি আমরা? সত্যি কথা বলতে কি দশটি টাকা আমার ঠাঁই ছিল। মিত্তিরদের ধান ভানব বলে তাদের কাছ থেকে পাঁচ টাকা আগুই এনেছি মা। এটা আমি ফিরিয়ে নেব না, ফেরৎ দিলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো। তুমি এ টাকা দিয়ে যদু চামারের দেনা শোধ কর, পরে আমায় দিও।"

"না বৌ তোর টাকা আমি ভাঙ্গবো না, যেমন করে হোক যদুর টাকা শোধ করবো—তুই টাকা নিয়ে যা। চাল, ডাল দিতে চাচ্ছিস তা নিতে আপত্তি নেই, চাল ডালের টাকা না হয় আমার কাছে জমা থাকবে।" বলিয়া মা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কৈবর্ত্ত বৌ সহসা মা'র পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল "ছোটনোক বলে, গরীব বলে কি এত ঘেন্না মা? যাঁরা আমাদের পরাণে বাঁচিয়েছে—তাদের একটু কাজ না করলে ধর্ম্মে যে সইবে না। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে, ক্যাবলার কথা মনে করে এ টাকা তুমি নাও মা। পরে যখন সুবিধা হ'বে তখন আমায় দিয়ো।"

মা স্নেহভরে কৈবর্ত্ত বৌকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন "বৌ, ওঠ আমি তোদের ঘৃণা করি না, এতদিন স্নেহ করতাম, আজ তোর মহত্ব দেখে তোকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি তোর টাকা নিলাম—এ টাকাটা আমার কাছে সুদে খাটবে।"

কৈবর্ত্ত বৌ প্রসন্ন হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল "এক্ষুনি আমি যদুর দোকানে যাই মা, তার দেনা শোধ ক'রে দিই গে। ব্যাটা মনে করেছিল কর্ত্তা-বাবাকে খুব জব্দ করতে পারবে?"

টাকা কয়েকটা সাবধানে অঞ্চলে বাঁধিয়া কৈবর্ত্ত বৌ চলিয়া গেল।

আমি মনে মনে ভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশে লুটাইয়া কহিলাম "ক্ষমা কর প্রভু, তোমার অধম সন্তানের ক্ষণিকের সংশয় সন্দেহ ক্ষমা কর। আর আমি তোমায় অবিশ্বাস করিব না, মোহের ছলনে তোমার দয়ার দান বিস্মৃত হইব না। আজ যে মর্ম্মে মর্ম্মে তোমার করুণা উপলব্ধি করিতেছি—এই করুণা তোমার সন্তানের হৃদয়ে চিরজাগ্রত চির বিরাজিত থাকুক।"

(১০)

কৈবর্ত্ত বৌয়ের অজস্র সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রবাহে পরিসিক্ত হইয়া সমাজ-পরিত্যক্ত অবস্থায় আমাদের দুইটি সুদীর্ঘ মাস কাটিয়া গেল—কিন্তু এ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিটুকু অধিককাল স্থায়ী হইল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা পোষ্টাফিস হইতে ফিরিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত মুখে দাওয়ার খুঁটিটায় দেহভার রক্ষা করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বেন্থুর দৈনিক বরাদ্দ কুশল প্রশ্নের অভাবে সে বাবার কোলের কাছটি ঘেঁসিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমি নিত্যকার মত হাতপাখা-খানা লইয়া বাবার পার্শ্বে যাইতেই তিনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন আজ তাঁহার বাতাসের প্রয়োজন নাই।

আজ যে কিছু একটা ঘটিয়াছে তাহার চিহ্ন বাবার মুখখানির প্রতিরেখায় সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাটি যে কি তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

এখন আমিই যে মাতা-পিতার একমাত্র অমঙ্গলের কারণ, আমারই নিমিত্ত তাঁহাদের অব্যক্ত যন্ত্রণা, অপরিসীম মনস্তাপ; হয় তো আমার জন্যই আর একটা নূতন বিপদে বাবা জড়িত

হইয়া পড়িয়াছেন—একথা স্মরণ করিবামাত্র আমার বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল, কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল। আমি সরল-অন্তঃকরণে বাবাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

কিয়ৎকাল পরে মা আসিয়া কহিলেন "হ্যাগা এমন হয়ে বসে রয়েছ কেন? এতক্ষণ হল এসেছ, এখনো হাত-পা ধোয়া হ'ল না। এত গরমের ভেতর গায়ে চাদর জড়িয়ে রয়েছ, অসুখ তো করে নি?"

বাবা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "আর অসুখ, এইবার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। এতদিন আধপেটা খেয়ে থাকৃতে, এখন সে আধপেটার বালাইও ঘুচে গেল। এইবার আমি বন্ধনমুক্ত হলেম।"

মা বাবার আক্ষেপের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার মুখের পানে চাহিলেন।

বাবা কহিলেন "আমি পোষ্ট মাষ্টারী কাজের নিতান্ত অযোগ্য বলে চৌধুরী দরখাস্ত করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছার জয় হয়েচে, আমার চাকরী গেছে। এখন মরবার মাহেন্দ্র সুযোগ, কনক মরবে, বেনু মরবে, তুমি মরবে! আমি মরবো কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে, কারণ দরিদ্রকে যমও অনাদর করে। আমি মরবো না, বসে বসে ভাত বিনে তোমাদের মরণ দেখবো।"

বাবা নীরব হইলেন। মার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। মা বাবার অদূরে মাটীতে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল না।

সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ দেখা দিল, চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না আমার চক্ষে কালী হইয়া গেল। যাহা শুনিলাম সেটুকুকে প্রলাপ বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া সুদূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলেই আমি যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম, আমার জন্য, এই অধম নারীর জন্য এত বিড়ম্বনা! হায়, বিধাতা তুমি আমার ললাটে কি লিখন লিখিয়াছিলে? আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া মাতা-পিতার জীবনে কি ভীষণ পরিণাম প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ। তোমার রহস্যময় যবনিকা একটুখানি তুলিয়া ধর, আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট চিত্রগুলি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করি ভাবিষ্যতের চিত্র-প্রদর্শনে বর্ত্তমানের জীবন্ত চিত্র ভুলিয়া যাই। জনকের নির্ব্বাক, নিশ্চল, নিস্পন্দ মূর্ত্তি, জননীর যাতনাময় মুখচ্ছবি, বেনুর ভীত-ম্লান ভাব আমি যে আর দেখতে পারি না। এই কয়েকটি প্রাণীর দীর্ঘ নীরবতা, বেদনাময় ব্যাকুলতা আমার চঞ্চল প্রাণে যে নিস্তব্ধ মৃত্যু-রজনীর মৌন-ব্যথা আনিয়া দিতেছে।

আমি আর অধিককাল স্থির থাকিতে পারিলাম না, মার কাছে সরিয়া গিয়া মার পায়ে একটা ঠেলা দিয়া কহিলাম—"বাবার খেতে যে আজ কত দেরী হবে মা, এখনো রান্না চড়লো না, কি রান্না হবে বলে দাও।"

বাবা স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া কহিলেন "এ বেলা আমার জন্য কিছু রেঁধ না মা, আমি খাব না, আমার জ্বর হয়েছে।"

মা ব্যগ্রভাবে বাবার ললাট স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্বর কখন এসেছে গা? মাথাটা তো খুব গরম হয়েচে। তখানি জ্বর নিয়ে তুমি এম্নি হয়ে বসে রয়েছ!"

"জ্বরের যন্ত্রণা এখনও আমার অনুভব হচ্ছে না, তাই বসে থাকৃতে পারচি। আমি কি করব, কেমন করে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবো, কিছুতেই যে তা ভাবতে পারছি না। আমার তো বেশী আশা ছিল না, বেশী সাধ করিনি, মাসে কুড়িটী টাকা—সেই যে আমার রাজার সম্পদ ছিল।"

মা কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া মৃদু সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন "তুমি এত উতলা হোয়ো না, শান্ত হয়ে শোবে চল। চাকুরী গেছে বলে সত্যি করেই ভগবান আমাদের অনাহারে মারবেন না, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই। তাঁর সৃষ্ট জীব তিনিই আহার দেবেন, মানুষ কেবল উপলক্ষ্য বই তো নয়! তোমার শরীর ভাল হলেই যা হোক একটা উপায় অবশ্যই হবে।"

মার আশ্বাসে সময়োচিত সান্ত্বনার দুটি মিষ্ট বাক্যে বাবার বিষাদাচ্ছন্ন মুখখানি একটু সরস হইল।

বাবা গৃহে প্রবেশ করিয়া জুতা জামা ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া কহিলেন "কনক, শুধু শুধু রাত করচ কেন মা? যাও, দুটি রান্না ক'রে নাও। আমার গায়ে মোটা চাদর খানা দিয়ে যাও।"

আমি বাবার জ্বরতপ্ত দেহটি চাদর দিয়া ঢাকিয়া,

বাবার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম "আপনার মাথা একটু টিপে দিয়ে যাচ্ছি বাবা, রান্না পরেই হবে। এত জ্বর হয়েছে, একটু ওষুধ খেলে জ্বরটা হয়তো রাতের মধ্যেই ছেড়ে যেত; গোপাল ডাক্তারকে খবর পাঠালে হয় না বাবা ?"

"একটু জ্বর হল না হল, অমনি ডাক্তার দেখানো, তোমার গরীব বাবার এত সুখের শরীর নয় কনক। জ্বর হয়েছে, আপনা আপনি সেরে যাবে। গোপাল ডাক্তারকে ডাকলেই কি সে আসবে মা ? তার কি সময়ের মূল্য নেই—ওষুধের দাম নেই ?"

"আপনি আর মা তাঁর যে কত উপকার করেছিলেন বাবা, গেল বছর বর্ষার সময় তাঁরা সবশুদ্ধ যখন জ্বরে কাতর হয়ে পড়লেন, অসুখের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর প্রসব হ'ল, তখন মা তাঁদের সমস্ত সেবাযত্ন করেছিলেন, আপনি সারা রাত জেগে কত সুশ্রুষা করতেন, সে উপকার কি মানুষ ভুলতে পারে বাবা ?"

"বিপদ তো কেটে গেছে মা, এখন মনে না থাকবারই কথা। কালও গোপাল ডাক্তারের সঙ্গে রাস্তায় আমার দেখা হ'য়েছিল, সে আমায় দেখে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। একটি কথাও বল্লে না, আমি ডাকলাম, সাড়াটি পর্য্যন্ত দিলে না।"

আমি ক্ষুণ্ণ হইয়া উত্তর করিলাম "কারুর কিছু করতে নেই বাবা, আপনি সকলের কত উপকার করলেন, দুদিনেই লোকে ভুলে গেল। এবার থেকে কারুর কিছু করবেন না।"

বাবা কথা কহিলেন না, নিরুত্তরে একটু দুঃখের হাসি হাসিলেন।

মা বেনুকে লইয়া দ্বারের পাশে বসিয়া এতক্ষণ আমাদের পিতা পুত্রীর আলাপ আলোচনা শুনিতেছিলেন, এখন অনুযোগের স্বরে কহিলেন "শুধু শুধু ওঁকে বকাচ্ছিস্ কেন রে কনক, এখন একটু ঘুমুতে দে। বিপন্নের উপকার করতে গিয়ে প্রত্যুপকারের আশা রাখতে নেই। আজ যখন গোপাল ডাক্তারকে ডাকা হ'বে না, তখন তার আলোচনায় কাজ কি মা ?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বাবার মাথায় বাতাস করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বাবা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

(১১)

রাত্রের মধ্যেই বাবার জ্বর ছাড়িয়া গেল। প্রভাতে প্রতিদিনের মত বাবাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া আমার মনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইল। বাবার চাকুরী যাইবার চিন্তা ছাপাইয়া তাঁহার অকস্মাৎ পীড়ার চিন্তাটাই আমার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে চিন্তার অবসানে আমি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্ত হইলাম বটে কিন্তু অচল সংসারের শোচনীয় দৃশ্যটা আমার চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

দুইদিন পরে বাবা ভাত খাইলেন এবং লোকমুখে জমিদারী সেরেস্তায় একটি কর্ম্মখালির সংবাদ পাইয়া মাকে কহিলেন, "আমি আজই একবার সাজাদপুরে যেতে চাই, পূজোর আগেই জমিদার নূতন লোক নিতে চাচ্ছেন, যদি বরাত ক্রমে জোটাতে পারি তাহলে দুটো ডাল ভাতের ব্যবস্থা হবে।"

মা কাতর দৃষ্টিতে বাবার শুষ্কমলিন মুখখানির পানে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন "আগে শরীরটা একটু সেরে উঠুক তারপর যেয়ো, অনিয়মে অত্যাচারে হয়তো চাপা দেওয়া জ্বরটা আবার তরুণ হয়ে উঠবে।"

"হলে আর কি করতে পারি বল ? আমার অসুখ হয়েছে বলে, চাকুরী গেছে বলে, পেটের ভাত পরনের কাপড়—তারা মানবে কেন ? সংসারের যেখানে যতটুকু দরকার আগে ছিল এখন তা তেমনি আছে। যাঁরা চাকুরী দেবেন, আমার অসুখ বলে কি তাঁরা চুপ করে থাকবেন ? দেরী করে গেলে হয়তো চাকুরীটা পাবই না।"

এ যুক্তিতর্কের পর মা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। একটু ভাবিয়া কহিলেন "পাল্কীতে গেলে মোটেই হাঁটতে হ'ত না, নৌকায় গেলে খানিকটা হাঁটতে হ'বে; তুমি কোনটায় যেতে চাও ?"

"কোনটাতেই নয়, চার পাঁচ টাকা খরচ করে পাল্কী চড়বার ক্ষমতা আমার নেই। নৌকায় গেলেও যাওয়া আসা

দু'টাকার কমে হ'বে না। এ দুটো টাকা বেঁচে গেলে বেন্থুর পুজোর একখানা নূতন কাপড় হ'বে। আমি ধীরে ধীরে হেঁটেই যাব। রোদ পড়ে গেলেই সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ফিরে আসতে পারব।"

মা বাবাকে নৌকায় যাইতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাবা মা'র কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

শত তালিযুক্ত জিনের কোটটি গায়ে দিয়া, চাদরখানা স্কন্ধে ফেলিয়া, একটা বাঁশের লাঠি হস্তে খুট খুট করিতে করিতে বাবা পথে বাহির হইলেন।

আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বাবার গমনশীল মূর্ত্তিটির প্রতি চাহিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিলাম।

সমস্তদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই তরুছায়ান্বিত অপ্রশস্ত, বাঁকা পথ বারম্বার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে দিবাবসানে শরতের স্নিগ্ধ অফুরন্ত জ্যোৎস্নায় ভুবন ভরিয়া গেল। শেফালী গন্ধবাহি সান্ধ্য বায়ু সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্চ্ছাতুরের বিষাদময় দীর্ঘশ্বাসের মত বহিতে লাগিল। অদূরে নদীর ঘাটে খেয়া নৌকার মাঝি খেয়া শেষে নৌকা বাঁধিয়া গান ধরিল।

বকুলের শাখান্তরাল হইতে বিনিদ্র কোকিলটা মাঝির ভাটিয়ালী গানের সহিত যোগ করিয়া স্বর লহরীতে আকাশ বাতাস ব্যপ্ত করিয়া ফেলিল। বাবা গৃহে ফিরিলেন না।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মা'র সহিত বাবার প্রতীক্ষায় শয্যায় আশ্রয় লইলাম কিন্তু ঘুম আসিল না। আমার মনের মধ্যে এলো-মেলো চিন্তার ধারা বহিতে লাগিল।

বার কয়েক পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিলাম। জানালার সম্মুখে গিয়া দেখিলাম আশ্বিনের ভরানদীর জলপ্রবাহ তরল রৌপ্যস্রোতের মত শুভ্র জ্যোৎস্নায় জ্বলিতেছে। নদীর নির্জ্জন বালুতটে, ফেন-শুভ্র কাশবনে, শব্দ-বিহীন, সীমা-বিহীন, সুষুপ্তিমগ্ন গ্রামখানির বুকের উপর জ্যোৎস্নারেখা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রজনী শান্ত, নিস্তব্ধ, বিশ্বপ্রকৃতি নির্ব্বাক, নীরব, নিশ্চল। কে বলিবে এই শান্ত জগতে দুঃখ আছে, অভাব আছে, এ যেন একটি রহস্যময় আনন্দলোক! এখানকার অধিবাসীরা অমৃতের সন্তান, কিন্তু এই আলোকিত পুলকভরা ধরণীর বুকে আমি কোথা হইতে আসিলাম? একমাত্র আমারই নিমিত্ত এত বিপদ, এত বিড়ম্বনা!

মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে খণ্ড চাঁদ বাঁশঝাড়ের আড়ালে নামিয়া গেল। পৃথিবীতলে নিশার কালিমা ঘনীভূত হইল। আকাশ বিদায়োন্মুখ আলোকের আলিঙ্গনে পাণ্ডুর শোভা ধারণ করিল। আমি আমার পরিত্যক্ত শয্যায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু ঘুম হইল না।

বাবার নিমিত্ত একটা অজানা আশঙ্কায় বাকী রাতটুকু কাটিয়া গেল। রাত্রে বাবার প্রত্যাগমনের আশায় নিরাশ হইয়া মনে ভাবিয়াছিলাম পরদিন বেলা প্রহরাধিকের মধ্যে বাবা নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন। এক প্রহরের কথা দূরে থাকুক, দ্বিপ্রহরের পরও বাবা ফিরিলেন না দেখিয়া মা'র মুখখানি মলিন হইয়া গেল।

অপরাহ্নে কৈবর্ত্ত বৌ আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মা, কর্ত্তাবাবা নাকি সাজাদপুর থেকে এখনও ফেরেন নি? যে শরীর নিয়ে গ্যাছেন, ক্যাবলার কাছে শুনে আর বাঁচি না। সাজাদপুর আমার পিসির বাড়ী, যদি বলেন ক্যাবলাকে নিয়ে আমি কর্ত্তাবাবার একটা খবর করতে যাই।"

মা চিন্তিতমুখে কহিলেন "তুই আবার কষ্ট ক'রতে যাবি বৌ, তিনি যদি আজ রাতে ফিরে আসেন শুধু শুধু তোর পথ হাঁটা সার হ'বে।"

"পথে কর্ত্তাবাবার দেখা হ'লে আমরা ফিরে আসবো মা। আমরা চাষার মেয়ে, হাটে বাজারে পথে ঘাটে বেড়ানোর অভ্যাস আছে। কষ্ট আবার কিসের? আমি পিসির বাড়ী থেকে ক্যাবলাকে কাছারিতে পাঠিয়ে কর্ত্তা-বাবার খোঁজ করাব। ঠাকুর না করেন অসুখ বিসুখ হ'লে পাল্কী ভাড়া ক'রে তাঁকে নিয়ে আসবো। ভাল থাকলে ভোর নাগাদ এসে তোমায় জানাব মা।"

মা বলিলেন "শেষ রাতে এতটুকু ছেলের সাথে ফিরে আসতে তোর ভয় হবে না বৌ? যা হবার হ'বে, তোর আর গিয়ে কাজ নেই, তিনি আজ যদি না আসেন, কাল অবিশ্যি আসবেন।"

কৈবর্ত্ত বৌ কহিল "যেতে যখন মানা করছ তখন আর যাব না। ভয়—ভয় কিসের মা? আমার কিছু ভয় নেই। তোমাদের ছিচরণের আশীর্ব্বাদে ক্যাবলার হাতে লাঠি থাকতে আমি খ্যাপা শেয়াল বুনো শূয়রকে ডরাই না মা।" বলিতে বলিতে পুত্র-গৌরবে কৈবর্ত্ত বৌয়ের মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল। এই অশিক্ষিতা চাষার মেয়ের সাহসের পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তাহার প্রতি সম্ভ্রমে আমার চিত্ত ভরিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ব্যথার ব্যথী

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র]

কে ওই উন্মাদ!

সমুদ্রের কূলে আপনহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার মুখে লেগে রয়েছে অফুরন্ত হাসি আর তার চোখে মাখা রয়েছে উদাস করুণ দৃষ্টি।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটে এসে তাকে গ্রাস করতে চাইচে, কিন্তু উন্মাদের পায়ের কাছ থেকে ভয়ে ভয়ে সরে যাচ্ছে—সাগরের বুকের মাঝে।

অনেকেই উন্মাদকে এমনি করে প্রকৃতির বুকে ছুটে বেড়াতে দেখেছে—লক্ষ্যহারা শূন্যহৃদয় নিয়ে; আবার অনেকে জ্যোৎস্না-মাখা নিঝুম রাতে অবাক হয়ে শুনেছে তার বাঁশীর আকুল তান। সে সুর ভরে ভেসে আস্‌ত একটা আকুল প্রাণের উচ্ছ্বাস—একটা বিরহ মাখা—প্রাণের আবেগ; আর আসত একটা প্রেমময় গীতি, হৃদয়ের প্রীতি আর প্রেমিকের প্রেমের মধুর রীতি।

একদিন উন্মাদেরও প্রাণের ভেতর দিয়ে বসন্তের পাগল হাওয়া বয়ে গেছল; তখন তারও প্রাণপোরা আশা ছিল, বুকভরা ভালবাসা ছিল—আরও ছিল হৃদয় জোড়া এক মানস-প্রতিমা। সংসারের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে আপনা ভুলে পূজার আসনে দিনরাত বসে থাকৃত—সেই প্রেম প্রতিমার পূজারী।

তখন উন্মাদ তার রঙিন নেশার ঘোরে একবারও ভ'বতে পারিনি যে কুসুমে কীটের অস্তিত্ব বাস্তব,—শুধুই কবির কল্পনা নয়—আর চাঁদের কলঙ্ক—সেটা কলঙ্কই বটে, প্রলাপ নয়।

নর্ত্তকী ফুলজান তারই কুঁড়ের পাশে থাকৃত; সে জানৃত না যে তারই প্রাসাদের দুয়ারে পড়ে থাকৃত তারই কৃপা-কণার এক ভিখারী।—যে দিতে চাইত তার হৃদয় ভরা অর্ঘ্য আর তার বিনিময়ে চাইত শুধু একটু মুখের হাসি।

উন্মাদ দূর থেকে সেই প্রাসাদের দিকে চেয়ে থাকৃত; সূর্য্য এসে দেখে ফিরে যেত আবার চন্দ্র তাকে সেই একই একই ভাবে বসে থাকতে দেখে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ত।

যখন সেই প্রাসাদের খোলা জানালা দিয়ে আলোর একটা রেখা ছুটে বেরিয়ে আস্‌ত তখন উন্মাদের বুক থেকে আশার একটা অস্পষ্ট রেখা তার সঙ্গে মিশ্‌তে ছুটে যেতে চাইত; আবার যখন গানের সুর গুলো জড়াজড়ি করে বাইরের বাতাসে বেরিয়ে আস্‌ত তখন উন্মাদ আকুল হয়ে ছুটে যেত তাদের আপনার করে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরতে।

উন্মাদের একটা ব্যথার ব্যথী ছিল যাকে সে যথার্থই আপনার বল্‌তে পারত—যে প্রাণের বন্ধু মুখের হাসি দিয়ে হৃদয়ের ঘৃণা ঢেকে রাখ্‌তে না—সে ছিল তার বাঁশী—। উন্মাদ তারই মুখে মুখ দিয়ে হৃদয় খুলে দিত আর সে আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ত।

একদিন সন্ধ্যায় সে দেখ্‌লে তার মানস প্রতিমা সমুদ্রের পথে চলেছে; উন্মাদও উঠ্‌ল; তার সুখ দুঃখের বন্ধু বাঁশীটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে তাদের সঙ্গে চল্‌লো। বুঝ্‌লে তার প্রাণ প্রতিমা কোন হৃদয়হীনের অভক্তির অঞ্জলী নিতে চলেছে—তার বুকের রক্ত মাখা প্রসুন পায়ে দলে।

আল্‌তারাঙাপায়ের নেশায় রঙিন হয়ে তরুণী ডগ্‌মগ্‌ হয়ে উঠ্‌লো—আর দূরে উন্মাদের চোখে ফুটে উঠ্‌লো প্রতিহিংসার একটা জ্বালা বুকফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস।

* * * *

হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুত ঝলকে উন্মাদের বুক কাঁপিয়ে সমুদ্রের মাঝে বাজ পড়্‌ল। ভয়ে ভয়ে সে চেয়ে দেখ্‌লে যে সমস্ত বাতাস এক হয়ে লুটে নিতে চাইচে সেই তরুণীর অমূল্যনিধি—সাগরও হাত বাড়িয়ে ছুটে এসে আছড়ে পড়্‌ছে সেই তরুণীর গায়ে—সেই সাগর ছেঁচা মাণিককে আপনার করে বুকে নিতে। উন্মাদ সে প্রলয় মাথায় করে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল; কাণ পেতে শুন্‌লে তার মানস প্রতিমা আকুল হয়ে ডেকে বল্‌ছে—প্রেমিক, আমি ডুব্‌ছি, আমায় বাঁচাও।"

আর কি উন্মাদ থাকৃতে পারে? সে সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল—তার বুকের নিধিকে বুকে তুলে নিতে—প্রেমের আহ্বানে আকুল হয়ে—বর্ত্তমান ভবিষ্যতে সবই ভুলে।

* * * *

উন্মাদ চোখ চেয়ে দেখ্‌লে চাঁদ তখন পশ্চিম সাগরে ডুব দিচ্ছে; তার পানে চেয়ে সে তার হারাণো-স্মৃতি ফিরে পেলে—এক এক করে সব কথাই তার মনে পড়্‌ল। তখন তার বন্ধুটীর কথা মনে হ'ল। বুকের মধ্যে হাত দিয়ে দেখ্‌লে তার জীবন মরণের সখা ভয়ে জড় সড় হয়ে নির্ব্বাক হয়ে পড়ে আছে। এসময় একজন আপনার লোককে পেয়ে উন্মাদ তার গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—ব্যথার ব্যথীও ব্যাকুল ব্যথার বেদনায় কেঁদে উঠ্‌লো।

সে আকুল সুর নীরব প্রকৃতির বুক চিরে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল—সে সুর যে শুন্‌লে সেও চোখের জল চেপে রাখ্‌তে পারলে না।

ভাবোল্লাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদগদ কয়—
ব্রজ পিরীতের প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীপ কি নিভাতে হয় !

* * * *

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]   ৪ঠা মাঘ শনিবার, ১৩৩১।   [১০ম সপ্তাহ

জেনে রাখ

[৺রজনীকান্ত সেন]

("বাণী" হইতে)

মানুসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পূরো পাঁচ হাত লম্বা

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা ;
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে, দেখায় রম্ভা !
ধার্ম্মিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাটে।

ধার্ম্মিক সেই, যে দিনরাত ফোঁটা তিলক কাটে

সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আস্‌টা টানে ;
নিষ্ঠাবান, যে কুক্কুটমাংসের মধুর আস্বাদ জানে ।
রসিক সেই, যার ষাট্‌বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ ;
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ্য ।

রসিক সেই, যার ষাটবছরে আছে পঞ্চম পক্ষ

সেই কপা'লে, বিয়ে ক'রে যে পায় বিশ হাজার পণ ;
নারী মধ্যে সেই সুখী, যার কস্তে হয়না রন্ধন।
সেই নিরীহ, রামের কথা যে শ্যামের কাণে দেয় ব'লে ;
সেই বাবু, যে বোঁচা হাত জামায় ফুঁ দিয়ে চলে !

সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যা'র উপলক্ষ্য

ভদ্র সে, যার ফরসা ধুতি ফুট্‌ফুটে যার জামা ;
দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে "ডসনের" বিনামা।
মদ খেয়ে, যা' ভুলে থাক্‌তে হয় সেই আদত বিচ্ছেদ ;
কালো ফিতে ধারণ আছে যার, তারেই বলি খেদ।

নারী মধ্যে সেই সুখী, যার কত্তে হয় না রন্ধন

বেহুঁস হ'য়ে ড্রেনে প'ড়ে রয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত ;
সাদা কালোয় ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত !
'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে, সেই দশকর্ম্মান্বিত ;
সেই দেবজ্ঞ, ফলারের নামে যে তারি আনন্দিত।

বেহুঁস হয়ে ড্রেনে পড়ে রয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত

'রাজ-লক্ষণ আছে আমার', যে কয়, সেই জ্যোতিষী ;
লম্বা-দাড়ী, গেরুয়া-ধারী, সেই তো আদত ঋষি ;
'সর্ট-সাইটেড্' চসমা নিলেই, বুঝ্‌বে, ছোকরা ভাল ;
বাপ্‌কে যে কয় 'ঈডিয়ট্', তার গুণে বংশ আলো !

লম্বা দাড়ী গেরুয়া ধারী, সেই ত আদত ঋষি

সেই গুরু, যিনি বৎসরান্তে আসেন বার্ষিক নিতে ;
বদান্য, যে একদম্ লাখ্ দেয়—উপাধি কিনিতে।
আসল তন্ত্রী সেই, যে সদায় আড়ায় মুখে 'ক্রমফট্' ;
সেই আদত বীর, সাহেব দেখ্‌লেই যে দেয় সোজা চম্পট !

সর্ট সাইটেড চশমা নিলেই বুঝবে ছোকরা ভাল

সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জান্‌ত,—
যে লেখক বল্লেই, বুঝ্‌তে হবে, এই ধুরন্ধর 'কান্ত' ?

"সেই আদত বীর, সাহেব দেখলেই যে দেয় সোজা চম্পট"

———— ——

মন্দিরের পথে

[শ্রীধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ]

সেদিন দেখা হয়েছিল—মন্দিরের পথে। সন্ধ্যে বেলা আমি রোজ মন্দিরে যেতাম—সেও আস্‌ত। কোনদিন দেখা হ'তো ; কোন দিন হ'তো না।

সুদূর প্রান্তরের উপর দিয়া পথ, বড় বিজন—বড় নিস্তব্ধ। স্নিগ্ধ বাতাস মৃদু বহিতেছিল। আমি দূর হইতে দেখিলাম সে আসিতেছে। আমি দাঁড়াইলাম। সে কাছে আসিয়া হাসিল। তারপর দুইজনে একসঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

তার পরণে নীল সাড়ী—সাচ্চা জরির কাজকরা ওড়না—গায়ে আঁটা ছিল ফিকেরঙের কাচুলী। সোণার মত গায়ের রঙ—ননীর মত কোমল তার প্রতি অঙ্গের পরশ। মাঝে মাঝে তার পরশ আমি পেতাম। সে আমার খুব কাছে আসিত।

আমি বলিলাম—হাসিলে যে ? সে আরো হাসিল—কিছুই বলিল না। আমরা চলিতে লাগিলাম। মাথার উপর দিয়া কতকগুলি পাখী উড়িয়া গেল। পথের ধারে একটা খুব ছোট খেজুর গাছের ডালে তার ওড়না আটকিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইতে গিয়া দেখি খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম—ছিঁড়িয়া গেল যে। সে বলিল—যাক্‌, চল। আবার চলিতে লাগিলাম।

কতকদূর গিয়া সে বলিল—আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি নিকটে একটা ঝরণা থেকে জল আনিয়া তার মুখে ধরিলাম,—সে অনেকটা জল পান করিল,—পান করিয়া আমার দিকে বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া কি স্নিগ্ধ হাসিই সে হাসিল। কি এক পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তার সমস্ত মুখ বুক ভরিয়া উঠিল।

আবার আমরা চলিলাম। এবার একটা ছোট জঙ্গলের পাশ দিয়া পথ। জঙ্গলের মধ্যে কি যেন একটা নড়িল। আমি তার হাত ধরিলাম। সে বলিল—চল। তার কোন ভয় ছিল বলিয়া আমার মনে হইত না।

তারপরে একটা খুব বড় হ্রদ। আমরা হ্রদের কিনারে আসিয়া পৌছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাত্রি আসিতেছে। হ্রদের যে পাড়টা পাথরে বাঁধান ছিল আমরা সেই পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কত কালের পুরানো সব পাথর, কত জায়গায় খসিয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দূরে একটা কুকুর শুইয়া ছিল। আমাদের দেখিয়া উঠিয়া গেল। পাড়ের নীচে খুব গভীর গর্ত্ত—কতদূর নামিয়া গিয়াছে বুঝা যায় না। একদল শূকর অনেকগুলি ছোট ছোট ছানা লইয়া খত্‌খত্‌ শব্দ করিতে করিতে এবং কি যেন শুঁকিতে শুঁকিতে বাঁশ বনের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। মনে হইল গর্ত্তের মধ্যে যেন কিসের শব্দ হইতেছে।

আমি বলিলাম—এখানে কি দাঁড়াবে ? সে বলিল—দেরী হয়ে যাবে যে।

এইবার—আমরা একেবারে মন্দিরের কাছে আসিয়া পৌছিলাম।

আরতির শঙ্খ ঘণ্টা দূর হইতেই আমরা শুনিতে পাইলাম। নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যদিয়া মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি আমার শুনিতে বড় ভাল লাগিত। আমি কান পাতিয়া থাকিতাম।

সে বলিল,—চল বড় দেরী হইতেছে। আমিও বলিলাম—চল। মন্দিরের সিংহদ্বারে সানাই বড় করুণ আলাপ করিতেছিল। মন যেন কাঁদিয়া উঠিল। একটা কালো বিষাদ যেন মনের মধ্যে ভরিয়া উঠিল। সেত পাশেই। কেন তা বুঝিতে পারিলাম না।

মন্দিরের পৈঠায় সে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। আমিও করিলাম। সিংহদ্বার পার হইয়া আমরা ভিতরে মন্দিরের চাতালে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

যাত্রীরা ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া হাতে করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমরা কিছু ফুল ও মালা কিনিলাম। একজন

সন্ন্যাসী চাতালে ভিড়ের মধ্যে ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছে। তার মাথায় খুব জটা। গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ। আমি দেখিলাম সন্ন্যাসী একদৃষ্টে উহার দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। মাথার কাপড় টানিয়া সে বলিল—চল ঐখানে গিয়া বসি। আমি বলিলাম—সন্ন্যাসীকে দেখিবে না? সে বলিল—না।

আমরা পাশাপাশি, আলো ও আঁধারে মেশামেশি একটু নিরালায় পাথরের উপর বসিলাম। যাত্রীর অগণ্য স্রোত আমাদের সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে লাগিল। আমরা বসিয়া রহিলাম আর শুধু দেখিতে লাগিলাম।

সহসা দেখি কখন সে তার হাতের ফুল মালা আমার পায়ের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। আমি বলিলাম—এ কি! সে বলিল—কেন? ঠিক ত হয়েছে। এতক্ষণ স্পষ্টভাবে তার মুখে আমি চাহি নাই। এইবার চাহিলাম। সে হাসিল না। শুধু আমার চোখে চোখ দিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি কেন জানি না, জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলাম। আমার বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। আমি পারিতেছিলাম না। তবু মুখে কোন কথা আসিল না। শুধু মনে মনে বলিলাম - না—না—না।

আমার ইচ্ছা ছিল একবার মন্দিরের ভিতরে যাই। বলিয়াও ছিলাম। সে বলিল বেশ ত আছি। দুজনে মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকাইয়া তেমনি বসিয়া রহিলাম।

একে একে যাত্রীরা সকলে চলিয়া গেল। আর একজনকেও দেখিলাম না। আমি বলিলাম—উঠ। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—চল।

আবার আমরা পথে বাহির হইলাম। অল্প অল্প জ্যোৎস্না। বেশ রাত্রি হইয়াছে। এবার যেন কেন ভয় হইতে লাগিল। আমি অনেক কথা বলিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই ভাল করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। সে আমার সঙ্গেই চলিল।

আমি তাকে চিনি। মন্দির পথে কতদিন কত রাত্রি এক সঙ্গে যাওয়া আসা করিয়াছি। একবার অনেকদিন তাকে দেখি নাই-- অনেকদিন সে আসে নাই। আমার বড় রাগ হইয়াছিল। আমি তাকে বলিয়াও ছিলাম। সে শপথ করিয়াছিল যে আর কোন তীর্থে সে যাইবে না। তবু যেন তাকে আমি বুঝি নাই। সুদূর স্বপ্নলোক হইতে সে যেন ভাসিয়া আসে। কেমন করিয়া সে তাকায়—কি যেন আছে তার বড় বড় দু'টি চোখে। কি স্নিগ্ধ তার হাসি! লোকলোকান্তরের অপার অগাধ অসীম রহস্যের মাঝে সে যেন আমায় নিয়ে ডুব দেয়। কি এক নিশুতি সুপ্তির কোলে সে আমায় শুইয়ে দেয়। আমার সমস্ত চেতনা সে যে কি করে এক নিমেষে কেড়ে নেয়—আমি তা বুঝি না।

আদর্শ শোকোচ্ছ্বাস

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়]

১। পত্নী-বিয়োগে

হায়গো তুমি কোথায় গেলে
কোন্ অজানা লোকে—
কোন্ অচেনা পথ দিয়ে সে,
ভুবন ফেলে শোকে!
নিত্যি সে আর নফর-দাসী
যায়না ছেড়ে-ছুড়ে—
স্যাকরা ব্যাটার অন্ন গেছে,
কান্না দেছে জুড়ে!
চাকর-বাকর দিন পেয়েছে,
যা খুসী তাই করে,
ঠাকুর করে রাম-রাজত্ব
ঢুকে ভাঁড়ার-ঘরে।
আমার বুকের পাথর সরা...
ঘুরি মনের মত—
বাইরে সখি, বাড়ুক গে রাত ··
প্রমোদ-সুখে রত!
সপ্তমেতে কণ্ঠ ছাড়ার
পাঠ সে গেছে চুকে!
ওহো প্রিয়ে, বিদায় নিয়ে
আরাম দেছ বুকে!

২। একটি লেখকের মৃত্যুতে

মরেছে আজিকে, মরেছে সে আজ,
বেঁচেছে বঙ্গভাষা!
গদ্য-পদ্য খোঁচার হস্তে
নিস্তার পেলো খাসা!
ব্যাকরণ আজ বানানে লইয়া
হাসে, দ্যাখো, তাল ঠুকে।
কাগজ হাসিছে মগজে পাবে সে,
যা-তা ছাপিবে না বুকে!
পাঠকের ঘরে পয়সা বাঁচিবে
এবারে সে খেতে পাবে!
হে কবি-লেখক, মরিয়া বাঁচালে
বাঙ্গালীকে কত ভাবে!

৩। বেচারা এঞ্জিনিয়ার

তিনি ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, গড়ে গেছেন পথ
তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গে, ..পুল,...পাকা ইমারৎ!
কিন্তু তাঁর এ দুঃখ ছিল, বহু অর্থে ঘিরে
গড়তে শুধু পারেননিকো আপন পত্নীটিরে!

৪। বাংলার দুই পুত্রের বিয়োগে

বাংলা মায়ের আদরের পুত
ছিল রে দুলাল দুটি।
একজন ছিল শিঙা নিয়ে হাতে,
আর-জন ভরা মুঠি!
প্রথম জনারি নাম ডাক্তার,
উকিল সে আর-জন—
দুটী ভাই, মরি, রত্ন দুটী গো—
মহাশয়, সজ্জন!
যতদিন ছিল বাঁচিয়া দুটীতে
করে গেছে হাড় কালি,
মিকশ্চার-পিলে, মামলা-দাখিলে
সিন্দুক করে' খালি!
দোঁহাকার দেহ পুড়ে ছাই হলো
অই দুটী চিতা জুড়ে!
কত সে ফন্দী, কেরামতি কত
সাথে ছাই হলো পুড়ে!
বল হরিবোল্ ঘুচে গেছে গোল,
কর গিয়ে নাওয়া-খাওয়া!
তপ্ত ধরণী হইল শীতল,
বহে ফাল্গুন হাওয়া!
নিয়ে গেছে রোগ, পিলের বালাই,
মামলা শামলা সবি;
রোগ-শোক ভুলে বাঁচিবে বাঙ্গালী—
কহিছে বেতালা কবি!

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যদুপতির বুদ্ধি।

বিবাহ হইয়া গেল; হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী দুইটী হৃদয় চিরতরে একত্রিত হইয়া গেল।—আমরা বাঁচিলাম; তোমরাও বাঁচিলে।

বর ও বরকর্ত্তা মহা ধুমধামের সহিত, বাদ্যোদ্যম ও বোম-নিনাদের মধ্য দিয়া ক্রন্দনমানা বধূকে লইয়া ষ্টীমারে চড়িলেন। মাননীয় শিখর বাবু যাইবার সময় দ্বারান্তরালে অবস্থিতা অবগুণ্ঠিতা প্রমদাকে বলিয়া গেলেন, 'আর আটদিনের মধ্যেই শরৎবাবাজী বধূমাতাকে এই বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, শাশুড়ীর আদর লাভ করে যাবে। আপনি একটুও ভাব-বেন না। জানবেন, মা ঈশানী যেমন আপনার মেয়ে, তেমনি আমারও ছেলের বৌ; সেখানে বৌমার কোন অভাবই আমরা রাখব না।"

বলা বাহুল্য, বুদ্ধিমতী প্রমদা, মাননীয় বৈবাহিকের এই মিষ্ট আশ্বাসবাক্যে সম্পূর্ণ আশ্বস্তা হইয়াছিলেন, এবং নয়ন কোণের জলবিন্দু বসনাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বর ও বধূ প্রস্থিত হইলে, কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ, অবস্থানের কারণ অভাবে, বিমর্ষ মুখে, ক্রমে একে একে, দুয়ে দুয়ে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বরের চন্দ্রমুখ পুনরায় দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া, আরও কয়েক দিন মুন্সেফ বাবুর অন্ন অকারণ ধ্বংস করিয়া, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যদুপতি কল্যাণীকে রাত্রে শয্যাগৃহে পাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কল্যাণু, তোমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে না?'

কল্যাণী কহিল, 'তা আবার করছে না? কতদিন তোমায় রেঁধে খাওয়াইনি বল দেখি?'

তোমরা মার্জ্জিত রুচি, আধুনিকা মহিলাগণ! তোমরা হয়ত বলিবে যে, কল্যাণী কখনও এমন অসম্ভব কথা বলে নাই। ইহা আমাদিগের ন্যায় ধূর্ত্ত ঔপন্যাসিকের বিকৃত কল্পনা মাত্র। কি? ভদ্রমহিলা রাঁধিবে?—তাও আবার সমাদৃত ও সমাগত বন্ধুর জন্য নয়; অসভ্য চিরাগত স্বামীর জন্য! এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা? কিন্তু তোমরাত জান যে, আমাদের কল্যাণী উপন্যাসের নায়িকা হইলেও, অশিক্ষিতা, অনলঙ্কৃতা এবং এক পণ্যজীবীর গৃহিণী মাত্র; তাই, সে এই অসম্ভব কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল।

সেই অসম্ভব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, যদুপতি আদরে কল্যাণীর করদ্বয় আপন করমধ্যে গ্রহণ করিল; এবং তাহা আগ্রহভরে নিপীড়িত করিল। সেই নিপীড়নে, বুঝিবা কল্যাণীর সেই প্রেমপুষ্ট হস্ত হইতে কিছু মধুরতা ক্ষরিয়াছিল; বুঝি, সে মধুরতার স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য যদুপতি তাহা আপন প্রেমতপ্ত অধর প্রান্তে উঠাইয়া চুম্বিত করিল; বলিল, 'সত্যি, এখানে ত কত ভাল ভাল জিনিষ খেতে পাচ্ছি; কিন্তু এই হাত দু'খানির রান্না সামান্য ডাল ভাত আমার যেমন মিষ্টি লাগে, স্বর্গের সুধাও বোধহয় তেমন মিষ্টি লাগে না। কল্যাণ, বল, কবে তুমি বাড়ী যাবে; কবে আমি আবার এই হাতের রান্না খেতে পাব?'

গোলাপের যেমন একটা নয়ন মুগ্ধকর রং আছে, কমলের যেমন একটা হৃদয়স্নিগ্ধকর শোভা আছে, আমাদের মনে হয় প্রেমেরও তেমনই একটা বর্ণ, একটা শোভা আছে; আর সেই বর্ণটা এবং শোভাটা গোলাপের মতই নয়নমুগ্ধকর, কমলের মতই হৃদয়স্নিগ্ধকর! তাহা না হইলে, স্বামীর আদর স্পর্শে কল্যাণীর শ্যাম গ্রীবা ও কপোলদ্বয় এমন গোলাপের নয়নাভিরাম আভা প্রাপ্ত হইল কিরূপে? তাহা না হইলে, তাহার বিশাল প্রেমবিহ্বল লোচনদ্বয়, প্রস্ফুটিত কমলের স্নিগ্ধ শোভায় রঞ্জিত হইল কেমন করিয়া? সেই গোলাপ দলনিন্দিত গণ্ড স্বামীর নয়নাগ্রে ধরিয়া, নয়নে প্রস্ফুটিত কম-লের সেই স্নিগ্ধ ও শান্ত জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করিয়া, প্রেম-

পরিস্ফুট অধরে ললিত হাসি মাখিয়া কল্যাণী স্বামীকে গদগদ কণ্ঠে কহিল, 'আমার ত আজই যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি করে যাব বল দেখি? বাবা যে বারণ করছেন; বলছেন, আরও দু'চার দিন থেকে, ঈশানীর শ্বশুরবাড়ী থেকে ফেরত আসাটা দেখে যেতে। আর মাস কাবার না হ'লেত।......

কল্যাণী সহসা মৌনাবলম্বন করিল। তাহার পিতা যে তাহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মাস গত হইলে, বেতনের অর্থ হস্তগত হইলে সেই ঋণ প্রতিশোধ করিবার জন্ম প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা সে সহসা প্রকাশ করিতে পারিল না। সেই ঋণের কথা প্রকাশ করিলে পাছে পিতার অগোচর করা হয়, এজন্ম সে স্বামীর নিকটও সে কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিতা হইয়াছিল। কিন্তু বুকভরা প্রেম লইয়া প্রেমপাত্রের নিকট কিছু গোপন করা চলে না; এজন্ম কল্যাণী স্বামীর নিকট কখনও কোন কথা গোপন করিতে পারিত না।—যে হৃদয় প্রেমে পূর্ণ, তাহাতে ছলনার স্থান নাই। সে পরক্ষণেই স্বামীর নিকট সকল অবস্থা বিবৃত করিল।

তাহা শুনিয়া যদুপতি বলিল, 'তুমি যদি বুদ্ধি করে টাকাটা না আনতে, তা'হলে কি হ'তো বল দেখি।'

বুদ্ধিটা কাহার, তাহা কল্যাণী ভুলিয়া যায় নাই; এবং কখনও তাহা ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনাও নাই। টাকাটা পিতার হস্তে প্রদান করিবার সময়, স্বামীর বুদ্ধি গৌরবে তাহার বুকটা সাত হাত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে স্বামীর মিথ্যা কথার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া কেবল মনে মনে ভাবিল, আহা! মিথ্যা কথা যে এমন ধর্ম্ম, এমন মিষ্ট হয়, তাহা ত আগে সে কখনও ভাবিতে পারে নাই। সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে বসিয়া স্বামীকে দেখিতে লাগিল।

প্রেমিকার সেই কমনীয় দৃষ্টি দেখিয়া যদুপতি মুগ্ধ হইল। কিন্তু সে কেবল মুখে বলিল, 'আমার দিকে অমন দুষ্টুর মত চেয়ে আছ কেন?'

কল্যাণী কৃত্রিম অভিমানভরে কহিল, 'আমি ত শুধু দুষ্টু; কিন্তু তুমি যে মি...।' কল্যাণী আর বলিতে পারিল না; তাহার জিহ্বা তামাসা করিয়াও কখনও স্বামীকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারে নাই; আজও তাহা উচ্চারণ করিতে পারিল না।

যদুপতি সব সময় তাহার আদরিণী ভার্য্যার অস্ফুট বা অকথিত ভাষা বুঝিতে পারিত; আজও কল্যাণীর অকথিত ভাষা বুঝিল, এবং তাহাতে কতটা মিষ্টতা আছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিল। কিন্তু পত্নীর সহিত আর একটু সুখকর বাদানুবাদ করিবার জন্ম সে বলিল, 'আমি শুধু দুষ্টু নই; আর কি কল্যাণু?'

কল্যাণী পূর্ব অভিমানের সুরেই বলিল, 'আমি জানি নে, যাও।'

যদুপতি পত্নীকে আপন বক্ষে ধরিয়া বলিল, 'আমি ত এখন যেতে পারব না কল্যাণু। এখনও ত সকাল হয় নি।'

কল্যাণী অপরাধীর ন্যায় বলিল, 'আমি কি তোমায় যেতে বলছি নাকি?'

যদুপতি তাহা বিলক্ষণ জানিত; তাই সে আলিঙ্গন আরও দৃঢ় করিয়া বলিল, 'তবে তুমি কি বলছ?'

কল্যাণী বলিল, 'আমি বলছি, টাকাটা সম্বন্ধে আমাকে একটু বুদ্ধি দাও।'

যদুপতি বলিল, 'টাকাটা আর তোমার বাবার কাছ থেকে ফেরত নিও না। তাঁহার অভাবের সময়, তাঁকে টাকাটা দিয়ে খুব ভাল কাজই করেছো; কিন্তু ভাল কাজ করে, মানুষ কি আবার সেই ভাল কাজ ফিরিয়ে নেয়?'

কল্যাণী বলিল, 'আমারও নেবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তা কি করে হবে, তাই ভাবছি। বাবা যখন ফেরত দিতে আসবেন, তখন আমি কি করে বলবো যে ও টাকা আমার আর চাই নে? তুমি বুঝছ না! তাতে আমার যে লজ্জা হবে, তার চেয়ে টাকা নেওয়া অনেক সহজ।'

যদুপতি বুঝিল যে, গুরুজনদিগের নিকট সাধুতার অনুষ্ঠানেও একটা লজ্জা আছে। এই সরলা সেই লজ্জা সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব সে বুদ্ধি দিল, 'দেখ, তুমি টাকা ফেরত নেবে না, একথা মোটেই বলবে না। তুমি বলবে, বাবা এখন ও টাকাটা তোমার কাছেই থাক; একটা দরকারের সময় তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেবো।'

স্বামীর এই বুদ্ধির কথা শুনিয়া কল্যাণীর হৃদয় মধ্যে তাহার প্রতি এতটা অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, সে নিতান্ত সরমা হইলেও, এমন একটা বেহায়ার কার্য্য করিয়া ফেলিল, যাহা তোমাদের কাছে উত্থাপন করিতেও আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। কি জানি, তাহা শুনিয়া পাছে আমার পাঠিকাগণ অনুরাগভরে আপন আপন স্বামীর প্রতি যদি সেই রকম কিছু করিয়া ফেলে!

(ক্রমশঃ)

[শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃবিয়োগের কারণ 'কল্যাণী ও ঈশানী' গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয় নাই।— সং, স-শি।]

জন্ম-উপেক্ষিত

(গল্প)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(১)

ক্ষীনকায়া পাহাড়ে-নদীর উপর বাঁধানো সেতুতে দুইটী তন্বী সুন্দরী রেলিংএ ভর দিয়া নীচের স্রোতের পানে তাকাইয়াছিল। বিকালের শেষ বেলা, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এখনও যেন গাছের মাথাগুলি অল্প অল্প চিক চিক করিতেছে। শীতকালের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া, দেহের প্রতি লোমকূপে কাঁপুনি তুলিতেছিল, চাদরটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে একজন অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—'বড্‌ড শীত, ঠাকুরঝি, তোমার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, ফিরে যাই চল।" রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি মৃদু হাসিতে আলোকিত করিয়া মীরা কহিল, "এই ঠাণ্ডাতেই ত আমার ভালো হয়, বৌদি, তোমার শীত লাগে তুমি যাও না, রামজীব ত দাঁড়িয়ে আছে—"

মৃদু হাসিয়া প্রতিভা বলিল, "ঈশ্‌ বড্‌ড যে সাহস! আমি যেন রামজীবকে নিয়েই গেলুম, তারপর আপনাকে মশাই কার কাছে রেখে যাব? আমার জন্য যেন বলছি, অসুখটা কি আমার না আপনার?"

হ'লই বা বৌদি, অসুখ আমার আর নেই, বেশ সেরে গেছি, সত্যি আজ কদ্দিন আর জ্বর হয় না।" ননদের চাদর খানি সারা গায় ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিতে দিতে প্রতিভা সস্নেহে বলিল, "হ্যাঁ, সেরেছে বই কি, অনেকটা ত সেরে গেছে, তা নইলে চেঞ্জের আর অত গুণ লোকে বলে? তা হোক ঠাকুরঝি, এবারে ফিরে চল, বেশী ঠাণ্ডা ত ভাল নয় ভাই!"

"চল।"

জনবিরল সুবিস্তৃত প্রান্তর পথ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটার ঝোপ, আর পদতলে কুয়াসা-সিক্ত তৃণ গুল্ম। প্রতিভা ও মীরা পাশাপাশি হাটিয়া চলিল, এবং প্রকাণ্ড লাঠি হস্তে রামজীব রহিল পেছনে। মাঝে মাঝে অৰ্দ্ধ গঠিত দেয়াল এবং ভাঙ্গা বাড়ীগুলি গৃহকর্ত্তার দৈন্যাবস্থা অথবা অমনোযোগিতার শত পরিচয় দিতেছে, কিছু দূরে, এক ধারে ত্রিকুট পাহাড় মাথা খানি শূন্যে তুলিয়া একাকী সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। পৃথিবীর যত আঁধার, যেন তাহারই উপর সব নামিয়া ক্রমেই তাহাকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিতেছে। প্রান্তর পথ ছাড়িয়া উভয়ে এইবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং ত্রিকুটের ঘন আঁধারের পানে তাকাইয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত হাঁটিয়া চলিল, বাড়ী এখনও অনেকটা দূরের পথ।

মিনিট দুই তিন হাঁটিয়াই পরিশ্রান্ত মীরা বলিল, 'একটু আস্তে বৌদি—'

'ঈশ্‌, হাঁপিয়ে পড়ছ যে ঠাকুরঝি, বসবে?'

'না, একেবারে বাড়ী গিয়েই শুয়ে পড়ব, এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না বৌদি।'

সস্নেহে প্রতিভা বলিল, "বেশ ত, আস্তেই চল।"

'আমার জ্বর হয় না আজ ক'দিন বৌদি?'

দিন হিসাব করিয়া প্রতিভা বলিল, 'ঠিক আট দিন। বৈদ্যনাথের হাওয়ার সত্যি ভাই গুণ আছে।' মীরা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বৈদ্যনাথের হাওয়ার গুণ, না কি বৈদ্যনাথজীর দয়ার গুণ কে জানে!' উভয়েই হাসিল। ধীরে ধীরে আরো খানিকটা হাটিয়া আসিতে চোখের সম্মুখে বাড়ীর আলো-রেখা ফুটিয়া উঠিল। উজ্জ্বল আলোর নীচে, টেবিলের সামনে কর্ম্মরত কাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল। মীরা বলিল, "দেখ বৌদি, আমরা বেরুবার সময় দাদাকে যেভাবে দেখে গিয়েছিলাম এখনও ঠিক তেমনি বসে কেবল হিসাবই করছে!"

প্রতিভা চুপ করিয়া রহিল। এই কেবল কাজ কাজ! এই খালি লাখ দু'লাখের হিসাব, তাহার ব্যবসায়ী স্বামিটীর

অন্তর হইতে অহর্নিশ কত রসই যে কেবল শুষিয়া নিতেছে তাহা কে জানে—ইহার জন্য মনের ভিতর হইতে তাহার যে গোপন ব্যথার রাগিণী প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরখানি বেদনার্ত্ত করিয়া তুলিত, সংসারে কে তাহার সন্ধান জানে! বাড়ীর সম্মুখে ধান ক্ষেতের জলের উপর সাপ কিংবা ভেক জাতীয় একটা কিছু ছপ ছপ করিয়া চলিয়া গেল—আঁধার ক্রমেই জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। প্রতিভা মীরার হাতখানি সস্নেহে ধরিয়া আর একটু ক্ষিপ্রভাবে পা ফেলিতে লাগিল—বাড়ীতে ঢুকিতেই সহসা আম গাছের তলায়, কাঁটা ঝোপের আড়াল দিয়া কে এক মনুষ্য মূর্ত্তি অতি দ্রুত লুকাইয়া পড়িল। উভয়েই ভীত হইয়া একই সঙ্গে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু নিতান্তই ইহা চোখের ভ্রম মনে করিয়া কেহই বিশেষ কিছু আর ভাবিল না,—তথাপি একটু ভয়-ত্রস্ত-কম্পিতভাবে উভয়ে গৃহে উঠিল। প্রজ্জ্বলিত তীব্র আলোকে গৃহমধ্যে বাহিরের সে ভয়াবহ অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। মীরাকে ঘরে পৌছাইয়া দিয়া প্রতিভা কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রতিভা আসিয়া দেখিল আপাদ-মস্তক গরম চাদরে ঢাকিয়া মীরা খাটে শুইয়া পড়িয়াছে। বৈদ্যনাথের হাওয়ার গুণে যে জ্বর আজ ক'দিন চাপা পড়িয়াছিল, আজ সহসা সেই জ্বর আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২)

পৌষমাসের রৌদ্র-ঝলমল সুন্দর সকাল।

নেটের পর্দ্দা-ঘেরা প্রশস্ত বারাণ্ডাটিতে স্প্রিংএর খাটে গায়ে মুখে একখানা চাদর ঢাকা দিয়া মীরা শুইয়াছিল,—প্রতিভা আসিয়া মাথার পাশটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল "ঠাকুরঝি,—আচ্ছা বল ত ভাই, একি হোল,—এত জিনিষ ঘরে থাকতে, এত সব দামী দামী কত কি,—সব থাকতে শুধু তোমারই ফটোটা কে নিলে ভাই! তোমার দাদা বলেন নেবে আবার কে, চাকররা ঝাড়তে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে, কিন্তু সেকি সত্যি? আমার যেন কেমন মনে হয়!"

একটু পাশ ফিরিয়া মুখের উপর হইতে চাদরখানা না সরাইয়াই মীরা মৃদু স্বরে বলিল, "ফটো আবার নেবে কে বৌদি? তোমার যে কথা! ঝাড়তে টাড়তে ওরাই ভেঙ্গে ফেলেছে, কিন্তু চোখে না দেখে কা'কে কি বলবে বল ত! মিছিমিছি খালি গোলমাল—থাক বৌদি, ও নিয়ে আর কাউকে কিছু না বলাই ভাল।"

"কিন্তু ঠাকুরঝি—"

"কেন বৌদি?"

"সত্যি কি ফটোটা ভেঙ্গেছে বলেই তোমার মনে হয়?"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া যদিও গলার স্বরটাকে যথা সম্ভব অবিকৃত রাখিয়াই মীরা সে কথার উত্তর দিল, তথাপি সে স্বরটাকে প্রতিভার তেমন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না, কতগুলি পুরাতন স্মৃতি লইয়া মনের ভিতর আলোড়ন করিতে করিতে সে নীরবেই বসিয়া রহিল।

মীরা বলিযাছিল—"জানি নে বৌদি, তোমার যে কথা, না ভাঙ্গলে আর কি হতে পারে, বল দেখি?" পাশের ঘরে খুকী কাঁদিয়া উঠিতেই প্রতিভা উঠিয়া দাঁড়াইল, চাদরের ভিতর হাত দিয়া ননদের দেহের উত্তাপ অনুভব করিতে করিতে বলিল, "জ্বরটা তো ঠাকুরঝি আজও আর কমলো না, কি ছাই ওষুধই ডাক্তার দিচ্ছে বাবু—এ নাকি আবার বিলেতের পাশ!"

বধূ চলিয়া গেলে চাদরটা দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া মীরা উঠিয়া বসিল, সারা রাতেও জ্বরটা একটুও তো কমলো না, মাথাটা এত দুর্ব্বল, উঃ! মাথার বালিশ দুইটা দেয়ালের দিকে একটু সরাইয়া মীরা হেলান দিয়া বসিল, শুভ্র সুন্দর হাত দু'খানিতে সোণার চুড়ি ক'গাছি কত বড় হইয়া গিয়াছে; ক্লান্তভাবে দু'চার বার সেগুলি নাড়াচাড়া করিয়া অবশ অলস নেত্র দু'টি তুলিয়া জানালা পথে শূন্য পানে চাহিয়া রহিল, অদূরের ঐ নারকেল গাছটার মাথার উপর দিয়া, কত উঁচুতে সাদা পায়রাগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছিল—তাহাদের রৌদ্রোজ্জ্বল রূপালী পাখা গুলির দ্রুত গতির পানে শূন্য দৃষ্টিতে মীরা তাকাইয়া রহিল। মিনিট কয়েক আগে পাশের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গিয়াছে, ডাক্তারের আসিবারও সময় হইয়াছে। ডাক্তারের কথা মনে হইতেই মীরার দুর্ব্বল দেহে অধিকতর ক্লান্তির আবেশ হইল,—পারি না যে আর,—

কেবল ডাক্তার--ডাক্তার—ডাক্তার, মাগো! কবে এই ডাক্তারের হাত হ'তে মুক্তিলাভ করিব!

(৩)

"ওমা, ওকি ঠাকুরঝি, অমন করে শুলে কেন ভাই! ডাকলেই ত হোত, বালিশটা সরিয়ে দিতুম!"

"নাঃ থাক, এই বেশ হয়েছে, বোস না বৌদি একটু কাছে, খুকী ঘুমিয়েছে? ওধারের কাজ সব শেষ হয়েছে?"

প্রতিভা বিছানার পাশে বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ খুকী এই ঘুমুল -এই টুকুন বাচ্চাটা কি জ্বালায় ভাই, বাবাঃ—জ্বালিয়ে খেলে একেবারে, ঘুমিয়েছে না বেঁচেছি।"

রোগক্লান্ত মুখখানিতে করুণ হাসি ফুটাইয়া মীরা বলিল—"আহা বৌদি, জ্বালাক না ভাই একটু, ক'দিন আর জ্বালাবে! মেয়ে হয়ে জন্মেছে, এর পরে নিজের জ্বলুনীই কি কিছু ওর কম আছে বৌদি!"

মীরার গলার স্বরের কাতরতাটুকু লক্ষ্য করিয়া প্রতিভা দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবেই কাটিল। প্রতিভার চুড়ি ক'গাছি নাড়াচাড়া করিতে করিতে মীরা বলিল, "আচ্ছা বৌদি— আমার ও ফটোটা খুব সুন্দর উঠেছিল—না?"

"চমৎকার হয়েছিল ঠাকুরঝি, তাই ত কষ্ট হচ্ছে এত। কতগুলো টাকা গেছে, কিন্তু তার জন্যে ত নয়, ওরকম ছবি কি আর হবে ঠাকুরঝি?"

"আচ্ছা, পাশের চেয়ারটাতে কি কতগুলো বই ছিল— তোমার মনে আছে বৌদি?"

"হ্যাঁ, সুধীর বাবুর দেওয়া সেই কাব্যগ্রন্থ তিনখানি, আর সেই ফুলদানিটা, সেটাও ত তোমায় সুধীর বাবুই দিয়েছিলেন ঠাকুরঝি?"

প্রতিভা অতি সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। মীরা বৌদির মুখের পানে মিনিট খানেক স্থিরভাবে তাকাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। উভয়েই নীরব, ঘরে কেবল একটা গভীর বিষণ্ণতা স্থিরভাবে ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। সহসা মুখখানি ফিরাইয়া একটু চঞ্চল ভাবেই মীরা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বৌদি একটা কথা আজ জিজ্ঞেস করব, কিন্তু ঠিক উত্তর কি দেবে?"

প্রতিভা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "বল, দেবো।"

"আচ্ছা বৌদি সুধীরবাবুকে দাদা সেদিন অমন করে তাড়িয়ে দিলেন কেন?"

মনে মনে ভীত হইয়া প্রতিভা বলিল, "সে তোমার দাদাই জানেন ঠাকুরঝি।"

মীরা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, দাদাই কেবল জানেন, আর তুমি জান না, মিথ্যে কথা! বল তুমি, আজ তোমাকে বলতেই হবে,—" উত্তেজনার বশে মীরা উঠিয়া বসিল, প্রতিভা অধিকতর ভীত হইয়া বলিল, "শোও, শোও তুমি ঠাকুরঝি, আমি বলছি।"

"না, আমি বসেই শুনব, তুমি বল।"

"তোমার দাদা ভয় পাচ্ছিলেন ঠাকুরঝি, সে বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা করে।"

মীরার রোগতপ্ত পাণ্ডুর মুখখানি ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল, বলিল—"কি চাঁদ বৌদি?"

"তোমায় সে বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিল ঠাকুরঝি, কত বড় তার সাহস! এখনো ত আমরা ম্লেচ্ছ হইনি ঠাকুরঝি, কায়স্থের ঘরের মেয়ে, বিয়ে হবে তার মুচির ছেলের সঙ্গে? কিন্তু সত্যি ভাই, অমন ছেলে কি আর হয়? রূপে গুণে, লেখাপড়ায়, কথা বার্ত্তায়,—কই ঠাকুরঝি, তোমার দাদা তোমার জন্যে এত ছেলের ত সন্ধান নিলেন, কিন্তু এমনটিত কই চোখে আর পড়লো না। ভগবানের কি বিচার ঠাকুরঝি, এমন রত্ন দিলেন কি না তিনি এমন নীচু ঘরে!"

নীরবেই কথাগুলি শুনিয়া মীরা ধীরে ধীরে বালিশটী সরাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

প্রতিভা বলিতে লাগিল, "সত্যি ঐ দোষটাইত তার সর্ব্বনাশ কল্লে, নইলে নিজের ভাইটীর মতন করে স্নেহ করতুম, এখনো মনে হলে মাঝে মাঝে মনটা কেমন করে। ছোট জাতের মনেও এত ভালবাসা থাকে ঠাকুরঝি!"

চাদরখানি ভাল করিয়া গায় দিতে দিতে মীরা কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "না, ওরা আবার ভালবাসবে কি! যত ভালবাসা সব কেবল এই কায়েত বামুনদের ঘরে, ছোট জাতের আবার ভালবাসা কি? ছিঃ—ওরা কি মানুষ!"

"কিন্তু বৌদি!"

"কেন ভাই !"

"কই তোমার কায়স্থদের ঘর থেকে ত আমায় কেউ ভালবাস্‌তে এলোনা বৌদি, আমি কি তবে আর-জন্মে মুচি টুচিই ছিলুম ?"

"ছিঃ, ওকি কথা ঠাকুর ঝি ? তুমি ত বিয়ে ইচ্ছে করেই কর্লে না, নইলে ভাল ছেলে কি জোটেনি ঠাকুরঝি ?"

"হ্যাঁ জুটেছিল বই কি ! সেই সুরেশবাবু যোগেন বাবুরা ত ? আমি কিন্তু মনে করি বৌদি কায়েতের ঘর ছেড়ে মেথর কিম্বা মুচি ডোমদের ঘরেই ওদের জন্মালে ঠিক হোত। ওরা আবার মানুষ, ওরা আবার ভদ্র বলে পরিচয় দেয় !"

ইহাতে নিজের স্বামীর উপর ও যে একটু শ্লেষের ইঙ্গিত পড়িল, তাহাতেই একটু ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিভা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

(৪)

সকাল বেলা সেদিন মীরার জানালা খানির তলা হইতে তাহার নিত্য ব্যবহার্য্য জড়ির জুতা জোড়াটি সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। পর পর দু'দিন একি অদ্ভুত চুরি ! বাটীস্থ সকলে গভীর বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া রহিল, একি কাণ্ড ! এত সব দামী দামী জিনিষপত্র থাকিতে ও চোরের দৃষ্টি কি শুধু মীরার অতি প্রিয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর জিনিষগুলিতে !

প্রতিভার মনে কেমনতর একটা সন্দেহের বীজ কখন কে জানে অঙ্কুর তুলিয়া, ক্রমে ডাল পালা মেলিয়া গজাইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু স্বামীকে সে কথা বলিতে সাহস হইল না।

রোগিনীর জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে কমিয়াই আসিতে-ছিল, কিন্তু জুতা চুরির পর দিন হইতে অবস্থা তাহার ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া খারাপই হইতে লাগিল। আগে কাহারো সঙ্গে না হোক, প্রতিভার সঙ্গে সর্ব্বদাই কথা বলিত, কিন্তু ক্রমে তাহাও কমিয়া আসিতে লাগিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "এ ভীষণ ক্ষয়রোগে বাঁচবার ত কোন কথাই ছিল না, কিন্তু শীগ্‌গীর যাবার মত অবস্থাও ত ছিল না !"

বধূ অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া বলিল,—"আর কি আপনাদের কোন ঔষধ নেই ? আর কিছুদিন ধরে রাখতে পারেন না ? এত শীগ্‌গীর যাবে !"

ডাক্তার ম্লান হাসিয়া বলিলেন "সে আর হয় না মা, - এখন যে ভাবে চলছে সে শুধু ভগবানের হাত !" দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়া রোগিণীর প্রতি প্রৌঢ় ডাক্তারের মমতা জন্মিয়াছিল, তাই আজ শেষ কথা উচ্চারণ করিতে চোখ তাঁহার সজল হইয়া উঠিল।

ইহার পর দিনের পর দিনগুলি যে কেমন করিয়া কিভাবে কাটিতে লাগিল—রোগের দারুণ বিকারে সকল সময় রোগিণীর দেহে সমানভাবে জ্ঞান থাকিত না, কখনো বা একেবারে চৈতন্য হীন, কখনো বা অর্দ্ধ চৈতন্য এবং কখনও বা দেহে পূর্ণ চেতনাই আসিত।

পৌষমাস কাটিয়া গিয়া মাঘের শীত পড়িয়াছে। দিনের বেলা এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাই সেদিনের সন্ধ্যা-টায় ঠাণ্ডাটা যেন বেশী, হাওয়াটা যেন বেশী কন্‌কনে ! লাল র‍্যাগ্‌ খানিতে বুক অবধি ঢাকা দিয়া খোলা জানালার পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া মীরা শুইয়াছিল। দেহখান অতি শীর্ণ, মুখখানি বড় করুণ, চোখ দু'টি জলভার নত। ঘরে ঘরে ধূপ ধূনা দিয়া প্রতিভা আসিয়া নীরবে ঘরে প্রবেশ করিল, খোলা জানালাটা দিয়া মাঠের ঝাউগাছ তলার কেমন একটা স্যাঁত সেঁতে ভিজা গন্ধ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, প্রতিভা তাই জানালাটি বন্ধ করিতে গেলে, মীরা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"না, না বন্ধ করো না বৌদি, খোলা থাক ওটা, ও জানালা খোলাই থাক্।"

"কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া যে আসছে ঠাকুরঝি, জ্বর রয়েছে গায়, ও হাওয়াটা কি ভাল ?"

"তা হোক, খোলাই থাক্ ওটা।"

ঘণ্টাখানেক পরে মীরা ঘুমাইয়া পড়িলে, প্রতিভা উঠিয়া অতি সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু গভীর রাত্রিতে সহসা একটা শব্দ শুনিয়া, চমকিয়া জাগিয়া দেখিল, খাট হইতে নামিয়া, জানালাটির তলায় মীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ! বন্ধ জানালাটি খোলা রহিয়াছে এবং জানালা খুলিতে আসিয়াই যে দুর্ব্বল শরীরে মীরার এই অজ্ঞানাবস্থা—প্রতিভা তাহা বুঝিতে পারিল।

স্বামীর সাহায্যে মূর্চ্ছিতা মীরাকে শয্যায় তুলিয়া শোওয়াইতেই ঝাউতলার ওপাশের বড় রাস্তার উপর বাঁশীর শব্দ শুনিয়া বিস্মিত প্রতিভা জানালার পাশে সরিয়া দাঁড়াইল, —নীরব নির্জ্জন পথখানিতে বাঁশীর শব্দ ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে শূণ্যে মিলাইয়া গেল। কি এ করুণস্বর! কি এ বুক-ফাটা প্রাণ ফাটা রাগিণী! মাগো, কে এ বাঁশী বাজায়? এত রাত্রিতে ঘরে মন টেঁকে না, চোখে ঘুম আসে না,—কে এ সৃষ্টি ছাড়া মানুষ!

প্রতিভার অতি গোপন অন্তরখানিতে সন্দেহের একটা কালো মেঘ ক্রমেই যেন ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল,—কিন্তু সত্যি কি তাই! কি সর্ব্বনাশ, কি হবে তবে? ....

(৫)

স্বহস্তে জানালা খুলিতে যাইয়া ব্যথা পাওয়ার অপরাধে ভ্রাতৃজায়ার কাছে মৃদু তিরস্কার লাভ করিয়া মীরা বলিল, "আমার বিছানাখানি তবে ঐ জানালাটার তলায় টেনে দাও, আমি এই মাঝ ঘরে ঘুমুতে পারি না।"

ইহার পর ক্রমাগত দুদিন, তিনদিন, চারদিন ধরিয়া গোপনে সজাগ থাকিয়া প্রতিভা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে খোলা জানালা পথে যাহার মূর্ত্তিখানি ফুটিয়া উঠিতে দেখিল, এবং তাহার পরও বহুদূর পর্য্যন্ত যাহার বাঁশীর তানে এক করুণ আবেদন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাহার ভয় এবং বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

এ কি কাণ্ড, এ কি অসম্ভাবিত ঘটনা! কিন্তু হায়, কেন এই গভীর প্রেম সুখে দুঃখে, নিদ্রায় স্বপনে, এমন কি রোগে ভোগে পর্য্যন্ত মানুষের পেছনে পেছনে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া বেড়ায়! এই ফটো চুরি জুতো চুরি কোথা হইতে কেমন করিয়া যে হইল, এবং অনুমানে মীরাও যে সকলই বুঝিয়াছিল, একথা প্রতিভার আর অজ্ঞাত রহিল না। হায়রে, এ কি গভীর প্রেম! কত বাধা কত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাত্রির অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, কতখানি ব্যবধানপথে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্ম শুধু প্রিয়তমার রোগ-শীর্ণ দেহখানি সুধীর দেখিয়া যায়,—সমাজের শাসনে যাহাকে স্পর্শ করিবার অধিকারটুকুও নাই, পিপাসায় গলা শুকাইয়া প্রাণ বাহির হইয়া গেলেও মুখে যাহার একফোঁটা জল দিবার অধিকার নাই, তাহারই প্রতি সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া এ কি গভীর প্রেম! কিন্তু মীরার দাদা এ সংবাদ জানিতে পারিলে ত রক্ষা নাই, সে নীরস কাঠখোট্টা ব্যবসায়ী লোক, সংসারে কেবল লাভ ক্ষতির ব্যবসাই তাহার কাজ, এত ভালবাসার মূল্য সে কি বুঝিবে! প্রতিভা মনে প্রাণে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু মীরাও যে রাত্রির এই ঘটনাটা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত তাহা নহে, প্রবল জ্বরের ঘোরে, জানালা পথে সুধীরকে কেবল স্বপ্ন বলিয়াই তাহার মনে হইত। কিন্তু সারাটা দিনরাত্রি সে যেন এই স্বপ্নের আবেশেই তন্ময় হইয়া থাকিত। কেবল যেন মনে হইত, কতক্ষণে জানালা পথে তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত, চিরদুর্ল্লভ মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিবে! কতক্ষণে নীরব রাস্তার আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া সেই জন্ম-উপেক্ষিতের করুণ আবেদন ফুটিয়া উঠিবে!

দেহ মনের সমস্ত ক্ষীণ শক্তি একত্র নিয়োজিত করিয়া মীরা দ্বিপ্রহররাত্রির এই স্বপ্নটুকুর জন্য আপনাকে সজ্ঞানে রাখিতে প্রয়াস পাইত, কিন্তু জ্বরটা কি ছাই,—সারা রাত্রির মধ্যে একটুও কমিত না!

দিনকে দিন মীরার অবস্থা অতি দ্রুতবেগে খারাপের দিকেই নামিতেছিল। তাহার জীবন সম্বন্ধে সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া প্রতিভা এবারে সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া অশ্রুসজল চোখে ননদের বিছানাটিতে আসিয়া বসিয়া রহিল,—কাজ কর্ম্মের দিন ত ভবিষ্যতে যথেষ্টই মিলিবে, কিন্তু এই যে পিতৃমাতৃ-হারা, সংসারের সকল-সুখ-পরিত্যক্তা, তাহার এতকালের সুখ দুঃখের সঙ্গিনীটি মরণ-শয্যায় শুইয়াছে, এ ত আর ফিরিয়া আসিবে না!

নিজের চোখের জল সম্বরণ করিয়া মীরা প্রতিভাকে বলিল, "কেঁদোনা বৌদি, তুমি কাঁদলে আমার যে ভাই কান্না পায়, আমার যে মনে ভয় জাগে বৌদি! কোথায় যাব, একলাটি একেবারে, আলো নাই, সঙ্গী কেউ নাই, উঃ ভাবতে পারি না, বৌদি, তুমি কেঁদে আমায় ভয় পাইয়ে দিয়ো না।"

আহা, ভয় করে ! প্রতিভা প্রাণপণে তাই চোখের জল মুছিতে চেষ্টা করে, কিন্তু হায়রে অবুঝ পোড়া চোখ ! একবার মীরা বলিল, "আচ্ছা বৌদি, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জান —আমরা চোখ মুদলে যেমন আঁধার দেখতে পাই, সেটাও কি তেমনি একটা আঁধারের রাজ্যি ভাই ? ··· ···· বৌদি, একলাটি একটা আঁধার ঘরে আমি থাকতে পারি না, আর অতদূরে একলা আমি কেমন করে যাব ?"

পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া প্রতিভা আকুল হইয়া কাঁদিল :—বন্ধু আমার, দিদি আমার, বোন আমার,—তোর ভয় করে দিদি ! কিন্তু কি করব আমি বল !

দিন এবারে গণনার ভিতর আসিয়া পড়িল, পলকে পলকে, নিমেষে নিমেষে সময়টা যেন পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিল। ওষুধ পথ্য ইত্যাদি সকল কিছুর ব্যবস্থা ডাক্তার এখন রোগীর হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন, ওষুধে ওষুধে এবং নিয়ম বন্ধ পথ্যের ভারে, যাহার ক্ষয়প্রাপ্ত জীবন কেবলমাত্র তিক্তই হইয়া উঠিয়াছে, শেষ ক'টা দিন সে সেই সকল নিয়ম পালন হইতে অব্যাহিত লাভ করিয়া একটু তৃপ্তি, একটু শান্তি পাইয়া যাক্ .....

কৃষ্ণ পক্ষের ঘন অন্ধকার রাত্রি।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই চারিদিক হইতে অন্ধকারের একটা তীব্র বিভীষিকা আসিয়া চতুষ্পার্শ্বের বাড়ীগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল অদূরে ঝাউ গাছ তলায় মাঝে মাঝে দুই একটা শেয়াল কুকুরের বিকট চীৎকার শোনা যাইতেছে— সারাদিনের হাট বাজার, কেনাবেচা শেষ করিয়া অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র গ্রামে ফিরিবার আশায় সহরের ভিতরের পরিষ্কার রাস্তা ছাড়িয়া বন পথের এই জটিল পথে গ্রামবাসীদের হাতের দোলায়মান লণ্ঠনগুলি অন্ধকারের গভীরতা আরো যেন ফুটাইয়া তুলিতেছিল। সেইদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রতিভা মীরার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল ।

—বৌদি !

—কেন দিদি !

—এরপরে আমার মিনুকে কিন্তু যত্ন করে রেখো—আচ্ছা, ওকে আদর করে মনে করে কে খেতে দেবে বৌদি ? ওটাকে আমি তোমায়ই দিয়ে গেলাম।.........প্রতিভা দৃষ্টি ঘুরাইয়া ঘরের এক কোনে একবাটী দুধ-পানে-রত, খাঁদা বিড়ালটার পানে তাকাইল, নীরব ঘরখানিতে ঘড়ির টিক্ টিক্ ধ্বনী ও বিড়ালের দুধ খাওয়ার চুক্ চুক্ শব্দে কেমন একটা রাগিণী ধ্বনীত হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিভা নীরবেই বিষণ্ন নয়ন দু'টির দৃষ্টি ফিরাইয়া, আবার ঐ বন পথের নীবিড় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

— বৌদি !

—কেন ঠাকুরঝি !—

—যা অন্ধকার বাইরে, আজ রাত্তিরে আর আলো নিবিয়ো না।

—আলো ত নিবুই না ঠাকুরঝি, তোমার চোখে লাগবে ব'লে শুধু বারাণ্ডায় বার করে রাখি।

—তা হোক্, ও আলো চোখে সয়ে যাবে, এমন করে আলোটা জানালার পাশে রাখ বৌদি, যেন ওধারের পথটা আমার চোখে পড়ে।—তারপর একটু থামিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—এই বেলা দেখে নি, আর কতটুকু বা সময়, বড় জোর দুদিন কি তিন দিন—না বৌদি, তোমার কি মনে হয় ?

প্রতিভা শক্ত কাঠের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাবই দিতে পারিল না। আবার—বৌদি !

—একটু ঘুমোও না ঠাকুরঝি, সারাদিনে আজ চোখটি বোজনি, এরপর যে মাথা ঘুরবে !—

— না, না না, এখন ঘুম কি; একটু জেগেই থাকিনা বৌদি, এখনোত পারছি, এরপর ত মাথা খুঁড়ে চেঁচিয়ে মরে গেলেও আর জাগাতে পার্ব্বে না বৌদি !··· ··

প্রবল বেদনায় অসম্বরনীয় অশ্রু সম্বরণ করিতে করিতে দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু প্রতিভার গণ্ড বাহিয়া মীরার হাতে আসিয়া পড়িল। রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, চারিদিকে একটা মৃত্যু-ছায়া-ঘন বিরাট আঁধার, কঠিন একটা নীরবতার সৃষ্টি করিয়া প্রতিভার বক্ষস্থল একএকবার কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, মীরার শিয়রে একটা বালিশে হেলান দিয়া প্রতিভা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,—সহসা একটা কিসের শব্দে চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল।—এ যে সেই, সেই বাঁশী ! দূর বহুদূর হইতে একটা

করুণ ধ্বনী তুলিয়া ঝাউ বনের ওপথটা ধরিয়া কাছের পথেই যেন আসিতেছে! ভয়ে আতঙ্কে প্রতিভার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল,—মাগো, কে এ! এ কে গো? চকিতে প্রতিভা মীরার রোগক্লান্ত ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকাইল। অভাগীর কিসের জন্ত জাগিবার এত প্রয়াস ছিল, মুখ ফুটিয়া প্রতিভাকে তাহা না বলিলেও ত প্রতিভার তাহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু হায়রে কঠিন রোগ, রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের ঘোর এমনি করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহাকে চাপিয়া ধরিল, যে অভাগী আর চোখ খুলিতে পারিল না। প্রতিভার চক্ষে জল আসিল।

(৭)

—সারা রাত কি এম্নি জেগে বসে আছ বৌদি?

প্রতিভা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'না ঘুমিয়েছি ত!' ম্লান মুখখানিতে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া মীরা পাশ ফিরিল, সমস্ত বুকখান মথিয়া, একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাহার ফুটিয়া উঠিল। মাগো, আর কতদিন মা!—

—বৌদি—

—কেন ভাই?

—আজ একটা কথা বল্‌বো।—

মীরার মুখখানির উপর নত হইয়া প্রতিভা বলিল, "বল ঠাকুরঝি।"

একটু থামিয়া দুই একবার সঙ্কোচ করিয়া অবশেষে মীরা বলিল, 'স্বপ্ন কিনা জানিনা বৌদি কিন্তু স্বপ্নই বা কি করে বলি, তা'হলে ফটো জুতো কোথায় গেল?'

—কিসের কি বলছ ঠাকুরঝি?

—রোজ রাত্তিরে বৌদি ক'দিন আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত, কি দেখ্‌তুম ভাই, যেন জানালার ওপাশ দিয়ে কা'কে দেখা যায়, যেন ঠিক কার মত, খানিক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ফিরে যেত, যেন একটা বাঁশীর শব্দ শুনতুম, পরপর ক'দিনই দেখ্‌লুম বৌদি;!......

—তোমার কি মনে হয় ঠাকুরঝি, বিভূতিবাবু এখানে এসেছে?

স্থির শান্ত দৃষ্টিতে প্রতিভার মুখপানে তাকাইয়া মীরা বলিল,—হয়ত বৌদি এসেছে, আমাদের এখানে চেঞ্জে আসার কথা হয় তো শুনেছে।

প্রতিভা মৃদুকণ্ঠে কহিল, ঠিকানাটা জানলে একবার খবর দিতুম।—

—থাক থাক বৌদি, দাদাকে আর জানিয়ে কাজ নেই, কিন্তু একটা কাজ কর্ত্তে পার বৌদি? আজ রাত্তিরটা যেকরে হোক্ আমায় তুমি জাগিয়ে রাখতে পার?

কিন্তু সেদিন অপরাহ্নের পর হইতেই মীরার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিল। ডাক্তার আসিয়া একবার দেখিয়া গেলেন,—কিন্তু বলিবার ত কিছুই নাই! যে এই পৃথিবী হইতে চিরতরে চলিয়াছে, পশ্চাতের সহস্র মায়াডোর এবং স্নেহের-ব্যাকুলতা গমনপথে তাহার কতখানি বিঘ্ন ঘটাইতে পারে?

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা পৃথিবী খানিকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল, থমথমে মেঘের আড়ালে ক্ষুদ্র-প্রাণ তারাগুলি কখন কে জানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, সারা রাত্রিতে আজ আর তাহাদের আলো প্রকাশের এতটুকু সম্ভাবনা নাই।—

রোগিণীর শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া প্রতিভা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—সম্মুখে, নিম্নে, উর্দ্ধে কোথাও আলোর রেখা মাত্র নাই, অভাগী আজ একি দারুণ আঁধারেই বিদায় লইবে! এই সমবয়সী ননদিনীর সহিত পরিচয় তাহার ত অল্পদিনের নহে, কোন শৈশবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর হইতে শ্বাশুড়ী-বিহীন গৃহে সুখে দুঃখে, কাজে কর্ম্মে এই দুজনেই শুধু দুজনের সঙ্গিনী ছিল। মীরার দাদার তখন পাঠ্যাবস্থা, বিকালে প্রায় প্রতিদিন কলেজ ফেরত একটি অতিপ্রিয়দর্শন ধনীর দুলাল সহপাঠি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিতেন, উহার সঙ্গে ইহাদের কত পরিচয় কত ভালবাসাই ছিল;—প্রতিভা এবং যোগেন মাঝে মাঝে মীরার সঙ্গে সুধীরের বিবাহের স্বপ্নও দেখিত, হায় রে,—সেদিন আর এদিন!—তারপর? তারপর কি হইল, প্রতিভা সেকথা আজ ভাবিতেও পারে না,—কবে একদিন কোন সূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িল এই এত দীর্ঘ দিন যে সুধীর তাহার অজস্র ভালবাসা এবং আত্মীয়তার বন্ধন দিয়া এই

ক্ষুদ্র পরিবারটিকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে,—সেত কায়স্থ নহে, সে যে অতি হীন অস্পৃশ্য মুচির সন্তান!

সর্ব্বনাশ! মাথায় বাজ পড়িলেও ঠিক ইহার চেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ সেদিন ইহাদের হইত কিনা সন্দেহ। তারপর দীর্ঘ চার বৎসর গিয়াছে, প্রতিভার কোমল মন ননদের অবস্থা ভাবিয়া আরও কোমল হইয়াছিল এবং পিতামাতাহীন স্বজন সমাজ ছাড়া কলিকাতাবাসী সুধীরের হস্তে মীরাকে দিতে স্বামীকে সে যথেষ্ট অনুনয় অনেকদিন করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। জাত কুল মানের যে গর্ব্ব, ব্যবসায়ী যোগেনের শিরা-উপশিরার রক্তস্রোতে অনুক্ষণ প্রবাহিত হইত, তাহাতে কোমলতা কিম্বা প্রেম প্রণয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।

যাহোক, দিন তবু কাটিতেছিল। তারপর মীরার কঠিন রোগ, তাহার চিকিৎসা, হাওয়া পরিবর্ত্তন,—যথাযোগ্যভাবে সকলই চলিতেছিল,কিন্তু ব্যবসায়ী স্বামীর সকল কিছুতেই এমনই একটা নির্লিপ্ততার পরিচয় ফুটিয়া উঠিত, যে তাহাতে কঠোর প্রাণের কথা ভাবিয়া প্রতিভা তাহার অতি গোপন অন্তরে একটা বেদনা অনুভব করিত।

অকাল-বর্ষার-জলে-পূর্ণ ডোবাটার পানে চাহিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রতিভা তাহার অতীতের সহস্র স্মৃতির চিন্তায় মনটাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। ঘর হইতে আলোক রশ্মি গিয়া ডোবাটার একপ্রান্তে পড়িয়া ধীরে ধীরে কাঁপিতেছিল, প্রতিভা তাহারই পানে তাকাইয়া রহিল। ডোবার জল, ভেকের চীৎকার, ঝাউ পাতার মৃদু কম্পন যেন জগতের সমস্ত বেদনা রাশি বুকে বহিয়া কালো মূর্ত্তিতে প্রতিভার মনের উপর বোঝা হইয়া জমিতে লাগিল। পাশে ননদের মৃত্যু শয্যা, যে কোন সময়ে, যে কোন মুহূর্ত্তে—আজই ইহার সকল কষ্টের অবসান হইবে!

বেশিদিন বাঁচিয়া থাকাটা মেয়ে মানুষের সুখের নহে সত্য, কিন্তু হায়, এমন দুঃখের মরণ ক'জন মরে?

শয্যার উপর মীরা নড়িয়া উঠিতেই প্রতিভা পাশে আসিয়া বসিল। বাহিরে তখন বর্ষণ-ক্ষান্ত থমথমে মেঘরাশি হইতে আবার ধীরে ধীরে বর্ষণ সুরু হইয়াছে। মাঝে মাঝে দু'একবার বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, ঘরের একপাশে হিসাব নিকাশেরত ব্যস্ত স্বামীর পানে তাকাইয়া, ঘরের সে ভয়াবহ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রতিভা ডাকিল,—ওমা একি, একি করছে ঠাকুরঝি, ওগো, একটু উঠে এসো না, দেখে যাও না একবার!

* * * *

—রাত তখন আড়াইটা—

মীরার শূন্য শয্যায় প্রতিভা অবশ হইয়া পড়িয়াছিল—বৃষ্টি তখন ধরিয়া গিয়াছে, সহস্র ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে অশ্রুসিক্ত ধরণীর বুকে একটা গভীর কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দূরে দক্ষিণের মাঠের শেষ প্রান্তে চিতার নীল ধূঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঝাউ গাছের অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছিল।

—সহসা—মাগো মা, এযে সেই বাঁশী! শয্যার উপর ছটফট করিয়া প্রতিভা উঠিয়া বসিল,—মৃদু হাওয়ায় ঝাউ গাছগুলির কম্পন আধ আলো আধ ছায়ায় প্রেতের তাণ্ডব নৃত্যের মতই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। তারই পাশ দিয়া ডোবার জলে ছল ছল শব্দ তুলিয়া কে ঐ! মানুষ না!—প্রতিভা মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া গেল!—

* * * *

—একদিন নয়, দু'দিন নয়, চার পাঁচ দিনও নয়, ক্রমাগত ক'দিন ধরিয়াই, অর্দ্ধ রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া প্রতিভার সঙ্গে যোগেনও যাহা শুনিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কেবলই শিহরিয়া উঠিত,—তাহা ঐ নির্জ্জন শ্মশান ঘাট হইতে প্রতিধ্বনিত, বাঁশীর সুরে ব্যর্থ একটা জীবনের এক অতি মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ!……

———

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(১২)

মার অনুমান মিথ্যা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে বাবা ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে নয়।

বাবার প্রবল জ্বর দেখিয়া কাছারীর নায়েব মহাশয় পাল্কী ভাড়া করিয়া বাবাকে গৃহে পাঠাইয়াছেন। যে পয়সার অভাবে রুগ্ন দুর্ব্বল শরীর লইয়া কত কষ্টে কত দুঃখে বাবা পদব্রজে কাছারীতে গিয়াছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে বাবাকে নামাইয়া দিয়া পাল্কী ভাড়া নগদ পাঁচটী টাকা লইয়া পাল্কী বাহকরা প্রস্থান করিল।

মা বেনুকে গোপাল ডাক্তারের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বারান্দায় তোলা-উনুনে বাবার জন্য দুধ জ্বাল দিতে লাগিলেন। আমি বাবার শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পর বাবা আরক্ত চক্ষু মেলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে জল চাহিলেন।

শীতল জল পানান্তে বিহ্বল দৃষ্টিটা আমার পানে নিবদ্ধ করিয়া বিজড়িতস্বরে বলিলেন "কে গা, তুমি কে ?"

এ প্রশ্নে আমার বক্ষ স্পন্দিত হইল। চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমি বাবার মুখের উপর আনত হইয়া কহিলাম, "আমি আপনার কাছে বসে রয়েছি বাবা, আমি কনক।"

বাবা সখেদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কনক না রাক্ষুসী, সরে যা আমার কাছ থেকে, যা। আর আসিস না, আমায় একটু শান্তি দে।" উত্তেজনার আতিশয্যে বাবা আমাকে শয্যাপাশ হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া আমি মেজেয় বসিয়া পড়িলাম।

বাবার চীৎকারে মা দুধ ফেলিয়া ক্ষিপ্রপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘরের সব কটা দরজা জানলা খুলিয়া দিলেন। পরে ঠাণ্ডা জল দিয়া বাবার মাথাটা উত্তমরূপে ধুইয়া দিতে দিতে কহিলেন "জ্বরটা বড্ড বেড়েছে বলে এম্‌নি করেছেন কনক। কাহারদের কাছে শুনলাম এখান থেকে যেয়েই সন্ধ্যাবেলা জ্বর এসেছিল, দুদিন কিছু খান নি ; খালি পেটে আরও মাথা গরম হয়েছে। রোগীর প্রলাপ তুই মনে দুঃখ করিস্‌ না মা ; উঠে আয়, মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বেশ করে জোরে জোরে একটু হাওয়া কর। আমি দুধটুকু জুরিয়ে নিয়ে আসি।"

উচ্ছ্বসিত অশ্রু অতিকষ্টে সংযত করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলাম "আমিই দুধ জুরিয়ে আনছি মা, তুমি এখানে থাক, হয় তো আমাকে দেখে আবার বাবার মাথা গরম হবে।"

"একবার হয়েছে বলে কি বারবারই হবে," বলিয়া মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মার হাতে দুধের বাটীটা দিয়া নির্জ্জনে যাইতেই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া গেল। যাঁহার নিকট রোগে, শোকে, দুঃখে, সুখে, হাসিতে অশ্রুতে কেবল অনির্ব্বচনীয় স্নেহে, উচ্ছল বাৎসল্যে অভিষিক্ত হইয়া শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করিয়াছি, আজ সেই স্নেহময় পিতার এ সত্য প্রলাপে আমার হৃদয়টি যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিশয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

বাবার প্রতি অভিমান হইল না, বাবার অসীম স্নেহে একটু সংশয়ও আসিল না, কিন্তু নিজের প্রতি ঘৃণায় বিরাগে চিত্তটি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আমার নিমিত্ত—যে অভাগ্য কন্যার নিমিত্ত পিতা বিপদগ্রস্ত, রোগশয্যায় শায়িত, তাঁহার প্রতি কি আমার কোনই কর্ত্তব্য নাই ? শুধু সুখ লইতে, শান্তি লইতে, আহার লইতে, আরাম লইতেই কি মেয়ের জন্ম ? পিতা আদর দিবেন, সোহাগ দিবেন, বসন দিবেন, ভূষণ দিবেন,

পথের কাঙ্গাল হইয়া, নিজের ভিটেমাটী উচ্ছন্ন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার পাথেয় দিবেন, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবেন—প্রতিদানে কন্যা তাঁহাকে কি দিবে ? তাহার কি দিবার কিছুই নাই ? যিনি জন্মদাতা, শাস্ত্রকারগণ যাঁহাকে ধর্ম্ম, স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কি মেয়ের এতটুকু কর্ত্তব্য নাই ?

নারীর প্রাণ যে পরের জন্য চির-উৎসর্গিত করা। স্বজনের স্নেহের সলিলে স্নাত হইয়া দিব্য আরামে হাসিয়া খেলিয়া নিজেকে লইয়া মগ্ন থাকাই তো নারী জীবনের সার্থকতা নয়। এ সংসার-সংগ্রামে তাহাকে জয়ী হইতে হইলে পরের জন্য আত্ম বিসর্জ্জনের মন্ত্র শিখিতে হইবে। একথা এতদিন কেমন করিয়া ভুলিয়াছিলাম ? প্রতিকার ত আমারই হস্তে, অমানিশার অন্ধকারে বিদ্যুৎস্ফুরনের মত আজ যাহা অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে—আশ্চর্য্যের বিষয় এতদিন তাহা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইয়া ছিলাম ! আজ সত্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতে হইবে—লজ্জা করিলে ত চলিবে না। এটা লজ্জা দ্বিধার সময় নয়।

ঘটীর জলে চোখ মুখ ধুইয়া বাবার কক্ষে ঢুকিতেই মা কহিলেন "গোপাল ডাক্তার এল না কনক, বেনুর কাছে ব'লে দিয়েছে তার শরীর ভাল নয়, সে আজ বেরুতে পারবে না। গাঁয়ের ভেতর দুটি ডাক্তার, দুটিই চৌধুরীর অনুগত। তার ভয়ে, তার শাসনে কখনো তারা এ বাড়ীতে আসবে না, অথচ এমন বেহুস জ্বর—কাউকে না ডেকে, কাউকে না দেখিয়ে কেমন করেই বা নিশ্চিন্ত থাকি।"

"ক্যাবলাকে পাঠিয়ে বিজনপুর থেকে ডাক্তার আনলে হয় না মা ? ক্যাবলা এখন গেলে দুপুরের ভেতর ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসবে। বিজনপুরের ডাক্তার এ গাঁয়ের ডাক্তারদের থেকে ঢের ভাল, ব্যারামের অবস্থা চট করে বুঝতে পারবে।"

মা প্রত্যুত্তর করিলেন "সে তো বুঝলাম কিন্তু টাকা কোথায় মা ? বিজনপুরের ডাক্তার দশ টাকার কমে যে গাঁয়ের বাইরে যান না ; আমার দশ টাকা সম্বলের ভেতর পাঁচ টাকা পাল্কী ভাড়াতেই গেছে, আর পাঁচ টাকা আছে, তাতে কি হবে ?"

মার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। সেই সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সাধ্বীর গরিমা-দীপ্ত মুখখানিতে ক্ষণকালের জন্য অসহায়া বালিকার কাতরতা, ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য ! বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের চঞ্চলতা আবেগ নিমেষের মধ্যে প্রশমিত হইল—শান্তকণ্ঠে বলিলেন "তুই ব্যস্ত হস্‌না কনক, যা করতে হয় করা যাবে। আজকের দিনটা আমি দেখবো, রাতের মধ্যে জ্বর না ছাড়লে কাল সকাল বেলা বিজনপুর থেকে ডাক্তার আনানো যাবে। টাকার যোগাড়—তা আমি ঠিক ক'রে নেব।"

মা যে আজিকার দিনের মধ্যে কোথা হইতে, কি উপায়ে টাকার যোগাড় করিবেন সেটা জানিতে ইচ্ছা হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া যে কথা ব্যক্ত করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম তাহা গোলমাল হইয়া গেল, কিন্তু আমার সংকল্প প্রতিহত হইল না, সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

(১৩)

সুযোগ মিলিয়া গেল। বৈকালে বাবার জ্বর দুই ডিগ্রি নামিয়া মাথার যন্ত্রণা কমিয়া আসিল, বাবা একটু গরম দুধ পান করিয়া নিরুপদ্রবে প্রশান্ত বদনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেনু বাবার বিছানার কাছে বসিয়া রাজ্যের পুঁতি ও রাংতা সংযোগে পুতুলের পূজার গহনা গড়িতে মনোনিবেশ করিল।

আমি কোনের দিকে বসিয়া বাবার জন্য আনীত ঠোঙ্গার কিস্‌মিস্‌গুলি কুলায় ঢালিয়া বোঁটা ছাড়াইতে লইয়াছিলাম, এমন সময় মা আমার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার সিক্ত-কেশ চিরিয়া চিরিয়া শুকাইয়া দিতে লাগিলেন।

আমি আরব্ধ কাজ হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিলাম "বাবার জ্বর কমের মুখে একটা ওষুধ পড়লে জ্বরটা আর রাতে বাড়তো না মা ; বাবা ক্রমেই কাহিল হ'য়ে পড়ছেন, আজ ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ দিলেই ভাল হ'ত। যদি গোপাল ডাক্তারকে ওই—তিনি বলে দেন তা'হলেই তো আগে যেমন ছিল সব তেমনি হয়ে যায় মা। বাবা চাকুরীও ফিরে পান, আমাদেরও সব বিপদ কেটে যায়।"

মা উৎসুকনেত্রে আমার পানে প্রসারিত করিয়া স্নেহার্দ্র-

কণ্ঠে বলিলেন "পাগলের মত কি বলছিস্ কনক! তোর কথার অর্থই বুঝতে পারছি না। কিসের বিপদ, কেমন করে কেটে যাবে? গোপাল ডাক্তারকে আমাদের বাড়ী আস্‌তে কে বলে দেবে? আর কেমন করেই বা আগে যেমন ছিলাম তেমনি হ'য়ে যাব? ওঁর অসুখের কথা বেশ করে ভাবতে ভাবতে তোরও মাথা গরম হয়েছে! এত ভাবিস নে মা, কাল ভোরেই আমি বিজনপুর থেকে ডাক্তার আনাবো, আমাদের টাকা না থাক্‌লেও ঘরে জিনিষপত্র আছে, সেই সব বিক্রী ক'রে ওঁর চিকিৎসা করাবো, তোর ভয় নেই।"

মার স্নেহের স্পর্শে, স্নেহ সম্বোধনে আমার হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত হইল। আজ সমস্ত দিবাব্যাপী অন্তরের নিভৃত স্থলে যে গোপন কথাটি রাখিয়াছিলাম তাহা আর লুক্কায়িত রহিল না। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে সংসার ভুলিয়া, আমার বয়সের অহঙ্কার ভুলিয়া, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া মার কোলে মুখ লুকাইয়া অবিভূতের মত কহিলাম—"আমি চৌধুরীর কথা বলছিলাম মা। তাঁর প্রস্তাবে তোমরা রাজী হও, আজই কৈবর্ত্ত বৌকে দিয়ে ব'লে পাঠাও। তা হলেই গোপাল ডাক্তার বাবাকে দেখে যাবেন। আমাদের সব দুঃখ দূর হ'বে। আমি মরবো না, আমার কষ্ট হ'বে না, আমি সুখী হব—বড্ড সুখী হব মা।"

মুখস্থ পাঠের মত একনিঃশ্বাসে আমার যাহা বলিবার বলিয়া, লজ্জায় আমি মার দিকে মুখ তুলিতে পারিলাম না। মার কোলে মাথা গুঁজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পর অনুমানে অনুভব করিলাম মার চক্ষুপ্রান্ত বহিয়া, জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে! জানি সে বেদনা-কাতর অশ্রু আমার বাক্যাঘাত জনিত নয়—তাহা বিশ্বপিতার চরণে দীনের নিবেদন মাত্র।

অনেকক্ষণ পরে মা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন "কনক ওঠো, মুখ তোল, আমার কাছে তোমার লজ্জা করতে হবে না। যে মেয়ে মা-বাপকে সুখী করতে, শান্তি দিতে এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে ভগবান তাকে কখ্‌খনো অসুখী করেন না। আজ তুমি যেমন তোমার মাতৃ-পিতৃ-ভক্তির পরিচয় দিলে তেমনি তাঁরাও যেন একদিন তোমার এত ত্যাগের পুরস্কার দিতে পারেন।" বলিতে বলিতে মা আমার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আমার মস্তকে ডান হাতখান রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইলাম।

বেনু ডাকিল "দিদি, বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।"

মা উঠিয়া বাবার কাছে গেলেন, আমি মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাবার শয্যা পার্শ্বে উপনীত হইয়া বাবার পদতলে বসিলাম। সম্মুখে যাইতে যেন কেমন একটা কুণ্ঠা বোধ হইল, দুর্নীবার উত্তেনায় আজ মার কাছে নির্লজ্জের উক্তি করিয়া আমার অন্তঃকরণ সঙ্কোচে ম্রিয়মান হইয়াছিল। লজ্জা সঙ্কোচের বোঝায় কুণ্ঠিত হইয়া আমি নিত্যকার মত স্বাভাবিক ভাবে বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না।

বাবা আমাকে না দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কনক কোথায়? আজ কনককে একটীবারও দেখতে পাচ্ছি না।"

মা বিছানার উপর হইতে পাখা খানা তুলিয়া লইয়া উত্তর করিলেন "কনক তোমার পায়ের কাছে বসে রয়েছে।"

"সমস্ত দিন কি পায়ের কাছেই ছিল? পায়ের কাছে কেন?"

"সকালে তোমার জ্বরটা খুব বেড়েছিল ব'লে জ্বরের ঝোঁকে তুমি কনককে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিলে, তাই ভয়ে ও সমস্ত দিন সামনে আসেনি।"

বাবা পায়ের কাছে হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া আমাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। গভীর স্নেহের সহিত আমার মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া আর্দ্র করুণস্বরে কহিলেন "জ্বরে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আমি তোকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম মা, তাই মনের দুঃখে ঐখানে বসেছিলি? রোগা মানুষের কথায় কি দুঃখ করতে হয়, আমি যে তোর রোগা ছেলে কনক।"

আজ প্রভাত হইতে আমার অন্তরাকাশে যে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, সেই পুঞ্জীভূত মেঘ হইতে অকস্মাৎ শ্রাবণের ঘন বারিধারার ন্যায় বর্ষণ আরম্ভ হইল। বাবার

মমতাভরা বক্ষ অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া আমি শান্ত হইলাম। বহুকাল পরে একটা সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার তাপ-দগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

(১৪)

বিজনপুরের ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বাবা সারিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা ব্যাপারে আমাদের ভাঙ্গা সংসারটি একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। ঔষধ এবং পথ্যে গৃহের নিত্য ব্যবহার্য্য বাসন ও তৈজসপত্র নিঃশেষিত হইয়াও বাবা কার্য্যক্ষম হইতে পারিলেন না। একে নিদারুণ চিন্তাভারে প্রপীড়িত, তাহার পর আবার অর্থাভাব ও কঠিন রোগে বাবা বাহ্যিক যেমন শক্তিহীন হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় তদপেক্ষা অধিক ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। কোন সহায় নাই, সম্পদ নাই, আশা নাই, উৎসাহ নাই, চারিদিকেই নিরাশার ছবি, চারিদিকেই অন্ধকার!

আমাদের মাথার উপর দিয়া দুঃখের একটা ঝড় বহিয়া গেলেও এ ঝটিকায় কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না। সংসার পূর্ব্বেও যেমন বাঁধা নিয়মে চলিত এখনও তেমনি চলিতেছিল। সেই পূর্ব্ব নিয়মে নিদাঘে তাপিতা ধরণী বর্ষার শীতল ধারায় স্নাত হইয়া শরতের সোণার আলোয় হাসিতে লাগিল। আসন্নপূজার হর্ষকোলাহলে প্রতিগৃহ মুখরিত হইল। দূর প্রবাস হইতে প্রবাসীগণ শান্তির আলয়ে সুখের কুটীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের গৃহে কেহ আসিল না, কেহ একবার উঁকি মারিয়া দেখিল না, একটি কুশল প্রশ্নও করিল না।

শরতের এই সজীবতার মধ্যে প্রাণ কেন যে একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, একটু মিষ্ট বাক্যের প্রত্যাশায় ব্যগ্র হইয়া উঠে কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারি না।

আজকাল কাজকর্ম্মের অবকাশে গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের বাড়ীর পশ্চাৎভাগে ঘন বনবীথির ছায়া শীতল তলে বসিয়া পরপারের বনরাজির পানে চাহিয়া আমার অনেক সময় কাটিয়া যায়।

ঘরের কাজ সারিয়া আজও নিত্যকার মত আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়াছিলাম।

নদীর উপকূলে সমস্ত দিন ধরিয়া পরিশ্রান্ত বন্য হংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্য্যাস্তের দীপ্তির মধ্য দিয়া নিজেদের নিভৃত শান্তির নীড়ে ফিরিতেছিল। কাকের কলরব অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার ক্ষীণ স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইতে না মিলাইতেই নবোদিত চাঁদের আলোকে কঠিন জগৎ যেন বিগলিত হইয়া আসিল। আমি উঠিব উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে যেন আমার চোখ টিপিয়া ধরিল।

এ কৌতুক, এ স্পর্শ আমার নিকট চির পুরাতন, চির মধুময়; স্পর্শকারিণীকে চিনিতে আমার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।

ক্ষণকাল পূর্ব্বে বেনুর মুখে ইহার আগমন সংবাদে আমার হতাশা-পীড়িত আঁধার হৃদয়ে প্রীতির দীপালোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

সুদীর্ঘ একটি বছর পর সকৌতুকে আমি নীহারের হস্ত ধরিয়া তাহাকে নীরবে আকর্ষণ করিয়া হাসিমুখে কহিলাম "কোন্ দুপুরে আসা হ'য়েছে, এতক্ষণে আমায় দেখা দেবার সময় হ'ল বুঝি? এ যেন পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা, সমস্ত দিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতক্ষণে দয়া করতে এলেন!"

নীহার আমার পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া আমার অবেণীবদ্ধ চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে উত্তর করিল "কার যে দয়ার অভাব তা খুব বোঝা গেল ভাই। ঘণ্টাখানেক হ'ল এসে কাকীমার সাথে গল্পই করচি, মশায়ের চুলের টিকিটিরও দেখা নেই। আজকাল দেখছি বেশ একটু কাব্য রোগে ধরেছে। সময় সন্ধ্যা, সামনে নদী, আকাশে পাখীর ঝাঁক, বাগানে শিউলির গন্ধ—"

আমি নীহারের ব্যঙ্গ স্রোতে বাধা দিয়া কহিলাম "আর কবিতা আওড়াতে হ'বে না, খুব হয়েছে, কাব্য রোগে যে কা'কে ধরেছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ভাই, এখন ওসব বাজে কথা রেখে কাজের কথা হোক। তুই এত রোগা হ'য়ে গেছিস কেন নীহার? কোন অসুখ বিসুখ হয় নি তো? তোর ছেলে কেমন হয়েছে রে? তাকে আনলি না কেন? আমরা একঘরে হ'য়েছি, আমাদের জাত গেছে—তাই বুঝি এ বাড়ীতে ছেলে আনতে সাহস হয় নি?"

"আমার ছেলে ছোট্ট হলেও ক্ষুদ্র নয় কণা, এত সহজে তার জাত যায় না। এতকাল পরে তোর কাছে এসেছি, ফিরতে রাত হ'বে বলে মা খোকাকে আনতে দিলেন না। তুই তো বাড়ীর বার হবি না, ছেলে দেখাতে ছেলে নিয়ে একদিন আমার আসতে হবে। কাকীমার কাছে এতক্ষণ তোদের অনেক কথা শুনছিলাম, কিন্তু চৌধুরীর এত আক্রোশের কারণ ভাল ক'রে বুঝতে পাচ্ছি না ভাই! মানুষ যে মানুষের ওপর এত বিমুখ হয় কেন তা আমি ভেবেই পাই না।" বলিয়া নীহার আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এই কোমল হস্তস্পর্শ নীরব প্রশ্নের মত আমার গোপন বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, একটু একটু করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নীহারের কাছে ব্যক্ত করিয়া আজ একটু শান্তি পাইলাম।

নীহার ধীর কণ্ঠে উত্তর করিল "চৌধুরীর এমন প্রবৃত্তি হ'ল কেন? বুড়ো বয়সে মানুষের এত কুপ্রবৃত্তি হয়, ছিঃ! তুই সেদিনকার কথা কাকীমাকে না বলে অন্যায় ক'রেছিস কণা, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে, কিন্তু চৌধুরী যদি বাইরে এত আড়ম্বর না করে, অতর্কিতভাবে তোকে বেশী রকম অপমান করতে চেষ্টা করত, তা হলেই মুস্কিল হ'ত।"

"মুস্কিল কি নীহার? চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে দিতে আমি নিজমুখেই মাকে বলেছিলাম। বাবা মা সম্মত হ'লে আমি জুড়াতাম।"

নীহার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে আমার পানে চাহিয়া বলিল "তুই কি কথা বলছিস কণা, চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ের কথা কাকীমাকে ব'লতে পেরেছিলি? যত সহজ মনে করেছিস্ হিন্দুর বিয়ে তত সোজা নয় কণা, বিয়ের প্রধান উপাদান পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা। যাকে এত মনে প্রাণে ঘৃণা করিস্ তার সাথে বিয়ে হয়?—বাইরে থেকে অনেক বিষয় ভাবা যায় বটে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নিষ্ঠার তেজ ম্লান হ'য়ে আসে, তখন আর নিজেকে বঞ্চনা করা যায় না।"

"যাকে ঘৃণা করি না, ভক্তি করি, ভালবাসি, অথচ কিছুদিন পর সে যদি ভক্তি ভালবাসার উপযুক্ত না থাকে তখনও শতকরা পঞ্চাশটি মেয়ে তেমনি স্বামীরই ঘর করে থাকে, সেটা যদি সম্ভব হয়, এটাই হবে না কেন নীহার?"

নীহার স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "বিয়ের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়া একান্ত আপনার ভেবে যাকে ভালবাসা যায়, যার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে, পরে সে ভালবাসার অযোগ্য হলেও ভালবাসা তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না ভাই, ভ্রমর গোবিন্দলালের ওপর অভিমান করেছিল, কিন্তু ভালবাসা তো ফিরিয়ে নিতে পেরেছিল না।"

আমি কৌতুহলের বশীভূত হইয়া অকস্মাৎ নীহারের সুকোমল হৃদয়বীণার তারে একটা ঘা দিয়া ফেলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম "লোকের মুখে শুনি উপেন বাবু তোর ওপর বড় অত্যাচার করেন, তুই আগেও তাঁকে যেমন ভালবাস্‌তিস্ এখনও কি তেমনি বাসিস্ নীহার?"

নীহারের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি সহসা অতি বিবর্ণ হইয়া গেল; সে অত্যন্ত করুণকণ্ঠে উত্তর করিল "তিনি আমার ওপর অত্যাচার করেন না কণা, ওটা তোদের ভুল ধারণা। তিনি নিজের প্রতি নিজেই অত্যাচার করেন, তাইতে আমার বড় দুঃখ হয়, ভয় হয়, নইলে আমার মত সুখী কে? ভালবাসার কথা বলছিস্—যখন তোর ভালবাসার বস্তু হ'বে, তখন আমার ভালবাসার মর্ম্ম বুঝতে পারবি।" বলিয়া নীহার চুপ করিল।

নীহার সুখী, তাহার সুখের বার্ত্তা আমাদের অবিদিত ছিল না। দুঃখের সমুদ্রে ডুবিয়া রাতদিন মানসিক দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া যে শান্ত অবিচলিত মুখে নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, সে প্রকৃতপক্ষেই সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী। আমিও মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সামান্য কৌতুকের বশে নীহারের হাস্যোদ্দীপ্ত মুখখানিকে মলিন করিয়া দিলাম বলিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। এই মেয়েটীর ব্যথার স্থান আমার বিলক্ষণ রূপেই জানা ছিল। সে স্বামীর এতটুকু সুনামের জন্য, সম্মানের জন্য হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও বুঝি কুণ্ঠিত হইত না। স্বামীর আলোচনায়, স্বামীর প্রসঙ্গে স্বামীর বিরুদ্ধে পাছে কোন অপ্রিয় কথায় যোগ দিতে হয় আশঙ্কায় তাহার অতি প্রিয় প্রসঙ্গ হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিত। তাহার গভীর ভালবাসার মধ্যে একটা কাতর সঙ্কোচ ছিল। সে সহজ ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না, অন্তঃসলিলা ফল্গুর নির্ম্মল প্রবাহের মত তাহার ভালবাসা গোপনে, লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

আমি সেটা উপলব্ধি করিয়া উপেন বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে কখনও তাহাকে কোন প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিতাম না। কিন্তু আজ পুরাতন প্রথা বিস্মৃত হইয়া নিজের অন্যায় আচরণের জন্য নিজে কম দুঃখিত হইলাম না। যাহা ব্যক্ত করিয়াছি সেইটুকু চাপা দিবার মানসেই আমাকে অন্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল।

দুই একটি সাংসারিক প্রশ্ন করিয়া আমি বলিলাম "কতদিনের ছুটি পেয়েছিস্ ভাই? এবার অনেককাল পরে

এসেছিস্, কিছুদিন থাক্‌বি তো ? অন্ততঃ অগ্রাণ মাস পর্য্যন্ত তোর থাকতেই হবে।"

নীহার ম্লান হাসির সহিত কহিল—"এতদিন কি থাকা যায় ভাই! শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর আমরা একেবারেই একলা হয়ে পড়েছি, আপনার বলতে সংসারে আরতো কেউ নেই, তাঁকে খালি বাড়ী, খালি ঘরে রেখে আমার কি স্বস্তি থাকে কণা ? পূজার কটা দিন পরেই আমাকে যেতে হবে।"

"যেতে যে হবে সে তো বুঝলাম কিন্তু আমার স্বয়ম্বর দেখে যাবি না ? আশ্বিন কার্ত্তিকে হিন্দুর বিয়ে নিষিদ্ধ, অগ্রাণের আগে তো স্বয়ম্বর হবে না।"

মেঘমুক্ত চাঁদের মত অকস্মাৎ প্রসন্ন হাসিতে নীহারের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "স্বয়ম্বরও ঠিক হয়ে গেছে! কোথায় কার সঙ্গে শুনতে পাব কি ?"

আমি নীহারের হাসিমুখ মলিন করিয়া দিয়াছিলাম, আমিই আবার সেই মুখ অধিকতর প্রফুল্ল করিবার চেষ্টায় কহিলাম "তোকে তা বলব কেন ? তুই যদি ভাগ নিতে চাস ?"

"ওমা বলে কি! একি তোর বাগানের শশা, না বাতাবী যে আমি ভাগ ক'রে খাব ? সত্যি বল না কণা কে তোকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছে ?"

"কেউ চায়নি, আমিই চেয়েছি নীহার।"

নীহার আমার মুখের পানে চাচ্ছিল। আমি পায়ের কাছ হইতে শুক্‌নো মাটির একটা ঢিল লইয়া ছুঁড়িয়া কহিলাম "ঐ নদীর অথই জলে আমার স্বয়ম্বর হ'বে নীহার, লোকালয় থেকে ও জায়গা অনেক নিরাপদ—অনেক শীতল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী বেশান্ত

"কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সকল দলের কংগ্রেসে যোগদান সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু ঐ সব দলেও এরূপ স্বদেশপ্রেমিক আছেন যাঁহারা কংগ্রেসের কর্ম্মীদের মতই দেশভক্ত ও ভারতের সুসন্তান। আমি প্রত্যহ সকালে আধঘণ্টা করিয়া সূতা কাটি কিন্তু মাসিক দুই হাজার গজ সূতা কাটিতে পারি না। অপরের কর্ত্তিত সূতা ক্রয় করিয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি আমার নাই। সূতা দেওয়া বাধ্যতামূলক না করিতে আমি অনুরোধ করি। কংগ্রেসের নামে কেবল স্বরাজ্য দলই ব্যবস্থাপক সভায় যাইবে কেন ? সকল দলের সম্মিলন না হইলে কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া খ্যাত হইতে পারে না।"

নারী-প্রকৃতি

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]   ১১ই মাঘ শনিবার, ১৩৩১।   [১১শ সপ্তাহ

বিলাতী নাচের নমুনা

উভয় প্রান্তের মিলন।

মিস্ লরী ডি ভাইন্ একজন বিদুষী আমেরিকান্ নৃত্য-পটিয়সী মহিলা।

মিস্ লরী ডি ভাইন্।

ইঁহার অঙ্গভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যে মানুষ ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে।

মিস্ মার্জোরী গর্ডন অপরূপ পোষাক পরিয়া অপরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছেন।

এই পোষাকটি তাঁহার জন্য বিশেষ আদেশ দ্বারা (special order) তৈরি করা হইয়াছে।

মিস্ হেদার থ্যাচার।

বাংলা দেশে "আলিবাবা" নৃত্যগীতের জন্ত বিখ্যাত। আবদাল্লা ও মর্জ্জিনার নাচ দেখিবার জন্ত দর্শকগণের ভীড় অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। বিলাতে "প্রিমরোজ" এমন একটী নৃত্য-গীতবহুল ছোট গীতিনাট্য। এই নাটকে "পিংকী পীচ" একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা। ক্ষুদ্র হইলেও মিস্ হেদার থ্যাচার নামক জনৈকা অভিনেত্রী এই ভূমিকায় তাঁহার অভিনব লাস্য ভঙ্গিদ্বারা দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

মিস্ এ্যানষ্ঠী স্পিন্‌লী।

"কোকৌলি" একটী বালিকার নাম। পিতা কোটিপতি। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে থাকিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পিতার নিকটই কোকৌলি স্নেহে যত্নে প্রতিপালিত হইতে থাকে। তারপর একদিন পিতার মৃত্যু হয়। কোকৌলিকে তাঁহার স্বদেশে (home—France) পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য সেখানে "finished" and "polished"—এবং চাই কি—"married" হইয়া আসিতে পারিলেও মন্দ হয় না।

এই "কোকৌলি"র ভূমিকায় কুমারী স্পিন্‌লী গ্রীষ্মদেশের কন্যা-রূপে স্বল্প বেশভূষায় সহজ নৃত্য-ভঙ্গিমায় স্মিত-আস্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

মিস্ ডোরোথি ডিক্সন্।

আহামরি নাচ!

মিস্ ডোরোথি ডিক্সন্ এই অপরূপ নৃত্যভঙ্গিতে বিলাতে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহা নাকি খুব একটী "effective dance!"

মিস্ ডোরোথি ডিক্‌সন্।

মিস্ ডোরোথি ডিক্‌সন্ এখানে নায়িকার অভিনয় করিতেছেন।

এটা ফুটবল খেলা, না কুস্তীর মারপ্যাচ—কে জানে!

বল্ খেলা।

ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের রমণীগণ শুধু গৃহস্থালীর কাজ, সন্তান পালন ও উপন্যাস পাঠ করিয়াই সময় সুখে কাটিয়া গেল বলিয়া মনে করেন না। যাঁহারা জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত

"আমরা নাচি সবে তালে তালে।"

পরের ঘরে যাইয়া চাকরী করেন তাঁহারাও অবসর সময়ে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানের জন্য নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে যোগদান করিয়া থাকেন।

উইল

[শ্রীমতী গিরিবালা দেবী চট্টোপাধ্যায়]

(সচিত্র শিশির গল্প-প্রতিযোগিতায় কার্ত্তিকের পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

হরিচরণের দাদা সাধুচরণের বড় কষ্টের সংসার; চল্লিশটী টাকা মাত্র বেতনে, পরিবার প্রতিপালন করা আজকাল ভাবনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর হরিচরণ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া যখন ঘরে আসিয়া বসিল, তখন সাধুচরণ ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার! একেই সে সংসারের খরচ-পত্রে সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্থ, তাহার উপর এক বেকার ভাই, বড়ই প্রাণে বাজিল। সমস্ত আশা ভরসা যেন তাহার নির্ম্মূল হইয়া গেল!

পত্নী নৃত্যকালী গোপনে সৎপরামর্শ দিয়াও যখন বুঝিল, হরিচরণ এই ক্ষুদ্র সংসারেরই একজন, পৃথক হইবার নহে, তখন এই সংসারের মঙ্গল চিন্তার গুরুভারে তাহার হিষ্টিরিয়া আসিয়া দেখা দিল। দু'চারদিন সময়ে আফিস যাইতে না পারিয়া সাধুচরণ আফিসের বড় সাহেবের মিষ্ট-মধুর বাক্য-সুধায় উদর পূর্ণ করিয়া আসিল! সে বাক্য সাধুচরণের মত অভাগাদের শীঘ্রই হজম হইয়া যায়, ভুলিয়াও ভুলিতে পারে না!

হরিচরণ আজন্ম কষ্টের ভিতর দিয়াই প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে, শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় দাদার এই বহুকষ্টের অন্ন তাহাকে হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু বধূ নৃত্যকালীর নির্ম্মম বাক্য তাহার বাড়া ভাতে বালির ন্যায় বড়ই প্রাণে বাজিত। হরিচরণ এ কথা তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে গোপন রাখিয়া শুধু যাতনা অনুভব করিত, প্রকাশ করিত না। দু'একদিন ভাত না খাইয়াও স্কুলে গিয়াছে, তাহার দাদা জানিতেও পারে নাই। এই দুঃখের অনুলোম তাহার হৃদয়ে করুণ সাহানার সুরের ন্যায় বাজিত সে চাপা দিবার চেষ্টা করিত, তাহার দাদার শিশু পুত্রকন্যাদের কোলে পিঠে লইয়া এই নীরব যাতনা সে দাবিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইত। একদিন বালকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

বউ-দিদি, আজ স্কুলের মাইনে দিতে হবে—

আমার কাছে তো টাকার বাক্স নাই, যে খুলে বের ক'রে দেবো—

আজ না দিলে যে নাম কাটা যাবে—

তা কি করবো। এ মাসে আমাদেরই প্রায় এক'শ টাকা ধার হয়েছে—এর উপর তোমার মাইনে—তুমি ত আর খোকাটী নও।

হরিচরণ বুঝিল, তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। সেই অবধি তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। সাধুচরণ সমস্তই বুঝিল, একবার জিজ্ঞাসা করিল, কেন স্কুলে যাও নাই, তাহার উত্তরে ছোট ভাই হরিচরণ বলিল, দাদা নাম কাটা গিয়াছে!

সাধুচরণের মানসিক দুর্ব্বলতা বিলক্ষণ ছিল, সেই দোষে হরিচরণের আর পড়িবার ব্যবস্থা হইল না। হরিচরণ বালক হইলেও তাহার মনের তেজ নিতান্ত কম ছিল না। সে এ সংসারে আর তাহার দাদার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে না, প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু তাহার মত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এ সংসারে কি করিবে?

দিবসের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া সমস্ত আপিসে ঘুরিল, এণ্ট্রান্স পাশ না করিলে চাকরী হয় না এই কথা শুনিয়া সে হতাশ হইয়া এক মাঠের ধারে বসিয়া পড়িল। তখন বৈকাল বেলা, পশ্চিম সূর্য্যের রক্তকিরণ দিবসের ম্লান

মুখে পড়িয়া মাঠটী সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই মাঠে তখন মহকুমার সাহেবেরা টেনিস্ খেলিতেছিল—অনতিদূরে সাঁওতাল পল্লী, মাঝে মাঝে লাল মাটীর উপর বিচ্ছিন্ন বনরাজি, শাল মহুয়ার পত্রশাখার আচ্ছাদন। দু'একটী টেনিসের বল হরিচরণের কাছ দিয়া ছুটিয়া গেল, সে সেইগুলি কুড়াইয়া লইয়া চাপরাশির হাতে দিয়া আসিল; বালকের মন কি ভাবে কার্য্য করে, কে জানে!

কিছুক্ষণ পরে হরিচরণ দেখিতে পাইল, একজন কুলীসর্দ্দার একটী সাঁওতাল রমণীকে জোরপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে—তাহার অতি নিকটে-এই রমণীর আর্ত্তনাদ তাহার কানে গেল। উঠিয়া দেখিল সাঁওতাল রমণী বিপন্ন, তাহারই ন্যায় বিপন্ন। সমবেদনার করুণসুর তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে যেন বাজিয়া উঠিল—সে এই ভীমকায় সর্দ্দারের হাত হইতে কি করিয়া রমণীকে রক্ষা করিবে? একবার ভাবিল. রক্ষণেই সে পথিমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে আবার তাহার পায়ের নিকট দিয়া টেনিস বল ছুটিয়া গেল। এবার সে বলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সর্দ্দারকে বলিল—ছেড়ে দে, দেখছিস না সাহেব

সর্দ্দারের একটী প্রকাণ্ড চড় বালককে অভিভূত করিয়া দিল। এমন চড় সে মাষ্টারের নিকট কখনও খায় নাই! এমন সময়ে সাহেবের চাপরাশি বল আনিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, বালকের মুষ্ট্যাঘাতে এক কুলীর সর্দ্দার ভূলুণ্ঠিত! এক সাঁওতাল রমণী উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে।

সাহেব বল আনিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বালককে তিনি পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া সর্দ্দার কলাপাতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল—তিনি সর্দ্দারকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এই—

সর্দ্দার ভূমিতে নত হইয়া সেলাম করিয়া বলিল, হুজুর—তোম হামারা বল লিয়া?

এই অবসরে হরিচরণ বলটী সাহেবের হাতে তুলিয়া দিল। সর্দ্দার ভাবিল, বল চুরী আর এক অপরাধ ঘাড়ে পড়িয়াছে—সে তখন যুক্তকরে সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, হুজুর—

হাম হুজুর নাই মাঙ্গতা—হাম বল মাঙ্গতা থা।

এমন সময়ে সাঁওতাল পল্লী হইতে কতকগুলি সাঁওতাল ছুটিয়া আসিল।

সাহেব তখন বালককে লইয়া বাঙ্গলো অভিমুখে যাইতেছেন। সাঁওতালেরা সেই কুলী সর্দ্দারকে দেখিতে পাইয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল; চাপরাশি দেখিল, সর্দ্দার এ যাত্রা আর বাঁচে না! এসব কাণ্ড তাহার চক্ষে নূতন নহে, সুতরাং সে দার্শনিকের ন্যায় ধীর মন্থর গতিতে বাঙ্গলোতে চলিয়া গেল।

সাহেব হরিচরণের নিকট জবনের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া কেবল মাত্র বলিলেন "আচ্ছা"। তাহার পর হরিচরণকে আর কেহ দেখিল না।

সাধুচরণ রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত হরিচরণের দেখা না পাইয়া ভাবিত হইল। ভাবনাটা একেবারে যায় না, কারণ তাহারা এক মায়ের পেটের ভাই! আজকালকার বালকেরা ১৬ বৎসরের আগেই স্বাধীন হইয়া উঠে, হরিচরণের তো কথাই নাই, কারণ সে ১৮।১৯ বৎসরের ছোকরা। কোথাও যদি চলিয়া গিয়া থাকে!

সাধুচরণ দেখিল, পত্নী নৃত্যকালী তাহার খাবার ঢাকা দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন! আজ হরিচরণের খাবার রাখা হয় নাই, কেন অনর্থক বাজে খরচ! আজ নৃত্যকালী অনেক দিনের পর সুখে নিদ্রা যাইতেছে! এদৃশ্য দেখিয়া সাধুচরণ হয়তো ভাবিয়া থাকিবে, তাহার বিবাহ না করাই ছিল ভাল। বাঙ্গলার অর্দ্ধেক দুঃখ কমিয়া যাইত যদি সাধুচরণের মত অন্ন-কাঙ্গাল লোকেরা বিবাহ না করিত! কিন্তু বাঙ্গলার লোকেদের ধর্ম্ম ভয় বেশী, পাছে স্বর্গদ্বার অবরুদ্ধ হয়—বিবাহ করিবেই!

সেরাত্রে সাধুচরণবহুস্থান খুঁজিয়া সাঁওতাল পল্লীতে উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেখিল এক বৃদ্ধ সাঁওতাল দম্পতী তখনও চড়কা কাটিতেছে। এই রাত্রিকালে এক অপরিচিত লোককে দেখিয়া দুইটী কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল। সাধুচরণ প্রাণভয়ে ডাকিল, মাঝি, মাঝি—

মাঝির পরিচিত শীষ শুনিতে পাইয়া কুকুর দুটী নিবৃত্ত হইল। সাধুচরণ—তখন পথ শ্রান্ত, অবসন্ন প্রাণ, বিষণ্ণ হৃদয়। সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল।

মাঝি আসিয়া দেখে এক বাবু হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে— মাঝি অসভ্য হইলেও হৃদয় আছে, জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে রে বাবু ?

আমার ভাই কোথায় চলে গেছে মাঝি—

অবরুদ্ধ উৎস বেগে প্রবাহিত হইল। ভাই—পৃথক হইলেও অমঙ্গল চিন্তা তাদের হৃদয়ে প্রথমে আঘাত করে। হায়! হরিচরণের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাতের থালা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে! সে না হয় তাহার পাতের অন্ন হরিচরণকে পূর্ব্বের মত ভাগ করিয়া দিত, সে কেন চলিয়া গেল ?

সে তোর কেমন ভাই আছে রে বাবু, না ব'লে চলে গেছে!

তার কোন দোষ নাই মাঝি—এই বলিয়া সাধুচরণের কণ্ঠরুদ্ধ হইল!

তোদের সব ভাল, তোরা ভাই ভাই এক জায়গায় থাকতে পারিস্ না, এই যা দুঃখু—

এমন সময়ে সেই পূর্ব্ববর্ণিত সাঁওতাল রমণী—বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বলিল, বাবা, সাহেব আমাদের সব ডেকেছিল।

কেন রে বুড়ী ?

আসাম যাবি। সেই বাবু চলে গেছে!

"সেই বাবু" শুনিয়া সাধুচরণের হৃদয় কম্পিত হইল! শেষে কি পেটের ভাতের জন্য হরিচরণ কুলী চালান গেল!

সাধুচরণ আর থাকিতে না পারিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, সে কোন বাবু মাঝি ?

তার নাম কি রে বুড়ী ?

নাম তো জানি না বাবা, ছোকরা বয়েস আছে, চোকের ডগে দুটো কাঁচ আছে।

বল্ বুড়ী সে কোথায় গেছে ? সেই আমার ভাই—

তাতো জানিনা বাবু—বুড়ীর এই কথা শুনিয়া সাধু মাথায় হাত দিল। হায়! দুটী ভাতের জন্য আজ সে কোন্ দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে!

ভাবিস না রে বাবু, আমরা কাল সকলে মিলে খুঁজিয়ে দেখবো—আজ তুই এখানে থেকে যা, আমাদের ঘরে ভাল চিড়া গুড় দহি আছে, খেয়ে শুয়ে থাক্।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্রি বৃদ্ধের সহৃদয়তা যেন প্রতিধ্বনিত করিয়া সাধুচরণের জীবনে মহান্ সান্ত্বনার প্রতিচ্ছায়া আনিয়া দিল। ভগবান নিজের মঙ্গলময় ক্রোড় হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। সাধুচরণের জীবনের গুপ্ত মমতাগুলি যেন একদিনে সাঁওতালের কথায় জাগিয়া উঠিল। পত্নীর তপ্ত নিঃশ্বাসে সেগুলি যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, আজ আবার প্রাণে সরস হইয়া উঠিল—কিন্তু কোথায় সে ? কেন সে সেই মমতার প্রাণটীকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল ?

সাধুচরণ সেই রাত্রেই ফিরিয়া গেল। থালের ভাত শুষ্ক, তাহার প্রাণও শুষ্ক।

তাহার বড় মেয়েটী কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কাকা আসে নি ? সাধুচরণ শুষ্ককণ্ঠে "না" বলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল, নৃত্যকালী একবার পাশ ফিরিয়া শুইল মাত্র।

অবশিষ্ট রাত্রি সাধুচরণ বিনিদ্র অবস্থাতেই কাটাইল। ভাবনার কুল-কিনারা নাই—একটীর পর একটী চিন্তা, বায়স্কোপের ঘটনার ন্যায়, তাহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল—কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

পরদিন আফিসের বড় সাহেবের কাছে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করায় সাহেব দয়াপরবশ হইয়া তাহার ভাইকে খুঁজিবার জন্য সাধুচরণকে তিনমাস বিনা বেতনে ছুটী দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রভুর কি দয়া!

এই তিন মাস তাহারা কি খাইবে ? একজন তো তাহার সংসারের কমিয়া গিয়াছে, তবে আর ভয় কি! ছুটী লইয়া সে কি করিবে ? হরিচরণকে খুঁজিতে যাইবে ? কোথায় সে ?

তাহার পরদিন সাধু তাহার স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতিকে শ্বশুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। বৃদ্ধ শ্বশুর অকালে বজ্রপাতের ন্যায় এই হঠাৎ খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় জামাইএর মঙ্গল কামনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না! এমন পিতার এমন কন্যা না হইলে সুশোভন হইবে কেন ?

সাধুর শ্বশুর পেনসনার কোন রকমে চলে। তিনি পেন্‌সন পাইয়াই জামাইর তত্ত্ব ইত্যাদি বাজে খরচ বন্ধ

করিয়াছিলেন--কিন্তু আজ তাহার গোনাগুন্‌তি টাকার উপর এই বাজে খরচ চলিবে কিরূপে? সাধুচরণ নিতান্তই অসাধুর মত কার্য্য করিয়াছে!

পত্নী নৃত্যকালী তাহার পিতাকে গোপনে বলিয়াছিল, ভয় কি বাবা, আমার গহনা আছে। তাহার বৃদ্ধ পিতার হাসি তখন মেঘের কোলে চন্দ্ররেখার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

নৃত্যকালী একবার মাত্র স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হ্যাগো ক'মাসের ছুটী হলো? তাহার উত্তরে সাধুচরণের কথা সকলেরই মনে থাকিবে—এ তিন মাস বোধ হয় অনেক খরচ ক'মবে! তারপর সাধু আর আসে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সুপারিশে হরিচরণ আসামে উপস্থিত হইল। আসামের চা-কর সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আত্মীয়, সুতরাং হরিচরণ তথায় সাদরে গৃহীত হইল। চা-কর সাহেব বিস্তৃত চা-উদ্যানের মালিক, খুব বড় আফিস, অনেক লোকজন খাটিয়া থাকে। হরিচরণেরও তথায় স্থান হইল।

তাহার প্রথম প্রথম কুলীদিগের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার বড়ই প্রাণে বাজিত, একটী সাঁওতাল রমণীকে উদ্ধার করিয়া সে অনেকের প্রিয় হইয়াছে। এখানে দেখিল, শতগুণ অত্যাচার কুলীদিগকে নিষ্পেশিত করিতেছে! এ বিষয়ে কোন প্রতিকার করিবার কি উপায় নাই?

সাহেব একদিন সন্ধ্যাকালে আফিসের কাজ করিতেছেন, হরিচরণ নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে তথায় উপস্থিত হইল। সে অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছে,—সাহেব তাহা জানিত, তাহার সত্যপ্রিয়তা ও সহৃদয়তা যুবক হইলেও অনেককে শিক্ষা দিবার মত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ তাহার শরীরে জ্বর, তথাপি সে আসিয়াছে। আসামের কালা-জ্বর বড়ই সাংঘাতিক, সে যদি না বাঁচে, সাহেবকে মনের কথা বলা হইবে না!

সাহেব তাহাকে দেখিবামাত্র কলম বন্ধ করিয়া ডাকিলেন—হরিচরণ!—

হরিচরণের তখন সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল, অনেক কষ্টে কথা কহিয়া বলিল, যাবার আগে একটা কথা বলতে এসেছি।

সাহেব বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

আর কিছুদিন থাকিলে আমি পাগল হয়ে যাব, আমার বাগানের কুলীরা আপনার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করে কেন জানেন সাহেব? সেখানে বেত নাই

এমন সময়ে বাঙ্গলোর চতুর্দ্দিকে অস্ফুট কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল। আজ অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে সমস্ত কুলী উত্তেজিত হইয়াছে, আজ তাহারা দু'একটী সর্দ্দারকে বাঁধিয়া লইয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এ দৃশ্য সাহেবের চক্ষে নূতন নহে, তবে হরিচরণের চক্ষে নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইল!

ঐ দেখুন সাহেব, আজ কুলীরা কত উত্তেজিত হয়েছে,—এই অত্যাচারের যদি প্রতিবিধান না হয়, আমায় বিদায় দিন, আমি দেশে গিয়ে মরি, উঃ—বলিয়া সে বসিয়া প'ড়িল।

দু'একজন উত্তেজিত কুলী নিকটে আসিয়া হরিচরণকে দেখিতে পাইয়াই শান্তভাব ধারণ করিল। হরিচরণ আর কিছু জানিতে পারিল না, সে তখন অজ্ঞান!

হরিচরণের এই অবস্থা জানিতে পারিয়া সমস্ত কুলী দুঃখে অভিভূত হইল। উত্তেজনা সমবেদনার নিকট দ্রবীভূত হইল।

সাহেব নিজের বাঙ্গলোয় হরিচরণকে রাখিলেন, তাহার জন্য গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিলেন। শুশ্রূষার অভাব হইল না, সমস্ত কুলী হরিচরণের জন্য দুঃখিত। তাহাদেরই মুখে শুনিলেন, এই যুবক অত্যাচার নিবারণকল্পে সমস্ত বাগান ঘুরিয়া বেড়াইত, কত সর্দ্দারকে বুঝাইত, এই পরিশ্রমের জন্য দিবাভাগের প্রচণ্ড রৌদ্র তাহার বালকোচিত সুন্দর দেহকে যেন অঙ্গারের ন্যায় কালীবর্ণ করিয়া দিয়াছে!

সমস্ত দিন অজ্ঞান থাকিবার পর হরিচরণ চক্ষু মেলিল! দেখিল তাহার নিকট অনেক কুলী, তাহাদের ভিতর দু'একটী পরিচিত মুখ দেখিয়া তাহার শুষ্ক চক্ষু সরস হইয়া উঠিল। তাহার দেশের পরিচিত সাঁওতালের পল্লীর সমস্ত কুলীরা এখানে আসিয়াছে। তাহার পরিচিত সাঁওতাল রমণী সেই বুড়ীও আসিয়াছে।

কেমন আছিস রে বাবু? ভয় নাই, ভাল হবি। সেই

বৃদ্ধ সাঁওতাল সর্দ্দারের বাক্য যেন ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া বোধ হইল। হরিচরণের মনে হইল, এখন মরিলে যেন তার ততটা দুঃখ হইবে না!

আমার দাদা কেমন আছে মাঝি? একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস, তার পর যেন অব্যক্ত যাতনা। সেও আসছিল রে, ছুটী পেলে না। এমন চাকরী নাই বা করতো!

সাধুচরণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হরিচরণের সঠিক খবর পাইয়া চাকরীতে যোগদান করিয়াছে। সেই অবধি তাহার নিকট আর নৃত্যকালী আসে নাই!

হরিচরণ বৃদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া ভাবিল, সাঁওতালেরা অসভ্য নয়, তাদের হৃদয়ের কাছে সভ্যতালিকা ভুক্ত অনেক উচ্চজাতি সর্ব্বাংশে নীচু। এ সংসারে সভ্যদের এখনও অনেক শিখিবার আছে।

দে বুড়ী বাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দে, এখানে তো আর কেউ লোক নাই। আমরাই ওর চাকর আছি। হরিচরণ এই বৃদ্ধের স্নেহবাক্যে অনেক কথা মনে পড়িয়া যেন সঙ্কুচিত হইল—এই রোগশয্যায় এই সাঁওতালেরাই তার সব। আর বুঝি সংসারে কেহ নাই! আজ সভ্য ও অসভ্যে যেন সহানুভূতির তীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিচরণের উত্তপ্ত ললাট যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। শুষ্কমুখে কার জন্য অপেক্ষার আগ্রহ যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল, বোধহয় তাহার দাদার জন্য! মরিতে বসিলেও বুঝি তাহার সহিত দেখা হইবার উপায় নাই!

পনর দিন অক্লান্ত শুশ্রূষার পর হরিচরণ বাঁচিয়া উঠিল। সাঁওতালের শুশ্রূষায় হরিচরণ বাঁচিল, সমস্ত কুলী-দের সমবেত প্রার্থনার জোরে সে প্রাণ ভিক্ষা পাইল।

চা-কর সাহেব নূতন মানুষ হইয়া গেল।

হরিচরণের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। সে এখন সাহেবের কৃপায় কতকটা জমীতে নিজেই চা-এর আবাদ করিল। এই বাগানটাই তার সব। তাহার বাগানের জন্য কুলী ডাকিতে হয় না, দলে দলে কুলী ঝুঁকিয়া পড়িল। অন্যান্য সর্দ্দারেরা তাহাদের রোজগারে ব্যাঘাত দেখিয়া ও কুলী-দিগের প্রতি হাতের সুখে বেত মারিতে না পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রহিল। হরিচরণ এ কথা যেন বুঝিয়াও বুঝিল না। অতি অল্পকাল মধ্যেই হরিচরণ চা-আবাদ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ হইয়া উঠিল। সে অন্যের উপর নির্ভর করিতে জানে না, তাহার চা অন্য কেহ পরীক্ষা করে না, অথচ বৎসর শেষে তাহার বাগানের চা সকল বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইল।

ভগবান যেন উপর হইতে তাহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সুফল প্রদান করিলেন। হরিচরণের সাহেব নিজের বিস্তৃত বাগান মধ্যে এই সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিলেন। বেতের রাজত্বে কুলীরা উপদ্রব করিত, প্রায়ই একটা না একটা হাঙ্গামা লাগিয়া থাকিত। কই, এখন তো কাহাকেও জোর করিয়া খাটাইতে হয় না,—তারা নিজে প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করে, তাহারা হরিচরণের গুণ গায়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে নীতি ও সৎসাহস এত শাস্ত্র মাথা পাতিয়া কেহ লইতে চায় না। অন্যান্য সাহেব ও কুলী সর্দ্দারেরা হরিচরণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, এক অজ্ঞাত কুলশীল বাঙ্গালী যুবক আসামে কুলীদিগের উপর প্রভুত্ব করিবে!—তাহারা বোধ হয় জানিত না, এই প্রভুত্ব বেত মারিয়া লাভ করা যায় না, কিন্তু সনাতন রীতি কে শীঘ্র বদলাইতে চায়? এবার যেন দৈববলে সমস্ত চা এর বাগানে একপ্রকার পোকা আসিয়া দেখা দিল। হরিচরণ পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করিয়া-ছিল—তজ্জন্য সে প্রস্তুতও হইয়াছিল। সে রোগ হইতে উঠিয়া চা সম্বন্ধে যত রকম উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, তাহারই অনুশীলন ও পরীক্ষা করিয়াছিল। তাহার নিজের বাঙ্গলোর টবের চা গাছগুলিতে নিজের পরীক্ষায় ভাল পর্য্যবেক্ষণ করিত, আর তাহার সাঁওতাল বন্ধুদিগকে এ বিষয়ে বুঝাইত। তাহারা হরিচরণের শিক্ষায় অন্যান্য কুলী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত কুলী হরিচরণের বাগানে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া পোকার ঔষধ ছড়াইতে লাগিল। অন্যান্য সাহেবেরা মনে করিল যে এবার হরিচরণ ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে, সর্দ্দারেরাও বেত মারিবার আনন্দে হাত ঠিক করিতে লাগিল।

হরিচরণ একদিন বৃদ্ধ সাঁওতাল সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিল, ওষুধ লেগেছে সর্দ্দার?

হাঁ তো, ঠিক লাগবে, তুই যখন এত ভাল, তোর খুব ভাল হবে। এই অসভ্যের বিশ্বাস হরিচরণের প্রাণে যেন দ্বিগুণ উৎসাহ ঢালিয়া দিল। সে দুইচারি দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে নিজের সাহেবের বাগানে সেই ঔষধ ছড়াইয়া দিয়া আসিল। বিলাতী ঔষধ অপেক্ষা তাহার ঔষধের ফল শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পোকাগুলি একে একে বিনষ্ট হইতে লাগিল। সাহেব তাহার অন্নদাতা, তাহার বাগান সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা চাই।

সমস্ত বাগানের সাহেবেরা এই লোকের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে; বিলাত হইতে দু'একজন অভিজ্ঞ সাহেব আসামে আমদানী হইয়াছেন। এবার চা সমূলে বিনষ্ট হইলে অনেক টাকা লোকসান হইবে। এত দুঃখের মধ্যে যে হরিচরণ বিনষ্ট হইবে এই তাহাদের আনন্দ, ইহাকেই বলে বাণিজ্যের politics! সেই হরিচরণ একদিন রাত্রে অন্য একটী সাহেবের বাসায় উপস্থিত হইল। সঙ্গে কেবল মাত্র বৃদ্ধ সর্দ্দার। সাহেব হরিচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্য এখানে এসেছ? হরিচরণের নিকট পোকার ঔষধের কথা শুনিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—এই অবজ্ঞার হাসি হরিচরণের প্রাণে বাজিলেও সে নীরবে ফিরিয়া আসিল। যাইবার সময় সেই সাহেবের বাগানে দু'চারটা গাছে ঔষধ ছড়াইয়া দিল। এই মঙ্গল চিন্তা হরিচরণ অতি অল্প বয়সেই করিতে শিখিয়াছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই মঙ্গল কামনা তাহার হৃদয়ে সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

যাইবার পথে কুলী সর্দ্দারদিগের আড্ডা, তাহারা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা জানে না বৃদ্ধ সর্দ্দার অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিতে ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, এমন সময় কি মনে করে? আর একজন বলিল, আমাদের সাহেবের কাছে বুঝি পোকার ওষুধ জানতে গিয়ে ছিলে? আর একজন বলিল, এবার তো পাততাড়ি গুটুতে হবে—বেত না লাগালে কি চায়ের আবাদ হয়? ইহারা সকলেই বাঙ্গলা দেশের লোক,—স্থান মাহাত্ম্যে তাহারা অন্য জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

হরিচরণ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া নিজের সাহেবের বাঙ্গলোর পথ ধরিল। উত্তেজিত কুলী সর্দ্দারেরা বহুদিন হইতে সুযোগ খুঁজিতেছিল, রাত্রিকালে সে একাকী, এমন সুযোগ কি আর পাওয়া যায়! তাহারা এক যোগে তাহাদের পাকান বেত লইয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণের পিঠে এই বেত ভাঙ্গিতে পারিলেই তাহাদের সুখ হয়।

হরিচরণ মনে করিল সর্দ্দাররা বুঝি চলিয়া গিয়াছে,—পরক্ষণেই সে দেখিতে পাইল একটী বাঁটুল তাহার কানের কাছ দিয়া সোঁ করিয়া চলিয়া গেল, সেই বাঁটুল তাহার শত্রুদের ভিতর একজনকে ধরাশায়ী করিল। ক্রমান্বয়ে চারপাঁচটী বাঁটুলের আঘাতে চার পাঁচজন কুলী সর্দ্দার বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন ধীরে সাঁওতাল সর্দ্দার আসিয়া হরিচরণের কাছে দাঁড়াইল। হরিচরণ এই বৃদ্ধের প্রভুভক্তি, অদ্ভুত লক্ষ্যভেদ দেখিয়া আনন্দে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, সর্দ্দার- তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আর কোন কথা বাহির হইল না! সর্দ্দার হাসিয়া বলিল, তুই খুব ভয় পেয়েছিলে? আমরা থাকিতে তোর কুছ্ ভয় নাই!

হরিচরণের সাহেব তার পরদিন সমস্তই শুনিলেন। সৎচরিত্রের এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। হরিচরণের জয় জয়কার হইল। হরিচরণের নিজের আবিষ্কৃত ঔষধে তাহার বাগান, তাহার সাহেবের বাগান পোকা শূন্য হইল, আর হইল সেই সাহেবের তিন চারটী গাছ! অন্য বাগানগুলি পত্র শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল!

সৎগুণের আদর সাহেবেরা করিতে জানে, সুতরাং শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া অন্য সমস্ত সাহেবের হরিচরণের বাঙ্গলোতে আসিয়া তাহার সহিত কর মর্দ্দন করিল। কৃতজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, সুযোগ পাইলেই বাহির হইয়া পড়ে। ইহাই মানব চরিত্র।

হরিচরণের নাম বিলাত পর্য্যন্ত পঁহুছিল। বহু সংবাদ পত্রে এই চায়ের পোকা প্রতিষেধক ঔষধ আলোচিত হইয়া সুখ্যাতির মিষ্ট বর্ষণ হরিচরণের শিরে পড়িতে লাগিল। এতদিনে তাহার উত্তপ্ত শরীর শীতল হইল। তাহার দুটী পেটের ভাতের যোগাড় হইল।

এদিকে কেরাণী সাধুচরণ—কলম পিষিয়া পেটের ভাতের যোগাড় করিতে পারিতেছে না ; আর হরিচরণ নিজের অধ্যবসায়, নিজের পরিশ্রমের ফলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে ! বাঙ্গালীর ছেলেরা একটা চাকরী পাইলেই সন্তুষ্ট—কেরাণী-গিরী, নয় রাতদিনের বাঁধা রেলের চাকরী। দু'পয়সা উপরি থাকিলেই হইল ! বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব এই জন্যই লোপ পাইয়াছে ! ইংরাজী ambition কথাটার অর্থ জীবনের higher aim, ইহাই হইল প্রকৃত অর্থ। বাঙ্গালী কোন রকমে ঘরের কাছে একটা বাঁধা চাকরী পাইলেই তাহার যেন সমস্ত অধিকার বজায় রহিল। স্বাধীন জীবিকা, স্বাধীন চিন্তা যেন এদেশ হইতে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে !

বধূ নৃত্যকালী তিন মাস গেল, তিন বৎসর গেল, স্বামী প্রদত্ত গহনাগুলিতে পেট ভরাইলেন। আর তো চলে না। বৃদ্ধ পিতা জামাইএর গহনা বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা দালালি পাইয়াছে, এইবার নিজের কন্যাকে খাওয়াইতে হইলে সে পয়সাও বুঝি যায় !

বসে বসে খাবি, এটা কি আর ভাল দেখায় !

কন্যা নৃত্যকালী পিতার এই কথার ইঙ্গিৎ বুঝিতে পারিল, সেও তেমনই বাপের কন্যা। উত্তরও সেই রকম—

এতদিন তো আমার স্বামীর পয়সাতেই খেয়ে আসছিলাম —তোমার পয়সা খরচ হবার পূর্ব্বেই আমি চলে যাবো।

বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ করিতে গেল।

সাধুচরণ সংবাদ পত্রে হরিচরণের প্রশংসা দেখিতে পাইয়া মনে ভাবিল, এই ভাইকে আমি পর করিয়া দিয়াছিলাম !

ডাকের পিওন সাধুচরণের হাতে এক রেজেষ্টারী পত্র দিয়া গেল—খুলিয়া দেখেন, স্ত্রী নৃত্যকালীর পত্র ! কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, আর বাপের বাড়ীতে বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না, তাহারই রেজিষ্টারী নোটীশ ! সাধুচরণ পত্র পাইয়া মাথায় হাত দিল। মাথা কাটা গেলেও কন্যার বিবাহে ত টাকা চাই ! বাঙ্গলায় যত নিঃস্বার্থপরতার মূল —টাকা !

শুভদিনে শুভলগ্নে বধূ নৃত্যকালী শ্বশুর বাড়ীর পুরান আসর জমকাইয়া বসিলেন। গহণার বাক্স খালি দেখিয়া সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুলে এসেছ নাকি ?

বাবার হাতে টাকা ছিল না, তাই বন্দকী ছাড়িয়ে আনতে পারি নাই—স্ত্রীর এই সময়োচিত কথা শুনিয়া সাধুচরণ হাসিল !

হাসছো যে ?

এই দেখ দেখি কার নাম—

এ কি আমার দেওর নাকি ?

তাকে বিয়ের টাকার জন্য লিখবো ?

খুব লিখবে। ওমা, এক পেটের ভাই, কখনও কি পর হয় ! তোমরা তো ভাই ভাইএ এক জায়গায় থাকৃতে পার না !

সাধুচরণ আবার হাসল। এ হাসি বড় মর্ম্মান্তিক, বিদ্রুপশ্লেষ-পরিপূর্ণ। সহজ হাসি মন্দনা —চিমৃটি কাটে—কিন্তু নৃত্যকালীর অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারিল না ! বাঙ্গালীর মেয়েদের শিক্ষা ঘরে ঘরে বাকী। কবে আবার আগেকার মত সহজ সরল দেখিতে পাইব ?

সাধুচরণের এই তিন বৎসরের মধ্যেই অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে স্ত্রীর দেওরের প্রতি টান দেখিয়া বিস্মিত হইল না ! ইহাই তো বাঙ্গালী সংসারের চিত্র !

সাধুচরণ হরিচরণকে পত্র লিখিল—

ভাই, আমার কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। তুমি কি একবার আসিবে না ?

সেই পত্র যথা সময়ে আসামে পৌঁছিল। সেদিন হরিচরণের বড় আনন্দের দিন। সমস্ত চা-কর সাহেব আজ হরিচরণের সম্বর্দ্ধনার জন্য ব্যস্ত। সে বিলাতের চা-সমিতির ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছে। মহত্ত্বের আদর, গুণের আদর, গুণগ্রাহীরাই জানে, আর জনার্দ্দনের মত স্থিতিশীল বাঙ্গালী আপনার নেশায় বিভোর !

হরিচরণের সাহেব সে পত্র দেখিল। আমি শীঘ্রই বিলাতে যাবো। আমার সমস্ত চা-বাগান তোমাকে দিয়ে যাবো ; লাভের অর্দ্ধেক আমায় পাঠিয়ে দিও। আমার ইচ্ছা তোমরা দুই ভাইএ কাজ কর্ম্ম কর। তাকে এখানে আসিতে লেখ। তোমার ভাইঝির বিয়ে দেখে আমি বিলেত যাবো।"

এমন সুন্দর কথা হরিচরণ বহুদিন শোনে নাই। হরিচরণ দাদাকে সেই ভাবেই পত্র লিখিল।

সেই পত্র পড়িয়া বধূ নৃত্যকালীর আর মুখে হাসি ধরে না —একঘেয়ে বাসন মাজা, একঘেয়ে হাত পুড়িয়ে রান্না তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু এত পথ বাঙ্গালীর মেয়ে বিনা আভরণে কি করিয়া যাইবে! এক হাত কাচের সৌখীন চুড়ি পরিয়া মনের সাধ মনে রাখিল! যথা সময়ে তাহারা আসামে পঁহুছিল।

আজ হরিচরণের ভাইঝির বিবাহ। আজ সমস্ত সাঁওতাল কুলীরা নূতন কাপড় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল। একটু স্নেহ একটু মমতা,একটু ভালবাসা. জীবনের যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত করে, তাহা বলা যায় না।

আজ সমস্ত সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাহাদের প্রদত্ত যৌতুকে ভাইঝির জীবন দামী হইয়া উঠিল। হরিচরণ যে গহনাগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিল, সেগুলি বিবাহের দিনে বধূ নৃত্যকালীকে দিয়া বলিল, এগুলি তোমার বউদিদি। বধূ নৃত্যকালী বোধ হয় নিজের ভুল বুঝিতে পারিল।

সাহেবেরা আজ বাঙ্গালীর আহার খাইয়া পরিতুষ্ট হইল। আমরা শুনিয়াছি, সেদিন অনেক সাহেব শাকসব্জী হইতে আরম্ভ করিয়া পায়স মিষ্টান্ন কিছুই বাদ দেন নাই।

এই সাঁওতালের দল ঘরে দেখিয়া বধূ নৃত্যকালীর কিন্তু মনে খটকা বাধিয়াছিল। সে গালভরা হাসি লইয়া একদিন দেওরকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এইবার বিয়ে থা কর।

হরিচরণ বলিল, তোমার মেয়েদের আগে বিবাহ হোক, তারপর!—এ শ্লেষবাক্য নৃত্যকালী বুঝিতে পারিল না, বুঝিল সাধুচরণ!

সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আর দেশে যাবে না—

না, দাদা এখন নয়। আমার কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তবে আমার সম্পত্তি তোমার, আমার রইল। কেবল ঐ কুলীগুলি সব—তাদেরই জন্যই যৎকিঞ্চিৎ রেখেছি, এই দেখ আমার উইল!

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(১৫)

ষষ্ঠীর নিশি ভোর হইতেই সুপ্তিমগ্ন গ্রামবাসীর নিবিড় মিলন মুখে বিহ্বল হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া সানাই তান ধরিল। আজ বাঙ্গালীর চির আকাঙ্ক্ষিত, চির আশার শারদীয়া পূজা। গৃহে গৃহে হর্ষ পুলকোচ্ছ্বাস. নিরাশা তিমিরে আচ্ছন্ন ব্যথিতের ম্লান মুখচ্ছবিও আজ হাসির তরুণালোকে সমুজ্জ্বল। জগৎ যেন কোন স্বপ্নালোকের মদিরা পানে মাতোয়ারা হইয়া কেবল তিনটি দিনের নিমিত্ত তাহাদের ব্যথাময় দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পদে পদে অভাব অনটনের স্মৃতি বিস্মৃতি হইয়াছিল। আজ গগনে, পবনে, শরতের ভরা নদীর বুকে বিকশিত কাশের বনে সমস্ত বিশ্বময় আনন্দের একটা প্রবাহ বহিতেছে।

কিন্তু এই উন্মাদনা ভরা আনন্দের প্লাবনে আমাদের গৃহে আনন্দের একটা আভাস ও জাগিল না। শরতের শিশির-সিক্ত উৎসব-হাস্য-রঞ্জিত স্নিগ্ধ রৌদ্রটি প্রতি বছরের মত আমাদের অঙ্গনে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু আজ তাহা গলিত স্বর্ণের ন্যায় আমার চক্ষে অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিতে পারিল না। পূজা বাড়ীর সেই অতিকরুণ সুললিত বাঁশীর গানের প্রতিধ্বনি আমার বক্ষের মধ্যে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিতে লাগিল!

মনে পড়িল গতবছরের পূজার স্মৃতি। সেই পূজা, ধনীর পূজা, দরিদ্রের পূজা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! গত বছরের এমন দিনে মা বাবার সহাস্য মুখ এমন করিয়া ম্লান হইয়াছিল না, দরিদ্র কুটীরে শারদোৎসব না হইলেও একেবারে নিরানন্দ ছিল না। বাড়ী বাড়ী হইতে ভোগ-রান্না করিবার জন্য মার ডাক পড়িত। পূজার ফুলদূর্ব্বা তুলিয়া দিতে প্রতিবেশীর গৃহ হইতে বেনুর আহ্বান আসিত। বাবা ও সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন যাহার জন্য আজ শান্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে—এ অভাগীরও সকল গৃহেই অবারিত দ্বার ছিল। আর আজ সেই সুন্দর প্রভাতটি উদিত হইয়াছে, সেই বাঁশীর গান

"গা তোল, গা তোল, বাঁধমা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।"

পুষ্প গন্ধ ভারাক্রান্ত মৃদু বাতাস ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেদিন কোন্ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। অজানা একটানা জীবনের স্রোতে আমরা কয়েকটি প্রাণী ভাসিয়া চলিয়াছি। জানি না কতদিনে আমাদের ভাগ্যবিধাতা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবেন।

বারান্দার কোণে বসিয়া দূরে স্বর্ণোজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম, সহসা বসন্তের চঞ্চল বাতাসের মত বেনু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। অঞ্চল হইতে একরাশী শেফালী ফুল আমার পায়ের কাছে ঢালিয়া মৃদুস্বরে কহিল "দিদি, চাট্টি ফুলের বোঁটা ছাড়িয়ে দাও না। আমার অনেকগুলো বোঁটা জমেছে, এ গুলোর সাথে সেগুলো মিশিয়ে দুখানা কাপড় রং হবে।"

আমি বোঁটা ছাড়াইবার জন্য কতকগুলি ফুল হাতে লইয়া কহিলাম "বাবার অসুখ হ'ল ব'লে এবার পূজোয় তোর নতুন কাপড় হ'ল না বেনু, বোঁটাগুলো রোদে শুকিয়ে শিশিতে রেখে দিস্, একখানা সাদা লালপেড়ে কাপড় কিনে পরে ছুপিয়ে দেব।"

বেনু প্রত্যুত্তর করিল "আমার সেই কালোপেড়ে শাড়ীটা কৈবর্ত্তবৌয়ের কাছে ধুতে দিয়ে এসেছি দিদি, সেইখানা আজ রং ক'রে দিও। রং করলে সেখানাই নতুন

কাপড় হ'য়ে যাবে। সেইখানা পরেই আমি পূজো দেখ্‌তে যাব দিদি।"

'উৎসব দিনে বালিকার ছিন্নবস্ত্র নূতন করিবার প্রয়াস দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা বাজিল। আমি হস্তের ফুল-গুলি মাটিতে রাখিয়া কহিলাম "কোথায় পূজো দেখতে যাবি বেন্থ? তোর দিদি থাক্‌তে কোথায় ও তোদের পূজা দেখা হবে না। তোরা ভাত পাবি না, কাপড় পাবি না; বাবার, মার, তোর আমিই যে মৃত্যুর বাণ বেন্থ।"

বেন্থ বিস্ময়ে ডাগর চক্ষু দুইটি আমার পানে মেলিয়া একটু ভাবিয়া বলিল "দিদি ছেঁড়া কাপড় রং করে বোঁটাগুলো ফুরিয়ে ফেলবো বলে তোমার বুঝি রাগ হয়েছে? আমি আর কাপড় ছোপাতে চাই না, যখন নতুন কাপড় কেনা হবে তখন তুমি ছুপিয়ে দিও। কারু বাড়ী পূজো দেখতে যদি নাই ডাকে—তাতে আর কি? বিজয়ার দিন নদীর ধারে দাঁড়ালে কত ঠাকুরের ভাসান দেখা যাবে, আমরা তাই দেখ্‌বো দিদি।" বলিয়া আমাকে প্রসন্ন করিবার মানসে বেন্থ একটু বিষাদের হাসি হাসিল। কিন্তু সেই চোখের করুণ কোমল হাসিটুকু বেন্থর অশ্রুর চেয়ে আমার বুকে বেশি বাজিল। আমি কিছু না বলিয়া বেন্থর নির্ম্মল ললাটে একটি স্নেহচুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

বেন্থ আমার কোলের উপর হইতে মাথাটা তুলিয়া কি যেন বলিতে চাহিয়া নীহারকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেল।

নীহার ছেলে কোলে অগ্রসর হইয়া তাহার ক্রোড়স্থিত শিশুটিকে আমার কোলে সমর্পণ করিল।—স্মিত মুখে কহিল "ছেলে দেখবি ব'লে পাগল হ'য়েছিলি, এখন খুব ক'রে দেখে নে কণা! খোকাকে আমি তোকেই দিলাম।"

আমি নীহারের কপোলে অঙ্গুলির একটা আঘাত করিয়া তাহার কুন্দ কলির মত খোকাটিকে বক্ষের মধ্যে নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। শিশুর স্নিগ্ধ পরশে আমার বিক্ষিপ্ত হৃদয় অকস্মাৎ জুড়াইয়া গেল। সেই খসিয়া-পড়া চাঁদের মত একটুকরা মাণিকের মত খোকার ক্ষুদ্র মুখ, ফুল্ল ওষ্ঠাধর, নীলনেত্র, মধুর হাসিটুকু মুহূর্ত্তের মধ্যে আমায় যেন মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এত সুন্দর, এত স্নিগ্ধ এমন হৃদয়ানন্দ বস্তু আর কোনদিন আমার নয়ন বা মন হরণ করিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইল না! আমি খোকার ছোট মুখখানি চুম্বনে চুম্বনে ভরাইয়া দিলাম। খোকার বয়স দশমাস হইলেও সে মানুষের আদর সোহাগের মর্ম্ম বিলক্ষণ রূপেই বুঝিতে শিখিয়াছিল। তাই আমার আদর ও সোহাগে উৎফুল্ল হইয়া গালভরা হাসি হাসিয়া খোকা আমার ক্লিষ্ট হৃদয়ে আনন্দ ধারা ঢালিয়া দিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে শরৎ-শ্রী আমার নিকটে নিতান্তই শ্রীহীন ব্যর্থ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় একটি শিশুর হাসিতে, স্পর্শে তাহাই যেন অনির্ব্বচনীয়, অপরিমেয় অনন্ত মধুর রূপে আমার চঞ্চল অন্তঃকরণের মধ্যে অকস্মাৎ বিকশিত হইয়া উঠিল। আজিকার এই স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত, শিশিরসিক্ত প্রভাত ব্যর্থ হয় নাই; আশ্বিনের আগমনীর একটা আনন্দছবি আমি বক্ষে পাইয়াছি। আমার হৃদয়-নদী আজ কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে, সফলতার আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

আমি খোকাকে বুকে চাপিয়া, আদর করিয়া কিছুতেই যেন তৃপ্তি পাইতেছিলাম না। খোকার মা মুগ্ধ নেত্রে এতক্ষণ এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল "খোকাই যেন সব, আমি বুঝি কেউ নয়! এক ঘণ্টার ওপর খোকাকেই আদর হচ্ছে, আমার সঙ্গে একটা মুখের কথাও বলার অবসর হ'ল না। বন্ধুত্ব পুরনো হ'লে এমনি হতাদরই হয় বটে।"

আমি হাসিয়া কহিলাম "তোর মত আমার এত অভিজ্ঞতা নেই নীহার, ছেলেকে আদর করলে মার যদি অনাদর হয়—তা হোক্ গে, আমি তাতে ব্যস্ত নই।"

"ব্যস্ত নও, তবে ছেলে নিয়েই থাকো, আমি চলে যাই, এমন চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে আমার ভাল লাগে না বাপু! পূজো-দিনে দুটো ভাল কথা বলবো না, শুনবো না, কেবল ছেলের আদর!" বলিয়া নীহার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

আমি হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া কহিলাম "এত রঙ্গ করতে হবে না, ঢের হয়েচে, এখন বল খোকার নাম কি রাখা হ'বে ?—নাম ঠিক হয়েছে কি ?"

"না, নাম ঠিক হয়নি। তুই খুব মিষ্টি দেখে একটা নাম ঠিক করে দে কণা, আর এক মাস পরে ওর ভাত হবে। ভাতের সময় তোর-রাখা-নামই ওর ডাকনাম হবে।"

"আমার দেওয়া নাম কি তোদের পছন্দ হবে? তোর ছেলে বেশ সুন্দর হ'লেও আমার ইচ্ছা হচ্ছে ওকে 'নীলমণি' বলে ডাকি।"

নীহার সুন্দর ভ্রূযুগটি বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল "সাধে কি তোকে খোকার—যশোদা মা বলেছিলাম কণা, তোর মাতৃত্ব তোর নাম রাখাতেই প্রকাশ হ'য়ে গেল, তোর দেওয়া নামেই খোকাকে ডাকা যাবে নামটি আমারও বেশ পছন্দ হ'য়েছে।"

আমাদের দুই সখীর নাম সমস্যার মধ্যে হঠাৎ বেনু জিজ্ঞাসা করিল "আজ তুমি পুজো দেখতে যাবে না নীহার দি? তোমার নেমন্তন্ন হয়নি? এবার আমাদের কেউ নেমন্তন্ন করেনি, পুজো দেখতে ডাকেনি। লাহিড়ীদের শান্তি বলে, আমাদের নাকি জাত গেছে।"

নীহার ব্যথিতা বালিকাকে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া আদর করিয়া কহিল "জাত কারুর যায় না রে, দুষ্টলোকের সব মিছে কথা। দুদিন পর কত লোক তোদের বাড়ীতেই সেধে খেতে আসবে, তখন দেখে নিস্। যারা মিছে কথা বলে, লোকের দুঃখ বোঝে না, আমি তাদের বাড়ী নেমন্তন খাইনা বেনু। আমি আজ কাকীমার কাছে খেতে এসেছি। আমার চাল নেবার কথা কাকীমাকে বলে আয়।"

বেনু খুসি হইয়া মার সন্ধানে উঠিয়া গেল। নীহারের নিমন্ত্রণে না যাইবার কারণ বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। তাহার চরিত্রহীন স্বামীর সম্বন্ধে শুভার্থিনীদের সহানুভূতি, সবিদ্রূপ প্রশ্নের ভয়ে সে লোকালয়ের কোলাহল হইতে সরিয়া থাকিত, পাছে, পূজাবাড়ীর উৎসবে যোগ দিতে গেলে স্বামীর আলোচনা শুনিতে হয়, সেই আশঙ্কায় আজিকার এই উৎসব দিনেও নীহার নিজেকে বঞ্চিত করিয়া আমাদের গৃহে আসিয়াছিল।

(১৬)

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর নীহার আমার বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার খোকাকে দোল দিয়া দিয়া ঘুম পাড়াইয়া তাহারই পার্শ্বে শোওয়াইয়া দিলাম।

বাবার শীতের লেপখানা একেবারেই ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, আসন্ন শীতের সম্ভাবনায় আমি অনেকগুলি ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়া বাবার জন্য পুরু করিয়া একখানি কাঁথা সেলাই করিতেছিলাম।

কাঁথাখানার ভাঁজ খুলিয়া সূচটি হাতে লইতেই নীহার ডাকিল "ওসব সূচি কাজ, শিল্পকাজ আজকের মত শিকেয় তুলে রাখ কণা! আয়, আজ দুজনা শুয়ে শুয়ে একটু গল্প করি। সেলাই রোজই পাওয়া যাবে, কিন্তু এমন দিনে, আর কখনো দু'জনা একত্র হতে পারবো কিনা তা ভগবান জানেন। আজ যখন পেয়েছি, তখন চুপ করে হেলায় একে হারাব না।"

অগত্যা কাঁথাখানি বাক্সের উপর তুলিয়া রাখিয়া নীহারের শয্যার অংশ গ্রহণ করিলাম। নীহার একখানি বাহু আমার গায়ে জড়াইয়া নীরবে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল।

পূজা বাড়ীতে ভোগের বাজ্না বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গেল। নিমন্ত্রিতগণের ব্যস্ত আনা-গোনায় নির্জ্জন পথটি ক্ষণকালের নিমিত্ত মুখরিত হইয়া উঠিল।

নীহার ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা কণা, তোদের বাড়ীতে এত সুন্দর সুন্দর বাসন ছিল, এবার তার একখানাও দেখছি না কেন? আজ কাকাকে পর্য্যন্ত কলা-পাতায় খেতে দেখলাম; বাসনগুলো কোথায় গেছে রে?"

উত্তর দিলাম—"বিক্রমপুর বেড়াতে গেছে নীহার; ঘরের বাসন, বাগানের আমের গাছ, জামের গাছ সব বেড়াতে গেছে!"

"ও, বুঝেছি, কাকার চাকুরী যাবার কথা; অসুখের কথা কাল রাতে মা'র কাছে সব শুনেছি। সেদিন এত কথা বল্লি, কৈ এমন দুরবস্থার কথা তো একটিবারও বল্লি না? কাকীমাও বল্লেন না। তোরা আগে যেমন আমার ভাল

বাস্‌তিস, এখন তেমন বাসিস্‌ না। কাকীমা না বল্লেন কিন্তু তুই কি ক'রে এত দুঃখ গোপন ক'রে গেলি কণা?"

অভিমানে নীহারের অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল; চক্ষে জল আসিল। আমি সমস্ত ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় বলিলাম "নিত্যকার ছিঁচ্‌কাঁদুনী ও সব বলে আর কি হবে নীহার; তাই বলিনি। বিশেষতঃ এখনও অনাহারের অবস্থা হয় নাই; হলে বল্‌তাম বৈকি। মা যে কি কোরে কোথা দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তা আমিই জানি না, তোকে জানাব কি করে? নিজের অজানা কথা জানাই নি বলে বুঝি সেই পুরণো ভালবাসা কর্পূরের মত উবে গেছে; তাই কি তোর মনে হয়?"

'মনে কেন! কাজেও তাই দেখছি কণা, আজ ভালবাসার পরীক্ষা হবে। সেই ছেলেবেলার স্নেহ, স্বার্থ শূন্য ভালবাসার একটি নিদর্শন তোমায় নিতে হবে—আমি তোর সাতদিনের বড়, বড় বোনের অধিকার কখ্‌খনো দিতে আসিনি, আজ বড়বোনের দাবী তোকে মান্‌তে হ'বে।"

নীহারের কথার ধরণে আমি মনে মনে উৎসুক হইলেও সহজভাবেই বলিলাম "সখীত্বের থেকে একেবারে দিদির আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বাবা গো, এ যেন ডবল প্রমোশন! বল দিদি, তোমার কি আদেশ পালন করতে হবে?"

নীহার আমার কপোলে একটা চপেটাঘাত করিয়া, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল "আমি তোর মুখে 'দিদি' ডাক শুন্‌তে চাইনা কণা; এতকাল পর দিদি বল্লে বড্ড বিশ্রী শোনায়। দিদির অধিকারটুকু শুধু চাই; সেটুকু তোর স্বীকার করতেই হ'বে।"

কহিলাম—"অস্বীকার করছি না নীহার, কবে তোর কোন কথা না শুনেছি? চিরকাল যা শুনেছি, এখনও তা শুনবো; ভূমিকা রেখে যা বল্‌তে হয় বলে ফেল।"

নীহার ইতস্ততঃ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। সেমিজের ভিতর হাত ঢুকাইয়া বুকের নিকট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল। পরে আমার হাতখানা টানিয়া লইয়া হাতের মধ্যে কাগজগুলি গুঁজিয়া দিল।

আমি সবিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম। নীহারের প্রদত্ত কাগজগুলি যে নোটের তাড়া—তাহা বুঝিয়া আমার মনের অদম্য কৌতূহল নিমেষে অন্তর্হিত হইল। কি করিয়া যে আমি এ সমস্যার সমাধান করিব তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার বিলক্ষণ রূপে জানা ছিল দান গ্রহণে মা'র কি লজ্জা, কি কুণ্ঠা। তাঁহার দরিদ্রতা তিনি সাদরে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন; তথাপি ভিখারীর ঘৃণ্য আচরণ অবলম্বন করিতে পারেন নাই। মার দরিদ্রতার মধ্যে দৃঢ়তা ছিল, গৌরব ছিল, কিন্তু কাঙ্গালের দীনতা ছিল না। জানি—এ দান গ্রহণ করিলে কিছুকালের নিমিত্ত আমাদের অন্নকষ্ট ঘুচিবে, একখানি তুচ্ছ নব বস্ত্র বিহনে বেনুর মলিন মুখখানি অভীষ্ট দ্রব্য প্রাপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কিন্তু মা কি ভাবিবেন! মা'র সুকোমল অন্তঃস্থলে না জানি কত আঘাতই লাগিবে। আর এ টাকা না লইলে নীহার অভিমান করিবে—ব্যথা পাইবে; নীহারের বিমুখতাও আমার কম দুঃখের কারণ নহে। এ যে আমার উভয় সঙ্কট!

আমি নীহারের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলাম "নীহার, তোর স্নেহের দান আমার মাথার মণি হলেও টাকার বিষয় মা যা কোরবেন তাই হবে। তাছাড়া আমাদের এমন অভাব নয় যে এতগুলো টাকা এম্‌নি এম্‌নি নিতে যাব। জিতুদার কাছে শুনেছি, এখন তোদের অবস্থা খারাপ হ'য়ে গেছে। এ টাকাটায় তোদের কত কাজ হবে।"

নীহার ম্লান হাসির সহিত প্রত্যুত্তর করিল "এ এত টাকা নয় কণা, সামান্য এক'শ টাকা মাত্র। আমার শাশুড়ী মরবার সময় আমায় এই এক'শ টাকা দিয়ে গেছেন। সেই থেকে টাকা আমার কাছেই রয়েছে। মনে ভেবেছিলাম এটাকা অনর্থক খরচ করবো না; একটা ভাল কাজে লাগাব। কাকার এত কষ্ট, কাকীমা ভাব্‌তে ভাব্‌তে শুকিয়ে গেছেন, বেনু ছেঁড়া কাপড়ে মুখ ভার ক'রে রয়েছে; আমার তুচ্ছ টাকায় যদি তোদের একটু উপকার হয়, তা হলেই এটাকা সার্থক হ'বে কণা। অবস্থার কথা বলছিস, ঘরে একটা কানা আধ্‌লা থাক্‌তে তাঁর নিস্তার নেই। টাকা—টাকাতেই তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে। আমার কাছে এ টাকা চাইলে আমি মিছে কথা বল্‌তে পারবো না। আবার

টাকা দিলে তাঁর উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। তার চেয়ে তুই নে বোন ; দান না ভেবে আমার ভালবাসার চিহ্ন ভেবে নে কণা। দান করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই. আজ পূজোর দিনে এ টাকা কয়টা তোকে আমি যৌতুক দিলাম।"

বিছানার উপর হইতে নোটের তাড়াটি লইয়া নীহার পুনরায় আমার হস্তে তুলিয়া দিল। এবার আমি হাত সরাইয়া লইতে পারিলাম না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সঙ্কোচের সহিত নীহারের দান গ্রহণ করিলাম। কিন্তু বক্ষ আমার ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। দান গ্রহণের যে এত জ্বালা, পূর্ব্বে তাহা জানা ছিল না। নীহারের দানের ভারে আমার উন্নত মস্তক অকস্মাৎ অবনত হইয়া গেল। কেমন করিয়া কি উপায়ে যে আমি এত বড় দানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইব, মুক্তি পাইব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একবার মধ্যাহ্নের দীপ্ত জ্বালাময় আকাশের পানে চাহিয়া, একবার দূর বিস্তৃত মাঠের পানে চাহিয়া আমি মার সন্ধানে উঠিয়া গেলাম।

কিয়ৎকাল পর মা আমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নীহারের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিলেন "নীহার, কণার কাছে সব শুনলাম ; তোর খুব ভাল মন, তাই ভাল কাজের জন্তে টাকাগুলো রেখে দিয়েছিলি। তোর জিনিষ কনক কখনো অবজ্ঞা করতে পারে না। তুই যথার্থ ই আমার বড় মেয়ে মা ; তোর সাধু সংকল্পের টাকাগুলি কনক যাতে ভাল কাজে লাগাতে পারে আমাদেরও সেই সাধ।"

নীহার বলিল "কণার ও বেন্থুর পূজোর কাপড় ওটাকা দিয়ে কিনে দিন কাকীমা ; ওদের ভোগে লাগ্‌লেই টাকা আমার সার্থক হবে।"

"তুমি যখন দিয়েছ মা, তখন কাপড় কিনে দেব বৈ কি ! একশ টাকা তো কাপড় কিন্‌তে লাগবে না নীহার, তাই আমি মনে করছি কনক, বেন্থুর ছ'জোড়া কাপড় কিনে দিয়ে বাকী টাকা দুর্ভিক্ষ সমিতিতে পাঠিয়ে দেব। তোমার কাকা গরীব হলেও তাঁর বাড়ী আছে, ঘর আছে, করে' খাবার সামর্থ্য আছে ; তোমার মত মেয়ে জিতুর মতন ছেলে আছে কিন্তু বন্যায় যাদের সর্ব্বস্ব গেছে, তাদের যে কি দুঃখ নীহার, তারা যে সকলেরই দয়ার পাত্র। এ টাকায় কত দুঃখী খেয়ে বাঁচবে মা।"

দুঃখীদের দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে আমার দুঃখিনী মায়ের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। দুঃখী ভিন্ন দুঃখীর দুঃখ সংসারে কয়জনা বুঝিতে পারে ?

কিছুকাল চিন্তার পর নীহার বলিল "বন্যা-পীড়িত লোকের চেয়ে কাকার অবস্থা—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন "তোর কাকা গরীব হলেও নিরাশ্রয় ত নয় নীহার। দরকার হ'লে তোদের কাছে হাত পাত্‌তে আমার লজ্জা নেই মা ; তোরাই যে আমার অসময়ের ভরসাস্থল। ওঁর শরীর ক্রমেই ভাল হচ্ছে, শীগ্‌গীরই উনি একটা কাজের যোগাড় করে নেবেন, তখন আর কোন অভাব থাক্‌বে না। এতগুলো টাকা আমার সংসারে অযথা অপব্যয় না ক'রে সেই গৃহ-হারা অনাথদের ক্ষিধের অন্ন যদি জুগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে একটা কাজের মতন কাজও হয়, তোর ও কল্যাণ হয়—কনকেরও কল্যাণ হয় মা ! ক্ষুধিতের অন্নদান যে সকলের চেয়ে বড় দান নীহার।"

মা এমনভাবে যুক্তি তর্কের দ্বারা নীহারের মনটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন যে তাহার এতটুকু চিত্তক্ষোভও জন্মিবার অবসর হইল না। সে প্রশান্ত বদনে কহিল "আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে কাকীমা ; কাউকে দিয়ে ওদের দুজোড়া কাপড় আমায় আনিয়ে দিন।"

মা নোটের তাড়ার মধ্য হইতে একখানি দশটাকার নোট লইয়া বলিলেন "আমি এখুনি কৈবর্ত্ত বৌকে দিয়ে তাঁতী পাড়া থেকে কাপড় আনিয়ে দিচ্চি। কাপড় আন্‌বার সময় দুর্ভিক্ষ সমিতিতে খবর দিয়ে আসবে। আজ পুজোর দিনে মা'য়ের নাম ক'রে তোরা দু'বোনে টাকা দিয়ে দিস। এতদিন কনক তোর স্নেহই নিয়েছে, আজ পুণ্যের অংশও ভগবান তাকে দেবেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি কনক যেন এমন গভীর ভালবাসার ঋণ একটুও পরিশোধ করতে পারে। শৈশব জীবন থেকে তোরা যেমন জড়িত হয়ে গেছিস—সমস্ত জীবন যেন তোদের এ স্নেহের বন্ধন অক্ষয়, অটুট হয়ে থাকে।"

ছল ছল চক্ষে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আমরা দুই বাল্যসখী ভূমিষ্ট হইয়া মায়ের পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইলাম।

(ক্রমশঃ)

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্বশুরালয়।

বালিকারা বালিকা-সুলভ কল্পনা বলে, আপন আপন শ্বশুরালয়ের যে উজ্জ্বল চিত্র আপনাদের নবীন ও সদ্য বিবাহ প্রফুল্ল হৃদয় মধ্যে আঁকিয়া রাখে ঈশানী স্বামীসহ ঢাকায় আসিয়া, তাহা অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও সুসজ্জিত শ্বশুরালয় দেখিল। দেখিল, বৃহৎ ও সুদৃশ্য বাটী বিবিধ মূল্যবান ও সুদৃশ্য গৃহ-সজ্জায় পূর্ণ; সন্ধ্যায় বাটীতে আলোকের বাহার দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। শ্বশ্রূঠাকুরাণী নানাবিধ অলঙ্কার ভারে আপনাকে প্রপীড়িত করিয়া, পরিচারিকাগণ পরিবৃতা হইয়া, অবগুণ্ঠনবতী সুসজ্জিতা নববধূকে সঙ্গে লইয়া একদিন দ্বিপ্রহরে, আপনাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ও গাড়ী, ঘোড়া আস্তাবল ও রূপী বাঁদর, কাকাতুয়া প্রভৃতি দেখাইতে গেলেন। ঈশানী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আস্তাবলে বলিষ্ঠ অশ্ব সকল এবং সুদৃশ্য শকট সকল দেখিল; বাঁদরের নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দেখিল, এবং কাকাতুয়ার নানারূপ বুলি শুনিল। তাহার পর আরও দেখিল, বাটীতে দাসদাসীর সংখ্যা অনেক বেশী;- এত দাসদাসী লইয়া তাঁহারা কি করেন, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সে এটা সহজেই বুঝিতে পারিল যে তাহার শ্বশুর মহাশয়, তাহার নিরীহ পিতার অপেক্ষা অনেক বেশী ধনশালী। শ্বশুর এইরূপ ধনশালী হওয়ায়, সে তাহার নবীন বক্ষে একটু গর্ব্বও অনুভব করিল।

পাকস্পর্শের দিন, কতকগুলি আত্মীয় স্বজন বেলা একটার সময় আহারে আহুত হইয়াছিলেন। ঈশানীকে প্রায় প্রহর কাল ধরিয়া, বহু অলঙ্কারে ও বেশ বিন্যাসে সজ্জিত করিয়া, এবং একটি পায়স পূর্ণ সুবর্ণ নির্ম্মিত পাত্র তাহার হস্তে প্রদান করিয়া, নিমন্ত্রিতদের নিকট পাচিকাগণ লইয়া আসিল; সে বস্ত্রালঙ্কার ভারে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া অতিকষ্টে সর্ব্বপ্রথমে সেই পায়সান্ন সুবর্ণ নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত চামচ দ্বারা আহুতগণ মধ্যে বিতরণ করিল। পরে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া, নানারূপ ভোজ্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত রূপে আহার করাইল। খাইয়া সকলেই বলিলেন, নব-বধূমাতা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বরূপিনী; তাঁহার লক্ষ্মীমন্ত স্পর্শে খাদ্যদ্রব্য সকল অমৃতের মত সুস্বাদু হইয়াছে।

সেইদিন রাত্রে বাটীতে খুব আলোক মালার বাহার হইয়াছিল। এবং তাহার সহিত খুব ধূমধামের সহিত সান্ধ্য ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ইহা সান্ধ্যভোজ হইলেও, সন্ধ্যাকালে ইহা অনুষ্ঠিত হয় নাই; তত সমারোহ ব্যাপার কি সন্ধ্যাকালেই সংঘটিত হইতে পারে? রাত্র একটার পর নিমন্ত্রিতগণ আহারে বসিলেন। ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন কি না, বা তাঁহাদের ভোজন কিরূপ হইল, তাহা ঈশানী অন্তঃপুরবাসিনী নববধূ হইয়া, জানিতে পারিল না। কিন্তু যে স্থানে উপঢৌকন বিনিময়ে আপনার বধূ-মুখ দেখাইবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া বসিয়াছিল, সেই স্থান হইতে সে আহুতা, অলঙ্কার ভূষিতা ভদ্রাগণকে দেখিতে পাইতেছিল। সে দেখিল নিমন্ত্রিতাগণ গান বাজনা শুনিয়া ক্লান্তা হইয়া ও নিদ্রাকাতরা হইয়া, সেই নিশীথ ভোজনে বসিল বটে, কিন্তু কেহই পরিতৃপ্তা হইতে পারিল না। ঈশানী একটা ব্যাপারে কিছু বিস্মিত হইল। যাহাদের আহারের জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, তাহাদের আহার কালে বাটীর কোন লোক আহার স্থানে উপস্থিতই হইল না; উপযুক্ত তত্ত্বাবধান অভাবে, পরিবেষণকারিণীগণ ঘুমঘোর চক্ষু লইয়া, দেখিয়া সকলকে সকল ভোজ্যদ্রব্য পরিবেষণ করিয়া উঠিতে পারিল

না ;—কেহ বহুবার চাহিয়াও একটু তৃষ্ণার জল পাইল না ; কেহ বেগুনভাজা পাইল ত লবণ পাইল না ; কেহ পলান্ন পাইল বটে, কিন্তু কালিয়া সংগ্রহ করিতে পারিল না ; কেহ বার বার রাশি রাশি লুচি পাইল, কিন্তু একটু ছোলার ডালও পাইল না ; কেহ বার বার ক্ষীর পাইল, কিন্তু একটু দই পাইল না। ফলতঃ অব্যবস্থায় অনেক জিনিষ অপচয় হইল বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিতাগণ কেহই পরিতৃপ্তা হইতে পারিল না ; সকলেই বিরক্ত হইয়া বাটি ফিরিল ; কেহ কেহ বাটীর লোকের অযথা অহঙ্কার সম্বন্ধে কিছু কিছু নিন্দা করিয়া গেল।—শ্বশুরবাটীর এই নিন্দাগুলা ঈশানীর গাত্রে তীরের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল।—এই দুই তিন দিনেই সে শ্বশুর বাড়ীকে এত ভালবাসিতে শিখিয়াছিল যে, সে বাটীর সামান্য নিন্দাও তাহার সহ্য হইত না।

সেইদিন রাত্র প্রায় দুইটার সময়, ঈশানী পুষ্পভূষায় ভূষিতা হইয়া, এক দাসী কর্ত্তৃক স্বামীর কক্ষে নীতা হইল। সেই সুসজ্জিত কক্ষে ফুলশয্যা রচিত ছিল। শ্রীমান শরৎ কুমার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া ফুলের সুশোভন মালা পরিয়া সেই শয্যায় বসিয়াছিল। ঈশানীও আসিয়া স্বামী পদপ্রান্তে, অবনত মুখ অবগুণ্ঠন আবরণে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া বসিল। দুই একজন আত্মীয়ার অনুরোধে, শরৎকুমার নিজের গলার মালা খুলিয়া ঈশানীর কণ্ঠে পরাইয়া দিল ; লজ্জা-কুণ্ঠিতা ঈশানীও আত্মীয়াগণের বহু অনুরোধে আপন কণ্ঠের পুষ্পমাল্য স্বামীর গলায় পরাইয়া দিল। এইরূপে মালা বদল কার্য্য সমাধা করিয়া আত্মীয়াগণ প্রস্থিত হইলেন। তখন শরৎ কুমার উঠিয়া পত্নীকে আপন পার্শ্বে শোয়াইয়া যে কত আদর করিল, তাহা আমরা সমস্ত বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিব না। কখনও চিবুক ধরিয়া ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা ঈশানীর মুখ আপন মোহমুগ্ধ নয়নের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল যে এমন সুগঠিত সুধাপূর্ণ মুখ, সে পৃথিবীতে আর কখনও দেখে নাই ; তাহা পূর্ণ শশধর কিম্বা প্রস্ফুটিত শতদল অপেক্ষা শতগুণ সুললিত। কখনও পত্নীর লজ্জা-চিত্রিত কপোলদেশ চুম্বিত করিয়া বলিল যে, সেই গণ্ড গোলাপদল অপেক্ষা নয়নাভিরাম। কখনও অধরের স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিল যে, তাহা স্বর্গের সুধা অপেক্ষা মধুর। কখন পত্নীর কাণের কাছে মুখ আনিয়া আগ্রহভরে বলিল যে, তাহাকে সে প্রাণ অপেক্ষা শত সহস্র গুণ বেশী ভালবাসে ; জল অভাবে মৎস্য বরং বাঁচিতে পারে, কিন্তু তাহার অভাবে সে নিশ্চয় প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না। কখনও তাহাকে এই ধ্রুব-সত্য-গুলা বুঝাইয়া দিল যে, সে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী, সে প্রাণেশ্বরী, সে প্রাণাধিকা, সে ননীর পুত্তলি, স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালে যাহা কিছু মনোহর ও শ্রেষ্ঠ আছে, সে তাহা সবই।

নবোঢ়া তরুণীরা আপনাদিগের রোমাঞ্চিত নবীন হৃদয় লইয়া পুরুষ স্বামীর কোন প্রেমকথা অবিশ্বাস করিতে পারে না। ঈশানীও যুবক স্বামীর কোন কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না ; সব কথাগুলিই আনন্দে অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ধারণা লইয়া, সে কত সুখিনী হইয়াছিল, তাহা আমরা ক্ষুদ্র লেখক কেমন করিয়া বলিব ? আহা ! বিধাতা কি কিছুদিন তাহাকে এই সুখ উপভোগ করিতে দিবেন না ?

শ্বশুর বাটীর ঐশ্বর্য্যের কথায় এবং শরৎ কুমারের ভালবাসার কথায় সরলা ঈশানী তাহার সরল হৃদয় পূর্ণ করিয়া, স্বামীর সহিত ষ্টীমারে চড়িয়া মহানন্দে আবার পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। লজ্জাবশতঃ সে স্বামীর অগাধ ভালবাসার কথা মাতার নিকট বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু শ্বশুর বাটীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা, সেই ভালবাসার মিষ্ট রসে সিঞ্চিত করিয়া তাঁহার নিকট বার বার সবিস্তার বিবৃত করিল। এবং ঈশানী নিভৃতে অত্যন্ত গোপনে দাসীর নিকট স্বামীর যে ভালবাসার কথা প্রহরকাল ধরিয়া বর্ণনা করিয়াই শেষ করিতে পারে নাই তাহাও ক্রমে মাতার কর্ণে প্রবেশ করিল।

বুদ্ধিমতী প্রমদা উভয় কথা শুনিয়া, মনে মনে একটা মহা গর্ব্ব অনুভব করিলেন। এবং এইরূপ সুখকর বিবাহটা ঘটাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, আপনার মহাবুদ্ধির মনে মনে প্রশংসা করিলেন। তিনি সমাগত জামাতাকে তাহারই ঐশ্বর্য্যের উপযুক্ত নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া, অতি যত্নের সহিত আহার করাইলেন ; এবং তাহার সুখ সাচ্ছন্দ্যের আপনি ব্যবস্থা করিলেন ; কয়েকদিন বাটীতে অহরহ যেন একটা উৎসব লাগিয়া রহিল।

কল্যাণী ও যদুপতির দুর্ভাগ্য যে তাহারা এই উৎসব-আনন্দ উপভোগ করিয়া যাইতে পারে নাই; যেদিন সন্ধ্যাকালে ঈশানী তাহার ঐশ্বর্য্যময় শ্বশুরালয় হইতে স্বামীসহ প্রত্যাগতা হইয়াছিল, তাহার পরদিন প্রত্যুষেই তাহারা সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিয়াছিল।

শ্রীমান্ শরৎকুমার কয়েকদিন শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর নিকট ঐশ্বর্য্যবান জামাতার আদর, ও নবীনা পত্নীর নিকট নবীনার নব প্রেম উপভোগ করিয়া, পরমানন্দে শ্বশুরালয়ে বাস করিল। তাহার পর, শ্বশুর-শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদযুক্ত পদধূলি গ্রহণ করিয়া, ক্রন্দনমানা বিরহ-কাতরা পত্নীর নিকট আদর ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বিদায় লইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, প্রণয়পত্র লিখনের প্রতিশ্রুতি প্রদান ও গ্রহণ করিয়া, দাসদাসীকে পুরস্কৃত করিয়া, বড় দুঃখেই সেই অত্যজ্য সুখ ত্যাগ করিয়া গেল।

প্রমদা বসনাঞ্চলে আপন অশ্রুপূর্ণ চক্ষু আবৃত করিয়া অখিলবাবুকে বলিলেন, 'তুমি টাকা খরচ করতে চাও নি; বেশী টাকা খরচ করতে না পারলে কি আমরা এমন জামাই দেখতে পেতাম।'

অখিলবাবু ইদানিং প্রেমময়ী পত্নীকে মাঝে মাঝে দুই একটা নির্ব্বোধের মত কথা বলিয়া ফেলিতেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে আজও তিনি পত্নীর সরল প্রশ্নের একটা দুঃশীল উত্তর দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'টাকা না খরচ করেও যদুপতিও আমাদের মন্দ জামাই হয় নি।'

প্রমদা মহারোষভরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বলিল, "কিসে আর কিসে!"

(ক্রমশঃ)

রবিবারের উত্তর

(চোরা গুপ্তির প্রতি)

[শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী]

গা'ল খেয়ে ঘা'ল হয়ে কেউ কভু মরে না,
দুর্ব্বল সিংহও ফেরুকুলে ডরে না।
পিশাচের তাণ্ডবে প্রেতিনীর গন্ধে
শব সাধকেরা কভু পড়েনাক ধন্ধে।
যত পারো গাল দাও কর' মুখ খিচুনী
খুব জোর নাম পাবে ও-পাড়ার মেছুনী।
দিস্তা দিস্তা লিখে কর' মুখ খিস্তী
আঙুলের জোরে মাৎ হবে নাক কিস্তী।
জানো ভাই কাহাদের 'গালি' বলে চিরকাল—
ক্লীব নও, নটী নও, কেন তবে ছোড়ো গা'ল।
মুখের থুথুরে ফিরে চোখে পেয়ে লাভ কি,
ভবী কি সহজে ভুলে পেয়ে ভুয়ো ভাব্‌কী?

দাম নিয়ে অপভাষা শুনাইছ সবারে,
দগ্‌দগে পোকাপড়া ঘা ঢাকে না কভারে।
সাধু সাধু বীরবর নিজে রয়ে' আড়ালে
লক্‌লকে টক্‌টকে জিভখানি বাড়ালে।
কাল্‌চার আছে শুনি, ভারি সব উঁচু দিল,
তবে কেন ও রসনা পঙ্কিল অশ্লীল?
বিজ্ঞ ঘেঁষারা শুনি ভারি সব মার্জ্জিত
কি রকম তরিবৎ বুঝ্‌তে তা' পার্চ্ছিত।
রঙ মেখে সঙ দিলে হাসে বটে ইতরে,
সঙদারে ঘৃণা করে সবে তবু ভিতরে।
ছুঁচা যদি তাড়া দেয় হাসে বটে বালকে,
ছুঁচাটিরে উচা করে' তবু বলে ভাল কে?

বড়দিনের একদিন

(বি-চিত্র ভ্রমণ কাহিনী)

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

প্রস্তাবনা

নিত্যকার কর্ম্মকোলাহল হঠাৎ একদিন নীরব হয়ে যখন জানিয়ে দিলে বড়দিন ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছে, তখন এই বলে আক্ষেপ হল,—আগে থেকে কোনও রকম প্রোগ্রাম করে, কোথাও বেরিয়ে পড়বার মতলবটা এতদিন মাথার মধ্যে প্রবেশ করেনি কেন! ছুটির সময় বাড়ীতে বসে থাকাটা বিশ্রাম লাভের দিক দিয়ে মনোরম হলেও, শরীর ছাড়া আর একটা যে বড় জিনিষ আছে আমাদের মন, তার মোটেই প্রীতিকর হয় না—একথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কাজেই খুঁতখুতে মন নিয়ে, কি ভাবে বড়দিন কাটান যায় এই একটা বিষম সমস্যায় পড়াগেল। বন্ধুদের মধ্যে কেউবা গেলেন দেওঘর, কেউবা পুরী, আর কেউবা ওয়ালটেয়ার। তাঁরা আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন, কাজেই তাঁদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার মত ভরসা পেলুম না। কাজেই দু একজন আমারই মত সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ সুরু হল—কি করে ছুটিটা উপভোগ করা যেতে পারে। তখনই একটা 'কমিটী' ঠিক হয়ে গেল, দু দিনের মধ্যেই একটা যা হয় মতামত সাধারণ্যে প্রকাশ করতে হবে; আর সেই অবসরে, Zoo, Botanical Garden, আর বায়স্কোপ দেখে, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নিতে হবে।

যাই হোক, অনেক আলোচনা বাক্‌বিতণ্ডার পর কমিটীর রায় বাহির হল—বিলাতে যেভাবে ছেলেরা ছুটির ঘণ্টা কাটায় সেই উপায়ই অবলম্বন করতে হবে, আর আমাদের দেশেও আজকাল এ ভাবে ছুটি কাটান যে বেশ প্রসার লাভ করছে—তার নিদর্শনের অভাব নেই। কাজেই যখন রায় বেরুল—পদব্রজে ডায়মণ্ডহারবার যাত্রা করতে হবে, তখন সকলে প্রথমে একটু চমকে উঠলেও, একটা 'নতুন কিছু' করার আনন্দে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। ভ্রমণে অপটু চরণ দুখানিকে এই দীর্ঘপথ নিয়ে যাবার কথা স্মরণে মনে একটু শঙ্কাও যে জাগে নি এমন নয়,—কিন্তু তত্রাচ আট জন এই যাত্রায় সফলতা লাভ করবার জন্য উদ্যোগী হলেন।

অপর পাঁচজনের কাণে যখন আমাদের যাত্রার সম্বাদ পৌছল, তখন তাঁরা বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে যা জানালেন, তার মধ্যে একটি কথা পরিস্ফুট হয়ে পড়ল, যে এদের মস্তিস্কের বিকৃতি সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁদের উক্তিকে সত্য বলে গ্রহণ করার ফলেই হোক, আর বাড়ীর অভিভাবকদের উপদেশফলেই হোক্—যাবার সময় দেখা গেল উদ্যোগী তরুণের সংখ্যা ঠিক অর্দ্ধেকে গিয়ে পৌচেছে। আমরা তখন চারটি প্রাণী—শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান নলিন বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান কিরণকুমার গাঙ্গুলী ও স্বয়ং যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম।

যাত্রা

যাওয়া যখন স্থির, তখন "অর্দ্ধং ত্যজতি" নীতিবাক্যের উপদেশটুকু স্মরণ করে শুক্রবার রাত্রির ভোরে, আমাদের নিরুদ্দেশ পাড়ির (অবশ্য স্থলপথে) বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। নিরুদ্দেশ পাড়ি বলছি এই জন্য যে ডায়মণ্ডহারবার আমাদের লক্ষ্য হলেও (আমরা যে পাকা জহুরী, আমাদের লক্ষ্য দেখে তা বোধ হয় সকলেই বুঝছেন) সেখানে কখনও আমাদের চরণ স্পর্শ ঘটে নি, আর পরিচিত বা অপরিচিত কোনও লোকের কোনও রকম সন্ধান পাই নি—কাজেই রত্নবণিকদের মত রত্নের আশায় অকূলে ভাসা ভিন্ন আর কি বলতে পারি?

শুক্রবার দিনেই যাত্রার আয়োজন করে ফেলা হল। রাত্রি চারটার সময় ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেই যাত্রা প্রশস্ত বলে মনে হল,

ঠিক রইল সেই সময়ে যেখানে মাইলষ্টোন পাঁচের অঙ্ক বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সকলে হাজির থাকবে।

রাত্রি তিনটার সময় শয্যাত্যাগ করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। শীতের রাতে অন্ধকার পথে চলতে, সুখশয্যা আর লেপের আরাম ছেড়ে বিদ্রোহী মন কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না, কিন্তু অজানার এই অভিসারে তরুণ প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল, বিজয়লাভের আনন্দপাবার বিপুল উৎসাহে, নিমেষে অলসতা কোথায় চলে গেল। অপর দুজন সঙ্গীও এসে হাজির হলেন। ভাল করে গরম কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করে, ভ্রমণের উপযোগী দ্রব্যসম্ভারে প্রত্যেকে রণযাত্রী সৈন্যের মত রসদ ও জল নিয়ে সজ্জিত হয়ে পড়লুম। তার পর চতুর্থ সঙ্গীটির অপেক্ষায় প্রায় পনের মিনিট অপেক্ষা করে, উষ্ণ চা পান আর উষ্ণ কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করে, ভগবানের নাম নিয়ে অন্ধকার পথে 'হীরক বন্দরে'র আহ্বানে বেরিয়ে পড়লুম।

চতুর্থ সঙ্গীটির বাড়ী গিয়ে দেখা গেল, যা ভয় করেছিলুম তাই হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর ঘুম ভাঙ্গানর জন্য 'এলারম্' ঘড়ি দেওয়া সত্ত্বেও,তিনি তখনও দিব্য আরামে নিদ্রাঘোরে অচৈতন্য! ডাকাডাকির পর, তিনি বাহিরে এলেন, আর শীঘ্রই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছেন বলে, আমাদের বাহিরের ঘরে বসিয়ে রাখলেন। তিনি যে যাওয়ার অন্য রকম আপত্তি উত্থাপন না করে, আমাদের বসতে বললেন, এই-ই তখন আমাদের সৌভাগ্য বলে মনে হল। আধঘণ্টার মধ্যেই বিবি সাহেব (এঁর নাম বি, বি, মুখার্জ্জী—কাজেই সংক্ষিপ্ত আকারে এই নামেই ইনি পরিচিত) প্রস্তুত হয়ে, তাঁর শিকার-বন্দুকটি কাঁধে নিয়ে এসে হাজির হলেন, উদ্দেশ্য—পথে যদি দু একটা শিকার জোটান যায়।

অনেক রাত্রি থেকে চলতে আরম্ভ করলে পথে কষ্ট হবে না, এ জানলেও যখন আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা করলুম তখন পাঁচটা বাজতে আর পনের মিনিট মাত্র বাকী!

পথে

শনিবার ২৭শে ডিসেম্বর—১২ই পৌষ

"এবার যাত্রা হল সুরু মোদের ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার—"

—এই গান ধরে ত যাত্রা আরম্ভ হল। নিঝুম শীতের রাত—অন্ধকার পথের ধারে এক একটা আলো মিট্ মিট্ করে তারা-ভরা-আকাশের দিকে চেয়ে আছে; বন্ধ দোকান ঘরের দোর জানালার ছিদ্র দিয়ে আলোক রশ্মি অন্ধকারের বিরাট স্তূপকে তীর-বিদ্ধ করছে। এই সব দেখতে দেখতে মহা উৎসাহে চলতে লাগলুম। কাণে বাজছে শুধু আশার বাণী,—চোখে ভাসছে লক্ষ্যস্থানে পৌছানর বিজয়দীপ্ত আনন্দের হিল্লোল, আর প্রাণের মধ্যে চঞ্চল রক্ত বলে উঠছে—মা ভৈঃ—আগে চল! আগে চল!.....

কচিৎ দু একখানা গরুর গাড়ী ঘড়্ ঘড়্ করে চলে' দোকানের কোল-ঘেঁসে-শোওয়া দুই একটা কুকুরের ঘুমের ব্যাঘাত করছে—কিম্বা দূর পথের যাত্রী একটি আলো জ্বালিয়ে তখন পথে চলতে আরম্ভ করেছে!

বরাবর সোজা ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে চলেছি,—ঘুমন্ত পল্লী ছাড়িয়ে, অন্ধকারের কোলের মধ্য দিয়ে শিশির-ভেজা পথের ওপর আমাদের চলার চিহ্ন রেখে। খানিক পরে পথের ধারে দোকান ঘর নেই—কেবল বড় বড় গাছ পথটার ওপর যেন কালো কালীর বৃষ্টি করছে—নিস্তব্ধ প্রকৃতির এই গম্ভীর ভাব উপেক্ষা করে, আমরা বিজয়ী বীরের মত কখনও গল্প করতে করতে, কখন বা গান গেয়ে গেয়ে চললুম। ক্রমে আলো ফুটতে লাগলো—আমরাও মাঠের মাঝ-দিয়ে চলা, এই প্রশস্ত রাজপথ ধরে চললুম।

পথে দু একজন লোক চলতে সুরু করেছে। অন্ধকার থাকতে চলতে আরম্ভ করেছি শুনে, দু একজন জানালে যে, পথে বদমাইসেরা সুযোগ পেলে আমাদের আক্রমণ করতে পারত। আমরা অবশ্য, সঙ্গে বন্দুক থাকায়, সেটাকে বিশেষ ভয়ের কারণ বলে ভাবতে পারলুম না। আলো ছায়ার মধ্যদিয়ে চলতে ভারী আমোদ লাগছিল। কুয়াসা ঘন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, দূরের কিছুই দেখা যায় না, কেবল ধোঁয়া আর ধোঁয়া......পাশে অদূরে মাঠের ওপর কাটাধানের আঁটি পড়ে আছে; ম্লান আলোকে মনে হচ্ছে যেন একটা পল্টনের সৈন্যদল পথের ধারে শত্রুর আশা—পথ চেয়ে আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

কুয়াসার অন্ধকার ভেদ করে পূবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল—দিনমণি জানিয়ে দিলেন, রাত্রির অবসান হয়েছে। পথের পাশে গাছগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনের স্ফূর্ত্তিও যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

অদূরে পল্লীর মধ্যে যে কাজের সাড়া পড়ে গেছে, তার শব্দ আমাদের কাণে এসে বাজছে। মাঠে কৃষাণরা মাথায় কাপড় বেঁধে কাজে লেগে গেছে। কেউ বা এক হাতে দুটো গরুর দড়ি ধরে, আর এক হাতে হুঁকো ধরে তামাক খেতে খেতে মনের আনন্দে চলেছে। পাখীর গান, লোকজনের আনন্দরত কর্ম্মের কোলাহল প্রাণে একটা আনন্দের সুর জাগিয়ে তুলছিল। রাস্তার পূর্ব্বদিক দিয়ে যে ছোট রেলের লাইন ফলতা অবধি গিয়েছে, সেই লাইনে গাড়ী এসে পড়ল। এই ভাবে চলতে চলতে, আমতলায় প্রাতরাশের জন্য যখন উপস্থিত হলুম, তখন বেলা ৮টা। আমরা মাইল ষ্টোন দেখে বুঝলুম, সবে ৯ মাইল পথ অতিক্রম করেছি।

চা তৈরী করে, রুটি মাখন ভাগ করে খেতে প্রায় তিন কোয়ার্টার কেটে গেল। এখানে দোকান থেকেও কিছু খাবার নেওয়া হল। তারপর আবার যাত্রা করা হল। আমাদের শিকারের পার্টি ভেবে, পথে অনেকে পাখীর সন্ধান দিতে লাগল, কিন্তু পথের ধারে বিশেষ কিছু লোভনীয় দেখতে পাওয়া গেল না

আবার সেই চলা ; তবে পথে এখন লোকজন অনেকেই যাতায়াত করছে। এক এক স্থানে পথের ওপর ছোট্ট একটু খানি গ্রাম—চালে লাউ গাছ ভরা ছোট ছোট মেটে ঘর.... ছোট ছেলেমেয়েরা পথের ধারে খেলা করছে। রাস্তার দু'ধারে আর বড় গাছ পালা নেই, মাঝে মাঝে এক একটা বাবলা বা বাদাম গাছ। মাথায় সূর্য্যের কিরণ, আর পথ ছায়াহীন হওয়ায়, একটু অসুবিধা বোধ হতে লাগল।

বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় আমরা ফতেপুর হাটে এসে পৌছলুম। কালীঘাট-ফলতা লাইন, এই খানে রাস্তা পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। এই খানেই আহারাদির বন্দোবস্ত হল। আবার চা, রুটি নিয়ে জলন্ত উদরে নিক্ষেপ করে কিছু ক্লান্তি দূর করা গেল। আমরা আরও সাত মাইল পথ এসেছি,—এখানে শুনলুম আর ১০ মাইল পথ গেলেই আমাদের লক্ষ্য স্থানে পৌছান যাবে। বেলা ১টার সময় আবার বেরিয়ে পড়া গেল। পথ ধূ ধূ করছে,—পথের ধারে গাছপালা নেই—রোদেরও তেজ দীপ্ত হয়ে উঠল। আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখা গেল না। কমলালেবু, লজেঞ্জুস, প্রভৃতি খেয়ে তৃষ্ণাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করা হল। সঙ্গে জল থাকলেও, ঘর্ম্মাক্ত হওয়ায় পান করতে ভরসা হল না। এই সময়টায় বিশেষ কষ্ট অনুভূত হল। আমাদের বিবি সাহেব ত গাড়ী পেলে ভাড়া করবেন বলে জানালেন। তাঁকে কোনও ভাবে ওই ইচ্ছাটি সম্বরণ করবার নানা রকম মতলব দিয়ে, ক্লান্ত শরীরে চলবার জন্য অপর তিনজনে উৎসাহ দিতে লাগলুম। আড়াইটার পর রোদের চণ্ডভাব দূর হলে, কষ্টের কিছু লাঘব হল। পায়ের অবস্থা তখন বেশ চমৎকার হয়ে উঠেছে—একবার বসলে আর উঠবার শক্তি যেন থাকে না। কোনও ভাবে আশ্বাস দিতে দিতে, তাঁর প্রাণে উৎসাহের নূতন ধারার সৃষ্টি করে, আমরা যখন গন্তব্য স্থলে এসে উপস্থিত হলুম তখন বেলা ৪টা বেজে মিনিট পাঁচেক হয়েছে। সেখানে মাইল ষ্টোনের গায়ে অঙ্কিত সংখ্যা একত্রিশ।

ফোর্ট সম্মুখে দেখা গেলেও, সেদিন যাবার মত আর শক্তি ছিল না। রাত্রিবাসের জন্য অনেক স্থানীয় ভদ্র-লোককে সন্ধান দিতে বলায়, বিশেষ প্রীতিকর একটিও ঘরের নিশানা কেউ দিতে পারলেন না। Lock gate আর গঙ্গার তীরের চমৎকার দৃশ্য দেখে, সেই দিনকার ট্রেণেই বাড়ী ফিরা যুক্তি সঙ্গত মনে হল। স্থানীয় মুন্সেফ শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রের কাছ থেকেই আমরা যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতি পেয়েছিলুম। স্কুল গৃহে রাত্রিবাসের মত আয়োজন তিনি করতে চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিলেও, সকলে সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। শ্রীচরণের অবস্থা তখন শোচনীয়। কাজেই আশে পাশের আদালত ঘর, গঙ্গাতীরের শোভা সন্দর্শন করে আমরা সটান ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। চা ও খাবারে পরিতৃপ্ত হয়ে ট্রেণে বসলুম। ছটার সময় ট্রেণ ছাড়ল ; তারপর—তারপর যথারীতি স্বস্ব গৃহে প্রত্যাগমন—বড়-দিনের ভ্রমণ-কাহিনীও সমাপন।...

কাজের ধারা

[শিবরাম চক্রবর্ত্তী]

তুমি আছো আকাশপানে চেয়ে,
আমি আছি চেয়ে তোমার মুখে !
হারিয়ে গেছি তোমার চোখে যেয়ে—
তোমার আঁখি হারায় মাঠের বুকে !

আকাশপানে চেয়ে আছই বটে,
হারিয়ে গেছ বটেই শ্যামল ক্ষেতে !
চোখে তোমার কৌতুক যে, ঠোঁটে
চাপাহাসি খেলছে পলকেতে !

চেয়ে আছি তোমার পানে তাও
না দেখেও দেখ্‌তে যেন পাও,
ভালকরে দেখ্‌তে তোমায় দাও,—
তাইকি হেসে আকাশপানে চাও !

শূণ্যপানে চেয়ে কি পাও সুখ
বুঝতে না চাই, বুঝতে পারিনে !
পূর্ণপ্রাণে তোমার মিষ্টি মুখ
দেখ্‌তে আমি মোটেই ছাড়িনে !

আমার আঁখির এই যে চপল ত্রুটী
মনে মনে মাপ করেচ তুমি,—
কৌতুকে তাই হাস্‌ছে আঁখি দুটি
আপ্‌নি হাসি ফুট্‌চে অধর চুমি !

চেয়ে আছি তোমার পানে তাও
না দেখেও দেখ্‌তে যেন পাও,
ভালকরে দেখ্‌তে তোমায় দাও,—
তাইকি হেসে আকাশপানে চাও

জমাদারের আত্মকাহিনী

(গল্প)

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

মেথরাণী হ'লে কি হয়—অনেক রাজরাণীরও তেমন রূপ ছিল না—সে আজ নেই, থাকলে দেখাতাম কি চোখ, নাক মুখ, সুডোল হাতপা, আর মাজার বা কি ঢং—চলন দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়—লখিয়া যেন আমাদের ঘরে গোবরে পদ্মফুল ছিল।

সে বাবুটি আজ হাইকোর্টের জজ। তাঁদের বাথরুমের কাজ লখিয়া করতো। আমি বাইরে ব'সে গাঁজা টিপছি ও গুণ্‌গুণ্ করে একটা গজল গাইছি—কতক্ষণে লখিয়া কাজ সেরে আসবে। ফাগুনের সন্ধ্যা—দাখণে বাতাস উঠেছে—পাখীগুলো মাথার উপর নারকেল গাছে ব'সে কি যে কিচিরমিচির করছে—আর এওর ঠোঁটে ঠোঁট দিচ্ছে—কেন দিচ্ছে বুঝলাম না।

হঠাৎ বাথরুমের ভিতর হ'তে লখিয়ার গলা শুনলাম। ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বলছে—"দশ রূপেয়াকে লিয়ে হাম্ লাখোরূপেয়াকে ইজ্জত দেউঙ্গী ?"

বাথরুমের মেথরের দরজা ঠেলে দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। কিসের ঝটাপটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। বড়লোকের বাড়ী ভয়ে কিছু বলতেও পারি না—বুকের মধ্যে ঠিক যেন ঢেঁকিতে পাড় দিতে লাগলো।

আমি মেডিকেল কলেজের জমাদার ছিলাম। সন্ধ্যার হাজিরার সময় হ'য়ে গিয়েছিল—ব্যাপার কি না জেনেই চাকরিতে হাজিরা দিতে ছুটলাম। রাত্তির দশটার সময় এম্বুলেন্স গাড়ীতে মেয়েদের ওয়ার্ডে একটা রুগী এল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সন্তান নষ্ট হওয়ায় রক্তস্রাবে সে নাকি এসেই মারা গিয়েছে। মেয়ে ওয়ার্ডের জমাদারণী এসে কানে কানে আমায় জানিয়ে দিয়ে গেল—সে যে আমারই লখিয়া !

তারপর তিনদিন মুখে ভাত উঠে নি। দেহে জীবন থাকতে একটীবার দেখাও হ'ল না। লখিয়ার মৃতদেহ নিয়ে সারারাত কেঁদেছি। সাহেবের হুকুমে লখিয়াকে নিয়ে ময়না ক'রে তাকে পোড়াবার বন্দোবস্ত অন্য সব জমাদারেরা করলো। লাল পাছাপাড় কাপড়, কপালে সিঁদুর-ঢালা, সতীলক্ষ্মী আমায় ত্যাগ ক'রে কোথায় চলে গেল। এ পাপজগতে কেন মেথরের ঘরে গরীবের ঘরে তুই রূপের পসরা নিয়ে এসেছিলি লখিয়া ?

আজ বছর দুই হ'য়ে গেছে—মেডিকেল কলেজের কাজই করছি। নেশার মাত্রা খুবই বাড়িয়ে দিয়েছি। তা না হ'লে লখিয়ার ভাবনায় পাগল হ'য়ে যাই। সাহেবের কাছে ব'লে মেয়েদের ওয়ার্ডেই কাজ নিলাম। যত লাস চালানের ভার আমার উপর থাকলো। কত মেয়ে মরছে—তাদের নগ্নরূপ দেখতাম—আর লখিয়ার কথা মনে প'ড়ে বুক জ্ব'লে ক্ষার হ'য়ে যেত। এত দেখলাম কিন্তু তেমন রূপটি চোখে পড়লো না।

একদিন একটা মড়া এল,—মেয়েটির বয়স বছর ২০ হবে। কি রূপ ! লখিয়াও যেন তার কাছে হার মেনে যায়। শুনলাম বড়লোকের স্ত্রী, তিনি কোন্ হাইকোর্টের জজ, স্বামীসঙ্গ না পেয়ে মোটরের ড্রাইভারের সঙ্গে ভালবাসা হয়, কলঙ্কের কথা জানাজানি হ'লে বিষ খেয়ে মরে। কিন্তু শরীর তখনও তাজা, লাবণ্য সকল অঙ্গে ফুটে রয়েছে—যেন ফাগুনের পূর্ণিমা নিশি নিস্পন্দ হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে। লখিয়ার আজ মৃত্যুর দিন—তারই স্বপ্নে আমি বিভোর।

দেহখানা চুরি ক'রে নিয়ে আমার ছোট্ট ঘরে পুরলাম। তারপর—সব কথা মনে নেই—আমি তখন উন্মাদ অবস্থায় ছিলাম।

আজ চাকরি গিয়েছে—মৃতদেহের অত বড় অপমান আমার চেয়ে কেউ করে নি—কিন্তু আমার নিকট সে দেহে মরণ ছিল না—আমার চোখের নেশা, প্রাণের তৃষা দিয়ে সে দেহও যেন ন'ড়ে উঠেছিল।

খেতে পাই না—শোকে, দুঃখে, চিন্তায় আধমরা হ'য়ে আছি—একদিন মনে ভাবলাম জজ সাহেবের কাছে যাই—এত লোকের বিচার করছে, আর আমার বিচার করবে না—ফাঁসি দিলেও তো বাঁচি।

গেলাম জজ সাহেবের কাছে, সকল কথা খুলে বললাম—তিনি কিন্তু ফাঁসির হুকুম বা জেল কিছুই দিলেন না, বললেন আমার এখানেই থাক, কাজকর্ম করতে হবে না—ছুটো খাবি-পরবি আর থাকবি।

এইবার রাজার জন্মদিনে জজ-সাহেব মস্ত একটা খেতাব পেয়েছেন—না পাবেন কেন, এমন ন্যায়বিচারক সংসারে দেখাই যায় না।

"অভিমান"

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন দে

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]   ১৮ই মাঘ শনিবার, ১৩৩১ ।   [১২শ সপ্তাহ

বায়স্কোপের কথা

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

মানুষ বুদ্ধির দৌলতে সংসারে সুখ এবং সুবিধা লাভের জন্য কতবিধ চেষ্টা যে করিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কাজ করিবার সহজ পন্থা সকল আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। সময় এবং টাকা এই দুইটী জিনিষের মূল্যই আজকাল সব চেয়ে বেশী সুতরাং কি করিলে একটা কাজ খুব অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে বেশ সুসম্পন্ন করা যায় বর্ত্তমান যুগের মানুষের কেবল সেই চেষ্টা।
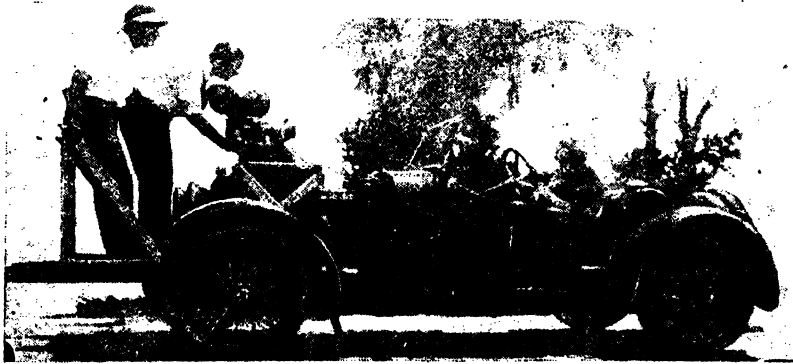
বায়স্কোপে দেখা যায় চলন্ত মোটর দর্শকগণের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মোটরের সম্মুখে এইভাবে ক্যামেরা স্থাপন করিয়া তাহার ছবি তোলা হয়।

বায়স্কোপ বর্ত্তমান যুগের একটী অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। ইহার আবিষ্কারের প্রথম দিকে নানা বিস্ময়োৎপাদক ঘটনার ছবি তুলিবার জন্ম এক একটা বায়স্কোপ কোম্পানীকে বিস্তর টাকা খরচ করিতে হইত। কিন্তু পূর্ব্বে সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাওয়ার দৃশ্য দেখাইবার জন্ম সত্যিকার জাহাজের খোল কিনিয়া সমুদ্রে লইয়া গিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া বায়স্কোপ কোম্পানী তাহা হইতে ফটো লইয়া দর্শককে দেখাইত
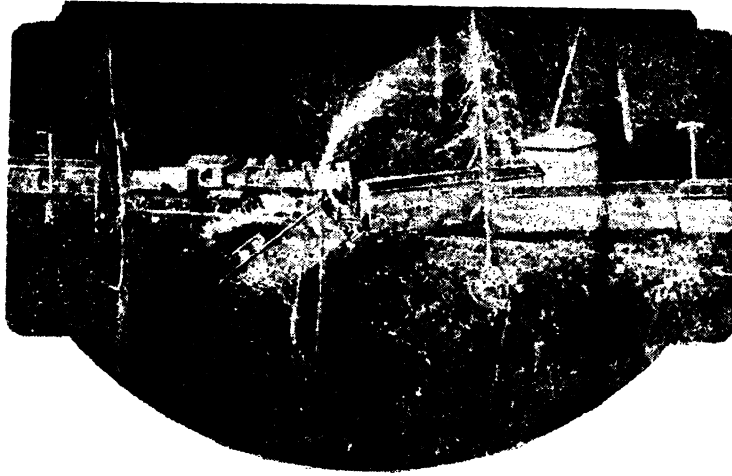
ছোট পুতুল গাড়ী ও কৃত্রিম রেল লাইনের সাহায্যে দুর্ঘটনার ছবি লওয়া হইতেছে—ইহাকেই বড় করিয়া বায়স্কোপে দেখান হইবে।

মানুষের সূক্ষ্মবুদ্ধি আজ এই সমস্তার মীমাংসা আশ্চর্য্যরূপে করিয়া লইয়াছে। আগুনে বাড়ী-ঘর পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছে, সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে এবং সেই ঝড়ে পড়িয়া জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছে, উচ্চ পাহাড়ের গায় রেলপথ ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে এবং তাহারই উপর দিয়া চলন্ত ট্রেণ হুড়মুড় করিয়া একেবারে পাঁচশত হাত নীচে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে—এই সব ঘটনা বায়স্কোপে দেখাইতে হইলে আজকাল যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাহা শুনিলে বায়স্কোপ কোম্পানীগুলিকে ফাঁকিবাজ বলিয়াই মনে হইবে. কিন্তু যা-ই মনে হোক না কেন—ইহাদের সূক্ষবুদ্ধি মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এমন ভাবে ফাঁকী দিতে সমর্থ হইয়াছে যে তাহাতে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এবং তাহাতে বিস্তর টাকাও খরচ হইত কিন্তু আজ ঐরকম ঘটনা দেখাইতে হইলে ঘরের ভিতরই সমুদ্র, অগ্নিকাণ্ড এবং জাহাজ-ডুবী সব দেখাইবার ফন্দী আবিষ্কৃত হইয়াছে! একটা চৌবাচ্চা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে ছোট্ট একটী খেলনা-জাহাজ ভাসাইয়া দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া আজকাল তাহারই ফটো লইয়া শেষে তাহাকেই খুব বড় করিয়া দেখান হয়। সমুদ্রে ঝড় দেখাইতে হইলেও চৌবাচ্চার জলে ঢেউ তুলিয়া নানা কৃত্রিম উপায়ে কাজ সারিয়া লওয়া হয়; তেমনি রেল-সংঘর্ষ, পুল ভাঙ্গিয়া রেলের পতন ইত্যাদি দেখাইতে হইলেও ছোট ছোট কৃত্রিম রেল লাইন, রেলগাড়ী ও প্ল্যাস্টার দ্বারা তৈরী ঘরবাড়ী, ষ্টেশন, পার্ব্বত্য পথের দৃশ্য প্রভৃতি তৈরী করিয়া লওয়া হয়। এই রেলগাড়ীগুলি এত

ছোট যে একটা টেবিলের উপর সেগুলিকে দাঁড় করাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহাদের ছবি তুলিয়া স্ক্রীণের উপর

উচ্চ মঞ্চের উপর ক্যামেরা স্থাপন করিয়া অগ্নিকাণ্ডের ফটো লওয়া হইতেছে।

যখন খুব বড় করিয়া দেখান হয় তখন উহারা যে নিতান্ত খেল্‌না তাহা আর মনে হয় না।

অগ্নিকাণ্ড দেখাইবার জন্য কৃত্রিম বাড়ীঘর এমন সব জিনিষ দ্বারা প্রস্তুত করা হয় যে সেগুলি আগুনে খুব তাড়াতাড়ি পুড়িয়া যায় না। আগুন দিতে মাত্রই যদি ফস্ করিয়া সব পুড়িয়া যায় তাহা হইলে আর ফটো তোলা যায় না, তাই ক্যামেরার সম্মুখে ঐ কৃত্রিম বাড়ীর আগুন নিভাইবার জন্য বহুলোক মিলিয়া ছুটাছুটি হৈ রৈ করিতে থাকে, আর এদিকে সুবিধামত জায়গায় ক্যামেরা দাঁড় করাইয়া ফটো তোলা হয়।

কোন ষ্টেশনে সাধারণ যাত্রীদের দৃশ্য দেখাইবার জন্য বায়স্কোপ কোম্পানীর লোকগণ কেমন সহজভাবে বসিয়া আছে!

বায়স্কোপ কোম্পানীতে এক একজন লোক এমনি ওস্তাদ থাকে যে সে একা ফটোগ্রাফী, স্থাপত্যবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারীং, অভিনয় সকল বিদ্যাই বেশ ভাল করিয়া শিখিয়া থাকে। কোন পৌরাণিক গল্প কিম্বা ঐতিহাসিক ঘটনা
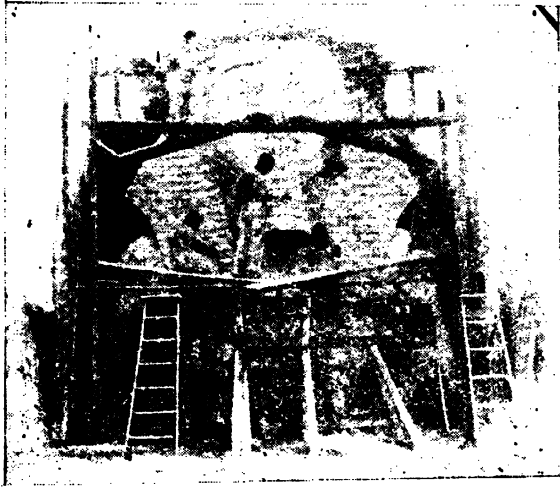
প্ল্যাস্টার দ্বারা প্রকাণ্ড একটী মিশরীয় মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইতেছে—ঐতিহাসিক দৃশ্যে ইহার আবশ্যক হইবে

লোকপূর্ণ ঘর আলোকিত করিবার জন্য এই ল্যাম্প হইতে প্রচণ্ড আলো নিক্ষেপ করা হয়।

চলন্ত গাড়ীর আরোহীদের ছ।ব লওয়া হইতেছে।

বায়স্কোপে দেখাইতে হইলে সেই সেই কালের দৃশ্য ও পরিচ্ছদাদি হুবহু দেখাইতে না পারিলে সবই একেবারে মাটি—সুতরাং যিনি ডিরেক্টার তিনি ইতিহাসের সঙ্গে মিলাইয়া দৃশ্যপট ইত্যাদি তৈরী করাইয়া লইয়া থাকেন।

অনেক সময় কোন ঘটনার জন্য বহুলোক লইয়া বায়স্কোপ কোম্পানীকে এক জায়গায় যাইয়া আড্ডা করিয়া অনেকদিন থাকিতে হয়। সেখানে আসবাব পত্র, যন্ত্রপাতি, ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী ইত্যাদি সব জিনিষই তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এই সব ব্যাপারে এক একটা কোম্পানীকে যে কত হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে হয় তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।
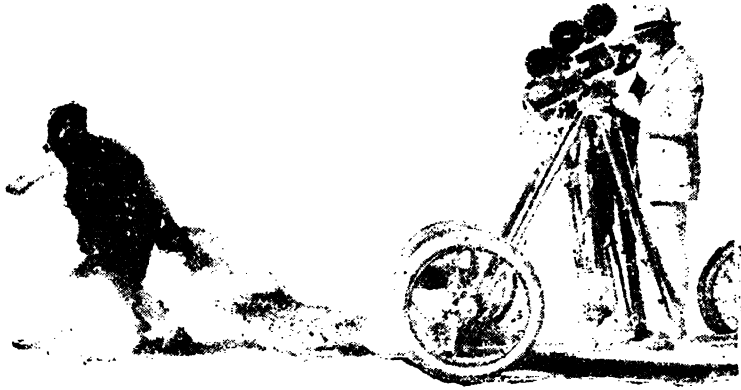
বিজ্ঞান—বৈচিত্র্য

মানুষের বুদ্ধিকে 'সাবাস' বলিতেই হইবে। সে আজ কত জটিল সমস্যাকে বুদ্ধির সাহায্যে অতি সহজ করিয়া তুলিতেছে—কত কঠিন কাজ সে আজ অনায়াসে এবং অল্পায়াসে সাধিত করিতেছে—যাহা দশজন লোকের পক্ষে কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহা বুদ্ধির বলে সে একা করিয়া লইতেছে—ইহার পরেও কি তাহার বুদ্ধিকে 'সাবাস্' বলিতে ইচ্ছা হয় না? সম্প্রতি এক ব্যক্তি এমন একটী বাদ্য-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে যাহা একা বাজাইলে চৌদ্দটী বিভিন্ন যন্ত্রের আওয়াজ উহা হইতে শুনিতে পাওয়া যাইবে। চৌদ্দজন লোক চৌদ্দটী বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা একটী ঘর যেখানে গুলজার করিয়া তুলিত, সেইখানে সামান্য একজন লোক দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা?
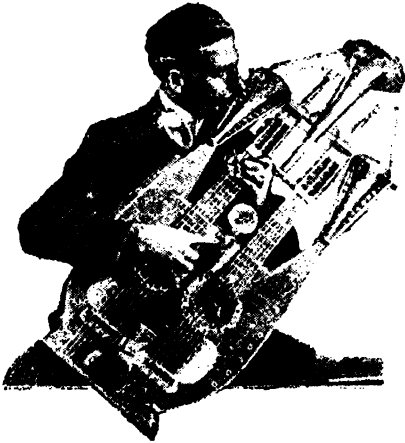
এই যন্ত্রে বাদ্যকর একাই চৌদ্দজনের বাজনা বাজাইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতের মানুষ আজ সভ্যতায় দুনিয়ার আর সকল জাতিকে পেছনে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রতিভা যেমন সর্ব্বতোমুখী, তাহাদের চেষ্টাও তেমনি সর্ব্বতগামী। সংসারে এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে এই পাশ্চাত্যজাতির সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কাজ না করিতেছে। কি করিলে—কেমন ভাবে শিক্ষা লাভ করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে, শান্তিতে বাস করিতে পারে, কেমন করিয়া সহজে বহু মানুষের শিক্ষা ও উন্নতি-বিধান করা যাইতে পারে সেই চেষ্টায় পাশ্চাত্য জাতি আজ পৃথিবীর সকল জাতিকে পেছনে ফেলিয়া চলিয়াছে। তাহারা এক দিকে যেমনি যুদ্ধের চিন্তা করিতেছে, মারাত্মক বন্দুক কামান বিমানপোত তৈরী করিতেছে, বিষাক্ত গ্যাস, প্রাণ-ঘাতী আলোকরশ্মির আবিষ্কার করিতেছে, আবার তেমনি অতি নিরীহ গৃহস্থালীর বিষয় চিন্তা করিতেও তাহাদের মস্তিস্ক পরিচালন করিতে কসুর করিতেছে না। ছোট ছোট সংসার কি করিয়া শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিতে হয় সেই উদ্দেশ্যে রোড দ্বীপের সরকারী কলেজে একটী আদর্শ কুটীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত কলেজের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা বছরের বেশীর ভাগ সময় এই কুটীরে আসিয়া বাস করে এবং গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ তাহারা নিজহাতে করিয়া থাকে। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শানুসারে তাহারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করে, বাজার সওদা, রান্না-বান্না, বাসন মাজা, ঘর দোর গুছান, টেবিল বই ইত্যাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইয়া রাখা, এমন কি নিজেদের কাপড় জামা প্রভৃতি কাচিয়া পরিস্কার করা—সব কাজ তাহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। এই ভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিয়া মেয়েরা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আদর্শ রমণীরূপে গঠন করিয়া তুলিতে সুযোগ পায়।

আমাদের এই বাংলাদেশে মেয়েরা ছোটবেলা হইতেই গিন্নীপনা আপনা আপনি শিখিয়া থাকে। তবে যে সকল বালিকা-বিদ্যালয় ও কলেজ এবং বোর্ডিং ইত্যাদি আছে সে গুলিতে মেয়েদের গৃহস্থালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে আশা করি দেশের কল্যাণ হয়।

মেয়েরা নিজ হাতে রান্না ও গৃহস্থালীর কাজ করিতেছে।

*　　*　　*　　*

গ্যাসের আলো ধরাইতে হইলে এতদিন গ্যাস্ বার্ণারের নিকট হাত লইয়া গিয়া তবে আগুণ ধরাইতে হইত; তাহাতে আশঙ্কার কারণ এই ছিল যে হঠাৎ হাতে আগুণের তাপ লাগিয়া অনেক সময় আঙুল পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। বর্ত্তমানে একটা নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে—উহা দ্বারা এখন নির্ভয়ে সকলেই গ্যাসের আগুণ ধরাইতে পারিবে। যন্ত্রটী এমনি মজার—দূর হইতে একটা স্প্রীং টিপিলেই একটা চাকা ঘুরিয়া ছোট্ট একটী পাথরের সঙ্গে ঘষা লাগিবে এবং তাহারই ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া গ্যাস বার্ণারে আগুন ধরাইয়া দিবে।

গ্যাসের আলো ধরাইবার নূতন যন্ত্র।

*　　*　　*　　*

ইংলণ্ডে একটী নূতন যন্ত্র তৈরী হইয়াছে—তাহার নাম মাইক্রো-টেলিস্কোপ। ইহা দ্বারা অতি নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম জিনিষকে বর্দ্ধিত আকারে দেখা যাইবে, আবার বহুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রকেও অতি নিকটে দৃষ্টিগোচর করা যাইবে। এই মাইক্রো-টেলিস্কোপের সাহায্যে আবার ফটো তোলাও যায়। ইহা দ্বারা ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী এক পর্ব্বতের ফটো তোলা হইয়াছে। ক্যামেরা হইতে ২০ ফিট্ দূরের বন যেমন পরিষ্কার দেখা যায়—এই ৬০ মাইল দূরস্থিত পর্ব্বতের ছবিও এই মাইক্রো-টেলিস্কোপে তেমনি পরিষ্কার উঠিয়াছে।

ছবির বামদিকে যে খেজুর গাছের কাঁটার মত দেখা যাইতেছে উহা শামুকের মুখের তালুর ছবি, ক্যামেরায় বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। উপরের বৃত্তের ভিতর একটী মাছি—ক্যামেরা হইতে ১৫ ইঞ্চি মাত্র দূরে অবস্থিত। নীচে গোল পাকাইয়া ঠিক যেন সাপের লেজের মত রহিয়াছে – ওটা আবার কি ? ওটা একটা প্রজাপতির জিহ্বা !

মাইক্রো-টেলিস্কোপ।

* * * *

পাশ্চাত্য দেশের লোক কি করিলে যে কোন্ কাজে কত সুবিধা হইবে তাহা ভাবিয়াই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দাড়ি কামাইবার জন্ম ক্ষুর ছিল—নিজ হাতে নিঃসঙ্কোচে কামাইবার সুবিধার জন্ম হইল Safety Razor—সেফ্‌টী ক্ষুর। তা'তে ও মানুষ সন্তুষ্ট হইল না—অন্ধকারে হঠাৎ গালে হাত দিয়া অনুভব করা গেল দাড়ী গজাইয়াছে, কিন্তু উপায় ! পকেটে সেফ্‌টী ক্ষুর আছে সত্য কিন্তু আশে পাশে কোথাও ত আলো পাইবার সম্ভাবনা নাই—অন্ধকারে ঠিক কায়দা মাফিক্ ত দাড়ী কামান যাইবে না ! এখন কি করা যায় ! তাই এখন এক রকম ক্ষুর তৈরী হইয়াছে তাহার সঙ্গে ব্যাটারী লাগান থাকিবে এবং কামাইবার সময় আঙ্গুল দিয়া বোতাম টিপিলেই সুন্দর আলো ক্ষুরের ভিতর দিয়া ঠিক কামাইবার জায়গায় গিয়া পড়িবে এবং তাহা দেখিয়া খুসী মাফিক্ কামান যাইবে। এই সব
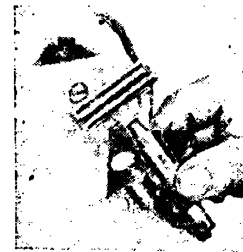
সেফ্‌টী ক্ষুরের সঙ্গে
বিদ্যুৎবাতি।

বাবুয়ানা ক্ষুর যাঁরা দেশ ভ্রমণে বাহির হন শুধু তাঁহাদেরই কাজে আসিতে পারে—গৃহস্থদের জন্ম এসব অনাবশ্যক আড়ম্বর মাত্র।

মানুষ-মারিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পাশ্চাত্য জাতি আজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। কে কত সাংঘাতিক রকমের মারাত্মক যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে তাহা লইয়া আজ সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা খুব শান্তিতেই বাস করিতেছে কিন্তু অশান্তি বাড়াইয়া তুলিবার জন্য যে পাশ্চাত্য সভ্যজাতিগণ কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে সে খবর হয়তো অনেকেই আজও পায় নাই। জার্মানরা বিগত যুদ্ধের সময় আকাশপথে
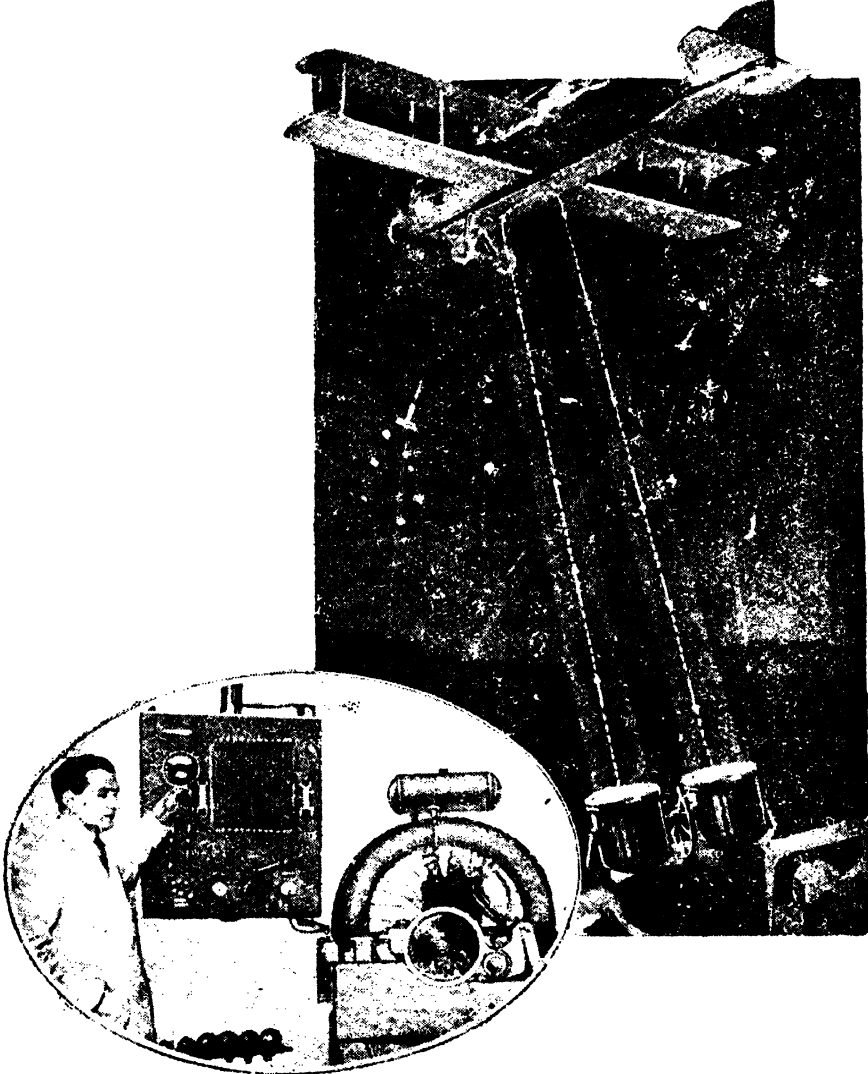
মরণরশ্মি।

আরম্ভ হইয়াছে। বিগত জার্মান যুদ্ধে আমরা অনেক নূতন নূতন মারাত্মক যন্ত্রের নাম শুনিয়াছি। সেই প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ বহুদিন থামিয়া গিয়াছে—মানুষ আজ মনে করিতেছে তাহারা আসিয়া ইংলণ্ডবাসীদের অত্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল, তাই আজ লণ্ডনের এক বৈজ্ঞানিক এই আকাশ পথে যাহারা বিচরণ করে তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য অনেক মাথা

থামাইয়া একটা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূর পর্য্যন্ত একটা আলোর রশ্মি নিক্ষেপ করা যাইবে এবং ঐ রশ্মি বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ থাকিবে। এই বৈদ্যুতিক-শক্তিপূর্ণ-রশ্মি আকাশগামী এ্যায়রোপ্লেনের ইঞ্জিনের উপর পড়িয়া তাহার চলন-শক্তি একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে এবং চাই কি—তাহাতে আগুন ধরাইয়া অগ্নিকাণ্ডও বাধাইয়া দিতে পারিবে। কি ভাবে আলোক-রশ্মি দ্বারা শত্রুর এ্যায়রোপ্লেনকে আকাশ হইতে টানিয়া মাটীতে নামাইয়া লওয়া যাইবে পূর্ব্বপৃষ্ঠার ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে। ছবির বামদিকে আবিষ্কারক মিঃ গ্রিণ্ডেল ম্যাথু তাঁহার এই মরণ-রশ্মি দ্বারা একটী মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন থামাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন।

চুরুট ফেরীওয়ালা তাহার চলন্ত ঘরে দাঁড়াইয়া পথিকের নিকট চুরুট বিক্রয় করিতেছে।

মিঃ ম্যাথু সাহেব তাঁহার গবেষণা খুব গোপন ভাবেই করিয়াছিলেন কিন্তু আজ পাশ্চাত্য বহু জাতির বৈজ্ঞানিকগণই বলিতেছেন যে তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই এই মরণরশ্মির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সুতরাং ম্যাথু ইহার একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা এই দাবী তিনি করিতে পারেন না।

* * * *

জার্ম্মানী আজ ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে বণিকের জাত ইংরাজকেও টেক্কা দিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি বার্লিন সহরে এক চুরুটের ব্যবসাদার চুরুট বিক্রী করিবার বেশ এক নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিয়াছে। ঠিক চুরুটের মত দেখিতে একটী গোলাকার ঘর তৈরী করিয়া তাহার ভিতরে দাঁড়াইয়া সে চুরুট বিক্রী করে। সহরে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া যখন দেখে বিক্রী তেমন আর হইতেছে না, তখন ঐ ঘরটী গোল পাকাইয়া পিঠে করিয়া সে সহরের অন্য জায়গায় চলিয়া যায় এবং যেখানে খুব ভীড় সেইখানে দাঁড়াইয়া বেদম বিক্রী করিতে থাকে! কত রকম বুদ্ধিই যে এই সকল পাশ্চাত্য বণিক জাতির মাথায় খেলে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বীর বাঙালী

(গল্প)

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

রামবাবু মাস ছয় হ'ল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বাহাল হওয়া অবধি মৈমনসিংহে আছেন। তাঁর বোন বাণীর বিয়ের সময় কিছুতেই অনুরোধ উপরোধ করেও ছুটী না পাওয়াতে বাড়ী আসতে পারলেন না। বাণী অভিমান করে দাদাকে চিঠি লিখলে—তাঁর সঙ্গে তার জন্মের শোধ আড়ি; দেখা হ'লে আর কখনও কথা কবে না, বরং মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আজ পর্য্যন্ত সে ভয়ঙ্কর রকমেই তার সত্য পালন করে এসেছে। কেন না, বাণীর শ্বশুর বাড়ী দিল্লীতে; আর স্নেহশীলা শ্বশ্রূমাতা ও প্রেমিক স্বামীর আদরে সেই অতদূরের দেশে গিয়েও সে বেশ মনের সুখে আছে; কাজেই এই ক'মাসের মধ্যে তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে আসবার সময় ও সুবিধা হয় নি। দাদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ তার না হলেও প্রতি সপ্তাহে সে পুরো চার পাতা ভর্ত্তী একখানা করে চিঠি নিয়মমত পাঠিয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে কথাবার্ত্তা ত আদৌ করে নি! বাণী শুধু এই কথাটাই প্রতি চিঠিতে তার দাদাকে লিখেছে, যে তিনি তাকে একেবারে ভুলে গেছেন; এই তেরো-নদীর-পারের-দেশে তাকে বিসর্জ্জনে পাঠিয়ে বেশ সুখে মজা মারছেন; সে আর তাঁকে আবদার করে জ্বালাতন করতে পারবে না ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, ইত্যাদি। রামবাবু অভিমানী বোনকে লিখে জানালেন "লক্ষীটি বোন্! আর কিছুদিন সবুর কর। পূজার ছুটী হলেই আমি নিজে গিয়ে তোকে নিয়ে আসব।"

পূজার ছুটী আসতে রামবাবু খাঁটী ইউরোপীয় পোষাকে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, চামড়ার 'সুটকেশ' ও বিছানা মুটের মাথায় চাপিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলেন ও নূতন ডেপুটীর উপযুক্ত একটু গম্ভীর সগর্ব্ব চাল চলনে চারি পাশের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইউরোপীয়ানদের জন্য রিজার্ভ করা কামরায় চড়ে বসলেন। মাঠের পর মাঠ ভেঙে, মাঝে মাঝে সগর্ব্ব হুঙ্কারে চারিদিক কাঁপিয়ে ট্রেণ চলতে লাগল। নেটিভ ইণ্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত লোক যখন একটুখানি বসবার মত জায়গা দখল করবার জন্য যুদ্ধ ঘোষনা করছে, রামবাবু তখন সাদা ও কালা ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে গদীর উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে নিদ্রাদেবীর চরণ বন্দনা করতে লাগলেন।

বেলা থাকতে বেরোবার সুযোগ করে নিতে পারেন নি বলে রামবাবুকে বাধ্য হয়ে মোগল সরাই এক্সপ্রেসে যেতে হয়েছিল। এজন্য তাঁর বিশেষ দুঃখ ছিল না। ভেবেছিলেন মোগল সরাইএ নেবে ধর্ম্মশালায় স্নানাহার ও বিশ্রামাদি করে শেষে আবার রাত্রিতে দিল্লী এক্সপ্রেসে চড়া যাবে। যা হোক, যথা সময়ে রজনী প্রভাত হ'ল। কেলনারের মারফত প্রাতরাশ সম্পন্ন করবার পর রামবাবু একখানা পাইওনিয়ার কিনে পড়তে পড়তে আপন মনে মহাত্মা ও দেশবন্ধু প্রমুখ স্বদেশী ও স্বরাজ্যি দলের মুণ্ডপাত করতে লাগলেন।

দুপুর একটা নাগাদ্ মোগল সরাইএ গাড়ী থামল।

ধর্ম্মশালায় সেই অবেলায় স্নানাহার করবার পর দুই পাঁচ বার হাই তুলে রামবাবু একটুখানি গড়িয়ে নেবেন ভাবছেন, এমন সময় দু'বেটা সাধু সন্ন্যাসী গোছের হিন্দুস্থানী তাঁর ইংরিজী কায়দায় 'আবি ভাগো' ইত্যাদি নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করেও কাশীর মহিমা ও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করলে। রামবাবু বিরক্ত হয়ে একটা আধুলী ফেলে দিয়ে তাদের কোনওমতে বিদায় করলেন; তখন আবার পাণ্ডার দল একে একে এসে হাজির! সবাই বলে, এতখানি এসেও কাশী সহরটা তাঁর না দেখে যাওয়া ভাল দেখায় না। আর প্রত্যেকেই চায় তার বাড়ীতেই 'বাবু' আশ্রয় নিন, তা'হলে সে নিজে সঙ্গে করে তাঁকে একদিনের মধ্যেই প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য সকল জায়গা দেখিয়ে নিয়ে আসবে। রামবাবু

'ফেরবার পথে যাব' এই প্রবোধ বাক্যে তাহাদিগকে নিরস্ত করলেন। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ধর্ম্মশালার এক কর্ম্মচারী বলে গেলেন, রাত্রের ট্রেণে যাবার যদি মতলব থাকে তা'হলে তখনই যেন ষ্টেশনে গিয়ে বসেন। চোরের উপদ্রব খুব ; তাইতে আটটা বাজতেই সেখানকার ফটক বন্ধ হয়ে যায়। কি আর করবেন! অগত্যা সেই হিমে রামবাবু ষ্টেশনে আটটা রাত থেকেই একটা বেঞ্চির উপর ঠায় বসে উদাস নয়নে চতুর্দ্দিকে চাইতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে 'কব্জি ঘড়িটীর' দিকে চেয়ে অনিমেষ নয়নে কাঁটা দুইটীর মন্থর গমন-ভঙ্গী দেখতে লাগলেন। ট্রেণ সেই পৌনে দুটোয়! আপশোষ হতে লাগল কি মুখ্যুমিই করেছেন মোগল সরাই এক্সপ্রেসে এসে!

চারদিক নিস্তব্ধ। দু'একজন তাঁহারই মত হতভাগ্য এদিকে ওদিকে পায়চারী করছে। দুজন মুসলমান নাবিক তাঁর বেঞ্চির সামনে মাটীতে হাতের উপর মাথা রেখে দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। রামবাবুর সময় আর কাটে না। চোখ ঢুলে আসছিল ; কিন্তু ঘুমোতেও পারলেন না। দুই একশ টাকার জিনিষ তাঁর সঙ্গে আছে। বিদেশে বেঘোরে কেউ এসে মেরে সব কেড়ে নিলেও বলবার কিছু নেই। বসে বসে একটা সিগারেট মুখে দিয়ে কখনও বা ভাবতে লাগলেন কোনও রকমে রেল ষ্টেশনের ও তথা জগতের সমস্ত ঘড়িগুলার কাঁটা জোর করে পৌনে দুটোর ঘরে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কি করে?

রাত প্রায় এগারটা। সহস্র মানা সত্ত্বেও ঘুম এসে চোখের পাতায় বসছিল। একজন 'রেলের গার্ড' পাশ দিয়ে যেতে যেতে রামবাবুর সুটকেশে রঙীন অক্ষরে নাম ও ধাম দেখে থমকে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ রামবাবুর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে কাছে এসে বললেন "মশাই, স্বজাতি দেখছি! আসছেন কোথা থেকে?"

ভদ্রলোকের কথা শুনে রামবাবু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ রগড়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন "কি জিজ্ঞাসা করছেন?"

"বলছিলুম আসছেন কোথা থেকে?...কলকাতা? ওঃ! বেজায় শীত পড়েছে মশাই! একটা সিগারেট দিতে পারেন?"

"বিলক্ষণ! এই নিন্ না! নমস্কার! এইযে, বসুন না! তবু খানিক গল্প করেও যদি কিছু সময় কাটে!"

ভদ্রলোক রামবাবুর পাশে বসলেন। তাঁর স্বভাবটা অদ্ভুত! দু পাঁচ মিনিটের মধ্যে এমনি আলাপ জমিয়ে নিলেন যে কে বলবে এঁদের আগে পরিচয় ছিল না! ভদ্রলোক বললেন—"মাল গাড়ীর চার্জ্জে আমি আছি। আপনাদের এক্সপ্রেসের আগে সেটা আসবে কিন্তু পরে ছাড়বে। সুতরাং আমাকেও বসে থাকতে হবে সেই দেড়টা দুটো পর্য্যন্ত। কিছু মনে করবেন না, একটু বকা আমার স্বভাব। মোগল-সরাই থেকে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আমার ডিউটী। কি আর বলব মশাই দুঃখের কথা, এই রকম রাত জেগে জেগে শরীরটা গেল। কর্ম্মভোগ! শীগ্‌গিরই ছেড়ে দেব এ কাজ। সন্ধানে আছি এবার জাহাজে চাকরী নেব। প্রথম কয়েক বছর চাকরী করে সমস্ত শিখে পড়ে একটা ছোট খাট জাহাজ কিনে ক্যাপ্তেনী করব। আমি সব রকম লাইনে কাজ করে সমস্ত সুড়ুক সন্ধান জেনে, বাঙালী জাতের সামনে একটা আদর্শ খাড়া করতে চাই। বাঙালীর অলস নিদ্রা ভাঙিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাই সামনে উন্নতির কত পথ পড়ে রয়েছে। শুধু চাকরী নয়, হাকিমী কিম্বা ওকালতী নয়, বড় জোর ডাক্তারী অবলম্বন নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বুঝেছেন?"

রামবাবু মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আচ্ছা লোকের হাতে পড়া গেছে বাবা! এ নিশ্চয় স্বদেশী! কিম্বা গোয়েন্দাও হতে পারে! যা'হক সাবধান হওয়া দরকার!

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—উচু আশা কতই মনে জাগে! সফল করতে পারি তবে ত! কি বলেন? জাহাজ করে সাগরের মাঝখানে পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকব, আকাশে মেঘ উঠবে, বাজ ডাকবে, জলে তুফান বইবে, ঢেউএর তালে তালে আমার জাহাজখানি নাচতে থাকবে—সে যে কি সুখের জীবন তা কি বলব মশাই! আপনি কখনো সাগর পাড়ি দিয়েছেন? যান নি? ওঃ! আমাদের জাতটা মশাই, রাগ করবেন না, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কদর বোঝে না! এইতেই ত সর্ব্বনাশ হয়েছে। পৃথিবীর তিনভাগ জল। আর এই জলের বুকে

রত্ন যা আছে তার হিসেব ধরতে গেলে লক্ষ পৃথিবী কেনা যায়। আমরা তা দেখব না, চোখ বুঁজে অন্ধ হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকব! দুঃখ রাখবার জায়গা নেই মশাই! সিংহলে যেবার গিয়েছিলুম, ডুবুরীদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সাহায্যে সাগরের তলে নেবেছিলুম। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, যা দেখেছি জীবনে কখনো ভুলব না! সে ঐশ্বর্য্যের তুলনা হয় না! সে সৌন্দর্য্যের ধারণা করা যায় না! লাল নীল পীত সবুজ কত রকম মাছ ও উদ্ভিদ সেই হাজার হাত নীচে সাগরের তলায়, বুঝেছেন মশাই,—আর তাদের মাঝে এক একটা শুক্তি এমনি সুন্দর আর বড় যে তা দিয়ে এক রাজার সম্পত্তি করা যায়! যত সব বিদেশী লুট করে নিয়ে যাচ্ছে মশাই! কিন্তু তার দিকে কজন বাঙালীর দৃষ্টি পড়েছে? কজন বাঙালী ডুবুরী হতে চেয়েছে? আমাদের জাতটা চোখ বুঁজে আছে মশাই! কত আর বলব! সব বড় কাজে পৃথিবীর আর সমস্ত জাত বুক দিয়ে লেগেছে। কিন্তু বাঙালীর ঘুম ভাঙবে না! ভাঙবে না! এ ভাঙবার নয়! আমি বাইরের এই সব পথ ঘাট দেখবার জন্য অনেক সন্ধান করেছি, অনেক সময় নষ্ট করেছি।"

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে, পরে বললেন "আমার এই সমস্ত কাহিনী শুনতে আপনার হয়ত বিরক্তি হচ্ছে। কিন্তু আমায় ক্ষমা করবেন, এমনি করে যার-তার-কাছে কাঁদা আমার স্বভাব! তাই বাঙালী কারুকে কাছে পেলেই আমি কাঁদি আর দুঃখের কথা বলি।"

রামবাবু বাধা দিয়ে বললেন "না—না—বিরক্ত হইনিক মোটেই। আপনার জীবনের কাহিনী আরও কিছু বলুন। এরকম বীরত্বের গল্প শুনতেও পুণ্য আছে।"

ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করলেন—"আমি নিজে বড়লোকের ছেলে। আমার বাবা একজন বড় আড়তদার ছিলেন। দিল্লীতে তাঁকে চিনতনা এমন লোক খুব কমই ছিল। আমি এই যে চাকরী করি সেটা অভাবে নয়! একটা কিছু না করলে আমি থাকতে পারি না। আর টাকা আছে বলেই যে বসে বড়মানুষী করব সে স্বভাবও আমার নয়। এম্ এস্ সি পড়বার সময় একটা বোমা তৈরীর হাঙ্গামায় ধরা পড়েছিলুম। গোপনে অনেক কাজ এগিয়েছিলুম। কিন্তু দলের একটা লোকের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সব ধরা পড়ে গেলুম। বাবা তখন বেঁচেছিলেন। গোপনে ম্যাজিষ্ট্রেটকে টাকা খাইয়ে আমায় ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। ভেবে দেখলুম সত্যিই ওপথে সফল হওয়া সম্ভব নয়। মহাত্মার মত অসহযোগ প্রথাই ভাল। কি বলেন?"

একি সব কথা! গোয়েন্দা নাকি? রামবাবুর মনে সন্দেহ হল, ফন্দী করে তাঁকে বা ফাঁপরে ফেলতে চায়! প্রকাশ্যে বললেন "বলুন বলুন—তারপর?"

"অসহযোগ প্রথাটা ভাল—কিন্তু তাতেও একটা গোল দাঁড়াল। কিছু করব না—এ ব্যাপারটাকে আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি চাই কাজ! উপায় কিছু ঠিক করতে না পেরে দক্ষিণাপথ, সিংহল, এমনি অনেক জায়গা ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। শেষে পণ্ডিচেরী থেকে ফ্রান্সের সেনাদলে ভর্ত্তি হয়ে গেলুম। তখন মনে হচ্ছিল, যুদ্ধ বিদ্যাটিও আমাদের ভালরকম শিখতে হবে। আমাদের বীর হতে হবে। ছমাস যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরেছিও। 'বাপে খেদান মায়ে তাড়ান' গোছের বাঙালীর ছেলে মুষ্টিমেয় যে কজন আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলুম, মৃত্যু তুচ্ছ করে রণ-বাদ্যের ছন্দে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছিলুম। যেন ভাঙনের বানের সাথে, দেশ বিদেশের হাজার হাজার বছরের কীর্ত্তি বড় বড় প্রাসাদ, সুরম্য উদ্যান, সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিলুম। যুদ্ধ থেমে গেলে, সেই সব শ্মশানের মাঝে দাঁড়িয়ে চারদিকটা একবার ভাল করে চেয়ে দেখলুম। রুশ জার্ম্মাণ ইংরেজ ফরাসী কত বীর আত্মবিচ্ছেদ ভুলে একত্র বীরের শয়ন বেছে নিয়েছে। দুদশজন বাঙালী বন্ধুদেরও সেই মৃত্যু স্তূপের মাঝে চিনতে পারলুম। এই সব মৃত্যুজয়ী ভায়েদের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে গর্ব্বে অহঙ্কারে আনন্দের অশ্রু উথলে উঠেছিল। বাঙালী পারে সব, কিন্তু চায় না। এই জন্যই ত আজও ভীরু অপবাদ তার ঘুচল না। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অবধি আর কিছু ঠিক করতে না পেরে শেষে রেলের চাকরী নিয়েছি। আজও কিন্তু টিক্‌টিকি বেটারা আমার পেছু নিতে ছাড়ে নি! রাত ভিতে চাকরী। কখন কি ঘটে, এই ভেবে যোল-নলী পিস্তল আমি বরাবর কাছে রাখি। সাবধানের মার নেই।"

এবার রামবাবুর মনে সত্যিই ভয় হয়েছিল। কি মতলব

লোকটার, বোঝা দুষ্কর। এই রকম সব গল্প করে, পিস্তলের ভয় দেখিয়ে টাকাকড়ি চুরি করতে চায় নাকি? লোকটা বাহাদুর বটে। রামবাবু নিজে হাকিম! আশে পাশে পুলিসও দু'চারজন আছে! অথচ ষড়যন্ত্র, বোমা তৈরী ইত্যাদি সব কথাই অনর্গল মন খুলে স্বীকার করে যাচ্ছে! লোকটার ভয় ডরও নেই?

একটা বাজে! আর একটা সিগারেট চেয়ে ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন "সময় হয়ে আস্‌ছে। এবার উঠতে হবে!"

রামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "মশায়ের নামটা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"কেন? ধরিয়ে দেবেন? যা যা বলিছি পুলিস তা জানলে নিশ্চয়ই তারা আমার প্রতি আর একটু বেশী অনুগ্রহ দেখাবে! কিন্তু তাতে আমি ভয় করি না! আমার নাম সত্যচরণ বিশ্বাস। আপনারা হাকিম লোক, সব পারেন। নোট বইএ নামটা টুকে রাখবেন, ভুলবেন না!"

রামবাবু যে হাকিম তা সে জানলে কি করে? সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। রামবাবু বললেন "আমায় আপনি এত ছোট লোক ভাববেন না। নাম জিজ্ঞাসা করায় যদি ধৃষ্টতা হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।"

সত্যবাবু প্রতি নমস্কার করে বললেন "কিছু মনে করবেন না। আমাদের সকলকেই সন্দেহ হয়—বুঝেছেন ত? যাক্ সেকথা। যাবেন কোথায় বললেন?"

দিল্লী।

আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হয়েছি। দিল্লীর কোন জায়গায় যাবেন বলুন ত?

চাঁদনী চকে।

কা'দের বাড়ী? ওঃ রঙ্গলাল মুখুজ্যের বাড়ী যাচ্ছেন? তা আগে বলতে হয়! রাঙাকে আমি খুব চিনি। সেও ত রেলে কাজ করে। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে খুব। বেশ যাহোক্। সে আপনার কে হয়?

ভগ্নীপতি।

দেখুন দেখি, এতক্ষণ জানলে!—রাঙা এখানেই আছে। তার ডিউটী প্যাসেঞ্জারে। আমি ডেকে আনছি তাকে। দেখি সে যদি কাউকে বদলি দিয়ে আসতে পারে। পালাবেন না আপনি। আমি এখনই আসছি। একসঙ্গে তিনজনে আজ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাই চলুন। সেখান থেকে কাল বাড়ী ফেরা যাবে।"

দশমিনিট পরে একঠোঙা ভাল দেখে খাবার নিয়ে এসে বিশ্বাস মহাশয় রামবাবুকে বললেন "রাঙার দেখা পেলুম না। নিন্—নিন্—কিছু মনে করবেন না।"

জল খাওয়া শেষ হলে সত্যবাবু বললেন "আগে বললে হয় ত আপনি কিছু খেতেন না। একটা দুঃসম্বাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। রাঙাটা আজকাল এতটা গোল্লায় যে গেছে তা জানতুম না। এক খ্রীষ্টানী মাগীর সঙ্গে ইয়ার্কি করতে বেরিয়েছে, কোথায় আছে তার খবর কেউ দিতে পারলে না! এদিকে তারও ট্রেণের সময় হয়ে আসছে। শেষকালে চাকরীটা খোয়াবে দেখছি! আপনি যদি নেহাত কষ্ট হবে ভাবেন আর অনুরোধ করব না। এক্সপ্রেসেই চলে যান। পরশু পারি ত আপনার সঙ্গে দেখা করব। নমস্কার।"

মালগাড়ীটা আগে এসে সাইডিংএ দাঁড়াল। বিশ্বাস চলে গেলেন। রামবাবু ভাবতে লাগলেন—বাণীর কথা। তার কপাল পুড়েছে! রঙ্গলালের জন্য রাগও হচ্ছে—দুঃখও হচ্ছে। বাণীর মত স্ত্রী পেয়েও সে সন্তুষ্ট নয়! শতধিক তাকে! স্বামী লম্পট হওয়ার চেয়ে বাণী যদি বিধবা হত · না—না—একি কথা মনে আসে! থাক্, থাক্, বেঁচে থাক্, শুধু বেঁচে থাক্, এও ভাল। বাণীকে বরং তাঁরা বাড়ীতে নিজেদের কাছে এনে রাখবেন—কিন্তু বিধবার জ্বালা সে যেন না পায়!

বিশ্বাসের উপরও রাগ হল। ওই সব গোঁয়ার গোবিন্দ বন্ধু থেকেই নিশ্চয় রঙ্গলাল খারাপ হতে বসেছে। রামবাবু অনুরোধ করে এখানকার চাকরী ছাড়িয়ে রঙ্গলালকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাবেন, তাহলে হয় ত শোধরাতেও পারে!

দিল্লীতে গাড়ী পৌছাল তার পরের দিন রাত সাতটায়। বাণীদের বাড়ীতে আসতেই রামবাবুকে দেখে বাণী ত মহা আহ্লাদে তাঁকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গেল। অভিমানের বাঁধ এক নিমেষে ভেঙে গেল। রামবাবু বুকের ব্যথা জোর করে চেপে রাখতে যথেষ্ট চেষ্টা করছিলেন। বাণী একবার অমঙ্গল সন্দেহ করে শঙ্কিত চিত্তে দাদাকে জিজ্ঞাসা

করল "এতদিনের পর দেখা হল, তবু তুমি হাসছ না কেন দাদা? কি হয়েছে বল—বলবে না? বাড়ীর সব খবর ভাল ত?"

হায় অভাগী! কেমন করিয়া এ নিষ্ঠুর কথা বলা যায়? রামবাবু হাসির ছলনায় কিছু নয় বলে অস্বীকার করলেন; কিন্তু মনের ভিতর গভীর বেদনা গুমরে উঠছিল। সে রাতটা কাটল। তার পরের দিন দুপুরবেলা কোনও ক্রমে দুমুঠো ভাত খেয়ে বৈঠকখানায় একলা বসে আকাশ পাতাল ভাবছিলেন। টেলিগ্রাম এল—রঙ্গ মদ খেয়ে গাড়ীর তলায় পড়ে মারা গেছে! যাক্—নিশ্চিন্ত! সংশোধনের সমস্ত উপায় শুধু ভাবাই সার হল। হায় ভগবান্! এমনি করে সর্ব্বনাশ ঘটাতে হয়! কি করে বাণীকে এ নিদারুণ সংবাদ জানাবেন? রামবাবু আর সইতে পারছিলেন না। ভাবলেন, সেখান থেকে পালিয়ে যাবেন!

এমন সময় বিশ্বাস মহাশয় এলেন। রামবাবুকে তাবং অভিভূত দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। রামবাবুর হাতে টেলিগ্রামটা পড়ে চমকে উঠে বললেন "তাহলে যা ভয় করেছিলুম তাই ঘটল শেষে? বোধ হয় মাতাল অবস্থাতেই গাড়ীতে উঠতে গিয়েছিল! হায়! হায়! এই পরিণাম ধ্রুব জেনেও সব সাবধান হয় না! আহা! কেঁদে আর কি হবে? ভাগ্যে যা আছে কে খণ্ডাবে বলুন! বাণী ছেলে-মানুষ! এই বয়সেই বিধবা হল! আমি তাকে জানি, যে রকম আদরে তার দিন কেটেছে, সে কখনো সইতে পারবে না। এদের দেখেই মনে হয় বিধবা বিবাহ হওয়াটা নিতান্ত দরকার। বিদ্যাসাগর এই কষ্ট বুঝেই ত শাস্ত্র ঘেঁটে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। মনটা স্থির হক্। বাবাকে বলে দেখবেন। বাণীর ফের বিয়ে দেওয়াতে কোন দোষ হবে না। বলেন ত আমি নিজেও তাকে বিয়ে করতে রাজী আছি।"

এই শোকের সময় রামবাবুর মন একেই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সত্যবাবুরর মুখে এই সব কথা শুনে তিনি একে-বারে জ্বলে উঠলেন। বললেন "প্রকৃতিস্থ হয়ে কথা বলবেন।"

বিশ্বাস মহাশয় একটু থতমত খেয়ে বললেন "তা—তা—বাণী নিজে যদি রাজী হয়? আপনারা জোর করে যে তার সাধ আহ্লাদ ও মনের ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়ে চেপে রাখতে চাইবেন তাও ত ভাল নয়! এটা হচ্ছে নিষ্ঠুর অত্যাচার! তা ছাড়া বাণী—আমাকে ভালও বাসে! আমি মিথ্যা বলছি না,—তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন!"

বৈঠকখানায় দাদা একলা বসে আছেন। এই জন্য খাওয়া দাওয়া সেরে বাণী তাঁকে ডাকতে আসছিল। দাদার পাশের লোকটীকে দেখে সে লজ্জাবশত একটুখানি ঘোমটা টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল। বাণী যে তাকে দেখে মুচকে হাসছিল, রামবাবু তা লক্ষ্য করে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার দিকে তীব্র নয়নে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "সত্যি একথা? তুই এই অভদ্রটাকে ভাল বেসেছিস?"

বাণী ব্যাপারটা কি না বুঝলেও দাদার প্রশ্ন করবার ধরণ দেখে হাসি চাপতে পারলে না। মৃদুস্বরে বললে "অত মাথা ব্যথা আমার নেই! আমার দায় পড়েছে ভালবাসবার!"

প্রকাশ্যে অস্বীকার করলেও বাণীর মুখ, চোখ, অধরের হাসিটী পর্য্যন্ত জানিয়ে দিচ্ছিল সে তাকে ভালবাসে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে! রামবাবু একবার তার দিকে, আর একবার পাশের লোকটীর দিকে ভাল করে চাইলেন। না—না—এ ত অবিশ্বাসীদের কুটীল হাসি নয়! এ যে অতি নির্ম্মল, পবিত্র, রমণীয়! এর মাঝে বিন্দুমাত্র লুকোচুরী নেই, চপলতা নেই! তবে কি—এ নিজেই—রঙ্গলাল? পথের মাঝে চিনতে পেরে ছল করে মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলেছে? এর আগা-গোড়াই কি তবে মিথ্যা! এত ধূর্ত্ত রঙ্গ!

রামবাবু আবেগে স্নেহে বাণীকে বুকের মাঝে টেনে এনে বললেন "ভালবাস দিদি! জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভালবাস!"

বাণী দাদার পায়ে নত হয়ে প্রণাম করল।

রঙ্গলাল বললেন "ষ্টেশনে তোমার সুটকেশে নাম পড়েই তোমায় চিনতে পেরেছিলুম। দুঘণ্টা ধরে আলাপ করলুম—লাখ লাখ মিথ্যা বানিয়ে বললুম—অথচ ধরা দিই নি! সিংহলে আমি যাই নি কখনো; আর যুদ্ধ করা ত দূরে থাক, বন্দুক ছুঁড়তেও জানি না। অথচ আমি যে বীর আর বাঙালীর আদর্শ—একথা স্বীকার না করলে তোমার সঙ্গে রাগারাগি হবে বলে রাখছি।"

রামবাবু বললেন "নিশ্চয় স্বীকার করব! তুমি বীর—কাজে নও, কথায়! আর শুধু বীর নও—'মহাবীর'!"

রঙ্গলাল হেসে বললেন "বাণীর আক্ষেপ ছিল তুমি আমাদের বিয়েয় উপস্থিত থাকতে পার নি। সেই জন্যই বিশেষ করে আজ নূতন করে আবার এই বিয়ের অভিনয়—বুঝেছ?"

আদর্শ ভর্ত্তা

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়]

বিদ্যা বুদ্ধি যেমন হোক, চেহারা তস্তুল্য,—
টাকা মোদ্দা থাকা চাই—টাকাই প্রেমের মূল্য!
বকা-ঝকা জানবে নাকো মেজাজ শিষ্ট-শান্ত,
আমার কথায় দেবে সে সায়,—আমার প্রাণের কান্ত!

বেলা নটায় কিম্বা ভোরেই আপিসে যান্—যান্ তা—
আধা-সেদ্ধ ভাত গিলে, নয়, আগের রাতের পান্তা!
চেয়ে কভু দেখেন না পাঁচ-ব্যঞ্জন যা খাই আমি,—
অল্পে তুষ্ট গো-ব্যাচারী— সে যে আমার স্বামী!

মেটাতে সখ আমার, দেবেন রোজগারেরি কড়ি,—
তাতে ভাগ্যে জুটুক তাঁর সে কলসী কিম্বা দড়ি!
গয়না, শাড়ী, দামী ব্লাউজ দিতে দরাজ হাত,
নিজের হোক্ গে খদ্দর মদ্দর—সে মোর প্রাণের নাথ!

আপন মা-বাপ ভাই-বোনেরি মুখ সে চাইবে নাকো,
তাদের চোখের আড়ালে সে শিকেয় তুলে রাখো!
শালীর বিয়েয় ভিটে বাঁধা দিতে গো তৎপর—
শালার ছেলের ভাতে দেউলে—সেই তো প্রাণেশ্বর!

রাত্রে ছেলে কাঁদলে পাছে ভার্য্যার নিদ্রা টোটে,
ছেলে কোলে ভোলাবে তায়, ঘুমোবে না মোটে!
আপিসেরি মত নিষ্ঠায় গৃহকর্ম্মক্ষম,
গয়লার ফর্দ্দ ধোপার হিসাব রাখবে—প্রিয়তম!

প্রিয়ার গীতবাদ্যকালে তারিফ করবে বসি,
আগিয়ে দেবে লেখার কালে কাগজ-কলম-মসী।
বেবাক্ শূন্য সংসারে এই ভার্য্যা মাত্র গতি,
তাকে সুখী করাই ব্রত—সেই তো প্রাণের পতি!

বাজার-সাজার যা-সব ঝক্কি রাখা নিজের প'রে,
বামুন যদি ভাগে, অমনি ঢুকবে রান্নাঘরে!
সকল ধান্দা-জ্বালা ভার্য্যার প্রাণে রাখবে তুল্লভ—
পাছে মেজাজ চটে গো তাঁর—সেই তো জীবন-বল্লভ!

ভার্য্যার আদেশ-বাক্য সদা যার গো শিরোধার্য্য,
ইঙ্গিতে তাঁর ওঠা-বসা, সাধা সকল কার্য্য!
সত্ত্বা নিজের রাখবে নাকো, কি দিন, কি সে রাত্রি,
হাস্যে-লাস্যে অটুট দাস্য সেই তো জীবন-সাথী।

খরচ করবে ভার্য্যা যখন খুসী হবে যা তার,
লক্ষ্য রাখবে ভার্য্যার সম্মান, বিনা তর্ক-বিচার!
অর্থাৎ সকল দায়িত্ব যার, নামে গৃহের কর্ত্তা,
কর্ম্ম ভার্য্যার ইচ্ছা-মাত্রে, আদর্শ সেই ভর্ত্তা!

———

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(১৭)

বাড়ীতে লক্ষ্মী পূজা। আমাদের সংসারের সহিত লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর ঘনিষ্ঠতা বেশী না থাকিলেও অনুষ্ঠানের অভাব ছিল না। লক্ষ্মীর শুভ সমাগম সম্ভাবনায় ঘর দ্বার ঝাড়িয়া, নিকাইয়া তক্ তকে করা হইয়াছিল। গৃহের অবশিষ্ট স্বল্প কয়েকখানি বাসন মায়ের হস্তের স্পর্শে যত্ন মার্জ্জিত ঝক্ ঝক করিতেছিল। অনেক কালের পর সামান্য একটু উৎসব আয়োজনে বেণুর বিষন্ন মুখখানি আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরাহ্নে বারবেলা পড়িবার পূর্ব্বেই মা লালপেড়ে তসরের শাড়ী পরিধান করিয়া, আল্পনা-চিত্রিত চৌকীর উপর লক্ষ্মীর চিত্রের সম্মুখে সিন্দুর, কড়ি, শঙ্খ প্রভৃতি রাখিয়া ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন।

বেণু গা ধুইয়া, ধোয়া কাপড় পরিয়া পূজার সাজ করিতে বসিল। আজ বেণুর হুকুমে আমার অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ; কারণ ঘরের মেজে ও বারান্দা আল্পনার দ্বারা চিত্রিত করিতে হইবে। লোকের বাড়ী কত পূজা, কত ব্রত এবং মাঙ্গলীক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এ বাড়ীতে যখন এক লক্ষ্মী পূজা ব্যতীত অন্য কিছু হইবার আশা নাই, তখন সারা বাড়ীটা আল্পনায় না চিত্রিত করিলে বেণু ছাড়িবে কেন?

মা পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া, কয়েকটা ফল মূল কাটিয়া, ভোগের আয়োজন করিতেছিলেন। মঙ্গলার দুধের 'সর' তুলিয়া এক ভাঁর ঘি তৈয়ার হইয়াছিল, সেই ঘি দিয়া ভোগের লুচির ব্যবস্থা হইতেছিল। এবার আমরা সমাজচ্যুত, আমাদের পুরোহিত নাই, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ নাই। পুরোহিতের পরিবর্ত্তে মা পূজারিণী হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সদ ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে আমাদের বাড়ীতে কেবলা ও তাহার মায়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

ঘরের আলপনা শেষ করিয়া, বারান্দায় আলপনা দিতেছিলাম, এমন সময়, খোকাকে লইয়া নীহার আসিয়া উপস্থিত হইল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আলপনার লতাটির পানে চাহিয়া নীহার বলিল "ভগবান এত বিদ্যেও তোর ভেতর দিয়েছিলেন কণা! পোড়া দেশে গুণের আদর নেই, নইলে এ রত্ন এমন ভাবে এখানে পড়ে থাকত না।

"বল, রাজার মুকুটে শোভা পেত। দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস।" বলিয়া আমি হাত ধুইয়া খোকাকে কোলে লইলাম। মায়াবী শিশু দুই হাতে আমার কেশ-গুচ্ছ ধরিয়া, মুখের পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

নীহার মাটীতে বসিয়া জবাব দিল "রাজার মুকুটে শোভা পেত, এটা তো মিছে কথা নয় কণা। কিন্তু এখানে কিছুই বৃথা যায় না রে। চৌধুরী যতই চক্রান্ত করুক, গাঁয়ের লোক যতই ঘোঁট পাকাক, সে সব ছাপিয়ে ভগবানের করুণা এক দিন আসবেই কি আসবে। আমার মনে হচ্চে দাদা এলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জিতুদার কি চিঠি পেয়েছিস? পূজোর ছুটী তো প্রায় ফুরিয়ে এল; জিতু'দা আর আসবে ক'বে? এর পর তার কলেজ খুলে যাবে।"

"কালী পূজোর পর কলেজ খুলবে। দাদা ছুটিতে আগ্রা বেড়াতে গেছে, আগ্রা থেকে এখানে এসে, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে, পরে কলকাতায় যাবে। আমি তোদের কথা দাদাকে সব লিখেছিলাম, তোরা এতদিনকার এতকথা তাকে জানাস নি বলে—সে বড্ড দুঃখ ক'রে চিঠি লিখেছে।"

"তার পরীক্ষার বছর ব'লে মা এসব গোলমেলে কথা

তাকে জানাতে দেন নি ; নইলে আমি জিতুদা'কে সবই জানাতে চেয়েছিলাম।"

"কাকার এত বড় অসুখ গেছে, গাঁয়ের ভেতর চক্রান্ত চলচে, তোদের এমন কষ্ট—এর চেয়ে দাদার পরীক্ষার পড়াটাই বড় হ'ল বুঝি ? দাদা এলে দেখিস কাকীমার সাথে কেমন কোন্দল ক'রে, আর তুই তাকে কিছু জানাস নি ব'লে,—তোকে কেমন শাস্তি দেয়।—দাদা শাস্তি দেবে শুনে হাসি হচ্ছে ! ভেবেছিস সে এসে পড়লে একটি রাঙ্গা বরের ব্যবস্থা হবে ! তা নয় গো, তা হবে না, চৌধুরীর সাথে—বুঝেছ ?"

"জিতুদার পুরস্কার যখন রাঙ্গা বর, শাস্তি হ'ল চৌধুরী ; আমি তাকে কিছু জানাই নাই বলে আমার যেন শাস্তি হবে। তুই এত কথা জানিয়েছিস, জিতু'দা এলে তোর কি পুরস্কার হবে নীহার ?"

নীহার মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে জবাব দিল "দাদা যখন আস্‌বে, তখন আমি তার তিরস্কারের, পুরস্কারের অনেকটা বাইরে যেয়ে পড়বো ভাই। আমার যে বাড়ী ফেরার ডাক এসেছে, কাল পরশুই আমায় যেতে হ'বে।"

নীহারের 'যেতে হ'বে' কথাটা আমার বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরির মত যেন বিদ্ধ হইয়া গেল। এতকাল পর আসিয়া এত শীঘ্র নীহারকে যাইতে হইবে ! এবার শুধু নীহারই যাইবে না। আমার অন্ধকার অন্তরাকাশে যে উজ্জ্বল উদ্দাম তারকাটি উদয় হইয়া, অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছিল, সেই শুভ্র সুন্দর ক্ষুদ্র শিশুটিও নীহারের সহিত চলিয়া যাইবে। রহিবে কি ? অশ্রু-বেদনা-ভরা দুর্ব্বিসহ জীবন বহন, আর একটি অমৃতময় স্মৃতি।

আমি দুই হাতে খোকাকে বুকে চাপিয়া কহিলাম "এত শীগ্‌গীর এমন করে যদি যাবার ইচ্ছে ছিল,—তবে এসেছিলি কেন নীহার ? দু'দিনের জন্তে কেবল জ্বালাতে আসা বৈ তো নয়। ভারী অনেকদিন এসেছেন, উপেনবাবু বিরহে অস্থির হয়ে চিঠি লিখেছেন। তাঁর যেন আর ত্বরা সইছে না ! তুই উপেনবাবুর নয়নতারা হ'য়েছিস !"

আমার কথায় নীহারের মুখখানি প্রথমে রক্তজবার মত রাঙ্গা হইয়া গেল ; কিন্তু সে আরক্তিম ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পরক্ষণেই সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া, মুখের উপর একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা পরিস্ফুট হইল। নীহার নত নেত্রে হাতের চুড়িগুলি নাড়া চাড়া করিয়া বলিল "পাগলের মত কি বকছিস কনা ? আজ তোর মাথা গরম হ'য়েছে। তিনি তিনি তো আমায় চিঠি লেখেন নি। পাড়ার একটি বৌয়ের সাথে আমার খুব আলাপ সালাপ ; সেই আমায় শীগ্‌গীর যেতে লিখেছে।"

"তোকে দিয়ে তার এত শীগ্‌গীর দরকার কি বাপু ! গল্প করবার লোকাভাব হয়েছে বুঝি ?"

নীহার বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল "না কনা, তা নয় তাকে ওঁর খবর জানাতে আমিই অনুরোধ করে এসেছিলাম। সেই জন্তেই সে চিঠি লিখেছে। তুই তো তাঁর বিষয় সব জানিস ; সর্ব্বস্ব খুইয়ে চাকরীর চেষ্টা করছিলেন। পশ্চিমে কোথায় নাকি একটা চাকরীর খবর এসেছে, শীগ্‌গীরই বেরিয়ে পড়বেন। যে মানুষ, একবার ঘরের বার হ'লে, কে তাঁকে ফেরাবে। ফেরাবারই বা লোক কোথায় ? তাই ভাবছি, আমি তাঁর সঙ্গী হব জানি, তিনি আপত্তি কোরবেন। বিদেশে আমায় নিয়ে অসুবিধা হবে ; কিন্তু তা বলে কি আমি চুপ করে থাকতে পারি ? আমায় যেতেই হ'বে।"

বলিলাম "যেতে যে হবে, তা যেন বুঝলাম, এতটুকু ছেলে নিয়ে, দায়িত্বহীন স্বামীর সঙ্গে অজানা জায়গায় যেতে তোর সাহস হয় ? একশ টাকা ছিল--তাও দান খয়রাতে উড়ে গেল। সেখানে যেয়ে যদি এক মাস বোসেই খেতে হয়, তখন ? সব ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে, জিতুদা এলে তার পরামর্শ মত কাজ করিস।"

নীহার বলিল "দাদা কবে আসবে তার ঠিক নেই দাদার ভরসাতে আমি দেরী করতে পারবো না। স্বামীর যতই দুর্ব্বলতা থাকুক না কেন, স্বামীর সঙ্গে যেতে স্ত্রীর আবার ভয় কিসের বোন ? টাকা পয়সার কথা বলছিস ; এখনো আমার গায়ের গয়না রয়েচে ; তাঁর চাকরী না হলেও ওতেই কিছুকাল চলতে পারবে।"

নীহারের একান্ত আগ্রহে আমি আর বাধা দিতে

পারিলাম না। বাধা দিবার সাহসও হইল না। কিন্তু মনে মনে বিস্ময় বোধ হইল। ব্যাভিচারী মদ্যপায়ী স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এমন আন্তরিক, অকপট ভালবাসা, অপরিসীম নির্ভর, অনন্ত বিশ্বাস—কোথা হইতে আসে? এত অত্যাচারে, অবিচারেও মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ ধারা স্ত্রীর হৃদয়ে কেমন করিয়া প্রবাহিত হয়? ইহাকেই বুঝি সতী কহে? ইহাদেরই আত্মত্যাগ, ইহাদেরই মনোবল, সহিষ্ণুতা বুঝি পুরাণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে? ভারত আজ অধঃপতিত, রিক্ত, দীন, সম্পদহারা কিন্তু এখনও তাহার মরুশুষ্ক বুকে একটি রত্ন লুকানো রহিয়াছে। তাহা সতীর সতীত্ব, সতীর মহিমা!

আমি চিন্তামগ্না নীহারের গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলাম "মা'র কাছে যাবার কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করবি না নীহার?"

"হ্যাঁ, কাকীমার কাছে শুনতে হ'বে বৈ কি! কাকীমা কোথায় রে?"

"রান্নাঘরে, লক্ষ্মীপুজোর ভোগ বোধ হয় চড়িয়েছেন।"

"চল্ সেইখানেই যাই।" বলিয়া নীহার উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা উনুনে ছোলার ডাল চড়াইয়া দিয়া ময়দা মাখিতে বসিয়াছিলেন। নীহারকে দেখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন "আয় মা, এখানে বোসবি আয়। দিদির লক্ষ্মী পুজো আছে ব'লে আজ তোকে খেতে বলিনি; কাল কিন্তু সকাল বেলা তোর এখানে এসে খেতে হবে নীহার। মায়ের পূজোর কাজকর্ম্ম হয়ে গেছে?"

নীহার ঘাড় নাড়িয়া, বলিল "তা, আসবো কাকীমা; কিন্তু আমায় যে শীগ্গীর ক'রে যেতে হচ্চে।"

"যেতে হচ্চে, এত তাড়াতাড়ি, জামাইয়ের শরীর ভাল আছে তো?"

নীহার সলজ্জমুখে আমার পানে চাহিল। আমি সকল সংবাদ মার নিকটে বিবৃত করিলাম।

সব শুনিয়া মা বলিলেন "নীহার আমার লক্ষ্মী মেয়ে! বেশ বুদ্ধি ঠাওরেছিস; স্বামীর সঙ্গে যেতে স্ত্রী আবার দোমনা! সাবিত্রী রাজার মেয়ে হয়ে, গহন বনে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন, মনের জোরেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন, তুই ও তাঁদের দৃষ্টান্তে স্বামীর সাথী হোস্। কিছুতেই নিরাশ হোস্ নে, বিমুখ হোস নে, তোর কাজের ফলাফল বিধাতার খাতায় জমা হবে। আমি বলি কি—কালকের দিনটা থেকে পোশু ই তুই রওনা হোস।"

নীহার স্মিতমুখে "আচ্ছা" বলিয়া মার নিকট হইতে ময়দার থালাটা টানিয়া লইয়া ময়দা মাখিতে বসিল।

(১৮)

নীহার চলিয়া যাওয়ার কয়েকদিন পর সেদিন হেমন্তের ম্লান অপরাহ্নে—আমি গৃহ কাজ সমাধা করিয়া মা'র বড় সাধের মটর শাকের ক্ষুদ্র ক্ষেত খানিতে জল ছিটাইয়া দিতেছিলাম, বেনু ছোট কলসী ভরিয়া ডোবা হইতে জল আনিয়া দিতেছিল।

কিয়ৎকাল পর বেনু শূণ্য কলসী কক্ষে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হর্ষাবেগে চিৎকার করিয়া উঠিল "দিদি, দিদি, চেয়ে দেখ, জিতুদা এসেছে। এখন আমি আর জল আনতে পারবো না বাপু। আমার জিতুদা'র কাছে যাই।" বলিয়া কলসীটা ঘাসের উপর ফেলিয়া বেনু ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া গেল।

আমি পুলকিত হৃদয়ে বেনুর অনুসরণ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জিতুদার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। জিতুদার পশ্চাতে একটি সৌম্য শান্তমূর্ত্তি অপরিচিত প্রৌঢ়কে দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলাম। অপ্রশস্ত পথের মাঝখানে সরিয়া যাইবারও স্থান ছিল না!

বেনুকে বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া জিতুদা আমার নিকটে উপস্থিত হইল। সস্নেহে আমার পিঠ চাপ্ড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছিস কণী? এখানে বুঝি কৃষিকাজ হচ্ছিল? কাকা, কাকীমার শরীর এখন ভাল আছে তো?"

আমি নিরুত্তরে ঘাড় নাড়িয়া, জিতুদা'কে প্রণাম করিতেই জিতুদা তাহার সঙ্গীকে প্রণাম করিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল "ইনি আমাদের কাকাবাবু হন কণী, এঁর কাছে তোর লজ্জা নেই। এবার পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে এই কাকাবাবুকে পাওয়া গেছে!"

আমি সঙ্কুচিত ভাবে ভদ্রলোকের পায়ের কাছে নত হইতেই তিনি পরমাত্মীয়ের মত আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া

স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন "থাক্ হয়েচে মা, তোমার বাবার কাছে আমায় নিয়ে চল। বাবা কি ঘরে আছেন ?"

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই বেনু জিতুদার হাত ছাড়াইয়া আগন্তুকের নিকটে গিয়া, কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—বাবা ঘরেই আছেন। আপনি আমার সাথেই আসুন; বাবার কাছে নিয়ে যাচ্চি। আমার বাবা সব্বারি কাকা হ'ন; এবার থেকে আপনিও আমাদের কাকাবাবু হলেন।"

"হ্যাঁ লক্ষ্মী; আজ থেকে আমি তোমাদের কাকাবাবু হলেম। তোমরা আমার মা হলে।" বলিয়া ভদ্রলোক বেনুর হাত ধরিয়া প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার কাঁচা পাকা চুল; সাদা গোঁফ, সাধারণ পরিচ্ছদ, সুন্দর উদার মূর্ত্তি ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর —আমার মনে একটা ভক্তির উদ্রেক করিল। আমার আশৈশব হইতে এ পর্য্যন্ত কত জনাই দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল আত্মীয়, অনাত্মীয় কত প্রৌঢ় বৃদ্ধের সংস্পর্শে আমার ভাগ্য বিধাতা আমাকে জড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এমন স্নেহময়, হাস্যময় করুণার প্রতিচ্ছবি আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। এমন মধুর মাতৃ-সম্বোধনে এমন করিয়া আর কোনদিন আমার তাপিত অন্তঃকরণ স্নাত হইতে পারে নাই। আজ যেন আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন।

আমরা আত্মীয় শূণ্য, বন্ধু শূণ্য। কাকাবাবু পরিচয় দিয়া, নিতান্ত আপনার জনের মত কেহ যে আমাদের গৃহে আসিতে পরে—ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই। আজ জিতুদা' আসিয়াছে, অনাত্মীয় অপরিচিত কাকাবাবুকে আনিয়াছে। দীর্ঘকালের পর বাবা আজ ইঁহাদের সহিত দুটো কথা বলিয়া বাঁচিবেন, ভাবিয়া আমার অন্তঃস্থলে আনন্দের ধারা বহিয়া গেল।

ক্ষণকাল পর আমি গৃহে ঢুকিয়া দেখিলাম বারান্দায় চৌকীর উপর কাকাবাবুকে বসাইয়া বাবা বাক্যালাপ করিতেছেন। জিতুদা অনুচ্চস্বরে মার নিকটে কাকাবাবুর পরিচয় দিতেছে।

কাকাবাবুর নাম উমা প্রসাদ রায়, ইঁহারা কলিকাতার অধিবাসী; সাহাজাদপুরের জমিদার; পিতৃহীন একটি ভাইপো ও ভাইঝি লইয়া তাঁহার সংসার। অল্প বয়সে কাকাবাবুর পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল। কিন্তু আত্মীয় পরিজনের বহু অনুরোধেও তিনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ধারণা বিবাহ মানুষের একবারের বেশী হইতে পারে না, "নেকা" বহুবার হয়। এই ধারণার বশীভূত হইয়া নিঃস্বকে দান করিয়া, ব্যথিতের অশ্রু মুছাইয়া এই পরোপকারী মহাপুরুষ যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়া, প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। আগ্রার ধর্ম্মশালায় জিতু-দা'র সহিত প্রথমে ইঁহার আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। দীর্ঘকাল একত্রে অবস্থানের ফলে সেই স্বল্প পরিচয় এখন সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পর্য্যবশিত হইয়াছে।

বছরে একবার করিয়া জমিদারী পরিদর্শনের নিমিত্ত কাকা বাবুকে এ অঞ্চলে আসিতে হয়। এবারেও জিতুদা'র সহিত তিনি জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়াছেন। কমলার 'বরপুত্র' হইলেও তাঁহার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ। বিশুদ্ধ ছানা ও ঘৃতের ব্যবসা করাই তাঁহার অভিপ্রায়। তা ছাড়া দেশের নিষ্কর্ম্মা তাঁতির দ্বারা, চরকার সূতায় কাপড় বুনাইয়া, কাপড়ের ব্যবসা চালানও তাঁহার ইচ্ছা। এসব কাজে বিশ্বাসী কর্ম্মঠ লোকের প্রয়োজন। জিতুদার নিকটে বাবার পরিচয় পাইয়া—কাকাবাবুর আন্তরিক ইচ্ছা বাবাকে এই কার্য্যভার সমর্পণ করেন। মূলধন তাঁহার, পরিশ্রম বাবার। লাভের দুই তুল্য অংশ। বাবা এখান হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন। কাকাবাবু অপর লোক দ্বারা তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাইবেন। এই সব পরামর্শ আলোচনার জন্যই কাকা বাবুর দরিদ্রের দীন কুটীরে আগমন।

জিতুদা'র মুখে কাকা বাবুর পরিচয় পাইয়া মা হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন—"একালে এমন লোকও আছে জিতু! বড় ঘরে এমন অহঙ্কার শূণ্য, দয়ালু মানুষ সচরাচর জন্মে না। আমাদের কপাল গুণে এঁর সাথে তোর আলাপ হয়েছে। উনি কি তোর সঙ্গে তোদের বাড়ীতেই উঠেছেন ?"

"আমরা এক সাথে এসেছি বটে, কিন্তু কাকাবাবু আমাদের ওখানে ওঠেন নি। কাছারীর পান্সী, লোক জন,

ওঁর জন্যে ষ্টেশনে ছিল ; উনি কাছারীর পাল্কীতেই আছেন। কাকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে কাল বোধহয় কাছারীতে যাবেন।" বলিয়া জিতুদা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঘরে চা আছে কণা ? কাকা বাবু লোকটি ভয়ঙ্কর স্বদেশী হ'লেও বড্ড চা-খোর। একটু চা খাইয়ে দিতে পারিস ?" মা বলিলেন "তুই সেবার যে এক কৌটা চা এনে দিয়েছিলি, তুই চলে যাবার পর তা তো আর ব্যবহার হয় নি, ঘরেই রয়েছে। দুধ চিনিও আছে ; চা খাওয়ানো যাবে না কেন ? তুই শীগ্‌গীর আসবি শুনে তোর প্রিয় জিনিষটি আমি যত্ন করেই রেখেছি।"

জিতুদা স্মিত মুখে বলিল "তোমরা খাও না বলেই আমার প্রিয় খাদ্য বলচ কাকী মা, একবার নেশা ধরে উঠলে তোমাদেরও প্রিয় জিনিষ হত। কলকাতার মানুষের চায়ের মধ্যেই প্রাণ। ভাত না খেয়েও তারা বোধহয় একদিন কাটাতে পারে ; কিন্তু চা না হলে এক বেলাও কাটে না।"

"কাটবে কি করে জিতু ; তারা মাছ পাবে না ; দুধ পাবে না ; মুক্ত বাতাস টুকুও পাবে না, কাজেই দুধের তৃষ্ণা ঘোল দিয়ে মেটায়। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কোন্ দুঃখে ও নেশা ধরতে যাবো।" বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

আমি চায়ের কৌটা, দুটি পাথরের গেলাস লইয়া রান্না ঘরের দিকে যাইতেই মা বলিয়া দিলেন "ভদ্রলোক প্রথম আমাদের বাড়ী এসেছেন, শুধু চা' নয়, একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিতে হয়। দুখানা রেকাব নিয়ে যা, দুধের সরটুকু তুলে, বাতাসা আর ক্ষীর তক্তি দিয়ে সাজিয়ে আনগে। এক খানা জিতুকে, আরেক খানা তোর নতুন কাকা বাবুকে দিস।"

জলযোগের পর চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়া কাকা বাবু বাবার পানে চাহিয়া বলিলেন "বাঃ, চায়ের স্বাদটি তো চমৎকার হয়েছে ! অনেক কালের পর এমন চা খেলেম। এ কোন মা লক্ষ্মীর হাতের গুণ, ছোটর, না বড়র ?"

বাবা প্রফুল্ল হইয়া জবাব দিলেন "রান্না বাড়া, খাবার দাবার এসব আমার বড় মেয়েই করে থাকে। আজকের চা কনক তৈরী করেচে। খাঁটী গোরুর দুধে চা তৈরি হয়েচে ব'লে আপনার মুখে ভাল লাগছে। আমার মহালা গাইয়ের দুধে খুব স্বাদ, বিনা মিষ্টিতেও দুধ মিষ্টি লাগে। এমন জিনষটি তো আপনারা কলকাতায় পান না। এটা পল্লীর নিজস্ব সম্পত্তি।"

"কলকাতায় পাই বৈ কি ! বিলাত থেকে টীন ভ'রে ভ'রে দুধ আসে, তাই পেয়েই আমাদের দেশের খাঁটী জিনিষের আদর করতে আমরা জানি না। মুখে খুব বক্তৃতা দিতে পারি, 'দেশ গেল, রক্ষে কর ; রক্ষে কর।' মুখে বলা, আর কাজে করা—দুই তো এক নয়।"

বাবা বলিলেন—সবাই চেষ্টা কল্লে তো ঢের কাজ হ'তে পারে। আমার মনে হয় এখান থেকে শুকনো ক্ষীর নিয়ে গিয়ে কলকাতা চা-য়ের দোকানে চালাতে পারলে বেশ একটা ভাল কাজ হয়।"

কাকাবাবু সোৎসাহে জবাব দিলেন "বেশ বুদ্ধি করেছেন ! আমি যাবার সময় কিছু শুকনো ক্ষীর নিয়ে যাব ; এ'তে যদি ভাল চা হয়, আর সস্তা পড়ে তা হ'লে এ ব্যবসাও করা যেতে পারে।—অনেক ব্যবসা করাই তো স্থির হয়ে গেল, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে এখনো কিছু স্থির হল না। আগে সেইটে স্থির হওয়াই দরকার।"

বাবা কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার বিষয় আপনি কি বলতে চান ? যা হয় বলুন।

কাকাবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "ব্যবসার টাকা আমার হ'লেও আপনার গুরুতর পরিশ্রম করতে হবে। যখন লাভ হবে তখন যেন লাভের অংশ পাবেন, কিন্তু তাতে আপনার সংসার চলবে কি ক'রে ? আর এত পরিশ্রমেরই বা মূল্য কি ? তাই মনে করেচি মাসে একশ টাকা আপনার পারিশ্রমিক ধরে দিলে, তাতে আপনার অকুলান হবে না তো ?"

বাবা ক্ষণকাল চিন্তার পর বিনম্র কণ্ঠে কহিলেন 'মাসে একশ' টাকা করে আমি যদি পারিশ্রমিক ধরে নিই, তা হলে কাজে লাভ হবে কি করে ? অথচ কিছু না নিলেও আমার অচল অবস্থা। আমি পোষ্টাফিসে কুড়ি টাকা করে পেতাম ; আপনি আমায় সেই কুড়ি টাকা করেই দেবেন ; তাতেই আমার সচ্ছন্দে চলে যাবে। একশ' টাকায় আমার দরকার নেই, আমি তা নেব না।"

"নেবেন না ! আমি আপনার আত্ম মর্য্যাদায় আঘাত করতে চাই না। আপনি অর্থহীন হ'লেও সাধারণের অনেক উঁচুতে। এমন জায়গায় এমন জিনিষটি দেখবার আমি আশা করি নি দয়াল বাবু। আপনাকে বন্ধুরূপে পেলে আত্মীয় রূপে পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে কোরবো।" বলিয়া সেদিনের মত কাকাবাবু বাবার নিকটে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অভাবনীয় রূপে কাকাবাবুর অকস্মাৎ আগমনে আমাদের নিরানন্দ কুটীরে অনেক কালের পর একটা সুবিমল আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। বরষার তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর পরিবর্ত্তে সহসা শারদ জ্যোৎস্নালোকে অন্তরাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ সংসার

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়]

সকাল হতেই সুরু সেকি তাণ্ডব জাগার সঙ্গে,—
ছেলেমেয়ের চ্যাঁ-ভ্যাঁ, গিন্নীর মাতন ছন্দে-রঙ্গে !
নাই নাই, এবং দাও-দাও শব্দে শিরোঘূর্ণন বেগে,
ভীষণ-ক্ষুব্ধ কর্ত্তার হুঁকা-হস্তে প্রস্থান রেগে !

গৃহ-দুর্গ ঝাঁ-ঝাঁ তপ্ত. প্রাণে সে যা বাঁচা,—
তা ঐ আপিসেতে ঢুকে - হোক্ তা যতই খাঁচা !
পয়সা চারের মুড়ি-মুড়কি, আর ঐ বাদাম চীনের—
তাতেই উদর-পূর্ত্তি নিত্য,—সারা কাজ, যা দিনের !

পয়সা-কড়ি যেমনি আসা, নাই সে অমনি আর হে,
গয়লা মুদি কোনো ব্যাটাই দ্যায় না কিছু ধারে ··
রক্তচক্ষু পাওনাদার গো নানান্ মূর্ত্তি ধরি,
দ্বারে খাড়া সর্ব্বক্ষণই, কাঁপায় সে থরহরি !

ভীষণ-মূর্ত্তি করালিনী চ্যাঁচান্ ঘরের লক্ষ্মী,
বাড়ীর সীমায় আসে না চিল, কি ঐ বায়স-পক্ষী !
দাসী-চাকর তিষ্ঠাতে হায়, নারে মিনিট-মাত্র -
তাঁর সে কণ্ঠের শাণিত স্বর বেঁধে সকল গাত্র !

নাইকো কামাই, পিশে-ভাগনে, আর ঐ শালা-জ্ঞাতি,
হাজির হেথায় সকল সময়,—কাটান্ দিবস-রাতি !
খাওয়া-দাওয়া আমার খরচায়, আয়েস ষোলপোয়া,
আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আরামে খান্ কোয়া !

দিনের মাঝে পঞ্চাশবার সাধ গেরুয়াটা নিতে,—
গিন্নী মুখ্‌খী, সদাই রুক্ষী—ফতুর জোগান্ দিতে !
আপন-গৃহে থেকে ভাবি, শ্মশানেতে আছি,
দেহ-কক্ষ ছাড়লে প্রাণ এ, বুঝি প্রাণে বাঁচি !

তুচ্ছ খুঁটী-নাটী নিয়ে কি সে ভীষণ যুদ্ধ,
কর্ত্তার মুখ ভার, গিন্নীর তর্জ্জন,—সদাই দোঁহে ক্রুদ্ধ !
ছেলেমেয়ের দুম্‌দাম্ হরদম্, ভাঙ্গা জিনিষ-পত্তোর !
চাকর-ঝীয়ের লাঠালাঠি, ভাবি কেবল, দুত্তোর !

তিলেক শান্তি নাইকো চিত্তে, অশান্তিতে ভরা···
ছেলে-মেয়ে গদাধর, আর গিন্নী খড়্গ-ধরা !
চাল-ডাল নুন-তেল তাতো নেইই, নেই তিল্ মায়া-স্নেহ,
মুখের পানে তাকাবো যে, নাইকো এমন কেহ !

আপিসে ঐ হুঙ্কার-টঙ্কার, গৃহেও তদবস্থ···
হায় ভাগ্য, হায়, আরাম কৈ গো ! সদাই তো জোড়হস্ত !
ঘর ও বাহির দেখি সমান,--আছেন পেতে থাবা—
আদর্শ সংসারে হেথায়, মরে আছি, বাবা !

———

শিল্পী রবি বর্ম্মা

[শ্রীমতী সুশীলপ্রতিমা দেবী]

ভারত মাতার একনিষ্ঠ সাধক,—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী,—চিত্র জগতের যুগাবতার রাজা রবি-বর্ম্মা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের 'মে' মাসে ত্রিবাঙ্কুর সহরের নিকট কিলিমান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ত্রিবাঙ্কুর-রাজ প্রদত্ত জায়গীরদার এবং রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া রাজার প্রিয়-পাত্র হন এবং রাজকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাঁহাকে এক জায়গীর দান করিয়া সম্মানিত করেন। সেই সময় হইতে পুরুষানুক্রমে রাজপরিবারের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। রবি-বর্ম্মার দুই ভাই ও এক ভগিনী—সকলেই স্বভাব শিল্পী, তাঁহাদের পিতা যেরূপ রাজকার্য্যে যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মাতা ও কবিতা লিখিয়া সেরূপ যশঃস্বিনী হইয়াছিলেন।

জন্ম ও পরিচয়

গাছ হইতে যেমন ফলের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারা যায়, মানুষের বাল্য জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও তেমনই তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। বাল্যকালে লেখা পড়া না শিখিয়া চিত্র আঁকিবার জন্য রবি-বর্ম্মা শিক্ষক এবং পিতামাতার কাছে অনেক তিরস্কার লাভ করিয়াছিলেন—অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্রিবাঙ্কুরে লইয়া আসেন। এখানে ও তিনি লেখা-পড়া না করিয়া কেবল চিত্রই আঁকিতে লাগিলেন। পুত্রের চিত্রানুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা সাতিশয় প্রীত হই-লেন এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"রবি! এই চিত্রাঙ্কণ দ্বারা তুমি একদিন আমার বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে ও ভবিষ্যতে ভারতের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হইবে।" ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সেই—তের বৎসর বয়স্ক বালকের হস্তাঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হন এবং ইঁহাকে চিত্রণ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।

বাল্য কথা ও চিত্রানুরাগ

রবি-বর্ম্মার চিত্রাঙ্কণ দেখিয়া চিত্রলেখা নাম্নী মহারাজের এক ভগিনী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে,—একদিন রাজ-প্রাসাদে বসিয়া রবি বর্ম্মা চিত্র অঙ্কণ কারতেছিলেন, অদূরে চিত্রলেখা দর্পণে চিত্রকর ও চিত্রখানিকে প্রতিফলিত করিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন। রবি বর্ম্মা তাহা জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি সেই চিত্রখানি সরাইয়া রাখিলেন ও চিত্রলেখার অসমাপ্ত চিত্রখানি সম্মুখে লইয়া, সম্মুখ দর্পণে প্রতিফলিত চিত্রলেখাকে আঁকিতে লাগিলেন।—তাহা দেখিয়া চিত্রলেখা হাসিতেছিলেন, মহা সুযোগ বুঝিয়া শিল্পী সেই সহাস্য বদনখানি অঙ্কিত করিলেন। তারপর একের পর অঙ্গগুলি অঙ্কিত করিয়া, পায়ে অলক্তক-রাগ পরাইবেন এমন সময় চিত্রলেখা দৌড়িয়া আসিয়া, শিল্পীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"সাবধান, আমার পাদস্পর্শ করিও না, আমি যে তোমার প্রেমমুগ্ধ।" শিল্পী অবাক হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"চিত্রলেখা! আমিও যে তোমার রূপমুগ্ধ।" এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ১৮ বৎসর বয়সে মহাসমারোহে রবি-বর্ম্মা চিত্রলেখার পানিগ্রহণ করেন এবং 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন।

বিবাহ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে থিওডোর নামে একজন চিত্রকর রাজ—পরিবারের চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য নিযুক্ত হইলে, রাজা রবি বর্ম্মা তাঁহার নিকট তৈল চিত্র-অঙ্কণ শিক্ষা করেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি জল মিশ্রিত বর্ণে চিত্রাঙ্কণ করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে একটি ললিত-কলা-

যৌবনে চিত্রাঙ্কণ

প্রদর্শনী হয়। উহাতে রবি বর্ম্মা নিজের হস্তাঙ্কিত দুইখানি তৈল চিত্র প্রেরণ করেন এবং তখনকার গভর্ণর লর্ড হোবার্টের প্রদত্ত একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড যখন যুবরাজ রূপে ভারতে আসেন, তখন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁহাকে রবি বর্ম্মা কৃত একখানি চিত্র উপহার দেন, যুবরাজ চিত্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়া চিত্রকরের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তার পরবৎসর মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে রবি-বর্ম্মা "শকুন্তলার পত্র-লিখন" চিত্রখানি প্রেরণ করেন এবং প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহাই তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্য-ঘটিত প্রথম চিত্র। অতঃপর ইনি বাস্তব ব্যক্তি বিশেষের আলেখ্য (Portrait) এবং অন্যান্য চিত্র আঁকিতে লাগিলেন। তখনকার মান্দ্রাজের গভর্ণর "ডিউক-অব-বাকিংহামের" চিত্র আঁকিয়া ইনি বিশেষ যশোপার্জ্জন করেন। কিছুদিন পরে ইঁহার "সীতার পরীক্ষা" চিত্র দেখিয়া স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও মোহিত হন এবং বরোদার গাইকোবারের জন্য তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয় করেন। নিজের জন্য "একটি নেয়ার বালিকা বেহালায় সুর বাঁধিতেছে" এই মর্ম্মের একখানি চিত্র ক্রয় করেন। শেষোক্ত চিত্রখানি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পুনা প্রদর্শনীতে দেওয়া হয় এবং চিত্রকর গাইকোবারের প্রদত্ত স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গাইকোবাড়ের অভিষেকে নিমন্ত্রিত হইয়া রাজা-রবিবর্ম্মা বরোদায় গমন করেন। তথায় চারি মাস কাল অবস্থান করিয়া রাজপরিবারের সকলের চিত্রাঙ্কণ করেন। তাহার পর তিনি ভবনগর ও মহীশূরে গমন করিয়া তত্রত্য রাজপরিবারের চিত্র আঁকিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। মহীশূরের মহারাজা অন্যান্য উপহারের সহিত চিত্রকরের উচ্চ-মর্য্যাদাজ্ঞাপক দুইটী সুন্দর হস্তী প্রদান করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতার আন্তর্জাতিক (Calcutta International) ও লণ্ডনের ভারতীয় ঔপনিবেশিক (India and Colonial) প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মা রৌপ্য-পদক ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রবিবর্ম্মা গাইকোবাড়ের নূতন প্রাসাদের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত হইতে চৌদ্দটি চিত্র আঁকিয়া দিবার জন্য আদিষ্ট হন। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও চিত্রাদি হইতে হিন্দুরাজা ও রাণীদিগের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহের জন্য ইনি উত্তর ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলমান প্রাধান্যকালে তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তু লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতের প্রত্যেক জাতির, এমন কি উপজাতির এবং কোন কোন প্রদেশে প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি আছে এবং সকল শ্রেণীর একটা সাধারণ পরিচ্ছদ আবিষ্কার করা বড়ই কঠিন। ইনি ইহার পর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতনা ও কলিকাতায় আগমন করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গাইকোবাড়ের আদিষ্ট চিত্রগুলি বরোদায় প্রেরণ করেন এবং তথায় কয়েকদিন প্রকাশ্য স্থানে সেগুলি প্রদর্শিত হয়। তখন বরোদায় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। ভারতের নানা প্রদেশে ঐ সকল চিত্রের হাজার হাজার ফটোগ্রাফ বিক্রীত হইয়াছিল। চিত্রগুলি সাধারণের প্রীতিকর হইয়াছে দেখিয়া রবিবর্ম্মা বোম্বায়ে একটা লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তথা হইতে নিজের চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নানাবর্ণে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুপ্রাপ্য করেন।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

শেষ জীবনে ভারতের জীবন ব্যাপার বিষয়ক দশখানি চিত্র আঁকিয়া রবিবর্ম্মা চিকাগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন এবং তথা হইতে দুইটি পদক এবং প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত পদক ও প্রশংসা পত্র তাঁহার হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই, ৫৯ বৎসর বয়সে চিত্রজগত অন্ধকার করিয়া হৃদ্‌রোগে তিনি পরলোক গমন করেন।

রবিবর্ম্মা অতিশয় বিনয়ী, ধীর প্রকৃতি ও দানশীল লোক ছিলেন। চিত্রবিদ্যার সমালোচকেরা বলেন যে, রবিবর্ম্মা দেশীয় চিত্রাঙ্কণে নিপুণ হইলেও তাঁহার অঙ্কণ-পদ্ধতি পাশ্চাত্য ধরণের। এই সম্বন্ধে আবার কাহারো মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলেন যে রবিবর্ম্মা একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে এই দেশীয় চিত্র বিদ্যাকে এক নূতন জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

আজও ভারতের ঘরে ঘরে এবং সাময়িক পত্রে ইঁহার চিত্রের রাশি রাশি অনুকৃতি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এ সকল চিত্র তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি নহে, কারণ ঐ সমস্ত চিত্রের ফটো তোলা বা লিথো করা তখনকার দিনে বড়ই দুঃসাধ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি বিক্রীত হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের বাহিরে যাওয়ায় তাহাদের ফটো পাইবারও উপায় ছিল না। পৌরাণিক বিষয় ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে গৃহীত উপাদান লইয়া তখনকার দিনে রবিবর্ম্মা ব্যতীত এমন সুরুচি সঙ্গত মনোজ্ঞ চিত্র এত বহুল পরিমাণে আর কেহ অঙ্কণ করিতে পারেন নাই—এখনকার দিনেও কোন চিত্র-শিল্পী পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রবি বর্ম্মার চিত্রিত মনুষ্য বা দেবদেবী মূর্ত্তিগুলি এবং পোষাক পরিচ্ছদাদি অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ পরিচায়ক হইলেও সমগ্র ভারত-বাসীর আদর লাভ করিয়াছিল। ভারতে অনেক মহাকবি, দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রবি বর্ম্মার মত চিত্রকর পুরাকালে এবং এই কালে একজনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি ?—"কীর্ত্তি র্যস্য সঃ জীবতি।" রবি বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা বর্ম্মা ও নিপুণ চিত্রকর ছিলেন; তবে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বাস্তব মনুষ্য—আলেখ্য চিত্রণেই সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।

উপসংহার

রঙ্গ-রস

[শ্রীভোলানাথ মুন্সী]

কোন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রকাশ্যে নিরামিষ ভোজী বলিয়া পরিচয় দিতেন কিন্তু গোপনে মাছ ব্যতীত ভাত খাইতেন না। একদিন তিনি বাজারে বড় একটা রুইমাছ দেখিয়া লোভের বশীভূত হইয়া তাহাকে খরিদ করিলেন এবং অতি সযত্নে তাহাকে গামছায় জড়াইয়া বগল দাবায় করিয়া লইয়া আসিতেছেন কিন্তু মাছটা একটু দোরসা ছিল এবং গামছা ভেদ করিয়া রস পড়িতেছিল; ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করেন নাই। হঠাৎ পথিমধ্যে আর এক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন : –

কক্ষতলে কোয়ং ?

উঃ পুস্তকং ;—

ঈদৃশ দীর্ঘতম ?

উঃ শ্রীমদ্ভাগবতম।

কথং রস গলিতং ?

উঃ প্রেমে পুলকিতং।

ঠাকুর এই কথা বার পাঁচ ছয় বলিতে বলিতে হাত নাড়িতে নাড়িতে সভয়ে ও লজ্জায় বাটীর দিকে পলায়ন হইলেন।

কোন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথশ্রমে কাতর হইয়া চটী জুতা জোড়াটী বাম হস্তে এবং দক্ষিণ হস্তে যষ্টী গাছটী লইয়া পথ চলিতেছেন। এমন সময় রাস্তার ধারে কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে গুটীকতক স্কুল ছাড়া বয়াটে ছেলে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী ছেলে উপহাসসূচক বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয়ের নিবাস ? উঃ অমুক গ্রামে। মশায় দেখছি যে পরকালটী হাতেই রেখেছেন। তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে হ্যাঁ বাপু—আমার পরকাল ত হাতেই আছে, তোমরা যে একেবারে পরকালের মাথা খেয়ে বসে আছ। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, ছোকরার দল নীরব!

কোন পল্লীগ্রামে একটী লোক একটী নূতন ঢেঁকী খরিদ করিয়া মাথায় করিয়া যাইতেছে। লোকটী কিন্তু কালা, শুনতে পায় না। অপর লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে :—

মাথায় কি ?

উঃ রামচন্দ্রপুর।

যাচ্ছো কোথায় ?

উঃ তেঁতুলের ঢেঁকী।

কত্ কে কিন্‌লে ?

উঃ পুরো পাঁচহাত।

লোকটী অবাক।

আদর্শ ভার্য্যা

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়]

আমার ভার্য্যার চাই রং ফর্শা,···সেরা রূপের পরী,
গড়ন নিখুঁৎ, খাসা নাসা, মুখ-চোখ আহা-মরি !
মৃদু ভাষ্যে কথা কবেন, জানবেন না ভ্রূ-ভঙ্গী !
থিয়েটার বা বায়োস্কোপে হবেন নাকো সঙ্গী !

গৃহের কার্য্যে দিবারাত্র রবেন তিনি ব্যস্ত,
অল্পে-সল্পে সারা বাজার, ফর্দ্দ নয় তার মস্ত !
লেশে দরজীর বিলে তিনি হবেন নাকো রাজী,
স্যাঁকরাটাকে দেখবেন সদা অতি-বদ্ আর পাজী !

রন্ধনেতে পোক্ত, রাঁধবেন অল্প তেলে-ঘীয়ে,
কাপড়-চোপড় ঘরেতেই তা কাচেন সাবান দিয়ে !
সূচী-কার্য্যে হবেন দক্ষ, দরজী ভাগবে লাজে,
সেলাই করবেন ইজের-জামা-সেমিজ, নানা সাজে !

রোগে সেবা-নার্শিং এবং পথ্য-তৈয়ারীতে
পোক্ত হবেন দস্তুরমতই,—শুধু আরাম দিতে !
পাওনাদারে পারবেন দিতে বিদায় গুঁতো-বন্যায়,
পুত্রজন্ম দেবেন শুধু, দেবেন নাকো কন্যায় !

খাওয়া-পরা যেমন জুটুক তাতেই পরম তুষ্ট,
রোগের বালাই জানা নাইকো, শরীর রবে পুষ্ট
স্বামীর পয়সা-টাকার, পরে রাখবেন নাকো দৃষ্টি,
জাগাবেন না তর্ক-কৈফিয়তে অনাসৃষ্টি !

স্বামীর চিঠি-পত্র-হিসাব লেখায় হবেন তিনি দক্ষ,
ঝাড়া-পোঁছা সাফ-সোফে 'বয়', সদাই রবে লক্ষ্য !
মানের পালা গাবেন নাকো, ট্রাজেডিতে ইতি,
নিছক কমেডিটি হবেন,—স্বামীর উপর প্রীতি !

নাকে কান্না চান্না মোটেই, অধর-ভরা হাস্য,
স্বামীর বিরল অবসরে সোহাগ-আদর-লাস্য !
গীতে-বাদ্যে থাকবে দখল, মুগ্ধ করবেন গেয়ে,
গদ্যে-পদ্যে মাসিকেরো পৃষ্ঠা ফেলবেন ছেয়ে !

বাপের তাঁরি থাকবে অঢেল টাকা, জমিদারী,
তিনি মাত্র একক-পুত্রী, উত্তর-অধিকারী !
গঞ্জনায় বা ব্যঙ্গে তিনি হবেন নিরেট মূর্খ,
মেজাজ হবে অতি-মিষ্ট, নয় গো ঝাঁজী রুক্ষ !

স্বামীর কথায় ওঠা-বসা হবেন স্বামীর ছায়া,—
নিজের নয়কো মন বা মেজাজ—কেবল যা ঐ কায়া !
অর্থাৎ এ-সব গুণেই বুঝবে নারী সাক্ষাৎ আর্য্যা,—
আমার গৃহের লক্ষ্মী, তিনি আদর্শ মোর ভার্য্যা !

ভিটের গৌরব

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র]

পাহাড়ের গায়ে নদীর কোলে আব্দুল গফুরের ছোট কুটীরখানি ছিল—আর তারই পাশে ছিল তার সামান্য ক্ষেতটুকু। তাতেই আবাদ করে কোন রকমে তার দিন গুজরান্ হ'ত।

থাকবার মধ্যে তার সংসারে ছিল এক কন্যা—দরিদ্রের কন্যা, আমিনা, অন্ধের যষ্ঠী—খোদার দান, আধ ফুটন্ত ফুল-কলি।

গফুর সমস্ত দিন মাঠে কাজ করত আর আমিনা নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে ছুটে বেড়াত। কখনও বা পাথরের আড়ালে শীতল ছায়ায় সুপ্ত প্রকৃতির বুকে নদীর ঘুম পাড়ানি গানে ঘুমিয়ে পড়্‌ত, আবার কখন বা সাঁজের আলোয় পাথরের ওপর বসে নদীপারের পড়ন্ত সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাকৃত। দিনের শেষে বাপের হাত ধরে কুটীরে ফিরত।

গরীব হলেও গফুর বড় শান্তিতে ছিল; সে দীনের পর্ণ কুটীরে বোধ হয় ঘৃণায়, অভাব কখন ফিরেও চাইত না।

তখন সবে মাত্র দু'একটী সাঁজের আলো জ্বলছে; যেখানটায় আকাশের নীলে আর মাঠের সবুজে মিশে গেছে সেখানটায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো দেখা যাচ্ছে দিক সুন্দরীর কপালের টিপের মতন।

জমিদারের পাইক এসে বিশেষ জরুরী কাজ বলে গফুরকে ডাকতে এল। গামছাটা কাঁধে ফেলে তার সঙ্গে যেতে যেতে গফুরের মনে হ'ল, 'খাজনা কি বকেয়া পড়েছে?' ভেবে দেখলে, না, হাল সন পর্য্যন্ত ওয়াশিল দেওয়া আছে।

তবে? তবে আবার কি; জমিদার দেশের রাজা আর সে গরীব প্রজা। গরীবের কি কৈফিয়ৎ চাওয়া ধৃষ্টতা নয়?

* * *

"হুজুর আমার হাল গরু যা কিছু আছে সব নিয়ে ঐ ভিটেটুকু ছেড়ে দিন; মেয়েটার হাত ধরে দিন মজুরী করে খাব, কিন্তু আমায় ঐ বাপ দাদার ভিটে, ঐ দরগায় আমায় থাকতে দিন।"

গফুর অনেক করে কেঁদে কেটে বল্লে যে তার বাপ দাদার ভিটে,—দেবতার আস্তানা, তার ধর্ম্ম মন্দিরে তাকে থাকতে দিতে; যখন কোন ফল হ'ল না তখন নায়েব মশায়ের পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "তা'হলে হুজুর আজ রাতটার মতন সময় দিন—জন্মের মতন আমার বাপের ভিটেয় কাঁদবার ফুরসৎ দিন।"

নায়েব মশাই চশমার ওপর দিয়ে চেয়ে হেসে বল্লেন, "ওসব কাঁদুনী গাইলে কিছু হবে না; রেওতের চোখের জল দেখতে গেলে আর জমিদারী করা চলে না।" তারপর চশমাটা কপালের ওপর তুলে স্বর নামিয়ে একটু হেসে বল্লেন "দেখ গফুর, তবে একটা কাজ যদি করতে পারিস—কাজটাও খুবই সোজা আর তাতে সব দিকই বজায় থাকে।"

জমাটবাঁধা—নিরাশার মধ্যে সামান্য আশাটুকুকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে গফুর বল্লে, "হুজুর আজ্ঞা করুন আমি নিশ্চয় করব।"

"দেখ তোর মেয়েটাকে যদি আমার বাড়ী—পাঠিয়ে দিস্ —কাজকর্ম্ম করবে, খাবে দাবে, বেশ সুখে থাকবে—"

গফুর তার চোখ দুটোর আগুন-দৃষ্টি নায়েব মশায়ের মুখের ওপর রেখে চেঁচিয়ে বল্লে, "আমি ভিটে চাই না।"

"যা, যা, বেটা, অত কথা – শোনবার আমার সময় নেই; কাল সকালে মেয়েটাকে এনে কাজে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাবি, না হলে দুটোর কোনটাই রাখতে পারবি না—না ভিটে না মেয়ে।"

হাউ হাউ করে কেঁদে নায়েব মশায়ের পায়ের ওর আছড়ে পড়ে গফুর বল্লে, "হুজুর"—আর কোন কথাই সে বলতে পারলে না।

"আর হুজুরটুজুর নয়—কে আছিস্, বেটারে বার করে দে।"

যখন ধাক্কা দিয়ে তাকে দরজা থেকে বার করে দিলে সে তখন বাইরের অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাড়িয়ে রইল। মেঘের ওপর মেঘ জমে তখন একটা প্রলয়ের আবাহন করছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝড় আর প্রলয়ের ধারা নেমে এল। শান্ত প্রকৃতি তাণ্ডব নৃত্যে মেতে গেল—আর তার সারা অঙ্গে একটা বিভীষিকার ছায়া ফুটে উঠ্‌লো।

সে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে বল্লে, "একি অবিচার; গরীব বলে কি বিত্তশালীর সমস্ত বোঝাই মাথায় বইতে হবে? গরীব হওয়াটা কি এমনই অপরাধ যে সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সইতে হবে! কখনই নয়; জমিদারের লোক এলে আগে আমিনাকে কাটবো—তারপর—বুকের রক্ত ঢেলে ভিটে রাখ্‌বো। বাপদাদার দরগাখানি কি রাখতে পারবো না?"

ভেতর থেকে প্রাণটা কেঁদে উঠে বল্লে, "বোধহয় রাখ্‌তে পারবে না"—সে চীৎকার করে উঠ্‌লো, "রাখ্‌তে—না পারি ভিটেয় পড়ে মরতে ত পারবো।"

কিন্তু একি! গফুরের বাস্তু কোথায়! সে নদীই বা কোথায়! ভয়ে ভয়ে গফুর ডাকলে "আমিনা—"

প্রতিধ্বনির বুকফাটা উত্তর শুনলে :—

"আমিনা না—ই—"

তার আমিনা আর তার ভিটে কোথায় গেল! নদী তার সহচরীর অপমানে আর গফুরের বিপদে রাগে ফুলে আমিনাকে আর তার বাপের ভিটেকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। চারিদিকে শুধুই জল—আর তারই মাঝে মাঝে পরিচিত গাছগুলো শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা হুতাশ করছে! গফুর তার ভিটের গৌরব রাখলে—রাখতে তাকে হারাতে হ'ল তার কলিজা—দেবতার আশীর্ব্বাদী ফুলটী।
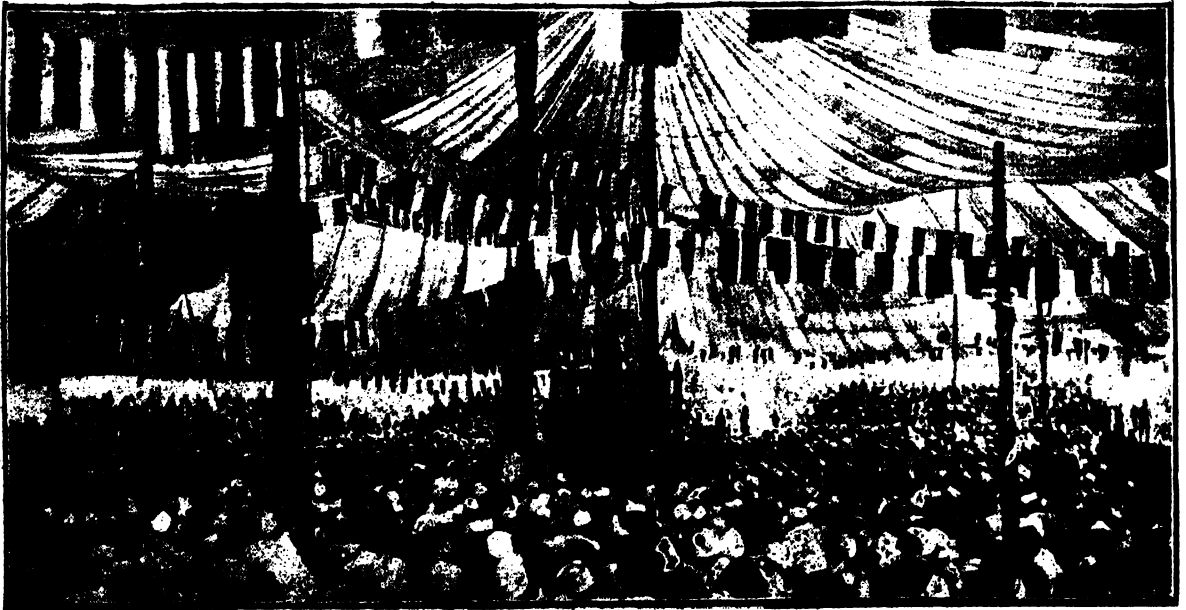
বেলগাঁও কংগ্রেস মণ্ডপ। (সমস্ত খদ্দরের)

কে এ সারথী ?

(নলোপাখ্যান)

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২৫শে মাঘ শনিবার, ১৩৩১। [১৩শ সপ্তাহ

গৃহিণী
(ভিতরে ও বাহিরে)

হাতা বেড়ী ঠেলেই জীবন কাটল !

ভৃত্য-সকাশে

নগদ পয়সা, ওজন কড়া !

উদাসীন-স্বামী—সম্ভাষণে

বিনীত-পুত্র সকাশে

দুর্বিনীতা পুত্র-বধূ সমক্ষে
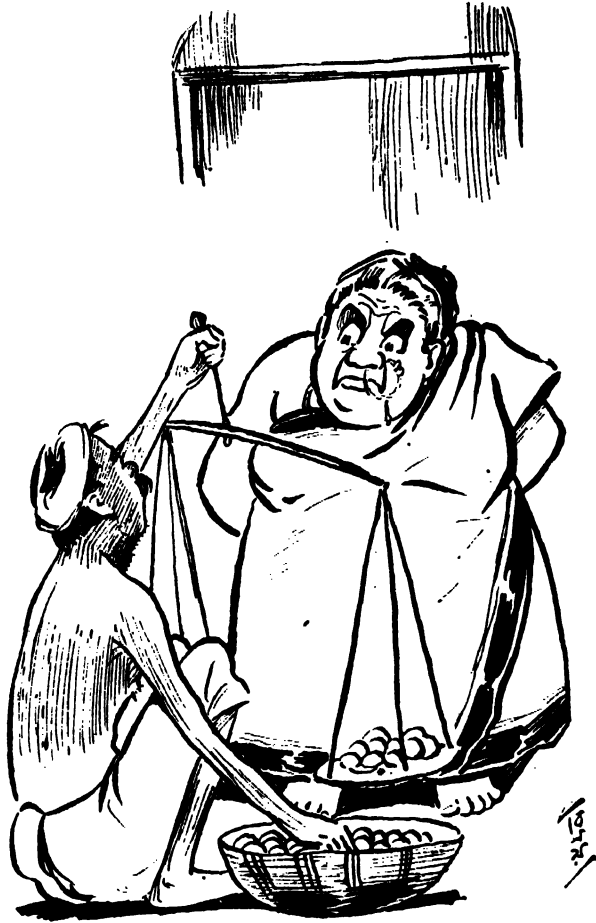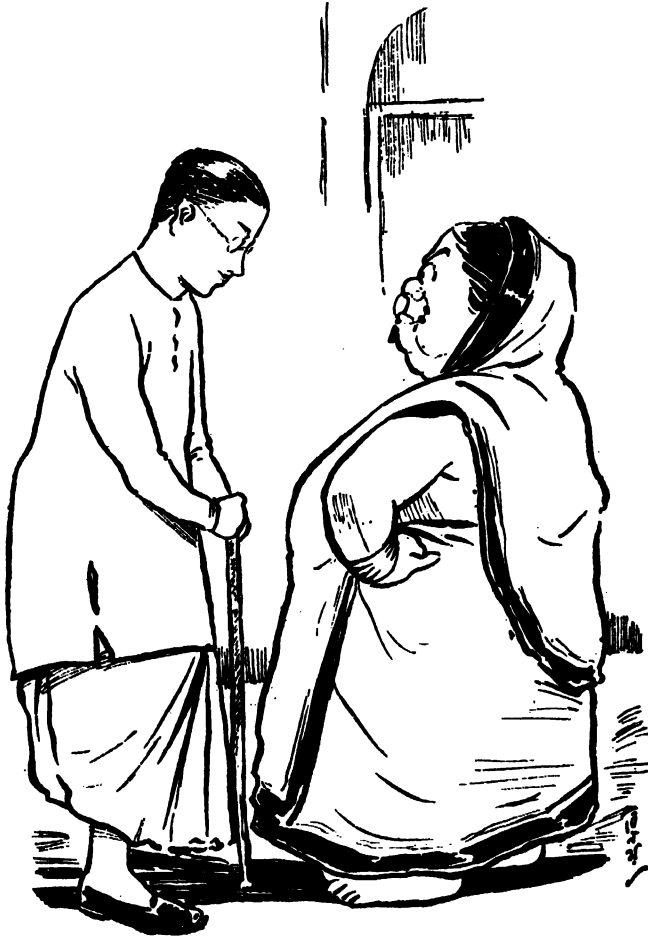
কর্ত্তা। (স্বগতঃ) এ বয়সেও গহনার ফর্দ্দ ? হা রে অদৃষ্ট !

নিশীথ রাক্ষসী

[শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়ান মহকুমার (আধুনিক হিজলি-কাঁথি এক্ষণে সদরে পরিণত) হাকিম—সেই সময়ে তাঁহাকে সরকারী কার্য্যে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে যাইতে হইত। যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—তাহা ঐ মফঃস্বল পরিদর্শনের উজ্জ্বল ও চরম দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়ানে থাকিবার কালীন "দরিয়াপুর" গ্রামে নির্জ্জন ঘন শ্যামাচ্ছাদিত অরণ্যের মধ্যস্থলে—"বাঙ্গলায়" বাস করিতেন। বাঙ্গলার দুই পার্শ্বেই দরদালান, মধ্যস্থলে বড় ঘর। চারিপার্শ্বে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। দালানের একদিকে ঘনান্ধকার অরণ্যানীর কিঞ্চিৎদূরে ক্ষীণসলিলা ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বাঙ্গলাকে বেষ্টন করিয়া কুলুকুলু স্বরে মৃদুমন্দ গতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা, আর দালানের অপরদিকে সেই মত শ্যামল তরুরাজি পূর্ণ নিবিড় কানন (যেন মূর্ত্তিমতী নিস্তব্ধতা বিরাজমানা) তার বহুদূরে যেস্থলে সীমা অসীমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত—সেই স্থলে জঙ্গল ও প্রান্তরের শেষে জরাজীর্ণ ভগ্ন কালী মন্দির। সেই স্থান হইতেই দৌলতপুরের আরম্ভ (আজি দৌলতপুরের অস্তিত্ব ও নাম একেবারে লোপ পাইয়াছে)। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐস্থানে থাকিবার সময়—সরকারের হুকুমে খুনের মকর্দ্দমার তদ্বির করিবার জন্য দরিয়াপুর হইতে দৌলতপুরে যাইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃই সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারিতেন না। সেই নিমিত্ত কোথাও যাইতে হইলে—সূর্য্যের উত্তাপ কমিলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে রওয়ানা হইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন না। দূরপথে কোথাও যাইতে হইলে পাল্কীতে যাইতেন। সরকারী হুকুম অমান্য করিবার কোন উপায় নাই। কাজে কাজেই তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া সন্ধ্যার অনতি বিলম্বেই দৌলতপুর যাত্রা করিতে হইল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই পাল্কীর ডাক বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই মনে মনে কুলদেবতাকে স্মরণ করিয়া পাল্কী করিয়া দৌলতপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দরিয়াপুর "সরকারী বাঙ্গলা" হইতে দৌলতপুর প্রায় সাত আট ক্রোশ পথ। যে ক্ষীণতোয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী দরিয়াপুরের সরকারী নিশান বাঙ্গলাকে বেষ্টন করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিতা—সেই নির্ঝরিণী দৌলতপুরকে পশ্চাৎ রাখিয়া পরিপূর্ণ যৌবনা পূর্ণতোয়া হইয়া খরতর বেগে সাগরাভিমুখে ধাবমানা। ইহাই দৌলতপুরে ভীষণাকার নদীতে পরিণত। সেখানকার লোকেরা উহাকে বলিত "রসুলপুরের নদীর মোহানা।" সেই নদী ক্রমশঃ স্ফীত ও অতি বিস্তৃত হইয়া —"সাগর সঙ্গমে" যাইয়া মিলিত হইয়াছে। দুঃখের কথা এখনকার দিনে এই বাঙ্গালার বাঙ্গালীরা রসুলপুরের নদীর নাম পর্য্যন্ত জানেন না—কিন্তু তখনকার দিনে এই বাঙ্গলার বাঙ্গালীদিগের মুখে মুখে রসুলপুরের নদীর নাম ফিরিয়া বেড়াইত। সেই রসুলপুরের নদীর উপকূলেই দৌলতপুর গ্রাম। দৌলতপুর গ্রাম নাতি বৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র। নির্জ্জন জনমানব শূন্য দরিয়াপুর অপেক্ষা দৌলতপুর সমৃদ্ধিশালী ছিল। দৌলতপুর দরিয়াপুরের ন্যায় মনুষ্য বিরল ছিল না ঠিক নদীর উপরেই অবস্থিত বলিয়া দৌলতপুর একখানি ক্ষুদ্র গঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বহুলোকের সমাগম দৌলতপুরে হইত। কালের কঠিন কষাঘাতে দৌলতপুর শুধু স্মৃতি বুকে রাখিয়া জঙ্গলে রূপান্তরিত হইয়াছে।

(২)

সেই দৌলতপুরে তখন এক ঘর সম্ভ্রান্ত ধনকুবের বাস করিতেন। তিনি সমস্ত নাগোয়ান পরগণার ও আশে পাশে অনেক মহলের একচ্ছত্র সম্রাট স্বরূপ প্রবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার রূপে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রভবন তুল্য পাকা চকমিলান সুবৃহৎ বাটী, ক্ষেত, খামার, গোলাবাড়ী,

ধানের মরাই, গোয়াল পরিপূর্ণ গাভী বলদ, গৃহপালিত গাভীর নির্জ্জলা দুগ্ধ, ভেজালশূন্য গৃহ-প্রস্তুত ঘৃত, মাখন, বাটীতে স্থাপিত গাছের খাঁটী সরিসার তৈল, সিন্ধুকভরা টাকা, আজ্ঞাবহ সুচতুর কার্য্যক্ষম ভৃত্যবর্গ, গোমস্তা, নায়েব, কর্ম্মচারী, বাটীর আনন্দ ও জীবন-স্বরূপ, সরল সদা হাস্যময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু, বালক-বালিকা, পরিণত বয়স্ক উদ্যমশীল, নম্র, পুত্র-কন্যা, তদুপরি সংসারের শ্রেষ্ঠবন্ধন স্বরূপ সহাস্যময়ী শান্তিস্বরূপ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় বিরাজমানা, অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী। প্রত্যেক পুত্রের জন্য জমিদার বাবু এক একখানি স্বতন্ত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগানবাটী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রকন্যারা সকলেই পিতার স হত এক বাটীতে বাস করিতেন। কেবল মাত্র মধ্যম পুত্র ও মধ্যম পুত্রবধূ জানিনা কি কারণে পিতার নিকট হইতে দূরে যাইয়া বাগান বাটীতে বাস করিতেন। মধ্যম পুত্রবধূ পরমাসুন্দরী ঠিক যেন সাক্ষাৎ মাতা ভগবতী স্বরূপ। বোধ হয় মধ্যম পুত্র নিভৃতে গোপনে সেই রূপের ধ্যান ও পূজা করিবার বাসনায় নির্জ্জন পরিষ্কার বাগান বাটী মনোনীত করিয়া পত্নীসহ সেইখানে বাস করিতেন। কিন্তু বিধির বিধান বড়ই কঠোর। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ই বলিয়া গিয়াছেন "মানুষে গড়ে বিধাতা ভাঙ্গে।" বড়ই সুখে জমিদার বাবুর মধ্যম পুত্রের দিন কাটিতে ছিল। বোধ হয় সেই নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল সুখ বিধাতার চক্ষুঃশূল হইয়াছিল। জনশ্রুতি এইরূপ হঠাৎ একদিন স্বামী-স্ত্রীতে সামান্য কথায় বাদ বিসম্বাদ হয়—হইয়া ভীষণ কলহে পরিণত হয়। স্ত্রী অভিমান ভরে বাগান বাটীর দীঘির পরিষ্কার শীতল কাল জলের তলদেশে দেহভার ন্যস্ত করিয়া সকল মান অভিমানের হাত এড়াইয়া জ্বালা যন্ত্রণার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন—হতভাগ্য স্বামী স্ত্রীর এই আকস্মিক আত্মহত্যায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যখন হৃদয়ে অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, সেই সময়ে পিতামাতার আকুল আহ্বানে, অশান্ত হৃদয়ে, শান্তি পাইবার আশায় পিতামাতার পরম শান্তিময় স্নেহশীল ক্রোড়ে উন্মত্তের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি মধ্যম বাবু সংসারে একপ্রকার উদাসীন হইয়া পিতামাতার শান্তিময় আশ্রয়ে থাকিয়া নির্জ্জনবাসে কালযাপন করিতেন। জমিদার বাবু সেই বাগানবাটী সমভাবে রাখিয়া সযত্নে লোকজন দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সেই বাগানবাটীতে বাহিরের কোন লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। যদি গ্রামে কখনও কোন ধনী মহাজন বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী আসিতেন তখন জমিদারবাবু তাঁহাদিগের বাসের জন্য সেই বাগানবাটী খুলিয়া দিতেন।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়ানে থাকিবার কালীন—সরকার হইতে দৌলতপুরে খুনের তদ্বির করিবার গুরুভার প্রাপ্ত হইলেন। মনে মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজকার্য্যের কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে দরিয়াপুর হইতে দৌলতপুরে যাইতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে রৌদ্রের উত্তাপ যেমন অসহ্য—তেমনি ঘোড়ায় চড়াও—তদ্রূপ অসহ্য।—সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গোধূলিতে কুলদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কীর ডাক বসাইয়া—দৌলতপুরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দৌলতপুরে আসিয়া পঁহুছিলেন তখন প্রায় একদণ্ড রাত্রি হইয়াছে।—বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর সেখানের জমিদার বাবুর বাটীতে গিয়া উঠিলেন। জমিদার বাবু স্বয়ং মহা সমারোহে শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করাইয়া নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের সমভিব্যাহারে--স্বতন্ত্র পাল্কী করিয়া সেই বাগান বাটীতে যাইয়া--সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের থাকিবার ও আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া হাস্যমুখে বিদায় লইয়া নিজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।—যে রাজকার্য্যের অনুরোধে সরকারী হুকুমে বঙ্কিমচন্দ্রকে দৌলতপুরে যাইতে হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার বাবু বিদায় গ্রহণ করিবার পরই সদরের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত বৈঠকখানায় দুই পার্শ্বে দুইটী সেজ জ্বালাইয়া সেই কার্য্যে মনসংযোগ করিলেন। সেই অবসরে জমিদার বাবুর প্রেরিত "সিধা" সহ পাচক ঠাকুর যত্ন সহকারে নানাবিধ মুখরোচক মাছ মাংসের তরকারী ও অন্যান্য আহারাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় আহারাদি প্রস্তুত হইলে সর্দ্দার খানসামা যখন তাঁহাকে আহারার্থে সংবাদ দিল তখন বঙ্কিমচন্দ্রের হুঁস

হইল যে রাত্রি অনেক হইয়াছে। কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল ; যেটুকু বাকী ছিল তাহা অসমাপ্ত রাখিয়া আহারার্থ গমন করিলেন—যাইবার সময় সর্দ্দার খানসামাকে হুকুম দিলেন যে সরকারী কাগজপত্র নথি, জবানবন্দি প্রভৃতি যাবতীয় কাগজ সমুদায় যত্ন সহকারে গুছাইয়া লইয়া ডেস্‌প্যাচ বাক্‌সে রাখিয়া দিতে। পরম তৃপ্তিসহ পরিতোষ রূপে আহার সম্পন্ন করিয়া হাতমুখ ধুইয়া বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় মহলে যে ঘরটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দক্ষিণ খোলা সেই ঘরটী শয়নের নিমিত্ত স্থির করিলেন ; ও সর্দ্দার খানসামাকে সেই ঘরে শয্যা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন। সর্দ্দার খানসামা প্রভুর হুকুমানুযায়ী—সেই ঘরে পালংএর উপরে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রস্তুত করিয়া জমিদার বাবু প্রেরিত বৃহৎ গড়গড়ায়—তাওয়া দিয়া—সুগন্ধযুক্ত খাস অম্বুরী তামাক সাজিয়া প্রভুকে সংবাদ দিলে—প্রভু সেই ঘরে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া ধূমপান করিতে করিতে খানসামা প্রবরকে হুকুম দিলেন "দ্যাখ্‌, নূতন জায়গা, নূতন দেশ—সদাসর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকা উচিৎ। তোরা সকলে আহারাদি সকাল সকাল শেষ করিয়া মহলের শেষের ঘরে একটু সজাগ থাকিয়া শুইবি। আর দুইটী বাতিদানে বাতি পরাইয়া আমার শয্যাগৃহে রাখিয়া দিয়া যাস।" সুচতুর সর্দ্দার খানসামা "যে আজ্ঞে হুজুর" বলিয়া মনিবের হুকুমমত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া মনিবের নিকট বিদায় লইয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্থান করিল। সেই মহলের শেষ ঘরে বঙ্কিমচন্দ্রের আদেশ মত সর্দ্দার খানসামা দুইজন আরদালী ও সরকার প্রেরিত দুইজন প্রহরী স্বরূপ শরীর রক্ষক ও জমিদার বাবু প্রেরিত সেই পাচক ঠাকুর সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল। বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চিন্ত মনে গৃহের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষণেক ধূমপানের পরে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

(৪)

এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মুখের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠক শুনুন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিতেছেন "কতক্ষণ এইভাবে নিদ্রাভিভূত ছিলাম ঠিক স্মরণ হয় না। হঠাৎ দরজায় তিনবার তীক্ষ্ণ আঘাত "দুম, দুম্‌ দুম্‌" ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল হয়ত সর্দ্দার খানসামা আমার কলিকা বদলাইয়া দিবার জন্ত দরজা ঠেলিতেছে। তন্দ্রার ঘোরে উহা ভীষণ আঘাত বলিয়া মনে হইতেছে। মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দরজার সম্মুখে বা আশেপাশে কোন মানুষের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। মহলের শেষ নির্দ্দিষ্ট ঘরে ভৃত্যগণের গভীর নাসিকাধ্বনি ; বুঝিলাম—আমার নিষেধসত্ত্বেও সকলেই অকাতরে ঘুমাইতেছে কেহই—জাগিয়া নাই। সর্দ্দার খানসামার উপর ভয়ানক রাগ হইল—কেন সে মড়ার মতন পড়িয়া ঘুমাইতেছে। যাহা হউক পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। শয়ন মাত্রই নিদ্রা। আবার কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম মনে নাই। আবার পূর্ব্বের ন্যায় দরজায় তিনবার অকস্মাৎ "দুম, দুম, দুম।" আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এবার মনের ভিতর কেমন একটা কৌতুহল হইল। ভাবিলাম কি ব্যাপার, কি গভীর রহস্য! দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইলাম। যাইবামাত্র যাহা দেখিলাম—তাহা দেখিয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে লোকজনকে ডাকিলাম! দরজা খুলিয়া দেখিলাম বাহির দরজার সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড কাল কুকুর (বাঘের মতন) সামনের দুই পা তুলিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছে ও আঁচড়াইতেছে। তোমরা সবাই জান কুকুর কি ভয়ানক জিনিষ, আর আমি ঐ জিনিষটাকেই বড়ই ঘৃণা করি ও একটু ভয়ও করি। সুতরাং তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ অত রাত্রে শোয়ার ঘরের দরজায় অত বড় একটা কাল কুকুর দেখিয়া আমার কি রকম ভয় হইয়াছিল। আমি ঘরের ভিতর হইতেই চীৎকার করিয়া চাকরদের ডাকিলাম। আমার আওয়াজ শুনিয়া সর্দ্দার খানসামা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর অমন ভাবে ডাকলেন কেন? কোন কিছু অস্বাভাবিক দেখিয়াছেন কি?" আমি উত্তরে বলিলাম—"না সে সব কিছুই ঘটে নাই। একটা প্রকাণ্ড কাল কুকুর বড়ই জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে

আমি যেই একটু ঘুমাইয়া পড়ি ঠিক সেই সময়েই ঐ কুকুরটা আসিয়া দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেছে। বোধহয় ঐ কুকুরটা রাত্রে এই ঘরেই থাকে, আজ আমি আছি বলিয়াই ঘরে ঢুকিতে পারিতেছে না, আর সেই জন্যেই বোধহয় এমন ভাবে দরজায় ধাক্কা দিতেছে। সে যাই হ'ক তুই এক কাজ কর্। আমার পিস্তলটা আমায় এনে দে। এর পরেও আবার যদি কুকুরটা দরজায় ধাক্কা দেয় তাহা হইলে কুকুরটাকে একেবারে গুলি করে মেরে ফেলব। সর্দ্দার খানসামা "যে আজ্ঞে" বলিয়া পিস্তলটা আমায় দিয়া গেল। আমিও কতক নিশ্চিন্ত হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। বড় জোর বোধহয় আধঘণ্টা বেশ ঘুমাইয়া ছিলাম। আবার দরজায় সেইরকম তিনবার ধাক্কা "দুম, দুম, দুম।" মনে হইল এবারকার শব্দ যেন খুব কোমল ও মৃদু। মনে মনে বড়ই রাগ হইল, একটা কুকুর এমন ভাবে সমস্ত রাত জ্বালাতন করে ঘুমুতে দেবে না! তার চেয়ে কুকুরটাকে একেবারে গুলি করে মেরে ফেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমান খুব ভাল। সেই মতলব ঠিক করে একহাতে পিস্তল, আর একহাতে বাতিদান নিয়ে খুব সাবধানে দরজা খুলে বাহিরে বেরিয়ে পড়লেম। বাহিরে বেরিয়ে যা দেখলেম সে আবার কুকুরের চেয়েও আশ্চর্য্য। দেখলেম কুকুরের কোন চিহ্নও নেই। সেই রাত্রি সেই প্রকাণ্ড বাড়ী, চারিদিকে বনজঙ্গল, হঠাৎ কাণ ঝালাপালা করিয়া সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া স্ত্রীলোকের খলখল হাসি শুধু কাণে আসছে—হিঃ!—হিঃ— হিঃ!—হিঃ হিঃ শব্দে যেন কাণে তালা লেগে যাবার উপক্রম। আমি বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি কোথা হইতে এই অমানুষিক হিঃ হিঃ হাসির শব্দ আসিতেছে ও কে হাসিতেছে।

[বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর গ্রন্থে "কে হাসে কে কাঁদে" পড়িলে ইহা অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।]

আমি বিস্মিত নেত্রে ক্ষণেক এদিক ওদিক দেখিবার পরই দেখিলাম হঠাৎ সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গে বহু মূল্যবান অলঙ্কার পরিয়া—দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। "আমি প্রথমটা ভয়বশতঃ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলাম। পরে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সেই স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "তুমি কে? কি জন্য এই নিশীথ রাত্রিতে একাকিনী এই বিজন মনুষ্যসমাজ শূন্য ঘনান্ধকারে এই বাগান বাড়ীতে আসিয়া ক্রমাগত দরজায় ধাক্কা দিয়া আমার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইতেছ? আমার খুব বিশ্বাস হয় যে তুমি নিশ্চয়ই জমিদারবাবুর কোন আত্মীয়া ও পুরমহিলা স্থানীয়া। কারণ তোমার চেহারা ও বেশভূষা দেখিলে উহা সহজেই বোঝা যায়। এক্ষণে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? তুমি জান আমি কে—আমি মনে করিলে এই দণ্ডে তোমাকে পুলিসে দিতে পারি? কিন্তু আমি সেরকম কিছু করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তাহা হইলে জমিদার বাবুর ঘরের কলঙ্ক আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবার সম্ভাবনা। আপাততঃ আমি তোমাকে আমার আরদালী ও সিপাহির জিম্মা করিয়া দিতেছি। রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত তাহারা তোমাকে আটকাইয়া রাখিবে। কাল খুব ভোরে অতি গোপনে জমিদার বাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে তোমাকে অর্পণ করিব, তার পর তিনি যেমন ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন। আমার এই কথা শুনিয়া সেই পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকটী চীৎকার হিঃ হিঃ শব্দে বিকট উচ্চহাস্যে সেই স্থান কম্পিত করিয়া ও আমাকে স্তম্ভিত করিয়া অতি মৃদু স্বরে আমাকে বলিল "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা আমি সব জানি ও মানি। আরো আমি জানি যে আপনি হাকিম, আপনার নাম বঙ্কিম বাবু ও এই নাগোয়ান মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। মনে করিলে শুধু আমাকে কেন জমিদারবাবুকে পর্য্যন্ত গারদে পাঠাইতে পারেন কিন্তু সে কথা থাক, একটা কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এ বাড়ীতে এত ভাল ভাল ঘর থাকিতে আপনি আমার শয়ন ঘর দখল করিলেন কেন? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার বক্ষে যজ্ঞোপবীত, আপনার শরীর ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ। আপনি এই ঘরে থাকিলে আমি উহাতে প্রবেশ করিতে পারিব না। আমাকে অন্ধকারে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। মিছামিছি আমাকে কষ্ট দিয়া আপনার লাভ কি। আপনি দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই ঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘর দখল করুন। কেহই আপনার দরজায়

আঁচড় পর্য্যন্ত কাটিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইবেন।

(৫)

বঙ্কিমচন্দ্র নির্ব্বাক। সেই স্ত্রীলোকটী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল "আপনার আমাকে আরদালী ও সিপাহির জিম্মা করিয়া দিবার চেষ্টা বৃথা! আপনার আরদালী সিপাহী ত তুচ্ছ সামান্য বেতনভোগী সরকারী চাকর—আপনার স্বয়ং এমন সাধ্য নাই যে আমাকে স্পর্শ করিতে পারেন। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি ত আপনার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছি—আপনার সাধ্য-মত চেষ্টা করিয়া দেখুন আমাকে ধরিতে পারেন কি না ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। "বুঝিলাম তোমার যথেষ্ট সাহস ও বুদ্ধি আছে। কিন্তু ইহাও তুমি স্পষ্ট ও স্থির জানিও আমি বঙ্কিমচন্দ্র। আমাকে বৃথা ভয় দেখান। "ভয়" বলিয়া যে কোন জিনিষ পৃথিবীতে আছে আজ পর্য্যন্ত তাহা আমার অজ্ঞাত। বুঝিলাম তোমার অধঃপতন হইয়াছে, তুমি মহাপাপে ডুবিয়াছ। এই নির্জ্জন বাগানবাড়ী তোমার রাত্রি কালের অভিসারের স্থান। প্রত্যহ গভীর নিশীথে তোমার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য—কামবাসনা পরিপূর্ণ করিবার আশায় —তুমি তোমার মনোমত নাগর লইয়া এই ঘরে পাপ-বাসনা পরিতৃপ্ত কর। আজি আমি এই ঘরে আছি বলিয়া তোমার পাপ অভিষ্ট সাধনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। সেই কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্যই একটা প্রকাণ্ড কাল কুকুর আমার এই ঘরের দরজার সামনে ছাড়িয়া দিয়া মনে করিয়াছিলে আমি ভয় পাইয়া এই ঘর পরিত্যাগ করিব। কিন্তু যখন দেখিলে আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হইলাম না তখন নিজে আসিয়া নানান্ কথায় আমাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছ। তুমি ইহা স্থির স্পষ্ট জানিও আমি কিছুতেই ভয় পাইবার পাত্র নহি। তুমি বলিতেছ—আমার আরদালী সিপাহী ত তুচ্ছ—আমার নিজের এমন সাধ্য নাই যে তোমাকে স্পর্শ করিতে পারি। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক কাহার তেজ ও বল অধিক।"

সেই স্ত্রীলোকটী বাহির মহলের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পিস্তলটী দক্ষিণ-হস্তে মজবুত করিয়া ধরিয়া বাতিদানটি সেই বারাণ্ডায় রাখিয়া দিয়া বামহস্ত বাড়াইয়া স্ত্রীলোকটীকে যেমন ধরিতে যাইবেন অমনি সেই স্ত্রীলোকটী মুহূর্ত্ত মধ্যে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে দশহাত পিছাইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই স্ত্রীলোকটী ক্রমাগত পূর্ব্বের ন্যায় পিছাইতে লাগিল। (একজন ক্রমাগত পিছাইয়া যাইতেছে—অপর জন তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে) উভয়ে এইভাবে দ্বিতীয় মহল হইতে একেবারে বাহির সদর মহলের দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া পঁহুছিলেন। সেই সময় সদর দরজা দৃঢ়রূপে বদ্ধ—আর যাইবার পথ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তখন রোষ-কষায়িত লোচনে স্ত্রীলোকটীকে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "কেমন এখন কি হয়—আমায় বড়ই হায়রাণ করিয়াছ —তোমার কি দুর্দ্দশা করি এইবার দেখ।"

স্ত্রীলোক। "যতক্ষণ না আমায় ধরিতে পারিতেছেন—ততক্ষণ আপনার ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী অতি দুঃসাহসিক ব্যক্তির মুখের বড়াই শোভা পায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃই বড় রাগী ছিলেন। রাগ হইলে তাঁহার দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকিত না। তাহার উপর ঐ স্ত্রীলোকটীর ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে তিনি অস্বাভাবিক রকম রাগিয়া গিয়াছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটীকে ভস্ম করিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে তাহার দিকে অতি কঠোর কটমট করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—যে সেই স্ত্রীলোকটি সদর দরজার সহিত ঠেসাইয়া মিশিয়া গিয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুজনে বোধ হয় এক বিঘৎ তফাতে দাঁড়াইয়া। বঙ্কিমচন্দ্র যেমনি হাত বাড়াইয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিবার চেষ্টা করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া বিদ্যুৎগতিতে ক্ষিপ্র পদবিক্ষেপে সেই স্ত্রীলোকটী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ দুইজনে সামনাসামনি ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই স্ত্রীলোকটী যেন ইচ্ছা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কি হুজুর, এখনও কি আশা মিটে নাই ? এখনও কি সাহস হয় ? আমাকে ত আমার শয়নগৃহ হইতে তাড়া করিয়া

করিয়া সদর বাটীর দরজায় আটকাইয়াছেন—আমাকে ধরা ত দূরের কথা—আমার পরণের কাপড়ের আঁচল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিলেন না! এখনও কি আমাকে ধরিবার ইচ্ছা হয়? সাহসে কুলায়—আসুন সাধ্যমত আমাকে ধরিবার চেষ্টা করুন। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি—বৃথা চেষ্টা। এই বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটী চঞ্চল গতিতে কয়েক পদ অগ্রসর হইল। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন স্ত্রীলোকটী চোখে ধূলা দিয়া পালায়; তখন তিনিও দ্বিগুণ উৎসাহে নবীন উদ্যমে পুনরায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এবারে সেই স্ত্রীলোকটী অগ্রে অগ্রে, বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চাতে। স্ত্রীলোকটী ক্ষিপ্রগতিতে যাইতেছে। পদবিক্ষেপ অতি ক্ষিপ্র, অতি লঘু। পদচারণা দেখা যায় না, যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া যাইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত নয়নে সেই স্ত্রীলোকটীর পদচারণার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃদুমন্দগতিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে—"ইহা কি সত্যসত্য মানবী না কোন ভূতযোনি বা মায়া—" ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক ভাবে নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকটীর ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে "পথিক পথ হারাইয়াছ—আইস"—শুনিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।...

[পাঠক একবার সেই জনমানবশূন্য বিজন অরণ্যে—বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নবকুমারের সহিত সেই গম্ভীর বারিধি তীরে সিকতাময় সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ ও তৎসঙ্গে সেই তরুণীর পরদুঃখ গলিত বীণানিন্দিত কণ্ঠে "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ—আইস।" এই পরিচ্ছদটী পাঠ করিলে বঙ্কিম চন্দ্রের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন (লেখক)]

বঙ্কিমচন্দ্র ও সেই স্ত্রীলোকটী এইভাবে মৃদুমন্দগতিতে সদর মহল প্রদক্ষিণ করিয়া উঠান পার হইয়া পুনরায় দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করিলেন। ক্রমশঃ দ্বিতীয় মহলের এক দিককার দালান পার হইয়া যে ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র শয়ন করিয়াছিলেন—সেই ঘর পর্য্যন্ত আসিলেন কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটী এবারে সেখানে না থামিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিরুপায়—বাধ্য হইয়া তাঁহাকেও যাইতে হইল। এইরূপে দ্বিতীয় মহল প্রদক্ষিণ করিয়া উঠান পার হইয়া উভয়ে তৃতীয় মহলে প্রবেশ করিলেন।

(৬)

উভয়েই চলিয়াছেন স্ত্রীলোকটী অগ্রে অগ্রে, বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ। বঙ্কিমচন্দ্রের একহাতে পিস্তল অপর হস্ত স্ত্রীলোকটীকে ধরিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ প্রসারিত। একজনের পদবিক্ষেপ অতি লঘু—অতি মৃদু—আর একজনের পদবিক্ষেপ অতি দ্রুত অতি কঠিন। স্ত্রীলোকটী যেন ইচ্ছা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে হায়রাণ করিবার ইচ্ছায়—তৃতীয় মহলের সমস্ত ঘর দালান ঘুরিয়া উঠানে নামিল। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠানে অবতরণ করিলেন। ক্রমশঃ সেই স্ত্রীলোকটী উঠান পার হইয়া উহার শেষ সীমানায় যেখানে খিড়কী দরজা—সেই অবধি যাইয়া হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইবা মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হইল যে উহার শরীর ও নয়ন হইতে অগ্নির উত্তাপ বাহির হইতেছে। উহার এত তেজ ও এত উষ্ণতা যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া কয়েকপদ পিছাইয়া আসিতে হইল। তখন সেই স্ত্রীলোকটী খিড়কী দরজায় ঠেস দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিল দেখুন, আপনি এই মহকুমার হাকিম। অনেক চোর বদমায়েসকে ধরিয়া জেলে দিয়াছেন ও দিতেছেন—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেছেন; আমি আপনার কোন অনিষ্ট করি নাই—বা করিবার শক্তি আমার নাই—কারণ আপনার শরীর রীতিমত ব্রহ্মণ্য তেজে পরিপূর্ণ ও আপনি অদ্ভুত দৈবশক্তিতে রক্ষিত। রাত্রি ত প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল। আমার আর থাকিবার অধিকার নাই। এক্ষণে আমাকে স্বস্থানে যাইতে হইবে। প্রভাত বায়ু বহিবার পূর্ব্বে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। হয় ত আরো এক আধ ঘণ্টা থাকিতে পারি। আপনি যখন নাছোড়বন্দা তখন আপনাকে আমার পরিচয় দিয়া যাইতেছি—কারণ আপনি আমার পরিচয়ের জন্য বড়ই ব্যস্ত; শুনুন আমার নাম—বিরহ। আমি জমিদার বাবুর মধ্যম পুত্রবধূ। এই নির্জ্জন বাগানবাটীতে আমি ও আমার স্বামী উভয়ে বহুকাল বাস করিয়াছি। উভয়ে কতকাল কত সুখ দুঃখের কথা কহিয়

কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছি। কতদিন পূর্ণিমা নিশীথে যে ঘরে আজ আপনি শয়ন করিয়াছেন—ঐ ঘরে ঐ পালংএর উপর দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যায় দুইজনে পাশাপাশি শুইয়া জানালা খুলিয়া দিয়া নীলাকাশে-রজতময় শুভ্র পূর্ণচন্দ্র ও মেঘের লুকোচুরী খেলা দেখিতে দেখিতে মনুষ্য সমাগম শূন্য এই বাগানবাটীর প্রাণ ও মন মাতান ফুলের সৌরভে আনন্দিত পুষ্পোদ্যানের নির্জ্জন বনপথে ঝিল্লির অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে পার্শ্বেই ঐ পুষ্করিণীর কালো জলে চাঁদের কিরণ পড়িয়া—রজত শুভ্রজলে বাতাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ দেখিতে দেখিতে দুজনে আত্মবিস্মৃত হইয়া—কত সুখনিশি যাপন করিয়াছি—তাহা বঙ্কিমবাবু তুমি কি বুঝিবে? আজ নিজ দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমি স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন আজ ঐ সকল সুখ কেবল অতীতের স্মৃতি। আজ যেমন আমি রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—স্বাভাবিক মানুষের মতন কথাবার্ত্তা কহিতেছি—মহাপাপ হেতু এক্ষণে আর আমার স্বামীর সম্মুখে যাওয়া ত দূরের কথা, তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত আমার মাড়াইবার শক্তি নাই। আর বৃথা কেন কষ্ট করিয়া আমার পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়াইবেন—আপনি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যান, আর কেহ আপনার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইয়া আপনাকে বিরক্ত করিবে না—আপনার ন্যায় অপূর্ব্ব তেজধারী দুর্দ্দমনীয় সাহসী পুরুষ আমি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নাই। সুখের বিষয় আমার যৌবন সঞ্চারের সময় আপনার ন্যায় সুপুরুষ ভয়শূন্য অদ্ভুত সাহসী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি এক্ষণে চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন যেন শীঘ্র শীঘ্র এ দুঃসহ যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া পুনরায় মনে শান্তি পাই। এই বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটী খিড়কী খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরদৃষ্টিতে সেই স্ত্রীলোকটীর অদ্ভুত পদবিক্ষেপ লক্ষ্য করিতেছিলেন কারণ সেই স্ত্রীলোকটীর এত কথা কাণে পৌছায় নাই! পঁহুছিলে তিনি উহাকে কিছু না কিছু উত্তর দিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ব্বাক। যখন দেখিলেন সেই স্ত্রীলোকটী বাগানের রাস্তায় বাহির হইল তখন তাঁহার হুঁস হইল, সেই অদ্ভুত স্ত্রীলোক কোন পথ দিয়া কোথায় যায় তাহা দেখিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রও পুনরায় সেই স্ত্রীলোকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। বাটীর খিড়কি দরজা হইতে একটী লাল কাঁকর খোদিত পরিষ্কার রাস্তা বরাবর যাইয়া বাগানের শেষ সীমায় যে একটী নাতি বৃহৎ গেট ছিল—সেখানে যাইয়া শেষ হইয়াছিল। গেট খুলিলেই সরকারী সদর রাস্তা। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে দেখিলেন সেই স্ত্রীলোকটী বরাবর সেই রাস্তা ধরিয়া গেট খুলিয়া সরকারী সদর রাস্তায় বাহির হইল! বঙ্কিমচন্দ্রও সদর রাস্তায় বাহির হইলেন।

(৭)

সরকারী সদর রাস্তা হইয়া একটী উত্তর দক্ষিণে ও অপরটী পূর্ব্ব পশ্চিমে গিয়া ও জঙ্গলে যাইয়া শেষ হইয়াছে কিন্তু কোথায় শেষ হইয়াছে তাহার নিরাকরণ হয় নাই। যেখানে জঙ্গল (গভীর অরণ্য) আরম্ভ হইয়াছে ও রাস্তাটী যেখানে যাইয়া মিশিয়াছে তাহার সীমানা স্বরূপ সেখানে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিতা। ঠিক এই জঙ্গল, সদর রাস্তা ও ক্ষুদ্র নদীর সংযোগ স্থলে বৃহদাকার দৈত্যের ন্যায় দুইটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান। একটী অশ্বত্থ ও অপরটী তেতুল বৃক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে ঐ স্ত্রীলোকটী যে রাস্তা বরাবর জমিদার বাবুর বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে—সেই রাস্তা দিয়া সোজাসুজি জমিদার বাবুর বাটীতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন সেই স্ত্রীলোকটী সে রাস্তা ছাড়িয়া বরাবর জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছে তখন তাঁহার কৌতুহলের পরিবর্ত্তে মনে মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহার মনের ভিতর উদয় হইল "আচ্ছা তাহলে এই স্ত্রীলোকটী কি মানবী না কোন প্রেতযোনী?" বঙ্কিমচন্দ্র হতবুদ্ধির ন্যায় সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন আর এক পাও অগ্রসর হইলেন না। সেই তৃতীয় প্রহর রাত্রে মনুষ্য সমাগমশূন্য নির্জ্জন পল্লীপথে অতি বিস্তৃত ঘন শ্যামাচ্ছাদিত বহুযোজন ব্যাপী গভীর অরণ্যের সম্মুখে একাকী দাঁড়াইয়া ভীতিবিহ্বলচিত্তে বিস্ফারিত নয়নে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিতেছিলেন। কি দেখিতেছিলেন—দেখিতেছিলেন সেই স্ত্রীলোকটী ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সেই সংযোগস্থলে যাইয়া হঠাৎ তাঁহার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেখান

হইতে উচ্চরবে অমানুষিকস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কি আপনি এখনও আমার পাছু ছাড়েন নাই? বুঝিতেছি আমার থাকিবার স্থান না দেখিয়া আপনি ফিরিবেন না—কিন্তু উহা না দেখাই আপনার সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল। যখন আপনি স্থিরচিত্ত, যখন পৃথিবীতে "ভয়" বলিয়া যে কোন জিনিষ আছে তাহা আপনার অজ্ঞাত, যখন আপনি স্বয়ং তেজস্বী নির্ভীক ও অদ্ভুত দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ তখন আপনাকে নিষেধ করা বা বিশেষ কিছু বলিবার নাই। প্রভাত তারা উদিত হইবার সময় আগত প্রায়। আর আমার এ পাপ মৃত্তিকায় থাকিবার শক্তি নাই, আমি চলিলাম। যদি আমার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া যথার্থ আপনার মনে দয়ার উদ্রেক হয় ও প্রবৃত্তি ও সময় হয় তাহা হইলে আমার স্বামী বা শ্বশুরকে বলিয়া আমার গতি করাইবার চেষ্টা করিবেন।" এই বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটী সেস্থান হইতে ভক্তি সহকারে গলবস্ত্র হইয়া সাষ্টাঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া—মাটী হইতেই একটী পা তেঁতুল গাছে ও অপর একটী পা অশ্বত্থ গাছে অর্পণ করিল। হঠাৎ ঝড় উঠিলে গাছের পাতা যেমন নড়ে, গাছ যেমন দোলে সেইভাবে ঐ দুইটী বৃক্ষের পাতা জোরে জোরে নড়িয়া উঠিল ও গাছ দুইটী এত জোরে দুলিতে লাগিল যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম। অতবড় যে দুঃসাহসিক বঙ্কিমচন্দ্র তিনিও দেখিয়া শুনিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায়। সেখান হইতে যে এক পা নড়িয়া অন্য কোথাও যাইবেন তখন তাঁহার সে ক্ষমতাও লোপ পাইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিকটধ্বনি করিয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ঐরূপ বিকট চীৎকার শুনিয়া, সর্দ্দার খানসামা, সিপাহি প্রভৃতি সকলে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাটীর ভিতরে চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে না পাইয়া খিড়কির দরজা খোলা রহিয়াছে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া সেইখানে তাঁহাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সর্দ্দার খানসামা ধীরে ধীরে প্রভুর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া মহা কোলাহল করিতেছে ও সর্দ্দার খানসামা তাঁহার গায়ে মৃদু মন্দভাবে হাত বুলাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র আরো খানিক নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় সেই দুইটী গাছের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। তখন উষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, চতুর্দ্দিক বেশ ফরসা হইয়াছে সমস্তই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দেখিলেন গাছ দুইটী পূর্ব্বের ন্যায় নিস্পন্দ; কোন বৃক্ষেরই একটীও পাতা নড়িতেছে না; আর তাহার তলায় বা আশে পাশে কোন মনুষ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। তখন ভাবিলেন ছি ছি কি কুকার্য্যই করিয়াছি। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া একটী "নিশীথ রাক্ষসীর" সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। পুনরায় জীবনে এমন দুঃসাহসিক কর্ম্ম কখনও করিব না।" তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর লোকজন সমভিব্যাহারে সদর রাস্তা ঘুরিয়া সেই বাগান বাটীর সদর গেট পর্য্যন্ত আসিলেন। দেখিলেন সদর ফটক খোলা—সম্মুখেই ফটকের ভিতরে বাদাম গাছের তলায় তাঁহার পাল্কী ও বাহকগণ সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গে পুষ্করিণীতে হাত মুখ ধুইতেছে। সর্দ্দার খানসামা বলিল "হুজুর ভিতরে চলুন—চা তৈয়ারী করিয়া দিই।" বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জীবনে আর কখনও ঐ বাগান বাটীতে প্রবেশ করিবেন না সুতরাং সর্দ্দার খানসামাকে হুকুম দিলেন "যে সকাল হইয়া গিয়াছে আর বাটীর ভিতর যাইবার কোন প্রয়োজন নাই—আমি এই বাহিরে একটু শীতল বাতাসে পায়চারী করিয়া মাথাটা ঠাণ্ডা করি—তুমি সমস্ত জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইয়া পাল্কী বেহারাদের পাল্কী এইখানে আনিতে হুকুম দিয়া চলিয়া আইস।"

তৎক্ষণাৎ তাঁহার হুকুম তামিল হইল। বঙ্কিমচন্দ্র রাত্রিবাসের কাপড় পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া রীতিমত প্রভাতী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পাল্কীতে আরোহন করিয়া একজন সিপাহিকে হুকুম দিলেন "তুমি এই মুহূর্ত্তে বাটীর সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সদর ফটকে চাবি দিয়া সেই চাবি জমিদার বাবুকে পঁহুছিয়া দিবে ও জমিদারবাবুকে সেলাম দিয়া বলিবে তিনি যেন অতি অবশ্য অবশ্য কাল আমার বাসায় যাইয়া সাক্ষাৎ করেন। বিশেষ জরুরী সরকারী কাজ-কর্ত্তব্যের খাতিরে আমি এখন আর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না। অপরাপর

পালকী বাহকদিগকে পালকী উঠাইতে হুকুম দিলেন। এই-রূপে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত রাত্রি নিশীথ রাক্ষসীর সহিত বেড়াইয়া প্রভাত সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেলা প্রায় সাতটা আটটার সময় দরিয়াপুরের সরকারী বাঙ্গলায় আসিয়া পঁহুছিলেন। পরদিনই স্বয়ং জমিদার বাবু শশব্যস্ত হইয়া আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া পায়ের ধূলা লইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে সেই রাত্রের ঘটনা আগাগোড়া বলিয়া বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহার মধ্যম পুত্র সত্বর গয়ায় যাইয়া বধূটীর পিণ্ডদান করিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূ তাঁহাকে এই নিমিত্ত বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে।

জমিদার বাবু সমস্ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি ভাল দিন দেখাইয়া যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার মধ্যম পুত্রকে গয়ায় পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র আর একদিন মাত্র নাগোয়ানে ছিলেন। রাত্রিতে মাঝে মাঝে ঐ "নিশীথ রাক্ষসীর" দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল ও সদা সর্ব্বদাই মনে একটা আতঙ্ক ও ভয় উপস্থিত হইল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সত্বরই ছুটী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আমরা এই "নিশীথ রাক্ষসীর" গল্প মাতামহ দেবের নিজমুখে শুনিয়াছি,যে রাত্রে তিনি এই গল্প আমাদের শোনান সে রাত্রে তাঁহার শয়ন গৃহে আমার ন্যায় শ্রোতা অনেক ছিল—এমন কি আমার স্বর্গীয়া মাতামহী দেবীও উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর তিনি এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া "নিশীথ রাক্ষসী" নাম দিয়া "সাহিত্য" মাসিক পত্রে প্রকাশার্থ পাঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পাঠগৃহে পুরাতন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাগজ পত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে উহা দেখিতে পাইয়া আনিয়া খাতায় অবিকল নকল করিয়া রাখিয়া দিই। এখানে সেই খাতা হইতে পুনরায় নকল করিয়া সচিত্র শিশিরের পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

১

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(১৯)

পরদিন প্রাতঃকালে জিতুদার সহিত কাকাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত ঘরের লোকের মত অসঙ্কোচে বাবার পাশে মোড়াটা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি নিকটেই ছিলাম। আমার পানে চোখ তুলিয়া হাসি-মুখে বলিলেন "মা লক্ষ্মীর এমন কি কাজ হচ্ছে? একটু চা খাওয়াতে পার? কাল অত আদর করে ক্ষীর তক্তি চা খাওয়ানো ভাল হয় নি; তোমার এ ছেলেটি বড্ড লোভী মা; ভাল জিনিষের প্রতি এর আর লোভের অন্ত নেই।" বলিয়া প্রাণ খোলা সরল হাসির ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

আমি আস্তে আস্তে বলিলাম "আপনি একটু বসুন, আমি চা তৈরী করে আনচি।"

"আমার তাড়াতাড়ি নেই মা, তুমি ধীরে সুস্থে আন। এবেলা আমি শুধু চা খাই। তোমার পেটুক ছেলেকে ভুলোতে চায়ের সঙ্গে আর কিছু কিন্তু এনো না। পাঞ্চীর বামন ঠাকুর ভোর বেলা এক দফা চা খাইয়ে দিয়েচে, কিন্তু তার হাত তোমার মত মিঠে নয়।"

আমি বারান্দার তোলা উনুনে চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া সরঞ্জামগুলি আনিবার জন্য ঘরে গিয়া শুনিলাম—জিতুদা কহিতেছে "কাকাবাবু কনকের হাতের চা খেয়েই এত খুসী; এখনো তো রান্না খান নি! আমাদের এ গাঁয়ে কাকীমার মত রাঁধুনী একটিও নেই; কনী কাকীমার হাতটি যেন কেড়ে নিয়েচে। একদিন আপনার কনকের রান্না খেতে হবে।"

কাকাবাবু বলিলেন "কাছারী থেকে ঘুরে এসে একদিন মা লক্ষ্মীর রান্না খাব।"

বাবা হাত জোড় করিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "বাড়ীতে এরকম ভাবে বলা আমার উচিত হয় না জানি, তবু অনুরোধ করাছ—আজ দুপুরে গরীবের কুঁড়ের কনকের হাতের দু'টো শাক ভাত আপনার খেতেই হবে। কাছারী থেকে ঘুরে এসে আরেক দিন না হয় খাবেন।"

কাকাবাবু বাবার যুক্তকর করের মধ্যে গ্রহণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন "এই কথা! এর জন্যে এত বিনয় কেন দয়ালবাবু? আমি ওসব সামাজিক বাঁধা নিয়মের ধার ধারি না। আপনি সরল অন্তঃকরণে খেতে বল্লেন এই আমার যথেষ্ট। নিজেকে গরীব বলে সঙ্কুচিত হন কেন; আপনার গাঁয়ের লোক আপনাকে গরীব বলে যতই বিপদে ফেলুক না কেন, তবু আপনি তাদের চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু আমায় খেতে বলে কাজটা তো ভাল করলেন না!"

বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কাকাবাবুর পানে চাহিলেন। কাকাবাবু হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন "যার লোভ বেশী, তাকে অন্নপূর্ণার পরমান্নের খবর দেওয়া ভাল নয়। শেষে অন্নপূর্ণা শুদ্ধ চুরী না হয়!"

এই সামান্য পরিহাসে বাবার মলিনমুখে আনন্দের দীপ্তি খেলিয়া গেল। বাবা প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিলেন—"কনক দুঃখী বাপের দুঃখিনী মেয়ে, চুরী যাবার স্পর্দ্ধা তার একটুও নেই উমাপ্রসাদ বাবু।"

কাকাবাবু জবাব দিলেন "চোরের যদি স্পর্দ্ধা হয়, তাহলে হিমালয় অন্নপূর্ণাকে ধরে রাখতে পারবে না। শিবের জন্যে—উমাপ্রসাদকেই উমা নিয়ে যেতে হবে।"

এ সব প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বাবা কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন আমি তাহা না জানিলেও কেমন একটা অজানা পুলকে আমার হৃদয় মন উতলা হইয়া উঠিল। যে বিশ্ব এতদিন

আমার কাছে নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কোন অদৃশ্য হস্তের পরশে আজ সেইখানে আশার সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইল। হেমন্তের উদীয়মান সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটা আজ যেন আমার সমস্ত রোমকূপ ভেদ করিয়া অন্তঃকরণকে রাঙাইয়া তুলিল। আজিকার গৃহকাজ প্রতিদিনের গৃহ কাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমার সমস্ত নৈপুণ্য প্রয়োগ করিয়া রান্না করিতে বসিলাম। মা রান্নার যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। একঘণ্টার মধ্যে জিতুদা জেলেপাড়া হইতে বৃহৎ একটি রোহিৎ মৎস্যের আমদানী করিল। মা কৈবর্ত্ত বৌকে পাঠাইয়া গয়লা বাড়ী হইতে দই আনাইলেন। মঙ্গলার দুধটুকু জাল দিয়া ক্ষীর প্রস্তুত হইল।

মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়া কাকাবাবু সোল্লাসে কহিলেন—"এত অল্প সময়ের ভেতর এমন আয়োজন করেছেন দয়ালবাবু! সাধে কি বলেছি—আপনার ঘরে অন্নপূর্ণার অচল আসন পাতা! এমন সুন্দর রান্না অনেককাল খাইনি। এক খেয়েছিলাম মার হাতে, আর অনেক কালের পর খাচ্চি এই মায়ের হাতে।"

কাকাবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইলেন।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার মা কোথাকার মেয়ে ছিলেন? কতদিন হল তাঁর কাল হ'য়েছে?"

"অনেক দিন, সতেরো আঠারো বছর হবে। মা পাড়া গাঁয়ের মেয়ে ছিলেন; ঠিক কনক মায়ের মতনই তাঁর চেহারাটি ছিল। তিনি বর্ণে শ্যামা হলেও গুণে লক্ষ্মী ছিলেন। এ মায়ের সঙ্গে তাঁর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এর নাম কনকলতা, মার নাম ছিল কান্তিময়ী, সেখানেও আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে।"

বাবা হাসিয়া উত্তর দিলেন "অনেক সময় একের চেহারা বা স্বভাবের সাথে অন্যের মিল দেখা যায়, কিন্তু তার সংখ্যা খুব কম। আপনি মাতৃভক্ত সন্তান, সামান্য সাদৃশ্যে মায়ের প্রতিচ্ছবি ধরতে পেরেছেন।"

বাবার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া নানা অবান্তর কথা বলিতে বলিতে কাকাবাবু খাওয়া শেষ করিলেন।

শয়ন-কক্ষে বিছানা পাতিয়া কাকাবাবুর বিশ্রামের স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রান্না ঘরের কাজ সারিয়া আমি কাকাবাবুর বিছানার পাশে বঁটিখানা টানিয়া লইয়া নারিকেলের কৃত্রিম চিড়া, জীরা, ফুল, পদ্ম প্রভৃতি কাটিতে বসিলাম। অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে কৈবর্ত্ত বৌয়ের বোনঝির বিবাহ, বিবাহের পিঁড়ি আল্পনা ও বরের জল খাবার প্রস্তুতের ভার কৈবর্ত্ত বৌ আমাকেই দিয়াছিল।

কাকাবাবু তাকিয়া বালিসটার উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন "এক বিরাট খাওয়া তো এখুনি মিটিয়ে এলে মা, আবার বঁটি নিয়ে কিসের কুটনো হচ্চে? নারকেলের ওগুলো দিয়ে কি রান্না হবে?"

নারিকেলের রসনা তৃপ্তিকর নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্যের সহিত পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ সকলেই পরিচিত, কিন্তু সহরবাসী এ রসের আস্বাদ হইতে একেবারেই বঞ্চিত। কাকাবাবু খাদ্য সামগ্রীকে রন্ধনের পর্য্যায়-ভুক্ত করায় বেনুর কৌতুকের অবধি রহিল না। কাকাবাবু খুব ঠকিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মা'র বিছানায় গড়াইতে গড়াইতে জিতুদাও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বাবা বলিলেন "তোরা শুধু শুধু হাসছিস কেন রে, কলকাতার লোক এঁরা; এ সব পাড়াগেঁয়ে খাবার চিনবেন কি করে?" বলিয়া বাবা নারিকেলের বিবিধ দ্রব্যগুলি হাতে লইয়া তাহা প্রস্তুতের কারণ ও প্রণালী কাকাবাবুকে বুঝাইয়া দিলেন। কৈবর্ত্ত বৌয়ের বোনঝির বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিতেই বেনু ছুটিয়া গিয়া ঘরের কোণ হইতে কাপড়-ঢাকা চিত্রিত পিঁড়িখানি আনিয়া কাকাবাবুর সম্মুখে রাখিল।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে পিঁড়িখানার প্রতি চাহিয়া কাকাবাবু প্রশ্ন করিলেন "এটা কে এঁকেছে দয়ালবাবু? কেমন সুন্দর পরিকল্পনা; পদ্মবন, তার পাশে হাঁসের সারি; রঙগুলি কি সুন্দর মানিয়ে দেওয়া।"

"যে এটা এঁকেছে, সে আপনার সামনেই রয়েছে উমা-প্রসাদ বাবু। কনকের হাতের আঁকা এ সব।"

"কনক-মায়ের হাতের! কেবল খাবার তৈরিতে নয়, রান্না-বাড়ায় নয়, চিত্রেও মায়ের এমন হাত!"

"শুধু তাই নয়, এ গাঁয়ে কনীর মতন চরকায় সরু সূতো

কাটতে কেউ পারে না। সূচি কাজে কনক অদ্বিতীয়া, যা তো বেন্থু কণীর সেলাই টেলাই গুলো নিয়ে আয়।"

বেন্থুকে পাঠাইয়া দিয়া জিতুদা আসরে অবতীর্ণ হইলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকে সেখান হইতে উঠিয়া আসিতে হইল। কিন্তু দূরে যাইতে পারিলাম না। আপনার স্তব-স্তুতির মূর্চ্ছনা আমাকে যেন আবিষ্ট করিয়া ফেলিল।

একেই বেন্থু দিদির বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব ঘোষনা করিতে পারিলে আনন্দে দিশেহারা হইয়া যায়; তাহার পর আজ আবার দিদির গুণপণা জাহির করিবার ভার তার উপর ন্যস্ত হওয়ায় সে নাচিতে নাচিতে আমার যত কিছু কৃতিত্বের নিদর্শন সমস্তই লইয়া গিয়া কাকাবাবুর সম্মুখে স্তূপাকার করিতে লাগিল। কাঁথা হইতে সুরু করিয়া পাথরে খোদাই সমস্ত; এমন কি নগণ্য পুঁতির গহনা পর্য্যন্ত বাদ গেল না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কাকাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, যাদের জন্যে পিঁড়ি আলপনা হয়েছে,—তাদের বিয়ে কবে দয়ালবাবু? অঘ্রাণের প্রথম কি বিয়ের দিন আছে?"

বাবা বলিলেন "৫ই অগ্রহায়ণ বিয়ের খুব ভাল দিন আছে। যাদের জন্যে এসব আয়োজন হচ্চে তাদের বিয়ে ১০ই অঘ্রাণ। বিয়ের খবরে কি হবে উমাপ্রসাদ বাবু?"

"বিয়ের খবরে কি হবে! আমার একটি অমূল্যরত্ন আছে, সেই রত্নের বিনিময়ে—আমার একটি রত্ন কিন্‌বার ইচ্ছা হয়েছে দয়ালবাবু। ৫ই অগ্রহায়ণ আপনার মেয়ের বিয়ে! এই পিঁড়িতে বসে বিয়ে হবে; এই সব দ্রব্যে বরভোজন হ'বে। মায়ের কাজ মা আগে থেকেই সেরে রেখেছে। ও কি! চম্‌কে উঠলেন কেন দয়ালবাবু? আমি ঠাট্টা করিনি। জিতুর কাছে আপনাদের সব কথাই আমি শুনেছি। আপনাদের মহত্বের কথা শুনে, দূর থেকেই আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা আমার হয়েছিল। তাই আমি আপনার মেয়েটিকে বিশেষ লক্ষ্য করে দেখতে এসেছিলাম। ভগবান আমার সাধ পূর্ণ করেছেন। সন্তানের চোখে মায়ের স্বরূপ-মূর্ত্তির প্রকাশ পেয়েছে।"

গৃহে একটি বজ্র পতন হইলে লোকে বুঝি এত চমকিত হইতে পারিত না। বাবা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার বাক্য স্ফূরণ হইল না। কৃতজ্ঞতার অশ্রু সমাগমে চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আমি যেটুকু শুনিলাম, তাহাতেই মহা-সুখে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমি বারান্দার খুঁটাটা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া কোনরূপে পতনবেগ সম্বরণ করিলাম।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে স্থান গল্প গুজবে মুখর হইয়াছিল, এক দণ্ডে কোন যাদুমন্ত্রে যেন সেই কলরব উচ্চভাষা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েকটি প্রাণী পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। হেমন্তের মৃদু অলস বায়ু ধরাচ্যুত মল্লিকার শেষ সুগন্ধটুকু বিলাইয়া, দ্বার হইতে দ্বারান্তরে ঘুরিতে লাগিল। কোন সুদূর তরুতল হইতে রাখালের সাধের বাঁশীটি দ্বিপ্রহরের শান্ত মৌনতা ভেদ করিয়া সকরুণস্বরে বাজিয়া উঠিল। বাঁশীর তানে সচেতন হইয়াই বুঝি নিম্ববৃক্ষের ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন শাখায় বসিয়া উদাসস্বরে ঘুঘু ডাকিয়া উঠিল 'ঘুঘু ঘু' 'ঘুঘু ঘু'।

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কাকাবাবুই প্রথমে কথা কহিলেন। বাবার হাতখানার উপর ঈষৎ চাপ দিয়া ডাকিয়া কহিলেন "দয়ালবাবু, চুপ করে এত ভাবছেন কি? বিনা মূল্যে আপনার রত্নটিকে আমি অপহরণ করবো না। আমারো যে রত্নটি আছে—রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সে কনকের অযোগ্য হবে না। তার কথা—আপনাকে ভাল করে জানানো হয় নি। সে আমার ভাইপো। আমার ইচ্ছা ছিল মণীশের আইন পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলে বিয়ে দেব, কিন্তু মাকে দেখে আমি সে সংকল্প পরিত্যাগ করলেম। মণীশকে দেখা শোনার জন্যে আপনার আর কষ্ট করে যেতে হবে না; জিতু তাকে দেখেছে।—হ্যাঁ জিতু, তুমি তো মণীশকে জানো, সেকি কনকের অযোগ্য হ'বে?"

জিতুদা প্রসন্ন হাস্যে জবাব করিল "অযোগ্য! এদেশে মণীশবাবুর মত কয়টা বর পাওয়া যায় কাকাবাবু? মণীশ বাবুর সঙ্গে কণীর বিয়ে হবে, এতটা যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। কণীর কি এতবড় সৌভাগ্য হবে? আমি মণীশ বাবুকে বিলক্ষণ জানি, যেমন বিদ্যায় বুদ্ধিতে, তেম্‌নি রূপে—যা একশ'র ভেতর একটা মেলে কিনা সন্দেহ।"

কাকাবাবুর আগ্রহে, জিতুদার মন্তব্যে বাবা কিছু না

বলিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। বাবার নির্ব্বাক উপেক্ষায় জিতুদা চঞ্চল দৃষ্টিতে বাবার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। কাকাবাবুর প্রশান্ত বদনে কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা ফুটিয়া উঠিল।

খানিকক্ষণ পর কাকাবাবু বলিলেন "আমি কি অসঙ্গত প্রস্তাব করে আপনাকে আঘাত কোরলাম দয়ালবাবু? আমি সব দিক দিয়ে ভেবে দেখেছি, এ বিয়ে হ'তে কোথায় কোন বাধা নেই। তবু যদি আপনার আপত্তির কোন কারণ থাকে, সেটা বলুন।"

বাবা আবেগভরে কাকাবাবুর বাহু জড়াইয়া ধরিয়া, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বলিলেন "উমাপ্রসাদবাবু আপনি দেবতা, আমায় উদ্ধার করতে এসেছেন; কিন্তু এ করুণা, এ দয়া নেবার আমার সাধ্য নেই।"

"সাধ্য নেই কেন দয়ালবাবু? কিসে আপনার অসাধ্য হ'ল?"

বাবা জোড় হাতে, ধরা গলায় বলিলেন "আমি দরিদ্র, নিতান্ত দীন হীন, আপনার সাথে কুটুম্বিতা করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। তারপর—আমার মেয়ে কালো; আপনার রূপবান ছেলে এরূপ হীনতা বোধ হয় সহ্য কোরতে পারবে না। ফলে আপনার শান্তির সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হবে। আপনি মহৎ, আপনি উদার, আমার স্বার্থের জন্যে আপনাকে আমি অশান্তির ভেতর ফেলতে পারবো না।"

"এই কথা, এরি ভয়! আমার হাঁড়ির খবর না নিয়েই কি আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছি দয়ালবাবু? মণীশ তার কাকাকে কতখানি ভালবাসে, ভক্তি করে তা আপনি জানেন না। সেই ছেলেবেলা থেকে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত সে কখনো তার কাকার দেওয়া জিনিষ উপেক্ষা করে নি, এখনও করবে না; সে বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র ভয় নেই। আপনি আমায় দেবতা বলে, মহৎ বলে অযথা বড় ভাববেন না। আমি আপনার স্বদেশবাসী, স্বজাতি, আমি আজ যা করতে চাচ্চি মানুষ মাত্রেরই, হিন্দু মাত্রেরই তা করণীয়। এ খুব বেশী কিছু নয়। তারপর অবস্থার কথা—ধনী, দারিদ্র অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, কারুর গায়ে লেখা থাকে না। রাজার মত আপনার অন্তঃকরণ, আপনার মেয়ে কালো হলেও বিধাতা তাকে দেবীর ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। আপনার কাছে কনক মাকে আমি দাবী করচি না, ভিক্ষা চাচ্ছি। বলুন ভিক্ষা দেবেন?"

বাবা কাকাবাবুকে আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন "কনক"। আমি অবাধ্য অবশ পদদ্বয় কোনমতে টানিয়া লইয়া আনত শিরে বাবার নিকটে উপস্থিত হইলাম। বাবা কম্পিত হস্তে আমার হাত ধরিয়া, কাকাবাবুর পায়ের উপর রাখিয়া, সজল নয়নে কহিলেন "উমাপ্রসাদবাবু, আমার কনককে আজ আমি আপনার পায়ে সঁপে দিলাম। আমি মণীশকে জানি না, তাকে দেখি নাই; আপনাকেই চিনি, আপনি কনকের কাকাবাবু ন'ন, এখন থেকে বাবা হলেন। কনক যেন আপনার এ দানের মর্য্যাদা বুঝতে পারে। নিজের স্থান করে নিয়ে আপনাকে সুখী করতে পারে।"

কাকাবাবু সাদরে সস্নেহে আমার মুখখানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া আমার মস্তকে অধর স্পর্শ করাইলেন।

(২০)

আজ আমার বিবাহ। জগৎ যেন সুধার ধারায় স্নাত হইয়াছে। নদীর বুকে, বিহগ কণ্ঠে, ফুলের হাসিতে কি শোভা! কি মধু! হেমন্তলক্ষ্মী অম্লান মূর্ত্তিতে আজ প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের রুদ্ধ দ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন।

যেসব প্রতিবেশীরা আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়া অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই উপযাচিকা হইয়া আমার বিবাহে যোগ দিতে আসিয়াছেন। কারণ আমাদের দুঃখের নিশা প্রভাত হইয়াছে, সৌভাগ্য সূর্য্য দিক্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া—অদূরে উদয়োন্মুখ। আজ আমি ধনী গৃহের বধূ হইতে যাইতেছি। সে বধূও যেমন তেমন ভাবে নহে, স্বয়ং জমিদার স্নেহে, করুণায়, বিনা কপর্দ্দকে, বিনা অনুসন্ধানে সমাজচ্যুত পিতার রূপহীনা কন্যাকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেছেন। এমন অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ঘটনা সংসারে কয়টা হইয়াছে? কয় জনাই বা ইহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকারী হইয়াছেন! এ যে নূতন একেবারে বিস্ময়ের উপর চরম বিস্ময়! এখন সকলেই

আমাদের আত্মীয়, সকলেই আমাদের সুহৃদ! আজ আমাদের নিরানন্দ কুটীর লোক-সমাগমে মুখরিত, আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

কতকালের পর বাবা যেন আনন্দ সাগরে স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। মা'র কাণে কোন ত্রিদিবের বীণার ঝঙ্কার পশিয়াছে। মা প্রফুল্ল বদনে, প্রফুল্ল নয়নে একা দশের খাটুনী খাটিতেছেন। বেনু বসন্ত-বায়ু-বিক্ষিপ্ত লঘু মেঘ খণ্ডের মত পুলক পূরিত হৃদয়ে বরের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া ঘুরিতেছে।

বেনুর দিদিরও ব্যগ্রতার সীমা নাই। কি একটা অজানা আনন্দোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া আমি দিনাবসানের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার স্বতঃই মনে হইতেছিল এ অনির্ব্বচনীয় আশাভরা দিনটি বড় ধীর, বড় মন্থর।

অগ্রহায়ণের অনতি শীতল মধুর অপরাহ্ণ-অবসানে আমার আকাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যাটি অযুত ফুলের পরিমল বহিয়া আমার হৃদয় দ্বারে সমাগত হইল। বাঁশ ঝাড়ের মাথার উপরে নবোদিত শুক্ল পক্ষের চাঁদের আলো স্পর্শরূপে আমার সমস্ত অন্তঃকরণকে বারম্বার বেষ্টন করিয়া ধরিল। কোন অপরিচিতের অপরিমেয় করুণারসার্দ্র আঁখিরূপে জ্যোৎস্না-লোক—আমার মুখের উপরে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমার সর্ব্ব শরীর পুলকিত, এবং গত দিনের দুঃখ কাহিনী স্মরণে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। এক দিন যে পৃথিবীকে বিরস ও জীবনকে দুঃসহ বোধ হইয়াছিল, আজ সেই ধরণী শান্ত শীতল শোভাময় বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রাণের তারে তারে একটা হর্ষ শিহরণ উত্থিত হইয়া—অব্যক্ত সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা সূচনায়—একটি তরুণী আমাকে রাঙ্গা শাঁখা পরাইয়া বধূবেশে সজ্জিত করিতে লাগিল। প্রদীপের নিকটে বসাইয়া সুনিপুণ হাতে আমার ললাটে চন্দন লেখা আঁকিয়া দিল।

কিয়ৎকাল পর করুণ কোমল স্বরে সানাই বাজিয়া উঠিল। পুর মহিলারা ঘন ঘন হুলুধ্বনি দিয়া কাহার শুভ সমাগম চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ বেনু ছুটিয়া আসিয়া, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুপে চুপে কহিল "তোমার বর এসেছে দিদি; কি সুন্দর, এমন আর জন্মে দেখি নি। তুমি তো একটু বাদেই দেখ্‌তে পাবে। এখন আমি ভাল করে দেখিগে।"

বেনু যেমন ভাবে আসিয়াছিল, তেম্‌নি ভাবেই ছুটিয়া গেল। আমার হৃদয়ের নিভৃতে রাখিয়া গেল—'কি সুন্দর, এমন আর দেখি নি।'

বিবাহ সভায়, শুভদৃষ্টির সময় তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু আমার জুড়াইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার অন্তরে তাঁহার সুন্দর প্রশান্তমূর্ত্তি মুদ্রিত হইল। আমার কুমারী হৃদয়ের প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পায়ে অর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইয়া গেলাম। বিশ্ব জগতে আমার যেন আর কিছু রহিল না; কেবল ঐ চন্দন চর্চ্চিত প্রসন্ন মুখখানি আমার একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখেই ফুটিয়া রহিল।

বিবাহের পর বাসরে তাঁহার প্রফুল্লমূর্ত্তি তেমন প্রফুল্ল যেন রহিল না। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদের উপর কোথা হইতে যেন একটু সূক্ষ্ম মেঘের ছায়াপাত হইল। দীপালোকে উদ্ভাসিত সেই মুখের পানে চকিতে চাহিয়াই আমি মেঘোদয়ের কারণ বুঝিলাম। মনে মনে বলিলাম "হে আমার তরুণ দেবতা, তুমি প্রফুল্ল হৃদয়ে, আশাপূর্ণ নেত্রে প্রথমে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আমার রূপ-হীনতায় নিরাশ হইয়াছ, ক্ষুব্ধ হইয়াছ! তোমার আশার মঞ্জরী মুকুলেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। যাহা হইতে বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন; তাহা দিয়া তো তোমাকে পূজা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাহা আমার আছে—অম্লান নির্ম্মল হৃদয়, কুমারীর অমলিন অনাবিল ভালবাসা, কৃতজ্ঞতার অসীম উচ্ছ্বাস, তাহা তো তোমাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। আজ আমি রিক্ত। আমার বাহ্যিক রূপ-হীনতায় তুমি বিমুখ হইয়ো না। মানসচক্ষে একটিবার আমার অন্তরের অভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ কর, সেখানে তোমারই পূজার জন্য আমার হৃদয়ের রক্ত-সরোবরে প্রেমের কমল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ এ সুন্দর চন্দ্রোজ্জ্বল রজনীতে তোমার ঐ ম্লান ব্যথিত মুখখানি আমার সদ্যোজাগ্রত নির্ম্মল হৃদয়ের মাঝখানে একটি বিদারণ রেখার সূত্রপাত করিল। তুমি একটি বার প্রসন্ন নয়নে আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া

অরুণালোকে অধর দুইটি রাঙাইয়া তোল ; দেখিয়া আমি নয়ন সার্থক করি।'

কিন্তু আমার কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি কাহারও সহিত ভাল করিয়া বাক্যালাপ করিলেন না। পরিহাস প্রিয় রমণীদিগকে ক্ষুব্ধ করিয়া, নিরাশ করিয়া, গম্ভীর মুখে শুইয়া পড়িলেন। আমার সাধের বাসর নিরানন্দ হইয়া গেল।

পরদিন অপরাহ্ণে আমাদের বিদায়ের সময় আসিল। অশ্রুসিক্ত চক্ষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মা আমায় সাজাইতে বসিলেন। যাহাকে সপ্তদশ বৎসর বুকের কাছে রাখিয়া, কত স্নেহে আদরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, আজ তাহার বিদায়ের পালা! পরের সুখ দুঃখের সহিত, পরের হাসি, অশ্রুর সহিত কাল রজনীতে তাহার জীবন জড়িত হইয়া গিয়াছে। আবাল্যের সুপরিচিত গৃহ, এখন তাহার গৃহ নহে। কোন অজানা স্থানকে তাহার চিরন্তন গৃহ করিতে হইবে। নিকটতম আত্মীয়ের সহিত দূরত্বের ব্যবধান দাঁড়াইবে ; আর অপরিচিত, অনাত্মীয় যাহারা তাহাদের আপনার করিতে হইবে। ইহাই বিধাতার বিধান, নারী জন্মের পরিণাম।

আমাদের নৌকাপথে যাইয়া রেল ধরিতে হইবে। তাই বিদায়ের ত্বরা পড়িয়া গিয়াছিল। গত রজনীর মত আসন্ন বিদায় মুহূর্ত্তে সানাই বাজিয়া উটিল ; কিন্তু রজনীর ন্যায় এখন সুধা বর্ষণ করিল না। অতীত যুগের কোন কন্যাহারা মা গিরিরাণীর সকরুণ বিলাপ ধ্বনি আজ যেন বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। মা অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে আমার ললাট চুম্বন করিয়া আমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। বেনু ছল ছল চক্ষে আমার বুকে মুখ লুকাইল।

আলপনা-চিত্রিত প্রাঙ্গণে কদলী বৃক্ষ ও যাত্রা কলসীর সম্মুখে আমার স্বহস্তে চিত্রিত পিঁড়ির উপর তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। মা আমার হাত ধরিয়া তাঁহার বাম পাশটিতে দাঁড় করাইয়া দিলেন। কাকাবাবুর ইঙ্গিতে বাবা কম্পিত হস্তে আমার হাত খানা তাঁহার হাতে গুজিয়া দিয়া ধরা গলায় কহিলেন "আমার বড় দুঃখের ধন তোমায় দিলাম।" বাবার চক্ষের প্রান্ত বহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু আমাদের যুগল বাহুতে ঝরিয়া পড়িল। এবার আর আমার চোখের জল বাধা মানিল না। দু'টি চক্ষে ঝরঝর বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।

কাকাবাবু আমাকে ধরিয়া লইয়া নৌকায় তুলিয়া দিলেন। ভাসমান নৌকার বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম—বাবার অশ্রু সজল ম্লান মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ ব্যাকুলা মায়ের উচ্ছ্বসিত রোদন। বেনুর ধূলায় লুটাইয়া কাতর বিলাপ "দিদি, দিদি!" যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম। ক্রমে তীর তরুর অন্তরালে আমার প্রিয় পরিচিত মুখগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল ; তবু বাহির হইতে আমি চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিলাম না। সেই ঢেউ খেলানো শস্যক্ষেত্র, সঙ্কীর্ণ বন পথ, ছায়াশীল পল্লীছবি আমার নিকটে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর বোধ হইতে লাগিল।

নদীর বাঁকে নৌকা ঘুরিতেই চৌধুরী পাড়ার ঘাটে একটি গাছের গুঁড়ির উপর চৌধুরী মহাশয়কে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। চোখে চোখ মিলিতেই আমার বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আজ আর আমি মুখ ফিরাইয়া লইতে পারিলাম না। চোখ নত করিতে পারিলাম না। যুক্ত করে ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। আমার বিদায় মুহূর্ত্তে কাহারও প্রতি বিরাগ নাই, বিদ্বেষ নাই। আজ সকলেই আমার প্রিয়, সবই আমার প্রীতি ভাজন।

আমার প্রিয় দেশ, প্রিয় জন্মভূমি, প্রিয় পল্লী—বিদায়! বিদায়! তোমার শান্ত শীতল কোল হইতে আজ বিদায়!

(ক্রমশঃ)

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষার ফল।

শ্রীমান শরৎকুমার ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী ঈশানী বিবাহোৎসবের পর প্রায় এক বৎসরকাল সময়স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সময় স্রোতে গা ভাসাইয়া, শরৎ, নবীনা ও উত্তরোত্তর যৌবন প্রাপ্তা নব পত্নীকে পাঁচ বার দেখিতে এবং দেখা দিতে বরিশালে আসিয়া প্রায় দেড় মাস কাল শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিয়া, পূজনীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অশেষ যত্ন ও আদর লাভ করিয়াছে। বৎসরের অবশিষ্ট কাল, কবিতা ও দুরূহ শব্দযুক্ত অতি দীর্ঘ ভাবময় প্রেমপত্র সকল লিখিয়া পত্নীকে আপন অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও অগাধ প্রেম দেখাইয়াছে; এবং সন্ধ্যায়, রাত্রে, প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে পত্নীর প্রিয় আননের ধ্যান করিয়াছে। এমন অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়া, সে যদি আপন পাঠাভ্যাসের সময় বা অবসর না পাইয়া থাকে, —তাহা হইলে, তোমরা তাহার কোনও নিন্দা করিও না। তজ্জন্য যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাহাকে বি, এ, পাশের অনুপযুক্ত মনে করিয়া থাকেন, তবে আমরাও তাঁহাদের কোন বিশেষ দোষ দিতে পারিব না। কিন্তু নির্বুদ্ধি অখিল বাবু পরীক্ষায় জামাতার অকৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া বিশেষ প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।

বুদ্ধিমতী প্রমদা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দেখ, আমার বেয়াইএর যে বিষয় সম্পত্তি, টাকা কড়ি, ঘরবাড়ী, হীরা মুক্তা আছে, তাতে আমার জামাইকে কখন চাকুরী করে খেতে হ'বে না; 'রাজার হালে', আপনার বাড়ীতে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে। পাশ করা ওর পক্ষে একটা নাম, একটা শোভা। তা' এখন ত ওর এই কচি বয়স; এক বছর পরে পাশ করলেও, ও অন্য ছেলের চেয়ে অনেক কম বয়সে পাশ করবে।

অখিলবাবু বুদ্ধিমতী পত্নীর কথা ভাল বুঝিতে পারিলেন না; বোধহয়, তাঁহার তত বুদ্ধি ছিল না। তাঁহার চির-সন্দিগ্ধ মনে সন্দেহ জন্মিল যে, কনিষ্ঠ জামাতাটি যে বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহাতে সে চিরদিনই ভাসিয়া যাইবে; পৃথীবীতে কখনও সে কূল পাইবে না; পরীক্ষায় সে কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

ঈশানীও স্বামীর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার কথা শুনিয়া কিছু ক্ষুণ্ণা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নবীন বয়স, হৃদয়ে রাত্র দিন নবপ্রেমের উৎস উঠিতেছিল; সে অল্পকাল মধ্যেই ক্ষুদ্র দুঃখের কথা ভুলিয়া গেল।

এই অকৃতকার্য্যতার অপমান এবং লজ্জা শরৎও অধিক দিন গাত্রে মাখিয়া রাখে নাই। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পক্ষকাল পরেই সে পুনরায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া আপনার অপমান কলঙ্কিত আনন দেখাইল। পক্ষকাল প্রেমোন্মত্তের ন্যায়, নবীনা, স্ফুটযৌবনা, প্রণয়িনীর সহিত প্রেম-লীলা করিল, এবং পক্ষকাল, মৎস্য মুণ্ড, ক্ষীর ও সন্দেশের সহিত পূজ্যা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদর ও যত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিল।

তাহা দেখিয়া, সন্দিগ্ধ অখিলবাবু সন্দেহ করিলেন। মনে করিলেন. বুঝি তাঁহার বুদ্ধিমতী পত্নী, কণ্টকযুক্ত মৎস্য মুণ্ডের সহিত জামাতাকে তাহার পরকাল খাওয়াইতেছেন; এবং সেও আনন্দিত চিত্তে, অম্লান বদনে আপনার পরকাল ভক্ষণ করিয়া সুখী হইতেছে। তিনি একদিন কিছু বিরক্ত হইয়া প্রমদাকে বলিয়া ফেলিলেন, 'জামাইকে বাড়ী গিয়ে, আবার পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে বল'গে। এ রকম আমোদ

আহ্লাদে দিন কাটালে আগামী বছরেও সে পাশ করতে পারবে না।

প্রমদা মহা ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন যে, তাঁহার স্বামীর মত নীচমনা কৃপণ, এই বিশাল মহীমণ্ডলে আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি রোষ কম্পিত কণ্ঠে স্বামীকে ভৎ র্সনা করিয়া কহিলেন, 'দু'দিন বাড়ীতে জামাই এসেছে ব'লে, অত গর গর করছ কেন? এর পর, হিসাব ক'রে দেখ, এতে তোমার কিছু বেশী খরচ হয়ে যা'বে না।'

অখিলবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'আমি আমার খরচের কথা ধরিনে, কিন্তু জামাইটা যাতে অধঃপাতে না যায় তা তোমাকেও দেখতে হ'বে; আমাকেও দেখতে হ'বে।

প্রমদা আরও রুষ্টা হইয়া বলিলেন, এই বয়সে সবাই একটু আমোদ আহ্লাদ করে থাকে; তাতে কেউ কখনও অধঃপাতে যায় না। তুমি নিজে ওই বয়সে কি করেছিলে, একবার মনে করে দেখ। প্রথম পক্ষের কালপেঁচীকে নিয়ে যে একবারে পীরিতের বানে হাবুডুবু খেয়েছিল। আমার বেলাই, না হয়, বুড়ো বয়সে, কোন আমোদ আহ্লাদ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

ক্রুদ্ধা প্রমদা যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে সমাধা হইবার কোন প্রত্যাশাই ছিল না। কিন্তু অখিলবাবুর পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে, তখন অফিস যাইবার সময় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পত্নীর প্রেম কথা শুনিবার সুযোগ অবহেলা করিয়া সত্বর স্নানস্থানে প্রস্থান করিলেন; এবং স্নানান্তে নীরবে অল্প সময়মধ্যে আহার কার্য্য সমাধা করিয়া, নীরবে 'এজলাস' নামক দুর্গে পলাইয়া গেলেন, বুদ্ধিমতী প্রমদা উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে সারা দিন আপন মনে গর গর করিতে লাগিলেন।

আমরা ঔপন্যাসিক, আমরা অর্গলিত নিভৃত কক্ষের ভিতরের সংবাদও রাখিয়া থাকি; এবং অস্ফুট গোপন প্রেম কথাগুলিও শুনিতে পাই। কিন্তু সেই রাত্রে, রাত্র জাগিয়া এবং জাগাইয়া মধুরভাষিণী প্রমদা, নিদ্রাকাতর অখিলবাবুকে যে সকল মধুর কথা শুনাইয়াছিলেন, সেরূপ মধুর কথা আমার বয়োবৃদ্ধ পাঠকবর্গের ভিতর অনেকেই শুনিয়াছেন; কাজেই আমরা আর তাহার অনাবশ্যক পুনরুক্তি করিলাম না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

যদুপতির ব্যবসায় বুদ্ধি।

ঠিক সেই সময় একদিন যদুপতি দোকান হইতে আহার জন্য বাটীতে আসিয়া, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কল্যাণু, তোমার হাতে এখন কত টাকা জমেছে? তুমি আজ আমায় কত টাকা দিতে পারবে?'

কল্যাণী কহিল, 'আমি এখনই তোমায় হাজার বারোশ' টাকা দিতে পারি।'

যদুপতি। আমার হাজার টাকা হ'লেই এখন চলবে।

কল্যাণী। এখন তোমার হঠাৎ টাকার দরকার হ'ল যে?

যদুপতি। হঠাৎ নয়। তুমি ত আগে থেকেই জান, সেবার তোমার বোনের বিয়েতে বরিশাল গিয়ে, আমি একজন নারিকেল ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করি। পরে, তার কাছ থেকে নারিকেল আনিয়ে আমি সেগুলি রংপুর অঞ্চলে চালান দিই। রংপুরে আর দিনাজপুরে অনেক বেশী দরে সেগুলা বিক্রি হওয়ায়, তিন মাসে আমার প্রায় আড়াই হাজার টাকা লাভ হয়।

কল্যাণী। সে কথা ত আমাকে তুমি আগেই বলেছিলে। তুমি আরও বলেছিলে যে আরও নারিকেল পাঠাবার জন্যে তাকে আবার চিঠি লিখেছিলে। কিন্তু এখন নারিকেল সুবিধা দরে পাওয়া যাবে না বলে সে পাঠায় নি।

যদুপতি। তারপর, আমি অন্য অন্য লোকের কাছে অন্য অন্য জায়গায় অনুসন্ধান কোরে জানতে পারলাম যে, নারিকেলের নতুন ফসল জন্মায় আশ্বিন মাসের প্রথমে। তখনই নারিকেল খুব সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়। আর পৌষ মাসের প্রথমেই তা বিক্রি করতে পারলে খুব বেশী লাভ পাওয়া যায়।

কল্যাণী। হাঁ; ওই সময় পৌষ পার্ব্বণের জন্যে অনেকেরই নারিকেলের দরকার হয়।

যদুপতি। তাই, নারিকেল কেনবার এখনও আমার সময় হয় নি।—এটা ত মোটে আষাঢ় মাস। আশ্বিন মাসে নারিকেল কিনতে হবে;—সে এখনও পূরা তিন মাস দেরী আছে। আমার হাতে সেই লাভের আড়াই হাজার টাকা

আর দোকানের বাকী আদায় বাবদ পনেরো শ' টাকা, আর তোমার হাতে এই হাজার টাকা, এই মোট পাঁচ হাজার টাকা আমাদের আছে। ততদিন এই পাঁচ হাজার টাকা মিছামিছি মজুদ করে রাখা ত আমাদের মত ব্যবসাদারের পক্ষে ভাল নয়। এই টাকা থেকে আমি একটা লাভ করব মনে করেছি।

কল্যাণী। কি লাভ করবে? দোকানে আরও মাল কিনে রাখবে? তারপর এই তিন মাস গেলে, পূজার বাজারে সেই মাল বেশী দরে বিক্রি করে লাভ করবে মনে করেছ বুঝি?

যদুপতি। না কল্যাণু, আমি তা মনে করি নি। এই বর্ষার প্রথমে, দোকানের মাল কিনলে, সে মাল কি আমরা এই বরষার স্যাঁৎসাঁতায় ভাল রাখতে পারব? তা' ছাড়া মাল নিয়ে আসবার সময়ই বৃষ্টির জল লেগে কতক মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি মনে করেছি, আমি উড্‌বরুন্ কোম্পানীকে দশ হাজার মণ পাট বিক্রি করব।

কল্যাণী। পাট? পাট ত আমাদের দোকানে মজুদ নেই।

যদুপতি। দশ হাজার মণ পাট কি আমাদের মত দোকানদার মজুদ রাখতে পারে? আমার দশ হাজার মণ পাট মজুদ রাখবার মত গুদামও নেই, আর দশ হাজার মণ পাট কেনবার টাকাও নেই।

কল্যাণী। দশ হাজার মণ পাটের দাম কত?

যদুপতি। মোটামুটি লাখ টাকা।

কল্যাণী। তোমার ও আমার হাজার টাকা নিয়ে মোটে পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি! তুমি দশ হাজার মণ পাটের দাম দেবে কি করে?

যদুপতি। দাম আমি দেব না। দাম দেবে উড্‌বরণ কোম্পানী। আমি খালি লাভ করব।

কল্যাণী। কেমন করে লাভ করবে, সেটা আমায় বুঝিয়ে দাও।

যদুপতি। শোন বলি। বাবু গুরুচরণ পালকে তুমি চেন?

কল্যাণী। চিনি নে, তবে খুব নাম শুনেছি। তিনি এখানকার সেই বড়লোক ত?

যদুপতি। হাঁ। কিন্তু তিনি বড়লোক হলেন কি করে? তা কিছু জান?

কল্যাণী। শুনেছি পাটের ব্যবসা করে।

যদুপতি। এখন সেই পাটের ব্যবসাদারটি বুড়ো হয়ে ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দিয়েছেন। আজ দু'তিন মাস হ'ল তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে ছোট দু'জন খুব লেখাপড়া শিখে কলকাতায় চাকুরী করছেন।

কল্যাণী। কেন? লোকে লেখাপড়া শিখে চাকুরী করে কেন? তাঁরা ত বাড়ীতে বসে বাপের ব্যবসা আরো ভাল করে চালাতে পারতেন?

যদুপতি। কেন দেশের লোক চাকুরী চাকুরী করে ঘুরে বেড়ায় আমি ত তা' বুঝতে পারি নে। বোধ হয়, মহাকবি যা বলেছেন তাই ঠিক।—'গোলামের জাতি শিখেছি গোলামী।'—যাক্, এখন গুরুচরণ পালের কথা শোন। তাঁর বড় ছেলে, ভাল লেখাপড়া শিখতে পারেন নি বলে, বাপের কাছে থাকতেন, আর বাপের কাজ কর্ম্ম দেখতেন। এই বড় ছেলেও বাপের সঙ্গে তীর্থে গেছেন। বাপ তীর্থ ভ্রমণের পর কাশীবাসী হ'বেন; ছেলে তাঁর কাশীবাসের বন্দোবস্ত করে, এক বছর বাদে আবার দেশে ফিরে এসে পাটের ব্যবসা দেখবেন। কাজেই এ বছর উড্‌বরণ কোম্পানী তাঁদের কাছে পাট কিনতে পারবেন না; অথচ এ বছরও কোম্পানীর পাটের দরকার আছে। তাঁহাদিগকে পাট সরবরাহ করবার আমরা এ বছর সুযোগ পেয়েছি। এই সুযোগটা কি আমি হাতছাড়া করতে পারি? শোন কল্যাণু, আমরা যদি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারি, তা'হলে তোমরা আমাদের পুরুষ মানুষ বলে ভক্তি করবে কেন? আমাদের স্বামী বলে পূজা করবে কেন? আমাদের জীবনের সহায় হ'য়ে চিরকাল আমাদের সংসারে বদ্ধ হ'য়ে থাকবে কেন?

(ক্রমশঃ)

পথ-চলা

[শ্রীধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ]

শীত যেন যায় যায়। শীতের পরের দিনগুলি যেন আসে আসে বলে মনে হয়। বাতাসে যেন কার অঞ্চল উড়ে। পায়ের শব্দ শুনা যায়। গায়ের গন্ধ ভেসে আসে।

সে এসেছে।

তুমি কি করে জানলে?

আমি জানিতে পাই।

সে বুঝি তোমার কানে কানে বলে?

হ্যাঁ তাই।

সিন্দুর সীমন্তিনী—মন্থর-গামিনী মৃদু-ভাষিণী তরুণী সঙ্গিনী আমার, গুরু যৌবন ভারে টলমল। গাল ভরা পান ঠোঁট দু'টি লালে লাল। ঠোঁটে গালে কে যেন হোলি খেলে গেছে। দু'টি চক্ষুতে যেন খালি আমাকেই চেয়ে চেয়ে দেখে। আর কিছু দেখে না। কি সুন্দর ছোট কোমল দু'খানি পা। হাত দু'খানি যেন দু'টি পদ্মফুল। সে মুখের তুলনা আমি কি দিয়ে করি!

তুমি যে গো এইটুকু হেঁটেই থেমে গেলে। পারবে ত? এই মাঠের আঁকা বাঁকা পথ ঘুরে ঐ পাহাড়ের উপরে মন্দিরে। মন্দিরের পাশে ঐ একটা কি গাছ রয়েছে দেখেছ? পারবে?

চলত। দেখি পারি কি না।

সে কি রকম? যদি না পার? আমি কি মাঝ পথে এই জঙ্গলের ধারে তোমায় একলা ফেলে যাব? বাঘে নিয়ে যাবে যে।

কেন, ব'য়ে নিয়ে যেতে পারবে না?

না।

আমি কি এতই ভারী?

হুঁ।

আমরা তখনো মাঠের মাঝে। সমতল ভূমিতে। ছোট কতকগুলি পাথরের ঢিপির পাশেই দুই তিনটা আমের গাছ। এ ওর গায়ে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুলে গাছ ছেয়ে গেছে। মৌমাছিরা দলে দলে মুকুল গুচ্ছের উপর মাতালের মত মাতামাতি করিতেছে। উড়িতেছে, পড়িতেছে, আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। দক্ষিণা বাতাসের গন্ধে কে যেন পাগল হয়ে ছুটে ছুটে যায়। আমি চেয়ে দেখি—সেও চেয়ে আছে। আমি বলিলাম—

কেমন আসে নাই?

হ্যাঁ—এসেছে।

দেখেছ?

দেখেছি।

আমি সহসা তার দিকে চেয়ে দেখলাম, কি আশ্চর্য্য! তার রূপ একেবারে বদলে গেছে। তার ঠোঁট আর গালই লাল ছিল। তাও এত লাল ত ছিল না। চোখ দুটি বেশ রক্তিমাভ। হাত পা মুখ যেন এই ফুটেছে গোলাপের পাপড়ী। তার মাথায় ঘোমটা যেন খসে খড়ে। গায়ে যেন কাপড় থাকতে চায় না, বাতাসে উড়ে। পা চলে কি না চলে। বক্ষ দোলে। একি ছন্দ, একি নৃত্য! একি একটা সুর না রূপ? একি কায়া? সত্যি? একে ধরা যায় আমার এই দু'টি বাহুর বেষ্টনে? না মায়া,—শুধু ছায়া? একি মেঘে বিদ্যুৎ? এত স্থির কেন? এর চঞ্চলতা গেল কোথায়? আঁখি কোণে? কৈ না। দৃষ্টিও ত অতি গভীর। অতি প্রশান্ত বহুদূর ব্যাপী। কতদূরে সে চেয়ে দেখে তা আমি বুঝিতে পারি না। কি দেখে? আমি ত কাছেই, তবে অত দূরে দেখে কি?

আমার আর হাঁটিতে ইচ্ছে হ'ল না। বললাম—এস বসি এইখানে। সে বললে বোসো। এক আমাকে ছাড়া তার যেন জগতে আর কোনই ইচ্ছা ছিল না। সে ঘাসের উপর তার আঁচল বিছিয়ে দিল। আমি বসলাম। সূর্য্য পাহাড়ের উপর দিয়া অস্ত যায় যায়। পাহাড়ের উপরে অনেকটা

আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে। আরো কত রকমের রং ফুটে উঠেছে। কি দিয়ে কোথায় বসে কে যে আঁকে!

আচ্ছা—তোমায় একটা কথা বলব?

বল।

তুমি রাগ করবে না?

না। তুমি কি আমার রাগের জিনিষ?

আমি মরে গেলে তোমার কি হবে?

কারই কিছু হবে না। আমারই সব যাবে।

চল ফিরে যাই। আজ আর পাহাড়ে না গেলাম।

চল।

তোমার পাহাড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে?

তুমি যাও—যাই।

আচ্ছা,—তোমার কি নিজের কিছু ইচ্ছে হয় না?

কেন?

যা বলি—তাই বল আচ্ছা।

আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। যে দিকে হয় এক দিকে চল।

আর আমি যদি কোনদিকে না চলি? একেবারে অচল হই?

না চল—বেশ—থাক দাঁড়িয়ে। আমার পা ধরে গেছে। আমি একটু বসি।

কেন—আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাও না। একলা যেতে পারবে না? কত জনে ত যায় দেখি। তুমি ও দেখ না।

তার অর্থ কি?

না কোন কিছু অর্থ নাই। চল ফিরে যাই। রাগ করো না।

সে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়াই চলিলাম। কিন্তু যে পথ দিয়া এসেছিলাম, সে পথ দিয়া ফিরিলাম না। আর এক পথে চলিলাম। বুঝি সেই পথে ফিরিলেই ভাল হইত। সন্ধ্যা বয়ে গেছে। বাতাস ঠাণ্ডা বোধ হতেছে। দূরে কে বাঁশী বাজায়। তাকে দেখা যায় না। শুধু সুর ভেসে আসে।

তোমার যে গো গায়ের কাপড় খসে খসে পড়ে?

এতদিকেও চোখ যায়? চল। তুমি আগে যাও।

না। তুমি আগে যাও।

আর যদি আমি কখনো আসি।

আর যদি আমি কখনো নিয়ে আসি।

কেন, আমি সঙ্গে এলে কি তোমার ভাল লাগে না?

না। তোমাকেই আর আমার ভাল লাগে না।

এখন—বিষ বিষ লাগে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

আমি দেখিলাম সে হাসিল। আর কিছু বলিল না। তার হাসির অর্থ—ফেলে ত আর দিতে পারিবে না? আমি হাসিতে পারিলাম না।

আমি ঘরে ছিলাম একা। মন্দ ছিলাম না। সেই আমায় হাত ধরে পথে বের করেছে। হাব ভাবে কত প্রলোভন দেখিয়েছে। কিন্তু কোন দিন ধরা দেয় নাই। ছুঁতেও দেয় নাই। কত পথে ঘুরিয়েছে। কেন এত পথে পথে ঘুরায়? কিছুত বলে না। তবু কেন তার পেছনে এত ঘুরে মরি!

যেমনি তার সঙ্গে পথে বের হয়েছি সে আগে আমি পিছে পিছে। কোন দিন আমি আগে যাইনি। সেই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গে'ছে। অপথ বিপথ সব পথেই তার সঙ্গে হেঁটেছি। পথ চলার ত আর আমাদের বিরাম ছিল না। পথ ছিল যেন আমাদের ঘর। নদীর পারে পথের ধারে সামান্য একখানি কুঁড়ে বেঁধে আমরা দু'জনে ছিলাম। ঘরে আর কতক্ষণ থাকিতাম—কেবল বাহিরেই বেড়িয়ে বেড়াতাম। ঘরে আমাদের কে ছিল আর কিইবা ছিল! আমরা ছিলাম দু'জন খালি। ঘরে থাকিলেও বাহিরের দিকে তাকাতাম না। আর ঘুরিয়ে বেড়ালেও ঘরের দিকে ফিরে চাহিতাম না। পথ অপথ ঘর বাহির সবি সমান ছিল। এখানে সেখানে এর বাড়ী ওর বাড়ী শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম।

তাকে সঙ্গে পেয়ে আমার নিজের চিন্তা একবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার চিন্তা সেই করিত। পথে চলিতে তাকেই আমি খালি অনুসরণ করেছি। যে পথ দিয়ে গেছে—পিছে চলেছি। পথের দু'একটা বড় বড় মোড়

ঘুরিতে, হয়ত কখনো সে আমায় জিজ্ঞাসা করেছে কোন দিকে যাবে? আমি হঁা অথবা না—যেমন খুসী বলে দুচোখ বুজে চলে গেছি। পথ সব সময়ে সুবিধার ছিল না। পথে বিপদ ছিল।

তুমি চলতে চলতে এক মনে কি ভাবছো, বলত?

তোমাকেই ভাবছি।

আমি কি তোমার একটা ভাবনা?

তা এক রকম ভাবনা বৈ কি।

তা এত ভাবনা হয়ে থাকে ছেড়ে যাওনা কেন? কিসের এত মায়া?

মায়া? কে তুমি—ওগো কে তুমি? আমি ভুলে থাকতে চাই, কেন তুমি খুঁচিয়ে তুল? আমি ভুল দিয়ে জাল বুনেছি। সেই জালের মধ্যে গুটিপোকা হয়ে বাস কচ্ছি। তুমি আমার ভুল।

আবার হঠাৎ এ রকম করছো কেন? তোমায় নিয়ে যে আমি কি করবো। কি যে আমার বরাতে আছে!

হ্যা—দেখ, মায়া—না? তুমি সত্যি বলেছ কিসের এত মায়া? আমি তোমায় ভাবিতাম তুমি আস্ত একটি বোকা। আচ্ছা বুকু,—বল দেখি তুমি কি আমার মায়া?

চল, বাড়ী চল। আমার ভাল লাগে না।

আমরা যেমন চলিতেছিলাম তেমনি চলিতে লাগিলাম। কত কাঁটা বন দিয়ে আমাদের পথ ছিল। কত নদীর ধার দিয়ে আমরা গে'ছি। কত অজানা পথে আমরা ঘুরেছি। কত অচেনা মুখে আমরা চেয়ে দেখেছি।

পথের কাঁটা পায়ে ফুটেছে। একদিন তার পা রক্তে রক্তময় হয়ে গেল। ঠিক যেন একটা এই-ফুটেছে-রক্ত পদ্ম। সে বলিল—কিছু হয়নি, চল। আমি তাড়াতাড়ি হাঁটু পেতে বসে তার পা খানি দুই হাতে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তার পায়ের কাঁটা খুলে দিলাম। পথের কাঁটা রক্তেরাঙা পায়েরতলে আমরা এমনি দলে মিশে চলে গে'ছি। আমরা কোন দিন থামি নাই। ঝড় বাদল মানি নাই। আঁধার রাতে নদী পাহাড় পার হয়ে গে'ছি। পথের কাঁকর পায়ের তলে কড় কড় মড় মড় করেছে। অশথের ডাল দুলেদুলে যেন ডেকে ডেকে বারণ করেছে।

হঁ্যা গো, তুমি যে হাতীর মত চলেইছ! অর্থাৎ আমি বলছি যে তুমি গজগামিনী। অতি সুন্দর উপমা।

এতক্ষণ কি ভেবে ভেবে ঠিক করলে যে আমি একটা হাতী?

না না, তুমি হাতী হ'তে যাবে কেন?

যাক, পিঁপড়ে না হয়ে যে একটা হাতী হলাম এও ভাগ্যি।

দেখো, তোমার মনে আছে?

কি?

সেই একদিন রাত্রে ফিরিবার পথে আকাশ ভেঙ্গে মেঘ আমাদের মাথায় পড়েছিল। আমরা ভিজিতে ভিজিতে হেসেছিলাম। হাসিতে হাসিতে ভিজে ছিলাম। খুব কাছে ঘেসে বড় পাশাপাশি ছিলাম। নদীতে বাণ ডেকেছিল। সেই আঁধারে পথ ধরে ভিজে ভিজেই দেখতে গেলাম। মনে আছে? অজস্র ধারে বর্ষণ তোমার সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে পড়েছিল। সে যেন একটা উৎসব। নদীর বুকের সেই দোলনি। সেই রুদ্ধশ্বাস। চাপা কান্নার মত। স্ফুরিত অধর। মেঘের ফাঁকে ক্ষণিক বিদ্যুৎ ঝলকে সেই চাহনি? যা দেখেছিলাম তা আর দেখিব না। দেখিতে চাই না। আমরা সমানে চলে গেছি। এত দূর পর্য্যন্ত চলে এসেছি। কিন্তু আর পথ নাই। এই শেষ।

২১—১—২৫
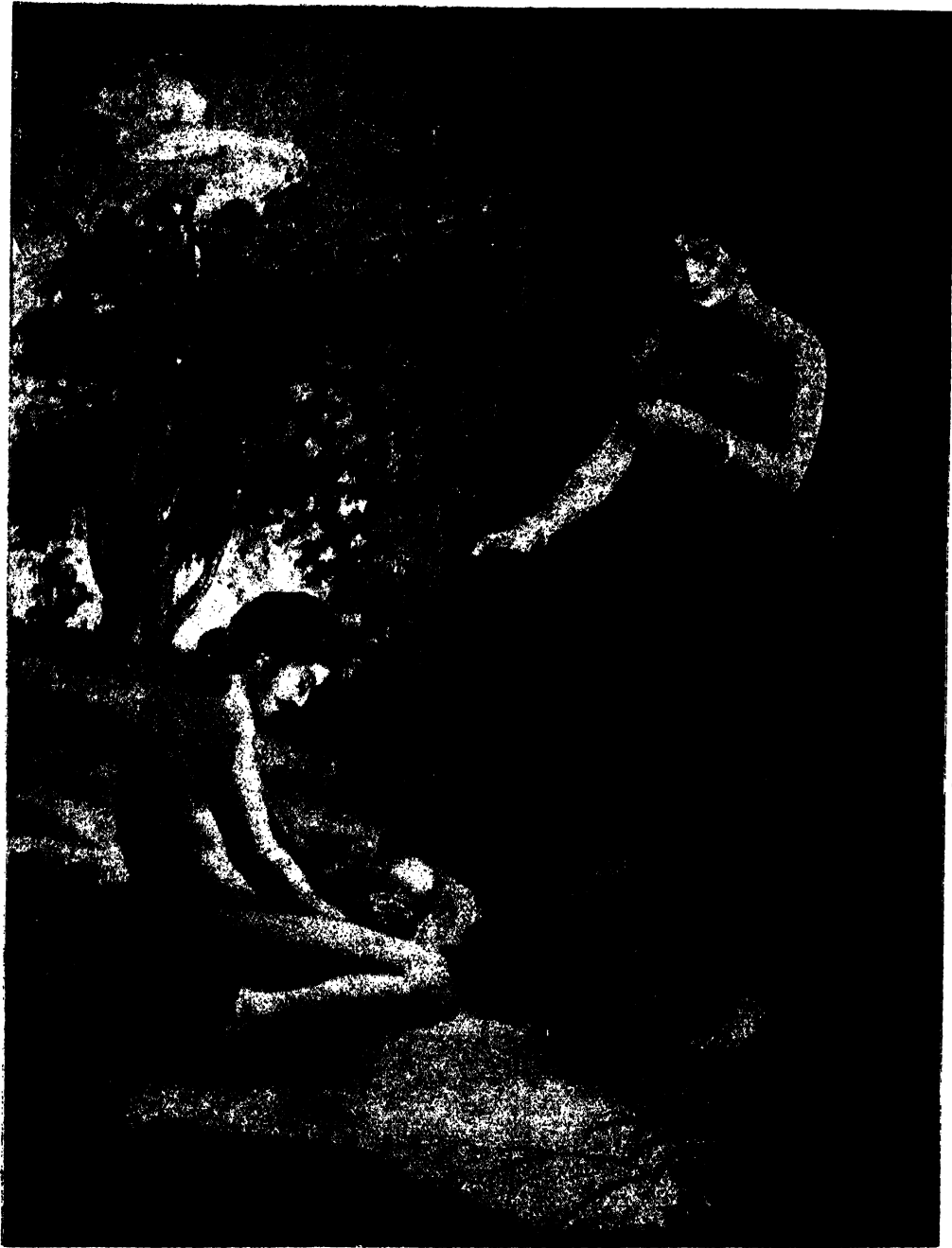
বসনহীন নল

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] রা ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ । [১৫শ সপ্তাহ

সেনা-শিবিরে বিশ্ববিদ্যালয়-বাহিনী

[ল্যান্স কর্পোরাল সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

শীতের প্রকোপটা তখন সহরের বুকে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল, এমন কি দিনে দুপুরেও মাঝে মাঝে বেশ হানা দিতে সুরু করেছে,—শীতের ঠিক এমনি এক মধুর প্রভাতে যখন সবেমাত্র চায়ের কাপে হাত দিয়েছি,—একখানি পত্র এসে হাজির। পত্র বললে তা'র গর্ব্বকে বোধ হয় কিছু ক্ষুণ্ণ করা হয়—পরোয়ানা বললেই তা'র যথার্থ নামকরণ করা হয়, পরোয়ানা,— তা-ও মিলিটারী। ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—On his Majesty's service. বাপ্ !... 'হিস্ ম্যাজেষ্টি'র সার্ভিস যে আমাদের মত পুঁটীবাটীর কাছেও কিছু আশা করে এতটা সৌভাগ্যের কথা প্রথমে ভাবিনি। কাগজ খুলতেই দেখা গেল লেখা আছে জাঁদরেল গোছের একটা হুকুম অর্থাৎ—"আগামী বৃহস্পতিবার ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে 'এলেনবরো' ময়দানে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী কোরের শিবির স্থাপনা হবে, তাতে প্রত্যেক সভ্যই যদি যোগদান করেন তো সরকার সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত এবং বাধিত হবেন।"

X'masএর ছুটী তখন সুমুখেই ; বায়স্কোপ কোম্পানীও তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্লাকার্ড মারছেন, সার্কাসের বিজ্ঞাপনে কাগজ ভর্ত্তি,—চারিদিকেই বড়দিনের আনন্দ-জ্ঞাপন করছিল,—আমার সুমুখে তখন মিলিটারী-ভরা পরোয়ানা, এক ! অমান্য করতে সাহসও হয় না, অথচ সিনেমার রঙীন প্লাকার্ড, সার্কাসের বিজ্ঞাপন—'বড়দিনের আনন্দ যেন মনটাকে মাঝে মাঝে নাচিয়ে তোলে। 'ক্যাম্পে' যোগদান করব, কি, পরীক্ষার পর ক্লান্ত নীরস অন্তরকে একটু অবসর দোব বহু চিন্তায়ও ঠিক করতে পারলুম না। এই ক্যাম্প-ট্রেনিংএও যে আনন্দ বা উপভোগ করবার জিনিস নেই তা নয়, এবং তার যথেষ্ঠ পরিচয় অন্যান্য বারে ভাল করেই পেয়েছি। আমার অবস্থা হয়ে দাঁড়াল—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গোছের।

অনেক গবেষণার পর শেষে ক্যাম্পে যাওয়াই স্থির করলুম। বড়দিনের আনন্দ উৎসব—কিন্তু সে কাহাদের জন্য ? সে তো চির-পদানত অর্থের-কাঙাল এই বাঙালীর জন্তে নয়! যাক্—Camp Trainingএ যোগদান করবার উদ্দেশ্তে আপনাকে প্রস্তুত করতে লাগলুম।

রামের কথা উল্লেখ না করে রামায়ণ রচনা করা যেমন হাস্তোদ্রেক করে, তেমনি ইউনিভারসিটী কোরের কথা কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি কর্‌বার জন্তে নাম মাত্র পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালী যখন সুদূর সীমান্তে নিজের জাতির শক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে আপনার গৌরব নিশানা উড়িয়ে আবার বাংলায় ফিরে এল, তখন শুধু ইউরোপ নয়, সমগ্র জগত বিহ্বল বিস্ময়নেত্রে বাঙালীর দিকে ফিরে তাকালে। ভারত সরকারও এতটা আশা করেন নি ; দেখলেন, বাঙালী প্রয়োজন হলে কলম ছেড়ে কামান ধরতেও পারে,—বাঙালীও

ছাত্রগণ কুচ-কাওয়াজ করিতেছেন।
পশ্চাতে ফোর্ট দেখা যাইতেছে।

না বলে তার Campএর কথা বলাও হাস্তজনক হতে পারে, তা হ'লে গোড়ার কথাও কিছু বলা দরকার।

গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে মহা সমরের অবতারণা হয়েছিল তাতে যোগদান করার অধিকার ভারত সরকার এই ভীরু (?) বাঙালীকেও দিয়েছিলেন, বাঙালীকে নির্ভীক সমরকুশল যোদ্ধা ভেবে তাঁরা সে অধিকার দেন নি, কেবলমাত্র সৈন্ত-সৈন্ত হতে পারে, যে সৈন্ত জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং মৃত্যুকে ভয় করে না।

গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সে মহা সমরের অবসান হয়। গভর্ণমেন্ট ১৯১৮ খৃষ্টাব্দেই বাঙালীকে নিয়মিত যুদ্ধ শিক্ষার অধিকার দিয়ে Indian Defence Force বা ভারত সংরক্ষক সেনাদলের সৃষ্টি করলেন, বাঙালী 'ভারতীয় পদ'

পেয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌তে সুরু করে দিলে। সেই Indian Defence Force বা ভারত সংরক্ষক সেনাদলই এখন ভারত সীমান্তের সেনাদল বা Indian Territorial Forceএ নামান্তরিত হয়েছে। যুদ্ধ শিক্ষা যাতে বেশ সহজ এবং সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়মিত চলতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার Territorial Forceটাকে দুইটী শাখায় বিভক্ত করেছেন, প্রথমটীর নাম ১১।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট এবং দ্বিতীয়টী হচ্ছে আমাদের University training corps বা বিশ্ববিদ্যালয় সেনাবাহিনী।

অনেকে হয় তো মনে করতে পারেন ছাত্রদের কাছে এ শিক্ষা অত্যন্ত ক্ষতিকর, বিশেষতঃ তাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে,—কিন্তু সে ধারণা একেবারেই ভুল, যেহেতু এর শিক্ষা সপ্তাহে তিনদিন, বৈকালে অর্থাৎ কলেজের পরে একঘণ্টা করে হয়ে থাকে। শিক্ষার স্থান কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম, সেখানে যেতে আসতে যে ট্রামভাড়া খরচ হয় তা গবর্ণমেণ্টই দেন,—নিজেদের খরচ হয় না। তা ছাড়া পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি যা দরকার হয় তাও সবই পাওয়া যায়, মোট কথা ইংরাজ সৈন্যেরা যে সকল দ্রব্য, যে 'পদ,' যে সম্মান এবং যে অধিকার পেয়ে থাকেন ইউনিভারসিটী কোর তা'র সবই পেয়েছেন। তবে তাঁরা নিয়মিত বেতন পান না,—তার পরিবর্ত্তে পা'ন যথেষ্ট ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার এবং সম্মান।

এই সেনাদলে Major Rankin, Captain Hyde এবং স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজের অধ্যাপক Lieut Mc Donald ছাড়া ভারতীয় অফিসরও আরও চারজন আছেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বজনপ্রিয়—লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুশীত চন্দ্র চৌধুরী। নিজ দক্ষতায় এবং সামান্য সৈনিক থেকে ইনিই ভারতে প্রথম—সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'King's Commission' পেয়েছেন। শুধু সৈন্য হিসাবে নয়, ছাত্র হিসাবেও ইনি অনেক উচ্চে, রসায়ণ শাস্ত্রে এম্ এস্ সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করে ইনি সকলেরই আদর্শস্থল হয়েছেন। শুধু বাঙ্গালীর নয়—এ বাংলারও গৌরব!

ইউনিভার্সিটী কোরে দৈনিক শিক্ষা প্রায় সম্বৎসরই চলে। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যদের মত সমস্ত জিনিষ শিখতে হলে মাঝে মাঝে Camp এরও দরকার হয়। ফাঁকা মাঠের ওপর তাঁবু ফেলে, সৈনিক-জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতাকে বলি দিয়ে কঠোরতা সহিষ্ণুতারও প্রয়োজন যথেষ্ট হয়। এ শিক্ষা শুধু শিক্ষাই দেয় না, ছাত্রদের যথেষ্ট পরিশ্রমী করে তুলে।—সেই নিয়মানুসারে এ বছরেও পনেরো দিনের জন্যে Camp এর অধিষ্ঠান হল। দিন স্থির হল বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর। বারবেলার দোহাই দিয়েও নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই!.....

ক্যাম্পে যাবার ক'দিন আগে থেকেই বন্ধুমহলে বেশ একটু 'হল্লা' প'ড়ে গিয়েছিল। কি কি জিনিষপত্র সঙ্গে নিতে হবে, কি পরিমাণ—ইত্যাদি নিয়ে! তাঁদের মধ্যে যাঁরা 'পুরাণো পাপী, অর্থাৎ আগে দু একবার 'স্বাদ' পেয়ে এসেছেন তাঁরা নিজের নিজের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। শেষে মুস্কিল হল গাড়ী নিয়ে। কেউ বললেন গরুর গাড়ীতে যাওয়া যাবে, কেউ মন্তব্য প্রকাশ করলেন লরী; যাঁরা 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা,স্থির করেছিলেন তাঁরা কিছু বললেন না। আগের দিন বৈকালে শেষ স্থির হোল একসঙ্গে যাওয়া অসম্ভব, যে যাতে পারে যাবে; তবে যাঁরা কাছাকাছি থাকেন তাঁরা নিজেদের মধ্যেই বন্দোবস্ত করে নিলেন।

১৮ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠ্‌তেই মনে পড়ে গেল ক্যাম্পে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। সরকারের হুকুম ছিল এগারটার মধ্যে হাজির হতে। শফারকে দশটার সময় মোটর আনতে বলে দিয়ে একবার বাজারে বেরুলুম। আবশ্যকীয় জিনিস পত্রাদি নিয়ে যখন ফিরলুম ঘড়ির ছোট কাঁটা তখন ঘুরতে ঘুরতে আটটার ঘরে এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি কেরানীবাবুদের মত কোন রকমে দুটী ভাত নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়া গেল। পথে আরও দু একটী বন্ধুকে তুলে নিয়ে যখন গন্তব্য স্থানে পৌছুলুম, এগারটা তখন বেজে গেছে! বাঙ্গালীর এগারটা কখন বাজে কাপ্তেন সাহেব বোধ হয় তা জানতেন, তাই পরোয়ানায় ১২ টার জায়গায় এগারটা লিখেছিলেন!

গন্তব্যস্থানে পৌছুতেই—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ভোজে বসে খাওয়ার মত সব সারি সারি বসে।

আমাদেরও তাঁদের দলভুক্ত হতে হ'ল—সব বসে পড়া গেল ! এ দৃশ্য দেখলে অবিশ্যি রামায়ণের আর একটী দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়, যখন রামের হুকুমে কপিশ্রেষ্ঠরা লঙ্কা আক্রমণ করবার সময় সাগরতীরে সারি দিয়ে বসেছিল। তবে সাগর পার হবার জন্যে এখানে কাউকে ভাবতে হয় নি, এখানে সবাই শুধু ভাবছিল—আর কতক্ষণ পরে নিজের নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করবার অনুমতি পাবে।

বেলা একটা পর্য্যন্ত সকলে একে একে এলেন। কেউ মোটরে, কেউ গাড়ীতে, আবার কেউ কেউ বা 'রিট্রেঞ্চমেণ্ট' করে মুটের মাথায় বোঝা চাপিয়ে হেঁটেই এলেন। গরুর গাড়ী বা তথা কল্পিত মোষের গাড়ীতে আর কাউকে দেখা গেল না। সকলেই যখন নিতান্ত ক্লান্তভাবে বসে বসে সুমুখের পনেরোটা দিনের ভাগ্য পরীক্ষায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ শ্যামের বাঁশীর মতই একটা বাঁশী জোরে বেজে উঠলো। শুধু বাঁশী হলে কথাই ছিল না, সার্জ্জেণ্ট মহাপ্রভুদের কণ্ঠস্বরও বেজে উঠলো—Fall in, fall in two ranks ইত্যাদি। সমবেত ছাত্রগণ ওরফে সৈন্যগণ সারি বেঁধে দাঁড়ালে, কাপ্তেন সাহেব ও সার্জ্জেণ্ট-মেজর লরী সৈন্য সংখ্যা পরীক্ষা করে গেলেন। দশ ও এগার নম্বর পণ্টন বা সিটিকলেজের ছাত্রগণ ও আরও দুটো পণ্টন (৯ এবং ১২ নম্বর) একত্র করে তার নাম রাখা হোল 'সি কোম্পানী।' সি কোম্পানীর Commander বা অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুশীত চন্দ্র চৌধুরী। পরে প্রত্যেক কোম্পানীতে চারিটা করে পণ্টন সংযোগ করে আরও তিনটী কোম্পানী গঠন করা হোল।

"অফিসারদিগের তাঁবু—"

সি কোম্পানীর মধ্যে এগার ও দশ নম্বর পণ্টনের প্ল্যাটুন সার্জ্জেণ্ট, নির্ব্বাচিত হলেন যথাক্রমে সার্জ্জেণ্ট মেজর হেম লাহিড়ী এবং সার্জ্জেণ্ট এম্ রাধাকৃষ্ণম্! মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের নামটী আয়াস-সাধ্য করে নেবার জন্যে অনেকে অনেক রকম নাম নির্ব্বাচন করে নিয়েছিলেন। দু একজন পরিহাসচ্ছলে তাকে 'রামপিয়ারী' বলেই ডাকতে সুরু করলেন। আমরা তাঁকে শুধু 'সার্জ্জেণ্ট' বলেই ডাকতুম।

আমাকে দশ নম্বর পণ্টনের Section Commander হতে হয়েছিল। Section Commander এর দায়িত্ব

কখন অনুভব করি নি, আজ যুদ্ধে আসলেই তার পরিচয় পেলুম। তবে দায়িত্বের ভারটা অধীনস্থ লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে, কষ্টের লাঘব অনেকটা হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

জুতো জামা ছাড়বার হুকুম তখন সকলকেই দিয়েছিলুম, হঠাৎ সার্জ্জেণ্ট মেজর লরীর কড়া হুকুম এলো—Corporal Gupta will take his men in the fort for Rifles and Blankets অর্থাৎ "কর্পোরাল গুপ্তকে তাঁর অধীনস্থ লোকদের বন্দুক ও কম্বলের জন্ত কেল্লার ভেতরে নিয়ে যেতে হবে।" তথাস্তু! অমান্য করবার যো নেই, তক্ষুণি লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট করতে করতে কেল্লার ভেতরে মার্চ্চ করে চল্লুম। অনেকের মুখ দিয়েই ধ্বনিত হয়ে উঠলো—বাপ!

একখানি করে কম্বল, একটা সতরঞ্চি, একটা গ্রেট কোট এবং রাইফেল নিয়ে যখন তাঁবুতে ফিরলুম সূর্য্য তখন পশ্চিমের কোলে মাথা পেতেছেন। বিছানা পত্র গুছিয়ে নেওয়া তখনও শেষ হয়'নি, আবার বাঁশী বেজে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার—ফল্ ইন্, ফল্ ইন্ টেন্থ প্লেটুন! বাপ্—সাধে কি কবি গেয়েছিলেন—

কাণের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!

মরমে শুধু 'পশা' নয়, সমস্ত অন্তরটাকে রাগে জ্বলিয়ে দেয় ঐ বাঁশীর সুর! বাঁশী শুধু বাজলেই চলতো,—তা নয়, তার ওপর আবার হুকুমও আছে, কি,—না কোয়ার্টার গার্ড এবং নাইট গার্ড হবার জন্য দশ নম্বর পল্টন থেকে বাছা বাছা ছাব্বিশ জন লোক চাই, আর তারা যেন সন্ধ্যার আগেই প্রস্তুত হয়ে থাকে! সার্জ্জেণ্ট রাধাকৃষ্ণ কোয়ার্টার গার্ডের জন্তে আটজন, আর নাইট গার্ডের জন্তে আরও আঠারজন লোক নির্ব্বাচন করে ল্যান্স কর্পোরাল শিশির ঘোষকে নিযুক্ত করলেন—গার্ড কম্যাণ্ডার!

এই কোয়ার্টার বা নাইট গার্ডদের বিষয়ে এবার কিছু বলবো। এ গার্ড পদ্ধতি প্রচলন হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের রীতি অনুসারে। বাইরে থেকে কোন শত্রুপক্ষ যাতে তাঁবু আক্রমণ

রান্নাঘর—খাদ্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

করতে না পারে তারই উদ্দেশ্যে চারিদিকে সশস্ত্র Sentry বা প্রহরী রাখা হয়। তবে নাইট গার্ডরা শুধু রাত্রিটা পাহারা দিয়েই খালাস, আর যারা কোয়ার্টার গার্ড থাকে তাদের সারারাত্রি পাহারা তো দিতেই হয়, তা ছাড়া পরদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত যতক্ষণ না নূতন দল গার্ড হয়ে আসে ততক্ষণ সমানে পাহারা দিতে হয়। প্রত্যেক গার্ডকেই দু'ঘণ্টা করে পাহারা দিতে হয়। গার্ড বদল করার ভার Guard Commanderএর ওপর! তা ছাড়া জিনিষ পত্র জমা নেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া, পলায়িত বা অপরাধীদের কোয়ার্টার গার্ডে বন্দী করে রাখা ইত্যাদি সবই গার্ড কমাণ্ডারকে করতে হয়, শেষোক্ত কাজটা অপ্রিয় হলেও সামরিক বাধ্য বাধকতার হিসাবে তাও করতে হয়।

সন্ধ্যার সময় দশ নম্বর পণ্টনকে সঙ্গে নিয়ে পায়খানা, Canteen, রান্নাঘর, Reservoir, খাবার জায়গা ইত্যাদি ঘুরে দেখিয়ে আনলুম। খেতে যেতে হয় একটু দূরে, পায়খানার ত কথাই নেই। মাঠের ওপর দিয়ে সে অনেকখানি যেতে হয়। তাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু গিয়ে যা দেখলুম সিভিল তো দূরের কথা, মিলিটারীর মধ্যেও এমন কেউ নেই যিনি ভদ্রতাকে মাথায় চড়িয়ে অনায়াসে মলত্যাগ করতে পারেন। পায়খানাগুলি সবই সামনা সামনি, অথচ দরজা বা কোন আবরণ নেই। কি আর করা যায়— উপর্য্যুপরি আবেদন সত্ত্বেও কোনও ফল না দেখে, সেইগুলিই ব্যবহার করতে হোল। তবে ঠিক সামনা সামনিগুলি কেউই ব্যবহার কোরতেন না, একটু পাশে গিয়ে বসতেন।

Canteenএর অবস্থা দেখতে গেলুম। জিনিষ পত্র সেদিন তেমন কিছুই ছিল না, তবে শুনলুম কাল থেকে নাকি পূর্ণ উদ্যমে চলবে।

সাড়ে আটটার সময় খাবার বাঁশী বাজলো; প্রথম দিন, তায় সকাল বেলা অনেকেরই ভাল করে খাওয়া হয় নি। সকলে যে সে রকমে খেতে গেলেন। ভাত ডাল তরকারী সবই এলো,—শেষে মাংস পর্য্যন্ত এলো,—কিন্তু মাংস খাবার সময়—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সকলের চোখ দিয়েই আনন্দাশ্রু (!) গড়াতে সুরু করে দিয়েছিল,—অথচ ছাড়তেও পারা যায় না।—পাচকেরা বাংলাদেশের না সুদূর মাদ্রাজের তাও অনেকেরই সন্দেহ স্থল হয়ে দাঁড়ালো! কি আর করা যায়, দিনের মধ্যে সমস্ত কাজ বাদ দিলেও আহার নামক সৎকার্য্যটী বাদ দেওয়া চলে না!—বাড়ীতে যাঁদের আহারের বিন্দুমাত্র ত্রুটী হ'লে আকাশ পাতাল খোঁজেন, এখানে তাঁরা সকলেই এক একটী 'গুড বয়' হয়ে গেলেন, যেহেতু সাধিবার জন্যে মা পিসী এখানে কেউই নেই!

'আহার' কোন রকমে শেষ করে যখন বিছানায় ফিরে এলুম,—সমস্ত বিছানা তখন হিমে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। সরকারের দেওয়া কম্বল দুটো জড়িয়ে তাতেই শুয়ে পড়ে রইলুম। ক্রমে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এলো—সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমটা খুব শীগ্‌গীরই এসেছিলো।

তার পরদিন শুক্রবার।—ভোর তখন পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা হবে,—হঠাৎ বাঁশী বেজে উঠলো আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার—Open your flaps, make yourselves ready ইত্যাদি আরও কত রকমের বাঁধা বুলি। আমার তাঁবুর পাশের তাঁবুর প্রথমেই যিনি শুয়েছিলেন তিনি বোধহয় একটু রসিক গোছের। কারণ বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর ষণ্ড বিনিন্দিতস্বরে কম্বলের মধ্যে থেকে সুর করে গান ধরলেন—কালার বাঁশী বাজলো লো সই, যেতে হবে যমুনায়!—কিন্তু তাঁর অমন সুস্বর কারও ভাল লাগল না। তক্ষুণি আর একজন তাঁর বিছানার মধ্যে থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে উঠলেন—আর কেন বাবা, অমন বাজখাঁই গলা খানি বার করছ,—Washermanএর 'ইয়ে'টা এক্ষুণি ছুটে আসবে!—চুপ কর!

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সকলে উঠে পড়লো, এবং সেই স্থানটুকুও গুলজার হয়ে উঠলো। কেউ নাচছেন, কেউ গাইছেন, আবার কেউ বা তখন প্রাতঃকৃত্যের বদলে প্রাতরাশ সেরে নিচ্ছিলেন—অবশ্য নির্জ্জনে গিয়ে!

আধ ঘণ্টার মধ্যেই officerরা তাঁবু পরীক্ষা করতে বেরুলেন। ফাঁকা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে—উঃ সে কি শীত! ভোর হতে তখনও ঢের দেরী, Prinsep ঘাটের আলোগুলো তখন মিট্ মিট্ করে জ্বলছিলো।

আলস্য আর শীত তাড়াবার জন্যে বেলা সাড়ে ছ'টার

সময় একবার ডবল মার্চ্চের হুকুম দেওয়া হোল। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হোল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে শরীরটা যেন একটু হাল্কা বলে মনে হোল, শীতের প্রকোপও অনেকটা কম্‌লো। আড়া দেড় ঘণ্টা কুচকাওয়াজ করার পর সকলে যখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো, Breakfastএর জন্যে তখন একঘণ্টা ছুটী দেওয়া হোল। অন্যান্য বারের চেয়ে ব্রেকফাষ্টের আয়োজন এবার মন্দ দেখলুম না। চা, খানচারেক বড় বড় টোষ্ট, আর দুটো করে মুরগীর ডিম প্রত্যেককে দেওয়া হোল। যাঁরা এসে দাঁড়াতে না পারে। তা সত্ত্বেও অনেকে চোখে ধুলো দিয়ে চারখানার জায়গায় আটখানা রুটী সংগ্রহ করেছিল। তাঁদের ধারণা সরকারী মাল,—যত পার লুটে খাও, ইতস্ততঃ কোরো না।

বেলা ন'টার সময় বাঁশী আবার বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে 'সাজ সাজ' রব। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সকলে full uniformএ আবার বেরিয়ে এলো। এবারকার Programme ছিল ১২টা অবধি প্যারেড করা। তিন

বিশ্রাম-কাল

আহারের পর ছাত্রগণ নিজ নিজ দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতেছেন।

Vegeterian অর্থাৎ নিরামিশাষী তাঁরা ডিমের বদলে আরও চার খণ্ড টোষ্ট পেল। Breakfast মন্দ হ'ল না। সমস্ত ভার Contractorএর হাতে না দিয়ে তার বদলে নিজের হাতে নেওয়ার দরুণই বোধ হয় অন্যান্য বারের চেয়ে আয়োজন এবারেই ভাল হয়েছিল।

চা খাবার দৃশ্যও বড় মন্দ দেখাল না, জেলের কয়েদীদের মত সব কাপ হাতে করে দাঁড়িয়ে। এক একজনকে দেওয়ার পর খুব সতর্ক দৃষ্টি নেওয়া হচ্ছিল যাতে তারা ফের ঘুরে ঘণ্টাব্যাপী প্যারেড, বড় সোজা কথা নয়, তা ছাড়া একঘেয়েও হয়ে পড়ে, সুতরাং তিন ঘণ্টাকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা হোল একঘণ্টা সেক্‌সন ড্রিল, একঘণ্টা এক্সটেণ্ডেড অর্ডার ড্রিল ও সেন্ট্রি ড্রিল, আর একঘণ্টা ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্‌।

Extended order ড্রিল যুদ্ধক্ষেত্রেই বেশী দরকার হয়, হয় তো কোন দল বেশ মার্চ্চ করে চলেছে, হঠাৎ শত্রুপক্ষের বন্দুকের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল,—এই ড্রিল শেখা থাকলে তখন ততটা ভয়ের কারণ থাকে না। এক

সেকেণ্ডের ভেতর দলটী এমন ছড়িয়ে পড়ে যে বন্দুকের গুলি কারুরই গায়ে লাগে না। অর্ডার বা হুকুম যা দেওয়া হয় সবই বাঁশী আর হাতের সঙ্কেতে।

Sentry drill শুধু পাহারা দিতে শেখানোর জন্যেই ব্যবহৃত হয়, গার্ড বা সেন্ট্রিদের চলা-ফেরা এবং অফিসরদের কা'কে কিভাবে 'সেলাম' দিতে হয় Sentry drillএ তাই শেখানো হয়।

Instruction ক্লাস হয় ঝাড়া একঘণ্টা। এ ক্লাসটাকে

সঙ্গীন-যুদ্ধে ও বন্দুকের লক্ষ্য-স্থিরে রত কয়েকজন ছাত্র।

'ঘুম' বললেও বলা যায়। প্রত্যেকদিন এই classএ একটী করে বিষয় থাকে। Lecturerও বিভিন্নদিনে ভিন্ন অফিসার থাকেন। তারপরেই ব্যস্—ছুটী! সারাদিন বা রাতে আর কোন খাটুনী নেই।

ঝাড়া তিনঘণ্টা নাচিয়ে, বসিয়ে, শুইয়ে যখন তাঁবুতে ফিরে এলুম বারটা তখন বেজে গেছে। প্রোগ্রামে ছিল একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগদান করতেই হবে। এই একঘণ্টার মধ্যে স্নান, পায়খানা সব সেরে নিতে হবে, নইলে সেদিনের মত তাকে স্নানী করেই থাকতে হবে, আহার আর জুটবে না। যে যার কাঁধে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, কেউ চল্লেন Reservoirএ, কেউ বা প্রিন্সেপ ঘাটে—গঙ্গায়।

এবেলাকার খাওয়াটা মন্দ হোল না। মাছ ডাল তরকারী প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া গেল। নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত থাকার দরুণ পরিবেশনে মোটেই গোলমাল হয় নি।

খাওয়া দাওয়ার পর এক রকম ছুটী, তবে ইচ্ছামত সকলে,—যাঁরা পছন্দ করতেন Ambulance classএ গিয়ে যোগদান করতেন, অন্যান্য সকলে ঘুম বা চলিত কথায় যাকে 'আড্ডা' বলি তাতেই যোগদান করতেন।

বিকেল তখন চারটে কি সাড়ে চারটে—আবার একবার বাঁশী বেজে উঠলো। কি, না খেলবার জন্যে fall in করতে হবে। যারা sick তারা ভিন্ন আর কেউ তাঁবুর ভেতর থাকতে পারবে না। খেলা অনেক রকম আছে। বল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় নি। আর যারা এর কোনটাই জানে না, তাদেরও নিষ্কৃতি নেই, তাদের

কিছু না কিছু 'Fatigue duty' দেওয়া হয়, কিছু না থাকে, অন্ততঃ ঘাস ছেঁড়বার ভার দেওয়া হয়। কাপ্তেন সাহেব নিজে ও সকলের তত্ত্বাবধান করেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় সেন্ট্রি বদল। পুরাণ দল বিদায় নেয়, নতুন দল আসে। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু না থাকলেও দর্শনযোগ্য এতে যথেষ্ট আছে।

সন্ধ্যার সময় Amusement বসলো; হারমোনিয়ম, বাঁশী, গ্রামোফোন সবই এলো, সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অনেক গলারও আভাস পাওয়া গেল। গ্রামোফোনের একটা ইংরিজী গানের সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন তালে তালে নাচতে লাগলেন! কয়েকখানা গানের পরেই—বক্সিং আরম্ভ হোল। Boxing এর প্রধান উদ্যোক্তা হয়েছিলেন সার্জেন্ট শৈলেন্দ্রনাথ সেন। ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটে আমরা কয়েকদিন ধরে Boxing অভ্যাস স্থরু করেছিলুম, কাপ্তেনের আদেশে এবং সার্জেন্ট সেনের উদ্যমে Boxing স্থরু হোল। আমাদের চেষ্টা ও উদ্যম দেখে কাপ্তেন সাহেব এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে সেইদিন রাত্রেই তিনি নগদ দশ টাকা খরচ করে আমাদের দশজনকে সার্জেন্ট শৈলেন্দ্র সেনের অধীনে Boxing Competition দেখবার জন্যে Presidency Battalionএর Headquarterএ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া বক্সিং করবার 'রিং' ও একটা পরদিনই তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন।

Amusement এর ক্লাশ কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলুম্ না, পরদিন ভোরের জন্যে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নেওয়া গেল।

দিন এই রকমে স্থখ ও দুঃখের ভেতর দিয়েই কেটে যেতে লাগ্‌লো। এক কথায়—আমাদের দিন কেটে যায় Parade করে, রাত কেটে যায় ঘুমে— হয়ে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল 'আগামী কল্য প্যারেড বন্ধ থাকিবে।' এত বড় 'সৌভাগ্য সূচক বাণী' হঠাৎ কেউই বিশ্বাস করতে পারলে না। কারণ কর্ত্তারা এবার রবিবারের প্রাপ্য ছুটীটাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।—অনুসন্ধানে জানা গেল ছুটী থাকবে একথা সত্য। কারণ Military হলেও X'masএর দিনটা তাঁরা খুব ভালভাবেই পালন করেন। আরও জানা গেল সেদিন আমোদ করবার জন্যে সকলেই বাড়ী যেতে পারবে। তবে যেন তেন প্রকারেন রাত্রি আটটার আগে ফিরতেই হবে। যেহেতু পরদিন 'C' কোম্পানীকে Firing করবার জন্যে সকাল আটটার আগেই বেলঘরিয়া যাত্রা করতে হবে।

সেদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই শুনলুম—কাপ্তেন আর সার্জেন্ট মেজর আর কিছুক্ষণ বাদেই সমস্ত দিনের জন্যে বিদায় নেবেন। থাকবেন শুধু লেফ্‌টেন্যান্টরা। বেলা সাড়ে আটটার সময় চা, ডিম খাবার পর বাঁশী বেজে উঠ্‌লো। কি, —না ট্রামভাড়া নেবার জন্যে fall in করতে হবে। এতদিন ধরে যাঁরা Parade করে আসছেন তাঁরাই দৈনিক হিসাবে আজ সমস্ত পাবেন। ট্রামভাড়া কমাণ্ডাররা নিজের কোম্পানীর মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন।

ট্রামভাড়া বিতরণ করা হয়ে গেলে সকলে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত—সহসা সার্জেন্ট রাধাকৃষ্ণম্ এসে আমাকে জানিয়ে দিলেন যারা নিজেই রাইফেল আর পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করে না রাখবেন তাদের যেন আমি কিছুতেই না ছাড়ি। তাদের ছুটী দেওয়া হবে না। কি করি, উপরওয়ালার হুকুম! দরখাস্তগুলি 'Granted' এর বদলে 'Cancelled' করতে লাগলুম। পরে সকলের জিনিষপত্রাদি পরিষ্কার হয়ে গেলে তাদের ছুটী দিয়ে দিলুম। দায়িত্বটা তাদের চেয়ে আমারই ছিল বেশী, তাই 'বাবা বাছা' বলে সকলকে বুঝিয়ে দিলুম যেন সকলে গুড্‌বয়ের মতন আটটার আগেই ক্যাম্পে ফেরে, নচেৎ আমার চাকরী (!) তো যাবেই, উপরন্তু তাদেরও শাস্তি দেওয়া হবে! অনুরোধের ফলে কি ভয়ে বলতে পারি না, সেদিন তারা সকলেই আটটার আগে ফিরেছিল।

হঠাৎ একটা গোলমালে যখন ঘুম ভাঙল রাত তখন ঢের, বোধ হয় চার'টে হবে। ব্যাপার কি,—না, ফায়ারীং যাবার জন্যে প্রস্তুত এখন থেকেই হতে হবে। বাপ! শীতের চোটে তখন হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে আসছে, তখন—এর চেয়ে কোর্টমারশিয়ালের শাস্তিও বোধ হয় আরামপ্রদ! আমারই অধীনস্থ কয়েকটী ছেলে এসে আমাকে জানালে যে এই শীতে প্রস্তুত হতে তারা মোটেই পারবে না, তাদের একটা উপায় কোরতেই হবে। সে ক্ষেত্রে

আমি নিজেই নিরুপায় ছিলুম। সকলকে কোন রকমে প্রস্তুত হয়ে নিতে বলে কেবল দুজনকে মাত্র 'Sick' উপাধিতে ভূষিত করে সেই দারুণ বিপদ থেকে মুক্ত করলুম। —কি করি, ওপরওয়ালার হুকুম। ······

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে, Break fast শেষ করতে করতেই ভোর হয়ে এলো, তারপর সাজগোজাদি সেরে নিয়ে, water-bottle গুলি জলে ভর্ত্তি করে এবং Haversackএ মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে সম্প্রতি আমরা কোথায় যাচ্ছি। তার উত্তরে কয়েকজন হেসে উত্তর দিয়েছিল—going to attack Bulgaria বেলঘরিয়া নামটা আমাদের কাছে বুলগেরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়ী ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে লেফ্‌টন্যান্ট চৌধুরী সমস্ত কামরাগুলি পরীক্ষা করে গেলেন। পরীক্ষা করা হয়ে গেলে গাড়ী ভস্‌ ভস্‌ কোরতে কোরতে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লো। আর যায় কোথা, বোঝাই কামরাগুলা

"কোয়ার্টার গার্ড"

যখন লেফট রাইট, করতে করতে যাত্রা করলুম, তখন সাতটা বেজে গেছে। কথাছিল খিদিরপুরের কাছে আমাদের জন্যে দুখানি ট্রেণ Reserve থাকবে, পৌছে দেখলুম আদেশ অমান্য হয় নি,—হাজার হো'ক মিলিটারী তো!

শেয়ালদায় পৌছুতে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! এতগুলি রাস্তা—বিশেষতঃ বাঙ্গালী সৈন্য দেখে লোক জমে গিয়েছিল খুবই। আশে পাশের বাড়ীর ছাদ, বারান্দা লোকে লোকারণ্য! রেলওয়ের জনৈক গার্ড জিজ্ঞেস করেছিলেন থেকে সমস্বরে চীৎকার উঠ্‌লো—বন্দে মাতরম্‌! শুধু তাই নয়, রুমাল ওড়ানো, হিপ-হিপ-হুররেরও অন্ত ছিল না। বাঁধন ছাড়া মুক্তজীব তখন সব। এ সব ছাড়া গাড়ী যখন ষ্টেশনের অন্ধকার ছাড়িয়ে আলোর মধ্যে এসে পড়লো—কামরায় কামরায় গানের শেষ নেই,—নাচও যে চলছিল না, তা নয়! বিশেষভাবে লান্স-কর্পোরাল শিশির ঘোষ যা 'আলী সাহেবের' সুমধুর কীর্ত্তনের সুর তখন ট্রেণের শব্দকেও ছাড়িয়ে উঠেছিল!

বেলঘরিয়া ষ্টেশনে নামতেই আবার সকলের মুখ শুকিয়ে

এলো। আমাদের সময়টুকু এত শীগ্‌গীর যে কেটে যাবে তা কেউই আশা করে নি!—Left Right করতে করতে আবার Range এর দিকে মার্চ্চ করে চললুম।

প্রথমেই একশ গজ দূর থেকে 'ফায়ারিং' সুরু হোল। ক্রমে দু'শ—তিনশ পর্য্যন্ত ফায়ারিং শেষ হলো। পূর্ণ নম্বর মোটে একশ তিরিশ,তার মধ্যে যারা ছিয়াশি বা তার বেশী পাবে তাদের first class shot, যারা বিয়াল্লিশ বা তার ওপরে পাবে তারা second class shot, এবং যারা বিয়াল্লিশেরও কম পাবে তাহা third class shot বলে অভিহিত হবে। যার সংখ্যা সব চেয়ে বেশী first prize হবে তারই। তারপর second third প্রভৃতি আরও উনিশটী প্রাইজ আছে। তবে যারা repetition করে বেশী নম্বর পাবে তারা প্রাইজ মোটেই পাবে না।

ফায়ারিং শেষ করে দলটীকে আবার মার্চ্চ করিয়ে সবেমাত্র ষ্টেশনে আনা হয়েছে, এমন সময় শোনা গেল ট্রেণ নাকি দু' মিনিট আগে চলে গেছে। হরি, হরি! ফায়ারিংএ সকলে এমন ব্যস্ত ছিলেন ট্রেণের সময়টুকু দেখবার অবসরও ঘটে নি। কি আর করা যায়, লেপ্টন্যাণ্ট চৌধুরীর হুকুমে সকলে Platformএর ওপরেই বিশ্রাম করতে সুরু করে দিলে।

পরের ট্রেণ ছিল ঠিক একঘণ্টা পরে। ট্রেণ আসবামাত্র যে যেখানে পারে শ্রেণী নির্ব্বিচারে উঠে পড়লো। কামরায় কামরায় আবার গান, বাজনা। তবে ল্যান্স কর্পোরাল শিশির ঘোষকে আর আমোদে তেমন নিবিড়ভাবে যোগদান করতে দেখা যায় নি। তাঁর firingএর ফল বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

শেয়ালদহ থেকে আবার মার্চ্চ সুরু হোল। ফেরবার সময় সরকার বাহাদুর আর ট্রামের বন্দোবস্ত করেন নি।—আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বৌবাজারের ভেতর দিয়ে। গলার আওয়াজে আর আড়াই মণ ভারী বুটের শব্দে যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটে এসেছিল। দু' পাশের ছাদ জানালা প্রভৃতি লোকের মাথায় ভরে গিয়েছিল। কথায় বলে—'কারু পৌষমাস কারু সর্ব্বনাশ'—আমাদের দশাও হয়েছিল ঠিক তেমনি। সকলেই আমাদের আনন্দভরে দেখছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের দশা তখন—সে আর না বলাই ভাল।

ক্লান্ত নির্জ্জীব দেহখানা কোনরকমে যখন Camp পর্য্যন্ত টেনে আনলুম সন্ধ্যা তখন হয়ে গিয়েছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ছেড়ে তখন অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে রাত্রে Amusementএ যোগ দেবার মত অবস্থা আর কারুর ছিল না। কাপ্তেন সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সার্জ্জেণ্ট মেজর হেম লাহিড়ী একটু হেসে উত্তর দিলেন যে তাঁর লোকেরা বুলগেরিয়া (!) থেকে ফিরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—নড়বার-চড়বার শক্তিও অনেকের নেই।

কাপ্তেনের মেজাজ সেদিন ভালই ছিল, একটু হেসে সেকথার সমর্থন করে নিলেন।

তারপরের দিনগুলো খুব শীগ্‌গীরই কেটে যেতে লাগলো। হঠাৎ একদিন শোনা গেল আগামী পয়লা জানুয়ারী যে Proclamation Parade হবে তাতে ইউনিভার্সিটী কোরকেও যোগদান করতে হবে। এবং তারই Rehearsal Parade প্রত্যেক দিন শেখানো হবে।

Proclamation Paradeএ যোগদান করবার সৌভাগ্য ইউনিভার্সিটী কোর উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধরেই পেয়ে আসছে। এই বিরাট উৎসবে শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ রেজিমেণ্টই যোগদান করে! Parade পরীক্ষা করেন Viceroy এবং গভর্ণর নিজে!—

কয়েকদিন উপর্য্যুপরি rehearsalএর পর একদিন General officer commander Major General টমসনের অধীনে Parade groundএ rehearsal দিয়ে এলুম। শুধু University Corps নয়, সেদিন অনেক re iment উপস্থিত হয়েছিল। সেদিনকার কুচকাওয়াজ দেখে কাপ্তেন সাহেব 'C' কোম্পানীর ওপর ভারী সন্তুষ্ট, আসল দিনে যাতে কৃতকার্য্যতা লাভ হয় সেই উদ্দেশ্যে 'C' কোম্পানীকেই তিনি সুমুখে রাখবার বন্দোবস্ত করলেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট চৌধুরী 'সি' কোম্পানীকে আরও ভাল করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। উদ্যম ও চেষ্টা না-কি বৃথা যায় না, এ ক্ষেত্রেও গেল না।

১লা জানুয়ারী, ক্যাম্পট্রেণিংএর শেষ দিন! সেদিনও

উঠতে হয়েছিল ভোর পাঁচটায়, সাতটার আগেই সমস্ত কোম্পানী 'ফল ইন' করানো হোল। 'C' কোম্পানী দাঁড়াল আগে। তারপরেই দাঁড়াল 'B' কোম্পানী। মার্চ্চ করাতে করাতে আবার সেই মাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হোল। সমস্ত পথ আজ ভীড়েই ঢাকা ছিল। যেদিকে তাকানো যায় কেবলই মাথা। রাস্তায় পুলিস প্রহরী সার্জ্জেন্টদেরও অন্ত নেই—পথ খালি করতেই ব্যস্ত। একে একে সমস্ত দলই যখন এসে গেল,—তার কিছু পরেই সশস্ত্র দেহরক্ষী বেষ্টিত তালে তালে পা ফেলে মার্চ্চ সুরু করলে। বাহিরে দর্শকরা এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সমবেত দলগুলির মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্তের march past দেখে তারা আর স্থির থাকতে পারলে না। তাদের সশব্দ করতালি ধ্বনিতে কি একটা অজানা উত্তেজনায়, গর্ব্বে আমাদের সারা প্রাণ নেচে উঠলো। বাঙ্গালী সৈন্তেরা, বিশেষতঃ সামান্ত ছাত্রেরা যে এরূপ সুন্দর কৃতকার্য্যতা লাভ করবে তা দর্শক তো দূরের কথা,আমাদের শিক্ষাদাতা Captain Hyde স্বয়ংও তা আশা

ক্যাম্প-ভঙ্গে

প্রত্যাবৃত—কম্বল ও সতরঞ্চির উপর উপবিষ্ট কয়েকজন ছাত্র ও স্কটীশচার্চ্চের অধ্যাপক লেফ্‌টেন্যাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড।

হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বড়লাট ও বঙ্গেশ্বর এলেন। পরে একে একে একত্রিশটা তোপধ্বনি করা হোল। তারপরেই—march past, যা দেখবার জন্তে সারা সহরের লোক আজ ভেঙ্গে পড়েছে।...

ভারতেশ্বর ও বঙ্গেশ্বর একটী বেদীর কাছে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন,—একে একে সমস্ত দল মার্চ্চ করে চলে গেল। তারপরেই আমাদের পালা।—হঠাৎ মিলিটারী ব্যাণ্ড বেজে উঠলো, University corps সেই বাজনার করেন নি। বড়লাট বাহাদুরও Captainকে ডেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এরূপ সুন্দর march past আর এত সৈন্তদল কোন ব্রিটিশ সৈন্যদলও Parade groundএ নামাতে পারে নি। পরদিন Englishmanও মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—It was noticed that second Bengal Calcutta University training corps looked very—very smart on parade—" ভারত সরকার দেখলেন ইউনিভার্সিটী কোরের জন্য এতদিন ধরে

যে, অর্থ ব্যয় হয়ে আসছে, তা বৃথা যায় নি। সুদে আসলেই তা উঠে এসেছে।

প্যারেড থেকে ফিরে আসতেই শুনলুম ষ্টেট্‌সম্যান থেকে লোক এসেছে আমাদের Photo তুলবার জন্যে! আধ-ঘণ্টার মধ্যেই সকলকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হোল। সর্ব্বশুদ্ধ দুখানা তোলা হোল, শুধু অফিসার ও staffদের।

বেলা এগারটার সময় কাপ্তেন সাহেব নিজে সকলের কাছ থেকে সতরঞ্চি, কম্বল ও গ্রেট কোট বুঝে নিলেন, Rifle ফোর্টের মধ্যে জমা দিয়ে আসতে হোল। বেলা ১২টা থেকেই যে যার জিনিষপত্র নিয়ে সরে পড়তে লাগলো, আমাদের মধ্যে অনেকেই পেটের জ্বালা সইতে পারেন নি। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি পাচকরা কেহই নেই, তারাও চলে গিয়েছে। তবে রান্না তারা শেষ করে গিয়েছে। খাবার সমস্তই ঢাকা। নিজ হাতে যে যা পারলেন, শেষ করে উঠে পড়লেন। কাপ্তেন সাহেবের 'রেস' ছিল, তিনি মোটরে করে তখনি চলে গেলেন। দুখানা গাড়ী ভাড়া করে আমরা কয়েক বন্ধু যাত্রা কোরলুম—বেলা তখন তিনটে।

মনে পড়ে, গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই এলেন বয়ো কোর্সেই যখন ক্যাম্প পড়েছিল তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ছিলুম—এইখানেই যেন আবার camp পড়ে। দেখলুম সে প্রার্থনা বিফল হয় নি। গাড়ীতে উঠছি, শুনলুম পাশের তাঁবু থেকে কারা গাইছিল—

আর তো 'ক্যাম্পে' থাকব না ভাই
　　থাকতে প্রাণ নাহি চায়,
'ক্যাম্পের' খেলা ফুরিয়ে গেছে
　　তাই চলেছি কলকাতায়।
কাপ্তেন ছেড়েছি, N. C. O. ছেড়েছি
প্যারেড করা ভুলে গেছি
এখন হায়দ্রাবাদে * প্যারেড করা
　　ভুলাবে এই 'এলেনবয়ায়।'

সমস্ত গানটুকু শুনতে পাই নি, যেটুকু শুনেছিলুম সেইটুকুই উদ্ধৃত করলুম।

* ইউনিভারসিটী কোরের ক্যাম্প ট্রেণিং শেষ হলে উক্ত স্থানে ১১।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেন্টের ক্যাম্পের অধিবেশন হয়েছে।—লেখক

মায়ার টান

(গল্প)

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত]

(১)

পত্নী কালীতারাকে দাহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেই তারককেও যখন সেই রোগে ধরিয়া বসিল, সে তখন আড়াই বৎসরের শিশু পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী উমাকে বলিল, "আমার সময় ত ফুরিয়ে এসেছে উমা; আমি মরে গেলে বিশুকে তোর শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যাস্। তুই ছাড়া ওর ত আর আপনার বলতে কেউ রইল না!"

উমা ক্ষুদ্র শিশুটিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "বিশুর জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। অত হতাশ হয়ো না, সেরে উঠবে বইকি!"

উমার কথা শুনিয়া তারক একটু ম্লান হাসি হাসিল। কোন কথা বলিল না।

দুইদিন পরে যখন তারক সত্যসত্যই পত্নীর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার অনুগমন করিল তখন উমা কোন মতে উভয়ের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশুকে লইয়া শ্বশুর বাড়ী ফিরিয়া গেল।

ছেলে দেখিয়া উমার ছোট-জা ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কার ছেলে দিদি, তোমার ভায়ের বুঝি?"

উমা বিশুকে ইন্দুর কোলে দিয়া বলিল, "হাঁ, ওকে তুই নে। আজ থেকে ও তোরই ছেলে। এর মাও ছিল ঠিক তোর মত দেখ্তে। দেখছিসনে—দুষ্ট ছেলে তোর কোলে গিয়ে কেমন করে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! ওকি, কাঁদছিস! ছি বোন, তুই বড় ছেলেমানুষ।"

ইন্দু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশুকে উমার পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া ম্লান মুখে বলিল, "দরকার নেই দিদি ওসব পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করে। তোমার বোঝা তুমিই টান।" বলিয়া ইন্দু ধীর পদে তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে ইন্দুরও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। ইন্দু পুত্রের নাম রাখিয়াছিল অমিয়। শিশুর পবিত্র সুন্দর মুখখানি দেখিয়া সে সকল যন্ত্রণা ভুলিয়াছিল। সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিত, যেন সে শিশুর মুখখানির ভিতর কি এক নূতন জগত দেখিতে পাইয়াছিল!

শুব্ধ নিশীথে যখন চাঁদের আলো ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া ঘুমন্ত শিশুর মুখের উপর আসিয়া পড়িত,—ইন্দু তখন মুগ্ধনেত্রে শিশুপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। কোন দিন ঘুমন্ত শিশু ঘুমের ঘোরে বলিয়া উঠিত—"মা!" ইন্দুর যেন সমস্ত শরীর আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত;—সে আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘুমন্ত শিশুকে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিত, শিশু ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠিত; ইন্দু তাড়াতাড়ি তখন তাহাকে আবার শান্ত করিতে বসিত। এমনি ভাবে ইন্দুর দিন কাটিতেছিল।

কিন্তু ভগবান তাহার এ সাধে বাদ সাধিলেন। আড়াই বছরের শিশু অমিয় হঠাৎ দুই দিনের জ্বরে সকলকে ফেলিয়া অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল; তখন ইন্দু চুপ করিয়া তাহার এই শেষ দৃশ্য দেখিল। তাহার মুখ দিয়া একটিও আর্ত্তনাদ বাহির হইল না; চোখ দিয়াও এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। সে শুধু জমাট বেদনার রুদ্ধ আবেগে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিশুকে দেখিয়া আজ তাহার অতীত স্মৃতি মানস নয়নে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ তাহার শয্যার উপরে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর ইন্দু পাশের বালিসটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া একটি জ্বালাময় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—"মা গো!" তাহার চোখ হইতে কয়েকবিন্দু অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল।

এমন সময় কে যেন কুসুম-নরম সুকোমল বাহু দুইখানি

দিয়া ইন্দুর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া মধুর আধ-আধ-স্বরে ডাকিল—"মা !"

ইন্দু থড়্‌ফড়্‌ করিয়া বসিল। সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বিশু তাহার ক্ষুদ্র দুইখানি বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

ইন্দু বিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। আজ তাহার বহুদিনের সঞ্চিত গুপ্ত-বেদনা এই অজানিত শিশুর মা ডাকেই বুঝি গলিয়া শ্রাবণের ধারারমত ঝরিয়া পড়িতে ছিল!

উমা বিশুকে ঘরে ছাড়িয়া দিয়া এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল; এই দৃশ্য দেখিয়া সে চোখ মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে ইন্দু বিশুকে আনিয়া উমার নিকটে নামাইয়া দিয়া বলিল, "তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি দিদি, যে এমন করে তার শোধ নিচ্ছ! পরের বোঝা নিজে সাম্‌লাতে পারলে না,—দিচ্ছ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে। আমায় দিয়ে ওসব হবে না। তোমার ত ছেলে পেলে নেই. তুমিই নাও না কেন ওকে! তোমার পায়ে পড়ি দিদি, ওসব আমার দরকার নেই। আমার যা হবার খুব শাস্তি হয়েছে, খুব জ্বালা ভোগ করছি, আর না!" বলিয়া ইন্দু চোখ মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল। উমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, সেও আঁচল দিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া বিশুকে তুলিয়া কোলে করিল।

(২)

সমস্ত রান্না-ঘরটা জল ঢালিয়া কাদা মাখিয়া, বিশু মহানন্দে খেলা সুরু করিয়া দিয়াছিল। উমা অন্যঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, ইন্দু ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল, সে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কলসীটা দাওয়ার উপর রাখিতেই বিশুর কাণ্ডখানা দেখিতে পাইল। বিশু ইন্দুকে দেখিয়াই 'হি' 'হি', করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ইন্দু তাহাকে উঠানে আনিয়া রাগত ভাবে বলিল, —"এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্ লক্ষীছাড়া হাবাতে-ছেলে,— সমস্ত গায় কাদা মেখে ভূত হয়ে বসে আছেন,—অসুখ ক'রবে যে! আর দিদি, তোমারই বা কি আক্কেল! কলসী থেকে জল ফেলে দিয়ে ঘরটা কি করেছে একবার দেখে যাও। জল বুঝি অমনি আসে—না বাড়ীতে জলের কল আছে! ওকি আবার কোলে ওঠার চেষ্টা হচ্ছে! তা হবে না। থাক্ এইখানে দাঁড়িয়ে, যেমন গায়ে কাদা মেখেছ, অই কাদা নিয়েই আজ থাকতে হবে বলে দিচ্ছি।" বলিয়া বকিতে বকিতে ইন্দু ঘর পরিষ্কার করিতে গেল।

উমা এতক্ষণ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্দু ও বিশুর কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছিল। এক্ষণে সে হাসি চাপিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওকে কাদা-মাটি মাখিয়ে রেখেই যে বড় চলে গেলি? ঘর আমি পরিষ্কার করছি, তুই তোর ছেলে নে।"

"আর আমার ছেলে আমার ছেলে বলে জ্বালিও না দিদি; ভগবান যদি আমার বলিতে দিতেন তবে আর সে হতভাগা আমাকে ফেলে রেখে এমন করে চলে যেত না।" বলিয়া চোখ মুছিয়া ইন্দু বিশুকে ধোওয়াইয়া কোলে লইয়া তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "রান্না আজ আমি করবো, তুই বিশুকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়া।"

ইন্দু বিশুকে কোলে লইয়া তাহার ঘরে গিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া মৃত পুত্রের একটি ফ্লানেলের ফ্রক্ বাহির করিয়া পরাইয়া দিল। ইন্দু জামাটা বিশুর গায়ে পরাইয়া দিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সেও ঠিক এমনি আড়াই বছরেরটী হইয়াছিল! তারও গায়ের রং চোখ মুখ ঠিক এমনি ছিল! এই জামাটি গায় দিয়া একগাছি সরু হার গলায় দিয়া জুতা মোজা পরিয়া এক দিন সে মায়ের কোলে চড়িয়া নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল। ইন্দু মৃত পুত্রের হারগাছি, জুতা, মোজা বিশুকে পরাইয়া দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—"বিশু বাবা!"

বালক ইন্দুর চুলগুলি টানিয়া উত্তর করিল, "মা!"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে উমা ইন্দুর ঘরে আসিয়া দেখিল, ইন্দু বিশুকে বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিশুর গায়ে ইন্দুর মৃত পুত্রের জামা, হার [illegible] অতিকষ্টে চোখের জল চাপিয়া ঘুমন্ত বিশু ও ইন্দুর [illegible] দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উমা তথা হইতে [illegible]

একদিন ইন্দু বিশুর চুলগুলি সম্মুখের দিকে ঝুটি করিয়া বাঁধিয়া দিয়া তাহার কপালে একটি খয়ের টিপ পরাইয়া কোলে করিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। এমন সময় মুখুজ্জেদের বাড়ীর নিভা আসিয়া ইন্দুকে ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি লো, একেবারে কৃষ্ণকে কোলে ক'রে নন্দের-ঘরণী হ'য়ে বসেছিস্ যে! পরের ছেলের উপর বাপু অতটা ভাল না!"

ইন্দু কোল হইতে বিশুকে নামাইয়া দিয়া মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "পরের ছেলের আদর করতে ভারি দায় পড়েছে আমার! দিদি এইগুলি পরিয়ে জোর করে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে গেল তাই।"

"নে, নে. আমাকে আর বোকা বোঝাতে হবে না। ওর দিদিই সব করে, আর উনি কিচ্ছু জানেন না! মিছেমিছি পরের ছেলে ঘাড়ে নিয়ে মায়া বাড়াচ্ছিস. হাজার হলেও পর পরই থাকে। তোর যদি ভাল কপালই হ'তো তবে অমন সোণার চাঁদ ছেলে অমন ক'রে চলে যাবে কেন!" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিভা ইন্দুর চিবুক ধরিয়া পুনরায় বলিল, "রাগ কল্লি ভাই?" ইন্দু কোন কথা বলিল না, তাহার চোখ দিয়া দুই-ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

নিভা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি তোর মনে কষ্ট দেবার জন্যে বলিনি ভাই; আমার কথায় যদি তুই কষ্ট পেয়ে থাকিস তবে আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ঠাট্টা করে ওসব বলছিলাম; তোর পায়ে পড়ি ভাই—"

তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া ইন্দু বলিল, "পাগলের মত কি যে করিস, কোন অন্যায় কথা বলিস নি ত! সত্যি ভাই, পর কি কখন আপন হয়!"

নিভা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "বেড়াতে যাবি—মিত্তির দের বাড়ী? চলনা যাই,—কাল ওদের নূতন বউ এসেছে দেখে আসি।"

ইন্দু বলিল,—"না।" কথাটা একটা আর্ত্তনাদের মতই তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

"তবে আমি আসি। ফিরে যাবার সময় আবার আসবো।" বলিয়া নিভা চলিয়া গেল। বিশু ইন্দুর কাপড় ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—"মা।"

ইন্দু উদাস দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। সত্যইত, সে একি করিতেছে! কোথাকার এক পরের ছেলের জন্য তাহার এত মাথা ব্যথা কেন? কিন্তু দোষ ত তার নয়, উমা যদি কুড়ানো ছেলেকে দিয়া তাহাকে এমন করিয়া না বাঁধিত! ইন্দুর রাগ হইতেছিল উমার উপর। সেত এক ভাবে দিন কাটাইতে ছিলই। এ নূতন অশান্তি ত উমাই সৃষ্টি করিল। বিশু যখন দেখিল তাহাকে কেহ কোলে লইল না;—সে তখন মা, মা, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ইন্দুর বুকের মধ্যে মাথা রাখিল।

বিশুর স্পর্শে ইন্দুর বুকটা যেন নূতন করিয়া তোলপাড় করিয়া উঠিল, সে বিশুকে কিছুক্ষণ তাহার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অনিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষুদ্র শিশুটিও যেন মোহাবিষ্টের মত ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দু সাগ্রহে কয়েকবার বিশুর মুখখানি চুম্বন করিয়া তাহাকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর উমার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,—"দিদি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে ছিলেন, ইন্দুর সাড়া পাইয়া উমাকে বলিলেন, "শুনছ? বৌমা ডাকছেন।"

উমা ঘরের বাহিরে আসিয়া বিশুর এই অভিনব বেশ দেখিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেই ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আজ আবার হলো কি?"

অতি ধীরে ধীরে ইন্দু তাহার নিকটে আসিয়া বিশুকে উমার কোলে তুলিয়া দিয়া সে আছাড় খাইয়া উমার পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া উমা তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "আজ কি হয়েছে তোর, অমন করছিস কেন বল দেখি?"

বিশু উমার কোলে আসিয়া বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছিল। সে বারংবার ইন্দুর দিকে হাত বাড়াইয়া ঈষৎ ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিল, "মা যাব।"

বিশুর কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্দু চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "যে জ্বালা নিয়ত আমি ভোগ করছি, তারপর আর নূতন ক'রে জ্বালার সৃষ্টি ক'রনা দিদি। আজ থেকে আর ওকে আমার কাছে দিওনা। ও তোমার জিনিস

তোমা[illegible] থাক।" তার পর সে হাত দুটি জোড় করিয়া উমার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া বলিল, "কেন দিদি আমাকে পুতুল দিয়ে ভোলাচ্ছ! কোনও দরকার নেই আমার ওতে। আমি অমনি বেশ থাকতে পারবো।"

উমা কি যেন বলিতে যাইতেছিল। বাধা দিয়া ইন্দু বলিল,—"তোমার পায় পড়ি দিদি, আর কোন কথা শুনবো না, ও যে আমার অশান্তি বই শান্তি ফিরে আসবে না।" বলিয়া ইন্দু তাহার ঘরে গিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

বিশু ইন্দুকে এইরূপ হঠাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা, মা, আমি মা দাব।"

(৩

অজয় কুমার রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিল, ইন্দু বিছানার একদিকে জড়সড় হইয়া শুইয়া আছে। সে ইন্দুর মাথায় হাত দিয়া বলিল, "সমস্ত দিন রাত শুয়েই কাটাবে নাকি? বৌদি ছেলেটাকে নিয়ে একা সংসারের কাজ করতে পারছেন না, সেটাও একবার দেখতে হয়। যাক, বৌদি বল্লেন খেয়ে এসোগে।"

ইন্দু কোন কথা না বলিয়া তেমনি ভাবেই শুইয়া রহিল।

খানিক পরে উমা আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "ঠাকুরপো, ইন্দু কি ঘুমিয়েছে?"

"মোটেই না! ঐ দেখনা কেন কাপড়ের বুচকীর মত ঐখানটায় পড়ে আছে।" উমা ডাকিল, "ইন্দু খেতে আয়।" কিন্তু ইন্দুর উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। উমা এবার একটু তীব্রস্বরে বলিল, "একি ছেলে মানুষী ইন্দু তোর! খাস না খাস এদিকে এসে একটা কথা শুনে যা।"

এবার ইন্দু অগত্যা উঠিয়া আসিয়া উমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

উমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "দুটো খাবি চল্। বিশু এতক্ষণ মা, মা করে কেঁদে কেঁদে এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ধন্তি প্রাণ তোর বাপু! মেয়ে মানুষের প্রাণ এত কঠিন হয়! চোখের সামনে সেই সকাল থেকে দুধের ছেলেটা কেঁদে কেঁদে খুন হচ্ছে, আর তুই ছল করে শুয়ে আছিস!"

উমার হাতখানি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া ইন্দু বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, ওর কথা আর আমার সামনে ব'লনা। আমি ডাইনী, নিজের ছেলেকে খেয়েছি, এমন ডাইনীর হাতে কি বাপ-মা-মরা ছেলে স'পে দিতে আছে!"

আহারাদির পর ইন্দু ঘরে গেলে অজয় বলিল, "আজ যে বিশুর শোবার ব্যবস্থা ওঘরে হলো?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ইন্দু বলিল, হবে না কেন, ও আমাদের কে? যার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এসেছি।" বলিয়া ইন্দু স্বামীর অলক্ষিতে নয়ন কোনে সঞ্চিত অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিল।

ইন্দু কাছে আসিতেই তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অজয় ব্যথিত স্বরে ডাকিল, "ইন্দু।" ইন্দু এতক্ষণ প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত রাখিয়াছিল, কিন্তু স্বামীর নিকট লুকাইবার মত ক্ষমতা তাহার আর রহিল না। আজ আট বৎসর সে স্বামীর ঘর করিতেছে। কিন্তু কোন দিন স্বামীর নিকট কোন কথা গোপন করিয়া রাখে নাই; আজও পারিল না। সে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অজয় সস্নেহে পত্নীর মাথায় হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "ইন্দু, কি ব্যথা পেয়ে যে আজ এমন করে কাঁদছ, কেন যে আজ বিশুকে বৌদির কাছে দিয়ে এলে—সবই বুঝি। কিন্তু উপায় কি, এ যে ভগবানের দান; ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আমাদের মাথা পেতে নিতেই হবে।" বলিয়া অজয় পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইল।

ইন্দু কোন কথা বলিল না, সে স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিল।

অনেক রাতে বিশুর ঘুম ভাজিয়া গেল। সে ইন্দুকে নিকটে না দেখিয়া "মা দাব, মা দাব" শব্দে ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল।

ইন্দুর চোখে ঘুম ছিল না, সে চুপ করিয়া চোখ বুঁজিয়া শুইয়াছিল মাত্র। বিশু কাঁদিয়া উঠিতেই সে ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল। আজ সকাল হইতেই তাহার বুকটা যেন পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল। অবাধ্য মন তার প্রতিক্ষণেই ক্ষুদ্র শিশুর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। সকাল হইতে সে অনবরত হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিজে

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে বিশুর মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া আর কিছুতেই সে নিজকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না। ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনে তাহার হৃদয়ের বল, দৃঢ়তা সংযম সব ভাসিয়া গেল। ইন্দু উঠিয়া দ্বার খুলিয়া কম্পিত চরণে আসিয়া উমার ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইল। শুনিল, উমা বলিতেছে,—"লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ছেলে, বাপ মাকে খেয়ে এসে এখন আমার হাড় জালাতন করতে এসেছে!" সঙ্গে সঙ্গে একটি চপেটাঘাতের শব্দ ইন্দুর কানে গেল। ইন্দু আর থাকিতে পারিল না। অধৈর্য্য হইয়া দ্বারে ঘা দিতে লাগিল।

[illegible] বলিলেন, "দেখত, বোধ হয় বাইরে বৌমা [illegible]ছেন। বিশুকে নিয়ে ওঁর কাছে দিয়ে এস।"

[illegible] করিয়া উমা বলিল, "থাক, আর অত দিয়ে দরকার [illegible]। [illegible] যেমন কপাল তেমন ভাবেই থাক।" বলিয়া [illegible] জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া ধমক দিয়া বলিল, [illegible] কাঁদবি, তবে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব—[illegible]ছাড়া ছেলে।"

ইন্দুর তখন আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি ছিল না, কোন মতে দেহটাকে নিজের ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া স্বামীর পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। হায়, কেন সে পরের ছেলেকে তাহার হারাণো মাণিকের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল!

(৪)

ভোর হইতেই ইন্দু স্বামীকে ধরিয়া বসিল সে বাপের বাড়ী যাইবে। অজয় প্রথমে ইন্দুকে নানাপ্রকারে বুঝাইল কিন্তু ইন্দু কোন কথা না বলিয়া স্বামীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া [illegible] কাঁদিতে লাগিল। অজয় অগত্যা বৌদিদিকে বলিয়া [illegible] মত লইয়া ইন্দুকে পিত্রালয়ে রাখিয়া কলিকাতার চাকুরী স্থলে চলিয়া গেল।

যাইবার সময় বিশু যখন ইন্দুর কাপড় চাপিয়া ধরিয়া 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়াছিল তখন যে কেমন করিয়া তাহার হাত হইতে কাপড় ছাড়াইয়া টলিতে টলিতে গাড়ীতে উঠিয়াছিল, তা সেই জানে। উমাকে প্রণাম করিতেই তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া উমার পায়ের উপর পড়িয়াছিল। উমা সজল নয়নে ইন্দুর চিবুক ধরিয়া সস্নেহে বলিয়াছিল,—কত বেদনা বুকে করে এবার এখান থেকে যাচ্ছিস্ বোন, তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বেশ বুঝতে পারছি। আজ যে তুই কিসের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিস তাত আমার জানতে বাকী নেই বোন। আশীর্ব্বাদ করি তুই মনে শান্তি পা।

ইন্দু মনে করিয়াছিল যে চোখের উপর হইতে দূরে সরিয়া গেলেই সে নিষ্কৃতি পাইবে। কিন্তু যখন দূরে সরিয়া আসিয়া দেখিকে পাইল তাহার হৃদয়ের সমস্তই সেই 'পরের বোঝায়' অধিকার করিয়া বসিয়াছে তখন সে তাহার মুক্তির উপায় আর কিছুই দেখিতে পাইল না। এ কয়দিন তাহার কানে কেবলই বাজিতে ছিল, "মা যাব।" কোন কোন সময় সে নিজেই চমকিয়া উঠিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিত। কিন্তু কোথায়ও কিছু না দেখিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজের কাজে মন বসাইতে চেষ্টা করিত।

পূর্ব্বে যতবার এখানে আসিয়াছে, সে সময় কত আনন্দ কত উৎসাহ; আর এবার কি হইল তার! এমন ত তাহার কোন দিন হয় নাই! যেদিন আনন্দের উৎস, সাধনার ধন, নয়নের মাণিক হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছিল সে দিনও ত এমন হয় নাই! পরের ছেলের উপর এ—কি আকর্ষণ তার!

ইন্দুর অবস্থা দেখিয়া মাতা পিতা মনে করিতেন পুত্র শোকে ইন্দুর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাই তাঁহারা সকল সময় তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। একদিন অপরাহ্ণে ইন্দু তাহার কক্ষের জানালা খুলিয়া দিয়া আকাশের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়াছিল, এমন সময় মাতা আসিয়া ডাকিলেন—"ইন্দু!"

"কি মা?"

মাতা আসিয়া তাহার মাথাটী নিজের কোলে টানিয়া লইয়া হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে বলিলেন, "একটু মন স্থির কর বাছা, একেবারেই যে সারা হয়ে গেলি।"

ইন্দু কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া মাতার কোলে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল। মাতা তাহার চুলগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, জগতে কোনটাই অসহ্য নয়

মা, চেষ্টা ক'রলে সবই সহ্য করা যায়। মিছামিছি ভেবে ভেবে শরীর একেবারে মাটি করিস্ না!

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মা, আমার একটি কথা রাখবে?"

"কি মা?"

"একবার সেখানে পাঠিয়ে দেবে?"

বিস্মিত হইয়া মাতা বলিলেন, "মোটে এই দিন সাতেক হ'ল এসেছিস, এরই মধ্যে আবার শ্বশুর বাড়ী যাবি—কারও সঙ্গে ঝগড়া করে আসিস্ নি ত?"

ইন্দু অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "না মা।"

"তা তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে, যাস দিন কয়েক পরে।"

ইহার চারিদিন পরে ইন্দুর ভাই প্রকাশ একখানি চিঠি আনিয়া ইন্দুর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "নে, তোর শ্বশুর বাড়ীর চিঠি।"

চিঠির কথা শুনিয়া ইন্দুর বুকখানি যেন কি এক অজানা আশঙ্কায় দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে কম্পিত হস্তে চিঠিখানি লইয়া পড়িয়াই সেইখানে বসিয়া পড়িল।

প্রকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "ব্যাপার কিরে, বিশুটা—কে?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ইন্দু কাতরস্বরে প্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা, আমাকে আজই সেখানে নিয়ে যাবে?"

কিছুক্ষণ ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রকাশ বলিল, "শ্বশুর বাড়ী যাবি কিরে! বাবা বাড়ীতে নেই, তিনি আসুন, তারপর যাস।"

ইন্দু কাঁদিয়া প্রকাশের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, তুমি এখনি গাড়ী নিয়ে এস। আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

*　　*　　*　　*

রাত বারটার সময় যখন ভাড়াটে গাড়ীখানা ষ্টেশন হইতে ইন্দুকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছাইয়া দিল তখন ইন্দুর মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। সে কম্পিত চরণে উমার গৃহদ্বারে পৌছিয়া শঙ্কাকুল নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "দিদি!"

উমা বিশুর পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় বাতাস দিতেছিল; ইন্দুর সাড়া পাইতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "আয় বোন আয়, মা হয়ে কি ছেলের উপর অভিমান করে যেতে হয়!" বলিয়া উমা ইন্দুর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া রুগ্ন বিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখ্‌ত, ছেলের শরীরে কি কিছু আছে! ধন্যি পাষাণী প্রাণ তোর বাপু!"

ইন্দু কোন কথা না বলিয়া বিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বিশু, বিশু, বাবা আমার!"

ইন্দুকে দেখিয়া বিশুর রোগ ক্লিষ্ট বদনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে শক্ত করিয়া ইন্দুকে জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত অথচ করুণকণ্ঠে ডাকিল "মা!"

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

কল্যাণী কথা কহিল না; কেবল স্বামীর তেজগর্ভ মুখমণ্ডল আকুল নয়নে অবলোকন করিল; এবং মনে মনে বুঝিল যে তাহার চিরারাধ্য স্বামী শুধু পুরুষ নহেন, তিনি মহাপুরুষ।

যদুপতি বলিয়া যাইতে লাগিল, 'এখন শোন কল্যাণু, আমি কি রকম করে সময়ের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই। গুরুচরণ বাবু তীর্থযাত্রা করেছেন বলে, উডবরণ কোম্পানীর সাহেবরাও, তুমি যেন মনে কর না, পাট কিনতে না পেয়ে তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করছেন। ও সাহেব জাতটার স্বভাবই ও রকম নয়। অর্থ ই তাহাদের ধর্ম্ম—অর্থ অন্বেষণই তাদের তীর্থ-যাত্রা। এই অর্থের জন্যই তারা প্রতি বছর বাঙ্গলার চাষাদের কাছে পাট কিনে থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার চাষাদের কাছে যেতে হলে, এ বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ের পথের এক হাঁটু কাদা ভাঙতে হয়। পোষাক আর বুট-পরা পা নিয়ে তাঁরা সে কাদা ভাঙতে পারেন না। তাই তারা আমাদের মত লোকের সাহায্য ল'ন।

কল্যাণী। উড্‌বরণ কোম্পানীর সাহেবরা কি তোমার কাছে এসেছিলেন!

যদুপতি। তারা শুধু আসেন নি; তাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তাও হয়ে গেছে। তারা পাঁচহাজার টাকা বায়না দিয়ে, আমার সঙ্গে একটা লেখাপড়া করতে চান যে, আমি যথা সময়ে তাদের দশহাজার মন পাট দেব; আর তার জন্যে, তাদের কাছ থেকে প্রতি মন দশ টাকা হিসাবে অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা দাম পাব।

কল্যাণী। কিন্তু তোমার ত এখন এক মনও পাট নেই।

যদুপতি। পাট আমার নেই বটে, কিন্তু চাষাদের মাঠে অনেক পাট আছে। সেই পাট পাকলে, আর কাটা হলে, আর তৈরী হ'লে, তারা আমায় দেবে। আমি সেই পাট সাহেবদের দেবো, আর সাহেবদের কাছ থেকে দাম আদায় করে চাষাদের দেব।

কল্যাণী। তাতে আমাদের লাভ কি?

যদুপতি। শোন, এই আষাঢ় মাসটা চাষাদের পক্ষে সব চেয়ে টানাটানির মাস।

কল্যাণী। কেন?

যদুপতি। এই মাসে তাদের হাতে টাকা থাকে না; অথচ খরচ বেশী করতে হয় এই সময়, প্রধানতঃ তাদের চাষের জন্য খরচ করতে হয়; বীজ কিনতে হয়, সার কিনতে হয় কিম্বা মেরামত করতে হয়, কারও কারও গরু কিনতে হয়, গরুকে বেশী খাটাবার জন্য দানা খাওয়াতে হয়, মজুরের মাহিনা দিতে হয়। তাহার উপর, এই সময়, বর্ষার জল নিবারণ করবার জন্যে, তাদের ঘরের চাল মেরামত করতে হয়, কখনও বা নতুন চাল তৈরী করতে হয়; তাতেও খরচ আছে। এই জন্যে তারা এই সময় টাকা খোজে। আমি, আমাদের পাঁচহাজার টাকা তাদের দিয়ে, তাদের কাছ থেকে লেখাপড়া করে নেব যে, তাদের পাট হলে, তারা আমার দরকার মত পাট আগে আমাকে আট টাকা মণ হিসাবে বিক্রী করবে।

কল্যাণী। কেন? তারা দশ টাকা দামের জিনিষ আট টাকায় বিক্রি করবে কেন?

যদুপতি। তাদের এই অভাবের সময় গরজে করবে। আর এই টাকার জন্যে, অন্য লোকের মত, সুদ নেব না শুনলে, তারা আমার কাছে ছুটে আসবে। আজই তারা অনেকেই আসবে, আর লেখাপড়া করে টাকা নিয়ে যাবে; তাই তোমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যাব।

কল্যাণী। কিন্তু এর জন্তে তার ঘরের টাকা বার করতে হ'বে কেন ? তুমি সাহেবদের সঙ্গে লেখাপড়া করে যে পাঁচহাজার টাকা পাবে, তাই চাষাদের দিলেই ত চলবে।

যত্নপতি। সাহেবদের সঙ্গে লেখাপড়া করবার আগেই আমি অর্দ্ধেক চাষার সঙ্গে লেখাপড়া করতে চাই।

কল্যাণী। কেন চাও ?

যত্নপতি। এটা তুমি সহজে বুঝবে না, কল্যাণু। এটা আমার একটা জুয়াচুরি।

কল্যাণী। কি রকম জুয়াচুরি আমাকে বুঝিয়ে দাও।

যত্নপতি। সাহেবদের কাছে যদি আগে টাকা নিই, আর লেখাপড়া করি, তাহ'লে সিরাজগঞ্জের মত ছোট যায়গায় তার কথা সহজেই প্রকাশ হ'য়ে পড়বে ; আর চাষারা এখানকার লোকের কাছে নিশ্চয়ই তার খবর পাবে। এই খবর পেলে, তারা আর দশ টাকা দামের জিনিষ সহজে আট টাকায় দিতে চাবে না। তার আগে, যদি আমি কতকগুলা চাষার সঙ্গে লেখাপড়া করে নিতে পারি, তাহ'লে, পরে সাহেবদের টাকা পেলে, সেই চাষাদের দলিল দেখিয়ে, বাকী চাষাদের সঙ্গে ঐ আট টাকা দরেই সহজে লেখাপড়া করে নিতে পারবো।

যত্নপতির এই জুয়াচুরীর কাহিনীর ভিতর কল্যাণী তাহার অসাধারণ ব্যবসায়-বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে বিহ্বল নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল ; ভাবিল, এই স্বামীই যেন জন্ম জন্ম তাহার প্রাণেশ্বর হয় ; ভগবানের কৃপায় এই স্বামীকেই যেন সে জন্ম জন্ম পূজা করিতে পায়।

তিন মাস মধ্যে যত্নপতি উডবরণ কোম্পানিকে পাট বিক্রয় করিয়া প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা লাভ করিল। লাভ আরও বেশী হইত ; কিন্তু কোম্পানীর সাহেবরা কতক পাট নিকৃষ্ট বলিয়া, তাহার মূল্য কম দিলেন ; এবং কয়েক মণ পাট একবারে তাহাদের ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। তাহা আপাততঃ দোকানে থাকিয়া গেল, এবং ক্রমে দড়ী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় হইতে লাগিল।

তোমরা বলিবে, যে যত্নপতির এই লাভটা সম্পূর্ণ দৈব ব্যাপার ; সকলের পক্ষে এরূপ অসম্ভব। আমরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করি না। আমরা বলি, সকলেই ইচ্ছা এবং পরিশ্রম করিলে এইরূপ লাভবান হইতে পারে। এই লাভটা প্রধানতঃ যত্নপতির পুরুষকার ও পরিশ্রমের পুরস্কার। সে কিছু সুযোগ পাইয়াছিল বটে ; কিন্তু এরূপ সুযোগ সকলের ভাগ্যেই জীবনে বহুবার ঘটিয়া থাকে। কয়জন এরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে ? উপযুক্ত পুরুষকারের অভাবে কেহ হেলায় তাহা ত্যাগ করে, কেহ বা পরিশ্রমের আশঙ্কায় তাহাতে বিমুখ হয়। যত্নপতির পুরুষকার ও উদ্যম দুই ছিল ; তাহার উপর পরিশ্রমের ভয়ে সে ভীত হয় নাই। সে সেই দারুণ বর্ষায় কখন বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কখন অসময়ে আহার করিয়া, কখন অর্দ্ধাহার করিয়া, কখন বা অনশনে বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম সমূহের দীর্ঘ এবং আবদ্ধ কর্দ্দমময় পথে, পাদুকাহীন পদে ও ছত্রহীন মস্তকে অক্লান্ত-ভাবে বিচরণ করিতে পারিয়াছিল। সে ভাদ্রের প্রচণ্ড ও রোগোৎপাদক রৌদ্রে, যানবিহীন রাস্তায়, ছায়াহীন মাঠে এবং পাট পরিষ্কারের দুর্গন্ধময় পল্বলে পল্বলে কখন দিবাভাগে, কখন রাত্রে নিদ্রাহীন চক্ষে শয্যাশ্রয়হীন স্থানে, ঘুরিতে পারিয়াছিল, তবে সে রুগ্ন, শ্রমকাতর কৃষককুলের নিকট যথা সময় পাট সংগ্রহ করিয়া উডবরণ কোম্পানীর সাহেবদিগকে সর্ত্ত মত বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছিল। তিনমাস কাল, সে কখন সুস্থির হইয়া পেট পূরিয়া খাইতে পায় নাই, শয্যায় কখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায় না। কখন প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে একদণ্ডের জন্য আদর করিতে পারে নাই। তাই ভগবান তাহার কষ্টকর পরিশ্রমের পুরস্কার দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশটা বাণিজ্য প্রধান দেশ নয়, শিল্পপ্রধান দেশও নয় ; এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বাণিজ্য ও শিল্প সহরে বসিয়া হয় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে না যাইলে কৃষিকর্ম্মের উপায় নাই। তোমরা সহরের চাকুরী ও বিলাস ভুলিয়া গিয়া পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া পরিশ্রম কর, ভগবান তোমাদিগকেও, যত্নপতির ন্যায় পুরস্কৃত করিবেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অখিলবাবুর পীড়া।

অখিলবাবুর বরিশাল সহরটি বেশ ভাল লাগিয়াছিল ;— সহরটি বাঙ্গলার অন্য অন্য সহরের তুলনায় অনেক পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন ; বৃহৎ নদীর ধারে অবস্থিত বলিয়া দেখিতেও সুন্দর এবং সেখানে বালাম চাল, মৎস্য, মশুর প্রভৃতি বাঙ্গালীর কতকগুলি খাদ্য দ্রব্য সস্তায় পাওয়া যায়। তাই অখিলবাবু বরিশালে একটী ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া ছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, পেন্সেন লইয়া তিনি কিছু দিন নিশ্চিন্ত হইয়া সেই বাটীতে বাস করিবেন ; এবং তাহার অবর্ত্তমানে তাহার প্রিয়তমা পত্নী আশ্রয়হীনা হইবেন না।

কিন্তু এই বাটী লইয়া তিনি এমন একটী জটিল মকর্দ্দমায় বিজড়িত হইয়া পড়িলেন যে তিনি প্রথম মুন্সেফ হইয়াও তাহা হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে বহুকষ্টে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু ভাবনায় চিন্তায় অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি পীড়িত হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বরিশালে সেই সময় নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক য্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ সহজে আরোগ্য হইল না।

আশ্বিন মাসের প্রথমে পাটের ব্যবসায়ে যদুপতি প্রচুর লাভ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বাটীতে বসিয়া সেই লাভ উপভোগ করে নাই। আরও লাভের প্রত্যাশায় সে বাখরগঞ্জ, বরিশাল কলসকাটী, ঝালকাটী প্রভৃতি স্থানে সস্তাদরে বেশী পরিমাণে নারিকেল সংগ্রহ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বরিশালে আগমন করিয়া সে আগে শ্বশুরালয়ে শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। দেখিল, তিনি রোগশয্যায় শুইয়া জরভোগ করিতেছেন। দেখিল, পতিব্রতা প্রমদা, তাহার এযোত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাঁহার সীমন্তের সিন্দুর উজ্জ্বল করিয়া, তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার পল্লবৎ স্নিগ্ধ হস্ত বুলাইয়া দিতেছেন এবং আপন সেবারত অঙ্গুলির শোভা নিবিষ্ট নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাহাকে নিকটে দেখিয়া অখিলবাবু কৃতজ্ঞতা পূর্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার সেই রুগ্ন অবস্থা দেখিয়া যদুপতি আপন হৃদয়ে বিলক্ষণ ব্যথা অনুভব করিল। যদুপতি ঈশানীকে দেখিতে না পাইয়া, অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, গত শ্রাবণ মাসে তাহাকে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে লইয়া গিয়াছে ; এবং তাহাকে তাঁহারা অগ্রাহায়ণ মাসের আগে পাঠাইবেন না। সে ডাক্তারের কাছে গোপন অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, শ্বশুর মহাশয়ের দূষিত ম্যালেরিয়া হইয়াছে ; তাহা আরোগ্য হইবার আশা অতি কম। এই সংবাদ শুনিয়া সে অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িল। ভাবিল, এসময় তাঁহার কন্যাদের ভিতর অন্ততঃ এক জনকে তাহার কাছে রাখা দরকার ; —একা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দ্বারা ইঁহার সেবাশুশ্রূষা সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে না।

যদুপতির নারিকেল ক্রয় কার্য্য তখন শেষ হইয়াছিল। সে সত্বর সিরাজগঞ্জে ফিরিয়া আসিল ; এবং কল্যাণীকে সংবাদ দিল ; 'তোমার বাবার অসুখ দেখে এসেছি। অসুখ বেশী কিছু নয় ; তোমার ভাববার কিছু নেই। ডাক্তার দেখছেন ; তোমার মা তাঁর সেবা করছেন ; কিন্তু তাঁর সাহায্য করবার জন্যে, আরও একজন আত্মীয় লোকের দরকার। ঈশানী শ্বশুর বাড়ী গেছে, তাঁরা এখন তাকে পাঠাবেন না। তুমি কি বল ?'

কল্যাণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সজল নয়নে কহিল, 'তুমি আমাকে এখনই বরিশালে রেখে এস।'

যদুপতি বলিল, 'কিন্তু তোমার মা, তোমার যাবার কথা বলে দেন নি।'

কল্যাণী বলিল, 'তা' হ'ক। মার কি এখন মাথার ঠিক আছে ? আমি কাল সকালের ষ্টীমারেই যাব।

যদুপতি বলিল ; 'আমি ত এখন তোমায় নিয়ে যেতে পারব না। তোমায় আর কারও সঙ্গে যেতে হবে।

কল্যাণী বলিল, 'না, আমি আর কারও সঙ্গে যেতে পারব না। তোমারই যেতে হবে।'

যদুপতি বলিল, 'এখন আমি এখান থেকে গেলে, আমি যে বিশ হাজার টাকার নারিকেল কিনে চালান দিয়েছি তা বুঝে নেওয়া হবে না। তাহলে আমাদের বড় লোকসান হবে।'

কল্যাণী কহিল, 'তা হ'ক। বাপের চেয়ে টাকা বড় নয়। তুমি কেন আজই গমস্তাকে সব ভার দিয়ে, কাল সকালের ষ্টীমারে আমাকে নিয়ে চল না।

যদুপতি তাহার সেই পিতৃভক্তিময়ী পত্নীর দিকে মুগ্ধ নেত্রে

চাহিয়া মনে মনে ভাবিল, ভগবানের কৃপায় সে কি কখনও এই পিতৃভক্তিময়ীর গর্ভে একটি পুত্র লাভ করিতে পারিবে না; এবং সেই পুত্র ইহার মত পিতৃভক্ত হইবে না? মুখে বলিল, 'তুমি অত উতলা হয়ো না। আমি আজ আমার সমস্ত কাজ গমস্তাকে বুঝিয়ে দিয়ে, আর রংপুরের দোকানদারদের ক'খানা পত্র লিখে, কালই তোমাকে নিয়ে বরিশাল রওনা হ'ব। কিন্তু আমি সেখানে থাকতে পারব না। তোমাক সেখানে পৌছে দিয়ে আমি চলে আসব; আবার দশ বার দিন পরে সেখানে যাব।'

পরদিন কাঁদিতে কাঁদিতে কল্যাণী স্বামীর সহিত বরিশাল যাত্রা করিল। ষ্টীমার পূর্ব্ববর্ণিত পথে চলিয়া পরদিন সন্ধ্যার সময়, তাহাদিগকে বরিশালের ঘাটে পৌছাইয়া দিল। কল্যাণী অতি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্বামীর অনুগমন করিয়া, অল্প পথ অতিক্রম করিয়া পিত্রালয়ে পৌছিল।

কল্যাণী প্রথমেই পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া যাইলেও সে কক্ষে সন্ধ্যাদীপ জলে নাই। বাতায়ন পথে যে অল্প বাহিরের আলোক আসিতেছিল তাহাতে সে দেখিল যে, কক্ষে অপর কোন ব্যক্তি উপস্থিত নাই; কেবল তাহার পিতা রোগশয্যায় একাকী শুইয়া কাতরোক্তি করিতেছেন। সেই অন্ধকারে সজল নয়নে কল্যাণী পিতরে পদতলে উপবেশন করিল।

অখিলবাবু মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে?'

কল্যাণী কহিল, 'বাবা, আমি;—আমি কল্যাণী।'

অখিলবাবু কহিলেন, আমি এই অন্ধকারে তোমায় দেখতে পাচ্ছি নে। তাহ'লে তুমি এসেছ। তবে আমি যে শুনলাম তুমি আসতে পারবে না বলেছ।'

কল্যাণী কহিল, 'আমি ত, বাবা, সে কথা বলিনি। আমি খবর পেয়েই এসেছি।'

অখিলবাবু বলিলেন, 'তবে এরা তোমায় খবর দিয়েছিল?'

কল্যাণী কহিল, 'কই, আমাকে ত মা কোন পত্র লেখেন নি; আপনার অসুখের খবরও দেন নি।'

অখিলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি আমার অসুখের খবর পেলে কি করে?'

কল্যাণী কহিল, 'ওঁরা এখানে নারিকেল কিনতে এসেছিলেন। আপনাকে দেখে, ফেরত গিয়ে আমাকে আপনার অসুখের খবর দিয়েছিলেন।'

অখিলবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, 'ওঃ।' এবং তাহার পরই নীরবে পার্শ্ব ফিরিয়া শুইলেন।

কল্যাণী দীপের সন্ধানে গেল। দেখিল, পার্শ্বের এক কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। সে দীপের সন্ধানে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাতার সন্ধান পাইল। দেখিল, তিনি বাক্স খুলিয়া উজ্জ্বল আলোকে কি একটা কাগজ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন।

কক্ষমধ্যে অন্য লোক সমাগত হইয়াছে বুঝিয়া, বুদ্ধিমতী প্রমদা কিছু বিচলিত হইয়া কাগজখানি বাক্স মধ্যে রাখিয়া বাক্স সত্বর বন্ধ করিয়া ফেলিলেন; এবং মুখ তুলিয়া কিছু উচ্চঃস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'ঘরে কে রে?'

কল্যাণী বলিল, 'আমি।'

প্রমদা আলোক একটু উচ্চে তুলিয়া কল্যাণীকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'ওমা! তুই? তুই কোত্থেকে এলি? একটা খবর দিয়ে আসতে হয় না? আমি হঠাৎ তোর ওই কাল চেহারা দেখে কি ভয়ই পেয়েছিলাম।'

বিমাতার হিংসা প্রসূত মন্তব্য গ্রাহ্য না করিয়া, কল্যাণী স্থিরভাবে কহিল, 'আমি বাবার অসুখ শুনে এখনই এসেছি।'

প্রমদা জিজ্ঞাসা করিল, 'জামাই বুঝি দেখে গিয়ে তাড়াতাড়ি তোকে খবর দিয়েছিল? মিছিমিছি এ খবর দেওয়া কেন বাপু? কি এমন অসুখ, যে সাতটা সংসার এক যায়গায় করতে হবে? এতদিন বেশ অফিসে যাচ্ছিল, এই পূজার ছুটিটা হ'য়ে পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে আছে; আর বলে রোজ সন্ধ্যার সময় তার জ্বর আসে। আমি কিন্তু তার গায়ে হাত দিয়ে একদিনও একটু গরম টের পাই নি। আর রোজ রোজ অমন জ্বর হ'লে, মানুষ কি দুবেলা অমন এক বাটী করে সাবু খেতে পারে? আবার তার উপর এই মাগ্‌গির বেদানা! তাও রোজ একটা করে খাওয়া চাই।'

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কোন ডাক্তার দেখছেন?'

প্রমদা কহিল, 'গোড়া থেকে ত সেই হাঁসপাতালের বড় ডাক্তার নরেনবাবু দেখছেন। আগে শুনেছিলাম,

সরকারী ডাক্তার সরকারী কর্ম্মচারীদের চিকিৎসা করলে ভিজিট নেন না। ইনি কিন্তু রোজ দু'টাকা করে ভিজিট নেন, আর দামী দামী ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছেন। সেই তত ওষুধ খেয়েও বলছে যে জ্বর ছাড়চে না।—জ্বর থাকলে ত জ্বর ছাড়বে? আমি বলি কি, ও ডাক্তার টাক্তার সব বন্ধ করে দিয়ে, রোজ রোজ একটু করে হরি তলার মাটী ভক্তি করে খেতে পারলে, ঐ অসুখের খেয়ালটা সেরে যাবে।—হরি গোবর্দ্ধন পাহাড়টা কড়ে আঙ্গুলের ডগা করে ধরেছিলেন,—আমাদের বাড়ীতে ছবি আছে, তুই দেখিস নি,—তিনি কি আর এই সামান্য অসুখটুকু সারিয়ে দিতে পারবেন না?'

কল্যাণী মাতার দীর্ঘ বাক্য-বিন্যাসের কোনও উত্তর করিল না। পিতার আরোগ্যের ভাবনায় তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। সে সত্বর পিতার কক্ষে যাইবার জন্য চঞ্চল পদে দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, 'মা, তোমার এই আলোটা আমি কি বাবার ঘরে নিয়ে যাব?'

প্রমদা তাড়াতাড়ি বলিল, 'না, না,—আমি বাছা অন্ধকারে থাকতে পারি নে। তুই খোঁজ করে একটা প্রদীপ জ্বেলে ওঘরে নিয়ে যা।' আবার বাপের সঙ্গে দেখা শুনা করে প্রদীপটা নিভিয়ে দিস্; আমি মিছে তেল পোড়া পছন্দ করি নে।'

কল্যাণী আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, অন্য প্রদীপ সংগ্রহ করিয়া পিতার কক্ষে গমন করিল এবং পিতার শুশ্রূষায় আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিল। মাতার সেই মূল্যবান বেদানা লইয়া, নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া, দানার রস করিয়া কাঁচের গ্নাসে পিতাকে যত্নের সহিত খাওয়াইল; সময় মত ঔষধ দিল; উত্তপ্ত মস্তকে স্নিগ্ধ হস্ত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইল। পিতা নিদ্রিত হইলে, সে কেবল একবার উঠিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে গেল।

যদুপতি মুখ হাত ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কল্যাণী আহার সামগ্রী লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সে খাইতে বসিল।

তখন কল্যাণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাল সকালেই যাবে মনে করেছ?'

যদুপতি আদরে কহিল, 'হঁা, আমাকে ত কালকেই যেতে হবে কল্যাণু। আর দশ বার দিন পরেই নারিকেলগুলার ব্যবস্থা করে তোমার কাছে ফিরে আসব।'

কল্যাণী মধুর বচনে স্বামীকে উপদেশ দিল, 'কিন্তু যতদিন সেখানে থাকবে, রোজ আমাকে পত্র লিখো; লক্ষ্মীটি যেন ভুলে যেও না। আর নিজের শরীরটার দিকে একটু নজর রেখ; দেখ যেন অসময়ে নেয়ে, অবেলায় খেয়ে অসুখ করে ফেল না। না হয় বামুন পিসীদের একটু বেশী করে সিদে পাঠিয়ে দিয়ে, তাদের বাড়ীতেই সময় মত দু'টী রান্না ভাত খেও।'

যদুপতি আশ্বাস দিয়া বলিল, 'আমার জন্যে তোমার একটুও ভাবতে হবে না। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থেক; তোমার অসুখ করলে আমার কিছুই ভাল লাগবে না।'

কল্যাণী কহিল, 'আর একটা কথা তোমায় বলছি। আমি কিছু টাকা সঙ্গে করে এনেছি; আর তুমি যখন আবার আসবে, তখন আমার জন্যে আরও কিছু টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এস। এখানে আমার কিছু খরচ করা দরকার হ'বে।'

যদুপতি টাকা আনিতে স্বীকৃত হইল। পরে আহার শেষ করিয়া, পত্নীর প্রদর্শিত কক্ষে তাহারই রচিত শয্যায় শয়ন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

কল্যাণী স্বামীর ভুক্তাবশেষ অমৃতবৎ আহার করিয়া পিতার শুশ্রূষার জন্য আবার তাঁহার কক্ষে ফিরিয়া গেল।

রাত্র দেড় প্রহরের সময় পতিব্রতা প্রমদা আপনার সুদীর্ঘ আহার সমাপনান্তে কিমাম-মিশ্রিত তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে রক্তাধরে এবং আপন ললাটের সিন্দুর শোভা আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, এবং স্বামীর পথ্য জন্য সাবুর পাত্র হস্তে লইয়া, মন্থর গমনে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং কল্যাণীকে বলিলেন, 'আমি এখন এখানে থাকব, তোর আর এখানে থাকবার দরকার নেই। তুই খেয়ে দেয়ে শুগে যা।'

কল্যাণীর আহারের আর আবশ্যক ছিল না; সে নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে যাইয়া নীরবে শয়ন করিল।

—————

(ক্রমশঃ)

রঙ্গ-কথা

[অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

ষ্টার থিয়েটারে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট একদিন কয়েক শিশি তৈলের নমুনা লইয়া জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমি এই খাঁটি তৈল বিক্রয় করিতেছি, কতকগুলা বাজে জিনিষ মিশাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বসি নাই। আপনাকে একখানি সার্টিফিকেট দিতে হইবে। তৈলটী আপনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" অমৃতবাবু বলিলেন,—"মশায়, আমি থিয়েটার করি, থিয়েটারের বই লিখি ;—তেলের কারবার তো কখনো করি নি ; খাঁটি কি অখাঁটি তৈল—কেমন করে বুঝবো বলুন ? আপনি হলা কলুর দোকানে যান,—তার সার্টিফিকেট পেলে আপনার কাজ হবে।"

আর এক সময়ে জনৈক গ্রন্থকার একখানি নাটক লিখিয়া আনিয়া তাঁহাকে বলেন,—"মহাশয়, আমার এই নাটকখানি আপনার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য এনেছি ; একবার পড়িয়া দেখুন। নাটকখানি পাঠ করে হাইকোর্টের জজ * * * মহাশয় পরম প্রীত হ'য়ে বল্লেন,—"তোমার নাটকখানি থিয়েটারে অভিনয়ের বড়ই উপযোগী হয়েছে।" অমৃতবাবু গ্রন্থকারকে বলিলেন,—"আপনি কি আইনের নাটক লিখেছেন ?" গ্রন্থকার বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"আইনের নাটক কি মশায় ?—আমার এ রোম্যাণ্টিক ড্রামা।" অমৃতবাবু বলিলেন,—"তিনি আইনে সুপণ্ডিত, এ কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে, কিন্তু আপনার নাটকখানি অভিনয়ের পক্ষে যে বিশেষ উপযোগী হয়েছে, এটা কেমন ক'রে তিনি বুঝলেন ?" এই বলিয়া তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। আমার স্ত্রী এক তাল গোবর নিয়ে যেমন ঘুঁটেটি দেবে, মহারাণী স্বর্ণময়ী কি তেমনটী পারবে ? সেই ঘুঁটে দেওয়ার ট্যাক্‌টিক্‌স (tactics) আমার পরিবারের মতন যারা—তারা বুঝবে। সেইরকম সমালোচকও যে, যে বিদ্যায় পারদর্শী, সে সেই বিষয়েই করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের এমনি দুর্ভাগ্য—ডাক্তার আইনের বইএর চর্চ্চা করে থাকেন, উকীল ইঞ্জিনিয়ারিং বইএর অনুশীলন করেন, আবার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারি বইএর সার্টিফিকেট দেবেন।"

(২)

বিডন ষ্ট্রীটস্থ ষ্টার থিয়েটারে (বর্ত্তমান মনোমোহন নাট্যমন্দিরে) একদিন গিরিশচন্দ্রের "নিমাই সন্ন্যাস" নাটক অভিনয় হইতেছে। ঢাকা নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক সম্মুখের আসনে বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ সুরাপান করিয়া, একটু বেশী মাত্রায় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এবং মধ্যে মধ্যে ভক্তিসহ হরিধ্বনি করিতেছিলেন।

সার্ব্বভৌমের সহিত চৈতন্যদেবের জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া যে সময়ে তর্কাভিনয় চলিতেছিল, সে সময়ে কিন্তু উক্ত বাবুটীর এমন প্রবল ভাব আসিয়া পড়িল, যে তিনি আর আসনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না,—দাঁড়াইয়া উঠিয়া রঙ্গমঞ্চের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি জ্ঞান বিচার করবার চাই—আমি জ্ঞান বিচার করবার চাই।" পার্শ্বস্থ দর্শকগণ ভক্তটীর প্রাণে ভাবের বন্যা বহিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বহু কষ্টে চিফগার্ড তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

(৩)

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সুবিখ্যাত নাট্যরথী অমেরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ষ্টার থিয়েটার লিজ লইয়া অভিনয় করিতেছিলেন। সে সময়ে একদিন তিনি তাঁহার থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেতা হাস্যার্ণব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে রহস্য করিয়া বলেন,—"তুমি বুড়া হইয়া পড়িতেছ, আর তোমার দ্বারা কাজ চলে না।" অক্ষয়বাবু করুণ স্বরে বলিলেন,—"ক্লাসিক থিয়েটার হ'তে মশায়ের কাছে বাঁধা থেকে সমস্ত যৌবনটা দিয়েছি ; এখন এই বুড়ো বয়সে বিদায় দিলে—যাই কোথায় বলুন ?" অক্ষয়বাবুর এই ব্যর্থ উত্তরে সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(২১)

"মা শীগ্‌গীর এস, নতুন বৌ এসেছে; আমার বৌদি সছে।"

বৃহৎ থামযুক্ত প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী খামিতেই একটি বার তের বছরের সুবেশা সুন্দরী বালিকা উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"মা শীগ্‌গীর এস, নতুন বৌ এসেছে; আমার বৌদি এসেছে।"

বালিকার ডাকার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চনিনাদে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। নানা রকমের, নানা বেশের কয়েকটি রমণী দ্বার পথে আগাইয়া আমার হাত ধরিয়া ভিতরের "হলে" লইয়া গেলেন। সেখানে পাটার উপর বরণের নানাবিধ দ্রব্য সজ্জিত ছিল। সে 'হল' গৃহটি রমণীর রূপে, বসনের ঔজ্জ্বল্যতায় ও হীরা মাণিকের আলোকচ্ছটায় ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল। আমি ঘোমটার ফাঁকে বিস্মিত নেত্রে সহরের ঐশ্বর্য্য, বিলাসের আধিক্য দেখিতে লাগিলাম। আমি পল্লীবাসিনী, এ সব বিদ্যুৎ বরণীর বিদ্যুৎ কটাক্ষ,ও শত বিদ্যুৎ ঝলসিত বসন ভূষণের সহিত জীবনে পরিচয় হয় নাই। আজ ইহাদের পাশে দাঁড়াইয়া, ইহাদের বিদ্রূপপূর্ণ মৃদু মন্দ হাস্যে পরস্পরের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ে লজ্জায় সঙ্কোচে আমি যেন মরমে মরিয়া গেলাম। নিজের রূপহীনতা আজ নিজের বক্ষে আরও বেশী করিয়া বাজিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বরণ সমাধা হইল। আমার ভূষণ বিহীন দেহ অলঙ্কারে ভরিয়া উঠিল। গাঁটছড়ার চাদরখানি তিনি আমার গায়ে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল পর একটি গৌরবর্ণা বর্ষীয়সী বিধবা আমার ঘোমটা তুলিয়া, মুখখানি এদিক ওদিক ঘুরাইয়া, ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। অনুমানে বুঝিলাম ইনিই আমার শ্বশ্রুমাতা। আমার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই ইঁহার ক্ষোভের নিঃশ্বাস পড়িল, ভাবিয়া আমি ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। মনে মনে বলিলাম "ভগবান, এতই দিলে যদি তবে আর একটু দিলে—তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার শূন্য হইত না। জন্ম অন্ধকে স্বর্গের আলো প্রদান করিলে, ভিখারীকে রাজসিংহাসনে বসাইলে; কিন্তু আমাকে তাহার যোগ্য করিলে না কেন প্রভু?" রূপ—রূপ, এতদিন তো তাহার মূল্য বুঝি নাই। বুঝিতে চেষ্টাও করি নাই। ধারণা ছিল রূপ বাহিরের জিনিস, উহার সহিত অন্তরের কোনই যোগ নাই, কিন্তু আজ উপলব্ধি করিতেছি চোখের তৃপ্তি না হইলে অন্তর তৃপ্ত হইতে পারে না। চোখকে উপবাসী রাখিয়া, মনকে পিপাসাতুর দেখিয়া, অন্তরের তৃপ্তি কোথা হইতে আসিবে?

মা বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর মুখে ডাকিলেন—"ঠাকুর-পো।"

প্রশান্ত স্মিত বদনে কাকাবাবু মেয়েদের ভিড়ের পাশ দিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় ডাকচ বৌঠান্? বৌ তোমার পছন্দ হয়েছে তো? রংটা একটু কালো হলেও এমন লক্ষ্মীবৌ কারুর ঘরেই আসে নি। আমার হারা মাকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি। কিগো বাছারা, সব চুপ ক'রে রয়েছ যে; বৌ তোমাদের মনের মতন হয়েছে?"

সমবেত রমণীকণ্ঠে অবজ্ঞার মৃদুহাস্যধ্বনি পরিস্ফুট হইল। কাকাবাবুর কথায় কেহ উত্তর করিলেন না।

মা সবিষাদে বলিলেন—"বৌয়ের কথা জিজ্ঞাসা করচ ঠাকুর পো; মণিকে তুমি একি এনে দিলে? তোমার এত আদরের, এত ভালবাসার মণি—কি দোষে তাকে এত বড়

শাস্তি দিলে? আমার পাঁচ নয়, দশ নয়, এক ছেলে— তার কি এই বৌ! আমার বিশ্বাস ছিল তুমি যা মণিকে এনে দেবে—তা মন্দ হবে না। সেই বিশ্বাসে গরীব ঘরের কথা শুনেও আমি আপত্তি করিনি। যে মণি সুন্দর এত ভালবাসে বাড়ীর কালো কুৎসিৎ ঝি চাকর পর্য্যন্ত সইতে পারে না, সেই মণির এই বৌ!"

একটি প্রৌঢ়া রমণী সাজ সজ্জায় তরুণীকেও হারাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি মা'র পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া হাত নাড়িয়া', মুখ ঘুরাইয়া ঝঙ্কার দিলেন—"কেবল রূপেই নয়,—গুণেও নতুন বৌ মণির মাথা ছাড়িয়ে উঠবার যো হয়েছে দাদা! মাগো, এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড জন্মে দেখিনি; বৌ নয় তো, এ যেন মণির ঠাকুর মা! এর বয়স বোধ হয় কুড়ি বছরের কম নয়।"

প্রৌঢ়ার অন্তরাল হইতে তাঁহার পুত্রবধূ চাপাগলায় টিপিয়া টিপিয়া বলিল—"মার যে কথা,—কুড়ি বছর তো আমাদেরি বয়স হোল; একে দেখে মনে হচ্ছে এ আমাদের ঢের বড়। কেমন পাকা-পাকা কাঠ-কাঠ গড়ন; বয়েস কম হলে কি এমনি হয়? আমার মেজ দিদির ছোট জাটিও কালো; কিন্তু বেশ ছিরিখানি, যেন ননী দিয়ে গড়া।"

একটি সুন্দরী তরুণী নাসাকুঞ্চিত করিয়া, সুবাসিত গোলাপী রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে সবিদ্রূপ হাস্যে কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কাকাবাবু, নতুন বৌয়ের বাবা আপনাকে কি দেখিয়ে ভুলিয়েছিল? সে বুঝি যাদু বিদ্যা জানে, নইলে হাজার হাজার সুন্দরী মেয়ে রেখে এমন 'বনে থেকে বেরুলো টিয়ে, সোণার মুকুট মাথায় দিয়ে' বৌ আপনার নজরে পড়বে কেন?"

এই মহিলা-যুথের মধ্যে আসিয়া গোবেচারা কাকাবাবু এতক্ষণ বিমূঢ়ের মত নত বদনে, নত শিরে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। এখন মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ছেলেকে কি কেউ ভুলোতে পারে দীপ্তি? মা'র স্নেহে, মা'র মায়ায় সন্তান নিজেই যে ভুলে যায়। যাদু বিদ্যার কথা বলছ—মায়ের ছেলেকে কি মানুষ যাদু কোরতে পারে? ভগবানই যে তাকে যাদু করে দেন। তোমরা সুন্দরী কা'কে বল দীপ্তি? যার স্বভাব সুন্দর, সুন্দর অন্তঃকরণ, জীবে দয়া, কর্ত্তব্য, নিষ্ঠা—সেই যে সকল সুন্দরের শ্রেষ্ঠ সুন্দর মা।"

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করিয়া, মা'র মুখের পানে চোখ তুলিয়া, হাসি মুখে বলিতে লাগিলেন "বৌঠা'ন, আজ শুভদিনে, শুভ মুহূর্ত্তে তুমি ক্ষুন্ন হ'য়ো না। তোমার অসন্তোষে মণির অকল্যাণ হ'বে। তুমি প্রাণ খুলে এদের আশীর্ব্বাদ কর। মণির কাকা মণিকে কখখনো মন্দ জিনিস দেয় না ব'লে তোমার বিশ্বাস আছে। এক্ষেত্রেও সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম হয় নি। আমি মণিকে কাঁচ এনে দিই নাই, কোহিনুর এনে দিয়েছি বৌঠা'ন। কাঁচের চাকচিক্যে বালক ভুলতে পারে, কিন্তু তুমি আমি ভুললে সেটা মানাবে কেন? যা' এনে দিয়েছি—তার মূল্য দিনে দিনে তুমি বুঝতে পারবে। ছেলে মিষ্টি খেতে ভাল বাসলেই মা'র কি উচিত তাকে অপরিষ্যাপ্ত মিষ্টি খাওয়ানো? মিষ্টিতে যে কৃমির ভয় থাকে।"

"ভয় থাক্লেও লোকে মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে না ঠাকুর পো। আগে চোখ না ভুললে মন যে ভুলতে চায় না। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার বুঝবার সাধ্য নেই— মার বুকে ছেলের ভবিষ্যতের কত কামনা, কত আশা সাজানো থাকে। আশাভঙ্গের দুঃখ, সে তুমি বুঝবে না ঠাকুর পো।"

"সত্যি কাকাবাবু, জ্যেঠাই মার, আর মণিদা'র দুরবস্থা মনে কোরতে আমারি চোখে জল আসচে। এই বৌ নিয়ে চিরজীবন এঁদের কি করে কাটবে? আপনি বৌকে গুণে কোহিনুর বলছেন,—পাড়াগেঁয়ে মেয়ের আবার গুণ কি? বিশেষতঃ ইনি যে ঘর থেকে এসেছেন, সেখানে কোন ভাল শিক্ষা যে হয়েছে তাতো মনে হচ্ছে না। ভাল গান বাজনা জানা, খুব লেখাপড়া শেখা মেয়ে হলে,—অনেক সময় রূপের অভাব চাপা পড়ে যায় বটে, কিন্তু এর মধ্যে তার কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না।" দীপ্তি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া তাহার বাম স্কন্ধের নীচে অঞ্চল বদ্ধ ব্রুচটি ঠিক আছে কিনা তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কাকাবাবু স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তোমার এ আশঙ্কা অমূলক দীপ্তি, মণীশের শ্বশুর বাড়ীর যে শিশুর

আমি পরিচয় পেয়েছি, সারা দেশটার প্রতি ঘরে ঘরে যদি তেমন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে,—তা হ'লে বাংলা আজ সোণার বাংলা হ'য়ে যাবে। তোমরা এতগুলি মেয়ে এখানে আছ, আমি স্পর্দ্ধা করে বলতে পারি,—আমার এ নতুন মা'টির মত তোমাদের কারুর এমন শিক্ষা হয় নি; কখনো হবেও না। শিক্ষায় এ তোমাদের বড়, এক রং ছাড়া রূপেও এ তোমাদের কারুর চেয়ে খাটো নয় দীপ্তি। এমন চোখ, এমন নাক, এমন জোড়াভ্রু ক'জনার আছে? এমন চুলের বাহারই বা কার?"

বলিতে বলিতে কাকাবাবু আমার মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া, এলো চুলের গোঁপাটি খুলিয়া দিলেন। আমার আজানু লম্বিত চুলের রাশী পৃষ্ঠে, বক্ষে, বাহুতে ছড়াইয়া পড়িল। আমি ললাটে-লতিয়া-পড়া চুলের ফাঁক দিয়া দেখিলাম রূপ গর্ব্বিতা রমণীগণের গর্ব্বোজ্জ্বল মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। দীপ্তি বিবর্ণ মুখে ঘাড় নীচু করিয়া আঙ্গুলের হীরক অঙ্গুরীটি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

কাকাবাবুর পক্ষপাতিত্বে আমার হৃদয়টি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেও লজ্জায় আমি সঙ্কুচিত হইয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিলাম। এতগুলি রূপসীর সহিত তুলনায় আমি যেন মরমে মরিয়া গেলাম। আমার যেন কত বড় অপরাধের সূচনা হইল, আমি কাহারও দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিলাম না।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবেই কাটিল। এতগুলি মুখর রমণী কণ্ঠ নিঃশব্দে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ছাড়া একটিও বাক্যালাপ করিল না।

খানিকক্ষণ পর কাকাবাবু প্রস্থানোদ্যত হইলেন; এমন সময় একটি যুবতী কাকাবাবুকে ডাকিয়া বলিল "জ্যেঠামশায়, আপনার মতে মণীশের বৌ যেমন রূপে গুণে অতুল্যা, নামেও সে সকলকে ছাড়িয়ে উঠবে নাকি! ওর বাপ মা কালো মেয়ের কনকলতা নাম দিয়েছিলেন, আপনার বিধানে ও এবার কোহিনুর হয়ে গেল। আমরা কনক বৌয়ের বদলে ওকে কোহিনুর বৌ বলে ডাকবো, না আর কিছু বলে ডাকবো? কিসে আবার বৌয়ের অসম্মান হবে, তাই জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি।"

"জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছ মা, তা—বেশ ভাল। আমার নতুন মা কনকের চেয়ে, কোহিনুরের চেয়ে বড়, শস্য শ্যামলা পল্লীদেশ থেকে আমার মণীশের শ্যামা এনে দিয়েছি। ও আমার শ্যামা মা, ওকে তোমরা শ্যামা বলে ডেকো। এখন তো আপত্তির কারণ নেই?" বলিয়া কাকাবাবু আমার পাশে আসিয়া কহিলেন, "তোমাকে যে কত ত্যাগ করে এখানে আসতে হয়েছে, এঁরা সেটা ভুলে গেছেন। তাই কেবল সমালোচনাই হচ্ছে। তোমার বাবা মাকে তুমি ছেড়ে এসেছ, কিন্তু তোমার কাকাবাবু তোমার কাছেই আছে। চল মা, তুমি আমার ঘরে চল।"

(ক্রমশঃ)

পূর্ণ এক-বৎসরাধিক কাল শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার "সচিত্র শিশিরে"র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়া গ্রাহকবর্গের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। উপস্থিত তিনি অবসর গ্রহণ করায়—আমিই বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে "সচিত্র শিশিরের" সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিলাম। সচিত্র শিশিরের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ এতদিন আমাকে যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, আশা করি, ভবিষ্যতেও সেইরূপ দেখিবেন—কোনদিনই তাহাদের কৃপা দৃষ্টি হইতে আমি বঞ্চিত হইব না।

বিনীত—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

মান-ভঞ্জন

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]　　৯ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১।　　[১৫শ সপ্তাহ

নৃত্যকলার শ্লীলতা বিচার

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

মানব প্রকৃতিতে যে একটী নৃত্য প্রবণতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই দেখা যায় অসভ্য মানুষও নৃত্য অত্যন্ত ভালবাসে। পৃথিবীর যাবতীয় অসভ্য অধিবাসীরাই নৃত্য করিয়া থাকে। আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া অনার্য্যদের মধ্যে এই নৃত্যচর্চ্চা দেখিতে পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন এই ঐতিহাসিকতার একটী প্রমাণ মহেশ্বর আমাদের নটগুরু।

কিন্তু অসভ্য সমাজে নৃত্য জিনিসটী একটী বিশেষ বিদ্যা রূপে বিরাজ করে না এবং তাহা কলারূপেও সেখানে বিকশিত হয় নাই। সভ্য সমাজ ইহাকে কলা হিসাবে চর্চ্চা করিয়া একটী সুকুমার শিল্পে পরিণত করিয়াছে।

সুতরাং নৃত্যকলা স্বতঃই শ্লীলতা বিরুদ্ধ ছিল না, আনুসঙ্গিক অবস্থার জন্যই ইহা শ্লীলতা বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অসভ্য সমাজে আমরা যে অবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাই তখন ইহা একপ্রকার তাণ্ডব মাত্র, লাস্য নৃত্যের তখনো জন্ম হয় নাই।

নৃত্যকলা শ্লীল কি অশ্লীল তাহা বিচার করিতে যাইবার পূর্ব্বে নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। নৃত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি নৃত্য কেবল তাহাই নহে। এ ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা একটা গণ্ডীবদ্ধ সংস্কার দ্বারা অবরুদ্ধ। ব্যাপক ভাবে না দেখিলে কোনো জিনিষকেই যথার্থভাবে দেখা হয় না। সুতরাং নৃত্যের প্রকৃতিটি আমাদিগকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইবে।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রে একটা বিরাট বিশ্ব নৃত্য চলিয়াছে। সৃজন প্রলয় ও জন্ম মৃত্যু আমাদের দেশে কালের তাণ্ডব নর্ত্তনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মহাদেবের বিশ্ব নৃত্য তাহারি একটী রূপক মাত্র। ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া আমাদের এই পৃথিবীর দিকে

চাহিলেও দেখিতে পাই এখানে নীল সাগরে, নীল পাহাড়ে ও নীল আকাশে নৃত্যের উর্ম্মি জাগিয়া রহিয়াছে। বাতাস এখানে ধানের উপর ঢেউ খেলাইয়া এক অপূর্ব্ব নৃত্যের ছন্দ জাগাইয়া তোলে।

পৃথিবীর শিশু মানুষ তাহার প্রকৃতিতেও এই নৃত্য প্রবণতাটি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ধমনী অহর্নিশ নৃত্যের মনোভাব প্রকাশের উপর সংযমের শাসনও ততই বাড়িয়া চলে। তাই মানব শিশু বা শিশু মানব যে ভাবটি দ্বিধা মাত্র বোধ না করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলে বর্দ্ধিত মানব তাহা করে না। নৃত্য সম্বন্ধে একথা বোধ হয় খুব সত্য। শিশু নৃত্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না—শিশু মাত্রেই নৃত্য করিয়া থাকে। তেমনি সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই নৃত্য করিবার

বিখ্যাত রুষ নর্ত্তকী মিস্ মোনা পায়েভা।

ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাই আনন্দ বা ভাবের আতিশয্য হইলেই তাহার মন নাচিয়া উঠে। নৃত্য সেই মনোভাবের শারীরিক বাহ্য প্রকাশ মাত্র। মানুষ মাত্রের প্রাণেই যেমন গান আছে তেমনি সকলের মনেও এই নৃত্য করিবার ভাবটি রহিয়াছে, কিন্তু সকলে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না বা চাহে না। মানুষের বয়স যত বাড়ে তাহার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নৃত্য একটী বিদ্যা বা কলা নহে, অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজে ইহা কলা রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

নৃত্যকলা সমাজের যৌবনাবস্থার একটা বিলাস ক্রীড়া মাত্র। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমাজ তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমাজ দিন দিন যতই অগ্রসর হয় ততই নৃত্যকলা সমাজ দেহে

হইতে স্খলিত হইয়া একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে। ভারতের সমাজের দিকে চাহিলেই আমরা এ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিব। হয় ত কোনোদিন আমাদের দেশেও ইহা সমাজ দেহের একটী অঙ্গভূষণ ছিল। কতকগুলি আচার বা প্রথা আমাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাচীন গ্রীসে এবং আমাদের দেশেও অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্যের সম্বন্ধ ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নৃত্যকলা স্বতঃই শ্লীলতা বিরুদ্ধ নহে, আনুসঙ্গিক অবস্থার জন্যই ইহার এমন অধঃপতন ঘটিয়াছে। এবং এই অধঃপতন ভারতবর্ষে তত অধিক হয় নাই যত বেশী হইয়াছে ইয়োরোপে। সেখানে অর্দ্ধনগ্ন নর্ত্তকীর নৃত্যেরই প্রশংসা বেশী। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশেও ইহা প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের থিয়েটার গুলিতে যে ভাবের নৃত্য আজকাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা দেশী ও বিদেশী নৃত্যের একটা সংমিশ্রণ। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই সংমিশ্রণ চেষ্টা কৃতকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু অশ্লীলতার দিকে মানুষের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে—সুতরাং নর্ত্তকীগণ যদি তাহার সেই বিকৃত রুচিতে ইন্ধন জোগায় তাহা হইলে তাহারা বেশী করিয়া বাহবা পায়।

তাই ইয়োরোপের নৃত্যকলা দিন দিন অশ্লীল হইয়া চলিয়াছে এবং আমাদের দেশে তাহারি অনুকরণ চেষ্টা চলিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এই জাতীয় নৃত্য দেখিতে খুব ভালবাসে। কিন্তু ইয়োরোপে এবং আমাদের দেশে এমন অনেক নৃত্য পদ্ধতি আছে যাহা আমাদের রুচিকে আঘাত না করিয়াও প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে।

বিদুষী নর্ত্তকী মিস্ লিসানা।
প্যারী সহরে ইঁহার নাচের খুব আদর।

নৃত্যকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে; যথা তাণ্ডব ও লাস্য। পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য বলে। উদ্দাম নৃত্যকেও তাণ্ডব বলা হয় এবং আমরা তাণ্ডব বলিলে সেই অর্থই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের বা স্ত্রীলোকের উদ্দাম নৃত্যকেও তাণ্ডব বলা চলে। ইয়োরোপের অধিকাংশ নৃত্যই তাণ্ডব জাতীয়। বল্ নাচ, মুরীশ নাচ, ইটালিয়ান্, স্পেনীশ্ ও রুষ নাচ্—সকলি তাণ্ডব নৃত্য ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা দেখিয়াছি এবং মুগ্ধ যে না হইয়াছি তাহা নয় কিন্তু তাহাদের নাচের একটা মহৎদোষ এই যে নাচিবার সময় নর্ত্তকীর শ্লীলতার বাঁধন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে এবং দর্শকমণ্ডলীর করতালি ও পুরস্কারের লোভে তাহার কুন্দধবল অঙ্গশোভা ধীরে ধীরে ছন্দতালে বসনমুক্ত হইয়া লোলুপদৃষ্টিকে আরো প্রলুব্ধ করিয়া মাতাল করিয়া তোলে। একজন ইয়োরোপীয়ানের কাছে এই সকল নাচের ভিতর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য এবং কলাশিল্পের পূর্ণ বিকাশ প্রকটিত বলিয়া মনে

যুগল নর্ত্তকী—মিস্ ন্যান্সী বার্ণেট ও মিস্ ডেসিলিয়া মোত্রে।

কলাহিসাবে লাস্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কলাকুশলতার ঔৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ইহা শ্লীলতাবর্জ্জিত হইয়া উঠে।

কোনো এক সংস্কৃত গ্রন্থে নৃত্যকে কামোদ্দীপক বিলাসাঙ্গভঙ্গী বলা হইয়াছে। যদি সেকথাই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তবে আর ইহাকে কোন মতেই শ্লীলতাসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে নৃত্য জিনিষটা স্বতঃই শ্লীলতাবিরুদ্ধ ছিল না, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া উহার আজকাল এত দুর্ণাম এবং অধঃপতন ঘটিয়াছে। ইয়োরোপীয়গণের নাচ হইতে পারে কিন্তু আমাদের চোখে যেটা সবচেয়ে বিসদৃশ এবং গন্তময় বলিয়া ঠেকে তাহা ঐ নর্ত্তকীদের অমার্জ্জিত অঙ্গভঙ্গী, জিম্‌নষ্টিকের কায়দা ওস্তাদী এবং শাখামৃগের অফুরন্ত লম্ফ ঝম্ফ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের নাচই যে পৃথিবীর সেরা নাচ তাহা বলিতে কিম্বা প্রমাণ করিতে আমরা যাইতেছি না। রাষিয়ায় লাস্য নৃত্য খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। একবার এক রুষ নর্ত্তকী ভারতে আসিয়া শস্যশীর্ষে বাতাসের নৃত্য অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাপুড়িয়া ডাকিয়া তিনি সাপের অঙ্গভঙ্গী নিজের

দেহে নৃত্যরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ নৃত্য কলাহিসাবেও শ্রেষ্ঠ এবং শ্লীলতা বর্জ্জিতও নহে। তবে নৃত্য জিনিষটা প্রত্যক্ষভাবে কামোদ্দীপক না হইলেও ইহা যে বিলাসাঙ্গ ভঙ্গী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই এই বিলাসকে শ্লীলতার পথে রক্ষা করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব হরিনামে আত্মহারা হইয়া ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে নৃত্য করিতেন এবং তাঁহারই অধ্যাত্মনর্ত্তনে একদিন সমস্ত বাংলাদেশ হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ নৃত্যকলা শিক্ষা করিতে উচ্চাঙ্গের কৌশল ও বিশিষ্ট বুদ্ধির আবশ্যক হয়। ইচ্ছা করিলে সকলেই master হওয়া ছাড়া আমাদের দেশে অন্য কোনো প্রকার উপকার হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইয়োরোপে কিছুকাল পূর্ব্বে নর্ত্তনের প্রতিযোগীতা হইয়া গিয়াছে—পঁচশ ছাব্বিশ বছর বয়সের মেয়েরা ক্রমাগত নাচিয়া—দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—এই ভাবে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া ৪৮ ঘণ্টা একদমে নাচিয়া বহু যুবককে হারাইয়া দিয়াছে! ব্যাপারটা যে কতদূর সাংঘাতিক তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝিতে পারি যে ঐ মেয়েদের নৃত্যের ভিতর কলাশিল্প থাক আর নাই থাক আসুরিক শক্তির পরিচয় যথেষ্ট রহিয়াছে। আমাদের দেশে

লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ আর্টের ছাত্রীগণ একটা টেব্ল করিবে—
তাহারই রিহারস্যাল দিতেছে।

নৃত্যকলা শিক্ষা করিতে পারে, তবে শিল্পী হইতে গেলে শারীরিক আনুকূল্য প্রয়োজন। তন্বাঙ্গীরাই যথার্থ নৃত্যের অধিকারী। স্ফীতবপু বিশিষ্ট ব্যক্তির নৃত্য কেবল মাত্র হাস্যরসেরই সৃষ্টি করিতে পারে।

নৃত্যের সহিত সঙ্গীতের অভিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে বটে, এবং ইচ্ছা করিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে স্কুলে কিছু কিছু নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে এরূপ শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নাই। সঙ্গীতকে আমরা শিক্ষার একটা মূল্যবান অঙ্গ বলিয়া মনে করি কিন্তু নৃত্যকলা শিক্ষার তেমন মূল্যবান অঙ্গ নহে। নৃত্যশিক্ষা করিলে Dancing পাশ্চাত্য নর্ত্তনের অনুকরণ চেষ্টা চলিলেও এহেন ভীষণ নর্ত্তনপ্রতিযোগীতার অনুকরণ করিতে কেহ সাহসী হইবে কি না বলিতে পারি না। পৌরাণিক যুগে উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা কিন্নরীগণ নর্ত্তনবিদূষী ছিল বটে কিন্তু তাহাদের সুখ্যাতি ছিল নর্ত্তননৈপুণ্যে। তাছাড়া গৃহস্থের মেয়েরাও যে নৃত্য শিক্ষা করিত তাহার প্রমাণ বেহুলা। এই বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিয়াই তবে মৃতস্বামীকে ফিরাইয়া পাইয়াছিল।

নৃত্যচর্চ্চা আমাদের দেশে এককালে খুবই হইত কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময় অত্যাচার উৎপীড়নের হাত হইতে
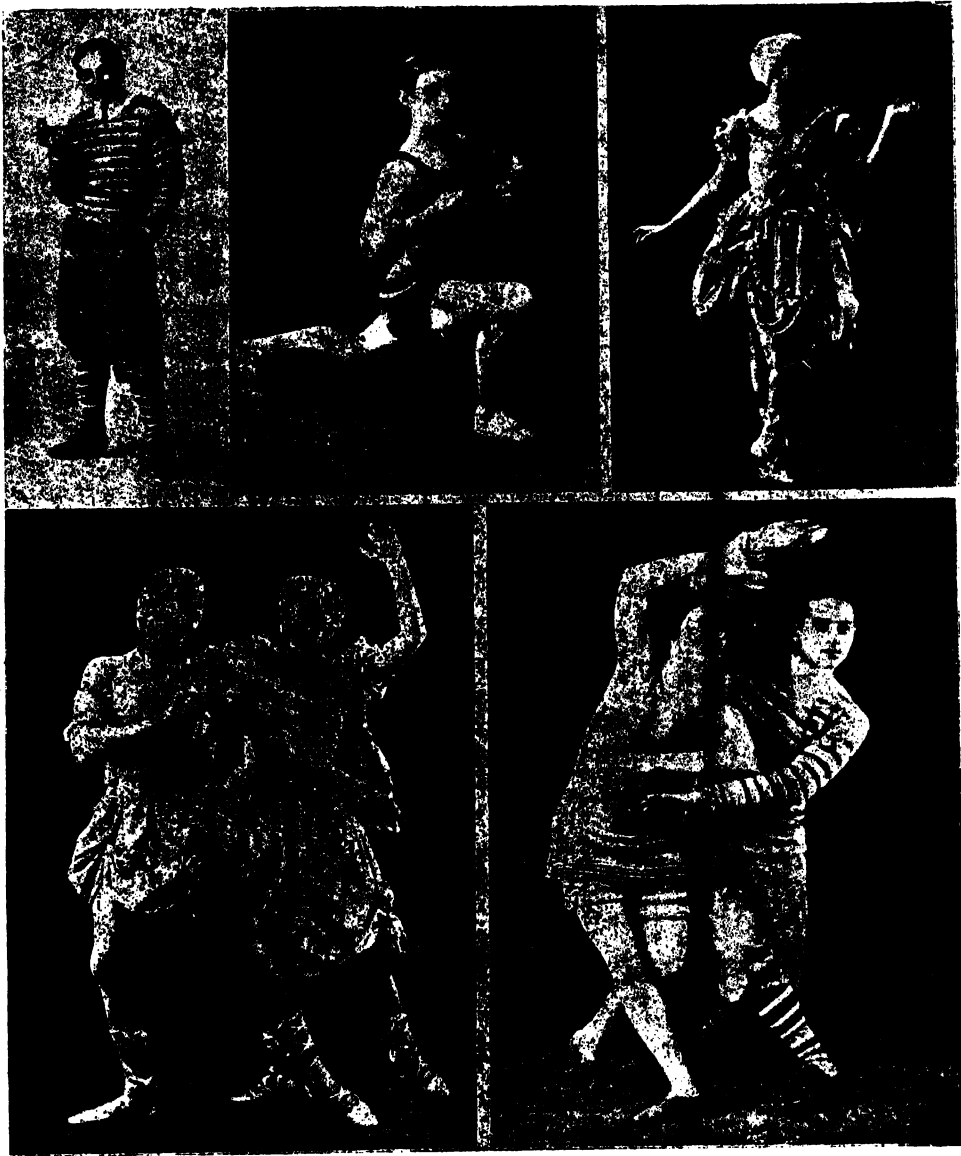
[রুষ দেশের নাচের নমুনা। এখানে একটী নৃত্যবহুল ক্ষুদ্র নাটকের কয়েকটী দৃশ্য দেখান হইয়াছে। একটী গ্রাম্য মেষপালক ও একটী সরল মেষপালক-দুহিতা। নীচে বাম ধারে ফুলের অলঙ্কার পরিয়া প্রজাপতি ও রতিদেবী চলন-তালে নৃত্যলীলা ফুটাইয়া তুলিতেছেন। ডান ধারে মেষপালক-দুহিতা তাহার প্রেমাস্পদের সহিত নৃত্য করিতেছে।]

মেয়েদিগকে বাঁচাইয়া দূরে রাখিবার চেষ্টায় যে সংযমের পথ অবলম্বন করা হয় তাহারি ফলে ঐ কলাশিল্প আমাদের অন্তঃপুর হইতে চিরনির্ব্বাসন লাভ করিয়া কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতরে যাইয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আমাদের মেয়েদের প্রধান গৌরব হইতেছে লজ্জা, এবং যে লজ্জা ভারতের রমণীবৃন্দকে একটী পবিত্র শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের নিকট পাশ্চাত্যের লজ্জাহীন বিলাস-নর্ত্তনের অনুকরণ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া নৃত্যকলা দেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাক্ এমন ইচ্ছা কেহই করে না। এই বিদ্যা কোনো এক বিশেষ দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক ভাবে এবং সময়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

মানব-মিত্র বিষাক্ত গ্যাস

ইয়োরোপের বিগত 'কুরুক্ষেত্র' যুদ্ধে মানুষ মারিবার ফন্দি অনেক রকমই আবিষ্কার করা হইয়াছিল—তন্মধ্যে বিষাক্ত বাষ্প একটি প্রধান ফন্দি বা অস্ত্র। মানুষকে মানুষ গুলি করিয়া মারিয়া হয়রাণ হইয়া গিয়াছিল, তাই কি ভাবে অতি অল্প সময়ে ও অল্প লোক দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে মারিয়া ফেলা যায়, রণোন্মত্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় বহু মাথা ঘামাইয়া এই বিষাক্ত বাষ্প আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই বাষ্প শত্রু মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইত এবং যে কেহ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিত সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

সেই মানুষ-মারা বিষাক্ত গ্যাস আজ মানবের মিত্ররূপে

রোগীর সম্মুখে, টেবিলের উপর ছোট্ট বাক্সে ক্লোরাইন গ্যাস রহিয়াছে এবং তাহা হইতে এইভাবে খলির ভিতর দিয়া খুব অল্প পরিমাণে রোগী নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ গ্রহণ করিতেছে।

বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবহারে লাগাইতেছেন। নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি ফুস্ফুস্ সংক্রান্ত যত ব্যাধি আছে সব নাকি এই গ্যাস দ্বারা আরোগ্য করা যায়। সম্প্রতি বিলাত ও কানাডার হাঁসপাতাল সমূহে এই বিষ-বাষ্প দ্বারা রোগীর চিকিৎসা পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। থিয়েটার হল, কংগ্রেস কিম্বা বড় বড় সভা গৃহ ও গীর্জাঘর বহু লোকে পূর্ণ থাকে এবং এই সকল স্থানেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বহু ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ পরামর্শ করিতেছেন যে ঐ সকল স্থানে এই বাষ্প এমন ভাবে ছড়াইয়া রাখা হইবে যাহাতে রোগের বীজ একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। কিছুদিন পর হয় ত শুনিতে পাইব কলিকাতার মত বড় বড় সহরে—যেখানকার বাতাস নানা রোগের বীজে ভরপুর, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির লোক রাস্তায় যেমন জল ছড়ায়, তেমনি আকাশে বাতাসে এই গ্যাস ছড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে!

ক্লোরাইন্ গ্যাস্ই খুব বিষাক্ত, কিন্তু এই ক্লোরাইনের ভিতর যে রোগের বীজ ধ্বংস করিবার ক্ষমতা আছে তাহা এক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক দশ বছর আগেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিলে যে রোগী সুস্থ হয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ও দেখা গিয়াছে সৈন্যদের ভিতর যখন কোন সংক্রামক ফুস্ফুসের ব্যাধি আরম্ভ হইয়াছে তখন যাহারা এই বিষাক্ত গ্যাসের ভিতর থাকিয়া মুখোস পরিয়া যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা মোটেই অসুস্থ হইয়া পড়ে নাই কিন্তু অন্য সকলেই রোগে ভুগিয়া উঠিয়াছে।

ইয়োরোপের বিগত 'কুরুক্ষেত্র' যুদ্ধের একটী ছবি। শত্রু শিবির হইতে পুঞ্জীভূত বিষাক্ত গ্যাস কালো মেঘের মত আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিতেছে। যাহারা এই গ্যাস-প্রতিরোধক মুখোস পরিয়া আছে তাহারাই শুধু এই মরণ-অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইবে, আর যাহাদের মুখোস নাই তাদের মরণ অনিবার্য্য।

শেষ রক্ষা

(গল্প)

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

(১)

মিহিরকুমার ধনী যুবক ; এম, এ পাশ করিয়া ই, আই, রেলওয়ে এ, টি, এস, এর পদ পাইয়াছেন। সংসারে আপনার ব'লিতে আর কেহ ছিল না। বাপের আমলের পুরাণো চাকর নন্দ ছাড়া দুঃসময়ে দেখিবারও কেহই নাই।

আফিসের সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহাকে ডিষ্ট্রিক্ট ষ্টেশনে বদলী হইবার জন্য অনুরোধ করে—মিহিরের তাহাতে মন সরে না—আজীবন কলিকাতায় বাস করিয়া কোথায় কোন সুদূর মফঃস্বলে যাইবে ? মধ্যে মধ্যে নন্দ তাহাকে বিবাহ করিতে বলে উত্তরে মিহির বলে "বেশ আছি নন্দ, ইচ্ছে হ'লেই দিল্লী লক্ষ্ণৌ যেখানে খুসী চ'লে যেতে পারি, বিয়ে ক'রে পায় শেকল পরলে একেবারে বন্দী!—তারপর বছর বছর চ্যাঁ ভ্যাঁ এ বেশ থাকা গিয়েছে।" নন্দ দুঃখ করে, বকাবকি করে, চ'লে যাবার ভয় দেখায়, কর্ত্তার নাম ধরিয়া কান্নাকাটি করে কিন্তু মিহির কুমার অচল অটল।

সন্ধ্যার পর বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাহার সাজান বৈঠকখানা গুলজার করে—চা, পান, সিগারেট, কোনও কোনও দিন ষ্টোভে ফাউল-কারি, লুচি ইত্যাদি ধ্বংশ করে, খোস গল্প ক'রে—রাত্রি বারটার সময় যে যার ডেরায় চলিয়া যায়—মিহিরকুমারও আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া প্রবেশ করে। বন্ধু বান্ধব তাহার অনেক। তাহার মধ্যে হরেন্দ্র খুব অন্তরঙ্গ। ছেলেবেলা হইতে একসঙ্গে স্কুলে পড়িয়াছে, একসঙ্গে খেলা করিয়াছে, একসঙ্গে মেসে থাকিয়া আড্ডা দিয়াছে, তর্ক করিয়াছে, বায়স্কোপ দেখিয়াছে। বর্ত্তমানে হরেন্দ্রও ই, আই, রেল আফিসে চাকুরী ক'রে—মিহিরকুমারের পয়সায়ই তাহার বাবুয়ানি চলে, মাঝে মাঝে গেলাসটা আসটাও মিহিরের পয়সায়ই চলে। হরেন্দ্র নিজে যাহা রোজগার ক'রে তাহা তাহার সংসার খরচেই ফুরাইয়া যায়—নিজের বাবুয়ানা এবং মধ্যে মধ্যে একটু স্থানে অস্থানে যাওয়া—দু'এক গ্লাস দেশী, বিলিতি পান—এ সমস্ত মিহিরেরই পয়সায় হয়। মিহিরের নিজের ওসব বালাই নাই—তবে বন্ধু হরেনের এই সমস্ত খরচ সে হৃষ্টচিত্তেই চালাইয়া থাকে—তাতে বেশ একটু আনন্দও অনুভব করে।

মিহিরের চরিত্র-দোষ কিংবা পান-দোষ মোটেই নাই, এমন কি সে সিগারেট পর্য্যন্ত খায় না—তবে সে যে খুব সৌখীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। [illegible] গল্প লেখারও একটু [illegible] আছে [illegible] খানা মাসিক পত্রে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে—যেদিন [illegible] পত্রিকা বাহির হইয়াছে সেদিন বন্ধু বান্ধবরা লাফাইয়া, ঝাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া তাহার বৈঠকখানা ফাটাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে—বন্ধু হরেন্দ্রনাথ বোতল বোতল হেলথ্ পান করিয়া ফেলিয়াছে।

* * * *

হরেন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছে—মিহির কুমারকে একটু একটু করিয়া মানুষ করিয়া তোলে—কিন্তু কিছুতেই তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে সে নানা রকমের ফটো আনিয়া মিহিরকে দেখায়, এবং বলে উহাদের প্রত্যেকেই মিহিরের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত। মিহিরকুমার এমনিই বেরসিক যে এমন কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয় এবং মুঠা মুঠা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলে "এই টাকা নিয়ে গিয়ে আমার হ'য়ে তুমি আলাপ ক'রে এস।" হরেন্দ্রনাথ ইহাতে নিজের মনে নিজেই গুমরাইয়া মরে।

(২)

আজ বিজলী থিয়েটারে 'রাজসিংহ' প্লে আছে; অনেক সাধ্য সাধনার পর মিহিরকুমার 'রাজসিংহ' দেখিবার জন্য রাজী হইল। হরেন্দ্র গিয়া একখানা বক্স রিজার্ভ করিয়া আসিল। যথাসময়ে মিহিরকুমার সদলবলে বিজলী থিয়েটারে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। থিয়েটার বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—মিহিরকুমারের বেশ ভালই লাগিতেছিল—বিশেষ করিয়া 'চঞ্চলকুমারী'র অংশ যে অভিনেত্রীটি অভিনয় করিতেছিল তাহার হাব-ভাব, চেহারা, কথাবার্ত্তা, মিহিরের বেশ ভালই লাগিতে লাগিল—মধ্যে মধ্যে যখন 'চঞ্চলকুমারী' উপরে বক্সে উপবিষ্ট মিহির কুমারের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছিল—তখন যেন মনটাও বেশ একটু প্রফুল্ল হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর হরেন্দ্রনাথের "ঐ তোমাকে দেখছে" উক্তিতে যেন মিহিরকুমার একটু লজ্জাও পাইতেছিল। হরেন্দ্রনাথ একথাও শুনাইতে ছাড়িল না যে অভিনেত্রীটির নাম 'পেশমান'—এবং তাহার সঙ্গে একটু আধটু আলাপও তার আছে। যাহা হউক এইরূপে থিয়েটার ভাঙ্গিল—সঙ্গে সঙ্গে মিহিরকুমারের মনও যেন একটু ভাঙ্গিল। পরদিন সমস্ত দিনই যেন কি রকম কিসের একটা অভাব সে অনুভব করিতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ নানা কথা পাড়িয়া নানাভাবে মিহিরের মনস্তুষ্টির প্রয়াস পাইল। কিন্তু মিহিরের মনটা যেন রাজ্যের বিষণ্নতায় চাপা পড়িয়া রহিল। আফিসের পর হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিহিরকুমার মোটরে মাঠের দিকে বেড়াইয়া মনটাকে প্রফুল্ল করিয়া আনতে চলিল। হাওয়া খাইতে খাইতে হরেন্দ্রনাথ হঠাৎ বলিল "আচ্ছা মিহির, আজকাল প্রায় সব লেখকরাই নারী চরিত্র, নারীর সতীত্ব, পতিতার মনস্তত্ত্ব এইরূপ কিছু একটা নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখিতেছেন তুমিও কেন এইরূপ একটা কিছু নিয়ে নাম জাহির করে ফেলো না?" কথাটা মিহিরের কাণে বেশ ঠেকিল। সে বলিল "নারী-চরিত্র, পতিতার মনস্তত্ত্ব লিখবো কোথা থেকে, সে সম্বন্ধে আমার ত কোনো অভিজ্ঞতা নেই।"

"তার জন্যে ভাবনা কি? উপাদান আমি সংগ্রহ করে দিচ্ছি।—আচ্ছা চল না কোথাও যাওয়া যাক্! আমরা ত আর কোন কু-মৎলব নিয়ে কুকাজ করতে যাচ্ছি নি।—দুই এক দিন গেলেই ওদের হাল চাল সব বেশ করে বুঝে আসা যাবে।" মিহিরের বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, অথচ কথাটা শুনিতে তার বেশ ভালই লাগিল। অন্যদিন হইলে হয়ত কথাটা মিহির হাসিয়া উড়াইয়া দিত কিন্তু আজ আর সে হাসিতে পারিল না। যেন মনের কথাটা কেহ টানিয়া আনিয়া বাহির করিয়াছে—একটু যেন তার লজ্জাও হইল।

"কি বল?" হরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল।

"তা—তা—কারুর সঙ্গে আমার ত আলাপ নেই—"

উৎসাহিত হরেন্দ্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"ফুঃ! তার জন্যে ভাবছ? কেন ওই যে পেশমান রয়েছে—ওরি কাছে তোমায় নিয়ে যাব'খন। দেখবে—দু'দিন গেলেই আর লজ্জা ভয় কিছুই থাকবে না।"

মিহিরের বুকটা দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুখে বলিল "না না কাজ নেই, শেষে আবার"—মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই হরেন্দ্রনাথ বলিল "শেষে আবার কি?—আমরা ত দোষী নই—আমরা ত আর কিছু খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্চি নি—অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্ত্তে—শিক্ষালাভের জন্য—"

"থাক্, ওসবে কাজ নেই, চুপ কর" বলিয়া মিহির হরেন্দ্রকে থামাইয়া দিল—তাহার কানে "শিক্ষার জন্য— কথাটা যেন ভয়ানক বেসুরা শোনাইল।

মিহিরের মোটর পেলিটি হোটেলের সামনে আসিয়া পড়িল, হরেন্দ্র সোফেয়ারকে থামাইয়া মিহিরের হাত ধরিয়া টানিয়া নামিয়া পড়িল এবং পেলিটিতে ঢুকিয়া খানার অর্ডার দিল।

দুই বন্ধুতে যখন খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল তখন রাত্রি আটটা। মোটরে উঠিয়াই হরেন্দ্র হুকুম করিল "রামবাগান।" গাড়ী ভোঁ ভোঁ শব্দে গন্তব্য স্থানে পৌছিল। হরেন্দ্র মিহিরের হাত ধরিয়া একরূপ টানিয়াই নামাইল। সঙ্কুচিত বিস্ময়ে মিহির বলিল—"আজই! এক্ষুনি! আজ থাক্ হরেন্দ্র—"

"রেখে দাও লজ্জা সঙ্কোচ—সাহসে বুক বেঁধে চলে এস নেকাম ক'রো না।"

মিহিরের ক্ষীণ আপত্তিটুকু হরেন্দ্রের ধমকে উড়িয়া গেল—কোনও রকমে স্খলিত পদে মিহিরকুমার হরেন্দ্রের অনুসরণ করিয়া একটি দ্বিতল বাটীর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল মিহিরের বুকটা যেন ভয়ে আতঙ্কে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। হাত, পা সমস্ত যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। মাঘ মাসের দারুণ শীতেও দর দর ধারে মিহিরের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ দরজায় পৌঁছিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং মিহিরকুমারকে হাত ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "কই গো পেশমান্ কোথায় গেলে—কাকে এনেছি দেখবে এস।" চীৎকারের শব্দে মিহিরের মনে হইল যেন সমস্ত বাড়ীটা সশব্দে ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় পড়িতেছে। সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হরেন্দ্রনাথ "আবার ওকি!" বলিয়া মিহিরকে টানিয়া সিঁড়িতে উঠাইল। উপরে সিঁড়ির সম্মুখে একটি ষোড়শী যুবতী হাস্য মুখে আসিয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিল—মিহির চিনিতে পারিল—এই যুবতীই সেদিন 'চঞ্চলকুমারী'র ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। মিহিরের সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল—পদদ্বয় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল সর্ব্বাঙ্গ হইতে দর দর ধারে ঘাম ঝরিতে লাগিল, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আর এক পা অগ্রসর হইতে পারিল না। শেষে যেন দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া হরেন্দ্রকে ধরিয়া বলিল "আজ আর না—কিছুতেই না—না—"বলিয়া একরূপ জোর করিয়াই হরেন্দ্রকে টানিয়া সিঁড়ি হইতে নীচে নামাইয়া বেগে বাহির হইয়া একেবারে মোটরে উঠিয়া হুকুম করিল "চালাও।" ভাবগতিক দেখিয়া হরেন্দ্র একেবারে থ হইয়া মোটরে বসিয়া পড়িল।

(৩)

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। 'বিজলীর' অভিনেত্রী পেশমান বিবির ঘরে ধবধবে বিছানার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া আমাদের মিহির কুমার উপবিষ্ট; সম্মুখে রৌপ্য রেকাবীতে পান, জর্দ্দা, সিগারেট—পার্শ্বে ঢুলু ঢুলু নেত্রে বন্ধুবর হরেন্দ্রনাথ হারমনিয়াম বাজাইয়া বাজখাঁই গলায় তান ধরিয়াছে—

'কাঁহা মেরি সুন্দরী রাধে—'

একটু দূরে—পার্শ্বে পেশমান একখানি মিহি শান্তিপুরে জরীপাড় সাড়ী পরিয়া উপবিষ্ট। মিহিরকুমার হরেন্দ্রনাথের সুর সংগ্রাম বেশ উপভোগ করিতেছেন ও মাঝে মাঝে পেশমান বিবির দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন—পেশমান বিবিও মৃদু হাসিয়া কটাক্ষ বিনিময় করিতেছেন। আজ আর মিহিরকুমারের সে ভাব নাই—আজ যেন সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ। ইতিমধ্যে আরও একদিন সে এখানে আসিয়াছিল, প্রথম দিনের ন্যায় সে আর সেদিন সিঁড়ি হইতে ফিরিয়া যায় নাই, পেশমানের ঘরে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া পান খাইয়া গিয়াছে। আজ তৃতীয় দিন—আজ লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ অনেকটা কম—নাই বলিলেই চলে। বেশ নির্ব্বিকার ভাব। সকলেই বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছে, হঠাৎ হরেন্দ্রনাথ হারমনিয়ামটা ছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মিহির তুমি একটু বস, আমি এক্ষুনি আসছি" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। মিহির ভীত ভাবে "কোথা যাও—আরে কোথা যাও" বলিয়া তাহার অনুসরণ করিবার উপক্রম করিল কিন্তু হরেন্দ্র ততক্ষণে ঘরের দরজাটা সশব্দে বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গিয়াছে। মিহিরের ভয় হইল, সে ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না যে হরেন্দ্রের মৎলব কি! একাকী এই ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতেও তাহার সাহস হইল না—সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ষোড়শী পেশমান মাজা দুলাইয়া কাছে আসিয়া মিহিরের একখানি হাত ধরিয়া মৃদু হাসিতে সুধা ঢালিয়া বলিল "ভয় কচ্ছে? আসুন, বসবেন আসুন" বলিয়া মিহিরকে বিছানার উপর টানিয়া বসাইল। একজন ষোড়শী যুবতীর নিকট ভয় করিতেছে একথা স্বীকার করিতে কোনও যুবকই পারে না— মিহির কুমারও পারিল না—ঢোঁক গিলিয়া বলিল "না—না—তবে—ও কোথায় চলে গেল"

"তা'তে কি হয়েচে—আবার আসবে'খন—আর এই ত আমি রয়েচি—"

মিহিরকুমার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না—মোহাবিষ্টের ন্যায় হইয়া পেশমানের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

"কি দেখচেন—আমার মুখে ?"

অপ্রস্তুত হইয়া মুখ ফিরাইয়া মিহির বলিল "না—না" মিহির ঘামিতে লাগিল—খানিকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

"আপনি বড্ড ঘামচেন—একি—শীতকালে অত ঘামচেন কেন ?"

"কই ঘামচি" এ ছাড়া আর কোনও উত্তর মিহিরের যোগাইল না।

"হ্যাঁ ঘামচেন বই কি !" বলিয়া হঠাৎ যুবতী নিজের অঞ্চল দিয়া মিহিরের মুখ মুছাইয়া দিল।

অপরিচিতা নারীর কোমল স্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে মিহিরের সর্ব্ব-অঙ্গে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। নিজের ভাব গোপন করিবার জন্য মিহিরকুমার গায়ের শালটা বেশ করিয়া জড়াইয়া একটা তাকিয়ার উপর আড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া র'হল।

"ওকি ! অমন করে বসে রইলে কেন ? ঐ—যাঃ—তুমি বলে ফেল্লুম, অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন "

"না, না,--তাতে কি হয়েছে—'আপনি'র চেয়ে 'তুমি' শোনায় ভাল"—বলিয়াই মিহিরের মনে হইল "এ কি করিতেছে সে—একটা পতিতা নারী—চিরকাল যাহাদের সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে—আজ তাহাদেরই একজনের পাশে বসিয়া—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—লজ্জায়, ধিক্কারে তাহার মাথাটা যেন ছিঁড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল—সে একটা বালিসে মুখ লুকাইয়া মনে মনে হরেনের মুণ্ড-পাত করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় একখানি সুকোমল বাহু ধীরে ধীরে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিল—মাথার চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে যুবতী বলিল—"বলবে না আমায়-তোমার কি হ'ল ? অমন ক'রে রইলে কেন ?"

মিহির আবার সব ভুলিল—আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া দেখিল দুইটি ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি তাহার অন্তরের ভিতর কি যেন অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। থতমত খাইয়া মিহির বলিয়া ফেলিল—"ভয়ানক সর্দ্দি হয়েছে, বড্‌ড মাথা ধরেছে।"

অভিমানপূর্ণ স্বরে যুবতী বলিল —"এতক্ষণ আমায় বলনি কেন ?" বলিয়াই উঠিয়া অঞ্চলস্থিত চাবি দ্বারা গৃহ পার্শ্বস্থ বুককেশ খু লিয়া একখানি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত রেশমী রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে ইউক্যালিপ্‌টাস ঢালিয়া আনিয়া মিহিরের হাতে গুজিয়া দিল। মিহির লইতে আপত্তি করিতেছিল—কিন্তু যুবতীর পীড়াপী ড়তে সে ক্ষীণ আপত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল।

আবার—আবার দুইখানি কোমল বাহু দ্বারা মিহিরের গলদেশ বেষ্টন করিয়া যুবতী একটু হাসিয়া বলিল—"ফের ঘামচ ?"

"কই না ত !" বলিতে বলিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন মিহির যুবতীকে নিজের দিকে টানিয়া লইল। যুবতীর মুখ মিহিরের মুখের খুব কাছে আসিয়াছে এমন কি তাহার নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত মিহিরের মুখে আসিয়া লাগিতেছে। যুবতী আদরের স্বরে বলিল—"এই ত টপ্ টপ্ করে তোমার ঘাম পড়ছে" বলিয়া মুখ উঁচু করিয়া মিহিরের মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মিহিরের ওষ্ঠদ্বয় যুবতীর চিবুক স্পর্শ করিল—মিহিরের সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল—জোরে নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল—যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, হঠাৎ কে যেন বুকের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—"এ কি করিতেছ মিহির ? সুনাম, চরিত্র সব যে যায় !" মনে হইল তাই ত ! একি করিতেছি আমি ! কোথায় আসিয়াছি ! ঘৃণিত, ধীকৃত পতিতালয়—যাহাদের আজীবন অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি - যাহাদের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছি—রূপযৌবন যারা পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করে—মুখের হাসিটি পর্য্যন্ত যাহারা বিক্রয় করে সেই ঘৃণিত একটা পতিতা নারী—একটা বেশ্যার

জন্ম আজ আমি আমার পবিত্র চরিত্র কলুষিত করিতে উদ্যত হইয়াছি! আমার শিক্ষা, আমার মনুষ্যত্ব সব আজ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি! এই ঘৃণিত মুখে যে মুখে আজ আমি আমার প্রণয়চিহ্ন অঙ্কিত করিতে উদ্যত, সেই মুখে ইহার পূর্ব্বে—ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণা!—

ধাক্কা দিয়া যুবতীকে দূরে সরাইয়া দিয়া মিহির উঠিয়া দাঁড়াইল, পকেট হইতে এক মুঠা টাকা বাহির করিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

পরদিন হরেন্দ্র আফিসে টীফিনের সময় খোঁজ করিতে মিহিরকুমারের কামরায় যাইয়া শুনিল বেলা ১২ টার ট্রেনে সে কানপুর বদলী হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

চাঁদা

[শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক]

চাঁদা, চাঁদা, চাঁদা!
চাঁদি দাও চাঁদ, সূক্ষ্ম এ ফাঁদ
অনেক ফিকিরে ফাঁদা।

ভিক্ষা চাহিলে মুখটী ঘুরাও বেশ,
কর্জ্জ চাহিলে দাও ঝেড়ে উপদেশ,
তাই ত চাঁদার খাতা করিতেছি পেশ,
দেখাবো গোলক ধাঁধাঁ।

এখনি চাহিনা, করে দাও সই
পরেতে তাগিদ চালাবো—'মশায় কই?'
পালাবে কোথায়? বেচাবো কাপড় বই
শুনিব না নাকে কাঁদা।

'স্পীচে'র আঁকুসী গলাতে বাধায়ে টান
দিব, যে কারণ মোরা সবে আগুয়ান
মহৎ কাজেতে, বাঁচাতে আপন মান
সাজ দেনদার হাঁদা।

এড়াবে ভেবেছ! আছি মোরা বহু ভাই
কজনে এড়াবে? সকলেরি মুখে 'চাই'
ধর্ম্ম স্বরাজ বন্যাদি কোনটাই
ফাঁক যাবে নাক দাদা;

কিসের ব্যয়ের হিসাব দেখিতে চাও?
হিসাব-নিকাশ দুনিয়াতে কোথা পাও?
বাড়াবাড়ি কর, চোখেতে দেখাবো তাও
সরষে, ধুতুরা, গাঁদা।

রঙ্গ-কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(৪)

নটগুরু গিরিশচন্দ্র অবকাশ মত একটু আধটু জ্যোতিষ চর্চ্চা করিতেন। এতদ্‌সম্বন্ধে তিনি দুই একটী প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। একদিন বাটীর ছাদে দূরবীক্ষণ লইয়া গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সুপরিচিত পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বটব্যাল মশায়, বলেন মিছে,—এই দেখুন বৃহস্পতি দেখুন।" বলিয়া দূরবীক্ষণটী বটব্যাল মহাশয়ের হস্তে দিলেন। বটব্যাল মহাশয় দূরবীণ লইয়া দেখিলেন—একটী বৃহৎ তারা। দূরবীক্ষণে যে বৃহস্পতি তারা দেখা যায়, তাহা তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। ভাবিলেন—ইহা কদাচ বৃহস্পতি নহে, কারণ বৃহস্পতি তো দেখা যাবার নয়, তবে দূরবীক্ষণে কেমন করিয়া দেখা যাইবে? গিরিশবাবু পুনরায় বলিলেন, "আবার মঙ্গল দেখুন",—এই বলিয়া মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় দূরবীক্ষণটী বটব্যাল মহাশয়ের হাতে দিলেন। বটব্যাল মহাশয় পুনরায় মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—একটী বড় নক্ষত্র মাত্র।

গিরিশবাবু বটব্যাল মহাশয়কে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,—"কেমন দেখ্‌লেন বলুন?" বটব্যাল মহাশয় ভাবিলেন, গিরিশবাবু হয়তো তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক পাইয়া যা তা একটা নক্ষত্র দেখাইয়া বৃহস্পতি—যাহা দেখা যায় না—তাহাই দেখাইতেছেন। তখন তিনি গিরিশবাবুকে বলিলেন, "হ, যাই ওক একটা তারা দেখাইয়া বেরস্পতি কইচ বটে, কিন্তু চোন্দ্রকে চোন্দ্র দেখাইতে হইব, আর সূর্য্যুকে সূর্য্যু;—সেইকালে যে একটা যা তা তারা দেখাইয়া আমারে ঠকাইবা, তা পারবা না।"

(৫)

সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকার স্বর্গীয় ডি এল, রায় মহাশয়ের সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সুবিজ্ঞ ডাক্তার তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন,—"আপনার Blood preasure বেড়েছে, সকালে ও বৈকালে হেদুয়াতে বেড়াতে আরম্ভ করুন।" তিনি তাঁহার সমবেত সুহৃৎবর্গকে বলিলেন,—"কাল প্রাতে সব আমার বাড়ীতে আস্‌বে—একত্রে বেড়াতে বা'র হব।" কবিবরের মূল্যবান জীবন রক্ষার্থে সকলে তৎপর হইয়া তৎপরদিবস প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চায়ের আয়োজন, গল্পগুজব ইত্যাদিতে বেলা হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—"তাইতো, বড় বেশী বেলা হ'য়ে পড়্‌লো, বৈকালে সব আসবে।" অপরাহ্ণেও সকলে আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু প্রাতের ন্যায় চা-পান ও গল্পগুজবে রাত্রি হইয়া গেল। তৎপর দিবস প্রাতে আবার সকলের একত্র হইবার কথা হইল।

এইরূপে তিন দিন গত হইল, বেড়াইতে যাওয়া আর ঘটিল না। তাঁহার সুহৃদ্বর্গ অনুযোগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আপনার স্বাস্থ্যের জন্যই ডাক্তার বেড়াবার advice দিয়েছেন, আপনার উপেক্ষা করাটা কি ভাল হচ্ছে?" দ্বিজুবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ, কাল খুব ভোরে উঠে, তোমাদের আস্‌বার আগেই, আমি হেদোয় বেড়িয়ে এসেছিলুম। দেখ্‌লুম, কতকগুলা বুড়ো, জোর আর একটা বৎসর বেশী বাঁচবে বলে, এমনি প্রাণপণে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যে তাদের অবস্থা দেখে বাস্তবিকই আমার দুঃখ হলো। যা হবার হবে—আমি তো আর বেড়াতে যাচ্ছি না।"

(৬)

লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরলোকগত অভিনেতা অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, যিনি 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকে 'অ্যাঙ্গাসের' ভূমিকা অভিনয় করিয়া সাধারণের নিকট 'অ্যাঙ্গাস' নামে সুপরিচিত, তিনি একদিন কোনও প্রৌঢ়া অভিনেত্রীকে কথায় কথায় বলেন, —"ছেলেবেলায় স্কুলের বইএ পড়েছিলুম—'সহবাস ফল ধরে অবিকল' অর্থাৎ যে ভদ্র সঙ্গ করে সে ভদ্র হয়, যে অভদ্র সঙ্গ করে—সে অভদ্র হয়। আমাদের বেলায় দেখ্‌ছি—সেটা হাতে হাতে মিলে যায়; কিন্তু তোমরা তো এত ভদ্রলোকের সঙ্গে এতকাল কাটিয়ে এলে, কিন্তু কই স্বভাব তো কিছুই বদলায় নি, সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তিটি তো আগাগোড়াই সমান বজায় রেখেছ!"

(৭)

এমারেল্ড থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ষ্টারে যোগদান করিলে, এমারেল্ডের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় গোপাললাল শীল মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়কে তাঁহার থিয়েটারের নাট্যকার-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মনোমোহন বাবু প্রথমে 'রাসলীলা' নামক একখানি গীতিনাট্য অভিনয়ার্থে প্রণয়ণ করেন।

উক্ত গীতিনাট্যের রিহারস্যাল হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক অভিনেতা একজন স্বর্ণকারকে ধরিয়া আনিয়া রঙ্গালয়ে হাজির করিল। স্বর্ণকার মনোমোহন বাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু, আপনার মেয়ের বালা জোড়াটি ঠিক আর পনের দিনের মধ্যেই দেব—এ কথা এঁকে বার বার বল্লুম, ইনি শুন্‌লেন না,—জুলুম ক'রে আমায় ধ'রে আন্‌লেন।" মনোমোহন বাবু বলিলেন,—"বাপু, পনের দিন ক'রে ক'রে তো এই এক বৎসর কাটালে। আজ তোমায় ডাকিয়েছি, বালার তাগাদার জন্য নয়, তোমার মুখে একটা সত্য কথা শোনবার জন্য। সত্য কথাটা বল্‌বে কি?" স্বর্ণকার বালার কথা নয় শুনিয়া আগ্রহের সহিত বলিল, "সে কি বাবু, আজ্ঞা করুন, আপনার কাছে মিথ্যা কইলে জিব খ'সে যাবে যে!" মনোমোহন বাবু বলিলেন,—"কথাটা এই,—আমার মেয়েটা সধবা থাক্‌তে থাক্‌তে কি বালা জোড়াটা হাতে দিতে পারবে?"

স্বর্ণকার অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"বাবু, নানা লোকে নানা রকম মিঠেকড়া কথায় আমাদের তাগাদা করেন,—আমাদের এ জাত ব্যবসায়ে সবই সইতে হয়। কিন্তু এমন কড়া কথা কখনো কেউ বলে নাই। এই পনের দিনের মধ্যে যদি আমি বালা গড়িয়ে না দিই, তাহ'লে আমি মাধব স্যাক্‌রার ছেলেই নই, আপনাকে আর বেশী কি বল্‌বো!"
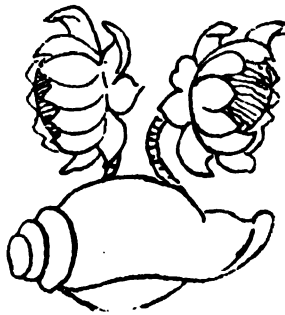
কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঈশানী দেখিল ও শুনিল।

দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে যাইয়া ঈশানী অনেক নূতন ব্যাপার দেখিল। প্রথমেই দেখিল যে, তাহার প্রেমময় সুন্দর স্বামীটি তাহাকে কেবল মাত্র আদর ও প্রেম বিতরণ করিতেই জানেন না; তিনি সময় সময় আদরিণী পত্নীকে শাসন করিতেও সুপটু।—বোধ হয় বড়লোকের পুত্রগণ ভৃত্যগণকে সর্ব্বদা শাসন করিতে করিতে শাসন কার্য্যে এই পটুতা অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

একদা স্বামীর এই সুপটু শাসন কার্য্যে ঈশানী অতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছিল; এবং অশ্রুজলের ভিতর দিয়া স্বামীর পূর্ব্ব আদরের সহিত সেই তীব্র শাসনের কোনও সম্বন্ধ বা ঐক্য দেখিতে পায় নাই। সেদিন ঈশানী বিশেষ কোনও অপরাধ করে নাই। এক নব নিযুক্তা যুবতী পরিচারিকাকে শ্রীমান শরৎকুমার কিছু অনুগ্রহ দেখাইয়াছিল। তাহাতে ঈশানী রহস্য চলে ঐ পরিচারিকাকে কিছু বলিয়া একটু হাসিয়াছিল। এই হাসিটুকুই তাহার অপরাধ। এই ক্ষুদ্র অপরাধ হইতে ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বিপুল বটবৃক্ষের উদ্ভব হয় তেমনই শরৎকুমারের বিপুল রোষ উৎপন্ন হইয়াছিল। পত্নীর সেই হাসিটা বিদ্রূপাত্মক মনে করিয়া তাহার মহা ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে অত্যন্ত কর্কশস্বরে পত্নীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিল, 'উল্লুকের মত আর দাঁত খিচুতে হবে না; ভদ্রলোকের বাড়ীর বৌ হ'য়ে কেউ অমন খানকীর মত হাসে না।' শুনিয়া ঈশানীর অধরের মৃদু হাসিটুকু অগ্নিতাপে নব পল্লবের ন্যায় শুকাইয়া গেল, এবং সে কাঁদিল। কিন্তু কখনও সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া বুঝিতে পারিল না যে, যে মুখ একদিন পূর্ণ শশধর ও প্রস্ফুটিত শতদলের তুলনা স্থল ছিল, তাহার হাসি কিরূপে, এক বৎসর পরেই, তাহার যৌবনালোক না নিভিতেই, উল্লুকের দাঁতখিচুনী হইয়া দাঁড়াইল? ইহাকেই অদৃষ্টের পরিহাস বলে!

কিন্তু ঈশানী কেবল মাত্র স্বামীর ক্রোধই দেখে নাই। হায়, দুর্ভাগা! সে সেই পরিচারিকার সহিত স্বামীর লাম্পট্যও দেখিল। কিন্তু এবার সে উল্লুকের মত দাঁত খিচাইয়া হাসে নাই; এবার সে অপহৃত পুত্তলিকা শিশুর মত ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়াছিল।

তাহার পর ঈশানী দেখিল যে, তাহার ভক্তিভাজন স্বামী দেবতা কঠিন পাঠ-শ্রম দূর করিবার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একটু একটু করিয়া সুরাপান করিয়া থাকেন; কখন বা কীর্ত্তনের বৈষ্ণবদের মত রাস্তার ধূলায় গড়াগড়ি দিবার জন্য একটু বেশী পরিমাণে খাইয়া বোতল শূন্য করেন। সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, পুত্রের মদ্যপান সম্বন্ধে সকল সংবাদ অবগত হইয়াও, তাহার পূজনীয় ও মান্য শ্বশুর মহাশয় তাহার শাসন এবং সংশোধন জন্য তাহাকে তিরস্কার করেন না। কেন করিবেন? তিনিও যে ধূলায় গড়াগড়ি যাইবার রাস্তার পথিক। ঈশানী দেখিল যে তাহার পূজনীয় স্বামীর অতি পূজনীয় পিতাঠাকুর পত্নীকে শাসন করিতে পুত্র অপেক্ষা অনেক বেশী সুপটু;—কখন কখনও শ্রীমতী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী ভর্ত্তার পবিত্র এবং দুরপনেয় শাসন চিহ্নসকল পদ্মরাগ মণির অলঙ্কারের ন্যায়, আপন কোমল দেহে ধারণ করিতে বাধ্য হইতেন।

ঈশানী এখনও অন্ধ হয় নাই। কিন্তু অন্ধ হইলেই

তাহার ভাল ছিল ; এখন ক্রমে ক্রমে সে যাহা দেখিল, তাহা হইলে, তাহা তাহার দেখিতে হইত না ; এবং তজ্জন্য অসীম হৃদয় ব্যথা ও লজ্জা পাইতে হইত না। তাহার চক্ষু অক্ষুন্ন থাকায় এখন সে অনেক অদর্শনীয় ব্যাপার দেখিতে বাধ্য হইল। দেখিল, তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে সকালে এবং সন্ধ্যায় কতকগুলি লোকের নিত্য সমাগম হইয়া থাকে। তাহাদের মাথায় বিচিত্র উষ্ণীষ, ও ধূলি ধূসরিত চরণ যুগলে নাগরা পাদুকা শোভা পাইত। তাহারা সেই জুতা খুলিয়া, সেই ধূলি-ধূসরিত পদে, শ্বশুর মহাশয়ের জাজিম-মণ্ডিত বৃহৎ তক্তপোষের উপর উঠিত ; এবং শুভ্র বিছানায় আপনাদের পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া হেলায় শুভ্র বেশধারী মান্য শ্বশুর মহাশয়ের অতি নিকটে বসিত ; শ্বশুর মহাশয় তাহাদিগকে সম্মান করিয়া আপন পৃষ্ঠের অমল তাকিয়াটি অগ্রসর করিয়া দিলে, তাহারা অক্লেশে তাহাতে আপন মলিন দেহভার রক্ষা করিত ; শ্বশুর মহাশয় আপন বৃহৎ রৌপ্য খচিত করঙ্ক হইতে সুগন্ধী তাম্বুল অর্পন করিলে, তাহারা তাহা অবশ্য প্রাপ্য বোধে অম্লান বদনে গ্রহণ করিত, এবং তাহা চর্ব্বন করিয়া আপনাদিগের বিকশিত দশন শ্রেণীকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিত। তাহারা উচ্চরবে কথা কহিত ; মহামান্য শ্বশুর মহাশয় যেন কিছু আতঙ্কে মৃদুরবে তাহার উত্তর দিতেন। ঈশানী তাহাদিগকে দেখিয়া ভাবিত ইহারা কে ? কেন আসে ? এই মলিন বেশধারীগণকে শ্বশুর মহাশয়ই বা এত খাতির করেন কেন ?

পরে একদিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট গোপনে শুনিল যে, সেই আগন্তুকেরা অন্য কেহ নহে ; তাহারা শ্বশুর মহাশয়ের পাওনাদার। কাহারও নিকট সমস্ত জমিদারী বন্ধক রাখিয়া ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া বাটী প্রস্তুত করাইয়াছেন ; কাহারও নিকট আবাব সেই বাটী আবদ্ধ রাখিয়া পনেরো হাজার টাকা লইয়া বাটীর আরও উন্নতি করিয়াছেন ; কাহারও নিকট আস্তাবল দুই হাজার টাকার জন্য বন্ধক রাখিয়া ঘোড়া ও গাড়ী কিনিয়াছেন। ঈশানী আরও শুনিল যে, পাওনাদার কেবল পশ্চিম দেশবাসী মাড়োয়ারীগণই নহেন, এতদ্দেশীয় বহুতর ব্যবসায়ী ব্যক্তিও আছেন। কেহ মুসলমান, কেহ হিন্দু ; কেহ কাপড়ওয়ালা, কাপড় যোগাইয়াছেন, দাম পান নাই ; কেহ মুদী, তাহার চার পাঁচ মাসের খাদ্য সরবরাহের মূল্য পাওনা আছে ; কেহ দরজী, কেহ জুতাওয়ালা, তাহাদেরও নিকট চার পাঁচ শত টাকা বাকী ; হারু মিঞা তামাকওয়ালার প্রায় সাড়ে পাঁচ শত টাকা পাওনা।

একদিন ঈশানী স্বামীর নিকট শুনিল যে, হারু মিঞা তামাকওয়ালার এক ছেলে রাস্তায় মারামারি করায় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে এবং হাকিম শ্বশুর মহাশয়ের হাতে তাহার বিচার ভার পড়িয়াছে।

ঈশানী কৌতুহল বশতঃ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা তাঁর কি সাজা দেবেন ?'

শরৎ বলিল, 'বাবা কি সাজা দেবেন, এখনও তা বলতে পারা যায় না। বোধ হয় দু'মাস জেল দেবেন। কিন্তু বাবা বলেছেন, ছোড়ার বাপ বেটা যদি তামাকের বাকী ক'টাকা উশুল করে নেয়, তাহলে ছোড়াকে বেকসুর ছেড়ে দেবেন।'

ঈশানী ঈষৎ আশঙ্কিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু সেটা কি ঘুষ নেওয়া হবে না ? যদি এর পরে লোকে জানতে পারে ?'

শরৎকুমার উৎসাহের সহিত বলিল, 'জানতে পারলেই বা। বাবার মত একজন বড় পাঁচশ টাকা মাহিনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আর জমিদার, সামান্য একটা তামাকওয়ালার কাছে, সামান্য পাঁচশ' টাকা ঘুষ নিয়েছেন, একথা কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট কখন বিশ্বাস করবে না। আর ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া অন্য চুনো পুঁটীদের বাবা গ্রাহ্যই করেন না। বাবা এ পর্য্যন্ত কত ঘুষ নিয়েছেন, কোন লোক জানতে পারে 'ন ; আর জানতে পারলেও কিছু করতে পারে নি। এই সেবার খুনের তদন্ত করতে গিয়ে, ঐ বড় দু'টা ঘোড়া আর ঐ বড় গাড়ীখানা, এক বেটা বড় লোক মোছলমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিলেন। নইলে কি বাবা দু'হাজার টাকা দিয়ে ঐ গাড়ী ঘোড়া কিনতে পারতেন ?'

ঈশানী আর কোনও কথা কহিল না। পরে একদিন ঋণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সে স্বামীর নিকট শুনিল, 'ধার না করলে কি, ঐ পাঁচশ' মাহিনায় আমাদের অমন বাবুগিরি করা চলত ?'

ঈশানী মনে করিল যে, এমন ধার করে বাবুগিরি করা কেন ? কিন্তু স্বামীর ভৎর্সনার ভয়ে সে কথা মুখে বলিতে পারিল না। মুখে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন জমিদারীর আয়ও ত আছে ?'

শরৎকুমার কহিল, 'জমিদারীর আয় আছে বটে, কিন্তু তা' আমাদের ভোগে আসে না। যে মাড়োয়ারী বেটা, আমাদের জমিদারী বন্দক রেখে, ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছে, সেই বেটাই খাজনা আদায় ক'রে গভর্ণমেণ্টের মালগুজারী চুকিয়ে দেয় ; আর বছর নিজের দু'হাজার সাতশ' টাকা সুদ আদায় করে নেয় ; তারপরে খাজনা আদায়ের যে দু'এক শ' টাকা বাকী থাকে, তাই আমাদের দেয় ! সে দু'একশ' আনতে, চাকর বামুন নিয়ে আমাদের জমিদারীতে যেতে হ'লেই খরচ হয়ে যায় ?'

ঈশানী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, তোমরা এত কম পাও কেন ? আমি যে শুনেছিলাম জমিদারী থেকে বছরে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায় !'

শরৎকুমার বুঝাইয়া বলিল, 'হাঁ, হাজার টাকাই প্রজাদের কাছ থেকে আদায় হয় বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের একুশ' শ' টাকা মালগুজারী দিয়ে আমাদের মোট দু'হাজার ন'শ' টাকা থাকত। এখন মেড়ো বেটা সুদের দরুণ দু'হাজার সাতশ' টাকা কেটে নেওয়ায় আমাদের ওই দু'একশ' টাকাই থাকে। তাইত ধার করতে হয়, ঘুষ নিতে হয়।"

ঈশানী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু ঘুষ নিয়ে, ধার করে কি বাবুগিরি করা ভাল ?'

শরৎকুমার বিদ্রুপ করিয়া বলিল, 'বাবা, অত ভাল ছোকরা হ'য়ো না চাঁদ !'

ঈশানী তখন আর সাহস পূর্ব্বক কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু কিছু দিন পরে, আশ্বিন মাসে, যখন চারিদিকে পূজার ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল, তখন একদিন আবার স্বামীর মুখে শুনিল, পুলিশের মকদ্দমা কেচে যাওয়ায় রেগে, হারুমিঞার ছেলের মকদ্দমার রায় দেবার পরই, হারুমিঞার ঘুষ দেওয়ার কথা পুলিশ সাহেব বেটা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলেছিল। জাতভায়ের সেই কথা শুনে, ম্যাজিষ্টার বেটা হারুমিঞার হিসাবের খাতা হঠাৎ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেই খাতাতে, বেটা আহাম্মক নেড়ে, ঐ মকদ্দমার ঠিক রায় দেবার দিনই বাবার নামে পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা ওয়াশীল দিয়েছিল। তাই দেখে সন্দেহ করে ম্যাজিষ্টর বেটা আপাততঃ বাবাকে Suspend (কর্ম্মস্থগিত) করেছে।'

ঈশানী অত্যন্ত আশঙ্কিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি হ'বে ?'

শরৎ বলিল, 'এখন আর কিছু হ'বে না ; এখন পূজার ছুটী পড়ে গেছে। ছুটীর পরে ম্যাজিষ্টর সাহেব বাবার নামে আর হারুমিঞার নামে মকদ্দমা রুজু করলে, তখন দেখা যাবে। কলকাতা থেকে ভাল ব্যারিষ্টার এনে হয়কে নয় করে দেব। ম্যাজিষ্টর বেটা তখন দেখতে পাবেন, কার সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছিলেন !'

বলা বাহুল্য, স্বামীর এই গর্ব্ববাক্যে ঈশানী কিছুমাত্র শান্তি লাভ ক'রিতে পারিল না ; একটা ভবিষ্যৎ মহা বিপদের আশঙ্কা, প্রলয়কালের মহা অন্ধকারের ন্যায় তাহার নবীন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হায়, দুঃখিনী বালিকা ! তোমার বুদ্ধিমতী মাতা, আপনার অনেক বুদ্ধি, এবং স্বামীর কষ্টার্জ্জিত অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তোমাকে যে উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কি সমস্তই অলীক আকাশকুসুমে পরিণত হইবে ? হায়, হায় ! জননীর হৃদয়স্থিতা আশালতার ফল সমস্তই কি অন্তঃসার শূন্য হইবে ?

আহা ! অখিলবাবুর কি সৌভাগ্য যে, সেই সময় তিনি রোগশয্যায় শুইয়া, মাননীয় বৈবাহিক মহাশয়ের সেই অপমান কাহিনী অবগত হইতে পারেন নাই। পরন্তু রুগ্ন পিতাকে দেখিবার জন্য ঈশানীকে পিত্রালয়ে আসিতে না দেওয়ায়, সে যাহা দেখিয়াছিল বা শুনিয়াছিল, তাহাও জানিতে পারেন নাই। সেই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে, তাঁহার আদরিণী কন্যার অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং তাহার বিবাহের বহুব্যয় কিরূপ অনর্থক হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি হৃদয়মধ্যে কি বিপুল ব্যথাই অনুভব করিতেন ?—তাঁহার রোগ-শয্যা বিষম কণ্টকাকীর্ণ হইত, অতি ভয়ানক বহ্নিজ্বালায় তাঁহার রোগতপ্ত হৃদ্‌পিণ্ড দগ্ধ হইয়া যাইত।

(ক্রমশঃ)

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(২২)

কাকাবাবুর নিভৃত ঘরটিতে আসিয়া আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। জানলার পাশে একখানি চৌকীর উপর আমাকে বসাইয়া, কাকাবাবু বলিলেন "এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম কর। পরশু গোলমালেই সারা রাত কেটে গেছে, কালও রাস্তার কষ্ট; মুখখানি তোমার শুকিয়ে গেছে মা। ভয় নেই, এঘরে কেউ আসবে না। আমার বাইরে একটু দরকার আছে; ঘুরে আসছি।"

কাকাবাবু চলিয়া গেলেন। আমি বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যখন গ্রামে ছিলাম, তখন লোকমুখে কলিকাতার রসনা তৃপ্তিকর নানা গল্প শুনিয়া ইহাকে ত্রিদিব বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। কলিকাতার সহিত ক্ষণিক পরিচয়ে আজ সে ধারণা তিরোহিত হইল। এই কলিকাতা, তৃণ শূন্য, বৃক্ষ শূন্য, ইটের পর ইটের সারি। এযে হৃদয়কে শান্তি দেয় না, চোখকে কেবল পীড়াই দেয়।

এই আঁকা বাঁকা বাঁধানো রাস্তাটি, দুই ধারের অগণিত অট্টালিকা দেখিয়া, কলিকাতা-বাসিনীদের ক্ষুরধার বাক্যবাণের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া আমার মনের মধ্যে একটা গুরু বেদনা রহিয়া রহিয়া জাগরিত হইতেছিল। অশ্রুজলের আবেগে বুকের ভিতর কেমন যেন পীড়িত করিতে লাগিল।

মনে পড়িল, আমি সব ছাড়িয়া আসিয়াছি। এখানে আমার বাবা নাই, মা নাই, বেনু পর্য্যন্ত নাই। যাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আমার জীবন-তরণীটি ভাসাইয়া দিয়াছি, তিনি যে তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কেহ আমায় একথা না বলিয়া দিলেও আমার মনই যে তাহা আমায় বলিয়া দিয়াছে। মাতৃবক্ষ বিচ্যুত হইয়া যে মায়ের স্নেহের আশায় এখানে আসিয়াছিলাম, তাঁহার আশাহত চিত্তের সকরুণ বিলাপে আমার হৃদয় বেদনায় ম্রিয়মান হইয়াছে। এক কাকাবাবু, তিনি আমার জন্য সকলের সহিত কত সংগ্রাম করিবেন? তাঁহার বহির্জগৎ আছে, অসংখ্য কাজ আছে, তিনি কেমন করিয়া আমার দিবা রাত্রের সঙ্গী হইয়া দুঃখের ভার লাঘব করিবেন?

এই বিশ্বভুবন কত বৃহৎ, কত বিশাল! সাথীশূন্য হইয়া কেমন করিয়া এখানে আমি দিন কাটাইব? নূতন জগতের নূতন মানুষের স্নেহহীন বিরাগ দৃষ্টির সম্মুখে— আমার কর্ত্তব্য, আমার স্থান কি প্রকারে আয়ত্ত হইবে? বিবাহ রজনীতে যে জীবনযাত্রা সরস বসন্তময় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, আজ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি তাহা জটিল, দুর্গম। পদে পদে শত বাধা, শতবিঘ্ন। সম্মুখে ছায়া বর্জ্জিত, তরুবর্জ্জিত দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে! আমি ভ্রান্ত পথিক, সহজ সুগম পথের খবর কাহার কাছে পাইব? কে বলিয়া দিবে?

দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আপনার মনে চিন্তা করিতেছিলাম। অকস্মাৎ কাহার পরশে চমকিয়া উঠিলাম।

তখন গাড়ীর নিকটে যে বালিকাটি ছুটিয়া আসিয়াছিল সেই বালিকাটি আমার পিঠে একখানি হাত রাখিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল 'বৌদি।'

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া, মেয়েটির পানে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল "আমায় দেখে তোমার ঘোমটা টানতে হবে না বৌদি, আমি যে তোমার ননদ। আমার নাম মঞ্জুলিকা। তুমি কালো বলে সবাই অত ঠাট্টা কল্লেন, সেই জন্যে বুঝি মুখ ভারী হয়েছে? ওরা বলবে, বলুকগে

—ওদের কথা কে শোনে! কাকাবাবু তোমায় ভাল বলেছেন, আমিও বলছি, তখন আর দুঃখ কি?"

হায় অবোধ বালিকা, হায় সরলা, তুমি কি বুঝিবে দুঃখ কি! এতক্ষণ যে অশ্রু পড়ে নাই—দেখিতে দেখিতে দুই চোখ ছাপাইয়া সেই অশ্রু উছলিয়া পড়িল। জলভার বহিয়া মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল, একটু স্নেহ-বায়ু-স্পর্শে রুদ্ধ বারি বিন্দু ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

"বৌদি, কাঁদছ! সবাইকে ছেড়ে এসেছ বলে বুঝি কষ্ট হচ্ছে? আবার তো বাপের বাড়ী ফিরে যাবে, সকলের সঙ্গে দেখা হবে। এখানে তোমার কিচ্ছু ভয় নেই. কাকাবাবু তোমায় বড্ড ভালবাসেন, আমিও বাসবো।" এই বলিয়া সে আমাকে আদরে জড়াইয়া ধরিল।

অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে কহিলাম "আমি তো তোমাদের মত সুন্দর নই ঠাকুরঝি, কালোকে তুমি ভালবাসবে, বাসতে পারবে?"

"মাগো! তোমার কথা শুনে আর বাঁচি না। ভাল-বাসবো কি, বেসেছিই তো। তোমার রং কালো হোক্ গে, তবু তোমায় আমার খুব ভাল লাগে। তুমি আমায় ঠাকুরঝি বলচ কেন বৌদি, আমি তোমার কত ছোট, তুমি আমায় মঞ্জুলিকা বলে ডেকো। আমি তোমার মঞ্জু।"

মঞ্জুলিকা ছল ছল নয়নে আত্মসমর্পনের ভাবে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বালিকার আত্মদান অবহেলা করিতে পারিলাম না। ইহাকে দেখিয়া আমার বেনুর কথা মনে পড়িল। এযে বেনুরই রূপান্তর, তেমনি উজ্জ্বল, উদ্দাম. তেমনি চঞ্চল, স্নেহপরায়ণা। আমি সস্নেহে বালিকার সুগঠিত হাতখানি ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলাম। আমার বলহীন হৃদয়ে দৃঢ়তা আসিল; মরুশুষ্ক প্রান্তরে সহসা স্বচ্ছ-সলিলা ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী মিলিয়া গেল। আমার ভয় কি! কাকাবাবুর অসীম স্নেহ আছে, আঁধার জীবন পথে ক্ষুদ্র স্নিগ্ধভাতি একটি প্রদীপও মিলিয়া গেল; ইহাই লইয়া আমি কি অন্ধকার পথযাত্রায় জয়লাভ করিতে পারিব না? আমার স্থান যে আমার নিজেরই করিয়া লইতে হইবে; পরাজয়ের লজ্জা গায়ে মাখিয়া গৃহের কোণে অশ্রু বর্ষণই নারী জন্মের পরিণতি নহে। হৃদয় না পাইলেও হৃদয় দিয়া বাঞ্ছিতের প্রিয় কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতে হইবে।

"বাঃ, এখুনি ভাব হয়ে গেছে! বৌদিকে তোর মনে ধরেছে মঞ্জু?" বলিতে বলিতে নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া কাকাবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি সলজ্জে মঞ্জুর বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া একটু সরিয়া বসিলাম।

মঞ্জু কাকাবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া সহাস্যে বলিল "বৌদি খুব ভাল হয়েছে কাকাবাবু, বড্ড লক্ষ্মী, বড্ড সুন্দর। আমার খুব ভাল লাগছে।"

কাকাবাবু কহিলেন "আমি কত খুঁজে খুঁজে তোর জন্যেই এ লক্ষ্মীকে এনে দিয়েছি! তুই একলা থাকতিস, এখন দু'জনা হ'লি, আমিও একটার জায়গায় দুটো মা পেলাম। এখন শ্যামা মাকে নিয়ে গিয়ে স্নান টান করিয়ে কিছু খেতে দে গে। কাল রাতে ওর কিছু খাওয়া হয় নি।"

মঞ্জুলিকা চুপে চুপে বলিল "চল বৌদি, তোমায় তেতালায় দাদার ঘরে নিয়ে গিয়ে তেল মাখিয়ে দিই গে। সেখানে লোকজন কেউ নেই; দাদাও নীচে নাইতে নেমেছে। একটু আগে তুমি যে কাণ্ডটি কোরেছ সেইটা কাকাবাবুকে বলে দিয়ে চল আমরা যাই।"

আমি ভীত হইয়া মঞ্জুলিকার মুখের দিকে চাহিলাম; মঞ্জুলিকা দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল "তুমি খানিক আগে যে কেঁদেছিলে—তা কাকাবাবুকে বলে দিই? অমন করে চাইতে হবে না, আমি কাকাবাবুকে কিচ্ছু বলবো না। আগে বল আর কখ্খনো কাঁদবে না?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া মঞ্জুলিকাকে শান্ত করিলাম।

মঞ্জুলিকার সহিত তাঁহার কক্ষে গিয়া আমি গলবস্ত্রে ভক্তিভরে আমার প্রিয় পদচিহ্ন ভূষিত বাসভূমিকে প্রণাম করিলাম। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার যে সৌন্দর্য্য প্রিয়তার ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম, তাঁহার গৃহে আসিয়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

ত্রিতলের সবটাই প্রায় তাঁহার রাজত্ব। সিঁড়ির মুখেই খানিকটা খোলা ছাত, ছাতের পর দুইটি বড় বড় ঘর; একখানি তাঁহার পাঠাগার, একখানি শয়ন গৃহ। গৃহের পাশে একটি টানা বারান্দায় দুই সারি ফুলের টব। টব

গুলির অধিকাংশেরই বক্ষে পুষ্পিত বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। দ্বারের নিকটে টবটিতে একটি রক্তবর্ণের গোলাপ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধে বাতাসকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে।

শয়ন গৃহের কোণে একখানি মেহগ্নি পালঙ্কে শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। দেয়ালের গায়ে বৃহৎ দর্পণ ও বিখ্যাত চিত্রকরগণের সুবিখ্যাত চিত্রাবলীতে পরিশোভিত। চিত্রগুলির সবই প্রায় সুন্দরী তরুণী বা কিশোরীর প্রতিকৃতি। বাকি কয়েকখানি নিজেদের পারিবারিক ফটোগ্রাফ, বা তৈলচিত্র। আমি মুগ্ধনেত্রে ছবিগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার তরুণ জীবনের আশা আকাঙ্খা যে এই ছবিকে কেন্দ্র করিয়া দিনে দিনে ফুলে ফলে বিকশিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না।

একটি আলুলায়িত কুন্তলা, আরক্তবর্ণা, হাস্যমুখী তরুণীর চিত্রের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া মঞ্জু বলিল "এই ছবিটা দাদার খুব ভালবাসার বৌদি, দাদাকে বিয়ের কথা বলতে গেলেই দাদা বলতেন "এমন মেয়ে না হ'লে আমি বিয়েই কোরবো না।" আমি বলেছিলাম "ছবির মত আবার মানুষ হয়!" দাদা বলছিলেন "দেখিস হয় কি না, ছবির চেয়ে সত্যিকার মানুষ যে বেশী সুন্দর হয়, বোকা মেয়ে তাও জানিস না?" "হ্যাঁ বৌদি, এই ছবির চেয়ে সুন্দর মেয়ে তুমি দেখেছ? আমি তো বাপু দেখি নি।"

আমার বক্ষ আলোড়িত হইল। ছবিখানা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উপর দিকে চাহিতেই দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছায়া চোখে পড়িয়া গেল। আমি বিদীর্ণ হৃদয়ে মেঝেয় বসিয়া পড়িলাম। হায়, কাহাকে কি দিয়া জয় করিতে চাহিয়াছিলাম, বিজয়িনী হইবার কি সম্পদ আমার আছে? যাহার আশার মন্দির আমার জন্য চুর্ণ বিচুর্ণ, যাহার সাজানো বাগান এই অভাগিনীর নিমিত্ত ভীষণ শাহারায় পরিণত, তাহাকে জয়? হায় নারী, এত কল্পনার জাল বোনা, এত দুরাশা তোমার!

(২৩)

দ্বিপ্রহরে 'বৌভাত' হইয়া গেল, বৈকালে কাঙ্গালী বিদায়। রাত্রে প্রীতি ভোজ, এবং ফুলশয্যা।

নিমন্ত্রিতগণের আহারাদির পর অনেক রাত্রে কয়েকটি রমণী আমাকে তাঁহার শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি গৃহেই ছিলেন; আমার দূর সম্পর্কীয়া বড় ননদ রাঙ্গাদিদি পরিহাস করিয়া কহিলেন "কিরে মণি, না ডাকতেই হুজুরে হাজীর, এতেই এত, না-জানি সুন্দর হ'লে আর বা কি কোরতিস! একালের ছেলেদের ফুলশয্যায় ডাকতে হয় না, নিজেরাই শয্যা আগলে বসে থাকে।"

তিনি নিরুত্তরে রাঙ্গাদিদির মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসলেন। কিন্তু সে হাসি নয়, ব্যথিত চিত্তের অশ্রু জমানো হাসির ভাণ মাত্র। এ বয়সে অনেক জিনিষের সহিতই আমার পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু এমন কোমল করুণ হাসি আর কখনো দেখি নাই। এ হাসির রশ্মিপাতে আমার হৃদয়াকাশ সমুজ্জ্বল না হইয়া ঘন মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রমণীগণের আহ্বানে তিনি নীরবে নত শিরে 'ফুলশয্যা'র সমস্ত মেয়েলী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। কিছুতেই আপত্তির মৃদু প্রতিবাদ তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইল না।

"যা বলি তাতেই আচ্ছা! কিছুতেই ছেলের 'না' নেই; বিয়ের রাতেই গোলামী স্বীকার করা হয়েচে, আর তো দিন পড়েই আছে—" বলিয়া কিয়ৎকাল পর রাঙ্গাদিদি তাঁহার দলবল লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নিভৃতে ঘোমটার ফাঁক দিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। নিমেষে তাঁহার কাষ্ঠ প্রফুল্লতার ছদ্ম দীপ্তি কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। একটা অবর্ণনীয় অসীম ব্যথা তাঁহার মুখখানিতে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া, দুই গৃহের মাঝের পর্দ্দাটা সরাইয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পুষ্প সৌরভাকুল সুকোমল শয্যায় অনাদৃত সজ্জাভার লইয়া, অনাদৃত হৃদয় ভার লইয়া আমি বসিয়া রহিলাম।

শুক্লপক্ষের চন্দ্রদেব প্রথম রজনীতে আলো বিতরণ করিয়া, ক্রমে নারিকেল গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অন্ধকারের নিবিড়তা, বিপুলতা নিস্তব্ধ জগতের বুকে গাঢ় হইয়া আসিল। গৃহ হইতে যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছিল তাহা অন্ধকারে পূর্ণ। কোথায়ও আলো

নাই, কোলাহল নাই, অন্ধকার নিশীথিনী, অন্ধকার গগন পট। আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে চাহিয়া দেখিলাম তাহাও বিরাট অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে।

তাঁহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া আমি স্পন্দিত বক্ষে পর্দ্দার আড়ালে আশ্রয় লইলাম। পর্দ্দার ফাঁক দিয়া আমার ভয় চকিত দৃষ্টিটা তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া দেখিলাম একখানি সোফায় তিনি শুইয়া আছেন। বিশাল আঁখি-পল্লব মুদিত-পদ্মের মত নিমীলিত। গায়ের বাদামী রঙের পাতলা চাদরটা শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া কিয়দংশ মেজের কার্পেটের উপর লুটাইতেছে। দক্ষিণ বাহুখানি বুকের উপর বিন্যস্ত। মৃদু মৃদু নিঃশ্বাসে বক্ষ এক একবার স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের প্রতিবিম্ব তাঁহার সুপ্ত শান্তিভরা মুখে নিপতিত হইয়া সেই সুন্দর মুখখানি সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। আমি মুগ্ধনেত্রে প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষে জল আসিল, আমার মত দীনা হীনার এই স্বামী! এযে দরিদ্রের রত্নহারের মত, কেমন করিয়া ইহাকে আমি কণ্ঠে ধারণ করিব? কি দিয়া ইহাকে আমি পূজা করিব, আমার কি আছে?

বিবশ বিহ্বলা হইয়া কতক্ষণ যে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার পানে চাহিয়াছিলাম তাহা জানি না। ঘড়ীর ঠং ঠং তিনটা বাজার শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল। তিনি নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া শুইলেন। আমি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া নিজের স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু তাঁহার বিছানায় শুইতে পারিলাম না। তিনি আমায় তাঁহার শয্যা ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে, তাহা অধিকার করিবার ক্ষমতা আমার কোথায়? একবার ভাবিলাম—তাঁহার সোফায় শুইতে হয়তো কষ্ট হইতেছে, ডাকিয়া বলি "আমার বিছানায় প্রয়োজন নাই, তুমি গিয়া তোমার বিছানায় শুইয়া থাকো।" কিন্তু সে সঙ্কল্প আর কার্য্যে পরিণত করা হইল না। তিনি কি ভাবিবেন? কুরূপা বলিয়া যাহার পানে একটিবার চাহিয়া দেখিলেন না, সে কিসের স্পর্দ্ধায় নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করিতে যাইবে?

আলনার উপর তাঁহার আধ ময়লা একখানি কাপড় ঝুলিতেছিল, আমি সেইখানা মেঝেয় পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার চোখে ঘুমের পরিবর্ত্তে ভাসিতে লাগিল—একটি দীপালোক উদ্ভাসিত কক্ষ, সোফায় শয়ান তরুণ মূর্ত্তির শুভ্র সুন্দর প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ বিশ্রান্ত আঁখি যুগল, সুধাভরা হাসিভরা দুইখানি রাঙা ঠোঁট। ভাবিতে ভাবিতে কখন যে নিদ্রায় আঁখি পল্লব বুজিয়া গিয়াছিল তাহা জানি না।

নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, আকাশের পূর্ব্ব দিকের কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া স্বর্ণচ্ছটায় হেমন্তের স্নিগ্ধ উষা তাহার আনন্দ মূর্ত্তি উদ্ঘাটন করিতেছে। গৃহদ্বার ও বাতায়ন উন্মুক্ত, পাশের ঘরে সোফা শূন্য, সেখানে কেহ আছে বলিয়া অনুমান হইল না। মঞ্জু আমার মুখের পানে চাহিয়া কোলের কাছে বসিয়া আছে।

আমি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠিয়া বসিতেই মঞ্জু জিজ্ঞাসা করিল "বিছানা থাকতে তুমি মাটীতে শুয়েছিলে কেন বৌদি? এখন শীতের সময় খালি মেঝেয় শুয়েচ, তোমার যদি অসুখ করে? তোমার চোখ এত রাঙা হয়েচে কেন? রাতে দাদা ঘুমুলে তুমি বুঝি কেঁদেছিলে?"

হাসিয়া কহিলাম "কাঁদবো কিসের দুঃখে মঞ্জু? মেঝেয় শুলে আমার অসুখ হয় না, ও আমার অভ্যাস আছে।"

"কাঁদবে কিসের দুঃখে! কেন, সেখানকার সকলের জন্যে? তাঐমশায়, মাঐমার জন্যে, আর তোমার বেণুর জন্যে। কাকাবাবুর কাছে আমি বেণুর কথা সব শুনেছি, বেণু তোমার বড় ভালবাসার,—না বৌদিদি?"

"ছোট বোন সকলেরি ভালবাসার হয় মঞ্জু, তোমার ছোট বোন থাকলে তুমি বুঝতে পারতে।"

মঞ্জু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের সহিত বলিল "আমার ছোটবোনও নেই, বড়বোনও নেই। আচ্ছা বৌদি, একটা কাজ করলে হয় না? এখন থেকে আমি তোমায় শুধু 'দিদি' বলে ডাকবো, তুমি আমায় বেণু বলে না হয় ডেকো, বেণুর মত ভালবেসো; তা'হলে আমারও দিদি হবে, তুমিও বেণু পাবে।"

আমার তাপদগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া গেল, শীতল হইল। রাত্রি হইতে আমি যেন দুঃখের পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ এক নিমেষে মঞ্জুর স্নেহ আমাকে যেন বজ্রলোক হইতে আনন্দময় জগতে লইয়া আসিল। আমি বলপূর্ব্বক চিত্তক্ষোভ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সানন্দে মঞ্জুর দিদিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম। আজ দিবসারম্ভের সূচনায় মঞ্জুকে পাইয়া আমার জীবনযাত্রা সহজ সুগম হইল।

(ক্রমশঃ)
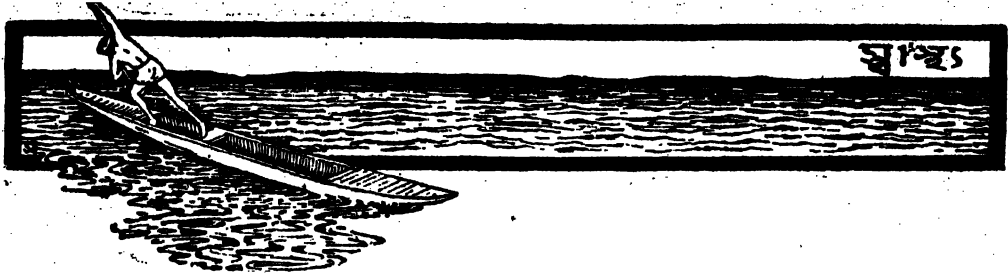
আহার করা (ভোজন)

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্]

যেমন সকল কাজেরই একটা বাঁধাবাঁধি নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে, আহারেরও তেমনি নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। যাঁহারা নিত্য সময়-মত আহার করেন, তাঁহাদের শরীর বেশ সুস্থ থাকে। মোটামুটি হিসাবে, পুরুষদের আহারের সময় প্রায়ই ঠিক থাকে; কিন্তু মেয়েদের আহার কখনো সময়মত হয় না; এইজন্য, মেয়েরা ব্যায়রামে এত ভুগিয়া থাকেন। সাধারণতঃ, দিনরাতে, গড়ে চারবার আহার করা সকলেরই উচিত। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলে, মলমূত্র ত্যাগ করিয়া, মুখ, হাত, পা ধুইয়া ও শীঘ্র শীঘ্র পূজা আহ্নিক সারিয়া লইয়া, অল্প স্বল্প কিছু খাওয়া উচিত—যথা, দুধ, চা, সরবৎ, মোহনভোগ, ফলমূল, সন্দেশাদি, ডিম্ব, পাঁউরুটি, মুড়ি, মুড়কি, চিড়া, নারিকেল ইত্যাদি। সুবিধা হয় ত ৭। ৮ টার পূর্ব্বেই এই ভোজন বা "প্রাতরাশ" সমাপ্ত করিয়া লওয়া উচিত। তাহার পরে—বেলা দশটা হইতে সাড়ে এগারটার মধ্যে "মধ্যাহ্ন" ভোজন সারিয়া লইয়া, বেলা ৪। ৫ টায়—কিঞ্চিৎ জল খাবার খাইয়া, রাত্রি ৯টার মধ্যে—রাত্রের ভোজন সারিয়া লওয়া উচিত। দিনে বেশী বেলা ও রাত্রে দেরী করিয়া খাওয়া অনুচিত।

খাইবার সময়ে মনে মনে ভাবিবে, তোমার কত সৌভাগ্য, তাই নানারূপ ব্যঞ্জনাদিসহ ভোজ্য ভোজন করিবার ভাগ্য ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্য শ্রীভগবান্‌কে মনে মনে প্রণাম করিবে। তাহার পরে, মনে করিবে যে, শ্রীভগবানের প্রদত্ত "প্রসাদ"ই তুমি ভোজন করিতেছ—তাই তাহা অমৃতোপম; এবং আরও মনে করিবে যে, যে চাউলের গ্রাস, যে ডাইলের কণা, ও যে তরিতরকারী তুমি গ্রাস করিতেছ—তাহার প্রত্যেকটাই সূক্ষ্মাকারে জননী প্রকৃতির উর্ব্বরাশক্তির আধার; এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন সেই অগ্নি সতেজ হইয়া উঠে, তেমনি এই দেহের মধ্যে যে পাচকাগ্নিগণ বিরাজ করিতেছেন—যাঁহারা ক্ষুধা, পরিপাকশক্তি ও দৈহিক কার্য্যরূপে অহরহ আমাদিগের নিকটে প্রতিভাত হইতেছেন—মনে মনে ভক্তিভরে সেই পঞ্চাগ্নিতে পাঁচটি গ্রাস আহুতিস্বরূপ প্রদান করিয়া, বাকী ভোজ্য খাইতে থাকিবে। এই ভাবে দুবেলা আহার করা অভ্যাস করিবে। কাজেই প্রফুল্লমনে, প্রকৃতই নিশ্চিন্ত হইয়া, তবে খাইবে; পড়াশুনা কাজকর্ম্ম প্রভৃতির এতটুকু চিন্তাও মনে করিবে না। পরিষ্কার হইয়া - অর্থাৎ মুখ-হাত পূর্ব্বে যতই ভাল করিয়া ধোয়া থাকুক না কেন, পুনরায় অতি অবশ্য বেশ করিয়া ধুইয়া,—কাপড় ছাড়িয়া, পরিষ্কার করা যায়গায় বসিয়া, আহার করিবে। খাইবার সময়ে কাজের কথা, উত্তেজনার কথা বা অপর বাজে বেশী কথা কওয়া অন্যায় - তাহাতে খাইতে খাইতে বিষম লাগিতে পারে, সময়ে সময়ে ভাল করিয়া না চিবাইয়া গিলিতে হইতে পারে, অথবা খাইয়া সুখ নাও হইতে পারে। এ সকলগুলিই হজমের ব্যাঘাতকারী। অতএব, একান্তে বসিয়া, একমনে ভোজন করাই ভাল। কখনো তাড়াতাড়ি খাওয়া উচিত নহে। যে ছেলেরা জোয়ান বয়সে পাল্লা দিয়া বেশী খাওয়ার বা তাড়াতাড়ি খাইতে পারার বাহাদুরি দেখায়, তাহারাই, যৌবন পার হইতে না হইতেই অম্ল, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগিয়া থাকে। যাহারা বেশী বেলা করিয়া খায়, বা বেশী পরিমাণে খায় বা বেশী তাড়াতাড়ি খায়, তাহাদেরই আহারে বসিয়া পিপাসা বেশী

হয়, তাহারাই বেশী জল খায়। খাইতে বসিয়া ডাল, ঝোল, ভাত প্রভৃতিতে এত জল থাকে যে, আলাদা জল খাইবার প্রায়ই দরকার হয় না। যদি কখনো দরকার হয়, তবে খাইতে বসিয়া ২।১ ঢোকের বেশী জল খাইতে নাই; এবং আবশ্যক হইলে, খাবার ৩।৪ ঘণ্টা পর, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জল খাওয়া ভাল।

অনেকে মনে করে যে, খাইবার সময়ে জল না খাইয়া আঁচাইয়া উঠিয়া এক গ্লাস জল বা সোডা ওয়াটার বা ডাবের জল পান করা শুধু নির্দ্দোষ নহে, পরন্তু বড় উপকারী। এ ধারণাটি ভ্রান্ত। খাইতে খাইতেই জল পান কর, আর আঁচাইয়া উঠিয়াই জল পান কর—উভয়স্থলেই বেশী জল পান করিলে পরিপাক শক্তির হ্রাস করে; আর ডাবের জল, সোডা-ওয়াটার, লেবুর রস ও জল, ঘোল—কেহই পরিপাকে সাহায্য ত করেই না—পরন্তু অধিকাংশ স্থলে, দুদিনে না হউক, দুবৎসর পরেও অপকার করে। এই জন্য খুব ধীরে ধীরে প্রত্যেক গ্রাস এমন ভাবে চিবাইবে যে, চিবাইতে চিবাইতে মুখের গ্রাসে আর কঠিন পদার্থ কিছুই থাকিবে না—চিবাইতে চিবাইতে তরলীকৃত গ্রাসটা হড়াৎ করিয়া পেটের মধ্যে চলিয়া যাইবে। এইভাবে চিবাইয়া খাইলে, খাইতে বসিয়া একফোঁটাও জল পান করিবার প্রয়োজন হয় না।

কখনো শ্রান্ত বা গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া আহারে বসিতে নাই। অতিরিক্ত গরম থাকিতে কোনও খাদ্য খাওয়াও অন্যায়। নিতান্ত পান্তা বা খুব গরম খাওয়া—দুইয়ের কোনটাই ভাল নহে। লোণা ইলিশ, শুঁটকি মাছ, আমানি, ভিজাভাত, বাসি রুটী,লুচি, বাসি দৈ, ক্ষীর, টকিয়া গিয়াছে এমন তরকারী, পচা হরিণমাংস, অতিপক্ক বা গাঁজলা উঠিয়াছে এমন ফল, গাঁজলা উঠিতেছে এমন রস, দোকানের খাবার, বিশেষতঃ রাঁধা মাছ, ডিম বা মাংস, কেক্, ভাত একেবারেই খাওয়া উচিত নহে। টিনে করিয়া বিদেশ হইতে যে ফল, দুধ, মাছ বা মাংস আসে, তাহাও খাওয়া উচিত নহে। যে সকল বিলাতি ফল উজ্জল রঙ বিশিষ্ট ও দেখিতে তাজা, তাহাও খাওয়া উচিত নহে।

৯. শরীর ধারণ করিবার জন্যই খাওয়া।—আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু আধটু ভাসা-ভাসা ইংরাজী শিখিয়াছেন এবং যাঁহারা ষোল-আনা ডাক্তারি-মত-ঘেঁষা, তাঁহাদের মতে, ভাতে পুষ্টিকর জিনিষ খুব কমই আছে, এবং পুষ্টিকর জিনিষ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা—মাংস, ডিম, কোকো ও মদ্যে আছে। কিন্তু একথাটা যে কতদূর সত্য বা অসত্য তাহা ভাবিয়া দেখেন না। যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবে জীবন যাপন করেন, তাঁহার খাদ্যও সেইরূপ হওয়া উচিত। যে বাঙ্গালীরা পুরা সাহেবী চালে খাওয়া-দাওয়া করেন, অথচ যাঁহাদের অঙ্গ-চালনা তাদৃশ নাই, তাঁহারা কখনো সুস্থ থাকেন না। ইহা হইতেই সহজে বুঝা যাইবে যে, অলস ও গৃহপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে, সাদাসিধা ডাল-ভাতই যথেষ্ট। এই অন্নভোজী জাপানীরাই মাংসাশী রুষীয়ানদিগকে হারাইয়াছিল। অতএব পুষ্টি ও বলাধান, শুধু পথ্যের উপরে নির্ভর করে না। অভ্যাস, ব্যায়াম ও অন্যান্য জিনিষের উপরে বলাবল নির্ভর করে। কুলি-মুটে-মজুরেরা কত মাংস, ঘৃত বা পোলাও খায়?—অথচ তাহারা সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা কম পুষ্ট বা কম দীর্ঘায়ুঃ বা কম বলিষ্ঠ নহে।

আসল কথা হইতেছে, ক্ষুধা ও পরিপাক করিবার শক্তি। যাহার ক্ষুধা বেশ প্রবল এবং পরিপাক শক্তি সতেজ, সে ব্যক্তি সাদাসিধা আহার করিয়াই বলিষ্ঠও হয় এবং ভালও থাকে। এবং যাহার ক্ষুধা কম, তাহারই যত রকমের রসনা তৃপ্তিকর গুরুপাক আহারের দরকার হইয়া পড়ে। আমাদের গৃহস্থের ঘরে মেয়েরা, পোয়াতি অবস্থায়, সাদাসিধা ডাল ভাত খাইয়া দুইটা প্রাণীর প্রাণ বাঁচাইয়া, সুস্থ শিশু সন্তান প্রসব করিতে পারেন। অতএব, আমাদের আহারের প্রথম নিয়ম হওয়া উচিত—যত সাদাসিধা খাওয়া যাইতে পারে, ততই ভাল। মাংস, ডিম ও দুধ, ঘি—রোজ না খাইয়া মধ্যে মধ্যে খাওয়াই ভাল। মাংস ও ডিম খাইতে হইলে যত সাদাসিধা রকমের রান্না হয়, ততই ভাল। তবে যাঁহারা মাছ মাংস খাইতে চাহেন না বা পান না এবং দুধ, ঘি খাওয়াও যাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর, তাঁহাদের এমন মনে করা ভুল যে, ঐ সকল জিনিষ খাইতে পান না বলিয়া তাঁহাদের শক্তি বা স্বাস্থ্য মন্দ। মাছ না খাইলে চক্ষের দৃষ্টি খারাপ হয়, একথাও ভুল।

যে খাওয়া সহজে হজম হয়, এবং যাহা অতিমাত্রায় খাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা কম, সেই আমাদের চিরপরিচিত ডাল ভাতই ভাল। একবেলা রুটি, লুচি বা পরোটা এবং অপর বেলায় ভাত, অথবা দুবেলায় উভয় অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া খাইতে পারিলে খুব ভাল। অথবা বৈকালে জলখাবার খাওয়া হিসাবে রুটি, লুচি খাইয়া দুই বেলা ভাত খাওয়াই ভাল। যখনই খাওয়া হইবে, তখনই "কুঁচকি-কণ্ঠা" পুরিয়া খাইতে নাই। কোনও সময়ে ঐ রকম অতিভোজন করিতে নাই। জলযোগটা বিশেষ করিয়া হালকা হওয়া উচিত। রাত্রে যাহা খাইতে হয় তাহা সহজে হজম হয়, এমন জিনিষ খাওয়া উচিত; এই জন্য যাঁহাদের হাঁপানি বা অম্লরোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে, সূর্য্যাস্তের পরে তাঁহাদের পক্ষে আহার নিষিদ্ধ। কারণ, ঘুমন্ত অবস্থায় হজম ভাল হয় না; যদি পেট বেশী ভরিয়া খাওয়া হয় অথবা গুরুপাক জিনিষ খাওয়া হয় তবে রাত্রে ঘুম ভাল হয় না, সকালে পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, দমকা ভেদ প্রভৃতি হইতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটা চাকুরী-জীবি হওয়ায় এবং মনে প্রাণে ষোল আনা ভাবে ইংরাজের অনুকরণপ্রিয় হওয়ায়, বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজে যাহা কিছু গুরু ভোজন সবই রাত্রে হইয়া থাকে! ভাতের চেয়ে রুটি লুচি গুরুপাক, অথচ যাঁহারা একবেলা রুটি খান তাঁহারা রাত্রেই ঐ রুটি খাইয়া থাকেন। মাংসাহার, নিমন্ত্রণ প্রভৃতিও রাত্রে হইয়া থাকে।

খাইয়াই কখনো ঘুমাইতে নাই। দিবানিদ্রা যত অনিষ্টের হেতু। দুপুরবেলা, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, খাওয়ার পরে একটু "গড়াইয়া লইতে" আপত্তি নাই, কিন্তু কখনো দিনে ঘুমান ভাল নহে। রাত্রেও আহারের পরে অন্ততঃ ২।১ ঘণ্টা জাগিয়া থাকিয়া তবে ঘুমাইতে হয়—এই জন্য রাত্রি ৯টার ভিতরেই সকলেরই খাওয়া সাঙ্গ হওয়া উচিত। দিনে, বেলা ১১টা ও রাত্রে ৯টার মধ্যে খাওয়াই ভাল।

রোজ পাতে ঘি খাওয়া অভ্যাস থাকিলে, আলাদা কথা। নতুবা শীতের সময়ে অথবা যাহাদের গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় অথবা যাঁহারা হবিষ্য করিবেন তাঁহারাই ঘি খাইতে পারেন। যাঁহারা সাধারণ অলসভাবে জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের ঘি খাওয়া অন্যায়। পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদের রোজ দিনের বেলায় ঘি দিলে ভাল হয়। রাত্রে ঘি, দৈ, মাংস, রাবড়ী প্রভৃতি অম্লকারক গুরুপাক খাবার না খাওয়াই ভাল। কলিকাতার মেসে যে বালকেরা বাস করেন, প্রায়ই পরীক্ষার সময় আগত হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে মস্তিষ্কের পুষ্টিকর (অর্থাৎ মেধা ও স্মৃতি-বর্দ্ধক) খাদ্যের জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়। ক্রমাগত অতিমাত্রায় পাঠাভ্যাস করার ফলে, তাঁহাদের মস্তিষ্কের অবসাদ (exhaustion) আসে; সুনিদ্রা ও বিশ্রামই তেমন স্থলে মস্তিষ্কের যথার্থ পুষ্টিবর্দ্ধক; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্‌মাড়া কলে বিশ্রামের অবসর নাই; তাই, ছাত্রেরা কেহ "ব্রাহ্মীঘৃত" কেহ "নাবু-ভিগার," কেহ "অশ্বগন্ধা ওয়াইন." কেহবা 'ব্র্যাণ্ডী' খাইয়া ব্রেণের (মস্তিষ্কের) আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু তাঁহারা এই তিনটি কথা বিস্মৃত হন—প্রথমতঃ সুনিদ্রাই মস্তিষ্কের পক্ষে যথার্থ পুষ্টিবর্দ্ধক খাদ্য; দ্বিতীয়তঃ মধ্যে মধ্যে পাঠের বিশ্রামই মস্তিষ্কের পক্ষে পরম উপকারী; এবং তৃতীয়তঃ ব্রহ্মচর্য্যই মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধক—অতএব ডিম্বের কুসুম মস্তিষ্কের পুষ্টিবর্দ্ধক হইলেও, ঊর্দ্ধরেতা হইবার পথে বিঘ্নদায়ক।

যাঁহাদের ভাল করিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, তাঁহাদের পক্ষে কতকগুলা শাক পাতা খাওয়া বাঞ্ছনীয়। শাক ভাজা, ডাঁটা, চচ্চড়ি প্রভৃতি, আলু, বেগুন, কচু, ওল, লাউ, কুমড়া, মূলা, এঁচড়, থোড়, পেঁপে, মোচা, উচ্ছে, পটোল, করলা, ঢ্যাঁড়স, কপি, সুটি, সীম প্রভৃতি খাইলে বেশ মল-ত্যাগ হয়। মাংস, মসুর ও কলাই ডাল, কাঁচকলা, শিঙ্গি ও মাগুর মাছ—ইহারা পেটের অসুখে উপকার করে।

তিক্ত জিনিষ বারমাস খাওয়া উচিত নহে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়ে কখনো কখনো তিক্ত জিনিষ খাওয়া ভাল। খর ঝাল বা লবণ বা গরমমসলা বা বেশী করিয়া তেল ঘি দিয়া রাঁধা জিনিষ বারমাস খাওয়া দূরে থাকুক, কখনো খাওয়া ভাল নহে। সহমত মিষ্ট জিনিষ খাওয়ায় কোনও দোষ নাই। বেশী পরিমাণে মিষ্ট খাইলে অম্ল ও অজীর্ণ দাঁড়াইতে পারে, অল্প পরিমাণে মিষ্ট খাইলে পরিপাক ভাল হয়।

খাইতে বসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ঘি বা তিক্ত জিনিষ খাওয়া ভাল। পরে, নানা রসাত্মক তরকারী ও অবশেষে অম্ল, মিষ্টান্ন ও ফলাহার করিতে হয়। বেশী অম্ল খাওয়া কদভ্যাস। দৈ কখনো বেশী খাওয়া ভাল নহে। সামান্ত পরিমাণে অর্থাৎ মধুপর্কের বাটীতে যতটা দৈ ধরে—ততটুকু দৈ খাইলে উপকার, তাহার বেশী দৈ খাইলে অপকার।

যত রকম ডাল আছে, তাহাদের মধ্যে মুগের ডালই বাঙ্গালীর পক্ষে সর্ব্বাংশে হিতকারী। পুষ্টিহিসাবে খেঁসারির ডাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু অধিক দিন খেঁসারির ডাল খাইলে নানা কঠিন রোগ ধরে; মটর ডাল মলরোধ করে, অড়হর ডাল ও ছোলার ডাল গুরুপাক। কলাইয়ের ডাল স্নিগ্ধ।

কাঁচা ও সদ্য দোহন করা দুধই * সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু যে রকম নোংরা করিয়া নোংরা জায়গায় দুধ দোহা হয়, তাহাতে দুধ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াই ভাল। যাঁহাদের শুধু দুধ সহ্য হয় না, তাঁহারা যদি দুধের সঙ্গে ভাত বা মুড়ি, চিঁড়া, খৈ, সাগু, বার্লি, সুজি প্রভৃতি মিশাইয়া খান, তবে দুধ সহজেই হজম হয়। কিন্তু ভাত, চিড়া, খৈ, পাঁউরুটি, বিস্কুট, মুড়ি—এ সকল শুক্‌না চিবাইয়া খাইয়া, দুধ আলাদা চুমুক দিয়া খাইলে, দুধও সহজে হজম হয় এবং ঐ সকল খাবারও সহজে হজম হয়। রোগা লোককে কখনো দুধে পাঁউরুটি বা খৈ ইত্যাদি ভিজাইয়া খাইতে দিবে না—ঐ সকল খাবার শুক্‌না চিবাইয়া খাইবে। অনেকে কলিকাতার জল দেওয়া দুধের উপরে নারাজ। কিন্তু জল দেওয়া দুধ, খাঁটি দুধের চেয়ে সহজে হজম হয়।

বাঙ্গালীর খাবারের মধ্যে, পেঁপে (কাঁচা ও পাকা) পাকা আনারস, কচি ডাবের জল ও শাঁস, লেবুর রস, স্বল্পপরিমাণে দৈ (মুরে পাতা) ও অতি সামান্ত মিষ্ট—এই গুলি হজম করিবার ঔষধের মত কাজ করে। কিন্তু গুরুপাক ভোজন বা অতিভোজন করিয়া সাক্ষাৎ অগ্নিদেবকে খাইলেও হজম হয় না।

ডিম মাত্রেই গুরুপাক। মাছের ডিম, কাঁকড়ার ডিম, কাঁচা হাঁসের ডিম ও কুক্কুট ডিমের অপেক্ষা গুরুপাক; কিন্তু কুক্কুট ও হংস ডিম্ব যত বেশী সিদ্ধ হইবে ততই গুরুপাক হইবে।

---

* ল্যাকটোমিটার সাহায্যে দুধ পরীক্ষা সকল সময়ে ঠিক হয় না। দুধের সবচেয়ে উপকারী অংশ—"মাটা" (মাখন); গয়লারা ঐ মাটা ঘোলমৌনি সাহায্যে তুলিয়া লইয়া, দুধে পাণিফলের পালো বা এরোরুট বা সুজি ও সামান্ত চিনি মিশাইলে, ল্যাক্‌টোমিটারকে ঠকান যায়। অথচ লোকের ধারণা যে, ল্যাক্‌টোমিটার দিয়া দুধ খাঁটি কি জল মিশান, কি মাটা তোলা এসব ধরা যায়।

The monthly messenger.

বিচিত্রা

(সাগর পারের খবর)

[শ্রীদানীশ রায়]

(১)

'চুরী বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড় ধরা।' এই বিদ্যায় পাকা রকম লায়েক কর্ব্বার জন্য জাপানে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। La Revue ফরাসীদেশের একখানি সুপ্রসিদ্ধ কাগজ,—কিছুদিন আগে এই কাগজেই বেরিয়েছিল জাপানে কেমন ভাবে ছেলে-পেলেদিগকে চুরী বিদ্যা শেখায় তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সে দেশে চুরী বিদ্যা শেখার জন্যও রীতিমত 'স্কুল পাঠশালা' আছে,—সেখানে যত বড় বড় ওস্তাদ চোর ছেলেমেয়েদিকে অল্প বয়স থেকেই চুরী বিদ্যাটা আয়ত্ত কর্ত্তে শেখায়,—থিওরেটিক্যালি ও প্রাকটিক্যালি দুইই, মায় ডিমনষ্ট্রেশন্ সমেত! তারপর ছাত্রদিগকে 'টেষ্ট' দিতে হয়। কোন একটা আমোদ প্রমোদের বা মেলা উৎসবের সময় যখন লোকের ভিড় বেশ জমে যায় তখন তাদের চুরি কর্ত্তে পাঠান হয়। যারা 'পাশ' করে তারা স্কুলের সার্টিফিকেট পায়, যারা ওরই মধ্যে ভালরকম করে বেশ নিরাপদে কাজ উদ্ধার কর্ত্তে পারে তারা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পুরস্কারও পায়। কিন্তু যারা নির্ব্বিঘ্নে কাজ সমাধা কর্ত্তে পারে না তারা হয় 'ফেল,'—এখানে ফেল মানে চিরদিনের জন্যে স্কুল থেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দেওয়া। এই রকম করে যারা চুরি বিদ্যায় ক্রমশঃ ওস্তাদ হয়ে উঠে তারাই আবার শেষে হয় সেই বিদ্যালয়েরই অধ্যাপক! সেখানে বিশৃঙ্খল বা অনিয়মিত ভাবে কোন কাজ হবার জো নেই! প্রত্যেক চোরের নিয়মমত কাজের ও কার্য্য-ক্ষেত্রের বিভাগ করা আছে। কেউ রাস্তায়, কেউ দোকানে, কেউ থিয়েটারে, কেউ মজলিশে, আর কেউ বা রেলগাড়ীতে চুরী করে। পুলিশে এই সব স্কুল পাঠশালার কথা জানে কিন্তু জেনে-শুনেও এদের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ সাধারণতঃ কোন আদালতে আনে না।

(২)

এক একটা জিনিস এমনি 'অপয়া' থাকে যে যখনই যার হাতে যায় তখনই তার সর্ব্বনাশ করে তবে ছাড়ে। Hope diamond নামে একটি হীরা আছে তা'র প্রধান গুণ হচ্ছে যার কাছে সে থাকবে তা'র সর্ব্বনাশটি আগে কর্ব্বে! প্রথম অবস্থায় এই হীরাটি ছিল আমাদেরই ভারতবর্ষে—এক হিন্দু দেব মন্দিরে দেবমূর্ত্তির কপালে বসানো,—তারপর তাকে খুলে নেওয়া হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে টাভার্নিয়ের একে প্রথমে ইউরোপে নিয়ে যান। ইউরোপের মাটিতে পা দিয়েই টাভার্নিয়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তখন তিনি এই হীরা চতুর্দ্দশ লুইকে বিক্রী করেন। রাজা লুই উহা নিজে ব্যবহার না করে সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডাম্ মন্‌ৎশেন্ নাম্নী তাঁর এক প্রিয়পাত্রীকে দান করে ফেলেন। ম্যাডাম এই হীরাটি পাবার অল্পদিন মধ্যেই রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হ'ন। প্রিন্সেস্ লাম্বেল ম্যাডাম মন্‌ৎশেনের পর এই হীরার মালিক হ'ন—কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহীদের হাতে কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। ফালস্ নামে একজন ফরাসী তারপর ঐটি পায়—চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হবার ভয়ে তাকে সেইটি বিক্রী করে ফেলতে বাধ্য হ'তে হয় এবং কিছুদিন মধ্যেই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে তাকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করতে হয়। হেনরি টমাস হোপ নামক একজন ইংরেজ ১৮৩০ সালে এই সর্ব্বনেশে হীরাটি তার আগেকার মালিকের কাছ থেকে কিনে নেন। তখন থেকে তাঁর নামেই হীরাটির নামকরণ করা হয়—Hope diamond. হেনরী হোপের পৌত্র লর্ড হোপ এই হীরার মালিক হয়ে তাঁর আর দুঃখ কষ্টের অন্ত ছিল না। এই হোপ ডায়মণ্ড যে কতলোকের সর্ব্বনাশ করেছে তার আর ইয়ত্তা নাই। অনেককে সে সর্ব্বস্বান্ত করেছে, অনেককে পাগল করেছে—

অনেককে হত্যা করেছে। অনেক ক্রোরপতি বণিক, রাজা, রাজকুমার প্রভৃতির সর্ব্বনাশ করে হীরাটি আমেরিকার একজন ক্রোরপতির স্ত্রীর হাতে আসে,—কিছুদিন হ'ল তাঁরও একমাত্র পুত্র মারা পড়েছে! এত 'গুণ' সত্ত্বেও এই সর্ব্বনেশে হীরেটি হাজার হাজার টাকা খরচ করে লোকে কিনতে ছাড়ে না—মানুষের এম্‌নি স্বভাব!

(৩)

একটি ভদ্রলোক সমুদ্র ভ্রমণ করতে করতে কেপ্ ফ্লোরিডার কাছে দেখতে পান যে এক ঝাঁক হাঙ্গর সমুদ্রে ভাসমান প্রকাণ্ড একটা জীবের দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। আন্দাজে হিসাব করে তিনি বুঝলেন যে সেই জীবটির আকার লম্বায় আশী ফুটের কম নয়! পরের দিন দরকার মত আয়োজন করে লোকজন নিয়ে তিনি আবার সেই জীবটির সন্ধানে বার হ'লেন। কিন্তু নিকটে গিয়ে তিনি তার হাড় বার করা মাথাটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না—দেহের বাকী অংশ তখন হাঙ্গরেরা খেয়ে ফেলেছে। মাথাও সম্পূর্ণ পাওয়া গেল না,—যেটুকু পাওয়া গেল সেইটুকু দেখেই বেশ বোঝা গেল যে সেটা কোন বিপুল দেহ সাগর দানবের মাথা। মাথাটা ডাঙ্গায় তুলে এনে ওজন করে দেখা গেল যে সমস্তটা না থাকলেও তারই ওজন হ'ল চুরাশী মণ! মাথাটা লম্বায় ১৫ ফুট আর চওড়ায় ৭ ফুট। কিন্তু জীবটি যে তিমি জাতীয় নয় তা তা'র দেহের আকার ও মাংস দেখেই বোঝা গেছে।

একমিনিট

মেয়েদের পোষাক পরা—

প্রিয়নাথ। ওহে শচীন্! তুমি হ'লে কাজের লোক—ব্যবসা করে থাক। তোমাকে প্রায়ই দেখি বড়বাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, মুরগীহাটা কেবলি টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তোমার তো সময়ই নেই যে একটু নিরিবিলি বসে পড়াশুনা করবে। কিন্তু তবু ত দেখ্‌ছি তোমার কোন বিষয়ই অজানা নেই—দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সব খবরই তুমি রাখ—বাংলা সাহিত্যে কা'র কি নূতন লেখা বেরুচ্ছে তাও তোমার সব পড়া আছে—বিদেশের খবরও তোমার সব জানা! এত কাজের ভিড়েও তুমি কি করে যে এত পড়াশুনা করতে পার তা ভেবে আমি কোন মিমাংসা করে উঠ্‌তে পারছি না।

শচীন্। আমার সময় নেই তা ঠিক—কিন্তু জান ত গিন্নীর আমার একটু ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ধাত—তাঁকে নিয়ে রোজই আমায় একবার করে গড়ের মাঠে খোলা হাওয়া খাইয়ে আনতে হয়। বেরোবার আগে পোষাক পরতে তাঁর জন্ম আমাকে যেটুকু সময় অপেক্ষা করতে হয় সেই তখনই আমি রাজ্যের যত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং উপন্যাস সব পড়ে পড়ে শেষ করে ফেলি!

প্রিয়নাথ। অ...!

—অ—

মায়াবিনী

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ৬ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ । [১৬শ সপ্তাহ

বিলাত ফের্ত্তা

আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক'ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই ।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি ;
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা" আর
মুটেদের ডাকি "কুলি" ।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে রটি
যদি "সাহেব" না ব'লে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি ।

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি ।

আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই ।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট-বুট-প্যাণ্ট-কোট প'রে—
সেজেছি বিলিতি বাঁদর ;

"আমরা হ্যাট বুট প্যাণ্ট কোট পরে— সেজেছি বিলিতি বাঁদর"

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ, পরাই !
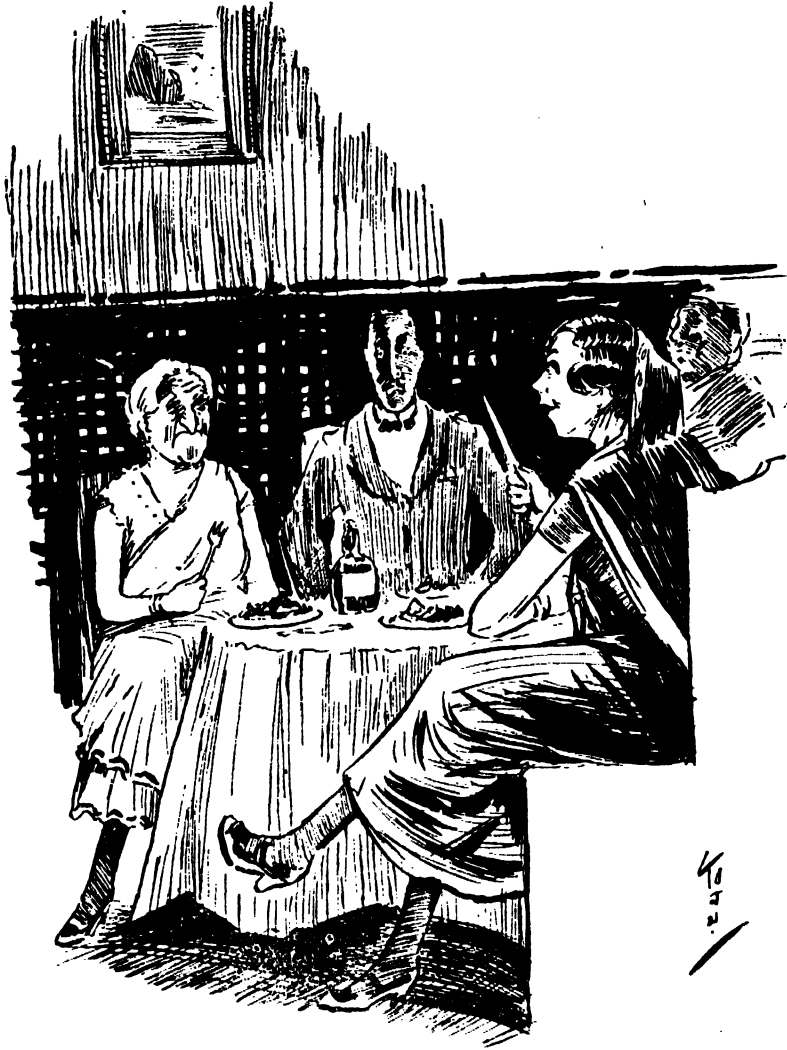
"আমরা—স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই"

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয়না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—"ভিনোলিয়া"
মাখি রোজ গাদা গাদা !

"ভিনোলিয়া রোজ মাখি গাদা গাদা—"

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

"স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি"

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

ইউরোপে বর্ত্তমান যুগের লেখকগণের মধ্যে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ একজন প্রতিভাবান শক্তিশালী লেখক। তাঁহার লেখার ভিতর এমনি জোর এবং মৌলিক চিন্তাশীলতার প্রমাণ রহিয়াছে যে তাহারই ফলে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে আজ ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

বার্ণার্ড শ ডাবলিন সহরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে সুখ সম্পদের ভিতর লালিত-পালিত হওয়ার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই; তাই পনেরো বৎসর বয়সেই তাঁহাকে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইতে হয়। চব্বিশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি যখন এডিসন টেলিফোন কোম্পানীতে কাজ করিতেন সেই সময় তাঁহার প্রথম লেখা Irrational knot বাহির হয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই তিনি সমাজ সংস্কারের চেষ্টা আরম্ভ করেন। নাটক লিখিয়াও তিনি যথেষ্ট যশ অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার মত ক্ষমতাশালী সমালোচকও আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

তাঁহার চিন্তার অভিনব স্বাধীনতা এবং সত্যের প্রতি নির্ভীক অনুরাগ আজ ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছে। অনেকেই তাঁহার মতবাদ মানিয়া লইতে রাজী নয় কিন্তু তবু তাঁহার নাটক ও পুস্তক নিচয় সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র লেখাই ইয়োরোপে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হইয়া থাকে। তাঁহার রাষ্ট্রীয় মত ও নৈতিক আদর্শের সঙ্গে অনেকেই একমত হইতে না পারিলেও আশা করা যায় জগতে এমন একদিন আসিবে যখন সকলেই তাঁহার অভিনব চিন্তাধারার সঙ্গে মত মিলাইতে বাধ্য হইবে

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ

নিম্নে তাঁহার সারগর্ভ লেখার সামান্য কয়েকটি কথা আজ 'সচিত্র শিশিরে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম—

সুখ সম্ভোগ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; জীবনের উদ্দেশ্য আরও উর্দ্ধে, আরও মহৎ একথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়ো।

*　　*　　*

মানুষের উচিত মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া যাওয়া। নিজের সুখ সুবিধার জন্য সে পৃথিবী হইতে যতটুকু গ্রহণ করিয়াছে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে পৃথিবীকে দান করিয়া যাওয়াই তার কর্ত্তব্য।

* * *

মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া সহজ কিন্তু মৃত্যুভয়টাকে এড়াইয়া যাওয়াই সবচেয়ে কঠিন।

* * *

নিঃশব্দে মরিলে কিম্বা অপরকে মারিলেই মানুষ অধঃপাতে যায় না, কিন্তু হীন দাসত্ব জীবন যে বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকে সে-ই অধঃপতনের শেষ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হয়।

* * *

দাসরূপে একজন বাঁচিয়া থাকার চেয়ে দশজন মানুষের মত মরিয়া যাওয়াও শতগুণে শ্রেয়।

* * *

মানুষ যাহাকে বলে পাপ তাহা চিরন্তন—যাহাকে বলে পুণ্য তাহা অধিকাংশ স্থলে মিথ্যা ফ্যাসান মাত্র।

* * *

অর্থ অনর্থের মূল—একথা সত্য নয়। অর্থ দুষ্ট লোকেরই অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকে কিন্তু মহৎ ব্যক্তিকে শান্তিদান ও সহায়তা করিয়া থাকে।

* * *

আপন কর্ত্তব্যের কাছে নারী সর্ব্বদা কর্ত্রীরূপে বিরাজ করিবে—দাসীরূপে নয়।

* * *

শিশুদের শাসন করিতে হইলে ঠাণ্ডা মেজাজেই শাসন করিতে হয়—রাগের মাথায় শাসন করা উচিত নয়। শাসন জিনিষটা খারাপ হইলেও স্নেহের শাসন সহজেই ভুলিয়া যাওয়া যায় কিন্তু প্রচণ্ড শাসন প্রাণে একটা দাগ রাখিয়া যায়।

* * *

পিতামাতার চরিত্র অনুকরণ করিয়াই সন্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং পিতামাতার পক্ষে মিথ্যাচরণ সর্ব্বাগ্রে পরিহার্য্য।

* * *

কোন কোন বিষয় আছে যাহা শৈশবেই শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হয়। স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় শিক্ষা শৈশবে, যখন সবটুকু বুঝিবার ক্ষমতা হয় না তখনি দিতে হয়। যৌবনে কুফল অবশ্যম্ভাবী।

* * *

যে অর্থ উৎপাদন করিতে পারে না, তার পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করাও সঙ্গত নয়;—যেমন নিষ্কর্ম্মা ধনীর দল—থার দায় মোটর হাঁকায়—তেমনি যে আনন্দ সৃষ্টি করিতে পারে না তার আনন্দ সম্ভোগ করিবারও অধিকার নাই।

* * *

স্বাধীনতার অপর নাম দায়ীত্ব-জ্ঞান। দায়ীত্ব-জ্ঞানহীন মানুষেরাই স্বাধীনতার নামে আঁৎকিয়া উঠে।

* * *

রুলের গুঁতো কিম্বা খোলা তলোয়ারের ভয় দেখাইয়া যে আইন জারী করিতে হয় সে আইন বেশীদিন টিঁকিতে পারে না।

মানুষ যখন একটা বাঘকে গুলি করিয়া মারিতে যায় তখন বলে সেটা শিকারীর খেলা; আর ঐ বাঘ যখন তাহাকে গ্রাস করিতে আসে তখন বলে সেটা জিঘাংসা, হিংস্র প্রবৃত্তি। দোষগুণ বিচারে মানুষের কি চমৎকার সম-দৃষ্টি!

* * *

সমাজ-স্বাস্থ্যের পক্ষে চারুশিল্প একটী প্রধান খোরাক। মানুষের মনকে সুস্থ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে হইলে চারুশিল্প অনুশীলনের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

* * *

একটা জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে নানাবিধ খেলা প্রচলনের যতটা প্রয়োজন, চারুশিল্প চর্চ্চার ততটা প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের রাজাকে তাই মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে কিম্বা খেলোয়াড়দের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করিতে দেখা আশ্চর্য্য নয় কিন্তু চিত্রকরদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করার আশা করা দুরাশা মাত্র।

* * *

ধন ও শিল্পবিদ্যা এক একটা জাতির স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

* * *

আদর্শ লাভের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া গেলে মানুষ কোন্ আশায় জীবন ধারণ করিবে?

* * *

সীমান্ত সীমাকে মনে করিবে তোমার জীবনের আদর্শ; তুমি যতই অগ্রসর হইবে সে ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিবে।

* * *

ঘুষীর বদলে যে ঘুষী ফিরাইয়া না দেয় তাহাকে সহজ পাত্র মনে করিয়ো না। সে তোমাকেও যেমন ক্ষমা করে না তেমনি তোমার নিজেকেও ক্ষমা করিতে দেয় না।

* * *

নীতিবাগীশদের মত কেবল 'এটা উচিত' 'ওটা উচিত' বলিয়াই জীবনটাকে খরচ করিয়া ফেলিয়ো না। তোমার ঐ 'উচিত' গুলিকে জীবনে 'নিশ্চিত' পরিণত কর।

* * *

যাহারা আধুনিক সভ্যতার উপাসক তাহারা কথায় কথায় বাষ্পীয় এঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির উল্লেখ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ঐ দুইটার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিয়াছে তাহারা আজীবন চেষ্টা করে কেমন করিয়া ঐ দুইটার পরিবর্ত্তে আরো কিছু ভাল, আরো কিছু উন্নততর উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে।

* * *

প্রত্যেক যুগের মানুষই মনে করিয়া থাকে পৃথিবী কেবলি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—ইহার একটা কারণ পৃথিবী সদা চলন্ত; কিন্তু ঘড়ির পেণ্ডুলাম চিরকাল তাল ঠুকিয়া সমতালেই চলিয়াছে।

* * *

সমাজের ভিতরে যদি পঁচা ঘা থাকে তবে সেগুলিই সভ্যতারূপ জীবদেহে ব্যাধি উৎপাদন করে। জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে অভিজ্ঞ সমাজ-চিকিৎসকের নিতান্ত প্রয়োজন।

গিরিশচন্দ্রের অশোক

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবতরত্ন]

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পরিণত বয়সের দান "অশোক" নাটকখানি নানা কারণে পরম শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার সামগ্রী। প্রিয়দর্শী অশোক জগতের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার পার্শ্বে সিজার সেকেন্দর কনষ্টান্টাইন বা নেপোলিয়ানেরও যশোভাতি ম্লান। সমগ্র মানব মণ্ডলীর যথার্থ কল্যাণ সাধন করিয়া তাহাদিগকে একতাসূত্রে বন্ধন করাই যদি মহাপুরুষের কার্য্য হয়—তাহা হইলে অশোক যে উক্ত বিশ্ববিজয়ী বীরগণের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমাদের জাতি যে অশোককে পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে, সেই অশোকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস অদ্বিতীয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র করিয়াছেন। অতএব এক্ষেত্রে একেবারে মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার আলোকসম্পাতে সুদূর অতীতের অশোক চরিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ গিরিশচন্দ্রের নিজের আধ্যাত্মিক জীবন বুঝিতে হইলে বিশেষ যত্নের সহিত অশোক নাটকখানি অনুধাবন করা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপালাভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের নিকট আধ্যাত্মিক জগতের সত্যগুলি প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দ্বারা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন তিনি বিবৃত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর নাটক বিশ্বসাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

গিরিশচন্দ্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এই জটীল বিষয়টীকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। কবির নিপুণ তুলিকাপাতে ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ধর্ম্ম সমস্যার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। নাটকখানির মধ্যে গতানুগতিক নিয়মের শৃঙ্খলবন্ধন নাই—ইহার চরিত্র বিশ্লেষণ, ঘটনা সমাবেশ, রস বিন্যাস সমস্তই অপূর্ব্ব। নাটকখানির গানগুলি যেন এক একটী হীরক খণ্ড। নাটকের স্থানে স্থানে যে কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মহাকবি কালিদাস ও সেক্সপীয়ারও ঈর্ষ্যান্বিত হইতে পারেন।

> কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল
> করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন
> বহ বহ প্রলয় পবন
> প্রবল ঝটিকা যথা
> আলোড়িত করিছে অন্তর
> আলোড়ন কর ধরাতল।
> চূর্ণ কর সুন্দর যে বস্তু আছে যথা
> ধ্বংস হ'ক মানব মণ্ডল
> মম কোপানল অনুরূপ প্রলয় দামিনী
> সহস্র দলকে দলি উগার প্রলয় ধারা
> বজ্র হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ।

বহিপ্র্ক্রৃতির সহিত অন্তঃ প্রকৃতির সামঞ্জস্য করিয়া যে নাটকে এরূপ বর্ণনা আছে বিশ্বসাহিত্যে তাহার একটী বিশেষ স্থান আছে বলিয়া মনে হয়।

অশোক-নাট্যে ঘটনা সমাবেশ

নাট্যকারকে সুনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘটনা সমাবেশ করিয়া রস ফুটাইয়া তুলিতে হয়। সেইজন্য নাট্য সাহিত্যে সাধারণতঃ একটি রীতি অবলম্বন করিয়া ঘটনা সমাবেশ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাট্যই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে যে সমস্যার উদয় হয়, তাহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া এমন এক স্থলে উপস্থিত হয়, যেখান হইতে উভয়ের মধ্যে একের জয় ও অন্যের পরাজয় অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়া আইসে। তাহার পর অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেই জয় পরাজয়

কার্য্যতঃ প্রকাশ পায়। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Hudson বলেন—"We have, to begin with, some initial incident or incidents in which the conflict originates; secondly the Rising Action growth or complication, comprising that part of the play in which the conflict continues to increase in intensity while the outcome remains uncertain; thirdly, the Climax, crisis or turning point at which one of the continuing forces obtains such controlling power that henceforth its ultimate success is assured; fourthly the falling Action, Resolution or denouncement comprising that part of the play in which the stages in the movement of events towards this success are marked out; and fifthly, the Conclusion or catastrophe in which the conflict is brought to a close." অর্থাৎ—প্রথমে এমন কোন ঘটনা দ্বারা নাট্যের সূত্রপাত করিতে হইবে যে তাহাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় সেই দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করিয়া তুলিতে হইবে ও ফলাফল অনিশ্চিত রহিবে। তৃতীয়তঃ ঘটনাকে এমন এক চরম সীমায় আনিয়া ফেলিতে হইবে যে একটী শক্তি বলবান হইয়া জয় বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবে; চতুর্থতঃ ঘটনার মধ্য দিয়া সেই জয় আনয়ন করিবার চেষ্টা থাকিবে ও পঞ্চমতঃ দ্বন্দ্বের অবসান বা সমস্যার সমাধান হইবে। নাট্যের এই পাঁচটী ভাগ লইয়া পাঁচটী অঙ্ক রচিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক গিরিশচন্দ্রের অশোক এই রীতিকে কিরূপভাবে অনুবর্ত্তন করিয়াছে।

নাট্যের প্রস্তাবনায় উপগুপ্ত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কথোপকথনে জানা যাইতেছে যে অশোকের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিরূপ মারের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে অশোকের জয়লাভ বর্ণনই নাট্যের উদ্দেশ্য। প্রথমাঙ্কে মারের সহিত অশোকের সংগ্রামের সূত্রপাত করা হইয়াছে। অশোকের মাতা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণকুমারী, তিনি দৈব গণনায় জানিতে পারেন যে তাঁহার গর্ভে রাজ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিবেন। সেইজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিন্দুসারের অন্তঃপুরে রাখিয়া যান। বিন্দুসারের অন্যান্য রাজ্ঞীরা সুভদ্রাঙ্গীর রূপ-লাবণ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে অশোক জন্মগ্রহণ করেন। অশোকের দেহে রাজ চক্রবর্ত্তীর ব্যঞ্জক জটুল চিহ্ন ছিল—কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে লোকে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত কদাকার মনে করিত। বিন্দুসার তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। অশোকের পিতা মহারাজ বিন্দুসারের রাজ্যকালে পাটলিপুত্র নগরী বিলাসপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুসীম ভ্রষ্টচরিত্র অপদার্থ যুবক। মার তাহার সহিত চিত্তহরা নাম্নী বেশ্যার মিলন ঘটাইয়া অশোকের প্রতি তাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষকে আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। মারের ইচ্ছা যে অশোক সকলের দ্বারা ঘৃণিত হইয়া জগতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুন। অশোক কিন্তু দয়াশীল, উচ্চাকাঙ্খী, মাতৃভক্ত—তিনি পাটলিপুত্রে অকারণে যে সপ্তাহব্যাপী উৎসব হইতেছে তাহাতে যোগ দিতে ঘৃণা বোধ করেন। সুসীমের প্ররোচনায় বিন্দুসার অশোককে আহ্বান করিয়া তাহার ঈদৃশ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সময় তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত—হীন উৎসব নিতান্ত অশোভন বলিয়া অশোক উহাতে যোগ দেন নাই বলিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অশোককে একাকী তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। অশোকের মনে দৃঢ় ধারণা তিনি রাজ চক্রবর্ত্তী হইবেন সুতরাং ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি একাকী যাত্রা করিলেন। সহোদর ভ্রাতা বীতশোক সঙ্গে যাইতে চাহিলে তাহাকেও লইলেন না। অথচ রাজা ভাবিলেন অশোক বোধ হয় নগর ত্যাগ করেন নাই। এই সন্দেহে অন্তঃপুরে সৈন্যদলসহ উপস্থিত হইয়া রাজা অশোকের মাতা পত্নী ভ্রাতা ও পুত্র কুণালকে অশোক কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন অশোক চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজা তাহা বিশ্বাস করিলেন না—তিনি উঁহাদিগকে কারাগারে বন্দী করিলেন ও অন্তঃপুরে অগ্নি সংযোগ করিলেন। তক্ষশিলার পথে

আকাল নামে এক ব্যক্তি অশোককে এই সংবাদ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু অশোক কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। আকাল আত্মীয়স্বজন বিহীন নিঃস্ব ব্যক্তি—অশোক পাটলিপুত্রে তাহাকে কারাগার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পথে আকাল ও অশোকের সমক্ষে মার আসিয়া নিজের ভোজবিদ্যা প্রকাশ করিল ও অশোককে মায়াসৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে চাহিল। কিন্তু অশোক মারের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। অশোকের অন্তরের দুর্জ্জয় সাহস ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া তক্ষশিলাবাসীরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। এমন সময়ে দেবী নাম্নী এক বণিক কন্যা সাধুর আদেশে তক্ষশিলার রাজসভায় আসিয়া তাঁহার গলে বরমাল্য দান করিলেন। অশোকের মনে যখন প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রবল হইয়াছিল তখনই মার আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু অশোকের সংভাবই জয়ী হইল। তিনি মারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন ও প্রতিহিংসাবৃত্তিকে সংযত করিলেন। সুতরাং এই অঙ্কে আমরা অশোকের সু ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে একটী দ্বন্দ্ব দেখিতে পাইলাম।

অশোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিহিংসা বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া দ্বিতীয় অঙ্কে মার তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। রাজা বিন্দুসার প্রতিশ্রুত ছিলেন যে অশোক তক্ষশিলা জয় করিতে পারিলে তাঁহাকে রাজ্যদান করিবেন। কিন্তু ফলতঃ বিদ্রোহ দমিত হইলে চিত্তহরার অনুরোধে সুসীম বিন্দুসারের নিকট হইতে তক্ষশিলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অশোককে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা করা হইল। তথায় দেবীর গর্ভে তাঁহার মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা নামে পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিন্দুসারের মুমূর্ষু অবস্থায় রাজমন্ত্রী রাধাগুপ্ত ও কল্লাটক তাঁহাকে সত্বর আসিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিতে উপদেশ দিলেন। অশোক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজ্য প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে অযথা কটুকাটব্য বলিয়া তিরস্কার করিলেন ও সুসীমের নাম করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ক্রমাগত অত্যাচার সহ্য করিয়া অশোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—এখন আবার পিতার অবহেলায় তিনি সংসারের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজ্য অধিকার করিলেন, আকালের ষড়যন্ত্রে সুসীম পাটলীপুত্রে আগমনের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অশোক সেনাপতির বিদ্রোহে ক্রুদ্ধ হইয়া সুসীমের গর্ভবতী পত্নী ও আত্মীয় স্বজন সকলকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। অশোকের পত্নী পদ্মাবতীর সহিত সেই সময় দেবী পুত্র-কন্যাসহ সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দেবী পুত্রকন্যাকে আত্মত্যাগ ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পদ্মাবতী সুসীম-পত্নী চন্দ্রকলার জীবন রক্ষার্থে তাঁহার সহিত চণ্ডালিনী বেশে নগর ত্যাগ করেন। অশোক পদ্মাবতীকে না দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন যে ইহা শত্রুর চক্রান্ত—তাই নগরবাসীদিগের প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন। বীতশোক ও কুণাল এ কঠোর আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। যখন অশোক কুণালের নিকট শুনিলেন যে পদ্মাবতী স্বেচ্ছায় অশোকের মঙ্গল কামনায় নগরত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়া পদ্মাবতীর মৃত্যু আদেশ দিলেন। বনের মধ্যে যাইতে যাইতে চন্দ্রকলা ন্যগ্রোধকে প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। চণ্ডালসর্দ্দার ও সর্দ্দারিণী আসিয়া ন্যগ্রোধসহ পদ্মাবতীকে তাহাদের গৃহে লইয়া গেল। মার অশোককে ভবিষ্যৎ গণনা-কৌশল দেখাইয়া ও ইন্দ্র বলিয়া স্তব করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইল। মারের মায়ায় একটী সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল—তাহাতে অহোরাত্র গীতবাদ্য হইতে লাগিল—তাহা দেখিতে যাহারা আসিল তাহারাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল। অশোককে অধিকতর নিষ্ঠুরতায় নিয়োজিত করিবার জন্য মার তাঁহাকে কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে উপদেশ দিল। অশোকের অভিষেক সময়ে কলিঙ্গরাজ উপস্থিত ছিলেন না তাই অশোকের ক্রোধের কারণ।

তৃতীয় অঙ্কে অশোক মারের প্রভাবে অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই চরমসীমায় পৌঁছিয়াই—প্রথমে উপগুপ্ত ও পরে ন্যগ্রোধের কৃপায় তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। এই অঙ্কে বুঝা গেল যে অশোক ত্যাগের মন্ত্রেই দীক্ষিত হইলেন—মারের পরাজয় হইল। বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত কলিঙ্গ জয় করিয়া অশোক

ভীষণ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে উপগুপ্ত আসিয়া তাঁহাকে বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করিলে শান্তিলাভ হইবে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু নগরে ফিরিয়া অশোক আবার নিষ্ঠুরতা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বালক ন্যগ্রোধ উপগুপ্তের উপদেশে পাটলিপুত্রে আসিয়া অশোককে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করিলেন।

চতুর্থ অঙ্কে অশোক বিশ্বহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়াও মারের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই দেখিতে পাই। তিনি বুদ্ধদেবের অবমাননার কথা শুনিয়া জৈন হত্যার আদেশ দিলেন ও মার প্রেরিত চিত্তহরা নাম্নী বেশ্যার কপট ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাহাকে সাদরে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। বীতশোক বৌদ্ধগণের সম্বন্ধে কটাক্ষ করায় অশোক তাঁহাকে শিক্ষা দিবার মানসে রাজসিংহাসনে উপবেশনের জন্য প্রাণ-দণ্ডের কপট আদেশ দিলেন। কিন্তু বলিয়া দিলেন যে সাতদিনের মধ্যে তিনি যাহা ইচ্ছা উপভোগ করিতে পারিবেন। মৃত্যুর বিভীষিকা যাঁহার সম্মুখে, তিনি উপভোগ করিবেন কেমন করিয়া? বীতশোকের এই জ্ঞান হইলে অশোক বুঝাইয়া দিলেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এইরূপে সংসারভোগ করেন। বীতশোক সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইলেন। কিন্তু নৃশংস জৈনহত্যা নিবারণকল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন। অশোক আবার সর্ব্বধর্ম্মে সম ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অঙ্কে অশোক মারের সকল প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইয়া বুদ্ধদেবের কৃপালাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য তিনি অশেষবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। দেবী, মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা ও ভিক্ষুদল দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। কিন্তু মার প্রেরিত চিত্তহরা অশোকের জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। চিত্তহরা কুণালের প্রেমে উপেক্ষিতা হইয়া প্রতিশোধ কামনায় অশোককে বশ করিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটনের জন্য আদেশ নিল। অন্ধ হইয়া কুণাল তাঁহার পত্নী কাঞ্চনমালা সহ ভ্রমণ করিতে করিতে বোধিদ্রুমের তলে উপস্থিত হইলেন। চিত্তহরা সেই সময়ে অশোককে বিষদান করিয়া হত্যা করিতে যাইতেছিল। চণ্ডালিনী বেশে পদ্মাবতী ইতিপূর্ব্বে অশোকের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি চিত্তহরার ষড়যন্ত্র আকালের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। অশোককে রক্ষা করিবার জন্য আকাল সেই বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল। তাহা দেখিয়া ভীতা চিত্তহরাও বিষপানে আত্মহত্যা করিল। উপগুপ্তের কৃপায় আকাল জীবন পাইল, কুণাল চক্ষু পাইলেন। অশোক দৌহিত্র সম্প্রীতিকে রাজ্য দিয়া নিজের শেষ সম্বল হরীতকী খণ্ড পর্য্যন্ত সঙ্ঘকে দান করিলেন। এইরূপে কঠোর আত্মত্যাগের দ্বারা তিনি বুদ্ধ-দেবের কৃপালাভে সমর্থ হইলেন—মারের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল।

গুরুমহাশয়

(গল্প)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

ক্ষুদ্র আনন্দপাড়া গ্রামখানির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাঠশালাও ছিল, এই পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন বৃদ্ধ হরিশ চক্রবর্ত্তী।

অনেককাল আগে পাঠশালাটী যখন সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছিল সেই সময় উপযুক্ত একটী গুরুমহাশয়ের অভাব বেশী রকমই অনুভূত হইয়াছিল। সে আজ অনেক কালের কথা, বোধ হয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর হইবে। তাহার পর একদিন বাদলার বৈকালে টিপটিপে বৃষ্টির সময় তালপাতার ছাতা হস্তে অকস্মাৎ গ্রামে গুরুমহাশয়ের আবির্ভাব সে এক অচিন্তিত অভাবনীয় ব্যাপার।

তাহার পর হইতে গুরুমহাশয় এই গ্রামেই রহিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। যখন আসিয়াছিলেন তখন তিনি তরুণ বয়স্ক, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স মাত্র।

অনেক দূরে ঢাকা জিলার কোনও পল্লীগ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। কলেরা রাক্ষসী লেলিহান জিহ্বা বিস্তৃত করিয়া যখন তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই গ্রাস করিল তখন একা তিনি জীবনে নিতান্ত বীতস্পৃহ হইয়াই দেশ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স বার তের। আমাদের দেশে ঘরে যেসব ছেলেদের বাপ মা আছে তাহারা এ সময়টায় আঁচলে ঢাকাই পরিয়া থাকে।

চলন সই লেখাপড়াটা কবে কোথায় কাহার কাছে তিনি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। উনিশ কুড়ি বৎসরে তিনি পাঠশালা চালানোর ক্ষমতা যে লাভ করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চয়ই সত্যকথা বলিতে হইবে।

তখনকার দিনে দেশে এত সংবাদ পত্র ছিল না, এত বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়িও ছিল না। এখন দেখিতেছি সামান্য একটা পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুলের একটী মাষ্টারীর জন্য দেড়শ খানি দরখাস্ত পড়ে, চাকরীর বাজারও এত আগুন হইয়া উঠিয়াছে। অনেক বি-এ পাশ ছেলে সামান্য কুড়ি পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরীও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সেকালের ইতিহাসে পড়িয়াছি ইংরাজের প্রথম রাজত্ব সময়ে অতি কষ্টে দশটী বারটী ইংরাজি শব্দ কোনও ক্রমে জুড়িয়া বলিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরী মিলিয়া যাইত, আর আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালী চাকরী খুঁজিয়া পায় না!

গুরুমহাশয় বিজ্ঞাপন দৃষ্টে এ গ্রামে আসেন নাই। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে অতিথি হইয়া গিয়াছিলেন। গৃহস্থ তাঁহার বিদ্যা আছে জানিতে পারিয়া এই গ্রামে গুরুমহাশয় হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়াই তাঁহার চাকরী হইয়া গেল।

মাহিনা ছিল মাসিক আট টাকা। কথাটা শুনিয়া এখনকার দিনে কেহ হাসিবেন না যেন। এই আট টাকা হইতেই তিনি টাকা জমাইতেন। তখনকার দিনের আট টাকা এখনকার আটশত টাকার সমান শ্রীযুক্তা সফিয়া খাতুনের এই কথাটী একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে চাল ছিল দুইটাকা মণ, এখন সেই চাল দশটাকা মণ দরে বিকায়। পল্লীগ্রামে তরকারী মাছ দুধ প্রভৃতি খুবই সস্তা ছিল কেন না রেলপথের এতদূর বিস্তৃতি হয় নাই। দেশের সব লোকেই কলিকাতা বা অন্য সহরবাসী হয় নাই, কাজেই সব জিনিষই কলিকাতায় অগ্নিমূল্যে বিক্রিত হইতে যাইত না। আজ আনন্দপাড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের ম্যালেরিয়া-পীড়িত দেহের পানে তাকাইলে চোখে জল আসিয়া পড়ে, তখন এ রকম দেহ ইহাদের ছিল না।

যাক সেকথা, গুরুমহাশয়ের কথাই হোক।

গুরুমহাশয়ের দিন বড় সুখেই তখন কাটিয়া যাইত।

মুসলমান ও হিন্দু সকলেই তাঁহাকে বড় ভালবাসিত কারণ তাঁহার মনটা বড় সরল ও উদার ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের ছেলেরা সমভাবে তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইত, নিজে হিন্দু বলিয়া হিন্দুর উপরেই অসাধারণ পক্ষপাতিত্ব তিনি দেখান নাই। তিনি হিন্দুর সহিত মহাভারত রামায়ণের আলোচনা করিতেন, মুসলমানের সহিত কোরাণ লইয়া আলোচনা করিতেন। দেশের কৃষক সম্প্রদায় আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া—তাঁহাকে ভক্তি করিত—ভালবাসিত।

এই সব কৃষকদের সহিত তিনি এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন যাহাতে কেহই তাঁহাকে পর ভাবিতে পারিত না। তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজে কর্ম্মে সব তাইতেই তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিত, তিনিও সানন্দে যোগদান দিতেন। ইহারা নিজেদের গৃহ হইতে পাল পার্ব্বণে গুরুমহাশয়কে পুরস্কৃত করিত, তবে সে টাকা পয়সা দিয়া নয়। যাহার ঘরে যাহা জুটিত সে তাহাই দিত। কেহ চাল, কেহ ডাল, কেহ নূতন গুড়ের পাটালি, কেহ নূতন সরিষার তৈল ইত্যাদি। গুরুমহাশয় ইহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হইয়া গিয়া মহা আনন্দে এখানে বাস করিতে লাগিলেন। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁহার একেবারেই উঠিয়া গিয়াছিল, একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর তিনি দেশে যান নাই।

কুড়ি বৎসর পরে একবার জন্মভূমি দেখিবার ইচ্ছা প্রবলভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠায় তিনি কয়েকদিনের জন্ম তাঁহার প্রিয়পল্লীটি ছাড়িয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দশদিনের স্থলে একমাস অতীত হইয়া গেল গুরুমহাশয় আর ফেরেন না। আনন্দ পাড়ার লোকেরা জানে না ঢাকা দেশ কোথায়। আর জানিলেও চাষামহলে পত্র লেখা তখনকার দিনে একটা বিরাট কাণ্ড ছিল কাজেই অতদূরে কেহ অগ্রসর হইতে পারিল না। একটী পড়ুয়া একদিন একখানা কাগজে গুরুমহাশয়কে কঞ্চির কলম দিয়া মোটা মোটা অক্ষরে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিল এবং দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সেই ঠিকানা বিহীন কাগজখানা মুড়িয়া মুড়িয়া দলা পাকাইয়া একটা পোষ্ট বক্সে ফেলিয়া দিয়া মহানন্দে বাড়ী ফিরিল। তাহার ধারণা ছিল এ পত্র গুরুমহাশয় ঠিক পাইবেনই। তিনি যে সে পত্র কেমন পাইয়াছিলেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

দু তিন মাস গেল গুরুমহাশয় যখন ফিরিলেন না তখন অত্যন্ত নিরাশ হইয়াই ভগ্নহৃদয় গ্রামবাসীরা আর একটী গুরুমহাশয়ের খোঁজ করিতে লাগিল, কেন না ছেলেদের পড়া সব মাটী হইয়া গেল। ইহা তাহারা সদুঃখে প্রকাশ্যে স্বীকার করিল "গুরুমশাই আবার একজন এলে পরেও যেমনটী গেছে তেমনটী যে আর জুটবে না এ ঠিক কথা।"

ঠিক এমনই সময়ে সস্ত্রীক গুরুমহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। দেশে যাইবা মাত্র তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় জোর করিয়া বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছেন।

দেশের অধিবাসীরা ভারি খুসি হইয়া উঠিল। তাহারা একটা মতলব ঠিক করিল এবং একদিনে সকলে একে একে কেহ দুই আনা কেহ চার আনা দিয়া গুরুপত্নীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া গেল। কৃষক পত্নীরা দলে দলে দুপুরে আসিয়া গুরুমহাশয়ের ক্ষুদ্র অঙ্গন জাঁকাইয়া বসিল।

সে আজ সতের আঠার বৎসরের কথা। ইহার মধ্যে কবে গুরুমহাশয়ের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল আবার কবেই বা শূন্য হইয়া গেল তাহা যেন স্বপ্নের মতই মনে হয়। একে একে কয়টী ক্ষুদ্র শিশুকে গুরুমহাশয়ের অঙ্গনে বসিতে দাঁড়াইতে দৌড়াইতে দেখা গিয়াছিল, তাহারা গুরুমহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহে হাসির ঢেউ বহাইয়া দিয়াছিল, বাঁশীর স্বরে গান গাহিয়াছিল, আজ সে সব আশ্চর্য্যের কথা। তাহারা আজ কেহ নাই, তাহারা আসিয়াছিল—সব চলিয়া গিয়াছে, রাখিয়া গিয়াছে তাহাদের হাসির সুর, কথার রেস, উন্মত্ত অশান্ত চরণ ক্ষেপনের দাগ।

স্ত্রীকে বেশীদিন সে জ্বালা সহ্য করিতে হয় নাই। কোলের সন্তানটীকে হারাইবার মাস খানেক পরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে পুণ্যবতী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। আজ সংসারে একা রহিয়াছেন গুরুমহাশয়।

আগেকার মত উৎসাহ তাঁহার আর নাই। মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া নিবিষ্ট ভাবে আর তিনি শিক্ষা দিতে পারেন না। থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কোন সময় অন্য মনস্ক হইয়া পড়েন, তামাক টানিতে টানিতে তামাক টানা বন্ধ হয়, হাতের হুঁকা

হাতেই রহিয়া যায়। মুখে সেই হাসি এখনও আছে কিন্তু সে যেন জোর করিয়া টানিয়া আনা।

মানুষটা ছিলেন যথার্থ মানুষ, মাঝখানে দমকা হাওয়ার মত এই কয়েকটী প্রাণী আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে যেন একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিয়া গেছে। নিতান্ত শান্ত বলিয়া তাই এখনও তিনি কোনও ক্রমে টিকিয়া আছেন, আবার হাসিতেছেন ও অন্য মনস্ক ভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন।

যে সময় কাছে কেহ থাকে না—অবশ্য তেমন নির্জ্জনতা পাওয়া যায় রাত্রে, যে সময় কেহ কাছে থাকে না, সেই সময় তামাক টানিতে টানিতে অন্যমনা তিনি ভাবিতে থাকেন—যাহারা আসিয়াছিল আবার নির্দ্দয় হইয়া চলিয়া গেছে—তাহাদের কথা। জানি তিনি জোর করিয়া মনকে বুঝাইতে চান – তাহারা গিয়াছে ভালই হইয়াছে। আগেকার দিনে আট টাকায় সচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া ও মাসে তিনচার টাকা তিনি ফেলিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, এখনকার দিনে এই আটটাকা ও ছেলেদের দেওয়া সামান্য চাল ডালে তিনি অতগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতেন কিরূপে? ভগবান দয়া করিয়াই তাঁহার ভার পূরণ করিয়াছেন। এ বেশ হইয়াছে। সব ছেলেদের তিনি প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে পারিতেছেন, সকলকেই আপনার কোলে টানিতে পারিতেছেন। যদি তাঁহার সন্তান কেহ বাঁচিয়া থাকিত তবে তিনি পরের ছেলেকে কখনই এমন ভাবে ভালবাসিতে পারিতেন না। নিজের অভাব না মিটিলে কেহ পরের অভাব মিটাইতে পারে না—তিনিও পারিতেন না।

মনের ক্ষোভটাকে তিনি কিছুতেই জাগিয়া উঠিতে দিতে চাহিতেন না। ভোরবেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই দরজাটার শিকল তুলিয়া দিয়া কড়ি বাঁধা থেলো হুঁকা, কলিকা ও কিছু তামাক গামছায় লইয়া পল্লী ভ্রমণে বাহির হইতেন। অবশ্য কখনই তাঁহার তামাক আর ব্যয় হইত না, বরং ডবল হইয়া বাড়ীতে ফিরিত। বেলা দশটা এগারটার সময় ফিরিয়া স্নান সমাপনান্তে ভাতেভাত রাঁধিয়া খাঁটী গব্য ঘৃত ও শেষটায় খাঁটি দুধ দিয়া আহার শেষ করিয়া লইতেন, ততক্ষণ পড়ুয়া ছেলেরা বাহিরের বড় চালাটায় বিচিত্র কলরব পূর্ণ করিয়া রাখিত। সকলেই বাড়ী হইতে চাটাইয়ের আসন, পাততাড়ি খাকের কলম ও একটা করিয়া মাটীর দোয়াত বহিয়া আনিত। পাঠশালায় ঘড়ি ছিল না, সূর্য্যের গতি নিরূপণ করিয়া পাঠশালার কার্য্য চলিত।

ছুটি হইলে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া গুরুমহাশয় ল্যাম্পভরা কাঁচের লণ্ঠন হাতে লইয়া বাহির হইলেন। ফিরিতে রাত্রি হইল, তাহার পর ওবেলার ভাত ও দুধ খাইয়া তিনি শুইয়া পড়িতেন, এই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য।

প্রত্যহ সকলের খোঁজ বিশেষ করিয়া জানা তাঁহার নিত্য আবশ্যকীয় কার্য্য ছিল। হরির মেয়েটার অসুখ, সে এখন কেমন আছে, নিতাইয়ের জমিটায় সার দেওয়া হল কিনা, ইব্রাহিমের জমিতে এবছর আলু দিলে খুব ভাল ফলবে, রহিমের কলাগুলো সেদিন পাখীতে খেয়ে ফেলছে দেখা গেছে, সেগুলো আর গাছে না রেখে কেটে ফেলা ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখনকার দিনে যখন গ্রামে ডাক্তার কাকে বলে তাহা কেউ জানিত না তখন গুরু মহাশয় ইহাদের দেখাশুনা করিতেন। তাঁহার কাছে অনেক রকম ঔষধ-পত্রাদি থাকিত সে সব দেশীয় গাছ গাছড়ায় তৈয়ারী করা। অনেকে তাহাতে বেশ ফলও পাইত। অনেক হিন্দু কৃষকের বাড়ীতে গুরুমহাশয় পুরোহিতের কাজও করিয়াছেন। গ্রামের লোক এই সব কারণেই গুরুমহাশয়ের নিতান্ত ভক্ত ছিল. গুরুমহাশয়কে তাহারা মানুষের উপরে আসন দিয়াছিল। ছেলেরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত, কেন না গুরু মহাশয় কখনও কাহাকেও বিশেষ অপরাধ ব্যতীত মারেন নাই। ছেলেদের ধর্ম্মে মন ছিল, নিষ্ঠা ছিল। হিন্দু মুসলমানকে ভাই বলিয়া যেমন টানিত, ভালবাসিত, মুসলমানও হিন্দুকে তেমনি ভালবাসিত।

পুরাতন কাল চলিয়া গেল, নূতন কাল আসিয়াছে।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের কথা চলিতেছে, শিক্ষা চাই, না হইলে জ্ঞানলাভ হইবে না. জ্ঞান না পাইলে মানুষ মানুষ হইতে পারিবে না।

আনন্দপাড়ার প্রধান রতন মণ্ডল সহর ঘুরিয়া গিয়া বলিল "একখানা দরখাস্ত করতে হবে আমাদের গাঁয়ের এই পাঠশালাটার জন্যে—কি বলুন গুরুমশায়?"

রতন মণ্ডলও একদিন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়িয়াছে। এখন তাহার তিনটী ছেলে এই পাঠশালায় পড়ে।

গুরু মহাশয় অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন কিসের দরখাস্ত ?"

রতন বুঝাইয়া দিল এই পাঠশালাটার জন্ত একটা দরখাস্ত করিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট পাঠশালা গৃহটী মেরামত করাইয়া এমন কি পাকা করিয়াও দিতে পারেন। সে শুনিয়াছে অনেক স্থানে সেকালের পাঠশালাগুলি এরূপ আশ্চর্য্যভাবে বদলাইয়া গিয়াছে যে সেগুলি যে পাঠশালা তাহা আর মনে হয় না। গভর্ণমেণ্টের চোখ যদি পড়ে তবে পাঠশালার ছেলেদের চেটাইয়ের আসনে বসিতে হইবে না, গুরু মহাশয়কেও স্বতন্ত্র মাদুর বিছাইয়া বসিতে হইবে না ; গভর্ণমেণ্ট বেঞ্চ চেয়ার সব দিবেন। এই যে রৌদ্রতেজ দেখিয়া সময়ের নিরূপণ করিতে হয়, একটা ঘড়ি থাকিলে বেশ হয়। ছেলেরা জানিতে পারিবে ঠিক দশটার সময় তাহাদের স্কুলে হাজির হইতেই হইবে এবং চারটার সময় ছুটি পাইবে। ছেলেরা নিজেরাই পাঠশালা ঝাঁট দেয়, গভর্ণমেণ্ট একটা লোককে মাহিনা দিয়া রাখিতে পারেন যে ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিবে।

গুরু মহাশয় বিষণ্ণভাবে রতনের পানে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন যদি ইহা হয় তাহা হইলে তাঁহারও গুরুমশাই-বৃত্তিটী ঘুচিল। তাঁহার যে বিদ্যা আছে—যাহা লইয়া তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর এই গ্রামের বাপদের শিক্ষা দিয়াছেন, এখন ছেলেদের শিক্ষা দিতেছেন, তাহা আজকালকার শিক্ষার উপযোগী আদপেই নয়।

শুষ্ককণ্ঠে তিনি বলিলেন "তা হলে তোমরা আমায় এখন বিদায় দিতে চাও রতন ?"

রতন সসম্ভ্রমে নত হইয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা দুইহাতে লইয়া মাথায় দিল,—"অমন কথা বলবেন না গুরুমশাই। আপনার চরণের ধূলোর জোরে আমরা মানুষ হয়েছি, আমাদের ছেলেরাও মানুষ হবে। আপনাকে কেউ ছাড়াতে পারবে না সে ভয় আপনার নেই। আপনার শিক্ষা এক আর এখনকার শিক্ষা এক, কার সঙ্গে কার তুলনা। আমি আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি গুরুমশাই। সেদিন বড় ছেলেটা আমার সঙ্গে সহরে গিয়েছিল, পথে আসতে স্কুলটা দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আসবার সময় বড় দুঃখ করে আমায় বললে—ওদের পাঠশালায় এত চৌকি রয়েছে, আমাদের পাঠশালায় নেই কেন বাবা ? তার কথা শুনে আমি দু'চারজন ভদ্দর লোককে এ কথা জিজ্ঞাসা করলুম, তাতে তারা বললেন দরখাস্ত করলে তোমাদের পাঠশালাও ভাল হবে। সরকার যদি টাকা দেয় গুরুমশাই, আপনার মাইনেও কিছু বাড়িয়ে দেব আমরা, এতে আপনারই ভাল হবে।"

রতনের জোর কথায় গুরু মহাশয় আশ্বস্ত হইলেন। গ্রামের সকলের নাম স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত লিখিত হইল এবং তাহা পাঠানও হইয়া গেল। কবে উত্তর আসিবে তাহার জন্ম গ্রামের প্রধানেরা দিন গণিতে লাগিলেন।

সংবাদ আসিল ইনস্পেক্টার আসিতেছেন, তিনি সব দেখা শোনা করিয়া বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া যাইবেন।

ক্ষুদ্র গ্রামে সাজ সাজ রব উঠিয়া পড়িল। ইনস্পেক্টার পাঠশালা দেখিতে আসিতেছেন এ কি বড় কম কথা। ইনস্পেক্টার যে কি তাহাই অনেকে জানে না, তাহারা গুরু মহাশয়ের কাছে তথ্য জানিতে ছুটিয়া আসিল।

গুরু মহাশয়ের যে বিদ্যাও তথৈবচ, তবু তিনি কোন প্রকারেণ বুঝাইয়া দিলেন যে ইনস্পেক্টার হাকিম, যিনি মানুষকে জেলে দেন।

সেদিন ক্ষুদ্র গ্রাম ওলোটপালোট, ইনস্পেক্টার আসিয়াছেন !

তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন। গ্রামের লোক হাঁ করিয়া তাঁহার কোটপ্যাণ্ট—হ্যাট—সুশোভিত মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহার ঘোড়াটাকে হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল।

ইনস্পেক্টার পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে আছেন গুরুমহাশয় ও কৃষকদের মধ্যে প্রধান কয়জন। ইহারা সব দেখাইয়া শুনাইয়া পরিচয় দিতেছিলেন।

গুরু মহাশয়ের বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিতেছিল। হুজুর যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার উত্তর কয়েকটা জানা থাকিলেও তাঁহার মুখে আটকাইয়া গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত জ্ঞানহারা হইয়াছেন তাহা ইনস্পেক্টার বুঝিলেন না, তিনি

কুঞ্চিত করিয়া আপন মনে উচ্চারণ করিলেন—"স্টুপিড্, ব্রুট।"

দুই চারদিন যাইতে না যাইতেই জানা গেল পাঠশালা নূতন শিক্ষার অনুযায়ী করিয়া গড়িতে হইবে। রাজমিস্ত্রী আসিয়া কার্য্যে লাগিল, বস্তা বস্তা চুণ, বালি, গাড়ী বোঝাই ইট আসিয়া পড়িল। রতন সসম্ভ্রমে নিজের বাড়ীর সামনের খোলা জমীটা স্কুলের জন্য দান করিয়া ফেলিল, সেই খানে স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল।

ততদিন পুরাতন ঘরেই পাঠশালা চলিতে লাগিল। গুরু মহাশয় আগেকার মতই ছাত্রদের পড়াইতে লাগিলেন। তিনি তখনও স্বপ্নেও জানেন নাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ হইয়া আসিয়াছে। যে কাজে তিনি বিয়াল্লিশ বৎসর নিযুক্ত আছেন কর্ত্তাদের আদেশে সে কাজ তাঁহার হাত হইতে খসিয়া গিয়াছে।

তিনি প্রসন্নমুখে আগেকার মতই পাড়ায় পাড়ায় হুঁকা হাতে ঘুরিতেন, হাকিমের গল্প সগর্ব্বে করিতেন। তিনি কিরূপ চতুরতার সহিত হাকিমের সহিত কথা কহিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেন।

স্কুলে সংলগ্ন মাষ্টারের গৃহও নির্ম্মিত হইয়া গেল। গ্রামবাসীরা সানন্দে বলাবলি করিতে লাগিল গুরুমহাশয় এবার কোঠা ঘরে বাস করিবেন।

গুরুমহাশয় অশ্রু ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন "এই সময়ে যদি সে বেঁচে থাকত।"

টেবিল চেয়ার বেঞ্চ আসিয়া পড়িল, দেয়ালের ব্ল্যাক বোর্ড, বড় বড় ম্যাপ, কিছুই বাকি রহিল না।

অবশেষে যেদিন ইনস্পেক্টারের সহিত বি-এ পাশ তরুণ যুবক একটী পায়ে পম্পস্, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি—আসিয়া দেখা দিল, গ্রামের লোক যখন শুনিল ইনিই মাষ্টার—তখন তাহারা বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গেল।

চুপি চুপি কেহ জিজ্ঞাসা করিল "মাইনে কত—আট টাকা?"

রতন গম্ভীর হইয়া বলিল "দূর দূর, ইনি কি গুরুমশাই যে আট টাকা মাইনে হবে? ইনি যে সার মশাই, এঁকে ছেলেরা সার মশাই বলে ডাকবে, ইংরিজি শিখবে, বাবু হবে, এঁর মাইনে কখনও আট টাকা হতে পারে? হাকিম এঁকে তিরিশ টাকা করে দেবেন শুনলুম।"

নব নিযুক্ত মাষ্টারের অভ্যর্থনায় সারা দেশ উন্মত্ত হইয়া গেল, ছেলেরা তন্ময়চিত্তে মাষ্টারের কাছে কাছে রহিল। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া একটা আদেশ করিলে সে যেন চরিতার্থ হইয়া যায় এমনিই তাহাদের ভাব।

এই গোলযোগে বৃদ্ধ গুরুমহাশয় কোথায় চাপা পড়িয়া গেলেন কে জানে। কেহ তাঁহার খোঁজ লইল না, বৃদ্ধও আর ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন না।

সেদিন স্কুলে ছেলেরা যখন ফাষ্ট বুক লইয়া চীৎকার করিতেছে বি—এল—এ—রে, বি—এল—ই—ব্লি, তখন গুরুমহাশয় নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে পথের উপর দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্কন্ধে সেই জীর্ণ তালপত্রের ছাতা, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, হাতে একটা বোঁচকা। তিনি আজ কয়দিন পরে ঘরের বাহির হইয়াছেন, চেহারা বড় মলিন, বড় ক্ষীণ। আজ জন্মের মতই তিনি তাঁহার ঘর, তাঁহার পরিচিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

যাইবেন কোথায় তাহার স্থিরতা নাই। আজ মনে হইতেছিল তিনি সোণা ফেলিয়া রাংতা কুড়াইয়াছেন। আজ মনে হইতেছে জাগিয়া সারা জীবনটাই তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহার বড় সাধের পাঠশালা শূন্য, বায়ু হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে। দূর হইতে ইংরাজি স্পেলিং কাণে আসিতেছে।

যাওয়ার স্থান নাই—তবু তাঁহাকে যাইতেই হইবে। এখানে আর থাকিবেন কি লইয়া, সবই যে ফুরাইয়াছে।

"তারা ব্রহ্মময়ী—"

গুরুমহাশয় দক্ষিণ পদ বাড়াইলেন।

আর কখনও তাঁহাকে সে গ্রামে দেখা যায় নাই। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহাশয় সম্বোধনটাও গ্রাম হইতে বিলীন হইয়া গেল।

সৃষ্টি-স্রোত

[শ্রীধ্বজবজ্রাঙ্কুশ]

অতীতের একটা ভগ্ন স্তূপের উপর আমি বসিয়া আছি। আজ আমার মনে হতেছে যে, আমাকে দিয়ে আর কি কোন নূতন সৃষ্টি হবে ?

যে সৃষ্টি, চক্ষের পলক ফেলিতে প্রলয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সে সৃষ্টির প্রয়োজন কি ?

তবু বারে বারে নূতন সৃষ্টি আর পুরাতন ধ্বংস,—আসে যায়। চলেছে—ফুরায় না। নূতন বুকে নূতন ভালবাসা ফুটে—তারপরে আবার সেই অপরিহার্য্য—বিচ্ছেদ এসে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। সেই একি দ্বন্দ ও কোলাহল ঘুরেফিরে আসে,—মন্থনে সেই একই হলাহল ফেণিল তরঙ্গে উছলিয়া উঠে। চলে যায়—আবার ফিরে আসে। থাকে না কিছুই। থাকে একটা চলন্ত প্রবাহ—জলন্ত শ্মশান—জীবন্ত মূর্ত্তি স্রোত।

এই প্রবহমান মূর্ত্তি স্রোতে আমি অবগাহন করিতে গিয়াছিলাম। বুঝি ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গেছি। ধাতু পাষাণ মাটী, কত মূর্ত্তি আমার বুকে মুখে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কোন মূর্ত্তিতেই ত আমি নিজের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এক একবার মনে হইয়াছে এই বুঝি সেই। আকুল আগ্রহে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছি। স্রোতে কিছু দূরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তারপর সহসা একদিন দেখি—না এত সে নয়—অমনি আবার ডুব দিয়াছি··· আবার ভাসিয়াছি—আবার খুঁজিয়াছি। এমনি স্রোতেভেসে চিরদিন বহে গেছি। বহে যেতেছি।

কত মূর্ত্তিতে কত দাগ রেখে এসেছি। তারা কি তা মুছে ফেলেছে ? হবে বা।

কখন কখন এই স্রোতে ভাসিতে আমার বড় সাধ গিয়াছে। কত জনকে নিয়ে কতবার আমি এই স্রোতে ভেসেছি—কাঁধে নিয়ে সাঁতার দিয়েছি। আবার তারা খসে গে'ছে—ভেসে গেছে, কিন্তু কেঁদে গে'ছে সবাই। এই স্রোতকে কখনো বা আমি আমার দুই মুঠির মধ্যে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। পারি নাই। মূর্ত্তি ভেঙ্গে যায়। স্রোত বহে যায়। ফেলে যায়—চলে যায়। ফিরে না।

আজ আবার আমি এই ভগ্ন স্তূপের মধ্যে বসে আছি অথচ সম্মুখে দেখিতেছি সেই স্রোত—সেই আবর্ত্ত স্রোতাবর্ত্তে সেই ক্লেদ ও পঙ্ক। এই ধ্বংসের মধ্যে বসে আবার একটা নূতন সৃষ্টির কল্পনা আমার মনে জাগে কেন ? আমার কি নিবৃত্তি নাই ? লজ্জাও বুঝি না ?

সৃষ্টি ছুটেছে প্রলয়ের মুখে। আমি ছুটেছি কোথায় ? কোথায় আমার সৃষ্টি ? কোথায় আমার প্রলয় ? কোন সূর্য্যে আবার আমি জ্বলিয়া উঠিব ? কোন রাহু আবার আবার আমায় গ্রাস করিবে ? কি অভিশপ্ত দুর্ব্বার এই স্রোতধারা। কাল-মৃত্যু ফণা তুলে এসেছে তারি মাথায় জীবনের নৃত্য চেয়ে দেখিতেছি। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দামিনি ঝলক্। জীবন মৃত্যু থেমে গিয়ে অনন্ত অতলে একদিন সব ঘুমিয়ে পড়ে না ? তা হ'লে আমার কি হবে ?

সৃষ্টি সাঁতার কেটে চলেছে। এই সৃষ্টিতে—আদি নাই অন্ত নাই কে সাঁতার দিয়াছে ? ধারা থেকে ধারা ছুটে কত মুখে কত দিকে ছড়ায়। কত জ্বলে উঠে—কত নিভে যায়,—আবার জ্বলে আবার নিভে! অন্ত নাই—অন্ত নাই!

তবে আমারো সৃষ্টি বুঝি আবার জ্বলেই উঠিবে ? এত জ্বালা—না জ্বলিয়া ত নাভবে না। আমাকে তাই জ্বলিয়া উঠিতে হবে। আবর্জ্জনা যত সব পুড়িয়া ফেলিতে হবে। সেই ভস্ম গায়ে মেখে আবার আমায় ধ্যানস্থ হতে হবে। ধ্যানেই সৃষ্টির জন্ম। কিন্তু আমি কি আবার জ্বলিতে পারিব ? একটা স্ফুলিঙ্গ—এতটুকু একটা কণা অবশিষ্ট নাই ? জ্বলিতে আসিয়া কি আমি এমনি করিয়াই নিভিয়া গেলাম ? ওরে ভগ্ন পাখা বিহঙ্গম আমার,—ঐ সুদূর শূন্যে অসীম রহস্যের বুকে আর কি তুই উড়িতে পারিবি না ? কি হয়েছে তোর,—দুরন্ত,—উদ্ধত বিদ্রোহী আমার! না! আমায় জ্বলিতে হবে। আমি জ্বলিব। বড় অন্ধকার। আমার সঙ্গে কে জ্বলিবে এস। একটা অচেতন সৃষ্টি আমার অপেক্ষায় পড়ে আছে,—আমায় যেতে হবে। আমি বুঝিতে পেরেছি। হোক দুই চক্ষু অন্ধ—তবু এ শক্তি। কি প্রচণ্ড কি দুর্ব্বার! স্থির থাকিতে দেয় না। আমারো শক্তির পরিচয় এরা জানে না। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার—চলিতে গেলেই পায়ের তলে ছন্দ জাগে। তাণ্ডবে চলি আমি—অনুপরমাণু শ্লথ হয়ে খসে পড়ে যায়। আমি নিরুপায়।

প্রত্যেক সৃষ্টির পরেই আমি মরে যাই। আমি কতবার মরে গেছি। সব আমার মনে আছে। কিন্তু মরণ ত আমার নাই। অমরত্বের চির অভিশাপ নিয়ে—আমি ছন্দাবেগে তাণ্ডবে ছুটে চলেছি। সৃষ্টি ও প্রলয় আমার পায়ের তলে গড়িয়ে যেতেছে! আমি চলেইছি।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(২৪)

কি একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথায় ও আশার ক্ষীণ আশ্বাসে আমার দীর্ঘ দিবা অতিবাহিত হইয়া রজনী আসিল। আত্মীয় কুটুম্বিনীগণ মধ্যাহ্নের আহারাদির পর প্রায় সকলেই বিদায় লইয়া গৃহে গিয়াছিলেন। কাজেই এ বেলার রান্না খাওয়া মিটিতে বিলম্ব হইল না।

গত রজনীর মত আজও দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে আমি তাঁহার কক্ষে উপনীত হইলাম। কিন্তু আমি মহাভুল করিয়া বসিলাম। মঞ্জু আমাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছিল। আমি ভুলক্রমে তাঁহার শয়ন গৃহের পরিবর্ত্তে পাঠ গৃহে ঢুকিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিলাম।

তিনি জানালার পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অন্যমনস্কের মত বসিয়াছিলেন। আমি সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিলাম না। সে মুখ যেন দূরে, বহুদূরে — আমার সহিত তাহার এতটুকুও সংশ্রব নাই ; সেই বিপুল ব্যথাভরা মুখ চোখ নিরীক্ষণ করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস নির্গত হইল। বোধ হয় সেই শব্দেই তিনি অকস্মাৎ মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত, জ্যোতির্ম্ময়, রহস্যময় চক্ষের উৎসুক দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখে আবদ্ধ হইয়া রহিল। আমি বধূজন-সুলভ লজ্জা ভুলিয়া, সঙ্কোচ ভুলিয়া, পিপাসিতের মত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সবেগে ঘরের ভিতর কয়েকবার পায়চারী করিয়া, সহসা আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরস্বরে কহিলেন—"তুমি এ ঘরে এসেছ কি জন্যে ? আমাকে কি কিছু বলতে চাও ?"

এ প্রশ্নে আমার হৃদয় আন্দোলিত হইল। দুঃখের বাষ্পে চোখে জল আসিল। আমি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিলাম—"তোমার বিছানায় তুমি গিয়ে শোওগে। কাল রাত তোমার কষ্টে কেটে গেছে। আমার জন্যে তোমাকে ঘর ছেড়ে, বিছানা ছেড়ে থাকতে হবে না আমি নীচে মঞ্জুর কাছে গিয়ে শুচ্ছি। তাই বলতেই এসেছি।"

শেষের মিথ্যাটুকু বলিতে আমার স্বর কাঁপিয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। আস্তে আস্তে সেইখানে বসিলাম।

তিনি একটু ভাবিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"তোমায় মঞ্জুর কাছে গিয়ে শুতে হবে না ! তুমি কাল যেখানে শুয়েছিলে আজও সেইখানে শোওগে ; আমার বিছানা আমি এখানেই করে নিয়েচি। আমার কোন কষ্ট হবে না।"

অঙ্গুলি তুলিয়া তিনি তাঁহার বিছানা দেখাইয়া দিলেন। একখানি ছোট নেয়ারের খাটে তাঁহার নবশয্যা বিস্তৃত হইয়াছিল ; সেই শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিসের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া আমি মূঢ়ের মত বলিয়া ফেলিলাম—"এত দিয়ে কাজ কি ; আমি কালো, আমি তোমার অনুপযুক্ত ;—আমি বাবার কাছেই ফিরে যাব। তোমার মনের মতন দেখে তুমি আর একটি বিয়ে করে সুখী হোয়ো।"

তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আমাকে হৃদয় হীন ভেবে ধিক্কার দিতে পার, কিন্তু পাষণ্ড ভেব না। যখন কথাই তুল্লে তখন সবটাই তোমার শোনা দরকার। তুমি কাকাবাবুর পছন্দের হলেও আমার হও নি। মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্য্যের উপাসক, আমিও তাই ; আমার আশা ছিল—আমি যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবো—সে রূপে আমার

ঘর, আমার হৃদয় তুই আলো করবে। সে আশা আমার একদিনের নয়, তুই দিনের নয়, সে আশা আমার কত যুগ যুগান্ত হতে অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল।—কল্পনায় আমি যে ছবি এঁকে রেখেছিলাম, তুমি তা নও দেখে আমার চিত্ত বিমুখ হয়েছে। কোন বিষয়ে কখনো আমি মনের ওপর জোর করতে অভ্যাস করি নি; এখনও তা পারবো না। প্রসন্নভাবে অন্তরের সাথে গ্রহণ করাই আসল পাওয়া, সে প্রাপ্তির আনন্দ থেকে অন্তর আমার বঞ্চিত হয়েছে, তাই আমি অভিনয় করতে চাই না। ছলনা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। জানি—তুমি আমার ব্যবহারে ব্যথা পাবে, কিন্তু আমি নিরুপায়।"

তাঁহার মুখে এমন নূতন ধরণের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এত দুঃখেও আমার কৌতুক বোধ হইতে লাগিল। অনেক উপন্যাস পড়িয়াছিলাম, সংসারের অনেক চিত্রও দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত ইহার কোথায়ও মিল হইল না। আমি পুনরায় সসঙ্কোচে বলিলাম "আশা ভাঙ্গা দিয়ে কাজ কি? পূরণ করবার ক্ষমতা থাকতে অযথা কষ্ট পাবে কেন? তুমি মনের মতন দেখে আবার বিয়ে কর। দরকার হ'লে এ বিষয়ে আমি কাকাবাবুকে অনুরোধ করতে পারি।"

তিনি বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমি ইচ্ছা করলে—বা তুমি অনুরোধ করলে তা হবার নয়। এ সম্বন্ধে কাকাবাবুকে কোন কথা বলে তুমি আমায় অপ্রতিভ করো না।"

তিনি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি—তাহা বিষদভাবে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম "হবার নয় কেন? এর ভেতর অপ্রতিভ হ'বারই বা কি আছে?"

"অনেক আছে। কাকাবাবু যাকে মনোনীত করে এ বাড়ীর বধূপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর একটি বিয়ে ক'রে সাধারণের কাছে তাকে আমি হীন বলে অপমান কোরতে পারবো না। তাকে—তার গৌরবের আসন থেকে ধূলোয় নামাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার মনের বিরুদ্ধ ভাব কাউকে আমি জানতে দিতে চাই না; এমন কি কাকাবাবুকেও নয়। যদি কখনো আমার মনের বিরুদ্ধ ভাব কেটে যায়, হৃদয় তোমাকে গ্রহণ করতে উৎসুক হয়, সেইদিন তোমায় আমি চাইব, তার আগে নয়।" এই বলিয়া তিনি নত মস্তকে টেবিলের কাগজপত্র গুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

আমি উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিলাম না। তাঁহার হতাদরে, অবসাদে, অভিমানে আমার হৃদয়টি যেন ধূলিশয্যায় লুটাইতে লাগিল। তাঁহার স্পষ্টবাদীতায় সরলতায় আমি যেমন শ্রদ্ধান্বিত হইলাম, আবার তেমনি মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার মনের মত হই নাই, তিনি আমায় ভালবাসিতে পারিবেন না। স্ত্রীর অধিকার পাইব না ভাবিয়া আমার হৃদয়-সমুদ্রে দুঃখের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। কিন্তু সেই ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত উদ্বেলিত অন্তরে অতি সূক্ষ্ম অতি মৃদু একটা সুখের রোমাঞ্চ উত্থিত হইল—তিনি আমাকে ভাল না বাসিলেও, আমার প্রাণের পূজা গ্রহণ না করিলেও পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন না। তিনি আমারি থাকিবেন। আর কাহারো হইবেন না। হৃদয়ে না রাখিলেও সংসারের চক্ষে তিনি আমাকে গৌরবের আসনে বসাইয়া আমারই থাকিবেন, একি আমার কম সৌভাগ্য! কিন্তু আমার নারীত্ব শুধু এইটুকু লইয়াই তৃপ্ত নহে। সে যে আরও চায়, আরো কিছু পাইবার নিমিত্ত তাহার কি উদ্বেগ, কি তৃষ্ণা! তাহাকে আমি কি দিয়া শান্ত করিব? কি উপায়ে তাহার অসীম ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে?

আমি স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া আপন মনেই চিন্তা করিতেছিলাম। আমার যে কক্ষান্তরে গিয়া শয়ন করিতে হইবে তাহাও বিস্মরণ হইয়াছিলাম। হঠাৎ তাঁহার পদশব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল। তিনি বিছানার কাছে সরিয়া গিয়া বলিলেন "আমি এখন শুয়ে পড়বো, রাত ঢের হয়েছে। তোমার যদি ভয় করে মাঝের দরজার পরদাটা গুটিয়ে রেখো। আর একটি কথা—যতদিন আমার প্রাণ তোমাকে না চাইবে—ততদিন আমি একলা থাকলেই শান্তি পাব। আশা করি এতে তোমার আপত্তি হবে না।"

আর কোনদিন ভুলক্রমে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত না করিবার এটা যে আদেশবাণী তাহা

হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইলাম এবং না বলিতে উঠিয়া যাই নাই ভাবিয়া অনুশোচনায় আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

আমি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। অবশ হস্তে তাঁহার পদযুগল স্পর্শ করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলাম "তুমি না ডাকলে আমি ভ্রমেও তোমায় বিরক্ত করতে আসবো না। তোমার সে ভয় নেই। তোমার ব্যবস্থাই আমি মাথা পেতে নিলাম। তোমার শান্তিতেই আমার শান্তি। আমার আপত্তি নেই, রাগ নেই, দুঃখ নেই, আর আমি তোমার সুন্দর চোখের সামনে আমার কালোরূপ নিয়ে আসবো না। আসবো না।" বলিয়া ঝড়ের বেগে সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম।"

নিভৃতে বিছানায় মুখ লুকাইতেই আমার সমস্ত দৃঢ়তা, তেজ, গর্ব্ব কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। আমি ক্ষুদ্র বালিকার মত অজস্র অশ্রুবর্ষণে উপাধান সিক্ত করিয়া ফেলিলাম। আমার অন্তঃকরণ নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি আর বিবাহ করিবেন না, আমারি থাকিবেন—কেবল এই আনন্দটুকু আমার মনের মধ্যে রহিয়া গেল।

(২৫)

পরদিন হইতে আমি বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহার চোখের সম্মুখ হইতে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিলাম। নিজেকে লুকান আজ আমার নূতন নহে, এ ব্রতে আমি বহুকাল হইতেই ব্রতী। কখন কোন পথে তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা—কোথায় তাঁহার কিসের প্রয়োজন অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকা আমার কঠিন হইল না। কঠিন হইল আমার অবাধ্য চোখকে বশীভূত করা। সে যে আমার শাসনের বাহিরে—তাহার কাছে যুক্তি নাই, তর্ক নাই; সে আপনহারা অনিমেষ দৃষ্টিতে কাহাকে দেখিতে চায়; জানালার ছিদ্রপথে—দ্বারের অন্তরাল হইতে বড় গোপনে নিজেকে লুকাইয়া একটিবার দেখিতে চায়। ক্ষণিকের দর্শনে আনন্দাশ্রুতে পরিসিক্ত হয়। দেখা দিতে সে ব্যগ্র নহে, দেখিয়াই তাহার আনন্দ। কিন্তু বঞ্চিতকে চিরবঞ্চিত করাই বুঝি সংসারের নিয়ম। দেখিবার আনন্দটুকু আমার বেশীদিন স্থায়ী হইল না।

কয়েকদিন পর মঞ্জুর মুখে শুনিলাম তিনি কাশী যাইতেছেন। কাশীযাত্রা এই তাঁহার প্রথম নহে; তাঁহার সন্তান হীনা কাশীবাসিনী পিসিমাকে প্রায়ই তিনি দেখিতে যান। ভাইপোর বিবাহে পিসিমার আসা ঘটিয়া উঠে নাই; তিনি বধূসহ ভাইপোকে যাইতে লিখিয়াছেন। কিন্তু ভাইপো বধূসহ যাইতে প্রস্তুত নহেন একাকী যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। মা ছেলেকে ডাকিয়া পিসিমার ইচ্ছাটা পূরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ছেলে বিনীতভাবে বলিয়াছেন ইহার পর পিসিমার সাধ পূর্ণ করিবেন।

আজ সকালবেলা হইতে তাঁহার যাত্রার উদ্যোগ চলিতেছিল। তিনি সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইবেন। দিবাশেষে ক্রমেই আমার হৃদয়টা যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কণ্ঠতালু শুষ্ক হইতে লাগিল। আশা-কুহকিনী কাণে কাণে কহিল "আজ তিনি ডাকিবেন। যাইবার সময় একটিবার স্মরণ করিবেন।" কিন্তু তাহা হইল না। নির্দ্দিষ্ট সময় তিনি সকলের নিকটে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আমার আশার ক্ষীণ বাতিটা নিবিয়া গেল।

আমি ভূমিতলে লুটাইয়া ডাকিলাম "ভগবান, তুমি আমার হৃদয়ে বল দাও, বল দাও প্রভু! আমি কি লইয়া এখানে থাকিব? আমার রূপহীনতা আমাকে পরিবর্ত্তনশীল সংসারের বাহিরে লইয়া গিয়াছে। আমি অন্য স্ত্রীলোকের মত নহি, আমার অবলম্বন নাই, আমার আশা নাই। আমি অধম, আমি মূঢ়, তোমার দয়া, তোমার করুণা অনুভব করিতে পারিতেছি না। তুমি আমার হৃদয়ে বল দাও; সত্য পথে, সহজ পথে লইয়া চল!'

মেঝেয় শুইয়া আপনার মনে ভগবানকে ডাকিতেছিলাম,—এমন সময় মঞ্জু আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। ম্লানমুখে বলিল "দাদা চলে গেল, আমার মনটা বড্ড খারাপ লাগছে দিদি; কাকাবাবু বল্লেন তোমারও যাবার চিঠি এসেছে। দাদা চলে গেল, তুমি গেলে এখানে আমি কেমন ক'রে থাকবো দিদি?"

আমার আহ্বান আসিয়াছে! সেই দূর দূরান্তর হইতে ঘনগুল্ম বনবেষ্টিত শান্তিপূর্ণ কুটীর হইতে আমার আহ্বান আসিয়াছে। করুণায় বিগলিত হৃদয়ে বাবা সেখানে পথ পানে চাহিয়া আছেন; কন্যাবিধুরা জননী আমার সেখানে বসিয়া দিন গুণিতেছেন। ভগিনী স্নেহে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বেণু সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছে—সেই শান্তির স্বর্গ হইতে আমার ডাক আসিয়াছে! কিন্তু সেখানে আমি যাইব কি করিয়া? পরাজয়ের লজ্জা গায়ে মাখিয়া, অপরাধীর বেশে কেমন করিয়া পিতামাতার পাশে গিয়া দাঁড়াইব। তাঁহারা যে বড় আশা করিয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মেয়ে নিজের স্থান নিজে করিয়া লইবে, তাঁহাদের শিক্ষা ব্যর্থ হইবে না। ব্যর্থ যে হইয়া গিয়াছে, গর্ব্বোজ্জ্বল মুখে তাঁহাদের সম্মুখে যাইবার যোগ্যতা আমি অর্জ্জন করিতে পারি নাই। তবু—তবু যে যাইতে সাধ হয়। সেই আবাল্যের স্মৃতিভরা পিতৃ গৃহে মায়ের, বোনের স্নেহের সমুদ্রে ছুটিয়া যাইবার সাধ হয়।

আমি সাদরে মঞ্জুর হাতখানা ধরিয়া বলিলাম "আমার যদি এখন ইচ্ছাপুর না যাওয়া হয় মঞ্জু তা'হলে তুমি কি খুব খুসী হও?"

"সুখী হই, আবার অসুখীও হই দিদি।"

"সুখীর ভেতর অসুখীর কারণ কি?"

"কারণ হচ্ছে না যাওয়া হ'লে তোমার যে মন খারাপ হবে। তুমি যদি মন খারাপ না ক'রে এখানে থাকো—তবেই আমি খুসী হ'ব দিদি।"

"আমি মন খারাপ না করেই এখানে থাকবো। চল কাকাবাবুর কাছে যাই।"

মঞ্জু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

মঞ্জুর সহিত আমাকে দেখিয়া কাকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মঞ্জুর কাছে সব শুনেছ মা? তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন। তা শুনে মঞ্জুর মস্ত ভাবনা হয়েছে—সে থাকবে কেমন ক'রে।"

মঞ্জু মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে জবাব দিল "এখন কিছু ভাবনা নেই কাকাবাবু, দিদি আমাদের কাছেই থাকবে, কোথাও যাবে না। ইচ্ছাপুর যেতে চাইলেই আমি ছাড়তাম কি-না—এতকাল ভরে তো সেখানে থেকে এলেন, এখনি আবার সেখানে যাওয়া। তারাই বুঝি সব, আমরা বুঝি কেউ নই?"

কাকাবাবু মঞ্জুর চিবুকে একটা নাড়া দিয়া কহিলেন "ঠিক কথা বলেছিস মঞ্জু, এখন তো তাঁদের চেয়ে আমাদেরই জোর বেশী; তাঁদের চেয়ে আমরাই আপনার হয়েছি। আমাদের কাঁদিয়ে বাপের বাড়ী যাওয়া—অন্যায় বৈকি, খুব অন্যায়। কিন্তু এ যেন আমাদের দুই মা'য়ে পো'য়ের ব্যবস্থা হ'ল, আমার ইচ্ছাটি কি তা তো শুনতে হবে?" বলিয়া কাকাবাবু আমার পানে চাহিলেন। আমি নীরবে মস্তক অবনত করিলাম। আমার অন্তরে একটা বিরোধ চলিতেছিল। ইচ্ছাপুর যাইবার দুর্ণিবার ইচ্ছা, এখানে তাঁহার আশাপথ চাহিয়া থাকিবার প্রবল আকাঙ্খা আমার ক্ষুদ্র হৃদয় মথিত করিতে লাগিল। কোন ইচ্ছাটাকে আমি যে দমন করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কিয়ৎকাল পর কাকাবাবু কহিলেন "তোমার কি সেখানকার জন্যে খুব মন খারাপ হয়েছে মা? আমি যদি তোমাকে আর কিছুদিন এখানে রাখি—তা হ'লে তোমার কি কষ্ট হবে? মণি চলে গেছে, তুমিও যদি চলে যাও তা হ'লে সত্যিই শূন্য শূন্য লাগবে। শুধু তুমি একলা গেলে তাঁরাও তেমন সুখী হবেন না। মণি না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি এখানেই থাকো; সে ফিরে এলেই তোমাকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।"

অন্তর্য্যামীর মত কাকাবাবু যে আমার গোপন বাসনাটিকে এমন করিয়া ধরিয়া ফেলিবেন, তাহা আমি জানিতাম না। এখন ধরা পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম।

কাকাবাবু প্রসন্ন হইয়া কহিলেন "বেয়াই ম'শায়কে এই কথাই আমি লিখে দেব, একথা শুনে অসন্তুষ্টের পরিবর্ত্তে তাঁরা সন্তুষ্টই বেশী হ'বেন। আমার ব্যবস্থায় তুমি তো খুসী মনে রাজী হয়েছ মা? না,—মনে মনে দুঃখ হচ্ছে?"

বলিলাম "দুঃখ নয় কাকাবাবু, আপনার ব্যবস্থায় আমার দুঃখ হয় না।"

"দুঃখ হয় না, ভাল কথা মা। এখানে এখনও তোমার অনেক কাজ আছে, সেগুলো সারা হ'য়ে গেলে শ্যামা মা আমার আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে হিমালয়ে দেখা দিতে যাবেন।" বলিতে বলিতে কাকাবাবু আমার মাথায় হাত দিলেন। লজ্জাভরে আমার মস্তক আরও একটু নত হইয়া পড়িল। এ কয়েকদিন আমার দগ্ধ হৃদয়ের অবর্ণনীয় জ্বালা আমি কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই। কাকাবাবুর সম্মুখে মলিনমুখে হাসি ফুটাইয়া আমার গোপনতম ব্যথা গোপন রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছি। ধারণা ছিল—স্বামীর মনোভাব বাড়ীর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বাক্যে, ব্যবহারে, এমন কি আভাস ইঙ্গিতে আমার প্রতি বিষম বিরাগ কাহাকেও জানিতে দেন নাই। জানিতে না দিলেও এক জোড়া স্নেহভরা মমতাভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে এমন করিয়া সুস্পষ্ট দিবালোকের মত আমার অন্তঃস্থলের গোপন বারতা জানিতে পারিয়াছেন ইহা অনুভব করিয়া লজ্জামিশ্রিত পুলকে আমার অন্তঃকরণ ভরিয়া গেল। মানব হৃদয় সুখের সঙ্গীর চেয়ে—দুঃখের দরদীর জন্যই বেশী উৎসুক, বেশী ব্যগ্র।

(ক্রমশঃ)

রঙ্গরস

(শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

ডাক্তার এসে রোগীকে উপদেশ দিলেন দেখুন আপনি যদি রোজ মাইল খানেক ক'রে ঘোড়ায় চড়ে দৌড়াতে পারেন—তা'হলে আপনার বেশ ক্ষুধা হ'তে পারে। রোগী খানিক ভেবে বল্লে তা নয় হ'ল কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমার ঘোড়ারও ক্ষুধা বাড়তে থাকবে তখন আমি টাল সামলাব কোথা থেকে ডাক্তারবাবু!

মা'র কাছে এসে মেয়ে বল্লে মা সেদিন সেই যে লোকটা আমাদের বাড়ীর দোরগোড়ায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, যাকে তুমি একবাটী গরম দুধ খাইয়ে চার আনার পয়সা দিয়েছিলে, সে আজ আবার পড়ে গিয়েছে।

দোকানদারের কাছে এসে লোকটি বলতে লাগল—"হ্যাথ ব্যাটা পাজি জোচ্চোর। কথা কইবে বলে তুই ডবল দামে পাখীটা আমায় বেচলি। আমি তার সঙ্গে ব'কে ব'কে হায়রাণ। কথা বলবার তার কোন চেষ্টাই নেই। আমায় ঠকিয়ে তুই—তোকে পুলিসে—" হেসে দোকানদার বলে,—"বাবু আপনি তাকে কথা বলতে সময় না দিয়ে নিজেই বলে গেলে সে আর—কথা কয় কি ক'রে বলুন দেখি।"

"ঘোড়াটা বেচবার সময় তার একটা চোখ যে কাণা আছে এ কথা ত তুমি আমাকে বল নি।"

"আমি যখন কিনি তখনও এর বিক্রেতা আমাকেও কথাটা জানায় নি। কাজেই আমি ভেবেছি ওটা গোপনই রাখ্‌তে হয়।

চা দিতে গিয়ে বেহারার কাপ উল্টে এক ভদ্রলোকের কাপড়ে পড়ল। ভদ্রলোক জলন্ত দৃষ্টিতে বেহারার মুখের দিকে চাইলেন। বেহারা মৃদু হেসে বল্লে "যাক্, মেজের কার্পেটে পড়েনি। কর্ত্তা যে রাগী! আস্ত রাখ্‌তনা তা' হলে।"

"তোমার যদি এতই অসুবিধে হয় তবে বল আমি অপর লোক দেখে আনি।"

"সে ত বেশ কথা। দু জনের যথেষ্ট কাজই বাড়ীতে রয়েছে বাবু।"

সন্ন্যাসী

(গল্প)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী—গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

"এক রাজপুত্র—"

"রাজপুত্র কি মা ?"

"রাজার ছেলেকে রাজপুত্র বলে বাবা।"

"হুঁ—তারপর ?"

"তিনি একলাটি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অনেক নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত পেরিয়ে তিনি একদিন ছবির মত সুন্দর এক দেশে এসে পৌঁছিলেন; সেখানে মস্ত বড় বড় বাড়ী ঘর হাট বাজার সবই ছিল শুধু ছিল না মানুষ! রাজপুত্র আশ্চর্য্য হলেন। অনেক খুঁজে পেতে শেষে তিনি রাজার প্রমোদ উদ্যানে এসে দেখলেন, সেখানে পদ্মফুলের নরম বিছানার ওপোর পদ্মের মত সুন্দরী একটী রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন; তার পায়ের কাছে সোণার কাটি মাথার কাছে—"

"আর সব মানুষ কোথায় গেছ্লো মা ?"

"রাজা রাণী, পাত্র মিত্র সবাইকে এক রাক্ষসী খেয়ে ফেলেছিল বাবা।"

"সব খেয়ে ফেল্লে ? রাক্ষসীটা বড্ড পাজি তো! আচ্ছা মা, রাজা রাজকন্যার কে হোতো ?"

"বাবা হোতেন।"

"বাবা! আমার বাবা ? আমার বাবা কোথায় ?"

করবীর বিষণ্ণ মুখখানি আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া সজল চোখে সে বলিল, "তোর বাবা বিদেশে গেছেন খোকা।"

"কবে আসবে মা ? আমায় দেখ্তে আসবে না ? আমার অসুখ যে!"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখে আঁচল দিয়া করবী বলিল, "কি জানি বাবা! জানিনে তো।"

শুষ্ক রোগপাণ্ডুর চোখ দুটী তুলিয়া খোকা আবার বলিল, "হ্যাঁ মা, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে তুমি কাঁদ কেন অমন ?"

করবী এবার অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল। হায় রে! এই ক্ষুদ্র শিশু কি বুঝিবে কেন সে কাঁদে ? কি গভীর রক্তমাখা ব্যথার ক্ষত তাহার এই বুকের নীচে লুক্কায়িত রহিয়াছে ? সে তাহার কণামাত্রও জানে না তো!

মার হাতের উপর শীর্ণ হাতখানি দিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে খোকা বলিল, "মা—মাগো! আর কেঁদনা মা; বাবার কথা আর কখ্খনো বোলবো না আমি।"

পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া করবী চমকিয়া উঠিল। তাই তো! সে কি পাগল হইল নাকি! ডাক্তারবাবু যে নিষেধ করিয়াছিলেন যেন রোগীকে কোন প্রকারে উত্তেজিত না করা হয়! উদ্বেলিত অশ্রুবেগকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া করবী বলিল "না বাবা, কাঁদ্বো কেন ? কই ? কাঁদিনি তো! তুই একটুখানি একলাটী শুয়ে থাক্ বাপ্, আমি দৌড়ে দুধটুকু গরম করে নিয়ে আসছি।"

(২)

করবীর স্বামী নিতাইচরণের বরাবরই ধর্ম্মের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। কাজেই হিন্দুর কন্যা করবী স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মত যথেষ্ট ভক্তিও করিত। কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার কেমন একটা ভয় হইত, এই উদাসীন স্বামীদেবতাকে হয়তঃ সে চিরদিন সংসার-কাননে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তাহার এই ক্ষীণ সন্দেহের ছায়াটুকু অবশেষে সত্য সত্যই একদিন সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া সভয়ে সবিস্ময়ে করবী দেখিল, পার্শ্বে স্বামী নাই! রহিয়াছে একখানি ক্ষুদ্র পত্র! কম্পিত হস্তে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া করবী পড়িল :—

কল্যাণীয়াসু

সংসার আর ভাল লাগ্লো না, তাই চল্লুম। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো; তিনিই সব অভাব দূর করে দেবেন।

নিতাইচরণ

করবী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। বুকের মধ্যে নিদ্রিত এক বৎসর বয়স্ক শিশুটির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। হায় রে! কি দিয়া—কেমন করিয়া সে এই ক্ষুদ্র স্নেহের পুতুলটাকে এই নাড়ী-ছেড়া ধনটাকে মানুষ করিয়া তুলিবে? তাহা কি তুমি একবারও ভাবিয়া দেখিলে না নিষ্ঠুর! ধর্ম্মই যদি তোমার নিকট বড় হইল, তবে সংসার-ধর্ম্মও কি ধর্ম্ম নয়? সন্তানের জনক হইয়া জনকের কর্ত্তব্য পালন করা কি ধর্ম্ম নয়? সহধর্ম্মিণীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া যাওয়াই কি ধর্ম্ম? অনেকক্ষণ কাঁদিয়া করবী শান্ত হইল, নিজের মনকে প্রবোধ দিল, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বামীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অযথা সন্দেহ করিয়াছে বলিয়া আপনাকে শতবার ধিক্কার দিল। স্বামী-দেবতার শেষ আদেশ মাথায় তুলিয়া লইয়া, সমস্ত সুখ—দুঃখ, অভাব—অনটন ঈশ্বরের চরণে ন্যস্ত করিয়া দিয়া করবী নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু ঈশ্বর স্বহস্তে কাহারও মুখে অন্ন তুলিয়া দেন না; কাজেই করবীকে আবার ভাবিতে হইল। সংসারে এমন একটী পয়সারও সংস্থান ছিল না যাহা দ্বারা তাহারা দুইটী প্রাণী জীবন ধারণ করিতে পারে, করবী একে একে আসবাবপত্র গুলি বিক্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন সে অনন্যোপায় হইয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিল। এইরূপে দৈহিক মানসিক সকল কষ্ট ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শুধু পুত্রের মুখ চাহিয়া করবী দীর্ঘ দুইটা বৎসর কাটাইয়া দিল। কিন্তু বিধাতা তাহার অদৃষ্টে আরও দুঃখ লিখিয়াছিলেন, তাই এই সময় হঠাৎ একদিন খোকা সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়িল। পুত্রের চিকিৎসায় করবীর দুই বৎসরের কষ্টলব্ধ সামান্য সঞ্চয় সমস্তই ব্যয়িত হইয়া গেল; অধিকন্তু বাসগৃহ খানিও ঋণের দায়ে মহাজনের নিকট বন্ধক পড়িল; কিন্তু করবী সেজন্য অনুমাত্রও চিন্তিত হয় নাই। কারণ তাহার সকল কষ্ট সার্থক করিয়া দিয়া বিধাতা তাহার হৃদয়-কোণে আশার ক্ষীণ রশ্মি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন; প্রায় একমাস মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া আজ কয়দিন হইতে খোকা একটু ভাল আছে।

(৩)

কিন্তু দুর্ব্বোধ্য এই ঈশ্বরের লীলা! মাত্র দুইদিন ক্ষণ-সুখপ্রদ আশার শান্তিবারি সেচন করিয়াই তিনি হতভাগিনীর বুকের মধ্যে জ্বলন্ত দাবানল জ্বালিয়া দিলেন। করবীর অন্ধের যষ্টি নয়নমণি শিশু পুত্রটীর নিষ্পাপ আত্মা হঠাৎ একদিন দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া কোন অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে উড়িয়া গেল।

তখন সন্ধ্যাকাল। বৈকাল হইতেই খোকার আবার একটু জ্বর আসিয়াছিল, তাই করবী তাহার শিয়রে বসিয়া মৃদু হস্তে ব্যজন করিতেছিল; হঠাৎ খোকা কেমন যেন অস্থির হইয়া উঠিল, যন্ত্রণা সূচক স্বরে ডাকিল, "মা—মাগো!"

খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া করবী বলিল, "কি ধণমনি? খুব কষ্ট হ'চ্ছে তোমার?"

"বুক যে জ্বলে গেল মা!"

ত্রস্তে পুত্রের বক্ষে হাত দিয়া করবী দেখিল, তাহা তপ্ত প্রস্তরের মত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল, তৎপরে পাশের বাড়ীর পাহাড়ী ঝিটাকে ডাকিয়া একটু বসিতে বলিয়া জ্বলন্ত উল্কার মত বেগে সে উচ্চ নিম্ন পার্ব্বত্য পথ দিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিয়া চলিল।

রোগীর নাড়ী দেখিয়া ডাক্তার মুখ বিকৃত করিলেন; ত্বরিতে একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "এইটে দৌড়ে ডাক্তারখানা থেকে নিয়ে আসুন মা! দাম বোধ হয় টাকা দুই পড়বে। এনেই খাইয়ে দেবেন, আর আমায় ঘণ্টাখানেক পর আবার খবর দেবেন।"

ডাক্তারবাবু ফি (Fee) না লইয়াই চলিয়া গেলেন; কারণ এই ভাগ্যহীন দুঃখী পরিবারটীকে তিনি বেশ উত্তম রূপেই চিনিতেন। ডাক্তার চলিয়া গেলে বাক্স খুলিয়া করবী দেখিল, এককোনে দুঃখিনীর সম্বল মাত্র ৭টী পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে। করবী পুনরায় চক্ষে অন্ধকার দেখিল, পাহাড়ী ঝিটার হাত ধরিয়া বলিল, "আমায় দুটো টাকা ধার দিতে পারিস্ লখিয়া?"

লখিয়া বিষন্ন বদনে মাথা নাড়িল, "লেইতো দিদিমুনি! এখানো তলব মেলে না যে! বাবু কাছে তাকা আছেনা।"

উন্মাদিনীর মত করবী ঋণের সন্ধানে ছুটিয়া গেল। কিন্তু হায়রে! এই অভাবগ্রস্থা ভাগ্যহীনা নারীকে বিনা স্বার্থে কে ঋণ দিবে? অনেকের চরণ ধরিয়া নিষ্ফল ক্রন্দনে বিফল মনোরথ হইবার পর সর্ব্বাবশিষ্ট নারীর শ্রেষ্ঠ রত্ন বিসর্জ্জন দিবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে একজনের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঔষধ ক্রয় করিয়া করবী যখন শুষ্ক বদনে রুক্ষ কেশে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে!

করবীর চোখের বন্যায় শ্মশানের চিতা নিভিয়া গেল; কিন্তু তবুও বুঝি তাহার শেষ নাই! ৭৮ দিন ক্রমাগত কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটী ফুলিয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ একদিন সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, রক্তচক্ষে বদ্ধমুষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

একবৎসর বাতুলাশ্রমে শৃঙ্খলিতা থাকিবার পর সবে মাত্র আজ মুক্তি পাইয়াই করবী শ্মশানের দিকে ছুটিয়া চলিল। তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি অনেকটা সারিয়া গেলেও পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুর বিষাক্ত স্মৃতিটাকে সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

চিতাভস্মের উপর অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে করবী দেখিল, কেমন করিয়া দেদীপ্যমান রক্তচক্ষু সূর্য্যটা একটা পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে লুকাইয়া পড়িবার সাথে সাথেই চারিদিক হইতে একটু একটু করিয়া অন্ধকারের বন্যা আসিয়া জগৎটাকে মুহূর্ত্তমধ্যে প্লাবিত করিয়া ফেলিল; এ যেন ঠিক্ তাহারই মত। তাহারও জীবন - সূর্য্য অস্তাচলে গিয়াছে, আছে এখন বুকভরা সূচীভেদ্য অন্ধকার! বাহিরের এই বিরাট ঘন তমসা কল্যই উষার হাসিতে উবিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্ধকার এ জীবনে দূর হইবার নহে; চিরদিন তাহাকে আঁধার সাগরে ডুবিয়া মরিতে হইবে! ভাবিতেই করবীর মাথার ভিতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলিয়া উঠিল।...... হঠাৎ অনতিদূরে মধুরকণ্ঠে কে যেন ডাকিল, "মা!" কম্পিত বক্ষে করবী লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'ঠিক্—ঠিক্, সেই খোকার মত আওয়াজ নয়?' আশা-মুগ্ধ হৃদয়ে করবী বলিল, "কে? বাবা? দুঃখিনী মার কাছে ফিরে এলি ধন? কইরে! কোথায় তুই?"

"এই যে মা! তোমায় নিতে এসেছি যে!"

বিস্মিত বিস্ফারিত চক্ষে করবী চাহিয়া দেখিল, অদূরে সেই সূচীভেদ্য তমসার খানিকটা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার মধ্যে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া তাহার বুকের ধন খোকা!

ছোট ছোট হাতদুটী বাড়াইয়া দিয়া খোকা আবার বলিল, "আমায় একবারটী কোলে নে না মা।"

"এই যে যাদুমনি, আয় বাপ কোলে আয়!"—সম্মুখে একটু দূরেই পাহাড়টা খাড়াভাবে নিম্নে নামিয়া গিয়াছিল; কঙ্কালাবশিষ্ট উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া পাগলিনী সেই দিকে ছুটিয়া চলিল।......

সহসা পতনোন্মুখ করবীর হাতখানি বজ্র মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল "করবী"!

বাধাপ্রাপ্ত করবী সক্রোধে পিছন ফিরিয়া দেখিল, সম্মুখে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি! এতদিন পরেও এই নূতন বেশে স্বামীকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না, সবিস্ময়ে সে বলিল, "তুমি! তুমি আমায় ধল্লে কেন?—ছেড়ে দাও।"

"আমায় মাপ্ কর করবী! এতদিন পরে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, আর তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

"পেরেছ? ভাল। কিন্তু বড় অসময়ে বুঝেছ! আমি এখন খোকার কাছে যাচ্ছি যে!"

"খোকার কাছে! আত্মহত্যা কোত্তে চাও? ছিঃ! তার চেয়ে চল দুজনে নূতন কোরে সংসার পাত্‌বো।"

"সংসার!" করবী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। "আমার সংসার আর এ সংসারে নেই! ওই যে খোকা আমায় ডাক্‌ছে! যাই যাই বাপ্—একটু দাঁড়া।" আচম্বিতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া করবী অসীম শূন্যে ঝাপাইয়া পড়িল। পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় নিতাইচরণ—বর্ত্তমানে সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর একটা ক্ষীণ পতন-শব্দ বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া আসিল 'ধুপ্!'......
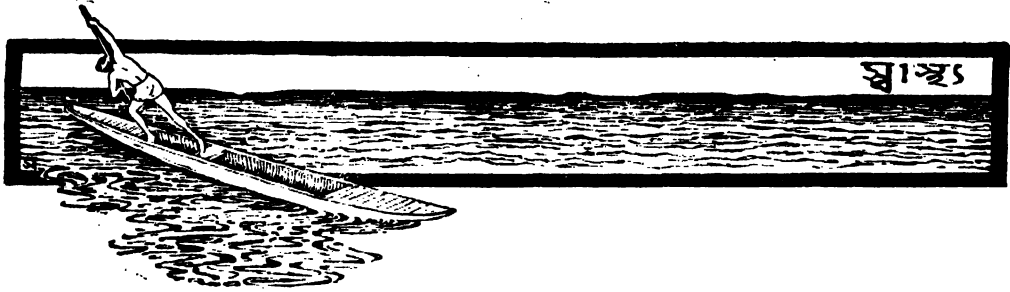
দুগ্ধ-সমস্যা

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম্‌, বি,]

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান অধিনায়কেরা কার্য্যভার লইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমাদের আশা দিয়াছিলেন যে তাঁহারা অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে কলিকাতায় বিশুদ্ধ সস্তা দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের, বিশেষতঃ শিশুদের এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটীর অভাব ঘুচাইবেন। এ পর্য্যন্ত আমরা বাজারে দুগ্ধের ব্যবসায়ে কোনও উন্নতি দেখি নাই, সন্ধানে জানা গেল যে কর্ত্তৃপক্ষেরা এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটের এক সংখ্যায় ৩টী Schemeএর কথা পড়িলাম কিন্তু ঐ তিনটীর মধ্যে কোনটীই যে আমাদের সুলভ ও বিশুদ্ধ দুগ্ধের সুবিধা করিবেন বলিয়া বুঝিলাম না। ডাঃ জে. সরকার ও রায় বাহাদুর ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়গণ, দুগ্ধ একজামিন্‌ বা Control করার কথাই বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল মহাশয় একটী সমিতিকে এক লক্ষ টাকা ধার দিয়া তাহাদের আপাততঃ প্রত্যহ প্রায় ৫৫ মণ দুগ্ধ বিক্রয়কে বাড়াইয়া ১০০ মণ করাইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। দেখিলাম কলিকাতায় প্রত্যহ ১০০০ মণ দুগ্ধ লাগে; তাহাতে ৫০ মণ বাড়াইবার ব্যবস্থা করিলে, সাধারণের কি যে সুবিধা হইবে বুঝিলাম না। আমাদের মনে হয় কর্ত্তৃপক্ষরা, দুগ্ধ সমস্যার বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করেন নাই। তাহা হইলে, তাঁহাদের মত কর্ম্মবীর নেতারা অনেক ভাল Schemeএর আলোচনা করিতে পারিতেন।

প্রথমতঃ ৪০০০ মণ দুগ্ধ কলিকাতায় প্রত্যহ ভাল অবস্থায় পাওয়া ও তাহাকে গৃহস্থের নিকট ভাল অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেওয়া এই দুইটীই হইল দুগ্ধ সমস্যার প্রধান বিবেচনার বিষয়।

চার হাজার মণ দুগ্ধের ভিতর ১০০ মণ কলিকাতায় উৎপন্ন হয় ও বক্রী বাহির হইতে আসে। আমাদের দেশে গরুর যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহাতে এই ৪০০০ মণ দুগ্ধ যদি প্রতি গরু গড়ে ৩ সের দুগ্ধ দেয়, তবে ৫২০০০ গরুতে দিতে পারে। এই ৫২ হাজার গরু সব সময় দুগ্ধবতী রাখিতে হইলে অন্ততঃ এক লক্ষ গরু আমাদের জন্য এই কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ করে বলিতে হইবে। আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ঐ গরুগুলিকে সবল করিয়া তাহাদের দুধ দিবার ক্ষমতা বাড়ান, কি করিলে গো-জাতি সুস্থ থাকে ও কি খাদ্য দিলে গোজাতি বেশী দুধ দিতে পারে। এইটি যতক্ষণ আমরা না ঠিক করিতে পারিতেছি, আমাদের দুগ্ধ সমস্যা ততক্ষণ মিটিবে না। ১ লক্ষ গরুতে এখন যে দুধ দেয় বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় অন্ততঃ ২৫ বা ৩০ হাজার গরুতে সেই দুধ দেওয়া উচিত—তাহা যদি হয় আপনিই দুধের দাম কমিবে—কারণ কম সংখ্যা গরুকে খাওয়াইতে হইবে। নতুবা কখনই দুধের দাম কমিতে পারে না—তাহার পর সেই দুধের ঠিকভাবে আনার ও ঠিকভাবে গৃহস্থকে পাঠাবার ব্যবস্থা পরে করা যাইতে পারে।

অশিক্ষিত গয়লাদের হাতেই এখন দুধের ব্যবসা আছে, তাহারা গরু কিনিয়া তাহার নিকট হইতে যতটা পারে দুধ আদায় করিয়া পরে কসাইকে বিক্রয় করে, তাহাতে আমাদের দেশের গরু দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, গো পালন জিনিষটার প্রয়োজনীয়তা থাকে না—কারণ গরুকে পালন করিবার বা আবার গাভিন করিবার কোনও প্রয়োজনই তাহাদের নাই।

এখন কর্ত্তৃপক্ষদের উচিৎ একটা বাসা করিয়া এই সময় এইখানে একজন সুদক্ষ লোক রাখিয়া বিশেষজ্ঞদের পরিচালনে অনেকগুলি ভিন্নদেশ হইতে গাভী ও ষাঁড় আনাইয়া Experiment করিয়া ঠিক করিতে হইবে কোন Breedটি এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল থাকে ও

বেশী দিন দুধ দেয়, ও সহজে কোন গরুগুলি কি ভাবে গাভিন্ হয় জানা উচিত। এই সকল Experiment সাধারণ গৃহস্থ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, কাহারও দ্বারা হইতে পারে না যেহেতু ইহা অনেক ব্যয়সাধ্য। এই কার্য্যটি গভর্ণমেন্টেরই করা উচিত, অন্য সভ্যদেশে তাহাই হয় কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হইতে পারে না; যেহেতু Law and order ছাড়া অন্য কোনও কর্ত্তব্যই আমাদের দেশে সরকার মানেন না। এখানে কর্পোরেশনের মত বড় সভ্যকে সেইরূপ Experimentএ টাকা খরচ করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ১৫।২০ মাইলের ভিতর একটি মডেল Shed করিয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যদি ৫০০ গরু আমদানি করা হয় তাহাতে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। আজকাল কলিকাতার বাজারে ভাল গরুর দাম প্রতি সের দুধ প্রতি গড়ে ১৫ টাকা; বাহির হইতে আনিলে ও একত্রে বেশী গরু লইলে ১০৲ টাকা সের পড়া উচিত—তাহা হইলে আমাদের ঐ ১ লক্ষ ব্যয়ে প্রত্যহ ২৫০ মণ দুধ পাওয়া উচিত। এই ৫০০ গরু রাখিবার মত জায়গা, সেড (Shed) ও কর্ম্মচারীদের বাসস্থান ও খাদ্যাদির সময় মত খরিদ করিবার জন্য আরও এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে।

২৫০ মণ দুধ প্রত্যহ কলিকাতায় আনিয়া বেচিতে বেশী অসুবিধা হইবে না, কারণ কলিকাতার সব হাঁসপাতালগুলিতে যদি ঐ দুধ দেওয়া যায় তাহা হইলে টাকা আদায়েরও অসুবিধা হয় না। ঐ ২৫০ মণ দুধের দাম হইবে টাকায় /৩ করিয়া ধরিলেও প্রত্যহ (১৩×২৫০)= ৩২৫০৲। ইহা হইতে গরুর খাওয়া, অন্যান্য সব খরচ চলিয়া টাকার সুদ নিশ্চয়ই পোষাইয়া যাইবে—এই ৫০০ গরু ও কিছু ষাঁড় লইয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা Experiment করিয়া ঠিক করুন কোন গরু আমাদের দেশের পক্ষে উৎকৃষ্ট, কি খাওয়াইলে ঐ সকল গরু ভাল থাকে, বেশী দিন দুধ দেয় আবার সবল গাভীর জন্ম দিতে পারে। কি উপায়ে রাখিলে দুধ না দেওয়ার অবস্থাতেও গরুর খরচ কতক চলিতে পারে: ঐ বাছুরগুলি কি করিলে ভাল থাকে, ও উহাদের মধ্যে ষাঁড়গুলি কিরূপ লাভে বিক্রয় হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুধ কি প্রকারে দুহিলে বেশীক্ষণ রাখা যায়—কি উপায়ে কলিকাতা আনা যায়, সে সব বিষয়েও ক্রমে ক্রমে Experiment হইতে পারে। ৪।৫ বছরের ভিতর কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সব ঠিক করিয়া লইয়া লোকদের সে সব দেখাইয়া দিলে, তাঁহাদের উপদেশ অনুযায়ী অন্যান্য লোকে উন্নত প্রণালীতে গরুর ও দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে পারে ও কলিকাতায় ভাল খাঁটি দুধ, সস্তায় পাইবারও আশা করা যায়। দুধ পাওয়ার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে সরবরাহের কথা পরে ঠিক হইতে পারে। আমাদের মনে হয় এইরূপ Experiment করা আমাদের কর্ত্তাদের প্রথম উচিত। তাহাতে দেশের এক মহৎ কার্য্য তাঁহারা করিবেন—ও দেশে গরু, মহিষাদিরও উন্নতি হইবে। তাহাতে কৃষি-কার্য্যেরও যে ক্রমে সুবিধা হইয়া দেশবাসির কত উপকার হইবে তাহা বলা যায় না। কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই কার্য্য করিতে যত শীঘ্র অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের দেশবাসীর অবস্থাও তত শীঘ্র ভাল হইবে। এখন পর্য্যন্ত আমরা নূতন কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারা কোনও উন্নতিই সহরে দেখি নাই। আজ কাল বিডন ষ্ট্রীটের মত একটী Important রাস্তা মেরামত করিতেও কর্ত্তৃপক্ষদের ২।৩ মাস কাটিতেছে তাহাতে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের কাজও যে কিরূপ চলিতেছে কলিকাতাবাসিরা কতক বুঝিতে পারেন। যাহাহউক, কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন এই দুগ্ধ সমস্যার বিষয় মনোযোগ করিয়াছেন, যত শীঘ্র পারেন সবগুলি কমিটি, সব-কমিটি, গবেষণা ইত্যাদি সব শেষ করিয়া কোনও রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কলিকাতাবাসি বুঝিবে যে কর্ত্তৃপক্ষরা সত্যই তাঁহাদের একটা অসুবিধা দূর করবার জন্য লাগিয়াছেন, ও অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের সামান্য ব্যয়ে শুধু কলিকাতায় সুবিধা দরে, ভাল দুধ পাওয়া যাইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দুধের ব্যবসার একটী নূতন প্রণালী চলিয়া গয়লা ও অন্যান্য যাঁহারা দুধের ব্যবসা করেন তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে ভাল গাভী হইবে ও অন্যান্য স্থানেও দুধ ভাল পাওয়া যাইবে, চাষারাও ইহাতে কম লাভবান হইবে না।

পরিশেষে বক্তব্য যে আমাদের এ বিষয়ে কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তবে, একটী সম্ভবপর Scheme করা হইয়াছে কেবল দুগ্ধ Control করিয়া যদি কলিকাতায় আনীত সব দুধই কর্পোরেশন নিজে বিশুদ্ধভাবে বেচেন, দুধের দাম অনেক অধিক হইয়া যাইবে, কারণ ঐ একজামিন ও বেচার মধ্যে অনেকগুলি কর্ম্মচারিকে পুষিতে হইবে; অনেক গোয়েন্দা ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাতে সহরবাসির কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিছু Constructive করাই এখন উচিত, যাহাতে নিকট ভবিষ্যতে কলিকাতার ও বাঙ্গলাদেশের লোকেরা ভাল দুধ চিরদিনের জন্য পাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

ঘরের খবর

পত্র

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ঘরের খবর পাইনা কিছুই গুজব শুনি নাকি,
কুলিশ-পাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনচি নাকি বাঙলা দেশের গানহাসি সব ঠেলে,
কুলুপ দিয়ে করচে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ের যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
মদনেরে জালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি'।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা,
বাঙলা দেশের যৌবনেরে জালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জ্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে।

* * *

জানি তুমি বলবে আমায় থাম একটুখানি,
বেণু বীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝমঝমানি।
শুনে আমি রাগবো মনে করো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারাত নয় ফাঁকি,
গিল্‌টিকরা তকমা ঝোলা নয় তাহাদের খাকী।
কপাল জুড়ে নেই ত তাদের পালোয়ানের টীকা,
তাদের তিলক নিত্যকালের সোণার রঙে লিখা।
যেদিন ভবে সাজ হবে পালোয়ানীর পালা,
সেদিনো তো সাজাবে জুই দেবার্চ্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভায়ের রক্ত ছিটায় যারা,
লড়বে তারা চিরটা কাল ? গড়বে পাষাণ কারা ?
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে ত এক দমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাই ত তাহার আয়ু।
ধৈর্য্য বীর্য্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে,
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে,
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,
ভগবানের ব্যথার পরে হাঁকায় সে চার ঘুড়ি।
তাই ত প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ,
হাতকড়ারই কড়াকড়ি দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উল্‌টো দিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তবু সহে না তবু,
ধর্ম্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের জোরের প্রভু।

রক্ত রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
বাহুর দম্ভ রাহুর মত একটু সময় পেলে,
নিত্যকালের সূর্য্যকে সে এক গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগ্‌রে দিয়ে মেলায় ছায়ার মত,
সূর্য্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোন ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নূতন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুক্‌রে উঠে ভয়ে,
অনন্ত দেব শান্ত থাকেন, ক্ষণিক অপচয়ে।

* * *

টুটল কত বিজয় তোরণ লুটলো প্রাসাদ চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধূলোয় হলো গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে,
তখনো এই বিশ্ব দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙীন কুর্ত্তী, সঙীন মূর্ত্তি রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুই।
ভাঙ্‌বে শিকল টুকরো হয়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য সিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয়না সবুর প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ স'বার তপস্যাতেই হোক বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যু যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুকপেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব উঠে যেদিন ক্ষেপে',
ফোঁসে সর্প হিংসাদর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জ্জি বলে আমিই সত্য, দেবতা মিথ্যা মায়া।
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশিন্‌ গানের সম্মুখে গাই জুই ফুলেরই গান।

(প্রবাসী, ফাল্গুন)

শঙ্খনাদ
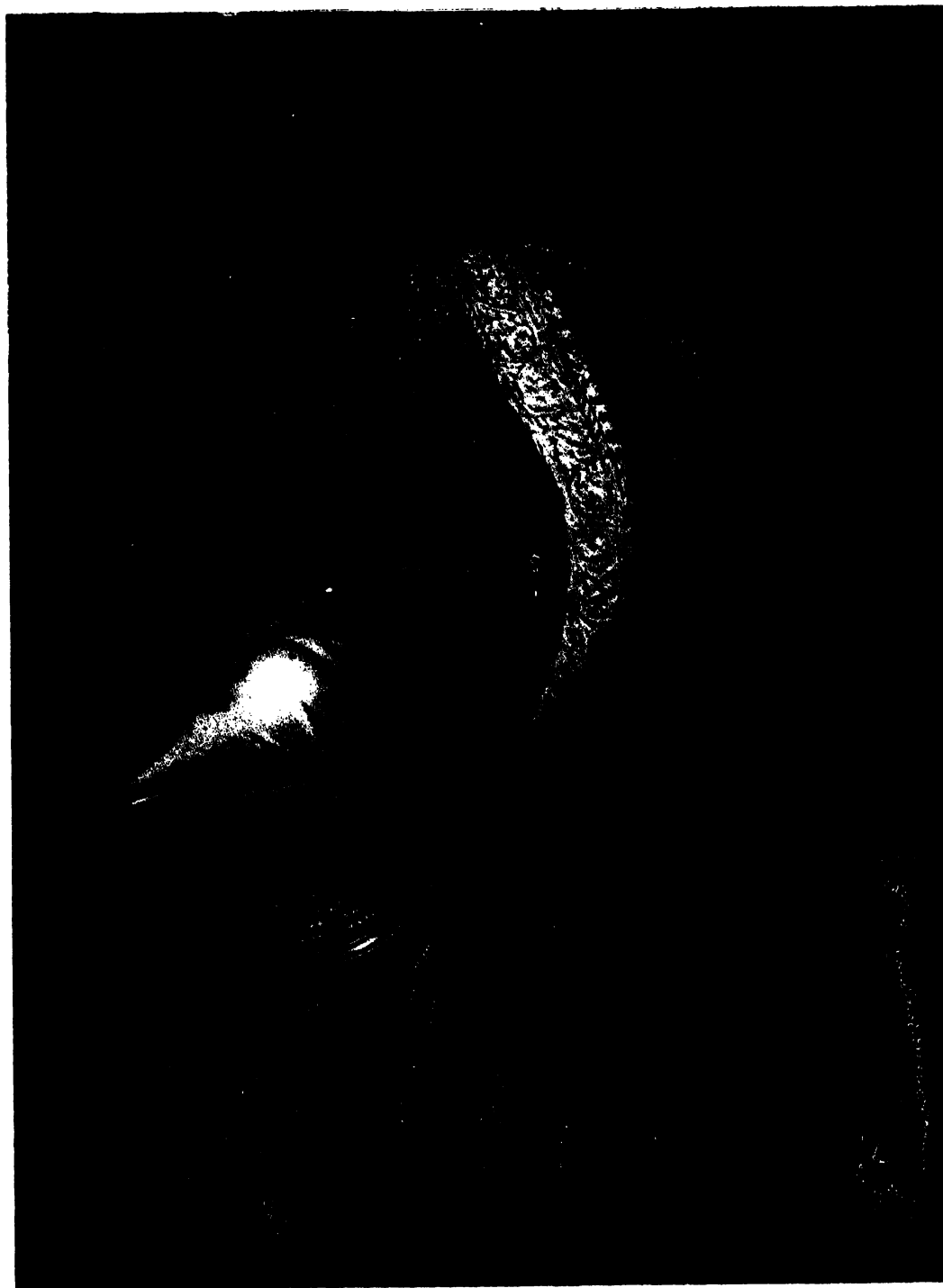
শিল্পী—জে, হোর।

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২৩শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১। ১৭শ সপ্তাহ

বরফের উপর বিলিতি নাচের কসরৎ

ত্রয়ী

উড়ন্ত নাচ

স্কেটারদের অভিনব খেলা

বরফের উপর স্কেটীং ও তৎসহ নাচ উভয়ই হইতেছে

এ শুধু নৃত্য নয়— রীতিমত সার্কাস!

বরফের দেশে সখের ঠেলা-গাড়ী!

অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গিসহ স্কেটিং
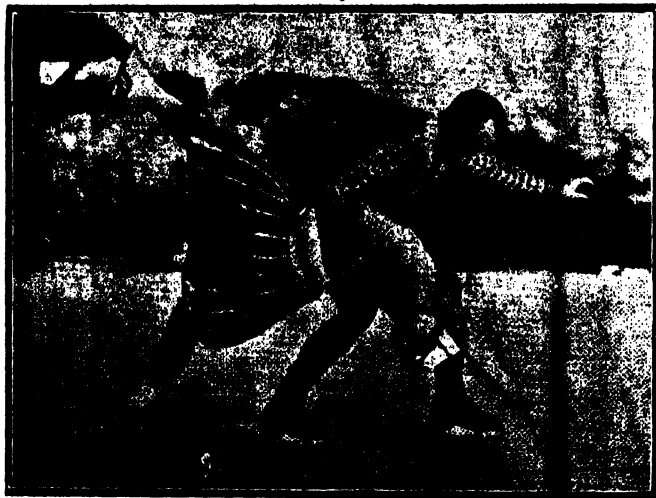
থিয়েটারহলে জোড়ায় জোড়ায় স্কেটিং হইতেছে

বিহার-বৈচিত্র্য

(রঙ্গ-চিত্র)

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

বেহারের একপ্রান্তে এক মহকুমার দেওয়ানী আদালতে সেদিন ভারি হুলস্থুল। একটা বড় রকম মোকদ্দমার বক্তৃতা হইবে। অপরাধ হইতেছে আদালতের হুকুম অবমাননা, এবং অপরাধী একজন পদস্থ সাহেব মিঃ লং। ছোট জায়গার পক্ষে এইরূপ একটা তুমুল কাণ্ডে ইস্কুলের ছাত্র হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত বহু দর্শকের সমাগমে ক্ষুদ্র আদালত গৃহ পরিপূর্ণ।

সাহেবের তরফ হইতে উকীল ছিলেন বৃদ্ধ বেহারী উকীল·অঘোরী কাশীনাথ বর্ম্মন। কৃশ খর্ব্ব চেহারা, দেখিলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ বৎসরের সুদীর্ঘ ওকালতীর পর দেহ যেন পেন্সন চায়। কিন্তু ছেক্‌রা-গাড়ীর ঘোড়ার মত তাহার পরিত্রাণ নাই, যতদিন পর্য্যন্ত না বোধ করি নির্ব্বাণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হ'ন। সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা করিয়াছিলেন ইনিই। কিন্তু বক্তৃতার সময় আসিয়াছেন সদর হইতে বড় বড় উকীল এবং একজন নামজাদা সাহেব ব্যারিষ্টার। উকীল ব্যারিষ্টারের অনুষ্ঠানে বিপক্ষ পক্ষও ত্রুটি করেন নাই। এবং উকীল—ব্যারিষ্টার ভকীল ও দর্শক-বৃন্দ সমাকীর্ণ আদালত-গৃহ আসন্ন বাক্-যুদ্ধের প্রতীক্ষায় যেন থম থম করিতেছিল।

কাশীনাথ বাবুর ডিস্‌পেপসিয়া ছিল, এবং দুইদিন হইতে আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন। তাহার পর পূর্ব্বদিন জ্বরের মত হইয়াছিল, এবং একে খাওয়া নাই, তাহার উপর রাত্রে ঘুমও হয় নাই। অন্যদিন হইলে দেহ-যন্ত্র বোধ করি বিশ্রাম পাইত, কিন্তু আজকের মোটা ফি-এর লোভ এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের ক্ষুধা সম্বরণ করিতে পারিল না। সিনিয়র উকীল এবং এই মামলার সম্বন্ধে সব কথাই জানেন সুতরাং লং সাহেব সসম্মানে তাঁহার স্থান বড় ব্যারিষ্টারটির পাশে কোনওরূপে করিয়া দিলেন। ছোট—আদালত সুতরাং উকীলদের বসিবার স্থানও যথেষ্ট নয়, এখন তাহার অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল ন স্থানং তিল ধারণে।

যতীনবাবু এই আদালতেরই উকীল, আজ দুই বৎসর হইল বাঙ্গলার নদীয়া জেলা হইতে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছেন। শরীর সবল, মাংসপেশী দৃঢ়, চেহারা দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে এই দুই বৎসরেই বাঙ্গলার ম্যালেরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কিছু স্বাস্থ্যও সঞ্চয় করিয়াছেন। মুখের ভাব দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক, দেখিলেই মনে হয় যেন ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে আসিয়া এবার কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবেন না, এই সঙ্কল্পই যেন মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উজ্জ্বল চক্ষুদুটি সর্ব্বদাই যেন ভাগ্যলক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

এতবড় একটা প্রয়োজনীয় বক্তৃতা, হয়ত ইহা হইতে অনেক কিছুই শেখা যাইবে, সুতরাং ইহাকে অবহেলা করা চলে না, এই মনের ভাব লইয়া যখন যতীনবাবু 'ওকু' স্থানে আসিলেন, তখন বসিবার জায়গার অভাব তাঁহাকে কিছু ক্ষুন্ন করিল। কিন্তু নদীয়া জেলা হইতে যে ভাগ্যোন্নতির জন্য ছয়শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এ বাধা কিছুই নহে।

সেই দুর্ভেদ্য আইন ব্যবসায়ীর ব্যূহের মধ্যে যে একটী মাত্র দুর্ব্বল স্থান ছিল, তাহা যতীন বাবুর চক্ষু এড়াইল না, কাশীনাথ বাবুর পাশে ইঞ্চি চারেক জায়গার উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া মিনিট পাঁচেকের ভিতরেই কোনও রকমে বসিবার স্থান করিয়া লইলেন, এবং তাহার ফলে দুর্ব্বল-দেহ কাশীনাথ বাবুর যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনীয় নহে।

(২)

বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে লং সাহেবের তরফের ব্যারিষ্টার আদালতকে বলিলেন যে বহুদিন রোগ-ভোগের পর তিনি সবেমাত্র সুস্থ হইয়া 'হোম' হইতে ফিরিয়াছেন, এবং পীড়ার পর এই তাঁহার প্রথম মোকদ্দমা করা, সুতরাং

যদি আদালত অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিয়া বক্তৃতা করিবার অনুমতি দেন ত' তিনি বাধিত হইবেন।

আদালত বসিয়া বক্তৃতার অনুমতি দিলেন।

মোটের উপর আদালতের ভাবটা তখন খুব গম্ভীর। হাকিম বক্তৃতা শুনিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, ব্যারিষ্টার সাহেব ব্রীফ খুলিয়া আরম্ভ করিবেন এবং দর্শক-বৃন্দ স্তব্ধ। ছুঁচটি পড়িলে শোনা যায় এমনি স্তব্ধ, গম্ভীর।

গত-রাত্রের নিরুদ্ধ নিদ্রা এই অবসরে শ্রান্তদেহ কাশীনাথ বাবুর চোখ-দুটিতে জুড়িয়া আসিল, ঘন ঘন হাই উঠিতে লাগিল, এবং দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু যেন বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

সাহেব তখন জলদগম্ভীরস্বরে বক্তৃতা সুরু করিয়াছেন। শুধু কথার জোরে যেখানে অপরাধীর অপরাধকে উড়াইয়া দিতে হইবে সেখানে সে বাক্যের ছটা সাধারণ হইলে ত চলে না। বড় বড় পদ এবং বিশেষণের মধ্য দিয়া ব্যারিষ্টার সাহেবের বাক্যচ্ছটা তখন সবে মাত্র নীল আকাশে পাখীর মত পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তিনি সবেমাত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে সুরু করিয়াছেন, কেমন করিয়া ধনী বিপক্ষ পক্ষের কূট ষড়যন্ত্র বহুদিন হইতেই তাঁহার নিরপরাধী মক্কেলকে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে,—এমন সময় কাঁধের নিকট একটা মৃদু ধাক্কা খাইয়া, ব্যারিষ্টার সাহেবের বক্তৃতাজাল ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, তিনি ক্রুদ্ধনেত্রে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার গায়ে ঢুলিয়া পড়ার অপরাধে লজ্জিত কাশীবাবুর সবেমাত্র ঘুম ভাঙ্গা দু'টি রক্ত চক্ষু মিনতির ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে এবং অস্ফুটস্বরে কাশীবাবু কহিলেন, "স্যার আমার শরীরটা ভাল নাই।"

সাহেব মৌনভাবেই ক্ষমা করিয়া আবার বক্তৃতা সুরু করিলেন। কাশীবাবু নস্যর ডিবা হইতে বড় দেখিয়া এক টিপ নস্য লইলেন, বাসনা যাহাতে ঘুম আর না আসে। সাহেবের নিকট হইতে আরও একটু দূরে বসিবার ইচ্ছায় একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিলেন, কিন্তু যতীনবাবু একটুও হেলিলেন না!

বক্তৃতার আসর জমিয়াছে ভাল, সাহেবের বাক্য-বিহঙ্গ তখন অবাধে আকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কখনও কালো মেঘের ছায়ার ভিতর দিয়া, কখনও উদার স্বর্ণ কিরণোজ্জ্বল ঝলমল রৌদ্রের ভিতর দিয়া,—এমন সময় কাশীবাবুর অবাধ্য নেত্রদ্বয় আবার বিরুদ্ধাচরণ করিল, এবং সাহেব আবার তাঁহার কাঁধে অনুভব করিলেন আর এক ধাক্কা!

সাহেব সজোরে প্রতি-ধাক্কা দিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধনেত্রে ফিরিয়া চাহিতেই যে ব্যাপার চোখে পড়িল তাহাতে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দেখিলেন যতীন বাবুর সবল বাহু-বেষ্টনের মধ্যে কাশীবাবুর দেহের উপরার্দ্ধ আবদ্ধ, এবং এই অবস্থায় কাশীবাবুকে লইয়া যতীনবাবু সেই ভিড়ের মধ্যে পথ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন।

তখন মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপে মৃদু গুঞ্জনের মত একটা শব্দ চারিদিক হইতে উঠিল। সকলেই ব্যগ্রভাবে অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে পরস্পরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ব্যাপার কি?"

হাকিম মনোযোগ সহকারে নোট করিতেছিলেন, হঠাৎ এই শব্দে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, যতীন বাবুর করায়ত্ত দুর্ব্বল কাশীনাথের দেহের উপরার্দ্ধ।

বিস্মিতভাবে হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি?

যতীনবাবু কহিলেন, "ফিট স্যার (মূর্চ্ছা)।"

তখন চারিদিকেই একটা ব্যস্ততার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল। ব্যারিষ্টার সাহেব এই অপটু দেহ লোকটির সম্বন্ধে অনতিপূর্ব্বে যে মনোভাব পোষন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য অনুতাপ অনুভব করিলেন, এবং হাকিম ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, বাইরে নিয়ে যান!

যতীন বাবুর সুদৃঢ় বাহু-বন্ধনের মধ্যে এই সকল গোলযোগে যখন কাশীবাবুর ঘুম ভাঙ্গিল (মূর্চ্ছা নহে) তখন নিজের অবস্থা তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কাছারিতে মামলার সময় ঘুমান এবং ঢুলিয়া পড়া হয়ত দোষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার শাস্তি ত' এ নয়। কি অপরাধে যে তাঁহাকে এমনি করিয়া অপরের বাহু-বন্ধনের মধ্যে সবলে জড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা কিছুতেই তাঁহার উপলব্ধি হইল না, তিনি নিজেকে বন্ধন-মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করিলেন।

কিন্তু যে সুদৃঢ় লৌহ বাহুদ্বয়ের বন্ধনে তিনি বদ্ধ ছিলেন, তাহা তিলমাত্র শ্লথ হইল না, বরং আরও দৃঢ় হইয়া বসিল। ইংরাজ রাজের একেবারে খাস বিচারালয়ে হাকিম এবং বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারের সম্মুখেই তাঁহার উপর এত বড় জুলুমের কোনও প্রতীকার হইতেছে না, এবং এতগুলা লোক শুধু দর্শক হইয়াই রহিল, এই বজ্রবন্ধন হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার তিলমাত্র চেষ্টা করিতেছে না, এই দুঃখে তাঁহার কান্না আসিতে লাগিল। যুদ্ধ অত্যন্ত অসমানে অসমানে, সুতরাং সেই লৌহ-কবল তাঁহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। দুয়ারের নিকট একবার শেষ চেষ্টা করিয়া কাশীনাথবাবু ক্লান্ত হইয়া আত্মসমর্পন করিলেন, এবং তাহার পর যখন চোখ খুলিলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাকে বারান্দায় একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং আশে পাশে পাখা লইয়া নানালোকে তাঁহাকে বাতাস করিতেছে, এমন কি লং সাহেবও একটা মস্ত বড় পাখা লইয়া নিজেই বাতাস করিতে সুরু করিয়াছেন।

গোলযোগ থামিলে ব্যারিষ্টার সাহেব আবার বক্তৃতা সুরু করিতে চাহিলে হাকিম কহিলেন, "একবার কাশীবাবুকে দেখে আসি, একটু অপেক্ষা করুন।"

কাশীবাবু তখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করিয়াছেন। টানা-হেঁচড়ার ক্লান্তি এবং মনের শোচনীয় অবস্থায় সত্যই যেন সমস্ত দেহ অবসন্ন, চেয়ারের উপর মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছিলেন।

হাকিম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশীবাবু এখন কেমন বোধ করিতেছেন?"

বুকের ভিতর চাপা কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া গেল। শুধু একবার রক্ত চক্ষুদুটি হাকিমের দিকে চাহিয়া কাশীবাবু মনের গোপন বেদনা যেন নিবেদন করিতে চাহিলেন।

কিন্তু ফল হইল উল্টা। হাকিমের ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে কাশীবাবুর মূর্চ্ছার ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, তিনি সেইখানে সমবেত তাঁহার কুড়িজন পেয়াদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে করছিস কি? মাথায় জল দে না!

তখন সেই বিশজন পেয়াদা বিশটা ঘড়া লইয়া সুরু করিল কাশীবাবুর মাথায় জল ঢালিতে,—স্বয়ং হাকিমের হুকুম—কে তাহাদের রোধ করে! যেটুকু বাকী ছিল তাহাও হইয়া গেল, সেই চোগা চাপ্‌কান জুতা মোজা সমেত কাশীবাবু সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হইয়া উঠিলেন!

(৩)

সেই যে কাশীবাবু সে-দিন কাছারী হইতে জ্বর লইয়া ফিরিলেন, তাহার বিরামান্তে পুনরায় সুস্থ হইয়া কাছারী আসিতে তাঁহার লাগিল ঠিক দেড়—মাস। জ্বর খুব প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং জ্বরের প্রকোপে ভুল-বকার জন্য কাশীবাবু যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে যতীন বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব যে প্রীতিপূর্ণ ছিল এমন কথা সপ্রমাণ হয় না।

কাছারী হইয়া আসিয়া তিনি বার এসোসিয়েসনের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করিলেন। যতীন বাবুর বিরুদ্ধে চার্জ—Assault, Injury, Insult, Causing mental pain and also lowering in the estimation of the public, এবং ব্যবসায়ের ক্ষতি। তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে বার এসোসিয়েসন যেন ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করেন, কারণ এরূপ ঘটনা ঘটিতে দিলে প্রত্যেক সভ্যেরই জীবন বিপদ-সঙ্কুল।

* * *

বারএসোসিয়েসনের বৈঠক বসিয়াছে—প্রেসিডেন্ট সুরেনবাবু এখানকার বড় উকীল তিনিই। সম্মুখে কাশীনাথ বাবুর অনুযোগ—পত্র। সকলেরই মুখ গম্ভীর।

কাশীনাথ বাবু কহিলেন,—বহুদূর বাংলাদেশ থেকে যতীন বাবু এসে এখানে তাঁর ব্যবসায় করেন, আমাদের তাতে আপত্তি নেই, আমরা তা' সহ্য করতে পারি। কিন্তু তিনি সে-দিন আমার ওপর যে অন্যায় আচরণ করেছেন এবং যা আপনারা সবই জানেন,—তা নিশ্চয়ই আমরা সহ্য করতে পারিনে। আমি আদালতে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি চাই যে আমাদের নিজেদের মধ্যেই এর একটা এমন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'ক যে ভবিষ্যতে এমন কাজ করতে আর কেউ সাহসী না হয়! যতীন বাবুর সে-দিনকার গুণ্ডামীর

ফলে শুধু যে সে-দিন আমাকে বহুবিধ লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করতে হ'য়েছে তা নয়, তার পর এই দেড়মাস ধ'রে আমার কঠিন পীড়া এবং ব্যবসায়ের ক্ষতি। আমি চাই এর উপযুক্ত প্রতিবিধান এবং শাস্তি।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন, আপনি যখন আদালতের কথা তুলেছেন তখন এইটে পরিষ্কার হওয়া চাই যে আপনারা উভয়েই আমাদের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত ব'লে স্বীকার করতে চান কিনা। না চান ত এ প্রহসনের কোন অর্থ নেই।

কাশী বাবু কহিলেন, আমি আপনাদের নিষ্পত্তিই যে মানতে চাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন, আর যতীন বাবু?

যতীন বাবু কহিলেন—আমিও।

প্রেসিডেণ্ট কাশী বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, আর দণ্ডের কথাটাও স্থির হওয়া চাই; কারণ দৈহিক দণ্ড দেওয়া আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। একমাত্র অর্থদণ্ডই আমরা দিতে পারি।

কাশী বাবু কহিলেন—উপযুক্ত অর্থদণ্ডেই আমি তুষ্ট হইব।

প্রেসিডেণ্ট যতীন বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—এখন বলুন আপনার কি কৈফিয়ৎ?

যতীন বাবু কহিলেন—আপনি কাশী বাবুকেই দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু আমাকে করলেন না। যদি এমন হয় যে আমার কৈফিয়ৎ আপনাদের সন্তোষজনক মনে হয় তা হ'লে অকারণ আমাকে অপমানিত করার জন্য কাশী বাবুও দণ্ডযোগ্য। এবং সে বিষয়েও একটা স্থির হওয়া ভাল।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন—ঠিক কথা। সেক্ষেত্রে আপনি কিরূপ দণ্ড হ'লে তুষ্ট হন?

যতীন বাবু কহিলেন—নিশ্চয়ই অর্থ দণ্ডের চেয়ে বেশী নয়।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন—বেশ, এখন আপনার কৈফিয়ৎ দিন। আমরা সকলেই সে দিনকার ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি, সুতরাং সে বিষয়ে সন্দেহ কারও নেই। আমরা চাই তার কৈফিয়ৎ।

যতীন বাবু কহিলেন, কাশী বাবু বয়সে এবং ব্যবসায়ে আমা অপেক্ষা বহু জ্যেষ্ঠ, এবং তাঁর প্রতি কোনও দিনই আমার অসম্মানের ভাব আপনাদের মধ্যে বোধ করি কেহ দেখেন নি, সুতরাং কাশী বাবু কি করে বিশ্বাস করলেন জানিনা যে সুদূর বাঙ্গলাদেশ থেকে আমি তাঁকে উত্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। তাঁহাকে উত্যক্ত করে আমার কোন লাভ নেই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা; এমন কি আর্থিক ক্ষতি পর্য্যন্ত! আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, যে কাশী বাবুর সহিত সে দিনকার পর আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয় নি কিন্তু তিনি যদি আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেন তা হ'লে ব্যাপার হয়ত এতদূর গড়াত না।

কাশী বাবু কম্পিত স্বরে কহিলেন—কারণ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আমি আর একবার অপমান হই?

যতীন বাবু কহিলেন, সে দিন যে কারণেই হোক, কাশী বাবুর শরীর একটু খারাপ ছিল। আমি মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছিলাম এমন সময় সজোরে তাঁর মাথা আমার দেহের উপর পড়ল। ঘুমে ঢুললে যেমন হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী জোরে। কাশী বাবু কি অস্বীকার করেন?

কাশী বাবু কহিলেন—না, বোধ করি ঠিক। তাঁহার মনে পড়িল, দ্বিতীয় বার সাহেবের ধাক্কা খাইয়া কিছু বেগেই যতীন বাবুর উপর পড়িয়াছিলেন।

যতীন বাবু কহিলেন, তা হ'লে আমার কৈফিয়তের অল্পই বাকী রইল। মনে করুন আপনি অবহিত মনে এক বক্তৃতা শুনছেন, এমন সময় আপনার ওপর আপনার পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীন ব্যক্তিটি সহসা সজোরে তার মাথা ঠুক্‌লে, এবং আপনার জানা ছিল যে সে ব্যক্তি সে দিন পীড়িত, এবং বসবার জায়গার অসুবিধা, লোকের ভীড় এবং গরম, এক্ষেত্রে কি এ কথা আপনার মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় যে এঁর হঠাৎ ফিট হয়েছে? আপনি কি বলেন, বাবু গোপাল জী?

বার লাইব্রেরীর বাবু গোপাল জী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক বটে।

যতীন বাবু কহিলেন, ঐ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে তারপর আমি যা ক'রেছি, তা যে শুধু অন্যায় নয় এবং কাশী বাবুর মঙ্গলের জন্যই করা হয়েছিল এ কথাও কি আপনাদের

মনে হয় না? সে ক্ষেত্রে আপনারাও ঠিক এমনি করতেন না?

বাবু রাধাশরণ কহিলেন, করতাম বৈ কি!

যতীন বাবু কহিলেন, তা হ'লে আমার অপরাধ?

বাবু কাশীনাথ কহিলেন, কিন্তু যতীন বাবু কি এই কথা বলতে চান তিনি বরাবরই বিশ্বাস করেছিলেন যে আমার ফিট হ'য়েছে?

যতীন বাবু—না, আমি কোনও কথাই গোপন করব না। দরজার কাছে গিয়ে আমি প্রথম বুঝতে পারি যে উনি ঢুলছিলেন—কিন্তু তখন ওঁর এবং আমার দু জনেরই পক্ষে ফেরা কঠিন। ওঁর ফিট হয়েছে মনে করে আমি এতদূর এগিয়ে পড়েছি যে আমার পক্ষে আর অন্য কোনও রকম আচরণ সম্ভব হয়, এবং ওঁকেই যদি ছেড়ে দি, ত উনিই বা কোন লজ্জায় ফিরে গিয়ে বসবেন, কারণ ফিট হওয়াটার মধ্যে তত লজ্জার কিছু নেই, যতটা কাজ করতে এসে সদরের এতগুলো বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারদের সামনে কাছারীতে বসে ঢোলার মধ্যে আছে!

যতীন বাবুর এই কৈফিয়তে এসোসিয়েসন গৃহ মৃদু চাপা হাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

যতীন বাবু কহিলেন, ভেবেছিলাম দরজার বাহিরে এসে ওঁর কাছে ক্ষমা চাইব, কিন্তু দরজার বাহিরে ওঁর যে অবস্থা দেখলাম তাতে আমার আবার সন্দেহ জন্মাল ব্যাপারটা বাস্তবিকই কি, ফিট না অন্য কিছু, এবং তখন তিনি লং সাহেব এবং অন্য বহু লোকের হেপাজতে পড়ে একেবারে আমার হাতের বাহিরে চ'লে গেছেন, সুতরাং সে স্থান ত্যাগ করাই আমার বিধেয়, এবং তাই করেছিলাম। তার পরের ঘটনার জন্যে—যেমন স্নান ইত্যাদি—আমি দায়ী নই, এবং আমার বিশ্বাস যে কাশী বাবুর পর্য্যন্ত নিজের ধারণা হয়েছিল যে সে তাঁর নিদ্রা নয়, কারণ বিশ ঘড়া জল ঢালা সত্ত্বেও তিনি নিজেই কোন আপত্তি করেন নি! নিজের অবস্থার সম্বন্ধে যদি তাঁর নিজেরই ভুল করা চলে, তা হ'লে আমার দোষ কোথায়?

এবার সমবেত কলহাস্যে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। যতীন বাবু কহিলেন এবার আপনারাই বিচার করুণ আমার অপরাধ কি!

প্রেসিডেন্ট সমবেত অন্যান্য উকীলদের সহিত পরামর্শ করিয়া যখন বলিলেন যে যতীন বাবু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তখন উচ্চ জয়ধ্বনিতে বিচার গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং কাশী বাবু লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

যতীন বাবু কহিলেন এখন কাশী বাবুর প্রতি কোন দণ্ড প্রয়োগ করিবেন? সেই কথাটা স্থির হোক।

প্রেসিডেন্ট কহিলেন—আপনিই বলুন।

যতীন বাবু বলিলেন, এই ঘটনার জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি, এবং তিনি আমাকে ক্ষমা ক'রে ছোট ভাইএর মতনই দেখেন এই আমার প্রথম দণ্ডের প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে তিনি আমাদের সকলকে একটা বড় রকম ভোজ দিন।

কাশী বাবু হাসিয়া যতীন বাবুকে আলিঙ্গন করিতে করিতে বলিলেন, একটা দণ্ডেরই কথা থাকলেও আমি দুইটাই প্রসন্ন মনে স্বীকার করলাম। কাল রবিবার কালই তা হ'লে ভোজটা হোক, এবং প্রথমটা ত এখনই হোল।

বাবু গোপাল জী হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু ভোজে এই প্রীতিকর অভিনয় ব্যাপারে আর একটি অভিনেতাকে বাদ দিলেও চলবেনা—তিনি আমাদের হাকিম।

কাশী বাবু নিজমুখে কহিলেন, নিশ্চয়ই নয়।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

টেবিল-আলমারী—

ইংলণ্ডে আজকাল নূতন ধরণের একরকম টেবিল তৈরী হইয়াছে—উপরে গোল কিন্তু নীচের দিকে চতুষ্কোণ। সেই
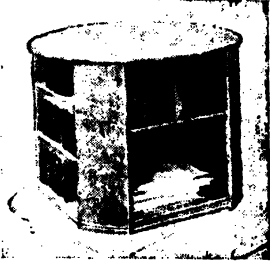
নীচে নানা আকারের থাক আছে—সেই থাকে পুস্তক এবং ছোট বড় নানা আকারের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রাদি সহজেই গুছাইয়া রাখা চলে। এই টেবিলগুলি সাধারণতঃ বড় বড় লাইব্রেরীর পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক। বহুলোক পড়িতে বসিলে বই আনিবার জন্ত কাহাকেও উঠিয়া দূরে যাইতে হয় না। টেবিলে বসিয়াই যখন যে বই, কি যে কোন পত্রিকা আবশুক তাহাই হাতের কাছে পাওয়া যাইবে।

রেল লাইনের উপর দিয়া জাহাজ চলিতেছে—

জার্ম্মেণী দুনিয়াকে একেবারে মজাইতে বসিয়াছে। সে
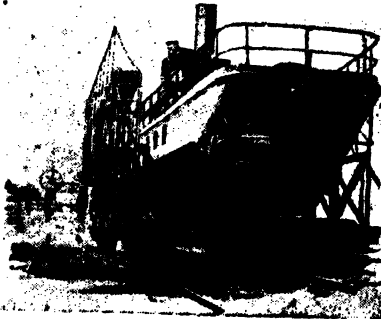
না পারে এমন কাজ নাই। এতদিন পর্য্যন্ত জাহাজ জলের উপর দিয়াই চলিতেছিল কিন্তু আজ জার্ম্মেণীর কল্যাণে জাহাজ মাটির উপর দিয়াও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে! এধারে জল, ওধারেও জল, মাঝখানে অনেকটা জমি পড়িয়াছে—যাত্রীদের উঠানামা করিতে বড় অসুবিধা, অতএব জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক কোমর বাঁধিয়া বলিল—দাঁড়াও, আমি এ অসুবিধা দূর করিয়া দিতেছি। সে আজ মানুষ এবং মাল বোঝাই জাহাজ সেই জমির উপর রেল পাতিয়া তাহার উপর দিয়া চালাইয়া নিয়া অন্ত জলাশয়ে নামাইয়া দিতেছে। জার্ম্মাণ জাতটাই দেখিতেছি নেপোলিয়নের খাঁটি শিষ্য হইতে পারিয়াছে। "অসম্ভব" বলিয়া কোন কথাকে তাহারা শুধু অভিধানে ঠাঁই না দেওয়া নয়, একেবারে দেশছাড়া করিয়া তবে ছাড়িবে।

কাঠের ঘোড়া লাফাইয়া চলে—

ছেলেদের খেলা করিবার জন্ত এই কাঠের ঘোড়াটী প্রস্তুত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার সামনের চাকাটী এমনি
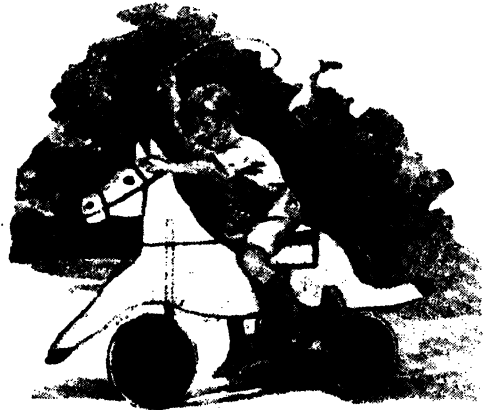
ভাবে তৈরী যে চলিতে আরম্ভ করিয়াই সে ঘোড়া এবং ঘোড়-সওয়ার উভয়কে লইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে থাকে।

বিমানবিহারীদের জন্য হাল্‌কা নৌকা—

আকাশে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ এ্যায়রোপ্লেনের কলকব্জা খারাপ হইয়া গেলে বিমানচারীদিগকে মহা মুস্কিলে

পড়িতে হয়। বাধ্য হইয়া যখন তাহাকে নীচে নামিতেই হইবে তখন যদি সে দেখে যে চারিদিকেই শুধু অসীম জলরাশি বিরাজ করিতেছে তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই অপমৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য একরকম হাল্‌কা নৌকা তৈরী হইয়াছে। বিমানচারীগণ এগুলি অনায়াসেই এ্যায়রোপ্লেনের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে পারেন এবং দরকার মত খুলিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। সমুদ্রের উপর দিয়াও এই নৌকায় চড়িয়া নির্ভয়ে একজন বাহিয়া তীরে আসিতে পারিবে।

বিদ্যুৎ-বাতির সেড্—

বিলাতে আজকাল বিদ্যুৎ-বাতির সেড্ নানাবিধ অদ্ভুত আকারের তৈরী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভিতরে আলো জ্বলিতেছে অথচ বাহিরটা দেখিলে মনে হয় যেন একটা পাতি হাস ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে। সেড্
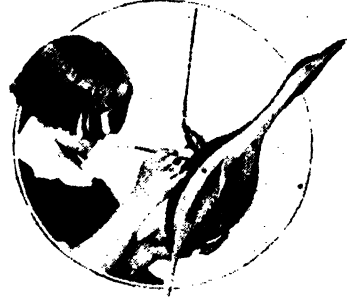
গুলি এই রকম নানাবিধ পশু ও পাখীর হুবহু নকল করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে, ফলে লাভ হইয়াছে এই যে এইগুলি হুহু করিয়া বিক্রী হইয়া যাইতেছে।

জুতার ফিতায় ফটো—

প্রেমাস্পদের ফটো ফ্রেমে বাঁধাইয়া দেয়ালে কিম্বা টেবিলে অথবা ফটোর এ্যালবামেই এতদিন শোভা পাইত, কেহ কেহ
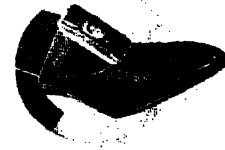
সখ করিয়া লকেটেও রাখিতেন কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান আড্ডা প্যারী সহর আজ সকলের উপর টেক্কা দিয়া প্রেমাস্পদকে রমণীর পায়ের জুতার উপর আনিয়া ফেলিয়াছে! ফিতা বাঁধিবার জায়গায় একটী ফ্রেম থাকিবে, তাহার ভিতর ইচ্ছামত ফটো রাখাও চলিবে, বাহির করাও যাইবে। প্রেমাস্পদের ঠাঁই বুকেই—কিন্তু কখনো কখনো দাস ভাব হইলে পায়ের তলায়ও হয়—যেমন—'দেহি পদপল্লবমুদারম্' ভাব হইলে আর বুকে থাকা চলে না। ফরাসীদেশে বৈষ্ণবী ভাবটা যেন প্রসারতা লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয়!

ডেরাইস্‌মাইলখাঁর পথে

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল বি-এ, এম, আর, এ, এস]

চিরকালটা ফলফুলে ঢাকা বাঙ্গলাদেশে পালিত হইয়া প্রথমে যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের হিসাব বিভাগে আসিয়া পড়িলাম, তখন চারিদিকে ধুম্র পাহাড়ে ঘেরা আমাদের ছাউনির অভিনবত্বগুলি প্রাণটাকে বেশ সতেজ করিয়া তুলিল; কিন্তু নূতনত্বের আস্বাদটুকু চলিয়া যাইতেও বিশেষ বিলম্ব হইল না। চারিদিকের তৃণপল্লব-বর্জ্জিত শুষ্ক প্রস্তরখণ্ডগুলি এবং সৈন্য বিভাগের নিরস কঠোর নিয়মগুলি জীবনটাকে নিতান্তই একঘেয়ে করিয়া তুলিতে লাগিল। আমরা ছিলাম "মনজাই" নামক ছাউনিতে, ডেরাইস্‌মাইলখাঁ হইতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তর-পশ্চিমে, একবারে হিংস্র মাসুদ ও ওয়াজিরিদের বিচরণ ভূমিগুলি অধিকার করিয়া। কাজেই কর্ত্তৃপক্ষদের সতর্কতারও অন্ত ছিল না। ঘাঁটি ছাড়িয়া বাহিরে যাইয়া যে একটু মুক্ত বাতাসে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিব তাহার উপায় ছিল না। বাঙ্গালী আমরা মোটে চারজন; তন্মধ্যে ঘ-দাদাই পদমর্য্যাদা ও বয়সে সকলের বড়। তিনি হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করিয়া বসিলেন যে ডেরাইস্‌মাইলখাঁ একবার বেড়াইয়া আসা যাউক। ডেরাইস্‌মাইলখাঁ সিন্ধু নদের তীরে একটি ছোট সহর, সেখানে কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন। তথা হইতে একটি রাস্তা আমাদের ও অন্যান্য ছাউনির মধ্য দিয়া একেবারে দুর্গম শৈলশ্রেণী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা সুরক্ষিত রাখিবার জন্য রীতিমত পাহারার বন্দোবস্তও আছে। ঘ-দাদার প্রস্তাবটি খুব উৎসাহের সহিত সমর্থন না করিবার মত কোনও কারণ ছিল না। আমি Mechanical Transport Companyর একাউন্টেন্ট, কাজেই একটি মোটরের বন্দোবস্ত করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। স্থির হইল বৃহস্পতিবার খুব ভোরে (বারবেলায় নয়) দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিব। যাত্রার পূর্ব্বদিন সারা দিনরাত খুব বৃষ্টি হইল, ভাবিলাম বিধি বুঝি বাদ সাধিলেন। এ বাঙ্গলা দেশ নয়, শীতের পর বসন্ত আসে না, শীতকালেও রীতিমত বৃষ্টি হয়। যাহা হউক অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই ভোর বেলায়ই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, কিন্তু কনকনে হাওয়া বহিতে লাগিল। একেই এখানে শীতকালে জল জমিয়া বরফ হওয়ার মত শীত, সেদিনকার শীত হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতে লাগিল। কোনওমতে গরম ওভারকোটে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মোটরে উঠিয়া বসিলাম। ঘ-দাদার পালোয়ানী ভৃত্য খুশলসিং কতকগুলি খাবার তৈয়ার করিয়া সঙ্গে লইল, বেশ নিশ্চিন্ত হইলাম।

সশব্দে মোটরখান ছাউনির বাহির হইল। একটি গল্প পড়িয়াছিলাম, একজন সুবাদার বিগত মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক শিবিরে অনেকদিন বন্দী থাকিয়া পরে মুক্ত হইয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসে, তখন সে নাকি একজন পাখী বিক্রেতার খাঁচা খুলিয়া সমস্ত পাখীগুলি ছাড়িয়া দেয়। পরে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকের নিকট প্রকাশ করে যে বন্দী জীবনের কষ্ট সে অনেকদিন ভোগ করিয়াছে, এতগুলি বন্দীর মুক্তিদান যে কিরূপে অন্যায় হয় তাহা সে বুঝিতে পারে না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে তুলনা না হইলেও নিয়ম ও নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া আসিয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের এই অবসরটুকুর মনোহারিত্বও কম নয়। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। দারিদ্রপিষ্ট গৃহস্থের ঘরে শিশুর হাসিটির মত বালসূর্য্য একটি তৃণশস্পহীন ধূসর পাহাড়ের উপর হইতে বিমল কিরণ রাশি চারিদিকে ঢালিয়া দিতেছে। একদিকে হিন্দুকুশের অত্যুন্নত শৈলশ্রেণী, অন্যদিকে বেলুচিস্থানের বিশাল পর্ব্বতমালা যতদূর দৃষ্টি চলে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুভ্র বরফ ঢাকা শিখরদেশ সূর্য্যালোকে রঞ্জিত হইয়া কোন এক অজানা দেশের মোহময় বার্ত্তা ঘোষনা করিতেছে। কি মহান দৃশ্য! কোন্ এক বিরাট পুরুষের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কোন্ সুদূর

অতীতে সৃষ্ট এই দিগন্তব্যাপী শৈলশ্রেণী কত যুগ যুগান্তরের কত স্মৃতি পাষাণ বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রত্ব কত পরিস্ফুট!

"হুজুর গাড়্‌ড় আউর নেহি যানে সক্‌তা।" মোটর চালকের রুক্ষ কণ্ঠস্বরে কল্পনা সুন্দরী প্রস্থান করিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, সারা দিনরাত বর্ষণের ফলে পাহাড় হইতে জলস্রোত নামিয়া সম্মুখের রাস্তা একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কয়েকজন মজুর পাথর ঘাস প্রভৃতির সাহায্যে সে প্রমত্ত জলস্রোতকে বাধা দিবার নিস্ফল চেষ্টা করিতেছে। মোটর খানির আর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মজুর দিগকে রাস্তা ঠিক হইতে কতটা সময় লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলাম। "কাল ঠিক হো জায়গা সাব।" কাল ঠিক হইবে শুনিয়াই তো চক্ষুস্থির হইল। এই অপদার্থ লোকগুলি কি এই রাস্তাটুকু ঠিক করিতে সমস্ত দিনটাই লাগাইবে? তবে কি এই দুই ঘণ্টা মাত্র মুক্তির আভাস পাওয়ার পর আবার 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' ফিরিয়া যাইব? কিছুতেই নয়; গন্তব্যস্থানে যাওয়া চাই-ই। সম্মুখে চাহিলাম, দুরন্ত জলস্রোতের অবাধ গতি। জহ্নুমুনির আখ্যান মনে পড়িল, কিন্তু এযে কলিযুগ। নিস্ফলতার কাতর দৃষ্টিতে ঘ-দাদার দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "তাইত, এখন কি করা যায়?" আমিও ভাবিলাম "কি করা যায়।" "এক কাজ করা যাক্, এখান থেকে ট্যাঙ্ক মাত্র দুই মাইল। এখানে অনর্থক সময় নষ্ট না ক'রে চল আমরা হেঁটে ট্যাঙ্কে চলে যাই। এই জায়গাটা কোনওমতে পার হতে পারলে আর কোন কষ্ট হবে না। আর তিন চার ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা ঠিক হ'লে ড্রাইভার মোটর নিয়ে আসবে। প্রভাত বাবুর "সিন্দুর কৌটায়" সুন্দরসিংকে মোটর লইয়া আসিবার আদেশ তখন ঘ-দাদার মনে হইয়াছিল কিনা জানি না; আমার কাছে এই প্রস্তাবটি খুব ভালই লাগিল। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কিন্তু আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন—"আমরা ট্যাঙ্কে পৌঁছে খাওয়ার বন্দোবস্ত যা হয় একটা করতে পারব, কিন্তু এই ড্রাইভার বেচারার অদৃষ্টে এখানে কিছুই মিলবে না। খাবারগুলো এর জন্য রেখে যাওয়া যাক্।" তখন বেলা প্রায় ১টা, ক্ষুধার তাড়না বিলক্ষণ প্রবল, কিন্তু নিজেদের স্বার্থের দিকে এতটা নজর দিলে ড্রাইভার বেচারার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। তাই, এত যত্নের খাবারগুলো নিঃশেষে দান করিয়া ফেলিলাম। পুরাকালের দধিচি মুনি ও নাকি এইরূপ একটা দান করিয়া অমর হইয়া আছেন! সমস্ত জিনিষপত্র মোটরেই রাখিয়া কুশল সিংএর সঙ্গে একটা চামড়ার বাক্স দিয়া পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক পেণ্টালুন যথাসাধ্য হাঁটুর উপর তুলিয়া বীরসাজে ধীরে ধীরে জলে নামিলাম। উঃ, কি ঠাণ্ডা সে জল! মনে হইল এইবার শরীরের সমস্ত রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। নগ্নপদে নিষ্ঠুরভাবে প্রস্তরখণ্ডগুলি ফুটিতে লাগিল। অনেক কষ্টে সে জলস্রোত অতিক্রম করিলাম। কিন্তু একি, সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে, সমস্তরাস্তা জলে ভাসিয়া গিয়াছে। তবুও রণে ভঙ্গ দিলাম না। ঘ-দাদা বলিলেন, "যখন এতটা পথ আসা হয়েছে, ফিরে যাওয়া কিছুতেই হবে না। এরকম অবস্থায় বোধ হয় আমাদের মোটরখানি আর ট্যাঙ্কে আসতে পারবে না, কিন্তু ট্যাঙ্ক থেকে আর একখানা মোটরের বন্দোবস্ত হবেই।" পুনরায় ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। জলহীন বর্ষাসিক্ত বিস্তৃত প্রান্তর, দুইপাশে উচ্চশৈলশ্রেণী, তাহার মধ্য দিয়া আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী অদম্য উৎসাহে পথ চলিয়াছি। অতীত শৈশবের মধুর দিনগুলির কথা মনে পড়িল। যখন ঝড়বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে কত সকাল সন্ধ্যা আনন্দে বিচরণ করিয়াছি। আজ সংসার ভারক্লিষ্ট যৌবনে শৈশবের সেই অবাধমুক্ত হৃদয়ের আভরণটি বড়ই মধুরতা আনিয়া দিল। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে বেলা প্রায় ৪টার সময় ট্যাঙ্কে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ট্যাঙ্ক একটি খুব ছোট সহর। দুর্দ্দান্ত সীমান্ত দস্যুদের আক্রমণে এখানকার অধিবাসীগণ সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। এখানেও সৈন্যের ছাউনি আছে, তাহাতেই কতকটা শান্তি রক্ষিত হইয়াছে। এখানে আসিয়াই খবর পাইলাম, রাস্তা মেরামত হইতে ৪ দিন লাগিবে। কাজেই আমাদের মোটরখানির আশা একেবারেই ত্যাগ করিতে হইল। ভিতর হইতে প্রবল তাগাদার তাড়নায় সব কাজ ফেলিয়া প্রথমেই আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। তাও কি ছাই এই পোড়া দেশে

মিলে! ৩।৪ খানি ফুল্কা (রুটি) আর ২।৩টি কাঁচা পেঁয়াজ হইলেই এ দেশী সাধারণ লোকের নির্ব্বিঘ্নে আহার হয়। তাহার উপর একটু তরকারী বা একটু ডাল হইলে ত ষোলকলা পূর্ণ! আমাদের কি আর তাহাতে পোষায়? বাঙ্গালীর ছেলে সরুচালের ভাত, একটু সুক্ত, একটু মাছের ঝোল, একটু টক্ খাইয়া কাণে কলম গুঁজিয়া আফিসে যায়, আর এ দেশবাসীরা মোটারুটি, শক্ত ডাল ও কাঁচা পেঁয়াজ খাইয়া লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া মাঠে যায়। ক্ষুধা পাইলে বাঘেও নাকি ধান খাইয়া থাকে, তাই বাজার হইতে কয়েকখানি ফুল্কা ও কিছু দুধ সংগ্রহ করিয়া সারাদিন পরে তাহাই অমৃতের মত খাইলাম। বেশ একটু তাজা হইয়া একখানি মোটরের সন্ধানে বাহির হইলাম। এখানকার S. D. O. কে সমস্ত অবস্থা বলায় তিনি দয়া করিয়া একখানি মোটর দিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু তখন নয়, পরদিন প্রাতঃকালে, কারণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহরের বাহির হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। রাত্রবাসের জন্য Rest camp এ আশ্রয় লইলাম। Rest camp কে এক কথায় সৈন্য বিভাগের ধর্ম্মশালা বলা যাইতে পারে। কোনও মতে রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া পরদিন খুব ভোরে পুনরায় যাত্রা করিলাম। টাঙ্কের পর হইতেই সমতল ভূমি। রাস্তার দুই পাশেই বিস্তৃত মাঠ। এখানকার ভূমি সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর নয়, তবে যেরূপ কষ্টে এখানে শস্য উৎপন্ন করা হয়, তাহার অর্দ্ধেক আয়াস স্বীকার যদি বাঙ্গলার কৃষকেরা করে, তবে ক্ষেতে সত্যই সোণা ফলে। স্থানে স্থানে মাসুদ ও ওয়াজির পল্লী। বৃটিশগভর্ণমেণ্ট দ্বারা এইস্থান প্রতিষ্ঠিত, কাজেই দস্যুবৃত্তির পরিবর্ত্তে ইহারা বেশ একটু ভদ্রভাবেই চাষআবাদ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সীমান্ত সমস্যার মীমাংসা ততদিন হইবে না যতদিন তত্রত্য অধিবাসীদের জীবিকা অর্জ্জনের কোনও পথ নির্দ্দেশ করা না হইবে। দুর্দ্দান্ত মাসুদ ও ওয়াজিরদের দেশ এত অনুর্ব্বর যে শতচেষ্টা করিলেও সেখানে শস্য উৎপাদন করা যায় না। আবার উহাদের সংস্কার, শিক্ষা ও সুযোগ সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনের অন্যান্য পথ অবলম্বন করার পক্ষে সম্পূর্ণ বিরোধী। সেইজন্য বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহাদের দস্যুবৃত্তি করিতেই হইবে, কোন বাধাই ইহারা মানিবে না। মানুষ যখন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কোনও কাজ করে তখন তাহার মধ্যে একটা অমানুষিক শক্তির আবির্ভাব হয়, যাহাকে বাধা দেওয়া সাধারণ শক্তির সাধ্য নাই।

যে রাস্তা দিয়া আমরা চলিয়াছি তাহার দুঃ পাশ দিয়া নালা কাটিয়া একটা পাহাড়ে নদী হইতে জল আনা হইয়াছে, এবং সেই জল ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মত রাস্তার দুই ধার দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই জল ছাড়া আশে পাশে পনের কুড়ি মাইলের মধ্যে আর কোথাও জল নাই! স্থানে স্থানে রাস্তার পাশে জলের ধারে পাঠান সুন্দরীগণ ঘাট আলো করিয়া বসিয়া আছে। কেহ কাপড় কাচিতেছে, কেহ বা জল লইতে আসিয়াছে; কেহই আমাদের দেশের পুকুর ঘাটের মহাসভার সভ্যাদের মত খানিকটা বক্তৃতা করিয়া, খানিকটা পরনিন্দা করিয়া আসর জমাইয়া বসিয়া নাই, নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহাদের সবল সুন্দর আকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অতুলনীয় রূপ, অটুট স্বাস্থ্য ও বিলাস-লালসা-বর্জ্জিত সরল দৃষ্টি মরুভূমিতে চাঁদের হাট বসাইয়া দিয়াছে। পুরুষেরাও মাঠে কাজ করিতেছে, তাহাদের শরীর উন্নত বিশাল ও বলিষ্ঠ, বর্ণ গৌর, আকৃতি সম্পূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক; তাহাদের ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ানক চক্ষু দুইটি মাত্র হিংস্র স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হাওয়ায়-নাচা টুকটুকে ফুলের মত চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটু বয়স্ক ছেলেরা আমাদের দেখিয়া ছোট ছোট ঢিল ছুড়িয়া বা হাত তুলিয়া বিদেশীয়ের প্রতি তাহাদের পুরুষানুক্রমিক মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে; তাহাদের তরুণ মুখে চোখে একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়া বড়ই অশোভন দেখাইতেছে। ভারতের অনেক স্থানে দেখিয়াছি নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সাহেবি পোষাকপরা লোক দেখিলেই কাছে আসিয়া সেলাম করে, প্রতিদানে সাহেবেরাও বেশ দু'পয়সা দান করেন, কাজেই তাহাদের আশাও খুব বাড়িয়া যায় এবং গরীব পিতামাতার কাছেও যথেষ্ট উৎসাহ পায়। এই লজ্জাকর ব্যবসাটি কিন্তু এখানে মোটেই নাই। ইহারা অন্যের নিকটে কোনও কারণে মাথা নত করে না।

টাঙ্ক হইতে ডেরাইসমাইলখাঁ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল হইবে। সমস্তটা রাস্তা মরুভূমির মত শুষ্ক মাঠের ভিতর দিয়া গিয়াছে. স্থানে স্থানে দুই একটি ছোট ছোট পাঠান পল্লী আছে মাত্র। সারাটা পথ একই রকম। বেলা প্রায় নয়টার সময় অভিপ্সীত ডেরাইস্‌মাইলখাঁতে আসিয়া পৌছিলাম।

গল্প নাটক নভেলভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের এতটা সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমার এই ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনী— যাহা বাস্তবের বাহিরে গিয়া একটু অতিরঞ্জিত করিয়া না লিখিবার অপরাধে নিতান্তই নিরস হইয়া পড়িয়াছে, এইখানেই শেষ করিলাম।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ঈশানীর সুখ এবং দুঃখ।

প্রমদা ঈশানীকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহা অগ্রে পাঠ না করিয়া, শরৎকুমার ঈশানীকে দিত না; এবং পত্রে যদি ঈশানীর দুঃখজনক কোনও সংবাদ থাকিত সে মোটেই তাহা ঈশানীর হস্তগত হইতে দিত না।—আপনার প্রেমলীলায় পত্নীর প্রেম-প্রফুল্লতা অব্যাহত রাখিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করায় সে কোনও দোষ দেখিতে পাইত না।

এইরূপে অখিলবাবুর পীড়ার সংবাদযুক্ত পত্রগুলি ঈশানী পড়িতে পায় নাই। পিতার রোগের বিষয় অনবগত থাকিয়া, এবং অগ্রহায়ণ মাসের আগে পিত্রালয়ে যাইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত মনেই শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছিল, ঈশানীর আরও কিছু সুখ ছিল।

যে হিন্দুর মেয়েরা স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, ঈশানী সেই হিন্দুকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বামী পরদারাভিলাষী ও মদ্যপায়ী হইলেও, এবং তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলেও সে স্বামীকে ভালবাসিত। স্বামী তাহাকে আদর করিলে সে পুলক প্রফুল্ল হৃদয়ে সকল অপমান ভুলিয়া স্বামীর আদর গ্রহণ করিত। স্বামী আদরকালে কোনও স্তুতিবাক্য বলিলে বালিকা হসিতমুখে তাহা শুনিত, কিন্তু কখনও তাহাতে আর আস্থা স্থাপন করিত না;—মনে করিত প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তাহা প্রবঞ্চকের উক্তি মাত্র। উপদেশ বাক্যদ্বারা সে কখন কখন স্বামীকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সে ছেলেমানুষ, কখনই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না; কেবল তজ্জন্য আপনাকে স্বামীর উপহাসের ও বিরাগের পাত্রী করিয়া ফেলিত। স্বামী কখনও তাহাকে কোনও কারণ বশতঃ কিম্বা বিনা কারণে ভৎর্সনা করিলে, সে কখনও তাহার কোনও উত্তর করিত না; কেবল গোপনে অশ্রুমোচন করিত। কিন্তু তখনও তাহার হৃদয় মধ্যে প্রাণঢালা ভালবাসা বিরাজ করিত।

ঈশানীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কেবল একটী দোষ ছিল; তিনি স্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখাইতে এবং তদ্বিষয়ে মিথ্যা গল্প করিতে ভালবাসিতেন। তাহা ছাড়া তাহার আর কোনও দোষ ছিল না। তিনি সুন্দরী, পুত্র-জননী, সুশীলা এবং পতিব্রতা। যে শ্বশুর মহাশয় এমন গুণবতী পত্নীকে মদ্যপান করিয়া অকারণ প্রহার করিতেন, উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বাবুগিরি করিতেন, এবং অপরিমিত সুরা পান করিয়া উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, ঈশানী সেই স্ত্রীনির্য্যাতনকারী, দণ্ডার্হ এবং মদ্যপায়ী শ্বশুরকে ভক্তি করিত, যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিত; তিনি কখনও 'মা' বলিয়া আহ্বান করিলে তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য ছুটিয়া যাইত, পুলকভরে তাঁহার আদেশ পালন করিত।—হিন্দুকন্যা ঈশানীর কাছে তিনি যে দেবতার দেবতা, পূজ্যেরও পূজ্য!

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট ঈশানী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর ও যত্ন লাভ করিত। তিনি তাহাকে আদর করিয়া কত মিষ্ট বাক্য বলিতেন; তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া কত যত্ন পূর্ব্বক আহার করাইতেন; কদাচিৎ সে কিছু কম আহার করিলে তাহার জন্য কত দুঃখ ও অনুযোগ করিতেন। তাহার অবসর সময়ে শরৎকুমারের বাল্যকালের নানারূপ মিষ্ট গল্প করিয়া বধূকে স্বামীর প্রতি আরও অনুরাগিনী করিতে চেষ্টা করিতেন। কখনও আপনার এবং আপনার স্বামীর ঐশ্বর্য্যের ও গুণপনার গল্প করিয়া ঈশানীর ভারাক্রান্ত অবসর সময়গুলি লঘু করিয়া দিতেন। কখনও তাহাকে আপন বস্ত্রালঙ্কার

সকল দেখাইতেন, এবং কোনটি ঈশানীর পছন্দ হইলে উহা তাহাকে উপহার দিয়া কিম্বা পরিধান করিতে দিয়া বধূর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মুখমণ্ডল স্নেহোচ্ছ্বসিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন।

এইরূপে ঈশানীর শ্বশুরালয়ে বাসটা এক প্রকার সুখেই চলিয়া যাইতেছিল। স্বামী কখনও কখনও তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেও অনেক সময় তাহাকে অত্যধিক আদরে ডুবাইয়া দিতেন; এবং স্বামীর অপরাপর দোষ থাকিলেও হিন্দুকন্যা ঈশানী স্বামীকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। শ্বশুর দূষিত-চরিত্র হইলেও ঈশানী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে সে কেবল ভক্তি করিত না, তাঁহাকে যথার্থই আপন মাতার ন্যায় ভালবাসিত। যে হৃদয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিরাজ করে, তাহাতে সুখ ও বিরাজ করিবে ইহাই বিধাতার বিধান। কিন্তু ঈশানী এমনই হতভাগিনী যে তাহার পক্ষে বিধাতার বিধানও ব্যর্থ হইয়া গেল।—এই সুখটুকুও তাহার সহিল না।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী যে পত্র ঈশানীকে লিখিয়াছিলেন তাহা তাহাকে না দিয়া গোপনে পাঠ করিয়া যেদিন প্রভাতকালে শরৎকুমার বুঝিল যে শ্বশুর মহাশয়ের পীড়া কিছুই কঠিন নহে, সামান্য জ্বর হয় মাত্র, সেইদিনই সন্ধ্যাকালে সে এক টেলিগ্রাম পাইল। তাহা বরিশাল হইতে যদুপতি নামক একব্যক্তি তাহাকেই পাঠাইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, 'শ্বশুর মহাশয় সাংঘাতিকরূপে পীড়িত, ঈশানীকে লইয়া শীঘ্র এস।' এই টেলিগ্রাম পাইয়া শরৎকুমার ঠিক করিতে পারিল না যে বরিশালে যদুপতি নামক লোকটা কে? সে তাহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না; তাহার নামও বোধ হয় সে কখনও শুনে নাই। বিংশ শতাব্দীর সভ্য পৃথিবীতে কাহারও নাম যে যদুপতি থাকিতে পারে, তাহা তাহার ধারণারও অতীত। সে ঈশানীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বরিশালে যদুপতি নামে তোমাদের আত্মীয় কেহ আছে কি?'

ঈশানী ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, 'বরিশালে নয়, সিরাজগঞ্জে আমার ভগিনীপতির নাম যদুপতি। তুমি এ পর্য্যন্ত তাঁর নাম শোননি?'

শরৎকুমার বলিল—'তোমার সেই দিদির স্বামী? তারা বড় গরীব; নয়? আমি লোকটাকে কখনও দেখিনি, তার নামও শুনি নি। কিন্তু লোকটার টেলিগ্রাম পেয়ে বুঝেছি, যে লোকটা ভারি অসভ্য; টেলিগ্রামে একটুও ভদ্রতার ভাষা নেই। লিখেছে, শীগ্‌গির এস; আমি যেন বাপের চাকর; আমাকে হুকুম চালিয়েছে, শীগ্‌গির এস। কেন? 'অনুগ্রহ করে এস' লিখ্‌তে পারে নি?'

ঈশানী বুঝাইয়া বলিল, 'দোকানদার মানুষ, তাতে ভাল লেখা পড়া শিখেনি, তাই ভদ্রতার নিয়ম জানে না। তুমি রাগ ক'র না।'

শরৎকুমার বলিল, 'এমন অভদ্রের উপর রাগ করব না? তুমি বল কি?'

ঈশানী একবার মনে করিল যে শরৎকুমারের বাক্যের একটা উত্তর দেয়; বলে যে, তাহার নিষ্ফল ক্রোধে যদুপতির কিছুই ক্ষতি হইবে না। কিন্তু সে টালিগ্রাম পাওয়ার কথা এবং শীঘ্র আসার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল; তখন সে স্বামীর ক্রোধোৎপাদক কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু বরিশাল থেকে সে তোমায় কি লিখেছে? সে তোমায় যেতে লিখেছে কেন?'

শরৎকুমার ঝোকের মাথায় বলিয়া ফেলিল 'সে লিখেছে যে তোমার বাবার অসুখ, তোমাকে নিয়ে আমার যেতে হবে।'

সলিলপূর্ণ মৃৎকুম্ভে ঢেলা নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহাতে ছিদ্র হইয়া জল বাহির হইয়া পড়ে, তেমনই সহসা শরৎকুমারের বাক্যের ঢেলায় ঈশানীর উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি নয়ন পথে বাহির হইয়া পড়িল; বস্ত্রাঞ্চলে সে সেই অশ্রুবেগ প্রশমিত করিতে পারিল না। বালিকা যে কত দিন তাহার পিতাকে দেখে নাই, আজ সহসা তাঁহার পীড়ার কথা কেন তাহাকে শুনিতে হইল? কি পাপে বিধাতা তাহাকে এই সাজা দিলেন? কতক্ষণ পরে সে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে বলিল 'তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বাবার কাছে দিয়ে এস।'

শরৎকুমার ক্রন্দনমানা পত্নীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল

'অমন ফিচ্‌কাঁদুনের মত কেঁদনা বল্‌ছি। অসুখ করেছে বলে তোমার বাপ একবারে মরে গেল নাকি? তার পর তোমার মার কাছ থেকে আজ সকালে এই চিঠি এসেছে। এতে কি লেখা আছে, দেখ। এতে তোমার বাবার জ্বর অতি সামান্ত বলে লেখা আছে। তোমার মার কথা সত্যি বলে মানচ, না, সেই অসভ্য বেটার কথা সত্যি বলে মানচ?' এই বলিয়া শরৎকুমার পকেট হইতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পত্র বাহির করিয়া দিল।

ঈশানী পত্রখানি পাঠ করিয়া কহিল, 'এ পত্র ত মা আমাকে লিখেছিলেন। কই, এপত্র ত তুমি আমাকে দাওনি!'

শরৎকুমার ধমক দিয়া বলিল, 'তাতে আর কি ক্ষতি হয়েছে। পত্রখানা তোমার কাছে না থেকে ঘণ্টাকতক না হয় আমার পকেটেই ছিল।'

তখন স্বামীর কথার প্রতিবাদ করিয়া কলহ উত্থাপন করিবার প্রবৃত্তি ঈশানীর ছিল না। সে তখন পত্রের তারিখ মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। তাহা দেখিয়া বলিল, 'পত্রখানা মা তিন দিন আগে লিখেছিলেন; তাই মা যা' লিখেছিলেন, আর আজকার টেলিগ্রামে যা আছে দুইই সত্যি হ'তে পারে;—তিন দিনে বাবার অসুখ বোধ হয় খুব বেড়ে গেছে, তাই আমাদের যাবার জন্ত টেলিগ্রাম করেছে। দিদি খবর পেয়ে জামাই বাবুর সঙ্গে আগেই এসেছে। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকেও কালকের ষ্টীমারে রেখে এস।'

শরৎকুমার মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তা' কি করে হ'বে? আগে এই টেলিগ্রামের উত্তরে আমি একটা টেলিগ্রাম করি, তার উত্তর আসুক; আমরা জানতে পারি, তিনি এখনও কি অবস্থায় আছেন। তার পর বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে যদি বুঝি যে আমাদের যাওয়া দরকার, তখন যা হয় করা যাবে।'

ঈশানী অশ্রুপ্লাবিত মুখে কহিল—'এখনই টেলিগ্রাফ করনা কেন? আজ রাত্রেই তার উত্তর পাবে। কাল সকালে আমাকে নিয়ে যাবে।'

শরৎকুমার রুষ্ট হইয়া বলিল, 'আমরা ভদ্রলোক, আমাদের একটা খাতির আছে; আমরা হুট করলেই কোনও যায়গায় যেতে পারিনে। আমাদের যেতে হ'লে আগে ষ্টীমারের ক্যাবিন রিজার্ভ করা দরকার। তা' আটচল্লিশ ঘণ্টা অর্থাৎ দু'দিন আগে দরখাস্ত না করলে হয় না। সে অনেক হাঙ্গাম। তুমি মিছামিছি বোকার মত কথা বলো না।'

ইহার পর ঈশানী স্বামীকে আর কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না। কেবল কাঁদিল, এবং অতঃপর তাহার শ্বশুরালয়ে বাসে আর কোনও সুখ রহিল না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যদুপতি আপনার ব্যবসার কার্য্য সমাধা করিয়া ঠিক দশ দিন পরে আবার তাহার প্রিয়তমা পত্নী কল্যাণীর নিকট বরিশালে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কল্যাণীর মূর্ত্তিমান রোদনের ন্তায় বিষাদপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া যদুপতির চক্ষে জল আসিতে লাগিল। সে অতি কষ্টে অশ্রুবেগ দমন করিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কি হয়েছে, কল্যাণু?'

কল্যাণী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'আমার কিছু হয় নি। কিন্তু আজ ক'দিন থেকে বাবার অসুখ বড় বেড়েছে। সন্ধ্যার পর ভুল বকেন, রাত্রে একটুও ঘুমান না। আমার বড় ভাবনা হ'য়েছে। তুমি দেখবে এস।'

তখন সন্ধ্যাকাল; তখন পতিব্রতা প্রমদা সারাদিন স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইয়া ক্লান্ত হইয়া বাহিরে হাত মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন এবং গন্ধ-সাবান দ্বারা হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর করিয়া, আপনার এয়োত অক্ষয় করিবার জন্ত পরিধানে রক্তপ্রান্ত শাটী, অঙ্গে অলঙ্কার, সীমন্তে সিন্দুর রাগ দ্বারা ভূষিত হইতেছিলেন।

তখন নির্জ্জন পাইয়া যদুপতি পত্নীর সহিত শ্বশুর মহাশয়ের কক্ষে প্রবেশ করিল। রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দীপালোকে তাঁহার স্তিমিত নেত্র, শীর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে নেত্রপাত করিয়া তাহার মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সে কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ ডাক্তার বাবু কখন এসেছিলেন?'

কল্যাণী পিতার মুদিত নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বাক্যালাপের মৃদু শব্দে তাঁহার তন্দ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় স্বামীকে কক্ষের বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল; এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিল, 'ডাক্তার সকাল 'বেলা এসে দেখে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, পরামর্শের জন্য আর এক জন ভাল ডাক্তার ডাকা দরকার;—সিভিল সার্জ্জন হলেই ভাল হয়।'

যদুপতি। তা শুনে, তোমার মা কি বল্লেন?

কল্যাণী। মা বল্লেন যে, ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে সিভিল সার্জ্জেনকে ডাকবার তাঁর পয়সা নেই; তাঁর এয়োতের যদি জোর থাকে তাহ'লে ওই ডাক্তারের হাতেই বাবা ভাল হয়ে উঠ্‌বেন। সত্যি, আমিও জানি, রোগা স্বামীকে বাঁচানোর পক্ষে মেয়ে মানুষের এয়োতের জোরটা বড় বেশী জোর। আমরা যদি কায়মনোবাক্যে স্বামী-পায়ে মন রাখি, তাহ'লে যমের সাধ্য নেই যে সেই স্বামীর গায়ে হাত দেয়;—সাবিত্রী কথা শুনেছ ত? আমাদের স্বামী ভক্তির তেমন জোর নেই, আর আমাদের মন বুঝে না বলে, তাই আমরা ডাক্তার ডাকি। আমার কেবল মনে হচ্ছে, সাহেব ডাক্তার এলেই বুঝি বাবা ভাল হ'য়ে উঠবেন।

যদুপতি। তাই আনবো কল্যাণু, তুমি কিছু ভেব না। কিছু দিন আগে আনলেই ভাল হ'ত। কিন্তু এখনও সময় যায় নাই। আমি এখনই নরেন বাবুর বাসায় গিয়ে, তার সঙ্গে পরামর্শ করে ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আস্‌ছি। আর দেখ, মাকে বলো যে আমার বাবার চিকিৎসায় আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারি নি; তাঁর দুঃখুটা, শ্বশুরের চিকিৎসার জন্যে খরচ করে, আমি কতক পরিমাণে দূর করতে চাই। তাই আজ থেকে ওঁকে কোন খরচই করতে হ'বে না। চিকিৎসা আর পথ্যের সমস্ত খরচই তুমি আমি দু'জনে মিলে করবো। এখন তাহ'লে আমি যাই?

কল্যাণী। একটু জল খাবার খেয়ে যাবে না?

যদুপতি। না, কল্যাণু, আর সময় নেই। এর পর, ডাক্তার সাহেব খানায় বসবে। আর আমি ত ষ্টীমারে অনেক জল খাবার খেয়েছি। এখনও ডাক্তারের আর ওষুধের ব্যবস্থা করে, একবারে চারটি ভাত খাব।

যদুপতি আর বাক্য ব্যয় না করিয়া সত্বর বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আবার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া পিতার শুশ্রূষায় মনোযোগ দিল। পতিব্রতা প্রমদা কক্ষান্তরে থাকিয়া, পতির আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় পতিব্রতাদিগের ন্যায় আপন শরীর-সজ্জায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময় অখিল বাবু একবার কিছু সন্ত্রাসিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন; ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—'কে, কে?'

কল্যাণী পিতার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'আর ত এখানে কেউ নেই বাবা! আমিই একলা বসে, তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

অখিল বাবু আবল্যবিজড়িত স্বরে কহিলেন, 'তাই দাও মা। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম—তোমার মা যেন স্বর্গ থেকে আমাকে দেখতে এসেছিলেন; বলে গেলেন, 'কেন রোগে কষ্ট পাচ্ছ? আমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে, আমার কাছে চলে এস।' আমিত তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছি মা।'

কল্যাণী অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া কহিল—তাও আমি জানি, বাবা।'

অখিল বাবু আবার লোচনদ্বয় মুদিত করিলেন; কন্যার বাক্যের উত্তরে প্রলাপ বলিলেন—'মা, মা, আর জন্মে তুমি আমার মা হয়ো, মা! তাহলে আমি তোমার কোলে শুতে পাব, কেমন?'

এই সময় অলঙ্কার ভারে ভূষিতা প্রমদা রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কল্যাণী পিতার প্রলাপের কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলা হইল না। প্রমদা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'খানিক আগে তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলি?'

কল্যাণী আনত আননে কহিল, 'সিরাজগঞ্জ থেকে ওঁরা এসেছেন।'

প্রমদা কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'কে? জামাই? এই ত সেদিন এসে তোকে রেখে গেছে। আবার এত শীগগির এল যে?'

কল্যাণী কহিল—'ডাক্তার ডাকবার জন্যে, সময় মত ওষুধ পথ্য কিনে আনবার জন্যে বাড়ীতে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার। তাই আমি ওঁকে আসতে বলেছিলাম।'

প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে এখন কোথায় গেল?'

কল্যাণী কহিল, 'বাবাকে দেখে,'সাহেব ডাক্তার ডাক্‌তে গেছে।'

জামাতার এই অযথা স্বাধীনতা গ্রহণে, প্রমদা রুষ্টা হইয়া কহিলেন—'সাহেব ডাক্তার! সাহেব ডাক্তার আনতে যেতে তাকে কে বল্লে? শুনেছি, সন্ধ্যার পর সাহেব ডাক্তারকে আনতে হ'লে বত্রিশ টাকা ভিজিট দিতে হয়। অত টাকা আমি এখন কোথা থেকে দেবো? যাবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তার যাওয়া উচিত ছিল।'

কল্যাণী মৃদু স্বরে বুঝাইয়া বলিল, 'টাকা তোমায় কিছু দিতে হবে না। ভিজিট বা ওষুধের খরচ যা লাগে, তা তিনিই দেবেন বলে গেছেন।'

প্রমদা আর কোনও কথা কহিলেন না। স্বামীকে ভাল ডাক্তার দেখাইয়া আরোগ্য করিতে তাঁহার কোনও আপত্তি ছিল না; কোনও বুদ্ধিসম্পন্না স্ত্রীলোকেরই তাহা থাকে না। তাঁহার আপত্তি ছিল কেবল তাহার যত্ন সঞ্চিত রুধিরসম অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিতে! কোনও বুদ্ধিমতীই ত তাহা করে না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে যদুপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বরিশালের সিভিল সার্জ্জনকে লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার সাহেব রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন; যে যে ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছিল নরেন বাবুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন; কাগজ কলম চাহিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন এবং বলকারক পথ্য রোগীকে সেবন করাইবার উপদেশ দিলেন। অতঃপর ডাক্তারদ্বয়, কল্য পুনরায় আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাত্রি আট ঘটিকার পূর্ব্বেই প্রস্থান করিলেন।

যদুপতি আপনি ঔষধের দোকানে যায়া ঔষধ লইয়া আসিল এবং তাহা রোগীকে সেবন করাইবার জন্য কল্যাণীকে উপদেশ প্রদান করিল। তাহার পর নিজে হাত মুখ ধুইয়া পত্নী প্রদত্ত অন্ন খাইতে বসিল। পল্লীবাসী, দুইদিন অন্নাহারে বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত্ত, পরিশ্রমের পর কিছু অধিক পরিমাণ অন্ন অল্পকাল মধ্যে উদরস্থ করিয়া ফেলিল। আহারাদির পর পত্নীকে ও শ্বশ্রূকে আহারের অবসর দিবার জন্য যদুপতি কিছুক্ষণ শ্বশুরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল।

অখিল বাবু নিদ্রাহীন চক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে আগ্রহ পূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু রোগবিকৃত দৃষ্টিতে সহসা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিছু কাল পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তোমাকে ত চিন্‌তে পাচ্ছি নে।'

যদুপতি কহিল, 'আমি আপনার বড় জামাই, যদুপতি। আমাকে আপনি চিন্‌তে পারছেন না? আলোটা একটু কাছে আনব কি?'

অখিল বাবু পুনরায় যদুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া কিছু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন—'না, আলো আনবার দরকার নেই। এইবার আমি তোমাকে বেশ চিনতে পেরেছি। তুমি আমাকে দেখতে এসেছ, বাবা! বড় ভাল হ'য়েছে। তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারবো না। একা মেয়ে মানুষ এরা,—সব—সব সামলাতে পারত না। তুমি শেষ পর্য্যন্ত থেকো।

যদুপতি তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া সংক্ষেপে বলিল, 'থাকবো।'

শুনিয়া অখিল বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া চক্ষু মুদিলেন।

যদুপতি কয়েক দিনের জন্য সকল কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া, শ্বশুরবাটীতেই বাস করিল। প্রত্যহ, কখন একবার কখনও দুইবার দুই জন ডাক্তার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন; তাঁহারা প্রত্যহ নূতন নূতন ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন প্রমদা প্রত্যহ উজ্জ্বল সিন্দুর রাগে আপনার সুন্দর ও মার্জ্জিত ললাটের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু মৃত্যু যাহাকে আপন মমতাশূন্য কবলে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিল না। বিচক্ষণ ডাক্তারদিগের ঔষধ ও পথ্য, প্রমদার উজ্জ্বল সিন্দুর রাগ, কল্যাণীর অক্লান্ত শুশ্রূষা, যদুপতির অর্থব্যয় সকলই বৃথা হইল। যদুপতির বরিশাল আগমনের অষ্টাহের মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল। কল্যাণীর করুণ ক্রন্দনে ধর্ম্মরাজের পাষাণ অন্তঃকরণ গলিল না, পিতার প্রাণহীন দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল না। প্রমদা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগিণী, কৌটার সমস্ত সিন্দুর মাথায় ঢালিয়াও আয়ুহীন স্বামীকে আয়ু দিতে পারিল না। তাহার অলঙ্কার, রক্তপ্রান্ত শাটী সমস্তই বৃথা হইল; তাহা দ্বারা আপনার বরদেহ সজ্জিত করিবার অধিকারও নষ্ট হইল; তাঁহার রমণী জীবনের সমস্ত রমণীয়তা তমোরাশিতে পরিণত হইল। (ক্রমশঃ)

শেষ যাত্রা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী]

আজকে আমার জীবন পথের যাত্রা হবে শেষ,
তাই সে আজি বীণায় বিষাদ বাজে,
আমায় কেরে পরিয়ে দিল আজকে কালোর সাজ
জবাব আমার আজ কি সকল কাজে ?
দিনের আলো মলিন হয়ে আসে
চোখের পরে সাঁঝের আঁধার ভাসে,
আঁধার আমার জীবন সহ মেশে
তাই তো নিরানন্দে কাঁদে প্রাণ,
যাবার বেলা বীণা বিদায় সুরে
জানায় কি সে সকল অবসান ?

যে পথ দিয়ে সারা জীবন করছি আনাগোনা
সে পথ চির ত্যক্ত সবার কাছে,
একলা আমি যাই বা আসি বাজিয়ে আমার বীণা
ভাবিনি কে বন্ধু আমার আছে।
আমার আলো জলতো আমার ঘরে
দেখে তারে আসছি জীবন ভরে,
আজ হারিয়ে আলো অন্ধকারে
ভাবছি আমার সবই হ'ল শেষ,
আমার বীণা গাইল শেষের গান
বুকের মধ্যে জাগল করুণ রেস।

আমার এ পথ থাকবে পড়ে এমনি নীরব হয়ে
পথিক কেহ আসবে না গো হেথা,
আমার বীণা রইবে পড়ে কেউ চাবে না তায়
তাই ভেবে যে বাজছে বুকে ব্যথা।
অন্ধকারে চলব এ পথ একা,
জানব না পথ সোজা কিম্বা বাঁকা,
আলোর ছবি বিস্মৃতিতে ঢাকা
আমার যাওয়া-আসার অবসান,
বাজরে বীণা শেষ বারটী আজ,
শেষ করে দে তোর সে সুখের গান।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(২৬)

কাকাবাবু বলিয়াছিলেন 'এখানে আমার অনেক কাজ আছে।' সে কাজ যে কি তাহা আমার অজানা নয়। কয়েকদিন হইল সেই কাজের ভারটি আমি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়াছি। এ কাজে যেমন বিপুল আনন্দ, তেমনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কথঞ্চিত্ত শান্ত হইয়াছে। আমি মায়ের সেবা কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি। গলিত স্বর্ণের ন্যায় আমার তরল হৃদয়টি বড় তৃপ্তিতে স্বীকার করিতেছে—জয় করিবার তাহার কিছুই নাই। সে জয় করিবে না, সে নিজেকে বিলাইয়া দিবে। নিজের সুখ ভুলিয়া, আরাম ভুলিয়া, বিরাম ভুলিয়া, প্রশান্ত নির্ম্মল হৃদয়ে বিলাইয়া দিবে। সে কিছুই চাহিবে না, চাহিবার কল্পনা করিবে না। প্রস্ফুটিত কুসুমের মত নিঃস্বার্থভাবে নীরবে সে তাহার অন্তরের সুগন্ধ প্রিয়তমের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া, তাহার পরিজনদের সুখী করিবে।

পরিজনদের মধ্যে—কাকাবাবুর স্নেহের উপমা হয় না। সে স্নেহ মন্দাকিনীর সলিল ধারার মত দিবানিশি আমার অন্তর প্লাবিত করিতেছে। সে অনাবিল মমতার উচ্ছ্বাস আমার সেবার অপেক্ষা রাখে না, ভক্তির প্রত্যাশা করে না; একান্ত স্নেহপাত্রীর অশেষ কল্যাণ কামনায় তাহা নিয়তই উন্মুখ। আমাকে গৃহে আনিয়া, আমাকে স্নেহ করিয়া কাকাবাবু সুখী হইয়াছেন! বালিকা মঞ্জু সানন্দে অকপট হৃদয়ে আমাকে আত্মসমর্পন করিয়া উল্লসিত। কেবল সুখী হইতে পারেন নাই, আমার জীবন দেবতা, আর মা। দেবতা আজ দূরে, মা নিকটে, তাই মায়ের সব কাজই আমি ধীরে ধীরে আয়ত্ব করিয়া লইতেছি।

এ জগতে কিছুই নাকি বিফল হয় না—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—আমার সেবায় আমার যত্নে মা'র বিমুখতা ক্রমেই সাদর প্রসন্নতায় রূপান্তরিত হইতেছিল। মার অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে আজ আমার এত আনন্দ। এখন মা'র পূজার যোগাড় করিয়া, জলখাবার সাজাইয়া দিয়া, আমার চিত্ত তৃপ্ত হইতে চাহে না। মা বিধবা সপাক খান; নিজ হস্তে রান্না বাড়া করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার ইচ্ছাটি আমার অন্তরে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সাহস করিয়া এ প্রস্তাব মার কাছে উত্থাপন করিতে পারি না। যেটুকু পাইয়াছি—সেইটুকু হারাইবার ভয়ে আমার ভীরু হৃদয় তাঁহার অধিকারের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধায় কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়।

আজ মা পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলে আমি কুটনো কুটিতে কুটিতে আপনার দরখাস্ত পেস করিয়া ফেলিলাম। আস্তে আস্তে কহিলাম "মা, আমি আজ রান্না করবো, আমায় রাঁধতে দিন।"

মা এ পর্য্যন্তও আমাকে ডাকিয়া আমার সহিত ভাল করিয়া কথা বলেন নাই। হাসিমুখে আমার কথার একটিও প্রত্যুত্তর দেন নাই। আজ আমার প্রস্তাবে মা একটুখানি হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন "তুমি তো আমার সব কাজই কোরচ; রান্না তোমার করতে হ'বে না। রাঁধতে গিয়ে হাত পা পুড়িয়ে অনর্থ করবে।"

রান্না করিতে আমার হাত পা পুড়িবে—এমন নূতন কথায় আমার হাসি আসিল। আমি আগ্রহের সহিত কহিলাম "হাত পা পুড়বে না মা। ইচ্ছাপুরে আমি প্রত্যহ রান্না করতাম। ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম রান্না বাড়া সবই আমি শিখেছি মা, এখন থেকে আপনার রান্না আমাকেই রাঁধতে দেবেন।"

"সেখানে যা ক'রতে এখানে যে তাই করতে হ'বে তার কোনো মানে নাই। আমার জন্যে তুমি এত কষ্ট করতে যাবে কেন বাছা ; তোমার রাঁধতে হবে না।"

মা'র স্নেহ-হীন কথায় আমার চক্ষে জল আসিল। আমি কুটনো ফেলিয়া মার দুইখানি পায়ে মাথা রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিলাম "আমায় কাজ করতে দিন মা। কাজ না করলে আমার যে দিন কাটে না। আমি কালো কুৎসিত ব'লে আর সকলেও পায়ে ঠেললে আপনি আমায় পায়ে ঠেলবেন না মা। আপনি পায়ে ঠেললে আমি কোথায় যাব ? আমার জায়গা কোথায় ?"

আমার অনাহত চোখের জলে মা'র পা দুটি ভিজিয়া গেল। মা ধীরে ধীরে আমার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইলেন। অঞ্চল দিয়া আমার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন "তুমি তো আমার পায়ে ঠেলার জিনিষ নও মা, তুমি আমার আদরের ধন, ঘরের লক্ষ্মী। আমার দুর্ভাগ্য তাই আমি এতদিন তোমায় আদর করতে পারি নি, তোমায় বুঝতে চেষ্টা করি নি, তোমার অন্তরের খবর নিই নি, শুধু বাইরের রূপটাই খুঁজে মরেচি। যা হবার তা হ'য়ে গেছে মা, তুমি এখন শান্ত হও। তোমার ঘর, তোমার সংসার তা—থেকে কে তোমায় বঞ্চিত করবে ? কাজ তোমার খুঁজে নিতে হবে না লক্ষ্মী, এখন থেকে তোমাকেই কাজ খুঁজে নেবে। শুধু আমার কাজ কেন মা, ভগবান তোমায় সকল কাজেরই অধিকারিণী করবেন, তুমি সুখী হ'বে। এত গুণ, এমন মিষ্টি স্বভাব কখনো বৃথা যাবে না।"

মা নত হইয়া আমার ললাট চুম্বন করিলেন। মা'র স্নেহ পাইয়া আমি ধন্য হইয়া গেলাম। আমার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত মেঘ রাশি কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। কিন্তু মেঘের একটু ক্ষীণ রেখা রহিয়া গেল। শ্বশুরের স্নেহ, শাশুড়ীর ভালবাসা, ননদিনীর প্রীতি, নারী জীবনের চিরকাম্য এ তিনটি ঐশ্বর্য্যের আজ আমি অধিকারিণী। একি আমার কম সৌভাগ্য ? একি আমার কম পুরস্কার ? তবু হৃদয়ের কোন গোপন প্রদেশে কিসের ব্যথা ফুলে ঢাকা তীক্ষ্ণধার কাঁটার মত আমার বুকে খচ্ খচ্ করিতেছে। আমি আঁখি ঠারিয়া মনকে যতই শাসন করিতেছি,—আমি কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিবার কল্পনা করিব না—ততই আমার নারীত্ব যেন ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতেছে।

ভাবিয়াছিলাম,—মা'র স্নেহ পাইলেই আমার অন্তরের ক্ষুধা মিটিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম মা'র স্নেহে হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হইলেও তৃপ্ত নহে। সে আরও কিছু চাহে,—আরও কিছুর আশা রাখে ; কিন্তু সে কি দ্রব্য তাহা আমি জানি না। তাহার আস্বাদ পাই নাই।

(২৭)

সেদিন মাঘের রৌদ্রালোকিত মধ্যাহ্নে মঞ্জুকে চটের আসন বোনা শিখাইতেছিলাম। মা মেঝেয় শুইয়া 'রামায়ণ' পড়িতেছিলেন। চারিদিকে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে কর্ম্মের সহিত বিরাম, শক্তির সহিত শান্তি, পুরাতনের সহিত নবীনতা বিরাজ করিতেছিল।

তিনটি সবুজ পাতার কোলে একটি গাঢ় লাল বর্ণের গোলাপ বুনিয়া—সেলাইটা মঞ্জুর হাতে দিতেই মঞ্জু সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "মা, চেয়ে দেখ ফুলের তোড়াটা কি সুন্দর হয়েচে। এই আসন খানা শেষ হ'লে দিদির কাছে আমি জড়ির পাতা বোনা শিখবো।"

মা ফুলপাতা গুলি নিরীক্ষণ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "তোমার সেলাইয়ের হাতটি বড় সুন্দর বৌমা ; এখনকার ইস্কুলে সেলাই-শেখা-মেয়েদেরও এমন সাফ হাত আমি দেখি নি। মঞ্জুকে তোমার মতন এমনি শেলাই শেখাতে হ'বে। শিখতে পারলে শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী দু'জনাই আমার কাছে খুব ভাল দু'টি পুরস্কার পাবে।"

পুরস্কারের উল্লেখে মঞ্জু উৎসাহিত হইয়া বলিল "আমি দিদির মত খুব ভাল সেলাই শিখবো মা, তুমি দেখে নিয়ো। শেখা হ'লে তখন কিন্তু পুরস্কারের কথা ভুলে যেয়ো না। পরে তুমি যদি ফাঁকি দাও মা, তার চেয়ে একটা পাকা কাজ করে রাখি।"

মঞ্জু একখানা বাঁধানো খাতা টানিয়া লইয়া নীল কালীতে বড় বড় অক্ষরে লিখিল—আমি সেলাই শিখিলে মা আমাকে ও দিদিকে খুব ভাল দু'টি পুরস্কার দিবেন। আজ এই কথা বলিয়াছেন তাই লিখিয়া রাখিলাম।"

লেখাটুকু মা'র চোখের কাছে ধরিতেই মা'র অধর

দুইখানি আনন্দের হাস্তে সমুজ্জ্বল হইল। মা স্নেহজড়িত কণ্ঠে বলিলেন "তোর এত সাবধান না হ'লেও চলতো মঞ্জু। আমি ভুলে গেলেও তোরা যে দু'টি গৃহীতা, তোদেরই দল ভারী। তোদের ফাঁকি দেবার সাধ্য কি আমার হবে ?"

"কিসের ফাঁকি বৌঠান ?" বলিতে বলিতে একখানি চিঠি হাতে লইয়া কাকাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মা বলিলেন "বৌমা মঞ্জুকে সেলাই শেখাচ্ছে, আমি বলেছি—মঞ্জু সেলাই শিখলে ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী দু'জনাই আমার কাছে দু'টি ভাল পুরস্কার পাবে। পাছে আমি ভুলে যাই, সেই জন্তে মঞ্জু পুরস্কারের কথা পাকা করে খাতায় লিখে রেখেছে।"

"আমার ক্ষুদে মা'টির মধ্যে বিষয় বুদ্ধি কি কারুর চেয়ে কম আছে! পুরস্কারের দলিল তো লেখাই হ'য়ে গেছে — এইবার সাক্ষীও জুটে গেল।" বলিয়া প্রাণ খোলা হাসির শব্দে কাকাবাবু সেস্থান শব্দময় করিয়া তুলিলেন।

এই উচ্ছ্বসিত হাসি গল্পের মধ্যে মা কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজকের ডাকে কি মণির চিঠি পেয়েছ ? তোমার হাতে ওখানা কি ?"

"এটা মণির চিঠিই, খানিক আগে পেয়েছি।"

"মণি কি লিখেছে ; সে আর কতকাল কাশীতে থাকতে চায় ? এখন তো তার ফিরে আসা দরকার ; আর কখ্খনো তাকে বাড়ী ছেড়ে এমন হ'য়ে থাকতে দেখি নি। তুমি একটু জোর ক'রে লিখলে সে কোন কালে ফিরে আসতো ঠাকুরপো ; সে যে তোমার কথা ভ্রমেও অমান্ত করে না।"

"অমান্ত করে না বলেই আমি তার ওপর একটুও জোর খাটাই না বৌঠান। ভয়ের চেয়ে ভক্তিরই মূল্য বেশী।— মণীশ তো কাশীতে নেই, সে কাশী থেকে চ'লে গেছে।"

"কোথায় আবার চলে গেল ?"

"মুঙ্গেরে গেছে। ছেলে আমার ভয়ানক কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে। আমি লিখেছিলাম "এতদিন কাশীতে কি কোরছ ?" আমার চিঠি পেয়েই কাশী পরিত্যাগ করা হয়েছে। আমাদের মুঙ্গেরের জমি গুলো পড়ে রয়েছে—তাতে নতুন বাংলা তৈরীর সাধ তার হয়েছে। কিছুদিন মুঙ্গেরে থেকে নতুন বাংলা বানানো, জমির বন্দোবস্ত করা তার ইচ্ছা। সে আমার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছে।"

মা চিন্তান্বিত মুখে বলিলেন "তুমি তাকে কি অনুমতি দেবে ঠাকুরপো ? এতদিন কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে ছিল সে এক রকম মন্দ নয়। এখন আবার মুঙ্গেরে থেকে যে কি হবে তা ভগবানই জানেন। যাকে ডেকে না খাওয়ালে ক্ষিধের কথা মনে হয় না, ঘুমুতে না বল্লে ঘুম পায় না, সেই ছেলে রাঁধুনী নিয়ে, চাকর নিয়ে সংসার করে খাবেন, তবেই হয়েছে !"

"সেখানে থেকে তার যখন কাজ কর্ম্ম করতে সাধ হয়েছে তখন আমি তাকে বাধা দেব না বৌঠান। বাইরে থাকবে, বেশ তো থেকে আসুক, থাকতেই আমি তাকে অনুমতি দেব।"

"সত্যি করেই অনুমতি দেবে ঠাকুরপো ? তার যে কত খানি কষ্ট পেতে হ'বে সেটা ভেবে দেখে বলেছ ?"

"ভেবেই বলেছি বৌঠান, আমার ব্যবস্থায় তার কিচ্ছু কষ্ট হবে না, এতটুকুও অসুবিধা হবে না। সে সুখে থাকবে, শান্তি পাবে।"

মা একটুখানি ভাবিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন "মুঙ্গেরে আমাদের নিকট আত্মীয় তো কেউ নেই ঠাকুরপো,—কাকে দিয়ে তুমি তার জন্তে ভাল ব্যবস্থা করাবে ? আপনার লোক না হ'লে মাইনে করা ঠাকুর চাকরে কি মানুষের যত্ন আত্যি হয় ? যতই টাকা দাও না, যতই ভাল হোক না—তবু রান্না খাওয়ায় আপনার জনটি চাই।"

কাকাবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন "তোমার ভয় নেই বৌঠান, মাইনে করা লোক দিয়ে তোমার ছেলের সেবা যত্ন করাতে চাই না। যাকে দিয়ে তার যত্ন করাতে চাচ্ছি— তার মত আপনার জন মণীশের একটিও নেই।"

কাকাবাবুর এ রহস্যময় ইঙ্গিতে আমার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কিসের সম্ভাবনায় মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। আমি উৎসুক হইয়া কাকাবাবুর পানে চোখ তুলিতেই কাকাবাবু আমার চোখের সহিত সরল চোখ মিলিত করিয়া পরিহাসের স্বরে বলিলেন "বল তো মা, আমি কার কথা বলছি ? বৌঠান তুমিও বল, মঞ্জুও বলুক, আমি কার কথা বলচি ?"

মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মঞ্জু বিজ্ঞের মত

ভাবিতে বসিল। আমি নতশিরে ছুঁচে সুতা পরাইতে গিয়া—হাতে ছুঁচ ফুটাইয়া ফেলিলাম!

সকলের মুখের পানে চাহিয়া কাকাবাবু বলিলেন "তোমরা কেউ বলতে পারলে না। এত সোজা কথাটাও তোমাদের মাথায় এলো না।—আমি শ্যামাকে নিয়ে মুঙ্গেরে যাব। শ্যামাকে মুঙ্গেরে রেখে কয়েকদিন পর এখানে ফিরে আসবো। কাশীতে পালিয়ে বেড়ান, মুঙ্গেরে বাড়ী তৈরী, ছেলের সব লুকোচুরী এবারে খতম হবে।" নিজের রসিকতায় নিজেই কাকাবাবু হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কাকাবাবুর কথায় আমার অন্তরের কোমল করুণ ভাব গুলি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যিনি আমার নিমিত্ত গৃহত্যাগী, প্রবাসী—আমি কোন লজ্জায়, কোন মুখে তাঁহার শান্তিপূর্ণ জীবনপথে গিয়া দাঁড়াইব? একদিন আশাভঙ্গের বেদনায় বড় দর্পে বড় তেজের সহিত যাঁহার চোখের সম্মুখ হইতে নিজের কালো রূপ লুকাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম,—আজ সেদিনের সেই অতীত ঘটনাবলী ভুলিয়া কেমন করিয়া তাঁহার কাছে যাইব? বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তিনি যখন মনে মনে ভাবিবেন—'যাহার চরিত্রের এতটুকু দৃঢ়তা নাই, যাহার বাক্যের এতটুকু সততা নাই, তাহার আবার তেজ! তাহার আবার গর্ব্ব!' তিনি একথা ভাবিলে—তাহা আমার অসহ্য, এত দুঃখের চরম দুঃখ। না, না আমি যাইব না, যাইতে পারিব না। তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া, তাঁহার বিষ-মিশ্রিত অমৃতময় প্রথম বাক্যালাপের প্রতি বর্ণটি স্মরণ করিয়া—তাঁহারই ধ্যানে, তাঁহারই গৃহে আমার এ নিরানন্দ ব্যর্থ দিবা-রজনী অতিবাহিত করিব।

কিন্তু কাকাবাবুর কাছে 'যাইব না' বলিতে কণ্ঠ কেন রুদ্ধ হইয়া আসে! কণ্ঠের ভাষা যে ফুটিতে চায় না! ইহা কি কণ্ঠেরই দোষ, না আমারি দুর্ভাগ্য?—দুর্ভাগ্য নয়, সৌভাগ্য! মন আমার বিদ্রোহী হইয়া কি করিতে বসিয়াছিল; কাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চাহিয়াছিল।

আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? সংসারের সূর্য্যতাপে মলিন—ধূলায় ধূসরিত, এই গন্ধ হীন, বর্ণহীন বনফুলটিকে কে আজ সাদরে সযত্নে দেবতার স্বর্ণ মন্দিরে লইয়া আসিয়াছে? কাহার স্নেহবারি সেচনে মলিন বন্য পুষ্পটি উজ্জ্বলতায় কোমলতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!—সেই পিতৃতুল্য, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা তুল্য দয়াময় করুণাময় কাকাবাবু; তাঁহার ব্যবস্থায়, আমার দ্বিধা, আমার কুণ্ঠা! নারী, শত ধিক্ তোকে, শত ধিক্ তোর অভিমানে। আমি আসন খানা হস্তে লইয়া আপন মনেই চিন্তা করিতেছিলাম; সহসা আমার নত মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া কাকাবাবু বলিলেন "মুঙ্গেরে নিয়ে যাব শুনে তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেল কেন মা? আমি তোমাকে বনবাসে বন্য জন্তুর কাছে নিয়ে যাব না। সেখানেও তোমার আপনার ঘর; তুমি আপন জনের কাছেই যাবে। তবু যদি অসুবিধা হয়,—আমি তোমায় সাথেকরে' ফিরিয়ে আন্‌বো। তার জন্যে এত চিন্তা কিসের লক্ষ্মী?"

মা বলিলেন—"আহা, চিন্তা হবে না! নতুন জায়গায় একলা থাকতে হবে—শুন্‌লে আমাদেরি আতঙ্ক হয়; ওতো ছেলে মানুষ। ওকে নিয়ে তোমার টানাটানি করে কাজ নেই ঠাকুর পো, তার চেয়ে মণীশকেই আসতে লিখে দাও। সেখানকার কাজ কর্ম্ম চিরকাল যেমন দরোয়ান দেওকীলাল দেখে আসছে, এখনও সেই পারবে। তার জন্যে সৃষ্টি ধরে নাড়া চাড়া করে দরকার কি?"

"কি দরকার, সে পরে তুমি বুঝ্‌বে বৌঠান, আজ তোমায় বোঝাতে চাই না। তুমি শ্যামার জিনিস পত্রগুলো গুছিয়ে টুছিয়ে ঠিক করে দিও। কালই আমি রওনা হব। ছেলের কাছে বৌ যাবে, তার এত চিন্তা কিসের বৌঠান? আমরা আর ক'দিন? ওদের বিষয়, ওদের জিনিস এখন থেকেই ওদের বুঝিয়ে দিতে হয়। কি জানি হঠাৎ যদি ডাক এসে পড়ে।" দূর নীলাম্বর পানে চাহিয়া কাকাবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। (ক্রমশঃ)

এক মিনিট

প্রশ্ন—

গুরুমহাশয়—এই নিমাই, এদিকে শুনে যা।

ছাত্র (সবিনয়ে) গুরুমশাই, আমার নাম ত নিমাই নয়, আমার নাম ফকির।

গুরুমহাশয়—আরে তা আর জানিনে আমি, যে তোর নাম ফকির; তবে তুই রোজ আমায় দাঁতন করবার জন্ম নিমের ডাল এনে দিস্ কি না—

আর একটি ছাত্র বলিয়া উঠিল—আচ্ছা গুরুমশাই, আমি যদি আপনাকে রোজ রোজ জামের ডাল এনে দিই, তা হ'লে কি বলে ডাকবেন ?

দোষস্খালন—

প্রতিবেশী হারাণ বাবুকে মদ খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, স্কুলের মাষ্টার রামবাবু বলিলেন, "একি হারাণ বাবু! আপনি মদ খেয়ে ঘরে পড়ুন তাতে ক্ষতি নেই, এ রকম ভাবে রাস্তায় পড়েন কেন? ভারী অন্যায় কিন্তু আপনার!"

হারাণ বাবু (জড়িত কণ্ঠে)—"একি বাবা, স্কুলের মাষ্টার হয়েও তুমি আমায় পড়ার জন্ম তিরস্কার করচ? ঘরে পড়লে ত কেউ জানতে পারবে না, তাই রাস্তায় পড়ে Mass Education এর পথ দেখাচ্ছি। এতে আর দোষের কি হয়েছে বাবা!"

দাঁতের গোড়ার ওষুধ—

১ম। "আর ভাই, যে কষ্ট পাচ্ছি, তা আর কি বলব তোমায়—এই ক'দিন ধরে দাঁতের গোড়ার অসুখ নিয়ে একেবারে মরে যাচ্ছি! এর একটা ভাল ওষুধ বলতে পার?"

২য় (সহাস্যে) "নিশ্চয় পারি;—আমার নিজের দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হয়ে, কদিন বড্ড ভুগিয়েছিল। আমার কথামত ওষুধ দাও—নিশ্চয় সেরে যাবে।"

১ম—"কি ভাই বল, বল,—আমি চিরকাল তোমার কেণা হয়ে থাকব।"

২য়—"সেদিন দাঁতের গোড়ার যন্ত্রণাটা বেশী হতেই বাড়ী চলে গেলুম। দুটো ডাক্তারী ওষুধ দিলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার স্ত্রী আমার যন্ত্রণা দেখে কাতর হ'য়ে, একটি নিবিড় চুম্বন দিলেন—আর বলব কি ভাই, ব্যথা একেবারে জল হয়ে গেল! ভারী চমৎকার ওষুধ!"

১ম—"সত্যি? তা'হলে এখুনি আমি এই ওষুধটা ব্যবহার করব। দয়া করে ভাই, তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা বলে দাও ত।"

তুষার কণা

[ডাক্তার মাধবচন্দ্র মিত্র এম-ডি]

কস্ট্রোমা রেজিমেণ্টের একদল সৈন্য সাইবেরিয়ার পলাতক আসামীর খোঁজে বাহির হইয়াছিল। তখন জানুয়ারী মাসের প্রথম। বেশ শীত পড়িয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহারা চলিতেছিল। মনটা তাহাদের ক্রমেই বিষণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর, আর রাত্রির হিম-শীতল অন্ধকার।

একটা ঢিপির পার্শ্বে যাইয়া তাহারা রাত্রের জন্য বিশ্রামের আয়োজন করিল। হঠাৎ একটা লোক চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'জানোয়ার।'

সকলে বন্দুক তুলিয়া গুলি করিতে গেল; একটা মনুষ্য কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদে কাপ্তেন বলিয়া উঠিল, 'খবরদার।'

সকলে বন্দুক নামাইল। মনুষ্যটী আস্তে আস্তে কাপ্তেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কাপ্তেন বলিল, 'পলাতক আসামী?'

মনুষ্যটী বলিল, 'না কাপ্তেন, আমি পলাতক আসামী নই।'

সকল সৈন্য হাসিয়া উঠিল। কাপ্তেন চীৎকার করিয়া বলিল, 'চুপ।'

কাপ্তেন শেষে বলিল, 'দেখ, ঠিক কথা বল তুমি কে?'

লোকটী বলিল, 'আমি মহামান্য জারের একজন অধম প্রজা।'

কাপ্তেন খুসী হইয়া বলিল 'জয় সম্রাটের জয়।' সকলে সেই চীৎকার ধ্বনিতে যোগ দিল।

লোকটী কাতরস্বরে বলিল, 'আমায় তোমাদের সঙ্গে থাকতে দাও এই রাতটীর জন্যে।'

কাপ্তেন হাসিয়া উঠিল। 'বড় চালাক। তুমি যে পলাতক আসামী নও তার প্রমাণ কি? রাতের জন্য থাকতে হবে না। তুমি আমাদের বন্দী।'

লোকটী বলিল, 'আপনাদের অনুগ্রহ।'

দুইজন সৈন্য বন্দুক ঘাড়ে তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল। ঘোড়াকে খাইতে দিবার কিছু শুষ্ক ঘাস ও গাছের কয়েকটা ডাল জ্বালাইয়া সৈন্যেরা চারিদিকে ঘিরিয়া রহিল।

রাত তখন অনেক হইয়াছে। লোকটী কাপ্তেনের পার্শ্বে বসিয়াছিল। পাহারার সৈন্য বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ক্রমে ঠাণ্ডা এত বেশী হইতে লাগিল যে সৈন্যদের দেহ অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা আগুনের কাছে ঘেঁসিয়া বসিতে লাগিল।

লোকটী শীতে কাঁপিতেছিল। কাপ্তেন ক্ষীণ আলোকে তাকাইয়া দেখিল সে মুখখানি ভারী সুন্দর। কাপ্তেনের মনে হইল সে মুখ যেন চেনা চেনা। কতদিন আগে মস্কোর নিকটে ইহারই সহিত বুঝি তাহার প্রথম কৈশোর কাটিয়াছে; সে স্মৃতি যে বড় মধুর। কাপ্তেন অনিমেষে সেই মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'ভেরেনকা!'

লোকটী চমকিয়া উঠিল। কাপ্তেন বলিল, 'বড় ঠাণ্ডা। আমার কোটের ভিতর এস।'

লোকটী কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। কাপ্তেন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। লোকটী ডাকিল, 'ভ্রন্‌স্কি!'

কাপ্তেন বলিল, 'কেন প্রিয়তম!' এযে বহুদিনের সেই সুখস্মৃতি-মণ্ডিত ডাক। কাপ্তেন বলিল, 'শেষে এই অবস্থায় তোমায় দেখতে হ'ল?'

ভেরেনকা বলিল, 'আর বেশী সময় দেখতে হবে না প্রিয়তম। এই দেখ।' বলিয়া সে কাপড়ের উপর হইতে একখণ্ড সাদা পদার্থ কাপ্তেনের হাতে দিল।

কাপ্তেন বলিয়া উঠিল, 'কি সর্ব্বনাশ! এযে তুষার কণা!'

ভেরেনকা বলিল, 'এখানেই আমাদের জীবনের শেষ হবে। তবু ম'রতে সুখ হচ্ছে, দু'জনে একসঙ্গে মরছি।'

কাপ্তেন বলিল, 'কেন এ বিপদের ভিতর এলে?'

ভেরেনকা বলিল, 'বেঁচেই বা কি হ'ত? তুমিও আমায় ভুলেছিলে। শেষে জারের দাসত্বে জীবন বিকিয়ে দিলে।'

কাপ্তেন ভেরেনকাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'প্রিয়তম, ফিরে চল। শেষে নিহিলিষ্টের গুপ্তচর হ'তে এলে!'

ভেরেনকা বলিল, 'আর ফেরবার উপায় নাই। ঐ দেখ।'

কাপ্তেন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল তুষারের ঝড় আরম্ভ হইয়াছে; সৈন্যদের বস্ত্রাবরণ সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে।

কাপ্তেন ভেরেনকার অধরে অধর স্পর্শ করাইয়া বলিল, 'প্রিয়ে, এই আমাদের শেষ চুম্বন।'

সমস্ত রজনী ভীষণ তুষারপাত হইয়া গেল। একটী প্রাণীও আর প্রভাতের আলোক দেখিল না।........

প্রেয়সী

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

নিত্য আমার চিত্তটারে
শাসন করি,
কতই রূপে মন-দুলালের
চরণ ধরি।
রাত্রি দিবস কোনো কাজে
মনটি আমার বসেই না যে,
সকল কাজের বিঘ্ন তুমি
সর্ব্বনাশী!
হায় প্রেয়সী—
তবু তোমায় সবার চেয়ে
ভাল বাসি।

যখন খুসী ঘুমটি আসে
চোখের 'পরে,
শ্রান্তদেহ নেতিয়ে পড়ে
নিদ্রাতরে।
স্বপ্নে দেখি আকুল করা
মুখটী তোমার হাস্যভরা,
জাগ্রতে যে স্বপ্নেও সেই
সর্ব্বনাশী!
লো প্রেয়সী—
তবু তোমার সঙ্গটুকু
ভালবাসি।

দুঃখ-সুখের-জীবন লয়ে
যেথায় থাকি,
সবখানেতেই জাগে তোমার
পদ্ম-আঁখি।
জ্যোৎস্না-গলা মধুর রাতে,
শিশির-স্নাত শারদ-প্রাতে,
ঊষার অরুণ কিরণ পাতে
তোমার হাসি,
লো প্রেয়সী!
দুঃখ সুখের সঙ্গী তোরেই
ভালবাসি।

সংগ্রামের এই আগুন-জ্বালা
ভবের হাটে
ভিড়ের মাঝে কেমন করে
জীবন কাটে?
এই ধরণীর ফলে ফুলে,
যেখানে চাই নয়ন তুলে
দেখি তুমি সবার মূলে
ছদ্মবেশী,
লো প্রেয়সী!
গভীর প্রেমে তোমারে তাই
ভালবাসি।

বিশ্বে আমি চাই না কিছু
তোমায় ছাড়া,
তুমি আমার প্রেম-সাগরের
ধ্রুব-তারা।
যেদিন ধীরে পড়বে বেলা,
সাঙ্গ হবে ভবের খেলা,
সেদিনও কি সঙ্গ লবে
সর্ব্বনাশী?
হায় প্রেয়সী—
ভব-পারের-সঙ্গী তোরেই
ভালবাসি।

শিশির

(কথিকা)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ভোর তখন হয় হয়।

একে একে সকল তারা গুলিই ডুবে গিয়েছে আকাশের বুকে—কেবল ডোবেনি তখনও শুকতারা। একদৃষ্টে চেয়েছিল সে তা'র প্রিয়তম দয়িতের মুখের দিকে—যেন কোন্ ভাষাহারা ব্যথার বাণী ঝরে পড়ছিল তা'র চোখের চাহনিতে।

অন্ধকার বল্লে—"তবে আসি ?"

শুকতারাটী কেঁপে উঠ্‌ল একটী বার—যেন কোন্ অসহ আঘাতের বেদনা লেগে। কি বল্‌বে সে ? কি বলে সে বিদায় দেবে তা'র অন্তরতম চিরদয়িতকে ? সকল বাণী যে তা'র জল হয়ে ভরে উঠেছে দু'টী আঁখির তীরে !

অন্ধকার আবার বল্লে "ওগো, বিদায় দাও। যাবার সময় যে আমার ঘনিয়ে এল।"

শুক তারাটীর কোমল বুকখানি একবার দুলে উঠ্‌ল—যেন কি কথা সে বল্‌তে চায়—কিন্তু ভাষা যে তা'র হারিয়ে গেছে !—কেবল পূবের হাওয়ায় ভেসে এল তা'র ব্যথিত হিয়ার দীর্ঘ শ্বাস !

অন্ধকারের চোখ দু'টী ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল। কি করবে সে !—আর যে বেশীক্ষণ থাকার অধিকার নেই তা'র।—সে যে বড় অসহায়, বড় পরাধীন ! যেতে যে তা'কে হবেই !

বনের বুকে পাখীরা ডেকে শুধাল "ওগো রাতের পথিক, আর কতক্ষণ ?"

অন্ধকার তা'র করুণ চোখ দু'টী তুলে একবার চেয়ে দেখ্‌লে তা'র প্রিয়তমার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে সে বিদায় চাইলে—শুধু দু'টী কথা বলে—"তবে আসি ?"

ব্যথার কাতরতায় শুক তারার শুভ্র মুখ খানি ম্লান হয়ে গেল অতি কষ্টে শুধু একটী কথা বেরিয়ে এল তা'র মুখ দিয়ে—"এস।"

ধীরে ধীরে অন্ধকার চলে গেল—কোথায় কত দূরে—কে জানে ?—শুধু টপ্ টপ্ করে তা'র চোখের জল ঝরে পড়্‌ল—গাছের পাতায়, ফুলের বুকে।

শুক তারাটীর মলিন দু'টী গণ্ডবেয়ে হু হু করে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল—নদীর তীরে, কাশের বনে, মাঠের বুকে, ঘাসের শীষে !

অরুণালোকের উজ্জল অভিযানে দু'টী বিরহী হিয়া কেঁদে চলে গেল—পৃথিবীর বুকে তা'দের অশ্রু জলের চিহ্ন রেখে। লোকে ভাব্‌লে—আকাশ থেকে শিশির পড়েছে !

নব বসন্ত

(অনুকৃতি)

[খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন]

ফুল গন্ধ ছড়া'য়ে দিয়ে প্রাণ্ মাতা'লো,
প্রিয়া চঞ্চল আঁখি ঠারে প্রেম্ জানালো;
পিক পঞ্চম রাগিণীতে সুর্ ভাজিছে,
হেথা বিশ্ব প্রকৃতি মুগ্ধ হাসি ছড়া'লো।

অই শীশ্ দিয়ে বুলবুলি গান্ গাহিছে,
চাঁদ নীল্ নভো-মণ্ডলে সুধা ঢালিছে;
মৃদু গুঞ্জনে অলি আগমন্ জানালো,
মন চঞ্চল হ'য়ে কার প্রাণ্ মাগিছে।

গৌতম বুদ্ধ

শ্রীযুক্ত বিমলচরণ লাহা

এম্‌.এ., পি এইচ ডি মহাশয়ের সৌজন্যে—

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ৩০শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১। ১৮শ সপ্তাহ

গিরিশচন্দ্রের অশোক

অশোক নাটকের ঐতিহাসিক তথ্য

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ ভাগবতরত্ন]

ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নহে। ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা ঐতিহাসিক নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাকে উল্লেখ না করিয়াও ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনীটিকে পরিস্ফুট করা যায়। সেক্সপীয়র John নাটকে একটীবারও উক্ত রাজত্বের শ্রেষ্ঠ ঘটনা Magna chartaর কথা উল্লেখ করেন নাই। অথচ সেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি পাঠ করিয়া অনেক মণীষী ইংলণ্ডের ইতিহাস শিক্ষা করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের প্রতিদ্বন্দ্বী বেন জন্‌সন্ রোমের ইতিহাস লইয়া যে দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাতে ট্যাসিটাস, লিউটেনাস্ প্রভৃতির প্রাচীন প্রামাণ্য উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু সে নাটক এখন আর কেহ পড়ে না। নাটকের মূল উপাদান—কল্পনা, তাহাতেই চরিত্রগুলি সজীব হইয়া উঠে। সুতরাং ইতিহাসের সহিত ঐতিহাসিক নাটকের অল্প বিস্তর কিছু পার্থক্য থাকিবেই।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র অশোক নাটকে ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন না করিয়াও নাট্যখানিকে মনোরম করিতে পারিয়াছেন। কেবল মাত্র কয়েকটী স্থলে তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সহিত ইতিহাসের পার্থক্য দেখা যায়। (১) বিন্দুসারের রাজত্বকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের কোথাও বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। তাহাতেই মনে হয় বিন্দুসার পিতার ন্যায় সুদক্ষ নৃপতি ছিলেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে লামা তারানাথ বলিয়াছেন যে বিন্দুসার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল জয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি Antiochus Soferএর নিকট একজন গ্রীক পণ্ডিত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয়। ইহার দ্বারা তাঁহার বিদ্যোৎসাহীতাই সূচিত হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অশোক চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বিন্দুসারকে অপদার্থ বিলাসমগ্ন অবিবেচক সম্রাটরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত—অথচ তিনি তাহা দমন

করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। অশোক বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতে চাহিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে একটি সৈন্যও দিলেন না। তক্ষশিলার বিদ্রোহ কবির স্বকপোল কল্পিত। (২) কলিঙ্গ বিজয়ের পরই অশোক জীবের ক্লেশ দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন এইরূপ কথা অশোকের কলিঙ্গ অনুশাসন পাঠ করিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার পরে তিনি যে আবার নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। গিরিশচন্দ্র যেভাবে কলিঙ্গ যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইতিহাসেরই অনুরূপ। অশোক কলিঙ্গ অনুশাসনে বলিয়াছেন যে দেড় লক্ষ লোক বন্দী, একলক্ষ হত ও তাহার বহুগুণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। নাটকে অশোকের ধর্ম্মভাব গ্রহণের কারণ ভীতি—কিন্তু অনুশাসনে অশোকের অনুশোচনার কথা আছে। (৩) অশোক তাঁহার দ্বাদশ পর্ব্বত অনুশাসনে সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি সম্মান করিতে আদেশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দিগকে সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জৈনদিগের জন্য ২৫৭ ও ২৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে গয়ায় গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অশোক একবার মহাবীরের পদতলে বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে শুনিয়া জৈনগণের প্রাণহত্যার আদেশ দেন। (৪) নাটকে অশোক বলিতেছেন যে সিরিয়া, মিসর, গ্রীস, এপিরাস, গান্ধার তাতার, লঙ্কা হইতে তাঁহার নিকট দূত আসিয়াছিল—কিন্তু গান্ধার তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ও তাতারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায় না।

(৫) অশোক ষষ্ঠ পর্ব্বত অনুশাসনে বলিয়াছেন যে তিনি অন্তঃপুরে থাকিলেও প্রজার কার্য্য সম্পাদনের জন্য বাহিরে আসিবেন—সকল সময়ে সকল স্থানেই প্রজার কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু নাটকে অশোক তিষ্যরক্ষিতা বা চিত্তহরার অনুরোধে তাঁহাকে সপ্তাহকাল রাজ্যভার প্রদান করিতেছেন দেখিতে পাই। অশোকের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ নৃপতির চরিত্রে এরূপ ব্যাপার সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু নাট্যে অশোক চরিত্রে মারের প্রভাবে সাময়িক দুর্ব্বলতা আসিলেও তাঁহার—

পুনঃ পুনঃ হইল উত্থান
শতগুণে নির্ম্মলতা লভি
অগ্নিতাপে কাঞ্চন যেমতি।"

বিশেষতঃ ঐ পাঁচটী অসামঞ্জস্যের মধ্যে একটিও মারাত্মক নহে। অশোক একাকী যাইয়া যেরূপভাবে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমন করিলেন, তাহাতে সেখানে যে বিদ্রোহ যথার্থই হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। অসন্তোষ মাত্র দেখা দিয়াছিল—এরূপ অসন্তোষ সর্ব্বত্রই সম্ভব। বিন্দুসার বিদ্যোৎসাহী হইলেও শেষ বয়সে কুমন্ত্রণায় কিছু উৎসবপ্রিয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর নাট্যের ভীতি ও ইতিহাসের অনুশোচনার মধ্যে পার্থক্য বড় কম। গিরিশচন্দ্রের অশোক সর্ব্ব ধর্ম্মে সম ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে সাময়িক ক্রোধ তাঁহার চিত্তে আসিয়াছিল। অশোকের শেষ বয়সে রাজ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ।

গিরিশচন্দ্রের সময় অশোকের অনুশাসন গুলির এত প্রচার না হইলেও মহাকবি যেরূপ আশ্চর্য্য পরিশ্রমের সহিত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে শ্রদ্ধায় তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত হইয়া আসে। মৌর্য্য যুগের ক্রীতদাস প্রথা, অশোকের ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধা প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তিনি নিপুণভাবে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদের জাতিভেদ মানার কথা শাস্ত্রী মহাশয় এই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাহার বহু পূর্ব্বেই সে সংবাদ লইয়াছিলেন। আজকাল যাঁহারা ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেন তাঁহারাও বোধ হয় গিরিশচন্দ্রকে ভ্রান্ত ইতিহাস প্রচারে দোষী করিতে পারিবেন না। গিরিশচন্দ্র যে যে স্থানে একটু আধটু ইতিহাসের দিক হইতে সরিয়া গিয়াছেন সেই সকল স্থানে তিনি রসপুষ্টির জন্যই ঐরূপ করিয়াছেন।

নাট্যের কালব্যাপ্তি

প্রাচীন যুগে নাটকের বর্ণিতব্য ঘটনা একই স্থানে, একই দিনে ও একটি ভাব অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হইত। নাটকখানি অভিনয় করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহারই মধ্যে যদি নাটকীয় ব্যাপার সম্পন্ন হয় তাহা হইলে উহা অতি উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রীক নাট্যে ও আমাদের দেশের রত্নাবলী এই শ্রেণীর নাটক। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এরূপ কঠোর নিয়ম ভাব বিকাশের অনুপযোগী বিবেচনায় সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেক্সপীয়র তাঁহার Comedy of Errors ও Tempest নাটক দুইখানি প্রাচীন রীতি অবলম্বনে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের নাটকে ঐ নিয়ম সম্বন্ধে Hennequin তাঁহার The Art of writing গ্রন্থে লিখিয়াছেন "no one pretends to regard them at the present day" কিন্তু বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইবসেন কয়েকখানি নাটক এরূপভাবে রচনা করিয়াছেন যে দৃশ্যের বা সময়ের কোন পরিবর্ত্তনই তাহাতে নাই। তাঁহার ghosts নাটক একটী ঘরে একটী দিনের কয়েক ঘণ্টা মাত্র অবলম্বন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে ও John gabrid Bookman অভিনয় করিতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক তত সময়ের ঘটনা লইয়া লিখিত। আমাদের গিরিশচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে আধুনিক—তিনি প্রাচীন রীতির বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়াই ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অশোক নাটক খানির ঘটনা অন্ততঃ তের চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে অশোক তক্ষশিলা জয় করিলেন ও তথায় দেবী তাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে সেই দেবী তাঁহার মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা নামক পুত্রকন্যা সঙ্গে পাটলিপুত্রে উপস্থিত। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা তখন গান গাহিতে পারে। সুতরাং তাহাদের বয়স যথাক্রমে অন্ততঃ সাত ও পাঁচ বৎসর অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তাহা হইলে প্রথম অঙ্কের সহিত দ্বিতীয় অঙ্কের ব্যবধান অন্ততঃ সাত বৎসর। কিন্তু এই স্থানে একটু জিজ্ঞাস্য আছে? পাটলিপুত্রে ফিরিবার পথে চিত্তহরা সুশীমকে বলিতেছে সে তক্ষশিলা যাইবার পর "সে তো আজ বছর ফিরতে গেল" অশোক তক্ষশিলা শাসনের পর উজ্জয়িণী শাসন করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে কি ছয় বৎসর তক্ষশিলা শাসনের পর? অশোকের নব লব্ধ প্রদেশ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সুশীমকে প্রদান করা হইয়াছে দেখানই বোধ হয় নাট্যকারের উদ্দেশ্য। আর চিত্তহরাও তক্ষশিলার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া সুশীমকে উহার শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিল। অশোক তক্ষশিলায় শান্তিস্থাপন করিয়া ছয় বৎসর শাসন করবার পর কি চিত্তহরার চিত্ত তক্ষশিলার প্রতি লুব্ধ হইল? তাহা হইলে একটু অসামঞ্জস্য বটে।

দ্বিতীয় অঙ্কে পলায়নপরা চন্দ্রকলার গর্ভে ন্যগ্রোধ জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে ন্যগ্রোধ উপগুপ্তের নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইতেছে। কিন্তু ন্যগ্রোধের তখনও "নহে আজ অতীত শৈশব।" শৈশব শব্দের অভিধানোক্ত অর্থ ধরিলে ন্যগ্রোধের বয়স তখন পাঁচ বৎসরেরও কম। তাহার দেশ দেশান্তরে একা ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করা একটু অলৌকিক। যাহা হউক দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত তৃতীয় অঙ্কের প্রায় পাঁচ বৎসরের তফাৎ। কিন্তু ইতিহাস মতে এ তফাৎ বার বছরের হওয়া উচিত। কেননা দ্বিতীয় অঙ্কে অশোক রাজ্য অধিকার করিলেন—সেটা ২৭৩খৃঃ পূর্ব্বাব্দে, আর তৃতীয় অঙ্কে কলিঙ্গ জয় করিলেন তাহা ২৬১খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথমেই শুনি যে অশোক ভারতবর্ষের সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে অন্ততঃ এক বৎসর লাগিবার কথা। চতুর্থ অঙ্কের সহিত পঞ্চম অঙ্কের মাত্র দুই এক মাস পার্থক্য কল্পনা করিলেও চলিতে পারে। কেন না পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই আমরা বৌদ্ধ পরিষদের কার্য্য সমাপ্তির বিবরণ জানিতে পারি। যাহা হউক অশোক নাটকের ঘটনা অন্ততঃ তের চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া হইয়াছিল বলিয়া নাটকেরই মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইতিহাসের মতে অশোক অন্ততঃ আঠাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তক্ষশিলা উজ্জয়িণীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নাটকে অশোকের তক্ষশিলা গমনের পূর্ব্ব হইতে কুণালপুত্র সম্প্রীতিকে রাজ্যদান পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। সুতরাং ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের ঘটনা অশোক নাটকে বর্ণিত হইয়াছে বলিতে হয়। নাটকের মধ্য হইতেও এরূপ সিদ্ধান্তের পোষকতা পাওয়া যাইতে পারে। আমরা ঘটনা সম্বন্ধে চৌদ্দ বৎসর গণনা করিয়াছি মহেন্দ্র সঙ্ঘমিত্রা ও ন্যগ্রোধের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভব কম বয়স লইয়া—তাহাদের সম্ভবযোগ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বয়স ধরিলেই ৩৫ বৎসর পূর্ণ হয়।

এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে গেলে unity of action বা কার্য্যাদির একত্ব রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়। মানুষের সাধারণ কার্য্যের motive বা উদ্দেশ্য এতকাল ধরিয়া সমান থাকা সম্ভব নহে। একই উদ্দেশ্য এতকাল ধরিয়া একটি লোকের চালিত হওয়া অসম্ভব। সাধারণতঃ অতি অল্প কালের মধ্যে নাট্য ঘটনার সমাবেশে করা হইয়া থাকে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এত দীর্ঘকালের ব্যাপার বর্ণনা করিয়াও সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

সমাজ-চিত্র

“বিয়ে হ'লে পুত্র-কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা।”
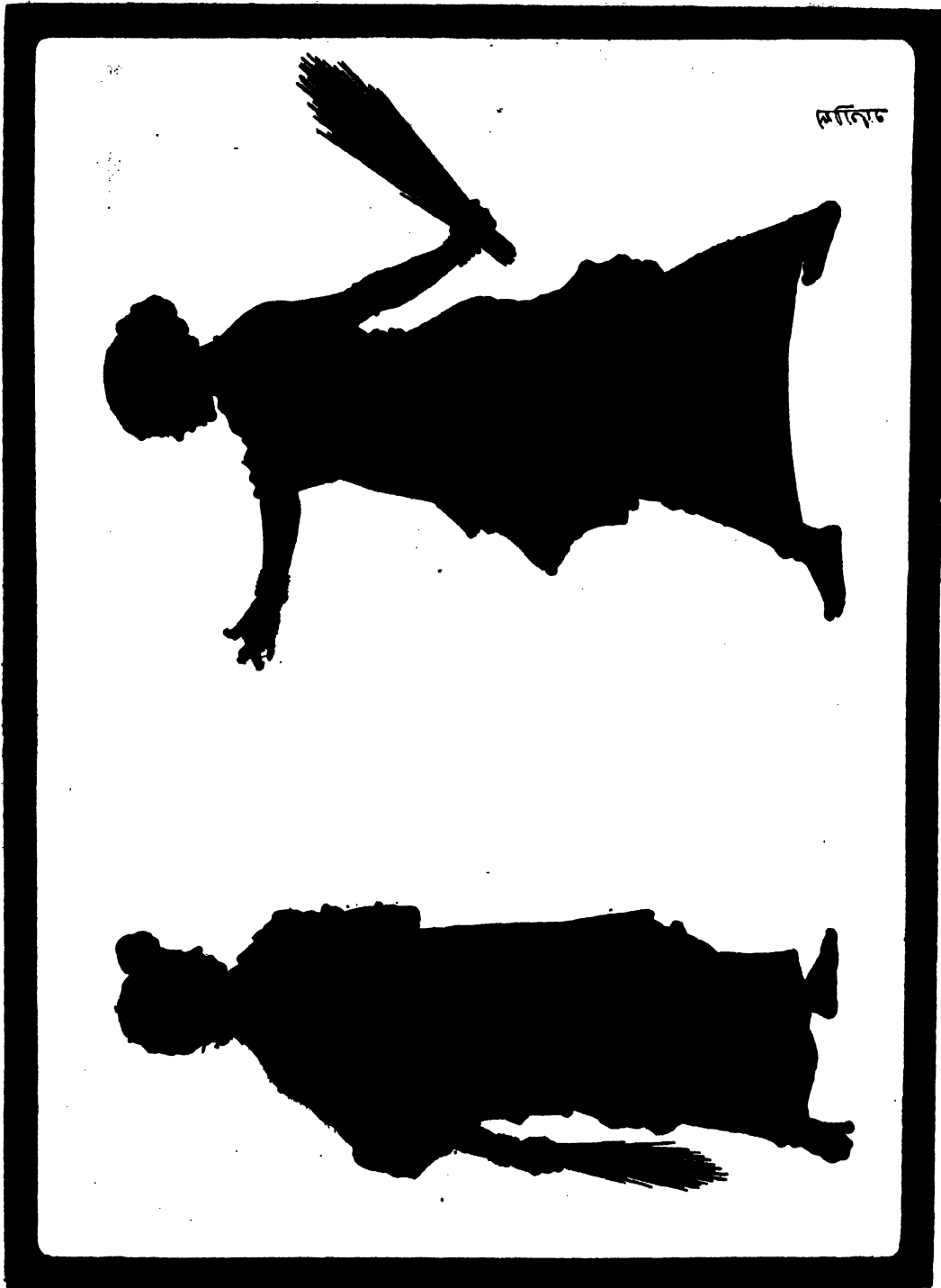
শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

দুই সতীন

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

তন্ময়

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

"গুড্-মর্নিং গুরুদেব"

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

অভিনব যন্ত্র—

সামান্ত একটা বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটগাছ কেমন করিয়া যে হয় তাহা বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। কি শক্তি যে ঐ ক্ষুদ্র বীজের অন্তরে নিহীত রহিয়াছে তাহা কোন বৈজ্ঞানিকই আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ আমাদের চোখের সুমুখে প্রতিনিয়তই ত মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে কিন্তু কিভাবে যে তাহার দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে মানুষের চর্ম্মচক্ষুতে তাহা ধরা পড়ে না। সম্প্রতি এই ক্রমবর্দ্ধমান গতিটুকু ধরিবার জন্ত বৈজ্ঞানিকগণ একটা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্র দ্বারা একটা গাছ কিভাবে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠে তাহা পরিষ্কার ভাবে টের পাওয়া যাইবে। যন্ত্রটা মাটী হইতে একটু উপরে রাখিয়া বৃক্ষকাণ্ডের সহিত উহা সংযোজিত করা হয়। গাছটা যেমনি একটু বাড়িয়া উঠে অমনি ঐ যন্ত্রে আসিয়া চাপ পড়ে এবং কতটুকু বাড়িল তাহা ঐ যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ লেখা হইয়া যায়।

বিপুল-দেহ লেন্স—

মঙ্গলগ্রহ আগামী আগষ্ট মাসে পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাই সেই সময় উহার পরিষ্কার ফটো তুলিয়া লইবার জন্ত বহুদিন হইতেই পৃথিবীব্যাপি আয়োজন চলিয়াছে। আমেরিকায় এই জন্ত একটা ফটো-লেন্স তৈরী হইয়াছে—তাহার ওজন ৪০ টন। জ্যোতির্ব্বিদগণ আশা করিতেছেন যে এইবার এই লেন্স দ্বারা তাঁহারা মঙ্গলগ্রহের এমন নিখুঁৎ চেহারাই তুলিয়া লইবেন যে বেচারীর পেটের ভিতরের সমস্ত খবর আর
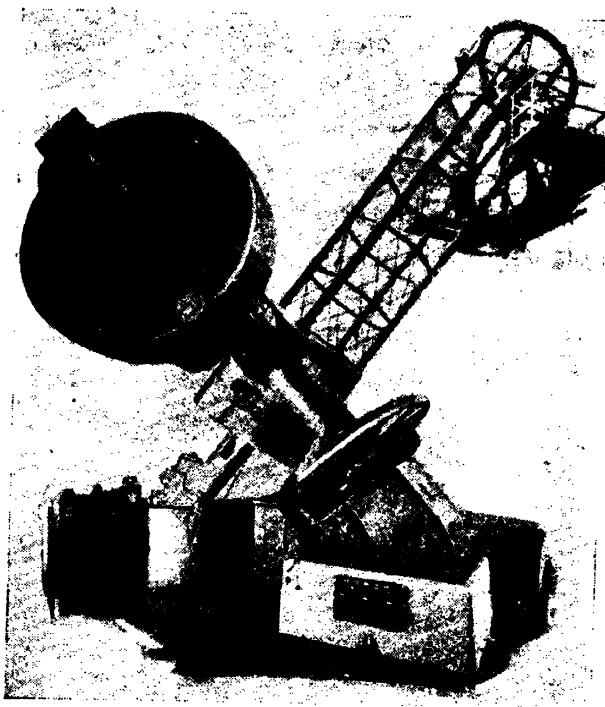
মঙ্গল গ্রহের ফটো তুলিবার জন্য বিপুল-দেহ লেন্স

পৃথিবীবাসীর নিকট অজ্ঞাত থাকিবে না। এবারকার ফটো দেখিয়া মঙ্গলগ্রহে বাস্তবিকই কোন প্রাণী বাস করে কি না তাহা স্পষ্ট জানা যাইবে। লেন্সটীর পরিধি ৭২ ইঞ্চি, পুরু ১২ ইঞ্চি এবং ওজন ৪০০০ পাউণ্ড!

দড়ি পাকাইবার যন্ত্র—

দড়ি পাকাইবার একটী যন্ত্র তৈরী হইয়াছে—ইহা শুধু ঘুরাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ী পাকানও হইয়া যায়।

অদ্ভুত ইঞ্জিন—

আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে এক বৈজ্ঞানিক এক অদ্ভুত ইঞ্জিন্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ইঞ্জিন্ খুব কম খরচে চলিবে, চলিবার সময় শব্দ কিম্বা ধূম উদ্গীরণ একেবারেই করিবে না। সাধারণতঃ ইঞ্জিন্ চালাইতে হইলে প্রচুর

পরিমাণে কয়লা পোড়াইতে হয় কিন্তু ইহার জন্য কয়লা একদম লাগিবে না, তেলের সাহায্যে পঞ্চাশ ঘোড়ার শক্তি লইয়া সে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিবে অথচ একটু শব্দও হইবে না।

আনাতোল ফ্রাঁস্

মানুষের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের সহিত মানুষের বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান ও সুসঙ্গতি-বোধের দ্বন্দ্বের ইতিহাসই সভ্যতার ইতিহাস। মানুষের চিন্তাশক্তি তাহাকে সামাজিক শিক্ষা বিশ্বাস সংস্কার রুচি প্রভৃতির প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত হইতে বরাবরই বাধা দেয়। সভ্যতার উষাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের বিচারবুদ্ধি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া পথের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী আনাতোল ফ্রাঁসের জন্ম লিখিয়াছিলেন।

যে-যুগে জ্ঞান ও যুক্তি মানুষের জীবনে অসাধারণ-রকম উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, আনাতোল সেই যুগেই পৃথিবীতে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে জগতে এতগুলি জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষ কখনও একসঙ্গে পরস্পরের
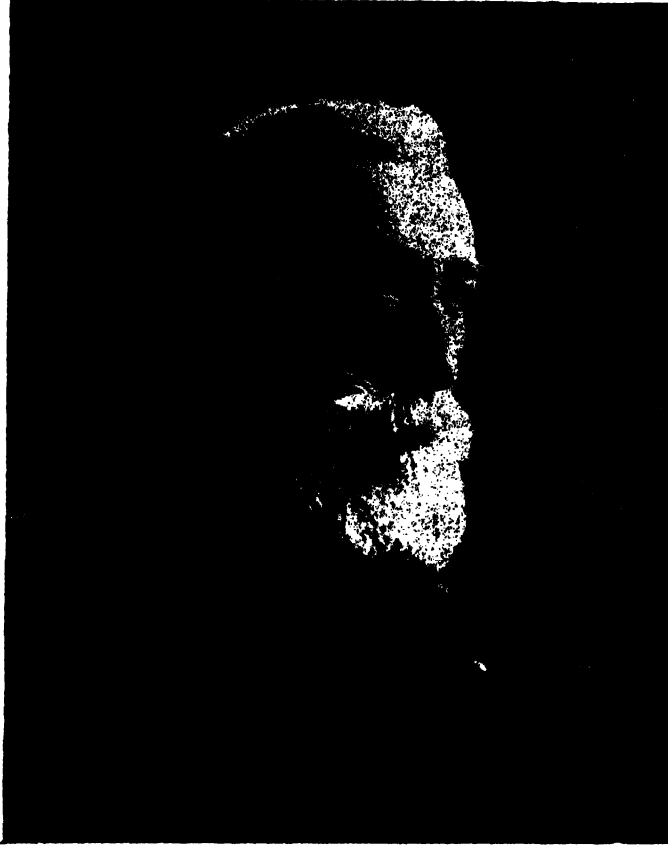
আনাতোল ফ্রাঁস্

আসিতেছে। বিচারবুদ্ধির এই সেনাদলে বহু মহারথী অগ্রণী হইয়া সমরে নামিয়াছেন। আজ আমরা যাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া গৌরব বোধ করিতেছি, ইনি বোধ হয় তাঁহার যুগে এই সমরাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ রথী ছিলেন।

ফরাসীদেশে বোধশক্তিকে দেবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল এবং ভাগ্যবিধাতা এই ফরাসীদেশেই জীবন-সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে দিনযাপন করেন নাই। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে জগৎব্যাপী বিস্তার ও যুক্তিবাদীদের যে দুঃসাহসিক সমালোচনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারই কথা বলিতেছি। মানুষের অন্তরলোকের যে-সকল কথা ও রহস্যকে স্পর্শ করাও মানুষ পাপ মনে করিত, যুক্তিবাদ সেইসকল বিষয়ই নির্ম্মমভাবে কাটিয়া-ছাঁটিয়া বিশ্বের

চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। এই যুগেই দৈবশক্তির নিশ্চিত প্রামাণ্যস্বরূপ কাহিনীগুলিকে চিত্তবিভ্রম কি কাল্পনিক সৃষ্টি আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল এবং এই যুগেই দেবতাকে স্বরচিত আইন ও অভ্যাসের কাছে হার মানিয়া খেয়াল-খুসীর খেলার অধিকার চিরতরে ছাড়িতে হইয়াছিল। নীতিকথা "অসার" "অযৌক্তিক" "পুরাতত্ত্ব" ইত্যাদি নূতন নামে ভূষিত হইল।

তত্ত্বহিসাবে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে জ্ঞান ও যুক্তির চরম উন্নতিই এযুগে হইয়াছিল। কিন্তু যখন জীবন আচরণ ও চরিত্রে এই জ্ঞান ও যুক্তিতত্ত্বকে খাটাইতে দেখি তখন দেখি সমস্ত ব্যাপার সমস্ত কার্য্য ও চিন্তাপ্রণালী যেন মধ্যযুগের কোন্ প্রান্তে পিছাইয়া গিয়াছে। যে-যুগে মানুষ নির্ভর করিতে ধর্ম্মবিশ্বাস পাইত, জীবনপথে আগাইয়া চলিতে নীতির সাহায্য পাইত, সে-যুগে তাহাদের জীবন অনেক সুসঙ্গত ছিল, নিজের কাছে তাহারা নিজে অনেক খাঁটি ছিল। কিন্তু আনাতোলের সমসাময়িক যুক্তিতত্ত্ববাদীদের জীবন এমন ছিল না। পুরাকালের মানুষ অনেক সময় ঈশ্বরভীতি নামক স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির সাহায্যে কুচিন্তা ও পাপ কর্ম্মকে ঠেকাইয়া রাখিত। এই ঈশ্বরভীতির ভিত্তিরূপে আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি না থাকিলেও সামাজিক কল্যাণ-কাজে ইহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। আধুনিক যুগে আমরা জ্ঞান কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরভীতি বহুল-পরিমাণে বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি এখনও পূর্ণতা পায় নাই এবং ঈশ্বরভীতির স্থানে বসাইবার উপযুক্ত যুক্তিভীতিও আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। ফলে আধুনিক জীবন অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতি-দোষ ও কপটতার চাপে পিষ্ট হইয়া মরিতেছে। অন্ধে করে বলিয়াই মানুষ অনেক কাজ করিতেছে, পাপ বুঝিয়াও অনেক কাজের গুণগান করিতেছে; মুখে গণবাদ সভ্যতা ও স্বাধীনতা প্রচার করিতেছে, কিন্তু কাজে দেখা যাইতেছে, নিকৃষ্টদরের অনধিকারচর্চ্চায় আসক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। সেই যুগেই দেবতারা মানুষের দাস হইয়া পড়িলেন, যে-যুগে যুক্তি ও জ্ঞানকে দেবত্বের আসনে বসাইয়া মানুষ সনাতনধর্ম্ম ও নীতিকে ধূলায় লুটাইয়াছিল এবং জ্ঞান ও যুক্তিকে অতিস্থূল অসামাজিক পাপ ও অমানুষিকতার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। বিশ্বাস ও ধর্ম্মের যুগে মানুষ দুঃখ সহ্য করিত এবং ভালোবাসার ও আদর্শের খাতিরে সর্ব্বস্ব ত্যাগও করিত; কিন্তু আধুনিক যুগের যুক্তিবাদীদের ভিতর সে গভীর নিষ্ঠা সে অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য তুচ্ছ লাভের জন্য সুযুক্তিকে ইহারা বিসর্জ্জন দেয়। আজ চারিদিকে যে-অবনতি দেখিতেছি তাহার অন্যতম কারণ ইহাই।

যে-কয়টি মানুষ যুক্তিবাদী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন এবং জীবনে ও আচরণে যুক্তিবাদকে সম্মান করিতেন আনাতোল ফ্রাঁস্ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সর্ব্বদাই নিজ লক্ষ্যপথে দৃষ্টি স্থির রাখিতেন, বুঝিতেন লক্ষ্য কি এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুসঙ্গত মস্তিষ্কের সাহায্যে জ্যা-মুক্ত তীরের মতন সরল পথে চলিয়া যাইতেন, উন্মার্গগামী হইতেন না। দেখিতে পাই সকল বিষয়কেই তিনি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন এবং সর্ব্বত্র মূর্খতা হইতে যুক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক:— ধরুন, শিল্পী সেণ্ট্ (সাধ্বী) ক্যাথারিনের চিত্র আঁকিতে চাহেন। তবে কেন দেবতার মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া তুলিয়া বৃথা শক্তি ও বুদ্ধির অপব্যয় করা? দেবত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চাও, মূর্খের মতন নারীদেহের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া শিল্পকে ভ্রান্ত করো কেন? যে-শিল্পীরা মানস-আদর্শ ফুটাইতে গিয়া, গঠন ও অবয়বের প্রতি আসক্তি ছাড়িতে পারেন না, আনাতোল তাঁহাদের এইরূপ উপদেশ দেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও ভয়ঙ্কর স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় যে অচির ভবিষ্যতে যুক্তি নব অবতাররূপে মানুষের মোহজাল ছিন্ন করিতে অবতীর্ণ হইবে; এবং যুক্তিভীতি মানুষের অন্তস্তল কাঁপাইয়া তুলিবে। যুক্তি ও জ্ঞানের প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছিল আনাতোল তাহা বহুল-পরিমাণে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। যে-দিন জ্ঞান ও যুক্তির প্রতি মানুষের পূর্ণ শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিবে সেই দিনের আশাপথ চাহিয়া আছি; কারণ আনাতোলের আত্মার মৃত্যু হয় নাই। সেই অবিনশ্বর আত্মা ধীরে-ধীরে শক্তির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে; সেই শক্তি অচির ভবিষ্যতে মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া মানুষের চেষ্টাকে সত্যপথ খুঁজিতে শিখাইবে। (মডার্ন রিভিউ—প্রবাসী)

পাগলের দু'টি কথা

(গল্প)

[শ্রীনীহারবালা বড়ুয়া]

আমি পাগল। লোকে আমায় পাগল বলে ঢিল ছোঁড়ে, কাদা দেয়, পরিহাস করে। আমি কি চিরদিনই এমনি পাগল ছিলাম? আমার কি ঘর বাড়ী ছিল না? আমার কি স্ত্রী পুত্র ছিল না? ওগো আমার সব ছিলগো সব ছিল। একদিন আমারও বাড়ীতে তোমাদের মত হাসির ফোয়ারা উঠ্‌ত, আমারও জীবন তোমাদেরই মত সুখ দুঃখে জড়ান ছিল। তা না হলে আজ বোধ হয় তোমরা আমায় পাগল বলে উপহাস করতে পারতে না। আমি আজ কেন এমন হয়েছি জান? আমারই মহাপাপে। এই মহাপাপীর পাপে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

আমি কিছুরই ভিখারী ছিলাম না। ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, কুটুম্বে আমার ঘর ভরা ছিল। আমার বাবা ঢের টাকা জমিয়ে গিয়েছিলেন, আমি পিতার একমাত্র পুত্র, আমার ধনের অভাব কি? তিনি মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে "আমার বড় কষ্টের উপার্জ্জিত ধন, অপব্যবহার করিস নে।" কিন্তু আমি যে কেমন করে তার সদ্ব্যবহার করেছি তাই আজ তোমাদের বলতে এসেছি। এই ত গেল ধন রত্নের কথা। আর আমার স্ত্রী - সে যে কেমন ছিল কেমন করে বলব। আমার এখন মনে হয় বোধ হয় পৃথিবীর মানুষের এত সদ্‌গুণ থাকে না। তার নাম ছিল সুরমা। প্রথম যেদিন রাস্তাভরা লোক ও গ্যাসের আলোর মাঝখানে লালচেলী পরা বালিকাকে নিয়ে আসি সেদিন স্বপ্নেও ভাবি নি যে ওর ভেতর এত আছে।

তারপর তার সেই হাসিভরা মুখ ও বুকভরা ভালবাসার মাঝখান দিয়ে যে দু'বছর কি করে কেটে গেল তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সে নেশা ছুটিয়ে দিলে আমার বন্ধু রমেশ।

সেদিন ভয়ানক গরম পড়েছিল। সে এসে বল্লে "কিহে তুমি যে একেবারে কনে বউটি হয়ে পড়েছ। বাড়ীর ভেতর থেকে বার হতে নিষেধ আছে কি? না প্রিয়ার চন্দ্রবদন খানি একদণ্ড না দেখে থাকতে পার না? চল চল, একটু ঘুরে আসা যাক্।" এই বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই একরকম টেনে নিয়ে চলল। খানিকটা গিয়ে সে বললে "রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কি হবে, চল মহিমদের বাড়ীতে গান বাজনা হচ্ছে. ঐখানে যাওয়া যাক।" তারপর সেখানে গিয়ে যা দেখলুম যা শুনলুম তা বলবার নয়। আমি রমেশের হাত থেকে হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে এসে বাড়ীর ভেতর ঢুকে ঘরে খিল দিলাম। একটু পরে সুরমা এসে ডাকতে লাগল। উঠে দোর খুলে দিতেই সে বললে "তুমি যে এখানে! তোমার কি কোন অসুখ করেছে যে ঘরের ভেতর চুপটি করে শুয়ে আছ? খোকা বললে তুমি নাকি রমেশ বাবুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছ, তাই আর আমি এধারে আসি নি।" আমি বললুম—খোকা ঠিকই বলেছে। তারপর রমেশের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কি হয়েছে সবই বললাম। সে শুনে হেসে বললে—"তাতে কি? গান বাজনা শুনতে দোষ কি আছে, নিজের মনের জোর থাকলেই হ'ল।" আমি বললুম "না না সুরমা আমায় ওপথে প্রলোভিত কোরো না। আমি এমন আমোদ চাই না।"

তারপর আর একদিন রমেশ এসে হাসতে হাসতে বললে "কিহে সেদিন বড় পালিয়ে এলে যে? একটু গান বাজনা শুনবে তাতেও তোমার ভয়! তোমরা বড়লোকের ছেলে হয়ে যদি স্ফুর্ত্তি না কর তবে কি ঘুঁটেকুড়ুনির ছেলে স্ফুর্ত্তি করবে?" আমিও মনে মনে ভাবলুম তাইত, সেদিন সুরমাও বলেছিল 'গান বাজনা শুনতে দোষ কি? মনের জোর থাকলেই হ'ল।' এমনি করে রমেশ এসে প্রায়ই আমাকে বোঝাত; সে বলত "বাড়ীতে কি আর আমোদ জমে।"

এমনি নানা কথা বলে প্রলোভন দেখাত। প্রথম প্রথম যেতাম না। পরে এক আধদিন যেতে আরম্ভ করলুম। তারপর একবার ওপথে গেলে লোকের যা দুর্দ্দশা হয় তাই হ'ল। যাক্, ওসব পাপকথা বলে আর কথা বাড়াব না। একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্য্যন্ত নাবলুম। একে তখন পয়সার অভাব নেই, তায় সঙ্গ, তার ওপর বাধা দেবারও কেউ ছিল না। সুতরাং পুরো দমে আমোদ চলতে লাগল। কিন্তু কতদিন আর চলবে ? হাজারে হাজারে টাকা দিনে উড়তে লাগল। তখন নজর পড়ল গয়নার ওপর।

সুরমা প্রথম থেকেই সব বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু একটি দিনও তার হাসি-মাখা মুখখানি ছাড়া মলিন মুখ দেখি নি। কিন্তু দিন দিন কে যেন তার মুখে কালী ঢেলে দিয়ে যেত। তাকে ক্ষয়রোগের মত দিনে দিনে যেন কে ক্ষয় করে ফেলছিল। আমি যেন বুঝেও বুঝতে পারতুম না। মাঝে মাঝে তাকে দেখলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করত। যদিও আমি খারাপ হয়েছিলুম তবুও সুরমাকে আমি বড় ভালবাসতুম। হায় সুরমা! এই কি তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিচ্ছি! তখনি মনে মনে কত প্রতিজ্ঞা করতুম, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যেত যখন রমেশ এসে ডাকত "অমল বাড়ী আছ ?"

যেদিন গয়নার জন্য সুরমার কাছে হাত পাতলুম সে গয়নার বাক্স আমার হাতে তুলে দিয়ে শুধু বললে "তোমার জিনিষ তুমি নিয়ে যাবে, তাতে আমি বাধা দেবার কে ? আমার আর কিছু বলবার নেই, শুধু ছেলেটার একটা উপায় রেখ। তাকে একেবারে পথে বসিও না।" কিন্তু আমার তখন ওসব কথা ভাববার সময় ছিল না। আমার বন্ধুগণ তখন বাইরে অপেক্ষা করছিল।

তারপর আস্তে আস্তে ঝি চাকর সব ছেড়ে চলে গেল। বিনে মাইনেয় কে থাকবে ? কিন্তু সুরমার জন্য বামুন চাকরের অভাব বুঝতে পারি নি; বুঝতে পারলুম সে টাইফয়েড জ্বর নিয়েও সাতদিন বেড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে যেদিন বিছানা নিলে। সেদিন সব শেষ করে এসেছি। ডাক্তার ডাকব তার পয়সা নেই। নিরুপায় হয়ে তখন শুধু বাড়ীটা বাকি ছিল, তাই এক মহাজনের কাছে বাঁধা দিয়ে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি খোকা মায়ের বুকের ওপর পড়ে কাঁদছে ও তার মাকে একটি কথা বলবার জন্য মিনতি করছে। তাকে গিয়ে বুকে টেনে নিয়ে সুরমার মাথায় জল দিতে লাগলুম। যখন একটু জ্ঞান হ'ল তখন খোকাকে ওখানে বসিয়ে ডাক্তার ডাকতে গেলাম। ডাক্তার দেখে বললে "বড্ড অত্যাচার করা হয়েছে, কিছুদিন না ভুগিয়ে ছাড়বে না।" কিছুদিন ফূর্ত্তিটা বাদ দিলুম। একে বাড়ীর ভিতর, তায় রুগীর সঙ্গে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছিল। আবার বেরিয়ে পড়লুম। সুরমাও একচল্লিশ দিন ভুগে একটু সেরে উঠল। বাড়ীতে কিছু টাকা রেখে বাকি টাকায় কিছুদিন চলল। তখন বন্ধুরাও কমে গিয়েছে। ক্রমে বাড়ীতে খাবারে টানাটানি পড়ল। মাঝে মাঝে এসে শুনতাম খোকা একটু দুধ, কি একটু মিষ্টি, এমন ভাত খেতে পারব না বলে কাঁদত। তা দেখে যে কত কষ্ট হ'ত কিন্তু কিছুতেই মনটাকে সামলাতে পারতুম না। তখন বাড়ী আসাই প্রায় বাদ দিলুম। দশ পনের দিন পরে যেদিন ফিরতুম, খোকা এসে গলা জড়িয়ে নালিশ করত "বাবা মা আমাকে খিদে পেলে খেতে দেয় না। সমস্ত দিনে একটিবার খেতে দেয়, তাও কোনদিন চারটি মুড়ি, কোনদিন শুধু ভাত।"

হায়, একদিন যার সামান্য একটু কষ্ট হ'লে আত্মীয়, স্বজন, ঝি চাকরে ঘর ধরত না, তার আজ এই অবস্থা ? তখনও যদি শোধরাতুম তা হ'লে হয়ত আজ আমার এমন অবস্থা হোত না, তোমরা আমায় এত ঘৃণার চক্ষে দেখতে না।

তারপর ? তারপর কি হ'ল শোন। এই পাপিষ্ঠের শেষ কথা কয়টি শোন। এমনি করে মাঝে মাঝে আসতুম যেতুম। সেবার প্রায় তিন মাস পরে বাড়ী গিয়েছিলাম। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে ঢুকতেই একটা করুণ আর্ত্তনাদ কাণে ঢুকল। ওগো, এ যে আমার খোকার স্বর! পাগলের মত ওপরে উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি খোকা ও সুরমার হাড় ক'খানা কে যেন চামড়া দিয়ে ঢেকে বিছানায় ফেলে রেখেছে। মাঝে মাঝে খোকার মুখের কাছ থেকে একটা করুণ অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখতেই, প্রাণপণ শক্তি দিয়ে কি যেন একটা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না, শুধু একটা কাতর

আর্ত্তনাদে ঘরটা ভরে গেল। তখন সুরমা বহুকষ্টে জড়িতকণ্ঠে বলল "কিছু খাবার এনে দাও।" উঃ, আজ না খেতে পেয়ে এদের এই দশা! মনটা আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল। আজ আমিই আমার স্ত্রী পুত্রের হত্যাকারী! মাথাটা ঘুরতে লাগল। কোনমতে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর যেমন করে এসেছিলাম তেমন করে আবার নেবে গেলাম।

তখন রাত বারোটা। ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে ছুটলাম। তিনঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরছিলাম, এই ঝড়ের রাতে কে আমাকে খাবার দেবে? কিন্তু ভগবান, দুঃখটা বেশী করে দেবার জন্যই বোধ হয় দেখতে পেলুম এক বুড়ো মিষ্টিওয়ালা ভিজে কাপড়ে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরছে। তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে আমার দুঃখের কথা বললাম। সে আমার হাত ধরে টেনে তুলে বললে "বাবা ক'খানা ভিজে লুচি ছাড়া ত আর কিছুই নেই।" "যা আছে তাই দাও, তারা হয়ত আমার পথ চেয়ে বসে আছে। শুধু হাতে কি করে বাড়ী ফিরে যাবো!" তাই নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরে এলাম। এসে দেখি সুরমা খোকাকে বুকে জড়িয়ে পড়ে আছে। খোকার গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলুম, যেন বরফ হয়ে গেছে! চেঁচিয়ে উঠলুম "সুরমা, আমার খোকার কি হয়েছে?" সে শুধু আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। এত ডাকলুম, এত চীৎকার করে কাঁদলুম কিন্তু সে একটু সাড়াও দিলে না। 'এই দেখ তোমার জন্য খাবার এনেছি—একটু খানি মুখে দাও।' কিন্তু সে শুনলো না। বোধ হয় এই মহাপাতকীর হাতে খেতে হবে বলে ভয়ে সে আগে ভাগেই পালিয়ে গেছে।

সুরমার দিকে চেয়ে দেখি সেও পাথরের মূর্ত্তির মত আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তার যেন সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। চোখের যে এক ফোঁটা জল তাও যেন শুকিয়ে গেছে। তার চোখে চোখ পড়তেই ইশারা করে ডাকলে, কাছে যেতেই আমার পা দু'খানা মাথার কাছে টেনে নিয়ে বললে, "আমারও সময় হয়ে এসেছে, ঐ দেখ খোকা আমায় ডাকছে। আমি খোকার কাছে যাচ্ছি। তোমাকে একটি শেষ অনুরোধ করে যাই, তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর তুমি ভাল হবে, অন্ততঃ ভাল হতে চেষ্টা করবে।" "সেকি সুরমা! তুমিও কি সত্যি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ? না, আমি ত তোমায় যেতে দেব না।" তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলাম। "তুমি কি জান না আমি তোমাকে কত ভালবাসি। তুমি নেই এ কথা ত আমি ভাবতে পারব না। এই বারটি আমাকে ক্ষমা কর, আর আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।" তার মুখে যেন একটা স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল, সে বললে "ওগো খুব জানি তুমি আমায় কত ভালবাস। জানি বলেই এতদিন বেঁচে আছি, তা না হলে বোধহয় আরও আগেই যেতে হ'ত। কিন্তু বড় দেরী, বড় দেরীতে এই কথা বল্লে। আর কিছুদিন আগে তোমার মুখে এই কথা শুনতে পেলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু এখন উপায় নেই আমায় যেতেই হবে, ঐ শোন খোকা কাঁদছে। তোমার কাছে যদি কোন দোষ করে থাকি ক্ষমা কোরো। তুমি ভাল হবে শুনে আজ আমার কোন দুঃখ নেই, আমি নিশ্চিন্দি হয়ে যাচ্ছি—বিদায়—।" তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। তারপর, তারপর সব শেষ। তাকে একটি কথা বলবার জন্য কত মিনতি করলুম, কত কঁাদলুম কিন্তু সে তখন বহুদূরে। আমার যা কিছু—সব কেড়ে নিয়ে সে তখন কোথায় চলে গিয়েছে!...

সুবর্ণসৃষ্টি

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

সম্প্রতি এক অদ্ভুত অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সভ্য জগৎ চমৎকৃত হইয়াছে। আবিষ্কারটী হইতেছে পারদ হইতে স্বর্ণসৃষ্টি। অনাদি কাল হইতে এদেশে 'পরশমণি' এবং পাশ্চাত্য দেশে 'Philosopher's Stone' একটা আজগুবি বিশ্বাসের ব্যাপার ছিল; মধ্য যুগের chemistরা অনেকেই—এই পরশ-পাথরের সন্ধানে জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন এবং এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টাপরাধে পাগল বলিয়া উপহসিতও হইয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেকের বিশ্বাস 'পরশপাথর' সত্যই অনেক গুহ্যবাদী জ্ঞানীর জানা ছিল। অনেক যোগীপুরুষেরাও না কি এখনও পারদ হইতে সোনা করিবার কৌশল অবগত আছেন শোনা যায়।

সে যাই হোক, সম্প্রতি জর্ম্মণির Charlottenburg Technical Collegeএর আচার্য্য Adolph Miethe এই পারদ হইতেই সোনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটাইয়াছেন; এবং এই সংবাদে সভ্য জগতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। মিথে যে পরশপাথরের আবিষ্কারেই রত ছিলেন তা নয়। এ আবিষ্কার একটা দৈব ঘটনা মাত্র। তিনি Ultra violet আলোকতত্ত্বের রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন; সেই উপলক্ষ্যেই এই নূতন সন্ধান লাভ হয়। তিনি অত্যধিক মাত্রার তেজযুক্ত এই আলোক ঘটাইবার জন্য পারদের বাষ্পপূর্ণ এক Quartz lamp ব্যবহার করিতে ছিলেন। এই lamp এর মধ্যস্থ bulbএ পারদের বাষ্প—এই বাষ্পের ভিতর দিয়া আচার্য্য খুব তেজালো বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চার করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি দেখিলেন Bulbএর ভিতর গাত্রে এক কালো বর্ণের পদার্থের পর্দ্দা পড়ে। তিনি এই পদার্থটার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন উহাতে সোনার দানা আছে। আচার্য্য ইহাতে বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তিনি ভাবিলেন, হয় তো উহা আকস্মিক একটা ঘটনা। কাজেই নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আবার তিনি নূতন একটা lampএ কিছু শোধিত পারদ দুই ভাগ করিয়া রাখিলেন, এবং এক ভাগের ভিতর দিয়া জোরালো বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চার করিলেন। অপর অংশ বিদ্যুৎপ্রবাহ হইতেই বঞ্চিত রাখিলেন। তার পর প্রায় ২০০ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক প্রবাহে রাখার পর দেখিলেন—প্রবাহ অধীন পারদাংশে সোনা দেখা দিয়াছে, অপরাংশে দেখা দেয় নাই। অতঃপর সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য যে উক্ত পারদাংশের কয়েকটা এটম সোনার এটমে পরিণত হইয়াছে। ব্যাপার এই পর্য্যন্তই এখন দাঁড়াইতেছে। অবশ্য এখনো এর সত্যতার জন্য যথেষ্ট মাত্রায় পুনর্পরীক্ষা দরকার। তবে আচার্য্য Meitheর পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার কিছু নাই—কেন না ইনি এক জন নামজাদা গণ্যমান্য বৈজ্ঞানিক। তাঁহার শক্তি ও সততা ও গবেষণাবুদ্ধিতে সন্দেহ কাহারো নাই। কাজেই বলিতে হয় যে মধ্যযুগের Philosopher's Stone সম্বন্ধীয় গুজব নিতান্ত কাহিনী নয়। এই আবিষ্কারের ফলাফল খুব সুদূরবিস্তারী। কেন না কৃত্রিম উপায়ে সোনাসৃষ্টি সত্য ও সম্ভব হইলে, সোনা কালক্রমে তার দুর্লভতা ও দুর্ম্মূল্যতা হারাইবে। সবাই এর পর সোনার খাটে শুইবে, সোনার ঘর বাড়ী করিবে। কেন না সোনা তখন লোহারই মত সুলভ ও সস্তা হইবে। একদিনে না হউক কিছু কাল পরে হইবেই। যদি কেহ বলেন—সে ভয় নাই; কেন না, এক তাল সোনা কিনিতে যা লাগে তার সহস্র গুণ দাম হইবে এই কৃত্রিম উপায়ে ১ রতি সোনা করিতে। উত্তর এই—এখন কিছু দিন তাই হইবে তবে চিরকাল তা থাকিবে না। প্রথম আবিষ্কারের পর সব জিনিসই দুর্ম্মূল্য হয়, পরে সস্তা হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত Electric lamp—এই আলো প্রথম যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন একটার পিছনে খরচ পড়িত হাজার ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৪০০০৲ টাকা। এখন

তার চেয়ে ভাল একটা Bulb ১৲ টাকায় মেলে। সে যাক্, অর্থ জগতে যে বিপ্লব ঘটিবে তার ভাবনায় মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। বিজ্ঞান জগতে এই আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম। সোনার পারমার্থিক গুণধর্ম্ম লইয়া বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত, উহার ব্যবহারিক মূল্য গ্রাহ্য করেন না।

পারা হইতে সোনার সৃষ্টির মূলে যে সত্য আছে তাহা বৈজ্ঞানিকের চিরপোষিত আশার সফলতা-পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। যাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের নব পরমাণুবাদের খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে পণ্ডিতরা সমস্ত এটম্‌কে এক মূল আদি Proto-matter এরই রূপান্তর বলিয়া সন্দেহ করিতেন। এই আদিজড় হয় তো ইথর বস্তু। হয় কেন, সত্যই তাই। নব পরমাণুবাদ মতে এতাবৎ স্বীকৃত যাবতীয় ভিন্নধর্ম্মী atom—উপাদানে ঐ ইথর বা Electricity শক্তি। এখনকার এটম্ আর Democritus বা Dalton এর গোলগাল শক্ত জড়বিন্দু নয়;—ইহা বিদ্যুৎকণা। এখনকার এটম গঠনে ও আকারে একটী সৌরমণ্ডলের মত; অর্থাৎ কেন্দ্রগত একটী Nucleusএর চতুর্দ্দিকে সতেজে ভ্রাম্যমান কয়েকটা বিদ্যুৎকণা। Nucleus টা কতক গুলা Positive বিদ্যুৎকণার সমষ্টি; আর তার চতুর্দ্দিকে সবেগে ভ্রাম্যমান বা ঘূর্ণ্যমান কতকগুলা Negative বিদ্যুৎকণা। মধ্যস্থ + বিদ্যুৎকণার নাম প্রোটন্ (Proton) আর ঘূর্ণ্যমান গ্রহস্থানীয় বিদ্যুৎকণাগুলার নাম Electron। এই প্রোটণের mass এবং Electronএর সংখ্যার উপরেই এটমদের ভেদত্ব ও বিশেষত্ব স্থাপিত।

উপস্থিত কথা—পারদের এটমে ইলেকট্রণ সংখ্যা ৮০টী; আর সোনার এটমে ইলেকট্রণ সংখ্যা ৭৯টী। উভয়ের স্বরূপ নৈকট্য কত বেশী দেখুন! এখন পারার এটম হইতে কোনো মতে একটা ইলেকট্রণ সরাইতে পারিলেই, উহা সোনার এটমে পরিণত হইবে, এ তো theoretically সোজা। কিন্তু কাজটাই ছিল কঠিন। কেন না, কৃত্রিম উপায়ে পারদাণু হইতে একটা ইলেকট্রণ না হয় সরানো গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উহা Proton আকর্ষণে ফিরিয়া আসিয়া লাগিয়া যাইবে; কাজেই পাকাপাকি রকমে ইলেক্ট্রণটাকে সরাইয়া রাখিতে দরকার হইতেছে প্রোটণের আকর্ষণী শক্তিও কমানো। এই শেষোক্ত কাজ দুই উপায়ে হইতে পারে। প্রথম, প্রোটনের + বিদ্যুৎকণাদের একটীকে সরানো; তাহা হইলে প্রোটনের আকর্ষণ শক্তি কমিবে; এবং ঐ হ্রস্ব প্রোটন ৭৯টী ইলেকট্রণ টানিয়া রাখিবে। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে, প্রোটণের Positive বিদ্যুৎকণারাশি মধ্যে একটা negative বিদ্যুৎকণা (Electron) ঢুকাইয়া দেওয়া। ইহাতে প্রোটনের ৮০টা ইলেক্ট্রণ টানিবার ক্ষমতা neutralised হইয়া যাইবে। কেননা প্রোটনের একটা + কণা নূতন প্রযুক্ত ইলেক্ট্রণ কণার দ্বারা শক্তিহীন হইয়া neutral হইয়া যাইবে।

সম্প্রতি মার্কিন দেশীয় বিজ্ঞান পত্রিকা, Scientific American আচার্য্য Miethe র পরীক্ষার পুনঃপরীক্ষণ করিবার মত করিয়াছেন। ফলাফল যথাকালে প্রকাশিত হইবে।

ফলে আচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে বৈজ্ঞানিকদের Transmutatoin of Elements রূপ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে। তাঁহাদের আর একটী যে কল্পনা আছে Intra-atomic energy—কাজে লাগাইতে পারিলে, জগতের অনেক সমস্যা পূর্ণ হইবে।

"প্রকৃতি"

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(২৮)

কাকাবাবুর সহিত মুঙ্গেরের বাংলার বাহিরে গাড়ী হইতে নামিয়া আমি আড়ষ্টের মত স্তব্ধ হইয়া পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার বক্ষস্থল হৃদপিণ্ডের আঘাতে কেবলি তরঙ্গিত হইতেছিল।

তখন রাস্তায় লোক ছিল না। পথের ধারের শীতক্লিষ্ট গাছগুলা বসন্তের আসন্ন আগমনে পল্লবাবরণ উন্মোচন করিবার আয়োজন করিতেছিল। আম্রকুঞ্জে মুকুলগুলি স'বে পল্লব ভেদ করিয়া ঈষৎ আত্মপ্রকাশ করিতে যাইতেছিল। পাড়ার বস্তির উপর একখানা শাদা কুয়াশার আচ্ছাদন তখনও ভাল করিয়া অপসারিত হয় নাই।

আমি সারা পথটি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত একান্ত মনে যাহা কামনা করিয়াছিলাম আমার অন্তর্য্যামী আমার অজ্ঞাতে সে কামনা পূর্ণ করিতে যত্নবান হইলেন।

আমাদের গাড়ীর শব্দে তিনি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার অতর্কিত আগমনে আমি মুখ তুলিতে তাঁহার সহিত চোখো-চোখী হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখখানি অবনত করিলেন। আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলাম—নিমেষের জন্য তাঁহার গৌরবদন রক্তিম আভা ধারণ করিয়াছে। তিনি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কাকাবাবুকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকাবাবু, আপনি এ সময়ে, এমন ভাবে! বাড়ীর সকলে কেমন আছে ?"

কাকাবাবু কল্যাণবর্ষী করে ভাইপোকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তর দিলেন—সকলেই ভাল আছে। অনেক দিন তোকে দেখি না, একটিবার দেখতে এলাম মণি! তুই কাজকর্ম্ম দেখতে এসেছিস—এতে বড্ড খুসী হয়েছি বাবা। এখানকার বাড়ী ঘর দেখাতে আমার মা'টিকে সাথে করে এনেছি।—হ্যাঁ মা, তুমি অমন হ'য়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ; যাও ঘরের ভেতর গিয়ে বোস গে।"

কাকাবাবু একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া বসাইলেন। নিজেও কাছে বসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি দ্বারের পাশেই ছিলেন। কাকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে তোর লোকজন সব ঠিক হ'য়েচে মণি ? দেওকীলাল কোথায় ? তাকে দেখছি না কেন ?"

"দেওকীলাল একটা রাঁধুনী ঠিক করতে গেছে। আমি এখানে এসে যে রাঁধুনীটা রেখেছিলাম, কাল দুপুর বেলা সে আমার রিষ্টওয়াচ, ফাউন্‌টেন পেন চুরী করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। কিষণ নামে একটা ছোকরা চাকর পেয়েছি, তাকে দিয়েই কাজ চলছে।"

"চুরী করে পালিয়েছে! নিজের লোক, দেখা শোনার লোক না থাকলে এই দশাই হয়। যাক্ যা হবার তা তো হয়েছে, দুপুরে ঠাকুর পালিয়েছিল রাতে তোর খাওয়ার কি হ'ল ?"

"দোকানের খাবার টাবার খেয়েছিলাম, কিষণ দুধ জাল দিয়েছিল।"

কিষণের কথা বলিতে বলিতে ট্রেতে চা ও বিস্কুট সাজাইয়া লইয়া কিষণ গৃহে প্রবেশ করিল। পাশের টেবিলে সেগুলি রাখিবার হুকুম করিয়া, স্বামী কাকাবাবুর দিকে চাহিলেন।

কাকাবাবু বলিলেন "তুই খা মণি, আমি মুখ হাত ধুয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে পরে খাব। শ্যামা আমার চা তৈরী করে দেবে।—এই কিষণ, মা'জীকে সঙ্গে করে নিয়ে যা তো ; স্নানের ঘর, রান্নাঘর, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে, আমার

একটু তামাক সেজে আন। ওই চুবড়ীর ভেতর টীনের কৌটায় তামাক টিকে সব আছে।"

আমি বাক্স খুলিয়া একখানি শাড়ী ও সেমিজ লইয়া কিষণের পশ্চাৎগামী হইলাম। এই নারীবর্জ্জিত নূতন গৃহস্থালী শত ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও আমার ভাল লাগিল। এখানকার গৃহিণী পদলাভের আনন্দে আমার হৃদয় গৌরবান্বিত হইল। আমি কিষণের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত বাড়ীটা দেখিয়া লইলাম। স্নানের পূর্ব্বে রান্নাঘরের অনেকটা সংস্কার করিয়া ফেলিলাম।

স্নানান্তে কাকাবাবুকে চা খাওয়াইয়া রান্না চড়াইয়া দিয়াছি—এমন সময় দেওকীলাল পাচক লইয়া আসিল। আমি স্বহস্তে রন্ধন শালার ভার লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কাকাবাবুকে বলিয়া পাচক প্রবরকে বিদায় করিয়া দিলাম। আমার ভাগ্যবিধাতা যখন আমাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছেন, তখন সেবা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? সেবায় সকলেরি প্রয়োজন; সেবা করিবার অধিকার সকলেরি আছে। হৃদয় পাই না বটে, কিন্তু হৃদয় দিয়া পূজা করিব। পূজাতেই আমার আনন্দ, পূজাতেই আমার তৃপ্তি।

মধ্যাহ্নে কাকাবাবু ও স্বামী আহারে বসিয়াছিলেন। ভঁাইয়ের সম্মুখে পূর্ব্বেই আমি অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া দিয়াছিলাম। রন্ধন শালার বিবরণ স্বামীর জানা ছিল না। দেওকী লালের আনীত ঠাকুর রান্না করিয়াছে মনে করিয়া স্বামী খাইতে খাইতে বলিলেন "এ নতুন ঠাকুরটা পনের টাকা মাইনে চেয়েছে কাকাবাবু; রান্না খেয়ে দেখে পরে মাইনে ঠিক করে দেব, তখন আমি বলেছিলাম। এখন দেখচি—পনের টাকা সে বেশী চায় নি; এমন সুন্দর রান্না আর কখ্‌খনো খেয়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না। আপনার মুখে রান্না কেমন লাগছে কাকাবাবু?"

আমি দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া উভয়ের খাওয়া দেখিতে ছিলাম, সহসা আমার হৃদয় মনের উপর দিয়া একটা পুলকের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। মহাসুখে বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল। আমি দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলাম।

কাকাবাবু ঝোল দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিলেন "এ রান্না আমার মুখে অমৃতের মত লাগছে মণি, ভাল যা,—তা সকলের কাছেই ভাল লাগে। এ রান্নার রঁাধুনীর মাইনে ঠিক করবার চিন্তা তোর করতে হবে না বাবা।"

"তা'হলে আপনি বুঝি মাইনে ঠিক ক'রে দিয়েছেন? কত করে ঠিক হ'ল কাকাবাবু?"

"আমি ঠিক করি নি, ঠিক করতে হবে না মণি, যিনি অন্নপূর্ণা হ'য়ে আজ আমাদের অন্ন দিয়েছেন, তিনি দেওকী লালের ঠাকুর নয়, তিনি আমার জননী 'শ্যামা'।"

স্বামী আরক্ত মুখ অবনত করিয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। কাকাবাবু আঁচাইয়া, আলবোলার নল মুখে দিয়া বিছানায় আশ্রয় লইলেন। আমি দেওকী লালকে ও কিষণকে খাওয়াইয়া নিজে আহারাদি শেষ করিলাম।

সমস্ত দিবস ব্যাপী শত কাজের মধ্যে স্বামীর মুখের "এমন সুন্দর রান্না" আমার কাণে এবং প্রাণে স্বর্গীয় বীণার তানে ধ্বনিতে লাগিল। ঝাড়া, ধোয়া, সাজানো, গোছানো করিতেই দিনের আলো নিবিয়া গেল। চন্দ্রোজ্জ্বল মধুর রজনীতে স্বামীর শয়ন কক্ষের পাশের কামরায় শ্রান্তিতে শুইয়া পড়িলাম। আধ তন্দ্রা, আধ জাগরণের মধ্যে হৃদয় বীণার তারে তারে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল "সুন্দর রান্না, এমন আর খাই নি।"

(২৯)

আমাকে মুঙ্গেরে রাখিয়া দিন কয়েক পর কাকাবাবু কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। বিষয় সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মের জন্য তিনি যে অধিক কাল এখানে থাকিতে পারিবেন না, তাঁহার থাকিবার উপায় নাই—ইহা আমার বিলক্ষণ রূপে জানা থাকিলেও কাকাবাবু চলিয়া যাইবেন শুনিয়া—মনটা হতাশায় ভরিয়া উঠিল। যাঁহার স্নেহ-সলিলে অবগাহন করিয়া স্বজনের অভাব অনুভব করিতে পারি নাই, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া যে আমার অজ্ঞাত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে,—অনেক ভাবিয়াও আমি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। যেদিন আজন্মের মমতার বেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্বশুর গৃহে যাত্রা করিয়াছিলাম—সেদিন শত আশা, শত আশঙ্কার মধ্যে 'কাকাবাবু সঙ্গে আছেন' ভাবিয়া

আমার একান্ত নির্ভরশীল হৃদয়টি বিচলিত হয় নাই। স্বামীর উপেক্ষায়, শাশুড়ীর অনাদরে, সমবেত আত্মীয় কুটম্বিনীদের সুতীব্র মন্তব্যে কাকাবাবুর সুশীতল স্নেহ-তরুর ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া আমি জুড়াইয়া গিয়াছিলাম। সেই কাকাবাবু এখানে থাকিবেন না মনে করিতেই মনটা যেন কিসের ব্যথায় টন টন করিতেছিল। এই অল্প দিনে—এখানকার যেটুকু পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম—তাহা আমার নিকটে অপ্রীতিকর নহে। স্থান হিসাবে গঙ্গার ধারের এ সুন্দর সুদৃশ্য বাংলাটা বড়ই শান্তিদায়ক। বাংলার দুই ধারে বিস্তৃত যবের ক্ষেত, সম্মুখে ছায়া সুনিবিড় পথ। পশ্চাতে স্বচ্ছ-সলিলা ক্ষীণাঙ্গিনী গঙ্গা কুলু কুলু কলোচ্ছ্বাসে তট-ভূমিকে সদাই জাগ্রত ও মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথম দর্শনেই নদী তীরের বনপথ আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, দিনে দিনে মুঙ্গেরের সহিত আমি একটা অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে বন্দী হইতেছিলাম।

আমার শ্বশুরের আমলের বৃদ্ধ দরোয়ান দেওকীলাল, বালক কিষণ আজ্ঞাবহ বিনম্র ব্যবহারে, মাতৃ সম্বোধনে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।—কেবল একটি স্থান হইতে আমি দূরে দূরে থাকিতাম। কিন্তু দূরে থাকিলেও তাঁহার চরিত্রের কোমলতা, নির্মলতা উত্তরোত্তর আমাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। এই স্বামী, এত উদার, এত মহান—ইঁহারই নিকটে আমায় থাকিতে হইবে। আমারি সেবায়, আমার হস্তের অন্নজলে—আমার হৃদয়-দেবতার পূজা হইবে। ইহার অধিক প্রীতিপ্রদ আমার কি থাকিতে পারে? কিন্তু এ হর্ষাবেগ ছাপাইয়া কাকাবাবুর আসন্ন বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় আমার বেদনাতুর অন্তরকে বারম্বার পীড়া দিতেছিল।

যাত্রার অনতিবিলম্বে কাকাবাবু গাঢ়স্বরে কহিলেন "আমার যাবার সময় হ'য়ে এল মা, কিছুদিনের জন্যে আমায় মা-হারা হ'য়ে থাকতে হবে। তুমি এখানে ভাল হয়ে থেকো, একটু অসুখ কিম্বা অসুবিধা হ'লে তক্ষুনি আমায় লিখো। আমি নিজে এসে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।"

কাকাবাবুকে বিদায় দিতে আমার বুকের ভিতর অশ্রু জল আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিল। আমি অতি কষ্টে ধরা গলায় বলিলাম "আপনাকে না দেখে আমি এখানে কেমন করে থাক্‌বো, কাকা বাবু? মঞ্জুর চিঠি পেয়েই আপনি তাড়া হুড়ো করে যাচ্ছেন, আর ক'টা দিন থাক্‌লে আপনার শরীর একটু ভাল হ'তে পারতো।"

"এ বয়সে শরীর আর কি ভাল হয় মা, এখন সে আশা করা তোমাদের অন্যায়।—মঞ্জুর চিঠি পেয়ে আমি যাচ্ছি না লক্ষ্মী, আমার যে কাজ আছে। সে গুলো সারতে হবে তো।—এত চিন্তা কিসের শ্যামা; আমায় ছেড়ে, আমায় না দেখে, বেশী দিন তোমায় থাক্‌তে হবে না। যে খেয়ালী মানুষের কাছে তোমায় রেখে যাচ্ছি, তার খেয়ালের খেলা শেষ হলে সে কি এখানে বোসে থাক্‌বে মা, তা তুমি স্বপ্নেও ভেব না।"

কাকাবাবুর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিলাম "আমার ভাল না লাগ্‌লে আমি কিন্তু তখুনি আপনাকে চিঠি লিখ্‌বো কাকাবাবু, আপনি আমায় নিয়ে যাবেন। আমায় ইচ্ছাপুর যেতে মানা করলেন, অথচ নিজের কাছেও রাখ্‌লেন না। আমি যদি এখানে না থাক্‌তে পারি!" আর বলা হইল না। আমার অবাধ্য অশ্রুর বাঁধ কাকাবাবুর সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কাকাবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন "পাগলী মেয়ে আমার, চলে যাচ্চি বলে এত দুঃখ হয়েছে, অভিমান হয়েছে; আমি তোমায় বনবাসে দিয়ে যাচ্ছি না মা, তা নয়, তুমি এখনও ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই তোমার জানা নেই। কত দুঃখে তোমার কাকাবাবু তোমায় এখানে রেখে যাচ্ছে—তা পরে বুঝ্‌বে। যে দিন বুঝ্‌তে পারবে সেদিন হৃদয় হীন ভেবে, নিষ্ঠুর ভেবে আমার ওপর অভিমান করতে পারবে না। আমি তোমাকে মনোকষ্ট দিতে ঘরে আনি নি মা; চির সুখ শান্তি দিতেই এনেছি। সেইটা তোমায় দিতে পারলেই তোমার কাকাবাবু নিশ্চিন্ত হবে সুখী হবে। এরি জন্যে এমন করে কি কাঁদে!"

কাকাবাবুর চক্ষু অশ্রুসজল হইল; তিনি আমার মস্তকে হাত দিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন। অন্ধকারে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত কাকাবাবুর উদ্দেশ্যে, কাকাবাবুর অধ্যবসায়

আমার মনোদর্পণে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। নূতন দেশ দেখাইবার নিমিত্ত, স্নেহ পাত্রের সেবা যত্নের নিমিত্ত তিনি যে এখানে আমাকে আনেন নাই, সেটা আজ আমি মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। আমি মনে মনে ভাবিলাম নারীর অভিমান, নারীর বিদ্রোহ আমি ত্যাগ করিব। তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আমার চিরপ্রাপ্য সম্পদ আর দুষ্প্রাপ্য করিব না। ভিখারীর মত চাহিয়া লইব না, প্রাপ্ত সম্পদ অভিমানের বশে ঠেলিয়া ফেলিব না। আমার রূপ নাই ; কিন্তু প্রাণ আছে—প্রাণ আহুতি দিয়া আমার কাকাবাবুর চিত্তক্ষোভ বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিব। পারিব কিনা—তাহা জানি না ; কিন্তু চেষ্টা আমার করিতেই হইবে।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

নাট্যমন্দির—শ্রীসুবোধ রায় প্রণীত—২৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ কল্লোল পাবলিশিং হইতে প্রকাশিত—মূল্য একটাকা।

ইহাতে শিক্ষা-বিভ্রাট, একালের ছেলে ও বন্ধু নামে তিনটী কথানাট্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর সম্মুখে যে সকল সমস্যা উঠিয়াছে, গ্রন্থকার তাহাই নাট্যাকারে চোখের সামনে ধরিয়াছেন। একঘেয়ে প্রেমের নভেল নাটক পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালীর অরুচি ধরিয়াছে। ইউরোপে আজ নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া কত নাটক লেখা হইতেছে—আর আমাদের নাট্যসাহিত্য কেবল প্রেম, মান অভিমান, মারামারি কাটাকাটির কথাতেই পূর্ণ। সুবোধবাবু সাহস করিয়া যে শিক্ষা ও সমাজের সমস্যাকে নাটকের মধ্যে তুলিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তিনি উদীয়মান সাহিত্যিক। কোরকের আকারে ক্ষুদ্র কথানাট্যে তিনি আজ যে সকল কথা বলিতেছেন, আশা করি সত্বরই তিনি তাহাকে ফুটাইয়া পূর্ণ বিকশিত পুষ্পরূপে সাহিত্যামোদীগণের নিকটে ধরিবেন।

"শিক্ষা বিভ্রাটে"—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার দোষ ধরিয়াছেন - কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া আর কি রকম প্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহা বলেন নাই। "একালের ছেলে" ও "বন্ধু"তে তারুণ্যের হিল্লোল আছে—অতএব উহা বেশ উপভোগ্য।

নাটিকা তিনটিই ছেলেদের অভিনয়ের উপযোগী। লেখকের ভাষা বেশ তরতরে ঝরঝরে—ভাবকে অল্প কথায় ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। আমরা গ্রন্থখানির সাফল্য কামনা করি।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হাসিমুখ।

ঈশানী শ্বশুরালয়ে অতি দুঃখে বাস করিয়া, পিতার রোগকথা শুনিয়াও তাঁহার শুশ্রূষার জন্য তাঁহার কাছে আসিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুকালেও উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সহিত শেষ দেখা করিতে পারে নাই। হতভাগিনী কেন এই মহাদুঃখ পাইল শুন।

অসভ্য যদুপতির অশিষ্ট টেলিগ্রামের উত্তর লিখিবে বলিয়া শরৎকুমার দুঃখিনী ঈশানীকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই রাত্রে বাটীতে টেলিগ্রাম করিবার ফারম খুঁজিয়া না পাওয়ায়,এবং পরদিন কোনও প্রিয় বন্ধুর বাটীতে দিবসে ভোজন এবং রাত্রে 'তয়ফা' দেখিবার নিমন্ত্রণ থাকায় এবং তৎপর দিবস উক্ত তায়ফার সুন্দর মুখ এবং লাস্যোল্লাস স্মরণ করিয়া টেলিগ্রামের কথা একবারে বিস্মরণ হওয়ায় কখনও সেই উত্তর লেখা হয় নাই। অলিখিত এই টেলিগ্রামের উত্তরের প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় ঈশানীর পিতৃ সকাশে যাওয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছিল।

তাহার টেলিগ্রাম পাইয়াও শরৎকুমার বা ঈশানী কেহই সমাগত না হওয়ায়, কিম্বা ওই টেলিগ্রামের কোনও উত্তর না পাওয়ায় যদুপতি কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুশোক কিছু প্রশমিত হইলে, এবং বিকলা প্রমদার ক্রন্দনবেগ কিছু সাম্যভাব ধারণ করিলে, সে কল্যাণীকে শোকাতুরা শ্বশ্রূর সান্ত্বনা জন্য বরিশালে রাখিয়া নিজে সিরাজগঞ্জে ফিরিবার পূর্ব্বে একদিন শ্বশ্রূকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঈশানী টেলিগ্রাম পেয়ে এখনও ত এল না। এখন তাকে এ দুঃসংবাদটা দেব কি ?'

প্রমদা আপন বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া বলিলেন, 'এত আর সুখের খবর নয়। আমরা জ্বলে পুড়ে মরছি, আমরাই মরি ! তাকে মিছামিছি এত দিন আগে থেকে কষ্ট দেওয়ার দরকার কি ? শ্রাদ্ধের আগে আসবার জন্য লিখ্‌লেই হ'বে।'

ইহার পরদিনই যদুপতি সিরাজগঞ্জে চলিয়া গেল। যাইবার সময়, পিতৃশোকাচ্ছন্না কল্যাণীকে বলিয়া গেল, 'এখন এখানে কোনও কাজ নেই ; তাই এখন আমি সিরাজগঞ্জে চল্লাম কল্যাণু। শ্রাদ্ধের সময় আবার এসে নিয়ে যাব। এখন এখানে তোমার মার কাছে তোমার কিছুদিন থাকা দরকার।'

কল্যাণী ম্লানমুখে কহিল, 'তুমি বলছ, তাই থাকব। কিন্তু মার জন্যে আমার এখানে থাকবার কোনও দরকার নেই ! মা তাঁর বাপের বাড়ীতে চিঠি লিখেছেন। সেখান থেকে তাকে আগলাবার জন্যে একজন লোক বোধ হয় কালই এসে পৌঁছিবে।'

যদুপতি কহিল, 'তা আসুক। তুমি বড় মেয়ে; তোমারও এখানে শ্রাদ্ধের পর পর্য্যন্ত থাকা খুব দরকার।'

কল্যাণী মনে মনে বলিল, না স্বামিন্, তোমার কাছে থাকাই আমার সব চেয়ে বেশী দরকার। কিন্তু মুখে স্বামীর বাক্যের কোনও প্রতিবাদ করিল না। বাধ্যা শিষ্টার ন্যায়, নির্ব্বিবাদে স্বামীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল। —সঙ্গীতে যেমন বিষধরকে বশীভূত করিয়া থাকে, তাহার বাধ্য হইয়া মোহিনী স্ত্রীজাতি তেমনই দুরন্ত পুরুষজাতিকে বশীভূত করিতে পারে।

বরিশালে আসিয়া কল্যাণী প্রথমদিনই দেখিয়াছিল যে,

প্রমদা একটি নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া, দীপালোকে একখানি কাগজ গোপনে পাঠ করিতেছেন। ঐ কাগজখানি দানপত্র ; অখিলবাবু তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ঈশানী দাসীকে দান করিতেছেন।—বলাবাহুল্য রোগ শয্যায় শুইয়া, দুর্ব্বল চিত্তে সেবারতা পত্নীর অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া তিনি দানপত্র খানি সম্পাদন করিয়া দিয়া ছিলেন। বুদ্ধিমতী প্রমদা এই দানপত্র খানি সেই দিনই সকালে লিখাইয়া লইয়া, বাটীতে রেজেষ্ট্রার আনাইয়া দ্বিপ্রহরে উহা রেজিষ্টারী করাইয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাতে কোনও ভুল বা ত্রুটী আছে কি না, সন্ধ্যাকালে আলো জ্বালিয়া তাহা পাঠ করিয়া দেখিতেছিলেন।

এইরূপ দানপত্র আপন গর্ভজা কন্যার নামে মুমূর্ষু স্বামীর নিকট লিখাইয়া লওয়া যে একটা গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল, তাহা বুদ্ধিমতী প্রমদা নিশ্চয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি ইহা তত গোপনে পড়িবেন কেন? এবং কল্যাণীর অপ্রত্যাশিত আগমনে সন্ত্রাসিতা হইয়া উহা বাক্স মধ্যে সত্বর গোপন করিতেন না। বুদ্ধিমতী রমণীগণ সাধারণতঃ দুইটী বিষয় গোপন করা বুদ্ধির কার্য্য মনে করিয়া থাকেন ; তাঁহারা আপনাদের প্রেমলীলা গর্হিত না হইলেও, প্রকাশ করিতে চাহেন না, এবং তাঁহারা আপনাদের গর্হিত কার্য্যগুলি অন্যের কাছে গোপন করেন। প্রমদা এই গর্হিত কার্য্যটি লোকচক্ষুর অন্তরালে করিতে পারিয়া আপনাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মনে করিয়াছিলেন। হায়! মানুষ কবে বুঝিতে পারিবে যে মানুষের কোন কাজে মানুষের অহঙ্কার করিবার কিছু নাই ; কিম্বা মানুষের ক্ষীণ বুদ্ধি পরিচালিত কোনও কার্য্যের সুফল ফলিবারও আশা করিতে নাই। এক চক্রধরের চক্রের তলায় পড়িয়া মানুষের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় ; তাহার সকল আশা নিষ্পেষিত হইয়া যায়।

যদুপতি বরিশাল ত্যাগ করিবার পরদিনই কল্যাণীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল ; প্রমদার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা সস্ত্রীক আসিয়া ভগিনীপতি-হীন, ভগিনীর বাটীতে নিরঙ্কুশ ভাবে আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি ভগিনীর নিকট গোপন সংবাদ সকল অবগত হইয়া ভগিনীর সুবুদ্ধির প্রশংসা করিলেন : এবং অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, সেই গতায়ু বুদ্ধিহীন লোকটা তাঁহার বুদ্ধিমতী দিদির কথা শুনিয়া জীবনে একটি মাত্র বুদ্ধির কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ;—ঈশানীকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ঈশানী তত বড় ধনাঢ্যের পুত্রবধূ হইয়া কখনও এই সামান্য সম্পত্তি গ্রহণ করিতে আসিবে না ; তাঁহার বুদ্ধিমতী ভগিনীই তাহা আজীবন ভোগদখল করিতে পারিবেন ; অথচ তাঁহার দিদির অবর্ত্তমানে ঈশানী ব্যতীত মজুমদার মহাশয়ের অন্য কোনও উত্তরাধিকারী তাহা পাইবে না, অথবা পাইবার জন্য বিবাদ করিতে পারিবে না।

এই সদ্বিবেচক ভ্রাতার সৎপরামর্শ পাইয়া কিছুদিনের মধ্যেই প্রমদা ঈশানীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। এই পত্রে বুদ্ধিমতী প্রমদা গর্ভজাকে তাহার জনকের মৃত্যু সংবাদ দিয়া অকারণ শোকাকুলা করিলেন না। কেবল কৌশলে জানাইলেন যে, তাহার পিতা তাহাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে চাহিতেছেন ; সে যেন অবিলম্বে আসিয়া তাহা গ্রহণ করে।

যথাসময়ে এই পত্র শরৎকুমারের হস্তগত হইল। তাহা ঈশানীর পত্র হইলেও, সে তাহার চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী তাহা ঈশানীকে পড়িতে দিল না ; গোপনে পত্রের আবরণ খুলিয়া তাহা পাঠ করিল। পাঠ করিয়া সে মনে করিল, পত্নী যদি পিতার সম্পত্তি লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সে-ই প্রকৃত পক্ষে তাহার অধিকারী হইতে পারিবে ; কেন না সতী স্ত্রীর ধনে স্বামীর ন্যায্য অধিকার। অপদস্থ পিতার অর্থের এই অপ্রতুলতার সময় একটা মোটা রকম অর্থ সমাগমের প্রত্যাশায় তাহার অর্থলোলুপ বক্ষ মহোল্লাসে কাঁপিয়া উঠিল। এইবার অতি সত্বর শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য সে আপনিই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে আপনিই অসময়ে ঈশানীর নিকট ছুটিয়া যাইয়া বলিল, 'চল, এইবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বরিশাল যাই।'

বরিশাল যাওয়ার বিরোধী স্বামীর এই আকস্মিক মত পরিবর্ত্তনে এবং হঠাৎ বরিশাল যাওয়ার প্রস্তাবে ঈশানী অত্যন্ত সন্ত্রাসিতা হইয়া পড়িল ; একটা মহাবিপদের

আশঙ্কায় সে কাতর হইয়া কহিল, 'কেন, এত দিন পরে আজ হঠাৎ নিয়ে যেতে চাচ্ছ যে? কি হ'য়েছে, আমায় সত্যি কথা ব'ল। আমি এই ধড়ফড়ানি আর সহ্য করতে পারছিনে।'

প্রিয়া যতই অপ্রিয়া হউক না কেন, সে যদি অর্থের অধিকারিণী হইতে পারে, তাহা হইলে স্বামীগণ তাহাকেই প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন। অতএব শরৎকুমার যথার্থ প্রেমিকের ন্যায় ঈশানীর বাক্যের উত্তর প্রদান করিল। কহিল, 'আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, তোমার কোনও বিপদ হয়নি। বরিশাল থেকে কোনও চিঠি বা টেলিগ্রামই আসে নি। কিন্তু অনেক দিন হ'ল, আমার টেলিগ্রামের কোনও উত্তর পেলাম না। এদিকে একটা মিছে ভাবনায় তোমার ওই সুন্দর মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যাচ্ছে, দেখ্ছি। এতে কি আমি মনে এতটুকু সুখ পাই; বুকটার ভেতর কি করে, তা' আমিই জানি।'

মেঘের কোনে ঈষৎ রৌদ্র রেখার ন্যায়, ঈশানীর বিষাদপূর্ণ ম্লান মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। শরৎকুমার আদরে সেই হাসিমুখ চুম্বিত করিয়া, বলিয়া যাইতে লাগিল, 'তাই, মনে করেছি, তোমাকে একবার বাপের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সকলকার সঙ্গে দেখা শুনা করিয়ে নিয়ে আসি; তখন আবার তোমার এ শুষ্ক মুখে হাসি দেখে মনে সুখ পাব।'

ঈশানী ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'কবে যাবে?'

শরৎকুমার উৎসাহের সহিত বলিল, 'আজ এখনই গিয়ে, পরশুকার ষ্টীমারে ক্যাবিন রিজার্ভ করে আসব। তার পর দিন বিকাল বেলা বরিশাল পৌঁছিয়ে, তোমার মধুমাখা মুখে আবার হাসি দেখ্‌ব।'

ইহার তৃতীয় দিনে, আহারাদি করিয়া বেলা দশটার সময় ঈশানী স্বামীর সহিত বরিশালমুখী ষ্টীমারে আরোহণ করিল; এবং তাহার পর দিন দিবা অবসান কালে কতকটা হর্ষ এবং কতকটা উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে বরিশাল পৌঁছিল। কিন্তু বাটীতে পৌঁছিয়া পিতৃহীনা কল্যাণীর অশ্রুজল এবং বিধবা জননীর হাহাকার ধ্বনির মধ্যে যে সংবাদ শুনিল, তাহাতে ঈশানীর হাসিমুখ দেখিবার, শরৎকুমারের আর কোনও আশাই রহিল না।

তখন শরৎকুমার অন্যা যুবতীর হাসি মুখ দেখিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

একমিনিট

কারণ নির্দ্দেশঃ—

"গাছের ওপর কে রে?"

"আজ্ঞে, আমি।"

"কে বাবা তুমি? দিব্যি জামা গায়ে দিয়েছ ত দেখছি, এ কি ভদ্রলোকের ছেলের ডাকাতী করা দেখে নাকি? না, জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় পথ ভুলে গাছের ওপর উঠেছ? আচ্ছা দাঁড়াও, শ্বশুরবাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি!"

(গাছের উপর হইতে, রাগত ভাবে) কেন মিছামিছি চোর অপবাদ দেন মশাই? আমি কি বলছি, পথভুলে গাছে উঠেছি?"

"তবে কি করতে গাছের ওপর শুভাগমন হয়েছে শুনি? সরকারের পেয়াদা হয়ে, গাছের আমগুলো গুণতে আসা হয়েছে নাকি?"

"আজ্ঞে না,—এরোপ্লেনে যেতে যেতে, এই গাছের ওপর পড়ে গেছি।"

———

অন্ধের কাহিনী

(গল্প)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

আমি একটী অন্ধ।

হাঁ, আমি জন্মান্ধ কিন্তু এইটুকু বললেই কি আমার সকল কথা বলা শেষ হয়ে গেল? এই অন্ধের জীবনের মধ্যে কি কোনও ঘটনা ঘটে থাকতে পারে না? ওগো চক্ষুষ্মাণ, তা নয়, তোমরা ও তোমাদের জীবনে যেমন ঘাত প্রতিঘাত চলে থাকে, অন্ধের জীবনেও সেইরূপ ঘাত প্রতিঘাত চলেছে।

আমি পথের ভিখারী। কোথায় ভিক্ষা করি তা তোমরা জানো কি? তোমাদেরই কাছে কতদিন হাত পেতেছি, কাতর কণ্ঠে ডেকেছি—ওগো, আমায় চারটী ভিক্ষা দিয়ে যাও। তোমরা আমার চেয়ে অনেক উচ্চে তোমাদের অবস্থা ভাল তা বুঝতে পারি তোমাদের পায়ের জুতোর মস মস্ শব্দে, তোমাদের হাসিতে তোমাদের গল্পে, তোমরা অবশ্যই আমায় যৎসামান্য কিছু দানও করে যেতে পারো; কিন্তু ভগবান সে দয়াটুকু কি তোমাদের দিয়াছেন? শুনি—দয়া মায়া সকলেরই বুকে আছে, তবে তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন? বুঝেছি তোমরা স্বেচ্ছায় সে দয়া গুণটীকে গুলিয়ে ফেলেছ, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছ, নইলে এই অন্ধকে, এই দীন ভিখারীকে কি সাহায্য করতে পারতে না?

আমি দৈনিক ভিক্ষা করে যা উপার্জ্জন করব, পরিমাণ যদি কম হয় প্রতিপালক আমার সেদিন আহার বন্ধ করে দেবে। অন্ধের ক্ষুধাশক্তি তো কমে না, দৃষ্টি নেই—তার সঙ্গে যদি ক্ষুধাটাও না থাকত—আঃ, তা হলে কি আজ পথের ধারে এমনি করে বসে এমনি করে ডেকে বলি—ওগো—সামান্য কিছু দাও গো, সামান্য কিছু দাও।

মানুষ হয়ে জন্মেছ, মানুষের ব্যথা একটু বোঝনা? যে ভিক্ষা করতে তোমার দুয়ারে আসে সে যে কতখানি নিজের হীনতা স্বীকার করে তা কি জানো? যদি কারও নিজের খাওয়ার সামর্থ থাকে, স্বেচ্ছায় সে কি হাত পাততে যায়? তোমার এত রয়েছে, তুমি এ রকম হীনতা স্বীকার করতে কখনও পারো কি? তবে বিবেচনা কর যে নিতে আসে সে কতটা হীনতা স্বীকার করে, তার হীনতায় তার দীনতা স্বীকার করে তোমার কি কিছু দান করা উচিত নয়?

হায়রে মানুষ, তা তুমি বোঝ কই? যদি তা বুঝতে তবে কি আমি দিন শেষে এক একদিন খালি হাতে ফিরে যাই, প্রহারে আমার পিঠ জর্জ্জড়িত হয়, আমার প্রবল ক্ষুধা সয়ে না-খেয়ে থাকতে হয়?

কারও কাছে যে পাই নি, কেউ যে আমার ব্যথা যথার্থ ভাবে বুক দিয়ে অনুভব করেনি এ কথাটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। হাঁ, পেয়েছিলুম একদিন একজনের কাছ হতে, সেই কথাটাই আজ বলব।

সে একটি মেয়ে, ছোট মেয়ে। কত বয়স হবে তার ঠিক বলতে পারি নে, তবে তার ছোট মুখখানার পরে একদিন হাত বুলিয়ে দেখেছিলাম বছর আট নয় বোধ হয় বয়স হবে। সে কেমন দেখতে, কাল কি সুন্দর তা জানিনে কিন্তু তার অন্তরের যে পরিচয় পেয়েছিলুম সে অন্তর তোমাদের সাধারণ মানুষ হতে একেবারে ভিন্ন, সে যে কি উপাদানে তৈরী তা আমি আজও ঠিক করে বলতে পারিনে।

এই খানেই এই ফুটপাথের ধারে আমার প্রতিপালক আমায় বসিয়ে দিয়ে গেছে; রোদ নেই, বৃষ্টি নেই আমায় এই খানে বসে থাকতে হবে। অন্ধ আমি—একা কোথাও যাওয়ার শক্তি নেই, কাজেই সে যতক্ষণ আবার না আসে ততক্ষণ আমায় বসে থাকতে হয়।

ভগবান কি পাপে আমায় এ শাস্তি দিয়েছিলেন তা আমি জানি নে। বাপ মা, ভাই বোন, এদের নাম

শুনেছি মাত্র, কখনও এদের অস্তিত্ব আমি অনুভব করি নি। আমি এই সতের আঠার বছর এই প্রতিপালকের কাছেই রয়েছি, এমনি করে তাকে উপার্জ্জন করে খাওয়াচ্ছি। জানিনে আরও কতকাল আমায় বাঁচতে হবে, আরও কতকাল এ যন্ত্রণা সইতে হবে?

আমারই পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে, আমি আগাগোড়া এক সমান সুরে যেমন চাচ্ছিলুম ভিক্ষা দাওগো, সামান্য কিছু দিয়ে যাও, তেমনিই সুরে বলে যাচ্ছিলুম। তার কানে আমার কথাটা গেল, খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আমার কাছে এলো।

কে মোটা গলায় ডাকলে—"মীরা যাচ্ছিস কোথা?"

মেয়েটী করুণ সুরে বললে "একটু দাঁড়াও না বাবা, এই কাণা লোকটা"—তার বাপ রুক্ষভাবে বলে উঠলেন—"নাঃ, তোর জালায় আর পারা যায় না মীরা, এমনি করে কে কোথায় কাণা খোঁড়া পড়ে আছে কেবল তাই খুঁজে বেড়াবি। তোকে নিয়ে পথ চলাই আমার দায় হয়ে উঠল দেখছি।"

"একটু দাঁড়াও বাবা, আমি এক্ষুনি আসছি।"

এবার আমার খুব কাছেই এসে দাঁড়াল সে, তার গায়ের বাতাস আমার গায়ে লাগল, করুণাময়ীর গায়ের সেই বাতাস টুকু আমার প্রাণে যেন অপরিসীম শান্তিধারা ঢেলে দিলে।

"ওগো, হাতখানা পাত তোমার, ভিক্ষা দিচ্ছি এই নাও। দেখি মুখখানা তোল তো একবার, দেখি তোমার চোখ দুটো।"

কি করুণতা মাখানো তার সুরে! কই,কেউ তো একদিনও আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলে নি। পথ দিয়ে এত ছেলে মেয়ে যায়, কদাচিৎ কেউ আমার দিকে চায় যদি, সে কেবল বিদ্রূপ করবার জন্যেই, অনেকের হাতের ছোড়া ঢিলও আমি কতদিন উপহার পেয়েছি।

আমি মুখ উঁচু করলুম, কিন্তু কোনদিকে আছে সে? কাণ উঁচু করলুম তার শব্দ শুনে সেই দিকে ফিরব।

মেয়েটী কোমল সুরে বললে "থাক, দেখেছি। আহা তুমি একেবারেই অন্ধ যে গো; চোখে বুঝি কখনই দেখতে পাওনি?—আহা, তবে তো বড় কষ্ট তোমার? আচ্ছা! তোমার মা বাপ কেউ নেই বুঝি! ভাই বোন—?, ওঃ, কেউ নেই! তবে—আচ্ছা, নাও হাতখানা পাত তো।"

হাত পাতলুম, সে আমার হাতের'পরে একটা কি ফেললে, বোধ হয় ডবল পয়সা—সেই রকম আকার।

"ওটা আগে তোমার আঁচলের একটা কোনে বেঁধে ফেল, পথে যে জুয়াচোর বদমাইস, তুমি তো কাণা মানুষ, তোমার হাত হতে নিতে ওদের একটুও কষ্ট হবে না। আচ্ছা, থাকো তবে, আমি চললুম।"

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, আমি যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ কাণ পেতে রইলুম।

কে এ ছোট মেয়েটী? কি সুন্দর কথা তার! কি দয়া তার ছোট্ট বুকখানিতে! ভাবতে ভাবতে ডবল পয়সাটা একবার আঙুলের 'পরে রেখে ঠোকা দিতেই সেটা ঠুন ঠুন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকখানাও দুলে উঠল। এতো পয়সা নয়, এ যে টাকার শব্দ! মেয়েটী কি আমায় টাকা দিয়ে গেল? অন্ধকে দয়া করে কে? করুণাময়ী—তুমি—

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, আমি সন্তর্পণে দয়াময়ীর-দান টাকাটা কাপড়ের এককোনে বাঁধলুম।

(২)

তারপর কয়টা দিন চলে গেল, তার আর দেখা পাই নি। প্রত্যেক দিনেই বড় আশা বুকে নিয়ে গিয়ে বসতুম আজ নিশ্চয়ই সে আসবে, কিন্তু হায়, সন্ধ্যায় আমাকে শুষ্ক হৃদয় নিয়েই ফিরতে হতো।

নিজের পরে নিজের রাগ হতো, মেয়েটীর পরে অভিমান হতো, আবার হাসতুম—হায়রে,, অন্যায় দাবী নয়? কে সে আমার? একদিন দৈবাৎ পথ দিয়ে যেতে দরিদ্র অন্ধকে দেখে ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে টাকাটা দিয়ে গেছে, তাই বলে সে যে প্রত্যহই আসবে এমন কোনও কথা নেই।

তবু আশা ছাড়তে পারতুম না। আমার অন্তর হতে কে চেঁচিয়ে বলে উঠত—আসবে, সে আসবে। তা'কে আবার এই পথে আসতেই হবে। আমার চক্ষু তাকে দেখতে পাবে না সত্য, কান তো ভগবান বধির করেন নি, কান দিয়ে তার কথা আমি শুনতে পাব।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছিল—সে এল না,আমি তার কথাও

শুনতে পেলুম না। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটুতে লাগল—হয় তো অন্ধকে টাকা দিয়ে যাওয়ার অপরাধে সে তিরস্কার ভোগ করেছে, তাই হয় তো সে আর এ পথে আসে না।

ভগবান, তার সকল ব্যথায় সান্ত্বনা দিয়ো প্রভু, তাকে ভাল বেসো।

সে দিন আকাশ বোধহয় মেঘে ছাওয়া। বাদল বাতাস সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। অন্নদাতা আজও সকালে নিত্যকার মত আমায় ফুটপাথের ধারে বসিয়ে দিয়ে গেছে। ঝড়ই হোক আর আকাশ ভেঙ্গে চুরে ধরার বুকে নেমেই আসুক, তার এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম কোন দিন হয় নি। ঝড়ের গর্জ্জন ডুবিয়ে চেঁচাতে হবে—জয় হোক বাবা, কাণাকে দুটো ভিক্ষে দিয়ে যাও। বৃষ্টির ঝর ঝর ঝরে পড়ার শব্দের উপরে তার কণ্ঠস্বরকে তুলতে হবে—দাতার জয় হোক দুটো ভিক্ষে দাও।

হায়রে, ভাবি তাই, ভগবান সব দিয়ে মানুষের সার দুটি চক্ষুকে কেড়ে নিয়েছেন কেন? হাত পা নাক কান যা হোক কিছু নেন নি কেন, চোখ দুটি কেন নিলেন? আমার হাত পা যা হোক একটা কিছু গিয়ে যদি চোখ দুটি থাকত আমি জগৎ দেখতে পেতুম, আলো অন্ধকারের যাওয়া আসা জানতে পারতুম। উঃ আছড়ে পড়ে এক একবার কাঁদতে ইচ্ছে হতো।

আজ সেই টিপটিপ্ বৃষ্টির মধ্যেও পথের ধারে বসে ছিলুম আমি। অন্যদিন আমার মত অনেকের কথা শুনতে পেতুম—জয় হোক বাবা, কাণাকে একটা পয়সা দিয়ে যাও, আজ কারও কথা কাণে আসছিল না। বুঝলুম কেউই আসে নি, আজ আমিই মাত্র একা ভিখারী পথে বার হয়েছি।

(৪)

পথে আজ লোক চলাচল খুব কম ছিল। আমি সেই পথের ধারে বৃষ্টিতে ভিজে মাঝে মাঝে চেঁচাতে লাগলুম "একটা পয়সা দাও বাবা, তোমাদের জয় হোক বাবা!"

দুজন লোক সুমুখ দিয়ে চলে গেল, একজনের কথা আমার কানে এল—"দেখেছ মানুষের কপাল! এই বৃষ্টি মাথায় করে পথের ধারে কাণাটা বসে ভিক্ষে চাইছে।"

আর একজন বলছিল "এসব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল। ছেলেটা জন্মান্ধ, গত জন্মের পাপে এর এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। পূর্ব্ব জন্মকে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সামনেই তার - "

বলতে বলতে তারা দূরে চলে গেল, আর তাদের কথা আমার কানে এল না।

পূর্ব্বজন্মের পাপে—হা ভগবান, পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলুম প্রভু, একবার তা কি কেউ আমায় বলে দেবে না? না জানি সে কি মহাপাপ গো, যার ফলে অমূল্য রত্ন চোখ দুটী আমার নেই। অন্ধকে সান্ত্বনা দিতে একটী ভাই বোন, স্নেহময়ী মাকেও যদি রাখতে প্রভু।

আমার অন্ধচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

"হ্যাগো, তুমি কাঁদছো কেন?"

এযে সেই কণ্ঠস্বর। একদিন যার কথা আমার কানে এসেছিল, আমার বড় জ্বালায় বড় সান্ত্বনা দিয়েছিল। কেরে, কে তুই ছোট্ট মেয়েটী, কোথা হতে নেমে এসেছিলি তুই, আমার বুকের ক্ষততে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে?...

সে আমার পাশে বসল, অচিরে আমার সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়ে গেল।

সে জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাগো, এই বৃষ্টির দিনে তুমি পথের ধারে বসেছ কেন? তোমার কি কেউ নেই,—ভাই বোন, বাপ মা - ?"

আমি মাথা নেড়ে চোখ মুছে বললুম "কেউ নেই।"

"কেউ নেই, আহা, তবে তো বড় কষ্ট তোমার। তুমি কোথায় থাকো?"

চোখের জল মুছতে মুছতে বললুম "একটা নিষ্ঠুর লোকের কাছে থাকি খুকী।"

"সে তোমায় আদর করে, ভালবাসে?"

আমি হাসলুম, এত কষ্টেও আমার হাসি এলো। "আদর করবে, ভালবাসবে? এই দেখ তার আদর ভালবাসার দাগ খুকী—।"

আমি কালকের মারের দাগ দেখালুম। সে চমকে

উঠল, করুণস্বরে বললে "উঃ, এমনি করে তোমায় মেরেছে? তোমায় মেরেছে কেন?"

আমি উত্তর দিলুম "পয়সা না নিয়ে গেলেই মারে।"

"আজ এই বর্ষার দিনে পথের লোকে যদি কিছু না দেয়, এদের এই না দেওয়ার শাস্তি তোমায় ভোগ করতে হবে?"

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললুম "হবে বৈ কি!"

সে চুপ করে রইল; বুঝি বুকে খুব আঘাত পেলে তাই।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সে বললে "আজ কেউ তো এদিকে ফিরেও চাইছে না অন্ধ, আজ তোমায় মার খেতে হবে?"

"তা হবে বৈ কি।"

"আচ্ছা, যাতে তোমার মার না খেতে হয় তার উপায় করা যায় তো! আমার গলার এই হারছড়া নিয়ে গিয়ে তাকে দাও গে, তা'হলে তোমায় বোধ হয় কিছুদিন আর ভিক্ষে করতে হবে না, মারও খেতে হবে না।"

আমি শিউরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের পরে তার হাত পড়ল, হাতে ঠেকল একছড়া ছোট হার—যা তার গলায় শোভা পেয়েছিল। আমি আর্ত্তভাবে বলে উঠলুম "না খুকি, আমি হার চাই নে। তোমার হার তুমি নিয়ে যাও।"

সে মিষ্টস্বরে বললে "না নিলে আজ তোমায় মার খেতে হবে যে।"

আমার অন্ধ নয়ন দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়তে লাগল, আত্মবিস্মৃত আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারলুম না। জ্ঞান পেয়ে যখন ডাকলুম—খুকি—তখন সে চলে গেছে।

হার নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়লুম। যতবার মনে হতে লাগল, পাছে আমি মার খাই সেই ভয়ে—এই দুর্ভাগা অন্ধকে রক্ষা করবার জন্যে সেই ছোট মেয়েটী নিজের গলার হার খুলে দিয়ে গেল ততবার আমার বুক চিরে কান্না ঠেলে আসতে লাগল। মনে হতে লাগল হয় তো বাড়ীতে তাকে কত নির্য্যাতন সইতে হচ্ছে, কত লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে।

হায় রে, সে আমার সব পরিচয় একে একে নিয়ে গেল, আমি তার একটী পরিচয়ও নেই নি। দূরশ্রুত তার যে মীরা নামটী আমার কাণে এসেছিল সেই নামটী নিয়েই আমি তন্ময় হয়ে থাকতুম। কোথায় তাদের বাড়ী, তার আর কে কে আছে, তার বাপের নাম কি—কিছু শুনি নি।

এ হার আমি কাউকে দেব না। সে আসবে, হয়তো কালই আমি তার দেখা পাব, তখন তাকে আমি এ হার ফিরিয়ে দেব। অন্ধ তার কাছ হতে যা পেয়েছে তাই তার বড় দুঃখে সান্ত্বনা।

বুকের মধ্যে হার লুকিয়ে রাখলুম। অদৃষ্টক্রমে সেদিন আর কিছু ভিক্ষা মিলিল না। প্রহার সহ্য করতে হ'ল, সেদিন আহার্য্য পেলুম না, সব কষ্ট সহ্য কললুম—হারের কথা বলতে পারলুম না।

(৩)

দিন চলে গেল, রাত গেল আবার দিন এল গেল, হায় রে, সে মেয়েটী এল না।

সকালে অনেক আশা নিয়ে সেই জায়গাটীতে গিয়ে বসতুম। বুকে হাত বুলিয়ে দেখতুম হার আছে কি না। আছে দেখে নিশ্চিন্ত হতুম, কিন্তু হারের অধিকারিণীর দেখা আমি পেলুম না।

কয়দিন খুব জ্বর হ'ল। সে জ্বরে আমার মোটে জ্ঞান ছিল না অচেতনাবস্থায় কয়দিন কাটিয়ে যেদিন জ্ঞান হ'ল সেদিন আগেই বুকে হাত দিলুম—হায় রে, সে হার কই? আমার অচেতনাবস্থায় কে সে হার আমার বুক হতে নিয়েছে।

কি মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণাই আমি সহ্য করতে লাগলুম। একবার বিকট চীৎকার করেও উঠেছিলুম তারপর বিছানার পরে লুটিয়ে পড়লুম আহত জন্তুগুলো যেমন লুটিয়ে পড়ে ছটফট করে ঠিক তেমনি ভাবে। কেউ আমার ব্যথা বুঝলে না, কেউ আমার পানে চাইলে না, সংসার যেমন চলত তেমনিই চলল আমার পরে নির্য্যাতন কমে গেল এইটুকু যা পার্থক্য।

যখন চলবার সামর্থ হ'ল—একদিন ঘুম ভাঙ্গলে কাউকে কিছু না বলে লাঠিটা নিয়ে ঘরের বার হয়ে পড়লুম। বরাবর একটা স্থানে যাওয়া আসা করে সেই পথ ও স্থানটা আমার জানাশোনা হয়ে গেছল। আমি নিজেই নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে পড়লুম।

আজ আর ভিক্ষা চাইবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না,

আমার কণ্ঠ আজ এড়িয়ে আসছিল। আমি কাণ উঁচু করে বসেছিলুম তার সে সুর ভেসে আসছে কি না।

"বাবু—এই সেই অন্ধ—"

আমার খুব কাছেই কে কাকে ডেকে এই কথা বললে। আমার বুকখানা থর থর করে কেঁপে উঠল। নিজের জন্যে নয়, অজানিতা সেই ছোট মেয়েটীর জন্যে। সে যে তার গলার হার দিয়ে নিজেকে বড় বিপন্না করে ফেলেছে।

"অন্ধ—"

বেশ বুঝতে পারলুম এঁর এই সুরই একদিন আমার কাণে এসেছিল যেদিন প্রথম আমি করুণাময়ী সেই মেয়েটীর দয়া পাই। ইনিই তাকে মীরা বলে ডেকে তার নামটা আমায় জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার গলা কাঁপছিল ত; উত্তর দিলুম—"বাবু—"

তিনি আমার সামনে দাঁড়ালেন, বেশ বুঝলুম তিনি আমার পানে তাকিয়ে আছেন।

"সত্যি কথা বলো বাবা, মিথ্যে কথা বলো না। আমি যা বলছি তার উত্তর দাও।

অতি কোমল তাঁর সুর, আমার মনে হ'ল যেন অশ্রুজলে তাঁর কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে গেছে।

আমি রুদ্ধকণ্ঠে বললুম "সত্যি কথা বলব বাবা, আপনি যা জিজ্ঞাসা করবেন বলুন।"

তিনি বললেন "মীরা—আমার একটী ছোট মেয়ে তোমায় কি একছড়া হার দান কর্ত্তে গেছল? আমি নেবনা, নিতে চাইব না, তোমায় শুধু জিজ্ঞাসা করছি—তুমি উত্তর দাও।"

আমার বুকটা অসহ্য যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে পড়তে চাচ্ছিল। আমি বললুম—"হঁ্যা—তিনি—তিনি—"

"হঁ্যা, সে তোমায় দিয়ে গেছে। তোমার ভয় নেই অন্ধ, তুমি কেঁপ না। সে স্বেচ্ছায় যা দান করে গেছে আমি তার বাপ হয়ে ফিরিয়ে নেব না। মা আমার পাছে আমি খোঁজ করি তাই আমার তিরস্কার লাঞ্ছনা ও সয়ে গেল। তুমি জানো না অন্ধ—তোমায় সে যে হার দিয়ে গেছে তা বহুমূল্য জহরত দিয়ে তৈরী। মাতৃহীনা একটী মাত্র মেয়েকে আমি ভাল জিনিস দিয়ে সাজাচ্ছিলুম; স্বর্গের দেবী সে,—এ সবে তাকে এতটুকু তৃপ্তি দিতে পারে নি। আমি তাকে সাজিয়ে পেছন ফিরলে আর তার গায়ে কিছু দেখতে পাই নি, সে দরিদ্রদের তা বিলিয়ে দিত। শুধু তোমায় নয়—নয় বছরের মেয়েটী আমার তার ক্ষুদ্র জীবন কালের মধ্যে অনেককে অনেক দান করে গেছে। আমার মা—আমার মীরা, সে আর নেই। সে ফুল মর্ত্তের নয় অন্ধ, সে তার মায়ের কাছে চলে গেছে।"

—আহা হা; সে নাই—সে নাই গো। আমি আর শুনতে পারি নি, দুই হাত কাণে দিতে দিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলুম। কখন জ্ঞান হ'ল জানি নে, তখন আমার প্রতিপালক সদয় চিত্তে আমায় বাড়ী এনে সেবা করছেন।

* * * *

তারপর—

তারপর আবার ভিক্ষা করি। সেই জায়গাটীতে আবার প্রত্যহ গিয়ে বসি, আবার কাতরকণ্ঠে ডাকি—"দাতা দয়াবান গো - দুটো পয়সা।

হায় রে, শুধু কি পয়সাই চাই? তোমরা কি এতটুকু স্নেহ দিতে পারবে না, দুটো কথা বলতে পারবে না? যে এসেছিল আমার কাছে যার কথা শুনে আমার ব্যথিত বুকখানা জুড়িয়ে গিয়েছিল সে চলে গেছে। অভাগা আমি—কারও স্নেহ যে আমার সহ্য হয় না।

হায় ভগবান, আমার এ কর্ম্মভোগ শেষ হবে কবে গো, একবার তা বলে যাও। আর যে পারি নে প্রভু, কম্পিত চরণ আর যে বইতে পারে না এ দেহভার; আমার এ জীবন শেষ করে দাও গো—শেষ করে দাও।

———

বুদ্ধদেব—শব সন্দর্শনে
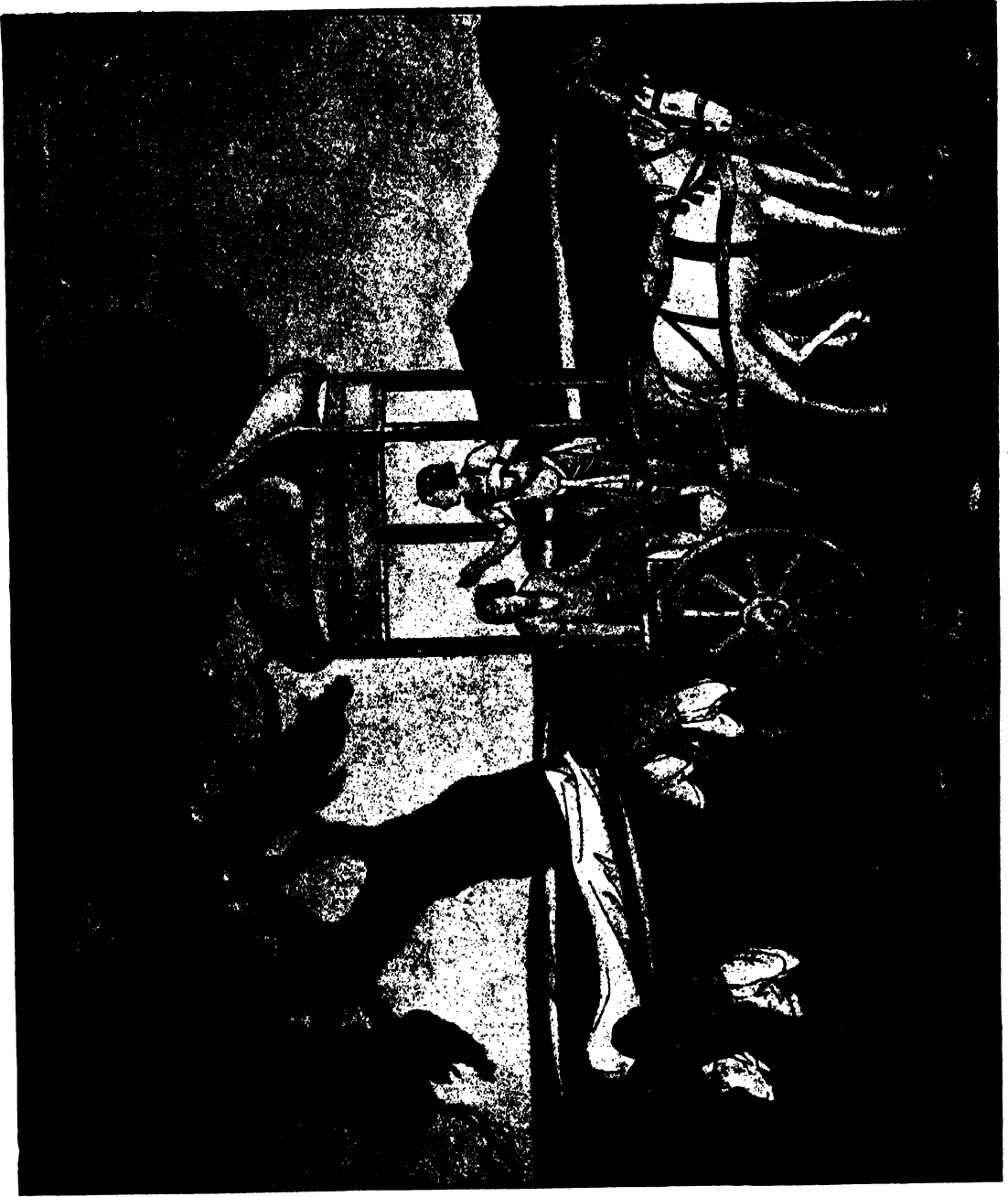
দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]   ৭ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩১।   ১৯শ সপ্তাহ

জাহাজের উপর খেলা

জাহাজ টেনিস্—এই টেনিস খেলায় কোন বল কিম্বা র‍্যাকেট্ থাকে না। একটী লোহার চাক্‌তি লইয়া খালি হাতে লোফালুফি করিয়া এই খেলা চলিয়া থাকে।

আজকাল যাত্রী জাহাজের ভিতর যাত্রীদের সুবিধার জন্ম নানারকম খেলার সরঞ্জাম রাখা হয়। যাত্রীগণ দীর্ঘ পর্য্যটনকাল যাহাতে নানা ক্রীড়া কৌতুকে আনন্দে কাটাইতে পারেন জাহাজ পরিচালকগণ সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বহুবিধ খেলা ও ব্যায়াম করিবার বন্দোবস্ত জাহাজে করিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রের উপর দিয়া দিনের পর রাত, রাতের পর দিন জাহাজ কেবল একটানা অবিরাম গতিতে চলিয়াছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—চারিদিকে সীমান্ত বিস্তৃত অসীম
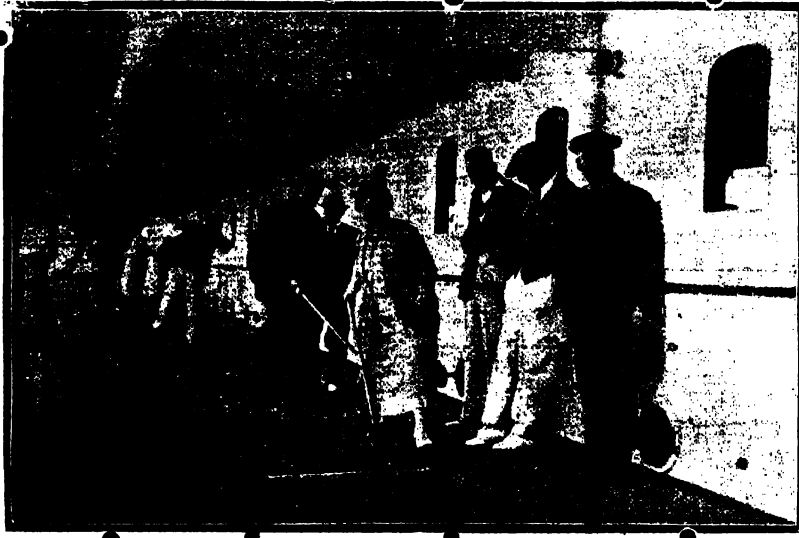
সাফল্ বোর্ড—একটী লোহার চাকৃতি আছে, তাহাকে জাহাজের ডেকের উপর দিয়া ঠেলিয়া ত্রিশ ফিট দূরে দূরে দাগ কাটা চৌকোশ ঘর রহিয়াছে—তাহার ভিতরে লইয়া যাওয়াই এই খেলার উদ্দেশ্য। যাহারা খুব বেশী পরিশ্রম করিতে পারে না, বিশেষ করিয়া মেয়েদের জন্মই এই খেলার সৃষ্টি হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট চৌকোশ ঘরে যে এই লোহার চাকৃতি একবারের চেষ্টায় লইয়া যাইতে না পারে তাহাকে জরিমানা দিতে হয়।

জলরাশি ভিন্ন চোখে আর কিছু দেখাও যায় না। এই এক-ঘেয়ে ভাবটা সকলের কাছেই একেবারে অসহ্য বোধ হয়। তাই দৈনন্দিক জীবনের ভিতরে কিছু বৈচিত্র্য আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজে আজকাল নানাবিধ ক্রীড়া ও ব্যায়ামের সরঞ্জাম রাখিয়া যাত্রীদের একঘেয়ে জীবনে একটু আনন্দ সঞ্চারের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে
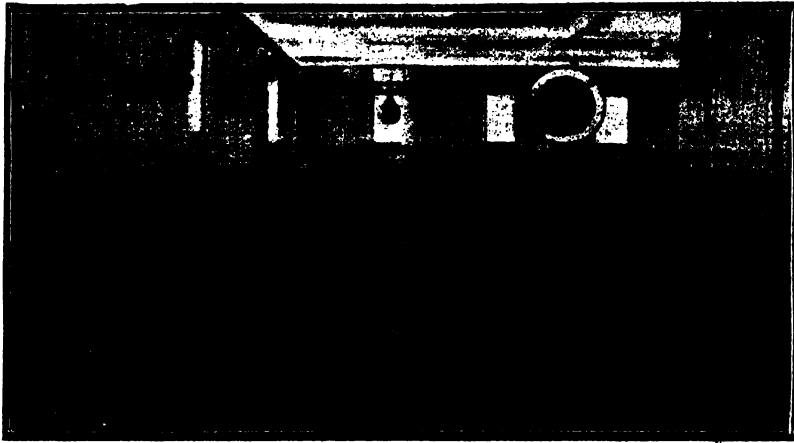
খেলার ঘর—এখানে নৌকা চালাইবার জন্য কৃত্রিম দাঁড়, ডাম্বেল, বাইসাইকেল প্রভৃতি যন্ত্রাদি রহিয়াছে। বসিয়া বসিয়া যত খুসী দাঁড় টান, সাইকেল চালাও আপত্তি নাই কিন্তু তুমি এক পা-ও আগাইতে পারিবে না, তোমার লাভের মধ্যে শুধু মাথার ঘাম পায়ে ফেলাই সার !

পুরুষ, দুর্ব্বল সবল—সকলের উপযোগী খেলার আয়োজনই এখানে পাওয়া যায়। যাহারা ঘরে বসিয়া চুপচাপ খেলা করিতে চায় তাহাদের জন্য তাস পাশা দাবার আয়োজন রহিয়াছে; যাহারা হাঁটাহাঁটি ছুটাছুটি করিতে ভালবাসে তাহাদের জন্য ঠিক তাহাদেরই উপযোগী খেলারও অভাব নাই; আবার যাহারা পালোয়ানী কসরৎ করিতে ভালবাসে,

বুল বোর্ড—একটি বোর্ডে ঘর কাটিয়া ১০, ২০, ৩০ এইভাবে একশ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘরে লিখিয়া রাখা হইয়াছে। দূর হইতে একটি চাকৃতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে ফেলিতে হইবে। দশ হইতে প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে। ভুল করিয়া অন্য কোন ঘরে চাকৃতি পড়িলেই শাস্তি—জরিমানা দিতে হয়।

তাহাদের জন্য খেলার ঘরে ডাম্বেল, মুগুর রহিয়াছে, টেনিস্ ব্যাডমিণ্টন, বক্সীং খেলিবারও নির্দ্দিষ্ট জায়গা রহিয়াছে, এমন কি একটা ঘরে কৃত্রিম ভাবে নৌকার দাঁড় বাহিবার এবং ঘোড়া হাঁকাইবারও বন্দোবস্ত রহিয়াছে! শুধু তাই নয়—পাশ্চাত্যজাতি যে আজকাল ঘোড়দৌড়ের কতটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে তাহারই প্রমাণ স্বরূপ যাত্রী
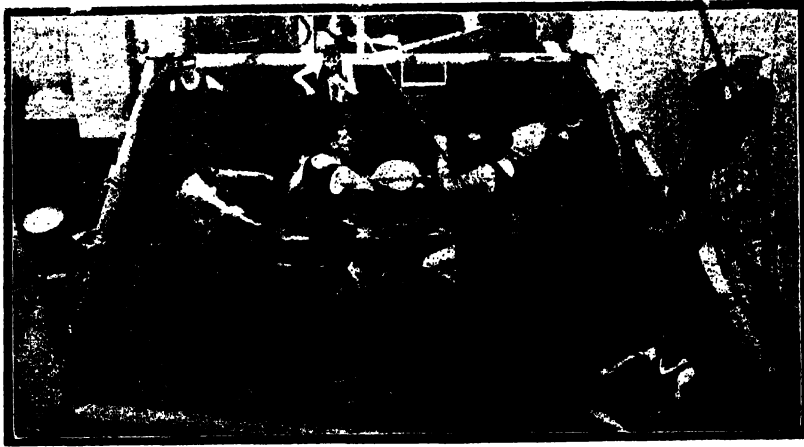
বক্সীং খেলা—

জাহাজের ভিতরে একটা পুকুরের মত আছে। জলের উপর দিয়া পুকুরের এপারে ওপারে একটা মোটা কাঠ রহিয়াছে—তাহার উপরে বক্সীং খেলা হইতেছে। ঘুসীর চোটে যে ব্যালান্স ঠিক রাখিতে পারে না সেই ঝুপ ঝাপ করিয়া জলে পড়িয়া যায়। এ খেলাটা ভারি মজার সন্দেহ নাই—কিন্তু খেলোয়াড়কে শুধু পালোয়ান হইলেই এখানে চলিবে না, তাহাকে রীতিমত সাঁতারও জানিয়া তবে এ খেলায় যোগদান করিতে হইবে!

জাহাজের ভিতরেও আজ কৃত্রিম ঘোড়দৌড়ের আয়োজন রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই ঘোড়দৌড়ের মাঠে—অবশ্য জাহাজের ভিতরেই—ছয়টী ছোট্ট কৃত্রিম ঘোড়া ছয়জন কৃত্রিম ঘোড়সওয়ারকে পিঠে লইয়া ছুটিতে থাকে।
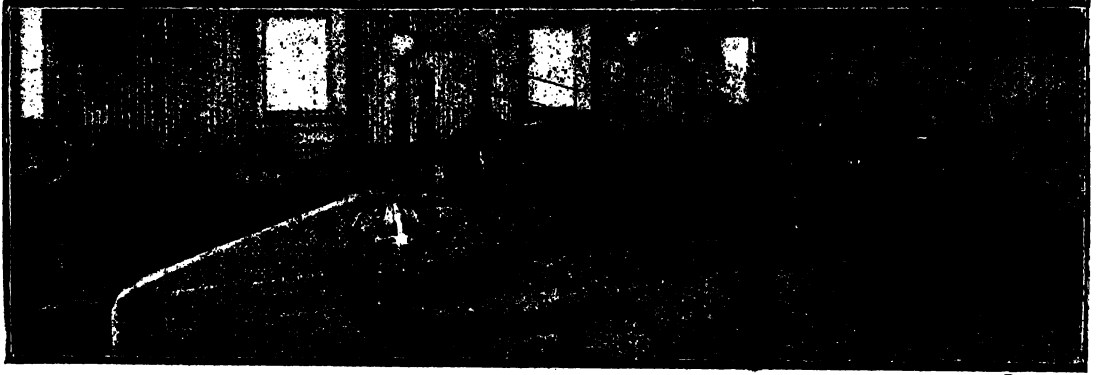
খেলার ঘরে কৃত্রিম ঘোড়া-যন্ত্র—এই যন্ত্রের পীঠে চড়িয়া ঘোড়া দৌড়াইবার সখ মিটান হয়!

জাহাজের ভিতর ঘোড়-দৌড় খেলা হইতেছে। খেলার মাঠের চারিদিকে দড়ি বাঁধা রহিয়াছে। যাত্রী-দর্শকগণ সেই দড়ি ধরিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া এই জুয়া খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

চোর

(গল্প)

[শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এ]

বাঁশ বনে ঘেরা ছোট্ট গৃহখানির মায়া ত্যাগ করিয়া দিনু সর্দ্দারের পুত্র কানু একেবারে কানাই বাবু হইয়া মিস্ত্রী পুকুরে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া বসিল। দিনুর ইচ্ছা ছিল যে কানু একটু লেখাপড়া শিখিয়া জমিদারের অত্যাচারের বিপক্ষে নিজের স্বত্ব বজায় রাখিয়া গ্রামের মধ্যে দশজনের একজন হয়; সুতরাং কানুর দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতে নিজের দুর্ব্বলতাকে চাপিয়া রাখিয়া দশজনের উপদেশ বাণী উপেক্ষা করিয়া মাতৃহীন কানুকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল। পাঠশালার গুরু মহাশয়ের ফরমাস খাটিয়া, কাঁচা কঞ্চির বেত বেমালুম হজম করিয়া কানু আপার প্রাইমারী পাশ করিল। দিনুর সংকল্প ছিল সে তাহাকে মাইনর পাশ করাইবে, কিন্তু তাহার মাতুল দিনুকে বেশ বুঝাইয়া দিল যে হাতের কাজের মত পয়সা আর কিছুতেই নেই; সুতরাং কানু মিস্ত্রী মাতুলের সহিত ছুতরের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ছুতরের কাজ তাহার ভাল লাগিল না, সে ইহা পরিত্যাগ করিয়া ইলেক্‌ট্রিকের কাজে মন দিল। বৎসর খানেক কঠোর পরিশ্রমের পর সে ইলেক্‌ট্রিক কাজে বেশ পাকা হইয়া গেল এবং ২৫৲ টাকা বেতন লইয়া একটী কারখানায় প্রবেশ করিল।

ইতিমধ্যে দিনুর কাল হইল। কানাইয়ের দূর সম্পর্কীয়া এক মাসী ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না; সুতরাং কানু মাসীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল ও মিস্ত্রী পুকুরে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিল।

সেদিন শনিবার। কারখানা হইতে কানাই একটু সকালে ফিরিল। তাহার কর্ম্মক্লান্ত দেহটীকে সজীব করিয়া তুলিবার জন্য সকল দুঃখহরা কলিকাটীতে অগ্নি সংযোগ করিতেছিল, তাহার মাসী রোয়াকে বসিয়া একরাশ তেঁতুল লইয়া বঁটি দিয়া কাটিতেছিল।

অগ্নিতে ফুঁ দিবার সময় সহসা একটী ফুলকি উড়িয়া কানাইয়ের ধোপ দেওয়া কাপড় খানির উপর পড়িল। কানাই কলিকাটী মাটীতে রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড় ঝাড়িয়া যেখানে আগুনের ফুলকি পড়িয়াছিল সেই স্থানটী পরীক্ষা করিয়া বলিল "আরে যাঃ এক খাব্‌লা পুড়ে গেল!" মাসী বঁটী হইতে হাত নামাইয়া ফিরিয়া বলিল, "কিরে, নতুন কাপড়টা গেল?"

"হুঁ, একটুখানি," বলিয়া কানাই নিজকর্ম্মে মন দিল। মাসীও ঝুড়ি হইতে একটী তেঁতুল তুলিয়া লইয়া কাটিতে কাটিতে বলিল, "হাঁরে, এমন করে আর ক'দিন চলবে?" কানাই বুঝিতে পারিল যে মাসীর অভিযোগ কি। কারণ এইরূপ অভিযোগ যে তাহার একরকম গা সহা হইয়া গিয়াছে।

কানাই যখন তাহাদের গ্রামের স্কুলে পড়ে তখন অনেকে তাহার বিয়ের কথা বলিয়াছিল। কিন্তু সে পাঁচজন ভদ্র-সন্তানের সহিত মেশে সুতরাং তাহাদের দেখিয়া শুনিয়া কানাই তাহার পিতার মুখের উপর বলিয়াছিল "যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি ততদিন পরের মেয়ে আনব না।" দিনু সেই হইতে আর কোন কথা বলে নাই, অন্য কেহ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে দিনু সাফ জবাব দিত, "ছেলের বে' দেব না।"

কানাই কেবল তাহার মাসীর বিপক্ষে কিছুই বলিত না, মাসী যে তাহাকে এতটুকু বেলা হইতে মানুষ করিয়াছে! তাহার সেদিনের কথা এখনও মনে আছে—সেই সেদিন যেদিন তাহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শুইয়া জলভরা চোখে তাহার হাতটী মাসীর হাতে তুলিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিয়াছিল, "বোন, আজ থেকে তুই কানুর মা হ'লি।" সেইদিন হইতে মাতার পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠাতা মাসী—সেই মাসীর বিরুদ্ধে

কথা কহিবে এমনি পাষণ্ড সে! লোক যতবড় মূর্খ হউক না কেন—সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় যতই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হউক না কেন, মায়ের চরণ স্পর্শে যাহার সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় না তাহার মত লোক পৃথিবীতে বিরল! কানাই তাহার মাসীকে মুহূর্ত্তের তরে ভাবিতে পারে নাই যে সে তাহার মা নহে; তাই মাসীর সকল কথা সে দেবী বাক্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে মাসী তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ম কতবার বলিয়াছে, সে মুখের উপর কোন উত্তর না দিয়া বলিয়াছে—ভাবনা কি মাসী, তোমার পছন্দ মত মেয়ে দেখ, যখনই বলবে তখনই বিয়ে করে এনে হাজির কর্ব্ব!" ইহাতে মাসী কতই না আনন্দানুভব করিয়াছিল, ভারী হৃদয়ে জলভরা চোখ দু'টী আঁচল দিয়া মুছিয়া কানাইকে বলিয়াছিল, "তাতো বটে, আমার কথা কি আর তুই অমান্যি কর্ত্তে পারিস। পেটের ছেলের চেয়েও যে তোকে বেশী দেখিরে।" ইহার পর মাসী আর তাহার বিবাহের কথা পাড়িয়া তাহাকে উত্যক্ত করে নাই; কেন না ভগবানের অচ্ছেদ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র মানবের মত দিদি দেহত্যাগ করিল এবং তরঙ্গ সঙ্কুল পারাবারে ভাসমান কর্ণহীন তরণীর ন্যায় এই ক্ষুদ্র পরিবারটী সংসারের তরঙ্গ ভঙ্গের সহিত যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। কিন্তু আজ বহুদিনের পর যখন মাসীর মুখ হইতে একথা ফুটিয়া বাহির হইল তখন কানাই-য়ের আর কোন ওজর করা চলে না তাহার আপত্তির সকল যুক্তি তর্ক যে সমাধিস্থ হইয়াছে, সে যে আজ উপার্জ্জনক্ষম কর্ম্মঠ যুবক।

মাসী যখন বলিল, "এমন করে আর ক'দিন চলবে" কথাটী হুঁকার একটা দীর্ঘ টানের একরাশ ধোঁয়ার সহিত তাহার মগজে প্রবেশ করিল।

কানাই তাহার নাক ও মুখ হইতে অনর্গল ধোঁয়া বাহির করিয়া একটু কাসিয়া, হাসিয়া বলিল "তা তুমি যদি বল তবে কর্ত্তে হয়। মেয়ে টেয়ের সন্ধান করেছ কি?" মাসী হাসিয়া ফেলিল, বলিল "সন্ধানে একটা মেয়ে আছে, ঐ রামুর মেয়ে। আজ সন্ধ্যেই তা হলে দেখে আসি, কি বলিস?"

কানাই বলিল "তা বেশ হয়েছে। আমি আজ থিয়েটার দেখতে যাব, তুমিও একটা মেয়ে দেখে এস।"

মাসী বিস্ময়ে বলিল "থেটর! সে আবার কি রে?"

কানাই বলিল, "ঐ যেখানে নাচ গান হয়।"

মাসী বলিল, "কি জানি বাপু আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক—ওসব থেটর ফেটর বুঝিনে—কলকেত্তার কতই ধরণ। কখন তা হ'লে ফিরবি?"

কানাই বলিল, "কতক্ষণ হবে তাত বলতে পারি না। ভোরের আগে যে ফিরতে পারব তাত মনে হয় না।"

তৎপরে মাসী ও বোনপোর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল, কত টাকা পর্য্যন্ত কানাই পণ দিতে পারিবে এবং কোন মাসে বিবাহ হইবে তাহার একটা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম সে মাসীকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিল, কেননা পণের টাকা ত তাহার যোগাড় করা চাই।

কানাই বলিল, "দ্যাখ্ মাসী ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ পণ আমি দিতে পারব না, তাতে বিয়ে হ'ক আর নাই হক, বুঝলে ত?"

মাসী ঘাড় নাড়িয়া বলিব, "হাঁরে আমি কি আর বুঝিনে, -- সব বুঝি। কসামাজা না করে কি আর অমি ছাড়ব! আমি কি তেমন।" এমন সময় বাহিরে হাঁক পড়িল, "কানাই" মাসী বলিল "কে ডাক্‌ছে রে?"

কানাই বলিল, "আমাদের কারখানার ছিদেম।"

"ওবুঝি তোর সঙ্গে থেটর দেখতে যাবে?"

কানাই একটু হাসিল, বলিল, "হুঁ।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘরের ভিতর হইতে জামা ও জুতা যোড়াটী বাহির করিয়া আনিয়া পরিল।

তৎপরে সে একটী ছোট আর্সি এবং চিরুণী দিয়া চুলটা ঠিক করিয়া লইয়া বাহির হইবার জন্ম রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। মাসী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে এক্ষুণি যাচ্ছিস নাকি?" কানাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হুঁ"।

"খাবি কখন?"

কানাই হাসিয়া উঠিল, বলিল, "মাসী, হাতে যখন পয়সা আছে, আর কলকেতায় অলিতে গলিতে যখন হোটেল আছে, তখন কি আর খাবার ভাবনা হয়।" এই বলিয়া সে বাহির

হইয়া গেল। যাইবার সময় কানাই মাসীর দিকে ফিরিয়া বলিল "দেখো যেন ৫০৲ টাকার একপয়সা বেশী না হয়।"

(২)

বোশেখের প্রথমে ৫১৲ টাকা পণ দিয়া কানাই রামধন সর্দ্দারের কন্যা ক্ষ্যান্ত মণিকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিল।

কুল প্রথানুসারে মাসী বধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিবার জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু কানাই তাহা সহ্য করিতে পারিল না, বলিল "তোমার চোখের কি ঠাহর নেই মাসী, এমন রূপকে বরণ করে ঘরে তোলবার কি দরকার ?" এই বলিয়া সে সঙ্কুচিতা ক্ষ্যান্তকে জোর করিয়া গাড়ী হইতে নামাইল এবং হিড় হিড় করিয়া টানিয়া গৃহ প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত আনিয়া ছাড়িয়া দিল।

রান্না ঘরের ছেঁচেতে একটী সুন্দরী মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল, মাসী তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা কানুর কি আর মন্দ বউ হয়েছে! পাঁচটার ঘরের মেয়ে, বেশ মিলে মিশে থাকতে পারবে, কি বল ?"

কানাই মাসীর দিকে একবার কঠোর কটাক্ষপাত করিল, বলিল "এর চেয়েও রূপ কি তোমার চোখে কখন পড়েনি মাসী ?"

মাসী ধমক দিয়া উঠিল, বলিল, "থাম, থাম, আর রূপের বিচার কত্তে হবে না।" তৎপরে সে লজ্জাবনতা ক্ষ্যান্তকে উঠানের এক পার্শ্বে দুধ আলতার পাথরের উপর দাঁড় করাইয়া ডাকিল "কানু! একবারটী আয়।"

কানাই চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল "আমি যাবনা, যাও।" তাহার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। সে কখনও মনে স্থান দেয় নাই যে মাসী তাহার জন্য এক "কাল পেঁচা" আনিবে; থিয়েটারের নাচওয়ালীদের মত অত ফর্সা না হ'ক, অন্ততঃ তাহাদের পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন একটা টুকটুকে বউ যে সে পাইবে, ইহা তাহার অনেক দিনের আশা। কানাই মিস্ত্রীর বউ ক্ষ্যান্তমণি যে একটা কাল পেঁচা তাহা পাড়ার কেহই বলিল না। বাস্তবিক ক্ষ্যান্তর সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব অপেক্ষাকৃত গোল মুখখানির মধুর লালিত্য, চোখ দু'টীর সরল চাহনি ও অপেক্ষাকৃত মলিন চর্ম্মের সমন্বয়ে বেশ মানানসই ছিল।

মাসী বিরক্ত হইয়া আবার ডাকিল "আয়না কেন ?" পুরাদস্তুর চীৎকার করিয়া কানাই বলিল, "না গেলেই বা কি হয়।" আমি অমন পেত্নীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। মাসী আর কোন কথা বলিল না, ক্ষ্যান্তর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "উঠে এস!"

*　　*　　*

স্বামীর হৃদয়ে যে কতটুকু দুর্ব্বলতা আছে, তাহা দ্বাদশ বৎসরের বালিকা ক্ষ্যান্তমণি বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল; কিন্তু সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না তাহার স্বামীর এই দুর্ব্বলতার কারণ কি। সে কি এতই বিশ্রী!

ক্ষ্যান্তমণি স্থির বুঝিয়া লইল, শুধু তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি দিয়া সে স্বামীর স্নেহের দাবী করিতে পারে না।

(৩)

আজ ছয় মাস বিবাহ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সে তাহার স্বামীর মুখে একটু স্নেহের কথা শুনে নাই, পতি দেবতার চরণে নয়নের জল দিয়া মনের কালিমা ধৌত করিবার অবসরও সে কখন পায় নাই। সর্ব্বদাই তাহাকে ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, পাছে প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের কোন অমঙ্গল কথা তাহার পাপ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। গভীর রজনীতে স্বামী যখন মাতাল হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে, তখনকার সে দৃশ্য তাহার শতক্ষত প্রাণের অন্তস্তলে যেরূপ জোরে শেলাঘাত করে, তাহাতে যেন তাহার দমবন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়া আসে; তখন মনে হয়, আজ বুঝি তাহার মুক্তির দিন আসিয়াছে। হায়! মুক্তির পথ কি এতই প্রশস্ত!

সারারাত মাতাল স্বামীর শুশ্রূষায় তাহার কাটিয়া যায়। গভীর অমানিশায় ক্ষুদ্র আশার দীপটী লইয়া যদি কখন তাহার স্বামীর মতিগতি পরিবর্ত্তন হয়; ঠাকুর দেবতার নিকটে সাশ্রু নয়নে সে দিবারাত্র কাতরকণ্ঠে ডাকে "হে ঠাকুর! স্বামীর মতিগতি ফিরিয়ে দাও।" ক্ষ্যান্তমণি কত দেবতার নিকট ডাকিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশি ভোর করিল; কিন্তু কোন

দেবতাই তাহাকে কৃপা করিলেন না ; বরং কানাইয়ের মাতলামি দ্রুতবেগে বাড়িয়াই চলিল। সেদিন কানাই মাতাল অবস্থায় তাহার পাড়ার একটী ছেলেকে গালাগালি দিয়াছিল। সে বাক্যে কোনরূপ প্রত্যুত্তর না দিয়া কানাইএর পৃষ্ঠদেশে তাহার প্রতিশোধ লইল, কানাই টলিতে টলিতে উঠানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া গেল। মাসী দৌড়াইয়া আসিল,—গুমরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষ্যান্ত স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাইএর পৃষ্ঠাঘাতে তৈল সিক্ত করিতে করিতে মাসী একটু কাঁদিয়া বলিল, "আমার কানু ত এমন ছিল না। অলক্ষুণে বউ না হলে কি এতদূর হ'ত!" ক্ষ্যান্ত মাসীর মুখের দিকে তাকাইল। তাহার চোখের জল—বিরসমলিন গণ্ডে দ্বিগুণ বেগে ঝরিয়া পড়িল।

(৪)

যুদ্ধের হাঙ্গামায় যখন সকল দ্রব্যেরই দাম চড়িয়া গেল, বিশেষতঃ চাউলের মণ অগ্নিমূল্যে যখন বিক্রীত হইতে লাগিল, তখন আপিস কারখানার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দের হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল—তাহার ফলে কাহারও বা মাহিনা বাড়িয়া গেল, কেহ বা আগাম মাসের মাহিনা প্রাপ্ত হইল।

কানাই দুই মাসের মাহিনা পাইল। তাহার ঘরের কোণে একখানি ছোট্ট চৌকীর উপর একটী ট্রাঙ্ক ছিল—ট্রাঙ্কের উপর একটী ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স। ইহাতে তাহাদের মাসিক হাত খরচের টাকা থাকিত। কানাই তাহার কোমরে বাঁধা কাল ঘুনসীতে আটকান চাবিটী বাহির করিয়া বাক্সটী খুলিল। তাহাতে তাহার দুই মাসের মাহিনা পঞ্চাশটী টাকা রাখিয়া মাসীকে ডাকিয়া বলিল, "মাসী শুনছ?" কোন উত্তর না পাইয়া কানাই রান্নাঘরের দিকে গেল, চৌকাটের বাহির হইতেই চীৎকার করিয়া বলিল, "মাহিনার পঞ্চাশটী টাকা কাঠের বাক্সে রইল, বুঝেছ মাসী?" এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল, দেখিল ক্ষ্যান্ত উনানের কাছে বসিয়া খুন্তি দিয়া মাছ নাড়িতেছে।

কানাই জিজ্ঞাসা করিল "মাসী কোথায় বলতে পারিস?"

ক্ষ্যান্ত খুন্তি দিয়া মাছ কয়টী উলটাইয়া জল ঢালিয়া দিল, ফিরিয়া মাথার কাপড়টী একটু টানিয়া, আঁচল দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া বলিল "কি জানি।"

কানাই ফিরিল। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঠের বাক্সটী লইয়া সে আড়ার তক্তায় লুকাইয়া রাখিয়া একটী বিড়ি মুখে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, পথের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, সারি সারি গ্যাসের আলো প্রজ্বলিত হইয়াছে। কানাইদের বাসার নিকট গ্যাসপোষ্টের ধারে ছিদাম দাঁড়াইল। কানাই বলিল, "একটু দাঁড়া ভাই, শীগ্‌গীর আসছি।"

ছিদাম বলিল, "দেখিস যেন দেরী করিস নে!"

কানাই গৃহে প্রবেশ করিল, ত্বরিৎ গতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া চৌকীর উপর কাঠের বাক্সটীর অনুসন্ধান করিল, ক্ষণপরে ডাকিল "মাসী?"

একটী কেরোসিনের ল্যাম্প হাতে লইয়া মাসী নিকটে আসিল, বলিল "ফিরে কি খুঁজছিস?"

অল্প জড়িতস্বরে বলিল, "কাঠের বাক্সটা।"

মাসী আরও একটু নিকটে আসিল। কানাইএর মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হাঁরে, এই সেদিন না দিব্বি করলি যে ঐ মদ ফদ্ আর খাবিনে?"

কানাই গলাটীকে সরল করিবার চেষ্টা পাইল, একটু কম্পিতকণ্ঠে বলিল "ওসব একটু আধটু না খেলে কি আর জীবন বাঁচে। এখন বাক্সটা কোথায় বল দেখি।"

মাসী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি জানি বাপু।" মাসী চলিয়া গেলে কানাই ভাবিল, বউ নিশ্চয়ই জানে, টাকা রাখিবার সময় সে বলিয়াছিল "বাক্সে পঞ্চাশটী টাকা রহিল," ইহা নিশ্চয়ই সে শুনিতে পাইয়াছিল এবং তাহা চুরী করিবার জন্য সে বাক্সটী নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে।

কানাই জলদগম্ভীরস্বরে ডাকিল "ক্ষেন্তী?" ক্ষ্যান্তমণি হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিল, কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, "কি, ডাকছ কেন?"

গম্ভীরস্বরে কানাই বলিল, "বাক্সটা?"

পূর্ব্ববৎ চাপা গলায় ক্ষ্যান্ত বলিল, "জানি না ত।"

কানাইএর আপাদ মস্তক যেন জ্বলিয়া গেল, ক্ষ্যান্তর দিকে এক কঠোর কটাক্ষপাত করিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল, একটু নাড়িয়া বলিল "শীগ্‌গীর বল্‌, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

ক্ষ্যান্ত তাহার সকরুণ আঁখি দুটি তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল, শান্ত অথচ ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমি কি তোমাদের বাক্সে হাত দি নাকি!"

কানাই ক্ষ্যান্তর হাতখানি ছুঁড়িয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সজোরে তাহার বক্ষে এক পদাঘাত করিয়া বলিল, "এখনও বল বলছি?"

কানাইএর সজোর পদাঘাতে ক্ষ্যান্ত ছিটকাইয়া পড়িল, জোর গলায় আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "আমি জানি না গো—জানি না!"

"তবে রে পাজী, মুখের উপর উত্তর?" কানাই ক্ষ্যান্তর বক্ষে ও ললাটে আরও তিন চার বার পদাঘাত করিল। মাসী রান্নাঘরে ছিল, দৌড়াইয়া আসিল। কানাইকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া একটী কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া সে ক্ষ্যান্তর নিকট আসিল, দেখিল অজস্র রক্তধারা তাহার ললাট ও মুখ হইতে নির্গত হইতেছে।

অস্ফুট চীৎকার করিয়া মাসী বলিল, "ওরে লক্ষীছাড়া, কি করেছিস, একবার দেখে যা।"

কানাই নিকটে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দেহ কাঁপিতেছিল। উজ্জ্বল কেরোসিনের আলোকে রক্তস্রোত দেখিয়া তাহার অন্তর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সে বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষ্যান্ত চক্ষু মেলিল, দেখিল কানাই নিকটে বসিয়া আছে; ভীতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো আমায় মেরো না, আমি চোর নই।" কানাইএর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, চক্ষু দিয়া অবিরল জলস্রোত প্রবাহিত হইল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল "না, না তুমি চোর নও। আমিই যে বাক্সটা ওপরের তক্তায় তুলে রেখেছিলুম।" ক্ষ্যান্তমণি স্বামীর দিকে একবার তাকাইল, তাহার মুখখানি ভরিয়া আনন্দ জ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিল, তারপর তাহা ম্লান হইয়া গেল। ছিদাম বাহির হইতে জোর কণ্ঠে হাঁকিল "আর কত দেরী?" ইহার একটু পরে ক্ষ্যান্ত চোখের পাতা দু'টী ধীরে ধীরে চিরমুদ্রিত করিল। ললাট স্পর্শ করিয়া ক্রন্দন স্বরে কানাই মাসীকে ডাকিয়া বলিল "হয়ে গেছে!"…

উকিলের প্রার্থনা

[শ্রীফটিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

(সুর—আর কবে দেখা দিবি মা)

আর কবে টাকা দিবি মা।
ফুরাইল জমার কড়ি টাকা দাও মা দয়া করি।
দিন দিন আয় ক্ষীণ চাপকান হ'ল ঝুল-মলিন
এ অভাবে নাহি দিলে আর কবে দিবি ওমা।
পড়ায়ে লেখায়ে পাশ করাইলে সমাপন
গাছ তলায় আর থাকি কত, কেন দাও না মনের মত,
এ সামলা এ চাপকান, তুমি ত করেছ দান
শূন্য হাতে ঘরে ফেরা কত দিন চলিবে মা।

বসন্ত-জাগরণ

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

আজিকে শীতের শীতল পরশ বিদায় লয়েছে চাহি,
দখিন হাওয়ার জোয়ার এসেছে, কোকিল উঠেছে গাহি।
মুগ্ধ নয়ন ফিরায়ে আজিকে কেব'ল দেখিতে পাই,
নবমঞ্জরী নব মুকুলের অভিনব রোশ্ নাই!
ইঙ্গিতে আজ কত সঙ্গীত ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া ওঠে,
প্রিয় যে তাহার প্রতি নিঃশ্বাসে মধু সৌরভ ছোটে।

ফাল্গুন আজ হাল্কা হাওয়ায় গলায় রক্তধারা,
কোকিল কেবলি আকুল কণ্ঠে কুহরি আত্মহারা।
চিত্ত কেব'লি বিহ্বল সুরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে,
মানস কুঞ্জে কত না ভৃঙ্গ রস-মধু-ধারা লুটে।

কতকাল ধরি বিরহী চিত্ত খুঁজেছে একটী সাথী,
কত বরষার ঘন সন্ধ্যায়, কত না দিবস রাতি,
শিশির-ধৌত শারদ-প্রভাত, কত হেমন্ত বায়,
কত না জ্যোৎস্না ব্যর্থ হয়েছে নিষ্ফল বাসনায়।
ফাগুন এসেছে কতবার হেথা উড়ায়ে রঙীন পাখা,
দখিন মলয় বহিয়াছে কত কুসুম-গন্ধ-মাখা;
কত বসন্তে অন্তর শুধু করিয়াছে হায় হায়,
তৃষায়-কাতর-চিত্ত কেঁদেছে স্পন্দিত বেদনায়।

তবু এতকাল কল্প লতাটি দেয় নাই কোনো সাড়া,
শুধু আলেয়ার আলোর মতন ঘুরায়ে করেছে সারা;
মধুমাসে আজ মধু-ঘোষ আসি ঘোষনা করিল কাণে —
রস-নির্ঝর-ধারা বরষিবে উষর তৃষিত প্রাণে।

আজ ফাল্গুনে সাঙ্গ হ'ল কি অকারণ চেয়ে থাকা,
সুরু হ'ল বুঝি করুণ-ছন্দে 'বৌ কথা কও' ডাকা?
বসন্ত আজ অন্তরে তাই আশা দিল সঞ্চারি,
মিলনানন্দে মানস চক্ষে ঝরিছে অশ্রুবারি;
তাই আজ বুঝি নিভৃত ব্যথাটি কাঁপায় বক্ষতল,
অশ্রুধারায় ধৌত চিত্ত করিছে বিচঞ্চল।
কোন অচপল চরণ কমল ফুটিয়া উঠিল ধীরে,
স্বচ্ছ শীতল রস ঢল ঢল এই হিয়াতল-নীরে!

হোথায় আজিকে মহা উৎসব সানাই উঠেছে বাজি,
হাসি পরিহাস, কত না বিলাস, কত কৌতুক আজি।
নব-কিশলয়-মুকুল-শোভিতা এল বসন্ত রাণী,
আমারি চিত্ত কুঞ্জ-কুটিরে বসনাঞ্চল টানি।

ঢল ঢল তার বদন কমল—কণ্ঠে অমিয় ঝরে,
আঁখি-পাখী দুটী খঞ্জন সম নাচে লজ্জার ভরে;
কাঁপে থর থর বিম্ব অধর চুম্বন মধু লাগি,
বক্ষের দ্বারে দুইটী অক্ষি সদাই রয়েছে জাগি;
চরণে নাহি সে চল-চপলতা, চলে মন্থর তালে,
সে চলন মৃদু-নৃত্য-দোদুল, প্রাণে সুধারস ঢালে।

ফাল্গুনে আজ ফাগুয়া উড়াও—কুঙ্কুম দাও ঢালি,
রাঙা ফাগ আর লাল ফুলে আজি সাজাও বরণ ডালি;
রক্ত কপোলে রং ঢেলে আজ রাঙা করি দাও তারে,
তুলে আন যত রক্ত কুসুম—সাজাও পুষ্পহারে।

হের দূরে ঐ কালো তমালের নির্জ্জন ছায়াতলে,
প্রতি ধূলি কণা লাল ফাগ মাখি হাসিছে কৌতুহলে;
যৌবন বনে স্বপন ভাঙ্গিয়া জাগিল রে মোর প্রিয়া,
মধুলোভে আজি চিত্ত-ভৃঙ্গ উঠিছে চঞ্চলিয়া;
রাঙা অধরের সুধা নিরবধি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে,
চাঁদের মদির জ্যোৎস্না ধারায় পরাণ কাঁদিয়া মরে।

যারে কাছে পাই তাহারে সুধাই—পেয়েছ কি তার দেখা?
শুনেছ কি তার নুপুরের ধ্বনি?—সেত আসে নাই একা!
আমের বৌলে, মলয় অনিলে, কিশলয়ে, কুহু তানে,
সে যে আসিয়াছে আমাদেরই এই বাংলার মাঝখানে;
যে আছ যেথায়—বাজাও শঙ্খ, কর আনন্দ সবে,
আজি বাংলার নব-বসন্ত-জাগরণ-উৎসবে।

দীপালি

(কথিকা)

[শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার]

দীপালির অদৃষ্ট-দীপ যেদিন নিভ্‌ল সেই দিন থেকে সে ভাসুরের সংসারে। মাতৃকুল এবং পিতৃকুল তা'র কাছে অন্ধকার—কেবল শ্বশুর কুলে ভাসুর ঠাকুরই আর পথ না পেয়ে শেষে বিপুল ঘর-সংসারের একটী কোনে নিঃসন্তান ভ্রাতৃ বধূটীর স্থান নির্দ্দেশ করলেন।

সেই থেকে আজ চৌদ্দ বছর সে এই সংসারের ভাত রেঁধে কাটিয়ে দিয়েছে। শৈশবের পরে ভরা যৌবনের বাণ ডাকতে না ডাকতেই তা'তে ভাটা পড়েছে—বিধবার সাদা থানের আড়ালে একটু একটু করে সে তা'র উদ্দীপ্ত, ফুটন্ত যৌবনকে চেপে মেরেছে; কিন্তু ক্ষুব্ধ মাতৃত্বের ক্ষীণ প্রবাহটুকু থেকে থেকে শুষ্ক হৃদয়ের দ্বারে ঘা মেরে যায়—তাই মাঝে মাঝে অন্যের অগোচরে দীপালি আপন দগ্ধ বুক খানির উপর কচি ছেলে মেয়েকে চেপে ধরে নিবিড় চুম্বনে, আপনার বুভুক্ষিত হৃদয়ের বিপুল তৃষ্ণাকে একটু তৃপ্তি দেয়। ক্ষণেকের জন্য ফুটন্ত ফুলের পাপড়ির মত ফুটফুটে কচি মুখের দিকে চেয়ে দেখে—ভাষাহীন অস্ফুট কাকলী, অর্থহীন ভাসা ভাসা চোখের চাহনি—যেন বুকের আগুনকে দ্বিগুণ করে জালিয়ে তোলে—মুখটা সরিয়ে নিয়ে একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে নিজের বুকের ভিতরটা কিছু হালকা করে নেয়। অতীতের লুপ্ত-প্রায় স্মৃতিকে মনের অন্ধকারে ঢাকা কোন্ থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়, কিন্তু পারে না—দেখতে দেখতে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

এমনি করে যখন সে বৈধব্যের দিন গুলি একে একে গুণে আসছে, এমন সময় একদিন জীবনের খেয়া ঘাটে পারের নৌকাকে যেন দেখতে পেলে। মাঘের কন্‌কনে শীত পড়েছে। সন্ধ্যার পর ধোঁয়ায় ঢাকা গ্রামখানি যেন সুপ্তির কোলে লুটিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার বুকে দিনের চিতার শেষ রশ্মিটুকু চিক্ চিক্ করছে। কুয়াসার আবরণ ভেদ করে,অন্ধকারের বুক চিরে দূরে গ্রামের দু একটী প্রদীপের আলো চোখে পড়ছে। দীপালি চলেছিল গ্রামের ঘাটে জল ভরতে—যেতে যেতে পথে কান্না শুনতে পেলে—একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে একটী শিশু ময়লা ছেঁড়া কাঁথায় ঢাকা—কতকগুলি খড়ের উপর পড়ে আছে; শীতে কচি শিশুর হাত পা একেবারে ঠাণ্ডা হিম। এই অভাবনীয় দৃশ্যে দীপালির লুপ্ত প্রায় মাতৃত্ব, ক্ষুব্ধ স্নেহের ধারা শুষ্ক হৃদয়কে বহিয়ে দিয়ে যেন শত ধারায় এই নিঃসহায় মাতৃহীন শিশুর উপর বর্ষিত হতে লাগল—আপন-হারা দীপালির অন্ধকার বুকের ভিতরে যেন মুহূর্ত্তে দীপালির শত দীপ জলে উঠ্‌ল,—সে শিশুকে বুকে চেপে ধরে আপন বসনের আড়ালে তাকে বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। সে এটা বেশ স্থির নিশ্চয় জানতো যে—এই শিশুর সঙ্গে তার এই গৃহে স্থান হওয়া বড়ই কঠিন; সে বেশ বুঝতে পারলো—আজ থেকে তার এ সংসারে বাস উঠ্‌লো—সে শুধু এই শিশুর জন্য নয়—তা'র ভিতরে যে মাতৃত্বের আলো জলেছে তা'কে ত সে নিভাতে পারে না। অনেক দিনের ঈপ্সিত বস্তুকে সে যে আজ একেবারে আপন করে, নিবিড় করে, নিজের বুকের ভিতরে পেয়েছে—তা'কে ত সে ফেলতে পারে না। যতই সে শিশুর মুখের দিকে তাকায় ততই তা'র ভিতরে বুকের বল যেন দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে উঠে—সে যে আজ "মা"—সে যে আজ মাতৃত্বের পূর্ণাহুতি দিবার জন্য উদ্যত; তাই সকল দ্বিধাকে মুহূর্ত্তে ডুবিয়ে দিয়ে মনের ভিতরের সেই একটী মাত্র দীপ নিয়ে বুকের উপর শিশুকে বস্ত্রাবৃত করে কন্‌কনে শীতের রাত্রের নিবিড় অন্ধকার সমুদ্রে ভেসে পড়ল।

* * *

মুগ্ধা প্রকৃতি এই মাতৃত্বপূর্ণ মা-কে আপনার রাত্রির কাল বসন খানি দিয়ে ঢেকে দিল—দীপালির ঘরের প্রদীপ নিবল বটে – কিন্তু অন্তর গৃহে যে দীপালির উৎসব সুরু হ'ল, সেত আজ আর কেউ নিভাতে পারবে না!

বোনের প্রতি ভাই

(পরিণয় দিনে)

[শ্রীকালিদাস রায়]

একটি কুলায়ে ঘেঁষাঘেঁষি রয়ে'
কলরব করি' বাসিয়া ভালো
এতবড় হ'লে, আজি কে তোমায়
ডেকেছে আকাশে প্রেমের আলো।

কাড়াকাড়ি করে' সবার সোহাগ—
ভাগাভাগি লুটে, একই কোলে
আজি বড় হয়ে কি এমন পেলে
সকলি যে ফেলে যেতেছ চ'লে ?

আজিকে তোমার মঙ্গল দিনে
জীবনসন্ধি অমৃত ক্ষণে—
হাসিব কি বোন কাঁদিয়া ফেলিব
আকুলি বিকুলি চলিছে মনে।

করুণ শিশিরে ঊষার অরুণ
কিরণে হিরণে শারদ দিবা,
তারি মত দশা হলো আমাদের,
তোমারে আজিকে বলিব কিবা ?

মধ্যমণিটি তুমি চলে' যাবে
মা'র কণ্ঠের মালিকা ছিঁড়ে—
এ কথা ভাবিতে পরাণ গুমরে,
শাসিত আঁখিও ভাসিছে নীরে।

উপকথা-সভা বসিবে না আর
গৃহ অলিন্দে সন্ধ্যাকালে,
শুভ হেমন্তে মন্ত্রমধুর
দ্বিতীয়ার ফোঁটা পাবনা ভালে :

তবু আজি নবশোচনার দিন
কর্ম' এ স্বার্থ সেবকগণে,
তুমি বৃতা হবে নারী গৌরবে
শুভ সংসার সিংহাসনে।

জীবনের ব্রত পালো বিধি মত,
হও প্রেমে রাজ রাজেশ্বরী,
সাধ্বি, তোমার ঋদ্ধি হেরিয়া
উৎসবে বুক উঠিবে ভরি'।

তব বিচ্ছেদ-ব্যথাটি হইবে
নব গৌরব—সুখের দ্বার,
ক্রৌঞ্চ বুকের ক্ষতটি যেমন
হলো রামায়ণী মধুরতার।

তোমার ভবনে কুল দেবতারা
ডাকে তোমা লয়ে বরণ ডালা,
যাও বোন, ধরো হাসি কান্নায়
হীরাপান্নায় গাঁথা এ মালা।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৩০)

স্নান ও কাজের সুবিধার নিমিত্ত এই বাংলা তৈরীর সঙ্গেই গঙ্গাগর্ভ হইতে বাংলা সংলগ্ন একটি পাকা ঘাট প্রস্তুত হইয়াছিল। ঘাটের দুইধারে কয়েকটা শিশুগাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নিভৃত ঘাটটিকে ছায়া-নিবিড় করিয়া রাখিয়াছিল।

কাকাবাবুর প্রস্থানের পর আমি সেই নির্জ্জন ঘাটে আসিয়া বসিলাম। শীতের দিনান্তের আলোটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি তারার দল লইয়া উদয় হইল। নদীর পরপারের প্রস্তরময় সান্ধ্যভূমি অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। যবের ক্ষেতের প্রান্ত হইতে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। আমার মাথার উপর দিয়া একটা নিশাচর পাখী হাঃ হাঃ শব্দে দিগন্ত কম্পিত করিয়া উড়িয়া গেল। এই পাখীর মতই আমার বক্ষোবাসী একটা উদ্দেশ্যহারা কামনা কিসের বেদনায়, কিসের আশায় আকুল হইয়া উঠিল।

কাকাবাবু থাকিতে—স্বামীর সেবাধিকার পাইয়াছি ভাবিয়া পুলকিতা হইয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সে পুলকোচ্ছ্বাস আমার কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। কি একটা মহাশূন্যতায় অন্তঃকরণ ভরিয়া গেল। ভবিষ্যতের একটা আশার চিত্রও আজ আমার উদ্‌ভ্রান্ত মরম কোণে ফুটিয়া উঠিল না।

আমি গায়ের আলোয়ান খানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া জলের প্রান্তবর্ত্তী সোপানটিতে পা রাখিয়া উপরের একটি প্রশস্ত সোপানে মস্তক রক্ষা করিয়া অন্ধকার বনের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এবেলা রান্নার ত্বরা ছিল না, অপরাহ্নেই রান্না শেষ করিয়াছিলাম। নিরানন্দ গৃহে নিভৃত শয্যায় আশ্রয় লইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। বিদায়োন্মুখ শীতের শীতল বাতাসে আমার শীতানুভব হইলেও আমি উঠিতে পারিলাম না। সিন্ধু লহরীবৎ চিন্তা তরঙ্গে অভিভূতের ন্যায় আমি আনমনা হইয়া রহিলাম।

কিয়ৎকাল পর সোপানোর্দ্ধে একটা মৃদু শব্দে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সভয়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম—অদূরে শ্রেণীবদ্ধ শিশুগাছের তলায়, পুঞ্জীভূত অন্ধকারে একটি মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মানুষটির শুভ্র পরিচ্ছদ ব্যতীত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই আমার নয়নগোচর হইল না। এই অন্ধকার রজনীতে নির্ব্বাক নিশ্চল মূর্ত্তির মত কেহ আমার সন্নিধানে আসিতে পারে তাহা আমার কল্পনার অতীত ছিল। এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আতঙ্কে আমার শরীর কম্পিত হইল। আমি ভয়বিহ্বল নয়নে কাল আকাশের পানে চাহিলাম—সেখানে অযুত নক্ষত্রগুলি সুস্পষ্ট জ্বলিতেছে। গঙ্গাবক্ষে চাহিলাম—সেখানেও মৃদু পবন স্পর্শে বীচিমালা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। দক্ষিণে ও বামে ভয়চকিত দৃষ্টিটা প্রসারিত করিয়া মনুষ্য সমাগমের চিহ্নও পাইলাম না। কেমন তীব্র শীতে অকস্মাৎ আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইল। সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি দুই হাতে সোপান ধরিয়া পুনরায় পশ্চাতে চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মস্তক কঠিন সানের উপর লুটাইয়া পড়িল। নিরস শুষ্ক কণ্ঠ হইতে ভয়াতুর কণ্ঠে উত্থিত হইল "মাগো!"

"ভয় পেলে! ভয় কিসের? একলা ঘাটে ভয় পাবে বলেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি যে আমায় দেখে চিনতে পার নি, তা তো আমি জানি না। আহা, মাথায় বুঝি বড্ড লেগেছে?"

স্বামীর এ স্নেহ সম্ভাষণে আমার চমক ভাঙ্গিয়া চোখে

জল আসিল। কি সুধাভরা কণ্ঠ, কি মমতার প্রস্রবণ! ভাগ্যে ঘাটে আসিয়াছিলাম, ভাগ্যে ভীত হইয়াছিলাম; তাই—আজ এমন অমৃতের আস্বাদ পাইলাম। হায় প্রিয়তম, তুমি আমায় কি দিলে? বামনকে চন্দ্রলোকে লইয়া গেলে, চির তৃষাতুরকে সুধার সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিলে! সোণার কাঠির একটুখানি স্পর্শে মৃতকে জীবিত করিয়া দিলে তোমার কণ্ঠে এমন মর্ম্মস্পর্শী স্বর এতদিন কোথায় লুকানো ছিল? তোমার বুকে করুণার এই উৎস কেমন করিয়া রুদ্ধ হইয়াছিল? আজ যখন রুদ্ধ উৎসের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে,—তখন আর দূরে কেন? আমাকে ডাকিয়া লও, এ অযোগ্যা দাসীর বাহুটি ধরিয়া তোমার চরণ প্রান্তে ডাকিয়া লও প্রিয়তম!

তিনি আমাকে ডাকিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আমি যেভাবে কামনা করিয়াছিলাম—সেভাবে নয়। তিনি আমার নিকট হইতে দূরে বসিয়া করুণায় বিগলিত কণ্ঠে কহিলেন "কাকাবাবু তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে অন্যায় করলেন। খালি বাড়ী—কথা বলার একটি প্রাণী পর্য্যন্ত নেই। একলা ঘাটে বসে থেকেই তো ভয় পেলে; মাথাটা সানে ঠুকে গেল। এই ভয়ের জন্যে হয় তো একটা শক্ত ব্যারামও হ'তে পারে। যার প্রয়োজন নেই, তার জন্যে তোমার কেন অনর্থক কষ্ট পাওয়া।"

'যার প্রয়োজন নাই।' কথাটা কঠিন না হইলেও আমার বুকে বাজিল—আমি মাথা তুলিয়া মুখরার মত বলিলাম "প্রয়োজন নাই যে তা আমি ভাল করেই জানি; আমি নিজে উপযাচিকা হ'য়ে এখানে আসি নাই, কাকাবাবুর আদেশেই আসতে হয়েছে, কাকাবাবুর ইচ্ছাতেই থাকতেও হ'ল। তাঁকে আগে বল্লেই এ আপদ বিদায় হ'য়ে যেতো। অন্যের অশেষ অসুবিধা হচ্ছে জেনে তিনি হয়তো আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারতেন না। তাঁর সামনে চুপ করে থেকে এখন ন্যায় অন্যায়ের কথা তোলা আমাদেরি কি অন্যায় নয়?"

অন্ধকারে ভাল করিয়া তাঁহার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু আমার রূঢ় কথায় তাঁহার অবিচলিত কণ্ঠস্বরের কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন প্রকাশ পাইল না। তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শান্তস্বরে কহিলেন "তুমি মনে ভাবচ, 'তুমি এখানে থাকতে আমার বুঝি অসুবিধা হচ্ছে! তুমি যা করচ তাতে আমার প্রয়োজন নাই;'—তা নয়। কথাটা হচ্ছে—তোমার যা প্রাপ্য তা আমি দিতে পারি নাই। যাকে যা দিতে পারি নাই, তার কাছ থেকে কিসের দাবীতে আমি আমার সব নিতে যাব? তুমি প্রাণপাত করে সেবা দেবে—তা আমি নেব, যত্ন দেবে তা আমি নেব। তোমার প্রদত্ত সমস্ত সুখ শান্তি আরাম আমি অবলীলাক্রমে গ্রহণ করবো; কিন্তু আমার দানের ঘর শূন্য পড়ে রইবে! এমন অন্যায়, এমন অবিচার কি হ'তে পারে? দানের ক্ষমতা যার নেই, গ্রহণে তার কত লজ্জা, তুমি তা বুঝবে না।"

মনে মনে বলিলাম "বুঝিতে চাহি না। যেটুকু বুঝাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট, তাহাই চরম। যাহার হৃদয় এত সুকোমল, পরদুঃখে এত আর্দ্র, তাহার নাকি আবার চেষ্টা করিয়া ভালবাসা শিখিতে হয়! করুণা হইতেই প্রেমের উদ্ভব, সেই করুণার বিমল ধারা যাহার হৃদয়ে এমন বেগে বহিয়া যাইতেছে সে আবার ভালবাসার কাঙ্গাল! তাহার দান গ্রহণে লজ্জা! শুনিয়া হাসি পায়, দুঃখ হয়। দুঃখের ভিতর সুখের আভাস জাগিয়া উঠে। নিরাশার ঝটিকাচ্ছন্ন আকাশে ম্লান চন্দ্রমা উদয় হইয়া—পূর্ণিমার আসন্ন বারতা জানাইয়া দেয়। কিন্তু আমার উদ্বেলিত হৃদয় দূর ভবিষ্যতের পানে অনিমেষে চাহিয়া থাকিতে ক্লান্ত হয়। মনের ক্লান্তি, রূপ, রস, গন্ধভরা জগতের বুকে বিচ্ছুরিত হয়। হৃদয় মন প্রতীক্ষা করিতে গিয়া অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

আমি সহজ কথা সহজ ভাবে বলিতে পারি না। যাঁহার স্মৃতি স্মরণ করিবামাত্র আমার অন্তঃকরণ প্রীতি রসে ভরিয়া যায়। যাঁহার সহিত একটু বাক্যালাপ করিবার আশায় আমার হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠে, আশ্চর্য্যের বিষয় আজ তাঁহার সহিত কথা বলিতেই আমার অন্তরের উত্তাপ এমনি করিয়া প্রকাশ পাইল; মানব চরিত্র কি দুজ্ঞের্য় কি প্রহেলিকা পূর্ণ! প্রয়োজন নাই—এই ক্ষুদ্র শব্দটি কি এম্‌নি রসহীন, এম্‌নি কঠোর, যাহার সংস্পর্শে আমার মনের ছাইচাপা আগুন এম্‌নি করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইল! ওগো আমার

দেবতা, আমি কি করিতে কি করিয়া বসিলাম! তোমারি জন্য আমার বক্ষে আমার কণ্ঠে অমৃত ভাণ্ড সঞ্চিত থাকিতে আমি তোমার কর্ণ কুহরে বিষবাণী ঢালিয়া দিলাম! যে সুযোগ একবার পাইয়া অভিমানের বশে হারাইয়া ফেলিলাম, সে সুযোগ আর একটি বার তুমি আমাকে দাও। আমি অভিমান ত্যাগ করিলাম। অভিমানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করিলাম। এবার আমার কণ্ঠে অভিমানের সুর ঝঙ্কৃত হইবে না। অপ্রীতিকর শব্দ নির্গত হইবে না। এবার এ কণ্ঠ এ হৃদয় তোমারি বন্দনা গানে ঝঙ্কৃত হইবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাকে কথা বলিবার সুযোগ প্রদান করিলেন। তাঁহার শান্তোজ্জ্বল আঁখি দুটি আমার পানে মেলিয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন "তুমি এখানে থাকলে তোমার যে পদে পদে কষ্ট পেতে হবে—সেটা আমি কাকাবাবুকে জানাতে চেয়ে ছিলাম; কিন্তু বলি বলি ক'রে বলা হয় নি। বিশেষতঃ কাকাবাবুর একান্ত ইচ্ছা জেনেই আমি চুপ ক'রে ছিলাম। সে যা হ'বার হয়ে গেছে; এখন রাতে ঘাটে আস্‌তে কিষণকে ডেকে নিয়ে এস। আর কখখনো একলা এস না। আমি কালই কল্‌কাতা চিঠি লিখে তোমার পড়বার ভাল ভাল বই, মাসিক পত্রিকা আনাবার বন্দোবস্ত করবো। তা হ'লে একা থাকতে এত কষ্ট হবে না। এখানে বাঙ্গালী ঝি পাওয়া যায় না; একটি বেহারী ঝি রাখলে তোমার যদি সুবিধা হয়, তবে তাই রেখে দিই।

বলিলাম "ঝি'তে আমার দরকার নেই, এখানে আমার কিছু অসুবিধা হবে না। আমি বেশ মনের শান্তিতেই থাকতে পারবো, চল তোমায় খেতে দিই গে: তোমার খাবার সময় হয়েচে।" আমি উঠিয়া অগ্রসর হইলাম। বিনা প্রত্যুত্তরে তিনি আমার সঙ্গী হইলেন।

(৩১)

তিন মাস অতীত হইয়াছে। এখন মুঙ্গের আমার নিকটে শান্তিহীন প্রবাস নহে। মুঙ্গেরের শীর্ণধারা গঙ্গা, তীরের তরুকুঞ্জ, পাখীর বৈতালিক গান আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে; এখানে আমার জন্মভূমির শ্যামল সুষমা সবই আমি ফিরিয়া পাইয়াছি। সেই সোণাঢালা অড়হর ক্ষেত্র, সেই গমের কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের উদাস ছন্দহারা গান, আমার অতীত জীবনের স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

জীবন ব্যর্থ ভাবিয়া, দিন বিফল বলিয়া এখন আমি ক্ষুব্ধ নহি। আমার ভাগ্য বিধাতা যাহা আমাকে দিয়াছেন—তাহা লইয়াই আমি তৃপ্ত হইতে চাই। স্বামীর হৃদয়ে আমার স্থান কতটুকু হইয়াছে, জানি না। আমার হৃদয়ে তাঁহার আসন যে আরও অটল অসীম হইয়াছে ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছি। তাঁহার সেবায় তাঁহার কাজে নিজেকে বিলাইয়া দিবার গৌরব—আমার চিত্তের বিমুখ বিরূপতা কথঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে বটে কিন্তু নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। আমি তাঁহার প্রণয় ভাগিনী প্রেয়সী পত্নী না হইলেও তিনি যে আমার, একান্ত আমারি, এগর্ব্ব কি আমার অবহেলা করিবার? তিনি আমার, আমি তাঁহার, এই মূলমন্ত্রটি সংসারের ক্ষুদ্রতা দীনতা হইতে আমাকে নবীন জগতে লইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসে আজ আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে। কর্ত্তব্য রূপে করুণা রূপে তাঁহার প্রাণের নীরব নির্ঝর ধারা আমার মরমতলে বহিয়া যাইতেছে। তাহাতেই আমার জীবন সফল, সফল! সময় সময় আমার নারীত্বটা মাথা তুলিতে চায়; কিন্তু কে তাহার অনাসৃষ্টি আব্দার, অর্থহীন রোদন শুনিবে? সে যতই ক্রন্দন করুক না কেন—তাহাতে কাহার আসিয়া যায়? আমি যাহা পাইয়াছি তাহাতেই তৃপ্ত, তাহাতেই পুলকিত!

দীর্ঘকাল এক বাড়ীতে অবস্থানের ফলে তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছে কিনা তাহা অন্তর্য্যামী জানেন। প্রথমে তাঁহাকে যেমনটি দেখিয়াছিলাম—তিনি এখনও তেম্‌নি ধীর শান্ত প্রকৃতি; বাক্যে, ব্যবহারে, কোমলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ। চক্ষু তেমনি শান্ত হাস্যময়, দৃষ্টিতে প্রেমের উদ্দামতা উজ্জ্বলতার চিহ্ন মাত্রও নাই। তাহা প্রণয় পাত্রীর আগমন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নব নব শোভার আধার হইয়া উঠে না। আদরে গলিয়া অভিমানে জ্বলিয়া সেই আয়ত আঁখি দুটি একটি হৃদয়

কাননের অস্ফুটিত শতদল প্রস্ফুটীত করে না। তা— না করুক তবু তাঁহার মুখখানি, মিষ্টি হাসিটুকু, চকিত চাহনীটি আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করে। নিকটে পাইলে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্তরালে থাকিলে তাঁহারই চিন্তায় আমার দীর্ঘ দিবা, বিনিদ্র রজনী কোথা দিয়া যেন কাটিয়া যায়।

অপরাহ্নে বাংলায় বসিয়া স্বামীর আনীত একখানি নূতন পত্রিকা পড়িতেছিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার মনোসংযোগ হইতেছিল না; যেখানে দূর নীলাম্বর গায়ে বিদায়োন্মুখ রৌদ্রের পাশে কালবৈশাখার ঘন মেঘ স্তূপাকার হইতেছিল, সেইখানে আমার চঞ্চল মন বারম্বার উধাও হইয়া যাইতেছিল। এই উন্মুক্ত উদার নীলাকাশ, রৌদ্রের কোলে মেঘখণ্ড, গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জন, আসন্ন বর্ষণ আশায় তরুপল্লবের সানন্দ হিল্লোল, প্রকৃতির দরবারে নাছোড়বান্দা পাখীর এক সুরের সকরুণ নালিশ, সবগুলি মিলিয়া আমার কৈশোর জীবনের সোণার ছবিখানি যেন আমার চারিদিকে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বাতায়নের পাশে বসিয়া খোলা পুস্তকের পাতা মুখের কাছে ধরিয়া আমি আকাশের মেঘ ও রৌদ্রের খেলা দেখিতেছিলাম। জুতার শব্দে চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম—স্বামী আসিতেছেন। তিন মাসের ভিতর একটি দিনও তিনি আমার গৃহে আসেন নাই! প্রসন্নচিত্তে আমার সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, তৃপ্তির সহিত রান্না খাইয়াছেন, অনেক সময় অনেক দরকারে আমার সহিত তাঁহার দুই চারিটা বাক্যালাপও হইয়াছে, কিন্তু এই প্রথম স্বইচ্ছায় আমার কক্ষে তাঁহার পদার্পণ।

তাঁহাকে এমনভাবে নিকটে আসিতে দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা পুলকোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া উঠিল। আমার হৃদয়ের অনাঘ্রাত অম্লান পূজোপকরণ তাঁহারি পায়ে অর্পণ করিয়া বলিতে সাধ হইল—'হে আমার দেবতা, হে আমার বাঞ্ছিত, আমার নীরব পূজায়, নীরব সাধনায় তোমার কি আসন টলিয়াছে? তাই—আমার পূজাভার গ্রহণ করিতে তুমি আসিয়াছ! এস, এস আমার অন্তরের শুভ্র শতদলের উপর সমাসীন হইয়া আমার নারী জীবন সার্থক করিয়া দাও। তোমার পূজা সম্ভার লইয়া, তোমার আশাপথ চাহিয়া, আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, শ্রান্ত হইয়াছি প্রিয়তম! আজ আমার অবসাদ ব্যর্থতার অবসান হোক্; তুমি করুণাভরা কোমল আঁখি দু'টি আমার মুখের পানে মেলিয়া একটিবার বল "আমার হৃদয়ে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, আমার অধিকার আমি আজ গ্রহণ করতে এসেছি।" আন্তরিক যদি নাই বলিতে পার, কেবল মুখেই একটিবার বল। তোমার মুখের কথাতেই আমি ধন্য হইব, কৃতার্থ হইব।

স্বামী আমার দিকে অগ্রসর হইয়া অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—"আমি আজ তোমায় একটি অনুরোধ করতে এসেছি; তুমি আমার কথা শুনবে কি? যদি তোমার খুব অসুবিধা না হয়—তা হ'লে"—বলিতে যাইয়া তিনি থামিয়া গেলেন। তাঁহার অনুরোধ! যাঁহার একটি আদেশ পাইলে আমি বাঁচিয়া যাই; সেই তিনি আজ আমায় অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন! দ্বিধায় সঙ্কোচে ম্রিয়মান হইয়া অপরাধীর বেশে সেবিকার নিকটে দেবতা অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন! হৃদয়, তুমি শান্ত হও। অধিরাবেগে এ মাহেন্দ্রক্ষণ হেলায় হারাইও না!

আমি সঙ্কোচের জড়তা সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলাম। আমার অশ্রু সজল চোখে আরতির প্রদীপ জ্বালাইয়া আমার প্রিয়তমের মুখের পানে চক্ষু তুলিয়া বলিলাম "আমায় তুমি আদেশ কর, অনুরোধ বলে অপরাধ বাড়াইও না। তোমার আদেশ—তাতে আমার অসুবিধা কিসের? আমার অসুবিধা নাই।"

তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি সরসকণ্ঠে বলিলেন, "আমার অনুরোধটা হচ্ছে কি—আমার সঙ্গে এখুনি তোমায় এক জায়গায় যেতে হ'বে। একটি বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করতে হবে। তুমি না গেলে তাঁদের উপকার করা আমার একার দ্বারা সম্ভব হবে না।"

"একার দ্বারা সম্ভব হবে না।" দুই চাই, এ জগতে যে দুইরই লীলা! পুরুষের প্রকৃতি চাই, প্রকৃতির পুরুষ চাই! কে গো তোমরা আমার অনাত্মীয়, অপরিচিত বিপন্ন পরিবার, তোমাদের শুভ হোক্ মঙ্গল হোক্, আমার ন্যায্য যাহা, প্রাপ্য যাহা, তোমাদের নিমিত্ত আমি আজ তাহা লাভ করিতে বসিয়াছি। স্রোতহীনা ক্ষুদ্র নদীটি এতদিন বালুর স্তর বক্ষে লইয়া কাঁদিয়াই মরিয়াছে, বালির বাঁধ

ভাঙ্গিয়া সাগর সঙ্গমে ছুটিবার তাহার সামর্থ্য ছিল না। তোমাদের বিপদরূপ প্রবল বারিধারায় আজ কঠিন বাঁধ কাটিয়া শীর্ণা নদীর পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। তোমরা আমার পর নও, তোমরা আমার আপন. চির আপনার গো! তোমাদের কল্যাণ হোক্।

আমি স্পন্দিত বক্ষে ধীরে ধীরে বলিলাম "কোথায় আমায় যেতে হ'বে? কি করতে হবে বল, কাদের বিপদ?"

"এখানে রেল-লাইনে একটি বাঙ্গালী বাবু কাজ করেন। তাঁর বসন্ত হয়েছে, খুবই সাংঘাতিক হয়েছিল, এখন অনেকটা ভাল হয়েছেন। কিন্তু সংসারে তাঁর একটি ছোট ছেলে আর স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই, ক'দিন হ'ল স্ত্রীর খুব জ্বর হয়েছিল, কাল গা ময় বসন্ত বেরিয়েছে। এখন ছেলেটিকে বাড়ী ছাড়া না করতে পাল্লে বাঁচানো যাবে না। এ বিদেশে ছেলের ভার কে নেবে? বাবুটি বলেছিলেন "আমরা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার স্ত্রী যদি দয়া করে ছেলেটার ভার নেন, তাহলে ও বাঁচতে পারে।" ছোট ছেলে সে কিছুতেই আমার সঙ্গে আসবে না। তুমি গিয়ে যদি ভুলিয়ে টুলিয়ে আন্‌তে পার, তাহলে আস্‌তে পারে।"

পীড়িতা মাতার বিপন্ন শিশুর ভার লইতে হইবে, যে শিশুর দল আমার স্নেহের ধন, স্বামীর অনুরোধে তাহারই একটিকে আমার তাপদগ্ধ বুকে আশ্রয় দিতে হইবে! এ কি আমার অপ্রিয়! এ কি আমার অসাধ?

বলিলাম—"আমি আন্‌তে গেলে ছেলে আস্‌বে বৈ কি, ছেলে পিলে খুব সহজে আমার বাধ্য হয়ে যায়। তাকে আমি অনায়াসেই আনতে পারবো। কিন্তু তার বাপ মা'কে দেখবে শুনবে কে? তাঁদেরও তো সেবা শুশ্রূষা করবার লোক চাই?"

"চাই বৈকি, এতদিন খোকার মা খোকাকে দাইয়ের কাছে রেখে—প্রাণপাত করে স্বামীর সেবা করেছেন। এইবার মুস্কিল হয়েছে। আমি সেবা করবার লোক ঠিক করেছি। হাঁস পাতালের নার্সের কাছে খবর পাঠিয়েছি। তাঁদের সেবা যত্নের জন্যে যতদূর যা করতে হয়, তা আমি করবো। তুমি শুধু খোকাকে বাঁচাও। ছেলেটি বড় সুন্দর, দেখলে ভারী মায়া হয়। স্বদেশ ছেড়ে, স্বজন ছেড়ে ভদ্রলোক এখানে এসে কি বিপদেই পড়েছেন!"

জিজ্ঞাসা করিলাম "তাঁদের বাংলা কত দূর? ওঁরা কত কাল হ'ল এখানে এসেছেন, দেশে কি কেউ নেই?"

স্বামী বলিলেন,—"ভদ্রলোকের আপনার জন নাকি কেউ বড় নেই। অল্পদিনই হ'ল এখানে বদলী হয়েছেন। ষ্টেশনের কাছেই ওঁরা থাকেন, সেখানে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এখন তা হলে কিষণকে গাড়ী আন্‌তে পাঠিয়ে দিই,—তুমি তৈরি হয়ে নাও।" বলিয়া স্বামী কিষণের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

আধ-মিনিট

উকীল (মক্কেলের প্রতি) জান তুমি যে কাজ করেছ, সেটা সম্পূর্ণ বে-আইনী হয়েছে,—কি অন্যায় করেছ নিজেই বেশ বুঝছ ত?

মক্কেল—আজ্ঞে হ্যাঁ জানি; সেই জন্যই ত আপনার শরণ নিয়েছি!

———

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

জরুরী টেলিগ্রাম।

আমরা একটা কথা বলি নাই। ঈশানী যখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল, তখন সে চারি মাস অন্তঃস্বত্ত্বা হইয়াছিল। এই অবস্থা তাহাকে কিছু রুগ্না ও পাণ্ডুবর্ণা করিয়াছিল। তাহার উপর মহা পিতৃশোকে সে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবসন্ন দেহ, পাণ্ডুবর্ণা, রুগ্না এবং সসত্বা পত্নীতে শরৎকুমারের আর কোনও আস্থা ছিল না। তাহার প্রেম প্রেম নহে, একটা নিকৃষ্ট বাসনা সম্ভূত আকর্ষণ মাত্র। ঈশানীর বর্ত্তমান অবস্থায় সে এই আকর্ষণ দেখিতে পায় নাই। তাই সে লোলুপ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল।

প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল শ্যামা স্নিগ্ধা কল্যাণীর উপর।—আহা! কি স্বাস্থ্য পূর্ণা রমণীয়া যৌবন শ্রীই তাহার কোমল দেহকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে! সে কি তাহার মধুময় মুখে হাসি দেখিতে পাইবে না? সে এই হাসি মুখ দেখিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়া পড়িল। তাহার সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার জন্য অবসর খুঁজিতে লাগিল।

তাহার পাপ অভিপ্রায় বুঝিয়া অত্যন্ত ঘৃণায় কল্যাণীর মুখ গম্ভীর হইল।

বুদ্ধিমতী প্রমদা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার অদ্ভুত জামাতা ঐ কাল রূপের ভিতর কি প্রলোভন দেখিতে পাইল যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে ছাড়িয়া, ঐ কাল রূপের উপাসনা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল? যাহা হউক, প্রমদা এক্ষণে জামাতার চরিত্রের সন্ধান পাইয়া সতর্ক হইলেন। কল্যাণীর গতিবিধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন।

সুতরাং শরৎকুমারের উপযুক্ত সৎসাহসের এবং সুবিধা মত সুযোগের একান্ত অভাব হইল। তাহার উপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা হইয়া যাওয়ায় এবং শ্রাদ্ধকালে দস্যুবৎ ঘোরকায় যদুপতি উপস্থিত থাকায় এবং কল্যাণীকে লইয়া শ্রাদ্ধের পরই সে সিরাজগঞ্জে প্রস্থিত হওয়ায় শরৎকুমারের আর কল্যাণীর হাসিমুখ দেখিবার অবসর হয় নাই। সে কেবল যুবতী শ্যালিকার প্রেমাল্পতা দেখিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; এবং পরিপক্ক দ্রাক্ষা ফল প্রত্যাশী শৃগাল যেমন কোনও ক্রমে দ্রাক্ষাফল লাভ করিতে না পারিয়া তাহার মধুরতার নিন্দা করিয়াছিল, সে তেমনই কৃষ্ণবর্ণা শ্যালীর রূপের নিন্দা করিয়াছিল।

কিন্তু তখনও সুপ্রেমিক শরৎকুমার প্রেমাচরণে আলস্য করে নাই। অপর কোনও সুপ্রাপ্য পাপ খুঁজিয়া না পাইয়া সে পত্নীর গজদন্তবিশিষ্টা এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্থা মাতুলানীর গজদন্তের হাসি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রথমে মাতুলানী জামাতার অন্তর্নিহিত প্রেমতত্ত্বের কোন সংবাদ না রাখিয়া, তাঁহার প্রতি জামাতার ব্যবহারটা ধনাঢ্যের সুসভ্য পুত্রের উপযুক্ত মধুর ব্যবহার মনে করিয়া একটু সুখিনী হইয়াছিলেন; এবং গজদন্তের একটু হাসি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে সুসভ্য জামাতাটি পত্নীর মাতুলানীর সহিত প্রেমলীলা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাহার সেই গজদন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া, এমন স্পষ্টভাবে খিচাইলেন যে, শরৎকুমারের ন্যায় নবীন প্রেমিকও তাহা প্রেমময়ীর মধুর হাস্য বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না। কিন্তু বিকশিত দন্তা মাতুলানী কেবল দন্ত খিচাইয়া ক্ষান্তা হয়েন নাই; তিনি ভৃত্যগণের সমক্ষেই সুসভ্য জামাতাকে এমন সব অনভিধানিক অপভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া বুদ্ধিমতী প্রমদাও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

ইহার পর শ্রাদ্ধের পর একমাস কাল বিগত হইতে না হইতে এবং শোকাকুল প্রমদার শোকব্যথা সম্যক উপশম হইতে না হইতে, আপন স্বামীর বুদ্ধিহীনতার বিষয় বিশেষ রূপে সপ্রমাণিত করিয়া এবং ভগিনী-প্রসাদ-ভোজী নিষ্কর্ম্মা স্বামীর হীন মস্তক গজদন্তে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিতে করিতে পল্লীগ্রামে স্বামীর হীন আবাসে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাহাতেই আবার মনের সুখশান্তি ফিরিয়া পাইলেন। আহা, পল্লীর এই মুখরা স্ত্রীগণ কি মধুরা! তাহারা ক্রোধবশে স্বামীকে কটূক্তি করিতেই শুধু জানেনা, সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উপাদেয় ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে জানে; স্বামীর আবাস বাটীকে ভাল করিয়া গোময় লেপন দ্বারা লক্ষ্মীর সিংহাসনের মত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে জানে।

যদিও ভ্রাতৃজায়ার সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহাকে বিদায় দিয়া বুদ্ধিমতী প্রমদা কতকটা নিশ্চিন্তা হইলেন, এবং একটা ব্যয়াধিক্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এক্ষণে জামাতাকে কন্যার সম্পূর্ণ অনুগত দেখিয়া প্রমদা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধিপূর্ব্বক এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন বাটী ভাড়া মাসিক চল্লিশ টাকা বাঁচাইবার জন্য প্রথমেই তিনি বৃহৎ বাটীটি ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার ভবিষ্যৎ বাস জন্য অখিলবাবু যে ক্ষুদ্র বাটীটি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে উঠিয়া গেলেন; তাহাই একমাত্র বিধবার এবং মাঝে মাঝে কন্যা জামাতার বাসের পক্ষে যথেষ্ট। একজন বিধবার রন্ধন জন্য একটা দশ টাকা বেতনের পাচক নিযুক্ত রাখা, এবং তাহার খোরাক পোষাক যোগান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বোধে তাহাকে বিদায় দিলেন। স্ত্রীলোকের সংসারে পুরুষ ভৃত্যের কোনও দরকার হইবে না বুঝিয়া তাহাকেও বিদায় দিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু জামাতা বাটীতে অবস্থিতি করায় তাঁহার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া আপাততঃ অভিলাস কার্য্যে পরিণত করিলেন না। তাঁহার অলঙ্কার মধ্যে দুই একটি ঈশানীর জন্য রাখিয়া বাকী সমস্ত বিক্রয় করিয়া ষোড়শ শত মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন। এই টাকা এবং তাঁহার হস্তে যে ছয় হাজার চারিশত টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহা জামাতার বিশ্বস্ত হস্তে সমর্পন করিয়া কহিলেন যে, এই টাকা ঈশানীর নামে কোনও ব্যাঙ্কে বেশী সুদে জমা দিয়া, বৎসর বৎসর তাহার সুদ বাহির করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবে। শতকরা ছয় টাকা সুদে ঐ আট হাজার টাকা জমা দিতে পারিলে বৎসরে চারিশত আশী টাকা পাওয়া যাইবে; অর্থাৎ মাসিক চল্লিশ টাকা হইবে। বুদ্ধিমতী প্রমদা স্থির করিলেন যে, তাহাতেই তাহার মত একজন স্বল্পাহারী বিধবার একবেলা একমুঠা আলোচাল একরকম করিয়া চলিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত অখিলবাবুর পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল। প্রমদা স্থির করিলেন যে এই কোম্পানীর কাগজের বার্ষিক সুদ হইতে অতিরিক্ত কোনও ব্যয় উপস্থিত হইলে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। প্রমদা স্থির করিলেন যে এই কোম্পানীর কাগজও সহায়হীনা বিধবার কাছে না রাখিয়া বহু সহায় সম্পত্তিযুক্ত তাঁহার সবচেয়ে বেশী আত্মীয় পুত্রাধিক জামাতার হস্তে গচ্ছিত রাখাই বুদ্ধির কার্য্য হইবে। আর অখিলবাবু তাঁহার নামে যে চারি হাজার টাকার লাইফ্ ইন্সিওর করিয়া গিয়াছিলেন তাহার টাকা বাহির হইলে পরে বিবেচনা মত ব্যবস্থা করা যাইবে।

তোমরা বলিবে জামাতাকে চরিত্রহীন জানিয়াও প্রমদা তাহার হস্তে তাঁহার সমস্ত সম্বল ন্যস্ত করিয়া ভাল করেন নাই। কিন্তু বুদ্ধিমতী প্রমদাও কখন জামাতাকে ঠিক চরিত্রহীন বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কালামুখী কল্যাণী বাপের বাড়ীতেও ইদানিং যেমন আড় ঘোমটা টানিয়া বেহায়ার মত পঁই পঁই করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাতে বড়লোকের ছেলে ত একটু আধটু নজর দিবেই; তিনি সময় মত সতর্ক না হ'লে, কালামুখী কি করিয়া বসিত, তাহা কালামুখীই জানে। আর শ্যালীকে কে না অমন একটু আধটু ঠাট্টা তামাসা না করিয়া থাকে? তা' বলিয়া শ্যালীকে কি অমনই ঢলিয়া পড়িতে হইবে? তাহার ভ্রাতৃজায়ার প্রতি জামাতার আচরণের কথা তিনি কেবল ভ্রাতৃজায়ার মুখে কটু ভাষাতেই শুনিয়াছিলেন। অমন সুরূপ ও সুসভ্য জামাতা, অমন সুন্দরী স্ত্রী থাকিতে যে অমন কদাকারা, দন্তুরা, তৈলগন্ধা পল্লীবাসিনীর প্রতি কখনও অনুরক্ত হইতে পারে, একথা তিনি কখনও

বিশ্বাস করিতে পারেন নাই ; ভ্রাতৃজায়ার উক্তিগুলা কটু-ভাষিণী মিথ্যাবাদিনীর উক্তি বলিয়াই প্রমদা বরাবর সন্দেহ করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া প্রমদা জামাতা বা তাহার পিতার কোনও দোষের কথা কখনও অবগত হইতে পারেন নাই। ঈশানী তাহার শ্বশুরালয়ে যাহা দেখিয়াছিল তাহা মাতার নিকট কখনও প্রকাশ করে নাই। এদেশের মৃদুস্বভাবা বালিকা-গণের নিকট শ্বশুরালয় বড় গৌরবের জিনিষ ; তাহারা কি কাহারও কাছে সেই শ্বশুরালয়ের কোন নিন্দার কথা প্রকাশ করিতে পারে ?—না, আপন গর্ভধারিণীর নিরাপদও নিভৃত কর্ণেও তাহারা সেই নিন্দার কথা পৌছিতে দেয় না। এতদ্ব্যতীত ঈশানী সর্ব্বদা পিতৃশোকে আচ্ছন্ন থাকিয়া মাতার বৈষয়িক কার্য্যকলাপ বড় একটা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইত না। শিখরবাবুর অস্থায়ী পদচ্যুতির সংবাদ যদিও সংবাদ পত্রে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু স্বামীর পীড়ার সময় হইতে স্বামী কোনও সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া স্বামী সেবারতা প্রমদাকে কোনও সংবাদ দিতে পারিতেন না বলিয়া, প্রমদা তৎসংবাদও অবগত হইতে পারেন নাই। এজন্য আমরা বুদ্ধিমতী প্রমদার বুদ্ধির নিন্দা করি না।

শরৎকুমার এইরূপ অনায়াসে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অর্থ হস্তগত করিতে পারিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইল ; এবং গর্ভবতী পত্নীকে প্রসব জন্য পিত্রালয়ে রাখিয়া ঢাকায় ফিরিবার এবং তথায় নূতন স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সে অল্পদিন মধ্যেই ঢাকায় ফিরিবার সুযোগ পাইল, কিন্তু তথায় কোনও স্ফূর্ত্তি করিবার সুযোগ ঘটিল কিনা আমরা পরে দেখিব।

অখিলবাবুর শ্রাদ্ধ কার্য্য হইয়া যাইবার প্রায় দুই মাস পরে শরৎকুমার আহারাদি করিয়া পত্নীর পার্শ্বে নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া যখন দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, তখন প্রমদা আসিয়া রুদ্ধ কক্ষদ্বারে করাঘাত করিলেন।

ঈশানী ঘুমায় নাই। শুইয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। সে উঠিয়া কক্ষদ্বার অনর্গলিত করিয়া দেখিল মাতা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সে উদ্বেগপূর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ?'

মাতা বলিলেন, 'শরৎকুমারের নামে একখানা জরুরী টেলিগ্রাম এসেছে। তাকে উঠিয়ে দে।"

টেলিগ্রামের নামে একটা অনিশ্চিত মহাবিপদের আশঙ্কায় ঈশানীর পিতৃশোকাকুল বক্ষঃ কাঁপিয়া উঠিল। সে সত্বর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তাহার প্রেমস্নিগ্ধ হস্ত স্বামীর গাত্রে আদরে বুলাইয়া দিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল।

শরৎকুমার নিদ্রারক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। পত্নীর নিকট সংবাদ শুনিয়া সত্বর তারের জরুরী সংবাদ লইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লিখিত আছে, "ভয়ানক বিপদ—শীঘ্র এস।"

(ক্রমশঃ)

কিশলয় *

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ. এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্]

কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে একখানি কবিতাপুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। কবিতাগুলি তাঁহার কন্যা (বাঙ্গালার বরেণ্য সন্তান ৺স্যর আশুতোষ চৌধুরীর পুত্রবধূ) শ্রীমতী লীলাদেবীর রচিত। আমরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া উহার ভাবের মাধুর্য্যে ও গভীরতায়, ভাষার সারল্যে ও প্রাঞ্জলতায় এবং রুচির বিশুদ্ধি ও নির্ম্মলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কতকগুলি কবিতা কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। যতীন্দ্রবাবুও কবিতাগুলি তরুণ বয়স্কা কবির পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য বিবেচনা করেন এবং সাদরে সেগুলি তৎসম্পাদিত "যমুনা" মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর অনেক সাময়িক পত্রে শ্রীমতী লীলাদেবীর বহু উৎকৃষ্ট কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হইতে থাকে এবং সেগুলি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত হইতেছে দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করি। সাময়িক পত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা রণেন্দ্রবাবুকে বহুবার অনুরোধ করি এবং এক্ষণে সেগুলি গ্রন্থকারে নিবদ্ধ হইতে দেখিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম।

আমরা বাণীর মন্দিরে "কিশলয়ে"র তরুণী রচয়িত্রীকে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালাদেশে আর যাহারই অভাব থাকুক না কেন, তথাকথিত কবিতা পুস্তকের অভাব নাই, এবং আমরা সচরাচর সেই সকল কবিতাপুস্তকের পক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার অনুমোদন করি—

"চাঁড়ালের হাত দিয়ে পোড়াও পুস্তকে!
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা জলে!—"

কিন্তু উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠ করিলে,—যে কবিতা পাঠ করিলে হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও উচ্চ ও মহানভাবে উদ্বুদ্ধ হয়—সেইরূপ কবিতা দৃষ্টিগোচর হইলে কাহার হৃদয় বিমল আনন্দরসে আপ্লুত হয় না?

"দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত রসে।"

অতি উচ্চশিক্ষিত, প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের কন্যা বা বধূর রচিত কবিতায় যদি উন্নতরুচি, মহানুভাব ও গভীর ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিতে না পাইব তবে তাহা আর কোথায় সন্ধান করিব? বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এরূপ সদ্ভাবে পরিপূর্ণ, যে ইহাই আধুনিক কাব্যসাহিত্যে গ্রন্থখানিকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকৃত করিতে সাহায্য করিয়াছে। গ্রন্থের আর একটি গুণ, উহাতে অন্তর্নিহিত ভাবগুলি কবির কষ্ট কল্পনাপ্রসূত নহে, উহা কবির হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত এবং কবি "শবদে শবদে বিয়া" দিবার জন্য ভাবকে ক্ষুন্ন করিয়া তাহাকে ভাষার নিগড়ে বাঁধিবার চেষ্টা করেন নাই। কবি স্বয়ং বলিতেছেনঃ—

"ভাষার নিগড় দিয়ে ভুবনে বরিয়া
পারিনা ভাবেরে আমি বাঁধিবারে আর,
সুললিত ছন্দসুরে বিচিত্র করিয়া
গাঁথিতে পারিনা নিত্য সুচিকণ হার!
অন্তর বাহির সারা নিখিল ভুবনে,
ভাব মোর ছেয়ে আছে অসীম হইয়া;
হে দুরন্ত! হে চপল! তুমি ক্ষণে ক্ষণে
সীমা হতে অসীমেতে যাও যে লইয়া!
আমি যত সযতনে গুছাইয়া বলি,
ভাবেতে পরাতে যাই সোণার শিকল,
তত তুমি যাও তারে ছড়াইয়া চলি,
আমি নারি গাঁথিবারে ছিন্ন ফুলদল!

*"কিশলয়"—শ্রীমতী লীলাদেবী প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

হে উদ্দাম ! সাজে তব এ দুরন্তপণা ?
আমার হৃদয় সে যে ক্ষুদ্র এক কণা !"

সেইজন্য বহু অব্যক্ত ভাব ও অকথিত বাণী কবির হৃদয় হইতে তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার অশ্রুর সহিত কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

"কি বলিব আর, নাহি বলিবার, কথা হয়ে গেছে শেষ,
কথার অতীত যে বাণী তাহার সাজেনা ভাষার বেশ !
সে থাক্ এমনি লুকায়ে গোপনে অন্তরে চিরদিন
সে থাক্ আমার মরমের মাঝে করমের সাথে লীন !
নীরব নিবিড় প্রাণের মাঝারে থাকুক সে ভালবাসা,
ভাবেতে বিভোর অশ্রুর মাঝে ঝরুক তাহার ভাষা !"

আধুনিক যুগের অন্যান্য অনেক কবির মতন লেখিকার কবি-প্রতিভার উপর সেই—বিশ্ববরেণ্য কবির কিছু প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে—যাঁহার

"নন্দ ললিত ছন্দ রচন
কান্ত কোমল গানের বচন
ক'রল সৃজন সপ্ত ভুবন
সিন্ধু অবিনাশী !"

কিন্তু ইহাতে অগৌরবের কিছুই নাই,—কারণ এরূপ প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নহে। বরঞ্চ এরূপ প্রভাব সত্ত্বেও যে লেখিকা নিজের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন এবং মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই কবির বিশ্বপ্রেমের গভীরতা উপলব্ধ হয় ;—

"আমার যা কিছু হারায়ে গিয়াছে
ফুরায়ে গিয়াছে দানে,
ছড়ায়ে গিয়াছে নিখিল ভুবনে
হাজার হাজার প্রাণে !

*　　*　　*

তাই আজ আমি কাঙ্গাল হে স্বামী !
শূন্য আমার সব !
সবার মাঝারে আমার প্রাণের
পাই আজ অনুভব !"

গ্রন্থের সুলিখিত ভূমিকায় মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী যথার্থই বলিয়াছেন,'সবার মাঝারে আমার প্রাণের পাই আজ অনুভব' এই এক ছত্রে আমরা তাঁহার সাধনার সিদ্ধি-সূচনা দেখিতে পাই ; এবং তিনি যে স্বভাবকবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।" এই ভাব আরও অনেকগুলি কবিতায় প্রকটিত হইয়াছে ;—

যথা,—

"সবার পায়ের ধুলায় যখন আসন পেতেছি আজ,
তার চেয়ে বড় তীর্থ কোথায় বিপুল ভুবন মাঝ ?
সবার চোখের জলেতে যখন মিশিল চোখের জল,
তার চেয়ে বড় এ জগতে কোথা কোন সঙ্গম স্থল ?
সবার সুখের হাসিতে যখন হাসিতে পেরেছি সুখে,
তার চেয়ে বড় স্বর্গ আছে কি দূর ত্রিদিবের বুকে ?

অথবা,—

প্রাণের মাঝে যে প্রেম জাগে ফুরায় না তা ফুরায় না,
চোখের মাঝে যে প্রেম জ্বালা জুড়ায় না তা জুড়ায় না,

*　　*　　*

সবার লাগি বিলায় যে ধন বিভব যে তার অফুরণ,
নিজের তরে রাখলে পরে অভাব চির অপুরণ।

*　　*　　*

ছড়িয়ে দে' ভাই ছড়িয়ে দে' ভাই নিজের বলে র খিস্ নে
কাঙ্গাল হ'য়ে হ'না রাজা স্বরাজকে আর ঢাকিস্‌নে !

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় লেখিকার গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেগুলি পাঠ করিলে হৃদয় উন্নত হয়।

যথা,—

হঠাৎ যদি বয় অনুকূল বায় !
হঠাৎ যদি তরী আমার কূলে লেগে যায়
দয়ায় সে যে তোমারি দয়ায় !
হঠাৎ ভরে ধারায় মরু
পুষ্পে সাজে শুষ্ক নো তরু
হঠাৎ আমার হাতের কুসুম পড়ে তোমার পায়
দয়ায় সে যে তোমারি দয়ায় !
হঠাৎ যদি আঁধার কায়া
আলোকে হয় উজল পারা
শীতের রাতি হঠাৎ যদি বসন্ত মাতায়
দয়ায় সে যে তোমারি দয়ায় !

আমার এধর গহন পারে
অতিথ যদি দাঁড়ায় দ্বারে
হঠাৎ যদি পাই হে দেখা নব বকুল ছায়
দয়ায় সে সে যে তোমারি দয়ায় !

নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় নিবদ্ধ ভাব কেবলমাত্র এদেশেরই কৃষ্ণ প্রেমানুরাগিণী সাধ্বী রমণীর রচনায় সম্ভব :—

দাসী হ'য়ে তব দেখা ক'রে নাথ দূর হ'তে শুধু হেরি
পুরে না পিয়াস কিসের তিয়াস সারা বুক ওঠে ভরি,
জননীর মত ভালবাসি আর জনকের মত পূজি
তৃপ্ত যে তায় হয় না হৃদয় তবুও কি যেন খুঁজি,
তনয়ের মত স্নেহের ধারায় আদর করিয়া তোরে
তাতেও কি যেন বাধা থেকে যায় ভাসি যে নয়ন-লোরে ;
বন্ধুর মত নিবিড় প্রণয়ে পরাণের কথা কয়ে,
মেটে বটে সাধ তবুও কিসের ব্যবধান যায় র'য়ে ;
ওগো চির সাথী জগতের নাথ চির জনমের স্বামী !
পতিরূপে যবে বসাই হৃদয়ে সার্থক হই আমি,
থাকে না তখন ভাবনা করম তুমি আমি এক হই,
তোমার বিরাট বিশাল বক্ষে কি সুখে ঘুমায়ে রই ;
আপনারে আমি নিঃস্ব করিয়া তখনি সঁপিতে পারি,
শুধু পূজনীয় প্রভু নয় যবে দয়িত হৃদয় হারি !

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের পদরজঃপূত এই দেশের রমণীগণের হৃদয়েই এইরূপ ভাব উত্থিত হইতে পারে !—

"এ হৃদয় হ'ত যদি আকাশ অসীম,
তুমি যদি হ'তে ওগো চাঁদ
কত বক্ষ কোটী যুগ বুকেতে ধরিয়া,
তবু কি মিটিত মোর সাধ ?
এই বক্ষ হ'ত যদি ধরণী অশেষ,
তুমি হ'তে নব দূর্ব্বাদল
প্রতি লোমকূপে মোর থাকিত ভরিয়া
তবু তৃপ্ত হ'ত হিয়াতল ?
এ নয়ন হ'ত যদি চির অপলক,
অনিমেষ চেয়ে মুখপানে
তোমার দেখার সাধ মিটিত কি তবু ?
পলকে নূতন তুমি প্রাণে।
এই দেহ হ'ত যদি জলধি অপার,
তুমি তার ঢেউ অগনণ
শ্রান্ত কি হতাশ তবু ব্যাকুল বেষ্টনে
পুরাতন হ'ত আলিঙ্গন ?"

কেবল ভক্তিবিষয়িণী কবিতা নহে, নানা বিষয়িণী কবিতায় লেখিকা তাঁহার প্রশংসনীয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ভাইফোঁটা" শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম :—

শুভকাজ সমারোহ; হর্ষ কোলাহল,
কুসুম চন্দন মাল্য গন্ধ নিরমল
স্মিত মুখে কত সুখে কুল পুরনারী
উতলা গবাক্ষ পথে লোচন প্রসারি :
কখন আসিবে প্রাণ প্রিয় সহোদর,
দিবে ফোঁটা কত সাধে ললাট উপর !
ভ্রাতৃহীনা অতি দীনা সে দিনে নীরবে,
এমন সবার মত সে কবে বা দিবে
ভায়ের কপালে ফোঁটা এমনি আদরে ?
ভাবি তার দুটী আঁখি ছল্ ছল্ করে !
কুমুদ কহ্লার ফোটা পল্বলের ধারে,
কাশ ফুলে ছাওয়া মাঠ ছিল পর পারে ;
সোণালী ধানের শীষ তার গায়ে আঁকা,
শেফালি পরাণ সেই পথ ছিল বাঁকা ;
গাভী আর একদল বালক আভীর,
বেণু হাতে যেতে যেতে দেখে কিশোরীর
জলভরা চোখ আর মধুর আনন.
বলে "আজ ভাই ফোঁটা, কাঁদ কেন বোন্ ?
আমরা যে ভাই তোর আছি অগণন
গরীবের ছেলে ব'লে পাব না কি মন ?"
সুখাকুল বালিকার কথা নাহি আসে,
অশ্রু চন্দনের ফোঁটা দিল সে উল্লাসে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কবিবর হেমচন্দ্র নারী জাতির উন্নতি-কামনায় বজ্রনির্ঘোষে তাঁহার দেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আজ একজন নারী বাঙ্গালার রমণীসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দেশভ্রাতৃগণের নিকট যে প্রার্থনা জানাইতেছেন তাহাও কি তাঁহাদিগের প্রাণে আঘাত করিবে না ?

* * *

"রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ কারায় যায় যায় যায় হ'য়েছে প্রাণ,
দাও হে মুক্তি দাও স্বাধীনতা ঘুচাও মোদের এ অপমান।
ভারতের কোটি কোটি নারী আজি হে পুরুষ তব চরণতলে,
মাগিছে ভিক্ষা দাও হে দীক্ষা ডুবিল ভারত নয়ন জলে!
কঠিন কারার শৃঙ্খলহার হাজার বছর বহি যে হায়।
স্নিগ্ধ বাতাস সুনীল আকাশ ধরার শ্যামল দেখা না যায়,
লৌহ প্রাচীর ভেদিয়া কখন, অন্ধকারের ভেদিয়া বুক
উদিত না হয় জ্ঞানের সবিতা, হেরি না কখন রবির মুখ।
বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে, শুধুই মিথ্যা আশার ছল,
ওগো ভারতের ত্যাগী ঋষি জ্ঞানী মুছাও মোদের নয়ন জল।
দাও ছেড়ে দাও কর্ম্মের মাঝে চলিব ধরিয়া স্বামীর হাত,
দাও মিটাইতে জ্ঞানের পিপাসা ফুটুক আলোক ঘুচুক রাত।
দাও স্বাধীনতা অম্লান মুখে তুচ্ছ করিব মিথ্যা ভয়.
ন্যায়ের পথেতে বিবেক রথেতে দারুণ শত্রু করিব জয়।
দাও খুলে দাও বদ্ধ দুয়ার অন্ধ করিয়া রেখো না চোখ,
মাঠের হাওয়ায়, সবুজ ধরায়, বিটপীর ছায়, ভুলিব শোক।
স্বার্থদুষ্ট হীনতা দৈন্যে লক্ষ নারীর পরাণবলি,
সহে না যে আর দাও প্রতিকার আগের গর্ব্বে চলিব দলি--
—ধর্ম্মের নামে সমাজের হেয় রমণীবধের এ প্রতারণা,
যে চায় দাও হে থাকিতে কুমারী তাপসিনী নারী শুদ্ধমনা।
তোলে প্রেমে যোগে অতুল প্রতিভা উঠিবে ফুটিয়া সাধনা বলে,
আবার ভারত তপোবনে বনে হোমের বহ্নি উঠিবে জ্বলে!"

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। কবিতাগুলির মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া আমরা অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু ইহাতেও পাঠকগণ গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন কি না সন্দেহ। আমরা কাব্যরসজ্ঞ পাঠকগণকে মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন 'যে জীবনে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতাসাধন তাহার বিড়ম্বনা'। মাননীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী লিখিয়াছেন "লেখিকার মর্ম্মস্থানে দারুণ আঘাতে অপূর্ব্ব অমৃতের উৎস সৃষ্ট হইয়াছে।" কিন্তু আজিকার দিনে আমরা কেবলমাত্র দুঃখের ও বৈরাগ্যের গান আর শুনিতে চাহি না। দেশে যে নব জীবনের সাড়া পড়িয়াছে, আমরা তাহার উপযোগী উদ্দীপনাময়ী গীতি-কবিতা চাহি। লেখিকা আলোচ্য গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে উদ্দীপনাশক্তি দেখাইয়াছেন, আমাদের বিনীত প্রার্থনা তিনি সেই শক্তির যথোচিত অনুশীলন করিয়া তাঁহার দেশভ্রাতৃগণকে ভবিষ্যতে নূতন গান শুনাইয়া উদ্বোধিত করুন, যাহাতে "মরা মানুষ উঠবে বেঁচে" এবং

"ছেড়ে লোক লজ্জা সমাজ-ভয়,—
যাতে সবাই আবার মানুষ হয়।"

আশা করি আমাদের এ প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না।

এই গ্রন্থের বহিঃসৌষ্ঠবের কথা না বলিলে গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত স্বদেশী তুলোট কাগজে আর্ট প্রেস দ্বারা পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। আর্টপেপারে সুমুদ্রিত, শিল্পী শ্রীমান আর্য্যকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক গৃহীত বহু-সংখ্যক আলোকচিত্র দ্বারা গ্রন্থখানি সুশোভিত। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটিও অতি সুন্দর। বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প গ্রন্থই এরূপ অভিনব সজ্জায় ভূষিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন

বিদেশী কোম্পানীর মারফতে বিদেশী বার্ত্তা এদেশে আমদানী হয়। সংবাদ সত্য হোক মিথ্যা হোক—আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। প্রচারিত কোন সংবাদের যখন প্রতিবাদ করা হয়, চারিদিক হইতে যখন ঐ সংবাদ ভীত্তিহীন, মিথ্যা বলিয়া সোরগোল উঠিতে থাকে, তখন ঐ বার্ত্তা-প্রচারকারী বিদেশী কোম্পানী একদম চুপ মারিয়া যায়, জবাব দিহির বেলায় তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হয় না।

চীনের রাষ্ট্রপতি ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন—শুনিতেছি আর ইহজগতে নাই। তিনি এরকম 'নাই' ইতিপূর্ব্বে আরো দুইবার হইয়াছিলেন—বারের বার তিন বারের পালায় এবার হয়তো সত্য সত্যই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

যদি সংবাদ সত্য হয় তবে বলিতেই হইবে যে চীনের আজ বড় দুর্দ্দিন। রাষ্ট্র বিপ্লবের পর এখন পর্য্যন্তও চীন দেশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। দেশ প্রেমিক, মহাপ্রাণ, অক্লান্তকর্ম্মী সান্-ইয়াৎ-সেন চীনদেশে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আজীবন যে দুঃখ, যে লাঞ্ছনা তিনি ভোগ করিয়াছেন, জীবনের প্রান্ত সীমায় আসিয়া তাহার সার্থকতা তিনি দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে বিশাল শান্তিরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা অহর্নিশ দোল্ খাইতেছিল—সেই কল্পিত শান্তি রাজ্যের প্রতিষ্ঠান তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

ডাক্তার সান্-ইয়াৎ-সেন ছিলেন চীনের পুরুষ-ভাস্কর। এই প্রদীপ্ত পুরুষ-সূর্য্যের অস্তগমনে চীন সাধারণ তন্ত্রের ভাগ্যাকাশ আজ ঘন তমসাচ্ছন্ন হইল। তিনি যে পথে দেশকে পরিচালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহার অভাবে তেমন পরিচালনদক্ষ স্বদেশ প্রেমিক বীর তাঁহার অভাব পূরণ করিতে পারিবে কি না কে জানে?

তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় স্বদেশের মুক্তি কামনায় তাহা আগাগোড়া সংগ্রামময়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টন জেলায় তাঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই পাঠশালার গুরুমহাশয়টীই অতি শৈশবে সান্ ইয়াৎ-সেনের মাথায় যে বিদ্রোহ বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন তাহারই শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবনটীকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। শিক্ষকটী প্রথমে রাজকার্য্য করিতেন কিন্তু মাঞ্চু রাজ-পরিবারের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজকার্য্য চলিয়া যায় এবং তিনি সেই প্রদেশে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সুতরাং এই শিক্ষকটী যে মাঞ্চুদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন তাহাতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা থা কতে পারে না।

বালক সানের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসীম সাহসের পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় তাহাকে দেশোদ্ধার মন্ত্রে দীক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই দীক্ষার ফলেই তিনি প্রাপ্ত বয়সে উপযুক্ত ডাক্তার হইয়াও দেশের কল্যাণ কামনায়, তাঁহার সেই অর্থকরী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি যে প্রদেশে জন্মিয়াছিলেন তাহা ছিল একটা পর্ত্তুগীজদের উপনিবেশ। হংকং হইতে তিরিশ মাইল দক্ষিণে এই প্রদেশ স্থাপিত। সানের পিতা ছিলেন দীক্ষিত খৃষ্টান এবং লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর তিনি ছিলেন ঐ প্রদেশের এজেণ্ট। বালক সান্ ছোটবেলা হইতেই মিশনারীদের সঙ্গে থাকিয়া, একজন ইংরেজ মহিলার নিকট ইংরাজী ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সের সময় তিনি হংকং মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি ডিপ্লোমা পাইয়া ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাকাও নামক স্থানে তিনি প্রথম ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেটা একটা পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ বলিয়া তাঁহাকে সেখানে ডাক্তারী করিতে দেওয়া হইল না, কারণ আইন রহিয়াছে যে পর্ত্তুগীজ-ডিপ্লোমা-ধারী না হইলে সেখানে কেহ ডাক্তারী করিতে পারিবে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ক্যাণ্টনে চলিয়া আসিতে হইল।

এই ক্যাণ্টনে আসিয়া ডাক্তার সান্ একটী দলের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল—হয় এস্পার, নয় ওস্পার—মাঞ্চু রাজত্বের হয় সংস্কার না হয় সংহার করিতে হইবে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই সঙ্কল্প পরিকল্পিত হয় কিন্তু অল্পদিনের ভিতরেই আঠার জন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সতের জন ধরা পড়ে। এবং রাজ আদেশে তাহাদের শিরচ্ছেদ হয়। বাকী একজন যে বাঁচিয়া গেল—তাঁহারই নাম সান্-ইয়াৎ-সেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই সান্-ইয়াৎ-সেনের প্রচেষ্টায় চীন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় এবং মাঞ্চুবংশের রাজত্ব অত্যাচারের মুখে যবনিকা নামিয়া আসে।

ক্যাণ্টনের ষড়যন্ত্রকারীগণ সহরের অস্ত্রাগার এবং সহরটী দখল করিতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার ফলে সতের জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। একমাত্র সান্ কোনরকমে পরিত্রাণ পাইয়া হনলুলু দ্বীপে পলায়ন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে গমন করেন কিন্তু সেখানে যাইয়াও তিনি নিস্তার পাইলেন না—চীন গভর্ণমেণ্ট সেখানে তাঁহাকে আবদ্ধ করিল।

দশদিন মাত্র আটক থাকিয়া তিনি তদানীন্তন ইংলণ্ডের মন্ত্রী সেলিসবেরী'র চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় দেশের দিকে যাত্রা করেন এবং জাপানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করেন। বাধা বিপত্তি, লাঞ্ছনা অত্যাচার কিছুতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই ; তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া বিপদ-সঙ্কুল সংগ্রাম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন—উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণ থাকিতে তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে পারিলেন না। জাপান হইতে ছদ্মবেশে তিনি চীনের নানা প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; ছদ্মবেশেই তিনি দেশ বিদেশে, এমন কি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইয়া প্রবাসী চীনবাসীদিগের ভিতরে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

সুদীর্ঘ আঠার বৎসর যাবৎ তাঁহার জীবনে এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য - নির্য্যাতিত দেশবাসীকে মাঞ্চুরাজের অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া। এই দীর্ঘ আঠার বৎসর পৃথিবীর ভিতরে এমন একটি স্থানও ছিল না যেখানে যাইয়া তিনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে এক মুহূর্ত্ত বাস ক'রতে পারেন। মাঞ্চুরাজের শ্যেনদৃষ্টি তাঁহার পেছনে পেছনে পৃথিবীব্যাপী সর্ব্বত্র তাঁহাকে তাড়া করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু পুরুষ-শার্দ্দূল সান্-ইয়াৎ-সেন্ সেই শ্যেন-দৃষ্টির সম্মুখে তীক্ষ্ণ চাতুর্য্যের জাল বিস্তার করিয়া বিপ্লব বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। চীন দেশের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পদব্রজে তিনি বহু জায়গায় গিয়াছেন এবং সকল স্থানেই লোক সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকিতে সকলকেই উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অনেকবার ইয়োরোপে যাইতে হইয়াছিল এবং বিদেশী শক্তিপুঞ্জের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া গোপনে বহু অস্ত্রশস্ত্র চীনদেশে চালান দিয়াছেন। এমন বন্দোবস্তও তিনি বিদেশী শক্তিপুঞ্জের সহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে যখন চীনদেশে বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে তখন তাঁহারা সকলেই নিউট্র্যাল্ থাকিবেন, কোন পক্ষেই কেহ যোগদান করিবেন না।

পর-পদানত লাঞ্ছিত মাতৃভূমির উদ্ধার করিতে যাইয়া সান্-ইয়াৎ-সেনকে যে কতবার কত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একবার ক্যাণ্টন সহরে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে, এবং গুপ্তসমিতির সভ্যগণ রাতারাতি সহর ছাড়িয়া পলায়ন করে। সেই সময় সান্ তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শেষে রাত্রিকালে দেয়াল টপ্‌কাইয়া ছাতের উপর দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া. খালের ধার দিয়া বহু মাইল হাঁটিয়া যাইয়া নৌকায় আরোহন করেন। সেখানেও রাজ-সৈন্য তাঁহার নৌকা তল্লাসী ক'রিতে আসে—কিন্তু সকলের চোখে ধূলা দিয়া তিনি ম্যাকাও এবং তথা হইতে হংকং পলায়ন করেন। সেখানেও টিঁকিতে না পারিয়া হোনোলুলু এবং হোনোলুলু হইতে আমেরিকা হইয়া লণ্ডনে গমন করেন। এমনি ভাবে কত লোমহর্ষণ ঘটনা যে তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে—কতবার যে তিনি মরণাপন্ন সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অপ্রমেয় সাহসের বলেই তিনি সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছেন।

তীরে বাস করা নিরাপদ নয় বলিয়া তিনি কিছুদিন জলের উপর জাহাজের ক্যাবিনে বাস করিতেন। সেই সময় একদিন একটা লোক তাঁহার ক্যাবিনে উপস্থিত হইয়া বলে --আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি। সান্ ছাড়িবার পাত্র নন্, --তিনি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে কি অপরাধে তাঁহাকে বন্দী করিতে আসিয়াছে দেশের দুরবস্থা দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য—দেশবাসীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা ত অন্যায় নয় - বরঞ্চ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া সেই অন্যায় করিয়াছে। লোকটা তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহার পায় লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। আর একবার ক্যাণ্টনে থাকিতে একদল সৈন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে যায়। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে শত্রুর আগমন জানিতে পারিয়া সান্ তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে একটী কন্‌ফিউসিয়ান্‌দের ধর্ম্ম পুস্তক লইয়া খুব জোরে জোরে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাহারা গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিল তাহারা খৃষ্টান সানের মুখে তাহাদেরই ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইয়া আর এক পা অগ্রসর হইতে পারিল না—বন্দী করিতে আসিয়া নিজেদের প্রাণেই সেখানে বন্দী হইয়া গেল !—তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

এইভাবে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—সুদীর্ঘ আঠার বৎসর ব্যাপী যাহার পিছনে মৃত্যুর করাল-ছায়া নানামূর্ত্তিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল আজ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে যদি চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকেন তবে অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। কিন্তু চীন দেশের কত বড় ক্ষতি যে হইল তাহা ভাবিলে আজ দুঃখের আর অবধি থাকে না।

কাশ্মীর

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]　　১৪ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩১ ।　　২০শ সপ্তাহ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত সপ্তাহের মধ্যে ৯ই তারিখটাই আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় মনে হয়। কারণ, ১৩১৭ সালের ঐ দিনে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথকে আমরা হারাইয়াছি। তাঁহার অভাব আজ এই সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে—এখনও অনুভব করিতেছি। তাঁহার পরিত্যক্ত আসন এখনও শূন্য আছে;—দ্বিতীয় ইন্দ্রনাথ আর দেখিতে পাইলাম না। বিলাতী 'পাঞ্চ'কে বাঙ্গালা 'পঞ্চানন্দে' পরিণত করিয়া তিনি যে রসের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, সে রস-তরঙ্গ তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সত্যই শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু-দিন উপলক্ষ্যে আজ তাঁহার ঐ সব কৃতিত্বের কথাই একটু বলিবার চেষ্টা করিব।

ইন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের রস ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে পর্য্যাপ্ত না হইলেও গুণে অসামান্য। সে রস কাহারও কাহারও নিকট হয় ত এখন উগ্র বা তীব্র বোধ হইতে পারে, কিন্তু সে রস যে একদিন বাঙ্গালার বাবু-সমাজের পক্ষে রসায়ণের কাজ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'পঞ্চানন্দ' ও 'ভারত-উদ্ধার,' তাঁহার 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' আমাদের কলঙ্কে ও কুৎসায় নিশ্চিত বটে; কিন্তু সে দোষ তাঁহার,—না আমাদের? তিনি বলিতেন,—"এত যে জাতীয়তার ভাণ, এত যে দেশ-ভক্তির ছলনা, এমন করিয়া না আঁকিলে কি ইহার প্রতিশোধ হয়?"

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য আজ আমাদের মধ্যে যে একটু ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, ভূদেব বা ইন্দ্রনাথের সময় তাহা ছিল না। তখন সাহেবীয়ানার দিকেই আমাদের সমস্ত মনটুকু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। সমাজ-

* এই রচনার প্রথমাংশ একটু ১৩২৩ সালের 'সাহিত্য' পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বাবু এই রচনা যতটা লিখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা তাহার সবটুকুই তাঁহার পুত্রদের নিকট হইতে পাইয়াছি। 'শিশিরে' ধারাবাহিক রূপে তাহা প্রকাশিত হইবে।—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়।

সংস্কারকেরা তখন উচ্চ গলায় এই সব বুলি ধরিয়াছিলেন—'Do away with your joint family system." অর্থাৎ—তোমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার চুরমার করিয়া দাও। "Break down the walls of your Hindu-Zenana. অর্থাৎ পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফেল। "Do away with your caste system—" অর্থাৎ জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া দাও। "Remarry your Hindu-widows"—অর্থাৎ, হিন্দু বিধবাদিগের আবার বিবাহ দাও।" শুধু সামাজিক

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আচার ব্যবহার নহে ; সাংসারিক সকল বিষয়েই—এমন কি, হাসি-কান্না ব্যাপারেও সাহেবদের ভঙ্গীটুকু অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া নিজেদের জীবনকে তখন ধন্য মনে করিতেছিলাম। সেই সময় সেই দারুণ দুক্রিয়ার প্রবল প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ প্রথম আমরা ভূদেবের এবং ইহার অনতি-কাল পরেই ইন্দ্রনাথের সন্দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করি। ইঁহারা উভয়ে মাতৃভাষাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, বলিতে পারি না।

তবে তাঁহাদের লেখা পড়িয়া মনে হয়, স্বজাতির প্রতি অতিরিক্ত মমতা-প্রযুক্তই যেন তাঁহারা মাতৃভাষার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাহেব সাজিতে গিয়া যে সঙ্ সাজিতেছে, এ কথা বুঝাইবার জন্য ভূদেব যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে পথ অবশ্য ইন্দ্রনাথ অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু উভয়েই প্রধানতঃ এক ভাবের ভাবুক ছিলেন,—একই উদ্দেশ্যে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন।

স্বজাতির সঙত্ব দেখিয়া ভূদেব কাতর হইতেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বিরক্ত বোধ করিতেন, ঘৃণায় মুখ ফিরাইতেন। তাঁহার সে ঘৃণা ও বিরক্তি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষের আকারে নিত্য ফুটিয়া উঠিত। তিনি নির্ব্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে লোক-চক্ষুর গোচর করিতেন। একজনের প্রতি শ্রদ্ধার অনুরোধে, তাঁহার দোষ বা ত্রুটি চাপিয়া যাওয়া তিনি শুধু অন্যায় নহে,—আর দশজনকে প্রতারণা করা মনে করিতেন। এইজন্য, বিদ্যাসাগর ও

কেশবচন্দ্রের প্রতিও বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। স্বর্গীয় আশুতোষের বিধবা কন্যার বিবাহে এবং স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দরের কোনও এক প্রবন্ধ পাঠে তিনি যে সব পত্র 'বঙ্গবাসী'তে লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার অকপটতা ও নির্ভীকতার অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। কাপুরুষ লেখকেরা হয়ত যে সব লেখাকে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ' মনে করিয়া ইন্দ্রনাথের নিন্দা করিতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া ব্যক্তির দোষ আলোচনা করার কথাকে শুধু কাপুরুষতা নহে, পরন্তু কপটতা বলিয়াই বোধ করিতেন। ভাবের ঘরে চুরি তাঁহার ছিল না। তাঁহার বিদ্রূপে বিষ থাকিত বটে, তবে সে শোধন-করা-বিষ।—তাহা মানুষের অপকার না করিয়া অধিকাংশ স্থলেই উপকার করিত।

ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' যখন প্রথম বাহির হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' উহার এক সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। সেই সমালোচনার একস্থলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"ইন্দ্রনাথবাবুর যে লিপি-কৌশল, যে রচনা-চাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গ-দর্শন-প্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত বেলেল্লাগিরিতে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়।"—বঙ্কিমের এই উক্তি আমাদের মনে হয়, কেবল 'কল্পতরু' নয়,—ইন্দ্রনাথের সমুদয় লেখার প্রতিই প্রয়োগ করা চলিতে পারে। এমন কি, 'বঙ্গদর্শনে' তিনি 'কল্পতরু'র যে বিজ্ঞাপনটুকু ছাপিয়াছিলেন, তাহাতেও 'ঈষৎ মধুর হাসি'র ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই। পাঠক-সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য সে বিজ্ঞাপনটুকু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"কিনিতে হইবে কল্পতরু

কেন কিনিতে হইবে? কারণ আছে। নহিলে, হয় বঙ্গদর্শনের মান যায়, নয় বঙ্গবাসীর মান যায়। বঙ্গদর্শন কল্পতরু সমালোচনায় বলিয়াছেন ;—......

কৈ আজ তিন মাস হইল, হে বঙ্গদর্শনের পাঠক! কেন আপনি স্বয়ং পরিচয় লইলেন না? যদি ঐ অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বঙ্গদর্শনের আর মান থাকে না, আর যদি বঙ্গদর্শনের কথা গ্রাহ্য করিয়া পয়সার মায়া ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ভয়ানক কৃপণতা দোষ বর্ত্তে, সুতরাং আমাদের বাঙ্গালিজাতির মান থাকে না। তাহাতেই বলিতেছি।

কল্পতরু কিনিতেই হইবে"

আমরা এই বিজ্ঞাপনের প্রতিধ্বনি করিয়া বাঙ্গালার পাঠক বর্গকে এখন বলিতে চাই যে, কেবল কিনিতে নয়—পড়িতেও হইবে। কেবল কল্পতরু নয়, ইন্দ্রনাথের সব লেখাই বাঙ্গালীর এখন পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের জন্য ইন্দ্রনাথ কি করিয়া গিয়াছেন, এবং কি জন্যই বা আমরা এই লেখার প্রথমে তাঁহাকে 'বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

রাজা বাহাদুর

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুসারে।

ভাবি-বৈবাহিক দ্বয়

মেয়ের বাপ

ব্যাটা কি চশমখোর।

ছেলের বাপ

শালা কি জোচ্চোর।

বাইজির বাঙ্গলা গান

"হামি যাজুলে মুরি হারে আরে—হায়রে বিরহী সে স্বরে—
সে করে চাঁই—আঁই—আঁই—আঁই—আঁই—তুরী।"
("আমি যার জন্যে মরি— হায়রে সে করে চাতুরী")

ষষ্ঠীর জামাই ।

ক্ষীণদৃষ্টি শ্বশুর—ওড়না সেমিজ পরে কে মা তুমি ?

জামাই—আমি হেম ।

শ্বশুর—হেমনলিনী ?

জামাই—না, আপনার জামাই হেম ।

শিশুশিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ।

দিদি

(গল্প)

[শ্রীপ্রিয়নাথ বসু]

নামকরণের সময় বাবা আমার নাম রেখেছিলেন, সুশীল! জানিনা বাবা আমার এই নামটা রেখে মনে মনে তাঁর এই নব বংশধরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত বড় আশা আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ কর্ত্তেন। যত বড় আশাই তাঁর মনে হয়ে থাকুক না কেন, অলক্ষ্যে বসে স্বয়ং ভগবান যে আমার আগাগোড়া জীবনটার সঙ্গে এই নামটা মিলিয়ে দেখে বিদ্রূপের হাসিটা একচোট হেসে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সংশয় কর্ব্বার তো আজ আর আমার কিছুই অবশিষ্ট নাই।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা গোড়াগুড়ি থেকেই বেশ ভাল ছিল, কাজেই জীবনে আর্থিক কষ্ট একদিনও পেয়েছি বলে মনে কর্ত্তে পারিনে; কিন্তু শত জীবন দারিদ্র্যকে বরণ করার চেয়েও যে কঠোরতর শাস্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন সে কথা ভুলে যাবার তো আজ আর কোন পথই নেই। উঃ, কি সে মর্ম্মান্তিক যাতনা—যার উত্তাপ আমার সমগ্র জীবনটাকে মরুভূমির চেয়েও তপ্ত করে রেখেছে, যার প্রত্যেকটী কাহিনী কাঁটার মতই খচ্ খচ্ করে আজ আমার অন্তরে গিয়ে বিঁধচে। সে কথা বলতে গেলে যেমন আমার বুক ফেটে যায়, না বললেও ঠিক তেমনি এ বেদনার গুরুভার, এ মর্ম্মান্তিক অন্তর্দ্দাহ আমার ভিতরটায় তুষানলের মত জ্বলে জ্বলে ওঠে। যৌবনের তারল্যে আর অর্থের প্রাচুর্য্যে জীবনটাকে একটানা ভাবে চালিয়ে এসে কোনদিন কল্পনাও করিনি যে, এ কাহিনী বিবৃত করে লেখবার জন্মে আমার আবার ডাক পড়বে। আজীবন ভেবে এসেছি, গায়ের জোরে এটাকে অগ্রাহ্য করে চলব; কিন্তু যখন সত্যিকারের ডাক হয়ে এসে পৌছায় তখন নাকি তাকে অগ্রাহ্য কর্ব্বার মত শক্তি মানুষের থাকে না, আমারো যে সে শক্তি নেই সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের সংসারে ছিল আট দশজন মাত্র লোক। বাবা, মা, আমার বড় ভাই সুনীল, বিধবা দিদি লতা, বড় ভ্রাতৃবধূ, আর কয়েকজন চাকর সইস, এই সব। বাবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমার যখন সাত বছর বয়স তখন তিনি পেন্সন নেন, দাদা তখন সিটি কলেজের প্রফেসার। লতা দিদি আমার বছর দশেকের বড়। তারপরে বাবার আরো দুটী ছেলে হয়ে মারা যায়, কাজেই আমাতে যখন তাদের মত মারা যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, বরং খেয়ে দেয়ে বেশ বড় হতে লাগলুম তখন বাবা ও মার সেই হারানো দু'টী ছেলের জমাট স্নেহ আমার ওপর এসে পড়ল। তাঁদের স্নেহও যেমন আমার ওপর কিছু অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হতে লাগল, আমার আব্দার অনুযোগও তেমনি দিন দিনই বর্দ্ধিত হতে লাগল। আমাকে বছর নয়েক করে রেখে মা স্বর্গে গেলেন। বাবা আমাকে যেন আরো নিবিড় করে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন; আর লতাদিদি আমাকে এতই স্নেহ কর্ত্তে সুরু করলেন যে, আমি প্রথম প্রথম অবাক্ হয়ে গেলুম, এত স্নেহ ঐ হতভাগিনী বাল-বিধবার ছোট্ট বুক-খানিতে এতদিন কি করে নিরাশ্রয় হয়ে লুকিয়েছিল। চৌদ্দবছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, ছ'মাস পরে তিনি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসেন। নারী জীবনের সর্ব্বস্ব সহসা একদিন অতি অসময়ে হারিয়ে, মাতৃত্বের রুদ্ধ দুয়ার হতে নিজের পিপাসার্ত্ত তরুণ হৃদয়কে নিতান্ত নির্ম্মম ভাবেই যাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হয় তাঁর হৃদয়ে এত অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার অন্তঃসলিলার মত কি ভাবে নীরবে আপনার বেগে আপনার মনে প্রবাহিত হয়ে যায়, একথা নয় বছরের বালক তখন আমি, কিছুই বুঝতে পারিনি। দিদি আমাকে আদর দিতেন, আমি আব্দার করতুম, এমনি করে দেখতে দেখতে আরো ছ'বছর কেটে গেল, আমার বয়স যখন প্রায় সতর তখন বাবাও স্বর্গে চলে গেলেন। নয় বছর বয়সে

মাকে হারিয়েছি, কিন্তু সে দুঃখের প্রত্যেকটী আঘাত আমাকে এত কঠোর ভাবে আক্রমণ কর্ত্তে পেরেছিল না, যতটা করল বাবার মৃত্যুতে। তাঁর স্নেহের শাসনকে আশ্রয় করে নিতান্ত নিরুপদ্রপে কি ভাবে যে আমার সেই কয়টা বছর কেটেছিল সে কথাও আজ যেমন আমি ভুলতে পারিনে; লতাদিদি সেই দুর্দ্দিনে তাঁর সমস্ত শোকতাপ ভুলে আমাকে যেভাবে আড়াল করে রেখেছিলেন সে কথাও তো আজ আর আমার ভুলবার কোন পথই নেই। তাঁরও তো পিতৃশোক! সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের দিনে আত্মসম্বরণ কর্ব্বার এ সংসারে বোধ করিবা আমার কোন উপায়ই থাকিত না, যদি না লতাদিদি তাঁর সেই অসীম সহিষ্ণুতা নিয়ে আমার সম্মুখে না দাঁড়াতেন। যখনই আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখতুম তখনই যেন আমার বেদনার ভার অনেকখানি লাঘব হয়ে আসত। আমি আজো ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি, কি সে দুর্জ্জয় নারীপ্রকৃতি যার আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি এ সংসারের প্রত্যেকটী আঘাতকে উপেক্ষা করে এসেছেন; কি সে হৃদয়ের বল যার শক্তিতে তিনি সেই কচি বয়সেও শতকোটী প্রলোভনকে ধুলোর মতই পায়ের তলায় মাড়িয়ে এসেছেন। আমরা ব্রাহ্ম ছিলুম, আমি তো বাবার মুখে কতদিন লতাদিদিকে বলতে শুনেছি, লতা একটা ভুলের কি সংশোধন হয় না মা। সে যদি অমন করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে না যেত, আর সে বিয়েতো তোর অমতেই হয়েছিল মা; মনকে একবার প্রশ্ন করে দেখ দেখি মা, সে আমার কথায় সায় দেয় কি না।

লতাদিদি কোন জবাব দিতেন না, হেসে অন্য কাজে চলে যেতেন। কিন্তু তাঁর সেই হাসি ছাপিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই যে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস তাঁর সেই ছোট্ট বুকখানিকে আলোড়িত করে দিয়ে যেত সে তো তখনো আমার চোখ এড়াতে পারেনি।

বাবার শোকটা যখন কতকটা সহনীয় হয়ে উঠল, তখন হঠাৎ একদিন শুনতে পেলুম যে বড় ভাই সুনীল আমাদের ছেড়ে আমাদেরই পাশের বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তিনি আর এ সংসারের জন্য একটী পয়সাও খরচ কর্ত্তে রাজী নন। আমি কোন কথা বল্লুম না, বলে বোধ করিবা কোন ফল হত না। লতাদিদি আমার দিকে চেয়ে নীরব থাকতে পারলেন না; তিনি একদিন দাদার কাছে বললেন, দাদা তুমি চলে যাচ্ছ, সুশীলকে দেখবে কে?

দাদা গম্ভীর ভাবে বললেন, ওতো আর এখন কচি-খোকাটী নেই লতা যে এখনো একজন দেখবার লোক চাই। আমার এ সব ঝঞ্ঝাট সহ্য হবে না, তা ছাড়া তোমার বৌদির অমত।

লতাদিদি বিস্মিত হয়ে বললেন, বৌদির অমত বলে ছোট ভাইকে ছেড়ে যেতে হবে দাদা?

দাদা এ সব কথায় কাণ দিলেন না। সাধ্যমত জিনিষ পত্র ও টাকা কড়ি নিয়ে পাশের বাড়ীতে উঠে গেলেন। আমি আর লতাদিদি আমাদের পুরাণ বাড়ীতেই আশ্রয়হীন হয়ে রইলুম।

মাস ছয়েক পরে লতা দিদির ঘন ঘন তাগিদ সহ্য কর্ত্তে না পেরে বিয়ে কর্লুম। দিদি আমার মহা আনন্দে ছোট ভ্রাতৃবধূ বরণ করে ঘরে আনলেন। বৌটীর নাম বীণা। দেখতে শুনতে বেশ ছিল। সে আজ আর বেঁচে নেই; কিন্তু আমি আজো ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে, নারী চরিত্র কি অপূর্ব্ব প্রহেলিকা। লতা দিদিতো এই নারীই ছিলেন; উঃ বীণাতে আর লতা দিদিতে কত তফাৎ—মাঝখানে যেন একটা প্রকাণ্ড পরিখা। কি সে দম্ভ, কি সে অহঙ্কার—যার তাড়নায় দিদির সেই শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হৃদয়খানিকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল! যার জ্বালায় সন্ন্যাসিনী দিদি আমার আমাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিয়ে করে নতুন গিন্নী ঘরে এনেই আমি যেন কি রকম হয়ে গেলুম। মেঘের দিনে আকাশের দিকে চাইলে যেন প্রিয়ার নিবিড় চুলের গুচ্ছ মনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল, ফুলের পাপ্‌ড়ির দিকে চাইলে প্রিয়ার কাতর চোখের কথা মনে উঠে চোখে জল আসতে লাগল; আর দখিণ হাওয়া গায়ে লেগে যে বাস্তবিকই মানুষের মনে পুলক জাগিয়ে দেয় সে কথা আমি জীবনে সেই প্রথম বুঝতে পার্লুম। একদিনে এক নিমিষে চক্ষের সম্মুখে সংসারটা যেন বদলে গেল। কোথাও আর শুষ্ক নীরস বলে কোন জিনিষ আমার চক্ষে পড়ল না। সারাটা বিশ্ব যেন সবুজ সাগরে স্নান করে

আমাকেই দুই হাতে আহ্বান কর্ত্তে লাগল। সে আহ্বান আমি তো কোনমতেই অগ্রাহ্য কর্ত্তে পার্লুম না, আমিও প্রেমিকার হাত ধরে সর্ব্ব প্রথম সেই জীবনের পথে বেরিয়ে পড়লুম। কি যে স্রোত, কি দুর্ব্বার তার গতি, বর্ষাকালে পদ্মানদীর পাকে নৌকা পড়ে বিদ্যুৎবেগে সে যেমন ঘুরপাক খেতে থাকে, পারের সবলোক দাঁড়িয়ে মজা দেখে আর আত্মীয় বন্ধু কেউ থাক্‌লে সেই শুধু হায় হায় কর্ত্তে থাকে, আমার তখন ঠিক সেই অবস্থা। যেমনি বেরিয়ে পড়া অমনি এক নিমিষে আমায় যে কোথায় নিয়ে গেল আমি তার কিছুই টের পেলুম না, টের পেলেন কেবল লতা দিদি, তিনি আমার দুর্দ্দশা দেখে পাড়ে দাঁড়িয়ে হায় হায় কর্ত্তে লাগলেন। কিন্তু চারদিকের কোলাহল ছাপিয়ে সে হায় হায় মুমূর্ষু রোগীর ক্ষীন কান্নাস্বরের মত এসে আমার কানে লাগলেও প্রাণে ঠিক গিয়ে আঘাত কর্ত্তে পার্ল না। আমি নবীনা সঙ্গিনীকে নিয়ে অতি আনন্দে তরী ভাসিয়ে দিলুম। দিন নেই, রাত নেই, সন্ধ্যে নেই, সকাল নেই, কেবল স্ফূর্ত্তি আর কেবল স্ফূর্ত্তি। থিয়েটার, বায়স্কোপ, গার্ডেন পার্টি আরো কত কি, জলের মত টাকা যেতে লাগল। আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। একদিন খেতে বসেছি, দিদি আমার কাছে এসে বল্লেন,—সুশীল, দিন কয়েক তো বেশ আমোদ প্রমোদ করে কাটালি এখন একটু লেখা পড়ায় মন দে ভাই।

দিদির কথাটা ঠিক আমার বেদনার স্থানটাতে গিয়েই আঘাত কর্ল। কলেজের পড়া বাইরে না কর্লেও মনে মনে যে আমি বহুদিন খতম দিয়ে রেখেছি, এবং বিয়ের পরে আর সে পথে পা বাড়াব না বলে এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করে আছি, এ কথাতো দিদি কল্পনাও কর্ত্তে পারেন নি। আমি কোন জবাব দিলুম না, নীরবে আহারে মন দিলুম। ওরে হতভাগা, ওরে অন্ধ, সেদিন তুই কোন সাহসে কিসের জোরে সেই চির ব্রহ্মচারিণীর বিপক্ষে মনে মনে বিদ্রোহ করেছিলি, কি আস্পর্দ্ধায় তাঁর প্রত্যেকটী শুভেচ্ছাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে গিয়েছিলি!

আমাকে মৌন দেখে দিদি বল্লেন, টাকা পয়সা যাই বল সুশীল লেখাপড়া না হলে যে পুরুষ জীবনই বৃথা! আর ঘরের বউ তাকে নিয়ে এত বাইরে বাইরে বেড়াবার কি দরকার। ঘরের যেখানে তার অধিকার সেখানকার কোন ভারই তো সে আজ পর্য্যন্ত নিলে না।

এ কথা পাশের ঘর থেকে বীণা যে সবই শুনেছে তা' আমি দেখতে পেলুম। তার সজল চোখ দুটী আমার চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠল, আমার হৃদয়কে উত্তেজিত করে তুল্ল, আমি বল্লুম,—দিদি, আমি তো দাসী বিয়ে করে আনিনি?

জীবনে বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম আমি দিদির কথায় শক্ত জবাব দিলুম। দিদিও বোধ হয় যা' কোনদিন কল্পনাও কর্ত্তে পারেন নি তাই শুনে প্রথম নিজের কাছেই তাঁর বিশ্বাস হোল না যে আমি তাকে এ কথা বল্‌তে পারি। দিদি আমার নীরবে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। দিদির সরল মনে কি যে ব্যাথা বাজল তিনি আর দুদিন আমার সামনে বেরুলেন না; একটী মুখের কথা পর্য্যন্ত বল্‌লেন না। আমি তখন মনে মনে ভাবলুম, বেশ হয়েছে। বাধা বিপত্তি সাম্‌নে থেকে যত সরে যায় ততই ভাল।

সংসারে ক্রমেই কি রকম একটা বিশৃঙ্খলা এসে জুটতে লাগল। সব কাজেই দিদি দূরে সরে থাকেন। কাকেও কোন হুকুম করেন না, কারো হুকুম শোনেনও না। নিজের মনে নিজের ঘরটীতে বসে বই পড়েন আর নিজের প্রয়োজনে দু'চার বার বাইরে আসেন। যখন বীণা পাশে থাক্‌ত না, দিদির কথা চিন্তা কর্ত্তুম, হায় মনে হ'ত, যাই ক্ষমা চাইগে দিদি যে আমার জন্য কত করেছেন, তাঁর মনে কষ্ট দিলে আমার পাপ হবে। মনে মনে কেবল চিন্তাই করেছি, কিন্তু ক্ষমা চাওয়াটা আমার কাছে তখন এতই কঠিন হয়ে উঠ্‌ল যে কিছুতেই আর তা চাইতে পার্লুম না। ওরে মূঢ় সে দিন কি তোর হাত দুখানিতে পক্ষাঘাত হয়েছিল, নইলে একবার হাত জোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তাঁকে ক্ষমা কর্ত্তেই হ'ত। আর আজ? যদি আমার সেই দিদিকে পাই তবে পুজো কর্ত্তে পারি।

দিন কয়েক এমনি ভাবে কেটে গেল। আমাদের ভাই বোনে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আমি তাঁর কাছে যাই না লজ্জায় অভিমানে, তিনি আমার কাছে আসেন না অপমান হবার ভয়ে। তখন যে আমি সবে মাত্র বিয়ে করেছি — হিতাহিত জ্ঞান তখন আমার নেই। দিদি নিতান্ত নিঃশব্দ

জীবন অতিবাহিত কর্ত্তে লাগলেন তবু বীণা তাঁকে খোঁচা না দিয়ে ছাড়তো না। নানা ভাবে নানা কারণে অকারণে তাঁকে শুনিয়ে যখন তখন যা তা বলতো, আমি বাধ্য হয়ে সে পরিহাসে যোগ দিতুম, নইলে যে প্রিয়া অসন্তুষ্ট হন। দিদি যে ঘরখানিতে বসে সন্ধ্যা আহ্নিক কর্ত্তেন খান দুই দেব দেবীর পট সাজিয়ে রোজ পূজা কর্ত্তেন, একদিন বীণা ইচ্ছা করে জুতো পায়ে সেই ঘরে ঢুকে সেই দেবদেবীর পটগুলিকে টেনে ফেলে দিয়ে বললে, ব্রাহ্মবাড়ী এ সব শোভা পায় না।

দিদি কোন কথা বললেন না, বাধা দিলেন না, অসীম গাম্ভীর্য্যে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দিদির মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলুম। এ বিশ্বের সমস্ত বেদনায় দুর্ব্বহ ভার সেদিন তাঁর চোখ ফেটে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে আস্‌ছিল—সেদিকে চেয়ে আমার চোখ ঝলসে গেলে আমি মাটীতে বসে পড়লুম।

পটগুলি ফেলে বীণা তার বিজয় বার্ত্তা যখন আমার কাছে প্রচার কর্ত্তে এল তখন আমি তার স্বপক্ষে কোন কথাই বললুম না বটে, কিন্তু বিপক্ষেও তো কিছু বল, সাহস হ'ল না। সেদিন শুধু আমি সারাদিন ধরে ভাবলুম দিদির হৃদয়ে কি অসীম শক্তি—যার প্রভাবে তিনি এতবড় একটা আঘাতকেও এমন নীরবে সহ্য করে নিলেন। কিন্তু সেদিন ভাব্‌তে পারিনি যে তিনি এ অন্যায় সহ্য করে নিলেন বটে, কিন্তু ভগবান শাস্তিটুকুই শুধু আমার জন্য তুলে রাখলেন। আজ এই ভঙ্গুর জীবনের শেষ অধ্যায়ে পা দিয়েও সেই কথাই শুধু ভাবছি। অতটুকু নারী হৃদয়ে ভগবান এত বড় শক্তি কি করে দিয়েছিলেন। আজ আমি পক্ষাঘাতে উত্থানশক্তি রহিত, বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার উপভোগ্য বস্তু হইতে বঞ্চিত, তবু আজ এই মরণের তীরে দাঁড়িয়েও সদাই মনে হয়, দিদি যদি পাশে থাকতেন, তবে আমার কিছুরই অভাব থাকতো না। একজন লোকের মৃত্যুতে অন্য একজনের আগাগোড়া জীবনটা কেমন একেবারে অসাড় অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়, সে কথা আজ আমি যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি তেমন বোধ করি বা আর কেউ করে না। যাক্ সে সব।

পূজোর দেবদেবীর ছবিগুলো তেমনি ভাঙ্গা ছেড়া হয়ে উঠানে পড়ে রইল। দিদি সেদিকে একবার তাকালেনও না। এই ছবিগুলো বাবা দিদিকে কিনে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও কোনদিন দিদিকে এ সম্বন্ধে কোন কথা ভুলেও বলেন নি। সেদিনকার সে ব্যাপারটা আমার মনে বাস্তবিকই বড় আঘাত করল। আমি তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নানাহার সেরে বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় দেখি—দিদি তাঁর ঘরে উপুড় হ'য়ে পড়ে কাঁদছেন। আমি কোন কথা বলতে সাহস করলুম না, চক্ষের জল মুছে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বাসায় ফিরে আসতেই বীণা চীৎকার করে বলে উঠল, একটা বেশ্যা মাগীকে ঘরে পুষ্‌ছিলে আজ তার সাজা হ'ল। আমি প্রথম দিনই চিন্তে পেরেছিলুম যে, এ মেয়ে কোনদিন ঠিক থাকতে পারে না, আজ তো দেশশুদ্ধ লোক হাসিয়ে সে চলে গেল।

আমি এ কথার অর্থ কিছুই ভাল করে বুঝতে পারলুম না। দৌড়ে উপরে উঠে দিদির ঘরে ঢুকে দেখলুম কেউ নেই। সারা বাড়ীময় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলুম।

বীণা বললে, এক বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।

বিশ্বাস হোল না। ছুটে গিয়ে দাদার বাসায় অনুসন্ধান করলুম। সারা রাত্রি সমস্ত পরিচিত স্থানে অনুসন্ধান করলুম, দিদির কোন সন্ধানই পেলুম না। পরদিন দিদির ঘরে ঢুকে দেখি, একটী জিনিষও তিনি নিয়ে যান নি। বাক্স, বিছানা, কাপড়, জামা যেখানে যা ছিল সেখানে তাই আছে। একটা একটা করে সবগুলো জিনিষ হাত দিয়ে নাড়তে লাগলুম, আর সেই নীরব ঘরে বসে আমার চক্ষের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল। সেদিন তো ভাবতে পারি নি যে আমার চক্ষের সে জলের ধারা এ জীবনে আর শুকোবে না। দিদির চিঠি লেখার বইখানি বের করে দেখি তার মধ্যে তিনখানি খাম রয়েছে। চিঠি তিন খানির দুই খানির উপরে বিলিতি পোষ্টাফিসের ছাপ আর একখানি দিশি। একে একে চিঠি তিন খানি পড়লুম।

(১)

লণ্ডন
৩-৭-২০

প্রিয় লতা,—

আমি নিরাপদে এখানে এসে পৌঁচেছি। আসবার দিন সাতেক আগেই শুনে এসেছি তোমার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। এতদিন বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে। আজ আমি বিশ্বের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করছি। কিন্তু লতা, আমি আজও ঠিক ভেবে উঠতে পারছি নে, তোমার বিয়ে হ'ল কি করে। তুমি আমার নও এ কথা যে আমি এক মুহূর্ত্তও মনে স্থান দিতে পারিনে। কিসের জ্বালায় এক উল্কাপিণ্ডের মত নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, সে কথা এ বিশ্বের সকলের নিকট অজানা থাকতে পারে কিন্তু তোমার কাছে তো তার একতিলও অজানা নেই লতা। তুমি না বিয়ে হবার ছ' মাস আগেও বলতে যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না, আর বিয়ের সময় তুমি তার স্বপক্ষে একটা মুখের কথাও বলতে পারলে না! সে আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানিত, তার অবস্থা ভাল, এই কি তার সব চেয়ে বড় জিনিষ? সংসারে কি বিদ্যা ও অর্থ ছাড়া মানুষের কাম্য আর কিছুই নেই? যাক্ সে সব। কিন্তু লতা, তুমি যদি জানতে যে তোমার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন আমার প্রাণের উপরে কতখানি গভীর দাগ কেটে দিয়েছে—তা'হলে তুমি এমন কাজ করতে পারতে না। আমি দেশ ছেড়ে এসেছি আর হয়ত বা ফিরব না, আর ফিরবই বা কেন? সংসারে আমার কে আছে? কিসের বন্ধন আছে? যার পিতামাতা নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, যে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণাকে বরণ করে নিয়ে ভিক্ষার্জ্জিত অর্থে দেশান্তরে চলে যায় তার বন্ধন কোথায়? তবু তোমার কথা মনে হয় লতা। হয়ত বা এ জীবনে ভুলতে পার্ব্ব না। অনেকদিন অনেক প্রকারে চিন্তা করে দেখেছি, এ জীবনের অন্ত না হ'লে বোধ করি বা এ পোড়া চিন্তার অবসান হবে না। শীঘ্রই আমি বার্লিনে যাব। ইতি—

সতীশ—

(২)

লণ্ডন
৪-১-২১

লতা,—

তোমার স্বামীর মৃত্যুতে আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেলুম। তিনি আমার যা-ই হোন, যত ন সর্ব্বনাশই করে থাকুন, তিনি যে তোমার স্বামী এ কথা তো ভুলবার উপায় নেই। লতা তুমি এত অল্প বয়সে এত জ্ঞান কোথায় পেলে? চির ব্রহ্মচর্য্যের এ দিব্য সৌন্দর্য্য তুমি কার কাছে পেয়েছ? লতা, তোমার চিঠি পেয়ে আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, আমারই ভুল। ভালবাসার চেয়েও বড় জিনিষ এ সংসারে আছে। তুমিই আমায় আজ সে সন্ধান দিলে। মূর্খ আমি তাই একটা ক্ষণিক উন্মাদনায় পাগলের মত ছুটে পালিয়ে এসেছি। লতা, তোমার চিঠির ঐ ছোট্ট 'দাদা' সম্বোধনটী যেন অমৃতের উৎস হয়ে আমার সম্মুখে বয়ে যাচ্ছে। সহস্র কণ্ঠে পান করেও আমি নিঃশেষ কর্ত্তে পারছি নে। যখনই তোমার চিঠি পড়ি, তখনই আনন্দে, গর্ব্বে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে যে এমন ভগ্নী আমার এ সংসারে আছে। ভ্রাতৃত্বের গর্ব্বে আজ বোধ করি বা সংসারে আমি অতুলনীয়। ইতি—

সতীশ—

(৩)

কলিকাতা
২-১-২২

লতা,—

তোমার চিঠি পেলুম। তোমার ভাই এত নীচ হতে পারে এ আমার কল্পনার বাইরে। তুমি আমার এখানে আসতে চেয়েছ সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমার তো আর সংসারে কেউ নেই, আমরা দুই ভাই বোনে আজীবন স্বচ্ছন্দে যে কাটিয়ে দিতে পার্ব্ব সে অর্থ আজ আমার হাতে না থাকলেও আমার দেহে সামর্থ্য আছে, না খেয়ে মর্ব্ব না। তুমি ঠিক থেকো। আমি কাল রাত দশটার সময় যাব। ইতি—

তোমার দাদা সতীশ—

সতীশ বাবুর চিঠিতে—ঠিকানা লেখা ছিল না, কাজেই তার বাসা ঠিক কর্ত্তে পারলুম না। দিদিও তার ঠিকানা কোনখানে লিখে রাখেন নি। বছর চারেক পরে, একদিন সতীশ বাবুর একখানা চিঠি পেলুম, লতা অসুস্থ, তোমাকে দেখতে চায়। যদি শেষ দেখা কর্ত্তে চাও শীঘ্র এস।

চিঠি পেয়ে উন্মত্তের মত ছুটে বেরিয়ে পড়লুম। সতীশ আমারি অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিল। বিলেত যাবার আগে থাকতেই আমাকে সে চিনত। আমাকে দেখেই বলে উঠল—এসেছ ভাই, এস এস।

আমি বল্লুম—দিদি কেমন আছেন এখন ?

আচ্ছা দেখবে চল। বড্ড অসময়ে এসেছ ভাই...

আগে খবর দিলে না কেন ?

নিষেধ ছিল।

সতীশের সঙ্গে উপরে যেতে সিঁড়িতে পা আমার কাঁপছিল। বুকটা চেপে ধরে কোন রকমে এগিয়ে চললুম। পর্দ্দা সরিয়ে সতীশ বলল—ভিতরে এস।

ঘরে গিয়ে দেখি দিদির আর সে চেহারা নাই, দিব্যকান্তি মৃত্যুর কালো ছায়ায় মলিন হয়ে শীর্ণ দেহ শয্যার সঙ্গে যেন মিশে গেছে! দেহে তখনো প্রাণশক্তি একটু অবশিষ্ট ছিল। আমি কাছে গিয়ে দিদির শীর্ণ হাতটী ধরে ধীরে অতি ধীরে বললুম—দিদি!

দিদি কোন কথাই বলতে পারলেন না, বড় বড় চোখ দু'টী মেলে আমার দিকে করুণভাবে চেয়ে রইলেন—আর সেই চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সতীশ বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি নিকটে এসে দিদির মাথাটী কোলে নিয়ে বলল—দিদি আমার, সত্যি ছেড়ে চললে ?

আমি কেঁদে উঠলুম—দিদি, দিদি!...

মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখ দিয়ে অস্ফুটে শুধু বেরিয়ে এল—ভাই!...

দুই মিনিট

পুণ্যলাভে বঞ্চিত।

১ম। কুপুত্রের পিতা—মশাই আপনার কটি' ছেলে ?

২য়। গৃহস্বামী—একটি মাত্র মশাই,

১ম। বেশ, বেশ, ছেলেটি বেশ ভাল ত! তার কোনও মন্দ সঙ্গী জোটে নি ত ?

২য়। আজ্ঞে না।

১ম। কোনও থিয়েটারের, ক্লাবে বা কোথাও আড্ডা দিতে যায় নি ত ?

২য়। আড্ডা দূরের কথা, সে একলা বাড়ীর বা'রই হয় না!

১ম। ওই ত, চাই মশাই, ওই হচ্ছে ভাল ছেলের লক্ষণ আচ্ছা—নিজের কোনও সখ সাধ বাবুয়ানা আছে ?

২য়। রাম! সে রকম ছেলেই সে নয় মশাই! যা পরতে দিই তাই পরে, যা খেতে দিই তাই খায়।

১ম। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া) আপনার বরাত ভাল মশাই যে আমার মতন কুসন্তান হয় নি। ভগবান তাকে ভাল রাখুন;—আচ্ছা মশাই, ছেলেটিকে একবার দেখতে পারি কি ? এমন ছেলের বাপ হওয়া ত দূরের কথা,—দেখা পেলেও পুণ্য হয়। একবার দয়া করে ডাকবেন তা'কে ?

২য়। "স্বচ্ছন্দে,"—বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্টা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তাঁহার পুত্রকে বাহিরে লইয়া আসিতে বলিলেন।

১ম। আচ্ছা মশায় আপনার ছেলেটির বয়স কত হল ?

২য়। (অবনত মুখে) আজ্ঞে, এই সবে ছ'মাসে পড়েছে। (ক্ষুব্ধচিত্তে পুণ্যলাভে জলাঞ্জলি দিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্নকারী গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।)

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৩২)

রেল ষ্টেশনের ধারে ছোট একটি বাংলায় স্বামীর সহিত উপনীত হইলাম। বাংলা খানিতে গুটি দুই তিন মাত্র ঘর। একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কায় সব যেন স্তব্ধ নীরব। সেই গভীর স্তব্ধতা ভেদ করিয়া রোগীর করুণ আর্ত্তনাদ এক একবার উত্থিত হইতেছিল। বাহিরে অত্যন্ত গুমট, সন্ধ্যার অন্ধকার ও জমাট বদ্ধ মেঘ পরস্পর একজোট পাকাইয়া ধরাটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল দ্বিপ্রহরে প্রচুর বারি বর্ষণে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধ বাষ্পে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রেল লাইনের অদূরে ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছিল ঝিল্লি রবে নিম গাছের তলাটা মুখর হইয়া গিয়াছিল।

ব্যথিত হৃদয়ে স্বামীর পশ্চাতে রোগীর শয্যা পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। পাশাপাশি দুইটি বিছানা—একটিতে উত্থান শক্তি রহিত পীড়িত স্বামী, অন্যটিতে মরণোন্মুখ পত্নী। একটি বৃদ্ধা হিন্দুস্থানী পরিচারিকা পাখা লইয়া উভয়ের মস্তকে বাতাস করিতেছে। কোণের দিকে রেড়ির তৈলের প্রদীপটা ঘরের ঘনীভূত অন্ধকারকে বিদূরিত করিবার মানসে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল।

স্বামী ডাকিয়া বলিলেন, "উপেন বাবু, আমার স্ত্রী আপনার খোকাকে নিতে এসেছেন। যতদিন আপনারা সম্পূর্ণ ভাল না হবেন—ততদিন নির্ভাবনায় খোকাকে এঁর হাতে দিতে পারেন। এঁর কাছে খোকার একটুও অনাদর অযত্ন হবে না।"

উপেন বাবু বন্ধ প্রায় চোখ দুটা স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন "খোকাকে নেবার জন্যে আপনি দয়া করে আপনার স্ত্রীকে এনেছেন! আমাদের বড় ভাগ্য, তাই আপনাদের এত দয়া পাচ্ছি। আপনাদের হাতে খোকাকে দিতে আবার ভাবনা, তাকে নিয়ে যান।"

উপেন বাবুর স্ত্রী একখানি মোটা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকিয়া নিশ্চল ভাবে পড়িয়াছিলেন। এখন মুখের কাপড় সরাইয়া হস্তের ইঙ্গিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আমি কাছে যাইতেই কৃতজ্ঞতা ভরা অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন "আপনি নীলুকে নিতে এসেছেন! আমার নীলুকে আমি আপনার হাতেই দিলাম। ভাল যদি না হই—নীলু চিরকাল আপনার থাকবে।"

নিমেষের মধ্যে আমি স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া গেলাম। পাগলের মত সেই শয্যায় শয়ান নারীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া ভাবিলাম "নীহার, নীহার এই এখানে, এমন করে এই বেশে! আজ আমি তোর নীলমণিকে নিতে এসেচি। এত কাছে আমরা ছিলাম—তাতো এক দিনও জানি না।"

নীহার কষ্টে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, আনন্দে অভিভূত হইয়া বলিল "কণা তুই, আহা, এত দিন পর এমন ভাবে দেখা! আলোটা সরিয়ে আন্ কণা, আমি তোর মুখ খানি ভাল ক'রে দেখি। কণা, ভাই, তোর এত ভাগ্য, তোর এমন স্বামী; এমন পরোপকারী, এত দয়ালু। আমার কি আনন্দ হচ্ছেরে—নীলু তোর কাছে থাক্‌বে, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম, একেবারেই নিশ্চিন্ত হলেম কণা।"

নীহারের কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিকতা ও চক্ষে কেমন যেন একটা তীব্র জ্যোতি বিস্ফুরিত হইতেছিল। পীড়ার প্রারম্ভেই ভিতরে ভিতরে যে বিকারের সঞ্চার হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমার হৃদয় তন্ত্রীতে কিসের আঘাত লাগিল।

বলিলাম "তোদের এমন অসুখ নীহার, জ্যেঠাইমাকে কেনে ডেকে পাঠাস নি, জিতুদাকেই বা খবর দিস নি কেন? আমি এখুনি তাঁদের টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। এ সময় তাঁরা না এলে কি চলে?"

"চলে না আবার কি রকম, চলেই তো গেল কণা। মা বুড়ো মানুষ তাঁকে আমি টানাটানি করতে চাই না। দাদা এসে কি করবে? এখানে তোরাই যে আমার দাদা দিদি রয়েছিস। তাদের খবর দিয়ে কাজ নেই বোন, তারা এসে আর কি দেখ্‌বে? দেখার থাক্‌বেই ব কি? সব ফুরিয়ে যাবে।"

নীহার একটু খানি চুপ করিয়া পুনরায় বলিল, "মনীশবাবু, অবাক হয়ে কি চেয়ে দেখ্‌ছেন? আপনি আমার ভগিনী পতি, কণা আমার ছোট বোন, শুধু তাই নয়—আমার বাল্য সখী! আমার নীলুকে আপনারা নিয়ে যান; এ ব্যারামের কাছে বেশীক্ষণ থাক্‌বেন না। কণা নীলুর যশোদা মা, আপনি, তার নন্দ বাপ। আজ আমার ভাবনা দূর হল, আমার বন্ধ দুয়ার খুলে গেল।"

স্বামী সজল চক্ষে ভারী গলায় বলিলেন "আচ্ছা, আমরা নীলুকে নিয়ে যাচ্চি। আপনি ভাল হলে আপনার নীলু আপনার কাছেই আস্‌বে। উপেন বাবু ভাল হয়ে গেছেন, আপনিও শীগ্‌গীর ভাল হয়ে উঠ্‌বেন।"

"না, না—আমার আর ভাল হওয়া হবে না। আমার পরমায়ু আমি ওঁকে দিয়ে দিয়েচি। প্রাণের বদলে প্রাণ, নইলে কি সারতে পারতেন?"

নীহার পাশ ফিরিয়া গভীর প্রেমময় দৃষ্টিতে উপেন বাবুর রোগ বিকৃত বিশ্রী মুখ খানির প্রতি চাহিয়া রহিল।

স্বামী আমাকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন "এঁর অবস্থা ক্রমেই যেন খারাপ হচ্ছে দেখ্‌ছি। ডাক্তারকে একবার খবর দিতে হ'বে। তুমি এঁদের একটু পথ্য দিয়ে নীলুকে নিয়ে বাড়ী চল: তোমায় বাড়ী রেখে, ডাক্তার নিয়ে নার্স নিয়ে আবার আমায় এখানে আসতে হবে। হয় তো রাতেও থাকৃতে হবে।"

আমি নিজের অজ্ঞাতসারে স্বামীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া কহিলাম, "নীহার কি সত্যিই ভাল হ'বে না? একটুও কি আশা নেই? ও যদি না বাঁচে, তা হলে আমি কি করবো, কেমন করে থাকৃবো?"

স্বামী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "বাঁচবেন বৈ কি! অবস্থা খারাপ হলেও মানুষ বাঁচে তো। উপেন বাবুর অবস্থাও খারাপ হয়েছিল, এখন প্রায় সেরে উঠেছেন; তবে—খারাপ ব্যারাম, তাই ভাবনা। পয়সা দিয়ে, শরীর দিয়ে যতটা করতে পারা যায়—তার ত্রুটী হ'বে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

আসিবার সময় নীহারের কাছে গিয়া বলিলাম "নীহার, নীলুকে আমি নিয়ে যাচ্চি। এখন আমার যেতে হবে; কাল আবার এসে তোকে দেখে যাব। দু তিন দিনের ভেতর তুই সেরে উঠ্‌বি; তোর কিচ্ছু ভয় নেই। নীলুকে নিয়ে থাকৃতে হবে, নইলে তোর কাছেই আমি থাকৃতে পারতাম।"

নীহার সবেগে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "তুই থাকৃতে চাইলেও তোকে আমি থাকতে দিতাম না কণা; এক তুই ছাড়া নীলুকে আমি কারুর কাছে রেখে বিশ্বাস পাই না। তুই নীলুকে খালি বাড়ীতে রেখে আমায় দেখ্‌তে আসিস না! নীলুকে নিয়ে যাবার আগে আমায় একটি বার দেখিয়ে নিয়ে যা। আর যদি দেখ্‌তে না পাই?"

আমি পাশের ঘর হইতে ঘুমন্ত নীলুকে কোলে লইয়া নীহারের কাছে আসিলাম। নীহার উপাধান হইতে মস্তক তুলিয়া পলক হারা নয়নে নীলুকে দেখিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই যেন তাহার আশা মিটিতেছিল না।

একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকার পর শান্তিতে নীহার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ আমার হাতখানা চাপিয়া, ধরিয়া বলিল "কণা, নীলু তোরি। ওর নীলমণি নাম রাখা এতদিনে সার্থক হল। পুজোর সময় জ্যেঠাই মা বলেছিলেন তুই আমার কাছে ঋণী; তোর নাকি ঋণ শোধ করতে হবে। একখানা সুতোর কাপড়ে মানুষ আবার ঋণী হয়, ঋণ বলে এরি নাম, মাতৃহীন ছেলেকে গলায় দিয়ে যাওয়া। এই হল সব চেয়ে বড় ঋণ কণা, আমি জন্মে জন্মে তোর কাছে ঋণী রইলাম।"

আমি আহত হইয়া বলিলাম "চুপ কর নীহার, ছিঃ ওসব কথা কি বলতে আছে। শুনলে আমার খুব কষ্ট হয়। তোর নীলু তোরি আছে। তুই ভাল হলে"—

বাধা দিয়া নীহার বলিল "আমার ভাল-মন্দ আমি তোদের চেয়ে ভাল বুঝি কণা; প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিয়ে কি কেউ থাকতে পারে? আমায় যেতেই হবে যদি আর না বলতে পারি, আমার বল্‌বার সুবিধা যদি না হয় তাই আজ শেষ কথা তোর সঙ্গে শেষ করলেম কণা। তোরা যেমন নীলুর ভার নিলি, তেমনি ওঁকেও এক একবার দেখিস, ওঁর জগতে আপনার বলতে কেউ নেই।"

স্বামীর প্রসঙ্গে নীহারের গলা ধরিয়া আসিল। যে অবলীলাক্রমে একমাত্র হৃদয়ানন্দ দুলালকে পরের হস্তে সঁপিয়া দিল, স্বামীর প্রসঙ্গে তাহার যে কোথায় বাজিল—জানি না। নীহার আর কথা বলিল না, নির্জ্জীবের মত নীরবে পড়িয়া রহিল। আমি উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম উপেনবাবুর কঠোরগত চক্ষের প্রান্ত বহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। আমার স্বামীর চক্ষুও শুষ্ক নাই। তিনি দ্বারদেশে সরিয়া গিয়া রুমালে চোখ মুছিতেছিলেন। আমার চোখের জল বাধা মানিল না। যতবার মুছিতে লাগিলাম ততবারই প্রবলবেগে ঝরিতে লাগিল। নীহারের শেষ সব কথাগুলা আমার হৃদয় বীণার তারে ব্যথার ঝঙ্কার তুলিল। কোন সুদূর পল্লীর বুকে দারিদ্র কুটীর প্রাঙ্গণে যে দুটি কোমল প্রাণ পরস্পরকে ভালবাসিয়া, পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, প্রীতিতে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহার একটির কি ঝরিবার সময় আসিয়াছে? সত্যই কি তাহার যাইতে হইবে, এই ছায়া ঢাকা, পাখী ডাকা স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুন্দর ভুবন হইতে 'নীহার' নাম কি চিরতরে মুছিয়া যাইবে? এতরূপ, এত গুণ, এত মহত্ব সবই কি শশ্মানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে চির ধৈর্য্যময়ী ধরণীর ধূলায় চিরদিনের মত নীরব হইবে।

অকস্মাৎ শুষ্ক আকাশের বুক চিরিয়া একটি বিদ্রোহী ঝড়ো হাওয়া প্রান্তরের প্রান্ত দিয়া ছুটিতে ছুটিতে আমার হৃদয়ের প্রতিধ্বনির মত হা-হা করিয়া বহিয়া গেল। বিকট গর্জ্জনে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। নীলু চমকিয়া ক্ষুদ্র বাহুর দ্বারা আমাকে আঁকড়িয়া ধরিল। স্বামী কহিলেন "ঝড় উঠে আসছে, আর দেরী করবার সময় নেই—এখুনি উঠতে হয়।"

আমি সন্তর্পণে নীলুকে কোলে করিয়া, নীহারের মুখখানি আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া, স্বামীর সহিত গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

(৩৩)

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর নীলু মধুর কণ্ঠে ডাকিল,—"মা—মা!"

আমি নীলুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিলাম "সোনা আমার, ধন আমার, আমিও তোর মা। আমি তোকে খেতে দেব, খেলনা দেব, আদর করবো।"

নীলু বিস্ময়ভরা ডাগর চক্ষু মেলিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "আমাল মা, মা মণি আমি মাল কাথে যাব।"

সেদিনের সে নীলু এখন আর নাই। নীলু এখন বড় হইয়াছে। কচি কচি শুভ্রদন্তে তাহার মুখের শোভা অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। অন্যের সহিত নিজের মায়ের ব্যবধান কতটা তাহা বুঝিতে নীলুর বাকী নাই। দুর্য্যোগময়ী রজনীতে মা'র চির নিরাপদ বক্ষোনীড় ভাবিয়া সে যাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, প্রভাতে তাহার মায়ের পরিবর্ত্তে অপরিচিতার মায়ের দাবীর স্পর্দ্ধায় তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ ভীতত্রস্ত হইয়া পরিচিত মুখখানি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আমি আদর করিয়া তাহাকে চুমো খাইলাম, সে মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি তাহার হাত ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া দিলাম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া সে তাহা মাটীতে ফেলিয়া দিল। হায়, তাহার মায়ের ক্ষুধা আমি কি দিয়া মিটাইব? আমার ধারণা ছিল—খাবার দিয়া, স্নেহ দিয়া, অনায়াসেই শিশু হৃদয় জয় করা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে বুঝিলাম—তাহা তেমন সহজ নয়। মায়ের হৃদয়ের সহিত সন্তানের হৃদয়ের যোগ; সে একদিনের নয়;—অস্থি, মাংস মজ্জায় তাহা মিশিয়া রহিয়াছে। হৃদয়ের মূলের সহিত হৃদয়ের যোগ, পদ্মের ডাটার সহিত পদ্মের যোগের মত। পদ্মে টান পড়িলে ডাটাতেও টান পড়িয়া যায়। নীলুর ভাগ্যবিধাতা মৃণাল হইতে পদ্মটিকে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত

হইয়াছেন ; মৃণাল বিহীন পদ্ম আমার স্নেহ সরোবরের স্নিগ্ধ সলিলে সজীব থাকিবে, কি শুষ্ক হইবে—অন্তর্যামী ব্যতীত তাহা কে বলিবে।

অনেক কৌশলে শিশুর "মাল কাথে যাব," কথাটা ভুলাইতে না পারিয়া তাহাকে লইয়া ঘাটে গিয়া বসিলাম। গঙ্গার মৃদুজলোচ্ছ্বাস, তীর তরুর শিরকম্পন, কৃষক বালক বালিকার জল খেলা দেখিয়া নীলু শান্ত হইল। আকাশে প্রথম অরুণোদয়ের মত নীলুর রক্তিমাধরে হাসির অরুণালোক ফুটিয়া উঠিল।

কিষণ গরম দুধ রাখিয়া গিয়াছিল ; আমি গল্পে গল্পে নীলুকে দুধ খাওয়াইয়া, তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য গাছের পাতা ছিঁড়িয়া নদীতে ভাসাইতে লাগিলাম। নীলু উল্লাস-ভরে খেলায় মাতিয়া মায়ের কথা ভুলিয়া গেল।

একটু বেলায় স্বামী নীহারদের ওখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রে তিনি সেইখানেই ছিলেন। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া—নীহারের খবর লইতে আমি উৎসুক হইলাম। আজ উপযাচিকা হইয়া স্বামী সম্ভাষণ করিতে আমার বাধিল না। আমাদের দুইজনার মাঝখানে বাক্যে বেদনার যে অটল ব্যবধান বিরাজ করিত—নীহার আর নীলু মাঝে পড়িয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এতদিনকার রুদ্ধ জলোস্রোত কথঞ্চিৎ বাধামুক্ত হইয়া আজ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল।

আমার প্রশ্নে স্বামী চকিত হইয়া জবাব দিলেন, "উপেন বাবুর স্ত্রীর অবস্থা শেষ রাত থেকে খুব খারাপ। একেবারে জ্ঞানশূণ্য হয়েছেন। ওষুধ চলাও বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন 'জীবনের আশা নেই, আজকের দিন থাকেন কি না সন্দেহ।' আমি তোমায় খবর দিতে এসেছি। এখুনি আমায় সেখানে ফিরে যেতে হবে।"

আমি নীলুকে নামাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলাম, আমার পায়ের তলায় ধরণী যেন রহিয়া রহিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি আর্তকণ্ঠে কহিলাম "নীহারের এমন অবস্থা, আমি এখনো এখানে। আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি নীহারকে দেখতে যাব।"

নীলু একটা চিনেমাটীর পুতুল হাতে করিয়া প্রতিধ্বনির মত বলিল "আমি নেহালকে দেখতে যাব।" অবোধ শিশু তাহার মাকেই জানে, নীহারকে চেনে না।

স্বামী মলিনমুখে বলিলেন, "সেখানে যেয়ে এখন কি করবে ? তিনি তোমায় চিন্‌তে পারবেন না, কথা বলতে পারবেন না। কাল রাতেই তাঁর যা বলবার শেষ ক'রে দিয়েছিলেন। তুমি গেলে—নীলু আবার কান্না সুরু করবে। আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভাল।"

নীলুর কান্নার উল্লেখে কান্নার কথাটা তাহার স্মরণ হইল। সে পুতুল ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর কোঁচার খুঁট ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,"আমি মা'র কাথে যাব, আমায় মা'র কাথে নিয়ে যাও।"

তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে নীলুর চোখ মুছাইয়া বলিলেন, "দিব্যি ভুলেছিলে, এখন ফের কান্না সুরু কল্লে। তুমি ওকে শান্ত কর, আমি এখন যাই।"

বলিলাম "স্নান করে, যা হয় দু'টো খেয়ে যাও। আমি চট্ করে রান্না করে দিচ্ছি।"

"না সেসব করতে গেলে ঢের দেরী হয়ে যাবে। সেই খানেই খাবার দাবার বন্দোবস্ত করে নেব। আরো দুই তিনটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁদের সাথে আমারো হয়ে যাবে।"

তিনি আল্‌না হইতে চাদর খানা স্কন্ধে ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই যে তখন তিনি চলিয়া গেলেন, সমস্ত দিনের মধ্যে আর গৃহে ফিরিলেন না। অবর্ণনীয় উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় আমার দীর্ঘ দিবা কাটিয়া রাত্রি আসিল।

ঘরকন্নার কাজ সারিয়া নীলুকে ঘুম পাড়াইয়া আমি যখন বারান্দায় গিয়া বসিলাম তখন ঘোলাটে আকাশের মাঝখানে চাঁদ দেখা দিয়াছে। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না রাত্রি—আমারি মত সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে কাহার প্রতীক্ষায় যেন জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে। অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত গঙ্গা একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক ঝক করিতেছে। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধোচ্ছ্বাস বাতাসে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি যন্ত্রণা দায়ক প্রতীক্ষা ও নৈরাশ্যপূর্ণ আশা লইয়া স্বামীর অপেক্ষায় জাগিয়া রহিলাম।

ভোরবেলা তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আমার কিছু জানিতে বাকী রহিল না। এমন অসীম সুন্দর পৃথিবী নিমেষে আমার চক্ষে অন্ধকার হইয়া গেল। আমি বজ্রাহতের মত স্বামীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলাম। 'নীহার নাই,' আমার বিশ্বাস হইল না। সেকি যাইতে পারে? এত সহজে এমন করিয়া চিরতরে চলিয়া যাওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব? সেই সীমাহীন ভালবাসা—জন্ম জন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না, তাহা কি এমনি করিয়াই ফুরাইয়া যায়? মানবের আশা আকাঙ্খার উচ্চ সৌধ এমনি করিয়াই কি চূর্ণ হয়?

নীহার নীহার, তুমি নাই—চলিয়া গিয়াছ। তোমার আসা যাওয়া এত নীরবে; কেহ দেখিল না, জানিল না। শরতের মুক্তা প্রতিবিম্ব শিশির খর-রৌদ্র স্পর্শে অকালে শুকাইয়া গেলে। যাইবার সময় একটিবার বলিয়া গেলে না, বিদায় চাহিবার অবসরও হইল না। যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ কত মর্ম্মান্তিক, যাহার মুহূর্ত্তমাত্র মিলন নিবিড়ানন্দময়,—তুমি যে আমার সেই নীহার!

(ক্রমশঃ)

সৃষ্টি-প্রহেলিকা

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

(১)

তুমি যদি সত্য প্রভু! মিথ্যা কি এ সৃষ্টি?
চক্ষু যদি অন্ধ নহে, বন্ধ কি এ দৃষ্টি!
　জগৎ জোড়া সৃষ্টি তব,
　মায়ার মরীচিকাই কব?
অভ্র যদি সত্য, প্রভু! মিথ্যা কিসে বৃষ্টি!
তুমি যদি সত্য, ওগো! মিথ্যা নহে সৃষ্টি।

(২)

সৃষ্টি যদি সত্য, তব বিচার কিগো ভ্রান্তি?
কেউ বা লভে দুঃখ কেন! কেউ বা সুখ ও শান্তি!
　এযে মহান্ কর্ম্মভূমি!
　আশীর্ব্বাদের বিত্ত তুমি—
কর্ম্মফলের ওজন বুঝে দাও যে কড়া ক্রান্তি!
সৃষ্টি যদি সত্য, প্রভু! বিচার নহে ভ্রান্তি।

(৩)

বিচার যদি ন্যায্য তব, বিবেক কিগো দুষ্ট?
স্বেচ্ছাচারে আপন পথে চলেই সেকি পুষ্ট?
　লও গো কারে স্বর্ণ রথে—
　পুণ্যভূমি সত্য পথে
কারেও পাপ-পঙ্কে শুধু ভুলিয়ে নিয়ে তুষ্ট!
বিচার তব ন্যায্য, প্রভু! বিবেক শুধু দুষ্ট।

(৪)

বিবেক যদি দুষ্ট, সে কি নয়কো তব সৃষ্টি
আলোক নহে সৃষ্ট তব, সৃজন শুধু দৃষ্টি!
　বিচিত্র এ তত্ত্ব তব—
　বোধ্য নহে, রবেই নব,
চরকা নয় সৃষ্ট তব, সৃজন বটে বৃষ্টি!
বিবেক যদি দুষ্ট, সে কি নয়কো তব সৃষ্টি?

অভাগা

(গল্প)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী]

(১)

হরিদাসী বৈষ্ণবী সেবার বৃন্দাবন গিয়াছিল; যাইবার সময় গ্রামের নিকট হইতে সে একরকম প্রায় চিরবিদায় লইয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোকে তাহার পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। সকলের নিশ্চিততাকে ব্যর্থ করিয়া বৎসর দেড়েক পরে বৈষ্ণবী যখন গ্রামে ফিরিল, তখন সে একা নহে তাহার সহিত একটী বৎসর পাঁচেকের শিশু।

ছেলেটীর নাম কৃষ্ণ, বৈষ্ণবী তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়াই ডাকিত। তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকটী যথার্থই সার্থকের; যেহেতু যশোদাদুলাল কৃষ্ণের সহিত তাহার সাদৃশ্য প্রচুর ছিল। গাত্রবর্ণ তাহার কৃষ্ণের মতই শ্যাম, মাথার চুলগুলি তেমনি ঘন কালো আর তেমনি ঢেউ খেলানো। বড় বড় দুটি চোখ, তার উপরে তেমনি টানা দুটি ভ্রূ, নাশাটী উন্নত, তাহার নিচে তেমনি পাতলা আরক্তিম অধরোষ্ঠ দুটি।

সে কালো, কিন্তু বড় মসৃণ কালো, যেন কালো চকচকে পাথর কাটিয়া তাহাকে তৈয়ারী করা হইয়াছে। ছেলেটীকে দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল; সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ছেলেটী কে গা বৈষ্ণবী? উত্তরে বৈষ্ণবী মুখ বাঁকাইয়া উত্তর দিল—বোনের ছেলে।"

সকলেই জানিত বৈষ্ণবীর ত্রিকুলে কেহ নাই, আগে বৈষ্ণবীই ইহা স্বীকার করিয়াছে, আজ হঠাৎ বোনের সংবাদে সকলেই অল্প বিস্তর বিস্মিত হইল, কিন্তু বৈষ্ণবীকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলিতে কেহই সাহস করিল না; যেহেতু হরিদাসী বৈষ্ণবীর মুখ তো নয়, ঝাঁটা, সে যখন মুখ ছুটাইতে আরম্ভ করিত তখন ভদ্র ইতর সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিত। কৃষ্ণ অজানিতা বোনের ছেলেই হোক, অথবা কুড়ানো ছেলেই হোক্ গ্রামের বুকেই রহিয়া গেল।

যত দিন যাইতে লাগিল ছেলেটী ততই বড় হইতে লাগিল। বৃন্দাবনের সে কালো কৃষ্ণের বাল্যে যতগুলি গুণ প্রকাশিত হইয়াছিল এই ছেলেটীরও সেই সব গুণ শীঘ্রই প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে সাঙ্গো পাঙ্গ অনেকগুলি জুটাইয়া ফেলিল, এবং অবিলম্বে তাহাদের সর্দ্দার হইয়া বসিল।

গ্রামের বুকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল; ছোট বড় ভদ্র ও ইতর সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইল।

বৈষ্ণবী লোকের অভিযোগে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কারণ কৃষ্ণকে কাহারও কিছু বলিবার সময় ছিল না, কাহারও একটা কথা যে সহ্য করিবে তেমন ছেলেই সে ছিল না। লোকে তাহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বৈষ্ণবীকে আসিয়াই ধরিতে লাগিল।

এতো বিষম জ্বালা! বৈষ্ণবীই বা পারে কত? প্রথমটা সে কৃষ্ণের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বুঝাইল, দুষ্টামী করো না বাবা দেখ, তোমার জন্যে আমার অনেক কথা সইতে হচ্ছে, কিন্তু কৃষ্ণ সে কথা কানে শুনিয়া গেল মাত্র আর এক কান দিয়া সে কথাটা ঘণ্টাখানেক বাদেই বাহির হইয়া গেল।

বৈষ্ণবী ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাল বিপদ বাপু, নিজের পেটের ছেলে নয়, পথে কুড়ানো ছেলে, তাহার জন্য কথা সহিতে হয় তো বড় কম নয়। নিজের ছেলে হইলেও হইত, এ ভূতের ব্যাগার সে পরের ছেলের জন্য খাটে কেন? আর বয়স ও চলিয়া গিয়াছে, বৈষ্ণবী এখন বিরক্তির চরম সীমায় পৌছিয়াই আছে; সামান্য একটা কারণেই সে রাগিয়া উঠে।

না পারিয়া বৈষ্ণবী একদিন অথর্ব্ব দেহ লইয়াও কৃষ্ণকে

যতদূর পারিল প্রহার করিল। ফল হইল এই কৃষ্ণ রাগ করিয়া সেইদিনই গা ঢাকা দিল।

এ আবার জ্বালার উপর জ্বালা। বৈষ্ণবী কাঁদিয়া বাড়ীতে হাট বসাইল, গ্রামবাসীর উদ্দেশ্য শ্রাব্য অশ্রাব্য গালাগ্রকথার গালিবর্ষণ করিল, এবং তাহাদের জন্যই যে তাহার দুলাল কৃষ্ণ ছাড়িয়া গিয়াছে; তাহার জন্য মা কালির কাছে অভিযোগ আনিয়া গ্রামবাসীদের সদ্য মৃত্যুপথ যাত্রী করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। গোঁড়া বৈষ্ণবী সে, ভুলিয়াও কখনও শিব দুর্গা কালির নাম করিত না, আজ প্রবল জ্বালার তাড়নায় সে তাহার চির বিদ্বেষ পাত্রী কালীকে ডাকিতে লাগিল, কারণ এরূপ স্থলে কালী ব্যতিত আর কাহারও নিকট হইতে উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। হরি ঠাকুর এ স্থলেও নির্ব্বাক, তিনি নাকি হিংসা দ্বেষের দিকে বড় একটা যান না।

যাহাই হোক, মা কালী গ্রামসুদ্ধ ধ্বংশ না করিয়া কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিয়া দিলেন। দু দিন গোপনে সে ছিল, অনাহার ক্লেশ আর সহ্য না হওয়ায় সে নিজেই আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বৈষ্ণবী আনন্দে চোখের জল ফেলিয়া সে দিন সন্ধ্যাবেলা পাঁচপয়সার হরিরলুট দিয়া ফেলিল। তুলসীতলায় গলায় কাপড় দিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল আর কখনও তাহার কেষ্টকে সে কিছু বলিবে না। সে যাই খুসি করুক, নাচুক খেলুক, বজ্জাতি করিয়া বেড়াক, সে একটী দিনও তাহাকে সে জন্য বকিবে না।

(২)

দুকড়ি মণ্ডলের বোন তারা ছিল ভারি ঠাণ্ডা প্রকৃতির। কৃষ্ণ এই মেয়েটীর উপর অবাধ অত্যাচার করিয়া যাইত, আবার সকলের চেয়ে ইহাকেই বেশী ভালবাসিত। সেও কৃষ্ণের খুব খোসামোদ করিয়া চলিত, পাছে একটু ত্রুটিতে তাহাকে মার খাইতে হয়, মারটা যেন তাহারই একচেটিয়া করা জিনিস ছিল। হাতে হাতে জিনিস জোগাইতে তাহার ন্যায় আর কেহই ছিল না। সে যে চট্ করিয়া কৃষ্ণের মনের মত জিনিসটী না চাহিতেই যোগাইয়া দেয়, ইহাতে কৃষ্ণ ভারি খুসি ছিল, এইটী যদি কোনরকমে কোন দিন সে না করিতে পারিত, সেই দিনই তাহার অদৃষ্টে উত্তম মধ্যম মার জুটিত।

এত মার খাওয়া সত্বেও তাহার আসা চাইই, না আসিয়া সে ও থাকিতে পারিত না। বউদি একদিন আসিতে দিবে না বলিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া দরজায় শিকল দিয়া রাখিয়া ঘাটে গিয়াছিল। সে দিন সে ব্যতিত কৃষ্ণের খেলাও জমিয়া উঠিতে পারে নাই, তাই সে তাহার সন্ধানে গিয়া তাহাকে বন্দিনী দেখিয়া মুক্ত করিয়া আনিয়াছিল। এইরূপ প্রায়ই ঘটিত।

বৈষ্ণবী কৃষ্ণকে পাঠশালায় দিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণের বিদ্যা যে অসীম, সীমাবদ্ধ হইলে তাহার চলিবে কেন? একদিন গুরুমশাই তাহাকে রস, যশ বানান দিয়াছিলেন, বই হাতে লইয়া কৃষ্ণ অবাক হইয়া ভাবিতেছিল রয়ের পিঠে স দিলে রস হইবে কি করিয়া? অবশেষে অনেক চিন্তার পর সে ভাবিয়া ঠিক করিল বাতাবী লেবু ছাড়াইয়া সেই কোয়া-গুলাতে লবন দিলেই যে রস বাহির হয় অথবা পক্ক জামে লবন মাখাইয়া রাখিলে সে রস বাহির হয় তাহাই এই—গুরু মহাশয় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "রস কি করে হবে বল?" তখন আরও একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, সে উত্তর দিল "আজ্ঞে খেজুর গাছ কেটে ভাঁড় পাতলে রস হয়, তাতে তাড়িও হয়। আর রস, বাতাবী লেবুর, জামের—"

অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া গুরুমহাশয় ছাত্রকে ধরিলেন, তাহার পর টাটকা কাটা একটা বেত দিয়া তাহার পিঠ হইতে পা পর্য্যন্ত পরিচর্য্যা করিয়া বলিলেন "এ ও একটা রস জানিস? চোখ দিয়ে এখনি রস বেরুবে, সব রসের চেয়ে মিষ্টি, চেকে দেখিস।"

প্রতীজ্ঞা করিয়া সেই দিনই সে পাঠশালা ছাড়িল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল "পাঠশালা ছাড়লি কেন রে কেষ্ট?"

কেষ্ট মুখ বাঁকাইয়া উত্তর দিল "ধেৎ তোর পাঠশালা। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলে রস কি করে হয়, বললুম খেজুর গাছে রস হয়, জাম, লেবুর রস হয়, আকের রসও বলতুম, আগেই বেত মারলে। পণ্ডিতকে একদিন রস খাওয়ালে বুঝতে পারবে আমি রস খেয়েছি কি না? কিছু জানে না মা আকাট মুখ্যু।"

বৈষ্ণবী ভারী খুসি হইল এবং পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া

বেড়াইতে লাগিল পণ্ডিত মহাশয় আদপেই লেখাপড়া জানেন না, ছেলেগুলিকে স্রেফ কেবল পিটাইয়া যান।

লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া খেলা করিয়া সর্দ্দার হইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া দিন যাইতে লাগিল বড় মন্দ নয়। গ্রামের বাহিরে মুক্ত মাঠ, এইস্থান ছিল ঘুড়ি উড়াইবার স্থান। কৃষ্ণর ঘুড়ি উড়াইয়া দিত তারা, আর কেহই নাকি তাহার মতন ঘুড়ি উড়াইয়া দিতে পারিত না। অনেক মেয়ে তারার হিংসা করিত, কিন্তু গোপনে, প্রকাশ্যে তারাকে কেহ কিছু বলিতে পারিত না।

দিন যাইতে যাইতে কবে তারা একাদশ বর্ষে পড়িয়া গেল, তাহার বিবাহের ঠিক হইয়া গেল। এতদিন অনেক আগেই তাহার বিবাহ হইবার কথা, জ্যেষ্ঠ দুকড়ির পছন্দ অনুযায়ী পাত্র পাওয়া যায় নাই। কৈবর্ত্তের ঘরে পাত্রকে টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। তারা দেখিতে সুশ্রী, তাহার বিবাহে বেশী টাকা পাইবার আশা থাকায় দুকড়ি এতদিন অনেক পাত্র ফিরাইয়া দিয়াছে। এইবার সে মনের মত পাত্র পাইয়াছিল। পাত্রটী যদিও পঞ্চম পক্ষটীকেও চিতায় শুয়াইয়া দিয়াছেন, এবং বয়স ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি বেশী পাইবার আশায় দুকড়ি প্রস্তাবমাত্রই রাজি হইল।

সেদিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। এ কয়দিন মোটেই তারা বাড়ীর বাহির হইতে পায় নাই, জ্যেষ্ঠের আদেশ। কৃষ্ণের সহিত কয়টা দিন দেখা করিতে না পাইয়া তাহার প্রাণটা ছটফট করিতেছিল; আশীর্ব্বাদের দিন দুপুরে একটু ফাঁক পাইয়াই সে পলাইল।

কৃষ্ণও বড় স্থির ছিল না। তাহার রাগও হইতেছিল কিন্তু সেটা বড় অন্যায় রাগ, কারণ তাহার রাগটা সম্পূর্ণ পড়িয়াছিল নিরপরাধিনী তারার উপরে। তারা যেন তাহার নিজস্ব বস্তু; সে কোথায়ও না যায় এই তাহার ইচ্ছা। বিবাহ করিলেই তো সে পর হইয়া যাইবে, শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, তখন তাহার উপর কোন দাবীই থাকিবে না।

অভিমানে সে ফুলিতেছিল, তারার উপর কোনও দাবী থাকিবে না এই কথাটা ভাবিতেও তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। এইরূপ সময়ে ভবিষ্যৎ স্বামীদত্ত লাল কাপড় খানি পরিয়া, সোণা বাঁধানো শাঁখা জোড়া হাতে পরিয় নাচিতে নাচিতে তারা আসিয়া খবর দিল তিনদিন বাদে তাহার বিবাহ, বর তাহাকে গহনা কাপড় দিয়াছে, আরও দিবে বলিয়াছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কৃষ্ণ বলিল "বেরো আমার সামনে থেকে, আনন্দে মরে যাচ্ছেন আর কি? যা দূর হ হতভাগি।"

বিস্ময়ে তারা এতখানি হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল সে যে লাল কাপড়, গহনা পাইয়াছে তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ কতটা আনন্দিত হইবে। কিন্তু কৃষ্ণ খুসী হওয়া দূরে থাক, এতটা রাগিয়া উঠিল যে তাহা তারার সম্পূর্ণ কল্পনার অতীত।

সে সম্মুখে যে দাঁড়াইয়াই রহিল ইহা কৃষ্ণের সহ্য হইল না, সে তাহাকে দুমদাম করিয়া পিটাইয়া দিয়া শেষে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তারা বাড়ী ফিরিয়া গেল।

(৩)

তারার বিবাহ।

আনন্দে দুকড়ি মণ্ডলের বাড়ী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ সেই বাড়ীর চারিপাশে কয়েকবার ঘুরিয়া আসিয়া বসিয়াছে। ইচ্ছা ছিল তারার সহিত তাহার একবার অবশ্য দেখা হইবে, সে দিন সে যে তারাকে মারিয়াছে, তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তাহার শেষ উপহার একটা ছোট রঙিন টিনের বাক্স তাহাকে দিয়া আসিবে। এ বাক্সটী বৈষ্ণবী কিছুদিন পূর্ব্বে এক মেলা হইতে কিনিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়াছিল। যদি ও ইহার উপর তাহার আসক্তি আজও তিলমাত্র কমে নাই, তথাপি তারাকে সে দিন মারার অপরাধে এবং আজ তাহার বিবাহের দিন তাহাকে চির বিদায় দিবার মুহূর্ত্তে এইটি দিয়াই সে শান্তি লভিতে যায়। দুর্ভাগ্য তাহার, এত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ তারার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না।

বিবাহ বাড়ীতে বাজনা বাজিতেছিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ রোদনোচ্ছ্বাসে কৃষ্ণের বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল। আজ সে এমন কিছু পাইতেছিল না যাহা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। তাহার হৃদয় খানা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেন গুঁড়া হইয়া যাইতে চাহিতেছিল।

অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর সে, তথাপি সে কোন দিন নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই, আজ সে নিজের হৃদয়ের পানে চাহিল দেখিল সেখানে কি আছে।

দূর হইতে অলস্ত চক্ষে সে চাহিয়া দেখিল তারা অপরের হস্তে অর্পিতা হইল। তারার স্বামীকেও সে দেখিল; তাহার মনে হইল এই বৃদ্ধটাকে সে একবার রীতিমত বুঝাইয়া দেয় এ সময়ে তাহার এই ক্ষুদ্র বালিকাকে বিবাহ করা কিছুতেই উচিৎ নয়। মনের ইচ্ছা তাহার মনেই রহিয়া গেল, ক্ষুদ্র বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া সে বিবাহ স্থল ত্যাগ করিয়া গেল।

হঠাৎ তাহার চক্ষে আজ যথার্থ ই অন্ধকার হইয়া আসিল, এরূপ অন্ধকারের কল্পনা সে ইতিপূর্ব্বে কখনই করিতে পারে নাই।

পর দিন সকালে সে নদীতীরে ঘাট হইতে একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল নদীর উপর দিয়া নৌকায় অশ্রুমুখী তারা শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। অশ্রুজলে তাহার চোখ দুইটা ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল, বেশীক্ষণ সে দাঁড়াইয়া দেখিতে সক্ষম হইল না।

খেলা ধুলা আমোদ প্রমোদ কিছুই তার ভাল লাগে না। মনটা তাহার এত খারাপ হইয়া গেল যাহা বলিবার নয়। তাহার মনে হইতেছিল কিছুদিন এ গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। যে স্থান চিরকাল সকল সুখের আকর অনুভূত হইয়াছে, সে স্থানই তাহার কাছে দুঃখের আকর হইয়া উঠিল।

দেশ ছাড়িয়া পলাইতে গিয়া তাহার পায়ে বন্ধন অনুভূত হইল, মাকে ফেলিয়া সে যাইবে কোথায়? যে তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে, অজস্র মাতৃস্নেহ তাহার উপর ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাকে এরূপ ভাবে শেষ বয়সে ফেলিয়া যাওয়া কখনই উচিৎ নয়।

কিন্তু ভগবান তাহাকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাই বৈষ্ণবী ব্যারামে পড়িল।

শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া কৃষ্ণ তাহার চিকিৎসা করাইবার সংকল্প করিল। তাহার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া শয্যাগতা বৈষ্ণবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "অমন কাজ করিস নে কেষ্ট; আমি মরলেও তোকে অনেক দিন বাঁচতে হবে। সব নষ্ট করলে এর পর তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে।"

চির দিনের কৃপণ কৃষ্ট তখন একেবারে মুক্ত হস্ত। তারার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটী ছাড়া সকল বাঁধনই ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। শেষ বাঁধন যেটী ছিল, সেটীও ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, আর কিসের জন্য সঞ্চয়, সব যাক, সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, নিঃস্ব অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া গাছ তলায় থাকিয়া কাটাইয়া দিবে।

সত্যই সে করিলও তাই, কিন্তু বৈষ্ণবী বাঁচিল না। কৃষ্ণকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, সংসার সম্বন্ধে ঢের উপদেশ দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল।

খানিকক্ষণ কৃষ্ণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; ক্রমাগত আঘাত পাইয়া সে কেমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মায়ের সৎকার শেষে ঘরে ফিরিয়া সে ভাবিতে লাগিল এখন সে করিবে কি?

করার মত একটী কাজও নাই যে। চারিদিকে আকুল নয়নে চাহিয়া কোন দিকে সে একটু আলোর রেখা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না।

পরদিন ভোর হইতেই সে দরজায় চাবি দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

(৪)

চার বৎসর পরে তারা বিধবা হইয়া ভাইয়ের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাতৃজায়া অনর্থক বিধবা ননদের আহার কাপড় দিল না, নিজে সব কাজ ছাড়িয়া দিল। তারার সপত্নী পুত্রেরা সমস্ত অধিকার করিয়া লইয়া তারাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল। ছ করি অর্থগুলি আগেই হস্তগত করিয়া ফেলিল।

গ্রামের চক্ষুশূল কৃষ্ণ তখন আবার দেশে ফিরিয়াছে। সকল দুঃখ দূর করিবার মহৌষধ সে পাইয়াছে, দেশে আসিতে আর বাধা কি?

তাহার দুঃখ দূর করে মদ, দিনরাত প্রায় সে মাতাল হইয়া থাকে, প্রকৃতিস্থ থাকে খুবই কম! গ্রামের লোক পাশ দিয়া যাইতে ঘৃণায় নাকে কাপড় দিত, সে তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিত না; সকল প্রকার নিন্দা ভয় অপমানের

হাত সে এড়াইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে চিত্তজয়ী, বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিয়াছিল।

মাতাল সে, এই নামে সে খুব সন্তুষ্ট। কোনও কোন হিতৈষী তাহাকে তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন দেখাইয়া দিয়া বলিল "এ করছো কি কেষ্ট, মদ খেয়ে আমোদ করতে গিয়ে দেহটাকে যে একেবারে বিসর্জ্জন দিলি ? এই অল্প বয়সে কোথায় খাটবি, খাবি, তা নয় মদ খেয়ে এমন করে নিজকে নষ্ট করে ফেললি ? এই রকম করে আর বেশীদিন মদ খেলে তুই বাঁচবি নে, মরে যাবি। ও সব ছেড়ে দে, বিয়ে থাওয়া কর, সংসার পেতে, সুখী হ'।

সংসার পাতাইয়া সে সুখী হইবে—এই কথাটা শুনিয়া তাহার বিষাদ মলিনমুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত। ইহারা জানে না যে সংসার পাতাইবে কি লইয়া, সুখী হইবে কি করিয়া ? ভাবিতে ভাবিতে তারার কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিত, তাড়াতাড়ি সে আবার মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিত।

বিধবা তারাকে হঠাৎ সে একদিন দেখিতে পাইল স্নানের ঘাটে। সে জানিত না তারা বিধবা হইয়াছে, সে আবার এখানে আসিয়াছে। গ্রামের কোন খবরই সে যেমন রাখিত না, তারার এ খবরও সে তেমনি জানিত না। তারা শ্বশুরালয়ে গিয়াছে, সুখে আছে, এই ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল। তারা যে বিধবা হইয়া আবার এখানে আসিতে পারে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। আজ হঠাৎ তারাকে এই বেশে দেখিয়া মনে হইল তাহার মাথায় বজ্রপাত হইল।

হা ভগবান, সে কি এই প্রার্থনা করিয়াছিল ? বল ভগবান, তাহার মর্ম্ম ব্যথা তো তোমাকেই সে নিবেদন করিয়াছিল তাহার মধ্যে কি এই কথাটী ছিল ? না—না সে এ প্রার্থনা কখনও করে নাই। সে তারাকে ভালবাসে, তারার ভালই সে চায়, মন্দ তো চায় না।

মনের এ অশান্তি নাশ করিবার জন্য সে সেদিন প্রাণ ভরিয়া মদ খাইয়া সারা দিন রাত পড়িয়া রহিল।

কিন্তু ইহার ফল তো আছে। এই যে অপরিমিত মদ্যপান, মাসের মধ্যে কুড়ি দিন অনাহারে কাটাইয়া দেওয়া, ইহার একটা ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্তব্য।

তাই একদিন সে আর মোটে উঠিতে পারিল না।

অমন নিটোল নধর স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ তাহার একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহ সেই কৃষ্ণ বলিয়া হঠাৎ চিনিতে পারিত না।

চিরকালের দুরন্ত সে, গ্রামের লোক স্বভাবতঃই তাহাকে ঘৃণা করিত, বৈষ্ণবী থাকিতে তাহার ভয়ে কেহ বড় একটা কথা কহিত না। তাহার পর সে যখন মদ খাইতে আরম্ভ করিল, তখন পাছে তাহার বাতাস গায়ে লাগে এই ভয়ে লোকে দূর হইতে সরিয়া যাইত।

রোগাক্রান্ত কৃষ্ণকে দেখিতে কেহ ছিল না। এমন কেহ ছিল না যে তাহার মুখে এক ফোঁটা জল ঢালিয়া দেয়। বৈষ্ণবীর পরিচিতা একটী বৃদ্ধা সকালে একবার আসিয়া এক বাটী সাগু ও জলের ঘটি তাহার পাশে রাখিয়া চলিয়া যাইত, তৃষ্ণা বা ক্ষুধা বোধ হইলে সে নিজেই অতি কষ্টে তাহা গ্রহণ করিত।

দিন ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল, কৃষ্ণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। আঃ, বড় শান্তি যে মৃত্যুতে, মৃত্যু আলিঙ্গনে তাহার দগ্ধ দেহ, দগ্ধ প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে, মৃত্যু তাহাকে নূতন জীবন দান করিবে। এ দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে তাহার আর ইচ্ছা নাই। কৃষ্ণ সাগ্রহে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৫)

দূরে কোথায় বাঁশী বাজিতেছিল, মুক্ত জানালা পথে তাহার সুরটা স্পষ্টরূপে কাণে আসিয়া পশিতেছিল।

আজ সেই দিন, সুদীর্ঘ ছয়টী বৎসর পরে আবার সেই দিনটী ফিরিয়া আসিয়াছে যে দিন তারা অন্যের করে সমর্পিতা হইয়াছিল। এই তো ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ, শুক্লা নবমীর রাত্রি।

বাঁশী বাজিতেছে, কোথায় কোন অজানা শুভ্র চন্দ্রালোকে বসিয়া বাঁশীতে সুর দিয়াছে। বাঁশীর সুর তালে তালে কাঁপিতে কাঁপিতে উচুতে চড়িতেছে, আবার তেমনি কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে খাদে নামিয়া যাইতেছে। শুভ্র আলো, বাঁশীর সুর আর মৃদুল বাতাস, আজ কি কৃষ্ণের মৃত্যু দিন ? এই সুন্দর নিশীথে—চাঁদের আলোর পানে চাহিতে চাহিতে,

বাঁশীর গান শুনিতে শুনিতে সে কি তার বাঞ্ছিত মৃত্যুর স্পর্শ লাভ করিতে পারিবে ?

আজ তাহাকে যাইতেই হইবে। এমন রাত্রি আর সে পাইবে না, এমন বাঁশীর গানও সে আর শুনিবে না। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছে, চক্ষু চির মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, আর সে কাল প্রভাত দেখিবে না।

এই শেষ মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতেছিল বাঞ্ছিতার কথা ; হায়, একবার প্রভু, একটীবারের জন্ম তাহাকে আনিয়া দাও, এই শেষ মুহূর্ত্তে একবার তাহার স্পর্শ - প্রভু, শুধু একবার, তারপরে আর তো নয়। সে বড় শান্তিতে মরিবে।

দুই চোখের কোন দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, স্তিমিত ভাবে সে পড়িয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে আবার তাহার বাস্তব জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। এ কি, তাহার পার্শ্বে এ কে, তাহার ললাটে এ কাহার হাত? অন্ধকার গৃহ যে, আলো কই? কেগো তুমি, আলো জ্বালো, কৃষ্ণ যে তোমায় দেখিতে পাইতেছে না।

"কে, কে তুমি ?"

মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিল "কেষ্ট দা, আমি তারা।"

"তারা, তারা –"

দৃঢ় মুষ্টিতে সে তারার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। আজ এই শেষ মুহূর্ত্তে সে তাহার বাঞ্ছিতাকে পাইল, তাহার মরণ যে তাহাকে মিলন দিল, ধন্য এ মরণ, সার্থক এ মরণ।

"কাঁদছ কেষ্ট দা, ছিঃ কেঁদ না, কাঁদছ কেন ?"

তারার নিজের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল, সে তাহা সামলাইয়া লইয়া সযত্নে অঞ্চল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগল "আজ যদি বৈষ্ণবী পিসী থাকত কেষ্ট দা, তোমার এত কষ্ট হতো না। কেউ তোমায় দেখতে নেই শুনে আমি কতবার আসতে চেয়েছি, পারি নি ; আজ সকলকে লুকিয়ে চলে এসেছি কেষ্ট দা।"

"বেশ করেছ তারা, আঃ, আজ আমার বড় সাধের মরণ।"

সে চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

তারা খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল "কেষ্ট দা—"

"কেন তারা ?"

তারা বলিল "আমি যাই। রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে, বাড়ীতে আবার—"

অকস্মাৎ চেতনা পাইয়া কৃষ্ণ বলিল "হ্যাঁ যাও তুমি। আমি ইহ জগতের দেনা পাওনা মিটিয়ে চলেছি, কিন্তু তোমার তো জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে তারা, তোমায় তো সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। যাও তুমি, আমার শেষ আশা মিটেছে, আর আমার দরকার নেই।"

তারা উঠিল, চোখ মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল।

আড়ষ্ট কৃষ্ণ পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ সে মুখ ফুটিয়া আকুল স্বরে ডাকিয়া উঠিল— তারা তারা—"

আকুলী বিকুলী সে উঠিয়া বসিল – অন্ধকার—সব অন্ধকার! আলো নাই, তারা নাই, কেহ নাই ; এই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে সে যে একা—।

সে হাঁপাইয়া উঠিল, একবার শেষ নিঃশ্বাস লইল, সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করিয়া তাহার প্রাণহীন দেহখানা জীর্ণ শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া গেল।

বঞ্চিতের ব্যথা

(কাহিনী)

[শ্রীনিশিকান্ত সরকার]

(১)

দূরে—বহুদূরে আকাশের কোলে-মিশিয়ে-যাওয়া প্রকাণ্ড একটী মাঠ। তারই মাঝখান দিয়ে আপন খেয়ালে নেচে চলে গেছে ছোট্ট একটী নদী—কোন দিকহারা মহাসাগরের অচিন বুকে।

এই নদীটীর তীরে আর দিগন্তে-মিলিয়ে-যাওয়া মাঠের শেষে প্রকৃতির আপন খেয়ালে জেগে উঠেছিল একটী গোলাপ গাছ—সেই বিরাট শূন্যতার মাঝখানে মাথা তুলে।

হঠাৎ একদিন কোকিলের গানে আর পাপিয়ার তানে বসন্ত নেমে এলো—ধরণীর বুকে মাধবী উৎসবের রাঙা আবীর মেখে।

গোলাপ গাছের বুকের আঁচল ছিন্ন করে ছোট্ট একটী ফুল ফুটে উঠ্‌লো ফুট্‌ফুটে একটী মেয়ের মত। বসন্তের পরশ লেগে ধীরে ধীরে সে বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো—যেন তার কোন্ অনাগত প্রিয়তমের আগমনের প্রতিক্ষায় দূরে নীল আকাশের পানে নরম তাহার দলগুলি মেলে।

কোথায় ছিল দখিন বাতাস ছুটে এসে তার পাপ্‌ড়ি গুলির উপর আদর করে একটী চুমা দিলে;—চুমার লজ্জায় সবে ফোটা ফুলটী রাঙা হয়ে উঠ্‌লো।

(২)

তারপর দিন থেকে রোজই সকালে সন্ধ্যায় বাতাস ছুটে আসে তার প্রিয়তমা ফুলটীর কাছে—ছুটে এসেই বুকের মাঝে তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমা খায়—ফুলটী লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে—কখনো বাতাস অভিমান করে দূরে চলে যায়—ফুলটী তার ব্যাকুল নয়নে পাপড়িগুলি মেলে ডাকে—"এসো, ওগো এসো"—বাতাস আর থাকৃতে পারে না—ছুটে এসে তার মুখটী ধরে একটী চুমা দেয়—ফুলটী অমনি অবশ হয়ে তার বুকে এলিয়ে পড়ে চুমার নেশায় আপনা ভুলে।

এমনি করে সবার আড়ালে রোজই তাদের গোপন অভিসার চলতো—তা' কিন্তু আর কেউ জান্‌তো না কেবল ঐ ক্ষুদ্র কায়া নদীটী ছাড়া।

(৩)

হঠাৎ একদিন বর্ষার মেঘ দুলে উঠ্‌লো আকাশের বুকে পাগল ভোলার জটাজালের মত। বিদ্যুতের ফণী গর্জ্জে উঠ্‌লো;—ঝর উঠ্‌লো -নিবিড় কালো আঁধার রাতে।

নদীর বুকে বন্যা এল তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে—দু'হাতে তার ধ্বংসের করতালি বাজিয়ে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তীর ভেঙ্গে গেল—মাঠ ডুবে গেল—গ্রাম নগর সব ভেসে গেল কোথায় কত দূরে।

বাতাসের বড় আদরের পুষ্প-প্রিয়া বন্যার বেগে কোথায় ডুবে গেল—কোন মরণ-সাগরের অতল অন্ধকারে—কে জানে?

(৪)

পরদিন প্রভাত হল। পাখীর ডাকে পুবের আকাশ ফরসা হতেই বাতাস ছুটে এলো;—কিন্তু সে কই?—বাতাস আবার ভাল করে খুঁজে দেখ্‌লে—সেখানে শুধুই জল আর জল।

বাতাস পাগলের মত তাকে খুঁজতে লাগলো নদীর তীরে—বনের ধারে—মাঠের বুকে বুকে—যেখানে তার দু' চক্ষু যায়।

* * *

প্রকৃতির আপন খেয়ালে কত গোলাপ নিত্য ফুটিতেছে—বাতাস তেমনি করে আজও আদর করে খেলতে আসে—কিন্তু সে আর তেমন শান্তি পায় না—প্রথম যৌবনের বড় আদরের লীলা সঙ্গিনী সেই পুষ্প-প্রিয়ার মতন কেহ আর তাহাকে ঠিক তেমনটী ক'রে আর শান্তি দিতে পারে না—তাই আজ ও তার খোঁজা শেষ হয়নি এখনো সে রোজই—বনের ধারে—নদীর তীরে—মাঠের বুকে বুকে তার হারাণো প্রিয়ার জন্যে কেঁদে ফেরে—হু—হু—হু.........

* * *

লোকে ভাবে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।

কবিয়ানা

[শ্রীশঙ্কু]

কবি—কবি বলছ সবাই, মিথ্যা মরীচিকা,
মিথ্যা প্রবঞ্চনায় বাড়াও কেবল অহমিকা।
তোমরা ক'জন 'কবি কবি' বলছ অবিরত,
ওটা শুধু কথার ফ্যাশান বিদ্রূপেরই মত।

পথে ঘাটে শুষ্কালাপে কৃপণ ত কেউ নও,
দুইবেলা কি পাচ্ছি খেতে খোঁজ কি তাহার লও?

কত দুখে রোগ যাতনায় কাটছে আমার রোজ,
কেউ কি কভু দয়া করে লও কি তাহার খোঁজ?

হায় তোমাদের প্ররোচনায় লুব্ধ কতই হই,
তাজা বুকের রক্ত দিয়ে ছাপিয়ে ফেলি বই।

আটটি আনা পয়সা দিয়েও কেউ কেনে না হায়,
পোকায় কাটে থাকে থাকে দপ্তরী খানায়।

হয়ত কবির নেই কোন' দাম নয় ত নহি কবি,
তোমাদের ঐ মিথ্যা কথায় ভোলে না আর ভবী।

বন্ধু বলে, পরিচিত এম, বি, প্রতিবাসী,
একটি আনাও কি ছাড়ে না—জ্বরে যখন কাসি।

একটী কড়াও দেয় না রেহাই জমিদারের লোক,
একটী পাইও সুদ ছাড়ে না মহাজনের জোঁক।

কবি বলে' কেউ ছাড়ে না ট্রাম বা ট্রেণে ঠাঁই,
নেমন্তন্ন করেও খেতে কেউ ডাকে না ভাই।

কবি বলে, ভোজ পচান, প্রতিবেশীর দল,
সুযোগ পেলে ছাড়েন না'ক দেখ্‌তে চোখের জল।

ভাইএর বিয়ের বিলাত ফেরতা গন্ধ আছে বলে,
ভোজ পচিয়ে কুটুম্বেরা গেলেন বাড়ী চলে।

বোনের বিয়ে, বর্ষাকালে নিতান্ত বিব্রত,
খাওয়া দাওয়ার করতে যোগাড় দুপুর হলো গত,
পেলেন না'ক এম-এ, বি-এ বরযাত্রীর দল,
পায়ে ধরে কেঁদে ফিরাই, এমনি কবির বল।

মোদের যিনি দাদা, তাঁহার নেই করিলাম নাম,
পেটের দায়ে টুইসনী যে করছে অবিরাম,
কবি বলে, কেউ কি ভুলে ভেবেছে তার কথা,
একখানা বই কিনেও তার কি করলে সহায়তা?
আর একজনের নামে হলো মিথ্যে মকর্দ্দমা,
কবি বলে, তেজস্বিতা করলে কি তার ক্ষমা?
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে কি কেউ করলে ইতস্ততঃ?
হাকিম কি আর তাহার বিচার করলে বিধিমত?
একটী আনা ছাড়লে কি 'ফী' উকীলে মোক্তারে?
আগালো কি রাখতে গরীব কবির মর্য্যাদারে?

ভাবছ বুঝি খাতির করে সাহিত্যিকের দল,
আরে রামঃ, তারা আরো দেয়নাক আমল।
খাতির কেমন খোঁজ লও না মাসিক আফিস ঘরে,
পাবে না তায় পরিষদের বাহিরে অন্দরে।
কয় না কথা চায় না ফিরে বইএর দোকানদার,
রাখতে না চায় বই জমা তার ফেরায় বারংবার।
বন্ধুসভায় খাতির চেয়ে অবহেলাই পাই,
সুধী সভায় নেইক কোথাও কাঙাল কবির ঠাঁই।
কবি বলে, মিথ্যে কেন করছ উপহাস,
তোমাদের ঐ অনুগ্রহে করি না বিশ্বাস।
শিল্ড ম্যাচে ব্যাক্ খেলে যা'র হয়েছে সুনাম,
তার হ'ত আর কোন কবির নয়ক বেশী দাম।

প্রেমের পূজা

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র]

নদীর ধারে একটা গাছ ছোট একটা ফুলের কলিকে বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের বুকটা ভরে উঠেছিলো—একটা স্নেহের পূর্ণতায় আর ফুল কলির দেহের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছিল একটা পুলকের সুষমা।

সেই স্নেহের আবরণের মধ্যে থেকে ফুল কলি যৌবন সীমায় পা দিলে আর বিশ্বের আকাশ জুড়ে তারই একটা সাড়া পড়ে গেল।

ঢেউএর পর ঢেউ তুলে নদীর জল ছুটে এসে আছড়ে পড়তে লাগল সেই বৃক্ষের পায়ের কাছে—তাকে বলতে লাগল মিনতি করে—"ওগো, দয়া করে তোমার স্নেহের পুতলীকে আমার শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করে আমার শূন্য হৃদয় পীঠে বসতে দাও। চোখের জল ঢেলে আমি তার অভিষেক করবো আর অহর্নিশি বসে তারই পূজো করবো এই পুলকভরা বিশ্বের অস্তিত্ব ভুলে।

বৃক্ষ তখন মাথ নেড়ে বল্লে, "বাপু অমন প্রেমের কথা আমি অনেকদিন থেকে আমি প্রেমের রঙিন নেশা দেখে আসছি। বয়সও আমার অনেক হয়েছে। পুরুষদের ও মৌখিক ভালবাসাও অনেক দেখেছি—অবলারা না বুঝেই পুরুষদের পায়ে আপনাদের লুটিয়ে দিতে চায় সব ভুলে আমরণের সাথী করে নেয় তাদের দয়িতের লাঞ্ছনা আর লাঞ্ছিত মর্ম্মের যাতনা। কেন বাপু, তুমিও ত অনেক দেখেছ; তোমার বুকের ওপর কত প্রেমিক প্রেমিকার অসার প্রেমালাপ, কত হাসি, কত সোহাগ, কত অভিমান—শেষে উৎসব রাতের বাসী ফুলের মতন তাদের পরিহার। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস শুনে তুমিও কতদিন ছুটে যেতে চাইতে তাদের তরণীর পাশে—তখনি আবার ক্ষেপনী আঘাতে ব্যথিত হয়ে পেছিয়ে যেতে দূরে—বহুদূরে।

ওঠে ত পড়ে হয়ে হুহু করে বাতাস সেই বৃক্ষের কাণে কাণে বলে গেল "বাপু তোমার ফুলকলির আর একজন উপাসক আসছে; এ বিত্তশালী, এ আর তোমায় অনুনয় বিনয় করবে না—ঐশ্বর্য্যের আবাহনে আবার অনুনয় কি? অবহেলার আলিঙ্গন দিয়ে তারা বাঁধতে চায় প্রেম—তাকে বসাতে চায় একই আসনে লালসার সঙ্গে সাথী করে; তারা ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে চায় যৌবন—তারা ত প্রাণ চায় না—তারা যে ঐশ্বর্য্য মদিরায় সদাই প্রাণহীন। তারাত প্রাণের ডাক কখনও শোনেনি। বৃক্ষ, ফুলকলি, আর সেই নদীর বুকের ভেতর দিয়ে ভয়ের একটা শিহরণ বয়ে গেল।

তারা দেখলে দূরে এক সুসজ্জিক তরণী সেই দিকেই আসছে—গর্ব্বে পালভরে. আর তার আরোহী মদিরালস নয়নে চেয়ে আছে তটস্থিত সেই ফুলকলির পানে।

যা, আর বুঝি রক্ষা হয় না। একেবারে কিনারায় এসে পড়েছে। বাতাস হা হুতাস করে উঠলো। ফুলকলি পিতার বুকে মুখ লুকিয়ে তাকে দৃঢ় করে জড়িয়ে ধরলে আর বৃক্ষ নিরুপায়ের উপায় সেই কাঙালের ঠাকুরকে ডাকতে লাগল।

আর নদীর জল একবার সেই ফুল কলির পানে চেয়ে দেখলে—অমনি তার বুকের মধ্যে কিসের একটা দারুণ ব্যথা বেজে উঠলো।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে উন্মত্তের মতন সে ছুটল। আর প্রতিদ্বন্দিকে পরাজিত করলে তরঙ্গের আঘাত করে। তরণী ডুবে গেল।

প্রেমের কাছে লালসা পরাজিত হ'ল আর তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল তারই প্রতিদ্বন্দির পায়ের তলায়।

দরদী

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২১শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩১। ২১শ সপ্তাহ

প্রাণ

[স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]

তব সম আর কে আছে আমার
ওহে প্রাণ প্রিয়তম ;
তোমারই তরে এ তনু আমার
(সখা) দেহ-রথে রথী সম।
বাল্য কৈশোর যৌবন আর
প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য কিবা,
সমান পিরীতি সমান আরতি
(মোরে) কর নিতি নিশি দিবা।

তুমি ছেড়ে গেলে সাধের এ দেহ
হইয়া রবে হে শব,
কেবা সে কাহার সব ফক্কিকার
তুমি বিনা হে বান্ধব।
তোমারই মিলনে মঙ্গলময়
পবিত্র এ দেহ-রথ
তোমারই বিচ্ছেদে মুহূর্ত্তে ঘৃণিত
অশুচি পদার্থ মত।

নারী-বিদ্রোহ

[চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন]

শাড়ী সেমিজ হয়েছে যে
নিতান্ত সেকেলে ;
ধুতি ও পাঞ্জাবী পর—
নইলে পিছে গেলে !

কি সুন্দর আহা মরি,
ইচ্ছে হয় বিয়ে করি!

"উঠ 'বাবু' মুখ ধোও পর নিজ বেশ
চায়ের বাটিতে মন করহ নিবেশ।"

"নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর
পান সিগারেট দোক্তা ছেড়ে, বর্ম্মা চুরুট ধর।"

যাত্রার দলে যোগেশ

(গল্প)

[নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—লিখিত]

মনের মত চাকরি তো কোথাও হয় না! করা যায় কি? বি-এ তো পাশ করলুম,—কিন্তু আর তো "পয়সা" রোজগার না ক'ল্লে সংসার চলে না! যতদিন বাবা মশাই বেঁচে ছিলেন,—একরকম কষ্টে স্বষ্টে তিনি সংসার চালিয়ে গেছেন, সেদিকে আমার বড় দৃষ্টি ছিল না। বাবার দেহরক্ষার পর (আমি তাঁর বড় ছেলে,—সুতরাং) "চার চালের ভার" আমারই মাথার ওপোর পোড়লো। দেনাপত্র করে কোন রকমে মা-ঠাকরুণ বাবার অবর্ত্তমানে বছর দেড়েক সংসার চালিয়ে আমায় বি-এ পড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন,—আমিও দু'বেলা দুটো প্রাইভেট্ টিউশানি করে আমার কলেজে পড়ার খরচটা চালিয়ে নিয়েছিলুম। যাহোক্—মা সরস্বতীর কৃপায় বি-এ-টা পাশ করা গেল। মা ঠাকরুণ ভাব্‌লেন, "আর ভাবনা কি,—এইবার আমার যোগেশ তো মানুষ হ'ল,—সংসারে আর অভাব থাকবে না!" মা তো এক রকম নিশ্চিন্ত হ'লেন। আমিও বি-এ পাশের খবর বেরুবার পর দু'এক মাস বাড়ী বসে ঐরকম নিশ্চিন্তই হ'য়েছিলেম। বি এ তো পাশ ক'রেছি, আর আমায় পায় কে? রোজগার ক'র্ত্তে বেরুলেই "পয়সা!" মাস দুই পরে মায়ের পদধূলি নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে প'ড়লেম, ক'লকেতার সহরে "পয়সা লুট্‌তে!"

ও বাবা! কলকেতায় এসে মাসখানেক ঘুরে ফিরে দেখি,—পয়সা রোজগার করা নয় তো,—যেন 'সোঁদোর বনে বাঘ দেখা!' ভীষণ ব্যাপার—ভীষণ বাজার! আরে কোথায় পয়সা—বিশেষ, বাঙ্গালীর ছেলের কাছে? অফিসে অফিসে ঘুরে দেখি—সব জায়গায় "No vacancy,—application not received!" যদিও বা কোথায় কোন ঘোঁজে একটা আধটা "vacancy" থাকে, সেখানে ঘেঁসে কার সাধ্য? সেখানকার Local man অর্থাৎ সেই অফিসের মাতব্বর বাবুরা—সেটা নিজেদের লোকেদের জন্যে—বিশেষতঃ বড়বাবু মশাই তাঁর শালা সম্বন্ধীদের জন্যে—আগ্‌লে নিয়ে বসে আছেন,—সেখানে আমার মত অসহায় মুরুব্বিহীন লোক এগোয় কি করে? সাহেবের কাছে? আরে বাপ্‌রে বাপ্! সেখানে তো গন্‌গনে আগুন! আঁচ সয় কে? একবার কপাল ঠুকে একজন সাহেবের কাছে দরখাস্ত হাতে করে যেই গিয়ে দাঁড়ানো,—সে ব্যাটা তো আমার খদ্দর পরা দেখে চেঁচিয়ে হিন্দিতে বলে উঠ্‌লো—"চাপড়াস! হামারা বন্দুক ল্যাও!" দৌড় দৌড়—উঠি কি পড়ি! ব্যবসা ক'র্ব্ব? পুঁজি তো দেশ থেকে এনেছি—মা'র বালা বাঁধা দিয়ে শতাবধি টাকা,—তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ খরচ হয়ে গেছে! ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা একেবারেই ছেড়ে দাও! দালালী? কাজটা বড় বটে! ঢাল নেই তরোয়াল নেই—নিধিরাম সর্দ্দার! চালাতে পারলে মন্দ হয় না, বেশ দু'পয়সা আছে! কিন্তু তার রাস্তা আলাদা,—আমার সে সব মোটেই জানা নেই! আর বাজারে বাঙ্গালী দালালই বা কই? মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, এরাই তো সব ছেয়ে ফেলেছে! নাঃ—পয়সা রোজগারের কোন সুবিধে দেখ্‌ছি না! অথচ মা-ঠাকরুণ সপ্তাহে দুইখানি করে চিঠি লিখে জানতে চাইছেন—কবে রোজগারের টাকা পাঠাচ্ছি! এ বছর বাড়ীটা মেরামত না করালে—বর্ষাকালে আর বাস করা চলবে না! অস্থির আর কি!

ঝাঁ করে একটা মস্ত রোজগারের পন্থা নজরে পড়ে গেল! আহ্লাদে প্রাণটা লাফিয়ে উঠ্‌ল। আর দুঃখ কি? এইবার বড়লোক হওয়াই বাকী! হঠাৎ গোলদিঘীতে বেড়াতে বেড়াতে আমার ক্ল্যাস্‌ফ্রেণ্ড প্রাণকৃষ্ণ পরামাণিকের সঙ্গে দেখা! দিব্যি সাজগোজ—চমৎকার বাব্‌রি চুল,—মজাদার চেহারা,—"প্রাণকেষ্টো" মোটরে চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন! প্রথমে দেখেই মনে করলুম যে "প্রাণকেষ্টো"

বুঝি জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা বড় দরের উকীল এটর্ণি ইত্যাদি রকমের কিছু হয়েছে! পরক্ষণেই মনে পড়লো—"আরে তা কেমন করে হবে? প্রাণকেষ্টা তো টেষ্ট্ একজামিনেই সব কটা ব্র্যাকেট ফেল্ হয়েছিল!" যাহোক্,—আলাপ পরিচয় ঝালিয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকল কথা জেনে নিয়ে বুঝ্‌লুম,—প্রাণকেষ্ট এখন কলকেতার থিয়েটারের একজন

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড় দরের আর্টিষ্ট্—অর্থাৎ ঘোর এ্যাক্‌টর্। সাড়ে চারশো টাকা মাইনে,—মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াতে পায়,—বাজারে খুব নাম!

আর প্রাণকেষ্টোকে ছাড়ে কে? ধরে বস্‌লুম্—আমায় একটা থিয়েটারের চাকরি করে দিতেই হবে! আমি তো বহুৎ অ্যাক্‌টো করিছি,—অবিশ্যি সখের থিয়েটারে! মেঘনাদ সেজেছি, শক্তসিংহ সেজেছি, যুধিষ্ঠির সেজেছি, পরাশর সেজে এমন গান গেয়েছি যে দেশে এখনও গদাই মণ্ডলের পিসি একবার দেখা হলেই আমাকে ধরে—"এই বলে নূপুর বাজে—" গানটা শুন্‌বেই,—আর তখুনি আমার বাড়ীতে বারো আনা দামের "সিধে" পাঠিয়ে দেবে।

প্রাণকেষ্টোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ (তার মোটরে নয়) পদব্রজে থিয়েটারে গেলাম। বাইরে দাঁড়িয়েই আছি—প্রাণকেষ্টো ভেতরে! যাকে ডেকে দিতে বলি—সে থিয়েটারী লোক, কথা গ্রাহ্যই করে না,—ডেকে দেওয়া তো চুলোয় যাক্! তবু দাঁড়িয়েই আছি। পা ভেরে গেল! বাইরে থেকে ষ্টেজের অনেক ব্যাপার শুন্‌তেও পাচ্ছি। মন্দ লাগ্‌ছে না! কখনো "প্রাণসখীদের" গানের আওয়াজ,

কখনো প্রাণকেষ্টোর আঁট্ (Art) মেশানো বক্তিমের মহলা,—কখনো পাঁচ কর্ত্তার "কর্ত্তামি"—ইত্যাদি বহুৎ রকমের জিনিষ শুন্‌ছি, আর ভাবছি—হায় রে! কবে আমি ওদের একজন হ'য়ে মর্ত্ত্যে অমরার সুখ ভোগ ক'র্ব্ব!

সেদিন ফিরে এলুম। তার পরদিন আবার গেলুম—সাড়ে চার ঘণ্টা বাইরে দাঁড়ালুম, ফের ফিরে এলুম,—তার পরদিনও ঐ রকম! দূর তোর থিয়েটারের চাক্‌রি! মারি তোর প্রাণকেষ্টোর মাথায়—ঝাঁক্! রাগ ক'রে চলে আস্‌ছি, হঠাৎ প্রাণকেষ্টোর পথের মাঝখানে আবির্ভাব! তাকে দেখেই—ব্যস্—অঙ্গ জল! সুড় সুড় করে সঙ্গে গিয়ে উঠ্‌লেম ষ্টেজের ওপোর,—দাঁড়ালেম এক সিন্ধুঘোটক মূর্ত্তির সাম্‌নে। বুঝলেম্—ইনি ম্যানেজার!

অনেক রকমের একজামিনের পর প্রাণকেষ্টোর recommendationএ—(চেহারা ভাল, গান গাইতে পারে, এ্যাক্‌টিং শিখিয়ে নিলে দশ বছর বাদে চল্‌বে—ইত্যাদি বিবেচনা করে) "মোচ্‌মুণ্ডা" কর্ত্তৃপক্ষের দল কুড়িটী টাকায় আমায় ভর্ত্তি ক'ল্লেন! কি করি,—তা'তেই লেগে গেলেম। হায় রে—প্রাণকেষ্টো! তুই টেষ্টে ফেল্—তোর পাঁচশো টাকা কিস্‌সৎ—আর আমি বি-এ পাশ, —আমার ভুয়ে একটি মাত্র শূন্য! বরাৎ!

কাটা সৈন্য থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের ছোট পার্ট তো আমার একচেটে! হঠাৎ একদিন প্রাণকেষ্টোর ভেদবমি রোগে "যায় যায়" অবস্থা। নূতন নাটকে তার "হিরোর" পার্ট,—মাত্র কয়েক রাত্রি বই খোলা হয়েছে,—"ডুপ্লিকেট" কেউ ছিল না। তিনশো চারশো টাকার "হিরোরা" "অপ্রস্তুত" পার্ট নিয়ে কেউ prestige এবং Art মাটী ক'র্ত্তে চান্ না। আমি তাল ঠুকে বল্লেম—"এ পার্ট আমার তৈরী আছে!" অনেকে—বিশেষ সিন্ধুঘোটক ম্যানেজারটী ঘোরতর আপত্তি তুললেন। যাহোক্—প্রাণকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষক দর্শকবৃন্দ—কেউ কেউ প্রাণকৃষ্ণবিহনে হয়তো চলে গিয়েছিলেন টিকিটের দাম refund নিয়ে! আমি সে রাত্রি কাজ চালিয়ে দিলুম! দর্শকরা কিছুই তো থিয়েটারের বোঝে না,—আমার acting শুনে চড়্‌চড়্ ক্ল্যাপ্ ঝাড়ে, Capital, Excellent, Grand, এই রকম সব কত কি ব'লে আমার অন্ন মার্‌বার চেষ্টা ক'র্ত্তে লাগলো। বাইরের অনেক লোক ষ্টেজের ভেতোরে (দলের কারুর না কারুর সঙ্গে আলাপসূত্র ধরে) এসে আমার সঙ্গে আমার অভিনয় দেখে খুব যেন খুসী হয়ে আলাপ পরিচয় ক'ল্লেন,—কত কথা বল্লেন,—উৎসাহ দিলেন! ফলে এই হ'ল—প্রাণকেষ্টো রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এসে সে সব শুনে আমার ওপোর একেবারে খড়্গহস্ত,—আর মাস খানেকের মধ্যে সিন্ধুঘোটক ম্যানেজার কর্ত্তৃক আমার চাকরীতে জবাব!

এখন উপায়? যাহোক্ কুড়ী-কুড়ীটা টাকা আস্‌ছিল তো? মাস তিনেক সেই টাকা মাকেই পাঠানো হয়েছিল। কারণ,বাসা খরচ চালাতুম মার বাঁধা-বাঁধা দেওয়া সেই বত্রী টাকায়,—আর রোজগারের টাকা বলে কুড়ীটাই মাকে পাঠিয়ে দিতুম! গোটা দুই তিন থিয়েটার সহরে আরও আছে বটে,—যাব না কি এক এক করে? তাইতো—সুবিধে হবে কি? এ তবু "প্রাণকেষ্টো" মুরুব্বি হয়েছিল,—অন্য জায়গায় তো একজন চেনা "ধিনিকেষ্টোও" কেউ আছে ব'লে মনে হয় না! আমল পাব কি?

বাসায় পাশের ঘর থেকে হরিসুন্দর মান্না একবার ডাক দিলেন। বয়োঃজ্যেষ্ঠ,—ডাক শুনে "খিঁচ্‌ড়োনো" মেজাজে তার ঘরে ঢ়ুক্‌লেম! হরিসুন্দর একটু খাতির করে বসতে বল্‌লেন,—কম্বলপাতা তক্তার উপরে বস্‌লুম। হরিসুন্দরের পাশে একটা চুয়াড়-আকৃতির লোক বসেছিল, ঘাড় পর্য্যন্ত বাব্‌রীছাঁটা চুল,—ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ী,—গোঁপ অবিশ্যি আছেই! বয়েস প্রায় ৫৩।৫৪,—গায়ে একটা ছিটের কোট, ময়লা উড়ানি কোঁচানো—কাঁধের ওপোর "আন্‌লায় কাপড় রাখা" গোছ ফেলা! পায়ে বুট্‌জুতো—ডান পাটাটার তিন জায়গায় তালি! অনবরত বিঁড়ি ফুঁক্‌ছে! হরিসুন্দর আমাকে ব'ল্লেন—"অন্য কোন থিয়েটারে জাইন্ ক'ল্লেন নাকি যোগেশবাবু?"

একটু রুক্ষস্বরে বল্লেম—"দূর তোর—আর থিয়েটার কর্ব্ব না! ভারি নোংরা কাজ! তার ওপোর—পয়সা নেই! কি হবে?"

হরি। "বাস্তবিক আমিও তাই বল্‌ছিলুম,—কেন মিথ্যে ২০।২৫৲ টাকার জন্যে বেশ্যাদের সঙ্গে নাচা?"

"কি করি বলুন—পেটের দায়ে!"

সেই যে ফ্রেন্‌চকাটদাড়ীবিশিষ্ট লোকটী বসে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ক্রমাগত বিঁড়ি ফুঁক্‌ছিলেন,—তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন,—"বাঃ, দিব্বি আপনার এ্যাক্‌টো! আর তেমনি সুন্দর আপনার চেহারা! মানিয়েছিল ফাষ্টো কেলাস্!"

প্রশংসা শুনে বেশ একটু খুসী হয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম—"আপনি আমার প্লে দেখেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ—গত শনিবারে আমি যে থিয়েটারে গিয়ে আপনার প্লে দেখে এসেছি! শুধু আমি নয়,—আমার দলের ৭৮ জন গিয়েছিল! প্রাণকেষ্টোবাবু সেদিন প্লে করেন নি! বাঃ—নতুন নেমে বেশ করেছিলেন মশাই! আমার দলের সবাই খুব তারিফ কল্লে।"

"আপনার কিসের দল?"

হরিসুন্দর বল্‌লেন,—"এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতেই তো ডাক্‌ছিলুম! এঁর মস্ত অপেরাপার্টি আছে—"

"অপেরাপার্টি? যাত্রার দল? পেশাদারী?"

"হ্যাঁ—খুব নামজাদা দল! শোনেন নি—কলকেতার মহীন্ পোদ্দারের থিয়েটারিকেল অপেরা পার্টি? ইনি সেই মহীন পোদ্দার,—নিজে অধিকারী! খুব মস্ত এক্‌টোর! দলও খুব বড়! এক্‌শো সওয়াশো লোক কাজ করে!"

"বটে?"

অধিকারী মশাই ব'ল্লেন—"একদিন আমার দলে হরি-ভায়ার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন দেখে শুনে আস্‌বেন! দল আমার এখনও মাসখানেক কল্‌কেতায় আছে,—বারোয়ারী আসরে রক্ষাকালী পুজোর দরুণ প্রায় তিরিশটা বায়না আছে। সেগুলো সেরে দল রংপুরে নিয়ে যাব! আজ তা'হ'লে আসি! নমস্কার।"

"নমস্কার।" অধিকারী মশায় বিদায় হলেন।

অধিকারী চলে গেলে আমি হরিসুন্দরকে জিজ্ঞাসা কল্লেম—"ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে এত ব্যস্ত হচ্ছিলেন কেন?"

"আপনারই তাল্লাসে ও এসেছিল। একগ্রামে আমাদের বাড়ী। হঠাৎ কি করে সন্ধান পেলে যে আপনি আমাদের বাসায় থাকেন—তাই এসে উপস্থিত।"

"কি মতলব ওর?"

"অনেক দিন থেকে একজন ভাল এ্যাক্‌টর খুঁজছে। সেদিন আপনার এ্যাক্‌টো দেখে ভারি খুসী হয়েছে! লোকটা খুব তুখোড়, বুঝলেন যোগেশবাবু—খুব হিসেবী—একটা দস্তর মত বুঝ্‌দার লোক! দলের অধিকারী হবার যোগ্য বটে!"

"আমায় কি দলে নিতে চায়?"

"সেই কথাই ব'ল্‌তে এসেছিল তো! কি ছাই পাশ এখানে ২০৷২৫৲ টাকার জন্যে থিয়েটারে পড়ে আছেন? আমি বলি—ওর যখন আপনাকে পছন্দ হয়েছে;—আপনি ঢুকে পড়ুন!"

"বলেন কি? শেষে পেশাদারী যাত্রার দলে? আমি যোগেশচন্দ্র মিত্র—বি-এ! আমি ক'র্ব্ব যাত্রা? তায় পেশাদারী—তার ওপোর বারোয়ারী তলায়? Impossible!"

"সে আপনার খুসী! তবে আমার কথা হচ্ছে—আর আপনিও এই মাত্র বল্লেন—পেটের দায়ে সব কর্ত্তে হয়! এখানে ২০৷২৫৲ টাকার জন্যে বেশ্যাকে "মা" বলে ডাক্‌ছেন,—এ যাত্রার দলে পুরুষমানুষ নিয়ে কাজ,—সে সব ভয় নেই! উপরন্তু ঢের বেশী রোজগার!"

"কত মাইনে দেবে?"

"আমি দেড়শো টাকা বলেছি! পুরো তা না দিক—জোর করে ধ'ল্লে ১০০৷১২৫৲ টাকা তো নিশ্চয়ই! একরকম নিম্‌রাজি হয়েই গেছে।"

একশো টাকা! মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে গেল! মনটাও সঙ্গে সঙ্গে একটু ছোট হয়ে গেল,—শেষে "যাত্রার দলে সং সাজব?" হরিসুন্দরকে বল্‌লাম—"আজকে একটু ভেবে দেখি, কাল পাকা কথা দোবো।"

"আমার লেহ্য কথা যদি শোনেন—আপনি চোককাণ বুঁজে ঢুকে পড়ুন! ১০০৷১২৫৲ টাকায় তো আরম্ভ—দু'এক বছরের মধ্যে কেরামতি দেখিয়ে বাড়িয়ে নিতে কতক্ষণ? কত ভদ্রলোক—পাশ করা—এম্-এ, বি-এল পর্য্যন্ত যাত্রার দলে ঢুকেছে তা জানেন?"

সমস্ত রাত ধরে ভাব্‌তে লাগলুম। শেষে "অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির" যাত্রার দল,—যাত্রার দলই সই!"

"দুর্গা" ব'লে তো ঝুলে পড়্‌লুম! মাইনে ধার্য্য হ'ল ১৩০৲ টাকা! অধিকারী পোদ্দার মশাই তো আমাকে পেয়ে খুব খুশী। দলের ভেতোর আমার খুবই খাতির। ষাট বছরের তব্‌লা-বাদক থেকে ন'বছরের "পুঁট্‌কে" রাখাল-বালক-সাজা দুগ্ধপোষ্য ছেলেটী পর্য্যন্ত আমাকে তুষ্ট ক'র্ত্তে ব্যস্ত। প্রথম প্রথম মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল—মনের মতন সঙ্গী অভাবে। আমি শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মিত্র বি এ—আমি পেশাদারী যাত্রার দলে মিশি কার সঙ্গে? আমার মেশ্‌বার মত একটা ভদ্দর চেহারা তো দলের ভেতোর কারও নেই! চেহারায় অবশ্য সকলে কুৎসিৎ নয়,—পোষাক কিন্তু অতি জঘন্য! ময়লা চিরকুট্টি কাপড়,—ছেলেবুড়ো প্রায় সবাকারই দেখি গাছকোমর বাঁধা,—সকল সময়েই একখানা গামছা,—(ভিজে অবস্থায় পাট করে কাঁধে ফেলা থাকে—আর শুক্‌নো থাক্‌লে গায়ের কাপড়ের কাজ করে),—পায়ে (যখ্‌ন দেখ) "গোড়তোলা শু" শোবার সময়—আর স্নান কর্ব্বার সময় ছাড়া,—চুলের বাহার ভীষণ! সাম্‌নের দিকে পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই,—বাকী পশ্চাদ্দিকে এবং দুই কাণের ওপর! সেই চুলে কারও বাঁকা,—কারও সিধে—কারও ঢেউ খেলানো কারও "অ্যালবার্ট ফেসান"—কারও কপাল-ঢাকা লম্বা তেড়ি! তেল এত বেশী মাখে যে কপাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়! সকলেরই দেশ সুদূর পল্লীগ্রামে,—কল্‌কেতাবাসী কেউ নয়! ধুমপানটী আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই যেন গোঁড়া-বৈষ্ণবের মালাজপের ব্যাপার, দিন্‌রাত কামাই নেই! গুড়ুকখোর যিনি, আধহাত লম্বা একটী হুঁকো তদুপযুক্ত কল্‌কে সমেত,—দিনরাত নিয়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে টান্‌ছেন, তা সে কল্‌কেতে আগুন থাক্ আর নাই থাক্! বিঁড়ি সেবী যারা, দুকাণের ওপোর দুটো আধপোড়া নেবানো বিঁড়ি আর মুখে একটা ঐ গোছের জলন্ত! হুস্ হুস্ করে কেবলই টান যাচ্ছে!

দলের সকলকেই একসঙ্গে এক বাসায় থাকতে হয়। আমিও কল্‌কেতার "মেসের" বাস তুলে দিয়ে অধিকারীর আস্তানায় এসে জুট্‌লুম। Lodg ng Boarding (খাওয়া দাওয়া অর্থাৎ দু'বেলা ভাত আর থাক্‌বার জ্যায়গা) অধিকারীর খরচা! অন্য সমস্ত খরচ (জল খাবার, ধোপা, নাপিত, তামাক, বিঁড়ি, সিগারেট্) যার যার নিজের! ধুলোয় বিকৃতবর্ণ সরকারী সতরঞ্চি আছে খান আষ্টেক,—রাত্রে তাই বিছিয়ে দেওয়া হয়! যে যার মাথার বালিশ নিয়ে গড়াগ্‌গড়্ শুয়ে পড়ে! ওরই মধ্যে যারা একটু সৌখীন—কিম্বা ঘেঁসাঘেঁসিতে শুতে পারেনা—(যেমন আমি আর জন দুইচার—তা'রা আপনাদের আলাদা বিছানা পেতে শোয়!

আমি নতুন লোক,—এখনও "পার্ট" টার্ট্ কিছু পাইনি; সম্প্রদায় এখন ক'ল্‌কেতায় কিছুদিন থাক্‌বে,—নতুন নাটক সীতাহরণ" রিহার্স্যাল দিয়ে তৈরি কর্ব্বার জন্যে! বায়না তো চ'ল্‌ছেই! নতুন নাটকে আমাকে একতাড়া লেখা কাগজ দিয়ে অধিকারী পোদ্দার মশাই ব'ল্লেন—"এই আপনার পার্ট্! অভ্যেস্ করুন!"

কাগজের তাড়ার ওপোরে লেখা রয়েছে—"লক্ষ্মণ"—"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র বাবু!" বুঝ্‌লুম—আমায় "সীতে-হরণে" ভাই "লক্ষ্মণ" সাজ্‌তে হবে! কিন্তু ওরে বাবা—একি "পার্ট"? এ যে একেবারে পুরো দস্তুর লোপাট্! এই শতাবধি পাতা কণ্ঠস্থ ক'রে আসরে আওড়াতে হবে? তার ওপোর তো প্রম্‌টার থাকে না! মাটী করেছে আর কি!

অধিকারী বল্লেন,—"বেন্দা নাপিত "রাম" আর আপনি "লক্ষ্মণ,"—এবার পালা খুব জম্‌বে! আর ভয় নেই আমি রাবণ "সাজ্‌ছি!"

"বটে? তা হ'লে তো বেশই হবে—আসর জলিয়ে দেবো!" যদিও স্থির বুঝেছিলুম, লঙ্কেশ্বর রাবণের এরকম গঞ্জিকাসেবী চুয়াড়ের মত চেহারা মোটেই ছিল না! তার ওপোরে—ঐ ফ্রেঞ্চ্‌কাট্ দাড়ী, ওটাতো রাবণের থাক্‌বেই;—কারণ, ওটী অধিকারী মশায়ের খুব সখের জিনিষ! আর রাবণের যে ঐ রকম ফ্রেঞ্চ্‌কাট্ দাড়ী ছিল না—তার প্রমাণ কি? আর সেকেলে জিনিষ এখন মোটেই লোকে চায় না,—তার সাক্ষ্যি—কল্‌কেতার থিয়েটারে রামায়ণী—মহাভারতী পোষাক আর সাজগোজ! সব "আর্টের" দোহাই দিয়ে ফাঁকির ওপর কাজ! "হিরোদের

সকলকে "ঝুট্‌মল গঙ্গাপ্রসাদ" গোছের মেড়ুয়াবাদীর পোষাক পরিয়ে দিলেই—ব্যস্—মস্ত "আর্ট্" দেখানো হয়ে গেল! হায়রে বাঙ্গালী দর্শক!

বাসাবাড়ীর উঠোনের এক ধারে গোটাচারেক উনোনে বড় বড় হাঁড়া চাপানো আছে;—চার পাঁচজন বামুনে রান্না কচ্ছেন! দুটোতে অড়রডাল ফুট্‌ছে—বাকী গোটা দুইতিন চুলোতে ভাত হচ্ছে! আমি অন্যমনে বেড়াতে বেড়াতে এক পাশে একা দাঁড়িয়ে রান্নার বহরটা দেখ্‌ছি! বেলা তখন প্রায় এগারোটা! এর মধ্যেই তিপ্পান্ন জন ছেলে বুড়ো ক্ষিধের জ্বালায় ভাতের তাগাদা কর্ত্তে এসে বামুনদের সঙ্গে দস্তুরমত গালাগাল—হাতাহাতি পর্য্যন্ত করে গেছে! সে গালাগালি থেকে স্বয়ং অধিকারী পর্য্যন্ত নিস্তার পান নি!

অন্ন প্রায় প্রস্তুত—এ সংবাদটা দলের ভেতর যে মুহূর্ত্তে প্রচার হ'ল,—অম্‌নি যে যেখানে দলের লোক ছিল,—এক একখানা শালপাতা পেতে দালানে বসে গেল! আর তখন রান্নার দিকে কা'রও নজর নেই! সবাই খাম্‌চা খাম্‌চা লবণ আন্‌তে,—যে যার জলের ঘটী বার করে জল নিয়ে পাতা ধুতে—পাতার নীচে জল ছড়িয়ে পাতাকে কায়দায় রাখ্‌তে—কাঁচালঙ্কা সংগ্রহ কর্ত্তে,—কেউ দু এক পয়সার ঘি কিম্বা দই,—কিম্বা খানিকটা দুধ বাজার থেকে কিনে এনে পাতের কাছে যত্ন করে রাখ্‌তে মহাব্যস্ত! দলের এই আহারের উদ্যোগ পর্ব্বটা কিছু ভীষণ রকমের! আমি সেই রান্নার জায়গায় এক পাশে দাঁড়িয়ে আছি;—বামুনরা আমাকে কেউ লক্ষ্য না করে—যাত্রার দলের তাবৎ লোকদের পিতৃমাতৃ উচ্ছন্ন ক'চ্ছে! ভাত ডালের হাঁড়া নাবিয়ে রাখা হয়েছে! হঠাৎ দেখি—একজন বামুন একটা ছোট চেঙ্গারী করে উঠোনের কোণ থেকে কতকগুলো বালিকাঁকর এনে—দু একবার এদিক ওদিক চেয়ে—সেই ডালের প্রকাণ্ড হাঁড়া দুটোর ভেতর ঢেলে দিয়ে—খোন্তা দিয়ে সেগুলো ডালের সঙ্গে খুব মিশিয়ে দিলে!

কি সর্ব্বনাশ! এ বামুন ব্যাটারা তো ভয়ানক বদ্‌মায়েস্! দু পাঁচজনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে—সমস্ত দলটার খাওয়া নষ্ট করে প্রতিশোধ নিচ্ছে? এ বেটারা তো দেখ্‌ছি সব পারে!

এক পাশে একটা বড় "বারকোশে" কাপড়ঢাকা স্তূপাকার ডাঁটাচচ্চড়ী ছিল! কোথা থেকে হঠাৎ অধিকারী মশাই এসে—বারকোশের কাপড়খানি তুলে—নিজের হাতে সেই বালিকাঁকর দশ বারো মুটো মিশিয়ে দিয়ে দুজন বামুনকে চেঁচিয়ে বল্লে—"তরকারিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হে,—আর একবার ভাল করে সাঁত্‌লে নাও!" বামুনরা একটু হেসে "যে আজ্ঞে" বলে আদেশ পালনে তৎপর হ'ল! অধিকারী মশাই সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন,—এমন সময় আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে হাত ধরে সমাদরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বল্লেন—"এ ব্যাটাদের খাওয়া হ'লে,—আমরা বস্‌বো এখন! আপনার কিছু জলযোগ হয়েছে তো? আসুন—ততক্ষণ দপ্তরে একটু কাজ সারিগে! গোটাকতক পরামর্শ আপনার সঙ্গে আমার আছে!"

আমি কোন কথা না বলে অধিকারীর সঙ্গে গেলেম! মনে মনে এমন রাগ হয়েছিল, তার ওপোর ইচ্ছে ক'চ্ছিল—একটী ঘুসীতে!—স্থির করলুম এদের ভাত কখনই ছোঁবোনা! একটা হোটেলে দুবেলা খাবার বন্দোবস্ত ক'র্ব্ব! ব্যাটা পাষণ্ড!

অধিকারীর দপ্তর—ঐ বড় দালানে—(যেখানে সারি সারি পাতা পেতে ক্ষুধার্ত্ত বেচারীরা জঠরজ্বালা নিবারণ কর্ব্বার জন্যে উৎসুক হয়ে বসেছিল)—তারই একধারে একখানি ছোট মাদুর পেতে—হাতবাক্স হিসেবের খাতাপত্র, দোয়াত কলম নিয়ে—হুঁকো হাতে অধিকারী মশাই—হিসেব নিকেশে মহাব্যস্ত! আমি সেখানে এক পাশে খুব রুক্ষ মেজাজ নিয়ে হতভাগ্যদের খাওয়ার পরিণাম দেখ্‌ব বলে বসে আছি!

প্রথমে ভাতের হাঁড়াগুলো বামুনরা ধরাধরি করে মাঝখানে নে নামিয়ে—সকলকে ভাত পরিবেশন কর্ত্তে লাগ্‌লো। সকলেই সমস্ত পাতাটা জুড়ে ভাত নিলে! আরে বাপ্‌রে! সে ভাত নেওয়া কি যেমন তেমন? সেই যে কথায় বলে শুনেছি—"বেরালে ডিঙ্গুতে পারে না,"—সকলের (ছেলে বুড়ো যুবা—একধার থেকে সকলেরই) সেই মাপ! ভাত পরিবেশন হয়ে গেলে—সেই বালিকাঁকর মেশানো ডাল এনে উপস্থিত। বুবুক্ষুর দল তখন ডাল এসেছে দেখে

—পাতে নেবার জন্যে—পাত্রাভাবে—স্তূপীকৃত বাড়াভাতের ঠিক মাঝখানে এক একটা মুষ্ট্যাঘাত করে—দিব্যি একটা কূপ সৃজন করে নিয়ে—তাতে পোয়াটাক্ ডাল নিয়ে গপাগপ্ বড় বড় ভাতের গরাস্ তুলতে লেগে গেল! ভীষণ ক্ষুধা! এমন ভীষণ যে কারও বোঝ্‌বার অবকাশ নেই যে কি জিনিষ বদনবিবরে প্রবেশ করাচ্ছেন! ডাল পরিবেশনান্তে এক এক তাল সেই ডাঁটাচচ্চড়ী যখন প্রত্যেকের পাতে বিরাজ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো—ব্যস্—বামুনদের পরিবেশন কার্য্য তখন সমাপ্ত!

মিনিট খানেক কেটে যাবার পর—ভোক্তাদের ভেতর থেকে দু'একজন ভাতের গরাসপূর্ণ বিকৃত মুখে মাথায় বাঁ হাত দিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"উহু হু—হু! ওরে শালা বামুন! দাঁত গেল রে শালা! এত কাঁকর কোথা থেকে দিয়েছিস্?"

একজন—দুজন—চারজন—দশজন,—ক্রমে সকলেই খেতে খেতে চীৎকার ক'রে এক একবার বামুনকে গাল দেয়,—আবার ভাতের গরাস্ তোলে!

দু'একজন বলে উঠ্‌লো—"ওরে—ও শালা অধিকারী,—গুওটা—পোদ্দারের পো! শালা! আমাদের কি জানে মার্ব্বে?"

কেউ বলে, "শালা, আজই তোর দলের মুখে—তোর বাবার মুখে জুতো মেরে চলে যাব—"

জনকতক বলে "শালা এক পাশে বসে কি গুষ্টির পিণ্ডি নেকৃছ? উঠে এসে দেখ না—!"

অধিকারী মশাই হুঁকো টানতে টানতে ক্রমে তাদের দিকে পেছন ফিরে বসলেন! আমি বিদ্রোহিতার লক্ষণ দেখে ভয়ে অধিকারীকে বল্লুম,—"অ মশাই! চুপ্ করে এই অকথ্য গালাগালগুলো খাচ্ছেন? একটু উঠে যান,—বুঝিয়ে বলুন—"

আমাকে সামান্য একটু ঠেলা দিয়া অধিকারী ব'ল্লেন,—"আঃ—আপনি ফিরে বসুন না! ও শালাদের কথায় কাণ দিচ্ছেন কেন? ওরা রোজ ঐরকম করে! চুপ্ করে শুনে যান না!"

চুপ্ করে শুনে যাব? এমন মা-মাসী—সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর অকথ্য, অশ্রাব্য, জঘন্য কথা শুনে কেউ স্থির থাকতে পারে? এ অধিকারীটা কি? মানুষ না জানোয়ার?

মরুক্ গে যাক্! আমায় তো গাল দিচ্ছে না!

আধঘণ্টা পরে দলের আহারকার্য্য শেষ হ'ল! ভোক্তারা গাল দিতে দিতে উঠে যাবার পর দেখি,—সমস্ত শালপাতাগুলি ভাত আন্‌বার পূর্ব্বে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল,—আহারান্তে তা'রা উঠে যাবার পর—ঠিক সেইরূপই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে! একটা দানা পর্য্যন্ত পাতের এক কোণে কোথাও পড়ে আছে বলে মনে হয়না। আহারান্তে আচমন করে যখন তারা অধিকারীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে যে যার হিসাবপত্র দেখ্‌বার জন্যে অত্যন্ত কাতরভাবে অনুরোধ ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লে, তখন তাদের মুখের ভাবে আর নরমস্বরে কথাবার্ত্তা শুনে কিছুতেই আমার বিশ্বাস হ'লনা যে, দশ পনেরো মিনিট পূর্ব্বে এই প্রাণীবর্গ ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে দলপতির মাথাটা কেটে নেবার জন্যে একসঙ্গে কোমর বেঁধেছিল! আর এক কথা,—মানুষে যে ঐ ছোট ছোট পেটের গহ্বরে ঐরকম ভয়ঙ্কর ভাতের স্তূপ গাদ্‌তে পারে,—এটা যিনি স্বচক্ষে না দেখবেন—তিনি কিছুতেই বিশ্বাস কর্ব্বেন না! আহারান্তে বেচারীদের মূর্ত্তি দেখে আমার ভয় হ'চ্ছিল। হয়তো বা পেটগুলো সব ফটাস্ করে ফেটে এখানে একটা বিকট "ডালভাতের" নর্দ্দামা সৃষ্টি করে! অধিকাংশ বালকই ম্যালেরিয়ার রোগী;—তাদের পেটজোড়া পিলের দরুণ স্বভাবতঃ খালি পেটেই পেটগুলো "ঢাউসের" মত ফোলা, তাতে ঐ রকম ভাতের গাদা ঠেসেছে! পেটই বা ফাটে,—Heartই বা Fail করে!

তারা সেখান থেকে বিদায় হ'লে অধিকারী মশাই হেসে বল্লেন—"যোগেশ বাবু! বুঝেছিলুম—আপনি আমার ওপোর একটু চটেছিলেন। মশাই! ঐ কাঁকরমেশানো ডাল দিয়েই গুওটাদের গোগ্রাসে গেল্‌বার ভঙ্গিমেটা দেখলেন? এর ওপোর একটু যদি ভদ্রভাবে খাবার বন্দোবস্ত হয়,—তা'হলে শালারা আমাকে শুদ্ধ খেয়ে সাফ্ করে দেবে!"

"না। আমি খাওয়া সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই নে। তবে ভারী অশ্লীল গাল দিচ্ছিল,—অসহ্য—"

"আরে মশাই,—ঐ রাক্ষুসে দল নিয়ে যাত্রার দল বজায়

রাখ্‌তে হ'লে—ওরকম গালাগাল হজম কর্ত্তেই হয়। তা নইলে কি—দেশে দোতলা কোটা তুলতে পারি—না—জমিদারী কিন্‌তে পারি, —না—আপনাদের মত—এল্‌-এ বি-এ পাশ করা এ্যাক্‌টরদের মোটা মাইনে দিয়ে দলে আন্‌তে ভরসা কর্ত্তে পারি ?"

এ কথার ওপোর আর কি উত্তর দিই ? কাজেই চুপ করে রইলুম।

আমাকে নীরব দেখে অধিকারী বল্লেন,—"আপনার কোন ভয় নেই,—আপনার আহার আপনার মত লোকেরই যোগ্য হবে! এখানে চার কেলাস্ (class) রান্না হয়। আপনি, বিধুবাবু আর নরেনবাবু—এঁরা ফাষ্টো কেলাস্‌ই পাবেন। দাদ্‌খানি চেলের ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ ভাজা—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"আমি গেরোস্তো গরীবের ছেলে,—রাজভোগ খেতে চাই না,—সাধাসিধে ভদ্রলোকের উপযোগী ডাল ভাত খেতে পেলেই হ'ল! মোদ্দাৎ—দোহাই,— তরকারী কিম্বা ডালে ঝোলে যেন বালির চাব্‌ড়া মেশাবেন না।"

অধিকারী হেসে আকুল! খুব আদর করে পিট চাপড়ে বল্লেন—"ক'দিন খেয়ে তো দেখ্‌ছেন। ফোর্থো কেলাস্ আর ফাষ্টো কেলাস্ কি সমান হয় ? রেলগাড়ীতে দেখেন নি ? হা—হা—হা !"

নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক্‌লেও ঐ গরীব ক্ষুধার্ত্ত বেচারীদের কথা মনে করে—প্রাণটার ভেতোর খুবই কষ্ট হ'তে লাগলো।

* * *

ক'ল্‌কেতায় দু'এক আসর "সীতাহরণ" পালা গাওয়া হ'ল। দর্শকবৃন্দ খুব ধন্য ধন্য কর্ত্তে লাগলো—দলেরও খুব নাম বেজে গেল। পাঠক! পেশাদারী যাত্রার আর সেদিন নেই। সেই কথায় কথায় ছেঁড়া চোগা-চাপ্‌কান্—পরা জুড়িদের মুহুর্মুহুঃ ঘণ্টাব্যাপী গান গাওয়া—তান মারা—সে রকম হাস্যোদ্দীপক সুর করে বক্তিমে (Acting),—সে নারদমুনির পাঁচপৃষ্ঠা একটানা হরি-কথা,—আজকাল এসব কিছুই নেই! পেশাদারী যাত্রায় এখন দস্তুরমত "লেও সাকি দেও ভর পিয়ালা—" গোছের সখীদের রকমারী গান নাচ—আঁট দেখিয়ে,—Gesture—Posture—Feelings Expression ইত্যাদির কেরামতি দেখিয়ে—চোস্ত রকমের কথাবার্ত্তা—অ্যাক্‌টিং। ষাট বছরের বুড়ো—গোঁপ্ কামিয়ে "বৃন্দেদূতী" সেজে আসরে আর গান গায়না—

"এখন চিন্‌বে কেন চিন্তামণি !
হয়েছ রাজা, পেয়েছ কুব্‌জা, আমি বৃন্দাবনের সেই
বৃন্দা কাঙ্গালিনী ॥
যখন ছিল রাধার চিন্তে, তখন আমায় চিন্‌তে,
বসেছ নাম কিন্‌তে, পারবে না হে চিন্‌তে,
কুঞ্জবিহার বনে, এ মধুর ভুবনে, (আমায়) অন্তে দিও রাঙ্গা
চরণ দু'খানি ॥"

তখনকার তাবৎ লোকেরা আকাট মুক্ষু ছিল,—এই গান শুনে মেতে উঠতো, কেঁদে ভাসিয়ে দিত,—তোড়া তোড়া টাকা,—জোড়া জোড়া শাল পেলা দিত। এখন আর সে রকম মুক্ষু old fool শ্রোতার দল নেই! এখন আঁতুড়ের ছেলে কুলোয় শুয়ে ট্যাঁ—ট্যাঁ করে,—আর আর্ট (Art) বাঁচিয়ে হাত-পা খেঁচে natural posture আর ইংরিজি feelings দেখায়! এখন old order has changed yeilding pla e to new! এখন বায় স্কোপ উঠেছে,—লোকে ইংরেজি থিয়েটার দেখেছে,—ইংরেজি ভাব প্রাণে পুষেছে ইংরেজিতে খায় দায়, ওঠে বসে, শোয় ঘুমোয়, চলে ফেরে, বেঁকে ঘাড় নাড়ে,—কোর্টশিপ করে, এবং ঘোমটা তুলে দেয়,—লভ্ করে,—চোদ্দ আনা মুখের ভাবে—দু'আনা কথায় আলাপচারী করে,—কাজেই এখন অভিনয় দেশ কাল পাত্র বুঝে সেই রকমের দরকার! এখন গোবিন্দ অধিকারী, দাশু রায়, লোকা ধোপার কি কল্কে পাওয়া সম্ভব ? এখনকার যাত্রা,—যাত্রাও নয়,—থিয়েটারও নয়,—পাঁচালিও নয়,—তরজাও নয়,—শুধু যাত্রা ব'লি কেন—এখন অভিনয় মাত্রই একটা "জগা খিচুড়ী" ব্যাপার! সুতরাং আমাকেও ঐ ভাবেই চলতে হয়েছে,—নইলে অধিকারী পোদ্দারের পো চটে যাবেন, অত টাকা মাইনে দেবেন কেন ?

* * *

যাত্রাটা কল্‌কেতায় খুব কমই হয়! বায়না অধিকাংশই বিদেশে! আর বিদেশ ব'লে বিদেশ ? জীবনে যে সব

জায়গার নাম পর্য্যন্ত কখনো শুনি নি, তল্পি-তাল্পা নিয়ে—সেই সব স্থানে সং সাজ্‌তে যেতে হয়! পেশাদারী দল, পয়সা দিয়ে নিয়ে যায়,—আবাহন বা খাতীরের কোন সম্পর্ক নেই! অধিকারীর মুখ চেয়ে যাই—আসি—অভিনয় করি—ব্যস্—এই পর্য্যন্ত!

একবার সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে কোন এক ধনবানের বাড়ী অভিনয় কর্ত্তে গিয়েছিলেম। মালিক শুধু ধনবান নয়—যাকে বলে ধনকুবের! প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার,—জাতিতে "পোদ্!" খুব সখের লোক! যাত্রা শুনে খুসী হ'লে বায়নার টাকা ছাড়া,—অভিনেতাদের মোটা রকমের বখ্‌শীষ্ দেন। সেই দেশে—সেই জমিদারের ঠাকুরবাড়ীতে ঝুলন উপলক্ষে যাত্রা গাইতে আমাদের সম্প্রদায় উপস্থিত।

পেশাদারী যাত্রা হ'লে কি হয়, কর্ত্তা খুব অমায়িক লোক, দলের চাকরবাকরদের পর্য্যন্ত খাতির যত্ন কর্ব্বার জন্যে লোক মোতায়েন করে দিয়েছেন! দলের জন্যে ম্যাওয়া মেওা জলযোগ থেকে সুরু ক'রে ঘি ভাত—পোলাও—মাছ—মাংস—ক্ষীরসরের পর্য্যন্ত ঢালোয়া বন্দোবস্ত! এমন খাওয়া, এত আদরযত্ন পেশাদারী যাত্রার দলকে কেউ যে ক'র্ত্তে পারে, এতো কখনো কল্পনায় আসেনি! চারদিন চার রকমের পালা গাওয়া হ'ল! শেষের দিন নতুন পালা—"সীতাহরণ" দেখে গাঁশুদ্ধ লোক "ধন্য ধন্য" কর্ত্তে লাগলো! এমন "গাওনা" আর কখনো হয় নি!

বিদায়ের দিন বেলা ৯ টার সময় নাটমন্দিরে (যেখানে আমরা বাসা পেয়েছিলুম—সেখানে) খবর এল,—কর্ত্তার তলব হয়েছে, জনকতককে—(যথা,—রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, হনুমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভূমিকায় অভিনয়কারীদের) তিনি নিজের হাতেবখ্‌শিস ক'র্ব্বেন।

অধিকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা জনদশেক লোক কর্ত্তার বৈটকখানাবাড়ীতে হলঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। মস্ত বড় ঘর; কর্ত্তা মোসায়েববেষ্টিত হ'য়ে মদের গেলাস হাতে "ঢুলু ঢুলে চোখে" অর্দ্ধ সচেতন—অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় বিরাজ কচ্ছেন! প্রসাদভোজীদেরও সবার হাতে অর্দ্ধ বা সিকিমাত্রায় পূর্ণ মদের গেলাস! হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, রকমারি কথাবার্ত্তায় সবাই মস্‌গুল্! আমরা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই—একজন মোসায়েব আমাদের কাণে কাণে বলে গেল—"একে একে কর্ত্তার কাছে জোরহস্তে খারা হও যাইয়া!"

প্রথমে শ্রীরামচন্দ্র হাজির হলেন।

কর্ত্তা। "এ হালা কেডা?"

শ্রীরামচন্দ্র। "আজ্ঞে—আমি রাম সেজেছিলুম!"

কর্ত্তা। "তুমি হালা শ্রীরামচোন্দ্র? প্রণাম! অহ! মা জানকীর লাগে বোরই দুঃখ্‌টা পাইছ! দাও হে—খাজাঞ্চি—হালারে পচিশ টাহা—"

কম্পিত বক্ষে আমি কর্ত্তার সাম্‌নে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলুম!

"তুমি হালা কেডা?"

"হালা—সম্ভাষণে" আমি তো নীরব!

"আরে—এ হালা কি বোবা নাহি? কওনা হালা—তুমি খারা হইছ কেডা?

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি লক্ষ্মণ!"

"তাই কও—তুমি হালা রামচোন্দ্রের কনিষ্ঠ—লক্ষণ ঠাউর! প্রণাম! হঃ—তুমি হালা খুব ভ্রাতৃবক্তি দেখাইছ! অহ হ! তুমি হালা ভাইযের সাথে না রইলে,—শ্রীরামচোন্দর গলায় দরি লাগায়ে পরাণ দিবার লাগ্‌তোন্! কি কও হে আরে হালারা—কথাডাই কও!"

ফেরুপালের ন্যায় মোসায়েবদল চীৎকার করে সায় দিল "এজ্ঞে—ঠিক কইলেন কোর্ত্তা! এমন সোণার বাই—কোন হালা কহনো পায় নাই! সাইক্ষ্যাৎ দেবতা!"

"দাও হালার বাইয়েরে তিরিশ টাহা পুরস্কার! বরই খোস্ কচ্ছে' হালা!"

যাহোক্—"হালা"—শুনে ত্রিশ টাকা তো লভ্য হ'ল! মরুক গে—! পেটে খেলে পিটে সয়।

ক্রমে "সীতাঠাকুরাণী,"—"হনুমান," প্রভৃতি একে একে কর্ত্তার সাম্‌নে হাজির হ'ল! প্রত্যেককে ২৫৲, ৩০৲, ৪০৲, ৫০৲টাকা করে—কর্ত্তার মদের খেয়ালে যাকে যেমন চক্ষে দেখ্‌লেন,—সেই রকম দিলেন! "হনুমানচন্দ্র"—আসরে মস্ত ল্যাজ্ নিয়ে "হুপ্ হুপ্" শব্দে কলা খাওয়ার দরুণ সকলের চেয়ে বেশী পেয়েছিল—৫০৲পঞ্চাশ

টাকা! কর্ত্তা হুকুম কল্লেন—"আর একবার তুমি হালা মুখব আইটে হনুমান সাজে ঐ প্রকার কদলী খাইয়ে এহানে লাফাইয়া দেহাও,—তোমারে আর পচিশ টাহা দিব অ্যানে!" হনুমান তাড়াতাড়ী আবার একবার স্বরূপ প্রকাশ ক'র্ত্তে বেশ-কারের কাছে ছুট্‌লেন! বড় আশায় এইবার স্বয়ং অধিকারী মহীন্‌ পোদ্দারমশাই কর্ত্তার সামনে মস্ত নমস্কার ঠুকে হাসিমুখে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন! কর্ত্তার অবস্থা তখন আরও সঙ্গীণ,—সমগ্র মোসায়েবদেরও তদ্রূপ! ধীরে ধীরে অধিকারীর দিকে চোখ্‌ তুলে বল্লেন—"লও—এ হালা জাম্বুবান আইছে—দেহ! দেহাও হালার পুত,—অগ্রে লাঙ্গুল দেহাও—তবে তোমার মুখদর্শন করমু!"

"আজ্ঞে—আমি জাম্বুবান নই! আমি রাবণ!"

মোসায়েবগণ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"আরে আরে হালা রাবনডা আস্‌ছে? দেহেন কোর্ত্তা দেহেন—এই হালা রাবনডা আইছে—"

কর্ত্তা। "হঃ—তুমি হালা রাবণ? লোঙ্কাপতি দশানন?"

অধিকারী। "আজ্ঞে—"

কর্ত্তা। "তুমি হালা মা জান্‌কিরে হোরণ করছ?"

অধি। "আজ্ঞে—"

কর্ত্তা। (সরোদনে) "হালা অকারণে মা জান্‌কিরে আমার এত ক্যালেশ দিছ? হালার পুত হালা—পাজি—নোচ্ছার বেকুব—রাইক্স—হোরখাদক—গর্ব্বস্রাব—"

ভয়ে অধিকারীর মুখখানি আম্‌সি হয়ে গেল!

ক। ঘরের মধ্যে ওব্‌লারে একা পাইয়ে—হালা চুলের মুটী ধরছ,—হিচাড়ে হিচাড়ে লোঙ্কায় আন্‌ছ, চেরির দল লেলায়ে দিয়ে মা জানোকীরে বেত লাগাইছ শোপাসপ্‌? ওরে—কেডা আছিস্‌! লাগাও হালা রাবণেরে বিশ জুতো—" যেমন মুখের কথা খসানো—অমনি মোসায়েব দল যে যেখানে ছিল—হতভাগ্য রাবণকে পটাপট্‌—পটাপট্‌ জুতো লাগাতে সুরু কল্লে! দৌড়—দৌড়—অধিকারী চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে দৌড়! আমি তাঁর দুর্গতি দেখে মোসায়েবদের থামাতে গিয়ে—বিশ ঘা জুতো আমার মুখে, বুকে, পিঠে উপ্‌রি লাভ হ'ল!

নাটমন্দিরের বাসায় গিয়ে অধিকারী পোদ্দার-পুত্র একটা ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় খিল দিল! দলশুদ্ধ ভয়ে ফাঁকা রাস্তায় ছুটে পালাল!

কে কা'কে থামায়? কর্ত্তার হুকুম—"রাবণ বধ" কর্ত্তেই হবে! বাধা দেয় কেডা?

পরদিন মানে মানে দল সেস্থান ত্যাগ করে চলে এল!

আর অধিকারী? যাত্রার দলের বিদায়কালে স্বয়ং কর্ত্তা মশাই ঠাকুর বাড়ীতে সহজ অবস্থায় ঠাকুর প্রণাম কর্ত্তে এসে,—অধিকারীর হাতে এক তাড়া পাঁচশো টাকার নোট্‌ দিয়ে—পিঠ্‌ চাপ্‌ড়ে বল্লে,—"এটা হালা—রাবণ রাজার পান খাইবার বাবদ!"

অধিকারী মশাই—এক গাল হাসি হেসে—টাকার তোড়াটা হাতে নিয়ে লম্বা নমস্কার ঠুকে জোড়হাতে বল্লেন—"কর্ত্তামশাই! আপনার জুতো মারাটাই আমার অভিনয়-সাফল্যের যথেষ্ট পুরস্কার! তুচ্ছ টাকা—তার কাছে কিছুই নয়!" বলিয়া নোটের তাড়াটা ভেতরের হাতকাটা ছোট জামার পকেটে ঠেসে রেখে—ওপোরের ছিটের সেই মামুলি কোটটার বোতাম আঁট্‌তে লাগ্‌লেন!

"আগামী বৎসর,—ফের আইও হালার পুত্‌—পয়জার লাগাইয়া খুসী করমু!"

সমালোচনা-সোপান।

[৺ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমালোচনার সাধারণ লক্ষণ।

[সমালোচনা কাহাকে বলে ;--চিন্তা-শক্তি ও জ্ঞান ;—সমালোচনা হইতে জ্ঞান উদ্ভূত ;—বস্তু ও অবস্তু ;---পাদার্থ ও তাহার স্বরূপ।

সাদৃশ্য, পার্থক্য ও সম্বন্ধ ;—তুলনায় জ্ঞানোদয় ;—উদাহরণ চতুষ্টয় ;—বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও দার্শনিক,--তাহাদের বিশ্লেষণ ; সাদৃশ্য, পার্থক্য ও সম্বন্ধ,--তিনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ;—বৈজ্ঞানিক-শ্রেণী-নির্ব্বাচন,— বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ,—কিরূপে তাহা করিতে হয় ;—সার-সংগ্রহ,—সম্বন্ধপরম্পরা ;—জ্ঞানের কার্য্য-কারণ-সংজ্ঞা নির্ণয়, জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? সমালোচনাই জ্ঞানোদয়ের অবলম্বন ও উপায়।]

কোন দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার সমালোচনা করার প্রয়োজন। সভ্যজগতে দ্রব্যমাত্রেরই যথাসম্ভব স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি তাহার জ্ঞানমাত্রের মৌলিক কারণ। সমালোচনা চিন্তা-শক্তি-পরিচালনার নামান্তরমাত্র। জ্ঞান-মাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতই নিহিত। সমালোচনা-রূপ সোপানদ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান-রূপ উচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সমালোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। *

বস্তু হইতে অবস্তুর বা অবস্তু হইতে বস্তুর জ্ঞান জন্মে। বস্তু কি জানিতে হইলে, অবস্তু কি—ইহা জানাও একরূপ অপরিহার্য্য অর্থাৎ উভয়ের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ কি—ইহা স্থির করা প্রয়োজন। এই স্বরূপ ও সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ-প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ সমালোচনা বলি। সমালোচনা-প্রক্রিয়া প্রধানতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয় ও তাহার মৌলিক প্রকৃতি কি, প্রথমতঃ তাহাই আলোচনা করিব।

পদার্থতত্ত্ববিৎ স্থির করিলেন যে, পদার্থ (matter) * আর কিছুই নয়,—কতকগুলি স্বরূপ বা ধর্ম্মের (properties) সমবায়মাত্র। এই স্বরূপ বা ধর্ম্ম দ্বিবিধ ;—স্থির ও অস্থির। স্থিরধর্ম্ম,—যথা,—ভার, বিস্তার, স্থান-রোধকত্ব, বিভাজ্যতা, স্থিতিস্থাপকত্ব, ইত্যাদি। অস্থিরধর্ম্ম,—যথা ; আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারণীয়তা, ঘনতা, তারল্য, শীতলতা, উষ্ণতা কাঠিন্য, কোমলতা, ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের এই সকল স্বরূপ বা ধর্ম্ম মূলতঃ কিরূপে স্থিরীকৃত হইল? ভারত্ব বা স্থান-রোধকত্ব, বিভাজ্যতা বা স্থিতিস্থাপকত্ব, তরলতা বা কাঠিন্য,—এবম্বিধ এক একটী স্বরূপের অস্তিত্ব আছে,—বৈজ্ঞানিক কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন? উত্তর,—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু এই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রকরণ কিরূপ? সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে, অনুভূত হইবে যে, কোন একটী স্বরূপের ভাবের উপলব্ধি বা নির্ণয় করার পূর্ব্বে বা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিপরীত ভাবের কল্পনা করা অপরিহার্য্য। ভারত্ব কি জানিতে হইলে, যুগপৎ ভার-শূন্যত্বের কল্পনা করিয়া, উভয়ের পার্থক্য-অনুভব করি ; নতুবা ভারত্বের ভাব কিরূপে বুঝিব? কোমলতার সহিত কঠিনতার বা কঠিনতার সহিত কোমলতার পার্থক্যানুভূতিই কোমলতা বা কঠিনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম ও স্থির করিবার একমাত্র উপায়। এইরূপে পদার্থের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিরূপণ করিতে, তদ্বিপরীত স্বরূপের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, সম্বন্ধ স্থির করার প্রয়োজন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপ-নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রক্রিয়ার আরম্ভ ; অথবা স্বরূপ-নিরূপণ

---

* "প্রত্যক্ষ" ও "অনুমিত" প্রভৃতি যে 'প্রমাণ' লকই হউক, জ্ঞান-মাত্রেরই মূলে, মুখ্য বা গৌণ-কল্পে, সমালোচনা অবস্থিত ; জ্যামিতির "স্বতঃসিদ্ধ" ও "স্বীকার্য্য" গুলিও, মূলতঃ সমালোচনা সমালোচনায় সিদ্ধ হয় নাই।

(*) বলা বাহুল্য যে, এস্থলে পদার্থের সাধারণ ও স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পদার্থের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ঘটিত 'ন্যায় দর্শনের' তর্কে প্রবৃত্ত হই নাই।

ও সম্বন্ধ-নির্ণয় উভয়ই পরস্পরের অনুগামী। একটীর সহিত অপরটী স্বভাবতই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা বিমিশ্র প্রক্রিয়াই মূলতঃ সমালোচনা। কথাটা পরিষ্কৃতরূপে বলা হইল না; এস্থলে গুটিকতক উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

১। বৈজ্ঞানিক গতির লক্ষণ স্থির করিতেছেন;—"এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার নাম গতি (motion)। মনে কর, আমি যেন কোন গৃহে বসিয়া আছি, তখন তোমরা আমাকে স্থির বা গতি-বিহীন বলিতে পার; কিন্তু তাহার পর যখন আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার ক্রিয়ার নাম গতি। আর এক স্থানে স্থির হইয়া থাকার নাম স্থিতি। এই গতি ও স্থিতি নিরপেক্ষা ও সাপেক্ষা বা প্রত্যক্ষা উভয়ই হইতে পারে। গতি বা স্থিতি নিরপেক্ষা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সচরাচর সাপেক্ষা গতি বা সাপেক্ষা স্থিতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; সেই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষাও বলে। যখন কোন একটী বস্তু চলিতেছে, আর একটী স্থির রহিয়াছে, তখন তুলনায় বলি—এ চল, ও স্থির; সুতরাং একের গতি ও অপরের স্থিতি পরস্পরের সাপেক্ষ।"*

২। পরন্তু সাহিত্য-সমালোচক গীতি-কাব্যের স্বরূপ-ব্যাখ্যা করিতেছেন;—"যখন হৃদয় কোন একটা বিশিষ্টভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি শোক কি ভয় কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটকের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতি-কাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ-হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশিষ্ট গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় ভাবই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতি-কাব্যে এই একটী প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। * * * * সত্য বটে যে, গীতি-কাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অবক্তব্য তাহাতে গীতিকাব্যের অধিকার।"*

৩। পক্ষান্তরে রাজনীতিবেত্তা উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর লক্ষণ-স্থিরীকরণপ্রসঙ্গে 'উন্নতি কি' বুঝাইতেছেন;—"স্থায়িত্ব ও তদ্ভিন্ন আরও কিছু উন্নতির অন্তর্ভূত। * * * * কোন বিষয়ের উন্নতির সহিত তদ্বিষয়ের স্থায়িত্ব স্বভাবতঃ সংশ্লিষ্ট। কোন বিষয় বিশেষের উন্নতির জন্য স্থায়িত্ব ধ্বংসীকৃত হইলে, তৎসহিত অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিরও ধ্বংস সংসাধিত হয়। এই ধ্বংসজনিত ক্ষতির তুলনায় প্রাগুক্ত উন্নতি যদি মূল্যহীন হয়, তাহা হইলে, এরূপ বুঝিতে হইবে, যে, কেবলমাত্র স্থায়িত্ব উপেক্ষিত হয় নাই; তাহার সঙ্গে সাধারণতঃ উন্নতিসম্বন্ধেও ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। * * * *

অপিচ শৃঙ্খলা উন্নতির অন্তর্গত। উন্নতি শৃঙ্খলার অন্তর্গত নহে। শৃঙ্খলা (order) যাহা অতি-অল্প-পরিমাণে সম্পাদন করে, উন্নতির দ্বারা তাহা অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হয়। * * * উন্নতিসাধনার্থে শৃঙ্খলা অন্যতম উপায়-মাত্র; কেননা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধি করিতে হইলে, যে পরিমাণে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমান আছে, তাহার রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব শৃঙ্খলা উন্নতির উপায়মাত্র। উন্নতির অনুরূপ উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। †

৪। অতঃপর দার্শনিক তুলনাদ্বারা দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

"দর্শন বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে এবং বিজ্ঞানও দর্শনের শাখা নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাহারা স্বতন্ত্র। নীতিবিজ্ঞান মনুষ্যের নৈতিক বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগত ভাব সমূহের 'দৈর্ঘ্য প্রস্থের' পরিমাণ করে;

* পদার্থ-বিজ্ঞান। প্রথম ভাগ। শ্রীকানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রণীত। ১৮৭৮। এই উদ্ধৃত অংশে ভাষার সামান্য শিথিলতা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

* বিবিধ সমালোচনা। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৭৬।

† Considerations on Representative Government, by J. S. mill.

কিন্তু নীতি-দর্শন উক্ত ভাবনিচয়ের উচ্চতম ও গভীরতম স্থল-নিহিত আভ্যন্তরিক সত্বার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত। প্রকৃতিগত ভাব পরম্পরায় একত্রীভূত অস্তিত্ব এবং পারস্পরিক আবির্ভাব এবং এতদুভয় হইতে যে সকল সাধারণ নিয়ম নিষ্কাশিত হয়, তাহারই আলোচনা করায়, বিজ্ঞানের অধিকার। বিজ্ঞান ভাবপরম্পরার সংযোজন-শৃঙ্খল ও তাহাদিগের অন্তস্তল-নিহিত সার সত্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু দর্শন এতদুভয়েরই অনুসরণদ্বারা সমগ্র নৈতিক প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান এরূপ চেষ্টাকে বৃথা ও নিষ্ফল বলা সত্ত্বেও দর্শন উহা হইতে বিরত হয় না।" *

আমরা উপরে চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা যথাক্রমে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমতঃ স্থিতির সহিত গতির তুলনা দ্বারা গতির সাধারণ লক্ষণ ও ধর্ম্ম বুঝাইলাম। স্থিতির 'স্থিতিত্ব' হেতুই গতির 'গতিত্ব'; অতএব গতি কি বুঝিতে হইলে, স্থিতির প্রকৃতির অনুধাবনও আবশ্যক; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করা অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয় সমালোচনা গীতি-কাব্যের। সমালোচক গীতি-কাব্য কি স্থির করিতে, নাটক ও মহাকাব্যের আংশিক স্বরূপনির্ণয় করিলেন। যে হেতু নাটক ও মহাকাব্য কি পদার্থ, ইহা কিয়ৎপরিমাণে না বুঝিলে, গীতি কাব্যের প্রকৃতি কি, উৎকৃষ্টরূপে অনুভূত হয় না। গীতি-কাব্য, মহাকাব্য ও নাটক তিনই কাব্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনেরই পারস্পরিক অতি ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে; অতএব একটীর লক্ষণ নিরূপণার্থে অবশিষ্ট দুইটীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি উদ্ঘাটন করা আবশ্যক।

তৃতীয় উদাহরণ;—উন্নতি কাহাকে বলে? শুভ বা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্নতি ও তাহা হইতে বিচ্যুতির নাম অবনতি। উন্নতি সাধনার্থে অবনতি-নিবারণ করা প্রথমেই আবশ্যক। অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যদ্দ্বারা পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ বিদূরিত হয়, এমন বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত-প্রস্তাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অগ্রসরণই উন্নতি, পশ্চাৎপতনই অবনতি। অতএব অবনতির কারণ বিদ্যমানে উন্নতি অসম্ভব। অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অবনতির কারণ, সুতরাং উন্নতির অন্তরায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা ভিন্ন অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা (তাহার অর্থ অবনতি) নিবারিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং উন্নতির সহিত স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বর্ত্তমান। অতএব উন্নতি কি ব্যাখ্যা করিতে, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহা আলোচিত হইয়াছে।

পরন্তু, চতুর্থ বা শেষোক্ত উদাহরণটীতে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের তুলনা। উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও পার্থক্যের নির্ণয়। এ উদাহরণটী পূর্ব্বোক্ত উদাহরণত্রয়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ; কেবল এইমাত্র বিভিন্নতা যে, ইহাতে সম্বন্ধনিরূপণার্থ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বরূপনির্ণয় ও সম্বন্ধ নিরূপণের প্রক্রিয়া পরস্পর সম্বন্ধ—একটী অপরটীর অনুগামী অথবা একের সম্পাদনার্থে অপরের সাহায্য প্রয়োজন। উপরোক্ত প্রথম তিনটী উদাহরণে স্বরূপ নির্ণয়ার্থে সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে; আর চতুর্থ উদাহরণে সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ উদ্দেশে স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় দিকেই প্রক্রিয়া প্রায় একই প্রকার। স্বরূপ নির্ণয়ার্থে যেমন সম্বন্ধের আলোচনা করার প্রয়োজন, সম্বন্ধনির্ণয় হেতু তেমনি স্বরূপের তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যক। স্বভাবতই একটীকর্ত্তৃক অপরটী আকৃষ্ট হয়।

পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগের ও জাতিনির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি। অপিচ পার্থক্য ও সাদৃশ্যানুভূতি হইতেই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। অতএব পদার্থগত অন্যান্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

পার্থক্য।—সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে অর্থাৎ যতপ্রকার দ্রব্য এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞানাধীনে আসিয়াছে,

---

* Ethical Philosophy Evolution; by Proffessor W Knight (The nineteeth-century No. 19 September 1878).

তাহাদিগের সকলেরই এক একটী স্বতন্ত্র নাম আছে। দ্রব্যমাত্রই এক একটী স্বতন্ত্রনামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? কারণ তাহাদিগের পার্থক্য বা বিভিন্নতা। আলোক ও অন্ধকার বিভিন্ন পদার্থ, এই কারণেই এতদুভয়ের স্বতন্ত্র নাম, আলোককে আলোক বলা যায়, কারণ উহা অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। যদি আলোক ও অন্ধকার একই পদার্থ হইত, উহাদিগকে স্বতন্ত্র নাম দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হইত না। আলোক অন্ধকার হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই অবশ্য, আলোকের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব। রাম শ্যাম হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই শ্যামের ন্যায় রামেরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইটী স্বতন্ত্র নাম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, পার্থক্য বা বিভিন্নতাদ্বারাই পদার্থমাত্রের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হয়।

অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রবল; আবার অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের বিভিন্নতা অতি-অল্প ও ক্ষীণ। অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, বস্তুমাত্রেরই পারস্পরিক বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী; নতুবা তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব।

দ্রব্যমাত্রের পারস্পরিক বিভিন্নতার আধিক্য ও অল্পতানুসারে তাহাদিগকে তুলনা করণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণের তারতম্য হয়। স্থূলদৃষ্টিতে সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগুলির বাহ্যতঃ যে বিভিন্নতা, তাহা উপলব্ধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পায়াস সাধ্য; কিন্তু নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক পার্থক্যানুভব করিতে হইলে, কিঞ্চিদধিক পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তি পরিচালন করা আবশ্যক। একটী হস্তীর সহিত একটী পিপীলিকার সাধারণতঃ যে যে অংশে বিভিন্নতা, তাহা নির্ণয় করা যেরূপ সহজ, দুইটী পিপীলিকার আকৃতিগত পারস্পরিত পার্থক্য স্থির করা অবশ্য তাদৃশ সহজ নহে। তিক্তে মধুরে যে আস্বাদ গত পার্থক্য, তাহা অতি-অল্প আয়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুইটী মধুরের কোনটী কতটুকু মধুর, ইহা প্রভেদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে পার্থক্যের অল্পতা, সেই সকল স্থলে উক্ত পার্থক্য-নিরূপণ করিতে, পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা ও চিন্তাশক্তির নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

একটু সূক্ষ্মরূপে তুলনা কর, দেখিবে, উভয়ের আকার, বর্ণ ও সৌরভগত একতাধিক্য সত্ত্বেও, গোলাপ দুইটীর মধ্যে কোন না কোন অংশে কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা আছে। সম্মুখে ঐ স্ফাটিকাধার ভেদ করিয়া, বর্ত্তিকালোক সমগ্র গৃহে প্রতিফলিত হইয়াছে। আলোকটী সম্যক্ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্। কিন্তু গৃহমধ্যে যদি একটী বাষ্পীয়ালোক আনিত হয়, বর্ত্তিকালোকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির হ্রাস হইবে; তাহাকে আর আলোকের পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পক্ষান্তরে বাষ্পীয়ালোকের সন্নিকটে একটী তাড়িতালোক সংস্থাপিত হউক, বর্ত্তিকালোকের ন্যায় বাষ্পীয়ালোকও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং তাড়িতালোকের ঔজ্জ্বল্যই তখন প্রবল ও পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এক্ষণে বর্ত্তিকালোক, বাষ্পীয়ালোক ও তাড়িতালোক এই তিনের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভিন্নতা, তাহা তাহাদিগের একত্রে সমাবেশদ্বারাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি। প্রত্যুত আলোকত্রয়ের একত্র সংস্থাপন কখন প্রত্যক্ষ না করিলে, তাহাদিগের পারস্পরিক বিভিন্নতার কদাচিৎ বিশদরূপে অনুভব করিতে পারিতাম।

শকুন্তলা ও সাবিত্রী দুইটী স্বতন্ত্র চিত্র। চিত্রদ্বয়ের সমাবেশ দ্বারা উভয়ের সৌন্দর্য্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। শকুন্তলা ও সাবিত্রী উভয়ই প্রণয়ের জীবন্ত প্রতিকৃতি;—পবিত্রতা ও কমনীয়তার অনন্ত আবাসস্থল; উভয়ই আত্মোৎসর্গের এবং পতি-প্রাণতার কবিতাময়ী প্রতিমা;—কবি-কল্পনা-প্রসূত মনোমোহিনী সৃষ্টি। শকুন্তলা সুন্দরী, সাবিত্রীও সুন্দরী, শকুন্তলার পার্শ্বে সাবিত্রী দাঁড়াইলেন। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্য মিলিল।

তাড়িতালোকের মিলনে বাষ্পীয় ও বর্ত্তিকালোক যেরূপ ক্ষীণপ্রভ হয়, এ স্থলের মিলন সেরূপ নহে। সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য দ্বারা যেমন শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না, শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে তেমনি সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে; অথচ উভয়েরই সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে;

পার্থক্য আছে বলিয়াই, উভয় চরিত্রের সমাবেশ অধিকতর সুন্দর। আর সেই পার্থক্য নিরূপণ করিবার জন্যই, উভয়ের সমাবেশ ও সমালোচনা আবশ্যক।

সাদৃশ্য। একটী বস্তুর সহিত অপর একটী বস্তুর পার্থক্যানুভূতিই তত্তৎবস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রারম্ভ। পক্ষান্তরে, বস্তুসমূহের পার্থক্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামের ব্যক্তিত্ব শ্যামের ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ হওয়া সত্বেও রাম ও শ্যাম অনেক অংশে সদৃশ। কেননা উভয়ই মনুষ্য ; উভয়েরই চক্ষু-কর্ণাদি সমান ইন্দ্রিয় আছে ; উভয়েই চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট ; ইত্যাদি।

একটী বৃক্ষ অপর একটী বৃক্ষের সদৃশ।

এক দিন অপর এক দিনের তুল্য।

দুর্গেশনন্দিনী ও "আইভ্যানহো" সমশ্রেণীর কাব্য।

উপরে যে কয়েকটী পদার্থের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের সাদৃশ্য অবশ্য পার্থক্যের সহিত বিজড়িত ; যেহেতু পার্থক্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র বস্তুত্ব অসম্ভব।

রামের সহিত শ্যামের অনেক অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক অংশে পার্থক্য আছে।

একটী বৃক্ষ অপর একটীর অনুরূপ হইলেও প্রথমটী হয়ত অধিক পল্লবপত্রবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়টী অধিক ফলপুষ্পযুক্ত। আজ ও কাল দুই দিনই একরূপ ; কিন্তু অদ্যকার উত্তাপ কল্যকার অপেক্ষা অধিক ; তদ্ভিন্ন আরও গুরুতর বিভিন্নতা আছে।

"দুর্গেশনন্দিনী ও আইভ্যানহো" সমশ্রেণীর গ্রন্থ হইলেও ভাষা, ভাবও কাব্যোল্লিখিত চরিত্রে বহুবিধ প্রার্থক্য আছে।

পরন্তু, কোন কোন দ্রব্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে ; কেবল অবস্থিতির স্থানভেদে তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ও বাম হস্ত, উভয়ই সম্পূর্ণ অনুরূপ ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত, এজন্য একখানি দক্ষিণ হস্ত ও অপরখানি বামহস্ত।

এইরূপে কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য অধিক ও পার্থক্য অল্প এবং কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ পার্থক্যের আধিক্য ও সাদৃশ্যের অল্পতা লক্ষিত হয়।

দুইটী বালকের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের আধিক্য, কিন্তু একটী বালকে ও একটী বৃদ্ধে পার্থক্যই অধিক ; পক্ষান্তরে একটী মনুষ্যে ও একটী পশুতে যে পার্থক্য, তাহা আরও অধিক। কিন্তু ইহারা সকলেই জীবন সম্পন্ন অর্থাৎ জীবনীশক্তি ইহাদিগেব মধ্যে সাধারণ ; সুতরাং সেই অংশে ইহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। মূলে একতা আছে।

একই ভাষায় লিখিত দুইখানি সমশ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থ মধ্যে কোন কোন বিষয়ে যেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, সেইই ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিত উহাদিগের (কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ের) সেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না ; প্রত্যুত বিলক্ষণ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। পরন্তু অপর ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান বা কাব্যের সহিত যখন ঐ একই ভাষায় লিখিত তিন গ্রন্থের কাহারও তুলনা করি, তখন পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণ অধিকতর হয়। কিন্তু গ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও সেগুলি সকলই মনুষ্যের চিন্তাশক্তিপ্রসূত ও মনুষ্য-ভাষায় লিখিত। অপিচ উহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তস্ফূর্তি সাধন করা। একারণ সাধারণতঃ উহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। সে সম্বন্ধে মূলতঃ উহারা সকলই এক।

এইরূপে দেখা যায় যে, একতার মধ্যে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একতা প্রকৃতির সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। একতা হইতে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতা হইতে একতা, সমালোচনার দুইটী ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীদ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই দুই প্রণালীর একটীকে বিশ্লেষণ (Analysis) ও অপরটীকে সংশ্লেষণ (Synthesis) বলা হয়। ক্রমশঃ এই প্রণালী-দ্বয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

আপাততঃ পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমরা 'মোটের উপর' যে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিয়াছি, এস্থলে তাহার সার-সংগ্রহ করা আবশ্যক।

(১) পার্থক্য-হেতুই ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা বস্তুত্ব এবং এই পার্থক্যানুভূতিই মনুষ্যজ্ঞানের প্রারম্ভ। (২) পদার্থমাত্রের পারস্পরিক পার্থক্যের ন্যায় পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। (৩) পার্থক্য ও সাদৃশ্যের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বা ন্যূনাধিক্যানুসারে তাহার নিরূপণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণ ও সমালোচনের তারতম্য হয়। (৪) তুলনীয় দ্রব্য সকলের সমাবেশ ও সংস্থিতির নৈকট্য তুলনার সবিশেষ উপযোগী। পার্থক্য ও সাদৃশ্য হেতু বিভিন্নতার মধ্যে একতা ও একতার মধ্যে বিভিন্নতা।

---

* এই রচনার প্রথমাংশ একটু ১৩২৩ সালের 'সাহিত্য' পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বাবু এই রচনা যতটা লিখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা তাহার সবটুকুই তাঁহার পুত্রদের নিকট হইতে পাইয়াছি। 'শিশিরে' ধারাবাহিক রূপে তাহা প্রকাশিত হইবে।— শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৩৪)

কালের কত পরিবর্ত্তন ! আজ যে আছে, কাল সে নাও থাকিতে পারে। এখন যাহার হৃদয় হাস্যকৌমুদী রাশিতে পরিপূর্ণ, মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরে অমানিশার ঘনঘটা। মানবের ভাগ্যসূত্রের সহিত প্রকৃতির কত না যোগ, এই নিদাঘের তপ্ত বায়ু, রৌদ্র তাপিতা বসুন্ধরা, তাহার পরই বরষার স্নিগ্ধ বরিষণ ! সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, পর পর আসিতেছে ; যাইতেছে। কিন্তু যে চলিয়া যায়, সে আর আসিতে পারে না। সুখ, দুঃখ, হাসি, অশ্রু বহুবার যাইয়া—বহুবার আসে। অনন্ত-কালপ্রবাহে যে মানব-জীবনটি ডুবিয়া যায়, তাহার উত্থান পতন নাই। সে যাইবে বলিয়াই যায়, আসিবে বলিয়া যায় না।

নীহার চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য জগতের কিছুই বন্ধ হয় নাই। সেই আহার, সেই বিহার, সেই নিদ্রা, সেই বিশ্রাম। যাহার ক্ষণিক বিচ্ছেদ কল্পনা কত কষ্টকর, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার চির বিচ্ছেদেও সহজ জীবন-যাত্রার পথে কোথায়ও বাধে না। সময়ে সবই সহিয়া যায়, বিস্মৃতির অন্তরালে স্মৃতি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়।

মা'য়ের কথা বলিয়া নীলু দুই দিন কাঁদিয়াছিল, খুঁজিয়াছিল। ব্যস, এই পর্য্যন্ত ! একমাস যাইতে না যাইতেই নীলুর অপরিস্ফুট মনোকোরক হইতে মা'র স্নেহের, মা'র মমতার স্মৃতি বিলীন হইয়াছে। এখন সে আমারি নীলু, আমি তাহার মা। মাতৃত্বের গরিমায় আজ আমার হৃদয়-নদী উচ্ছলিত তরঙ্গিত। আমার তৃষিত অন্তঃকরণ যখন উন্মুখ হইয়া, নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয় ও নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে ধাবিত হইতেছিল—সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভগবান নীলুকে আনিয়া দিলেন। কিন্তু এমন ভাবে আমাকে দান করিবার তাঁহার যে কি প্রয়োজন ছিল—তাহা আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নীলুর 'মা' ডাকে সাড়া দিতে গিয়া আজও আমি নিজেকে সম্বরণ করিতে পারি না। আমার মথিত হৃদয় হইতে উত্থিত হয়—মঙ্গলময়, এ তোমার কোন মঙ্গল বিধান ? শূন্যর বুক পূর্ণ করিতে এ তোমার কি নিষ্ঠুর খেলা ! এ খেলা খেলিবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল ? আমার জীবনের সহিত এ খেলা যোগ না করিলে কি চলিত না ? নীহারকে রাখিয়া আমাকে লইলে না কেন ? আমার অভাবে—সংসারের কোন ক্ষতি হইত না। কেহ মাতৃহীন হইয়া, পরাশ্রয়ে পরের স্নেহের ভিখারী হইত না ; তবু তুমি তাহাকেই লইলে ? যদি লইলে—তাহার ভার বহন করিতে আমাকে শক্তি দাও। ঝটিকা-বিচ্ছিন্ন যে কমল কলিটি বৃন্তচ্যুত করিয়া আমার ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়াছ আমি যেন তাহাকে ভালবাসা দিয়া প্রস্ফুটিত করিতে পারি।

নীলুকে কোলে লইয়া এলো মেলো কত কথাই ভাবিতে-ছিলাম, স্বামী আসিয়া বলিলেন "উপেন বাবু এসেছেন ; নীলুকে দাও।"

নীহারের মৃত্যুর পর এই প্রথম উপেন বাবুর আমাদের গৃহে আগমন। আমার স্বামী অগ্রজের সম্মান দিয়া শ্রদ্ধা দিয়া তাঁহাকে আমাদের নিকটে আনিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি দুই দিন যাইয়া তাঁহাকে আমাদের গৃহে সাদর আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের আদর আগ্রহ বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া—পত্নীর শেষ চিহ্ন বিজড়িত, লোক কোলাহল বর্জ্জিত সেই নিভৃত গৃহেই পড়িয়া ছিলেন। আজ সহসা তাঁহার আগমনে আমি ভীত হইলাম। নীলুর পিতা নীলুকে দেখিতে আসিয়াছেন,

নীলুকে ডাকিতেছেন, ইহার মধ্যে আশঙ্কার কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু আমার উদ্বেলিত হৃদয়ে উৎকণ্ঠার অন্ত রহিল না। আমি নীলুকে নিবিড় করিয়া বুকে চাপিয়া, কাঁপা গলায় কহিলাম "নীলুর বাবা নীলুকে চাচ্ছেন কেন? তিনি যদি নীলুকে আর আমাদের কাছে থাকৃতে না দেন?"

কথাটা বলিয়া আমার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। নিজের উচ্চারিত বাক্য নিজেরই কর্ণমূলে বারম্বার ধ্বনিতে লাগিল।

আমার আশঙ্কায় স্বামী সচকিত হইয়া বলিলেন "যাঁর ছেলে তিনি যদি নিয়ে যেতে চান তা হলে আমাদের বলবার কিছু নেই। যখন চাইবেন, তখুনি দিতে হবে। ওকে নিয়ে যাই, দেখি কি বলেন।"

স্বামী নীলুকে লইয়া গেলেন। নীলু কিন্তু পিতার প্রসারিত বাহুতে ধরা দিল না। তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহারই স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া রহিল। নীলু যে পিতাকে জানিত—এ তাহার সে পিতা নহে; নিষ্ঠুর রোগ উপেন বাবুর সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া, আপনার রাক্ষসী ক্ষুধার চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছিল। সে চোখ, মুখ, বর্ণ, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। নীলু পিতাকে চিনিল না।

স্বামী জোর করিয়া তাহার মুখ খানি তুলিয়া অভয় দিয়া বলিলেন "নীলু ভয় নেই, মুখ তোল কথা বল। তোমার বাবার কোলে যাও। লক্ষ্মী ছেলে এখন বাবার কোলে যাবে। আমি লক্ষ্মী ছেলেকে কত খেল্না দেব; রেল গাড়ী দেব; যাও বাবার কোলে যাও।"

"ধন আমার, মণি আমার, এস আমার কোলে এস" বলিয়া সাদরে সস্নেহে উপেনবাবু ছেলের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। নীলু প্রাণপণ বলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন জড়িতকণ্ঠে কহিল "ও বাবা নয়, ও ভয়। তুমি আমাল বাবা, তুমি আমাল মা'ল কাথে নিয়ে তল।"

তিনি লজ্জিত হইয়া মুখ অবনত করিলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল ও কর্ণমূল রাঙা হইয়া উঠিল। উপেনবাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নাসাপথ দিয়া একটা পঞ্জর-ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া গেল। চোখের কোনটা চক্ চক্ করিতে লাগিল। তিনি চেষ্টাকৃত হাসির দ্বারা শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানা ঈষৎ সরস করিয়া কহিলেন "আপনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন মণিবাবু? আপনার সঙ্কোচের কিছু নেই। আমি এতে দুঃখিত হই নি, ক্ষুব্ধ হয় নি। আমি মায়াজাল পাত্‌তে আসি নাই, ছিঁড়তেই এসেছি। ছেঁড়ার আগে একটিবার দেখতে এসেছিলাম—তা এ মন্দ হোল না; এই আমার বেশ। আমি নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে এখন থাকতে পারব; আর আমার ক্ষোভ নেই।" একটু খানি চুপ করিয়া আবার বলিলেন "আজ আমি চলে যাচ্ছি, হয় তো এ জীবনে আপনাদের সাথে আর দেখা হবে না। যাকে দেখতে এসেছিলাম—তার সম্বন্ধে নতুন করে বলবার আমার কিছুই নেই; যার বলা সেই তা বলে গেছে।"

স্বামী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোথায় যাবেন উপেনবাবু? কৈ আপনার যাবার কথা তো আমি শুনি নি! এখনো আপনার শরীর ভাল করে সারে নাই, এ অবস্থায় আপনার স্থানান্তরে যাওয়া কি উচিত হবে? নিতান্তই আপনার যদি এখানে থাকতে ইচ্ছা না হয়—তবে চলুন সবাই মিলে কল্‌কাতাতেই যাই। আপনার এমন শরীরে আমি আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না!"

"ছেড়ে আপনাকে দিতেই হ'বে মণিবাবু; না ছেড়ে দিলে আমি পাগল হয়ে যাব। আপনি বুঝি মনে করছেন—আমি মহা প্রেমিক, তার বিচ্ছেদ সইতে পারছি না। সেটা মনে করলে আপনার ভ্রম। আমি প্রেমিক নই, পাষণ্ড; রক্তে মাংসে গড়া পাষাণ। আমি যে কি পেয়েছিলাম, কি হারিয়েছি তা—আমার মত অভাগা ভিন্ন কেউ বুঝতে পারবে না। ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, সব আমি নিজের দোষে খুইয়ে, পথের কাঙাল হয়েছি। কাঙালকে ভগবান যে কত বড় রত্ন দিয়েছিলেন—রত্ন থাকতে এক দিনও তা আমার মনে হয় নি। কখনো বোধ হয় মনেও হোত না। কিন্তু সে যে তার নিষ্কল প্রাণটুকু বলি দিয়ে পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছে। নতুন পাওয়া প্রাণ সংসারের ধূলায় আর আমার মলিন করবার ইচ্ছা নাই। তাই আমি হরিদ্বারে যাওয়া মনস্থ করেছি। হরিদ্বারের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের মহাত্মারা এ পাপাত্মাকে যদি দশের কাজের একটু অধিকার দেন—

তা'হলে আমি একটা কাজ পেয়ে বেঁচে যাব। নইলে আমার বাঁচা নেই।"

"বাঁচা নেই কেন উপেনবাবু? এখন আপনার মন খারাপ বলে এই সব মনে হচ্ছে। মনের এভাব চিরকাল থাকবে না। আপনি যখন কিছুতেই আমাদের কাছে থাকবেন না তখন নীলুকে না হয়—আপনার কাছে নিয়ে যান। নীলু কাছে থাকলে আপনার এত ফাঁকা লাগবে না।"

"না, না নীলুকে আমি নিতে চাই না, নীলু আমার নয়, আপনাদের। জীবনে তার একটি সাধ পূর্ণ করি নি, একটি অনুরোধ রাখি নি, মরণে তার দানের অমর্য্যাদা করতে চাই না। নীলু আপনার ছেলে, বড় হলে ওকে আপনার ছেলে বলেই লোকের কাছে পরিচয় দেবেন। আমার নাম, আমার কীর্ত্তি কাহিনী ওকে জানতে দেবেন না।"

উপেনবাবু থামিয়া দূরের বনরাজির পানে চাহিয়া রহিলেন। এতক্ষণ জড়সড়ভাবে তাঁহার কোলে থাকিতে থাকিতে নীলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নীলুকে আমার কোলে দিয়া বলিলেন "উপেন বাবুর সব কথাই তো শুনলে? তিনি কিছুতেই থাকতে চাচ্ছেন না, তুমি একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে দেখ দেখিন, তোমার কথায় যদি ফল হয়!"

আমি নীলুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, উপেন বাবুর কাছে গিয়া দেখিলাম তখনো তাঁহার উদাস দৃষ্টি বাহিরে নিবদ্ধ। সেই রোগক্লিষ্ট মুখে চোখে অনুতপ্ত চিত্তের মহা বৈরাগ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি এতই চিন্তামগ্ন, এতই তন্ময়—প্রথমে আমার পদশব্দ শুনিতেই পাইলেন না। আমি চুড়ীর শব্দ করিতে তিনি চমকিয়া মুখ ফিরাইলেন।

আমি বলিলাম "আপনার সব কথা শুনলাম। এমন করে আপনাকে আমরা যেতে দিতে পারি নে। নীহার যাবার সময় নীলুকে যেমন আমাদের হাতে দিয়ে গিয়েছিল, তেমনি আপনাকেও দেখবার কথা বলেছিল। তার অনুরোধ পালন করবার অধিকার আপনাকে দিতেই হবে। আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব না। তার কথা মনে করে আপনাকে আমাদের কাছে থাকতে হবে। ভুললে চলবে না।"

"ভুলতে চাই না বলেই যেতে চাচ্ছি। আমি পশু, ভোগে, সুখে আমার পশু প্রবৃত্তি যদি আবার জেগে ওঠে, তার দেওয়া প্রাণকে আবার যদি আমি অবমাননা করি; তার চেয়ে—তারি স্মৃতি পূজো করে, তার প্রিয় কাজ করে, তার সাথে মিলিত হবার দিন গুলি সুগম করে আনাই যে আমার পক্ষে বেশী শান্তিদায়ক। আপনারা আর আমায় অনুরোধ করে অপরাধ বাড়াবেন না। আপনাদের দয়া, আপনাদের করুণা চিরদিনই আমার স্মরণ থাকবে। এ পবিত্র মুঙ্গের সতী স্থান, আমার চির নমস্য, চির আরাধনার। তবু এখানে থাকতে আমার সাহস হয় না; নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। তার কথা মনে করে আপনারা আমায় ক্ষমা করুন, মুক্তি দিন।" বলিতে বলিতে উপেন বাবুর চক্ষু পল্লব বহিয়া বেদনার পুত অশ্রুজল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সেই নৈরাশ্যপূর্ণ আক্ষেপ, উচ্ছ্বসিত অশ্রু—আমার স্মৃতির সাগর আলোড়িত করিল। হায়, ইহাই সে দেখিল না; তাহার বিরহে এত আকুলতা, হতাশা—সে জানিতে পারিল না। যাহার বিন্দু প্রেমের প্রত্যাশায় আনন্দে তাহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, এ প্রেমসাগরে অবগাহন করিবার তাহার সৌভাগ্য হইল না। আজ যদি সে আসিত, এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি আসিয়া দেখিয়া যাইত, তাহা হইলে স'বি বুঝি সার্থক হইত। ইহা দেখিয়া, ইহা শুনিয়া আমার চিত্ত দহন করিত না।

(ক্রমশঃ)

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধ কার্য্য।

বিপদ বার্ত্তাবহ সেই টেলিগ্রাম পাইবার পরদিনই প্রত্যুষের ষ্টীমারে শরৎকুমার ঢাকা রওনা হইল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ঈশানী ও শোকাকুলা ও প্রিয়তমা মাতাকে একাকিনী ও নিতান্ত সহায়হীনা রাখিয়া বিপদগ্রস্ত স্বামীর সহিত ঢাকায় যাইবার জন্ম বড় জেদ করিল ;— বুঝি স্বামীর বিপদের কথা শুনিয়া, গর্ভধারিণীর দুঃখের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল ; বুঝি, বালিকা স্বামীকে একলা ছাড়িয়া দিতে সাহস করে নাই ; বুঝি, সে মনে করিয়াছিল স্বামীর বিপদে, তাহার কাছে থাকিয়া তাহার সাহায্য করাই তাহার কর্ত্তব্য।

কিন্তু শরৎকুমার কি বুঝিয়া তাহাকে কোন ক্রমেই সঙ্গে লইয়া গেল না। কেবল, তাহার নামিত অখিল বাবুর দানপত্র, এবং তাহার মাতার অর্থ লইয়া, পত্নীকে একটি বিদায় চুম্বনের আস্বাদ প্রদান না করিয়াই নির্ম্মমের মত চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে শাশুড়ীর গচ্ছিত অর্থের কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া একটি ষ্টোভ, কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং এক বোতল সুরা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সেই অর্থের আরও কিছু ব্যয় করিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিল ; এবং প্রথম শ্রেণীর কক্ষের একমাত্র অধিকারী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ষ্টোভ জালিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে করিতে, খাইতে খাইতে, পান করিতে করিতে ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়াছিল।

কিন্তু চিরপরিচিত ঢাকাতে প্রবেশ করিয়াই সে একটা মহা পরিবর্ত্তন দেখিল। পূর্ব্বে সে উন্নত মস্তকে রাস্তায় বাহির হইলেই জন সাধারণ তাহাকে জমিদার পুত্র ও একজন মহামান্য ডেপুটীর বংশধর জানিয়া, সম্মানের সহিত অভিবাদন করিত ; কিন্তু এক্ষণে তাহারা তাহাকে দুই মাস মাত্র পরে দেখিয়া, সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিল ; সম্মান দূরে থাকুক, কেহ তাহাকে একটি কুশলবার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করিল না। সে আরও দেখিল, টেলিগ্রামে তাহার আগমন সংবাদ পাইয়াও তাহাকে ষ্টীমার ঘাট হইতে বাটী লইয়া যাইবার জন্ম বাটী হইতে মূল্যবান অশ্বযোজিত কোন গাড়ী আসে নাই। সামান্য দীন পথিকের ন্যায় তাহাকেও সেই অল্প পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া বাটী আসিতে হইল।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেই সদা উৎসবময় আনন্দ-নিকেতনে কোনও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিল না ; কর্ম্মানুরাগী ব্যস্ত ভৃত্যবর্গকে সে কোনও কাজে নিযুক্ত দেখিল না ; সেই কোলাহলময় পুরী যেন জনহীন কাননের ন্যায় নীরব হইয়া গিয়াছে ; পিতার বৈঠকখানা ঘরে শুভ্র জাজিম পাতা বিছানাটা যেন মূর্ত্তিমান হাহাকারের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে ; হুকায় নির্ব্বাপিত অগ্নি কলিকাগুলি যেন শ্মশান-ভস্ম মাথায় করিয়া বহিয়া রহিয়াছে। বহির্বাটী অতিক্রম করিয়া সে সত্বর অন্দর মহলে প্রবেশ করিল ; সেখানে তাহাকে সমাগত দেখিয়া পুরাঙ্গনাগণ কলরোলে কাঁদিয়া উঠিল। অলঙ্কার বিহীনা মাতা ধূলি শয্যায় শুইয়া বর্ষার ধারার মত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ষ্টীমারে পানাহারের নেশা তাহার কাটিয়া গেল ; চক্ষু ভেদ করিয়া তপ্ত অশ্রুরাশি বাহির হইয়া পড়িল ; সে বুঝিল জন্মের মত সে পিতৃহীন হইয়াছে।

অশ্রুবেগ কিছু প্রশমিত হইলে শরৎকুমার ক্রমে শুনিল যে ম্যাজিষ্টর সাহেব তদন্ত করিয়া তাহার পিতার উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রমাণ পাইয়া, তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন। তিনি বিংশ সহস্র মুদ্রার জামীনে মুক্তিলাভ

করিয়া বাটী ফিরিয়া আসেন। কিন্তু সেই দিনই এক মাড়োয়ারী, লোকজন লইয়া আসিয়া ঢোল বাজাইয়া, ছাব্বিশ হাজার টাকার দাবীতে এই বাটীটি ক্রোক করেন। যে আদালতে তুই দিন আগে হাকিমের উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া আইনজীবীগণের দ্বারা স্তুত হইতেন, সেই আদালতে আইনজীবীগণের সমক্ষেই হীন আসামী হইয়া দায়রা সোপর্দ্দ হওয়ায়, এবং বাটীতে আসিয়া স্বহস্ত সজ্জিত আপন শোভাময় নিকেতনটি ক্রোক হইতে দেখিয়া তিনি দুইটা মহা অপমানের মর্ম্মান্তিক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন নাই। এই নিদারুণ মনোকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি সুরার সহিত হলাহল মিশ্রিত করিয়া পান করিয়াছিলেন। বিষের জ্বালায় তিনি যখন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার নিশ্চয় মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া শরৎকুমারকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। যে দিন টেলিগ্রাম করা হয় সেই দিনই রাত্রশেষে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

শরৎকুমার শোকাকুল চিত্তে চীর ধারণ করিয়া পিতার মৃতাশৌচ গ্রহণ করিল। কিন্তু নিশিথের শোক, মাঘ মাসের শীতের ন্যায় কন কনে; তাহা সূক্ষ্ম চীর-বস্ত্রে নিবারিত হইল না। কাজেই সে একখানা কম্বল লইয়া গাত্রাবরণ করিল। কিন্তু তাহাতেও শোক এবং শীত নিবারিত হইল না। তখন সে বাক্স হইতে বোতল বাহির করিয়া ষ্টীমারের পাণাবশিষ্ট সুরা পান করিল। এইরূপে সেই রাত্রের শোক এবং শীত উপশমিত হইল।

কিন্তু পররাত্রে সুরাপানে শরীরের শীত কমিল বটে, কিন্তু বক্ষের শোক কমিল না। অগত্যা বক্ষকে সজীব করিবার জন্য সে ঢাকার একজন বিখ্যাত নর্ত্তকীকে ডাকিয়া আনিল। ক্রমে উদরে সুরাসুন্দরী, এবং কক্ষে নর্ত্তকী সুন্দরী অহরহ বিরাজ করিতে লাগিল। তখন তাহার মাথার উপর কোনও অভিভাবক ছিল না, এবং শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কৃপায় হাতে নগদ টাকারও অভাব ছিল না; সুতরাং সে অতি সহজেই নিজের অধঃপাতের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিল।

অভাগিনী স্বামীশোকাতুরা বিধবা মাতা অহরহ অশ্রুজলে প্লাবিতা হইয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিতা থাকিতেন। শরৎকুমার সুরাপানে মত্ত ও নর্ত্তকীর নর্ত্তন লীলায় মুগ্ধ থাকিয়া কখনও মাতার খোঁজ লইবার অবসর প্রাপ্ত হইত না। মাতার শুশ্রূষার ভার দাসীগণের উপরে নিহিত ছিল; তাহারা কখন কোনও খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিলে তিনি কখনও কিছু খাইতেন, কখনও খাইতেন না। তাহার উপর দারুণ শীতে সর্ব্বদা বাহিরে পড়িয়া থাকিতেন। এই সকল অনিয়মে তাঁহার যত্নরক্ষিত দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই ব্যাধির কোনও চিকিৎসা হইল না। কে চিকিৎসা করাইবে? ইন্ধন অভাবে যেমন অগ্নি নিভিয়া যায়, তাঁহার দেহও সেইরূপ খাদ্যও যত্নের অভাবে শুষ্ক হইয়া গেল; তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় সেই স্বামীহীন প্রাণ অল্প দিবস মধ্যে নিবিয়া গেল।

প্রহর কাল অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য শরৎকুমারকে পাওয়া গেল না; সে তখন নর্ত্তকীর বক্ষঃ আশ্রয়ে লুক্কাইত ছিল। সুতরাং আত্মীয়গণ তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া স্বামীর চিতাচিহ্নের উপর তাহা দগ্ধ করিয়া আসিল। এইরূপে শরৎকুমার পিতার মৃত্যুর অষ্টাহের মধ্যে মাতৃহীন হইল।

ঈশানী শ্বশুর মহাশয়ের ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে পাইল না। শরৎকুমার তখন পরকীয়া প্রেমে উন্মত্ত; তখন সে পত্নী-প্রেমের কোন ধার ধারিত না; পত্নীর মাতা পিতার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ দেওয়া দূরে থাকুক সে কোনও পত্রই লেখে নাই,—নিজের পৌছাইবার সংবাদও দেয় নাই। ঈশানী পত্র লিখিবার জন্য তাহাকে বার বার কাতর অনুরোধ করিলেও শরৎকুমার প্রেমময়ী পত্নীর প্রার্থনা কখন পূর্ণ করে নাই। আমাদের সন্দেহ হয়, সে ঈশানীর পত্রগুলিই পড়িত কিনা।—যে মাতার মুখাগ্নি করিবার অবসর পায় নাই, সে কি বালিকা পত্নীর পত্র পড়িবার সময় পায়?

প্রমদা একবারে ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া অবগত হইতে পারিলেন যে তাহার দুগ্ধের বৎস জামাতার টেরিকাটা সুন্দর মাথার উপর দগ্ধবিধাতা কি মহা বিপদের গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছেন! পরক্ষণেই বুদ্ধিমতী প্রমদা বিধাতাকে ততটা দোষী মনে করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে পিতার মৃত্যুতে যদিও জামাতার মাসিক আয়

পাঁচশত টাকা কমিয়া গেল বটে, কিন্তু মা বাপের একসঙ্গে সুবিধাজনক মৃত্যু হওয়াতে তাহার ব্যয়ও অনেক কমিয়া গেল ; অধিকন্তু শাশুড়ী মাগীর মূল্যবান অলঙ্কার গুলা ভাগ্যবতী ঈশানী এখন অনায়াসেই লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার মনের গুপ্ত সংবাদটি তিনি ঈশানীকে শুনাইলেন।

কিন্তু বোকা কন্যা এতটা অলঙ্কার প্রাপ্তির আশাতে সুখী হইতে পারিল না। সে শ্বশুর ও অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা শাশুড়ীর জন্য কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল এবং শোকাবেগ কিছু উপশম হইলে মাতাকে কাতরস্বরে বলিল, 'মা এখন আমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও। নইলে সেখানে বড় বিশৃঙ্খলা হ'বে।"

বুদ্ধিমতী মাতা বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহার জমীদার জামাতার বাটীতে অত লোকজন থাকিতে কিরূপে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে এবং কিরূপেই বা তাঁহার দুগ্ধপোষ্য কন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবে? তিনি বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 'যাবে বই কি মা! সেইখানেই যেন তুমি রাজরাণী হ'য়ে থাক'। কিন্তু পেটের ছেলেকে যতদিন না কোলে পাও ততদিন এত পথ ষ্টীমারে চ'ড়ে যাওয়া ভাল হ'বে না; পথে একটা বিপদ আপদ ঘটতে পারে।'

ঈশানী অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল, 'কিন্তু মা, আমি বেশ বুঝতে পারছি এখন আমি সেখানে যেতে পারলেই ভাল হ'ত।'

প্রমদা বুঝাইয়া বলিলেন, 'তাই যদি ভাল হ'ত, তাহলে অমন লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান জামাই তোমাকে কি নিজে নিতে আসত না?'

শরৎকুমার কতটা চরিত্রহীন, কতটা লম্পট, কতটা সুরাসক্ত তাহা ঈশানী বেশ অবগত ছিল ; এবং কেন যে সে তাহাকে লইতে আসে নাই, কিম্বা একখানা পত্রও লেখে নাই তাহা বালিকা হইলেও তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেছিল। তাই সে মনে করিতেছিল, সেখানে উপস্থিত থাকিলে স্বামীর দুষ্কার্য্যে কিছু বাধা দিতে পারিবে। কিন্তু তাহার অন্তরের সকল কথা সে আপনার মাতার নিকটও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না; তাহা বলিলে যে যে স্বামী তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, সেই স্বামীরই অত্যন্ত নিন্দা করা হইবে। ঈশানী হিন্দুর কন্যা হইয়া কিরূপে স্বামীনিন্দা মুখে আনিবে? সুতরাং ঈশানী নিরবে মাতৃ আদেশ পালন করিল; তাই তাহার পরলোকগত শ্বশুরের এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ-কারিণী পুণ্যময়ী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষ্যে ঈশানী শ্বশুরালয়ে আসিতে পারে নাই। আর কি কখনও সে সতীর সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠতীর্থ, সেই শ্বশুরালয়ে আসিতে পারিবে?

শরৎকুমার আত্মীয় ও বন্ধুগণের পরামর্শে এবং শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর অবশিষ্ট গচ্ছিত অর্থে মহা ধুমধামের সহিত মাতাপিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিল। ত্রেতায় বন-পরিত্যক্তা সীতার পরিবর্ত্তে রঘুবীর রামচন্দ্র যেমন সুবর্ণময়ী সীতার মূর্ত্তি গড়াইয়া অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন, এই কলিকালে শরৎকুমার তেমনই ঈশানীর পরিবর্ত্তে, এক স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা নর্ত্তকী আনাইয়া মাতাপিতার পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়াছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহহীন ও সম্পত্তি হীন

নিয়ম আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধি পরীক্ষা দিতে হইলে, ছাত্রকে একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিবস কলেজে উপস্থিত হইতে হয়। শরৎকুমার নির্দ্দিষ্ট দিন কলেজে উপস্থিত হইতে না পারায় এই বৎসরও বি, এ,—পরীক্ষা দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইল না। এইরূপে পাঠাভ্যাসের কঠিন দায় হইতে একবার নিষ্কৃতি পাইয়া, সে বিদ্যালাভের জন্য নর্ত্তকীর বাঞ্ছনীয় বাটীতে বিদ্যাদেবীর এমন জাঁকজমকের সহিত পূজা করিল যে, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ কার্য্যের পর তাহার হস্তে শ্বশ্রূঠাকুরাণী যে অর্থ অবশিষ্ট ছিল, এবং মৃতা মাতার দুইখানি অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থ, তাহা সমস্তই উক্ত দেবকার্য্যে ব্যায়িত হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া নর্ত্তকী সুরাপান সরস অধরে মধুর হাসি আনিয়া, আনন্দ দেখাইয়া বলিল, 'একেই বলে বাপের বেটার মতো কাজ।' শরৎকুমার সেই সরস মুখে সেই সত্য বাণী শুনিয়া ধন্য হইল।

শরৎকুমারের কোনও আয় ছিল না। পিতা ইদানিং কোনও বেতন পাইতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাহা কোন কালে পাইবার সম্ভব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। এবং তোমরা ত জান পিতার জীবন-কাল হইতে পৈতৃক জমিদারীর আয় হইতেও, এক বন্ধকী তমস্বকের সর্ত্ত-অনুযায়ী, তাহারা বঞ্চিত ছিল। একদিকে যেমন তাহার কোনও আয় ছিল না অন্য দিকে তেমনই মাতা পিতার মৃত্যু হওয়াতেও তাহার সাংসারিক ব্যয়ভার কিছু মাত্র লঘু হয় নাই। পরিচারক, পরিচারিকা, পাচক, গাড়ী, ঘোড়া, বাদর পক্ষী কিছুই বিদায় প্রাপ্ত হয় নাই; কিম্বা তাহাদের জন্য ব্যয়ও কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহাদের বিশেষ কোনও আবশ্যক না থাকিলেও মৃত পিতার মহা মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শরৎকুমার যতদিন পারে তাহাদিগকে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার উপর তাহার সুরাপানের ও নর্ত্তকী প্রতিপালনের বিপুল নূতন ব্যয় বহন করিতে হইত। এইরূপ অনর্থক ও প্রেমহীন প্রেমের অযথা ব্যয়ে কত কত ধনকুবেরের ঐশ্বর্য্য বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে; এক ক্ষীণ প্রাণ ডেপুটীপুত্রের বহু ঋণগ্রস্ত সম্পত্তি আর কতক্ষণ থাকিবে? শ্বশ্রূর সমুদয় অর্থ নিঃশেষ হইলে সে মাতার অলঙ্কার, নিজের ও পিতার ঘড়ী, চেন, আংটী ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া আরও কিছু দিন পৈতৃক মর্য্যাদা বজায় রাখিল। তাহার পর আর পারিল না; —মধুখবর্ত্তিকার উভয় দিকে আলোক জ্বালিয়া দিলে তাহা আর কতক্ষণ থাকে!

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অর্থ, অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থ, স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত তৈজস বিক্রয়ের অর্থ নিঃশেষ হইয়া যাইবার পর প্রাবৃটপ্রবলা ঐ ৎড়ীগঙ্গার কূলের মত সকল মর্য্যাদা একে একে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ঘোটক সকল খাইতে না পাইয়া একে একে মরিতে লাগিল; সহিস ও শকটচালকগণ বেতন না পাইয়া একে একে সরিতে লাগিল। পরিচারকগণ প্রভুর প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া চুরি করিয়া পলাইল। পরিচারিকাগণ প্রভুর গালাগালিতে উত্যক্তা হইয়া গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। পাচক সেয়ানা লোক; সে বেতন অভাবে বেতনের বহুগুণ মূল্যের তৈজস ও গৃহ-সামগ্রী সব আত্মসাৎ করিতে লাগিল। দ্বারবান বেতন না পাইয়া বেতন আদায়ের প্রত্যাশায় বাড়ী কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। কাকাতুয়া চানার পরিবর্ত্তে পায়ের শিকলির কাটিয়া উড়িয়া গেল; বানর পেটের দায়ে জন্মের মত দাঁত খিচাইল। নর্ত্তকী অর্থের অপ্রতুলতায় আর নাচিল না। তাহার পর, একদিন ঐশ্বর্য্যের শেষ আশ্রয়, জলবুদ্বুদের মত নিঃশেষ হইয়া গেল; —ক্রোকে আবদ্ধ বাড়ীটি সংকারী নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল।

তখনও যে ব্যক্তি বাটী ক্রয় করিল, সে বাটীর দখল না লওয়ায় শরৎকুমার কিছু দিন সেই বাটীতেই বাস করিতে লাগিল। এই সময় শরৎকুমারের কষ্টের অবধি রহিল না। প্রেম দেওয়া দূরের কথা, কোনও সুন্দরী তাহাকে একদিন আহারেও আহ্বান করিল না। অকৃতজ্ঞ শুড়ীগণ পানার্থ তাহাকে এক ফোঁটা সুরা ধার দিল না। অপহরণের তৈজসের অভাবে পাচক চলিয়া যাওয়ায়, তাহাকে নিজ হস্তে খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়া খাইতে হইল, কখনও বা দগ্ধহস্তে অনাহারে কাটাইতে হইল।

এই সময় সে ঈশানীর কাছ হইতে একখানি পত্র পাইল; আহা! অভাগিনী বড় দুঃখেই লিখিয়াছে, 'তুমি কি আমাকে একেবারেই ত্যাগ করিলে? সেই পৌষ মাসে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ, আজ শ্রাবণ মাসের অর্দ্ধেক হইতে চলিল, এ পর্য্যন্ত তোমার একখানা পত্রও পাইলাম না। আমি কত চিঠি দিই, তা' কি পাও না? পাও যদি, তবে তার এক খানিরও উত্তর দাও না কেন? আমাকে তুমি ত্যাগ করিতে পার, কিন্তু তুমি তোমার নিজের ছেলেকে কি করিয়া ত্যাগ করিবে? তার চার মাস বয়স হইতে চলিল, এখনও তুমি তাকে দেখলে না। সে এখন বেশ হাসতে পারে; সে হাসি তুমি যদি একবার দেখিতে, তাহ'লে বুঝিতে পারিতে সে হাসি কত মিষ্টি। লক্ষ্মীটি! তোমার পায়ে পড়ি, একবার এস।'

ঈশানী শরৎকুমারকে অনেক মিনতিপূর্ণ পত্র দিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত শরৎকুমার তাহার এক খানিরও উত্তর দেয় নাই। কিন্তু উপরোক্ত পত্র পাইয়া একবার শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য উৎসুক হইল। নর্ত্তকীর নৃত্যশীল প্রেমের অভাবে তাহার হৃদয়ে আবার কি পত্নীপ্রেম ফিরিয়া আসিয়াছিল? পুত্র মুখ

দেখিবার জন্ম তাহার হৃদয়স্থিত বাৎসল্য উদ্বেলাইয়া উঠিয়াছিল কি? না, তাহার হৃদয়ে প্রেম বা স্নেহ কিছুরই স্থান ছিল না; তাহা কেবল আত্ম-সুখেচ্ছায় ও ভোগ লালসায় পূর্ণ ছিল। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাহার অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল। সে এই অর্থ-সংগ্রহ করিবার জন্ম একবার ঈশানীর নিকট আগমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অর্থ সংগ্রহ ছাড়া তাহার একটু আশ্রয় পাইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া ছিল; কেন না যে ব্যক্তি নিলামে বাটী ক্রয় করিয়াছিল সে যে কোনও মুহূর্ত্তে বাটীর অধিকার গ্রহণ করিতে পারে; তখন তাহাকে একেবারে আশ্রয়হীন হইয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে; তাহার দৈনিক আহার পাইবারও দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সকল মনে মনে চিন্তা করিয়া এইবার—এই দীর্ঘ সাত মাস পরে ঈশানীকে পত্র লিখিতে বসিল; লিখিল, ‘আমি নানারূপ বিপদ ও ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া এতদিন তোমাকে কোনও পত্র দিতে কিম্বা তোমার কোনও খোঁজ লইতে পারি নাই। তা' বলিয়া তুমি যেন কখনও মনে করিও না যে, আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। সেই স্বর্গের সুধামাখা মধুর মুখ, এ প্রাণ থাকিতে কখনও ভুলিতে পারিব না। সেই মুখ দেখিবার জন্ম আমি শীঘ্র আবার বরিশালে যাইব; আবার সেই মুখে আমার আদর চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিব।'

ঈশানী সেই পত্র পাইয়া সেই সপ্তমাসব্যাপী অবহেলার কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া গেল। মনে করিল, নন্দন বন পরিশোভিত এক আনন্দময় স্বর্গ তাহার করতলগত হইয়াছে। মহানন্দে সে শিশু পুত্রকে বক্ষে ধরিল এবং তাহার লালা-প্লাবিত সুকুমার অধরে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোর বাবা কবে আসবে, বল্ দেখি খোকা?'

খোকা মাতার আদর বুঝিল, কিন্তু পিতার আসিবার কথা কিছু বুঝিল না। কেবল দন্তহীন মুখে শব্দহীন হাসির তরঙ্গ তুলিয়া, মাতার আনন্দপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহার দুইদিন পরেই শরৎকুমার বাটীর অধিকার ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হইয়াছিল; ইহার দুই মাস পূর্ব্বে তাহার জমিদারী ঋণের দায়ে বিক্রী হইয়া যাওয়ায় সে আর জমীদার ছিল না। আশ্রয় ও সম্পত্তিবিহীন শরৎকুমার বরিশালে আসিয়া ঈশানীর নিকট একটা খাদ্যপূর্ণ আশ্রয় লাভ করিল। অবশিষ্ট কয়েকটা আসবাব বিক্রয় করিয়া আপনার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল।

ঈশানী তাহাকে পাইয়া অত্যন্ত পুলকিতা হইয়াছিল; এবং তাহাকে কেবল মাত্র আহার ও আশ্রয় দেয় নাই; তাহাকে এমন একটা অপার্থিব জিনিষ দিয়াছিল, যাহা তাহার কাছে মূল্যহীন বলিয়া উপেক্ষনীয় হইলেও, তাহার মত অমূল্য সামগ্রী এই পৃথিবীতে মানুষের আর কিছুই হইতে পারে না; তাহা রমণীর অকৃত্রিম ও নির্ম্মল প্রেম। ঈশানী গঙ্গাজলের মত অনবদ্য ও পবিত্র প্রেমে স্বামীকে অহরহ ডুবাইয়া রাখিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

ত্রুটী স্বীকার—

গত সংখ্যার "ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নামটি প্রকাশিত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি foot note ভুলক্রমে বাহির হইয়াছিল। স, স, শি,
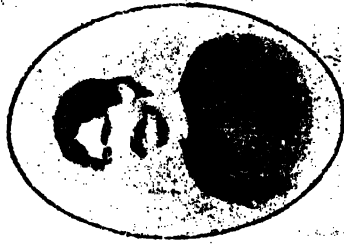
যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র
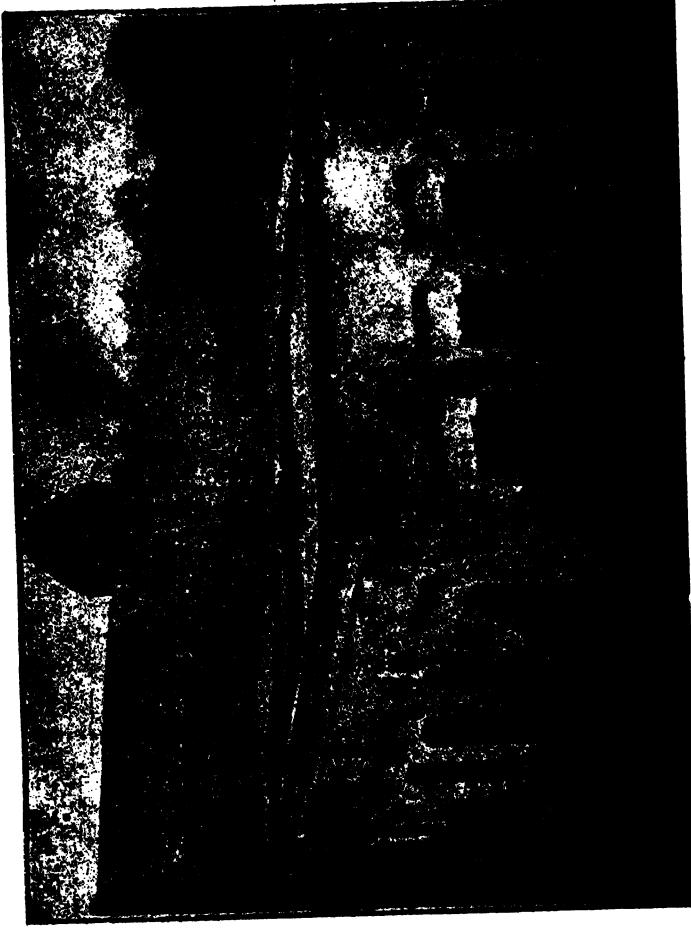
বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা—কাঁটালপাড়া

যে সিঁড়ির উপর একজন লোক বসিয়া আছে, তাহার ডানদিকে একটি ঘর এবং বামদিকে একটি ঘর। ডানদিকের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, বামদিকের ঘরটিতে দিনের বেলায় শুইতেন।

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২৮শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩১। [২২শ সপ্তাহ

বঙ্কিম-প্রতিভা

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে, সেই সকল প্রবন্ধের সারাংশ গ্রহণ করিয়া এইস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কি ছিলেন, আমাদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন লেখক প্রায় বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়া নানা সময়ে ও নানা স্থলে বুঝাইয়া গিয়াছেন। সেই সকল কথা একসঙ্গে গুছাইয়া পাঠক-সাধারণকে উপঢৌকন দিবার উদ্দেশ্যে আমরা এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে এই সঙ্কলন যদি পাঠক সকলের সহায়তা করে, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্কিম-প্রতিভা

—:(০):—

(১)

সাধারণের একটি সংস্কার আছে যে নব্য সম্প্রদায় ইংরাজীর অনুরাগে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় স্বদেশী ভাষার নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, সুতরাং তাহার উন্নতি সাধনে বা তাহাতে সদ্রচনায় সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু সে কুসংস্কারের একেবারে উন্মূলন করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালাবধি ইংরাজীর অনুরাগী; তেইশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষাই সর্ব্বদা অনুশীলন করিয়া তাহাতে বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। তৎকাল মধ্যে বাঙ্গালীর অল্পমাত্র অনুধাবন করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, সংস্কৃতে তিনি অভিজ্ঞ নহেন। অপর বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া ইংরাজীরই সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছেন, এবং আদৌ ইংরাজীতেই রচনা চাতুর্য্য প্রকাশার্থে কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রে উপন্যাস প্রকাশে প্রবৃত্ত হ'ন। তত্রাপি তিনি বাঙ্গালী ভাষায় যে প্রকার পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দ্বারা অদ্যাপি সম্পন্ন হয় নাই। বহুকালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনিলে শ্রোতার মনে বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশ সিংহাসন মনে পড়িত। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা কয়েক বৎসরাবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূতপ্রেতের পরিবর্ত্তে মানুষিক ঘটনায় উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন, এবং কয়েকখানি সুচারু পুস্তকও প্রস্তুত করিয়াছেন।

কিন্তু কেহই ইংরাজীর প্রকৃত নবেলের পারিপাট্য লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবুও সেই অনুরাগের অনুরাগী; এবং ইংরাজী উপন্যাস লেখকের মধ্যে স্কট নামা একজন শ্রেষ্ঠতমকে আদর্শ স্বীকার করিয়া পর পর তিন খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ-সঙ্কল্প হইয়াছেন; অধিকন্তু যে কেহ ঐ তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার রচনা চাতুর্য্যের ও গল্প বিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।

উপন্যাস রচনার এইটি প্রধান অভিপ্রায় তাহার সাহায্যে রচনায় মন আসক্ত হইবে, কল্পিত গল্পে সত্যের ভাণ হইবে, এবং বর্ণিত নায়ক নায়িকার প্রতি লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে অনুরাগ বা দ্বেষ জন্মিবে এই প্রসাদ গুণ এই মনসাকর্ষণ শক্তিই সল্লেখকের অসাধারণ মহিমা এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর রচনায় এই প্রসাদ গুণ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান আছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রহস্য সন্দর্ভ—সম্বৎ ১৯২৭

"যে বলে, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক,—তাহার কথা মিথ্যা।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(২)

বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম বাবু যে ভাবে যে প্রণালীতে সপ্রকাশ, তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের উপর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, 'Substance of religion is culture' এ কথা তাঁহার সাহিত্য-জীবনে অতি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু একদিকে সাহিত্যের 'খাস' মঞ্চ হইতে গৌণকল্পে যেমন ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছেন অপরদিকে তেমনি সাহিত্যালোচনার দ্বিতীয় স্তর হইতে প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম-প্রচারের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবুর বাল্য-রচনা। রচনা সাহিত্যাংশে খুব অস্ফুট। রচয়িতা নিজেই বলেন উহা অপাঠ্য—উহা 'হেঁয়ালি"। উহা অপাঠ্যই হউক, আর হেঁয়ালিই হউক, আর পুস্তক বিক্রেতার আলমারিতেই পচুক, উহাতে এমত এক আধ কণিকা দ্রব্য পাওয়া যায়, যাহা ভাবী প্রতিভার পরিচায়ক। পঞ্চম দশীয় বালক বঙ্কিমের 'ললিত' নামক গল্পটির গঠনে বেশ একটু নাটকীয় শক্তির আভাস পাই। যাহা হউক, সর্ব্বোপরি এই অস্পষ্ট অমিষ্ট বাল্যরচনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা রচয়িতার মানসিক অবস্থা। বাল্যকালের রচনায় নিজের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি সমাঙ্কিত করা গ্রন্থকার মাত্রেরই স্বাভাবিক বলিলেও চলে। বালক বঙ্কিমের সর্ব্ব প্রথম রচনাই ট্র্যাজিডি। রসিক চূড়ামণি তরুণ বয়সে তরল রসের ছড়াছড়ি না করিয়া 'শেষের সে দিন' ভাবিতে বসিয়াছিলেন, ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। বাল্যাবস্থাতেই বঙ্কিমের মন সংসারের অসারতা অনুভব করিয়া 'ললিতা-মন্মথের' প্রণয় ও তাহার পরিণাম বর্ণনা স্থলে বলিল :—

"মানবের কি কপাল! সংসার কি ছার!
বহিতে জীবন-ভার কে চাহিবে আর!"

পরন্তু;—

"এগভীর স্থির মত হয়েছে এখন
কারো অনুরাগা নই বিনা সনাতন।
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥
অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ,
জানিবে না, শুনিবে না, কাঁদিবে না কেহ।"

এ 'গভীর মত' তখন সম্পূর্ণরূপে 'স্থির' হইয়াছিল কিনা, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা অবশ্য কঠিন। কিন্তু 'মত স্থির' না হইলেও মনের স্বাভাবিক গতি যে দিকে তাহা বেশ বুঝা যায়।

তার পর গুরু-শিষ্যের কথোপকথনে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন —

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?'—সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। অনেক পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্য ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।" ইত্যাদি

এই পরিশ্রমের মুখ্য ও গৌণ ফল কি তাহা বঙ্গীয় পাঠক জ্ঞাত আছেন এবং অধুনা ইয়োরোপীয় সমাজেও তাহার কথঞ্চিৎ বিস্তৃতি হইতেছে।

'জীবন লইয়া কি করিবেন?' এই প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানে বঙ্কিম সাহিত্যে জীবন ঢালিলেন, সাহিত্যের সমগ্র ভূমি বেড়িয়া যথাসাধ্য পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনেক পরীক্ষা অনেক শিক্ষা হইল। অনেক পথ অনেক মত

"ইংরেজী শাসন, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির (বাহ্যসম্পদ) উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।"— বঙ্কিমচন্দ্র।

দেখিলেন। স্বভাবদত্তা সৌন্দর্য্যস্পৃহা সুকুমার সাহিত্যের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। স্বভাবোপযোগী ক্ষেত্র পাইয়া প্রতিভা প্রস্ফুট হইতে লাগিল। বঙ্কিম সৌন্দর্য্যের জন্য সৌন্দর্য্য প্রচার করিলেন। তদ্দারা তাঁহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হউক সৌন্দর্য্যের অপরপৃষ্ঠা ধর্ম্মও প্রচারিত হইল। 'দুর্গেশ নন্দিনী' হইতে 'রজনী' পর্য্যন্ত যে কয়েকখানি কাব্য তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় একটা ধর্ম্মকথা না থাকিলেও তদ্দারা গৌণ কল্পে ধর্ম্ম-নীতিই প্রচারিত হইয়াছে। তবে একথা অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না বটে। কিন্তু কোন্ কথাই বা অনেকে বুঝিয়া থাকে? ফলতঃ বঙ্কিমের যে কিছু রচনা—নগেন্দ্র দেবেন্দ্র হইতে প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও রোহিনী শৈবলিনী হইতে সূর্য্যমুখী প্রফুল্ল মুখী পর্য্যন্ত 'কুস্ম' যাহা কিছু সমস্তেরই চিত্ত-শুদ্ধি উদ্দেশ্য। রসের ঢলঢল ঢেউ হইতে গাম্ভীর্য্যের অতলস্পর্শী দৃশ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু তাহার একই মাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোন্নতি। এখন স্মরণ করিয়া দিতে হইবে কি যে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তোন্নতিই ধর্ম্ম?

বঙ্গদর্শনে বঙ্গসাহিত্যের নবীন সংস্কার নব যুগোৎপাদন করার পর বঙ্কিম বাবুর কিছু কাল বিশ্রাম। এ বিশ্রাম বড় বিশ্রাম নয়, পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা বলিয়াইত আমাদের বোধ হয়। এই বিশ্রাম বা পরিশ্রমের ফল অনেক। আর সেই ফল নানা আকারে বঙ্গ সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যের খাস-ইলাকা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আগমনের প্রথমাভাস আনন্দ মঠে। আনন্দমঠে অনেকটা আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিমবাবুর রাজনীতি ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিস্থল কোথায়, তাহা আনন্দমঠে বেশ দেখিতে পাই। আর জননী জন্মভূমির জন্য কবি-হৃদয় যে কিরূপ কাতর, কিরূপ উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বাসিত, তাহা 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে পাঠ করি। আনন্দ মঠে যাহার আভাস দেবীচৌধুরাণীতে তাহার প্রকাশ। যে নিষ্কাম কর্ম্ম চন্দ্রশেখরে অঙ্কুরিত প্রফুল্লমুখীতে তাহা বিস্ফারিত। এইরূপে সাহিত্যের পরিণাম ধর্ম্মে,—সে ধর্ম্মও কিন্তু সাহিত্য। সাহিত্যের ধর্ম্ম—পরিণামের প্রথম সোপান 'আনন্দমঠ', দ্বিতীয় 'দেবীচৌধুরাণী', তারপর 'প্রচারে' সে পরিণাম 'ষোলকলায়' পুর্ণিত। প্রচারে ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছে—কিন্তু উৎপন্ন হইয়াছে অতি উপাদেয় সাহিত্য। বেদব্যাখ্যা বঙ্গ সাহিত্যের বিলক্ষণ পুষ্টি সাধন করিবে।

'কৃষ্ণচরিত্রে' মহাভারত সমালোচন সুকুমার সাহিত্যেরই অন্তর্গত। বঙ্কিম বাবু ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়া কোন পথে যাইতেছেন তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন (প্রচার ২০২ পৃঃ ১ খণ্ড) প্রথমতঃ ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি কিনা? দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ধর্ম্ম সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত কি না? এই দুই কথা বুঝান তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম্মের বিবিধ ভাগ বিভাগ শাস্ত্রের স্তরে স্তরে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা শুদ্ধ হউক আর অশুদ্ধ হউক, ইহার ফল ভবিষ্যতে যাহাই দাঁড়াক, ইহা যে আমাদের সাহিত্যের যৎপরোনাস্তি পুষ্টিসাধন ও উপকার করিয়াছে ইহা বোধহয় কেহ অস্বীকার করিবে না। বঙ্কিম বাবুর এই ধর্ম্মালোচনায় বঙ্গ সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

(সাহিত্য-মঙ্গল—১২৯৫)

"বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালীর বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নাই, বল ও সাহস হইলেই আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বল হইলেই সাহস হইবে। বলের পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজনীয়।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৩)

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীয় চিন্তার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ,—এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখা যায়। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশার পূর্ণবিকাশস্থল। বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে,—তিনি সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক চিন্তা তাঁহাকে সংগঠিত করিয়াছে, তিনি সেই চিন্তাকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক আশা ভরসা, উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছে, আবার বঙ্কিমচন্দ্র সেই আশা ও উদ্যমকে জলন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—আবালবৃদ্ধবনিতা সকল সহৃদয় বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিস্তার করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া দেশীয় ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার অনুশীলন, পাশ্চাত্য উৎসাহের সহিত স্বদেশের উন্নতি ও ঐক্যসাধন, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া কায়মনঃপ্রাণ দেশের জন্য সমর্পণ করা,—এইটী আমাদের শতাব্দীর শেষ ফল,—এইটী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। সামান্য অনুকরণশীল ব্যক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় লোকের মধ্যে প্রভেদ এই ;—পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার মন পুষ্টিলাভ করিয়াছে, অজীর্ণতা-ক্ষুব্ধ হয় নাই। জ্ঞানরত্ন সকল স্থান হইতেই আহরণীয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সকল দেশ, সকল স্থান হইতে সেই রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহার অনৈসর্গিক প্রতিভা আরও সমুজ্জ্বল করিলেন। সে প্রতিভার ফল কি, তাহা আমরা গত ত্রিংশৎ বৎসর ক্রমান্বয়ে দেখিয়াছি।

যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ক-কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসীগণ বুঝিল সাহিত্যে একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় পুস্তক পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। সেরূপ মৌলিকতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যচ্ছটা, সেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্পের চাতুর্য্য বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যে পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎসিংহ ও ওসমানের দুর্দ্দমনীয় তেজ ও বীরত্ব, প্রখরা বিমলার চাতুর্য্য ও জগদ্বিমোহিনী কমনীয়তা, শান্তিময়ী আয়েসার প্রগাঢ় নিঃশব্দ হৃদয়ভাব, গড়মান্দারণ, দেবমন্দির, কতলুখাঁর গৃহে উৎসব,— এ সকল চিত্র অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অবিনশ্বর! কল্পনাসাগর মন্থন করিয়া মহারথী বঙ্কিম এই অমৃত বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করিলেন,—বঙ্গবাসীগণ সে অমৃতসাগরে ভাসিল।

আমরা বঙ্কিমবাবুর একখানি পুস্তকের কথা বলিলাম। তাঁহার কমনীয় কল্পনা হইতে উদ্ভূত সকল চিত্রের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ধ্যার আকাশে যেমন একটীর পর একটী জ্যোতির্ময় নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া শেষে নৈশ

"এমন কোন নৈতিকতত্ত্ব কোন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা নীতিশাস্ত্রে নাই, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, উক্ত এবং প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় ধর্ম্মনীতির প্রশংসা করিয়া দেশীয় ধর্ম্ম-নীতিকে অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ এবং অধর্ম্ম কলুষিত বিবেচনা করেন, তাঁহারা কেবল হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞতা বশতই এরূপ করেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

গগন জ্যোতির্ম্ময় করে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রগুলি সেইরূপ একটীর পর একটী ফুটিয়া সাহিত্যাকাশ জ্যোতির্ম্ময় করিল। অরণ্য বাসিনী কপালকুণ্ডলার চিত্রটী কি অপূর্ব্ব, কি বিস্ময়কর! দেশবিদেশ বিচারিণী গিরিজায়ার গীত কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী! গরীয়সী সূর্য্যমুখী, প্রশান্তমতি কমলমণি, দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী, আর চন্দ্রশেখর, ভ্রমর, দেবী চৌধুরাণী,—কত নাম করিব? প্রভাতে নিকুঞ্জবনে বন-পুষ্পগুলি যেরূপ একে একে ফুটিতে থাকে, বঙ্কিমের হৃদয়-কুঞ্জে কল্পনাপুষ্পগুলি সেইরূপ স্বতই ফুটিতে লাগিল। সেগুলিও সেইরূপ সুন্দর,—সেইরূপ মধুর!

এখন আমরা দর্প করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, বাৎসল্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। ধনের সহিত একটু শক্তি হইয়াছে,—রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য সম্বন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের একটু স্পর্দ্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের স্তুতিবাদক নহি, দেশীয় আচারব্যবহারে বীতরাগ নহি, দেশীয় ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্ম্মে অবহেলা করি না। আমাদের শরীরে যেন একটু বল হইয়াছে, মনে একটু স্পর্দ্ধা হইয়াছে, জাতীয় ধন চিনিয়াছি, জাতীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম শিখিয়াছি। এটী উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ। আমরা যেন ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

এ উন্নতি যে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা সাধিত, তাহা নহে। এটী কতকটা ইংরাজি শিক্ষার ফল, কতকটা দেশের ও সময়ের উন্নতি, কিন্তু এ উন্নতিও বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণবিকাশ পাইয়াছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০১।

"যদি বিবাহ বন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্য জাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৪)

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেব-কাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনির।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিণী পশ্চিমবাহিণী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্যনাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্বলোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন; পূর্ব্ব অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা

"গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে?"—বঙ্কিমচন্দ্র।

আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো একটি সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে-বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধনা—১৩৩০।

"যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর সমতার সম্ভাবনা নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র

অর্জ্জুনা পুষ্করিণী।—[কাঁটালপাড়া]

(বর্ত্তমান অবস্থা)

[এই অর্জ্জুনা পুষ্করিণীর নাম হইতেই সম্ভবতঃ 'চন্দ্রশেখরে' 'ভীমা-পুষ্করিণী নামকরণের উৎপত্তি]

(৫)

১৬ই এপ্রেল তারিখের "নেশান পত্রে" সম্পাদক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের সহিত সকলাংশে একমত না হইলেও, প্রবন্ধটি যে বেশ সুলিখিত, একথা আমরা বলিতে বাধ্য। নেশান সম্পাদক বলেন যে, বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যরাজ্য রাজহীন হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাঙ্গালী জনসাধারণ সকলেই এ ক্ষতি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে! সম্পাদক বলেন যে, আধুনিক বাঙ্গালী তাঁহার উপন্যাস যে পরিমাণে পড়ে, বোধ হয়, রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়িয়া দিলে অন্য কোনও গ্রন্থ তত পড়ে না। অতএব বাঙ্গালীর হৃদয়গঠনে, তাহাদের জাতীয় জীবনের বিকশনে ৺বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সবিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। সম্পাদক তাঁহার উপন্যাসাবলীর বিস্তৃত সমালোচনা বা বিশ্লেষণ করেন নাই। সাধারণতঃ ইহাই বলিয়াছেন যে, জাতীয় জীবনের সম্যক্ পরিণতির কালে সুসভ্য-জাতির মধ্যেও কদাচিৎ এরূপ মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, সুযোগ্য সম্পাদক একটু বিস্তৃতভাবে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশ করিবেন। সেই সঙ্গে বঙ্কিমবাবু পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট কি অংশে ঋণী এবং তাঁহার পরশ পাথর প্রতিভাস্পর্শে কিরূপে বিলাতী তাম্র দেশী সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে, তাহারও আলোচনা করিবেন। সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইলেও উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কাব্য দর্শন আলোচনা কালে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যত দিন বাঙ্গালী জাতি বা বাঙ্গালা ভাষা সজীব থাকিবে, ততদিন তাঁহার উপন্যাসের বিলোপ নাই। কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায় যে, বঙ্কিমবাবু ইদানীন্তন আপন উপন্যাসের তত পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, ইহাতে তাঁহার শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার ঘটিয়াছে। ইদানীং তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা ও সনাতন ধর্ম্মের জীর্ণসংস্কার। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য যে, সকল কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গেল। সরকারী চাকুরীতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি অনেক কথা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা আর বলা হইল না।

সর্ব্বতোমুখিতা বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার অসাধারণ লক্ষণ। কবির কল্পনাসৃষ্টি দার্শনিকের বিশ্লেষণী সমালোচনী সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহার প্রতিভায় মিলিত দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, পঠদ্দশা হইতেই এ বিষয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইতিহাস, গণিত, সাহিত্য তিনি সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুখের বিষয় যে অনেকের মত ইস্কুলেই তাঁহার কীর্ত্তির অবসান হয় নাই।

মানবচরিত্রাভিজ্ঞান বঙ্কিমবাবুর উৎকৃষ্ট ছিল। সামাজিক লক্ষণ পরিচয়েও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। জাতীয় চরিত্র সংহত-বুদ্ধির প্রকৃতি, মিশ্র জীবনের গূঢ়েঙ্গিত তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির অতীত ছিল না।

বঙ্কিমবাবুর প্রকৃতির এক প্রধান লক্ষণ স্বাতন্ত্র্য—বাঙ্গালাদেশে এ পদার্থের বড় অসদ্ভাব। কি দেশী কি বিদেশী, সকলের কাছেই তিনি সমান স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিতেন।

নেশান সম্পাদকের মতে ঘটনার বশে বঙ্কিমবাবুর চাকুরী গ্রহণে কোনও অনিষ্ট সংঘটন হয় নাই। ইহাতে তাঁহার অর্থাভাব দূর হইয়াছিল, এবং উদ্দাম প্রতিভার যে উচ্ছৃঙ্খল রচনা-উদ্গীরণ, তাহা সংযমিত হইয়াছিল। ইংরাজিতে যাহাকে Pot-boiler বলে, সেরূপ উপন্যাসাদি প্রকাশিত করিতে হয় নাই। এ কথার আংশিক যাথার্থ্য অবশ্য স্বীকার করি। মহাকবি গেটে স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সকল সাহিত্যসেবীর এক একটা নিয়মিত কার্য্য থাকা ভাল। কিন্তু যে অমৃতময়ী লেখনীমুখে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি রচিত

হইয়াছে, তাহা যে খড়-চুরি মোকদ্দমার রায় লিখিয়া ভোঁতা, হইয়াছে, এ খেদ আমরা কোথায় রাখিব, যে ক্ষুরধার বুদ্ধি ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা যে উকীল মোক্তারের যৎকিঞ্চিৎ সওয়ালজবাবের মহিমা অনুধ্যানে ব্যাপৃত হইত, ইহা আমাদের সামান্য আক্ষেপের কথা নহে। এই শক্তি, এ প্রতিভা, যদি শুধুই সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত হইত, তবে আমাদের আজ ভাবনা কি ?

অতঃপর নেশান সম্পাদক বাঙ্গালীর যে বাঙ্গালাতেই কাব্য নাটকাদি প্রণয়ণ করা উচিত, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এ মতের আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আমাদের মতে রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্ন আর কিছুই ইংরাজিতে লিখিত হওয়া উচিত নহে; দর্শন বিজ্ঞানও নহে। বঙ্কিমবাবু ইংরাজিতে গ্রন্থ রচনা করিলে আজ নগণ্য হইয়া থাকিতেন, কিন্তু বাঙ্গালা লিখিয়া তিনি সাহিত্যের শীর্ষস্থানে বসিয়াছেন।

নেশান সম্পাদকের মতে বঙ্কিমবাবু প্রধান হইলেও সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালী নহেন। কাব্যে মধুসূদন এবং প্রত্নতত্ত্বে রাজেন্দ্রলাল তাঁহার ঊর্দ্ধে। কিন্তু উপন্যাসে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে। আর দার্শনিক আলোচনায় তাঁহার সমান হইতে পারে কে আছে ? ভারতের অতীত সভ্যতার ভূত ইতিহাস তিনি যেরূপ রচনা করিতেন, সেরূপ আর কাহারও কাছে আশা করা যায় না। রমেশবাবুর ইতিহাস বিলাতী গবেষণা, ইংরাজী ছাঁচে ঢালা। ইহাতে কাহার মন উঠিবে ?

স্বাতন্ত্র্য বা জাতীয়তা না হারাইয়া বাঙ্গালী কিরূপে ইংরাজি শিক্ষার উপকারিতা লাভ করিতে পারে, বঙ্কিমবাবু তাহার আদর্শস্থল। তাঁহার মত কে ইংরাজি সাহিত্যের অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিয়াছে ? তাঁহার রচনা অনেক স্থলে ইংরাজি ভাবে পূর্ণ। কিন্তু কয় জন তাঁহার মত স্বতন্ত্র ও জাতীয়তাময় ?

ধর্ম্ম ও সামাজিক মত সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতালাভ করিবার পূর্ব্বেই, বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব অনুক্রমণিকা মাত্র। নেশান সম্পাদকের মতে, তিনি কিছু দিনে হয় Theosophist, না হয় Positivist হইতেন। আমাদের মনে হয় যে, বঙ্কিমবাবুর Positivist হওয়া কোন ক্রমে সম্ভব হইত না। যোগ না মানিলেও বঙ্কিমবাবু হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্মে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। বোধ হয় আর কিছু দিন বাঁচিলে গীতার পূর্ণ ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। সংক্ষেপে বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মমত গীতার অনুরূপ বলিলে বলা যায়। Theosophyর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। ধর্ম্মকে অনুশীলনের অপর নাম বলাতে, নেশান সম্পাদক কিছু আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, অনুশীলন আত্মগত, ধর্ম্ম পরগত। অনুশীলনে আত্মোন্নতি, ধর্ম্মে অপরের ভাবময় ভক্তিময় উপাসনা। বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মে এই ভাব, ভক্তির অভাব। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, সাধ্যসাধনভেদে অনুশীলন ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইলেও, মূলতঃ তাহারা একই। আর বঙ্কিমবাবুর প্রচারিত অনুশীলনের মুখ্যসাধন নিষ্কাম ভক্তি, অর্থাৎ সকল বৃত্তির অফলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরমুখিত্ব। অতএব ভক্তিভাব তাঁহার ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত নহে। তাঁহার আদর্শ ধার্ম্মিক প্রহ্লাদ—যিনি কৃষ্ণনামের আদ্য অক্ষর চক্ষে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। অতএব নেশান সম্পাদক যাহাকে white heat of ecstasy বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই নিষ্কাম ভক্তির বড় একটা প্রভেদ নাই।

সাহিত্য; ১৩০০

"বাঙ্গালা—হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান একক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূণ্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৬)

বাঙ্গালায় নবেলসাহিত্যের ও মাসিকসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি তার অপেক্ষাও বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালাসাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ. করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরূপ হন নাই। বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিষ বাঙ্গালাদেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই; তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙ্গালাভাষাকে স্নান করাইয়া তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেব দেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতসাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি; তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্ররক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; জীবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের শেষভাগের প্রত্যেক কার্য্যই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্য্য-মণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বঙ্গদর্শন,

"অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবন্ধের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৭)

বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের পঠদ্দশার শেষভাগে পরিচয় হয়। তখন আমরা বাঙ্গলার ভঙ্গি বুঝিতে পারি, ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারি, কোনটা পথ, কোনটা অপথ, কোনটা কুপথ, একটু একটু চিনিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা পাইয়া আমার মনে পড়ে, আমি প্রথম দিনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম।

* * * *

যখন টেকচাঁদ ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গলাকে বর সাজাইয়া সভাতে উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া বোধ হইল। বঙ্কিমবাবু যখন স্বয়ং বরবেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকেই উপযুক্ত সৎপাত্র বলিয়া বোধ হইল। পাত্র মিলিল দেখিয়া, সেই আহ্লাদেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। পরে দেখা গিয়াছে, আমাদের সেই আহ্লাদ বালকের আহ্লাদ হয় নাই। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতারিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার নানারূপ সেবা করিয়াছেন, বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং এক ভাষার গুণে বাঙ্গালীকে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছেন।

* * *

আমাদের কলিকাতার কলেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের "কপাল কুণ্ডলা" প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূণ্য, অথচ রসপরিপূর্ণ, বিন্দুভাবে অস্থি-মজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রত— কাব্যগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র "কপালকুণ্ডলা" লিখিলেই, কপালকুণ্ডলার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা যৌবনের সেই ভাবোদ্বেগ অবস্থায়, সংসার প্রবেশের সেই প্রথম উদ্যমে এই অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায়, বাঙ্গালীর লেখায় পাইয়া একেবারে চরিতার্থ হইলাম।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

—(বঙ্গভাষার লেখক)

---

(৮)

সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্র, যোগেন্দ্র, রমেশ—বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার প্রভা। সঞ্জীব বাবু, বঙ্কিম-রবি প্রতিফলিত চন্দ্রালোক। চন্দ্রনাথ বাবুর "শকুন্তলাতত্ত্ব,' বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্বোধিত। তাঁহার হিন্দুত্ব ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের ব্রাহ্মণত্বে জীবিত। চন্দ্রশেখর বাবুর উদ্ভ্রান্ত প্রেম, বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তর দপ্তরের একখানি মাত্র কাগজ পরিবর্দ্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ সুরের মধ্যে একটী সর মাত্র গীতিপুঞ্জে দীর্ঘীকৃত, কলকণ্ঠে মধুরনাদিত। অক্ষয় বাবু 'বঙ্গদর্শনে,' নবজীবনে,' 'সাধারণীতে' বঙ্কিমবাবুর মেধাবী শিষ্য। রবীন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও সহজ করিয়া লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর কবিত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, সুন্দরে সুন্দরে মিশ্রিত করিয়াছেন! রমেশ বাবুর 'বঙ্গবিজেতা' বঙ্কিম বাবুর উৎসাহে লিখিত। যোগেন্দ্র বাবুর আর্য্যদর্শন বঙ্গদর্শনের অনুযাত্রী। আমাদিগের দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিম তাঁহাদিগের সাহিত্য জীবনের প্রকৃতি বা জন্মদাতা, তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি।

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

---

(৯)

উত্তরচরিত পরীক্ষা করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু আলঙ্কারিকগণকে অত্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে উঁহারা যেভাবে কাব্য বা নাটক বুঝাইতে চান, সেভাবে কাব্য নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, "পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি, অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কিনা, ইহা রূপক—কি উপরূপক, নাটক কি প্রকরণ, ব্যায়োগ কি ত্রোটক, ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য্য কি, এ সকল তত্ত্বের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত নহি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ, যে অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি একেবারে বিস্মৃত হউন। নচেৎ নাটকের রস গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি—এই কবির সৃষ্টির মধ্যে কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না। পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে আমাদের অনুবর্ত্তী হউন।" অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু এদেশে চলিত কাব্যপরীক্ষা একেবারে ত্যাগ করিয়া ইউরোপের নূতন ধরণের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জয় জয়কার হইল। বাস্তবিকও একটা পুরাণ, পচা, একঘেয়ে সরুকাটা উপায় ত্যাগ না করিলে তখন কাব্যের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপায়ই ছিল না, এবং এইরূপে ত্যাগ করিতে বলায় বঙ্কিমবাবু যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, আপনার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং দেশের যথেষ্ট উপকারও করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তিনি বঙ্গবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু এই বিয়াল্লিশ বৎসরে সংস্কৃত অলঙ্কারের অনেক প্রাচীন ও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে বঙ্কিমবাবু আধুনিক আলঙ্কারিককে যত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা তত নিন্দার পাত্র নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যশাস্ত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া যথেষ্ট গুণপণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমার এখন এই ধারণা হইয়াছে যে, নব্য আলঙ্কারিকেরা পিঁজিয়া পিঁজিয়া যেখানে যে ছোট বড় গুণটি, দোষটি, অলঙ্কারটি ও রসটুকু থাকে, তাই দেখাইয়া দিতে খুব মজবুত। প্রাচীনেরা ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু পারিতেন। তাঁহারা গল্পটি কিরূপে সাজাইতে হয়, সে সম্বন্ধেও পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। রস ও ভাব কিরূপে ধীরে ধীরে ফুটাইতে হয়, তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নারায়ণ, ১৩২৩।

কাব্যের শ্রেণীবিভাগ—"ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য কাব্যের আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটী শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা—১ম দৃশ্য কাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি, ২য় আখ্যান কাব্য অথবা মহাকাব্য। রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপাল বধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য় খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(১০)

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি হিসাবে পেট্রিয়ট ছিলেন। তিনি সমাজের মঙ্গলকামী কবি ছিলেন। তিনি সমাজকে ইউরোপের আদর্শে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গড়িতে কখনও চেষ্টা করেন নাই। তিনি Iconoclast পুরাদস্তুর ছিলেন না; Ecclecticism এরও তিনি ষোল আনা সমর্থন করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে আচার-ব্যবহারগত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্ত্তনকে দেশের ও জাতির প্রকৃতির অনুকূল করিয়া পরিচালিত করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই কর্ত্তব্য। কম্‌টির পজিটিভিজম্ তাঁহার মনীষার উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, প্রতিবেশ প্রভাব আমরা এড়াইতে পারিব না; আমাদের অতীতের ইতিহাস এবং তজ্জন্য শ্লাঘাবুদ্ধি আমরা পরিহার করিতে পারিব না, আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং যে উপায়ে জাতিকে ধরিতে পারি, জাতির নিম্ন স্তরগুলিকে টানিয়া, সঙ্গে করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি সেই উপায়ই আমাদের অবলম্বনযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় প্রাদেশিকতার ভাবটা সর্ব্বপ্রথমে ফুটাইয়া তোলেন। তিনি অনেকবার বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বাঙ্গালী প্রথমে নিজেকে চিনিতে শিখুক, নিজের জাতির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিতে পারুক, তবে সে গোটা ভারতবর্ষের চিন্তা করিতে পারিবে ও জানিবে। কবি রঙ্গলাল হইতে হেমচন্দ্রের প্রথম দশা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক কবিগণ গোটা ভারতবর্ষ লইয়া দেশহিতৈষণা বা দেশাত্মবোধের চর্চ্চা ক'রতেন। তখন বাঙ্গালার কবি রাজস্থান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, পুরাণেতিহাস লইয়া দেশগীতি গান করিতেন। তখন বাঙ্গালার ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচন হয় নাই, তখন বাঙ্গালী ইংরেজের দেওয়া কাপুরুষতার দুরপনেয় কলঙ্কলেপে কলঙ্কিত ছিলেন। এ কলঙ্ক ভঞ্জনের চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গলার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিত মাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙ্গালিদের পরিচায়ক, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বাঙ্গালী, দেবীচৌধুরাণী বাঙ্গালী কুলাঙ্গনা, সীতারাম বাঙ্গালী ভৌমিক, চন্দ্রচূড় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন।

এই তিনখানি উপন্যাস বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের ত্রিপদ বেদী।

আনন্দমঠে তিনি ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবে সমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে শক্তিকে সর্ব্বসিদ্ধির আধারভূতা করিয়া বঙ্গীয় মানবতার উন্মেষ সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন; সীতারাম উপন্যাসে শক্তিবিরূপা হইলে, পুরুষ মোহান্ধ হইলে, কেমন ঝাড়া ভাতে ছাই পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিদের শ্লাঘা ও অপকুব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।

মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদিরসের মহাকবি। তাঁহার সকল উপন্যাসেই আদিরসের নানা অবস্থাগত বিশ্লেষণ আছে। তিনি বাঙ্গালার ইংরেজি-নবীশ বা উদ্ধত নায়কনায়িকাই ভাল করিয়া আঁকিয়াছেন, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সখা অন্য কোন ভাবের কথাই ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই।

বিলাতের যে আদিরসের Romanticism বায়রণ হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। শেষের তিনখানা উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও তিনি আদিরসের হাত এড়াইতে পারেন নাই। আদিরসের মৈনাকের উপর তাঁহার অনেক ভাবের নৌকা ফাঁসিয়া গিয়াছে। যেন তিনি বাঙ্গালীকে বার বার বলিয়াছেন যে, এই আদিরসের গুপ্ত পর্ব্বতের সংঘাতে তোমার তন্ত্র ধর্ম্ম, তোমার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম—তোমার সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যদি ইউরোপের আদর্শে দেশাত্মবোধের অর্ণবযান বাঙ্গালার ভাবের লহরের উপর ভাসাইতে হয়, তাহা হইলে সাবধান আদিরসের চোরা বালির উপর, ডোবা পাহাড়ের উপর দিয়া নৌকা চালাইও না; পূর্ব্বেকার অনেক সাধের সামগ্রীর মতন উহাও ফাঁসিয়া যাইতে পারে। ভবানন্দের কল্যাণীর রূপে মোহ, দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের প্রতি মোহ ও ঘর-গৃহস্থালীর প্রতি অনুরাগ, সীতারামের শ্রীর জন্য উন্মত্ততা, শ্রীর ভ্রাতার—গঙ্গারামের রমার রূপে মোহ,—এ সকলই উদ্ভট হইলেও, ঐ এক কথাই বুঝাইতেছে,—ঐ রিরংসার হলাহল বিস্তারের পথ ও প্রণালী দেখাইয়া দিতেছে। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় dramaকে নষ্ট করিয়া, উৎকটের আশ্রয় লইয়া উপদেশের সার্থকতা সাধনে অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি যে situation সৃষ্টি করিতে যাইয়া এতটা প্রমাদ করিবেন, ইহা ত বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক ইতিহাস কথা ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতটা প্রচারিত হয় নাই। তিনিই বরং বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে ও বুঝিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার অনেক বিস্মৃত কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার নারী চিরদিন এমন বিহ্বলা ও অবলা ছিল না। তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার অধ্যাপক-গৃহিণী স্বামীর অনুপস্থিতিকালে ছাত্রদের ন্যায় ও অলঙ্কারে পাঠ দিতেন। তিনি ত বাঙ্গালার ভৈরবী দেখেন নাই, এমন কি বাঙ্গালার শেষ ভৈরবী বিন্দুবাসিনীকেও দেখেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরের মেয়েরা এখনকারমতন কাপড় পরিত না; তাহাদের অনেকের হিন্দুস্থানী বা দাক্ষিণাত্যের ঢঙের কাপড় পরা ছিল। এখনকার কাপড়পরা ইংরেজের আমলের কিছু পূর্ব্ব হইতে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে যে সত্যই লড়াই করিতে পারিত, পাঠানদের সহিত লড়াই করিয়াছিল, রঘুডাকাতকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে সব খবর তিনি ঠিকমত জানিতেন না। অর্থাৎ এ সকল সমাচারকে তিনি historical truth বলিয়া গ্রহণ করিবার অবসর পান নাই। ডেপুটী ম্যাজেষ্টরী চাকরী করিতে করিতে বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহাকে ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেকের মুখে অনেক গালগল্প, অনেক কিম্বদন্তী তিনি শুনিয়াছিলেন। তাহারই উপর স্বীয় অপূর্ব্ব কল্পনা চড়াইয়া তিনি শান্তি, শ্রী, নন্দা, প্রফুল্ল প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন। ঐ সকল চিত্র ঠিক বাঙ্গালার নহে; অথচ উহাদের উপরে বাঙ্গালিত্বের মোটা গালার রঙ, বেশ জোর করিয়া বসান আছে। শ্রীকে বা শান্তিকে দেখিলে মনে হয়, যেন উহারা বাঙ্গালার ভৈরবী, বাঙ্গালার কুলাঙ্গনা; অথচ একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় বাঙ্গালায় এমন চরিত্র ফুটিবার নহে; তথাপি কিন্তু উহাদের উপর এমন একটা বাঙ্গালীয়ানা মাখান আছে, যাহার মোহ এড়ান যায় না; এইভাবে কতকটা কাল্পনিক, কতকটা আধুনিক উপাদান লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষের তিনখানা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

নানাভাবে অনুশীলন তত্ত্বটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম চন্দ্র এই তিনখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। অনুশীলন তত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউরোপের সামগ্রী। জর্ম্মণ পণ্ডিত ফিক্‌তের (Fichte) Individual and Communal Culture ব্যষ্টি এবং সংহতির অনুশীলনটাই, তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির

নাটক—"অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রিত করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর গল্প রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃ প্রকৃতি দ্বারা অন্তঃ-প্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনেই নাট্যকারের প্রধান কার্য্য।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রলেপ দিয়া, বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে। উহা যেন বিলাতের Lake Poets দিগের Susquehanna প্রদেশে Utopia সৃষ্টির জন্য আদর্শ,—প্রটেষ্টাণ্ট Monk দিগের অনেকটা অনুরূপ। গেরুয়াও থাকিবে এবং ঘরে পত্নীও থাকিবে, ব্রত উদ্‌যাপনের পরে সে পত্নীকে লইয়া ঘর করিবার আশা, তুষানলের মতন হৃদয়ে সদা জ্বলিতে থাকিবে, এমন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ছিল না হয় নাই। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাহারা শক্তি রাখিত বা শৈব বিবাহ করিত তাহারা গেরুয়াবসন পরিত না, রক্তাম্বর ধারণ করিত। গৌড়ীয় ভেকধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে গৈরিকের প্রচলন নাই; উহারা গেরুয়া বা রক্তবস্ত্র পরিধান করিত না। এই সস্ত্রীক সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটু গোলে পড়িয়াছিলেন। সে গোল শান্তির জবরদস্তি, ভবানন্দের কল্যাণী-মোহ আদি উদ্ভট ব্যাপারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য মনীষা বুঝিয়াছিল যে, তেলে জলে মিশ খায় না; পত্নীও থাকিবে, অথচ স্বামী ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিবে; আর পত্নী জাগান দেওয়া আমটির মতন পাতায় ঢাকা হইয়া চিরজীবন কাটাইবে—অন্ততঃ যৌবনটা কাটাইয়া দিবে—এমন অঘটন ঘটাইতে হইলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী উভয়ের পতন—ব্রতভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। গৃহানুরাগ বা domesticity বজায় রাখিয়া বাঙ্গালীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন চিত্র পূর্ণাঙ্গ করা যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেখাইয়াছেন যে সমষ্টির কল্যাণসাধন করিতে হইলে ব্যষ্টি ব্যক্তিবিশেষের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। যখন আনন্দমঠ রচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে জর্ম্মণ জাতির সমন্বয় বা ভলভরীণ হইতে National Cohesiveness বা জাতিসংহতি লইয়া ইউরোপ এবং আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ফলে একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কার্ডিন্যাল নিউম্যান এপক্ষে অনেক কথা সে সময়ে কহিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয় যে, আনন্দমঠের গড়নেন নিউম্যান-ভাবের মশলা অনেকটা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখিয়া বাঙ্গালীকে এই কথাটা যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইউরোপের ভোগপ্রচুর শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জাতির মঙ্গলকামী কর্ম্মী হইতে হইলে দেশীয়ভাবে ত্যাগী হইতে হইবে। তেমন কর্ম্মীকে সর্ব্বাগ্রে এমন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, যাহা দেখিলে বাঙ্গালার আপামর সাধারণে চিনিতে পারে, এবং চিনিয়া স্বেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিতে পারে। এইটুকু ইসারা করিয়া গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জর্ম্মণ জাতির প্রসারিত সমাজতন্ত্র ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইতেছে বলিয়া আনন্দমঠের সন্ন্যাসী না পূরা তান্ত্রিক, না পূরা বৈষ্ণব। উহারা মানুষও মারিতেছে, আবার "ধীর সমীরে যমুনাতীরে" গান করিতেছে। উহাদের তান্ত্রিকী সাধনা নাই, বৈষ্ণবের জপযজ্ঞ এবং কীর্ত্তন আনন্দও নাই। উহারা পরোপকার করিতেছে কোম্পানীর মাল লুঠিয়া কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীকে খুন করিয়া উহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকে ক্ষুধার অন্ন দিতেছে। পরোপকারের এমন উৎকট আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে নাই, ধর্ম্মে নাই; বিশেষতঃ কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস ধর্ম্মে নাই। কারণ আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর আদর্শের তলায় বিলাতী পেট্রিয়টিজম্ আছে, ইউরোপের outlawryর মোহন অংশটুকু অঙ্কিত আছে। এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাঠামর frame-work) উপর বঙ্কিমচন্দ্র এক অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ কাব্যে বৈষ্ণবের মাধুরী আছে, তান্ত্রিক শাক্তের তেজস্বিতা আছে এবং আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের Idealismএর মোহ আছে। এই তিনের সমবায়ে মঠের গল্পটা খুব জাঁকাল হইয়াছে বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত বাক্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। হয়ত বা অন্য নানা কারণে তিনি ইচ্ছা করিয়া তাহা ফুটান নাই। তাই আনন্দমঠের অনেক কথা ঢাকা আছে; সেই কারণ উহার নাট্যাংশ ও উপদেশাংশ উভয়ে উভয়ের অনুবাদী (complementary) হয় নাই। আনন্দমঠে জীবানন্দ ও

গীতিকাব্য—"গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

শান্তিই কেন্দ্রচরিত্র। এই দুই চরিত্র যেভাবে ফুটান হইয়াছে সেভাবে চরিত্রোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত কথাগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে সত্যানন্দকে আনিয়া সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে; অনেক কথা মহাপুরুষের উপর বরাত দিয়া রাখা হইয়াছে। আনন্দমঠের মহিমা চরিত্রোন্মেষে নহে, চিত্রাঙ্কনে নহে, উহার মহিমা "বন্দে মাতরম্" গানে এবং মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শনে। শক্তি-প্রতিমাকে কেমন ভাবে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে আনন্দমঠে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাই আনন্দমঠের বিশিষ্টতা।

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনুশীলন তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ পরিস্ফুট। দেবী চৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবী চৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্ত্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে; অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণবঠাকুরাণী। যখন শক্তি-মূর্ত্তি তখন পুরুষ সম্মূঢ়; ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে সম্মূঢ়, প্রফুল্লর রূপে সম্মূঢ়। এই পুরুষের তৃপ্তি-তুষ্টি সাগর বৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বৌ এবং ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী। প্রফুল্লকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী করিতে যাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন। প্রফুল্লকে একরাত্রির জন্য স্বামী-সঙ্গে সুখী করিয়া কবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পথে একটা কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা—ঘর সংসার দেখা। যেমন কর্ম্মী তেজস্বী ব্রাহ্মণ ডাকাতের হাত দিয়া কবি দেবীরাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোনা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কবি প্রফুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ-ভঙ্গী দেখান নাই। যেন প্রফুল্ল আসাতেই নয়ান বৌয়ের ঝগড়া থামিল, সাগর বৌয়ের অভিমান দূর হইল, আর ব্রজেশ্বর যেন "নিত্য সর্ব্বগত স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" পুরুষের হিসাবে, প্রফুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রফুল্ল, সাগর ও নয়ান বৌ—এই তিন গুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই তিনের সমাধান করিলেন প্রফুল্ল, সংসারে একটা negative সুখের বা স্বস্তির লহর তুলিলেন প্রফুল্ল, ফলভোগী হইল ব্রজেশ্বর। এই টুকুর জন্য প্রফুল্লকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান সবই শিখিতে হইল, কুস্তী করিতে হইল, লাঠি খেলিতে হইল, নানা ভঙ্গীতে ত্যাগের মক্স করিতে হইল, দেবীরাণীর দোকানদারী বসাইতে হইল, ডাকাতের দলের সর্দ্দার হইতে হইল! ভবানী পাঠকের গুরুগিরির পর্য্যাবসান হইল সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থালীর কার্য্যে—বাসনমাজায় ও সপত্নী বশীকরণে। আদিরসের কবি আদিরসটুকু ভুলিতে পারেন নাই, domesticityর লোভটুকু সাম্‌লাইতে পারেন নাই। এতটা শিক্ষার পরেও প্রফুল্ল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তান্ত্রিক মতে শাক্ত ভৈরবী হইতে পারেন নাই। ঝান্সীর রাণীর বা রাণী দুর্গাবতীর বা বাঙ্গালার সোনা বিবির এত শিক্ষা হয় নাই, তথাপি তাঁহারা শক্তিরূপিণী ছিলেন, অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বহুগ্রামে অপূর্ব্ব শক্তিশালিনী ও সংযমপরায়ণা বহু ভৈরবী ও বৈষ্ণবী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের আদর্শও প্রফুল্লের পরিণতি অপেক্ষা অতি উচ্চ স্তরের। গীতার হিসাবে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাইয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মের ছবি আঁকিলে ব্রজেশ্বরেও প্রফুল্লর স্বামী-বোধ থাকিবে না; ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশালতায় মিশিয়া যাইবে। তাই প্রফুল্ল-চরিত্র একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়; উহাকে শাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনের মাপ-কাঠিতে মাপিলেও পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ব্রজেশ্বরে শিবত্বের আরোপ করিয়া প্রফুল্লকে শক্তিরূপে খাড়া করিতেন, তাহা হইলে ব্রজেশ্বর চিত্র অন্য প্রকারের হইত, প্রফুল্লও আরও একটু ফুটিত। অথবা যদি প্রফুল্লকে বৈষ্ণবী সাজাইতেন তাহা হইলে উহাতে হয় সুভদ্রার নহেত রুক্মিণীর ছায়া পড়িত। দুইয়ের কোনটাই প্রফুল্লে পরিস্ফুট হয় নাই। এত

উপন্যাস ও ইতিহাস—"ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস লেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

করিয়াও যখন প্রফুল্লের স্বামীর ঘর করিবার আকাঙ্ক্ষা ঘুচে নাই, যখন সাগর বৌকে বজরায় ডাকিয়া রঙ্গভঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই, তখন প্রফুল্লে নিষ্কাম ধর্ম্মের, গীতাতত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ গীতার সিদ্ধান্তসকলের ছড়াছড়ি দেবীচৌধুরাণীতে করা হইয়াছে। সাধক ভবানী পাঠকের আলেখ্যে কোন বিষম দোষ দেখি না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রজেশ্বরের মতন পিতৃভক্ত বাঙ্গালী যুবক অনেক ছিল, ব্রজেশ্বরের জনকের মতন বিষয়ী বাঙ্গালী কর্ত্তা ব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, সাগর বৌ, নয়ান বৌ যে দুই একটা দেখি নাই তাহা নহে; কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অপূর্ব্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙ্গালীয়ানা মাখান। উহা বাঙ্গালীর ঘরে কখনও ছিল না, বাঙ্গালীর ঘরে কখনও হইবে না। যে উদ্ভটতা শান্তিতে আছে, সে উদ্ভটতা প্রফুল্লেও ফুটিয়াছে। কোনটা বাঙ্গালার নহে, ভারতবর্ষের নহে, অথচ, কোনটাকেই বাঙ্গালিত্বের গণ্ডী হইতে বাহিরে রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এইটুকুই কারিগরী—এই টুকুই শিল্প-নৈপুণ্য।

সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবীচৌধুরাণীর obverse proposition solve বা কতকটা বিরোধী ভাবের ব্যঞ্জনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট; সীতারাম রায় কর্ম্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা এবং রমা। শ্রী যেন ঐশ্বর্য্য, নন্দা যেন হ্লাদিনী, রমা যেন স্ত্রী বা মোহিনী। রাজার রাণী যেমন হইতে হয়, ঘরণী-গৃহিণী যেমন হইতে হয়, নন্দা তেমনই। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমতী, স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা, স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষায় সদা নিরতা; বাঙ্গালার গৃহস্থ কুলাঙ্গনার এক দিকের একটা আদর্শ নন্দা। রমা যেন মোমের পুতুল, সোহাগের খুঁচি, যেন আদিরসের মঞ্জুষা; স্বামীর সোহাগে সদাই যেন গলিয়া পড়িতেছেন; স্বামীর মহত্ত্বে বা গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার শক্তি নাই, স্বামীকে লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি বেশ আছে। ফলে, রমা সদা ভীতা ও সঙ্কুচিতা; সে স্বামীকে পাইলে পুতুল খেলা খেলিতে ভালবাসে, স্বামীর রাজাগিরির, দেশাত্মবোধের কোন ধারও ধারে না। এমন চীনের পুতুল, মোমের খেলনা, রাজা-বাদসা ধনীর ঘরে অনেক পাওয়া যায়। ইহাতে অস্বাভাবিকতা নাই। কিন্তু শ্রী—সে কেমন নারী! প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার আশঙ্কায় শ্রী স্বামীবর্জ্জিতা; সে বর্দ্ধনকালে, কিশোর বয়সে তাহার কেমন শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল তাহার কোন পরিচয় গ্রন্থকার দেন নাই। শ্রী ফুটিল গঙ্গারামের রক্ষা ব্যাপারে, দ্বিদণ্ড বটশাখায় দাঁড়াইয়া লোক সমাহরণে ও উৎসাহ দানে শ্রী ফুটিয়া উঠিল—বিদ্যাবিলাসের মত ভ্রাতা ও স্বামীর প্রাণ সংশয় বুঝিয়া একবার শ্রী বাঙ্গালীর মেয়ের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর শ্রী একটা প্রহেলিকা; সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে, কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ীর টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামী-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে। অথচ যখন সীতারাম তাহার দ্বারস্থ, তাহার জন্য পাগল, সে পাগলামীর ফলে রাজ্য যায়, স্বাধীনতা যায়, তখন শ্রী পাষাণী। এই পাষাণ ভাবটাই সীতারামের পুরুষকারের তাসের ঘর শেষে ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীকে allegory বলিতে পারি না কারণ allegoryর হিসাবে শ্রীর চরিত্রোন্মেষ ঘটান হয় নাই। শ্রী একটা abstractionও নহে, কারণ অমন ভাবে abstraction ফুটিয়া উঠে না। সীতারাম হেন পুরুষ,—যে দেশের জন্য, জাতির জন্য পাগল, যে স্বীয় পুরুষকারের প্রভাবে অঘটন ঘটাইয়াছিল, যাহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান মামুদাবাদ ও ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা,—তেমন একনিষ্ঠ সাধক এমন মোহে পড়িবে কেন? একনিষ্ঠার এমন পরিণাম হয় না। যাহার

সংস্থান—"যে সকল অবস্থা বিশেষে নায়ক নায়িকগণকে সংস্থাপিত করিলে রসবিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি।

ইহাতে নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার বা নাটককার কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সংস্থানই রসের আকর।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

একনিষ্ঠা আছে, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে, নিশ্চিন্ত না হইলে, তাহার মন অন্য দিকে যাইবে না। সীতারাম বিপদ্বেষ্টিত হইয়াও পতঙ্গের ন্যায় শ্রীর রূপে পুড়িয়া মরিল। শ্রীইবা এমন কোন দেশের ভৈরবী যে, ধর্ম্মরাজ্য ছারেখারে যাইতেছে দেখিয়াও টলিল না, সর্ব্বনাশ করিয়া তবে বাহির হইল! এমন allegory আমি বুঝিতে পারিলাম না। সাধনশাস্ত্রের মাপকাঠিতে ইহা বুঝি না, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের মাপকাঠি লইয়া ইহার পরিমাণ করিতে পারি না। তাহার পর গঙ্গারাম ও রমা—এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। গঙ্গারাম শ্রীর ভাই, সুতরাং শ্রীর সপত্নীর ভ্রাতৃস্থানীয়। গঙ্গারাম সীতারামের কৃপায় সব পাইয়াছিল; জীবন, পদ, ঐশ্বর্য্য, মান-সম্মান, তাহার ইহজীবনের সর্ব্বস্বই সীতারাম-দত্ত। সেই গঙ্গারাম নগরপাল, অবশ্যই বীর ও যোদ্ধা! নগরপালের হিসাবে, শ্রীর ভাইয়ের হিসাবে, রমা তাহাকে ডাকিতে পারে। তাই বলিয়া গঙ্গারামকে সহসা রমার রূপে পাগল করিয়া তুলিতে কোন আদিরসের কবি পারেন না, সাহসে কুলায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে লাভ হইল কি? সিদ্ধান্তবিকাশের পক্ষে উহা সহায়তা করিল না, আদর্শ ফুটাইবার পক্ষে উহা কাজে লাগিল না, ক্ষেত্রের মার্জ্জনা পক্ষে উহার কোন প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের প্রেম এবং শ্রীর প্রতি সীতারামের মোহ যেন allegoryর হিসাবেও ঠিক খাপ খায় না। অথচ এই উপন্যাসের এই দুইটি ঘটনাই মহাপ্রাণ; গল্পটা এই দুইটি ঘটনার উপরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পের Tragedy এই দুই ঘটনা হইতেই পরদায় পরদায় খুলিয়াছে। ফলে, এই দুইটা ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায় না, বর্জ্জন করা চলে না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, গল্পের বনিয়াদের সহিত এই ঘটনা দুইটি ঠিক খাপ্ খায় না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধের অনেক কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় কতটা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। Artএর হিসাবে তিনখানা উপন্যাসে দোষ থাকিলেও, উপদেশের হিসাবে উহা পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দ্দোষ। সে উপদেশ কথা সেই বুঝিবে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মণীষার শেষ পরিণতি বুঝিয়াছে, যে ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তসকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২০

১০২২

ব্যঙ্গের যোগ্য কি?—"পুণ্য, পাপ বা ভ্রান্তি কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ, ভর্ৎসনা দণ্ড শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ, ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য।

নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থা বিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে, উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ইংরাজী ভাষায় এই দুইটীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। একটীকে Error বলে, আর একটিকে mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ ক্রিয়ার পরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুণ্যের উপযোগী চিত্ত ভাবকে ধর্ম্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজী কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটী ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, folly ও তদ্রূপ।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(১১)

মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে,—"ভারত-কলঙ্ক বা বাঙ্গালার কলঙ্ক" এবং "বাঙ্গালীর উৎপত্তি"। তখনও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস রচনায় আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাঁহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ইতিহাস রচনা করিতেন, তাঁহারা তখনও এই প্রণালীর নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন-উক্তির মতন বলিয়া যান নাই; এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমনি করিয়া সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রকাশের পরে বিশ বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বোধ হয় না। এখনও কোন লেখক এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে, মুসলমানগণ যত সহজে প্রাচীন সিরিয়া বা পারস্যদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষও সেইরূপ অনায়াসে অধিকৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র কোন বিশ্বাস-যোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয় নাই, রাভার্টি'র অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট্‌ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'তাজ্‌-উল-মাসি'র ও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র সারাংশ মাত্রই এতদ্দেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার মুসলমান-বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ১২৮৭ সালে 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—

"সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখ্‌তিয়ার খিলিজী কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সেসকল দেশে কে রাজা ছিল? কি প্রকারে অবশিষ্ট অংশের স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল?"

ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি বাঙ্গালীর বিশ্লেষণ। ১২৮৭ সালের পৌষ মাস হইতে ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার প্রতিপাদ্য বিষয় সাত ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণ বিশুদ্ধ আর্য্যবংশ-সম্ভূত নহেন। "বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্যের শোণিতের এত প্রবল স্রোত বহে না।" তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যত্বাভিমানী বাঙ্গালা-দেশে এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ দান করে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২)

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সর্ব্বাগ্রে দেশের সাহিত্যিক অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই সর্ব্বাগ্রে দেশের রাজনীতিক অভাবও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন দেশে রাজনীতিক আন্দোলন যে প্রণালীতে পরিচালিত হইত তাহার অনুপযোগীতা এদেশের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'লোকরহস্তে' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে লোককে ইহা বুঝাইয়াছিলেন। বিদ্রূপ প্রতিভাবান লোকদিগের অস্ত্র হইলে প্রতিপক্ষ পরাজয়ে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব সংহারে নহে—সৃষ্টিতে, বিসর্জ্জনে নহে—প্রতিষ্ঠায়। সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন অযোগ্যকে নির্দ্দয়ভাবে উন্মূলিত করিয়া যোগ্যকে সাদরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রেও তেমনই অযোগ্যকে বিদ্রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগ্যকে সাহিত্যের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রেম স্বার্থসংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না; ত্যাগে তাহার প্রতিষ্ঠা—সাধনায় তাহার বিকাশ। তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে ভয়-ভীত শবৃত্তি ত্যাগ করিয়া গাম্ভীর্য্য গৌরবান্বিত সিংহবৃত্তি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার মা'র হস্তে ভণ্ডের ভিক্ষাভাণ্ডও নাই, আর বিদ্রোহীর আত্মবিস্মৃত তরবারিও নাই। তিনি 'আনন্দমঠে' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে বুঝাইয়াছেন শারীরিক বলের সাধনা করিতে হইবে; কিন্তু নৈতিক বল—সংযম ব্যতীত শারীরিক বল স্থায়ী কার্য্য করিতে পারে না। 'সীতারামে' তিনি দেখাইয়াছেন, অনাচারের স্পর্শে শারীরিক বলের দুর্গচূড়া বজ্রাহত গিরিশিখরের মত ধূলিবিলুণ্ঠিত হয়; উচ্ছৃঙ্খলতা সাধনার অন্তরায়, সিদ্ধির বৈরী। তিনি বুঝাইয়াছেন, নৈতিক শক্তিসাধনার প্রথম সোপান ত্যাগ, কর্ম্মে আত্মসমর্পণ। তাই তাঁহার "সন্তানগণ" সন্ন্যাসী, মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী-দারা-সুত সর্ব্বত্যাগী। তাহারা সংসারত্যাগী ও ইন্দ্রিয়জয়ী। তাহাদের ব্রতভঙ্গের, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত—"জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ।" যে ধনজন, দারাসুত, এসকলকে ভালবাসে, যে আপনাকে ভালবাসে, তাহার স্বদেশভক্তি অসম্পূর্ণ। এ সাধনায় "জীবন তুচ্ছ"; সাধককে দিতে হইবে—"ভক্তি।" তাঁহার "সন্তানগণ" দুর্দ্দান্ত দস্যু নহে; নিষ্ঠুর নরহন্তা নহে; তাঁহারা সন্ন্যাসী ও সাধক। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, নৈতিক শক্তিসাধনার দ্বিতীয় সোপান সংযম ও পদ্ধতিবদ্ধতা। দেবীর কঠোর শিক্ষায়, সন্তানগণের পরুষ প্রতিজ্ঞায় এবং "দেবীচৌধুরাণী" ও 'আনন্দমঠ' পুস্তকদ্বয়ে বর্ণিত পদ্ধতিবদ্ধ কার্য্যে তিনি ইহাই বুঝাইয়াছেন। নৈতিক শক্তিসাধনার তৃতীয় সোপান স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্মভাবে সমাজ-সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে স্বদেশপ্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইহার আভাস—'আনন্দমঠে' ইহার বিকাশ। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' কর্ম্মযোগের বিচিত্র ভাব বিবৃত। 'কৃষ্ণচরিত্রে' মূর্ত্ত কর্ম্মযোগের চিত্র চিত্রিত। স্বদেশপ্রেমে এই কর্ম্মযোগের পূর্ণ বিকাশ। "বন্দেমাতরম্" গীতে এই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নব্য-ভারতের রাজনীতিক গুরু। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে "নবীন-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী" মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শন। স্বদেশপ্রেম যত দিন কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য, তত দিন তাহা শক্তিহীন; যখন হৃদয়ে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়, তখনই তাহা মানুষকে চালিত করে, তখনই মানুষ তাহার জন্য জগতে আর সব তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখে। যতদিন মাতৃভূমি পর্ব্বত-কিরীটিনী, সাগর-সুশোভিতা ভূমিখণ্ড মাত্র, যতদিন দেশবাসী কেবল মনুষ্য-মণ্ডলী মাত্র, ততদিন স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। যখন মৃণ্ময়ী মা চিন্ময়ীরূপে দেখা দেন, তখন সেই মাতৃমূর্ত্তির দর্শনপুণ্যে মানবের জাড্য-দ্বিধা-সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থান্ধতা অরুণোদয়ে রজনীর অন্ধকারের মত দূর হয়। বঙ্কিম বাঙ্গালীকে ও ভারতবাসীকে সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। তাই যেদিন বাঙ্গালী জাগিল, সেদিন একজনের মুখে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারিত হইতে না হইতে সমগ্র ভারতবর্ষ সেই মন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই মন্ত্রে ভারতবাসীর ভাব প্রকাশের ভাষা পাইল।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২৩।

(১৩)

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তি নয়,—যদিও তিনি খুব প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই-ই।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comte এর Positivism থাকিতে পারে, Europe এর দুর্দ্ধর্ষ Nation-idea থাকিতে পারে, Middle Ageএর সন্ন্যাস থাকিতে পারে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপ-কাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনার অপরিহার্য্য ত্রুটী থাকিতে পারে—পারে কি, হয়ত আছে। কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে—এমন বাঙ্গালী আছে যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

আমি বঙ্কিম-সাহিত্যকে একটা যুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যুগ-সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্—বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে যুগ-সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম সাহিত্যের উপর Europeএর সাহিত্য, দর্শন, ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্য—আত্মস্থ,—সমাহিত, তেজঃপূর্ণ, অথচ প্রশান্ত ও গম্ভীর। ইহা সমুদ্র বিশেষ।

সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক ;—বঙ্কিম ও গিরিশ যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রতিভার বর-পুত্র এই দুই মহাকবিই Europeএর সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও—সাহিত্যের দুইটী বিভিন্নক্ষেত্রে প্রায়ই একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত, বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গলা—এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা সুবিধামত পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই। যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী নাটক নভেলে অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটক-রচয়িতাগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহা দুঃখের বিষয় যে তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা পাইতেছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক,—স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গলায় তাহাই করিয়াছে যাহা ফরাসী দেশে Voltaire Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। এই দিক্ হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায়, আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গলায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত, ফ্রান্সের Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ আপনাদের মধ্যে শীঘ্রই কেহ লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেননা আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গলার Voltaire ও Rousseau.

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।
মহিলা, ১৩৩১

কাব্য-বৈচিত্র্যের কারণ—"যেমন অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদেও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(১৪)

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে কর্‌লেন 'দুর্গেশনন্দিনী', তারপরে 'কপালকুণ্ডলা', তারপরে 'মৃণালিনী',—এই তিনখানিতে তিনি আমাদের বলে দিলেন যে, দেখ তোমরা ইংরাজী বই পড়, বাংলাতেও এ রকম বই হতে পারে। তার চাইতে আর একটু বড় কথা বল্‌লেন যে, তোমরা ইংরাজী নভেলে ইংরাজী সমাজের চিত্র দেখে, সেই Rebeca প্রভৃতি যে সকল ইংরাজ নায়িকা এবং নায়ক তাদের ছবি দেখে তোমরা ভাব, হায়! হায়! আমাদের ঘরে এ রকম Desdemonaও হবে না, এ রকম Rebecaও হবে না, এ যে আমাদের ক্ষমতায় সম্ভব নয়। বঙ্কিম বাবু দুর্গেশনন্দিনী দ্বারা দেখালেন যে, আমাদের ঘরেও ঐ রকম ছবি ফোটাতে পারা যায়। এই যে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী, এই তিন খানিতে তিনি এইটাই দেখালেন যে, বাংলা ভাষার সাহায্যে বাংলার সমাজের যে রীতিনীতি তার কিছু কিছু অবলম্বন ক'রে, তারই আশ্রয়ে রস-সৃষ্টি হ'তে পারে। এইটা দেখিয়ে তার পরের যে তিনখানি, "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "চন্দ্রশেখর",—এই তিন খানিতে আর একটু এগিয়ে এলেন। এখানে যা' দেখালেন তা' কেবল কল্পনাচিত্র নয়। আয়েষা ও তিলোত্তমা—ঐতিহাসিক সত্য হ'তে পারে—আমাদের কাছে কল্পনা; কপালকুণ্ডলা আমাদের কাছে কল্পনা; জেবুন্নেছা আমাদের কাছে কল্পনা; আমরা ত প্রতিদিন এদের সঙ্গে ঘর-কন্না করি না, এদের সঙ্গে চলা ফেরা করি না, দেখি না। কিন্তু "বিষবৃক্ষ"তে "চন্দ্রশেখর"এ এবং "কৃষ্ণকান্তের উইল" এ আমরা প্রতিদিন যে সকল লোকের সঙ্গে চলা ফেরা করি, তাদের নিয়ে তিনি রসসৃষ্টি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। এখন তাঁর রসসৃষ্টিটা বাংলার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ট হ'য়ে উঠল; এখানে আমরা দেখ্‌লাম যে, রসসৃষ্টির উপকরণ বাংলাতেও আছে। যখন সূর্য্যমুখীকে দেখ্‌লাম, কুন্দনন্দিনীকে যখন দেখ্‌লাম, আর হীরাকে যখন দেখ্‌লাম, যখন দেবেন্দ্রকে দেখ্‌লাম, নগেন্দ্র দত্তকে যখন দেখ্‌লাম, চন্দ্রশেখরকে যখন দেখ্‌লাম, শৈবলিনী এবং সুন্দরীকে যখন দেখলাম, আর শ্রীশচন্দ্র এবং কমলমণিকে যখন দেখ্‌লাম,—দেখ্‌লাম একটুকু নূতন রসানের গিলটী তাদের উপরে পড়ছে, তবু এঁরা সকলেই বাংলার জিনিষ। গোবিন্দলাল বাঙ্গালী জমিদার, রোহিণী বাঙ্গালী, ভ্রমর অপূর্ব্ব বাঙ্গালী। এখানেও সেই বাঙ্গালী পেলাম, বাংলার চিন্তা, বাঙ্গলার উপকরণ দ্বারা বাংলার উপন্যাসে। এই তিন খানি করে তিনি আমাদের স্বজাত্যাভিমানকে জাগিয়ে দিলেন; আমরা যে কেউ কেটা, ইউরোপের মত, ইংলণ্ডের মত রস-সৃষ্টির সরঞ্জাম আমাদের মধ্যেও যে আছে, এইটা বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন। তার পরের তিন খানিতে আমরা আর একটুকু ঘনিষ্টভাবে বাঙ্গালীকে পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে। এই তিনখানি—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নয় খানি এই তিন ভাগেতে বিভক্ত—

(১) দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী;
(২) বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল;
(৩) আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী;

এই যে নয়খানি উপন্যাসের তিনটী ভাগ করলাম, এর মধ্যে একটা ঘনিষ্ট যোগ আছে। প্রথম ভাগে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীতে কেবল একটা সার্ব্বজনীন রস-লিপ্সার প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই; ইন্দ্রিয়-ভোগের একটা সহজ স্বাভাবিক চেষ্টা এখানে দেখতে পাই এবং উপরে রসের সৃষ্টি। চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল,

"অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম, হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব-সুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?"—বঙ্কিমচন্দ্র।

এই তিনখানিতে দেখ্‌তে পাই একটা সংগ্রামের সূচনা হয়েছে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মধ্যে, এবং এদের প্রবৃত্তিটাই বেশী। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র দত্তের চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবৃত্তির ইন্দ্রিয়-ভোগলালসা এবং সংযম, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সংগ্রামের সূচনা করেছেন। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী এবং প্রতাপের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইন্দ্রিয়ভোগের লিপ্সা এবং ইন্দ্রিয়-সংযম, এদের মধ্যে একটা সংগ্রামের সূচনা দিলেন। আর কৃষ্ণকান্তের উইলে তিনি এই সংগ্রামটী একেবারে পাকিয়ে তুললেন, গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর চরিত্রের মধ্যে। এই যে সংগ্রাম, ত্যাগ এবং বৈরাগ্য, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, এ বিশ্বজনীন সংগ্রাম বিশ্বের সর্ব্বত্র আছে, সকল সমাজে আছে, সর্ব্বদাই হচ্ছে। এ সংগ্রামের কি কোন মীমাংসা নেই? সেই মীমাংসা দিতে চেষ্টা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারাম রচনা করেন। সে মীমাংসা কোথায়? প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির যে মীমাংসা সে মীমাংসা কোথায়? সে মীমাংসা হয় নিষ্কাম কর্ম্মে। এই কথাটা বঙ্কিমচন্দ্র বল্‌তে চেষ্টা করেছেন, এবং আনন্দমঠ, সীতারাম এবং দেবীচৌধুরাণীতে তিনি এই নিষ্কাম কর্ম্মের পথটাও পরিষ্কাররূপে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই নয়খানি উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান রচনা। এরা অতি অঙ্গাঙ্গীভাবে, অতি ঘনিষ্টরূপে, এক অঙ্গের সঙ্গে আবদ্ধ; প্রথম তিন খানিকে বুঝ্‌তে গেলে তৃতীয় তিনখানিকে বুঝ্‌তে হয়। আর এই নয় খানি উপন্যাসের মধ্যে তিনি একটি বিষম বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন। আর সেই মীমাংসার তিনি চেষ্টা করেন গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের যে সাধনা তার দ্বারা। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্ম বল্‌তে লোকে মনে করে যে, কোন কামনাশূন্য কর্ম্ম। বাস্তবিক কোন কামনা-হীন কর্ম্ম হয় না। কিছু চাইব না অথচ কাজ করব সে হয় না। তবে নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ কি? বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থ করেছেন সে অর্থ এই,—যে কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয় সেই কর্ম্মই নিষ্কাম। যে কর্ম্মের ফলভোগের লালসা কর্ম্মীর অন্তরে থাকে না, কেবল ঈশ্বরপ্রীতিকামী হয়ে লোকে যে কর্ম্ম করে সেই নিষ্কাম। কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতি অতি কঠিন কথা। সকলের সেই প্রীতির সাধনা সম্ভব নয়, সহজও নয়। সুতরাং আর কোন্ প্রীতিতে ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম হয়? ঈশ্বরপ্রীতির নীচেই, সব জায়গায় এই নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা হয় স্বদেশ-প্রীতিতে। আর বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্য আনন্দমঠ, সীতারাম এবং দেবীচৌধুরাণীতে ঈশ্বরপ্রীতিকে এই স্বদেশ-প্রীতিতে প্রধৃত ক'রে, স্বদেশ প্রীতিতে দীক্ষিত ক'রে তিনি তাদের জীবনে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। এই গেল তাঁর উপন্যাস নয় খানি। এখানেই যদি বঙ্কিম-চন্দ্রের কাজ শেষ হ'য়ে থাকে, তা' হ'লেও বল্‌তে হয় বাংলার নবযুগের সাহিত্যে তাঁর খুব বড় একটা স্থান আছে। কিন্তু এখানে ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ শেষ হয়নি, তাঁর ধর্ম্ম-সাহিত্য আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যটা কি? তাঁর ধর্ম্ম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মানবের প্রকৃতির উপরে ধর্ম্মকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্রের উপরে নয়, কিম্বদন্তীর উপরে নয়, পুরাকালের ইতিহাসের উপরে নয়, আর কিছুর উপরে নয়, মানব প্রকৃতির উপরে তিনি ধর্ম্মকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বের মূল কথা এই যে, মানুষের কতকগুলি বৃত্তি আছে, এই সকল বৃত্তির যথা-যোগ্য স্ফূর্ত্তিসাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মনুষ্যত্বলাভের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র উপায়। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কর্‌তে গেলে মানবের যে সমুদয় স্বাভাবিক বৃত্তি আছে, পরিপূর্ণভাবে সেই বৃত্তিগুলিকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে, এবং সেই বৃত্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে; এই হ'ল তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বের মূল কথা। অনুশীলন ধর্ম্ম বলে

"ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়াও বলি। যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে, স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্ত-বুদ্ধি বলিতে পারিব না।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বস্তুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমরা তখন সেই বস্তুকে অন্যদিকেও দেখেছি। এই বস্তু বাস্তবিক তখনকার যুগের একটা প্রধান বস্তু। ইউরোপে যাঁরা ধর্ম্ম আলোচনা করছিলেন, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার ক'রে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন,—ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা—এই যে মানবের বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্যীভূতির নামই ধর্ম্ম, এই সংজ্ঞা তাঁরাও দিয়েছিলেন। মার্কিণে "Theodore Parker, Fourfold Forms of Piety" ব'লে যে তাঁর উপদেশ আছে, তাতেও তিনি এই জিনিষটারই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সে সময়ে আমরা এই "Fourfold Forms of Piety"র ভাবে একেবারে ভরপূর হ'য়ে গিয়েছিলাম। এই সামঞ্জস্যীভূত জিনিষটাই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আদর্শ হ'য়ে উঠেছিল। যাকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলে, natural religion ব'লে যা আমরা ইংরাজীতে পড়ি, সেই natural religionই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁর অনুশীলন ধর্ম্মতত্ত্বে, সেই যে মানবের সহজ ধর্ম্ম, তাই তিনি প্রচার করেছিলেন। "মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে আমি তার বৃত্তি নাম দিয়েছি, সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাই মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ।" এই যে পাঁচটী সূত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায়, এই পাঁচটী সূত্রের উপরেই তিনি তাঁর অনুশীলন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম সূত্র হ'ল যে, মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে; সেই শক্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাই ধর্ম্ম, তাই মনুষ্যত্ব, মনুষ্যের ধর্ম্ম; আর এই যে বৃত্তি সকলের অনুশীলন, তার সীমা কোথাও নাই; সে গুলির অনুশীলনে পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যই হচ্ছে সীমা; আর তাই সুখ। এই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন; তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বে এই অনুশীলন-ধর্ম্মের প্রচার করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তার পরে তাঁর কৃষ্ণতত্ত্ব—তার বিস্তৃত আলোচনা করবার সময়ও নেই, পারবও না এ সময়েতে। কিন্তু কৃষ্ণ-তত্ত্বে আমরা দেখ্তে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলন-ধর্ম্মের মূর্ত্তিরূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একথা বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বতে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলের চেয়ে বড়—ভগবান্, কিন্তু সে কথা তিনি কৃষ্ণতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, আমার বিশ্বাস এটা হতে পারে, কিন্তু আমার দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এ কথাটা শুনবে না, আমি একথাটার আলোচনা করব না। আমি কৃষ্ণ চরিত্রের এইটুকু পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে চাই যে, শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। সে কথাটা তিনি একেবারে শেষে বলেছেন।

তিনি এই কথা বলেছেন যে, শরীরের শক্তিতে অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; ক্ষাত্র ধর্ম্মে, অস্ত্রশস্ত্রের পরিচালনায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; যুদ্ধ-বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; নীতিশাস্ত্রে, সাম্রাজ্য পরিচালনে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর লোকশাসনে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; বন্ধুত্বে অসাধারণ প্রেমিক বন্ধু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপভাবে তিনি আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ সখা, আদর্শ সম্রাট্ বা রাজা, আদর্শ যোদ্ধা, আবার আদর্শ শাস্তা ছিলেন। তাঁর কথাগুলি উদ্ধৃত করলাম না, আপনারা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখতে পাবেন যে, আমরা আজকাল ইংরাজীতে পাশ্চাত্য Superman ব'লে যে একটা কথা শুনতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্রে এই কৃষ্ণকে সেইরূপ Superman ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। এর বেশী তিনি করেন নি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটা বলেছেন যে,—এ জগতে যাঁরা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে একটা তুলনা ক'রেও বলেছেন যে, এমন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আর কোন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাতে দেখ্তে পাই না, শ্রীকৃষ্ণে যেমন দেখ্তে পাই। মানুষের যত রকম সম্বন্ধ আছে, সব সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে তিনি আপনাকে চরিতার্থ করতে চেষ্টা করেছেন। যীশু খৃষ্টে তা নেই, মহম্মদে তা নেই, বুদ্ধে তা নেই। সব সম্বন্ধগুলিকে তিনি এমনি ভাবে আয়ত্ত ক'রে, তার উৎকর্ষ সাধন ক'রে আপনার মনুষ্যত্ব অনুশীলন করতে তিনি চেষ্টা করেছেন। এই গেল তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্রের এবং তাঁর অনুশীলন ধর্ম্মের মূল কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

বিকাশ—১৩৩০

বঙ্কিমের মৃত্যু-দিন

[শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

বৎসরে কি কালের মাপ? ভাবে ও অভাবে কালের মাপ! সন ১৩০০, ২৬শে চৈত্র, আর সন ১৩৩১, ২৬শে চৈত্র—মাত্র একত্রিশ বৎসর, কিন্তু মনে হইতেছে যেন কত দিন, কত মাস, কত বৎসর, কত যুগ! এই একত্রিশ বৎসরে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, বঙ্গভাষা ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি—যখন-তখনই মনে পড়িতেছে—নাই—নাই নাই—বঙ্কিম নাই, বঙ্কিমের সে সাহিত্য-সাধনা নাই, সে আন্তরিকতা নাই, সে ভক্তি-বিহ্বলতা নাই, সে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি নাই, সে সাহিত্য-শাসন নাই, সে সাহিত্যে স্বদেশ স্বজাতি-প্রীতি নাই, বাঙ্গালীত্বে সে মমত্ব-বোধ নাই, সে বাঙ্গালার বঙ্কিম নাই!

সন ১৩০০, ২৬শে চৈত্র, বাঙ্গালায়, বাঙ্গালীর সাহিত্য-ক্ষেত্রের একটী সীমা রেখা। সেদিন সায়াহ্নে বাঙ্গালার জাহ্নবী-তীরে সাহিত্য-শ্মশানে যে চিতা চুল্লী জ্বলিয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের কথা উঠিলে আমি সেই চিতাচুল্লী আজিও প্রত্যক্ষ করি। বঁধুকে মনে পড়িলে শ্রীরাধা বলিতেন—"বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে, আমি চাহি বৃন্দাবন পানে, আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি। রন্ধন শালায় যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধুঁয়ার ছলনা করে কান্দি!" বঙ্গ-সাহিত্যের বঁধুর কথা মনে পড়িলে আমি ঐ দিনের সাহিত্য-শ্মশানে চিতা চুল্লীর দিকে চাহিয়া থাকি, চিতাধূমে বঙ্গীয় সাহিত্য-গগন অন্ধকার হইতেছে দেখিতে পাই; যখন যেখানে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, কাব্যের ছলনা করে কাঁদি! বিদেশী কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একদা বিদেশী কবি মিল্টনকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—"Milton! thou should'st be living at this hour—England hath need of thee!" ইংলণ্ডের কবি ইংলণ্ডের রাজনীতি, সমাজ-নীতি, সাহিত্য নীতির যে অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেদিন মিল্টনের আশাপথ চাহিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরও আজ সেই দিন আসিয়াছে। আজ বাঙ্গালায় বঙ্কিমের সেইরূপ প্রয়োজন, কিন্তু সকলেরই হারানিধি মিলে,—বাঙ্গালার হারানিধি—"লাখে না মিলিল এক"—বুঝি বা কভু মিলিবে না!

সন ১৩৩০, ২৬শে চৈত্র, বাঙ্গালা সাহিত্যে আনন্দ মঠের শেষ রাত্রি—"জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে, কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।" সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে বঙ্কিম-প্রতিষ্ঠিত ঘৃত-প্রদীপের উজ্জ্বল দীপশিখা চতুর্দ্দিকের অন্ধকারের করুণ রূপ আরও স্ফুটতর করিয়া তুলিতেছে—বিসর্জ্জনের করুণ রাগিণী বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন করিতেছে!

যে যুগের বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই গৌরবের পরিচয় ছিল, বঙ্কিম সেই যুগের বাঙ্গালীকে ঘাড় ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষা পড়াইয়াছিলেন। বঙ্কিমের মত এমন ঘাড় ধরিয়া পড়াইতে তাঁহার পূর্ব্বে রামমোহন পারেন নাই, বিদ্যাসাগর পারেন নাই, অক্ষয় দত্ত পারেন নাই। মাত্র এইটুকুই যে বঙ্কিমের কত বড় বাহাদুরী, তাহা সে যুগের ইতিহাস যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। যাঁহারা বঙ্কিমের সৃষ্ট-চরিত্রে বিদেশীয়ানার ছাপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন—তাঁহাদিগকে শুধু সেযুগের ইতিহাসটুকু স্মরণ করিতে

অনুরোধ করি। বাঙ্গালা ভাষা-বিমুখ বাঙ্গালীকে—কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, সেই বশীকরণ মন্ত্র বঙ্কিম জানিতেন। শৈবলিনীর দিব্যচক্ষু যেদিন চন্দ্রশেখরের রূপ দেখিল—রূপ দেখিয়া, বঙ্কিমের বাঙ্গালীত্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য, শৈবলিনীর মুখ দিয়া বলাইল—"সেই যে হাসি, ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকা রাশি তুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য—" সেইদিন মাত্র ঐ দুইটী কথায়—"দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য" বুঝিতে পারিলাম বঙ্কিমের বাঙ্গালীত্ব কত গভীর, তাঁহার প্রাণ বাঙ্গালীর ব্যথা কেমন করিয়া বুঝে, কতটা বুঝে—তাঁহার হৃদয় বাঙ্গালীয়ানায় ভরপুর!

বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনা বিশ্বেশ্বরের আরতি। সে সাহিত্য-সাধনার গভীরতা, আন্তরিকতা বুঝিতে হইলে "আনন্দমঠের" উপক্রমণিকাটুকু পড়িতে হয়। ধ্যানমগ্ন সাধক সাধনায় তন্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" তখন উত্তর হইল "তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তরে বলিল "পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।" প্রতিশব্দ হইল "জীবন তুচ্ছ—সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" "আর কি আছে? আর কি দিব?" তখন উত্তর হইল "ভক্তি!" সাধনমার্গে জীবন-বিসর্জ্জনের অপেক্ষাও ভক্তি যে বড়, তাহা হয়ত আধুনিক সাহিত্য-সেবকগণের ধারণারও অতীত। তাই এ যুগের সাহিত্য নিষ্প্রাণ, ব্যবসাদারী, কামিনী-কাঞ্চন-লাভের যন্ত্র মাত্র। তাই বিদেশী কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"Bankim! thou should'st be living at this hour—Bengal hath need of thee."

বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কোথাও বিভীষিকার সঞ্চার করিল, কোথাও কাহারও প্রাণে অমর হইবার সাধ জাগাইল। আমরাও অধুনা খুব স্বদেশ-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছি—দিন দিন আরও হইতেছি। কিন্তু বঙ্কিম বাঙ্গালাকে যে মাতৃমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাগ্রে দেখাইয়াছিলেন আমরা এখনও তাঁহার মৃন্ময়ী প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে গড়িয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম না। "প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভ-শোভিত হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শন চক্র ঘূর্ণমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটী প্রকাণ্ড ছিন্ন মস্তক মূর্ত্তি রুধির প্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা, শতদল-মালা-মণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক-বাদ্যযন্ত্র মূর্ত্তিমান রাগ-রাগিণী পরিবেষ্টিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী-মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।" বিষ্ণুর কোলে কি আছে, দেখিয়াছ? দেখিয়াছ—কে উনি? "মা।" মা কে? "আমরা যাঁর সন্তান।" কে তিনি? সময়ে চিনিবে; বল "বন্দে মাতরম্!" বঙ্কিম অন্য দেশবাসী হইলে তাঁহার এই ধ্যানলব্ধ মাতৃমূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, পূজিত হইত। আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালী বঙ্কিম এখন আমাদের কাছে সেকেলে! তাঁহার মৃত্যু-দিনে এখন এমন কি বক্তৃতার পিণ্ডদানও ঘটে না। সন ১৩০০, ২৬শে চৈত্র বাঙ্গালীর কাছে এখন বিস্মৃতপ্রায়!

"ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর যে শুধু সাহিত্য-গুরু, তাহা নহে; তিনি এই নব্য বঙ্গের নব-যুগের প্রাণ-স্বরূপ। বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি যত লেখা লিখিয়া গিয়াছেন, তত লেখা বাঙ্গলার আর কোনও সাহিত্যরথীকে আজ পর্য্যন্ত লিখিতে দেখি নাই। বাঙ্গালীর জীবনে যে আজ একটু স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে—এই জাতির ভিতর হইতে আজ যে একটু সঞ্জীবতার সাড়া পাওয়া যাইতেছে—তাহার মূল মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার'কে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দু বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা পড়িবার, বাঙ্গালীত্ব বুঝিবার ও স্বাধীন চিন্তা করিবার পথ না দেখাইয়া দিলে, আজ বোধ হয়, ফিরিঙ্গীয়ানা আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিত। বাঙ্গালীর যাহা বিশেষত্ব, যাহা গৌরব, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম তাহার প্রতি বাঙ্গালীর চেতনাকে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

যেদিন মেকলে সাহেব আসিয়া বাঙ্গালীর মুখে মিথ্যা-কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছিল, সেইদিন বাঙ্গালী সেই কালিমা-লিপ্ত-মুখখানাকে নিজের প্রকৃতি মুখ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে নাই। বাঙ্গালী মনে করিত যে, ইংরেজ যখন আমাদিগকে চিরকেলে মিথ্যা-বাদী, প্রবঞ্চক ও কাপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তখন তাহা সত্য না হইয়া যায় না। এই ভাবিয়া জড়ত্বের কোলে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া অঘোর ঘুমে আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে—সেই নিদ্রিত অবস্থায়, সহসা একদিন আমাদের কর্ণকুহরে স্নিগ্ধ গম্ভীর নিঃস্বনে ধ্বনিত হইল,—"যে বলে বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা"—অমনি মেকলের হাতের কালি মেকলের মুখে গিয়া লাগিয়া দিল।

ঐ মাভৈঃ বাণী বাঙ্গালীকে বঙ্কিমই প্রথম শুনাইয়াছিলেন। বঙ্কিমই বাঙ্গালীকে আশ্বাস দিয়া প্রথম বলেন যে,—"মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোনও লেখক কোনও জাতির সম্বন্ধে কলমবদ্ধ করে নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক—অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী চরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা যদি কতকটা সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে "বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।" এই বলিয়া বঙ্কিম ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-দ্বারা বাঙ্গালীর চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে,—"যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়; হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করে। বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নতুবা বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে।"—এই ভাবের প্রেরণায় বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারত-কলঙ্ক' ও "বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য" প্রভৃতি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ সকল লিখিয়া ছিলেন।

কিন্তু আদর্শ-প্রদর্শন কেবল ইতিহাসের বা উপদেশের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। "বীর

"সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ড প্রণেতা, ভরণ পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

হও", বা "সীতারাম রায় প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি ছিলেন" —এমন একটা নীরস কথা জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জীবনকে সেই ভাব-প্রভাবে গঠিত ও পরিচালিত করিতে পারে না। এই কথা বুঝিতে পারিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনতিকাল মধ্যেই দেশের অতীত-গৌরব-কথাকে একে একে সত্যানন্দ ও সীতারাম প্রভৃতির ভিতর দিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া দেশবাসীর মানস-চক্ষের সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন। দেশবাসীরাও এই মূর্ত্তিগুলিকে নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া হৃদয়ের স্মরণ-স্তম্ভে সাদরে স্থাপন করিল।

কিন্তু এইখানে একটা কথা আছে। কথা এই যে, বাঙ্গালীর অতীত-গৌরব-কাহিনীকে লইয়া এইরূপ রাতদিন কোলে করিয়া নাচাইবার ফলে দেশের যেমন একটু উপকার হইয়াছিল, তেমনি একটু অপকারও হইল। ক্রমে বাঙ্গালী কেবল হাত শুঁকিতেই আরম্ভ করিল—কবে ঘি দিয়া ভাত খাইয়াছে! বঙ্কিম তখন বেগতিক দেখিয়া বাঙ্গালীকে সায়েস্তা করিবার মানসে স্বহস্তে শাসন-সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এ পোড়া জাতিকে কেবল বরাভয় দিলে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত হইবে—সঙ্গে সঙ্গে শাসন দণ্ডের পরিচালনা ও আবশ্যক। এই স্থির করিয়া তিনি 'বঙ্গদর্শনে'কমলাকান্তের রূপ ধারণা করিয়া নানা রচনার মারফতে বাঙ্গালীর পশুত্ব ও অপদার্থত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে যে নিন্দার একটু আতিশয্য ছিল না, এমন বলি না—বঙ্কিমও অবশ্য তাহা জানিতেন। তিনি জানিয়া-শুনিয়াও যে কেন এমন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি নিজেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমরা যে বাঙ্গালীকে এতই অপদার্থ মনে করি, ইহা বোধ হয় সকলে সত্য বিবেচনা করেন না। আত্মনিন্দায় দোষ নাই—উপকার আছে। আমরা বাঙ্গালী হইয়া, বাঙ্গালীর নিন্দা করিতে অধিকারী—নিন্দার একটু অন্যায় আতিশয্য হইলেও লাভ আছে। আমাদিগের যে অবস্থা তাহাতে আপনাপনি ধন্যবাদ আরম্ভ করার অপেক্ষা অমঙ্গলকর আর কিছুই হইতে পারে না।"

বাঙ্গালীর মানসিক অবস্থা বুঝিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এদেশে সে ব্যবস্থার তুলনা নাই। মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাইবার পক্ষে "কমলাকান্তের দপ্তর" যে বাঙ্গালী চরিত্রের কিরূপ উপযোগী, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া বুঝাইবার নহে। কমলাকান্তের দপ্তরের আগাগোড়া সর্ব্বত্রই বঙ্গমাতার জন্য বঙ্গ-সুত বঙ্কিমের শোকাশ্রু জড়ানো মাখানো আছে। এ গ্রন্থ একটু বুঝিয়া পড়িতে পারিলে চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। বঙ্গভাষায় ইহা অতুল্য ও অমূল্য। বাঙ্গালী-প্রকৃতির পীড়কাগুলি হইতে দুষ্ট শোণিত ও ক্লেদ বাহির করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইহাতে যে অপূর্ব্ব কৌশল-সহকারে অস্ত্র চালাইয়াছেন, সে অস্ত্র চালনার সত্যই তুলনা নাই। অনেক সময় মনে হয়, এই গ্রন্থখানিই বঙ্কিম-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

"জমিদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয় শোণিত পান করা দয়ার কাজ।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

বাঙ্গালীর মা

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র বিপ্লবে, দুর্ভিক্ষে, মড়কে, মন্বন্তরে সূচীভেদ্য অন্ধকারে ডুবিয়া গেল সেই দারুণ দুর্য্যোগময়ী অমানিশায়ও বাঙ্গালী বুঝি মাকে ভুলিয়া যায় নাই। সাধক রামপ্রসাদ একটা জাতির শবের উপর বসিয়া মাকে ডাকিয়াছিলেন,—সেই কালিমাময়ী অন্ধকার কালী নামে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু সে মাতৃমন্ত্রের দীক্ষা বাঙ্গালী কাণ পাতিয়া শুনিল সে সুরঝঙ্কারে বাঙ্গলা ভরিয়া উঠিল—কিন্তু প্রাণ দিয়া, জীবন দিয়া সে দীক্ষা কেহ গ্রহণ করিল না!

যে বিশ্বাতীত মাতাকে বাঙ্গালী বিশ্বজনমনলোভা করিয়া ধ্যানে মূর্ত্তি দিয়াছিল, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—কর্ম্মের গৌরবে তাহা অব্যাহত রাখিতে পারিল না। পশ্চিম সমুদ্রের ফেণিল লবণাম্বুরাশি বাঙ্গালীর মাতৃপূজায় সমস্ত আয়োজন ভাসাইয়া লইয়া গেল। বাঙ্গালী মায়ের রূপ ভুলিল,—নিরাকার—আর সব একাকার! বাঙ্গালীর ধ্যানে—সম্মিলিত ধ্যানে মায়ের রূপ ধরা দিল না—হৃতসর্ব্বস্বা—নগ্নিকা কঙ্কাল মালিনী মা, নিজের শিব নিজের পদতলে দলিত করিতে লাগিলেন—কেহ দেখিল না।

দীর্ঘ একশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর মাতৃ সাধনার ধারা—ধর্ম্ম-কলহের শুষ্ক বাদানুবাদের বালুকায় বুঝিবা অদৃশ্য হইয়া গেল!

ভয়াবহ পরধর্ম্মের অন্ধ-অনুকরণ মোহে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী-প্রধানগণ যখন কোলাহল করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিলেন, তখন এক মহাপুরুষ আসিয়া দেখাদিলেন—কালীনাম উচ্চারণ করিয়া 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ-জলে' 'দম-সামর্থ্যে' ডুব দিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। রূপের সাধক পাগল পূজারীর সাধনা সিদ্ধ হইল - মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হইয়া জাগ্রতা হইলেন। রামপ্রসাদের সুরে যাহার আভাষ—শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধি তাহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ!

বাঙ্গলার প্রাণের ধারায় মাতৃ সাধনায়, বাঙ্গালীর দীর্ঘ দুইটী শতাব্দীর সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধি সাহিত্যের রূপান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে দান করিয়াছেন। রামপ্রসাদের গান,—রামকৃষ্ণের সিদ্ধি—বঙ্কিমের কালস্রোত মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন—একই স্রোতের বিভিন্ন তরঙ্গ মাত্র।

এক রবিরশ্মি সমুজ্জল প্রতিভার দীপ্ত আলোক হস্তে বঙ্কিম আসিয়া বাঙ্গালীর কালরাত্রিতে দেখা দিলেন—কাতরে কাঁদিয়া কহিলেন, আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় হইতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি! কোথা মা? কই আমার মা?

সেই অন্ধকারে মাতৃসাধক বঙ্কিম চকিতে একবার কালস্রোতের মধ্যে সুবর্ণময়ী বাঙ্গালীর মাকে দেখিলেন আর অভাগা বাঙ্গালীকে ডাকিয়া শুনাইলেন,—"দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জল কল্লোলে বিশ্ব-সংসার পুরিল। তখন যুক্তকরে সজল নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব,—ভ্রাতৃ বৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!

"উঠ উঠ মা বঙ্গ জননি! মা উঠিলেন না—উঠিবেন কি?"

"পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

"মা উঠিলেন না—উঠিবেন কি ?"—ইহাই বঙ্কিমের সাহিত্য সৃষ্টির মর্ম্মকথা। এবং মাকে উঠাইবার জন্ম বঙ্কিমের অকৃত্রিম যে সঙ্কল্প তাহাই বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বাঙ্গালীর শক্তি-সাধনার ধারাকে বঙ্কিম সাহিত্যের মধ্যে লইয়া আসিলেন, অমর 'বন্দে-মাতরম' গীতি বাঙ্গালীর কণ্ঠে দিলেন;—তাহার বাহুর শক্তি, হৃদয়ের ভক্তি যে 'মা' তাহা চিনাইয়া দিলেন—মন্দিরে মন্দিরে মায়ের প্রতিমা গড়িবার জন্ম বাঙ্গালীকে আহ্বান করিলেন। যতই দিন যাইতেছে—ততই ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম যেন আমরা ভাল করিয়া বুঝিতেছি। এই মাতৃ-সাধনার অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়াই বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর চিন্তায় চরিত্রে যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া অমর হইয়া থাকিবে।

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছিলেন,—"তিনি (বঙ্কিম) ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাব মন্দাকিনীর অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য স্রোতস্পর্শে জড়ত্ব শাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্ম রাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য।"

এই ঐতিহাসিক সত্যকে বিশ্বাস করিয়া আমরা যদি বঙ্কিম-প্রতিভার সহিত অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দেই—তাহা হইলে 'অসংখ্যবাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্র তাড়িত মথিত ব্যস্ত করিয়া' 'মায়ের সেই স্বর্ণ-প্রতিমা' মাথায় করিয়া আনিতে পারিব। পারিব না? 'ভয় কি? না হয়, ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?'

আনন্দ-মঠে মায়ের সন্তানরূপী বঙ্কিম-প্রতিভা—'বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী-মূর্ত্তি'—সৃষ্টির সহস্রদল পদ্মের উপর লক্ষ্মীর ও সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা' মাতৃ-মূর্ত্তি দেখাইয়া বাঙ্গালীর প্রতিনিধিরূপী মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বিষ্ণুর কোলে কে আছে, দেখিয়াছ?'

'দেখিয়াছি। কে উনি?'

'মা!'

'মা কে?'

'আমরা যাঁহার সন্তান।'

'সময়ে চিনিবে, বল বন্দেমাতরম্—এখন চল—দেখিবে চল!'

মা যা ছিলেন—মা যা হইয়াছেন—মা যা হইবেন—একে একে বাঙ্গালীকে দেখাইলেন। মায়ের এই তিন রূপের বঙ্কিম-পরিচয় দিয়াছেন—কিন্তু যে মাকে বাঙ্গালী চিনিতে পারিল না—সে মায়ের পরিচয় বঙ্কিম দিলেন না—কেবল বলিলেন, 'সময়ে চিনিবে।' সাধনহীন স্থূলচক্ষুতে মায়ের রূপ—বিচিত্র বহুবিধ রূপ ধরা দেয়—কিন্তু যে স্বরূপ হইতে নব নব রূপের জন্ম—সেই স্বরূপ ধরা দেয় না। মায়ের স্বরূপ দেখিতে হইলে দিব্যদৃষ্টি চাই—সাধনশুদ্ধ পবিত্র মানস চাই—তাই বঙ্কিম বলিলেন, সময়ে চিনিবে। আর সাধনহীন বাঙ্গালী শুধু বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—কে উনি?

বাঙ্গলার কবি গাহিয়াছেন,—

'স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখনো নাহিক হয়!'

মায়ের স্বরূপানুভূতি বঙ্কিম-প্রতিভার দিব্যদৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল,—তাই সেই সুদূর-সম্প্রসারিত ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, মা যা হইবেন তাহাও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। কেবল কল্পনা কেন—গভীর বিশ্বাসের সহিত গৌরবগর্ব্বে তিনি তাহা বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন, ভক্তিতে লুটাইয়া গদ্‌গদ্-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—'এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—

"যতদূর ইংরেজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরেজ হইতে পারিবে না।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শক্র বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শক্র-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—* * * দিগ্‌ভুজা—নানা প্রহরণ ধারিণী শক্র-বিমর্দ্দিণী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ।"

বাঙ্গালীর প্রতিনিধি-রূপী মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?'

বঙ্কিম-প্রতিভা বলিলেন,—'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্না হইবেন।"

আজ বঙ্কিম-স্মৃতি স্মরণ করিতে গিয়া বাঙ্গালীর মা-এর কথাই মনে পড়িল! বঙ্কিম-প্রতিভার অজস্র বহুমুখী সৃষ্টি যে বঙ্গ-সাহিত্যকে অল্প কালেই শৈশব হইতে নবযৌবন দিয়াছিল—বঙ্গ-বাণীর মুখের সেই অপূর্ব্ব লাবণ্য-শ্রী, সেই শুভ্র-সংযত পবিত্রতা মাখান ঢল ঢল ভাব—মায়ের রূপ ধ্যানে বিভোর সাধকের অপূর্ব্ব দান—একথা স্মরণ করিয়া, আজিকার নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলো দেখিতেছি। আর ভাবিতেছি, আজিকার বাঙ্গালা-সাহিত্য কি সাহিত্য-গুরুর দীক্ষা ভুলিয়া গেল! অনন্তরূপা মায়ের রূপের তরঙ্গ আজিকার সাহিত্য দেখাইতে পারে না কেন? অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ক্ষুদ্র আমরা—রিরংসার দ্যোতক অতি হীন কল্পনার জঞ্জাল আনিয়া বঙ্গ-বাণীর পূজা-মন্দির কলুষিত করিতেছি! এই পঙ্কিল-আবিলতা—স্বভাবের অনুকারী সার্থক সৃষ্টি নহে—অসুস্থ মস্তিষ্কের রিপুজ উত্তেজনার অস্বাভাবিক বিজৃম্ভন! স্বাভাবিক সাহিত্য সৃষ্টি বা আর্টের নামে এই মদন-বিজিত ভ্রষ্ট আমরা একবার সাহিত্যগুরুর পদতলে বসিয়া আজ তাঁহার চিন্তার অনুগামী হইয়া, বাঙ্গালীর মাকে ধ্যান করি—মদনের কেলী-বিলাসের ছলনা-ময় বিভীষিকা সাহিত্যের অজন হইতে দূরে সরিয়া যাক্!

এসো কবি, এসো সাহিত্যিক—এসো সাহিত্যামোদী—ঊষর মরুর উপলখণ্ড ত্যাগ করিয়া আজ প্রতিভার হিমালয়ের সম্মুখে দাঁড়াই! চাহিয়া দেখ, রবিরশ্মি প্রতিফলিত হিম গিরির শৃঙ্গে শৃঙ্গে কতরূপ, কত শোভা—কি বিপুল বিস্ময়! আনন্দ-মঠ-কৈলাস-শিখরে সত্যই মা সন্তানগণের সম্মিলিত আহ্বানের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন! বঙ্কিম-সাহিত্যের আহ্বান বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হউক,—বাঙ্গালীর জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধ্যানে, সাধনায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে 'মা' তাঁহার প্রভাত-প্রসন্ন-পদ্মের ন্যায় সুনির্ম্মল-চরণ নিক্ষেপ করুন—প্রতি পদক্ষেপে শুভ্র-শুচিতা ফুটিয়া উঠুক!

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-সাধনায়, মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হইয়াছেন, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার ধ্যানে মা ধরা দিয়াছেন—তবু অভাগা আমরা এখনো মা চিনিলাম না। 'সময়ে চিনিবে।' —সেই সময় কি আজও আসে নাই? হে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, তুমি ঊর্দ্ধলোক হইতে তোমার শুভ-আশীর্ব্বাদ দ্বারা এবং মর্ত্ত্যে তোমার অমর ভাব সমষ্টির দ্বারা বাঙ্গালীকে সেই শুভদিনের সমীপবর্ত্তী হইবার প্রেরণা দাও! বাঙ্গালী মাকে চিনুক—ঘরে ঘরে মঠে-মন্দিরে—মায়ের প্রতিমা গড়িয়া উঠুক। আমরা সকলে ঋষি বঙ্কিমের সহিত ভক্তিতে শির লুটাইয়া এককণ্ঠে ডাকি—

"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থদায়িকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

"যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিম

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল]

সপ্তকোটি হৃদয়ের রাজ অধিরাজ,
অপূর্ব্ব অজেয় রথী হে বিজয়ী বীর !
আপনি আনত হয় চরণে যে শির,
অভিনন্দনের অর্ঘ্য ধর তবে আজ !
ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সমাজ,
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে—মধুর গম্ভীর
বাজে দেবদত্ত ওই, কোন্ কিরীটির,
বঙ্গভূমে এলে কোন্ মহারথী আজ ?
এত শক্তি ছি কি গো এ কম ভাষার,
কি বাণী অপরাজিতা অনন্ত আশার !
কোথায় সঞ্চিত ছিল এ অপরিসীম
বেদনা ও আনন্দের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার,
—অবিশ্রান্ত ঝরে মণি-মাণিক্যের ভার,—
বাঙ্‌লোকের ধনঞ্জয় বঙ্গের বঙ্কিম !

বঙ্কিমচন্দ্রে নারীজাগরণের আভাষ*

[অধ্যাপক শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবত রত্ন]

বঙ্কিমচন্দ্র যুগ প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি নূতন যুগের নূতন আদর্শ লইয়া বঙ্গ সাহিত্য-সংসারে দেখা দিয়াছিলেন। যে কবির কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল তিনি জানিতেন হিন্দুর জীবনে সামাজিক নব আদর্শের প্রেরণা না আসিলে তাহার পক্ষে রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করা সম্ভব পর হইবে না। যতদিন না হিন্দু সমাজে মাতৃজাতির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাব হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার পুরুষ শক্তি কিছুতেই উদ্বোধিত হইতে পারিবে না। হিন্দু স্ত্রী কেবল মাত্র স্বামীর গৃহিণী নহেন, তাঁহার 'সচিব সখি' ও বটেন। অপদার্থ কুক্রিয়াসক্ত স্বামীর কামাগ্নির আহুতি সংগ্রহ করাও পতিব্রতা রমণীর কর্ত্তব্য—বঙ্কিমচন্দ্র এ আদর্শ মানিয়া লইতে পারেন নাই।

হিন্দু রমণীর অন্তঃপুরের অশেষ ব্যথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণে বাজিয়াছিল। তাই তিনি তাঁহার উপন্যাস গুলিতে তাহার প্রতিকারের কিছু উপায় আছে কিনা তাহাই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। যুগ যুগান্তর ধরিয়া হিন্দুনারী কত উপেক্ষা কত অনাদর সহ্য করিয়া আসিয়াছে। সহিতে সহিতে তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্বামীর সচিবত্ব করিবার ক্ষমতা বা অধিকার আর তাহার নাই। সে স্বামীর হস্তে ক্রীড়নক মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আবার তাহাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বোধ জাগরিত করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ও স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক রচনায় তিনি প্রধানতঃ মিলের Subjection of women নামক প্রবন্ধের অনুসরণ করিয়া হিন্দু স্ত্রীর জীবনের দুঃখ অভাব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যখন এই নারী স্বাতন্ত্র্যের নূতন আদর্শ লইয়া উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হিন্দু সমাজে ঘোরতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। মণীষি চন্দ্রনাথ বসু, সমালোচক গিরিজা বাবু হিন্দুর পারিবারিক জীবনের সনাতন আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার উপর সমালোচনার কঠোর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে বিচলিত হন নাই। তিনি নব্য বাঙ্গলার নারী জাগরণের আন্দোলনে অগ্রদূত স্বরূপে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি উপন্যাসে নারীর যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহার সত্ত্বাকে যে নিরপেক্ষ ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাই প্রচার করেন।

বিষবৃক্ষে কৃষ্ণকান্তের উইলে পারিবারিক জীবনে নারীর স্বাতন্ত্র্য বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই প্রথমে পতিসোহাগিনী ছিলেন। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অনাবিল আনন্দ ভোগ করা তাঁহাদের ভাগ্যে বেশীদিন ঘটিয়া উঠে নাই। কুন্দ নন্দিনী ও রোহিণী তাঁহাদের স্বামীদিগের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল, নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল স্নেহময়ী পত্নীর প্রাণঢালা ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়া নূতন প্রণয়ে নব রসাস্বাদনের আশায় প্রলুব্ধ হইলেন। সূর্য্যমুখী বা ভ্রমর কেহই এ উপেক্ষা নীরবে সহ্য করেন নাই। স্বামীর অনাদর প্রাণহীণ আঘাতের পরিবর্ত্তে তাঁহারাও প্রতিঘাত করিয়াছেন।

---

* প্রবন্ধের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন।—সম্পাদক, সচিত্র শিশির।

কিন্তু স্বামীকে তাঁহারা যথার্থই প্রাণদিয়া ভাল বাসিতেন। তাই প্রতিঘাত করিতে যাইয়া তাঁহাদেরও অন্তর যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তবুও স্বামীর এই অনাচারের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। নগেন্দ্র যখন অনুতপ্ত হইল, তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল, তখন সূর্য্যমুখী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। স্বাধ্বী রমণীর প্রেম স্পর্শে ভাঙ্গা ঘর আবার জোড়া লাগিল। কিন্তু ভ্রমর স্বামীকে এত সহজে ক্ষমা করিতে পারে নাই। সে যে তাহার প্রেম দিয়া এক স্বর্গ রচনা করিয়াছিল তাহাতে রোহিণীর অকস্মাৎ আবির্ভাবে তরল চিত্ত গোবিন্দলালের মতিভ্রংশ ঘটিল। ভ্রমর প্রেমের অবমাননা সহ্য করিতে পারিল না, সে অভিমান করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। সংরক্ষণ শীল সমালোচকগণ ভ্রমর ও সূর্য্যমুখীর এইরূপ গৃহত্যাগে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বামী যতই না কেন ভ্রষ্ট হউন, যতই না কেন অত্যাচার করুন, তিনি স্ত্রীর নিকট সর্ব্বদা উপাস্য। বঙ্কিমচন্দ্র এ আদর্শ মাথা পাতিয়া লইতে পারেন নাই। পুরুষ অত্যাচার করিয়া যাইবে, আর নারী যুগ যুগান্তর ধরিয়া পুরুষের স্বার্থের যুপকাষ্ঠে নিজকে বলি দিবে এই আদর্শ এই যুগে নহে। ইব্‌সেনের নোরা যেদিন বুঝিয়াছিল যে স্বামী তাহাকে এতদিন খেলার পুতুলের মতন ব্যবহার করিয়াছেন, সেই দিনই সে তিন চারিটি পুত্রের মাতা হইয়াও স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু নবযুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও, তিনি ছিলেন হিন্দু, তাই জানিতেন হিন্দু রমণীর প্রাণ স্বামীর প্রেমে পরিপূর্ণ। স্বামীর প্রেম-স্মৃতি বুকে করিয়া হিন্দু রমণী মরিবে, তথাপি সে নোরার ন্যায় বিদ্রোহিণী হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু রমণী নির্ব্বিকার চিত্তে মাটির পুতুলের ন্যায় স্বামীর যথেচ্ছ ব্যবহার সহ্য করিয়া যাইবে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র চাহিতেন না। তাই ভ্রমর স্বামীর উপর অভিমান করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল এবং অনুতপ্ত হইয়া স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর প্রেম-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেম-সমাধি লাভ করিল।

নারী যদি স্বামীর গৃহে আশ্রয় না পায়, তাহা হইলে যে তাহাকে দেহ বিক্রয় করিয়া পাপের পসরা মাথায় করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে, এ কথাও বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিতেন না। তিনি দেবীচৌধুরাণীর ও সীতারামের শ্রীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইলেন যে অসহায় অবস্থায় নারীও নিজের চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া কেমন করিয়া স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতে পারে। ব্রজবল্লভ রায় দরিদ্রা অসহায়া প্রফুল্লকে গৃহে স্থান দিলেন না। প্রফুল্ল তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার বলে এক শক্তিশালী সম্প্রদায়ের নেত্রীপদে অধিষ্ঠিতা হইলেন। কিন্তু স্বামীর প্রেম লাভের আকাঙ্খা তাহার অন্তর হইতে কোনদিন বিদূরিত হয় নাই। তাই স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া অবধি কেমন করিয়া আবার সে স্বামী গৃহে স্থান লাভ করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। স্বামীর প্রেমে নিজের জীবন ধন্য করিবার জন্য প্রফুল্ল তাহার রাজৈশ্বর্য্য—তাহার নেত্রীত্ব অকাতরে অকুণ্ঠিতচিত্তে বিসর্জ্জন দিল। বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের নারী স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের সহিত হিন্দু রমণীর স্বামী প্রেমের এইরূপ সমন্বয় করিয়াছেন।

দেবীচৌধুরাণীর ন্যায় শ্রীও স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র-ভাবে পবিত্র জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনী শ্রীকে আবার স্বামী প্রেমের আকর্ষণে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল।

হিন্দু নারীর অপর নাম অবলা। কিন্তু এই অবলার বাহুতে বল সঞ্চার করিতে না পারিলে তাহা দ্বারা কোনরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হইবে না। তাই প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হইবার পূর্ব্বে ও শান্তির আনন্দ মঠে যোগদান করিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদিগকে ব্যায়াম ও কৌশলে

"নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

সুদক্ষ করিলেন। মানসিক শক্তির সহিত দৈহিক শক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়া প্রফুল্লও শান্তি মহীয়সী রমণীর গৌরব লাভ করিতে সমর্থা হইলেন। রাজনৈতিক জগতেও রমণীর যে অধিকার আছে ও সে ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে তাহারা যে সেখানেও কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র একথা ঐ দুই চরিত্র অঙ্কন করিয়া জগৎ সমক্ষে ঘোষনা করিলেন। রাজসিংহের নির্ম্মলা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন। নির্ম্মলা যেন বিদ্যুতের মতন প্রতিভা-শালিনী। বিদ্যুতের ন্যায় তাহার হাসি, বিদ্যুতের ন্যায় তাহার ক্ষিপ্রতা, বিদ্যুতের ন্যায় তাহার কার্য্য-কৌশল। নির্ভীক অন্তরে ঘোড়া ছুটাইয়া শত্রুর শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে—ঔরংজেবের ভ্রূকুটি-কুটিল নয়ন সমক্ষে হাসির লহর ছুটাইতে পারে। রাজপুত রমণীর ঈদৃশ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার আদর্শ বঙ্গ-রমণীগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নারী জাগরণে যুগ-আদর্শের অনুসরণ করিলেও, পাশ্চাত্যের উৎকট স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়া বঙ্গললনাগণের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলেন নাই। ব্রাহ্ম সমাজের প্রবল আন্দোলনের যুগে বাস করিয়াও তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিকগণের ন্যায় বিদ্রোহিণীগণের চিত্র অঙ্কন করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে আমরা যে শুচি সংযতভাবের সহিত যুগ আদর্শের সমন্বয় প্রচেষ্টা দেখিতে পাই তাহাতেই তাঁহার প্রতি আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অবনত হইয়া আসে।

"বিরোধে মানসিক গুণ সকলের স্ফূর্ত্তি এবং পুষ্টি হয়। নির্ব্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ।"—বঙ্কিমচন্দ্র।
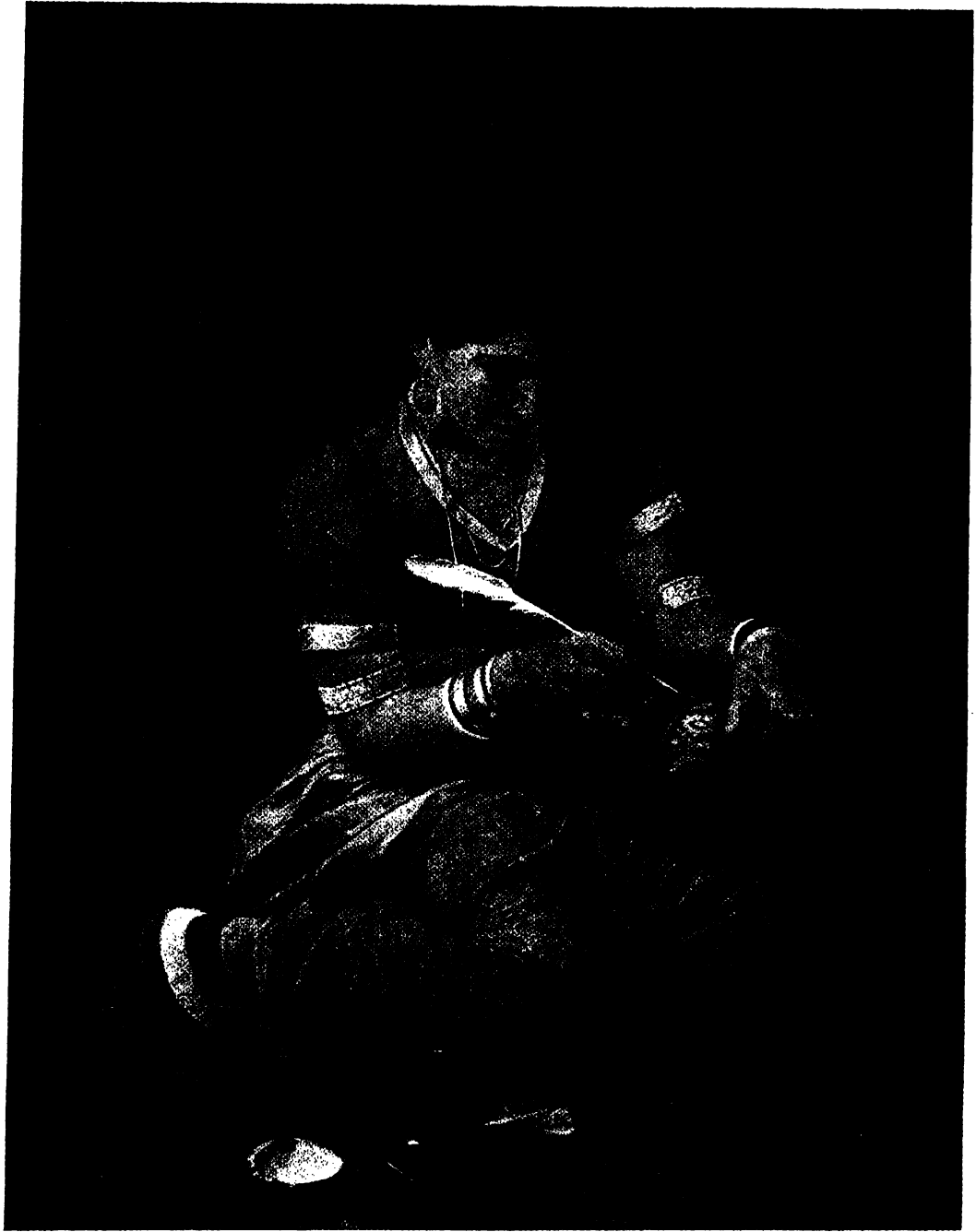
শিল্পী

চিত্রকর— শ্রীযুক্ত ঠাকুর সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ৫ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২। [২৩শ সপ্তাহ

বেকার বাঙ্গালী ও বঙ্গমাতা

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত]

(পাচ মিনিটে সমাপ্ত বিয়োগান্ত নাটক।)

দৃশ্য—বঙ্গদেশ।

বেকার বাঙ্গালী

পাশ ক'ল্লুম ডিগ্রী পেলুম—
"বি-এ", "এম্-এ", এম্-এস্-সি"।
(এখন) কোথায় চাকুরি—কি যে করি.—
(বুঝি) থাকৃতে হয় গো উপোসী॥
যে টাকাটা দিছি ঢেলে,
কলেজ আর "এক্-জামিন্-ফি-তে"।
মুক্ষু হয়ে ক'ল্লে জমা,—
(আজ) পেটে অন্ন পার্ত্তুম দিতে॥
মোটা মোটা বই কিনেছি,
মুটো মুটো টাকা ঝেড়ে।
মেষের মতন "মেসে" প'ড়ে—
ছিলেম দেশভুঁই মা-বাপ্ ছেড়ে॥

কি খাটুনি ! স্নান করিনি,—
দিনকে দিন আর রাত্‌কে রাত্‌
(খালি) পড়ে পড়েই পাত এ দেহ—
(এখন) হায়রে—পেটে নেইকো ভাত

"পড়ে পড়েই পাত এ দেহ—"

কোন্ পথে যাই, ভাব্ছি সদাই—
চাকরীর বাজার কি ভীষণ !
(কোথাও) নেই "ভেকেন্সি,"—সব্ অফিসই—
কচ্ছে "বাবু—রিডাক্‌সন্" ॥

"নেই "ভেকেন্সি"—"

এই তো দশা,—এর ওপোরে—
দেছেন বাবা বিবাহ ;
বিধির কার্য্যে নেইকো কামাই,—
(ঠিক্) বইছে "ইস্যুর" প্রবাহ ॥

"বইছে 'ইস্যুর' প্রবাহ—"

(বিশ) পঁচিশ টাকার চাকুরী একটা—
জুট্‌ল না ছার কপালে।
(হবে) পাশ ক'রে দুর্গতি এমন—
(ওগো) ভাবিনি কোন কালে॥

"পাশ করে দুর্গতি এমন—"

(কত) মুক্ষু আকাট্ ভিন্নদেশী—
(কেমন) ক'চ্ছে সুখে দিনপাত !
(ওগো) বঙ্গ আমার ! জননী আমার !
(তোমারি) ছেলের পেটে নেইকো ভাত !!

"মুক্ষু আকাট ভিন্নদেশী—"

ধিক্ রে জনম বঙ্গদেশে—
বাঙ্গালীর সুখ নেই এখানে।
বঙ্গমাতার নেই সুবিচার,—
চায় না ছেলের মুখের পানে॥

এবার ম'রে জন্ম নোবো,—
"ইংরেজ" কিম্বা "স্কচের" দেশে।
"জার্ম্মান" কি "ফ্রেন্‌চ্" মুলুকে—
"আমেরিকায়,"—নিদেন "রুষে॥"

(হ'য়ে) খ্যাব্‌ড়া মুখো "চীনে,"— খাব—
আরসুলা টিকটিকী ভেজে,—
(নয়) গ্যাঁটা গোঁটা খেঁদা "জাপান"—
বেড়াব বুক চিতিয়ে তেজে॥

(কিম্বা) "কাবলে-ওলা," "মাড়োয়ারী,"—
"গুজ্‌রাটী" কি "ভাটিয়া" জাত।
(কেবল) হ'বনাকো ছার "বাঙ্গালী"—
(যাদের) বিদ্যে শিক্ষেয় নেইকো ভাত॥

ভুল বলেছেন দেশের কবি—
বোঝেন্ নি,—"মা নেই আমাদের!"
বঙ্গ কাহার? জননী বা কা'র?
ধাত্রী কিসের? দেশটা কাদের?

আমরা এত ম'চ্ছি কেঁদে,—
"মা"—"মা" ব'লে অনাহারে;—
(ও) সৎ-মা বেটী,—"মা" হ'লে কি—
ছেলের কান্না সইতে পারে?

(এমন) ধনধান্যপুষ্পভরা—

যে "মা"—সকল দেশের রাণী,—

তার ছেলেদের ভাত জোটে না—

নেই পরণের কাপড় খানি ?

"তার ছেলেদের ভাত জোটে না—"

(যে মা) কোলের ছেলে ঠেলে ফেলে –

পরের ছেলে নিয়েই খুসী,—

(তারে) ডাক্‌ব কেন "মা ব'লে আর ?

নয় তো সে "মা,"—সে রাক্ষসী !!

বঙ্গমাতা।

কি বল্লি আবাগীর বেটা—
আমারি সব দেখিস্ দোষ ?
নিজের পাপে ভুগিস্ তোরা,—
আমার ওপোর করিস্ রোষ ?

(আমায়) ঘাড়ে ধরে—পরের ঘরে,
তোরাই তো রে দিচ্ছিস্ তুলে।
(তোদের) দুর্ম্মতিই যে দুর্গতির মূল—
এখন কেন যাস্ তা' ভুলে ?

মানবজন্ম পেয়ে শুধু—
সার বুঝেছ "একজামিন্ পাশ ?"
(খুব) বই পড়েছ গাদা গাদা,—
(এখন) খাওগে ব'সে চুলোর পাশ ?

(নিজের) হাত পা বেঁধে পড়ে আছ—
পরিশ্রমের নেইকো নাম।
(এমন) বাদশা কুঁড়ের ভালাই কিসে ?
(তোদের) বিধি চিরদিনই বাম ॥

সবই আছে হাতের কাছে—
চোখ্‌টা মেলে দেখ্‌না ওরে !
তোরা যদি না নিস্ নিজে,—
কেন তা-না নেবে পরে ?

তোদের) চেষ্টা যত্ন নেই উদ্যম,—
কোন কাজেই নোস্ উদ্যোগী,—
চাকরী তোদের চতুর্ব্বর্গ,—
(তোরা) তাইতে এত দুঃখভোগী ॥

আয় বুঝে ব্যয় জানিস্‌না রে—
(কেবল) বিলাসিতার দিকে টান।
পেটে অন্ন মোটেই না থাক্—
(চাই) সিগারেট্ এসেন্স্—সাবান ॥

চাষবাসে মন ওঠেনা রে—
হ'চ্ছে শ্মশান পল্লীগ্রাম।
ক'ল্‌কেতাটার আস্তাকুড়ও—
তোদের কাছে স্বর্গধাম ॥

নিজের জাতের হিংসা কেবল—
কোন কাজেই নেই একতা।
(যত) কুসন্তানে গর্ভে ধ'রে—
(আজ) কাঙ্গালিনী বঙ্গমাতা ॥

(তোরা) খদ্দর পরিস্—ক'টা শুদ্দর ?—
(মায়ের) এটুকুতেও রাখ্‌লিনি মান ?
(বল্) কোন্ জিনিষটা তৈরী তোদের ?
(ওরে) ছুঁচ্‌টাও পরদেশীর দান !

তেষ্টায় ছাতি ফাট্‌লে,—যখন
জলের গেলাস্ তুলিস্ মুখে,—
চোখ্‌টা চেয়ে দেখিস্ বেটা,—
যোগায় তা' কোন্ বিদেশ থেকে !

(ওরে—অ)—"বি, এস্-সি,"—"এম্, এস্-সি"—বাপ্ !
(আজ) "সুইডেন্"—"জাপান" আছে ব'লে,—
পয়সা-পয়সা পাও দেশালাই,—
(ঘরে) তাইতে তোমার চুলো জলে !

বস্তা-বস্তা চালডাল তোর—
ঘর থেকে সব যায় বিদেশে।
(তুমি) পেটপুরে "চা" খাওরে যাদু,—
ইয়ার-বন্ধু নিয়ে হেসে ॥

(তোরা) নিজেই গরু—তাই বুঝি রে—
গরু পুষ্‌তে ব্যাজার ধরে ?
(খাঁটি) দুধ-ঘি-ছানা—মাখন খেলেই—
সদ্য প্রাণে যাবি মরে ?

ভেজাল তোদের মুখরোচক--
ভেজাল দেখি সবেতে তাই,—
খাদ্যে,—বাদ্যে,—নৃত্যে,—গীতে,—
কাব্যেতে তো কথাই নাই ॥

চালচলনে,—কথায়,—সাজে,—
কোথাও "খাঁটির" নেইকো লেশ।
(তোদের) সরলতা উপকথা,—
প্যাঁচে ভরা এ বাংলা দেশ ॥

তোরা যদি মানুষ হতিস, -
বুঝ্‌তিস্‌ যদি আপন ভালাই,—
তোদের অন্ন খায় কে তা বল্‌—
থাকৃতো না রে কোন বালাই ॥

কুপুত্র যদিও হয় রে—
কুমাতা তো কভু নয়।
ছেলে যদি মন্দ ভাবে,—
মাকে তাও সৈতে হয় !!

গীত

(আমি) জনম দুঃখিনী তোদের জননী।
দীনা হীনা - পরাধীনা—
(দেখ্‌রে) আঁখি ঝরে দিনযামিনী ॥
(আমি) চেয়ে আছি তোদের মুখপানে,
মায়ের ব্যথা বাছা বোঝো প্রাণে,
(কেন) অভিমানে—অকারণে,—
দুষিছ আমারে বল শুনি ॥
পরমুখ চেয়ে গেল যে দিন,—
শক্তিহারা কেন এমন ক্ষীণ ?
(কবে) আপনার পায়,—দাঁড়াবি রে হায়,—
পোহাবে এ দুঃখরজনী ॥

যবনিকা পতন।

শেষ রক্ষা

[শ্রীজলধর সেন]

আফিস থেকে ভয়ানক রাগী মেজাজে বাসায় এসে রসিক তার স্ত্রীকে বলল "তবে আর কি! আমি এখন চাকরী ছেড়ে ঘরে বসি; তুমিই রোজগার ক'রে আমাকে খাইও।"

স্ত্রী সুষমা অবাক্! এ কি কথা? সে যে কি উত্তর দেবে, তা প্রথমে ভেবেই উঠ্তে পারল না। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল "তুমি কি বলছ আমি ত বুঝতে পারছিনে।"

রসিক মেজাজটা আরও চড়িয়ে বলল "বুঝবে আবার কি! কাগজে গল্প লিখ্তে আরম্ভ করেছ; লোকে বাহোবা দিচ্ছে; মুঠো ভ'রে টাকা দেবে। আর কি। আমার সব দুঃখ ঘুচে গেল, আমাকে আর এ সামান্য কেরাণীগিরি করতে হবে না।"

"এই কথা,—আমি বলি কি যেন ভয়ানক কিছু হয়েছে।"

"এর থেকে ভয়ানক আর কি হ'তে পারে। লোকে যে কত কি বলছে, কত ঠাট্টা করছে। আজ ত নাজির বাবু বললেন 'আর কি রসিক!' কেন আর এ ত্রিশ টাকার জন্য দিন রাত খেটে মর। তোমার স্ত্রী যখন রোজগার করতে শিখেছেন, তখন আর ভাবনা কি।" ভাব দেখি, এত লোকের মধ্যে কথাটা শুনে আমার মাথা কাটা গেল কি না। লেখাপড়া শিখেছ, বেশ কথা। তা কি এমন করে বাজারে জাহির না করলেই নয়। আমার যে মুখ দেখান ভার হয়েছে। তুমি কার হুকুমে এ কাজ করতে গেলে? আমাকে কি জিজ্ঞাসাও করতে হয় না।"

সুষমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলিল; আমার অপরাধ হয়েছে, এবার মাপ কর। তোমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে এমন কাজ করা অন্যায়ই হয়েছে দেখ্ছি।"

"অন্যায় এক-শ বার অন্যায়, হাজার বার অন্যায়! ঐ জন্যেই আমি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চাইনি! যেমন না-বুঝে কাজ করেছি, তেমনিই তার ফল হোলো। মেয়ে মানুষ, খাবে দাবে, ঘর-গেরস্থালীর কাজ করবে। তা নয়, একেবারে সাহিত্যিক। দেখ, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। খবরদার, আর কখনও যেন তোমার নাম কোন খবরের কাগজে না দেখি।"

সুষমা ধীর ভাবে বলল 'আমি ত অপরাধ স্বীকার করছি। আর কখন আমার নাম তুমি কোন পত্রে ছাপা দেখ্তে পাবে না; এবারের মত আমাকে ক্ষমা কর।"

রসিক বলল "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এ গল্প তুমি কবেই বা লিখ্লে, আর কবেই বা কেমন করে কাগজে পাঠালে।"

সুষমা বলল "তুমি ত জান বাবা আমাকে আর দাদাকে বড় যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বিয়ে হবার আগে আমি কত কবিতা লিখেছি, তার কতকগুলো বাবা মাসিকপত্রে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন। তারপর এ তিন বছর আর কিছুই বড় একটা লিখিনি। এই মাস দুই আগে কি মনে হোলো, তাই এ গল্পটা লিখে ফেলে রেখে দিয়েছিলাম; কাউকে দেখাব কি ছাপতে দেব, এ কথাও আমার মনে হয় নি। তারপর গেল মাসে দাদা একবার আমাকে দেখ্তে এসেছিলেন, তা'ত তোমার মনে আছে। তিনি এসে দুঃখ করতে লাগ্লেন যে, আমি লেখাপড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হোলো; আমি যে এখনও লেখাপড়া করি, আর তোমার যে তাতে উৎসাহ দেওয়া আছে, এই দেখাবার জন্যে আমি ঐ লেখাটা তাঁকে দেখাই। তিনি খুব খুসী হয়ে লেখাটা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের দেখাবার জন্যে। তারপর আমাকে না জানিয়েই তিনি এটা ছাপিয়ে দিয়েছেন। আমি কিন্তু এখনও সে কাগজ দেখতে পাইনি। আগে যদি জানতাম যে, তোমার এতে আপত্তি আছে, আর দাদা আমার ঐ সামান্য লেখাটা ছাপিয়ে দেবেন, তা হ'লে আমি তাঁকে লেখাটা দেখাতাম না। আমার এ দুর্ব্বলতা

তুমি ক্ষমা কর। আমি বলছি, আর কখন তুমি আমার নাম ছাপার অক্ষরে দেখতে পাবে না।"

রসিক বলল "এ যে তোমার দাদার কাজ তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তার ত আর কাজ কর্ম্ম নেই। এম্-এ পাশ করেছিস্, কোথায় বড় একটা চাকরী নিয়ে দুশো-পাঁচ-শ রোজগার করবি। তা নয়, সাহিত্য-সেবা করছেন। আমি ব'লে দিচ্ছি, ওর অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। তোমার বাবা যা রেখে গিয়েছেন, তা ও ঐ ক'রেই উড়িয়ে দেবে, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি। সে-ও তা জানে, তাই এই ছাব্বিশ বছর বয়স হোলো, বিয়ে করল না। দেখো, ওর অদৃষ্টে কত দুঃখ আছে!"

সুষমা বলল "আমাদের আর ত কেউ নেই। দাদা একেলা মানুষ। যা তাঁর প্রাণের ইচ্ছা তাই করুন। যা কিছু আছে, সব যদি যায়, তা হোলেও দুটো পেটের ভাত করে নিতে পারবেন, একটা স্কুল-মাষ্টারী জুটবেই।

রসিক বলল "যাক্ সে পরের কথা। তুমি কিন্তু আর কখন অমন কর্ম্ম করোনা। আমাকে যেন আর দশজনের-ঠাট্টা সইতে না হয়।"

সুষমা বলল "কতবার আর বলব; আমি অপরাধ করেছি। এমন কর্ম্ম আর কখন করব না।"

রসিক বলল "জান ত, আমাদের একটা ধর্ম্মসভা আছে। আমাদের নাজির বাবু তার সভাপতি। আমরা সবাই সে সভার সভ্য। সেদিন একটা সভায় নাজির বাবু আজকালকার মেয়েদের লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধে নিন্দা করে বক্তৃতা করে ছিলেন। আমরাও তাতে সায় দিয়েছিলাম; আর আজ কিনা আমারই স্ত্রী তার উলটো করে বসল। আজ আদালতে এ নিয়ে কত ঠাট্টা, কত তামাসা।"

সুষমা বলল "এর পরে আর তোমাকে এ বিপদে পড়তে হবে না। তুমি তোমার ধর্ম্মসভার সভ্য হয়ে থাক্‌তে পারবে। আসছে অধিবেশনে একাকাজ কোরো, বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষার নিন্দা করে তুমি একটা প্রবন্ধ পড়ো। তুমি যদি লিখবার সময় না পাও, তা হ'লে আমিই না হয় লিখে দেব। তাতে নাজির বাবুরও প্রশংসা করা থাকবে; তা হ'লে আমার এ অপরাধও মোচন হবে, চাই কি বেশী কিছু ঘুস না দিলেও নাজির বাবু তোমার মাইনে বাড়াবার জন্যে জজ সাহেবকেও অনুরোধ করবেন। কি বল?"

রসিক বলল "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

(২)

চার বছর পরের কথা।

ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা, হরি-সংকীর্ত্তন, তুলসীর মালা ধারণ, নাজির বাবুর মন যোগান, কিছুতেই কিছু হয় নাই; রসিকের বেতন ত বাড়েই নাই বরং ঘুস লওয়ার অপরাধে তাহার চাকরী গেল, নাজির বাবুর চেষ্টায় রসিককে আর জেল খাট্‌তে হোলো না। বৃদ্ধ নাজির বাবু আক্ষেপ করে বললেন "ওরে বাবা, ঘুস নেওয়ারও কৌশল আছে, শ্রীহরির কৃপা চাই। এই সাতাশ বছর চাকরী করছি, কত উপরি নিয়েছি, কিন্তু কেউ কি ধরতে পেরেছে, প্রেমোসনই হয়েছে। গুরুকৃপা চাই হে,—গুরু হে তুমিই সত্য।"

রসিক মলিন মুখে বাসায় আসিল। তাহার ভাবান্তর দেখে সুষমা তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বলল "ওগো তোমার কি হয়েছে; মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে। অসুখ করেছে কি?"

রসিক বলল "আর অসুখ! জজ সাহেব আজ আমাকে ডিসমিস্ করেছে; দয়া করে পুলিশে দেয় নাই।"

সুষমা ভয়ে কাতর হয়ে বলল "পুলিশ, কেন, তুমি কি করেছ?"

রসিক বলল "সকলেই দু পয়সা উপরি নিয়ে থাকে, আমিও এতদিন নিয়েছি। আর কারও কিছু হোলো না, নাজির বাবু আমাকেই ধরিয়ে দিলেন। আমার চাকরী গেল। এখন কি উপায় হবে? দুটো ভাতের জন্যে যে ভিক্ষা করতে হবে।"

সুষমা বলল "কিছুই করতে হবে না। ভয় কি তোমার। ছেলেপিলেও নেই যে, তাদের জন্য ভাবতে হবে। দুটো পেট চ'লে যাবে, তুমি কিছু ভেবো না।"

রসিক বলল "কি করে চলবে সুষমা?"

সুষমা বলল "তুমি যদি রাগ না কর, ত বলি।"

রসিক বল্‌ল "রাগ করব কেন সুষমা! এখন যে আমি পথের ফকির।"

সুষমা বল্‌ল "তোমার মনে আছে, তুমি আমাকে বলেছিলে যে, আমার নাম যেন কখনও কাগজে আর ছাপা না হয় কেমন? তুমি নাম ছাপা হতেই নিষেধ করেছিলে, লিখ্‌তে ত নিষেধ কর নাই। আমি তোমার কথার অমান্য করি নাই; আমার নাম দিয়ে কখনও কিছু লিখি নাই। কিন্তু লেখা আমি ত্যাগ করি নাই। এই চার বছরে আমি 'সুবাসিনী দেবী' এই ছদ্মনামে চার পাঁচ খানি বই লিখে দাদাকে দিয়েছি। তিনি এখন বইয়ের দোকান করেছেন, তা ত তুমি জান। সুবাসিনী দেবীর বই খুব বিক্রী হয়। সেদিনও দাদা এসে বলে গিয়েছেন, সুবাসিনী দেবীর হিসাবে খরচ খরচা বাদ প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা তাঁর দোকানে জমা আছে। তিনি আমাকে টাকা নিতে বলেছিলেন; আমি এক পয়সাও এতদিন নিই নি। আমার রোজগারের টাকা আমি এতদিন ঘরে আনি নাই; তোমার উপার্জ্জনেই খাব স্থির করেছিলাম। বই থেকে যা হবে, সব কোন সৎকার্য্যে গোপনে দিয়ে যাব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। এসব কথা তোমাকে জানাই নাই। আজ তোমাকে বল্‌লাম। দাদা বলেছেন, এখন যেমন করে হোক, আমার বইয়ের আয় মাসে একশ টাকার কম নয়। এতে কি আর আমাদের দুজনের চল্‌বে না। আমি এখন থেকে আরও লিখ্‌ব। কিন্তু তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম, তার অন্যথা করব না, বাঙ্গালা--গল্প--সাহিত্যে সুবাসিনী দেবীর নাম চল্‌বে, আমার নাম কখন ছাপার অক্ষরে বার হবে না। তোমার আদেশ কি অন্যথা করতে পারি?"

রসিক সুষমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলিল "সুষমা, আমাকে ক্ষমা কর।"

সুষমা রসিকের বাহুবেষ্টন মুক্ত হ'য়ে তাহার পদধূলি গ্রহণ করল।
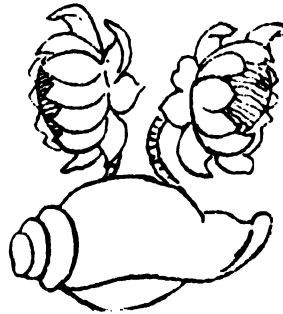
মনের মিল

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

এসেছেন? আঃ! কতদিন পরে আপনি এলেন! কথাগুলা বলিয়াই তৃপ্তি রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সরু সিঁড়ি, পাশ দিয়া যাইতে গেলে গায়ে হয়ত গা ঠেকিয়া যাইতে পারে, তাই আমি তার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

হাসিয়া বলিল, ওপরে আসবেন না? আসুন, বাঃ!

আমি—চলুন, বলিতেই সে উপরে উঠিতে লাগিল।

তৃপ্তির বাবা সত্যবাবু সম্প্রতি আপিস হইতে ফিরিয়া ঘরের মধ্যেই বিশ্রাম করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "এসো—এসো, অরুণ এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?"

কলকাতাতেই ছিলাম।

এখানেই ছিলে? অথচ কতদিন এখানে আসনি! আমি ত দুবার তোমার বাড়ী খোঁজ নিয়েছিলাম, শুনেছিলাম তুমি বাইরে গেছ, রাঁচী না কোথায়!

কিছুদিনের জন্যে গিয়েছিলাম বটে।

বসো—বসো, তিনি একটা চেয়ার সরাইয়া দিলেন। বসিতেই তৃপ্তি হাতে একখানা পাখা দিল।

এমনি সময়ে তৃপ্তির মা আসিয়াই আমাকে দেখিয়া সেই একই প্রশ্ন করিলেন, এতদিন কেন আসনি বাবা?

উত্তরটা তৈরী করিয়া আসা হয় নাই, বলিলাম সময় হয়ে উঠ্‌ত না।

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বাবা, এত কি কাজ?

হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আসল কথাটা ভাঙিতে ইচ্ছা ছিল না; তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী শেষ করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া আমি ব্যবসার দিকে গিয়াছিলাম, চিত্রকরের কাজে। সে দুই বৎসর আগের কথা। কিন্তু গত বৎসর তৃপ্তি যখন বি-এ পাশ করিল তখন আবার পড়ার মোহ আমাকে পাইয়া বসিল। আবার কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এবারে নিঃশব্দে পরীক্ষা দিয়া আসিলাম। গ্র্যাজুয়েট হইবার প্রলোভনে এতদিন তৃপ্তিদের বাড়ীতে আসিতে পারি নাই, সে কথা তৃপ্তির সামনে প্রকাশ করিব না মনে করিয়া দু' একটা অসত্য আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তাহার প্রয়োজন হইল না, তৃপ্তির মা জলখাবার আনিতে দিতে গেলেন, এবং সত্যবাবু স্নান করিবার জন্য উঠিলেন।

একলা পাইয়া তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

বলিলাম, "তারপর আর কি বলুন, কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছে।"

রাস্তার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া তৃপ্তি বলিল, তিন তলাটায় কি চমৎকার হাওয়া আসে দেখুন! বলুন, আপনি কেমন একজামিন দিলেন?

অতর্কিত প্রশ্নে বিব্রত হইয়া বলিলাম, কি একজামিনের কথা বলছেন?

আহা! এবার বি-এ দিলেন, আমি জানি না ভেবেছেন বুঝি?

বাস্তবিক! কি করে জানলেন, বলুন! কাকীমা জানেন?

না, মা জানেন না, বাবাও না। আমি শুধু খবর পেলুম, আপনি সিটি কলেজ থেকে দিচ্ছেন।

হু হু করিয়া দক্ষিণের হাওয়া আসিয়া ওধারের দেওয়াল পঞ্জিকার হাস্যমুখী সুন্দরীকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল; তৃপ্তির দীর্ঘ কোঁকড়ানো কালো চুল, অনুপম মুখশ্রী, ও সুচারু কাপড় পরিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমি ভাবিতেছিলাম এই বি-এ পাশ বিংশবর্ষীয়া তরুণীকে দেখিয়া বটতলার উপন্যাস লেখকেরা কি মুগ্ধই না হইতেন—তেরো বছরের মেয়ের যৌবন বর্ণনায় যাঁরা কালিদাসকেও ছাড়াইয়া যান।

বাংলার ঘরে জন্মিয়াছি বাঙ্গালী মহিলার রূপ যে দেখি নাই তা ত নয়, কিন্তু তৃপ্তির দীপ্তির দিকে চাহিয়া মনে হয়

এরই জন্য কোন্ অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ বার্লিনএ কে না জানি কতদিন ধরিয়া কত যোগ্যতা অর্জন করিতেছে।

আয়নাটা পরিষ্কার করিয়া তৃপ্তি টেবিল গুছাইতে লাগিল, একবার মুখ তুলিয়া বলিল, অরুণবাবু!

বলুন।

কেমন ছবি আঁকছেন আজকাল?

সে সব ছেড়ে দিয়েছি।

না, আপনি বাজে কথা বলছেন। বাঙ্‌লা লিখছেন কেমন?

কিচ্ছু না, আমার লেখা আবার কেউ নাকি পড়ে?

মাগো, আপনি এমন অদ্ভুত। আপনার লেখা কতলোক পড়ে, জানেন না?

কে কে নাম করুন।

আমি ত একজন, তারপর আমাদের বন্ধুরা—আশা, বীণা, প্রীতি, পরিমল, দীপ্তি, স্নেহ, কুসুমিকা, চন্দ্রা, কমলা, অন্নপূর্ণা...

হয়েছে, আর মিথ্যে নাম কতকগুল করবেন না।

মিথ্যে নয় অরুণবাবু, আপনার লেখা ওরা সাধনায় পড়ে যা প্রশংসা করত!

হঠাৎ ঝাঁটাটা তুলিয়া তৃপ্তি বলিল, আপনি একটু ওঘরে গিয়ে বসলে হ'ত না, ঝাঁটটা দিয়ে নিতুম।

দিন্ না, তাতে কি।

ধুলো উড়বে যে?

তাতে কি হয়েছে, আপনি দিন।

ঝক্‌ঝকে সোণার চুড়ী দু'গাছিকে গুঁজিয়া তৃপ্তি খাটের তলায় ঢুকিয়া ওকোণ হইতে আরম্ভ করিল। অন্যমনস্ক হইয়া আমি ভাবিতেছিলাম দর্শন শাস্ত্র এবং সমার্জনী দুই দিকের তাল এত স্বচ্ছন্দে এ মেয়েটি সামলায় কি করিয়া! প্রোফেসারের লেক্‌চার শুনিয়া কিম্বা চায়ের নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া সোজা রান্নাঘরে ঢুকিয়া ঝোল সাঁত্‌লাইতেও একে কতদিন দেখিয়াছি! আবার ঠাকুর ঘরের সমস্ত যোগাড় করিয়া দিয়া আসিয়া হার্মোনিয়মে বসিতেও ইহার এতটুকু বাধে না...তৃপ্তি বলিল, শুনছেন, পা তুলুন!

প্রথম ডাকটা শুনিতে পাই নাই শশব্যস্তে পা তুলিয়া লইলাম।

ঝাঁট দিতে দিতে তৃপ্তি বলিল, কি ভাবছিলেন আপনি এত তন্ময় হয়ে?

ভাবছিলাম আপনি কি কাজের লোক!

যান্! আপনি ভারী লজ্জা দেন।

নতুন কি গান শিখেছেন বলুন।

আপনি আসেন না তা কি বলব?

আজ একটা গান্!

আসছি—বলিয়া তৃপ্তি খাবার আর জল আনিয়া দিয়া হার্মোনিয়মে বসিল।

অস্তশেষ একটা রেখা তার কমনীয় গলার হারটির উপর পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল, জানালার বাহিরে প্রকাণ্ড গাছটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তৃপ্তি গাহিল,—

> শুধু তোমার বাণী নয় গো
> হে বন্ধু হে প্রিয়
> মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
> পরশ খানি দিও!

শেষ হইলে বলিলাম, বাঃ!

কি করেন আপনি!

তার পরদিন।

তৃপ্তির ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম অনেক লোক, সকলেই যুবক। পরিচিত তিন-চার জন দলের মধ্যে ছিল, কিন্তু সামান্য পটুয়া ভাবিয়া তারা আমার সঙ্গে অতিশয় অবহেলাভরে কথা কয়, এইজন্য আমিও সসঙ্কোচে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতাম। বিলাতফেরৎ অশোক তবু একবার বলিল, কি মশাই অরুণবাবু তুলি কেমন চল্‌ছে? আপনি জেনারাল লাইন ছেড়ে তবু একটা কাজ করছেন!

স্মিত দৃষ্টিতে উত্তর দিয়া তৃপ্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা ছবির এলব্যাম দেখিতেছে। আমার দিকে ফিরিয়া সে বলিল অরুণবাবু আপনি ছাতে যাবেন?

মৌনং সম্মতিলক্ষণং করিতে তৃপ্তি বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু সমবেত ভ্রুকুঞ্চনে ভস্ম হইবার সম্ভাবনা দেখা গেল।

খুব উঁচু ছাত, অনেকখানি লম্বা। চারিধারে বিচিত্র ফুলের টব তৃপ্তির হাতে বিচিত্র সাজানো। দুটি গোলাপ

সংগ্রহ করিয়া সে আমার নাকের কাছে ধরিল, তারপর বলিল যদি অনুমতি করেন, কোটে লাগিয়ে দিই।

সবিনয়ে বলিলাম, আপনার হাতে যেমন মানাচ্ছে, আমার কোটে......তৃপ্তি বাধা দিল, যথেষ্ট হয়েছে, সব সময় আপনি আমাকে......কথাটা অসম্পূর্ণ রহিল

বুকে দুটি গোলাপ লাগানো হইয়া গেল।

আমার পক্ষে এটা খুব গৌরবের হইতে পারে কিন্তু দুটি সুন্দর সুপুরুষ যুবক ছাতের দরজা হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল এবং তাহাদের মনের অসন্তোষ মুখের রেখায় সদ্যসদ্য ধরা পড়িল ?

একজন ই আই আর এর এটি এস, আর একজন ইন্সিরিওরেন্স আপিসে বড় চাকরী করে। কা'কে তৃপ্তি মাল্যদান করিবে সে কথা এখনো প্রকাশ পায় নাই কিন্তু কথাবার্ত্তা চলিবার আভাস আমিও যেন পাইয়াছিলাম।

তারা দুজনেই নামিয়া গেল, তৃপ্তি বলিল, দুটি ফুল। ইংরাজী কিম্বা বাঙলা অর্থে বলিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না, তার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া।

বলিলাম, যাই। দিনকতক এখন আসা হবেনা, কাল দার্জ্জিলিং যাচ্ছি।

দার্জ্জিলিং ? চিঠি লিখবেন ?

আমি লিখতে পারি, আপনি জবাব দেবেন কি ?

ওকথা বলবেন না অরুণবাবু, আমি বরাবর দিই, আপনিই দেন না !

আপনি......

আচ্ছা আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলেন কি করে ? তিন বছরের ছোট !

আপনাকে আপনি বলতে বেশ লাগে যে।

তৃপ্তি-হীন দার্জ্জিলিংএ বিশেষ তৃপ্তি পাওয়া গেল না ; কুড়িদিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিলাম, ঘটকীর সঙ্গে মা কথা কহিতেছেন। বুঝিলাম, আমারই জন্ত।

ঘট্‌কী বলিতেছিল সত্যমিত্তিরের মেয়েকে থিয়েটারে নিয়ে গেল, বলনাচে নিয়ে গেল, সে ছেলের আর পছন্দ হয় না।......

কি ব্যাপার ? বিদেশের কথা বন্ধ রাখিয়া ঘটকীর কাছে আসিয়া বসিলাম। কি গো কার কথা হচ্ছে, সেই বিএপাশ মেয়ে ?

হ্যাগো বাবু পটলডাঙ্গার সত্যমিত্তিরেরর মেয়ে। সেই রাজন্ দত্ত বারিষ্টর, তার সঙ্গে বিয়ে দেবার লেগে, মেয়ে নিয়ে তার বাপ মা যেন ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। মুরুব্বির জোর...বুঝলে দাদাবাবু, ছেলের বাপ যে কোন রাজার দাওয়ান...তাই সত্যমিত্তিরের অত ইচ্ছে।

বিয়ের ঠিক কিছু হলনা কি ?

সে ছেলে ম্যাম্ নিয়ে খেইলাছন্ করে তার ও মেয়েকে চোখে লাগ্‌বে কেন ? সে জবাব দিয়েছে।

তৃপ্তির সঙ্গে আমার আলাপের কথা মা জানিতেন না, বলিলেন তোর একটা সম্বন্ধ এনেছে। এটর্নীর মেয়ে......

চাকরী না করে আমি বিয়ে করব না। পেটিংএ কিছু হল না। বেশ ত চাকরী করুনা, মাদ্রাজে জনডিকিনশনের আপিসে ত হেড়বাবু চাকরী করে দিতে চাইছেন, বিয়ে করে যা সেখানে। আগে বরঞ্চ চাকরী ঠিক করে আসি।

তিনদিন ধরিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম তৃপ্তির বিয়ের সময় কলিকাতায় থাকা ঠিক নয়, বাহিরেই পালানো যাক্।

১০৩২ মাইলের পথ মাদ্রাজে আসিয়া মনে হইল, তৃপ্তির কাচ থেকে এবার যেন কিছু দূর আসা গিয়াছে। প্রবাসীর বাঙালীদের বাড়ীতে, নীল সমুদ্রের বালুসৈকতে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবং জর্জ্জটাউনের আপিসের কাগজপত্রের মাঝখানে অনেকটা অন্তমনস্ক হওয়া গেল। নূতন দেশের নূতন ভাষায় নূতন জাতির নূতন ধারার নবজীবনের নবীন স্পন্দন অনুভব করিলাম।

মাঝে মাঝে তৃপ্তির চিঠি আসে, ছাতের উপর বসিয়া পড়ি, দূরে তমালতালীবন রাজি লীলা উপকূলভূমির আড়ালে সূর্য্যালোক উজ্জ্বল সাগর রেখা সন্ধ্যার রঙীন গগণের মেঘমালার নীচে ওধারে লাইট্ হাউসের কাঁচটা ঝকঝক্ করে দেখি—চিঠি বন্ধ করিয়া তৃপ্তির কালো চোখ দুটি ভাবি।

একদিন অকস্মাৎ পত্র ব্যবহার স্থগিত হইল বুঝিলাম তৃপ্তির বিবাহ হইয়া গেছে, দ্বিগুণ উৎসাহে আপিসের কাজে মন দিলাম। পাঁচটা বৎসর পাঁচটি মাসের মত কাটিয়া গেছে।

চারিধারের বন্ধুবান্ধব ও বৌদিদিদের মাঝখানে প্রবাসের দিনগুলি স্বদেশের চেয়েও প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন আমাকে একটা কাজের জন্য বাঙ্গালোর যাইতে হইল। সেখানে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল, তিনি পূর্ব্বে কাছাকাছি কোন স্বাধীন রাজার মন্ত্রীত্ব পদে বহুদিন ছিলেন। হোটেলের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে অতিথি করিলেন। বিদেশে পরের অন্ন ধ্বংস করা ইদানীং বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, বোধহয় অকৃতদার বলিয়া কোনরকমই বাধ বাধ ঠেকিত না।

ভদ্রলোকের একটি মেয়েকে দেখিলাম, পনেরো বছরের সুশ্রী কিশোরী, তারই বিবাহের জন্য সম্প্রতি সপরিবারে তিনি বাংলায় ফিরিতেছেন। আমাকে কর্ত্তাগিন্নীতে বারবার যেরকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—আটাস বছর বয়স হয়েছে এখনও বিয়ে করনি কেন—তাহাতে দু-একবার সামান্য একটু সন্দেহ দেখা দিল! কিন্তু সে রকম ধরণের কথা তাঁরা কিছু তুলিলেন না। আমি মাদ্রাজে ফিরিবার দিনই তাঁরা কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে মার চিঠি আসিল, এক মন্ত্রীর কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে তাঁরা নাকি আমাকে দেখিয়াছেন। তখন বুঝিলাম কেন আমার বাড়ীর ঠিকানা অত তাঁরা চাহিয়াছিলেন! বি-বা-হ! কিন্তু আজ তেমন আপত্তি ছিল না, রোজগার একরকম করা যাইতেছে, বয়সও হইয়াছে এবং তৃপ্তির সম্বন্ধে আশা-আশঙ্কা কিছুই নাই।

সুতরাং দুমাসের ছুটি লইয়া দেশে ফিরিলাম। বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেছে। শুনিলাম দশহাজার টাকা নগদ ঘরভরা আসবাবপত্র ও একখানা মোটরকার দিবে। গহনা খাট্ বিছানা ঘড়ি ক্যামেরার যা বিপুল ফর্দ্দ দেখিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য হইলাম, আমার মূল্য এতখানি ত কোনকালে ছিল না।

ফাল্গুনের প্রথম বসন্তসমীরণে ঈজিচেয়ারটায় শুইয়া শুনিতে লাগিলাম, নীচে জল্পনাকল্পনা চলিতেছে কতবড় মিছিল হইবে, কোন্ কোন্ রাস্তা ঘুরিয়া ল্যান্সডাউন রোডে যাইতে হইবে। মনে পড়িল সেই নত আঁখি কিশোরী যৌবনোন্মুখী সালঙ্কারা পুষ্পমালাবিভূষিতা, কেমন করিয়া শুভদৃষ্টির সময় চাহিয়া দেখিবে, কেমন করিয়া একদিন এই শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিবে।

দেশবিদেশ হইতে আত্মীয় আত্মীয়ার সমাগমে বাড়ী ভরিয়া গেল, হাস্যপরিহাসে এই কথাটাই সকলে স্পষ্ট করিয়া দিতে লাগিলেন, সুন্দরী মন্ত্রীকন্যা ও অতুল ঐশ্বর্য্য এমন সমাবেশ বহু পুণ্যফলে ঘটে।

একদিন ভাবিলাম, কলিকাতায় আসিয়াছি, তৃপ্তির খবর নিয়া আসি, কোথায় বিবাহ হইল।

তৃপ্তিদের বাড়ীতে গিয়া প্রথমে তারই সঙ্গে দেখা হইল, কুড়ি বৎসরের সৌন্দর্য্য পঁচিশ বৎসর বয়সে কোথায় হারাইয়া গেছে। আজ অত্যন্ত সাধারণ তার ম্লান লাবণ্যবিলাস দেখিলে মনেই হয় না, একদিন সে অপূর্ব্ব লোভনীয় ছিল। আশ্চর্য্যের মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল, যখন শুনিলাম এখনো তার বিবাহ হয় নাই। একদিন উৎকৃষ্টতর লোকের সন্ধানে যে সব মধুপের দলকে অবহেলা করিয়া অমনোনীতের লাঞ্ছনা সে বরণ করিয়াছে, আজ তারাও তাহার আশা নিজেরা পরিহার করিয়া গিয়াছে। তৃপ্তির মা দুঃখ করিয়া জানাইলেন তৃপ্তির বাবার অতিরিক্ত লোভের ফলে এবং অবিবেচনায় মেয়ের আজ দুইকূল গিয়াছে। ভালঘরে খরচ করিয়া দিবার মত পয়সাও নাই।

তৃপ্তি আজ আমার সঙ্গে কথা কহিল, অতি স্নেহে অতি আন্তরিকতা সহকারে। নিরাশ জীবনের করুণ কাহিনী জানালার কাছে বসিয়া এমন করিয়া সে বর্ণনা করিল, যে তার চোখের জলের সঙ্গে সমবেদনায় আমারও অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আমার বিবাহের কথা সে শুনিয়াছে, উপন্যাসের সুরে বলিল সুখী হোন্। হৃদয়ের-সুর যেন শোনা গেল না।

বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত সন্ধ্যাটা মনটা ভারী খারাপ রহিল। ভাগ্যদোষে কি অমূল্য রত্নের আজ কি দুর্গতি পঁচিশ বছরের দরিদ্রের কন্যাকে কে আজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবে, রূপযৌবন যার অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে! অথচ সুখের একদিন ছিল যেদিন অনেকে ওর পদসেবার অধিকারের যোগ্যও আপনাদের মনে করিত না। রূপে গুণে-নবধা কুললক্ষণে বিভূষিতের দল—আজ তৃপ্তিকে কেহই কামনা

করিবে না ! গালে হাত দিয়া খাটের উপর শুইয়া ভাবিতেছি, পর্দ্দা ঠেলিয়া মামীমা ঘরে ঢুকিলেন। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট বলিয়া একটু সমীহ করিয়া চলেন, বলিলেন ওগো অরুণ মামা, মেয়েলী হাতের এ কার চিঠি ? গাড়ী থেকে নেবে দেখলুম, চিঠির বাক্সয় পড়ে রয়েছে !

চিঠিখানা হাতে লইয়া দেখিলাম, তৃপ্তির। সে লেখা আজও ভুলি নাই। বালিশের তলায় রাখিয়া বলিলাম একটি মহিলা বন্ধুর। তুমি কতক্ষণ আস্‌ছ মামী ?

এইত আস্‌ছি, তোমার বিয়ে দেখতে এলুম, কি রকম ফূর্ত্তি হচ্ছে ? নাও, তুমি বন্ধুর চিঠি পড়, আমি ঘুরে আসি।

তিনি বাহির হইয়া গেলে খুলিয়া পড়িলাম,—

শ্রীচরণেষু,

অরুণবাবু, যে কথা মুখে বলা যায় না, অনেক সময় তা চিঠিতে লেখা যায়। আর দুইদিন পরে আপনার উপর আমার কোন দাবী থাকিবে না, আজ সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিতে চাই, আপনার বিবাহের পরে আমি চিরকুমারী থাকিব। এইজন্য যে আত্মহত্যার চেয়েও সেটা সুন্দর এবং মহৎ পথ। কবে আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ জাগিয়া উঠিয়াছিল আমি জানিনা এবং কাহাকেও জানাই নাই, কিন্তু বড় করিয়া বিবাহ দিবার এটা যে একটা কু-ফল সে কথা আজ গভীরভাবে বুঝিয়াছি। যাহাকে পাইব না তাহাকে পাইবার আশা ও না পাইবার নিরাশার যন্ত্রনা কেহ যেন কখনো না ভোগ করে।

এত স্পষ্ট করিয়া তৃপ্তি আমাকে মনের কথা খুলিয়া বলিবে একথা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। তৃপ্তি আমাকে চায় এবং সে কথা নিজের হাতে লিখিয়াছে এটা বড় তীক্ষ্ণভাবেই আমাকে বিঁধিল।

কিন্তু তৃপ্তিকে আজ পাইতে হইলে অনেকখানি ত্যাগ করিতে হয়, সাধারণ মানুষের শক্তিতে সেটা ত সম্ভব নয়। ধনীকন্যার অনাগত যৌবন এবং জীবনব্যাপী ঐশ্বর্য্যভোগের কল্পনা মনের একদিকে ফুটিয়া উঠিল, আর একদিকে চিরজন্মের দারিদ্র্য আর যৌবনসীমায় উপনীতা নারী. বারবার বিচার করিয়া তৃপ্তিরই জয় হইল, তাকে চিনিয়াছি বুঝিয়াছি ভালও বাসিয়াছি, সে আমাকে সুখী করিবে আমি হয়ত তাকে খুসি করিতে পারিব। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া অতীতের মানসীর জন্য দেহমন লালায়িত হইয়া উঠিল।

মা কুট্‌না কুটিতেছিলেন, চুপি চুপি গিয়া বলিলাম এ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না, বড্ড ছেলেমানুষ।

মা বলিলেন ছেলেমানুষ কিরে ? পনেরোবছরের ছেলেমানুষ ?

নয়ত কি ? আমার চেয়ে ১৩ বছরের ছোট। আমি আটবছরের তফাৎ চাই।

যা বোঝ কর, কিন্তু ভদ্রলোকরা সব কি মনে করবেন ?

তাঁদের বলে দাও মা, আমার মতন পাত্র বাঙ্‌লা দেশে পাঁচশত লাখ আছে আমার চেয়ে ভালোরও অভাব মোটেই নেই। টাকা খরচ করেছেন, তাঁদের আবার সুপাত্রের ভাবনা।

চলিয়া আসিতেছিলাম, বলিয়া আসিলাম, আমার বিয়ে এই ফাল্গুনমাসেই হতে পারে, মেয়ে ঠিক আছে।

ঘট্‌কী ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ মেয়ে দাদাবাবু ?

পটলডাঙ্গার সত্যমিত্তিরের মেয়ে।

গালে হাত দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওমা গেছি মা সে তিরিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে যে...

বাধা দিয়া বলিলাম, তিরিশ নয়, আমার চেয়ে ছোট, তবে বয়স একটু হয়েছে, কিন্তু দেখলে তত বড় মনে হয় না !

সমস্ত বাড়ীতে যেন বিদ্রোহের ঝড় উঠিল। মেয়েরা একবারে কলরব করিতে লাগিলেন, এমন সোনার সম্বন্ধ পায়ে ঠেলিয়া কোথায় কোন্ অখাদ্য মেয়ের জন্য ঝোঁকা— এর মধ্যে তুক্‌তাক্ আছেই। বাবা রাগ করিলেন, মা কথা কহিলেন না, অযাচিত উপদেশে ইতরে জনাঃ বিরক্ত করিয়া তুলিল। কাহাকেও কোন জবাব না দিয়া তৃপ্তিকে গিয়া বলিলাম, এ সম্বন্ধ ছেড়ে দিচ্ছি।

কেন, আমার চিঠি পেয়ে ?

তাই। তোমারি জন্যে।

ওকাজ করবেন না, আপনি যে মুখের কথায় আমাকে স্বীকার করছেন সেই সৌভাগ্যই আমার খুব।

না তৃপ্তি, সে হয় না আমি জবাব দিয়েছি। আজ আমি

তোমাকে চাই। তুমি মুখ ফুটে বলেছ সে কি আমি অবহেলা করতে পারি। লক্ষ্মী যাকে চান সে কি দুর্লভ হতে পারে?

সত্যবাবু এবং কাকীমা সব কথা শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন, এ অবস্থায় কথা কহিবার দায়ীত্ব ঘাড়ে লইবারও যেন তাঁহাদের সাহস হইতেছিল না।

আমি স্পষ্টই বলিলাম, আমাকে কি আপনারা চান?

সহাস্যমুখে এবং সজল চোখে তৃপ্তির মা বলিলেন, বাবা, সে ভাগ্য কি আমাদের হবে?

ভাগ্য কিসে বলছেন, সামান্য লেখাপড়া শিখেছি, সামান্য চাকরী করি, কলকাতায় বাড়ী আছে, দেশে কিছু জমি আছে, এমন পাত্রেরও কি এতই অভাব হয়েছে দেশে, যে ভাগ্যের কথা আসে?

সংক্ষেপে তিনি জবাব দিলেন, না বাবা তোমার মনটি যে চমৎকার।

শুনিতে লাগিল ভাল, কারই বা না লাগে?

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলাম, আনন্দের উৎসব ঘন মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। তারপরে কয়টা দিন কথার কশাঘাতে ও অবহেলার তাড়নায় আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

আমার বিবাহের দিন সানাই বাজিল না, জনকতক বন্ধু বান্ধব ছাড়া বরযাত্রী বিশেষ কেহ আসিল না, নিমন্ত্রিতার দল অনেক রাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

মেয়েদের বাড়ীতে তবু একটু আমোদ হইল, খাওয়ার ও অভ্যর্থনার আয়োজনে কোন ত্রুটী দেখা গেল না এবং বাসর ঘরে আনন্দমেলা দস্তুরমত জমিল।

যাত্রা করিবার সময় তৃপ্তির চোখে বিদায়ের জল ঝরিল না, কিসের আতঙ্কে সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মা বিষণ্ণগম্ভীর মুখে বধূবরণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তৃপ্তির সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

হিন্দুর ঘরের বি-এ পাশ পঁচিশ বছরের মেয়ে যে শুধু একখানা কঙ্কাল কিম্বা অত্যন্ত মোটা ধুম্‌সি নয় এটা দেখিয়া সকলেই যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ক্রমশঃ কাছে আসিয়া কথাবার্ত্তা শুনিয়া সকলেই একটা ভক্তিগদ্‌গদভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু তবু একদল লোকের কুঞ্চিত নাক কিছুতেই সোজা হইল না। ফুলশয্যা কাটিয়া গেলেও দেখিলাম নিন্দাবাদ কমিবার কোন লক্ষণ নাই, তখন আমার কুহকময়ী মায়াবিনীকে লইয়া চাকুরীস্থলে সরিয়া পড়াই সমীচিন বিবেচনা করা গেল।

কতদিন পরে আবার মাদ্রাজের রায়পুরমের বাড়ীর ছাতে আসিয়া বসিয়াছি। পশ্চিমে মাদ্রাজ সহর সন্ধ্যার সূর্য্যকিরণে হাসিতেছে, পূর্ব্বে সেই তমালতালীবনরাজিনীলা উপকূলের অন্তরালে রবিকরোজ্জ্বল সাগর-রেখা, উপরে গগনে বিচিত্র মেঘমালা। তৃপ্তির সুকোমল হাতখানি ধরিয়া বলিলাম এই যে চারধারে এত পথ প্রান্তর সৈকত সিন্ধু দেখ্‌তে পারছ, তুমি জান এর রাজা কে?

আপনি বলুন।

আঃ, এখনো আপনি?

তৃপ্তি আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, বল। আমি বলিলাম, কেন জান? তোমাকে পেয়ে।

বেতের চেয়ারটায় আমাকে বসাইয়া পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সুন্দর চোখদুটি তুলিয়া তৃপ্তি মুখের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল; সূর্য্য ডুবিয়া গিয়া জলে স্থলে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

মুখখানি ধরিয়া বলিলাম ওঠো তৃপ্তি, আজ বাড়ীতে সকলে আমায় গালাগালি দিচ্ছে, তুমি সমস্ত রাত ধরে গান গেয়ে সেকথা ভুলিয়ে দাও, গাও, আমায় ঘিরি আমায় চুমি—

কেবল তুমি কেবল তুমি...

প্রিয়া হাসিয়া আরম্ভ করিল উন্মাদনাকর সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত।

——— ———

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চাকুরীর চেষ্টায়।

শরৎকুমার আপনার সম্পত্তি হীন, আহার হীন, ও গৃহ হীন দুরবস্থার কথা ঈশানীকে জানিতে দেয় নাই। কিন্তু প্রেমময়ী পত্নীর নিকট মানুষ কখনও কোন কথা গোপন করিতে পারে না;—তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়, তারহীন টেলিগ্রাফের যন্ত্রের ন্যায়, সকল সংবাদ পাইয়া থাকে; স্বামীর প্রত্যেক তথ্যটুকু সে, অন্তর্য্যামীর মত, জানিতে পারে। শরৎকুমার কিছু প্রকাশ না করিলেও, সে ইতিপূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে অবস্থান কালে যাহা দেখিয়াছিল, এবং শুনিয়াছিল, এবং এক্ষণে যাহা তাহার অন্তরাত্মা বলিয়া দিতেছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিল যে, এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা সমাধা করিয়া শরৎকুমারের চাকুরী গ্রহণ করাই উচিত। তাহা না করিলে, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ অর্থকষ্ট ও অভাব নিবারণের আর কোনও উপায় নাই। শরৎকুমার একমাস কাল বরিশালে অবস্থিতি করিবার পর, একদিন সে, সেই কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল।

এবং শরৎকুমারও তাহা সহজেই বুঝিতে পারিল। কিন্তু নানা লালসাপূর্ণ মনকে স্থির করিয়া আর বিদ্যাভ্যাস করা, তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। কাজেই পত্নীর উপদেশে, সে যে পরিমাণ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারই উপযুক্ত কোন প্রকার চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এই ঘোর কলিকালে বাঞ্ছনীয় চাকুরী বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। সে দরখাস্ত করিয়াও কোনও স্থানে সহজে কোন চাকুরী পাইল না।

বাঙ্গালীর পুলিশ বিভাগে চাকুরী পাওয়ার প্রধান অন্তরায় এই যে, বাঙ্গালী সাধারণতঃ অশ্বারোহণ বিদ্যায় পটু হইতে পারে না। বাটীতে উৎকৃষ্ট ঘোটক থাকায়, এবং বাল্যকালে কখনও কখনও তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করায়, শরৎকুমার আপনাকে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী মনে করিত। সে মনে করিল যে, পুলিশ বিভাগে চাকুরী লওয়া তাহার পক্ষে সহজ হইবে। কিন্তু ইহা বরিশালে থাকিয়া সম্পন্ন হইবার সুবিধা না পাইয়া, সে স্থির করিল, পুনরায় ঢাকায় যাইয়া কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া, চেষ্টা করিবে।

কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ ব্যয় আছে; তাহার হাতে ত তখন এক কপর্দ্দকও অবশিষ্ট ছিল না। সে পত্নীকে আপন অভিপ্রায়ের কথা বলিল, কিন্তু আপন ধনগর্ব্ব ক্ষুণ্ণ করিয়া আপন অভাবের কথা বলিতে পারিল না।

ঈশানী স্বামীর এই অভাবের কথা আপন হৃদয়মধ্যে অনুভব করিয়া, মাতার অগোচরে আপনার বাক্স হইতে দুই খানি অলঙ্কার বাহির করিল; এবং উহা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, যত দিন ঢাকায় থাকিয়া তোমার চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা বিক্রয় করিয়া, ততদিন তোমার খরচ নির্ব্বাহ করিও। ইহাতে খরচ না কুলাইলে, আবার আমায় লিখিও; আমি আবার আমার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তোমায় টাকা পাঠাইব।

শরৎকুমার পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় জন্য অম্লান বদনে গ্রহণ করিয়া বলিল, 'আবার হাতে টাকা হলেই তোমাকে নূতন গহনা গড়িয়ে দেব।' বলাবাহুল্য তাহার হাতে আর কখনও টাকা হয় নাই; কারণ, হাতে টাকা হইবার জন্য সে কখনও উদ্যোগ বা চেষ্টা করে নাই।

অলঙ্কার বরিশালেই বিক্রয় করিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিয়া,

আশ্বিন মাসের প্রথমে একটা শুভ দিন দেখিয়া সে আবার ঢাকা রওনা হইল।

ঈশানী যতক্ষণ দেখিতে পাইল, স্বামীর পশ্চাতে ছায়া দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে পুত্রকে ক্রোড়ে লইল।

শরৎকুমার ঢাকায় প্রত্যাগত হইয়া তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বাটীতে বাটীতে কিছুদিন কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইল। অবশেষে সে তাহার পিতার বন্ধু এক উকিলের বাটীতে আশ্রয় পাইল। এই আশ্রয়দাতার নিকট অপদস্থ হইবার আশঙ্কায়, সে, সুরাপান বা প্রেমলীলা অনুষ্ঠানের সুবিধা করিতে পারিল না। এই রূপে ইচ্ছা থাকিলেও সে পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থ ইচ্ছানুযায়ী অপব্যয় করিতে পারিল না।

পিতৃবন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী, শরৎকুমার তাঁহারই সহিত যাইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। উকিল বাবু তাঁহাকে শরৎকুমারের শোচনীয় দুরবস্থার কথা বুঝাইয়া বলিলেন; এবং পুলিশ বিভাগে তাহাকে কোন চাকুরী দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট দয়ালু ব্যক্তি। তিনি কর্ত্তব্য অনুরোধে শিখর বাবুকে দায়রা সোপর্দ্দ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য বিশেষ দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণে উকিল বাবুর অনুরোধ তিনি শরৎকুমারকে সাহায্য করিতে সহজেই সম্মত হইলেন।

পরে শরৎকুমার দরখাস্ত করিলে, তিনি তাহাকে বিশেষ ভাবে মনস্থ করিয়া, শিক্ষার জন্য, ভাগলপুরে পুলিশ বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন।

শরৎকুমার পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থ লইয়া, পুলিশে চাকুরী পাইবার প্রত্যাশায় কিছু উৎসাহের সহিত ভাগলপুরে গেল। সেখানে কিছু মনোযোগেরই সহিতই সে প্রথমে শিক্ষা আরম্ভ করিল; এবং পত্র লিখিয়া ঈশানীকে সকল সংবাদ জানাইল।

—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যদুপতির সবিমৃষ্যকারিতা।

আমরাও আগেই বলিয়াছি, তখন আশ্বিন মাস পড়িয়াছিল।

তখন যদুপতি পুনরায় সুবিধা দরে নারিকেল ক্রয়জন্য, ভোলা, কলসকাটী, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে জলপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শরৎকুমার ঢাকায় যাইবার পর, সে বরিশালে আসিয়া এক ব্যাপারীর আড়ৎঘরে বাসস্থান লইয়াছিল; নারিকেল ক্রয়ের সুবিধার জন্য তাহার এইরূপই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

একদিন সে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নূতন আবাস বাটী খুঁজিয়া বাহির করিল; এবং সৌজন্যের খাতিরে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। বিধবা প্রমদা, তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত, জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, যদুপতি তাহার পদপ্রান্তে প্রণত হইল এবং কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

প্রমদা জামাতাকে সেই বাটীতে আশ্রয় দিতে হইবে মনে করিয়া, অসন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তাড়াইবার জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিলেন, 'তাইত, এতদিন পরে তুমি আমাদের খোঁজ নিতে এসেছ; এই ছোট বাড়ীতে কোথায় যে তোমার থাকবার জায়গা দেব, তা' কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে; তা'তে আবার কাল থেকে চাকরটা পালিয়েছে।'

যদুপতি উপবেশন জন্য কোন আসন না পাইয়া, দণ্ডায়মান থাকিয়াই কহিল, 'আমার থাকার জন্য আপনার কিছু ভাবতে হ'বে না। আমরা দোকানদার মানুষ, দোকানদারের কাছে থাকাই আমাদের দরকার। তাই এ ক'দিন আমি একটা দোকানেই বাসা নিয়েছি।'

প্রমদা নিশ্চিন্তা হইয়া কহিলেন, 'তুমি তাহ'লে আজ বরিশালে আসনি?'

যদুপতি কহিল, 'না, আমি নারিকেল কেনবার জন্যে তিন চার দিন আগেই এসেছি।'

ঈশানী এতক্ষণ কক্ষের ভিতর বসিয়া অনুপস্থিত স্বামীর

বিষয় চিন্তা করিতেছিল ; এবং খোকাকে উৎসঙ্গে লইয়া, স্বামীর প্রতিভূস্বরূপ তাহাকেই আদর করিতেছিল।—স্বামীবিরহ-কাতরা বিরহিণীগণ পুত্রবতী হইলে, স্বামীর অভাবে, স্বামীর ক্ষুদ্রকায় প্রতিনিধিকে আদর করিতে ভালবাসে। সে যদুপতির পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাড়াতাড়ি পুত্রকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিল। এবং বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ওমা! এই যে জামাই বাবু! কোত্থেকে এলেন।'

ঈশানীকে সমাগতা দেখিয়া, যদুপতির অভ্যর্থনার ভার তাহার হাতে সমর্পন করিয়া, একটু অন্তরালে যাইয়া প্রমদা আপনার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিলেন।

শ্বশ্রূকে প্রস্থিতা দেখিয়া যদুপতি হাসিয়া শ্যালিকার কথার উত্তর দিল ; বলিল, 'তুমি হয়ত ভাববে যে আমি পাশের গাছ থেকে নেমে এলাম। কিন্তু সে কথা সত্যি নয় ; আমি সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছি।'

ঈশানী জামাই বাবুর রহস্য কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল একটু হাসিল। এবং খোকাকে ক্রোড়ে করিয়া যদুপতির বসিবার জন্য একখানা পীড়ি পাতিয়া দিল ; এবং গলায় অঞ্চল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

যদুপতি পীড়িতে উপবেশন না করিয়া ঈশানীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, 'দেখি, দেখি, তোমার বুঝি ছেলে হ'য়েছে? ওকে একবার আমার কোলে দাও ত।' এই বলিয়া যদুপতি খোকাকে আপন বলবান বাহুতে লইয়া তাহাকে নাচাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'লক্ষ্মী ছেলে, সোণা ছেলে, টুকটুকে ছেলে, চিরকার বাপ্ মার কোল জোড়া হ'য়ে বেঁচে থেকো। দেখ ঈশানী, ও কেমন হাস্‌ছে? আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবছে বল দেখি।'

ঈশানী পুত্রের লাস্য-লীলা এবং হাস্য মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে হাসিয়া বলিল, 'ভাব্‌ছে, মেসোর ফর্সা কাপড় নোংরা ক'রে দেব কি না? ভারি দুষ্টু, দিন আমার কোলে দিন, দিয়ে ঐ পীড়িখানায় বসে একটু মিষ্টি মুখ করুন।'

যদুপতি বলিল, 'দাঁড়াও, ওর হাতে কিছু দিই'।' এই বলিয়া যদুপতি খোকার হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিল। খোকা তাহা কোনও খাদ্যদ্রব্য মনে করিয়া তাহা উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিলে, ঈশানী তাহাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিল। এবং নোটখানি তাহার দৃঢ় কবল হইতে কষ্টে উদ্ধার করিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিতে গেল।

ইত্যবসরে প্রমদা স্থালীতে দুইটি রসগোল্লা সজ্জিত করিয়া মিষ্টিমুখ করিবার জন্য, জামাতার পীঠপার্শ্বে রক্ষা করিলেন।

যদুপতি মিষ্টমুখ করিবার জন্য কাষ্ঠ-পীঠে উপবেশন করিল।

প্রমদা খোকাকে কোলে লইয়া নিকটে মেঝের উপর বসিলেন।

ঈশানী জল ও পান প্রভৃতি আনিয়া দিয়া, জামাই বাবুর সহিত গল্প করিবার জন্য মাতার পার্শ্বে উপবেশন করিল। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদি এখন কেমন আছে।'

যদুপতি "ভালই আছে। তারও বোধ হয় এই মাসের শেষে ছেলে হবে। তুমি কেমন আছ? শরৎকুমার ভায়া এখন কোথায়?'

ঈশানী আমি বেশ ভাল আছি। সে এখানে ছিল ; আজ সাতদিন হ'ল ঢাকায় গেছে!

যদুপতি "ঢাকায় এখন তোমরা নূতন বাড়ী কোথায় কিনেছ?"

প্রমদা তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, এখন বাড়ী কিনবে কেন? এদের ত বরাবরই ঢাকায় মস্ত বাড়ী আছে? তবে আবার নূতন বাড়ী কিনতে যাবে কেন?'

যদুপতি "আপনি বোধ হয় শুনেছেন, শরৎকুমার ভায়ার বাপ মা, আমার বাপ মার মত, প্রায় এক সঙ্গে মারা যান।

প্রমদা। ওমা! তা' আবার শুনিনি। আমাদের যে নেমতন্ন করেছিল। তা' না করলেও অত বড় লোকটা মবুল, আমরা আর তার খবর পেতাম না। তুমি শ্রাদ্ধতে যাও নি?'

যদুপতি। না, জানতে পারিনি বলে আমার যাওয়া হয় নি।

প্রমদা। যাক্ সে কথা। বাড়ী কেনবার কথা কি বলছিলে?

(ক্রমশঃ)

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৩৫)

সেই রাত্রেই উপেনবাবু মুঙ্গের পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার অভাবনীয় প্রস্থান ব্যাপারে স্বামী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যে ব্যক্তি চিরদিনের তরে সংসারের মায়া, স্বজনের মায়া কাটাইয়া যাইতে পারে—তাহার নিমিত্ত কাহার না প্রাণ কাঁদে? উপেনবাবুর জীবন নাটকের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে আমার চক্ষেও দুইবিন্দু অশ্রু বহিল। হৃদয়খানি গভীর ব্যথার ভারে নিপীড়িত হইল। অশ্রু ব্যথা ছাপাইয়া নীলু যে আমার, একমাত্র আমারি এ আনন্দ অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। আমার নবপ্রাপ্ত প্রাণপ্রিয় ধনটুকুকে কাকাবাবুর কাছে লইয়া যাইতে আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। নানারূপ আকস্মিক ঘটনায় মুঙ্গের আমার বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু ভাল না লাগা আমার একপক্ষের কথা নহে, অপরপক্ষের নিকটে এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না শুনিয়া অগত্যা নীরবেই আমার অপেক্ষা করিতে হইতেছিল।

কিন্তু বেশীদিন প্রতীক্ষা করিতে হইল না। কয়েকদিন পর মঞ্জুর একখানি চিঠি পাইলাম। মঞ্জু লিখিয়াছে—

"দিদি,

তুমি যে এমন তা' জানিতাম না। তোমার ইচ্ছাপুর যাওয়ার কথা শুনিয়া আমার কান্না পাইয়াছিল, আমার কান্নাতেই তখন তোমার ইচ্ছাপুর যাওয়া হইল না।

তুমি মুঙ্গের যাওয়ার সময় আমার কষ্ট হইলেও আমি একটুও কাঁদি নাই, আমার কষ্টের কথা কাউকেও বলি নাই। আশা করিয়াছিলাম—তুমি গেলে দাদাকে লইয়া আসিবে। দাদাকে আনা তো দূরের কথা, তুমি গিয়া সেখানে সংসার পাতাইয়া মনের আনন্দে আছ। যেমন তোমরা তেমনি কাকাবাবু; তোমাকে রাখিয়া আসিয়া—আনিবার নামটি পর্য্যন্ত করিলেন না। আমি কতবার তোমাদিগকে আসিবার কথা লিখিতে চাহিয়াছি কিন্তু কাকাবাবু লিখিতে দেন নাই। সেই দুঃখে এতদিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই। রাগ করিয়া থাকিব, চিঠি লিখিব না, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না।

দিদি, কাকাবাবুর বড় অসুখ। অম্বলের ব্যারাম বাড়িয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল বৈকালে জ্বর হইতেছে। মুখে অরুচি, কিছুই খাইতে পারেন না। এতদিন কাহাকেও কিছু জানিতে দেন নাই বলিয়া আমরা কিছুই জানিতাম না। দুইদিন হইল ব্যারাম খুব বাড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয় আজ তোমাদের চিঠি লিখিতে বলিলেন। দিদি, তোমরা শীঘ্র এস। দেরী করিও না।

মা ডাক্তার ডাকিয়া কাকাবাবুকে দেখাইয়াছেন, কাকাবাবু ঔষধ খাইতে চাহেন না, সাবধানে থাকিতে চাহেন না। তাঁহার জন্ম আমাদের বড় ভাবনা।

দিদি, দাদা কাকাবাবুর কাছে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তোমার নীলুর কথা সব শুনিয়াছি। তোমার নীলুকে দেখিবার জন্য আমরা পথ পানে চাহিয়া আছি। মা ভাল আছেন। তোমরা কেমন আছ? ইতি—

তোমারি—মঞ্জু"

মঞ্জুর পত্রে হর্ষে বিষাদে আমার বক্ষ দুলিয়া উঠিল। পিতৃ পরিত্যক্ত মাতৃহীন শিশুর আদর প্রাপ্তির সম্ভাবনায় আমার দ্বিধা সংশয় তিরোহিত হইল। পরের ছেলে—গলগ্রহ ভাবিয়া তাঁহারা যদি বিরক্ত হন এই ভয়ে সময় সময় আমার কুণ্ঠা হইত। পর না ভাবিয়া, উপদ্রব বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা যে নীলুর আদরের আয়োজন করিতেছেন,

ইহাতে আমার হৃদয়ভার নামিয়া গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কিন্তু যাঁহার নিমিত্ত আমার এত সৌভাগ্য, আমার পিতামাতার শান্তি সুখ, সেই কাকাবাবুর পীড়ার সংবাদে আমার শান্ত হৃদয়ে অশান্তির ঝটিকা বহিয়া গেল। উজ্জ্বল আনন্দভরা জগত আমার নিষ্প্রভ বোধ হইল। আমি তাঁহাকে মঞ্জুর চিঠিখানি দেখাইলাম।

তিনি আদ্যোপান্ত চিঠিখানা পড়িয়া শুষ্কমুখে কহিলেন, "আজ মার চিঠিও পেলাম, তিনিও কাকাবাবুর অসুখের কথা লিখেছেন। মা প্রথমটা অত বুঝ্‌তে পারেন নি, তাই আমায় জানান নি, কাকাবাবু নিজের অসুখের কথা সহজে কাউকে তো জানতেও দেন না! জিজ্ঞাসা করলে হাসিমুখে জবাব দেন 'আমি ভাল আছি, আমার কিছু হয় নি।' অনেকদিন আগে এই অম্বলের ব্যারামে কাকাবাবু শয্যাগত হয়েছিলেন। অনেক চিকিৎসা পত্রের পর ভাল হয়ে ক'টা বছর ভালই ছিলেন। এতদিনের পর সেই পুরানো রোগে আবার ধরেছে—এবার কতদিন ভুগবেন তা ভগবানই জানেন।

স্বামী নীরব হইলে আমি সসঙ্কোচে কহিলাম "কাকা-বাবুর এমন অসুখ, মঞ্জু আমাদের শীগ্‌গীর করে যেতে লিখেছে, আমাদের কবে যাওয়া হ'বে?"

তিনি বলিলেন "আর চার পাঁচ দিন থেকে যেতে পারলে এখানকার কাজকর্ম্ম আমার সারা হ'য়ে যেত। কিন্তু কাকাবাবুর এমন ব্যারাম, দেরী করতে যে ইচ্ছা হয় না। কি করব তাই ভাবছি।"

আমি বলিলাম—"দেওকী লালকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের শীগ্‌গীর যাওয়াই উচিত। যে মানুষ ব্যারামের, কথাটা পর্য্যন্ত আমাদের এতদিন জানতে দেন নি, তিনি যখন যেতে লিখেছেন, তখন কি দেরী করা হয়! দেরী করবার আমার শক্তিও নেই।"

তিনি আমার পানে চোখ তুলিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন "ঠিক বলেছ, এখন দেরী করবার সময় নয়। যা কাজ রইল তা দেওকী লালই করাবে। আমরা কাল রওনা হ'ব। তুমি জিনিষপত্র গুলো আজ থেকেই গুছিয়ে রেখো। নীলু কিষণের বড় বাধ্য হয়েছে, আমার ইচ্ছা কিষণকেও নিয়ে যাই।"

"কিষণ গেলে তো ভালই হয়। দেশ ছেড়ে কিষণ কি আমাদের সঙ্গে যাবে?"

স্বামী তখুনি কিষণকে ডাকিয়া আমাদের সহিত যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিষণ অল্প সময়ের ভিতর নীলুর ভারী অনুরক্ত হইয়াছিল। আমাদের সহিত যাইতে কিষণের আপত্তি হইল না। সে সানন্দে কলিকাতা যাইতে স্বীকৃত হইল।

পরদিন আমরা সকলে কলিকাতা রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

"বন্দিনী"

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানির উপরে "ঐতিহাসিক" কথাটি ছাপা নাই বটে কিন্তু দেশটা মিশর, রাজার নাম "থুথমসিস্", তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী "মিতানির রাজা" সুতরাং আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর ম্যানেজার বাধ্য হইয়া বিজ্ঞাপন দিবার সময়ে লিখিয়াছেন "নবরসাত্মক গীতিবহুল নূতন ঐতিহাসিক নাটক।" গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং যখন আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর ম্যানেজার তখন ছাপা নাটকের প্রথম পাতায় "ঐতিহাসিক" কথাটী লেখা না থাকায় থুথমসিসের সময়ের কাহিনী "অনৈতিহাসিক" বলা চলে না। নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র পাকা মুন্সী। আর একবার "ইরাণের রাণীতে" এই নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র বইখানির প্রথম পাতায় "ঐতিহাসিক" কথাটি না ছাপিয়া বাঙ্গালী পাঠকের চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেবারেই তাঁহার সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এবারে "বন্দিনী" লিখিতে গিয়া মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের দুই একটা নাম লইয়া বন্দিনীর গ্রন্থকার নিজে অধিকতর বন্দী হইয়াছেন।

অপরেশবাবুর মোক্তার বৈকালী-পত্রে ঠিক এইকথা ধরিয়াই নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্রের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই মোক্তারটি বেনামা। খবরের কাগজের নিয়ম অনুসারে সমস্ত বেনামা লেখাই সম্পাদকের ঘাড়ে গিয়া পড়ে। বৈকালীর সম্পাদক স্বনামধন্য নেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র আমাকে জানাইয়াছেন যে তিনি নাট্য-বিনোদ অপরেশ চন্দ্রের মোক্তার নহেন এবং লেখাটি তাঁহার অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে বৈকালী-পত্রে ছাপা হইয়াছে। মোক্তারের মোক্তারীতে সাধারণের কোনই আপত্তি নাই তবে মোক্তার মহাশয় ঐতিহাসিক সত্যের নাম লইয়া কতকগুলি মিথ্যাকথা বলিয়াছেন এবং পরমস্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়কে অনর্থক গালি দিয়াছেন সেই জন্যই বাধ্য হইয়া নাট্যবিনোদের ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

বেনামা মোক্তার মহাশয় বিমানবিহারী বাবুকে কালকার যোগী বলিয়াছেন, তিনি নিজে কতদিন হঠযোগ অভ্যাস করিতেছেন সে কথাটা সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিলেই ভাল হইত। প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গে তাঁহার মতামত প্রকাশের অধিকার আছে কি না তাহাও জানিনা। শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্রের আছে কারণ সে ইতিহাসের বই কিনিয়া পড়ে এবং পড়িয়া বুঝে। কিন্তু নাট্যবিনোদের মোক্তারের লিখিত কথা অপেক্ষা নির্ম্মলচন্দ্রের মুখের কথায় আমার অনেক বেশী বিশ্বাস সেই জন্য নির্ম্মলচন্দ্রের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। আশা করি ভবিষ্যতে মোক্তার মহাশয় নাম সহি করিয়া লিখিয়া ঐতিহাসিক সমাজকে চিরবাধিত করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। আমাদের দেশে নাট্যামোদী সমাজের মধ্যে একটা দল আছেন তাঁহাদের ধারণা যে তাঁহারা উচ্চশিক্ষিত। এই শ্রেণীর নাট্যামোদীরা কোন বিশেষ কারণে সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না। এই জাতীয় একটি পরমশ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ইরাণের রাণী সমালোচনার সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা ইরাণটা কি পারসিয়া ছাড়া অন্য জায়গায় হইতে পারে না?" তিনি পূজনীয় ব্যক্তি সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে, "যে আজ্ঞে না"। পরে শুনিতে পাওয়া গেল যে এই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিটী পরে জানিতে চাহিয়াছিলেন যে কোন রকমে অন্য কোন স্থানে লইয়া যাওয়া যায় কিনা। এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে ইরাণ যেমন পারস্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না মিশর দেশটাকেও সেইরূপ Egypt হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া যায়না। তাহারা অবশ্য সাহিত্যরত্নকে এসিয়াটীক সোসাইটীর অন্যতম সভাপতির গৃহে পাঠাইয়া

অথবা ব্যবসার জোরে Royal Geographical Societyর সভাপতিকে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাজাইয়া দেখিতে পারেন। এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ফতোয়া চলিবে না।

মিশর দেশটা যখন Egypt এবং রাজার নাম যখন থুথমসিস্ তখন বন্দিনীর কালটা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আজ-কাল নাট্যবিনোদের দলের রথীরা নাটকের কাল নির্দ্দেশ করিতে গেলে বড়ই চটেন। কারণ প্রথমতঃ কাল নির্দ্দেশ করিলে ঐতিহাসিক নাটকের কেরামতি ধরা পড়িয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের ছাপা কেতাব পড়িয়া তবে বই লিখিতে হয়, তৃতীয়তঃ বিংশ শতাব্দীর কলা বিস্তার দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচার করিতে গেলে ধরা পড়িতে হয় এবং সর্ব্বশেষে Producerকে সাজ পোষাক ও দৃশ্যপট তৈয়ারী করিবার সময়ে লেখাপড়া শিখিতে হয়। এই সকল কারণের জন্য আমাদের দেশের কলাবিদ্যাবিনোদের কাল নির্দ্দেশের উপরে বড়ই চটা। ইতিহাস, বিশেষতঃ প্রাচীন ইতিহাস তাঁহাদিগের পক্ষে অপ্রিয় সত্য, তাঁহারা যাহা বর্ত্তমান বলিয়া বাজারে বেচিতে চাহেন তাহা ঐতিহাসিকের হাতে পড়িলে অপক্ক কদলী হইয়া যায়। এখনকার কলিকাতা সহরের ব্যবসাদার নাট্যসমাজগুলি যাহা চাহেন নাট্যবিনোদ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র সেই জাতীয় রচনায় সিদ্ধহস্ত। ইতিহাসের বই না পড়িয়া কেমন করিয়া ঐতিহাসিক নাটক লিখিত হয় সে বিদ্যায় তিনি মহামহোপাধ্যায়। বই পড়ে বেকুব, যে বুদ্ধিমান সে বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দেখিয়াই কাজ সারিতে পারে। প্রত্যেক নির্ব্বোধ ঐতিহাসিক প্রতিপত্রে প্রত্যেক কথার প্রমাণ দেয় এবং বুদ্ধিমান ঐতিহাসিকেরা তাহা চাপিয়া যায়। সকলেই আজকাল বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে সকল নাট্যকার নির্ব্বোধ তাঁহারা পয়সা খরচ করিয়া বই কিনিয়া পড়িতে যায় কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা ইতিহাসের বই ধার করিয়া আনিয়া সূচীপত্র দেখিয়া কাজ সারে। নাট্যবিনোদ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বুদ্ধিজীবি এবং অতি সাবধান। তিনি বাঙ্গলা দেশেনাট্যামোদী দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য একখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিলেন, মিশর দেশের ইতিহাসের সূচীপত্র দেখিয়া দুইচারিটী নাম লইলেন, বাকী নামগুলি ভক্তেরা আনিয়াদিল, নিজের প্রতিভাবলে নাট্যবিনোদ একটী ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি করিলেন। প্রমোদ উদ্যানের মাধবীলতা বিতানে কবি কাব্যকলা কিলাইয়া পাকাইলেন সঙ্গে সঙ্গে নাট্য সমাজের অধিকারীদের অধরে অপরিষাপ্ত অধরসুধা সঞ্চিত হইল। সেই সুধা-সঞ্চিত কদলী নাট্য-সাহিত্যের বাজারে উচ্চমূল্যে বিকাইবে এই আশায় তাহাকে রঙ্গমঞ্চের বাজারে আনা হইল। তাহা যে রামপালের অমৃত সাগরের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনগরের চিত্রিত দগ্ধমৃত্তিকা এই কথা বলিয়া বেচারা ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার অনর্থক গালি খাইল।

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের উপরে নাট্য-সাহিত্যের মোক্তার যে পরিমাণে আবর্জ্জনা বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় সে বেচারা যথোপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছে মনে করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছে। আমি এ-যাত্রায় নাট্যবিনোদ ও তাঁহার কুণ্ডলীর কৃপা কটাক্ষপাতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র বুদ্ধিজীবি। তিনি সহজে ধরা পড়িতে চাহেন না, নাট্য সাহিত্যে যদি পুলিশ থাকিত আমার বিশ্বাস যে তাহা হইলেও তিনি জেরার জোরে বাঁচিয়া যাইতেন। মিশর দেশের নির্ব্বোধ ইতিহাস লেখকেরা বলে যে থুথমসিস নামে চারিজন রাজা ছিলেন, বুদ্ধিমান নাট্যবিনোদ তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের Strategic retreatএর পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন, তাঁহার নাটকে থুথমসিসের নাম আছে বটে কিন্তু কোন থুথমসিস তাঁহার নাটকে উল্লিখিত সেকথা তিনি বলিয়া দিলেন না। ইহাই বিংশ শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য নাট্যকলা!

নির্ব্বোধ ঐতিহাসিকেরা বলে যে, যে চারিজন থুথমসিস মিশর দেশের রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ঐ দেশের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশের রাজা। প্রধান নির্ব্বোধ বেকুব ঐতিহাসিক মাসপেরো ফরাসী ভাষায় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন তাহার এক খণ্ডের নাম "The struggle of the nations" এই গ্রন্থখানি ১৮৯৮খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে 'মাস্ পেরোর, তিন খানি গ্রন্থ এককালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

পাঠ্য ছিল কিন্তু এখন মিশরের ইতিহাস সম্বন্ধে নাট্যবিনোদের দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় Gaston Masperoর কথা আর বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাহার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় নির্ব্বোধ ঐতিহাসিক Breastedএর ইতিহাস সর্ব্বজন পাঠ্য হইয়াছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে James Henry Breastedএর মিশর দেশের ইতিহাসের পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। Breasted ও Maspero ধরিয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিব যে 'বন্দিনী' রচনা কালে নাট্যবিনোদ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র কোন ছাপা বই পড়িয়া লিখিবার অবসর পান নাই, বুদ্ধির বলে কেতাবের মলাট দেখিয়া বীরদর্পে ইতিহাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন।

মিশরের ইতিহাস সম্বন্ধে বন্দিনী নাটকে নাট্যবিনোদ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র সত্যের বিরুদ্ধে যে কয়টা মিথ্যা কথা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অমার্জ্জনীয়—

(ক) "আপনারা জানেন, আমি অপুত্রক। এ্যামস্ মিশরের গর্ব্ব রক্ষা করে আমার পুত্রেরই কার্য্য করেছে। আমি সগর্ব্বে, সানন্দে আমার একমাত্র কন্যাকে এ্যামসের করে সমর্পন ক'চ্ছি।"

বুদ্ধিমান নাট্যবিনোদ এই কথাটী মিশরের রাজা থুথমসিসের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। মিশরে অন্ততঃ চারি জন থুথমসিস রাজত্ব করিয়াছিলেন—

(১) প্রথম থুথমসিস—তাঁহার সম্বন্ধে Maspero বলেন "Thutmosis I was left with only one son—a Thutmosis like himself to succeed him—" Maspero's 'Struggle of the Nations' p. 236.

Breasted বলেন "Among other children Thutmose I had also two sons by other queens—one, who afterward became Thutmose II, was the son of a princess Mutnofret; while the other, later Thutmose III, had been born to the king by an obscure concumine named Isis. "J. H. Breasted—A History of Egypt, London 1919, p. 267.

(২) দ্বিতীয় থুথমসিস—অপরেশ বাবুর মোক্তারের কথা অনুসারে তিনি Masperoর গ্রন্থ দেখিয়া বন্দিনী নাটক লিখিয়াছেন। এই Maspero বলেন "By his marriage with his sister, Thutmosis left daughters only, but he had one son, also a Thutmosis by a woman of low birth." The Struggle of the Nations. p. 243.

(৩) তৃতীয় থুথমসিস—Masperoর মতে তৃতীয় থুথমসিসের পুত্রের নাম দ্বিতীয় আমেনোথিস, "Amenothies II who succeeded him, must have closely resembled him, if we may trust his official portraits. He was the son of a princess of the blood, Hatshopsitu II, daughter of the great Hatshopsitu."—ibid pp. 289—90.

Breasted বলেন, "Amenhotep II had reigned as co-regent but a year when his father died and the storm broke."—History of Egypt, p. 323.

(৪) চতুর্থ থুথমসিস—Masperoর মতানুসারে চতুর্থ থুথমসিসের পুত্রের নাম তৃতীয় আমেনোসিস, "One of the two heiress—princesses, Khuit, the daughter Sistu, and wife of a king, had no living male offspring, but her companion Mutemuan had at least one son, named Amenothes" The Struggle of the Nations. p. 295.

Breasted বলেন, "The son who succeeded him was the third of the Amenhoteps and the last of the great Emperors."—History of Egypt p. 329

(খ) নাট্যবিনোদ অপরেশ চন্দ্রের দ্বিতীয় মিথ্যাকথা মিতানি জাতি কর্ত্তৃক মিশর দেশের জালু নগর আক্রমণ। "আজ আমার জয় নয়—সকলে সমস্বরে বল "সেনাপতির জয়!" তিনিই মিতানীর আক্রমণ থেকে তোমাদের এই নগরী রক্ষা করেছেন।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা কারণ মিতানী জাতি কখনও মিশর দেশের কোন নগর আক্রমণ করে নাই এবং উক্ত জাতি কর্ত্তৃক জালু নগর অবরোধের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। নাট্যবিনোদের মোক্তার মহাশয় Masperoর দোহাই দিয়াছেন কিন্তু Masperoর ইতিহাসের কোন পত্রে মিতানী জাতি কর্ত্তৃক মিশর দেশ আক্রমণের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(গ) মিশর দেশের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশে কোন রাজার আরভিয়া নাম্নী কোন কন্যা ছিল না। প্রথম থুথমসিসের কন্যার নাম হাৎসোপসিতু, তাহার সহিত তাহার ভ্রাতার বিবাহ হইয়াছিল। আরভিয়া নামটী গ্রীক নাম, মিশর দেশের কোন স্ত্রীলোকের নাম আর্ভিয়া হওয়া সম্ভব নহে। বোধ হয় নাট্যবিনোদের কোন ভক্তবিনোদ নামটী যোগাইয়া দিয়াছেন।

এই তিনটী বড় মিথ্যাকথা ছাড়া নাট্যবিনোদ শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্রকে ছোট ছোট অনেক মিথ্যা কথার আশ্রয় করিয়া বন্দিনী নাটক রচনা করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত গুলিই ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ। আশা করি এই নাট্যকার ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক নাটক রচনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণার্জ্জুন, রামানুজ, সুদামা, অপ্সরা প্রভৃতি কল্পনা-জাপক নাটকে নিজের লেখনীকে আবদ্ধ রাখিবেন।

একমিনিট

[শ্রীবাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যায়]

নববিবাহিতা পত্নী। দেখ একটা গুরুতর কথা আছে; কিন্তু তা-শুনেও কি তুমি আমাকে পূর্ব্বের মত ভালবাসবে? আমার দাঁতগুলো সব বাঁধান!

স্বামী। (মাথা হইতে পরচুলা খুলিয়া আরামের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া)—"আঃ বাঁচা গেল! মাথাটা একবারে ঘেমে নেয়ে গেছে।"

কেশ-বিন্যাস
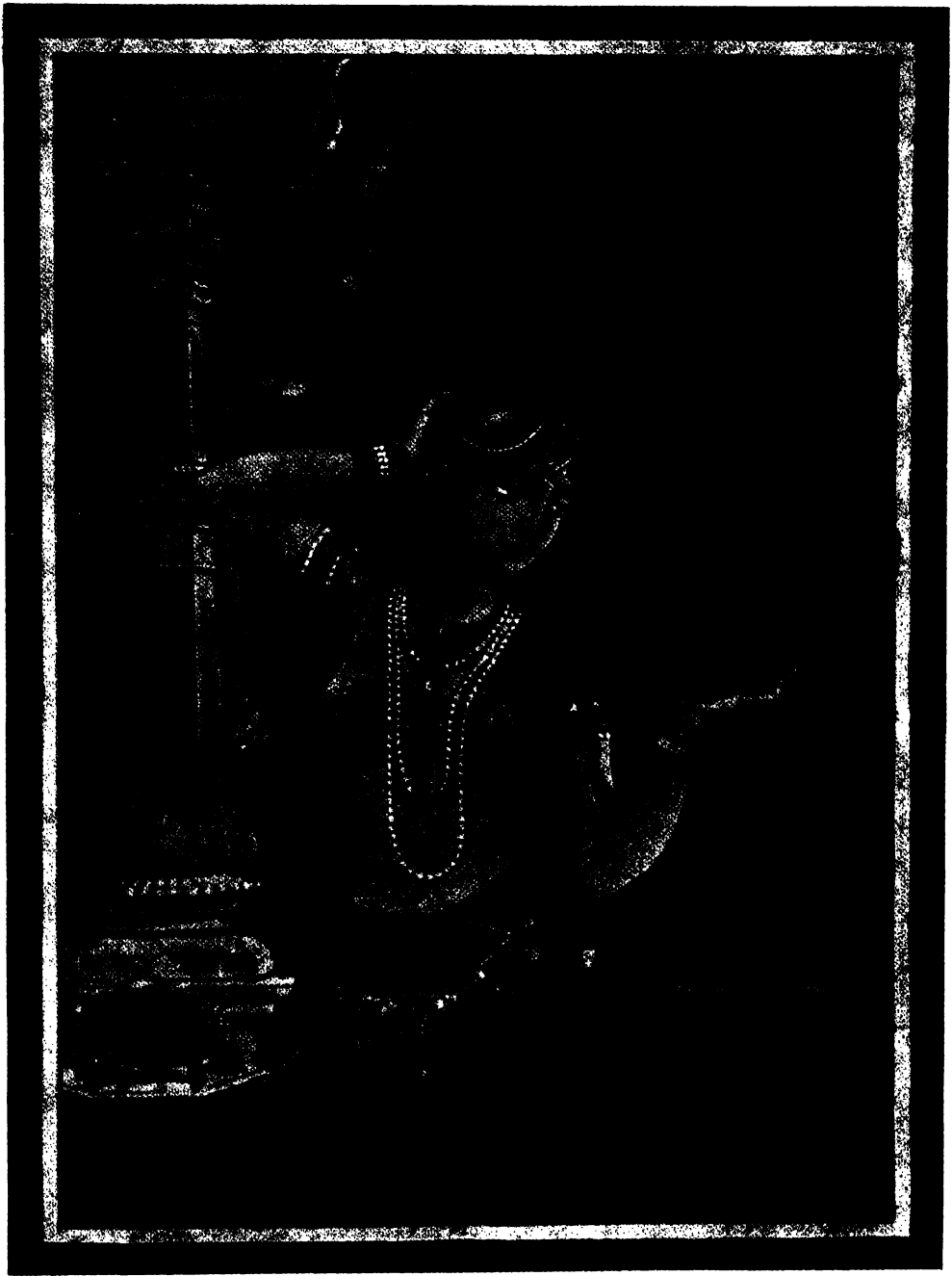
মেসার্স সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ এর সৌজন্যে—

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]　　১২ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২ ।　　[২৪শ সপ্তাহ

নারী-বিদ্রোহ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন]

কৌঁসুলি

"পলট্ দে রায়　　হাকিমকী
পলীডার হো　　তো এইসী হো"

"সুপারিন্টেডেন্ট পদী পিসী—
তার Underএ কলম পিষি।"

"—এ পাহারাওয়ালা মাঈ
গোড় লাগি ছোড় দে ভাই।"

"ক্রমে ক্রমে হৈল জজিয়তী।"

পরাজিত গ্রীস

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

(১)

গ্রীসে তুর্কীতে লোক বিনিময় চলিতেছে। জগতের ইতিহাসে এ এক অদ্ভুত কাণ্ড। হাজার হাজার মুসলমান গ্রীস হইতে তুর্কীতে ফিরিয়া আসিতেছে। আবার হাজার হাজার গ্রীক তুর্কী হইতে গ্রীসে ফিরিয়া আসিতেছে। লোজানের সন্ধি অনুসারেই এই অদল-বদল অনুষ্ঠিত হইতেছে। তত্ত্বাবধান করিতেছেন জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ।

এতগুলা নরনারী চালান করা মুখের কথা নয়। জাহাজ ভাড়া রেল ভাড়া ত আছেই, তাহার উপর নতুন দেশে পৌঁছিবার পর গৃহস্থালী পাতিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া আরও কঠিন কথা। চলাচলের অবস্থায় জনগণের স্বাস্থ্য এবং খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা বিশেষ মনোযোগ-সাপেক্ষ। কি গ্রীস, কি তুর্কী উভয় দেশেই এই সকল নতুন অতিথিকে গৃহে ঠাঁই দিবার জন্য যারপর নাই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইতেছে। দুই মুল্লুকেই এই উপলক্ষে মস্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে।

তাহার পর যে সকল লোক গ্রীস হইতে তুর্কীতে ফিরিয়া আসিতেছে তাহারা তুর্ক এবং মুসলমান বটে। কিন্তু আনাতোলিয়ার মুসলমানদের ধরণ-ধারণ লেন-দেন আদব কায়দা তাহাদের পক্ষে অজ্ঞাত। সেইরূপ যে সকল গ্রীক জাতীয় নরনারী আনাতোলিয়া হইতে গ্রীসে ফিরিতেছে তাহারাও গ্রীসের আবহাওয়ার একদম অনভ্যস্ত। নতুন নতুন মুল্লুকে আসিয়া স্বদেশী বনিয়া যাওয়া দুই এক দিনে সম্ভব নয়। যাহা হউক মানব সমাজে একটা বিরাট পরীক্ষা চলিতেছে। এমন কাণ্ড এরূপ বিস্তৃতভাবে পৃথিবীতে আর কখনো ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

(২)

গ্রীসে তুর্কীতে যখন লড়াই চলিতেছিল তখনই বহু সংখ্যক গ্রীক তুর্ক মুল্লুক হইতে "স্বদেশে" অর্থাৎ স্বজাতীয় নরনারীর মুল্লুকে পলাইয়া আসিয়াছিল। এই সকল পলাতকের সংখ্যা প্রায় ১,১৩৫,৪০০—তাহার পর সন্ধি অনুসারে অদল-বদল সুরু হইয়াছিল। দুই লাখ গ্রীকের সঙ্গে দুই লাখ তুর্কের বিনিময় সাধিত হইয়াছে।

প্রায় সাড়ে তের লাখ নতুন লোক গ্রীসে হাজির! গ্রীক মুল্লুকে ইহারা অজ্ঞাত কুলশীল। ইহাদিগকে গ্রীক বানাইয়া স্বদেশী করিয়া তোলা সরকারের প্রধান ধান্ধা। কিন্তু তাহার গোড়ার কথা হইতেছে এই সকল লোককে অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রাণে বাঁচানো।

গ্রীক রাষ্ট্র এমন কিছু ধনসম্পদশালী নয়। ভারতের ছোট ছোট প্রদেশ গুলার যেরূপ আর্থিক অবস্থা গ্রীসের অবস্থাও তদ্রূপ। কাজেই আমেরিকায়, জার্ম্মাণীতে বা অন্যান্য ধনী দেশে নির্দ্ধনদের জন্য যেরূপ সুব্যবস্থা করা হয় গ্রীসে তাহা সম্ভবপর নয়। সাড়ে তের লাখ নতুন লোকের খোরপোষ জোগাইতে যত টাকা লাগে তত টাকা গ্রীসের পক্ষে খরচ করা অসম্ভব। জনপ্রতি রোজ মাত্র এক দ্রাখ্‌মে (তিন পয়সা) ছাড়া গবর্ণমেণ্ট আর বেশী কিছু দিতে অসমর্থ। তবে কম্বল এবং কাপড় চোপড়ও দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকার "লাল ক্রস সমিতি" হইতে গ্রীকেরা অনেক টাকা সাহায্য পাইয়াছে। অধিকন্তু অন্যান্য বিদেশীয় লোক-হিত সঙ্ঘও এই সকল "প্রত্যাগত" গ্রীক নরনারীর হিকমত করিতেছে!

তাহা সত্ত্বেও গ্রীক গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে আর্থিক চাপ অনেক। ১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই দফায় ষোল ক্রোর দ্রাখ্‌মে (প্রায় এককোটী ভারতীয় মুদ্রা) সরকারী খরচ রূপে সাব্যস্ত দেখিতেছি।

(৩)

দান খয়রাত করাই গবর্ণমেণ্ট অথবা লোকহিত সঙ্ঘের

একমাত্র মতলব নয়। প্রত্যাগত নরনারীকে নতুন নতুন কাজে বাহাল করিয়া দিবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। এইজন্য আথেন্স সহরে এক কমিটি কায়েম হইয়াছে।

ইতিমধ্যে প্রায় বিশ লাখ বিঘা জমিন নতুন চাষের অধীনে আসিয়াছে। প্রত্যাগতেরা গ্রীসের নানা জনপদে নতুন নতুন পল্লী গড়িয়া তুলিতেছে।

আবাদ চালানো আর পল্লী গঠন বিনা পয়সায় সম্ভবপর নয়। এইজন্য টাকা দরকার। সেই টাকা জুটিতেছে ব্যবসাদারী বুদ্ধিওয়ালা লোকের নিকট হইতে। আথেন্সের "ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক" সাড়ে বার ক্রোর দ্রাখ্‌মে (প্রায় সত্তর আশী লাখ টাকা) কমিটিকে ধার দিয়াছে। কমিটির তদবিরে চাষীরা টাকা ধার পাইতেছে।

ব্যাঙ্কের লাভও হইয়াছে বেশ। গ্রীস হইতে যে সকল খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বুঝা যায় যে,—গ্রীস মুল্লুকে কৃষিকর্ম বিশেষ উন্নতি লাভ করিবার পথে উঠিয়াছে। নয়া চাষীরা নতুন নতুন প্রণালীতে আবাদ চালাইতেছে। দেশ ভরিয়া আর্থিক নব জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট একটা নতুন ব্যাঙ্ক কায়েম করিবার মতলবে আছে। ব্যাঙ্কের নাম হইবে কৃষি-ব্যাঙ্ক। চাষীদিগকে চাষের জন্য টাকা ধার দিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্কের জন্ম। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত-দেশে এইরূপ কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে।

(৪)

গ্রীক গবর্ণমেণ্ট প্রত্যাগত গ্রীকদের জন্য আর্থিক সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতেছে দেখিয়া নানাদেশের "হাভাতে" "হাঘরে" লোকেরা গ্রীসে আসিয়া জুটিতেছে। সরকারী খরচে অথবা লোকহিত সঙ্ঘের খৈরাতির উপর নির্ভর করিয়া তাহারা কিছু কিছু রোজগারের ফিকির করিতেছে। তাহার উপর "গোলে হরিবোল" চালাইয়া বিদেশী বলশেভিকরা এই ভিঁড়ের ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

আসল গ্রীক প্রত্যাগত ও পলাতক দিগকে এই সকল বিদেশীর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক কড়া আইন জারি করিয়াছে। অতি সহজে কোনো বিদেশী লোক গ্রীসে প্রবেশ করিতে পারে না। ট্যাঁকে পয়সার জোর কতটা তাহা খোলাখুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া না দিতে পারিলে কোনো পর্য্যটক গ্রীক সরকারের "পাশ" পায় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও চিরকালই এই নিয়ম আছে।

অধিকন্তু ছোঁআচে রোগওয়ালা নর নারীকে গ্রীসে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময়ও প্রত্যেক পর্য্যটককে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পাশ হইতে হয়।

(৫)

ইতালির কাগজে দেখিতেছি—পররাষ্ট্রনীতি লইয়া গ্রীসের সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। গ্রীকদের জবর শত্রু যুগোস্লাভিয়া। এই দেশের সঙ্গে একটা বনিবনাও কায়েম করিবার জন্য গ্রীকেরা বহুদিন ধরিয়া মাথা ঘামাইতেছে। কিন্তু কোনো মতেই কিনারা হইতেছে না।

যুগোস্লাভিয়া চায় ঈজিয়ান সাগরে প্রভুত্ব। এই সাগর গ্রীস ও তুর্কীর মধ্যবর্ত্তী জলভাগ—গ্রীসের হ্রদ বিশেষ। সালোনিকি পর্য্যন্ত যুগোস্লাভিয়ার রেল আছে। এইখানে যুগোস্লাভিয়ার খানিকটা কেরদানি খাটে! কিন্তু রেলটা আগাগোড়া গ্রীক জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগোস্লাভিয়ার মতলব,—গ্রীস তাহাকে এই রেলের মারফৎ সালোনিকি পর্য্যন্ত সকল জমিনের একতিয়ার প্রদান করুক। অবশ্য গ্রীস তাহার নিজ একতিয়ার ছাড়িতে রাজি নয়।

ত্যাগ

(গল্প)

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

[১]

তুষারের স্ত্রী রাণী দারজিলিং হইতে যখন তুষারের আবাল্য বন্ধু নীরোদ রঞ্জনের পত্র পাইল তখন যেন তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। রাণী যে কেবল নীরোদ রঞ্জনের পত্র মারফৎ এই সংবাদ শুনিল তাহা নহে, বহুদিন হইতে কাণাঘুষা তুষারের চরিত্র সম্বন্ধে সে শুনিয়া আসিতেছে— এতদিন সেকথা বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, একথা যে কখনও সত্য হইতে পারে এরূপ কল্পনাও সে করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল—একি সত্য তাহার স্বামী—আজ পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া যাহাকে সে প্রাণের চেয়ে ভালবাসিয়াছে—যাহার চরিত্র দেবদুর্লভ চরিত্র বলিয়া মনে মনে নিজে কত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে—স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর চরিত্রের মহত্ত্ব—স্বামীর হৃদয়ের প্রত্যেক কোণটি পর্য্যন্ত যে তার চক্ষে উজ্জ্বল। তাহার সেই স্বামী যে এরূপ হইতে পারে, একথা যে কিছুতেই তাহার প্রাণ বিশ্বাস করিতে চায় না। বার বার কেবলই মনে হইতে লাগিল—তাহার স্বামী—সে যে দেবতার চেয়েও মহৎ-উদার, তাহার স্বামীর হৃদয় যে তাহারই ভালবাসায় পূর্ণ—সে হৃদয়ে অপরের স্থান! না-না, এ অসম্ভব—যে যা বলে বলুক, সে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না ··· পারিবে না—তবে একথা ওঠে কেন? তাহার স্বামীর পবিত্র চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপিত হয় কেন? একি, সে কি পাগল হইয়া যাইবে? তাহার স্বামী যে পতিতা নারীর নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিত না—একমাত্র রাণী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যাহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই —যাহার চরিত্রের তুলনা হয় না, সেই স্বামী—তার প্রতি অবিশ্বাস! দর দর ধারে রাণীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল—প্রাণ আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল, এখনই এই মুহূর্ত্তে সে ছুটিয়া কলিকাতায় স্বামীসকাশে গিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বক্ষে মুখ লুকাইয়া চোখের জলে তাহার মনোবেদনা দূর করে। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—এমনি সময় তাহার একমাত্র পুত্র মণ্টু দৌড়াইয়া আসিয়া 'বৌমা' বলিয়া জড়াইয়া ধরিল। রাণী পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দুই বৎসরের শিশু মণ্টু মার এইরূপ ভাব দেখিয়া কেমন যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে এক সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ আসিয়া ডাকিল 'বৌমা'!

রাণী ধড়মড়িয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে চোখের জল মুছিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উত্তর দিল—"বেড়িয়ে এলেন বাবা?"

বালক পিতামহকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "দাদু, বৌমা কান্‌চে।"

রাণী পুত্রকে ধমকাইল, পরে শ্বশুরের দিকে ফিরিয়া মুখে জোর করিয়া হাসি আনিয়া বলিল—"না বাবা।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল—চোখ পুনরায় জলে ভরিয়া আসিল।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুষারের চিঠি পেয়েছ বৌমা?" রাণী মাথা নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে উত্তর দিল, না—এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানত্যাগ করিল।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া ডাকিলেন—"রামহরি"—বহির্ব্বাটী হইতে উত্তর আসিল "আজ্ঞে যাই।" সঙ্গে সঙ্গে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ হরকুমারবাবু বলিলেন "রামহরি এক্ষুনি তুষারকে টেলিগ্রাম করো যে কালই আমি বৌমাকে নিয়ে কলকাতা রওনা হ'ব—সেখানে বৌমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে সেই দিনই

রাত্রের গাড়ীতে মফস্বলে বেরিয়ে পড়ব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে—সমস্ত ঠিক করে নাও।"

"যে আজ্ঞে।"

হরকুমারবাবু আবার বলিলেন—"এক্ষুণি টেলিগ্রাম করে এস যেন কালকের মেলে সে গাড়ী নিয়ে attend করে—আর আজই ষ্টেশনে গিয়ে একটা গাড়ী রিজার্ভ করে এস।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া রামহরি প্রস্থান করিল। অপর দিক দিয়া একখানি রেকাবী হাতে রাণী কিছু মিষ্টান্ন ও একগ্লাস জল লইয়া বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বলিল—"বাবা একটু জল খান।"

বৃদ্ধ নিকটস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া রাণীর হাত হইতে রেকাবীখানি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মণ্টু?"

"সে খাচ্চে বাবা।"

বৃদ্ধ ডাকিলেন—"দাদু—"

নেপথ্য হইতে বালক মণ্টু বিস্কুট খাইতে খাইতে দৌড়াইয়া আসিয়া দাদুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হরকুমারবাবু কয়েক মিনিট পরে বলিলেন—"বৌমা সমস্ত গোছগাছ করে নাও, কালই সকালের মেলে কলকাতা যেতে হ'বে।"

রাণী হঠাৎ শ্বশুরের মুখে একথা শুনিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। হরকুমারবাবু পুনরায় বলিলেন—"তোমার শরীর ত বেশ সেরেছে—আর আমায় আজকালই একবার মফস্বলেও যেতে হ'বে। আদায় পত্রের সময় এখন না গেলে আর পরে যাওয়া না যাওয়া সমান তাই মনে করচি কালই রওনা হ'য়ে তোমাকে কলকাতায় পৌছে দিয়ে আমি কিছুদিনের জন্য মফঃস্বল চ'লে যাব।"

বলিয়া রাণীর হস্তস্থিত গ্লাসটী লইয়া জল খাইয়া ডাকিলেন "ওরে রামা তামাক দে"

রাণী "যাই পান নিয়ে আসি" বলিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া মনে মনে বলিল—"ভগবান—দুখিনীর মুখ রেখ—যেন কলকাতায় গিয়ে শুনি সব মিথ্যা।"

[২]

রাত তিনটা বাজিয়া গিয়াছে—কলিকাতা সহরের রাস্তা—রাত তিনটার সময়ও নির্জ্জন নয়—বৃদ্ধাগণ মালা জপিতে জপিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে; ময়লার গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়া চলিতে সুরু করিয়াছে।

এমনি সময় একখানি ট্যাক্সি আসিয়া বিডন ষ্ট্রীটে এক দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সিল্কের পাঞ্জাবী পরিহিত—Crocodile shell ফ্রেম বিশিষ্ট গোল গোল চশমা চোখে তুষারবাবু ট্যাক্সি হইতে নামিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া কড়া নাড়িলেন—কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য গঙ্গাচরণ চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তুষার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে গঙ্গাচরণ বলিল "রাত শেষ ক'রে এয়েচ খোকাবাবু, কর্ত্তার টেলিগ্রাম এয়েচে যে।" তুষার চমকিয়া উঠিল "টেলিগ্রাম—কই দেখি!" ভৃত্য সুইচ্ টিপিয়া বাতী জ্বালিল এবং খামশুদ্ধ টেলিগ্রাম খানি আনিয়া উৎকণ্ঠিত তুষারের হস্তে প্রদান করিল—তুষার ক্ষিপ্র-হস্তে খাম ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম বাহির করিয়া পড়িল "Starting to day attend tomorrow mail—Harakumar."

তুষার একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "যাক্ অসুখ বিসুখ কিছু নয়, ওরা আসচে"—ভৃত্য গঙ্গাচরণ আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "কবে—কবে?"

তুষার একটা ধমক দিয়া বলিল "কাল রে ব্যাটা—তা তুই অত লাফাচ্ছিস কেন? আহাম্মুক।"

বলিতে বলিতে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া তুষার শয়ন করিল—দেয়ালস্থ বৃহৎ ক্লক ঘড়ি ঢং করিয়া সাড়ে তিনটা ঘোষণা করিল। শুইয়া শুইয়া তুষার ভাবিতে লাগিল—কতদিন—কতদিন—প্রায় নয় মাস পরে রাণী আসচে—কতদিন পরে আবার তাহার রাণী তাহারই কাছে ফিরে আসচে—কই এতেতো তেমন আহ্লাদ হচ্চে না। কেন? কেমন যেন একটু ভয় ভয় করচে কেন?—রাণী ফিরে আসচে—কোথায় প্রাণ তার আনন্দে নেচে উঠবে—না কেমন যেন একটু অসোয়াস্তি—না না একি সে ভাবিতেছে! আবার কতদিন পরে রাণীকে বুকে জড়িয়ে ধরবে—কিন্তু

কিন্তু একি! উৎসাহ কমে আসে কেন? এ বুকে কি রাণী তেমনি করে লুটিয়ে পড়তে পারবে? এ বুক—যে বুকে একমাত্র রাণীরই অধিকার ছিল সেই বুকে সে যে আর একজনকে স্থান দিয়েছিল! কি করেছিল—সে কি করেচে! রাণীর কাছে—তাহার প্রাণের প্রতিমার কাছে অবিশ্বাসী হয়েছে! আর রাণী হঠাৎই বা চলে আসচে কেন—কই সে দিনও ত তাহার বাবা তাহাকে পত্র লিখেচেন—তাতে ত আসবার কথা কিছু লেখেন নি! তবে—তবে কি তারার কথা কিছু জানতে পেরেছে?—কিন্তু তারা ত সাধারণ বেশ্যার মত নয়—আর ওর বাড়ীতে দু'এক দিন বেড়াতে যাওয়া কি মস্ত একটা বড় অপরাধ? সে মনে করিল আর ভাবিবে না—কিন্তু চিন্তা আবার অজ্ঞাতে মনে আসে কেন? সে ত রাণীকে তেমনি ভালবাসে—কই সে ভালবাসার ত এতটুকুও ব্যতিক্রম হয় নি—তবে--তবে কেন এসব মনে আসে? অনেকদিন চিঠি লেখেনি—তা সে—সে ত রাগ করে, অভিমান করেই লেখেনি—তাতেই কি রাণী তাহার হৃদয় থেকে সরে যাবে? তুষার ঘুমাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু ঘুম যেন আজ তাহার সমস্ত প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়াছে। আবার ভাবিতে লাগিল কতদিন—কতদিন হলো রাণী বাপের বাড়ী বর্দ্ধমান চলে গিছলো, সেখানে তার সেই বাড়াবাড়ি অসুখ—অসুখ সারতেই তুষারের পিতা তাকে নিয়ে দারজিলিং চেঞ্জে চলে যান—সে আজ প্রায় নয় মাস! এই নয় মাস রাণী তাহার কাছ ছাড়া—এতকাল পর আজ রাণী আবার তাহারই কাছে ফিরে আসছে—তাতে কোথায় আনন্দে সে দিশেহারা হবে—না—একি! তারা—না না, একি—তারার কথা মনে আসে কেন? আর তার বাড়ীর ছায়া সে কিছুতেই মাড়াবে না।—একটা কাতর দৃষ্টি তাহার মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিল—সে ঠিক করিল আর একদিন মাত্র যাবে—বলে আসবে আর নয়, আর সে আসবে না—রাণীর মনে সে কষ্ট দিতে পারবে না।

ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল। একি! আজ ঘুম নেই কেন? তুষার উঠিল—কুঁজা হইতে কাঁচের গেলাসে জল ঢালিয়া পান করিল, তারপর ফ্যানের গতি বাড়াইয়া দিয়া পুনরায় শয়ন করিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা দশটা বাজিয়া গেল বিশ্বাসী ভৃত্য গঙ্গাচরণ একবার খোকাবাবুর ঘরে যায় আবার খোকাবাবু ঘুমাইতেছে দেখিয়া ফিরিয়া আসে, তাহাকে তুলিতে ইতঃস্তত করে, অথচ এদিকে ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছে—এইবেলা গাড়ী পাঠান উচিত। তাহার মনে পড়িল মণ্টু আসিতেছে,—বউমা আসিতেছে! আনন্দে বৃদ্ধ আত্মহারা হইয়া উঠিল—সে ত আজকের ভৃত্য নয়, সে যে তুষারকে এতটুকু বেলা হইতে মানুষ করিয়াছে। কর্ত্তাবাবু যে তার হাতেই খোকা বাবুকে কলকাতায় রাখিয়াছেন। সে আর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারিল না—হৈ চৈ করিয়া বাটীর অপর চাকরদের ডাকিয়া সোরগোল করিয়া—ড্রাইভারকে ডাকিয়া নিজেই হুকুম দিয়া গাড়ী বাহির করিয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরকুমারবাবু রাণী প্রভৃতিকে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। ষ্টেশনে ভৃত্য গঙ্গাচরণকে একা দেখিয়া তুষারের ষ্টেশনে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভৃত্য যথাযথ উত্তর দিলে হরকুমার বাবুর বাৎসল্য পরিপূর্ণ হৃদয়ে আশঙ্কা হইল "কোন অসুখ করে নাই ত?" ভৃত্যের আশ্বাস প্রদানেও বৃদ্ধের মনটা যেন স্থির হইতে পারিল না।

আর রাণী মোটরে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—একি হইল—আজ এতদিন পরে আমি আসচি জেনেও পূর্ব্বে খবর দেওয়া সত্ত্বেও একবার ষ্টেশনে আসবার সময় হ'ল না? নিশ্চিন্তে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছেন? এ কি! এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম কেন? কই, আমিত কাল সমস্ত রাত ট্রেণে ঘুমাইতে পারি নাই, তবে কি আমায় সত্যিই ভুলিয়াছেন? তবে কি পোড়া লোকের কথাই ঠিক্—নীরোদ বাবুর প্রাণঘাতি পত্রের কথা কি তবে তাহার পোড়া বরাতে সত্যই হইবে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। বুকের সমস্ত রক্ত যেন চোখ দিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। প্রাণপণে সে ঠোঁট কামড়াইয়া চোখের জল রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সশব্দে মোটর আসিয়া গৃহদ্বারে থামিল। হরকুমার বাবু

গাড়ী হইতে নামিয়াই একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুষার এখনও ঘুমুচ্চে ?"

"হ্যাঁ কর্ত্তাবাবু।"

বৃদ্ধ আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, উৎকণ্ঠিত চিত্তে ক্ষিপ্রপদে তুষারের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তুষার তখনো অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। বৃদ্ধ তুষারের বক্ষে ললাটে হাত দিয়া বুঝিলেন কোন অসুখ করে নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া পাশের কক্ষে উপবেশন করিয়া ডাকিলেন "ওরে তামাক দিয়ে যা"—

পরে কেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল বুঝি তোর খোকাবাবু থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তাবাবু, রাত তিনটের সময় খোকাবাবু এসেছেন।"

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া একটা আরাম কেদারায় বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

রাণী উদ্বেলিত হৃদয়ে অশ্রু রোধ করিয়া ধীরে ধীরে তুষারের শয়ন কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পলকহীন চোখে তুষারের যৌবন দৃপ্ত সুন্দর মুখপানে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার পাশে উপবেশন করিল,তারপর অতি সন্তর্পণে মুখ নত করিয়া নিদ্রিত তুষারের গণ্ডে একটী চুম্বন দান করিল।

ধড়মড়িয়া তুষার উঠিয়া বসিতেই সম্মুখে দেখিল রাণী বসিয়া আছে! তাহাকে দেখিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বিস্মিত হইয়া রাণীকে দুই বাহুমধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বিম্বাধরে একটি সুদীর্ঘ চুম্বন প্রদান করিল। মুহূর্ত্তে সমস্ত চিন্তা অশান্তি রাণীর মন হইতে সরিয়া গেল—একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল--তুষারের প্রসারিত বক্ষে রাণী মুখ লুকাইল।

[৩]

রাত ৯টা।

রামবাগানে তারার প্রকোষ্ঠে তুষারের বাহুমধ্যে আবদ্ধ তারা। তুষার একটা তাকিয়ার উপর আড় হইয়া পড়িয়া আছে, তারা তাহারই বক্ষে মুখ রাখিয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া আছে। উভয়ে নিস্তব্ধ, মাত্র দেয়ালস্থ ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। ধীরে ধীরে তারার মুখ তুষারের মুখের কাছে উঠিয়া আসিল—ধীরে ধীরে তুষারের ওষ্ঠে তারার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল মুহূর্ত্তের জন্য তুষারের ভ্রূকুঞ্চিত হইল, মুখে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইল। তারা তাহা লক্ষ্য করিল হাসিয়া তুষারের গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া বলিল "বারে তুমি না কি ঘেন্না করনা--তবে এমন মুখ সেঁটকাচ্ছ কেন ?"

তুষার বলিল "সত্যিই তারা আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি—কেমন যেন হ'য়ে যায়। মনে হয় যে এই মুখে—যাক্ সে কথা—শুনলে তোমার কষ্ট হ'বে।"

তারা অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল "এখনও এত ঘেন্না রয়েছে ? তবে এখনও ফের—এখনও ইচ্ছে করলে ফিরতে পার্ব্বে ; লজ্জা, ঘৃণা এখনও তোমার আছে--পরে হয়তো আর ফিরতে পার্ব্বে না।"

"সত্যিই তারা আমি তাই ভাবি—কি ছিলাম আর কি হয়েছি! আমার চরিত্র যে একটা গর্ব্ব করবার জিনিষ ছিল—জীবনে কখনও যে একাজ করি নি—তোমাদের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে ঘৃণা বোধ করেছি আর আজ সেই আমি আমার কি শোচনীয় অধঃপতন! উঃ ভাবতেও পারি না—যাক্ অন্যকথা কও।"

"সত্যি—তুমি আর এখানে এস না—আমিই তোমাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে চলেছি—এখনও ফের—ঘরে যাও—তোমার স্ত্রী তোমার আশায় বসে রয়েছে, এখনও তোমার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে—সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার কোমল প্রাণে আঘাত দিও না ফের।"

"যা বলেছ তারা—ঠিক বলেছ। আমি ভাবি কেমন করে এমন হ'লাম! চিরকাল তোমাদের উপর ঘৃণা পোষণ করেছি—যাদের নাম পর্য্যন্ত করতে ঘৃণা বোধ করেছি আজ কিনা তাদেরই একজনকে নিয়ে .."

তারার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল—অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—

"শোন,আর তুমি এখানে এস না"—বলিতে বলিতে তারার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল—সে আবার বলিল

—"তুমি না এলে হয়ত আমার একটু কষ্ট হবে তা হোক্—কিন্তু তুমি এলে—এই রকম ধীরে ধীরে অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমে গেলে আমার যে বুক ফেটে যাবে। তুমি ফের, তোমার পায়ে পড়ি তুমি এখনও ফের"—বলিতে বলিতে তারা বালিসে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তুষার একদৃষ্টে তারার দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তারার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "তারা, আজ বলতে এসেছিলুম, যে আর তোমার কাছে আসব না—আমার রাণী দারজিলিং থেকে ফিরে এসেছে—হঠাৎ এসেছে। নিশ্চয় সে আমার এ অধঃপতনের কথা শুনেছে—কিন্তু আমায় সে এখনও কিছু বলতে পারে নি—শুদ্ধ আমার কাছে কেঁদেছে—কাল সারারাত কেঁদে কেঁদে মুখ চোখ ফুলিয়েছে।"

তারা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া তাহার ডাগর ডাগর চোখ দু'টী তুষারের মুখের উপর ফেলিল—তখনও তাহার গণ্ডে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে ওষ্ঠ দুইটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তুষারও অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তারার মুখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল—উভয়েই নিস্তব্ধ। ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল—তুষার নিকটে আসিয়া তারার গলদেশ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া অশ্রুমাখা গালের উপর একটী চুমু খাইয়া বলিল, "দুটো বেজে গেল—আমায় এখন ছেড়ে দাও—"

তারা কোন কথাই বলিতে পারিল না, শুধু নিঃশব্দে তুষারের বুকে মুখ লুকাইয়া রহিল।

তুষার আবার আদরে তারার চিবুকটি ধরিয়া তুলিয়া ব্যথিতকণ্ঠে ডাকিল—"তারা!"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথা তুলিয়া তারা বলিল—"হ্যাঁ চল—"বলিয়াই উঠিয়া আলনা হইতে তুষারের জামা আনিয়া হাতে দিল, তুষার জামা পরিল। তারা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আবার কবে আসবে?"

তুষার একটু হাসিয়া বলিল, "এই না বললুম আর আসব না, আর তুমিও ত বললে আর এস না।"

তারা আবার তুষারের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—ক্রন্দনকণ্ঠে বলিল, "সত্যি তুমি ফের, তোমার অধঃপতন দেখতে চাই না,—তোমায় যথার্থই আমি ভালবেসেছি—তোমার অনিষ্ট কামনা করি না—তুমি এপথ থেকে এখনও ফের—তাতে আমার কষ্ট হয় হোক—কষ্ট সহ্য করবার জন্যই পতিতার ঘরে জন্মেছি। আজীবন কষ্ট সহ্য করবো—তবু মনে সান্ত্বনা পাব যে যাকে ভালবেসেছি তাকে অধঃপতনের পথে আসতে দিই নি—তাকে ফিরিয়েছি—তুমি আর এস না—আর এস না।"

তুষার রুমাল দিয়া তারার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—"ছিঃ, কি হচ্ছে তারা?"

নিজেকে সম্বরণ করিয়া তারা লণ্ঠন হাতে করিয়া দরজা খুলিয়া বলিল—"চল।"

তুষার তারার পশ্চাদনুসরণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

তারা আগে আগে আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। তুষার দরজার নিকট আসিয়া তারার মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—অকস্মাৎ তারা ক্রন্দন বেগ সামলাইতে না পারিয়া দরজার উপর লুটাইয়া পড়িল। তুষার হতভম্ব হইয়া তারাকে তুলিতে যাইতেছিল হঠাৎ সম্মুখের বাড়ীতে বারান্দায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে দেখিয়া তুষারের লজ্জায় যেন মাথা কাটা গেল—হন্‌হন্ করিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়া সম্মুখের একখানি চলতি ট্যাক্সি ধরিয়া উঠিয়া পড়িল।

[৪]

"কাল অত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?" দীপ্ততেজে রাণী তুষারকে জিজ্ঞাসা করিল। তুষার একদৃষ্টে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—মুখে তাহার মৃদুহাসি—চক্ষে প্রশংসাসূচক চাহনী।

পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে রাণী জিজ্ঞাসা করিল "বল কাল কোথায় গিয়েছিলে?"

তুষার এবার মৃদু হাসিয়া রাণীর চিবুকটি ধরিয়া বলিল—"ওঃ দেখছি তুমি বড় রেগেছ! মাইরি তোমায় কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।"

জোরে ধাক্কা মারিয়া তুষারের হাতটা ঠেলিয়া দিয়া রাণী রোষদীপ্ত কণ্ঠে কহিল "হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না - বল কোথায় গিয়েছিলে—আজ তোমায় বলতেই হ'বে।"

তুষার পুনরায় হাসিয়া বলিল - "তা অত রাগবার দরকার কি, ভাল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে কি বলতাম না থিয়েটারে গিয়েছিলুম।"

তুষারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাণী সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল- "মিথ্যাকথা রাত তিনটা পর্য্যন্ত থিয়েটার হয়? চালাকী!"

তুষার—"অ্যাঁ সেকি! হিন্দুর ঘরের স্ত্রী তুমি—স্বামীকে অবিশ্বাস! জান বঙ্কিমবাবু কি লিখেছেন—সূর্য্যমুখী স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল বলে কমলমণী তাহাকে জলে ডুবে মরতে বলেছিল, আর আজ সেই হিন্দু ঘরের বৌ হ'য়ে তুমি কিনা স্বামীর মুখের ওপর তাকে বল্লে বিশ্বাস করি না।"

রাণী পুনরায় বলিল—"তাইত তুমি চাও, আমি সত্যিই জলে ডুবে মরব এবার - তা বলে রাখছি।"

তুষার ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—"বল কি, বল কি—তুমি মরে গেলে এ অভাগার গতি কি হবে!"

"কেন, তোমার ত তারা জুটেছে - ওঃ আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব। আচ্ছা সত্যি করে বল তুমি থিয়েটারে গেছলে? বল আমার গা ছুঁয়ে বল?" বলিয়া তুষারের হাতখানা জোর করিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর ধরিল।

"কি বলছ রাণী! তারা কে? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? তোমার অসুখ দেখছি তাহ'লে এখনও ভাল করে সারে নি!"

"যাও যাও আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হ'বে না, আমি সব শুনেছি, তারা কে দেখবে?"—

বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া গৃহ কাঁপাইয়া গৃহকোণস্থিত টেবিলের ড্রয়ার হইতে একখানি ফটো আনিয়া ছুড়িয়া তুষারের গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"কে এ, কার ফটো সোহাগ করে টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর রাখা হয়েছে শুনি?"

তুষার এরূপ প্রত্যাশা করে নাই, - তাই হঠাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া একটু থতমত খাইয়া গেল—পরমুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইয়া বলিল "ওঃ ও ফটোখানা— সেদিন দত্তর ষ্টুডিওতে বেড়াতে গেছলুম—দত্ত ওখানা আমায় Present করেছিল।"

"হ্যাঁ—যাও আর মিথ্যা কথা বলে ভুলাতে হ'বে না। সত্যি—তুমি হ'লে কি? তুমি যে এমন হ'বে কখনও তা স্বপ্নেও ভাবি নি! মনে কর দেখি কি ছিলে—আর আজ কি হয়েছ?"

বলিতে বলিতে রাণী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ সামলাইতে পারিল না—তুষারের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া দুই পা'র মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তুষার ব্যথিতচিত্তে সাদরে রাণীকে ভূমি হইতে উঠাইয়া নিকটস্থ সোফায় উপবেশন করিল। রাণীর মাথাটা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাথার চুলগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে আঙ্গুল চালাইতে লাগিল—আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল "আমি কি পাষণ্ড!"

রাণী তুষারের বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়াই কাঁদিতে লাগিল। তুষার - অপরাধী তুষার—নিজের অপরাধের জন্য মনে মনে অনুশোচনা করিতে লাগিল—সান্ত্বনার ভাষা তাহার পাপমুখ হইতে বাহির হইল না— অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল— "ছিঃ রাণী কি হয়েছে—চুপ কর। বল কি করলে তুমি সুখী হও আমি তাই করব। তোমার মনে কখনও ব্যথা দেব না - আজ থেকে থিয়েটারে কি বায়স্কোপে যখন যেখানে যাব তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ওঠ লক্ষ্মীটি কেঁদ না ছিঃ।"

ধীরে ধীরে রাণী উঠিল—আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া দুইহাতে তুষারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বল আর কখনও এত রাত হ'বে না—কোথাও যাবে না?"

তুষার রাণীর মুখচুম্বন করিয়া গাল দুইটি টিপিয়া দিয়া বলিল "না গো না কোথায়ও যাই নি যাবও না—এখন চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

"কোথায়?"

"যেখানে হোক চল একটু ঘুরে আসা যাক—কেঁদে কেঁদে মুখ চোখ ফুলিয়ে ফেলেছ—যাও গা হাত পা ধুয়ে

এস,—মাঠের দিকে বেড়িয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনটাও বেশ একটু শান্ত হ'বে খ'ন।"

কিয়ৎকাল পরে উভয়ে সাজসজ্জা করিয়া মোটরে চড়িল—ভৃত্য গঙ্গাচরণ বালক মণ্টুকে লইয়া ড্রাইভারের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল—গাড়ী হু হু শব্দে মাঠের দিকে ছুটিল।

গাড়ী যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পাশ দিয়া যাইতেছিল—রাণী বলিল "চল না ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটা দেখে আসি, ওটা আমার মোটেই দেখা হয় নি।"

তুষার ড্রাইভারকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে যাইতে আদেশ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু অন্যমনা হইয়া পড়িল—তাহার মনে পড়িল কিছুদিন পূর্ব্বে তারাও তাহাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু নিজে সঙ্গে করিয়া তারাকে আনিয়া দেখাইবার সাহস তাহার ছিল না—সেই জন্য তারার অনুরোধ সে রক্ষা করিতে পারে নাই।

*　　*　　*

ভিক্টোরিয়া হলে ঘুরিতে ঘুরিতে তুষারের পরিচিত একটী বন্ধুর সহিত বহুকাল পরে দেখা হইল। একে বাল্য-বন্ধু—তাহাতে বহুকাল পরে দেখা—বন্ধু তুষারকে জড়াইয়া ধরিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বন্ধুর কথা আর ফুরায় না! রাণী কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গঙ্গাচরণের সঙ্গেই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে রাণী হঠাৎ একস্থানে আসিয়া দুইটী সুসজ্জিত রমণীর সম্মুখে পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অল্প বয়স্কা রমণীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাণী যেন কেমন হইয়া গেল—এই রমণীর ফটোই ত সে তাহার স্বামীর ড্রয়ার মধ্যে দেখিয়াছিল! তবে কি এই সেই তারা? রাণী এক দৃষ্টে রমণীর মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমণীটি রাণীর এই ভাব দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "কি দেখচ ভাই?" পরে রাণীর পশ্চাতে বৃদ্ধ গঙ্গাচরণের কোলে মণ্টুকে দেখিয়া বলিল—"এইটি বুঝি তোমার ছেলে?" বলিয়া গঙ্গাচরণের কোল হইতে মণ্টুকে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া একটি চুমু খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি খোকা?"

অপরিচিতার কোলে যাইয়া মণ্টু একটুও বিস্মিত হইল না, সে বলিল "মণ্টুবাবু" এবং অদূরে বন্ধুর সহিত কথোপকথনে রত তুষারকে দেখাইয়া বলিল "ঐ আমার বাবা ওখানে কথা বলছে।" মণ্টুর নির্দ্দেশিত দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তারা তুষারকে দেখিল এবং তৎক্ষণাৎ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় রাণীর দিকে ফিরিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন কোণে একখানি বেঞ্চিতে গিয়া বসিল ও রাণীকে পাশে বসাইল। বালক মণ্টু ইত্যবসরে তারার কোল হইতে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া গঙ্গাচরণের কোলে উঠিল। রাণীর একটী হাত নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম রাণী?" বিস্ফারিত নেত্রে রাণী তারার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"হ্যাঁ আমার নাম রাণী তুমি কি করিয়া জানিলে?"

তারা বলিল—"অনুমান করিয়াছি।"

রাণী প্রশ্ন করিল—"তোমার নামই কি তারা?"

"হ্যাঁ ভাই, আমিই সেই অভাগী।"

রাণীর চোখের জল আর বাধা মানিল না দর দর ধারে বক্ষ ভাসাইয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তারা কয়েক মুহূর্ত্ত অপলক নেত্রে রাণীর দিকে চাহিয়া রহিল, পরে নিজ অঞ্চল দিয়া ধীরে ধীরে রাণীর চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল "ভাই, তোমার সুখের ঘরে আমিই অশান্তির আগুণ জ্বালাইতে বসিয়াছি। ঘৃণিতা—পতিতা আমি—আমার পাপের অন্ত নাই—কিন্তু ভাই সতী তুমি—তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমি আজ বলিতেছি—তোমার সাতরাজার ধন মাণিককে আমি যথার্থই ভাল বাসিয়াছি"—বলিতে বলিতে তারার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিয়ৎকাল উভয়ে নীরব পরে হঠাৎ রাণীর হাতখানি তুলিয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তারা বলিল—"সতী তুমি—আজ আমি তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব—তোমার সুখের সংসারে শান্তি ফিরাইয়া আনিব—আর তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

এই সময় মণ্টুর হাত ধরিয়া তুষার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তারাকে রাণীর পাশে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। তারা অতর্কিতভাবে বালক মণ্টুকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে করিয়া অজস্র চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাণীর কোলে দিয়া ক্ষিপ্রপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

তুষারের মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না—রাণী পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ অচল হইয়া বসিয়া রহিল।

* * *

পরদিন বেলা দশটার সময় তুষার আরাম কেদারায় শুইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আছে—রাণী একপার্শ্বে টেবিলের উপর চায়ের সঙ্গে চিনি মিশাইতেছে—উভয়ের মুখ গুরুগম্ভীর। এমন সময় গঙ্গাচরণ ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি পুলিন্দা ও একখানি চিঠি তুষারের হাতে দিয়া বলিল—'একটি লোক এগুলি দিয়া চলিয়া গেল।' তুষার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল—

"প্রিয়তম, চলিলাম—চির-জীবনের জন্য চলিলাম। আমাকে তুমি বৃথা খুঁজিও না—খুঁজিলেও পাইবে না। ব্রেস্‌লেট্ জোড়া ভগিনী রাণীকে দিও—আমাকে ভুলিয়া যাইও—মনে করিও তারা মরিয়াছে।

—হতভাগিনী তারা"

পুলিন্দাটি খুলিয়া ফেলিতেই ভিতর হইতে একজোড়া হীরার ব্রেস্‌লেট্ ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া রাণী চায়ে চিনি মিশান ফেলিয়া রাখিয়া তুষারের নিকট আসিয়া বলিল "বাঃ, বেশ চমৎকার ব্রেস্‌লেট্ ত! কে পাঠালো?"

তুষার কোন জবাব দিল না—নীরবে রাণীর দিকে ব্রেস্‌লেট্ জোড়া আগাইয়া দিয়া তারার চিঠিখানি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া বসিয়া রহিল।

রাণী চিঠিখানি পড়িয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার বুকে সুখদুঃখের তুফান একসঙ্গে বহিয়া যাইতে লাগিল। তুষার কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখিল ইলেকৃট্রিক্ পাখার বাতাসে তারার চিঠিখানি জানালা দিয়া বাহিরে উড়িয়া যাইতেছে!

দরিয়ার দান

(গল্প)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

লাঙ্গলমুখে বসুধা কন্যা মৈথিলীকে লাভ করিয়া জনক ঋষি ততদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না যত আনন্দিত হইয়াছিল সেদিন হানিফ পাণিয়াকে লাভ করিয়া।

তখন সবে মাত্র ঊষাদেবী তাহার সলজ্জ অবগুণ্ঠন খানি ঈষদোন্মচন করিয়াছেন, এমন সময় হানিফ সেখ তাহার চির অভ্যাস মত বলদ দুইটাকে সঙ্গে লইয়া লাঙ্গল স্কন্ধে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। একটু দূরেই ক্ষীণাঙ্গী স্রোতস্বিনীটী কোন্ অজানা সুরের অনন্ত লহরী তুলিয়া বিদেশী দয়িতের বাহু-বন্ধনে ছুটিয়া যাইতেছিল, লাঙ্গলটাকে কোমল মৃত্তিকার উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া গরু দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া হানিফ তন্ময়চিত্তে তাহাই দেখিতে বসিল। হঠাৎ তাহার চঞ্চল দৃষ্টি পতিত হইল একটা মৃন্ময় ভেলার উপর; ভেলাটা তরঙ্গের বুকে নাচিতে নাচিতে সুদূর হইতে সেই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছিল।

একটু নিকটস্থ হইলে হানিফের বোধ হইল যেন তাহার মধ্যে সজীব একটা কিছু মাঝে মাঝে ভেলাটাকে একটু অস্বাভাবিক ভাবে নাড়াইয়া দিতেছে। কৌতূহলী হানিফ জলে নামিয়া ভেলাটা ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে কৌশল স্থির করিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া লাঙ্গলটা লইয়া আসিয়া তাহার অগ্রভাগের সাহায্যে সাবধানে ধীরে ধীরে ভেলাটাকে নিকটে টানিয়া লইয়া আসিল। তারপর তাহার অভ্যন্তরস্থিত অজ্ঞাত বস্তুটার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেই সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। হানিফ বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিল একরাশ পদ্মফুলের মত একটী ক্ষুদ্র শিশুকন্যা তাহার মধ্যে শায়িতা রহিয়াছে। এই অযাচিত রত্নলাভে নিঃসন্তান হানিফ দীন দুনিয়ার মালিককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। তারপর সেই কুসুম স্তবকটীকে সযত্নে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মহানন্দে নিকটস্থ কুটীর পানে ছুটিয়া চলিল; কারণ সে জানিত তাহার প্রেমময়ী পত্নী দিলজানের অঙ্কে এই ক্ষুদ্র উপহারটী দিতে পারিলে কত তৃপ্তি কত আনন্দেই না তাহার সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে!

গৃহে প্রবেশ করিয়া হানিফ্ শশব্যস্তে ডাকিল, "দিল্—দিল্! ও দিল্‌বিবি!"

হাস্যমুখী দিল্‌জান ত্বরিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কিরে! তুই এখুনি ফিরে এলি যে?"

"ছেলেপুলে হোলো না বোলে তুই কাল দুখ্যু কোচ্ছিলি না?"

"হ্যাঁ কোচ্ছিলুম তো, তা না হোলে কি ঘর মানায় বল দেখি? সব যেন কেমন ধারা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।"

"আমি বলেছিলুম তোকে দেনেয়ালা খোদা, কেমন না?"

"হ্যাঁ, তাতো বলেছিলি।"

শিশু কন্যাটীকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া হানিফ্ বলিল, "খোদা তাই মিলিয়ে দিয়েছেন দিল্—এই দেখ্।"

শিশুটীর পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া দিলজান বলিল, "একি! এ কোথায় পেলি রে?"

"দরিয়ায় ভেসে যাচ্ছিল, তাই তোর তরে কুড়িয়ে নিয়ে এলুম।"

দিলজান সভয়ে বলিল, "দরিয়ায়! হুরীর বাচ্ছা টাচ্ছা নয় তো?"

হানিফ্ বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিল, "নারে দিল্ না—এ মানুষ। হুরীর বাচ্ছা হ'লে সোণার ড্যানা থাকতো, কেমন কি-না?"

দিলজান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হঁ্যা—তা বটে। তা এখন কি কোরবি হানিফ ?"

"খোদা যখন দিয়েছেন একটা হিল্লে কর্—এই নে।"

দিলজান শিশু কন্যাটীকে হানিফের বক্ষমধ্য হইতে সযত্নে উঠাইয়া লইল। কি সুন্দর সেই চাঁদপানা কচি মুখখানি! দেখিতে দেখিতে দিলজানের নয়নকোণে একটা স্নেহের ঔজ্জ্বল্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, বক্ষের মধ্যে রুদ্ধ স্তম্ভিত মাতৃত্বের অমিয় প্রবাহ রাশি আজ যেন সহসা মুক্তি পাইয়া সেই ক্ষুদ্র শিশুটীকে শত তরঙ্গ বাহু মেলিয়া বেষ্টন করিতে চাহিল। স্নেহের আবেগে শিশুটীকে চুম্বন করিয়া দিলজান আপন মনে বলিল, "কোন শয়তানীর পেটে তুই জন্মেছিল ধন যে এমন আসমানের ফুলটীকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলে ? এখন কি ক'রে তোকে বাঁচাই বল দেখি ?"

হানিফ্ এতক্ষণ তন্ময় হইয়া সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতেছিল ; এইবার মৃদুস্বরে বলিল, "কেন ? তোর বুকে দুধ নেই ?"

দিলজান হাসিয়া বলিল, "তা আর খোদা দিলেন কই হানিফ্ ? দেখি এইবার যদি একে পেয়ে হয় !"

"তা নয় টাট্‌কা গরুর দুধই খাইয়ে দে একটু। যা হয় কর্ বেলা বাড়ছে। আমি মাঠে চল্লুম দিল্।"

মাঠে আসিয়া হানিফ্ লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল :—

'দীন দুনিয়ার মালেক খোদা......

(২)

দ্বারে দ্বারে নিরর্থক পরিভ্রমণান্তে রিক্ত ঝুলিটী স্কন্ধে লইয়া গৃহে ফিরিবার পথে সহসা কাঞ্চনখণ্ড কুড়াইয়া পাইলে দরিদ্র ভিক্ষুকের বুভুক্ষু হৃদয়টী যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, লক্ষ্যহীন জীবনের পথে ক্ষুদ্র শিশু কন্যাটীকে লাভ করিয়া এই চিরবন্ধ্যা কৃষক নারীর স্নেহক্ষুধিত হৃদয়টীও ঠিক্ তেমনি হরষিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কন্যাটীকে আদর করিয়া, ভালবাসিয়া, বক্ষে ধরিয়া দিলজান এমন এক নূতন মধুর সন্ধান পাইল, যাহা সে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার কর্ম্মহীন জীবনটা যেন এতদিন পরে সহসা কর্ম্মময় হইয় উঠিল ; সেই কর্ম্ম আর কিছুই নহে—সেই ক্ষুদ্র আসমানে ফুলটীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। সূর্য্যমুখী যেমন সমস্ত দিবস সূর্য্যের পানেই চাহিয়া থাকে, মলয়ে তীক্ষ্ণ স্পর্শও তাহাকে সেই গাঢ় সমাধি হইতে টলাইতে পারে না, শত গৃহকর্ম্মরতা দিলজানের মনশ্চক্ষুও তেমনি ন্যস্ত থাকিত সেই কন্যাটীর উপর।

স্রোতস্বিনীর বক্ষে কুড়াইয়া পাইয়াছিল বলিয়া দিলজান আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিল 'পানিয়া।' বিকাশোন্মুখ পদ্মের কুঁড়িটীর মতই পানিয়া দিনে দিনে বড় হইতে লাগিল এবং দিলজানের স্নেহ স্নিগ্ধ ক্রোড়টী জুড়িয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রাণটীতেও নিজের স্থান ক্রমশ বিস্তৃত করিয়া লইতে লাগিল। প্রতিবেশীনীদিগের মধ্যে কেহ কথাপ্রসঙ্গে বেহেস্তের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে দিলজান মৃদু হাসিয়া নিদ্রামগ্না পানিয়ার লাবণ্যমাখা কচি মুখখানিই দেখাইয়া দিত।

হানিফ ও পানিয়াকে প্রথমতঃ বেশ স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিল। সন্ধ্যার পর লাঙ্গল স্কন্ধে গৃহে ফিরিয়া শিশু কন্যাটীকে তাহার সবল সুগঠিত পরিশ্রান্ত বাহু দুইটীর ভিতর উন্মাদ আবেগে চাপিয়া ধরিয়া সে যেন বিলক্ষণ শান্তি বোধ করিত ; কন্যার নিদ্রা প্রযুক্ত যেদিন তাহা পারিত না সেদিন তাহার দৈনন্দিন কার্য্যতালিকার যেন একটা বিরাট অসম্পূর্ণতা রহিয়া যাইত। কিন্তু এভাব অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পানিয়ার উপর স্নেহের প্রাবল্য বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দিলজানের অন্তর্দৃষ্টি স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল হানিফের হৃদয় মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত আত্মম্ভরীতা ও আত্ম পর জ্ঞানটাও তেমনি ভিতরে ভিতরে সতেজে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। হানিফ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল, কেমন করিয়া এক ক্ষুদ্র নিঃসহায় উলঙ্গ অজানা পথিক আসিয়া তাহার পত্নীর হৃদয়স্থিত স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি সমস্ত কমনীয় মানসিক বৃত্তিগুলি গ্রাস করিতে বসিয়াছে, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অধিকারগুলি ক্রমে ক্রমে বেদখল করিয়া লইয়া সেই দুর্বৃত্ত পথিক তাহাদের স্বামী স্ত্রীর

মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে; কাজেই হানিফ পানিয়ার উপর ক্রমশঃই বীতরাগ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ক্ষুধিত বন্য পশু যেমন সুপক্ক মাকাল ফলটাকে পরম বস্তু জ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার বিস্বাদ উপলব্ধি করিবা মাত্র ঘৃণাভরে তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করে, হানিফ ও তেমনি পানিয়াকে তাহার হৃদয় হইতে শীঘ্রই দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিল।

(৩)

সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহে মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হানিফ অবসন্ন ভাবে ক্ষুদ্র কুটীর খানির দাবার উপর বসিয়া পড়িল। অন্য দিন হইলে দিলজান স্বামী প্রত্যাগমন করিবা মাত্র প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতি শান্তিদেবীর ন্যায় অধরে সর্ব্বশ্রম অপহারক মিষ্ট মধুর হাস্য লইয়া অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া আসিত, কিন্তু হানিফ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিল যে আজ আর তাহা হইল না। স্ত্রী'র এই চিরচলিত অভ্যাসের সহসা ব্যতিক্রম দেখিয়া হানিফ আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, কারণ সে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিল যে ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের নির্ম্মল শান্তিময় সংসার-গগনে একটা ক্ষুদ্র কুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারূপী ধূমকেতুর উদয়।

কয়েক মিনিট নীরবে বসিয়া থাকিয়া হানিফ মৃদুস্বরে ডাকিল, "দিল্!" দিলজান উত্তর দিল না।

হানিফ বিরক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "ও দিলবিবি, শুন্‌ছিস্?"

"এই যে যাচ্ছি"বলিয়া দিলজান দৌড়িয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "কখন এলিরে? কই টের পাইনি তো! আর পাবোই বা কি করে—খুকীমনি কিছুতে ঘুমোবে না,— দুষ্টুপানা কোর্‌বে—আবার বলে কি—"

হানিফ ধমক দিয়া বলিল, "আঃ—রেখে দে তোর খুকী। খিদে পাচ্ছে—পান্তা থাকে তো দে।"

বাধা পাইয়া বিষণ্ণ মুখে দিলজান বলিল, "একটু বোস্ ঐখেনে—এনে দিচ্ছি।"

গোটাদুই কাঁচালঙ্কার সহিত পরম তৃপ্তি সহকারে একথালা পান্তাভাত খাইয়া হানিফ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আঃ—বাঁচলুন। একছিলিম তামাক সাজতো দিল্।"

কুণ্ঠিত ভাবে দিলজান বলিল, "তামাক! তামাক কি ক'রে সাজ্‌বোরে—কল্‌কে নেইযে! হাতেম চাচার দোর থেকে খেয়ে আয়গে যা।"

বিস্মিত বিরক্ত হইয়া হানিফ বলিল, "কেন? কল্‌কেটা কি হ'ল আবার?"

"আজ বিহানে ভেঙ্গে গেছে।"

"ভেঙ্গে গেছে! কি ক'রে ভাঙ্গলো?"

"খুকী খেল্‌তে নিয়েছিল, হঠাৎ আছাড় খেয়ে—"

বাধা দিয়া হানিফ বলিল, "দুত্তোর, আচ্ছা অলক্ষুণে অপয়মন্তের বেটীকে কুড়িয়ে এনেছিলুম যাহোক। সব ভাঙ্‌চুড় ক'রে গোল্লায় দিলে।"

অলক্ষুণে কথাটা দিলজানের স্নেহ পিযুষপূর্ণ মাতৃহৃদয়ে তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্ধ হইল। আজ কয়দিন হইতেই সে পানিয়ার প্রতি স্বামীর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু অন্যায় বিরক্তি নীরবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ সে কিছুতেই এই অমূলক উক্তিটাকে হাসিমুখে পরিপাক করিতে পারিল না; তাহার সমস্ত দেহ মন স্বামীর উপর সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ক্রোধ পূর্ণ ভ্রুকুটী করিয়া দিলজান বলিল,"কেন ও তোর কি করেছেরে যে তুই ওকে অলুক্ষুণে বল্‌ছিস্?"

হানিফ বিকৃত স্বরে বলিল "বেশ ক'রেছি—একশবার বল্‌বো; ও হারামজাদী গুণ ক'রেছে তোকে।"

কম্পিত কণ্ঠে দিলজান বলিল, "না বোল্‌তে পাবিনে। ওকে অমন তাচ্ছিল্যি ক'লে খোদাতালা গোসা কোরবেন, হানিফ, আমি খোয়াব দেখছি।"

"কি খোয়াব দেখেছিস্?"

"বোলতে নেই তাই বলিনি। সেদিন রাত্তিরে দেখ্‌লুম, এক খুপসুরৎ থুন্‌থুনে বুড়ো—লম্বা লম্বা ধপ্‌ধপে পাকা চুল দাড়ি—ঠিক যেন পয়গম্বরের মত চেহারা, আমার শিয়রের কাছে এসে পানিয়াকে দেখিয়ে বোল্‌ছে, ওকে আমি পয়দা ক'রে পাঠিয়েছি দিলবিবি, তোর ঠেঙে কখনো দুঃখ্যু পায়না যেন।"

হানিফ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যা—পীর পয়গম্বর আস্‌বেন আবার তোর কাছে, মিছে বলছিস্!"

দিলজান কি একটা তীব্র প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে প্রতিবেশী করিম মিঞাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তড়িৎবেগে কক্ষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

(৪)

পানিয়ার ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য অত্যাচার সত্ত্বেও তাহার উপর স্ত্রীর অন্যায় পক্ষপাতীত্ব হানিফের অশিক্ষিত হৃদয়কে ক্রমেই বিষাক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রতিবেশীগণের নিকট পালিতা কন্যার বিরুদ্ধে নিত্য নূতন অভিযোগ শ্রবণ করিতে তাহার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। সে প্রায়ই হয়ত পানিয়া কাহারও গোবৎস ছাড়িয়া দেওয়ায় সেই নির্বুদ্ধি প্রাণীটী মাতার সমস্ত দুগ্ধটুকু পান করিয়া ফেলিয়াছে, কিম্বা কাহারও মুরগীকে বল প্রয়োগে তা দেওয়াইতে যাওয়ায় অনেকগুলি ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ব্যতীত কন্যার সুখান্বেষণরত দিলজানের অমনোযোগীতার জন্য সংসারে এবং নিজের শারীরিক মানসিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে যে নূতন নূতন বিশৃঙ্খলার উদয় হইতে লাগিল, হানিফ সেজন্য মনে মনে পানিয়াকেই দোষী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

তখন মাঠে মাঠে ধানের চারাগুলি বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। নবীন যৌবনের তরল সুষমা শস্য-শ্যামলা বসুধারাণীর অঙ্গে অঙ্গে শত তরঙ্গে ছুটিয়া যাইতেছে। হানিফের মাঠে বিশেষ কোন কাজ থাকায় সে কুটীর প্রাঙ্গনে বসিয়া বলদ দুইটার জন্য পুরাতন বিচুলি কাটিতেছিল, এমন সময় প্রতিবেশী রহিম আলির বৃদ্ধামাতা খাদিজা বানু ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

হানিফ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি চাচী, আদাব!—সব খবর ভালো তো?"

খাদিজা বলিল, "হ্যাঁ—আদাব সব ভাল হানিফ। কিন্তু তোর মেয়েকে একটু খবর্দ্দারি ক'রে দিস্ তো।"

"কেন কি হয়েছে চাচী?"

"বড় বজ্জাত হ'চ্ছে দিন দিন।"

হানিফ উগ্রস্বরে বলিল, "আঃ! কি ক'রেছে বল না?"

খাদিজা বিরক্তিভরে বলিল, "কোরবে আর কি! এই সেদিন হাট থেকে রহিম নগদা আট আনা দিয়ে একজোড়া মুরগী নিয়ে এল না? খাঁচায় ধরা ছিল, পানিয়া গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, কোথায় যে চ'লে গেল এ তল্লাটে তো খুঁজে পাচ্ছি না আর। মস্ত বড় মুরগী জোড়ারে!"

হানিফের শিরায় শিরায় শোণিতের উষ্ণ স্রোত বিদ্যুৎ বেগে বহিয়া গেল। হস্তস্থিত অস্ত্রটা সঙ্গে লইয়াই তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া রুক্ষস্বরে সে ডাকিল, "পানিয়া!"

কক্ষাভ্যন্তর হইতে ক্রীড়ারতা পানিয়া উত্তর দিল, "বাপ্‌জান্ ডাকৃছ?"

"এদিকে আয় পাজি ধেড়ে বজ্জাত!—"

পানিয়া ছুটিয়া আসিয়া পালক পিতার ক্রোধব্যঞ্জক মুখের পানে চাহিয়া সভয়ে বলিল, "গোসা ক'রেছ বাপ্‌জান?"

বাপ্‌জান্! এমন মধুর সম্বোধন হানিফ ইতিপূর্ব্বে কাহারও নিকট শ্রবণ করে নাই ত! হানিফের দৃঢ় প্রশস্ত বক্ষের মধ্যে সহসা একটা স্নেহের অমিয় উৎস উত্থিত হইয়া যেন তাহার সমস্ত ক্রোধানলকে শীতল করিয়া দিতে চাহিল। এক মুহূর্ত্ত নীরবে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হানিফ মনে মনে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না অন্যায় দেখতে পারবো না।" তারপর পানিয়ার পৃষ্ঠে সশব্দে কয়েকটা নিষ্ঠুর চপেটাঘাত করিয়া বলিল "হারামজাদী, ওদের মুরগী ছেড়ে দিয়েছিস্ কেন রে?"

পানিয়া করুণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবা মাত্র হানিফ তাহাকে পুনরায় প্রহার করিতে যাইতেছিল, এমন সময় উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া দিল্‌জান কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ওকে মারছিস্ কেন—কি করেছে ও?"

"ওদের মুরগী ছেড়েছে কেন? বজ্জাতী!"

"ও ছেলেমানুষ!—"

হানিফ বিকৃতস্বরে বলিল, "ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ না সয়তানের ধাড়ি। বেশ্যার মেয়েটাকে তুই বাড়ী থেকে তাড়াবি কিনা শুনি?"

বিস্মিতা দিলজান বলিল, "বেশ্যার মেয়ে!"

"তা নাতো কি! পাড়ার সব একঘরে করবে বলে জোট পাকাচ্ছে। আমি কি দেশছাড়া হব ওটার লেগে?"

দিলজান মৃদুস্বরে বলিল, "না-না, ও ভালঘরের মেয়ে।"

হানিফ নীরস কণ্ঠে বলিল,"হ্যাঁ, তোর কুঁড়েয় বাদশাজাদী জলে ভেসে এসেছিল!—তুই তাড়াবি কিনা শুনি?"

দিলজান দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না তাড়াব না—তুই ঘর করতে না পারিস্—আমায় তালাক্ দিয়ে দে।"

হানিফ গর্জ্জিয়া বলিল, "তবে রে হারামজাদী! তাড়াবি না? ওটাকে কেটে দুটুক্‌রো কর্‌বো আজ।"

দিলজান বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "ইস্ ভারি মরদ কিনা!"

"মরদ নয়? আচ্ছা দেখি তবে ওর কোন বাপ ঠেকায়?" ক্রোধান্ধ হানিফ নিমেষমধ্যে পানিয়াকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত অস্ত্রটা সবেগে নিক্ষেপ করিল। দিলজান সভয়ে কন্যাকে জড়াইয়া ধরিতেই তাহার দক্ষিণ স্কন্ধের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া দিয়া অস্ত্রটা নিকটস্থ মৃণ্ময় প্রাচীরে যাইয়া আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। রক্তাক্ত কলেবরে তারস্বরে চীৎকার করিয়া দিলজান ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

(৫)

পত্নীকে সাংঘাতিক রূপে আহত করিবার অপরাধে চারমাস কঠোর কারাদণ্ড ভোগের পর আজ সবে মাত্র মুক্তি পাইয়াই অনুতপ্ত হানিফ উন্মাদের ন্যায় গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

দিলজানকে সে যথার্থই প্রাণের অধিক ভালবাসিত এবং পানিয়ার প্রতি পত্নীর অপরিমেয় স্নেহের সহিত অস্বাভাবিক পক্ষপাতীত্ব তাহার স্বাভাবিক হিংসা প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া অধুনা উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি করিলেও পত্নীকে প্রহার বা আঘাত করিবার পাশবিক কল্পনা তাহার মনে কোন দিনও উদিত হয় নাই। একটা সাময়িক উত্তেজনার বশে পানিয়াকে আঘাত করিতে গিয়াই সে দৈব-দুর্বিপাকে দিলজানকে আহত করিয়াছিল। যাহা হউক সেজন্য হানিফ অবলা জ্ঞানহীনা বালিকার উপর তাহার ক্ষুদ্র সামান্য স্বার্থের জন্য ভীষণ পাশবিক প্রতিশোধ লইতে গিয়া নিজের প্রিয়তমা পত্নীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছিল ভাবিতেই তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিত।

হানিফ ভাবিয়াছিল এবার গৃহে গিয়াই সে পত্নীকে চতুর্গুণ অধিক ভালবাসিয়া এবং পালিতা কন্যাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ যত্ন করিয়া তাহার অত্যাচারের ঋণ পরিশোধ করিতে আরম্ভ করিবে এবং বক্ষ-সংলগ্না স্ত্রীর নিকট বিগলিত অশ্রুধারার মধ্য দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইবে। কিন্তু চক্ষের অন্তরালে অদৃষ্ট কি নিষ্ঠুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

তখন বন্যা-রাক্ষসীর করাল কবলে সমস্ত উত্তর বঙ্গ বিলুপ্ত প্রায়। সহস্র সহস্র নরনারীর এবং লক্ষ লক্ষ গৃহ-পালিত পশুর মৃতদেহ বক্ষে লইয়া পাষাণী বিভীষণা পদ্মানদী পিশাচীর অট্টহাস্যে বহিয়া যাইতেছেন। পুরুষসিংহ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের যুবজনোচিত নবীন উদ্যম এবং অক্লান্ত চেষ্টাও ক্ষুধিত শোকার্ত্ত ও অভাব গ্রস্তের অভ্রভেদী হাহাকার নিভাইতে পারিতেছে না।

এই সমস্ত দুঃসংবাদ গুলি যখন তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী সুখস্বপ্ন মুগ্ধ হানিফের মস্তকে অভিশপ্ত বজ্রের মত আপতিত হইল তখন সে কয়েকমুহূর্ত্ত পক্ষাঘাত গ্রস্তের ন্যায় স্তব্ধ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল বটে, কিন্তু মধুময়ী কুহকিনী আশারাণী শীঘ্রই তাহার কর্ণকুহরে মৃদু গুঞ্জনের অমিয় প্রবাহ ঢালিয়া দিলেন। হানিফ ভাবিল, তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি দ্বাদশ হস্ত গভীর জলের নিম্নে নিমগ্ন হইয়া গেলেও হয়ত খোদাতালার অনুগ্রহে দিলজানের প্রাণরক্ষা হইয়াছে এবং তাহার সাক্ষাতের আশায় সে আকুলাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

বন্যা রাক্ষসীর বিশ্বগ্রাসী উদর হইতে যে স্বল্প-সংখ্যক নরনারী কোনও ক্রমে প্রাণরক্ষা করিয়া শেষে ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দিলজানের সন্ধান না মিলিলেও হানিফ নিরাশ হয় নাই; কারণ তখনও বৃক্ষারোহণে প্রাণরক্ষাকারীদিগের উদ্ধার কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল। আশার নিষ্প্রভ ক্ষীণ মরীচিকা দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধের মত হানিফ স্বেচ্ছাসেবকদিগের দলে প্রবেশ করিল এবং মনে মনে খোদাতালার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করিয়া সে দ্বিগুণিত উৎসাহে বৃক্ষে বৃক্ষে মৃতপ্রায় নর-নারীদিগের মধ্যে প্রিয়তমা পত্নীর ব্যর্থ সন্ধানে মনসংযোগ করিল।

সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। বন্যা প্রপীড়িত দেশগুলির উপর ও চিরানন্দময়ী জ্যোৎস্নারাণীর অফুরন্ত হাস্য একই ভাবে শততরঙ্গে ছুটিয়া যাইতেছে। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত হানিফ সেখ তখনও পূর্ণ উদ্যমে উদ্ধার কার্য্য চালাইতেছিল। নৌকাস্থিত সকলেরই মুখে একটা গভীর বিষাদের চিহ্ন—চতুর্দ্দিকের নারকীয় দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রু ভারাবনত—সকলেই স্তম্ভিত নীরব, শুধু আত্ম চিন্তা মগ্ন হানিফ নৌকা বাহিতে বাহিতে অজ্ঞাতসারে মৃদুকণ্ঠে গান ধরিয়াছিল :—

ওমা তোরে গড় করি—
কখন তুই হাস্যময়ী কখন মা ভয়ঙ্করী।
কখন তুই শ্যামের বামে
ক'র্লি লীলা ব্রজধামে,
রাখাল রাজের গুপ্তপ্রেমে কাটালি মা বিভাবরী।
(আবার) কখন মা এ কোন ছলা,
কাট্‌লি নিজে নিজের গলা,
গলায় পরে মুণ্ডমালা শিবের বুকে দিগম্বরী।

একজন স্বেচ্ছাসেবক প্রশংসা পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিল, "সেখ সাহেব হিঁদুর গান ও জান দেখ্‌ছি ?"

হানিফ ম্লান মুখে উত্তর দিল, "হ্যা বাবু, আমাদের গেরামে হিঁদুও অনেক ছিল যে !"

এমন সময় অদূরে একটা মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গেল। স্বেচ্ছাসেবক দিগের মধ্যে কেহ বলিল মনুষ্য, কেহ বলিল কোন গৃহপালিত পশুর শব হওয়াই সম্ভবপর। উদাসীন হানিফের মনোযোগ প্রথমতঃ এদিকে ততটা আকৃষ্ট হয় নাই ; কারণ আজ কয়দিনের মধ্যে সে শত শত মৃতদেহ এইরূপে বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছে। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতানুবর্ত্তী দুইদলের মধ্যে তুমুল তর্ক উপস্থিত হইয়া অবশেষে পরীক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইল, তখন হানিফের দৃষ্টিও মৃত দেহটার উপর পড়িল। ধীরে ধীরে নৌকাখানিকে হানিফ অভিলষিত পথের পানে চালিত করিয়া দিল।

প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নার আলোকে সহসা মৃত দেহটার পানে চাহিয়া হানিফ চমকিয়া উঠিল। বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় একটা অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

হাইলটাকে উভয় হস্তে ঠেলিয়া দিয়া কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইয়া হানিফ বিস্ফারিত ভয়চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, তাহারই প্রিয়তমা পত্নী দিলজান অদূরে বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। হাস্যময় সুন্দর মুখখানি তাহার আজ যেন জ্যোৎস্নালোকে শতগুণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ; আলুলায়িত কুঞ্চিত কুন্তল রাশি তরঙ্গ ভরে শৈবাল গুচ্ছের ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। অভাগিনী শেষ মুহূর্ত্তেও পানিয়াকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ; মূর্ত্তিমতী ভালবাসার মত আপনার অনাবৃত বক্ষ সংলগ্না নগ্না কন্যাকে দিলজান তখনও দুইখানি রৌপ্যবলয় শোভিত মৃণাল বাহু দ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে ! কিন্তু হায়রে ! তথাপি তাহাকে মৃত্যুর করাল কবল হইতে বাঁচাইতে পারে নাই ত !

স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া সহসা হানিফ উন্মাদের ন্যায় বন্যার জলে লম্ফ দিয়া পড়িল। কিন্তু বৃথা তাহার এই প্রচেষ্টা ! দরিয়ার ঋণ দরিয়া বহু পূর্ব্বেই চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত ডিক্রী জারী দ্বারা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৩৬)

শয্যায় শয়ান কাকাবাবুর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বিস্ময় ব্যথার সহিত ডাকিলাম "কাকাবাবু, আপনি এমন হ'য়ে গেছেন, আপনার এত অসুখ, এমন অবস্থা হয়েছে তাও আমাদের খবর দেন নি!" আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় ও অভিমানে আমার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া গেল। ঝর ঝর করিয়া অবাধ্য অনাহুত অশ্রুজল কাকাবাবুর পায়ে ঝরিয়া পড়িল।

বিশীর্ণ হাত দু'খানি বাড়াইয়া আমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কাকাবাবু বলিলেন "এতটা কাহিল হ'য়ে পড়বো তা তো আগে বুঝতে পারি নাই মা। বুঝতে যেদিন পেরেছি সেই দিনই মঞ্জুকে দিয়ে তোমায় চিঠি লিখিয়েছি। তবু অপরাধ ধরা হোল! বুড়ো ছেলের এত অপরাধ ধরলে কি চলে শ্যামা? চিরকাল ভাল থেকে, চিরকাল বেঁচে থেকে—বুড়ো ছেলেই যদি মা'র স্নেহ ভোগ করবে,—তা হ'লে ছোটদের দশা কি হ'বে? তোমার ছোট ছেলেকে কৈ দেখালে না তো! নীলুকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

মঞ্জু নীলুকে কাকাবাবুর কাছে লইয়া গেল। কাকাবাবু আদর করিয়া নীলুর গাল দু'টি টিপিয়া দিলেন। মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "তুমি অক্ষয় হ'য়ে মা'র কোল আলো করে বেঁচে থাকো ভাই, ভগবান যেন তোমায় মানুষের মত মানুষ করে দেন।"

আমি কাকাবাবুর কাছে বসিয়া ছিলাম বলিয়া স্বামী এতক্ষণ দ্বারের পাশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমি একটু সরিয়া যাইতেই তিনি ঘরে ঢুকিয়া কাকাবাবুকে প্রণাম করিলেন। পা দুই খানি কোলে লইয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কেমন আছেন কাকাবাবু? কোন্ ডাক্তার এখন দেখছে? আগে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করে আমায় খবর না দিয়ে, ব্যারাম এতটা বাড়িয়ে তুলেছেন! এখন হয়তো অনেক কষ্ট পেতে হবে।"

একটা শাদা পাথরের গেলাসে একটু বেদানার রস লইয়া মা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "এতদিন ব্যারাম স্বীকার করতে চান নি, তোদের খবরও দিতে দেন নি; তবু আমি ডাক্তার ডেকেছিলাম, তাই কি ওষুধ খেয়েছেন, ওষুধ না খাবার মতলবই সাড়ে ষোল আনা, ধরে বেঁধে যা দুই এক দাগ খাওয়ানো হয়েছে। ওঁর যে কিছুই হয় নি এটা উনি বড় গলায় জাহির করতে যেয়ে এখন এমনি অবস্থা করেছেন।"

"কি অবস্থা করেছি বৌঠান? এতো আমার সুখের অবস্থা। তোমরা স্বার্থপরের মত কেবলই আমাকে কাছে রাখতে চাও। আর কারুর কথা কি ভাবতে হয় না? শক্ত বাঁধনে বেঁধে আর কতকাল রাখবে বৌঠান, এখন বাঁধন খুলে দাও। পুরাণ ত্যাগ করে নতুনকে ধর। আমাদের দাদুটিকে দেখেচ? কেমন সুন্দর দাদু হয়েছে! ভগবান আমার ইহলোকের সব সাধ পূর্ণ করেছেন বৌঠান। আমি মণিকে পেয়েই সব পেলাম।" বলিয়া কাকাবাবু নীলুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

মা সাবধানে বেদানার রসটুকু কাকাবাবুর মুখে ঢালিয়া দিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমুখে নীলুকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

সেইদিন অপরাহ্নে স্বামী দুই তিন জন বিখ্যাত ডাক্তার ডাকিয়া কাকাবাবুকে দেখাইলেন। তাঁহারা ঔষধের সহিত কাকাবাবুর বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন; কিন্তু

কাকাবাবু কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না।

আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দুঃখিত হইয়া বলিলেন "এ সময় কলকাতা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তোরা আমাকে নিয়ে অনর্থক টানাটানি করতে চেষ্টা করিস না। তোদের অনুরোধ রাখতে না পারলে আমার খুবই কষ্ট হয়।"

স্বামী কাতর হইয়া বলিলেন "যাতে আপনি ভাল হবেন তা করতে না পেরে আমাদেরও কম কষ্ট হয় না। কাকাবাবু! আর কোথায়ো না যেতে ইচ্ছা হয়, মুঙ্গেরেই চলুন। সেখানে খুব বৃষ্টি হ'য়ে এখন স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। নতুন বাংলাও সারা হ'য়ে গেছে। গঙ্গার ধারে কিছুদিন থাকলে শরীরটাও সেরে যাবে, আপনার নতুন বাংলাও দেখা হবে।"

"নতুন বাংলা দেখতে গিয়ে আমার প্রিয় পুরাণোর মধ্যে যদি আর না ফিরতে পারি মণি। এতদিন খুব দেখা হয়েছে, খুব ঘোরা হয়েছে। এবার এই ঘর খানায় শুয়ে শুয়ে আমি ছুটীর আনন্দ অনুভব করতে চাই। তোরা আমার জন্য ব্যস্ত হস্ নে। মুক্তি যদি আমার আসেই তাতে ক্ষুব্ধ হস্ নে। তোরা কি পরকাল মানিস নে মণি? তোরা একালের, তোদের শিক্ষা দীক্ষা একালের, তোরা হয়তো পরকাল মানতে চাস্ না। তোদের দ্বিধা আসে, সন্দেহ আসে। আমার সে সবের কিছুই বালাই নেই, সেইজন্যে ভয়ও নেই, ভীতিও নেই।" বলিয়া কাকাবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বপ্নভারাকুল নয়নে মুক্ত গবাক্ষ পথে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা সুবিমল আনন্দ বিভায় তাঁহার শুষ্ক মুখ সরস হইল। চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এযে কিসের পুলকোচ্ছ্বাস, কোন অমৃতের জন্য অভিযান আমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া সেই তৃপ্তিভরা, আশাভরা মুখখানির পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমার বিশ্বাস ছিল কাকাবাবুর উদার হৃদয়তলে কোন বাসনা নাই, কামনা নাই, জগতে যাহার স্নেহের পাত্র, নিকটতম, তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া, ভালবাসিয়া কাকাবাবুর চিত্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া রহিয়াছে। সকলে সুখে থাকুক, সকলের শুভ হোক, ইহা ছাড়া তাঁহার যে আর কোনও কাম্য থাকিতে পারে স্বপ্নেও তাহার সন্ধান পাই নাই। আজ কিন্তু আমার মনে একটা সংশয় আসিল, সন্দেহ হইল। কাকাবাবুর অন্তঃস্থলে কিসের যেন একটা বিশ্বব্যাপী অব্যক্ত ব্যথার আভাস পাইলাম। সে যে কিসের প্রচ্ছন্ন ব্যথা তাহা আমার অগোচর কিন্তু সে ব্যথার সহিত মৃত্যুর যেন একটা ঘনিষ্ট ভাব আছে, নহিলে 'মরিব' বলিয়া কি মানুষের এত উল্লাস হইতে পারে? এই রূপ রস-ময়ী সৌন্দর্য্যভরা শান্তিভরা জগত হইতে কে চিরদিনের তরে বিদায় লইতে চাহে? কাকাবাবু যেন যাইবার নিমিত্তই ব্যগ্র হইয়া পা দুটি বাড়াইয়া দিয়াছেন, মৃত্যুপুরী হইতে তাঁহার চিরবাঞ্ছিতের আহ্বান লিপি তাঁহার প্রাণে অমৃত-পরশ বুলাইয়া দিয়াছে। চোখের সম্মুখ হইতে অবসাদ ও নৈরাশ্যের কালিমাময় যবনিকা তুলিয়া লইয়াছে। কাহার আশায় আমার কাকাবাবুর এ আকুলতা, এ প্রতীক্ষা, তাহা যে আমার জানিতে ইচ্ছা করে! কাকাবাবুর গোপনতম ব্যথা-টুকুও যে আমার বুকে শেলাঘাত করে। কাকাবাবুর কিসের ব্যথা? ব্যথার গূঢ়ত্ব কতটুকু? আমার স্বামীর মত যাঁহার পুত্র, মঞ্জুর মত যাঁহার কন্যা, মায়ের মত যাঁহার ভ্রাতৃবধূ, যাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য, অতুল মান সম্ভ্রম—তাঁহারও ব্যথা! হায় মানব চরিত্র, হায় মানবের অপরিমিত আশা, আকাঙ্ক্ষা!

(ক্রমশঃ)

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রমদার চিন্তা।

নয়ন মুগ্ধকর কুসুমময় সরস ও মধুর ফলপূর্ণ-পাদপ-সমাকীর্ণ এই সৌরভময় ও শোভাময় এবং মধুরতাময় পৃথিবীতে প্রমদার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল অর্থ। এই অর্থ ব্যয় করিয়া সে পতিরতা হইলেও পাতর সুচিকিৎসা করাইতে পারে নাই; ঈশানীর বিবাহের সময় এই অর্থ ব্যয় করিয়া, চিন্তাগ্রস্থ স্বামীকে লজ্জাজনক অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই; এই অর্থ অপহারকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহামান্ত ও অর্থবান পিতার পুত্র, বিদ্বান এবং তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়, জামাতা শরৎকুমারের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি যদুপতির কথায় বিশ্বাস না করিলেও, শরৎকুমারের বিত্তনাশের সন্দেহ করিয়া তাহার এই অর্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন তিনি তেমন বুদ্ধিমতী হইয়া কিরূপে এমন দুর্বুদ্ধির কার্য্য করিলেন; কিরূপে আপন যত্নরক্ষিত অর্থ পরের ছেলে জামাতার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন? এবং তাহার কোনও সাক্ষী কোন রসিদ বা কোনও চিহ্ন রাখিলেন না? এখন এই অর্থ যদি দৈবাৎ নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তিনি কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? হায় অর্থ! তুমি অর্থাকাঙ্ক্ষিণী প্রমদার মনে কি অনর্থেরই সৃষ্টি করিয়াছিলে!

যদুপতি প্রস্থিত হইলে ঈশানী যদুপতি প্রদত্ত নোটখানি আবার বাহির করিয়া তাহা মাতাকে দিবার জন্য চিন্তাকুলা মাতার নিকট উপস্থিত হইল। নোটখানি মাতার হাতে দিয়া বলিল, 'মা, তুমি দশ টাকা রাখ।'

কন্যাকে সন্নিধানে সমাগতা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য প্রমদার চিন্তাজ্বরের বিচ্ছেদ ঘটিল। তিনি নোট খানা গ্রহণ করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'আহা, মুখ-দেখার শ্রী দেখ না? অমন সোণার চাঁদ ছেলেকে একটু সোণা দিয়ে মুখ দেখতে পারলে না। কিনা একখানা ময়লা কাগজ দিয়ে মুখ দেখ্‌লে যেমন ভূতের মত আখাম্বা চেহারা তেমনই বুদ্ধি!'

ঈশানী বিষন্ন মুখে বলিল, 'কিন্তু খোকা আর কারুর কাছ থেকে ওই ময়লা কাগজই এ পর্য্যন্ত পায়নি। ও এই প্রথম মুখ-দেখানি পেলে। আমি এমনই কপাল করেছি, যে দিদির ছেলে হ'লে আমি ওর অর্দ্ধেকও দিতে পারব না।'

হৃদয়মধ্যে সন্দেহের যে তপ্ত উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা চাপা দিবার জন্য প্রমদা কহিলেন, 'কেন, তুই কি মন্দ কপাল করেছিস্? লোকের একটা ভাল হয় না; তোর বাপঘর শ্বশুরঘর—তুইই ভাল। শরৎ, বাপের একছেলে; বাপের অত সম্পত্তি সবই একা পাবে; তুইও আমার সব পাবি।—এমন কে পায়? তুই কি মনে করেছিস্ যে যদুপতি সত্যি বলেছে?'

ঈশানী বলিল, 'না, মা, জামাই বাবু মিথ্যে বলবার লোক ন'ন। আর শুধু শুধু এমন একটা মিথ্যে বলবেন কেন?'

প্রমদা কহিলেন, 'হিংসে, হিংসে! তুই জানিস্ নে, বজ্জাৎ লোকে যেটা হবার জন্য মনে মনে ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা দ্বারা সেইটে ঘটিয়ে আপনার মনের হিংসেটাকে পরিতৃপ্ত করে।—হিংসুকে না পারে এমন কাজ নেই। অমনই কোথাও কিছু নেই, অমনই তোদের বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী হ'য়ে গেল!—এ শুধু ওর হিংসে।'

ঈশানী কাতর কণ্ঠে কহিল, 'না মা, জামাই বাবুর মনে একটুও হিংসে নেই; আর তিনি মিথ্যাও বলেন নি। তা' ছাড়া আমি শুনেছি যে আমার শ্বশুরের অনেক টাকা দেনা

ছিল ; আর বাড়ী ও বিষয় দেনার দায়ে বন্ধক ছিল ; আর ইদানিং ঘুষ নেওয়ার জন্য আমার শ্বশুরের চাকুরীও গিয়েছিল।'

প্রমদা অত্যন্ত শঙ্কিতা হইলেন ; সন্দেহ ও চিন্তার স্রোত আবার প্রবল বেগে তাঁহার মনমধ্যে বহিতে লাগিল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে ঈশানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই ত এসকল কথা আমাকে একটি বারও বলিস্ নি ?'

ঈশানী কহিল, 'সে কথা ত কখনও বলবার দরকার হয় নি ; আজ জামাই বাবুকে মিথ্যাবাদী মনে করলে তাই বললাম।'

প্রমদা অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'আমি যে শরৎকুমারের হাতে আমার যে টাকা কড়ি ছিল সব গচ্ছিত রেখেছি ! এখন সর্ব্বস্ব হারিয়ে, সে আমার টাকা ফেরত দিতে পারবে ত ?'

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শরৎকুমারকে মাতার এই অর্থ প্রদানের কথা ঈশানী ইহার আগে কিছুই জানিতে পারে নাই। এখন সে মনে করিল শরৎকুমার নিশ্চয় সেই অর্থ নষ্ট করিয়াছে। তাহা না হইলে সেই টাকা অবশ্যই তাহার হাতে থাকিত, এবং গৃহহীন হইয়া রাখিবার স্থান অভাবে এইখানেই লইয়া আসিত। তাহা ত আনে নাই ; আনিলে, সে কথা ঈশানীর অগোচর থাকিত না, কারণ ঈশানীই স্বহস্তে তাহার পেটক মধ্যে তাহার বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিত ; সে পেটক মধ্যে সামান্য কয়েকটা টাকা ছাড়া আর কিছুই দেখে নাই। আবার হাতে কোনও টাকা মজুত থাকিলে সে পত্নীর অলঙ্কার লইবার অপমান স্বীকার ক'রত না, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঢাকায় যাইত না। একটু চিন্তা করিয়া সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে মাতার অর্থ প্রত্যর্পণ কখনই তাহার অভিপ্রেত ছিল না। থাকিলে সে কখনও না কখনও মাতার অর্থ প্রাপ্তির কথা পত্নীর কাছে উল্লেখ করিত। সে এক্ষণে মাতার অর্থনাশের আশঙ্কায় ভীত হইয়া বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, 'তোমার টাকা সে ফেরত দেবে কিনা, তা' আমি বলতে পারিনে। এখন ত তার হাতে কিছুই নেই।'

ক্ষীণ আশার আলোক তাঁহার চিন্তাকুল হৃদয়ে জ্বালিয়া প্রমদা কহিলেন, 'কিন্তু আমার গচ্ছিত টাকাত তার হাতে থাকবার কথা নয়। টাকা সে কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখবে বলেছিল।'

ঈশানী কহিল, 'কিন্তু এত সব কথা হ'য়েছিল, তুমিত আমাকে একদিনও জানতে দাও নি।'

বুদ্ধিমতী প্রমদা বলিলেন, 'তা আর কি জানাব। টাকা কড়ির কথা কি পাঁচ কাণ করতে আছে ? তাতে আবার অমন বড়লোক জামাই ! তার কাছে আমার এই সামান্য ক' হাজার টাকা বিধবার পুঁজি জমা রাখছি, তাও কি আবার লোক-জানিয়ে কিম্বা রসিদ নিয়ে রাখতে হবে ?'

ঈশানী কহিল, 'এখন ত বুঝ্‌তে পারছ যে তাই করা তোমার উচিত ছিল ?'

প্রমদা বুদ্ধি পূর্ব্বক বলিল, 'আচ্ছা, এখন তুই এক কাজ কর দেখি। শরৎকে একখানা চিঠি লেখ ; তাতে লিখে দে যে আমার পাঁচশ' টাকার বড় দরকার হ'য়েছে ; আমার গচ্ছিত টাকা থেকে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়ে দিতে। এই পত্র খানার যা' উত্তরই লিখুক, সেখানা আমার টাকা গচ্ছিত রাখার একটা ভাল রসিদ হবে।'

ঈশানী স্বামীকে সেইরূপ পত্র লিখিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল বটে কিন্তু তখনও প্রমদা আপন মনকে চিন্তাশূণ্য করিতে পারিল না।—চিন্তারাশি আগ্নেয় গিরির তপ্ত ধাতু স্রাবের ন্যায় তাঁহার অন্তরমধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

বন্দিনী

অভিনয়ের সরঞ্জাম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

নাট্যবিনোদ অপরেশ চন্দ্রের বন্দিনী নামক ঐতিহাসিক নাটকের মুদ্রিত অষ্টম পত্রে দেখা গেল যে "শিক্ষক ও আহার্য্য সংগ্রাহক" গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সহকারী। ছাপা কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে নাট্যবিনোদ ও তাঁহার ভক্তবিনোদ অহীন্দ্র চন্দ্র সোজা ইংরাজি বই না পড়িয়াই বন্দিনীর আহার্য্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মিশর দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যতগুলি বই ইংরাজি ভাষায় লেখা হইয়াছে তাহার অনেক গুলিই কলিকাতার সরকারী ও বেসরকারী পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। আহার্য্য সংগ্রাহক ও তাঁহার সহকারী আর্ট থিয়েটার কোম্পানী লিমিটেডের বেতন ভোগী কর্ম্মচারী এবং মোটা বেতন আহার করিয়া থাকেন। আর্ট থিয়েটার কোম্পানী নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্রের বন্দিনী নাটক অভিনয় কালে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীদের গাফিলীর জন্য বন্দিনীর অভিনয়ের সরঞ্জাম যথাযোগ্য হয় নাই।

আমাদের দেশে দুই চারিজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি যে বন্দিনী নাটক ঐতিহাসিক নাটকের সাজ পোষাক ও দৃশ্যপট যথাযোগ্য হইয়াছে। এই ভুল ধারণাটীর জন্য ভবিষ্যতে বাঙ্গালার নাট্য সমাজের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হইতে পারে সেইজন্য ভুলগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা গেল যে মিশর দেশের দৃশ্যপট ও পোষাক নকল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে কিন্তু আর্ট থিয়েটারের বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের বুদ্ধির দোষে কোনটাই নকল হয় নাই। দৃশ্য-পটে দেখা গেল যে বড় বড় কতকগুলি থাম এক পাশে সাজান আছে কিন্তু থামের মাথা (Capital) নাই। এক জায়গায় মিশর দেশের থামের মাথার পরিবর্ত্তে দুই হাজার ক্রোশ দূরবর্ত্তী আশিরিয়ার থামের মাথা আনা হইয়াছে। এই থামগুলি দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে ইহা গ্রন্থকারের কল্পিত রাজপ্রাসাদ। মিশরের রাজপ্রাসাদের অনেক ছবি কর্ণাক, লক্সৌ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মন্দিরে পাওয়া যায়। দৃশ্য-পট দেখিয়াই বোঝা গেল যে আহার্য্য সংগ্রাহক যুগল ইংরাজি ছাপা বইএর ছবি দেখিবার অবসর পান নাই। Breasted's History of Egypt, Flindes Petrie র History of Egypt Vol III. এমন কি Gaston Maspero র অতীত যুগের "Struggle of the Nations" নামক অধুনা বাতিল গ্রন্থেও এই সমস্ত ছবি দেওয়া আছে। তাহা দেখিয়া মিশরের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশের প্রাসাদের ছবি স্বচ্ছন্দে আঁকান যাইতে পারিত। সংগ্রাহকযুগল কেন যে Imperial Library অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পদার্পণ করেন নাই তাহা তাঁরাই বলিতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্ভিয়া নামটী গ্রীক। আহার্য্য সংগ্রাহক যুগলের আর্ভিয়ার পোষাকও গ্রীক, মিশর দেশের রাজকুমারী কখনও এরূপ অদ্ভুত পোষাক পরে নাই। মিশরের রাজকুমারীর পোষাক Breastedএর Struggle of the Nations নামক গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদের ২৩৭ পাতায় "Queen Mutnotrit in the Gizeh Museum" এবং ২৩৯ পাতায় "Bust of queen Hatshopsitu" এই দুইখানি ছবি দেখিয়া তৈয়ারী করিলেই হইত। বাহাদুর আহার্য্য সংগ্রাহক যুগলের তাবেজ নামক বেদুইন আরব বালকের পোষাক সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত হইয়াছিল। শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীর পোষাকটী বোধ হয় এই সুগায়িকাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র ও তাঁহার ভ

অহীন্দ্রচন্দ্র design করিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে লক্ষ্ণৌ এর আমীনাবাদ বাজারে ও পুরাতন চৌকে অনেক সুদৃশ্য বালক এই জাতীয় পোষাক পরিয়া বেড়াইত। পরনে চুড়িদার পায়জামা, অঙ্গে ঢিলা জামা এবং মাথায় 49th Bengali Regimentএর foraging cap—কেবল কোমরে একখানি রঙ্গিন রুমাল বাকি ছিল। আর্ট থিয়েটার কোম্পানী লিমিটেডের বেতনভোগী আহার্য্য সংগ্রাহক নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্রের কল্পিত আরব বালকের এই পোষাক দেখিলে আধুনিক ও প্রাচীন সকল আরবই ভয়ে মাতৃগর্ভে পুনঃ প্রবেশ করিতে চাহিবে। বাহাদুরীর উপর বাহাদুরী ধুপ জ্বালাইবার কয়টী টেবিল। এই রকম ছয় কোণা টেবিল কেবল ভারতবর্ষে সিমলা ও শ্রীনগর সহরে তৈয়ারী হয়। আর্ট থিয়েটার কোম্পানী কেবল বন্দিনী নাটকের জন্য এই টেবিলগুলি তৈয়ারী করেন নাই, ইহার পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত নাটকেও এই টেবিলগুলি গ্রীস দেশের টেবিল বলিয়া চালান হইয়াছিল।

সুমালিয়া বা বন্দিনীর পোষাক আর্ত্তিয়ার অনুরূপ, কেবল কাপড় খানি অনেকটা আশিরিয়ার পুরুষদের ধরণে পরাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু আহার্য্য সংগ্রাহকদের মস্তিষ্কে আশিরিয়ায় পুরুষ ও রমণীর বস্ত্র পরিধানের প্রণালীতে যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে এ চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও উদিত হয় নাই। নাহেরের পোষাক আরও অদ্ভুত। তাহার পরণে পটী দেওয়া শাড়ী, লম্বা জামা এবং আরবী পাগড়ী। বোম্বাই প্রদেশের চিত্তপাবন বা কোঙ্কনস্থ ব্রাহ্মণেরা এই জাতীয় পাগড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর্ট থিয়েটারের আহার্য্য সংগ্রাহক যুগল অবশ্য চিত্তপাবন পাগড়ীর কথা বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহারা বোধ হয় ছাপা বই খুঁজিবার পরিশ্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এই অদ্ভুত পাগড়ী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সাধারণ সৈনিকগণের দুই একজনের পোষাক কতকটা মিশর দেশের মত হইয়াছিল বটে কিন্তু আর্ত্তিয়ার সহচরীগণের পোষাক আইশিস দেবীর সেবায় উৎসর্গীকৃত চিরকুমারীদের মত হইয়াছিল। এই কুমারীরা যে দেবীকল্পা এবং তাঁহারা যে কেবল রাজকুমারীর সেবা করিতেন না সেকথা বুঝিবার শক্তি আহার্য্য সংগ্রাহক যুগলের আছে বলিয়া বোধ হয় না।

মিশর দেশের রাজা থুথমসিসের যে পোষাক তৈয়ারী করা হইয়াছিল তাহা মিশর দেশের সাধারণ নাগরিকের পোষাক। চারিজন থুথমসিস মিশরদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সকল মূর্ত্তির ছবি ইংরাজি বহিতে ছাপা হইয়াছে কিন্তু তাহা খুঁজিয়া লইবার অবসর এই বাহাদুর স্বনামধন্য আহার্য্য সংগ্রাহক যুগলের হয় নাই। ইতালী দেশে তুরীণ মিউজিয়মে রক্ষিত তৃতীয় থুথমসিসের মূর্ত্তি যাহা Maspero র Struggle of the Nations নামক গ্রন্থের ২৫৫ পাতায় ছাপা আছে তাহা একবার দেখিলে হইত নাকি? মিশরের রাজারা মাথায় যে সর্পের মুকুট পরিতেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য অথচ আহার্য্য সংগ্রাহক যুগল সে কথা বুঝিতে পারেন নাই। Masperoর গ্রন্থের ২৯১ পাতায় দ্বিতীয় আমেন হোতেপ বা আমেনোথেসের একবর্ণ চিত্র এবং ২৯৭ পাতার সম্মুখে তৃতীয় আমেনোথেস বা আমেন হোতেপের ত্রিবর্ণ চিত্র দেখিবার অবসর আহার্য্য সংগ্রাহক যুগলের হয় নাই। বৈকালী পত্রে নাট্য বিনোদ অপরেশচন্দ্রের মোক্তার যে Masperoর দোহাই দিয়াছিলেন সে Maspero এখন দেখা যাইতেছে হাতী বাগানের লোক এবং তিনি বোধ হয় কোন দিন মিশর দেশে পদার্পণ করেন নাই।

মিশররাজ থুথমসিসের পরেই তাঁহার সেনাপতি এ্যাম্‌সিসের পোষাক। অহীন্দ্র বাবুর লাল রঙ্গের cloak সবুজ রঙের toga, ভারতবর্ষের কোমর বন্ধ তাঁহাকে রোমদেশের থিয়েটারের বিদূষক বা ভাঁড় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার শিরস্ত্রাণটী সিরিয়া দেশের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যাজকের, মিশর দেশের লোক গত ছয় হাজার বৎসরের মধ্যে এমন শিরস্ত্রাণ দেখে নাই। মিশর দেশের যে রাজধ্বজ আসিল তাহা ভারতবর্ষের শিবের ত্রিশূল। আহার্য্য সংগ্রাহকযুগল ভবিষ্যতে Crux ansata নামক চিহ্নের অর্থ খুঁজিয়া লইলে ভাল হয়; আর্ট থিয়েটারের কোনলোক কি Rider Haggard এর "She" বা 'Ayesha' পড়েন নাই? মিশরের নাগরিকেরা আসিল ডুগ ডুগি আর করতালি বাজাইয়া

গান করিতে করিতে। আহার্য্য সংগ্রাহক যুগলকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর আহার্য্য ভক্ষন করিয়া নাট্যকলার নামে এই অখাদ্য কেন রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ করিলেন? তাঁহারা চেষ্টা করিয়া মিশরের ছাপা ইতিহাস পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন যে দেবযাত্রায় বা শোভাযাত্রায় মিশরের জন সাধারণ নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইত না, সে কার্য্যের ভার ছিল দেব মন্দিরে বেতনভোগী গায়ক ও বাদক দলের। আর্ট থিয়েটারের মোক্তার 'বাঙলা' পত্রের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত শৈলেশ নাথ বিশী অবশ্য বলিবেন যে আমি প্রতিকথায় প্রত্নতত্ত্বের কচকচি তুলিয়া থাকি। আহার্য্য খাদক নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র যদি নাটক রচনা কালে প্রত্নতত্ত্বের দোহাই না দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রত্নতত্ত্বের কথা তুলিতাম না। প্রত্নতত্ত্বের আশ্রয়ে অজস্র মিথ্যার অবতারণা করিয়া নাটক রচনা করিবেন ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাইবেন তাহাতে নাট্যবিনোদের কোন দোষ নাই। সত্যকথা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেই এখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশী মহাশয়ের মত রসগ্রাহীর কাছে একেবারে পঞ্চমহাপাতক করিয়া বসে।

(ক্রমশঃ)

দুই মিনিট

[শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

চোরের চালাকী—

দুপুর রাতে এক চোর একটী ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকেছে!—রান্নাঘর থেকে বাসনপত্র একটা ছালায় বেঁধে সে বেরুতে যাবে এমন সময় কে একজন তার পিঠের উপর হাত দিলে। ভূতের ভয় তার না থাক্‌লেও চম্‌কে সে পেছন ফিরে চেয়ে বুঝলে একজন মানুষ। লোকটা বল্লে "অতি অন্যায় কাজ করছ তুমি আমার জিনিষপত্র চুরি ক'রে। মনে কর আমি যদি তোমায় জেলে দি তাহ'লে তোমার বউ ছেলে—" দ্বিরুক্তি না করে--হাতের ছালা ফেলে রেখে চোর জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।—অপর লোকটাও চোর!—সেও চুরি করতে সেই বাড়ীতে ঢুকেছিল! এক গাল হেসে সে তখন ছালাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কমলা

(কথিকা)

[শ্রীরামচন্দ্র পাল]

মুখটী খোলা উষার রাঙা মুখ খানার মত ফুট্‌ফুটে। চোদ্দ বছরের মেয়ে কম্‌লি সারা মুখ খানায় গোলাপী আভা ছড়িয়ে সেদিন ঠিক বিকেলবেলা রমেশদের বাড়ী থেকে ফিরে আস্‌ছিল —ঠিক সেই সময় হঠাৎ মেঘে-ঢাকা-চাঁদের-আলো যেমন পৃথিবীটাকে একটু কালি করে দেয় ঠিক তেমনি কমলিরও মুখখানা একটু কালি করে দিয়েছিল তার দিদিমাকে পথের মাঝে দেখতে পেয়ে……

*   *   *   *

পাঁচ ছয়দিন কেটে গেছে কম্‌লি তার দিদিমার জেগে-থাকা-চক্ষু দুটোকে কোন মতে ফাঁকি দিয়ে আবার গেল রমেশদের বাড়ী কিন্তু ফিরে আস্‌তেই তার দিদিমার বেরসিক জিহ্বার নিরস গালি গালাজ তার প্রাণের মধ্যে রঙীন ছবিটীর উপর যেন একটা পর্দ্দা টেনে দিয়ে গেল—যা এঁকে এনেছিল সে রমেশদের বাড়ী থেকে। কম্‌লি কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দিদিমা এমন ক্ষিপ্রতার সহিত তার মুখের কথাটী কেড়ে নিলেন যে রাবণকে বান মারবার সময় রামচন্দ্রও বোধ হয় তেমন ক্ষিপ্রতার সহিত বান চালান নি। তার দিদিমা পোড়ারমুখী চোখ্‌খাকী প্রভৃতি কতকগুলি বেশ প্রাচীন রসাশ্রিত গালি বর্ষণ করে প্রাণের ক্ষুধা কিছু শেষ করে 'রমেশদের বাড়ী যাওয়া রহিত'—এই রায় দিয়ে মুখশুদ্ধি করে তার ছোট ছোট চোখ দুটো যথা সম্ভব বড় করে ক্রোধের পরিস্ফুট ভাব দেখিয়ে এমন বীরদর্পে চলে গেলেন যে নেপোলিয়ান বিজয়ী ডিউক অব ওয়েলিংটনও বোধ হয় তেমন বীরদর্পে যেতে পেরেছিলেন কি-না সন্দেহ।

*   *   *   *

একবছর কেটে গেছে। আজ তারিণী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে সন্ধ্যা হতে না হতেই আলোর খুব ছড়াছড়ি আর কোলাহলটাও তেমন বেহাগ রাগিণীর মত লাগছিল না।—আজ কমলির বিয়ে।

*   *   *   *

রাত আটটা।

ঘরের কোণে বোঁটা-থেকে-ছিনিয়ে-আনা ফুলটির মত ঘাড় মুচড়ে পড়ে আছে কমলি, আর তার বুকের মাঝে একটা দারুণ বুকফাটা চাপা কান্না গলা পর্য্যন্ত উঠে মুখ দিয়ে বেরুতে সাহস না করে দু' ফোঁটা অশ্রু উপহার দিয়ে চলে গেল। কমলির বুকের মাঝখান থেকে রমেশের রঙীন ছবি আজ ছিঁড়ে ফেলতে হবে—আজ ভুলে যেতে হবে তার কথা—তার অসীম প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি! ভাবতে ভাবতে—বুঝিবা বিচ্ছেদের বেদনা সইতে না পেরে মূর্চ্ছা এসে তাকে ঢলিয়ে দিলে একটা শান্তির বুকে।

*   *   *   *

রাত বারোটা।

অনেক করে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা কমলিকে টেনে নিয়ে এসে পাত্রস্থ করবার জন্য দাঁড় করালে, তা না হ'লে যে সমাজের চোখ রাঙানি … … !

*   *   *   *

জীব-বিশেষের উচ্চস্বরের মত স্বর দিয়ে দিদিমা কোথা থেকে বলে উঠলেন, ওলো কমলি শুভদৃষ্টি কর। মাগো মেয়ে কি ঢ্যাটা! কৌতুহলের বেগটা সামলাতে না পেরে চোখ মেলে চাইতেই—একি! সে কি মৃত না জাগ্রত ?…

*   *   *   *

রাত তিনটা।

রমেশের কোল থেকে মাথা তুলে চোখ মেলে চাইতেই কমলা বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলে উঠ্‌লো—"তুমি! তুমি!"

রমেশ কমলার গাল দু'টী টিপে দিয়ে বল্‌ল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি।" অনভ্যস্ত হাতে খুলে-পড়া ঘোমটাটি কমলা মাথার উপর টেনে দিল।

———

মহাত্মা গান্ধী

দ্বিতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ১৯শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২। [২৫শ সপ্তাহ

স্বাগতম্

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা, রাজদণ্ড ও সিংহাসন ভিক্ষাপাত্রে দান করিয়াছিল, বণিক তাহার স্বর্ণ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল, বীর সৈনিক তাহার তরবারী দিয়াছিল—ভিখারিণী নারী তাহার চীরখণ্ড ভিক্ষাপাত্রে দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। করুণা ও মৈত্রী, অহিংসা ও ক্ষমার সেই প্রেম-সুন্দর বিগ্রহের পদতলে বসিয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব—ধর্ম্মের নামে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল!

সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের পুনরাভিনয় আর একবার আমরা চক্ষুর সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিতেছি। অহিংসা ও প্রেম বিলাইয়া আর এক মহাপুরুষ ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন। ভারতবর্ষের মনুষ্যত্ব কি দিয়া তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিবে?

কাশীর ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধদেবের মুখে নবধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল—শাস্ত্রাভিমানীর দম্ভে তিনি বিচলিত হ'ন নাই। তাঁহার প্রশান্ত মহিমা ক্ষুদ্রতার অপমানের আঘাতের ঊর্দ্ধে অবিচলিত থাকিয়া কল্যাণকেই জয়-গৌরব দিয়াছিল। আর আজ, ভারতের প্রতিষ্ঠাবান শিক্ষাভিমানী রাজনীতিজ্ঞগণ তাঁহার প্রদত্ত আদর্শ ত্যাগ করিয়াছেন; দেশের মহৎ ও বৃহতের দল সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাকে পরিহার করিয়াই চলিতেছেন—তথাপি একান্ত নিরভিমানী মহাপুরুষ ক্ষুব্ধ নহেন, বিচলিত নহেন—সর্ব্ব অসম্মান তুচ্ছকারী অসীম অনুকম্পা লইয়া তিনি ভারতের প্রতি পল্লী-নগরে কল্যাণ-বার্ত্তা প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন।

এবার বাঙ্গলায় তাঁহার শুভ পদার্পণ! দেশের অতি বুদ্ধিমান রাষ্ট্রবীরগণের পরিত্যক্ত, সমষ্টি-মুক্তির মহান আদর্শ আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনায় উপেক্ষিত! তবু তিনি কল্যাণ-সাধন হইতে বিরত নহেন। উপেক্ষায় তিনি অভিমান করেন নাই—মহাভিক্ষুক তাঁহার প্রসারিত ভিক্ষা-পাত্র হস্তে হাস্যমুখে বাঙ্গালীর দ্বারে উপস্থিত। আজ বাঙ্গলার মনুষ্যত্ব, বাঙ্গালীর পৌরুষ কি দক্ষিণা দিয়া মহাত্মার

সম্বর্দ্ধনা করিবে? মহৎ প্রাণের নিঃস্বার্থ-কামনা পূর্ণ করিবার শক্তি কি আজ বাঙ্গালীর আছে? দিকে দিকে অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহাকে দিবার উপযুক্ত অর্ঘ্য কি আজ বাঙ্গালীর ঘরে আছে?

হে রাষ্ট্রগুরু, তাই তোমার পুণ্যস্মৃতি সলজ্জ সঙ্কোচে স্মরণ করিতেছি, আর ভাবিতেছি সেদিনের উৎসাহ আর আজিকার অবসাদ। সেদিনের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, আজিকার সংশয়াতুর বুদ্ধি,—সেদিনের আদর্শানুরক্তি, আজিকার ব্যভিচার—সমস্ত অতীত যেন এক নিষ্ঠুর পরিহাসের মত ব্যর্থ-ব্যথা হানিয়া বর্ত্তমানের হীনতেজ ম্রিয়মান বাঙ্গালীকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। আমরা কি 'স্বখাদ সলিলে' ডুবিয়া মরিতে চলিয়াছি? তুমি আসিতেছ, অথচ তোমার পুণ্য-চরিতকথা স্মরণ করিয়া কোন বল কোন ভরসা পাইতেছি না! নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য, সংশয়ের পর সংশয়, অন্ধকারকে আবৃত্ত করিয়া অন্ধকার—ইহাই কি ভারতবর্ষের বিধিলিপি? কে জানে, কে বলিবে? অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিতে আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি; ভবিষ্যতের অন্ধ-যবনিকা তুলিয়া দেখিতে সাহসে কুলায় না—বর্ত্তমানের কঠিনবক্ষে দগ্ধপদ মানবের মত চরণদাহে কাতর হইয়া আমরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছি মাত্র। দৃঢ়পদে, এক অটল নির্ভর বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

সেদিন যাঁহারা তোমার মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, অসহযোগের পুরোহিতরূপে জাতির পুরোভাগে আসিয়াছিলেন—স্বরাজ-পতাকা-বাহী সেই সব রাষ্ট্রবীরের দৃঢ়নিবদ্ধ চরণ—আজ সত্যাগ্রহে—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভূমিতে—অস্থির, চঞ্চল, পলায়নোন্মুখ! অর্থ, খ্যাতি, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, কর্ম্মহীন বাক্যস্তূপ—আলেয়ার আলো জ্বালিয়া দিগ্‌ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। প্রবল ব্যক্তিস্বাভিমানে কলুষিত স্বরাজ সাধনার মহাশ্মশানে—মহৎ ও বৃহতের প্রেত-তাণ্ডব—তবুও বাঙ্গলা তোমার সাধনা ও সিদ্ধিকে একেবারে বর্জ্জন করে নাই! যাঁহারা এখনো তোমার পতাকা ধরিয়া আছেন—তাঁহারা দীন, দরিদ্র—নিষ্ঠামাত্র সম্বল, সামান্য কর্ম্মীমাত্র—বৃহৎ নেতৃত্ব ইঁহাদিগকে ব্যঙ্গহাস্যে বিদ্ধ করেন; দেশবাসী নির্ম্মম ঔদাসীন্যে ইহাদের উপেক্ষা করেন। তবু মুষ্টিমেয় কর্ম্মীসাধক এখনো অটল দাঁড়াইয়া আছেন—তাই বাঙ্গলায় তোমার সাধনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনো শোনা যায়—সেই দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের প্রতিধ্বনি—আমরা সংখ্যায় অল্প হই, আর অধিক হই—আদর্শভ্রষ্ট হইব না, গুরুদ্রোহী হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক অর্জ্জন করিব না—সত্যকে খর্ব্ব করিয়া কাপুরুষোচিত ক্লৈব্য প্রদর্শন করিব না।

সত্যকে বিসর্জ্জন দেওয়াও সাধ্যাতীত—অথচ তাহাকে ধারণ ও বহন করার মত বল ভরসাও নাই—এই দ্বিধাসঙ্কুচিত চিন্তার দৌর্ব্বল্যে সমগ্র দেশ অবসাদে স্তব্ধ! চরকা ও খদ্দর? সম্ভব কি? অসম্ভব চেষ্টায় শক্তির অপব্যয় নহে কি—সংশয়াতুর বুদ্ধির কুমন্ত্রণা আত্মপ্রতারণায় উদ্বুদ্ধ করে!

তুমি আসিয়া আমাদের মাঝে দাঁড়াইয়াছ! তোমার তপস্তেজ-দীপ্ত ললাটের দিকে নির্ভয় দৃষ্টিতে চাহিবার মত সাহস আমাদের নাই! হে ভারতের শিব—আজিকার অ-শিব, এই মিথ্যার কুহেলী, সত্যের শুভ্রজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া তুমি দূর কর বাঙ্গালীকে স্বরূপানুভূতি দাও!

হে রাষ্ট্রগুরু! তোমার সুদুস্কর সুদীর্ঘ সাধনালব্ধ সিদ্ধির কল্যাণাশীষ বাঙ্গালীর দগ্ধ ললাটে বর্ষণ কর। আদর্শভ্রষ্ট বলিয়া তুমি তো বাঙ্গালীর আহ্বান ফিরাইয়া দাও নাই! তাইতো 'আসিয়াছি'—বলিয়া আবার আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে! আমরা স্বরাজ সংগ্রামে বিজয়ী নহি বটে—কিন্তু পরাজিত নহি। আমরা পারি নাই সত্য—কিন্তু পারিব না বলি নাই শুধু বুদ্ধির বিভ্রমে পথপ্রান্তে বসিয়া আছি মাত্র। তুমি আসিয়া সত্যের অমোঘ বাণী শুনাও—আমাদের মোহ-অচেতন আত্মাকে আহ্বান কর! হে প্রলয়ের দেবতা, আজ ধ্বংসমূর্ত্তি সংযত করিয়া তুমি সৃষ্টিধর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছ; আমাদিগকে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দাও,—তোমার অমোঘবাণী আজ বাঙ্গালীর চৈতন্য সম্পাদন করুক। হে রাষ্ট্রগুরু! বাঙ্গালী জাগিয়াই আছে, তোমার আহ্বানে উঠিয়া আসিবে—তুমি শুধু ডাক—

"ওরে ভীরু, ওরে মূঢ় তোল তোল শির,
তুমি আছ, আমি আছি, সত্য আছে স্থির।"

———

গান্ধিজী

[৺সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত]

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী ! কি লিখিস্ হিজি বিজি ?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী' ! 'গান্ধিজী' !
বাতায়নে দ্যাখ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে !
জনসমূদ্রে ওঠে ঢেউ—কোন চন্দ্রের অনুরাগে !
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতারে উৎসুক নর নারী !
কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ তনু,—কৃশানু পুণ্য ছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !
কৌসুলি-কুলী করে কোলাকুলী কার সে পতাকা ঘেরি,
কার মৃদু বাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী !
ক্রোড় টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে অপরূপ অবদান,—
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান !
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝি,
কে রে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য 'গান্ধিজী' ! 'গান্ধিজী' !

* * * *

মহাজীবনের ছন্দে যে জন ভরিল কুলীরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া,
আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্ম্মে যে মহাকাব্য মূর্ত্ত, চরিতে যে অনুপম ;
দেশ ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি,
'গড়া' যে পরে গো, ফেরে খালি পায়, শোয় কম্বল পাড়ি,
তপস্যা যার দেশাত্ম-বোধ ছোটোর-ও-ছোটোর সাথে,
দিন-মজুরের খোরাকে যে খুসী তিন আনা পয়সাতে,
স্বেচ্ছায় নিয়া দৈন্য যে কাছে টানিল গরীব লোকে,—
ভালো যে বাসিল লক্ষ কাবর ঘন অনুভূতি যোগে,
অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে টলষ্টয়ের পাশে,
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,
বীর বৈষ্ণব - বিষ্ণু-তেজেতে উজল যে জন ভিজি,
ওই সেই লোক ভারত-পুলক ওই সেই গান্ধিজী !

* * * *

কাফ্রির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া নগরীতে,
বারে বারে ক্লেশ সহিল যে বীর স্বদেশ বাসীর প্রীতে,
উপনিবেশের অপ-হুজুগের না মানি জিজিয়া-কর,
মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
বারণ যাদের উঠা ফুট-পাথে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে,
ফুট-পাথে হাঁটা পণ যে করিল গোরার চাবুক স'য়ে,
মার খেয়ে পথে মূর্চ্ছা গিয়েছে, পণ যে ছাড়েনি তবু,
বারে বারে যারে জরিমানা ক'রে হার মেনে গোরাপ্রভু—
রদ ক'রে বদ্ আইন চরমে রেহাই পেয়েছে তবে !
ধীরতার বীর সেরা পৃথিবীর, নাই জোড়া নাই ভবে !
প্লেগের প্লাবনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবাব্রত,
বুয়ার-লড়াইএ জুলুর যুদ্ধে জখমী বহিল কত,
কৌসুলী-কুলি-মুদি-মহাজনে পল্টন গ'ড়ে নিয়ে,
উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে;
কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী ব'লে,
কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে !
কথা রাখিল না যবে হীনমনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া—ক্ষোভের ভেরা,
তখন যে জন কুলীর ধাতুতে বৈষ্ণবী-সেনা সৃজি,
ধৈর্য্য-বীর্য্যে মোহিল জগৎ এই সেই গান্ধিজী !

* * * *

সাগরের পারে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,
গোরা-চোখা দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের সনে,

বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিল যে নিজ হাতে,
বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাওবাব-আওতাতে,
ভারত-প্রজারে চোরের মতন থানায় থানায় গিয়ে,
নাম লেখাইতে হবে শুনে, হায়, আঙুলের টিপ্ দিয়ে,
যে বিধি অবিধি তারে নির্ম্মূল করিবারে বিধি ঠেলে,
দেশ-আত্মায় অপমান হ'তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,
গেল চ'লে জেলে জ্বালাইয়ে রেখে পুণ্য-জ্যোতির জ্বালা,
ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা !
ধায় দেশী কুলী দেশী কুঠিয়াল, না শোনে কাহারো মানা !
দেখিতে দেখিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,
মর্দ্দে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
স্বেচ্ছায় ধনী হ'ল দেউলিয়া,—তবু ছাড়িল না পণ !
ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে—
ইঙ্গিতে যার কষ্টের কারা বরণ ক'রেছে ধেয়ে,
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সত্য-লব্ধ মর্য্যাদা-সম্বোধি !
তামিল যুবক মরিয়া অমর যে পরশ-মণি ছুঁয়ে,
চির-পদানত মাথা তোলে যার মন্ত্র-গর্ভ ফুঁয়ে,
পুলকে পোলক মিতালি করিল যার চারিত্র্য-গুণে,
ভারতে বিলাতে আগুন জ্বলিল যার সে দীপক শুনে,
বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীরও রাখী-সূতা ;
ভেট যারে দিল প্রেমী অ্যান্‌ড্রুজ্ অযাচিত বন্ধুতা।
আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্সভাল হ'তে ফিজি
জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্ !—এই সেই গান্ধিজী !

* * * *

এশিয়া যে নয় কুলীরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,—
কুলীতে জাগায়ে মহা-মানবতা নর-নারায়ণ সেবা,
ধৈর্য্যে ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায়-মনে হ'তে খাঁটী,
সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান চেলার লাঠি,
বিশ্বধাতার বহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,
'সত্য' যাহার এক পিঠে লেখা আর পিঠে 'জীবে প্রেম'
সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হ'য়েছে যে খাঁটী সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি,
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি,
অর্জ্জন যার ব্রহ্মচর্য্য, তপের বৃদ্ধি কাজে,
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধির মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে অশুচি না মানে কিছু,
চাকরের সেবা না লয় কিছুতে,—নরে সে যে করা নীচু,
ক্ষুদ্রে-মহতে যে দেখেছে মরি আত্মার চির জ্যোতি,
দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিত্তের অধোগতি,
প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের শক্তি-বীজের বীজী
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার—এই সেই গান্ধিজী !

* * * *

দর্পী-তাপন ভারত-পাবন এই সে বেণের ছেলে,
শুচি-মহিমায় দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—
কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
সাজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্ত্তব্যের 'আবাহনে,
নীল-কর আর চা-কর-চক্রে কুলীর কান্না শুনি,
ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মুকুতা চুণি,
কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ম্মিতা,
নিজে ঝুঁকি নিয়া খাজনা রুখিয়া রায়তের চির-মিতা ;
রাজা-গিরি নয় কেবলি হুকুম কেবলি ডিক্রিজারি,
হাল-গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,
এ যে অনাচার এর ঠাঁই আর নাই নাই ভু-ভারতে,
রাজায় প্রজায় একথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
সাতশত গাঁয়ে বাজায়ে অমোঘ সত্যাগ্রহ ভেরী,
প্রজায় নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাক' যার দেরী,
অভয় ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে জন হরে ;
বিশ্ব প্রেমের পঞ্চ প্রদীপে কুলীর আরতি করে ;
আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান্,
পিতারও হুকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল,
গ্রীসের শহীদ্ সক্রেটিস আর ইহুদীর দানিয়েল্,

যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
তার আগমনী গাও কবি আজ গাও গান্ধীর জয়।

* * *

এশিয়ার হক্ হারুণের স্মৃতি, ইসলাম-সম্মান,—
মর্ম্ম-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
দরাজ বুকেতে সারা এশিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি।
সব হিন্দুর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া
সত্যাগ্রহ-চন্দে বাঁধিল ঝড়ের ছন্দ-ছাড়া,
প্রীতির রাখি যে বেঁধে দিল দুহুঁ হিন্দু-মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়ার জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,
ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
নৈযুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী দুর্নিবার,
বিধাতার দেওয়া ধর্ম্ম্য-রোষের তলোয়ার যার হাতে
সোনা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ণ-সম্পাতে
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আমলা-তন্ত্র সহ
অভয় মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ;
মহাবাণী যার শকতি-আধার অনুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে—
"স্বরাজ-প্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে।
যা' কিছু স্ববশে তাই ত স্বরাজ, সেই ত সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি;
স্বপাকে স্বরাজ স্বরাজ স্বকরে নিজের বসন বোনা,
স্বরাজ স্বদেশী শিল্প-পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু' পায়ে দলা;
স্বরাজ স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
স্বরাজ প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে।
সেই অধিকারে দেয় যারা হাত প্রেষ্টিজ্-অজুহাতে
স্বরাজ সে নৈযুজ্য তেমন আম্‌লা-তন্ত্র সাথে।
হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ স্বপ্রকাশের পথে,
স্বরাজ সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চারিত্র্য বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলৎ-শালা,
হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী আয়াস যে করে লভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না।" কহে যে সবে।
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধীর গাহ জয়।

* * *

হেস না হেস না হ্রস্বদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসের বিষ-নিশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিদ্রূপে কভু নয়।
ব্যঙ্গমা! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ-বাখান রাখ্,
গুঞ্জনে শোন ভরি' ভরি' ওঠে ভারতের মৌচাক,
ভীমরুলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে,
তার কথা কিছু জানিস্ তো বল, মন দোলে কুতুহলে,
জানিস্ তো বল্ মোহনদাসেরে মহাদুষমন্ গণি'
কি ফিকির আঁটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন তেলি কারাগারে,
কোন লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইস্তাহারে!
জানিস্ তো বল, কি যে হ'ল ফল আবকারী-যুদ্ধের,
মদ-জাতকের অভিনয় সুরু হ'ল কি মগধে ফের!
ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস নে ছল খুঁজে,
খুঁটি নাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয়, কি শ্রেয় খানাকুল সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।
পারিস যদি তো শুচি হ'য়ে নে রে স্নান ক'রে ওই জলে,
চিনে নে চিনে নে মহান আত্মা মহাত্মা কারে বলে।
এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস কোনো দিন?
—দেশ জুড়ে যার আত্মীয়-প্রিয়—তবু বিশ্বাস-হীন?
দূরবীণ ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, "সূর্য্যের বুকে পিঠে
আছে মসী-লেখা!", আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে?
সেই মসী নিয়ে হাস্তে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি;
রশ্মির গুণ বাড়ায়ে শশীর ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি।

কুটীরে কুটীরে মহাজীবনের জ্বেলেছে যে হোমশিখা,
মিনমজুরের জনে জনে সপি মর্য্যাদা-শুচি টীকা।
পৌঁছে দেছে যে পৌরষ নব চাষীদের ঘরে ঘরে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে।
যার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রে ত্রিশ কোটির মন,
দেশের খতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন
আত্ম বিলোপী কর্ম্মী-সঙ্ঘ যার বাণী শিরে ধরি'
নীরবে করিছে ব্রতের পালন দুঃসহ দুখ বরি',
ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
রাজ ভৃত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,
যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোস্‌লেম্‌,
আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মোহম্মদের ধর্ম্ম-শৌর্য্য যাহার জীবন মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি স্ফুরিছে নবীন সাজে,
সারাটা জীবন খ্রীষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
বিক্ষত পদে কণ্টক-পথে 'সত্য'ব্রত যে সাধে ;
যার কল্যাণে কুড়েমি পালায় প্রণমিয়া চরকারে
ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কালচারে' ;
যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদমহলের খিল্‌,
পুরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে ত্রিশ কোটীর দিল্‌,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী! গৌড়-বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধীর গাহ জয়॥

"ভারতী"—১৩২৮ সাল।

আত্মত্যাগের অসি

[রোঁম্যা রোলাঁ]

গান্ধী অহিংসা-মন্ত্রকেই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, অন্য উপায় সম্বন্ধে যে তিনি একেবারেই উদাসীন, এমন নহে। ইহা ধ্রুব সত্য যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি অহিংসা ছাড়া অন্য অস্ত্র ব্যবহার করিবেন না ; কিন্তু সাধারণ লোক অদ্যাপি এত পশ্চাতে রহিয়াছে যে, তাহাদের পক্ষে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করাটাকেই তিনি দোষের বলিয়া মনে করেন না। তবে তাঁহার কথা এই যে, যাহারা বর্ত্তমান যুগে হিংসার পথে চলিবে তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সৎপথে হাঁটিতে হইবে এবং কপটাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে। বহু অভিজ্ঞতার ফলে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে এই পথ মানবের ধ্বংসের পথ। যাহারা ঐ দিক্‌ বাঁচাইয়া চলিতে চান, তাঁহাদের জন্য অহিংসাই একমাত্র পথ।

যাহা ভীষণ ট্যাঙ্ক ও কামানকে উপেক্ষা করিয়া চলে, এই নূতন অস্ত্রটী কি? ইহা আর কিছুই নহে—ইহা আত্মত্যাগের অসি। এস্থলে "অসি" এই কথাটা ভাল করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে। গান্ধী নিজেই ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন ও পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লৌহ নির্ম্মিত অসির পরিবর্ত্তে আত্মত্যাগের অসি উত্তোলন করিয়াছেন। আজ কে কৃতাঞ্জলী ও কাপুরুষোচিত বাধ্যতার কথা বলে? গান্ধী বিশ্বাস করেন যে, যখন অসির দ্বারা বাধ্য হইবে, তখনই ব্রিটেন ভারতের দাবী পূরণ করিবে। কিন্তু সে দুর্জ্জয় অসি কোন প্রকার ধাতু নির্ম্মিত নহে ; উহা মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষিত সমগ্র জাতি।

মহাত্মা গান্ধী

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

জগতে এক এক সময়ে এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ব্যক্তি ও সমাজের ভাবরাজ্যে এমন এক আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া দেন যাহার ফলে যে দেশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত আলস্য ও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব সমাজে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লয়। আমেরিকায় ওয়াসিংটন, ইটালীর ম্যাজিনী এবং আধুনিক কালের গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা, সঙ্গে জগলুল পাশা, ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন প্রভৃতি এই শ্রেণীর মহাপুরুষ।

কিন্তু জগতে সময় সময় এমন এক একজন লোকোত্তর চরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যাহার প্রভাব কোন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকে না, তিনি সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে একটা তোলপাড় করিয়া দিয়া জগতের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। ভগবান বুদ্ধ, ভগবান খৃষ্ট প্রভৃতি এবং আধুনিক কালের মহামতি লেনিন ও ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধীকে এই শ্রেণীর মহাপুরুষ বলিতে পারি।

পৃথিবীর ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় এক স্মরণীয় চরিত্র আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখি না। হয়ত এই বিরাট মনুষ্যত্ব যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া যে প্রভাব যে প্রতিপত্তি বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী কালে রাখিয়া যাইবে তাহার পরিমাপ করা আধুনিক যুগে কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি স্থান ও কালের আংশিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে রাখিয়া এই নরকেশরীর অসমাপ্ত জীবন যতটা আলোচিত হয় ততই জীবের পক্ষে কল্যাণকর।

মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক নেতারূপে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—আজ আমরা তাঁহার জীবনের রাজনৈতিক দিকই আলোচনা করিব। কেন না পৃথিবীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবনের ঘটনা পরম্পরা সকল দিক দিয়া আলোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। বিশেষতঃ এই কার্য্যের আমরা অনধিকারী।

জন্ম

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকা তীর্থের সন্নিকটস্থ পোর বন্দর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও ব্রাহ্মণের তেজ ও আধ্যাত্মিকতা এবং ক্ষত্রিয়ের সাহস ও একনিষ্ঠা তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সন্তান নহেন। কাথিয়া বারের এক প্রাচীন বাণিয়া বংশে মহাত্মাজীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পঁচিশ বৎসর কাল পোর বন্দর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে তিনি রাজকোট ও অঞ্চল রাজ্যেও প্রধান মন্ত্রীরূপে কাজ করেন। মহাত্মার পিতার চরিত্রে অসাধারণ তেজস্বিতার ভাব বর্ত্তমান ছিল। প্রধান মন্ত্রীত্ব করিবার সময় তিনি প্রয়োজন হইলে পোর বন্দরের রাজা এবং পলিটিক্যাল এজেন্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজি আগাগোড়া যে অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইতেছেন তাহা অনেকাংশে তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত। মহাত্মার মাতাও একজন ধর্ম্মনিষ্ঠা মহিলা ছিলেন—তিনি নিয়মতরূপে প্রত্যহ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ গৃহিণীর ন্যায় সংসারের কাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। সন্তানগণ যাহাতে সাধু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় তৎপ্রতি তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল। মাতার ধর্ম্মভাব মহাত্মার জীবনে প্রথম হইতেই খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

পত্নীসহ মহাত্মাজী

শিক্ষা

মহাত্মাজি প্রথমে কাথিয়া বার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে সেখান হইতে ইংলণ্ড যাইয়া লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। মহাত্মাজির মাতা প্রথমে মহাত্মার বিলাত যাত্রার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, অবশেষে তিনি মহাত্মাজিকে প্রতিজ্ঞা করান যে বিলাতে যাইয়া তিনি কখনও মাংস মদ ও স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে পারিবেন না—তখন তাঁহাকে বিলাত যাইতে অনুমতি দেন। সেখানে তিনি অক্ষরে অক্ষরে মাতার আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। মহাত্মাজি ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার পরেই ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিন মধ্যেই ব্যবসায়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইতে আরম্ভ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায়

তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রথম অধ্যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে আদর্শ লইয়া, যে বিধিবদ্ধ অহিংসা-মূলক উপায় আবিষ্কার করিয়া পরাধীন প্রজাশক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত তিনি কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন ভারতক্ষেত্রে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ তিনি সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্থান কাল ও পাত্রভেদে কার্য্য করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-অস্ত্র প্রয়োগ করিতে যাইয়া তিনি তিন তিন বার কারাক্লেশ সহ্য করেন। মোট ৯০০০ হাজার ভারতীয় পুরুষের মধ্যে ২৭০০ জন কোন না কোন ঘটনায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিরুপদ্রব প্রতিরোধের আদর্শ ও উপায় ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ করিতে যাইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে আদালতের সম্মুখে তাঁহার আদর্শ ও উপায়ের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'আমার অপরাধ ইচ্ছাকৃত এবং বিশেষ বিবেচনা সহকারে সম্পাদিত। * * যতদিন গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়গণ সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে বিরত থাকিবেন, ততদিন আমি পুনঃ পুনঃ আইন ভঙ্গ করিবই করিব। * * আমিই প্রধান উদ্যোগী অতএব আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দণ্ড দেওয়া হউক।' দক্ষিণ আফ্রিকায় যখনই তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্তৃপক্ষের আইন ভঙ্গ করিবার জন্য বাধ্য হইয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রহরী দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই তিনি তাঁহার সহযাত্রীদলকে শান্তভাব অবলম্বন করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী পুনঃ পুনঃ আইন ভঙ্গ করিলেও তিনি যে একটা নৈতিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে আইন ভঙ্গ করিতেছেন ইহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধারণ অপরাধীর সহিত তাঁহার ইচ্ছাকৃত আইন ভঙ্গের অপরাধ যে তুলিত হইতে পারে না, তাহা এমন কি লর্ড হার্ডিঞ্জ পর্য্যন্ত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর মাদ্রাজের মহাজন-সভা প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে আভাসে ইঙ্গিতে স্বীকার করিয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছেন, "গান্ধী এবং তাঁহার সহযাত্রীরা ইচ্ছা করিয়াই আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, উহার ফলে তাঁহারা দণ্ডিত হইবেন জানিতেন, তথাপি সম্পূর্ণ সাহসে ও ধৈর্য্য বলে তাহা সহ্য করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। এই ব্যাপারে সারা ভারতের গভীর ও জলন্ত সহানুভূতি তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। শুধু ভারতের নহে—আমার ন্যায় যাঁহারা ভারতবাসী না হইলেও ভারতীয়-গণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রে সমবেদনায় করুণ ঝঙ্কার উঠিয়াছে। * * আমরা এই অভিযোগ বহুলভাবে প্রচারিত হইতে দেখিয়াছি যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধী দলের প্রতি এমন আচরণ করা হইয়াছে যাহা কোন সভ্য রাজ্যে একমুহূর্ত্ত সহ্য করা চলে না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকা লীগের উদ্যোগে মাদ্রাজে এক সভা আহুত হয়। মাদ্রাজের লর্ড বিশপ ঐ সভায় বলিয়াছিলেন, "গান্ধীকে যাহারা জেলে পাঠাইয়াছে, তাহারা আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাহাদের তুলনায় আমার চক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধী ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার অধিকতর যোগ্যতর প্রতিনিধি। কারণ

তিনি ন্যায় ও কৃপালাভের নিমিত্ত ধৈর্য্যবলে উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন।" যাহা হউক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ন-গবর্ণমেণ্ট 'ইণ্ডিয়ান রিলিফঅ্যাক্ট' বা ভারতীয় মুক্তি-আইন বিধিবদ্ধ করিয়া অনেকটা অভিযোগ দূর করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মুণ্ডকর রহিত হইল। ইমিগ্রেসন আইনে জাতিগত বৈষম্য উঠিয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট হিন্দু মুসলমানের বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভারতীয়গণের বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার ন্যায়সঙ্গত আইন বলে বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইল। জেনারেল স্মাট্স গান্ধীকে ইহা ছাড়াও লিখিয়া জানাইলেন যে ভারতীয়গণের অসুবিধা ও অসম্মানজনক অবশিষ্ট অভিযোগগুলির প্রতীকারের ব্যবস্থা ক্রমে তিনি করিবেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল বুঝিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রথম অধ্যায় শেষ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ব এই প্রথম অধ্যায়েই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমবার নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অস্ত্র প্রয়োগ কালে জেনারেল স্মাট্স একটা মিট্মাটের প্রস্তাব করেন, গান্ধী উহাতে সম্মত হ'ন, কিন্তু তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ইহা কাপুরুষতা মনে করেন। কিন্তু নির্ভীক গান্ধী কাপুরুষতার মিথ্যা অপবাদে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবার পাত্র নহেন, কেননা তিনি জানিতেন যে তিনি কাপুরুষ নহেন। যদিও তাঁহাকে কেহ কেহ কর্ত্তৃপক্ষের গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল, তথাপি তিনি আপোষের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নিজের নাম রেজেষ্ট্রী অফিসে লেখাইবার জন্ত পথপ্রদর্শক রূপে অগ্রসর হইলেন। পথের মধ্যে একজন পাঠান তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ভ্রমে সন্দেহ করিয়া এমন প্রহার করিল যে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী রোগশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় নিম্নলিখিত ইস্তাহার ঘোষনা করিলেন :—

"প্রহারকারিগণ জানিত না যে তাহারা কি করিতেছে। তাহাদের মনে হইয়াছিল, আমি অন্যায় করিতেছি। ফলে, প্রতিকারের যে একমাত্র উপায় তাহারা জ্ঞাত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়াছিল। অতএব তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কিছু করা না হয়—ইহাই আমার অনুরোধ। হিন্দুগণ হয়তো এইজন্ত ক্ষুব্ধ হইতে পারেন যে, একজন বা কয়েকজন মুসলমান আমাকে আঘাত করিয়াছে। এভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিলে তাঁহারা বিধাতার চক্ষে এবং জগৎবাসীর সমক্ষে দোষী হইবেন। আজ যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহা যেন হিন্দু-মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে জুড়িয়া দেয়—ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। শ্রীভগবান আমার কামনা পূর্ণ করুন।

"নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় থাকিবে না। সংযমশীল ভারতীয়গণ ঐ নীতি অবলম্বন করিলে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না, তাঁহারা স্বেচ্ছায় নাম রেজেষ্ট্রী করিলে নূতন আইন পরিত্যক্ত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্টের মতানুবর্ত্তী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

ইহা তাঁহার চরিত্রের একটা দিক। প্রথমবার আইন ভঙ্গ করিয়া ধৃত হইবার পূর্ব্বে সংবাদ আসিল যে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র মরণোন্মুখ। মুমূর্ষু পুত্রকে জীবনের শেষ দেখা দেখিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল, গান্ধীর চিত্ত অবিচলিত। তিনি কহিলেন,—"পুত্রের জীবন রক্ষার ভার আমি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া জোহেন্সবর্গে চলিলাম। কারণ পুত্র অপেক্ষা আমার জাতি বড়।" তিনি যখন দ্বিতীয়বার জেলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সংবাদ আসিল, তাঁহার পত্নীর আর জীবনের আশা নাই। জেল পরিদর্শনকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি জরিমানা দিয়া মুক্তিলাভ করুন। এ সময়ে পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করা আপনার কর্ত্তব্য।" সস্মিত আননে গান্ধী অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন, "আমি হাল ছাড়িলে সব বানচাল হইয়া যাইবে।"

এই সমস্ত ঘটনায় এই বজ্র কঠোর চরিত্রের তেজ ও বীর্য্য, ত্যাগ ও কর্ত্তব্যবোধ তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম অধ্যায়েই দেখা গিয়াছে।

যদিও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্নৌ কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন, যদিও বিহারের প্রতিনিধিগণ ত্রিহুতের

মহাত্মা গান্ধী
অস্ত্র চিকিৎসার পর তোলা ফটো

নীল-আবাদ সম্পর্কীয় বিবাদে কুঠীয়াল সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রজার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিহুতের অবস্থা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মজঃফরপুর রওনা হন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু কমিশনার মিঃ মরমেড্ বলেন, "আমরা চাম্পারণের সমস্যা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত আছি; আপনি একজন বাহিরের লোক, একার্য্যে আপনাকে কে ডাকিয়া আনিল?" গান্ধী উত্তর দিলেন, "আমি দেশের লোকের ডাকে আসিয়াছি।" কর্ত্তৃপক্ষ গান্ধীর উত্তরে নিরস্ত না হইয়া উত্তেজিত হইলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তিনি মজঃফরপুর হইতে মতিহারী চলিলেন, ১৬ এপ্রিল চাম্পারণের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেকক্ ফৌজদারী কার্য্যবিধির সেই স্বনাম-প্রসিদ্ধ ১৪৪ ধারা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া জানাইলেন যে, পত্রপাঠ তিনি যেন চাম্পারণ ছাড়িয়া চলিয়া যান, নতুবা তাঁহার উপস্থিতির জন্য জেলার শান্তিভঙ্গ হইবে এবং এমন কি প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা আছে। গান্ধী উত্তর দিলেন, কর্ত্তব্যবোধে চাম্পারণ তিনি ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ইচ্ছা করিয়াই তিনি ১৪৪ ধারা অমান্য করিতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে দণ্ড দিতে পারেন এবং যদি কর্ত্তৃপক্ষ দণ্ড দেন তবে শান্ত ও সংযত ভাবে সেই দণ্ড তিনি বহন করিবেন। তিনি নিজের দণ্ড লাঘবের নিমিত্ত কোন কৈফিয়ৎ দিতেছেন না। রাজ-শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া তিনি আইন-ভঙ্গ করিতেছেন না, কেবল অন্তরের মধ্যে বিবেকের বাণী শুনিয়াই তিনি আইন-ভঙ্গ করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আন্দোলন ভূমিষ্ট হয়। এই সংঘর্ষণের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ চম্পারণ-কৃষি-আইন পাশ করিয়া কৃষকদের অভিযোগ কতকটা দূর করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল বড় লাট গান্ধীকে দিল্লীতে মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করিলেন, উদ্দেশ্য জার্ম্মেনীর সহিত যুদ্ধে ভূমি ভারতের প্রজাশক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রিটিশ-কেশরীকে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য কর। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত কয়রা জেলায় শস্য না হওয়াতে অন্নকষ্ট দেখা দেয়। কৃষকেরা খাজনা দিতে পারে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ কৃষকদের গরুবাছুর তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া খাজানা আদায় করিতেছিল। মহাত্মা গান্ধী ক্ষেত্রে আসিয়া নামিলেন, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে ডেপুটেশন প্রেরণ করিলেন, যেন কমিশনারের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সম্প্রতি কিছুকালের জন্য খাজনা-আদায় বন্ধ থাকে। কমিশনার মিঃ প্রাট্ গান্ধীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, ফলে গান্ধী কৃষকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া খাজনা দেওয়া নিষেধ করিয়া দেন। কমিশনারের হুকুমে রাজকর্ম্মচারী প্রজার গরুবাছুর জমিজমা নিলাম করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু গান্ধীর প্রতি নির্ভর করিয়া প্রজাগণ অবিচলিত রহিল। তিনি কয়বার প্রজাদিগের উপর এই মর্ম্মে ইস্তাহার জারী করিলেন,—সমগ্র ভারত এখন কয়রার প্রতি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। যদি কয়রার কৃষকগণ এই সংঘর্ষে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য অংশের কৃষকেরা আর বহুকাল মাথা তুলিতে পারিবে না। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে বিষয় একাধিকবার চিন্তা করিয়া দেখা বিজ্ঞব্যক্তির কর্ত্তব্য। কিন্তু কার্য্যারম্ভের পর যদি তাহা আমরা ছাড়িয়া দেই তাহা হইলে অ-মানুষ বলিয়া অভিহিত হইব। ভূমির মূল্যবত্তা সেই ভূমিবাসী ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। কয়রার ভূমি সমূহে যদি লোকের বাস না রহিত, তাহা হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকিত না। কয়রার এই সংঘর্ষ প্রকৃতপক্ষে খাজনা মকুবের সংঘর্ষ নহে—ইহা নীতি রক্ষার সংঘর্ষ মাত্র।"

এ ঘোষণার পর গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন যে খাজনা আদায় স্থগিত রাখা প্রজারা অধিকার সূত্রে দাবী করিতে পারে না, ইহা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। গান্ধী উত্তরে বলিলেন যে প্রজার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রজা শাসন করাও অসঙ্গত। যাহা হউক জুন মাসের প্রথম ভাগ হইতেই গবর্ণমেণ্ট খাজনা আদায় স্থগিত রাখিলেন এবং তাহার ফলে গান্ধী প্রজাদিগকে বলিলেন, যাহারা খাজনা দিতে সক্ষম তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া খাজনা দাও।

চাম্পারণ ও কয়রা এই উভয় ক্ষেত্রেই নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অস্ত্র জয়যুক্ত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গান্ধী ব্রিটিশরাজ-শক্তিকে জার্ম্মান-যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি যে ব্রিটিশ রাজ-শক্তিকে সৈন্য সংগ্রহ দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার মূলে এই বিশ্বাস কার্য্য করিয়াছিল যে, "ইংরেজেরা যদি এই যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে জয় লাভ করে, তাহা হইলে, ভারতবর্ষকে ইংরেজ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ স্বরাজ দিবে।" তথাপি তিনি কোন চুক্তি করেন নাই; এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ করা একটা হীন কাপুরুষের কার্য্য বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন। তিনি রাজশক্তির সহিত উদার, সরল ও নির্ভীকভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহের জন্য মহাত্মা গান্ধীর যে চেষ্টা এবং তাহার যে সমস্ত কারণ তিনি তৎকালে দেখাইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সমালোচনার অতীত নহে। তবে তাঁহার কোন কোন উক্তির প্রতিবাদ হয়তো পরবর্ত্তী কালে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে আপনিই হইয়া পড়িয়াছে। সৈন্য সংগ্রহের সময় গান্ধী অগাধ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া কহিয়াছিলেন, "এই সাহায্য করার পুরস্কার আমরা নিঃসন্দেহেই প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহা পুরস্কার নহে।" যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্ট Defence of India Act পাশ করেন।

এই আইন যখন পাশ হয় তখন ভারতবাসিগণ মনে করিয়াছিল যে যুদ্ধের সময়ের একটা বিশেষ আইন, যাহা জার্ম্মানীর সহিত গুপ্তভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে, আইনের বলে সারা ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলায় সহস্র সহস্র যুবককে বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অন্তরীনে আবদ্ধ করা হইল! সাধারণ ডাকাতী মামলাতেও অনেক আসামী এই বিশেষ আদালতের আপীলহীন বিচারে কঠোর দণ্ড পাইল। এই শ্রেণীর কয়েদীদের মধ্যে কতজন আত্মহত্যা করিল, কতজন বা উন্মাদ হইয়া গেল! যুদ্ধ শেষ হইবার পর ছয়মাস মধ্যে এই আইন পরিত্যক্ত হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমলা-তন্ত্র দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই আইনের বলেই ভারতব্যাপী এক বিরাট অ-রাজকতা থামিয়া আছে, অতএব তাঁহারা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাউলাট্-কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয়ব্যবস্থাপক সভায় দুইটী বিল উপস্থিত করিলেন। একটী The Indian Criminal Law (Amendment) Bill No. 1 of 1919 দ্বিতীয় The Criminal Law (Emergency Powers) Bill No. 2 of 1919. এই দুইটি বিলকে সাধারণতঃ রাউলাট্ বিল বলা হইয়া থাকে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই ভারতের প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক জেলা এমন কি সহস্র সহস্র গ্রাম এই রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করে। প্রজাশক্তির পক্ষ হইতে এই ঘোষণা করা হয় যে ইহা মানুষের জন্মদত্ত যে অধিকার, তাহার বিরোধী। ঐ বৎসরের মার্চ্চ মাসে বিল দুইটী ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে দেশীয় সদস্যগণ একত্র মিলিত হইয়া উহার প্রতিবাদ করেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ বিল পাশ করিয়া ফেলেন। নিখিল ভারতের প্রজাশক্তির সমবেত প্রতিবাদ চেমস্‌ফোর্ডের গবর্ণমেণ্ট এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। তবে তিন বৎসর এই আইনের পরমায়ু নির্দ্ধারণ করিলেন। ফলে দেশে অসন্তোষ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী ঐ বিলের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহা চাম্পারণ ও কয়রার মত খণ্ড যুদ্ধ নহে, ইহা নিখিল ভারতের রাজ-প্রতিনিধির বিরুদ্ধে নিখিল ভারতের প্রজা-প্রতিনিধির যুদ্ধ ঘোষণা। ইহা কংগ্রেসী আবেদন নিবেদন নহে, ইহা বোমা-নিক্ষেপ-মূলক গুপ্ত রাজদ্রোহ নহে, ইহা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সম্মুখ যুদ্ধও নহে, ইহা নিরস্ত্র প্রজার সশস্ত্র রাজার বিরুদ্ধে অহিংসামূলক শান্ত ও সংযত ভাবে অবাধ্যতা মহাত্মা গান্ধি এই রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে যে ইস্তাহার জারী করিলেন তাহা এইরূপ;—

"প্রস্তাবিত বিলদ্বয় অন্যায় মূলক। উহা স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের ধ্বংসকারক। এই ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অধিকারের উপর সমগ্র জাতির ও রাজ্যের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে অতএব আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে উল্লিখি

বিলদ্বয় যদি আইনে পরিণত হয় তবে সেই আইন যতদিন প্রত্যাহৃত হইবে ততদিন আমরা উহা নিরুপদ্রবে অমান্য করিব। উহা ছাড়া অপর যে কোন আইন অমান্য করা প্রয়োজন বলিয়া আমাদের কমিটী ঘোষণা করিবেন তাহাও ভদ্রভাবে লঙ্ঘন করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই সংঘর্ষে আমরা সর্ব্বথা সত্যের অনুসরণ করিব এবং কাহারও প্রাণহানি অঙ্গহানি বা সম্পত্তিনাশ করিব না।”

ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণায় এক প্রবল আন্দোলনে নাচিয়া উঠিল। বোম্বাইএর রাজপথে মহাত্মা স্বয়ং শান্তভাবে এই আইন অমান্য করিয়া কতকগুলি নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয় কল্পে বাহির হইয়া পড়িলেন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট মহাত্মার কোন কৈফিয়ৎ তলব করেন নাই বা তাঁহাকে আইন ভঙ্গ কারী বলিয়া কোন শাস্তি দেন নাই। রাউলাট আইন যেদিন পাশ হইল তাহার পরের রবিবার দিবস হিন্দু ও মুসলমান ভারতবাসী আপন আপন ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া উপবাসী থাকিয়া ভগবানের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিবে এই ঘোষণা হইল। ঐদিন সত্যগ্রহের দিন বলিয়া ইতিহাস লিখিয়া রাখিবে। দিল্লীতে এই সত্যগ্রহের দিনে দিল্লীবাসীর সহিত কর্ত্তৃপক্ষের সংঘর্ষণ হয়, তাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষ মেসিন বন্দুক ও গোরাফৌজ নিরীহ দিল্লীবাসির উপর প্রয়োগ করেন। কেবল দিল্লী নহে, ভারতের জনাকীর্ণ প্রত্যেক সহর এই আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া উঠে। এই ঘটনায় মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যে ভারতবাসীর উপর কতদূর তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। তিনি যে প্রজ্ঞাশক্তির এক এবং অদ্বিতীয় প্রতিনিধি তাহা ঐ সত্যগ্রহের দিনে প্রমাণ হয়। দিল্লীর দুর্ঘটনা শুনিয়া গান্ধি বোম্বাই হইতে দিল্লী যাত্রা করেন। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট পথিমধ্যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী প্রবেশ বন্ধ করেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এই সংবাদ বারুদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠে। ভারতের সমস্ত খ্যাতনামা সহরে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। পাঞ্জাবেই দুর্ঘটনা বেশী হয়। কলিকাতা ও আহাম্মদাবাদেও গোলযোগ কম হয় নাই। এই সংঘর্ষণে অনেক নির্দ্দোষী নগরবাসী অযথা গোরাসৈন্যের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। পাঞ্জাব ও আহাম্মদাবাদে সামরিক আইন প্রচার হয়।

পাঞ্জাব দুর্ঘটনা

জালিয়ানওয়ালাবাগের সভা, বৈশাখী পূর্ণিমা—ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম, গৃহত্যাগ ও মহাপরি-নির্ব্বানলাভের পবিত্র স্মরণীয় তিথিতে আহুত হয়। হংসরাজ নামে একজন বিভীষণ—যাহার জননী ও ভগিনীর সম্বন্ধে কুলোকে কুকথা বলে—এই সভা আহ্বান করে। এই সভার পূর্ব্বে অমৃতসরবাসীদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য ডাক্তার কিচলু ও সত্যপালকে নির্ব্বাসিত করা হয়। ইহারও পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় কর্ত্তৃপক্ষ লোককে বলপূর্ব্বক সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং খাদ্য দ্রব্য যখন অত্যন্ত মহার্ঘ, তখন সমর-ঋণের জন্য বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। যখন ঘটনার পর ঘটনায় লোকের ধৈর্য্য সীমান্তরেখায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন অতি অল্প উত্তেজনাতেই ক্ষুব্ধ জনতা সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলে, ঘটিয়াছিলও তাহাই। অমৃতসরবাসী উত্তেজিত হইয়া কয়েকজন ইউরোপীয়কে হত ও কুমারী সারউড্ নাম্নী মহিলাকে আহত করিয়া ফেলিল ;—যদিও ভারতবাসীরাই এই আহতা মহিলাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই ধৈর্য্যচ্যুতির নিশ্চয়ই কারণ ছিল, কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। কি প্রাকৃতিক জগতে, কি মনুষ্য সমাজে, ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। অমৃতসরবাসীগণ ব্যাঙ্ক পোড়াইল, রাজার জাতির কয়েকজনকে হত্যা করিল এবং একজন অবিবাহিতা মহিলাকে পর্য্যন্ত আঘাত করিবার উপক্রম করিল। ইহা একটী কার্য্য—ইহার কারণ কি ছিল না ? কিন্তু এই কার্য্য আবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কারণ রূপে উপস্থিত হইল। এই কারণের জন্য পাকে-চক্রে আর একটী কার্য্যের প্রয়োজন হইল—এবং তাহাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা ও পাঞ্জাবের অত্যাচার। এই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা আবার একটী কারণরূপে মহাত্মা গান্ধীর নিকট উপস্থিত হইল। ভারতবাসী এই কারণের জন্য, ভবিষ্যতে ইহার পুনরাভিনয় দূর করিবার মানসে, আর একটী কার্য্য

খুঁজিতে লাগিলেন এবং তাহাই মহাত্মা গান্ধির এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভের চেষ্টা। এই যে চেষ্টা, ইহা একটা উপায়কে অবলম্বন করিয়া জাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই উপায় বর্ত্তমান অ-সহযোগ আন্দোলন।

মহাত্মা গান্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি রাষ্ট্রগুরু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য হিন্দু ও মুসলমানের জন্মভূমিতে অবতীর্ণ হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে রাজনীতি-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। এই আন্দোলন জাগ্রত করিয়া পৃথিবীর স্বাধীনজাতি সকলের মধ্যে ভারতীয় পরাধীন প্রজা-শক্তির পক্ষ হইতে তিনি, ভারত গবর্ণমেণ্টকে উপেক্ষা করিয়াও, একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দাবী উত্থাপন করেন।
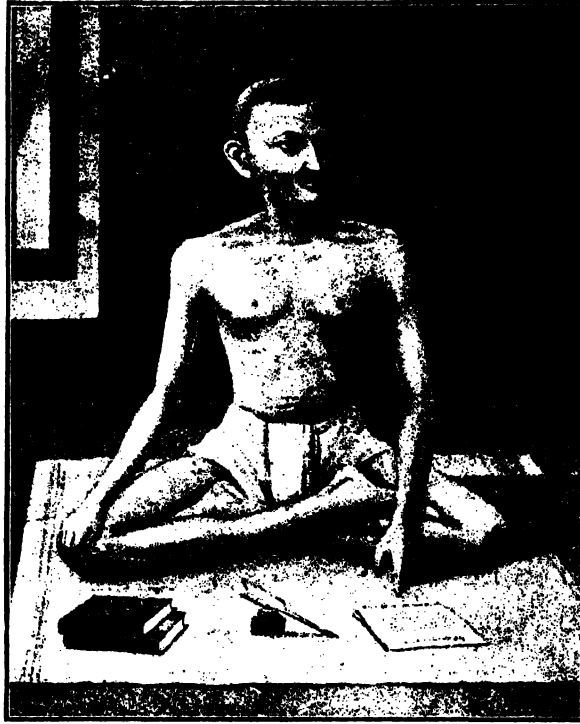
মহাত্মা গান্ধী

হইয়াছেন। সুতরাং যদিও এক পাঞ্জাবের অত্যাচারেই হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হইতে পারিত, তথাপি ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের ধর্ম্মের উপর পৃথিবীর স্বাধীনজাতি সকল যুদ্ধের পর শান্তির সময় যেরূপ ধীর ভাবে অবিচার করিয়াছেন, তাহা হিন্দু হইয়াও মুসলমানের পক্ষ হইতেও প্রতিবাদ করা তিনি সঙ্গত মনে করিয়াছেন এবং মহাম্মদআলি সৌকতালি প্রভৃতি মুসলমান ভ্রাতাগণকে সম্মুখে রাখিয়া খিলাফৎ আন্দোলন ভারত বক্ষে জাগ্রত করিয়াছেন। এই আন্দোলনে

মহাত্মা গান্ধি পাঞ্জাবের উপর এবং খলিফার উপর অত্যাচারের প্রতীকারকল্পে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ ইহার জন্য যে প্রতীকার করিয়াছেন, তাহা মহাত্মার আশানুরূপ হয় নাই। সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া পরিশেষে ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, যে শাসন-পদ্ধতির দ্বারা এই প্রকার অত্যাচার সম্ভব হইতে পারে, সেই শাসন-পদ্ধতিকে ভারতীয় প্রজার পক্ষ হইতে হয় সংশোধন করিতে হইবে, না হয় ইহার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইবে। প্রথম

সংশোধন এবং তাহা না হইলে দুঃখের সহিত বাধ্য হইয়া ইহার উচ্ছেদ সাধন—ইহাই মহাত্মা গান্ধির অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়কে ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে স্বরাজলাভের চেষ্টা বলিয়াও অভিহিত করা যায়। মহাত্মা গান্ধি যে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজলাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারও অর্থ এই যে, এই এক বৎসরের মধ্যে এই শাসন-পদ্ধতিকে নিজকে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ দেওয়া হইবে, এবং সুযোগ যদি তাঁহারা গ্রহণ না করেন, তবে বাধ্য হইয়া দুর্য্যোগকে ডাকিয়া আনিতে হইবে এবং সেই দুর্য্যোগ, রাজবিদ্রোহমূলক গুপ্তকথা নহে, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহও নহে, পরন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে নিঃসহায় নিঃসম্বল নিরস্ত্র পরাধীন জাতির পক্ষ হইতে এক অতি নিস্ফল বৈদেশিক ভাষার অশেষ বাক-বিভূতিপূর্ণ ব্যর্থ আবেদন নিবেদনও নহে, ইহা ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রজার পক্ষ হইতে এক নূতন অস্ত্রের প্রয়োগ। ইহা নিরস্ত্র প্রজার নিরুপদ্রবে প্রতিরোধ।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ যখন পূর্ণামাত্রায় চলিতেছে ; তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের যুবরাজকে এতদ্দেশে লইয়া আসেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যুবরাজের আগমন উপলক্ষ্যে উৎসবাদি বয়কট করা হয়। এবং তাহা লইয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আরম্ভ হয়। ইহাতে সকল প্রদেশেই কংগ্রেসকর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রেফ্‌তার হইলেন। সহস্র সহস্র যুবক কারাবরণ করিল। গবর্ণমেণ্ট মিটমাট করিতে চাহিলেন ; পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মধ্যস্থ হইয়া গান্ধির নিকট মিটমাটের সর্ত্ত দিলেন। কিন্তু গান্ধির সর্ত্ত সরকার না গ্রহণ করায় মিটমাট হইল না। তারপর আহাম্মদাবাদ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি অবলম্বনের প্রস্তাব হইল।

বারদোলী সিদ্ধান্ত ও মহাত্মার কারাবরণ

মহাত্মা গান্ধি স্বয়ং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বারদোলী তালুকে প্রথম আইন সাফল্য আন্দোলন আরম্ভ হইবে ঠিক হইল। এমন সময় চৌরী-চোরায় জনসঙ্ঘ উত্তেজিত হইয়া থানা পোড়াইল—পুলিশ মারিল। ভারতবাসীর হিংসার পরিচয় পাইয়া মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য স্থগিত রাখিলেন। সমস্ত দেশময় এক বিক্ষোভ দেখা দিল। একের পাপে সমস্ত ভারতবর্ষের আয়োজন পণ্ড হইয়া গেল। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করিল। মহাত্মা গান্ধী সুদীর্ঘ ৬ বৎসরের জন্য বন্দী হইলেন।

১৯২২—২৪ খৃষ্টাব্দ—মহাত্মার কারামুক্তি

মহাত্মা গান্ধী কারাগারে যাওয়ার পর, কংগ্রেসে মতভেদ দেখা দিল। একদল নেতা কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষপাতী হইলেন ; আর দল অহিংস অসহযোগ ধরিয়া থাকিতে চাহিলেন। গয়া কংগ্রেসে দুইদল পৃথক হইয়া গেলেন। স্বরাজ্যদল ও পরিবর্ত্তন বিরোধী দল এই দলের মত পার্থক্যে কংগ্রেস বলহীন হইল।

জেলে মহাত্মা গান্ধী অন্ত্রনিরোধে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে পুনায় সেসুন হাঁসপাতালে আনিয়া চিকিৎসা করা হইল। তখন তাঁহার প্রাণসংশয় হইয়াছিল ; যাহা হউক কর্ণেল ম্যাডকের অস্ত্র চিকিৎসা ও সযত্ন চেষ্টায় মহাত্মা ভাল হইলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে মুক্তিলাভ করিয়া মহাত্মা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্দ্দশা দেখিলেন। এবং হিন্দু-মুসলমানে মারামারি ও ঝগড়া দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। স্বরাজ্যদল মহাত্মার কথা শুনিলেন না। আহাম্মদাবাদ ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সকল সমস্যা ভঞ্জন হইল। মহাত্মা বুঝিলেন, দেশের প্রতিষ্ঠাবান নেতারা অনেকেই অসহযোগ-নীতির উপর আস্থা সম্পন্ন নহেন। তাহার পরেই কলিকাতায় স্বরাজ্যদলের সহিত মহাত্মাজীর মিটমাট হইল ; তদনুসারে বেলগামকংগ্রেসে অহিংস অসহযোগনীতি স্থগিত রাখা হয়। মহাত্মার ব্যবস্থা সকলে মানিয়া লয়। কংগ্রেসের পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন।

কংগ্রেসের পর মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটমাট করিতে যান। সেখানে কোহাটে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের উপর ভয়াবহ অত্যাচার করিয়াছে সংবাদ লইয়া মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিন

সপ্তাহ উপবাস করেন। ঐ সময় দিল্লীর সর্ব্বদল বৈঠকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী হিন্দু মুসলমান মিলন, চরকা ও খদ্দর এবং ছুঁৎমার্গ পরিহার—এই বিবিধ গঠনকার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। ত্যাগ, তপস্যায়, সত্যনিষ্ঠায় এই নিরভিমানী মহাপুরুষ আজ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবরূপে সর্ব্ব-দেশের মনীষীগণ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইতেছেন।

মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন সম্প্রতি ভারতে অস্থায়ী-ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুর্ব্বল পরাধীন আমরা মহাত্মা-জীর এই যে আদর্শ ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারি নাই। তবে একথা ঠিক যে কংগ্রেস সভায় যাহাই হউক মহাত্মাজী আন্দোলনের ফলে দেশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিস্ময় জাগরণ আসিয়াছে কংগ্রেসের ৩০ বৎসর আন্দোলনের ফলে যাহা সংসাধিত হয় নাই মহাত্মাজী তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিন বৎসরে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। আজ তাঁহার গৌরবও ভারতের সীমা ছাড়াইয়া সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইতেছে। ইংলণ্ডের ওয়েলস, ফ্রান্সের রোঁম্যা রোলাঁ, আমেরিকার টাইমস প্রভৃতি মহামানবীগণ আজ মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। আমরা এক হতভাগ্য জাতি এমন এক মহাপুরুষকে কর্ণধার স্বরূপ পাইয়াও আমরা আজ পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে অসমর্থ হইতেছি। ভগবান আমাদিগকে মহাত্মার আদর্শ—অনুসরণ করিবার মত ক্ষমতা দিন!

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর বাণী

(বক্তৃতা ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত)

ধর্ম্ম

ধর্ম্ম আমার প্রিয়। আমার প্রথম অভিযোগ এই যে, ভারতবর্ষ ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিতেছে। আমি হিন্দু-মুসলমান বা পার্শী ইত্যাদি বিভিন্নধর্ম্ম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। সকল ধর্ম্মের মূল সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই আমার লক্ষ্য। আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি।

*　　*　　*　　*

সকল ধর্ম্মই শিক্ষা দিতেছে, সকল কর্ম্ম ফেলিয়া সৎকর্ম্ম কর। অনিত্যধন সংগ্রহের জন্য, স্বার্থের তৃপ্তির জন্য আমরা আবেগের সহিত কর্ম্ম করিয়া থাকি। আমাদের ভোগ স্পৃহাকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের সমস্ত কর্ম্ম ভগবদভিমুখী করিতে হইবে।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম

আমি আমাকে সনাতনী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেই কেননা,—

(১) আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী। অবতারবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ আমি বিশ্বাস করি।

(২) আমি খাঁটী বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানি; কিন্তু বর্ত্তমানের কৃত্রিম জাতিভেদ মানি না।

(৩) আমি গোরক্ষা কর্ত্তব্য মনে করি। সাধারণতঃ গোরক্ষা বলিতে লোকে যাহা বুঝে, আমি উহা তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছি।

(৪) আমি প্রতিমা পূজা ও প্রতীকোপাসনায় বিশ্বাসী।

(৫) আমি বাইবেল, কোরান, জেন্দবেস্থা প্রভৃতি গ্রন্থকে বেদের ন্যায় পবিত্র ও ঐশ্বরিক বলিয়া মনে করি।

(৬) হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক আমি স্বয়ং পাঠ করিয়াছি এমন কথা বলি না। তবে শাস্ত্রগ্রন্থের গূঢ়মর্ম্মার্থ ও সত্য অবগত হইয়াছি।

(৭) হিন্দুধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দেয় না। সাধারণ ভাবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারশীল না হইলেও অনেক জাতিকে হিন্দু-ধর্ম্ম ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সকলকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম বিশ্বাসানুযায়ী ঈশ্বরোপাসনা করিতে বলে, সেইজন্যই আমি কখনো অস্পৃশ্যতার বিশ্বাসী নহি।

হিন্দু সমাজ ও ছুঁৎমার্গ

হিন্দুধর্ম্মের আমি যতটুকু বুঝিবার অবসর পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে "অস্পৃশ্যজাতি" বলিয়া কোন কথা নাই। যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন, কতক-গুলি জাতি "স্পৃশ্য" আর কতকগুলি জাতি "অস্পৃশ্য" ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বিধান, তবে আমি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিব।

*　　*　　*　　*

নির্য্যাতীত জাতিগুলির প্রতি আমি কৃপাপরবশ হইয়া সদয় হইতে বলিতেছি না। আমরা উচ্চ, এই অভিমান লইয়া তাহাদের সংস্কারে অগ্রসর হইও না। তাহাদিগকে সহোদর ভাই বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। যে সমস্ত অধিকার হইতে আমরা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি, তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। ছুঁৎমার্গ ধর্ম্মের বিধান নয়, শয়তানের সৃষ্টি!

কর্ম্মিগণের নৈতিক জীবন

প্রশ্ন—যদি কোন নেতার নৈতিক জীবন পবিত্র না হয় তবে কি করা কর্ত্তব্য?

উত্তর—ইহা একটি গুরুতর জটিল প্রশ্ন। সকলের দৃষ্টিই নেতৃগণের উপর পতিত হয়। বিশেষতঃ অলস ব্যক্তদের দৃষ্টিতে অন্যের ত্রুটিই সহজে ধরা পড়ে। সেইজন্যই এই সমস্ত অভিযোগের উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। নেতাদের চরিত্র সম্বন্ধে যত কথা বলা হয়

সবই যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে সঙ্ঘলাভের যোগ্য আর কেহই বাকি থাকিবে না। সকলেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। তুলসীদাস বলেন যে, চেতন অচেতন সকলেরই ত্রুটি আছে। হংস যেমন জল হইতে দুধই গ্রহণ করিয়া থাকে, সাধু ব্যক্তিরাও তেমনি মানুষের সদ্গুণগুলই গ্রহণ করে। কিন্তু যদি আমরা কোন অপরাধ প্রত্যক্ষ দর্শন করি কিংবা প্রত্যক্ষ না দেখিলেও প্রত্যক্ষের মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? তখন নির্ভীকভাবে অথচ বিনয়ের সহিত সেকথা তাঁহাকে বলা এবং অসৎপন্থা পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তথাপি যদি তিনি অসৎপন্থা পরিত্যাগ না করেন, তবে প্রকাশ্যভাবে সেকথা ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন নেতা প্রকাশ্যভাবে এবং কর্ম্মের পক্ষে ক্ষতিজনক কোন দুর্নীতি আচরণ না করেন, ততক্ষণ তাঁহার ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনের তথ্যানুসন্ধান করা আমাদের উচিত নহে। আমাদের উদ্দেশ্য ও উপায় দুই-ই পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে দুইটি পরস্পর বিভিন্ন পৃথক্ সত্তা বলিয়া মনে করিনা। আমরা বেশ জানি যে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্য জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা সংস্কারক এবং যাঁহারা সমাজের সংস্কার সাধন করিতে চাহেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন কলঙ্কিত হয়, তবে আমাদের সমস্ত কর্ম্মই বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং কর্ম্মিগণ আমার এই অনুরোধের প্রতি মনযোগ করিবেন।

আপনারা অতিসতর্কতার সহিত নিজদিগকে পরিচালিত করিবেন। যখন আপনারা নিজ মনের উপর আধিপত্য হারাইয়া ফেলেন, যখন আপনাদের দৃষ্টি ও শ্রবণ কলুষিত হয় এবং আপনাদের পা আপনাদিগকে অযথা স্থানে লইয়া যায়, তখন সৎসাহসের সহিত ঐ অন্যায় হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। সব সময় মনে করিবেন যে আপনারা আগুনের মধ্যে অবস্থিত। যদি আপনাদের সংযম-কবচের মধ্যে কোথাও কোন ছিদ্র হয়, তবে ঐ ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া সেই আগুন আপনাদিগকে পোড়াইয়া ফেলিবে। গ্রামের কোন কর্ম্মীকেই আহারে বা উৎসবে নিমন্ত্রণ করা উচিত নহে। তাঁহারা সেখানে আদেশ করিতে যান নাই, বরং আদিষ্ট হইতেই গিয়াছেন। তাঁহারা সেবা প্রিয়তা অর্জ্জন করিবেন; কারণ সেবাই আত্মার পোষণ করে। প্রত্যেক কর্ম্মীরই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। যদি তিনি কোন গৃহীর গৃহ অপরিষ্কার দেখেন, তবে তিনি স্বহস্তে গৃহ পরিষ্কার করিয়া অন্যের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করিবেন।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

কোন অবস্থাতেই হিন্দু দেব-মন্দির নষ্ট করাকে সমর্থন করা যায় না। সম্বার এবং আমেথির ব্যাপার সম্পর্কে মৌলানা শৌকৎ আলী অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিয়াছেন যে, এখন হিন্দুরাও যদি মুসলমানদের মসজিদ নষ্ট করে, তাহা হইলে মুসলমানদের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মৌলানা সাহেবের এই কথায় অনেক হিন্দু হয়ত গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন এবং সন্তুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু আমি তাহা পারি না এবং একথাও আমি বলি যে মুসলমানদের এই সকল উৎকট ধর্ম্মোন্মত্ততা আমি কাহারও অপেক্ষা কম বোধ করি না। আমি জানি যে, অনেক হিন্দু বলিয়া থাকেন যে, আমি মুসলমান জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিয়াছি। সেই জন্য আমি এই সকলের জন্য অনেকটা দায়ী। আমি এ অভিযোগের কথা বুঝি, কিন্তু আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য অনুতাপ করি না। এই জন্য অন্য সকল কারণ থাকা সত্ত্বেও এই কারণে আমি অন্য হিন্দুদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে বেশী অনুভব করি।

মূর্ত্তিপূজা

আমি নিজে মূর্ত্তি পূজকও বটে, আবার মূর্ত্তিপূজার বিরোধীও বটে। মূর্ত্তিপূজার পশ্চাতে যে ভাব রহিয়াছে, আমি তাহাকে খুব মূল্যবান মনে করি। মানুষকে জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে ইহার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। সেই জন্য যে সহস্র সহস্র দেবমন্দির আমাদের এই দেশকে

পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, আমি প্রাণপাত করিয়া সেই সকল মন্দির রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। আমি মুসলমানদিগের সহিত যে বন্ধুভাব স্থাপন করিয়াছি, তাহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে তাহারা আমার মন্দির এবং দেবমূর্ত্তি-পূজাকে সহিয়া চলিবে। যে সকল মূর্ত্তিপূজা ধর্ম্মান্ধতার জন্য অপরের অনুষ্ঠিত অন্য কোন ধর্ম্মকে সম্মান করে না, আমি তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, এই জন্য আমাকে মূর্ত্তিপূজার বিরোধীও বলা চলে।

পরস্পরের সহিষ্ণুতা

হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্য মুসলমানদিগকে অন্য ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে হইবে। মাত্র আবশ্যক হিসাবে আমরা কায়দা করিয়া এই সহিষ্ণুতার ভাব দেখাইলে চলিবে না, মুসলমানদিগকে এই পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতাকে তাহাদের নিজধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ হিন্দুদিগের পক্ষেও পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা আবশ্যক এবং এই সহিষ্ণুতার ভাবকে তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য ধর্ম্ম তাহাদের নিকট যতই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হউক না কেন, তাহার প্রতি সহিষ্ণুতার ভাব দেখাইতে হইবে। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আদমের যুগ হইতেই আমরা প্রতিশোধ গ্রহণের ভাব অনুসরণ করিয়া আসিতেছি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, এ পথ একেবারেই ফলপ্রদ নহে। এই প্রতিশোধ গ্রহণের ভাবের বিষের ক্রিয়ায় আমরা অব্যক্ত যন্ত্রণা-ধ্বনি করিতেছি। যাহা হউক, হিন্দুরা যেন মুসলমানদের মসজিদ নষ্ট না করে। সহস্র মন্দির নষ্ট হইয়া গেলেও আমি একটীও মসজিদ স্পর্শ করিব না। এইভাবে আমি আমার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিব।

মন্দিরের পুরোহিতগণকে মন্দির ও বিগ্রহরক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতে দেখিলে আমি খুব সুখী হইব। সর্ব্বভূতে বিরাজমান ভগবান যেমন আত্মবিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংসরূপ অপমান সহ্য করিয়া থাকেন, পূজারিগণও সেইরূপ ধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গ করুন। মুসলমান যেমন ক্ষেপিয়া উঠিয়া যেভাবে হিন্দু মন্দির ও হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ অপবিত্র ও ধ্বংস করিয়াছে, হিন্দুগণ কখনই সেরূপ ক্ষিপ্তভাবে তাহাদের ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না।

ইস্‌লামের পরীক্ষা

যেসব মুসলমান আত্মগোপন করিয়া মন্দির অপবিত্র করিবার জন্য পেছন হইতে জনতাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, "মনে রাখিবেন, আপনাদের চরিত্রের মাপকাঠির দ্বারাই সাধারণ ইস্‌লামের পরীক্ষা করিবে।" যে ক্ষেত্রে আলোচ্য অত্যাচারের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান, সেখানেও কেন ধীর স্থির প্রকৃতিসম্পন্ন মুসলমান এই অত্যাহিতের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, ইহা আমার জানা নাই। তথাপি তর্কের স্থলে ধরিয়া লওয়া যাউক যে, মুসলমানদের উত্তেজিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল, হিন্দুগণ মসজিদের নিকট বাজনা বাজাইয়াছিল, এমন কি কোন গুম্বজ হইতে দুই একখানা ইষ্টকও অপসারিত করিয়াছিল। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য হইব যে, প্রতিহিংসারও একটা সীমা আছে এবং মুসলমানদিগের হিন্দু মন্দির অপবিত্র করা আদৌ সমীচীন হয় নাই।

জীবনের চেয়ে ধর্ম্ম বড়

হিন্দুদিগের নিকট তাহাদের দেবদেবীর মন্দির জীবন অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। কাহারও জীবন নষ্ট হইয়াছে, একথা শুনিয়া স্থির থাকা সম্ভব হইলেও হিন্দুগণ তাহাদের মন্দিরের অমর্য্যাদার কথা শুনিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। দর্শনের কূটতর্কের বিচারে না টিকিলেও প্রত্যেকের নিকটই তাহার নিজের ধর্ম্ম বড়। কিন্তু যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় না যে, হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মুলতানে যে হিন্দু মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করা হইয়াছিল, সে ব্যাপারেও উত্তেজনার কোন কারণ ছিল না। আমার 'হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্য' শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল হিন্দু দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাহিতের কথার উল্লেখ আছে, আমি তৎসমস্তের সত্যতা নির্দ্ধারণের চেষ্টায় আছি। আমি সেই সকল অভিযোগের

কোন প্রমাণই এযাবৎ পাই নাই। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমেথী, সম্বার, গুলবর্গের অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা কখনই ইস্‌লামের সম্মান বাড়িবে না। আমার নিজের ধর্ম্মের মর্য্যাদা যেমন আমার কাম্য, ইসলামের সম্মানও আমার তেমনি প্রিয়। কারণ মুসলমানদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিয়া ভ্রাতৃভাবে থাকাই আমার উদ্দেশ্য।

অসহযোগ ও কংগ্রেস

কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সম্পর্কে, কতকগুলি দৃশ্যমান অস্পৃষ্টতা রহিয়াছে। এগুলি চাপা দিয়া রাখিলে চলিবে না। যদি আমার সূতা কাটার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐগুলি সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ সহ অসহযোগ প্রস্তাব কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রভুক্ত নহে। যদি আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য্যপদ্ধতি নিশ্চয়ই এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে। স্বরাজের 'স্কীম' রচনায় আমি যে প্রকার সাহায্য করিতে পারিব, তাহা এই যে, আমি অধিকাংশের ভোট মানিয়া লইব। আমার মনঃপূত হইল না, বলিয়া আমি আইন অমান্য বা অসহযোগ অবলম্বন করিবার ভীতিপ্রদর্শন করিব না। যদি দেশের অধিকাংশ ইহা মানিয়া লয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত এক বৎসর পরও তাহা করিব না। আমি যত কমে স্বীকৃত হইতে পারি, এই স্বরাজের স্কীমে যদি তাহার সহিত সামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলে আমি উহা লাভের জন্য কর্ম্মও করিব। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইয়াছে, সমালোচকগণ এই মত আমার মুখে বসাইয়াছেন। কংগ্রেসের নীতির দিক দিয়া দেখিলে, নিয়মতন্ত্র নিশ্চয়ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমার মতে, একথা এখনো বিবেচনা করিয়া অস্বীকার করা যায় না যে, সারা ভারতের মধ্যে কংগ্রেস এখনো সর্ব্বপ্রধান জাতীয় প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এখনো কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক অধিক এবং বহুতর স্বেচ্ছাসেবকও বৃত্তিপ্রাপ্ত কর্ম্মী রহিয়াছে। অসহযোগ সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইয়াছে, আমার মত এভাবে গৃহীত হউক, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। পক্ষান্তরে ইহা জাতিকে যেমন নববল প্রদান করিয়াছে, এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু ইহা আমাদের আশানুরূপ ফলপ্রদান করিতে পারে নাই। জনসাধারণ এই আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহা মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। যাহা হউক এ সমস্ত কথায় কর্ম্মীরা বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিবেন না, পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে তাঁহাদের আরও অনেক কাজ করিতে হইবে।

স্থগিত না প্রত্যাহার ?

একজন বন্ধু লিখিয়াছেন, "আপনার প্রস্তাবিত বর্জ্জননীতি স্থগিত রাখা কি প্রকৃত প্রস্তাবে একেবারে প্রত্যাহার করার অভিপ্রায়েই নহে ?—না, আমি তাহা মনে করি না। বর্ত্তমানে বর্জ্জন-নীতি প্রত্যাহার করিবার কোন উদ্দেশ্য আমি পোষণ করি না। যদি ঐরূপ উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইতে ইতস্ততঃ না করিয়া আমি প্রকাশ করিতাম। আমি আশা করি, ঐগুলি পুনরায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে না। কিন্তু জাতীয়-জীবনের পরিপুষ্টির জন্য ঐগুলি প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন বুঝিলে, আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সে চেষ্টা করিব, যেমন বর্ত্তমানে জাতীয়তার পরিপুষ্টির জন্যই আমি ঐগুলি স্থগিত রাখিবার প্রয়োজন বুঝিতেছি।

"আপনি কি পরস্পরের কলহমূলক আত্মধ্বংস নীতি এক বৎসরের জন্য চাপা দিতেছেন না ?" পুনরায় আমায় উত্তর—না। বৎসরের শেষে আমরা নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিব। যদি বৎসরের শেষভাগে তীব্র মত ভেদ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পঞ্চবর্জ্জন-নীতি পুনঃ প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। যদি রাষ্ট্রক্ষেত্রে কর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মীরা উহার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, তাহা হইলেই উহা জাতীয় কর্ম্ম-পদ্ধতিরূপে পরিণত হইতে পারে। সে অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত উহা অল্পসংখ্যকেরই কর্ম্মনীতিরূপে থাকিবে। যখন গবর্ণমেণ্ট নত হয়, তখন জাতির অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারী কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দাবীর নিকটই অবনত হয়, এই সত্যটী ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু যখন এই অংশটী নানা দলে বিভক্ত

হইয়া পড়ে, তখন কোন ফল লাভ করা যায় না। বৎসরের শেষে আমি দুই প্রকার ফল আশা করিতেছি। হয়, পরিবর্ত্তনবিরোধীদল সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক অর্থাৎ বহির্ম্মুখ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, নয়, খাঁটী রাজনৈতিকগণ বহির্ম্মুখ কর্ম্মের অসারতা বুঝিয়া প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত আভ্যন্তরিক গঠন-কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবেন, যাহাতে স্বাভাবিক-রূপেই পঞ্চবর্জ্জন-নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাও হইতে পারে যে, আভ্যন্তরিক পরিপুষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রচেষ্টা সমভাবে অধিকতর আগ্রহের সহিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবে এবং সকল দলই পরস্পর প্রত্যেককে সাহার্য্য করিবে এবং আমরা গবর্ণমেণ্টকে আমাদের সবদলের সর্ব্ববাদিসম্মত দাবী গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিব।

এক সাধারণ ভিত্তির উপর জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই আমার প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য এবং আশা এই যে, সকলদল সাধুভাবে পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এক সার্ব্বজনীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। এমন কি, যদি এই আড়ম্বরপূর্ণ উচ্চাশা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করি অন্ততঃ সকলেই ক্ষুব্ধ না হইয়া এবং পরস্পরের প্রতি দুরভিসন্ধি আরোপ না করিয়া পৃথক হইয়া কার্য্য করিব। কোন আন্দোলনের স্বাভাবিক সহজ অবস্থায় স্থগিত রাখার কথা উঠে না। সময় সময়, ভিতরে জীবনী-শক্তি থাকিলে আত্মসম্বরণের বেদনা অধিকতর শক্তি প্রকাশের কারণ হয়। অতএব যাঁহারা বর্জ্জননীতির প্রকৃত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, তাঁহারা স্বল্পকালের জন্য উহা স্থগিত রাখার ফলে চিরদিনের মত উহার অন্তর্দ্ধানের আশঙ্কায় অধীর হইবেন না। সেরূপ দুর্দ্দিন যে আসিতে পারে না, তাহার প্রমাণ তাহারাই—পূর্ণ বিশ্বাসীগণ

চরকা ও ভোটাধিকার

"আত্মত্যাগ হিসাবে চরকা কাটা ভাল, কিন্তু সূতা কাটাকে (কংগ্রেসের) ভোটাধিকারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় করা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার।" আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই প্রকারের আপত্তি অনেকে উত্থাপিত করিতেছেন। আমি এই প্রকারের আপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। প্রকৃত পক্ষে চরকা কাটার জন্য এই প্রকারের আপত্তি তোলা হয় না, চরকা কাটা সম্পর্কে যে গণ্ডী এবং বাধ্যতার ভাব রহিয়াছে, তাহাই এই আপত্তির মূল। কিন্তু এরূপ হয় কেন? অর্থসম্পর্কীত গণ্ডী যদি ভোটাধিকারের জন্য করা যায়, তাহা হইলে অর্থের স্থানে কর্ম্মশক্তির গণ্ডী নির্দ্দেশ করিতে আপত্তি কেন? কার্য্য না করিয়া অর্থ দেওয়াটাই কি অধিকতর সম্মানের? কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষেধক এসোসিয়েশনের প্রত্যেক সভ্যকে যদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বলা যায়, তাহা কি প্রকৃত পক্ষে কষ্টকর? কোন নৌ-বিভাগের এসোসিয়েশনের প্রত্যের সভ্যের নৌ-বিভাগ সম্পর্কিত কার্য্য জানা কি কষ্টকর? ফরাসীতে সামরিক শিক্ষা জাতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ; সুতরাং প্রত্যেক ফরাসীর পক্ষে সামরিক শিক্ষা লাভ করা কি বিরক্তিজনক? এই সকল ক্ষেত্রে আবশ্যক গুণ থাকা যদি বিরক্তিজনক না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার পক্ষে জাতীয় অপরিহার্য্য আবশ্যক চরকা কাটা এবং খদ্দর পরিধান করা উক্ত মহা-সভার সভ্যের পক্ষে বিরক্তিজনক হইবে কেন?

চরকা কাটাকে জাতীয় মহাসভার ভোটাধিকারের আবশ্যক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করায় অন্যায় কোথায়? দেশের জনসাধারণের মধ্যে খদ্দর প্রচার করিবার পক্ষে এবং খদ্দরের প্রতি প্রীতি আকর্ষণ করিবার পক্ষে কি এই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং সুবিধাজনক পথ নহে? অবশ্য যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বস্ত্র বিষয়ে ভারতবর্ষকে আত্ম-নির্ভর করিতে হইবে এবং চরকা ও তাঁতের সাহায্যেই এই আত্ম-নির্ভরতা আনয়ন করা যাইবে, আমি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছি।

মহাত্মা গান্ধী

(আমেরিকার চিকাগো সহরের 'ইউনিটি' পত্রিকার সম্পাদক রেভাঃ হোম্‌স্‌ মহাত্মা গান্ধী বন্দী হইবার সংবাদ পাইবার পর ১৯২২—১২ই মার্চ্চ যে সুদীর্ঘ 'সারমন' দিয়াছিলেন,—তাহারই আংশিক ভাবে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।)

মহাত্মা গান্ধী কে ?

অদ্য প্রভাতে মহাত্মা গান্ধীর পূত চরিত্র, তাঁহার স্বদেশে আরব্ধ কার্য্যের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ আলোচনা করিতে গিয়া আমার মনে পড়িতেছে, কিছুদিন পূর্ব্বের কথা যেদিন আমি এই গির্জ্জায় সমাগত ব্যক্তিদিগের নিকট মহাত্মা গান্ধীকে বর্ত্তমান জগতের জীবিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই কয়েক মাসে ঘটনাচক্রের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! তখন ভারতবর্ষের বাহিরে মহাত্মা গান্ধীর নাম একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল। আমি দৈবক্রমে তাঁহার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম এবং তখন যদিও তাঁহার সম্বন্ধে আমি অতি অল্পই শুনিয়াছিলাম, তথাপি সেই মুহূর্ত্তেই আমি বুঝিয়াছিলাম, যে, এক অতি উচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্মিক প্রতিভা লইয়া মহাত্মা গান্ধী সৃষ্টি ক্রীড়ায় নিযুক্ত। আজ সর্ব্বত্র মহাত্মা গান্ধীর নাম ; আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইউরোপের সমস্ত সংবাদপত্রের সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সকল প্রকার পত্রিকাতেই তাঁহার সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। এ দেশের বিখ্যাত সংবাদপত্র "নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড" একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কয়েক মাসের মধ্যেই এই ব্যক্তি অজ্ঞাত অপরিচিত রাজ্য হইতে বাহির হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার যশোরাশি জগতের ইতিহাসে অমরত্ব পাইতে চলিয়াছে। আজ সমগ্র জগতের মিলিত মুগ্ধ দৃষ্টি তাঁহার উপর স্থাপিত। ১৯১৯ সালে উড্রোউইলশন, ১৯২০।২১ সালে নিকোলা লেনিনকে জগত যে ভাবে আলোচনা করিত, আজ এই খর্ব্বকায় প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তি, যিনি রাষ্ট্রনায়ক নহেন, যিনি কোন শক্তি, যশঃ প্রার্থনা করেন না, যিনি আজ ইংরাজ কারাগারের লৌহপ্রাচীরের অন্তরালে আবরিত --তাঁহার কথাও সর্ব্বত্র নানাভাবে আলোচিত হইতেছে।

দৈবশক্তিশালী মহাপুরুষ

ভারতবাসীরা কি দেখিয়া ইঁহাকে মহাত্মা বলিয়া অভিনন্দিত করিল ? কোন অপূর্ব্ব দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া নয়, প্রতিভা দেখিয়া নয়, আশ্চর্য্য বাগ্মিতা দেখিয়া নয়, তাঁহার অকলঙ্ক শুভ্র-চরিত্র ও আধ্যাত্মিক মহিমামণ্ডিত প্রখর ব্যক্তিত্ব দেখিয়াই আজ সকলে তাঁহাকে দৈবশক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা দেখিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী লক্ষ লক্ষ দরিদ্র জনসাধারণের ন্যায় আড়ম্বর হীন সহজ সরল জীবন যাপন করেন। মহাত্মা গান্ধী ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বদেশে ও ইংলণ্ডে সুশিক্ষিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বোম্বাইএ আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি যাহা করিলেন, অল্প লোকেই তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। জনসাধারণকে ছাড়াইয়া, সাফল্যের সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া, "যশঃ ও অর্থের" চরম সীমায় উঠিবার চেষ্টা না করিয়া, তিনি ধীরভাবে ও দৃঢ়তার সহিত নামিয়া আসিতে লাগিলেন

তিনি নামিয়া আসিলেন মানুষের শোক ও দুঃখের মধ্যে,—যেখানে মানুষ উদরান্নের জন্য উন্মত্তবৎ অস্বাভাবিক কঠোর পরিশ্রম করিতেছে এবং শোচনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন

মহাত্মা গান্ধী
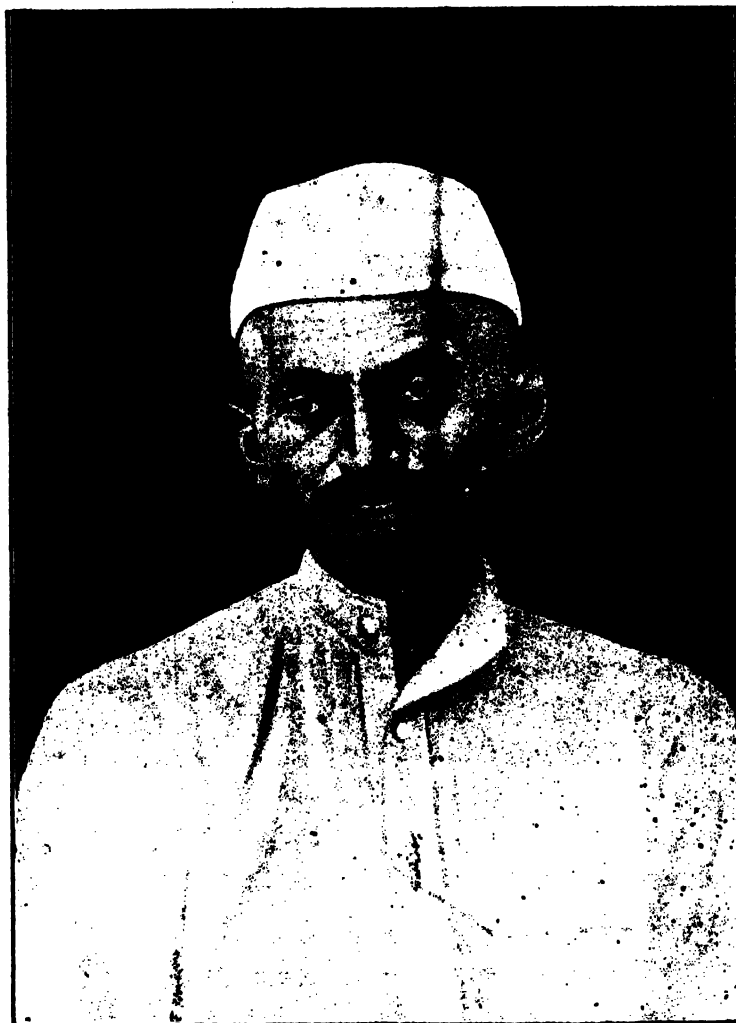
করিতেছে,—অশ্রু, রক্ত ও শ্রম-জলসিক্ত মানবের মর্ম্মান্তিক যাতনায় সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্ম্মভূমিতে নামিয়া আসিলেন। প্রথম হইতেই তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, মানব জীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ তিনি ভোগ করিবেন, প্রবল ও পাশব বল-দৃপ্তের সমস্ত অত্যাচার ও ব্যভিচার তিনি উৎপীড়িতদের সহিত একত্র দাঁড়াইয়া সহ্য করিবেন এবং জগতের দুঃখদৈন্যরূপ :"ক্রুশ" আজীবন গৌরবোন্নত শিরে বহন করিবেন। এমন কি "অস্পৃশ্য ও পতিতদের" মধ্যেও তিনি নামিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সহিত একত্র দাঁড়াইয়া জগতের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সহ্য করিবার জন্য। এক কথায় মনুষ্য জীবনে যত রকম দুঃখদৈন্য বিঘ্ন বিপদ আসিতে পারে তাহার প্রত্যেকটাই তিনি আগ্রহের সহিত সতত বরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। সংস্কার প্রয়াসে, তাঁহার জীবনের প্রথম সংগ্রামে তিনি অন্যান্য সহযোগীদের আহ্বান করিয়াছিলেন, যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশ অমান্য করিয়া শত শত ভারতীয়"কুলি"সহ নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে (জোহান্সবার্গ) যাত্রা করিয়াছিলেন—সেই কাহিনীটি কত সুন্দর। এইখানে মহাত্মা গান্ধী প্রথম তারকাখচিত গগন তলে উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রথম নিশা যাপন করেন, এই খানেই তিনি প্রথম দরিদ্রব্রত গ্রহণ করেন এবং স্বীয় অনুচরগণকে সেই ব্রতে দীক্ষিত করেন এবং এই খানেই তিনি জীবিকার্জ্জনের জন্য স্বহস্তে হলচালনা আরম্ভ করেন।

কৌপীনধারী মহাত্মা গান্ধী

আর এখন যে তিনি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত ঘটনাটি কত মহান্! মহাত্মা গান্ধীর যে কোন শত্রুর নিকটে এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন কর,সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে যে ইহা মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্মান্ধ উন্মত্ততা! এই ঘটনাটী কিরূপ? কয়েক মাস পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তিনি তাহার অনুচরগণকে ইংলণ্ড হইতে আমদানী বস্ত্র বর্জ্জন করিবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার বিদেশী বস্ত্র দগ্ধ করিবার উপদেশ দেন এবং ঘরে চরকার সুতা কাটিয়া স্ব স্ব আবশ্যকীয় বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া লইতে বলেন। কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দেখা গেল, যে ইহাতে জনসাধারণের বিস্তর অসুবিধা হইবে, এবং দরিদ্রগণ বিদেশীবস্ত্র দগ্ধ করিতে গেলে প্রায় উলঙ্গ হইবে। দেশের এই বস্ত্রাভাবের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী কটীমাত্র বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া মহানগরীর রাজপথে আবির্ভূত হইলেন। দেশের বস্ত্রাভাব পীড়িত দরিদ্রতম ব্যক্তির মত তিনিও সামান্য পরিধান বস্ত্র পরিধান করিলেন। ইহা মহাত্মার জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা! তাঁহার জীবনটাই সমগ্র মানব জাতির দুঃখ, দৈন্য, অভাব অনুভব করিবার এক ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসীগণ যখন মহাত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখনই দেখিতে পায় তিনি তাহাদেরই মত দরিদ্র, তাহাদেরই একজন সখা, সকলের ভ্রাতা—কিন্তু তাহারা সকলেই তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে।

আত্মঘাতী-আধুনিক সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ

ইহা সত্য যে মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য (আধুনিক) সভ্যতার প্রতিষ্ঠান গুলির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে বিশিষ্টরূপ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তাহাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। ধর্ম্মগুরু রূপে ইহাই তাঁহার প্রতিভার চরম পরিচায়ক বলিয়া আমার মনে হয়। গান্ধী তাঁহার স্বদেশকে দুইটী অধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ দেখিতেছেন। একদিকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট—এক সম্পূর্ণ বিদেশীয় শাসনযন্ত্রের অধীনতা—যাহার বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে, অপরদিকে—ধনীর প্রচুর অর্থ এবং বর্ত্তমানের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ফলে ধনীরা বৈজ্ঞানিক কলকারখানাগুলি আয়ত্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে দরিদ্র করিতেছে এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে প্রচুর ধনসম্পদ একত্রিত হইতেছে। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য মূলধনীদের কবল হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিতে পারিলে ইংরাজ সাম্রাজ্য-নীতিপুষ্ট ভারতের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের কবল হইতেও ভারতকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। আজ যদি ইংরাজ শাসনের অবসান হয়—আর যদি ইংরাজের রেল, ইংরাজের কলকারখানা, ইংরাজের কোম্পানীগুলি থাকে, তাহা হইলে

জুহু বাঙলায়

ভারতবাসী স্বাধীনতার কায়ার বদলে ছায়া পাইবে। তাহা হইলে তাহারা দাসত্বের নিগড়েই আবদ্ধ থাকিবে এবং এমন ব্যবস্থায় দাসত্ব করিবে যাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী। আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা, মহাত্মা গান্ধীর মতে মৃত্যুর চিহ্ন, জীবনের চিহ্ন নহে। আমরা এমন এক সভ্যতাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করিবে এবং প্রতিনিয়ত আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। এই দৈত্য প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, আমাদিগকে কলের চাকার সহিত বাঁধিয়া দিয়া পরিশ্রম করাইয়া লইতেছে এবং আমাদিগকে জড়বস্তুর মোহে আচ্ছন্ন করিয়া অধঃপাতিত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের উন্নততর আদর্শ হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি। এমন কি বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ইহা একটা বিরাট ব্যর্থতা কেননা পরিণামে ইহা এক একটী মহাযুদ্ধের বিভীষিকার করাল ধ্বংসলীলা প্রকট করে। এইভাবে একটা ধ্বংসলীলা, পাশ্চাত্যকে গ্রাস করিয়া এশিয়ার দিকেও অগ্রসর হইতেছে। ইহা জাপানকে গ্রাস করিয়াছে, চীনকে আক্রমণ করিয়াছে, ভারতেও ইহা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে—মহাত্মা গান্ধী ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

তিনি অহিফেনের ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তিনি সুরাব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি চরকা ও তাঁত বসাইতে কহিতেছেন। তিনি রেলগাড়ী ও মোটরকারের এবং সাধারণ ভাবে সর্ব্বপ্রকার কলকারখানার অপরিহার্য্য প্রয়োজন অস্বীকার করেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা-নাগিণীর বিষাক্ত দংশন হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে চান এবং সময় থাকিতে ভারতের অতীত সভ্যতা ও শিক্ষাকে রক্ষা করিতে চান। বাণিজ্যনীতির অভিশাপ হইতে, কলকারখানার ভয়াবহ লুণ্ঠন হইতে, শ্রমজীবির জঘন্য দাসত্ব হইতে মূলধনীদের কলঙ্কিত জীবনের লোলুপ গ্রাস হইতে তিনি তাঁহার স্বদেশকে রক্ষা করিতে চান। এই কার্য্যে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, কেবল ভারতবর্ষের জন্যই তাঁহার এই প্রাণপাত চেষ্টা! ভারতবাসীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, তাহাদের সারল্য, তাহাদের শিল্পকলা, তাহাদের ধর্ম্ম—যাহা মানুষের সহিত মানুষের এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে, যাহা ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার চরম ঐক্য প্রচার করে—মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণ হইতে তাহা রক্ষা করিতে চান।

মহাত্মা গান্ধীর অধ্যাত্ম জীবন

দেশের এই মহা সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া মহাত্মা গান্ধী আমার চক্ষে এক সত্য ও অবতার রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এইরূপে আধ্যাত্মিক মুক্তির চেষ্টায় তাঁহার সার্ব্বজনীন দিক প্রকটিত হইয়াছে,—যাহা কেবল প্রাচ্যের জন্য নহে, পাশ্চাত্যের জন্যও বটে। কেননা, ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীকেই রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার স্বদেশে ধনীর মূলধনের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া মূলক আন্দোলনকে জাগ্রত করিয়াছেন, তাহা ক্রমে আমাদের দেশেও প্রচারিত হইবে, এবং আমরাও জড়বাদের মোহমুক্ত হইয়া আমাদের সত্ত্বা ফিরিয়া পাইব। মহাবীর সীজারের সমসাময়িক রোমের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজ আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। সেই অতীতের রোমসাম্রাজ্য বাহুবলে জগজ্জয়ী হইয়াছিল, সমগ্র পৃথিবীর ধন লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং নিজেদের সুখসুবিধার জন্য মানুষকে ক্রীতদাস করিয়াছিল। এই বাহ্য চাক্‌চিক্যের আড়ম্বরের প্রাচুর্য্য যতই বাড়িতেছিল, ততই ভিতরে ভিতরে অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠিতেছিল। রোমের ইতিহাসের এক শঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে প্রভু যীশু খৃষ্টের ও খৃষ্টানগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা মুমুর্ষু জগতে এমন এক নবজীবনের স্পন্দন লইয়া আসিলেন, যাহা দুই সহস্র বৎসর মানব সমাজকে সঞ্জীবীত করিয়া রাখিয়াছিল। আবার এক অতি আসন্ন ধ্বংসের মুহূর্ত্তে মহাত্মা গান্ধী অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিও কি এক অভিনব জীবনীশক্তি বিতরণ করিতেছেন না? তাঁহাকে কি আমরা বর্ত্তমান জগতের পরিত্রাতারূপে সসম্ভ্রমে বরণ করিয়া লইব না?

মহাত্মা গান্ধী—দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট

এই সমস্ত বিচারের উপর নির্ভর করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সার্ব্বজনীনত্ব ও তাঁহার ভারতীয় প্রচার কার্য্য যথাসাধ্য বর্ণনা
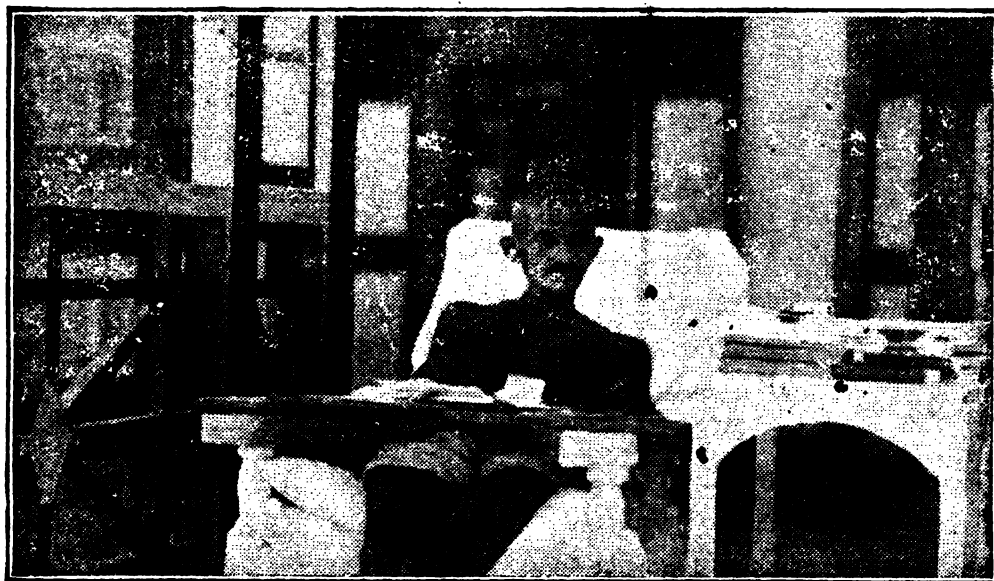
কারামুক্তির পর আহাম্মদাবাদে তোলা

করিলাম। প্রভু যীশুখৃষ্টের সহিত ইঁহার সাদৃশ্যের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। নাজারাথীয় যীশু এক স্বর্গীয় মহাপুরুষ,—তিনি প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, অপ্রতিরোধ নীতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি শয়তানের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের প্রতি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার সহায়তায় পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যও ইহার অনুরূপ! এই পবিত্র ও সাধুজীবন যাপনকারী ভারতীয় মহাপুরুষ প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন এবং নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ নীতির মধ্য দিয়া তাহা আচরণ করিবার পথ প্রদর্শন করিতেছেন এবং তিনি সমাজকে এক অভিনব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর নূতনরূপ দিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। যদি আমি প্রভু যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয়বার জন্ম পরিগ্রহের কথা বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে বলিতাম, প্রভু যীশুখৃষ্টই আজ মহাত্মা গান্ধিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহের, এক কবির কল্পনা ছাড়া ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নাই। সে হিসাবে আমরা প্রভু যীশুর ন্যায় গান্ধীকেও তুল্যরূপে শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে পারি। দূর হিমালয় পর্ব্বতের পদতলবাসী পল রিশারের "the seeovurge of christ" নামক পুস্তক হইতে আমি দুইটী উল্লেখযোগ্য পদ আবৃত্তি করিতেছি :—

(১) "যদি যীশুখৃষ্ট পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, তবে কি তিনি কোন সাম্রাজ্যের স্বাধীন রাষ্ট্রীক্ না হইয়া পরাধীন জাতির সন্তানরূপে আবির্ভূত হইবেন না?"

(২) "যদি যীশু জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই শ্বেতাঙ্গ হইবেন না, কেননা তাহা হইলে অন্যান্য জাতিরা তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না।"

মহাত্মা গান্ধীও কি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন না? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, তিনি বর্ত্তমান যুগের যীশুখৃষ্ট? যীশুখৃষ্ট পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন কি নাই—আজ এ প্রশ্ন একান্ত অনাবশ্যক। আজিকার সমস্যা এই—কে তাঁহাকে চিনিয়া লইবে, এবং তাঁহার অনুসরণ করিবে?

আনন্দবাজার পত্রিকা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সাল।

গান্ধীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব

[রেভাঃ জে, এইচ, হোম্‌স্]

গত বর্ষে ভারতের জাতীয় সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়া গান্ধী আর একটী তৃতীয় পন্থা দেখিয়াছিলেন। আমি গান্ধীর নিজের অপ্রতিকার বা অহিংসাত্মক উপায়ের কথা বলিয়াছি যাহা শত্রুকে ভালবাসিতে বলে, শত্রুর বিরুদ্ধে না গিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে বলে, যাহা তাহাদের লজ্জা ও অপমান নিজের উপর লইয়া তাহাদিগকে লজ্জা ও অপমান হইতে রক্ষা করিবার প্রেরণা দেয়। গান্ধী তাঁহার পাঠশালার একজন ছাত্রকে তাঁহার অবাধ্য দেখিয়া এবং তাঁহাকে আঘাত করিতেছে দেখিয়া তিনি কি করিতে পারেন? তিনি সেই বালককে শাস্তি না দিয়া নিজেই চব্বিশ ঘণ্টার জন্য উপবাস করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন এবং এই কার্য্য দ্বারা তাহাকে অনুতপ্ত করিয়া চিরদিনের মত তাহার ভক্তিভাজন হইলেন। গান্ধী যখন দেখিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা ঝগড়া করিতেছে, তখন তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন না এবং বিচারকের ন্যায় দণ্ডাদেশ ঘোষণাও করিলেন না—পক্ষান্তরে তিনি স্বেচ্ছায় তিন সপ্তাহ উপবাসরূপ ভীষণ ব্রত গ্রহণ করিলেন; কেননা, এই লোকগুলির 'অধঃপতনে' তিনি 'মর্ম্মাহত' হইয়াছিলেন, তাহাদের 'অবিবেচনা'য় তিনি 'ব্যথিত' হইয়াছিলেন, অতএব তিনি 'আত্মনির্য্যাতন' দ্বারা তাহাদিগকে 'সংশোধন' করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় কর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর স্বরাজীদিগের সম্মুখেও তিনি এইভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন—এমন কি, তাঁহার পক্ষে অধিকাংশ থাকিলেও তিনি বিরুদ্ধদলের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট

যাহা চাহিয়াছিল, তাহার বেশী দিলেন। তিনি একমাইল যাইতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু গেলেন দুই মাইল। তিনি বলিলেন, "আমার প্রতিপক্ষ দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য দেখাইয়াছেন এবং অগ্রাহের সহিত নিজেদের মত বজায় রাখিতে ভীত হন নাই...যদিও আমি একজন আপোষের বিরোধী নো-চেঞ্জার, আমি যে তাঁহাদের মেজাজ সহ্য করিয়া কাজ করিব, তাহাই নহে, এমন কি যেখানে আমি পারিব, সেখানে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিব।"

এইখানেই—যাহারা তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছে, যাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে,—তাহাদের প্রতি এই অপ্রতীকারের তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করার মধ্যেই আমরা গান্ধীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব দেখি এবং ইহার মধ্যে আমরা নেতা হিসাবে তাঁহার জয়ও দেখিতে পাই। কিছুকালের জন্য ভারতবাসীরা ব্যর্থ হইল, কিন্তু তাহাদের নেতা জয়ী হইলেন—যে ভাবে ইতিহাসে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি জয়ী হইয়াছেন, ঠিক সেই ভাবে জয়ী হইলেন। কি বাহিরে, কি ভিতরে উভয়তই তাঁহার জয়।

বাহিরে পুনরায় ভারতবাসীকে ঐক্যের পথ দেখাইয়া তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। বৃটেন আর একবার ঐক্যবদ্ধ জাতির সম্মুখীন হইতেছেন। গান্ধী কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বিরাট ধ্বংসস্তূপ! অতীতের ঘৃণা, বর্ত্তমানের ঈর্ষা—বিপরীত বুদ্ধি ও উপদেশের সংঘাত জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। দেশের এই বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জকে কেন্দ্রীভূত করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান যুগের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের আত্মার শক্তিতেও বুঝি কুলাইবে না বলিয়া মনে হইল; কিন্তু মহাত্মা এক অলৌকিক কার্য্য সাধন করিলেন। তিনি মূলনীতি অব্যাহত রাখিলেন, কেবল অহঙ্কারকে বলি দিলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তা সাজিলেন না, সকলকে সুবিধা দিলেন. তিনি ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রেমের পবিত্র সলিলে শুদ্ধ করিয়া সকলকে নিকটে আনিলেন। ভারতবর্ষ আজ আবার এক নূতনপথে যাত্রা করিয়াছে, যেখান হইতে স্বাধীনতার সমুন্নত শিখর অধিক দূরে নহে।

কিন্তু বাহিরে তাঁহার আশাহত স্বদেশবাসীর মধ্যেই তিনি কৃতকার্য্য হন নাই; ভিতরে নিজের আত্মাকে সুসংযত করিতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যদি "যে একটি নগর শাসন করে, তাহা অপেক্ষা যে নিজের আত্মাকে শাসন করিতে পারে সে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ"—একথা সত্য হয়, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী নিঃসন্দেহে আমাদের কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। গত তিন বৎসর তিনি তাঁহার শত্রুদের প্রদত্ত অনেক শাস্তি সহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধুদের হাতেও পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার আন্দোলন বিপথগামী হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতে দেখিয়াছেন। তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের অবাধ্য ঔদ্ধত্য দেখিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি ধৈর্য হারান নাই, সাহস হারান নাই। তিনি আশা বা বিশ্বাস কিছুই হারান নাই। সকলের চেয়ে মহানদৃশ্য এই যে, সমস্ত প্রকার ক্রোধ, আত্মরক্ষার জন্য উৎকট চেষ্টা এবং ঘৃণা তাঁহার আত্মার অপূর্ব্ব প্রশান্তি ভঙ্গ করিতে পারে নাই—তিনি সমস্ত মনুষ্যকেই নিজের বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেছেন। তিনি কেবল বলিলেন, "যদি নো-চেঞ্জার, স্বরাজী, লিবারেল, হোম-রুলার, স্বতন্ত্র এবং সেই সঙ্গে ইংরাজগণ সকলের প্রতিই আমার সমান ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে আমি জানি, তাহাতে আমার পক্ষে ভালই হইবে এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য এত চেষ্টা, তাহারও ভাল হইবে।"

এইরূপে—বাহিরের দিকে একজন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-নীতিবিদের মত তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নরাশির মধ্য দিয়াও বিজয়ী হইয়াছেন এবং ভিতরের দিকে ধর্ম্মের সুকঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় একজন মহিমান্বিত মহাপুরুষের মত বিজয়ী হইয়াছেন। তিনি এ সকল কেমন করিয়া করিলেন? নিজের অপ্রতীকাররূপ অহিংসার আদর্শে অটল থাকিয়া! যীশুখৃষ্টের যে মহাবাণীর আমরা উত্তরাধীকারী—যাহা আমরা প্রত্যহ ব্যঙ্গভরে উড়াইয়া দেই, তাহারই জয় মহিমা আমরা গান্ধীর মধ্যে দেখিতেছি। 'প্রেম কখনো ব্যর্থ হয় না' সাধু পৌল ঘোষিত এই বাণী মহাত্মা গান্ধী কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। আজ একজন মূর্ত্তিপূজক হিন্দু (Pagan) যাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিল, হিংসার নানাবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত—নররক্তে রঞ্জিত-হস্ত আমরা—কবে এই সত্যকে গ্রহণ করিব!

আনন্দ বাজার পত্রিকা

মহাত্মার দাবী

আনন্দবাজার পত্রিকা

(১৯শে জানুয়ারী, ১৯২২)

পাঞ্জাব, খিলাফৎ, স্বরাজ সম্পর্কে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের নিকট আমার দাবী এই,—

১। আমার স্মৃতি হইতে যথাসাধ্য স্মরণ করিয়া লিখিতেছি :—কনষ্টাণ্টিনোপলে তুর্কীদিগের পূর্ণাধিকার দান। আদ্রিয়ানোপল, অ্যানাটোলিয়া, স্মার্ণা ও থ্রেস তুরস্ককে প্রত্যর্পণ। আরব, মেসোপটেমিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়া হইতে সমস্ত অ-মুসলমান শক্তির অপসারণ ও ইংরাজ সৈন্য—ইংরাজ ও ভারতীয় উভয় প্রকার সৈন্য সরাইয়া লওয়া।

২। পাঞ্জাব সম্পর্কে কংগ্রেস সাবকমিটির রিপোর্ট পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া, স্যার মাইকেল ও তাঁহার জেনারেল ডায়ার এবং ঐ রিপোর্টে অন্যান্য যে সমস্ত কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা উচিত বলা হইয়াছে, তাহাদের সকলের 'পেনসন' বন্ধ করিয়া দেওয়া।

৩। যদি ঐ ঐই সর্ত্ত পালন করা হয়, তাহা হইলে স্বরাজ অর্থ উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসন। ঐরূপ স্বরাজের 'স্কীম' কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গঠিত হইবে। অর্থাৎ যে চারি আনা চাঁদা দিয়া কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছে, সেই নির্ব্বাচনাধিকার পাইবে। প্রত্যেক ভারতীয় নরনারী, যাঁহারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও ঈপ্সিত স্বীকার করিয়া কংগ্রেস 'ক্রীডে' নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন ও চারি আনা চাঁদা দিয়াছেন, তিনিই ভোট দিবার অধিকারী বিবেচিত হইবেন। ইহাতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্বরাজ শাসন তন্ত্র নিরূপণ করিবেন। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট তাহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। তদনুযায়ী ভারতীয় শাসন-যন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

মহাত্মার লিখিত বর্ণনা

মহাত্মা গান্ধি আদালতে যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলেন
তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইল

রাজভক্ত হইতে রাজদ্রোহী

কি করিয়া একজন রাজভক্ত ও সহযোগী হইতে আমি একজন দুর্দ্দমনীয় অসন্তোষ প্রচারক ও অসহযোগীতে পরিবর্ত্তিত হইলাম, তাহা ভারতের জনসাধারণের নিকট ও যে ইংলণ্ডবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আজ আমাকে ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিবার আমার একটা দায়িত্ব আছে। আদালতের নিকটও আমি ভারতে যে নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী বর্ত্তমান আছে, তাহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বীজ বপন করার অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

* * *

আঘাত পরম্পরা

রাউলাট বিল পাশ হওয়াতে আমার জীবনে প্রথম আঘাত লাগে। কারণ এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা হরণ করা। আমি ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ করিবার দায়িত্ব অনুভব করিলাম। তারপর আসিল পাঞ্জাবের সেই বিভৎস কাণ্ড—জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড—বুকে হাঁটিয়া চলার আদেশ—প্রকাশ্য বেত্রাঘাত এবং আরও অবর্ণনীয় অবমাননাকর নিগ্রহ! আমি আরও দেখিতে পাইলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের নিকট তীর্থস্থানগুলির সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাও প্রতিপালিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

তবুও সহযোগী

কিন্তু ১৯১৯ খৃঃ অব্দে অমৃতসরে আমার বন্ধুবর্গের সতর্কবাণী ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কাগুলি উপেক্ষা করিয়াও সংস্কার-আইন সমর্থন করতঃ সরকারকে সহায়তা করিয়াছি; কারণ, আমার ধারণা ছিল যে, প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকার হইবে। আর ধারণা ছিল যে, যদিও সংস্কার-আইন ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তথাপি ভারতে উহা নব-আশা ও নব-জীবনের সঞ্চার করিবে।

কিন্তু এই সমস্ত আশাই শূন্য বিলীন হইয়া গেল—খেলাফতের উপর অন্যায়ের প্রতীকার হইল না,—পাঞ্জাব,

অপরাধকে লঘু করিয়া দেখান হইল। অধিকাংশ অপরাধী যে কেবল শাস্তি পাইল না তাহা নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকের চাকরী বজায় রহিল, অনেকে ভারতের রাজস্ব হইতে পেন্সন পাইতে লাগিল—এমন কি কয়েক জনকে পুরস্কৃত করা হইল। আমি আরও দেখিলাম যে, সংস্কার আইন ভারতীয়গণের প্রতি মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইয়া বরং ভারতের অর্থ শোষণ করিবার জন্য এবং তাহার দাসত্ব আরও বাড়াইয়া তুলিবার জন্য ইহার প্রয়োগ হইল। অনিচ্ছার সহিত আমি এই ধারণাতে উপনীত হইলাম যে, ইংরাজের সংস্পর্শ ভারতকে রাজনীতি ও অর্থনীতি হিসাবে আরও অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। নিরস্ত্র ভারতবাসীকে তাহার অস্ত্রধারী শত্রুর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

মানবতার বিরুদ্ধে পাপ

আমাদের চর্ম্ম-চক্ষে গ্রামে গ্রামে আমরা ইহার প্রমাণ-স্বরূপ যে কঙ্কাল-সার সাক্ষী দেখিতে পাই, তাহা কোন কুটতর্ক কোন শব্দের ভোজবাজীতে দূর হইতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যদি ভগবান বলিয়া কেহ থাকেন, তবে দিন আসিবে যখন ইংরাজগণ ও ভারতের সহরবাসিগণকে ইতিহাসের অগোচর মানবতার বিরুদ্ধে এই মহা পাপের উত্তর দিতে হইবে। এখানকার আইন বিদেশীদিগের অর্থ শোষনের সংশয়তার জন্য তৈয়ারী। পাঞ্জাব-সামরিক আইনকে নিরপেক্ষ ভাবে আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, অন্ততঃ শতকরা নব্বইটা শাস্তি অন্যায় ভাবে দেওয়া হইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতে যে সমস্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যেও দেখিয়াছি যে প্রতি দশ জনের মধ্যে নয় জনের কোন দোষ নাই। তাঁহাদের অপরাধ মাত্র স্বদেশের প্রতি ভালবাসা। ভারতের বিচারাদালতে ইংরাজের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় শতকরা ৯৯ জনই সুবিচার পায় না। ইহা অত্যুক্তি নহে। সে সমস্ত ভারতবাসী এই সমস্ত ব্যাপারের কোন অংশে জড়িত ছিলেন, তাহারাই উহা প্রাণে প্রাণে বুঝেন। আমার মতে লুণ্ঠন-কারীদের সহায়তার জন্য জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ ভারত-আইনগুলির অপব্যবহার করা হইতেছে।

মহাত্মার ধর্ম্ম

আমি সংক্ষেপে আমার অসন্তোষ প্রচারের মূল কারণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে কোন শাসন কর্ত্তার উপর আমার কোন বিদ্বেষ নাই, রাজার উপর ত দূরের কথা। তবে যে নীতিসমষ্টি হিসাবে, ভারতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্নীতি অপেক্ষা বেশী অনিষ্ট করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার আমি ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি। পূর্ব্বে ভারতে যত শাসন প্রণালী বর্ত্তমান ছিল তাহা অপেক্ষা ইংরাজশাসনের আমলে ভারতবর্ষ অধিক কাপুরুষ হইয়াছে। এই ধারণা লইয়া উহার প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমি পাপজনক বলিয়া জ্ঞান করি—এবং আমার বিরুদ্ধে সম্প্রতি উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রবন্ধে আমি যে, ইহার বিরুদ্ধে লিখিতে সমর্থ হইয়াছি তজ্জন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। বাস্তবিক আমার বিশ্বাস ইংরাজ ও ভারতীয়গণ যে, অস্বাভাবিক অবস্থায় বর্ত্তমানে আছেন তাহা অসহযোগ-নীতি দ্বারা দেখাইয়া দিয়া আমি ভারত ও ইংলণ্ডের মহা উপকার করিয়াছি।

অসহযোগের সমীচীনতা

আমার ক্ষুদ্র মতে সৎকার্য্যের সহায়তা করা যে প্রকার কর্ত্তব্য, অসতের প্রতি অসহযোগ অবলম্বন করাও সেই প্রকার ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু অতীত যুগে অসহযোগ নীতি কেবল পাশব বলের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমি আমার দেশবাসীকে দেখাইতে চাই যে, পাশব বলের উপর প্রতিষ্ঠিত অসহযোগ কেবল অনিষ্টের জনক, অন্যায়ই কেবল বলপ্রয়োগ দ্বারা সমর্থিত হইবে, পাশব বলেরও অসহযোগ করিতে হইবে।

পদত্যাগ অথবা চূড়ান্ত শাস্তি

সুতরাং আমি আমার প্রতি প্রযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিকেই অভিনন্দিত করিতেছি এবং আনন্দের সহিত এই চূড়ান্ত শাস্তি গ্রহণ করিতেছি। কিসের জন্য,—না যাহা আইনের মতে জ্ঞানকৃত অপরাধ তাহা আমার মতে নাগরিকের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

সার হেনরী কটন

মিষ্টার গান্ধী যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে বিজয়ী হইয়া আজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাঁহার স্বদেশবাসী, তাঁহার নাম কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কর্ণেল ওয়েজউড

তাঁহাকে (গান্ধী) খৃষ্টের সহিত তুলনা করিলে ধর্ম্মের গ্লানি করা হইল বলিয়া কেহ মনে করে না। কারণ গান্ধি একজন দার্শনিক বিপ্লববাদী—তিনি টলষ্টয়ের এক অভিনব সংস্করণ।

মিষ্টার বেনস্পূর

প্রতীচী লেনিনের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার যুক্তি, ন্যায়, শক্তি অপ্রতিহত। প্রাচীও তাহারই ন্যায় অসীম শক্তি সম্পন্ন অবিচলিতনীতি গান্ধী সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু প্রথমোক্ত জন বিশ্বাস করে দৈহিক শক্তির উপর। আর শেষোক্ত জন বিশ্বাস করে প্রতিরোধের উপর। একজন নির্ভর করে অসির উপর, আর একজন নির্ভর করে আত্মার উপর।

লর্ড হার্ডিঞ্জ

সম্প্রতি আপনাদের স্বদেশবাসিগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যায় ও অসঙ্গত আইনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শাস্তির কথা জানিয়া শুনিয়াই সে সব আইন অমান্য করিবেন বা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহা সহিবার মত সাহস ও সহিষ্ণুতা তাঁহাদের আছে। ভারতীয় না হইলেও এ ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান।

(মাদ্রাজ বক্তৃতা)

সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল

তাঁহার (গান্ধী) কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিলে, তাঁহার আন্তরিকতা ও অকপটতায় সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার অনুবর্ত্তী সকলেই তাহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত এ কথা স্মরণ করিলে তাহার বালকসুলভ সরলতায় কাহারও অবিশ্বাস থাকিতে পারে না। আমি এই সন্দেহ জনক ক্রমোন্নতির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মার সুনির্দ্দিষ্ট পথের কথা উল্লেখ করিতেছি। তিনি রোগের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিতেছেন। তিনি অন্য চিকিৎসকের মত ক্ষণিক উপশমকারী ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, অস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার গভীর অস্ত্র প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ করিল,—জাতির আত্মসম্মান বোধ, মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতার স্পৃহা ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা গান্ধীর মত অত বড় একটা বিশাল ব্যক্তিত্ব, যাহা সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলতে পারে, জগতের ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত বিরল।

লর্ড এম্পথিল

মিষ্টার গান্ধি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং যাঁহার জন্য তাঁহারা প্রকৃত বীরের মত এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, আমার একান্ত কামনা, উহাতে তাঁহারা সফল মনোরথ হউন।

বাই আম্মা

"আমার প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, হিন্দু ও মুসলমান সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বরাজ অর্জ্জনের জন্য কাজ করিতে থাকুন। আমরা অন্যভাবে যতই চেষ্টা করি না কেন, একত্র না হইলে দেশোদ্ধার হইবে না। হিন্দু মুসল-

বিভিন্ন বয়সে মহাত্মা
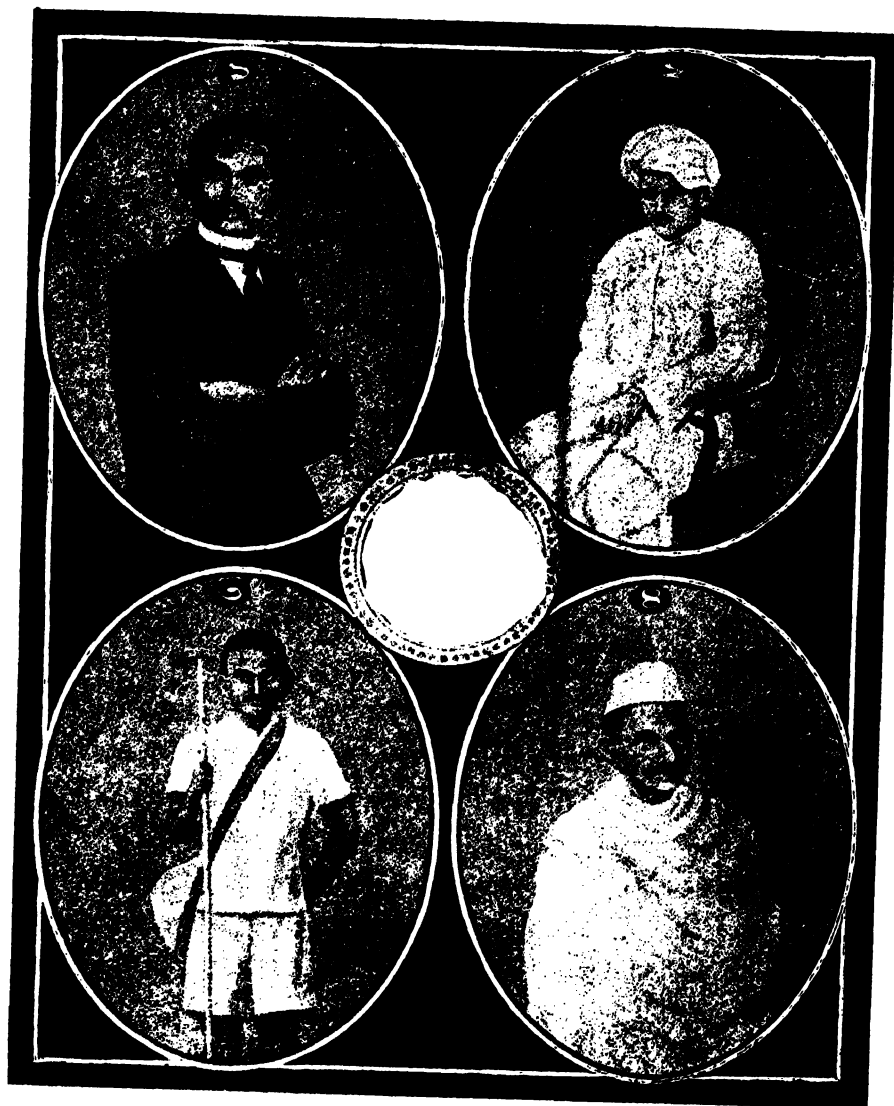
মানের একতার উপরই সব কিছু নির্ভর করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন একজন ইংরাজকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ভারতবাসীর কোন কাজটাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন? ইহার উত্তরে সেই ইংরাজ বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা যে আপোষে অনবরত কলহ বিবাদ করে, তাহাই আমি অধিক পছন্দ করি। তাই বলি, ভারতবাসী সাবধান! আপোষে কলহ, বিবাদ করিয়া জন্মভূমির অবনতি ঘটাইও না। কেহ কেহ বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমি ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মহাত্মার আন্দোলন মরে নাই—বরং দশ বৎসরে যাহা অসম্ভব হইত, দুই বৎসরে তাহাই সম্ভবপর হইয়াছে। মহাত্মাজীকে আমরাই কারাগারে প্রেরণ করিয়াছি। যদি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অন্যরূপ হইত। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যগুলি করা আমাদের একান্ত উচিত। ইহা যদি না করি, তবে আর কি করিব? আমরা যে কাজ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, তাহাতে যেন পশ্চাদপদ না হই। আমার শেষ কথা অগ্রসর—অগ্রসর!

মিষ্টার এস্, ই, ষ্টোক্‌স্

আমরা যদি এই মানুষকে (গান্ধী) আমাদের তুচ্ছ ভয় ও দ্বিধার দরুণ বিসর্জ্জন করি তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে, যখন ইঁহার জন্য গভীর অনুতাপেও কোনও ফল হইবে না। কারণ ঈদৃশ নেতা জাতির ভাগ্যে রোজ রোজ ঘটে না।

ডাক্তার সুব্রহ্মণ্য আয়ার

সামরিক শক্তি, দৈহিক বল বা অপরকে ভীতি প্রদর্শনের ক্ষমতা ভারতবর্ষ চায় না। ভারত চায় সেই আত্মিক শক্তি, যাহা মিষ্টার গান্ধী জাগরিত করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

ফেরোজশা মেটা

যে পর্য্যন্ত ভারতীয় পুরুষ সমাজে শ্রীযুত গান্ধীর মত ব্যক্তি মহিলা সমাজে শ্রীমতী গান্ধীর মত নারী বিদ্যমান—সে পর্য্যন্ত আমাদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, ইহারাই অমিত তেজ ও শক্তি এবং অপরিসীম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারেন।

ডাক্তার সান-ইয়েৎ-সেন

স্বরাজ্য পত্রিকার সাংহাইস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "চীন-গণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার সান-ইয়েৎ-সেন অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ আগ্রহ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তিনি মহাত্মাজীর একজন বিশেষ ভক্ত। তিনি তাঁহাকে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া মনে করেন।"

পুসিফুট জনসন

আপনি (গান্ধী) দুই বৎসরে মাদক দ্রব্য নিবারণ সম্বন্ধে যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে আর কেহ অতটুকু করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জগতের ইতিহাসে দেখা যায় না,……মহাত্মা গান্ধি ভগবৎ প্রেরিত ব্যক্তি। তিনি রেলওয়েতে কুলিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। নিতান্ত সাধারণ মানুষ যাহা খাইয়া কোনও মতে জীবন ধারণ করিতে পারে, তিনি তাহার বেশী গ্রহণ করেন না।

লর্ড গ্ল্যাডষ্টোন

মিষ্টার গান্ধী তাঁহার অভিপ্সিত কার্য্যে এমন একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

মানুষের জীবন হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মিষ্টার গান্ধী উহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে না দিয়া বরং উহার কুটিলতাকে দূর করিয়া উহাকে সরল ও পবিত্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার আসল ও চরম লক্ষ্য মানব সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন। বর্ত্তমান লেখক গান্ধীর রাজনৈতিক মতের অনুসরণকারী নহে। এই বিশাল

ব্যক্তিত্বের পূত প্রভাব তিনি (লেখক) অনুভব করিয়াছেন। লৌহবৎ দৃঢ়সংকল্প গান্ধীর কার্য্যকলাপ হইতে লেখক যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

লালা লাজপত রায়

গান্ধির সরলতা ও স্পষ্টবাদিতায় বর্ত্তমান রাজনীতিবিদ্‌গণের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে! কেহ বলেন তিনি নিহিলিষ্ট, কেহ বলেন, বিপ্লববাদী, কেহ বলেন তিনি টলষ্টয়ের মতাবলম্বী, আসলে তিনি ভগবান্, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিশ্বাসবাদী একজন ভারতীয় স্বদেশ প্রেমিক মাত্র।

কাউন্ট টলষ্টয়

ভগবান্ আমাদের ট্রান্সভালস্থ সহকর্ম্মিদের মঙ্গল করুণ। দুর্ব্বলের সহিত প্রবলের, বিনয় ও প্রেমের সহিত গর্ব্ব ও অত্যাচারের দ্বন্দ্ব জগতের সর্ব্বত্র ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ভ্রাতৃ ভাবে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

আপনি ট্রান্সভালে যাহা করিতেছেন, জগতে অবশ্য করনীয় কার্য্যের মধ্যে উহা অন্যতম। কেবলমাত্র খৃষ্টানগণ নয়, সমগ্র জগতই একার্য্যে যোগদান করিবেন।

গোখলে

যাঁহারা মিষ্টার গান্ধীর সহিত ব্যক্তিগত সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব কত অসাধারণ। তিনি যে কেবল প্রকৃত বীর ও আত্মোৎসর্গকারীর উপাদানে গঠিত এমন নয়, তাঁহার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ত্তমান, যাহা তাঁহার সহকর্ম্মিদিগকে এক একটা আত্মোৎসর্গকারী মহাবীরে পরিণত করিতে পারি। আমার জীবনে শ্রীযুত গান্ধীর মত আর দুইজন লোক আমার উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহাদের নাম মিষ্টার দাদাভাই নৌরোজী ও মিষ্টার রানাডো। ইঁহাদের সন্মুখে যে কেবল ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে লজ্জা হয় এমন নয়, ক্ষুদ্র বিষয় ভাবিতেও ভয় হয়। তাঁহার সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যদিও তিনি অবিশ্রান্তভাবে তাঁহার আরব্ধ সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে শ্বেতাঙ্গদের (দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী) প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষও বর্ত্তমান ছিল না।

পিয়ার্সন

ব্যক্তিগত ভাবে মহাত্মাজী সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, তাহাতে আমার মনে হয়, তাঁহার দুঃখযন্ত্রণার স্মরণ করিয়া তাহার কারাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হউক, ইহা তিনি কখনও ইচ্ছা করেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গত এক বৎসরের কারাগারে অবস্থান তাঁহার পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইয়াছে। কারণ তাঁহার পক্ষে যেটুকু বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন ছিল, তিনি সেখানে উহা পাইয়াছেন। তিনি নিজেও এই অবকাশ পান নাই, অথবা দেশ তাঁহাকে ইহার অবসর দেয় নাই। তিনি দেশসেবার জন্য, এবং জগতের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে, অহিংস অসহযোগের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, উহার জন্য আরও কার্য্যক্ষম হইয়া কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবেন।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শবাদী আজ কারাগারে আবদ্ধ, ইহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দুরপণের কলঙ্ক, কিন্তু ১৮ই মার্চ্চ তারিখে সরকারের কার্য্যের সমালোচনা না করিয়া বরং প্রত্যেককেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে, তাহাদের হৃদয়ের কোন শোচনীয় দুর্ব্বলতার দরুণ তাহাদিগকে এরূপভাবে অপমানিত করা সম্ভব হইল।

লোকমান্য তিলক

জনসাধারণের দুঃখ, দৈন্য ও উৎপীড়ন কাহিনীগুলির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার সংস্কার সাধন বা প্রতীকার করার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষীর কর্ত্তব্য। মহাত্মা গান্ধী এই কর্ত্তব্য যথোচিত যোগ্যতার সহিত প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তির যোগ্য পাত্র।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ,

মাদ্রাজের লর্ড বিশপ্

আমি সরলভাবে স্বীকার করিতেছি—যদিও একথা বলিতে আমি গভীর মর্ম্মযাতনা অনুভব করিতেছি—যে যাহারা মহাত্মা গান্ধীকে জেলে পাঠাইয়াও, যিশুখৃষ্টের নামে

আত্মপরিচয় প্রদান করে, তাহাদের অপেক্ষা মহাত্মা গান্ধীকে ন্যায় ও দয়ার জন্য ধৈর্য্যশান্ত দুঃখভোগের আদর্শের দিক দিয়া ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার একজন যোগ্যতম প্রতিনিধিরূপে দেখিতেছি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অধ্যাত্মশক্তি এবং অবিরাম আত্মোৎসর্গের মধ্যেই গান্ধীর সাফলের রহস্য নিহিত। অনেক জননায়ক স্বার্থ সাধনের জন্য আত্মত্যাগ দেখাইয়া থাকেন। ইহা অনেকটা কারবারে মূলধন খাটাইয়া অধিক লাভের প্রত্যাশার মত। কিন্তু গান্ধী ইহাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার সমগ্র জীবনই আত্মোৎসর্গের নামান্তর মাত্র।

তাঁহার আত্মা সতত দিবার জন্যই উন্মুখ -- তিনি কোন প্রতিদান চাহেন না। এমন কি ধন্যবাদ পর্য্যন্তও না। আমি বাড়াইয়া বলিতেছিনা আমি তাঁহাকে ভালরূপেই জানি।

তিনি একবার বোলপুরে আমাদের বিদ্যালয় আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার আত্মোৎসর্গ ও নির্ভীকতা একত্র হইয়া তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত করিয়াছে। সম্রাটগণ ও মহারাজগণ, বন্দুক ও পিস্তল, কারাদণ্ড ও নির্য্যাতন, অপমান ও আঘাত—এমন কি মৃত্যুও তাঁহার আত্মাকে ভীত বা বিচলিত করিতে পারে না। তিনি জীবন্মুক্ত। যদি কেহ আমার দেহ নিষ্পেষণ করে, তবে আমি সাহায্যের আশায় চীৎকার করিয়া কাঁদিব, কিন্তু গান্ধীকে পেষণ করিলে তিনি যে নীরব রহিবেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি। তিনি সেই পেষণকারীর প্রতি চাহিয়া হাস্য করিবেন। যদি তাঁহার তখন মৃত্যু হয়। তবে তাঁহার মুখে হাসি থাকিবে।

তাঁহার জীবনযাপন বালকের ন্যায় সরল; সত্যে তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা। মনুষ্যজাতির জন্য তাঁহার প্রেম সতত উন্মুখ। তিনি খৃষ্ট-আত্মা বলিয়া পরিচিত। আমি তাঁহাকে যতই দেখিয়াছি, ততই মুগ্ধ হইয়াছি। জগতের ভাগ্য-নিরূপণে এই মহাপুরুষ যে শক্তির আশ্চর্য্য মহিমা দেখাইবেন, ইহা আমার পক্ষে বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি তাঁহাকে কেমন করিয়া ঘোষণা করিব? তাঁহার জ্ঞানালোকদীপ্ত আত্মার সহিত আমার তুলনা হয় না। এবং যাঁহারা সত্যই মহাপুরুষ, তাঁহাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া মহা-পুরুষ করিতে হয় না। তাঁহারা স্ব স্ব গৌরবেই মহান্। যখন সময় আসিবে, তখন প্রেম, স্বাধীনতা ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রচারকরূপে গান্ধী সমগ্র জগতে পরিচিত হইবেন। প্রাচ্যের আত্মা গান্ধীর মধ্যে অতি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেননা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক জীবনৈতিক ও অধ্যাত্মিক-ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় এবং ঘৃণা এবং বারুদ-ধূম্র-কুহেলীতে মানবের দেহ ও আত্মা অধঃপতিত হয়। (আমেরিকার জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত কথোপকথন হইতে)

শ্রীমতী আনি বেশান্ত

আমাদের মধ্যে যিনি অল্পকাল হইল আসিয়াছেন, যাঁহার উপস্থিতি আশীর্ব্বাদস্বরূপ, যাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে—যেখানে তিনি পদার্পণ করেন, সেই গৃহই পবিত্র হয়—সেই গান্ধী আমাদের শহিদ ও সাধু। তিনি ত বিস্ময়কর উপায় এমন ঘটনা প্রবাহে পড়িয়াছেন, যেখানে তাঁহার অন্তর্নিহিত মহৎগুণাবলী স্ফুরিত হইয়াছে—ধৈর্য্য শান্ত অক্লান্ত সাহস, যাহা ভীত হয় না, নিঃস্বার্থপরতা, যাহা আপনাকে বিলাইবার আনন্দে আত্মহারা অসাধারণ নম্র সহৃতার অসাধারণ শক্তি যাহা সহজে বুঝা যায় না। আমি যখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তাঁহার হাত ধরিলাম--দেখিলাম, এক মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মা দুঃখের অতীত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়া পরের জন্য জীবন আহরণ করিতেছে—এমন একজনকে দেখিলাম, যাঁহারা মনুষ্যজাতের মুক্তিদাতার দুরূহ কর্ত্তব্যব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আমি যোদ্ধার পথই লইয়াছি, সাধুর পথ নহে। আমি দণ্ডধারী, অবিচারকে আঘাত করিয়াই যুদ্ধ দিতে চাই—বিনয়ের সহিত নহে- তথাপি

আমি এই মানুষের মধ্যে দেখিলাম—দুর্ব্বল কৃশদেহ হইলেও শক্তিমান ; ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে বলা যায়—যিনি অপরের উদ্ধার সাধন করেন ; কিন্তু নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন না।"

মিঃ সি, এফ্ এনড্রুজ্

মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে আমরা জগৎ আলোড়নকারী মনুষ্যত্বের আদর্শ পাইয়াছি—এক সমুন্নত নৈতিক প্রতিভা পাইয়াছি। তিনি ভিতর হইতে এক জীবন্ত স্বাধীনতার নিগূঢ় শক্তি আমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বাহ্যবস্তু অপেক্ষা ভিতরের সম্পদের প্রতিই অধিকতর আস্থাস্থাপন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে আমার সমস্ত প্রাণ সাড়া দিয়াছে এবং আমার আশা আছে যে, এই পথে আমরা সর্ব্বশেষে স্বাধীনতা লাভ করিব।

সন্দেহজনক ক্রমোন্নতিবাদ অপেক্ষা মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যক্ষবাদেরই আমি ভক্ত। আমি দেখিতেছি, তিনি ব্যাধির মূল বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিজ্ঞ যন্ত্র চিকিৎসকের ন্যায় তিনি যন্ত্রের অস্ত্রোপচারে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি ঔষধ দিয়া সাময়িক বেদনানিবৃত্তির পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার করধৃত ছুরিকা, যতই বিদ্ধ হইতেছে, আমরা রোগীর ততই আরোগ্য লক্ষণ দেখিতেছি—আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতাস্পৃহা ফিরিয়া আসিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় সমগ্র জাতিকে উদ্বোধিত করিতে পারেন, এমন প্রখর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে বিরল

"ইউনিটি", চিকাগো, আমেরিকা

গান্ধী কি সাফল্যলাভ করিবেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি সহজ—গান্ধী বহুপূর্ব্বেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যেই এমন এক মহা আন্দোলন তিনি জাগ্রত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস আর কোন আন্দোলনেই এত অধিকসংখ্যক লোক যোগদান করে নাই। তিনি তাঁহার অনুগামী লক্ষ লক্ষ নরনারীকে এক সমুন্নত নৈতিক আদর্শবাদ দিয়া নিয়মানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন—যাহা সাধারণতঃ বাধ্যতামূলক উপায়ে সম্ভব হয়। সামাজিক সমুন্নতির শক্তি তিনি উদ্বোধিত করিয়াছেন, যাহা পরিমাণে ভারতবাসীর জীবন আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। যদি আজ গান্ধী দেহত্যাগ করেন, যদি কাল তাহার আন্দোলনের আজ কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র না থাকে—তথাপি তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী নিত্যকাল জয়ম হম্যায় উদ্ভাসিত থাকিবে। গান্ধীর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার পথে এক বিঘ্ন এই যে আমরা তাঁহাকে কেবলমাত্র জাতীয়তার দিক দিয়াই বিশেষ ভাবে দেখিয়া থাকি। আমরা মনে করি তাঁহার সাফল্য ও ব্যর্থতা, তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরই নির্ভর করিতেছে। তাঁহার কার্য্যাবলী অবশ্য স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করিয়াই উদ্বেলিত হইতেছে ; এবং উহাকেই তিনি রূপ দিতেছেন। কিন্তু কোন জাতীয় আন্দোলনের সহিত তাহা যতই মহান হউক না কেন,—গান্ধীর আদর্শকে একেবারে মুক্ত করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ভুল বোঝা হইবে। যেমন যীশুখৃষ্টকে একজন জননায়ক মনে করিলে, যেহেতু তিনি রোমানদিগকে প্যালেষ্টাইন হইতে দূর করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহার জীবনও ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা গান্ধীকে এক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে দেখিতেছি—ঐশ্বরিকশক্তির মানবীয় আবির্ভাব স্বরূপ অল্প-সংখ্যক ঐতিহাসিক মহাপুরুষের সহিতই তাঁহার তুলনা হইতে পারে। এবং তাঁহার আন্দোলন—বৌদ্ধধর্ম্ম বা খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তুলনীয়। আমরা বিশ্বাস করি গান্ধী তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করিয়া ভারতকে মুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু এই সাফল্য মহান হইলেও, তাঁহার ব্যাপক আধ্যাত্মিক কার্য্যের একটী ঘটনা মাত্র।

নির্য্যাতিত মনুষ্যত্ব

হে মহাত্মা, ত্যাগীবীর, পুরুষ প্রধান !
যে আদর্শ তুমি আজ করিয়াছ দান
বিশ্বজনে—স্বপ্নাতীত, অভিনব হায়,
তোমারে করেছে খ্যাত এ বিশ্বসভায় !

কিন্তু তুমি শ্রেষ্ঠ নহ আদর্শ গঠনে—
শ্রেষ্ঠ নহ উচ্চকথা তুচ্ছ আস্ফালনে ;
তোমারে করেছে বড় ত্যাগের প্রভায়,
তুমি আজ নরশ্রেষ্ঠ ত্যাগ-গরিমায় ।

প্রবলের অত্যাচারে কাঁদিছে দুর্ব্বল,
অসত্যের অবিচারে ঝরে অশ্রুজল
সত্যের নয়ন বাহি। যেদিকে তাকাই
অত্যাচার-জীর্ণ-চিত্র দেখিবারে পাই
সর্ব্বত্র এ পৃথিবীর। সুখ-শান্তি-হারা
অত্যাচার নিপীড়িত নিঃসহায় যারা
তুমি আজ তাহাদের জীর্ণ আঙ্গিনায়
নামিয়া এসেছ নীচে—আপন মাথায়
তুলিয়া লয়েছ যত অপমান ভার,
আকণ্ঠ করিছ পান বিষ-অত্যাচার
নীলকণ্ঠসম আজ প্রশান্ত নীরবে।

বিশ্বপ্রেম শিখায়েছ এ বিশ্ব মানবে,
ছেড়ে দিয়ে অতীতের পথ পুরাতন
নবভাবে করিয়াছ পূজা আয়োজন
ধরার মন্দির দ্বারে। শুধু মাতৃভূমি
তোমার আদর্শ নহে—সবার চরণ চুমি'
দিতে হবে প্রেম—সবারে টানিয়া বুকে
দিতে হবে স্থান—নির্ব্বিচারে হাস্যমুখে
দিয়ে ভালবাসা শত্রু-মিত্র ভাবিবে সমান—
এই তব নব পথ—আদর্শ মহান!

ধনীর বাড়িছে নিত্য অর্থলিপ্সা, আর
শক্তিমান করে নিত্য নব অত্যাচার
নিঃসহায় দুর্ব্বলেরে; কি করিব হায়,
দুর্ব্বল লুটায় নিত্য প্রবলেরই পায়!
কিন্তু জানি অধর্ম্মের হ'লে অভ্যুত্থান
আপনি আসেন নেমে দেব ভগবান
নরলোকে যুগে যুগে।

হে অতি-মানব!
রক্ষা কর আমাদের; জিঘাংসা-দানব
গ্রাসিয়া ফেলেছে হের পৃথিবীরে আজ,
কোন্ পথে রক্ষা পাবে মানব-সমাজ
সে পথ দেখায়ে দাও নিয়ে চল সাথে—
দুর্ব্বলের নিবেদন বেদনাশ্রুপাতে।

মহাত্মা—

মুক্তি চাহ? শক্তি আগে করহ সঞ্চয়
দুঃখ সহিবার তরে; জানিয়ো নিশ্চয়
হিংসা দ্বেষ ঘৃণা দিয়ে মুক্তি কভু নয়,
মুক্তি শুধু প্রেম দিয়ে, প্রেমেতেই জয়
করিতে হইবে আজি শত্রুরে তোমার;
ক্ষমা দিয়ে সর্ব্বচিত্ত কর অধিকার,
চিন্তায় কর্ম্মে ও বাক্যে হও শান্ত ধীর,
অসূয়া কোরো না কভু; প্রকৃত যে বীর
সে কি কভু ডরে সয়তানেরে? সত্যপথে
যারা থাকে তারা জয়ী হয় এ জগতে:—
আর কি কহিব আমি—কি কহিতে পারি?
আমি যে তোদেরই মত ফেলি অশ্রুবারি
দুঃখে শোকে অত্যাচারে—আমি ভিন্ন নই,
আমি যে তোদেরই মত সমদুঃখী হই;
সর্ব্ব দুঃখ হবে দূর—পাবে পরিত্রাণ,
স্থির জেনো দুর্ব্বলের আছে ভগবান।

"যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ"

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]   ২৬শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২।   [২৬শ সপ্তাহ

মদের দোকান

সদাশয় গভর্ণমেণ্ট

"একদফা মদ বেচে লাভ
—আর এক দফা মাতালের
জরিমানা করে লাভ।"

অমৃতলাল

পয়সা দেও—মদ খাও
কোন আপত্তি নাই।

—মদ খাওয়া বে আইনী নয়।
।কন্তু বাবা মাতাল হয়ো না

মাতাল হয়েছ কি গারদে ঢুকেছ—শান্তিরক্ষা ত চাই।

শান্তি রক্ষার জের—স্ত্রী পুত্র পথে বসিল।
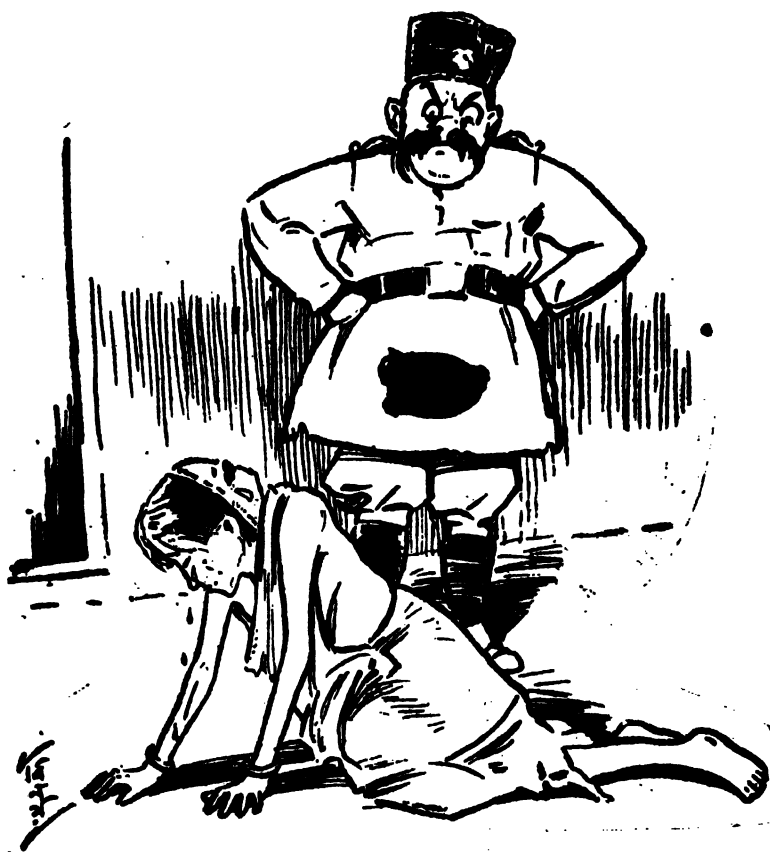
কিন্তু পথে বসাও বে আইনী —

কোম্পানীর ফুটপথ ভিখিরীর জন্য নয়

আর পেটের দায়ে চুরী এই বয়সে যে করতে পারে
সে ত ডাকু!
শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষক তাকেও ত ছাড়তে পারেন না।

পথের সন্ধান

[শ্রীপ্রিয়নাথ বসু]

বিষ্ণুপুরের কুমুদ ভট্‌চায্যি যে কেবল টাকার কুমীর ছিল বলিয়াই সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলিত তাহা নহে, তাহার অত্যাচার অনাচারেরও সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহার এক কথায় নাকি শূদ্র ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইত না। তাহার ক্রোধ হইতে রেহাই পাইবার জন্য গ্রামের কত লোকে যে কত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে তাহারা আদি অন্ত নাই; কিন্তু তাহার সেই নিদারুণ ক্রোধ বহ্নি হইতে গোকুল বৈরাগী যে আশ্চর্য্য উপায়ে অব্যাহতি পাইয়াছিল সে কথা বিষ্ণুপুরের লোক এখনো ভুলিতে পারে নাই, বোধ করিবাসহজে পারিবেও না।

প্রায় বছর তিনেক আগেকার কথা, গোকুল তখন মাস দুই ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া একেবারে অচল হইয়া পড়ে, পথ্যাদি পর্য্যন্ত চলিবারও আর কোন পথ থাকে না; তখন সে তাহার বোষ্টমী বিনদাকে পার্শ্বে ডাকিয়া বলে, বিন্দী, যা, আরতো কোন উপায়ই দেখছিনে, তুই না হয় একা গিয়েই দু'দিন ভিক্ষে করে আয়; আমি অসুস্থ আমার খাবারের ভাবনা নেই, তুই সুস্থ শরীরে শেষে কি না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ব্বি ?

বিনদা গোকুলকে ভালবাসিত। বিনদার যখন দশবছর মাত্র বয়স, তখন গোকুল বৈরাগীর সঙ্গে তার কণ্ঠী বদল হয়। গোকুলের বয়স তখন ষোল বছর ছিল। বিনদার কণ্ঠি বদলের পরের বছরই তাহার পিতামাতা উভয়েই স্বর্গগত হন। গোকুলেরও এক বৃদ্ধা মাতা ছাড়া আর কেউ ছিল না; গোকুল সেই হইতেই এই অসহায়া বালিকাকে নিবিড় স্নেহে আপনার বাহুবন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহার পর আজ পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে, দিনেকের তরেও উভয়ে ছাড়াছাড়ি হয় নাই। একে অপরের সুখে দুঃখে সমভাবে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। উভয়ের ভিক্ষার্জ্জিত অর্থে সামান্য কিছু জায়গা জমী এই কুমুদ ভট চায্যিরই নিকট হইতে প্রজাসত্ত্বে লইয়া বসবাস করিতেছে। ভিক্ষা করিয়া সামান্য কিছু কাজ কর্ম্ম করিয়া সংসার বেশ সুখেই চলিয়া আসিয়াছে; পুঁজিপাটা এমন কিছু জমে নাই যাহাতে দুই চারি মাস উপার্জ্জন না করিলেও চলিতে পারে। তাই গোকুলের দীর্ঘ অসুস্থতায় সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিবার যোগাড় হইয়াছে। বিনদা একা কোনদিন বাটীর বাহির হয় নাই; বিশেষত অসুস্থ গোকুলকে রাখিয়া সে বাহিরে থাকিতে পারে না, থাকিতে চাহেও না। প্রায় দুই মাস কাজকর্ম্ম না করিয়া এখানে ওখানে চাহিয়া চিন্তিয়া চলিয়াছে, আর বুঝি চলে না। চিন্তায় গোকুল অস্থির হইয়া উঠিল। সে তাহার নিজের জন্য বড় একটা ভাবে না, অসুস্থ শরীরে একভাবে শুইয়া থাকা চলে, কিন্তু সুস্থ শরীরে প্রায় এক প্রকার অর্দ্ধাহারে থাকিয়া বিনদার শরীরের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া গোকুলের প্রাণ আজ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিনদার দিক হইতে কোন জবাব না পাইয়া গোকুল আবার কহিল, বিন্দী আমার সঙ্গে সঙ্গে কি তোরও ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পেল নাকিরে, তোর এ দুর্দ্দশা যে আমি আর দেখতে পারিনে। একটু থামিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া কহিল, বিন্দী, না হয় এক কাজ কর, না হয় সেই রূপার গোঁটছড়াটাই বাঁধা দিয়ে দাদাঠাকুরের কাছে থেকে যা হয় নিয়ে আয়গে।—

এই গোঁট ছড়াটী আরো দুই তিন দিন আগেই বাঁধা রাখিবার জন্য বিনদা অনেক করিয়া কহিয়াছিল, কিন্তু গোকুল রাজী হয় নাই। সে কত কষ্ট করিয়া দুই চার আনা করিয়া জমাইয়া নগদ ষোলটী টাকা দিয়া ঐ গোঁটছড়াটী তৈরী করিয়াছিল, পেটের দায়ে যে তাহার অসীম স্নেহের সেই দান হাতছাড়া হইয়া যাইবে এ কথা গোকুল ভাবিতেই পারে নাই। এত দীর্ঘ দিনে সে শত চেষ্টা করিয়াও সে যে তাহার বিন্দীকে ঐ গোঁটছড়াটী ছাড়া আর একখানি

গহনাও দিতে পারে নাই। ঐ গোঁটছড়াটী যেদিন সে তৈরী করাইয়া আনিয়া প্রথম বিনদার হাতে তুলিয়া দেয়, সেদিন বিনদার মুখ যে অসীম আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল; স্বামীর সেই প্রথম দান বিনদা সেদিন যেভাবে দুই হাতে তুলিয়া লইয়াছিল, আর সেই হাত দুইখানি আপনি উঠিয়া তাহার কপালে ঠেকিয়াছিল, সে দৃশ্য তো গোকুল আজও ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া আজ বিনদার বেদনাক্লান্ত মুখখানি না কি সকলের চেয়ে দুঃখের মূর্ত্তিতে তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাই সে অতি অনায়াসে গোঁট ছড়াটার কথা বিনদাকে বলিতে সাহসী হইল। বিনদার শুষ্ক মলিন মুখ দেখিয়া তাহার সকল প্রকার চিন্তা আজ বহুদূরে মিলাইয়া গেল। সে আর একটু জোর গলায় কহিল, যা না, বিন্দি, ওঠ্, বেলা কি হয় নি?

কত বড় প্রচণ্ড বেদনাকে বুকের ভিতরে ঠেলিয়া রাখিয়া যে গোকুল আজ এই প্রস্তাব করিতেছে বিনদা তাহা বুঝিল; ঐ গোঁট ছড়াটী হাতছাড়া করিতে যে তাহার চেয়ে গোকুলের দুঃখ সহস্র গুণে বেশী হইতেছে, তাহাও সে অতি অনায়াসেই বুঝিল। সে আরো কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, যাচ্ছি, কিন্তু দাদাঠাকুরের কাছে না গেলে কি আর কোথাও পাওয়া যাবে না?

গোকুল বিনদার কথার ইঙ্গিতটা তলাইয়া না দেখিয়াই কহিল, কেন তার কাছে যেতে লজ্জা কিরে; তিনি আমাদের মুনিব তিনি না বাঁচালে কি আর কেউ আমাদের বাঁচাবে রে? তত টাকা তো এ অঞ্চলে আর কারো ঘরে নেই যে গেলেই দু' পাঁচ টাকা দিয়ে দেবে। তুই যা বিন্দি, আর দেরী করিস নি।—

বিনদা অগত্যা গোঁট ছড়াটী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। দু'খানা বাড়ীর পরেই দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণরাজ কুমুদ ভট্‌চায্যির বাড়ী। শত শত দীন দুঃখীর মুখের গ্রাসে পরিপুষ্ট বিশাল অট্টালিকা। বিনদা সভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একজন বিধবা যুবতীকে প্রশ্ন করায় সে দেখাইয়া দিল, পাশের ঘরেই কুমুদ ভট্‌চায্যি বসিয়া আছে। বিনদা একটু অগ্রসর হইয়া, বার দুই ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, দাদাঠাকুর!—

ভট্‌চায্যি বিনদাকে ইতিপূর্ব্বে আরো কয়েক বার দেখিয়াছে, নানা ছলে নানা কথায় তাহার কথা শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার অনাবৃত মুখ দেখিবার অথবা তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার সুযোগ তাহার ঘটে নাই। বিনদা বোষ্টমী হইলেও লাজলজ্জা সঙ্কোচ সবই তাহার যথেষ্ট ছিল। পর পুরুষের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথাবার্ত্তা বলা বিনদার জীবনে এই বোধ করি বা প্রথম। ভট্‌চায্যি বাহিরে আসিয়া কহিল, কিরে বিন্দী?

হাঁ আমি দাদাঠাকুর। বড় বিপদে পড়ে এসেছি।— বলিয়া মুখ ফিরাইয়া অশ্রু চাপিতে লাগিল।

ভট্‌চায্যি নারীর অনাবৃত মুখের এরূপ করুণ ভঙ্গীমা আর কখনো দেখে নাই। পরস্পরের মুখে সে শুধু বিন্দী বোষ্টমীর রূপের কাহিনীই শুনিয়া আসিয়াছিল, এরূপ মুখোমুখি দেখিবার অবসর তাহার কখনো ঘটে নাই। আজ সেই অসীম রূপসম্ভার তাহার সম্মুখে প্রদীপ্ত হইয়া তাহার দৃষ্টিকে যেন ঠিকরাইয়া দিল। সে অতিশয় বিস্মিত হইয়া মনে মনেই কহিল, হাঁ রূপ বটে; ছোটলোকের ঘরে এমন চেহারা—আশ্চর্য্য!— একটুক্ষণ পরে নিজের দীর্ঘশ্বাসে চমক ভাঙ্গিলে সে কহিল, হ্যাঁরে বিন্দী গোকুলের অসুখ কি বেশী হয়েছে?

বিনদা এবার আর কান্না চাপিতে পারিল না। ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, তুমি যদি না বাঁচাও, তবে এবার সব যায়। আজ দু'মাস তাঁর জ্বর ছাড়ে নি। একভাবে বিছানায় পড়ে আছে, পথ্য দেবার পয়সাটাও ঘরে নেই।—

ভট্‌চায্যি সহসা একগাল হাসি হাসিয়া সুদীর্ঘ শিখা নাড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া গোটা দুই হাই তুলিয়া কহিল, এরই জন্যে তোর এত ভাবনা বিন্দী। ঘরে পয়সা নেই, পথ্য চলচে না একথা তুই আমাকে আজ বললি! দু'মাস হ'ল বিছানায় পড়ে রয়েচে! টাকার জন্য কুমুদ ভট্‌চায্যির প্রজার পথ্য চলবে না, চিকিচ্ছে হচ্ছে না! এ কথা শুনলেও যে দশ গাঁয়ের লোক হাসবে রে! এরই জন্যে তোর এত ভাবনা! তা ভাবনা একটু হয় বৈকি।

ভট্‌চায্যির এই অতি সহানুভূতিসূচক কথা শুনিয়া

বিনদা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, তাই দাদাঠাকুর আমাকে তিনি বললেন, যা বিন্দী গোঁট ছড়াটা নিয়ে যা, তোর দাদাঠাকুর আমাদের মুনিব, তাঁর পায়ে গিয়ে পড়গে, সারা গাঁয়ের লোকে না দিলেও তিনি না দিয়ে পার্ব্বেন না।— এই বলিয়া কাপড়ের আঁচল হইতে গোঁটছড়া বাহির করিয়া দেখাইল।

ভট্‌চাযি্য লজ্জায় জিভ্‌ কাটিয়া কহিল, ছিঃ বিন্দী, তোরা কি এখনো আমাকে চিন্তে পার্লি নে! তোদের দু'টো পাঁচটা টাকা বিপদে আপদে দেব তাও একটা জিনিষ বাঁধা রেখে! এতটুকু দয়াও কি আমার নেই! টাকা নিয়ে আমার কি হবে বল তো? স্ত্রী নেই, পুত্র-কন্যা নেই, দশজনের কল্যাণে টাকা পয়সারও অভাব নেই, আর ক'দিনই বা বাঁচব, তোদের একটা উপকার কর্ব্ব এর জন্যে আবার বাঁধা বাঁধিরই বা দরকার কি রে!—

নিজেদের কার্য্যের জন্য অসীম লজ্জা ও সঙ্কোচে বিনদা মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের দাদাঠাকুর যে এইরূপ দশ বিশ ছড়া গোঁটকেও অতি তুচ্ছ মনে করেন, বিনদা তাহা বুঝিতে পারিল; কিন্তু কোন জিনিষ বাঁধা না রাখিয়া কুমুদ ভট্‌চাযি্য যে একটী পয়সাও কাহাকে দিয়াছে এরূপ কথা তো সে ইতিপূর্ব্বে শুনে নাই! আজ সহসা এই ব্যবহার বিনদার প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল, কিন্তু স্বামীর রোগকাতর মুখ খানির কথা মনে পড়ায় সে তো চলিয়া আসিতেও পারিল না।

কুমুদ ভট্‌চাযি্য কহিল, আয় বিন্দী, আয় টাকা ক'টা নিয়ে যা—বলিয়া খড়ম ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে ভিতরের একটা ঘরের দিকে চলিল। বিনদা যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কহিল, আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, নিয়ে যা। আমি আর অত হাঁটাহাঁটি কর্ত্তে পারি নে, আমার কি আর সে দিন আছে রে। তোর ঠাকুরমা যখন বেঁচে ছিলেন, আহা সে যে কি কষ্ট, বিন্দী সে তোরা কল্পনাও কর্ত্তে পার্ব্বি নে। তবু তোর মত একটা নাতনী পেলে সব দিক ঠিকঠাক করে রাখতে পার্ত্তু। তা-ই বা পাই কোথায়। টাকা দিয়েও তো মনের মত লোক পাওয়া যায় না। আয়রে, ওকি, ভয় পাচ্ছিস নাকি রে!

বিনদা কহিল, টাকা ক'টা এইখানেই পাঠিয়ে দাও না দাদাঠাকুর। আমি ছোট জাত, তোমাদের ঘরে ঢুকব কি করে?

কুমুদ বিরক্ত হইয়া কহিল, এই জন্যেই তোদের ছোট জাত বলেরে বিন্দী। সুখে থাকৃতে তোদের ভূতে কিলোয়। তবে এসেছিস কেন, মিছিমিছি আমাকে বিরক্ত কর্ত্তে, যা ঘরে গিয়ে সোয়ামীর কাছে বসে কাঁদগে। টাকা দিতে চাইলুম তা' আবার এখানে নিয়ে আসতে হবে।

বিনদা হতভম্বের মত হা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক অপ্রত্যাশিত আতঙ্কে তখন তাহার দেহমন অভিভূত হইয়া আসিল। সে না পারিল কথা কহিতে, না পারিল এক পা নড়িতে।

কুমুদ সহসা বিনদার হাত ধরিয়া টান দিয়া কহিল, আয়না লক্ষীটী, ভয় কিরে, আমি বামুন হয়ে তোর হাত ধরছি, বিন্দী কথা শোন।

বিনদা জোর করিয়া হাত ছাড়াইতে চাহিল, পারিল না। ভয়ে সঙ্কোচে তাহার আপাদ মস্তক শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। সে একপ্রকার টলিতে টলিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। কুমুদ মিনতি করিয়া কহিল, চল না বিন্দী একবারটী চ'ল তোর যত টাকার দরকার আমি দেব, আমার কথা শোন।

অসহনীয় সঙ্কোচে, আসন্ন অত্যাচারের নগ্ন কদর্য্যতার ভয়ে বিনদার নারীপ্রকৃতি মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইল। সে সবলে এক টান মারিয়া নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দাদাঠাকুর এই তোমার কাজ। আমরা ছোটজাত, আমরা ভিখারি, তাই বলে মনে করোনা যে তোমার এই অন্যায় ভগবান দেখবেন না। হও না তুমি বামুন, আমি স্ত্রীলোক, তোমাকে শাপ দিচ্ছি, যদি ভগবান থাকেন তোমারো এর সাজা পেতে হবে। হে ভগবান তুমি এর বিচার করো। বলিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

পাশেই যে বিধবা এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, সে কহিল, একি সুরো বামনিকে পেয়েছিস ভট্‌চাযি্য যে দু'টো টাকার লোভ দেখিয়ে তার সর্ব্বনাশ কর্ব্বি। ওরা বোষ্টমী হলেও মানুষ বুঝলি?

কুমুদ ক্রোধে ধিক্কারে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, চুপ কর নচ্ছার বেশ্যা মাগী।

সুরবালা সহসা অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদখানার মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, কি আমি নচ্ছার, আমি বেশ্যা, আর তুই ভট্‌চায্যি তুই বড় ভাল লোক। তুই আমার কি না করেছিস্? তুই তো আমাকে বেশ্যা করেছিস রে! কুলীনের ঘরের মেয়ে সুরো বামনিকে কে না চেনে? বলব রে হারামজাদা, সব কথা খুলে বলব? ক'টা শিশুর সর্ব্বনাশ তুই করেছিস?

কুমুদ সহসা জিভ কাটিয়া চমকিয়া উঠিল! সাপের মাথায় ওষুধ পড়িলে সে যেমন একনিমিষে উদ্যতফণা নামাইয়া পলাইতে পথ পায় না, ভ্রূণহত্যা মহাপাতকের কঙ্কালসার ছবি সহসা যেন তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। যে পাপ এতদিন অতি গোপনে সংসারে সকলের চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া দিবানিশি তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল, আজ একনিমিষে তাহা যেন প্রকাশ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিষাক্ত দংশনে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। সে তাড়াতাড়ি সুর নরম করিয়া কহিল, তুই থামনা সুরো, তুই কি আর ঝগড়া কর্ব্বার সময় পেলিনে?

এতদিন বিধবা সুরবালার নারীদেহে যে উৎপীড়িত মুমূর্ষু নারী প্রকৃতি অত্যাচারের যাতনায় মাথা খুঁড়িয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, আজ সহসা এই বিন্দী বোষ্টমীর অবস্থা দেখিয়া তাহা যেন সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল। এমনি করিয়াই তো ভট্‌চায্যি একদিন তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়াছিল, আজ আবার ঠিক সেই একই ভাবে আর একজন নিরপরাধিনীকে সেই পঙ্কে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার চক্ষের সম্মুখে তাহার জীবনের সেই গর্ব্বিতা নারী প্রকৃতি, সেই পবিত্রতার দম্ভ, সেই পতি-পরায়ণতা ঠিক এই বিনদারই মত উচু করিয়া দাঁড়াইল। আর মনে পড়িল, এই ঘৃণ্য দুর্ব্বহ জীবনের হীন- বৃত্তি, ঘৃণ্য কদর্য্যতা। আজ ঐ ছোট জাতের বধূকে দেখিয়া, স্বামীর অসুস্থতার জন্ম তাহার মাথা বার বার হেঁট হইয়া পড়িতে লাগিল। সে ভট্‌চায্যির কথায় কান দিল না, কহিল, ভট্‌চায্যি নরকেও বুঝি তোর স্থান নেই। একটা ছোট জাতের মেয়ে এসেছে বিপদে পড়ে দু'টো টাকা ধার নিতে তার ওপরও এই ব্যবহার। ও যে তোর মেয়ের মত রে। তুই আমার যে সর্ব্বনাশ করেছিস ভট্‌চায্যি জন্ম জন্ম যেন তারই ফল তোকে ভোগ কর্ত্তে হয়। আমি মা, আমাকে দিয়ে গর্ভের সন্তান বধ করিয়েছিস্। উঃ, হে ধর্ম্মঠাকুর, তোমার রাজ্যে কি বিচার নাই, তুমি তো সব দেখছো, তুমিই এর বিচার করো—বলিয়া দুই হাত উঁচু করিয়া অত্যন্ত আকুলতার সঙ্গে কাহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিল, তারপর বিনদার হাত ধরিয়া কহিল, চল বিন্দী চল, আমি তোকে রেখে আসি।—বলিয়া বিনদার হাত ধরিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

প্রচণ্ড আঘাতে আহত হইয়া হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন করিয়া টলিতে টলিতে কোন প্রকারে আপনার বিবরে যাইয়া আশ্রয় লয়, বিনদা ও সুরবালার আঘাতে আহত হইয়া ভট্‌চায্যিও কোন প্রকারে গিয়া আপনার ঘরে ঢুকিল। আজ এ কি হইল। আজীবন পাষণ্ড, এক আকস্মিক ঘটনার আঘাতে তাহার চিত্তে এ কি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া তাহার আজীবনের সংস্কারকে পর্য্যন্ত ওলোট পালট করিয়া দিয়া চলিয়া গেল! কুমুদ সেই যে ঘরে ঢুকিল সারা দিনমান কাটিয়া গেল দরজা খুলিল না। সে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া তাহার আজীবন সঞ্চিত পাপপুণ্যের বোঝাপড়া করিবার জন্ম হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিল। সে বহুদিন শুনিয়া আসিয়াছে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম মহাপাপ, ভ্রূণহত্যা মহাপাপ, রমণীর উপর অত্যাচার করা মহাপাপ, কিন্তু লালসার তাড়নায় ও অর্থের প্রাচুর্য্যে কোনদিনই সে সব গ্রাহ্য করে নাই। নিজের হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তি ও অপ্রতিহত সাংসারিক ক্ষমতাকে আশ্রয় করিয়া কত নারীর নারীত্বকে নিজের পায়ের তলায় মাড়াইয়া ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে, কত সন্তানের মুখে বিষের পাত্র ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু নারী যে এমন ভাবে ভগবানের সম্মুখে আপনার রুদ্ধদুয়ার এমন নির্লজ্জভাবে খুলিয়া ধরিতে পারে, নিজের কলঙ্কের কাহিনী অসীম ব্যথা ও বেদনা ভরে নিজের মুখে মুক্তকণ্ঠে সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ ভগবানকে সাক্ষী করিয়া এমন নির্ভরতার সঙ্গে অন্তরাত্মার নিগূঢ় মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিতে পারে তাহা ভট্‌চায্যি এই প্রথম দেখিল। তাহার জীবনের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত

ঘটনা তাহার চক্ষের সম্মুখে একে একে ছায়াবাজির মত রেখাপাত করিয়া যাইতে লাগিল। দুইদিন আগে শত প্রকার অত্যাচার করিয়াও সে কত অনায়াসেই না বাহিরের লোকের সম্মুখে নিতান্ত নির্লজ্জের মত চলাফেরা করিত আর আজ তাহার মনে হইতেছে, কি করিয়া সে কাল লোকের সম্মুখে মুখ দেখাইবে। কোন মুখে কাল আবার ঐ বিন্দী ও সুরবালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে। এ দুর্ঘটনা এ গ্রামের সকলেই এতক্ষণ জানিয়াছে, কি ভাবে সে কাল প্রভাতে সেই শত সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আপনার জীবন ধারার পথে অশংসয়ে চলিয়া যাইবে। আজিকার এই নির্লজ্জ ঘটনা যেন তাহার অন্তরের অন্তরে সূচের মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের শিখার মত জড়াইয়া ধরিল। তাহার গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে এই কয়টা বছর জীবনের উপর দিয়া কি নির্ম্মম অত্যাচারই না সে করিয়াছে! বিবেকের গলা টিপিয়া ধরিয়া এতদিন সে যাহা করিয়াছে, আজ তাহা ভাবিতেও তাহার আতঙ্ক হয়। আজ এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া সেই মুমূর্ষু বিবেক রহিয়া রহিয়া যে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, সংসারের শত কর্ম্মের আড়ম্বরেওতো আর তাহা ঢাকিয়া রাখিবার কোন পথই অবশিষ্ট নাই। ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে বিষ সে পান করিয়াছে তাহা উদ্গারণ করিয়া ফেলিবার আর কোন পথই তো আজ তাহার নাই। আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার কোন উপায়ইতো আজ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। দুঃখে বেদনায় ধিক্কারে তাঁহার প্রাণ যেন আজ বাহির হইয়া আসিতেছে।

সমস্ত দিনমান কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর সে ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুলিয়া কি কি সব জিনিষ পত্র সঙ্গে লইল। বাড়ীর গোমস্তাকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কি সব বুঝাইয়া বলিল। সুরবালাকে ডাকিয়া কি কহিয়া গেল। সুরবালা গলায় আঁচল দিয়া গড় হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল। তার পর ভট্‌চায্যি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সঙ্কোচে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে সে গোকুলের ঘরের পাশে আসিয়া ডাকিল, গোকুল—

গোকুল চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। এতক্ষণ ধরিয়া সে যাহা চিন্তা করিতেছিল সত্য সত্যই বুঝি তাহাই ঘটে। হাত হইতে শিকার ছুটিয়া আসিয়াছে, ভট্‌চায্যি তাই রাত্রির অন্ধকারে তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্ম আসিয়াছে। ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল। আরতো রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। এই মুহূর্ত্তেই ঐ অনাচারী তাহার বিন্দীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। বিনদা পাশেই নিদ্রা যাইতেছিল, সে তাহাকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

ভট্‌চায্যি আবার ডাকিল, গোকুল। এবার গোকুল বহুকষ্টে গলার ভারটাকে ঠেলিয়া নামাইয়া কহিল, কে, দাদাঠাকুর, কেন?

সাড়া পাইয়া ভট্‌চায্যি অগ্রসর হইয়া কহিল, এখন কেমন আছিস রে বাপ? হেটে ষ্টেশনে যেতে পার্ব্বিনে। গাড়ীর যে আর সময় নেই। আমার বিনদা মা কৈরে? আর কোন ভয় নেইরে, ভয় নেই, চেয়ে দেখ আজ আমি সত্যই তোদের দাদাঠাকুর। চল ভাই আমার সঙ্গে তোদেরও কাশী যেতে হবে।

ভট্‌চায্যির গলার স্বরের অসম্ভব পরিবর্ত্তনে গোকুলের ভয় যেন আপনা আপনি চলিয়া গেল! যে ঐরূপ মিনতি করিয়া কথা কহিতে পারে সে অত্যাচারী হইতে পারে না। আর বিনদাকে যখন 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে তখনতো শঙ্কা করিবার কিছুই নাই। গোকুল নিজে উঠিল, বিনদাকে উঠাইয়া তাহার কাঁধে ভর দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে যে আলো ছিল তাহারই ক্ষীণ আলোতে গোকুল দেখিল, মহামারীর নিস্পেষণ সংসারের সকল আত্মীয় বন্ধু, পুত্রকন্যাকে চিরবিদায় দিয়া রিক্ত গৃহস্বামীর মুখের উপর যে সহজ বেদনার ছায়া পড়ে, সংসারের কাহারো দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, ভট্‌চায্যির মুখখানি তাহারই মত দেখাইতেছে। তাহার পা খালি। গলায় একখানি চাদর হাতে টাকার একটা তোড়া। বিনদা ও গোকুল সেই অনুতাপবিদগ্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি এই গাড়ীতেই কাশী যাচ্ছি। তোদেরও যেতে হবে অভাবে যে তোদের বড় কষ্ট হচ্ছে। এ গ্রামে আর আমি বাস কর্ব্বনা। এখানকার কাউকে আর আমি মুখ দেখাতে পার্চ্ছিনা। গোকুল আমার কথা শোন। আজ আমি

পথের সন্ধান পেয়েছি আজ আর আমায় বাধা দিসনে। চল ভাই। চল মা বিনদা। এখনো কি তোমার ছেলেকে ক্ষমা কর্ত্তে পারনি মা।

বিনদা কহিল, চল যাই।—বলিয়া সামান্য দুই একটা জিনিষ পত্র লইয়া ঘরে তালাবন্ধ করিয়া তাহারা তিনজনে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ীর জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় এক জন স্ত্রীলোক আপাদ মস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া কাহাকে যেন অনুসন্ধান করিতেছিল তাহাদের দেখিয়া কহিল, দাদাঠাকুর আমিও আজ তোমার সঙ্গে যাব।

আনন্দে বিস্ময়ে ভট্‌চায্যির সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনাহূত অশ্রুর তরঙ্গ তাহার চক্ষু ছাপিয়া বহিতে লাগিল। একি পরিবর্ত্তন ? যে নারী দুই দিন আগে ঘৃণায় ইহার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতে চাহিত না, আজও যে ভগবানকে ডাকিয়া ইহারই বিপক্ষে নিদারুণ অভিযোগ করিতে ছাড়ে নাই। আজ সে কিসের সাহসে তাহারই কাছে অতি অনায়াসে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছে। ভট্‌চায্যি চক্ষু মুছিয়া কহিল, আমাকে কি ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বি সুরো ? আমি যে তোর—

সুরবালা বাধা দিয়া কহিল, থাক্ থাক্ ওসব পুরান কথা। যাও টিকেট করগে গাড়ীর আর দেরী নেই।—

সেই রাত্রিতে তাহারা চারিজন কাশী চলিয়া গেল।

বন্দিনী

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

অভিনয়ের সরঞ্জাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক দৃশ্যেই প্রথম অঙ্ক শেষ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাট্যবিনোদ অপরেশ চন্দ্র আর্ট থিয়েটার লিঃ প্রদত্ত আহার্য্য ভক্ষণে তাঁহার মত পটু বাঙ্গালা দেশে যে আর কেহই নাই তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আহার্য্য সংগ্রাহক স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা সুতরাং দৃশ্যপট দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে নাটকে তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন দৃশ্যপটে তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকে ১৯ পত্রে মুদ্রিত আছে "মিশরের সীমান্ত প্রদেশস্থ রাজপ্রাসাদ।" মিশরের সীমান্তে মিশর রাজের প্রাসাদ ছিল কিনা সে কথা বিচার করিতে গেলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হইবে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে মিশরের সীমান্ত নগর জালুতে মিশর রাজ প্রথম থুথমসিসের একটী প্রাসাদ ছিল। বিংশতি শতাব্দীর তৃতীয় অঙ্কে বিখ্যাত নাট্যকার নাট্যবিনোদ শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কল্পনা অনুসারে এই প্রাসাদের একটী কক্ষ নিম্নলিখিত রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল :—

কতকগুলি Papyrus মৃণাল গুচ্ছের আকারে কোদিত স্তম্ভের উপরে চিত্রিত ছাদ তাহার উপরে মিশর দেশের দেবতা আমনরার মুক্ত পক্ষ অঙ্কিত। রাজকুমারীর কক্ষে একটী আদত মিশর দেশীয় বীণা বা Either, দুই তিনখানি আসনের পৃষ্ঠে আমনরার পক্ষ অঙ্কিত। কক্ষের পশ্চাৎভাগে একটী ক্ষুদ্র নাট্যমঞ্চ। তাহার সম্মুখে কাঁচের পুঁতির পরদা, এ রঙ্গমঞ্চে চারি পাঁচটা অর্দ্ধ উলঙ্গ নর্ত্তকী নাচিতেছিল।

প্রথম কথা থুথমসিস যে সময়ের রাজা সে সময়ে মিশর দেশে Papyrus মৃণাল গুচ্ছের আকারের স্তম্ভ ব্যবহার হইত না; দ্বিতীয় কথা রাজনন্দিনীর শয়ন কক্ষে তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য দাস দাসী নাচিত বটে কিন্তু তাহার জন্য কখনও শয়ন কক্ষে নাট্যমঞ্চ নির্ম্মিত হইত না। শয়ন কক্ষে নাট্যমঞ্চ আনয়ন করিয়া নাট্যবিনোদ এবং তাঁহার সহকারী আহার্য্য সংগ্রাহক স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বাঙ্গালীর পেশাদার থিয়েটারের একমাত্র মূলমন্ত্র, "যেন তেন প্রকারেণ কিঞ্চিৎ পয়সা।" চোখে ধুলা দিয়া মিশরের ইতিহাসের চারি হাজার বৎসর হামামদিস্তায় পিষিয়া

তাহার সঙ্গে রাজপুত ও মোগলের ইতিহাসের ফোড়ন দিয়া কলা বিদ্যার নামে যে কুকুরের "রাতের" খাড়া করিব তাহা বাঙ্গালী চক্ষু বুজিয়া অমৃত সাগর জ্ঞানে গলাধঃকরণ করিবে এই দুইটী কলা বিদ্যা বিশারদ সেই চেষ্টায় আছেন। পরের দৃশ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই দৃশ্যে আর একটী বিসদৃশ ব্যপার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকুমারী 'আর্ভিয়ার সম্মুখে যে চারিটী দাসী নতজানু হইয়া থাকে তাহাদিগের পোষক আইসিস দেবীর মন্দিরের সেবিকা কুমারীদের ন্যায়। এই সমস্ত কুমারীরা মিশর দেশে দেবীরূপে পূজিত হইতেন—তাঁহারা কখনও রাজা বা রাজকুমারীদের সম্মুখে নতজানু হইতেন না, বিদ্যার এই অসম্ভব পরিণতি দেখিয়া আর্ট থিয়েটারের আহার্য্য সংগ্রাহক যুগলকে দু'খানি স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের First book কিনিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে।

তাহার পরের দৃশ্যেই নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্রের আর্টের আত্মশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ। অপরেশচন্দ্র মুদ্রিত পুস্তকে লিখিতেছেন, "জালু কেল্লা সম্মুখস্থ ময়দান।" জালু, মিশর ও সিরিয়া দেশের সীমান্ত নগর। সেটাকে এক বাগবাজার ব্যতীত আর কোন শক্তির জোরে ভারতবর্ষে টানিয়া আনা যায় না কিন্তু আহার্য্য সংগ্রাহক যুগল আর্টের জোরে এই জালু কেল্লার সম্মুখস্থ ময়দানকে একেবারে জয়পুর অথবা যোধপুরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ত্রেতার পরে long jump এর এমন বাহাদুরী আর দেখা যায় নাই কারণ দৃশ্যপট আঁকিবার সময় আহার্য্য সংগ্রাহক যুগল দেখাইয়াছেন রাজপুতের দুর্গ তাহার উপরে মোগলের মিশর। আমাদের দেশে নাট্যকলার যে রকম অবস্থা—বিদ্যারও সেই রকম। কিছুদিন পূর্ব্বে বন্দিনীর প্রতিকূল সমালোচনা লক্ষ্য করিয়া Forward পত্রে এক নাট্য ধুরন্ধর লিখিয়াছিলেন থিয়েটারে স্থাপত্য বিদ্যার সমালোচনার আবশ্যক কি? এই ধুরন্ধরটা নিজের পয়সা খরচ করিয়া আসিয়া বন্দিনীর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশুটী দেখিয়া যাইবেন কি?

নাহের একই পোষাকে এই দৃশ্যে আসিল কিন্তু আহার্য্য সংগ্রাহক নিজের পোষাকটী ভাল করিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পোষাকটী সত্য সত্যই সম্রান্ত মিশর দেশের ভদ্রলোকের মত হইয়াছিল। কেবল অলঙ্কারগুলি মখমলের উপরে ঝুটা জরি বসাইয়া তৈয়ারী করায় সামান্য একটু ক্রটী হইয়াছিল।

তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকলার চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একসঙ্গে কারণ ইহাতে ইতিহাস ভূগোল এবং নৃ-তত্ত্ব এক সঙ্গে মিশিয়া নাট্য বিনোদের জন্য দক্র হুতাশন তৈয়ারী করা হইয়াছে। নাট্যকলা, ইতিহাস ও সাহিত্যের নামে ইহার পূর্ব্বে পরমশ্রদ্ধাস্পদ নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্রের মত এত বড় মিথ্যাকথা আর কেহ বলিতে সাহস করে নাই এবং কলিকাতা সহরের অতি বড় ধড়িবাজ লোকও কখনও এতবড় ধাঁসায় ঠকে নাই। নাট্যবিনোদকে বাহাদুরী দিতে হয় কারণ তিনি এই প্রকাণ্ড মিথ্যাটা পঁচিশ রাত্রি চালাইয়া আসিতেছেন।

গ্রন্থকার নাট্যবিনোদ তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "তৃতীয় দৃশ্য, স্থান—জালু। উৎসব—মণ্ডপ।" দৃশ্যপট আঁকিবার সময়ে অধ্যক্ষ নাট্যবিনোদ দেখাইলেন খেজুর বনের মধ্যে একটী দুয়ার, তাহার দুই পার্শ্বে বসিবার বেদী। বাম দিকের বেদীতে তিনখানি কাষ্ঠাসন ও দক্ষিণ দিকের বেদীতে সারি সারি বসিবার বেঞ্চি। মুদ্রিত নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে মিশর রাজ থুথমসিস বিজয়ী সেনাপতি এ্যামসিসকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জালু নগরের দুয়ারে আসিয়া বসিয়া আছেন। এই স্থান হইতে সারি বাঁধিয়া মিথা আরম্ভ হইয়াছে :—

প্রথম মিথ্যাকথা—মিশরের কোনও রাজা কোনও কালে কোনও সেনাপতির অভ্যর্থনার জন্য নগরের দুয়ারে যান নাই।

দ্বিতীয় মিথ্যাকথা—মিতানি জাতির কোনও রাজা কখনও জালু নগর আক্রমণ করিতে ভরসা করে নাই। অথচ গ্রন্থকার নাট্যবিনোদ এই দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মুদ্রিত গ্রন্থের ৩৭ পাতায় সকলে সমস্বরে বল "সেনাপতির জয়! তিনিই মিতানীর আক্রমণ থেকে তোমাদের এই নগরী রক্ষা করেছেন।"

তৃতীয় মিথ্যাকথা—দৃশ্যপট—কারণ দৃশ্যপটে উৎসব মণ্ডপের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। একদিকে দেখা গেল তিনখানি চেয়ার আর একদিকে একটী গ্রীক Amphitheatreএর একটী নিকৃষ্ট নকল।

ছোটখাট মিথ্যাকথা অনেক আছে, যথা—

(১) মিশরের রাজকুমারী আর্ভিয়ার পিঠবস্ত্র বহিবার দুইটী ছোকরা চাকর ছিল কিন্তু আর্ভিয়ার পিতা মিশর রাজ থুথমসিসের পিঠবস্ত্র বহিবার লোক জুটে নাই।

(২) সেনাপতি এ্যামস যে বেশে প্রথম দৃশ্যে দেখা দিয়াছিলেন নাট্যবিনোদের কল্পিত মিতানি যুদ্ধের পরেও ঠিক সেই বেশে জালু নগরের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(৩) সিরিয়া দেশের বন্দীগুলি পূর্ব্ব বঙ্গের স্ত্রীলোকদের মত ফের্ত্তা দিয়া কাপড় পরিয়া আসিল। তাহাদের মাথায় পাগড়ী নাই, দাড়ির চুলগুলা ভারতবর্ষের মুসলমানদের মত। এই সকল বিষয়ে আর্ট থিয়েটারের আহার্য্য সংগ্রাহক নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র কি পরিমাণ মেকী চালাইয়াছেন তাহা বুঝাইবার জন্য একটু খুলিয়া লেখা উচিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে (অধুনা নিরুদ্দিষ্ট) বৈকালী, পত্রে নাট্যবিনোদ অপরেশ চন্দ্রের যে মোক্তার যে Masperoর দোহাই দিয়াছিলেন সেই Maspero নামক হতভাগ্য লেখকের মুদ্রিত গ্রন্থের ছবিগুলি দেখিয়াও যদি নাট্যবিনোদ বন্দিনীর সাজ পোষাক তৈয়ারী করাইতেন তাহা হইলেও বিশেষ দুঃখের কারণ থাকিত না, কিন্তু নাট্যবিনোদ এবং তাঁহার সহকারী ভক্তবিনোদ আর্টের দোহাই দিয়া বীর দর্পে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের আহার্য্য হজম করিয়াছেন সুতরাং দুই একটা সত্যকথা বলা আবশ্যক। Maspero নামক নির্ব্বোধ ঐতিহাসিকের, "The Struggle of the Nations" নামক মুদ্রিত গ্রন্থের ২৮৩ পাতায় কর সম্ভারবাহী সিরিয়াবাসীদের চিত্র আছে, ২৮৫ পৃষ্ঠায় কর স্বরূপ হস্তী ও ভল্লুক, গজদন্ত ও সুপাত্রবাহী দূতদিগের চিত্র আছে, ৩০০ পৃষ্ঠায় সিরিয়া নিবাসী বন্দীদিগের মিশর দেশের মন্দির নির্ম্মাণের চিত্র আছে।

এই গ্রন্থের আরও নানা স্থানে সিরিয়া বাসীর চিত্র আছে। গ্রন্থকার ও আর্ট থিয়েটারের অধিকারী বিনা আয়াসেই তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বন্দীদের মধ্যে একজনেরও সিরিয়া দেশের শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ী ছিল না। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার আর একবার ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। মুদ্রিত গ্রন্থের ৪১ পাতায় তিনি লিখিয়াছেন :—আপনারা জানেন, আমি অপুত্রক। এ্যামস্ মিশরের গর্ব্ব রক্ষা করে আমার পুত্রেরই কাজ করেছে। আমি সগর্ব্বে সানন্দে আমার একমাত্র কন্যাকে এ্যামসের করে সমর্পণ করছি।

বন্দিনীর সমালোচনার প্রথম দফায় দেখাইয়াছি যে মিশর দেশের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশে যে চারিজন থুথমসিসের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা কেহই অপুত্রক ছিলেন না সুতরাং নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র বা অপর কাহারও কোনও থুথমসিসের মুখ দিয়া একথা বলাইবার অধিকার নাই।

তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আবার সেই রাজপুত দুর্গ ও মোগল মিনার। তাবেজ ও নাহেরের পোষাকও পূর্ব্ববৎ।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গ্রন্থকার আবার আমাদিগকে মিশরের রাজকুমারী আর্ভিয়ার শয়ন কক্ষে লইয়া গেলেন। এই দৃশ্যে চতুষ্কোণ বেদিকার উপরে দুইটী দেবমূর্ত্তি দেখা গেল। পূর্ব্বের ন্যায় চিত্রিত ছাদ ছিল বটে কিন্তু এ ছাদের চিত্র অন্যরূপ। গ্রন্থকার বলিয়া দেন নাই যে এ কক্ষটী কোথায়, জালু দুর্গে অথবা মিশরের রাজধানী মেমফিসে; কিন্তু এই কক্ষেও পূর্ব্বের মত একটী ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ দেখা গেল।—তৃতীয় অঙ্কের এই দৃশ্যে এ্যামস্ ও রাজকুমারী আর্ভিয়ার অস্বাভাবিক প্রেমাভিনয়ের কথা পরে বলিব। এ্যামস্ এই দৃশ্যে শূন্য মস্তকে রাজমারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ্যামসের মত একজন ক্ষুদ্র সেনাপতি রাজকুমারীর প্রেমাস্পদ হইলেও তাঁহার শয়ন কক্ষে শূন্য মস্তকে প্রবেশ করিয়া প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইতেন। একথা অবশ্য গ্রন্থকার এবং আহার্য্য সংগ্রাহক কাহারও মস্তকে প্রবেশ করে নাই।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে গ্রন্থকরে মিশর দেশের দুর্গ কারাগারের বর্ণনা করিয়াছেন, কারাগারটী মিশর দেশের কোন দুর্গের তাহা অবশ্য তিনি বলিয়া দেন নাই। কিন্তু এই গ্রন্থকার আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ রূপে যে দৃশ্যপট আঁকাইয়াছেন তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এই গ্রীক অথবা রোমক স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মিশর দেশে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই রকম পাথরের বাড়ী তৈয়ারী হইত না।

ইয়াঙ্কিস্থানের নবীন নায়ক

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

(১)

আমেরিকার খবর ভারতে বেশী পৌঁছে না। ভারত-বাসীর পক্ষে মার্কিন দুনিয়ার আবহাওয়া বুঝিয়া ওঠা যারপর-নাই কঠিন। এমন কি ইয়োরোপেও নরনারীরা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ নেহাৎ কম রাখে। সে দেশের লোক-জনের গতিবিধি ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান বা অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান কাগজপত্রে অতি সংক্ষেপে অথবা কালে ভদ্রে আলোচিত হয় মাত্র। যে সকল ব্যক্তি অন্তর্জাতিক লেন-দেনে বিশেষজ্ঞ তাঁহারা ছাড়া ইয়োরোপে কেহ আমেরিকার ধার ধারে না।

তবে সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট-সেক্রেটারি ছিলেন শ্রীযুক্ত হুজেস। ইনি কাজে ইস্তাফা দিয়াছেন। এই ঘটনার ভিতর মার্কিন মুলুকের ভিতরকার কথা খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে বিদেশের স্বার্থও কিছু কিছু জড়িত আছে। এই উপলক্ষ্যে ইয়োরোপের নানা সংবাদপত্রে আমেরিকার কথা আলোচিত হইতেছে। ভারত সন্তানের পক্ষেও কথাগুলা জানিয়া রাখা মন্দ নয়।

(২)

প্রথম কথা এই যে,—যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-শাসন প্রণালী খানিকটা বিচিত্র। পররাষ্ট্র নীতির কথা ধরা যাউক। এই নীতির জন্য দায়িত্ব থাকে কাহার হাতে। খানিকটা গোটা দেশের প্রেসিডেন্টের হাতে। অপর অংশ সেনেটের হাতে।

সেনেট-সভাটা বিলাতী অথবা অন্য কোনো ইয়োরোপীয় পার্লামেন্টের মতন সার্ব্বজনিক দেশ-পরিষৎ নয়। যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রদেশ বা রাষ্ট্র দুইজন করিয়া প্রতিনিধি সেনেটে পাঠাইবার অধিকারী। সার্ব্বজনিক দেশ-পরিষদের নাম "রেপ্রেজেন্টেটিস" বা প্রতিনিধি সভা। এই সভার হাতে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কোনো এক্তিয়ার নাই।

সেনেটের নানা বিভাগ। এক বিভাগ পররাষ্ট্র নীতির তদবির করিয়া থাকে। এই বিভাগের একজন অধ্যক্ষ থাকেন। সেই অধ্যক্ষ আর গোটা দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট এই দুইজনে মিলিয়া বিদেশের সঙ্গে লেনদেন বিষয়ক কাজকর্ম্ম চালাইয়া থাকেন।

এদিকে প্রেসিডেন্টের অফিস নানা বিভাগে বিভক্ত। এক এক বিভাগের উপর এক একজন অধ্যক্ষ। তাঁহাদিগকে বলে ষ্টেট-সেক্রেটারি। পররাষ্ট্র বিভাগের জন্যও একজন ষ্টেট-সেক্রেটারি বাহাল হয়। শ্রীযুক্ত হুজেস এইরূপ সেক্রেটারিই ছিল।

দেখা যাইতেছে যে,—ইয়াঙ্কিস্থানের পররাষ্ট্র-নীতি প্রকৃত পক্ষে তিনজন লোকের তাঁবে। প্রথমতঃ প্রেসিডেন্ট, দ্বিতীয়তঃ সেনেটের অন্যতম অধ্যক্ষ, তৃতীয়তঃ ষ্টেট-সেক্রেটারি। বিলাতে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে অথবা ইতালিতে এইরূপ গণ্ডগোল নাই। একজন লোকের,—পররাষ্ট্র-সচিবের নাম জানা থাকিলেই বিদেশীরা যাহা কিছু বুঝিবার বুঝিয়া লইতে পারে। এক চেম্বার, এক এরিয়ো, এক ষ্ট্রেজেমান বা এক মুসোলিনি এই সকল দেশে সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু এই ধরণের ক্ষমতাওয়ালা লোকের ঠাঁই ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্রের শাসন নীতিতে রাখা হয় নাই। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি যে কি তাহা অনেক স্থলেই বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নয়।

(৩)

সেনেটার লজ ছিলেন অনেকদিন সেনেটের পররাষ্ট্র-বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই পদে বসিয়াছেন ইবাহো প্রদেশের সেনেটার শ্রীযুক্ত বোরা। হুজেসের সঙ্গে বোরার কোনো বিষয়েই বনিবনাও নাই। মার্কিন সমাজের নরনারী অনেকদিন হইতেই জানে যে, হুজেসে আর বোরায়

সম্বন্ধ ঠিক "আদায় আর কাঁচকলায়" হুজেসের প্রত্যেক মতের বিপক্ষেই বোরা সঙীন খাড়া করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত।

হুজেস একজন কট্টর "কন্‌জার্ভেটিভ" অর্থাৎ সনাতন পন্থী স্থিতিশীল জননায়ক। লর্ড কার্জন, গ্রে, বাল্‌ডুইন ইত্যাদি বিলাতী রাষ্ট্রবীরেরা যে জাতের লোক হুজেস সেই জাতেরই একজন। বোলশেভিক রুশিয়ার যম হিসাবে হুজেস ইয়াঙ্কি সমাজের অন্যতম পাণ্ডা। ইনি দক্ষিণ আমেরিকায় ইয়াঙ্কির রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার করিবার আন্দোলনে মাথা ঘামাইয়া থাকেন। ইয়োরোপের কাণ্ডকারখানায় নাক গুঁজিবার দিকেও হুজেসের ঝোঁক আছে।

আর বোরা? ইনি হইতেছেন অতিমাত্রায় "আধুনিক" বা নবীন পন্থী। সহজে এই মতের লোককে বলে "র‍্যাডিক্যাল।" যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়ায় আজকাল সব সে "চরমপন্থী" রাষ্ট্রনায়ক হইতেছেন হ্বিস্‌কন্‌সিন প্রদেশের সেনেটার লাফোলেট্। এই লাফোলেটের সঙ্গে বোরার বন্ধুত্ব অগাধ। দুই জনে "এক গেলাসের ইয়ার।" লাফোলেটকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কায়েম করিবার জন্য বোরা অনেক কিছু করিয়াছিলেন। অবশ্য মতলব হাঁসিল হয় নাই।

লাফোলেট্ শান্তিপন্থী যুদ্ধ-বিরোধী লোক। বোরাও তাই। যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে বিলাত ও ফ্রান্সের মতন "ইম্পিরিয়ালিষ্ট" বা সাম্রাজ্যবাদী হইয়া না পড়ে সেদিকে ইহাদের নজর খুব বেশী। এই কারণে ফিলিপিন দ্বীপের লোকেরা বোরাকে স্বাধীনতার সুহৃৎ বিবেচনা করিয়া থাকে।

বোরার বিবেচনায় ভার্সাইয়ের সন্ধিতে মানবজাতির অশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। যেখানে সেখানে বক্তৃতার আসরে বোরার বাণী নিম্নরূপ—"ভার্সাইয়ের সন্ধি রদ করাইবার জন্য আমি প্রাণ পাত করিতে রাজি আছি।" বোরা জেনেহ্বার "লীগ্ অব নেশুন্‌স্" বা বিশ্বরাষ্ট্রপরিষৎকে সাম্রাজ্যদ্রোহী মানবশত্রুদের একটা যন্ত্র বিবেচনা করিয়া থাকেন। কাজেই ইয়োরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে যুক্তরাজ্যকে আল্‌গা করিয়া রাখা বোরার মর্ম্মকথা।

তাহার উপর, বোরা চাহেন সোহ্বিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের হামদর্দ্দি। কেবল হামদর্দ্দি মাত্র নয়,—মাখামাখি এবং পুরাদস্তুর লেনদেন ও কর্ম্ম-বিনিময়।

(৪)

এই আবহাওয়ায় হুজেসের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া হুজেস পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৯২৮ সালে যখন প্রেসিডেণ্ট বাছাই হইবে তখন যাহাতে তাঁহার নামে বেশী ভোটে জুটে এখন হইতে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছেন। হুজেস নামজাদা লোক,—পয়সাওয়ালা উকীল,—লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি। ১৯১৬ সালের বাছাইয়ের সময়ে হ্বিল্‌সন অল্প কয়েকটা ভোটের জোরে হুজেসকে হারাইতে পারিয়াছিলেন। কাজেই ভবিষ্যতে হুজেসের কপাল ফলিবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি বোরার তাঁরে যুক্তরাষ্ট্র খানিকটা সমর বিরোধী ও রুশ-প্রেমিক রূপে দেখা দিবে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে। জাপানের সঙ্গে আড়াআড়ি যাহাতে না বাড়ে হয়ত সেই দিকে কিছু কিছু কাজ হইতে পারিবে। ইয়োরোপের রাষ্ট্র-মণ্ডলেও এই সকল কাজ ও চিন্তার যৎকিঞ্চিৎ প্রভাব পড়িবার কথা।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খঞ্জ ও রুগ্ন।

বুদ্ধিমতী মাতার ইচ্ছানুযায়ী ঈশানী স্বামী শরৎকুমারকে ভগলপুরে পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল যে, তাহারা লোক পরম্পরায় শুনিয়াছে যে, তাঁহাদের ঢাকার বাড়ী এবং বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ;—একথা কি সত্য ? লিখিয়াছিল যে, তাহার মাতার অর্থের অস্বচ্ছল হওয়ায়, তিনি আবশ্যকীয় সংসার খরচ চালাইতে পারিতেছেন না ; অতএব তাঁহার গচ্ছিত অর্থ হইতে শীঘ্র পাচশত টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। লিখিয়াছিল যে, সুদূর বিদেশে সে যেন খুব সাবধানে থাকে ; এবং সর্ব্বদা তাহার সুস্থ সংবাদ প্রদান করিয়া জীবনমৃতা অধিনী পত্নীকে জীবন প্রদান করে।

কিন্তু শরৎকুমার প্রেমময়ী পত্নীর এই আগ্রহপূর্ণ লিপির কোনও উত্তর প্রদান করিয়া, বুদ্ধিমতী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উদ্বেগ লাঘব বা প্রেমময়ী বিরহিনী পত্নীকে সঞ্জীবিতা করে নাই। সে সুস্থ শরীরে থাকিলেও এই পত্রের উত্তর লিখিত কি-না সন্দেহ ; কারণ তাহার অবসর এবং ইচ্ছার এখন একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। স্কুলের অধ্যক্ষ দিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, সে ইদানিং আবার সুরাপান ও প্রেমলীলা আরম্ভ করিয়াছিল,—এজন্য পত্নীকে পত্র লিখিবার তাহার অবসর ছিল না ; এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে, তাহার বুদ্ধিমতী শ্বশ্রূঠাকুরাণী অপেক্ষা তাহার অধিক জ্ঞান থাকায়, সে সেই পত্রের উত্তর লিখিয়া, টাকা গচ্ছিত থাকার কথা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। তাহার পর, পত্র পাইবার দুই একদিন পরেই সে মহা অসুস্থ হইয়া পড়িল ; তখন আর তাহার পত্র লিখিবার উপায়ই রহিল না।

শরৎকুমারের অসুস্থতা সম্বন্ধে আমরা কিছু সংবাদ দিব। অশ্বারোহণে সে আপনাকে মহা পারদর্শী মনে করিলেও, সে পুলিশ বিদ্যালয়ে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া যায়, বেগবান অশ্বের উপর হইতে জোরে কঠিন ভূমিতে পতিত হওয়ায়, তাহার জানু প্রদেশের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায় ; এবং সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে স্থানীয় হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দেন। হাঁসপাতালে পাঠাইবার সময় তাহার মুখে সুরা গন্ধ পাইয়া স্কুলের কর্ত্তাগণ অনুমান করেন, অতিরিক্ত সুরাপানই তাহার পতনের কারণ ; এবং এই কারণেই তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এরূপ মদ্যপায়ীকে বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

ঈশানী স্বামীর এই বিপদের কথা অবগত হইতে না পারিয়া, তাহার পত্রের উত্তরের প্রত্যাশায় পক্ষকাল অপেক্ষা করিল। তাহার পর চিন্তিত হইয়া পুনরায় তাহাকে মিনতিপূর্ণ পত্র লিখিল।

এই পত্রও শরৎকুমারের হস্তগত হইল। কিন্তু তখনও সে হাঁসপাতালে অবস্থিতি করিতেছিল, তখনও তাহার পত্র লিখনের কোনও সামর্থ্য ছিল না।

সুতরাং ঈশানী তাহার দ্বিতীয় পত্রেরও উত্তর পাইল না। এইবার সে চিন্তাভারে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। কয়েকদিন অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া, সে আবার কাতরতাপূর্ণ পত্র লিখিল।

এই তৃতীয় পত্র যখন শরৎকুমার পাইল, তখন সে হাঁসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে ; এবং স্কুল হইতেও বিতাড়িত হইয়া, আপনাকে অন্য স্থানে অপসারিত করিবার জন্য কেবল সপ্তাহ কালের সময় পাইয়াছে। শরৎকুমার

হাঁসপাতালে, অশেষ দৈহিক কষ্ট ভোগ করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জানু প্রদেশে অস্ত্রোপচারের যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু জানুর ভগ্ন অস্থিসকল কতক অপসারিত করিতে হওয়ায়, এবং কতক যথাস্থানে সন্নিবেশিত না হওয়ায়, তাহার দক্ষিণ পদ বাম পদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল; এজন্য তাহাকে যষ্টি ধারণ করিয়া খঞ্জের ন্যায় চলিতে হইত। খঞ্জ পদ লইয়া এবং কৃশ দেহ লইয়া সে ঢাকায় তাহার বন্ধুবর্গের নিকট যাইতে লজ্জা বোধ করিতেছিল; এবং যাইলেও তাহার কৃশ দেহের উপযুক্ত সেবা হইবে কি-না, সে বিষয়েও তাহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ভাবিতেছিল যে এক্ষণে ঈশানীই তাহার একমাত্র আশ্রয় স্থল;—হায়! বিধাতার কঠিন বিধানে লজ্জাহীন রুগ্নের পত্নীর অঞ্চলতল ব্যতীত আর কোনও আশ্রয়ই ছিল না; পত্নী আহার না দিলে তাহার দৈনিক আহার পাইবারও আর কোনও উপায় ছিল না। খঞ্জ হইয়াও সে মসীজীবীর জীবনাবলম্বন করিয়া, আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত; কিন্তু সে প্রকার সাধু অভিপ্রায় তাহার নিশ্চেষ্ট মস্তিষ্কে কখন উদিত হয় নাই। পত্নীর নিকট থাকিয়া, সে পতিব্রতার সেবা এবং আলস্যের অন্ন উপভোগ করিতে চায়।

অতএব শরৎকুমার পত্নীর সেই তৃতীয় পত্রের উত্তর লিখিল। লিখিল,—

ভাগলপুর।
—অগ্রহায়ণ, ১৩—।

প্রাণের সোণার চাঁদ,

"তোমার তিন খানি পত্রই আমি পরে পরে পাইয়াছি। কিন্তু এত দিন আমার কঠিন পীড়া হওয়ায় আমি শয্যাগত ছিলাম। তাই তোমার সুধাপূর্ণ পত্রগুলির উত্তর লিখিতে পারি নাই; আমাকে ক্ষমা করিও।

"এখন আমার রোগ সারিয়াছে বটে, কিন্তু এখানকার শিক্ষকগণ এখনও আমাকে এখানকার কঠিন শিক্ষার পক্ষে দুর্ব্বল মনে করিতেছেন; তাই তাঁহারা আমাকে কিছু দিনের জন্য ছুটী দিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছি, আমার এই দুর্ব্বল অবস্থায় একলা ঢাকায় বাস না করে, তোমার কাছে গিয়ে কিছুদিন বরিশালে বাস করিব। আমি শীঘ্রই তোমার কাছে পৌঁছিব।

"আর আর বিষয় তোমার যা জিজ্ঞাস্য আছে; তাহা তোমার কাছে যাইয়া তোমাকে বলিব।

"ভরসা করি, তুমি আর খোকা দুই জনেই ভাল আছ। তোমার মাকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিও। এবং তুমি আমার আন্তরিক প্রেমালিঙ্গন ও প্রগাঢ় চুম্বন গ্রহণ করিবে। ইতি— "তোমার প্রাণের প্রাণেশ্বর।"

এই পত্রে ঈশানীর জিজ্ঞাসিত কোনও প্রশ্নের কোনও উত্তর ছিল না। ইহা পাঠ করিলে অন্য লোকে বুঝিতে পারিত যে, ইহা কপট ও শঠের শঠতা মাত্র। ইহাতে ঈশানী বুঝিতে পারে নাই যে তাহাদের বাটী ও জমিদারী বিক্রীত হইয়া গিয়াছে কিনা; বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার নিকট তাহার মাতা কোনও অর্থ গচ্ছিত আছে কিনা; বুঝিতে পারে নাই যে, সে তাহা হইতে মাতার প্রার্থিত পাঁচ শত টাকা পাঠাইতে পারিবে কিনা; বুঝিতে পারে নাই যে কি প্রকারে তাহার কিরূপ ব্যধি হইয়াছিল; বুঝিতে পারে নাই যে স্কুলের কর্ত্তারা তাহার অনুপস্থিতির জন্য কতদিনের ছুটী দিয়াছিল। এই পত্রের বিবরণ শুনিয়া বুদ্ধিমতী প্রমদা এতটুকু সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তথাপি ইহাতেই, বৃষ্টিপাতে মোহিনীর শ্যামল বক্ষঃ যেমন শীতল হয়, তেমনই ঈশানীর প্রেমপূর্ণ বক্ষঃ শীতল হইয়াছিল; ইহাতেই শরতের যেমন পূর্ণিমার শশধরকে বক্ষে ধরিয়া, আনন্দিত হইয়া উঠে, তেমনই ঈশানী স্বামীমুখ অবিলম্বে দেখিবার আশায় আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সেই পত্রখানা আপন হৃদয়ে বিছাইয়া ধরিত এবং নিকটোপবিষ্ট পুত্রকে বার বার জিজ্ঞাসা করিত, 'এই, এই, খোকা, যাদু আমার, গোপাল আমার, আমায় বল্‌ত, তোর বাবা আর কত দিন পরে আসবে?'

ভবিষ্যৎ বক্তা খোকা, তাহার নির্ম্মল ও ক্ষুদ্র দন্ত বিকশিত করিয়া, দাউ দাউ শব্দে কি মধুর ভবিষ্যদ্বাণী মাতার কর্ণে ঢালিয়া দিত, তাহা ঈশানীই বুঝিত; সে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আদরে তাহার মুখ চুম্বন করিত।

(ক্রমশঃ)

মোহভঙ্গ

(গল্প)

[শ্রীহরিদাস ঘোষ বি-এ]

এক

ভাত খেয়ে উঠে দুপুর বেলায় রমেশ একখানা ইব্‌সেনের নাটক মুখে করে শুয়ে পড়ল। গরমের ছুটিতে এম্ এ ক্লাস বন্ধ হবার পর প্রায় পনেরো দিন এইভাবেই কাটছিল; আর কিন্তু তার ভাল লাগছিল না। বইখানা বুকের ওপর চেপে ধরে সে ভাবল,"যাই একবার কোথাও বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?—পুরী, দার্জ্জিলিং, সবই তো দু'একবার ঘুরে আসা গেছে।" হঠাৎ সে বিছানা ছেড়ে উঠল। সুদূর পল্লী থেকে বুড়ো দিদিমার নিমন্ত্রণটা তার মনে পড়ে গেল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল,—"মা ওমা. শুনছ?"

মা ছেলের হঠাৎ ডাকাতে-চীৎকার শুনে চকিত হয়ে বললেন—"কিরে?"

"কাল সকালের ট্রেণে মামার বাড়ী যাচ্ছি মা। দিদিমার খবরটা অনেকদিন পাই নি।"

"হঠাৎ দিদিমার জন্যে তোর প্রাণ কেঁদে উঠল কেন রে?"

"সে সব আমি জানি না—মোট কথা আমি চলেছি।"

ভোরের ট্রেণে রমেশ মামার বাড়ী চলে গেল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সে বেশ বুঝতে পারল যে পল্লী বাসটা তত সুখের নয়। দিদিমায়ের দেওয়া ঘন দুধের সর, পাকা আম, আর দুপুরের ঘুম তার জীবনটাকে আবার একঘেয়ে করে তুলল।

সেদিন বিকেলে ঘুম থেকে উঠে সবে একখানা বাংলা গল্পের বই হাতে করেছে এমন সময় পেছন থেকে উচ্চমধুর গলায় কে বলে উঠল, "বাঃ বেশ রমেশ ঠাকুরপো, তুমি আচ্ছা লোক যা হোক্! আজ সাত আট দিন হ'ল এসেছ অথচ আমাদের ওদিক মাড়াও নি! একেবারে ভুলেই গেছ,—না?"

রমেশ চেয়ে দেখ্‌ল ওপাড়ার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই বিপিনদার স্ত্রী শৈল, একটি ছোট ছেলে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিপিনদার বাড়ীই তার এখানকার আড্ডা ছিল।

রমেশ ফিরে বসে বল্‌ল—"না, সত্যি বলছি ভুলে তো যাই নি, বরং—" 'বরংটা' শেষ করবার মত কথা তখুনি মাথায় না আসাতে, সে কথাটা বদলে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,— "আচ্ছা বৌদি, ওটি তোমার ছেলে বুঝি?"

শৈল মুচ্‌কে হেসে বল্‌ল,—"না তোমার দাদার।"

রমেশ হেরে গিয়ে বল্‌ল,—"আচ্ছা ভাই বৌদি, তুমি নিজেই যখন কষ্ট করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তখন তোমার বাড়ী কাল আমার নেমন্তন্ন রইল।"

ঠাট্টা ছেড়ে দিয়ে শৈল বলে উঠ্‌ল,—"মনে থাকে যেন, পেটুকের মত যেমন যেচে নেমন্তন্ন নিলে, কাল গিয়ে খেয়ে আসতে হবে, তা না হ'লে -"

বাধা দিয়ে রমেশ চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল,—"দিদিমা,— আজ রাত্রে আমি আর কিছু খাব না।"

দিদিমা ব্যস্ত হ'য়ে এসে বল্‌লেন,—"কেন রে,—শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?"

শৈলর দিকে হাসিমুখে একবার চেয়ে রমেশ বল্‌ল,—"না, এই কাল বৌদির বাড়ী নেমন্তন্ন কি না, তাই পেট খালি করে রাখ্‌ছিলুম।"

দুই

"সত্যি বলছি বৌদি আমার পেটে আর এক ঢোক্ জল খাবার মত জায়গাও নেই। বিপিনদাকে বরং দাও।"

"দুধটুকু খাবার জায়গা হবে,—সুষি দুধের বাটীটা আন তো।"

রমেশ আর বিপিন খেতে বসেছিল। শৈল সামনে বসে তাদের খাওয়াচ্ছিল। তার কথা শুনে রমেশ ভাব্‌ল,—সুষি আবার কে? এ বাড়ীতে ঐ নামের কোনও লোকের সঙ্গে তার তো পরিচয় নেই! একখানি সুগোল হাত যখন পাতের কাছে দুধের বাটী রাখ্‌ল তখন সে মুখটা তুলে একবার চেয়ে দেখ্‌ল—একজোড়া কালো চোখ যেন তারই দিকে চেয়ে আছে! তার দৃষ্টির ভেতর থেকে যেন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতার সঙ্গে কি গভীর ব্যথা ঝরে পড়ছে! রমেশের বুকের ভেতর রক্তটা ছলাৎ করে উঠ্‌ল।

দুধের বাটী পাতের ওপর তুলে নিয়ে রমেশ চুপ করে বসে আছে দেখে শৈল অনুযোগেরস্বরে বল্‌ল,—"রমেশ ঠাকুরপো, তুমি বেজায় একগুঁয়ে। দুধটা খেলে বুঝি সত্যিই তোমার পেট ফেটে যেত?"

করুণ চোখে চেয়ে রমেশ বল্‌ল—"সত্যি বলছি আমার খাবার আর একটুও ইচ্ছে নেই,—তবু তোমার কথা রাখবার জন্যে একটুখানি খাচ্ছি।"

যে খবরটা জানবার জন্যে রমেশের সবচেয়ে বেশী ঔৎসুক্য হয়েছিল, খেয়ে ওঠবার পর শৈল নিজেই তা' বল্‌তে লাগ্‌ল।

"দেখ ঠাকুরপো, একজন লোক ভাগ্যিস পেয়েছিলুম, তাই আজকাল একটু ফুরসুৎ পাই।"

রমেশ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—"লোকটি কে?"

"ঐ যে মেয়েটিকে দেখলে, আমার বাপের বাড়ীর দেশে ওর ও বাপের বাড়ী। বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে—খুব গরীব কিন্তু। মেয়ের বয়স বছর তের হতেই গ্রামের লোক যখন টিট্‌কিরি দিতে আরম্ভ কর্‌ল তখন ওর বাপ মায়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। আমি ওদের বাড়ী মাঝে মাঝে যেতুম। একদিন হঠাৎ শুনলুম পাশের গ্রামের এক নেশাখোর আধ-বুড়ো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেদিন সুষমার বুকে যে কান্না জমাট হয়েছিল তা তুমি বুঝবে না। তার পরের ঘটনা অতি অল্প। এক মাসের মধ্যেই ওর স্বামী গেল মরে; শ্বশুর বাড়ীর লোক অপয়া বউ বলে ওকে তাড়িয়ে দিল, আর বছর না ঘুরতেই অভাগী বাপ মাকেও খেলে। আমি সেই সময় বাপের বাড়ীতে—খোকা সবে হয়েছে। ওঁর অনুমতি না নিয়েই আমি মেয়েটাকে সঙ্গে করে এখানে আনলুম।"

সুষমা একটু আগেই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল; শৈলর কথা শেষ হ'লে সে তার পাশ ঘেঁসে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"দিদি, তুমি খাবে এস—খোকাকে আমি ধরছি।"

"ঠাকুরপো, তুমি ততক্ষণ কর্ত্তার সঙ্গে একটু গল্প কর, আমি আসছি। দেখো পালিও না যেন!—" এই ব'লে শৈল সুষমার সঙ্গে চলে গেল।

রমেশ ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভাল করে মেয়েটিকে দেখে নিল। সুন্দর তাকে বলা যায় না, কিন্তু যে করুণ ধীরভাব তার সারাদেহ ব্যাপ্ত করে ছিল সেটা অনুভব না করে কেউ তার দিকে তাকাতে পারে না। সন্ধ্যার আঁধারে ক্ষীণ প্রদীপটি যেমন স্নিগ্ধ উজ্জল হ'য়ে জ্ব'লে—অল্প বাতাসেই হেলে দুলে ওঠে—সর্ব্বদাই যেন নিবু নিবু, এ রূপের শিখাও ঠিক সেই রকম। তার মাথায় রুক্ষ চুলের গোছাগুলো ক্রমাগতই মুখের ওপর এসে পড়্‌ছিল—যেন একটা বিষম বোঝা, তাতেই কিন্তু তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর এই সবের মধ্যে নিবিড় বেদনামাখা সেই কালো চোখদুটি হৃদয়ের সব আকাঙ্খাগুলোকে যেন চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল।

সেদিন দুপুরটা রমেশের কাছে যেন স্বপ্নের মত কেটে গেল। বিপিনদা, শৈল ও সুষমার সঙ্গে তাসের আড্ডাটা জমেছিল ভাল। সেই ভোমরা চোখের চাহান, খেলার শেষ পর্য্যন্ত তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল,—যদিও বেশী বারই তার হার হয়েছিল।

তিন

"সুষমা, একটা পান দেবে?"

সুষমা একলা বসে পান সাজ্‌ছিল। রমেশ সেইখানে এসে পান চাইল। দুটো পান হাতে দিয়ে সুষমা একটু হেসে বল্‌ল,—"আজ কিন্তু খেলা হবে না। দাদাবাবু কি কাজে বেরিয়েছেন, দিদি ঘুমোচ্ছে।"

আজ সাতদিন এই বাড়ীতে তাদের আড্ডা খুব জমছিল, আর রমেশ খুব উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিত। সুষমার হাত থেকে পান নিয়ে রমেশ ধপ্ করে তার পাশে বসে পড়ে বল্‌স,—"তা হোক্ আজ না হয় একটু গল্পই করা যাবে।"

সুষমা একটু সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসল; তার গালে একটু লালের রেশ এসে লাগল। তার প্রাণহীন দেহ বল্লবীর ভেতরে এ কয় দিনে যেন একটু সজীবতা এসেছিল। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি এনে সুষমা বল্‌ল,—"আচ্ছা. আপনি ক'লকাতায় ফিরছেন কবে? পাড়াগাঁটা আপনার ভাল লাগছে কি?"

রমেশের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—"ভাল লাগা নিশ্চয়ই উচিত,—বিশেষতঃ তুমি যখন রয়েছ!" কথাটা বলেই রমেশ স্তব্ধ হয়ে গেল; কি কথা সে বলে ফেলেছে! সুষমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর পাঁচ মিনিট দুজনেই চুপ। অন্য ঘরে হঠাৎ শৈলর খোকা কেঁদে উঠ্‌ল। সুষমা উঠে চলে গেল॥

আগুণ জলে উঠ্‌ল,—দুজনের মনেই। একটা আগুণ ধুনোর আগুণের মত দপ্ করে, আর একটা ঘুঁটের আগুণের মত ধিকি ধিকি করে।

তাস খেল্‌তে যাওয়া রমেশ দুদিন বন্ধ রাখ্‌ল। তৃতীয় দিন সেখানে যেতেই সবার আগেই অভিযোগ করল সুষমা। রমেশের মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে একবার চেয়ে সে মুখ ভার করে রইল। অভিযোগটা নীরব হলেও সুষমার চোখের চঞ্চলতা রমেশকে চঞ্চল করে তুল্‌ল। তাস খেলা সেদিন আর ভাল জমল না।

গরমের দোহাই দিয়ে রমেশ সেদিন রাত্রিটা জেগেই কাটাল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমিয়ে পড়্‌বার আগে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে,—এখান থেকে পালাতে হবে; তাকে এ প্রলোভনের সাম্‌নে থাকতে হ'লে, নিজেকে সংযত রাখা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কেন,—মন যাকে চায়, তাকে পেতে এত সঙ্কোচ কেন? তারপর আর একটা 'কিন্তু' এসে রমেশের চিন্তাকে বিপর্য্যস্ত করে দিয়ে, তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল।

সমস্ত রাত্রি জেগে, তার ওপর পুকুরের জলে ঘণ্টা দুই সাঁতার কেটে রমেশ জ্বরে পড়্‌ল। জ্বর খুব বেশী না হ'লেও সে মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। বিকেল-বেলার দিকটায় একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, এমন সময় ঘরে কে ঢুকল। রমেশ ভাব্‌ল বোধ হয় তার দিদিমা কি মামীমা হবেন। একটু পরেই কপালে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করে সে চেয়ে দেখল দুটি ব্যগ্র আকুল চোখ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। রমেশ একবার চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল—নিজের মনের অস্থিরতাকে চাপ্‌বার জন্যে। তারপর নিজের হাত দুখানা দিয়ে সেই স্নিগ্ধ স্পর্শকে কপালের ওপর চেপে ধরে চোখ বুঁজ্‌ল।

রমেশ একটু পরে শুনতে পেলে কে যেন প্রশ্ন করছে—"মাথাটা খুব ধরেছে?" সে শুধু 'হুঁ'—বলে উত্তর দিল। বেশী কথা বল্‌তে বা চোখ চাইতে তার সাহস হ'ল না।

কতক্ষণ এমনি ভাবে কেটে গিয়েছিল। পাশের ঘর থেকে হঠাৎ শৈলর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "সুষমা কোথায় গেলি রে!—রমেশ ঠাকুরপো কেমন আছ?—আজ আমাদের বাড়ী যাওনি কেন?" বল্‌তে বল্‌তে শৈল ঘরে ঢুকল। রমেশের কপাল থেকে স্নিগ্ধ প্রলেপ সরে গেল। শৈল অনেকক্ষণ গল্প করে, প্রায় সন্ধ্যার সময় সুষমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

আর এরকম ভাবে ত চলে না! রমেশ সেরে ওঠবার পরই কলকাতা যাওয়া ঠিক করে ফেল্‌ল। যে আগুন সে জ্বালিয়েছে তা নিভিয়ে না দিয়ে দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা নিয়ে দূরে পালানো ছাড়া কোনও উপায় ভাবতে তার সাহস হ'ল না। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধের পর সে ঠিক্ করল যে যাবার সময় সুষমার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে যাবে।

কলকাতা যাবার আগের দিন বিদায় নেবার সময় শৈল বলল,—"সত্যি ভাই রমেশ ঠাকুরপো, তোমার কলকাতা যাবার জন্যে মন যে খুব চঞ্চল হয়েছে, তা' মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কোথাও থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে না কি? বিয়ের নেমন্তন্নটা যেন ফাঁক না যায়!"

দিনের আলো অবসাদের মত এলিয়ে পড়েছিল। রমেশ সুষমার সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে, খিড়কির ঘাটে গিয়ে

পৌঁছল। সুষমা ঘাটের অন্ধকার কোণে গিয়ে বসেছিল। রমেশ সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই সুষমা সংযত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, সহজভাবে বলল,—"কাল ভোরেই যাচ্ছেন তো?"

কিন্তু হঠাৎ বন্যার মত চোখের জল কোথা থেকে এসে তার গণ্ড ভাসিয়ে দিয়ে তাকে বিপর্য্যস্ত করে ফেলল। সুষমা দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। রমেশ তার হাত দুটি ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েই,—পাথরের মত দুমিনিট স্থির হয়ে রইল। হৃদয়ের মধ্যে তখন তার তুফান খেলে যাচ্ছিল, কিন্তু বাহিরটা অবিকম্প, স্থির নিশ্চল; রমেশের মনে হতে লাগল—সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি মুছিয়ে তাতে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দেয়,—কিন্তু—এ বনফুলকে তুলে নিয়ে পঙ্কিল কর্‌বার কি অধিকার আছে তার? সে ফুলের সৌরভে তার প্রাণে মাদকতা না এসে বিমল আনন্দ আসা উচিত নয় কি? চিরবুভুক্ষু প্রাণের সরল ভালবাসাকে সে কি প্রতিদান দিতে যাচ্ছে? তারপর সেইভাবেই তার হাত দুখানি ধরে, রমেশ স্থিরকণ্ঠে বল্‌ল—"সুষমা, কাঁদছ কেন? আমি আবার আসব। জেনো, তোমার রমেশ দাদা চিরদিন তোমাকে স্নেহ কর্‌বে। আজ আসি বোন?"

অচঞ্চল দৃষ্টিতে একবার সুষমার মুখের দিকে চেয়ে রমেশ ফির্‌ল। ধরা গলায় সুষমা বলল—"দাঁড়াও।"

রমেশ দাঁড়াল। সুষমা গলায় আঁচল দিয়ে রমেশের পায় প্রণাম কর্‌ল। যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছে!

দুই মিনিট

[শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

(কণ্টক)

নবীন প্রেমিক যুগল বাগানে বেড়াতে গিয়ে একটী নিভৃত কুঞ্জে বস্‌লেন। বাগানের মালীর ছোট একটী ছেলে এই সময় সেখানে এসে জুট্‌ল। প্রেমিকবর তার হাতে একটা পয়সা দিয়ে বল্লেন "মুড়ি কিনে খাও গে।" সে পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে "আমি মুড়ি চাই না!" প্রেমিক একটা দু'আনি দিয়ে বল্লেন "মেঠাই খাও গে।" "ভারি মিষ্টি, আমি মিষ্টি বেশী খাই না"—বলে সে তাও ফিরিয়ে দিলে! বিরক্ত হ'য়ে প্রেমিক একটা আস্ত টাকা তার হাতে দিয়ে বল্লেন "তোমার যা খুসি খরচ করগে"—ছোঁড়াটা তবু নড়ে না! রেগে উঠে প্রেমিক যুগল বল্লেন "তুই কি চাস বল্‌ত?" পিট্‌পিটে হেসে ছোক্‌রা উত্তর করলে—"তোমাদের দেখ্‌তে চাই!"

লিচ্ছবি জাতি

এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সময় মহাযুদ্ধ ইউরোপের স্বাধীন রাজ্যগুলির অনেক ক্ষতি করিয়া রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ের অভিনব ভাবে আলোচনা সৃষ্টি করিল এবং যে সময় ভারতে উপন্যাসের বন্যা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে সেই সময়ে কোন এক প্রাচীন পরাক্রমশালী জাতির ইতিহাস মাতৃভাষায় লিখিবার আবশ্যকতা ও সার্থকতা কি? যখন পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইলাম তখনই এই প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হইল। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে এই "নাটক নভেলের" যুগে কোথায় বিমলাবাবু একখানা নাটক কিংবা উপন্যাস লিখিয়া মাতৃভাষার সেবা করিবেন, তা না করিয়া তিনি এক প্রাচীন জাতির ইতিহাস লিখিলেন। এইরূপ পুস্তকের আদর আছে কি-না বা আদর হওয়া প্রয়োজন কি-না এবং কি কি কারণে এইরূপ প্রাচীন জাতির ইতিহাস বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহাই আমরা আলোচনা করিব। এই ক্ষমতাশালী লিচ্ছবি জাতির সুসম্পন্ন ও ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আমরা কখনও পাঠ করি নাই। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও চৈনিক রচনা হইতে উপাদান সকল সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে লিচ্ছবি জাতির যে সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে প্রাচীন ক্ষমতাশালী জাতিগণের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠান, রাজ্যতন্ত্র, বিচার পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক ইতিহাস আধুনিক যুগে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পুস্তকে সাহিত্যিক প্রমাণ ব্যতীত মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে গৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

এই লিচ্ছবি জাতির চরিত্র এত মহৎ ছিল, একতা এরূপ দৃঢ় ছিল, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং এমন সুন্দরভাবে কার্য্য করিত যে শাক্যমুনি বৌদ্ধসভায় এই জাতির চরিত্র, একতা, ধর্ম্মানুরাগ ও কার্য্যব্যবস্থা প্রণালী আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে বিমলাবাবু লিচ্ছবি দিগের নাম ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়া যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই জাতির শাক্যদিগের ও গুপ্তদিগের সহিত যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে এই জাতি অন্যান্য ক্ষমতাশালী জাতির সমকক্ষ ছিল। তাহারা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। যদিও অনেকে বলেন যে লিচ্ছবিরা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ছিল।

Vincent Smith সাহেব আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে তিব্বতীয়গণ হইতে লিচ্ছবিদের উৎপত্তি এবং ডাক্তার যতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে লিচ্ছবিগণ পারসিকদিগের বংশধর। আবার আর একজন পণ্ডিত Beal সাহেব বলিয়াছেন যে লিচ্ছবিরা 'যুয়েচি' জাতি হইতে উদ্ভূত। যাহা হউক লিচ্ছবিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত তিনজন মণীষীগণের নিকট হইতে ভ্রান্ত ধারণা লাভ করিয়াছিলাম সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া বিমলাবাবু আমাদিগকে লিচ্ছবি দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় I.A.S.B. 1922 এবং Ksatriya Clans in Buddhist India এবং Some Ksatriya Tribes of Ancient India নামক পরবর্ত্তী পুস্তকে বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। অধুনা মাতৃভাষায় এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ জানাইলেন তজ্জন্য আমরা বিমলা বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি যে মাতৃভাষার অর্চ্চনা এখনও ত্যাগ করেন নাই ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বঙ্গমাতার বিদ্বান সন্তানগণ বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া মাতৃভাষার পূজা ত্যাগ না করেন ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিচ্ছবিদের রাজধানী বৈশালী সম্বন্ধে নানাপ্রকার সাহিত্যে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য এতদিন বিক্ষিপ্ত ছিল তাহা একত্রিত করিয়া একটী ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা বিমলা বাবুর নিকট প্রথম প্রাপ্ত হই।

তৃতীয় অধ্যায়ে লিচ্ছবি দিগের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রদ। ভগবান বুদ্ধদেব যখন বৈশালী দিগের সহিত প্রথম মিলিত হ'ন তখন তিনি বৈশালীর সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের সাজসজ্জা ও যান বাহনাদির বর্ণ বৈচিত্র দেখিয়া তাহাদিগকে তাবতিংস স্বর্গের দেবতাগণের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিগণ কাষ্ঠ খণ্ডকে উপাধান করিয়া নিদ্রা যাইত, কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী ছিল, এবং নিষ্ঠাবান ও ধনুর্বিদ্যায় দক্ষ ছিল। তাহাদের প্রাচীনের প্রতি সম্মান, শিক্ষায় ও শিল্পে অনুরাগ এবং নৈতিক বল আদর্শরূপ ছিল। তাহারা জীবনে আনন্দ উপভোগ

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ, ডি প্রণীত
হৃষিকেশ সিরিজ নং ১০। এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত—১২৮ পৃঃ মূল্য ১।০।
প্রাপ্তিস্থান—২৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, গ্রন্থকারের নিকট।

করিতে জানিত। মধ্যে মধ্যে উৎসব করিত। উৎসবে সঙ্গীত হইত, শিঙা ও ঢাক প্রভৃতি বাদ্য বাজান হইত।

চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠানাদি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে লিচ্ছবিগণ ধর্ম্মানুরাগী ছিল।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিলে আনন্দ হয়। লিচ্ছবিগণ এক বিশাল ও শক্তিশালী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহাদিগের রাজাতন্ত্রের ও বিচার পদ্ধতির যে সুন্দর ইতিহাস আমরা এই আলোচ্য পুস্তকে প্রাপ্ত হই তাহা বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রদ। লিচ্ছবি দিগের একতা ও সৌহার্দ্দ্য এত অধিক ছিল যে মগধ রাজগণের আক্রমণ বহুবার ব্যর্থ হইয়াছিল। একতা ও সৌহার্দ্দ্য না থাকিলে কোন পরিবার বা কোন জাতি আপনার শক্তি অটুট রাখিতে সক্ষম হয় না. ইহা ধ্রুব সত্য।

অজাত শত্রুর বৈমাত্রের ভ্রাতা অভয় এক লিচ্ছবি রমণীর সন্তান ছিলেন। এই কারণে অজাতশত্রু মনে করিতেন যে অভয়ের শরীরে লিচ্ছবি-রক্ত প্রবাহিত হইতেছে এবং সে যে লিচ্ছবিদিগের প্রতি অনুরক্ত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং অভয় লিচ্ছবিদিগের পক্ষ হইলে মগধরাজ্য বিস্তারের পথে লিচ্ছবিরাই যে প্রথম বাধা হইবে ইহা তিনি সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য মন্ত্রী বস্‌শকারকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন. বুদ্ধদেব বলিলেন, "ভবিষ্যতে লিচ্ছবিগণ সুকুমার হইবে, নমনীয় হস্তপদ বিশিষ্ট হইবে, সুকোমল শয্যায় তুলার উপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে এবং সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবে। উপহার দানে তাহাদিগকে প্রসন্ন করা কিংবা সঙ্ঘের জাতিবৃন্দ মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে লিচ্ছবিগণকে পরাজিত করিবার অন্য উপায় নাই।" বুদ্ধদেব লিচ্ছবিদিগের যে সব ভবিষ্যৎ গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন সে গুণ সমূহ কেবল লিচ্ছবিজাতীর কেন, অন্যান্য জাতীর পতনের কারণের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য। যে কোন জাতির অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে অনৈক্য ও পরস্পর বিবাদ পতনের মূলে বর্ত্তমান। অজাতশত্রুর মন্ত্রী বস্‌শকার মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়া লিচ্ছবিদিগের রাজ্যে আগমন করিল, এবং বজ্জিগণ কর্ত্তৃক বিচারক নিযুক্ত হইল, বিচার কর্ম্মে যশ অর্জ্জন করিল। যখন সে বুঝিল য লিচ্ছবিগণ তাহাকে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করিতেছে তখন সে লিচ্ছবি রাজগণের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদের সৃষ্টি করিল এবং অতি অল্পকাল মধ্যে যে একতার জন্য লিচ্ছবিগণ অজেয় ও প্রসিদ্ধ ছিল সেই একতা বস্‌শকার কর্ত্তৃক চিরদিনের জন্য অপহৃত হইল; এবং অজাতশত্রু এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তদ্বার পথে নগরে প্রবেশ করিয়া লিচ্ছবিদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিলেন এবং তাহাকে কর দিতে লিচ্ছবিদিগকে বাধ্য করিলেন। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে অজাত শত্রু লিচ্ছবিদের একেবারে বিলোপ সাধন করিতে সক্ষম হন্ নাই। এক্ষণে উপরোক্ত ঘটনা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ইতিহাস পাঠ না করিলে কোনও জাতির উন্নতির এবং অধঃপতনের কারণ সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না। প্রাচীন জাতির উন্নতির কারণ জানিতে হইলে তাহার জীবনের সুসম্বদ্ধ ও ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশেষ প্রয়োজন এবং এইরূপ ধারাবা হক ইতিহাসের সার্থকতা এই যে সকল কারণে প্রাচীন পরাক্রমশালী জাতিগণ পতিত হইয়াছিল সেই সকল কারণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী জাতিগণ তাহাদের স্বাধীনতা অটুট রাখিতে সক্ষম হইতে পারে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীনকালীন ভারতীয় এবং বিদেশীয় জাতির ইতিহাস চিরদিনই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বঙ্গভাষায় প্রাচীন লিচ্ছবি জাতির ইতিহাস লিখিয়া গ্রন্থকার আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করিলেন; তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা বিমলা বাবুর এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ইহা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। প্রত্যেক পুস্তকাগারে এই পুস্তকের স্থান হওয়া উচিত। ইহা বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত হইলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

রূপ-হীনা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

(৩৭)

মা কাকাবাবুর শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, কাকাবাবু ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন "বৌঠান আজ কি তিথি আমায় বলতে পার? আজ কি আকাশে খুব মেঘ করেছে, একটুও আলো নেই?"

মা হাতের পাখাখানা রাখিয়া কাকাবাবুর শীতল ললাট স্পর্শ করিয়া ধরা গলায় বলিলেন "আকাশে বেশ আলো আছে ঠাকুরপো। সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ দশমী, দশমীর চাঁদ উঠেছে।"

"দশমী, চাঁদ উঠেছে। ঘরের জানালাগুলো এত এঁটে বন্ধ করে রেখেছ কেন বৌঠান, সব খুলে দাও—আমি একটু চাঁদের আলো দেখি।"

"তোমার যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে ঠাকুরপো, বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস!"

মরণাহতের শেষ হাসির মত কাকাবাবুর অধরে মৃদুহাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল। কাকাবাবু কহিলেন "এখনো তোমার ঠাণ্ডা বাতাসের এত ভয়? ভয়ের এখনো কি বাকী আছে? এত সেবা কল্লে, ওষুধ খাওয়ালে, তবু যে রাখ্‌তে পারলে না। আমার ডাক এসেছে বৌঠান্, এ আর কারু ডাক নয়, তার ডাক!"

মা চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া উঠিয়া গিয়া ঘরের সবগুলি দরজা জান্‌লা খুলিয়া দিলেন। বর্ষার সজল স্নিগ্ধ বাতাসে ও চাঁদের আলোকে কক্ষটি ভরিয়া গেল।

কাকাবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন "বৌঠান!"—মা মুখ মুছিয়া ভগ্নকণ্ঠে সাড়া দিলেন "ঠাকুরপো!"

"আজ তার কথা আমার বেশী করে মনে পড়ছে। আমাদের বিয়ে, সেই হাসি-খেলা—তারপর তার অসুখে পড়া। ভাল হবার জন্যে কত আকুলতা, কত আগ্রহ। কিন্তু কিছুতেই যখন তাকে ভাল করা গেল না, তখনকার কথা তোমার মনে আছে বৌঠান?"

"সব মনে আছে ঠাকুরপো, সে তো খুব বেশী দিনের কথা নয়।"

"কম দিনেরও নয়, মাঝখানে দুইটী যুগ চলে গেছে! তখন আমার পঁচিশ বছর বয়স ছিল, এখন পঞ্চাশ হয়েছে। শেষ সময় সে ব'লে গিছ্‌লো 'তোমায় পেয়ে আমার আশা মিটলো না, তৃপ্তি হ'ল না; আমি তোমার প্রতীক্ষা করবো।' —তাকে বড্ড বেশীদিন প্রতীক্ষা করতে হয়েছে বৌঠান, নিরাশায় দুঃখে সে যেন কত কষ্টই পেয়েছে। তার প্রতীক্ষার কথা মনে ক'রে আমি দীর্ঘ জীবনে একদিনও আরাম পাই নি। আজ আমার খুব আরাম লাগছে, তাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

মা দন্তে অধর চাপিয়া ক্রন্দনোচ্ছ্বাস প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেন। স্বামী করতলে মুখ লুকাইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে একখানি যবনিকা সরিয়া গেল।—কেবল মহত্ত্বে নয়, পূত চরিত্রেও নয়, প্রেমেও কাকাবাবু এত বড়! আহা, কে জানিত ওই কোমলতা ভরা উদার হৃদয়তলে একটি ব্যথিত বিরহী চিত্ত নিশিদিন তাঁহার প্রিয়তমার সহিত মিলনের আশায় হাহাকার করিয়া মরিতেছে! বাহিরে হর্ষপুলকোচ্ছ্বাস, চোখে আনন্দময় দৃষ্টি,মুখে সুমিষ্ট হাসি;—তাহারই অভ্যন্তরে কুসুমে কীটের মত —প্রাণান্ত প্রতীক্ষা নিরন্তর দংশন করিয়া তাঁহাকে যে শুষ্ক জীর্ণ করিতেছিল—ইহা তো কেহই জানিত না। প্রেমের নীরব উৎস অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় গোপনে তাঁহার হৃদয়ে বহিয়া যাইত। সে প্রেমে উচ্ছ্বাস ছিল না, আড়ম্বর

ছিল না। তিনি যে পত্নী-প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক এ সত্যটুকুও কেহ বুঝিতে পারিত না। আজ শেষ মুহূর্ত্তে এমন করিয়া না বলিলে—এ গোপন কাহিনী অনন্ত গোপনেই রহিয়া যাইত।

কাকাবাবুর অবস্থা বৈলক্ষণ্যে আমার হৃদয় নিরাশার বিপুল অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছিল; এতক্ষণে সেই অন্ধকারে একটি ক্ষীণজ্যোতি তারকার উদয় হইল। আমি ভগবানকে ডাকিয়া আর বলিতে পারিলাম না, "কাকাবাবুর নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন প্রদীপটি তোমারি করুণা-ধারায় প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখ।" আমার ব্যথিত হৃদয় হইতে স্বতঃ উচ্চারিত হইল "আমাদের নিকট হইতে ইঁহাকে যখন কাড়িয়া লইতেছ প্রভু, তখন আর ধরিয়া রাখিব কি করিয়া? তোমার দ্রব্য তুমি তোমার শান্তিময় কোলে তুলিয়া লও। আর একটি তৃষ্ণাতুর আত্মার সহিত এ তৃষিত আত্মাটিকে যুক্ত করিয়া দাও। তোমারই সংমিলিত আত্মা ধরণীর দুঃখ তাপ ভুলিয়া, তোমার পূজার ফুলের মত তোমারি চরণতলে প্রস্ফুটিত হোক্।"

* * *

রাত্রি শেষের দিকে কাকাবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিঃশ্বাস প্রখর হইতে লাগিল। মা তাঁহার মুখে কয়েক চামচে দুধ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কি বড় কষ্ট হচ্ছে ঠাকুরপো? গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?"

কাকাবাবু রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন "না বৌঠান, কষ্ট নয়, এখন আর কিছু করতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে, আমি সেইটে বল্‌তে চাই।"

"বল।"

"মঞ্জু কোথায়?"

"সে এতক্ষণ তোমার কাছেই বসেছিল। এই একটু আগে নীলুর কাছে ওঘরে গেছে, তাকে কি ডাক্‌বো?"

"থাক এখন, আমি মঞ্জুর কথাই বলতে চাচ্ছি, মঞ্জুকে আমি বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেম না বৌঠান কিন্তু তার বর আমি ঠিক করেই রেখেছি। সে বর কি তোমাদের পছন্দ হবে?"

"তোমার কোন কাজ আমার কোন দিন অপছন্দ হয় নি ঠাকুর পো! অনেক দিন ভ্রম করে তোমার অনেক কাজ অনুমোদন না করে,—পরে নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি। তার জন্যে অনুতাপও হয়েছে।—কার সাথে তুমি মঞ্জুকে বিয়ে দিতে চাও?"

"জিতুর সাথে; জিতু টাকায় বড় না হলেও প্রাণে বড় আছে। তার হাতে পড়লে মঞ্জুমার আমার কোন দিন মনোকষ্ট পেতে হবে না।"

"আচ্ছা জিতুর হাতেই তোমার মঞ্জুকে দেব। তোমার ইচ্ছার ওপর আমার তো ভিন্ন ইচ্ছা নাই, ঠাকুরপো!"

কাকাবাবু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে কি আমি জানি না বৌঠান! জানি বলেই তোমায় না জানিয়ে কত কাজ করেচি। মণি কোথায়?"

তিনি কাকাবাবুর শয্যাপাশে বসিয়াছিলেন। কাকাবাবুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া ধীরে বলিলেন "আমি আপনার কাছেই বসে আছি কাকাবাবু।"

"আমার মা কোথায়? আমার শ্যামা মা!"

মা বলিলেন—"বৌমা তোমার পায়ের কাছে বসে আছে ঠাকুরপো।"

"পায়ের কাছে নয়, এস শ্যামা, আমার কোলের কাছে এস। এসেছ, বোস মা, এইখানে বোস। মণি তুই সুন্দর বড্ড ভালবাসতিস, আমি অবিচার করে তোকে কালো এনে দিয়েছিলাম। মুখে কিছু বলিস নি বটে, কিন্তু খুব দুঃখিত হয়েছিলি। সৌন্দর্য্য বাইরের জিনিষ, তার আকর্ষণ দু'দিনের—তা নিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। গুণ অনন্ত অসীম, তাতে যেমন শান্তি, তেমনি তৃপ্তি; তাই গুণের সমুদ্র তোকে আমি এনে দিয়েছিলাম—বলিয়া কাকাবাবু ক্লান্ত হইয়া একটু জল চাহিলেন।

জলপানান্তে একটুখানি চুপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন "মণি, মাথা অত নীচু করে রয়েছিস কেন? মুখ তোল; আমার কাছে আরো একটু সরে আয়। হ্যাঁ, কি বল্‌তে গিয়েছিলাম—আমি তোর বিয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তোর ওপর কখ্‌খনো জোর করিনি, জান্‌তাম আমার মা কারুর অবহেলার জিনিষ নয়, তার আসন অচল, অটল। তার অধিকার সে নিজেই করে' নিতে পারবে। ছেলে-

বেলা থেকে এ পর্য্যন্ত তুই ভুলেও তোর কাকাবাবুর দেওয়া জিনিষের অমর্য্যাদা করিস নি ; যা হাতে তুলে দিয়েছি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছিস। তোকে আমি শ্যামা এনে দিয়েছিলাম, কিন্তু হাতে তুলে দিই নাই। তখন দিলে তোর মনের ওপর জোর করতে হ'ত। এখন জোর করতে হবে না। আজ আমার শ্যামাকে, আমার মাকে আমি তোরি হাতে দিলাম। সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে আমার দেওয়া জিনিষের কখনো তুই অমর্য্যাদা করিস না।" বলিয়া কাকাবাবু কম্পিত হস্তে তাঁহার প্রসারিত হাতের উপর আমার হাতখানি তুলিয়া দিলেন।

স্বামী স্নেহের সহিত আমার হাতখানা মুঠার মধ্যে ধরিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিলেন "আমার সব দোষ সব ত্রুটী ক্ষমা করে আমায় আশীর্ব্বাদ করুন কাকাবাবু।"

কাকাবাবু কষ্টে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া থামিয়া থামিয়া বলিলেন "আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোদের জীবন চির-সুখের চির শান্তির হবে। বৌঠান, তুমিও এদের আশীর্ব্বাদ কর।" বলিয়া কাকাবাবু তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

* * *

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের 'কাকাবাবু ডাকা জন্মের মত শেষ হইল। একটী মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক, অনন্তে মিশিয়া গেল। একদিন যে গৃহ কাকাবাবুর সরস হাস্যালাপে মুখরিত হইত—সেই গৃহ শোকের করুণ রোল উত্থিত হইয়া সেই দিনকার নির্ম্মল প্রভাত ও সুনীল আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

(৩৮)

কোথায় দিয়া কেমন করিয়া যে কয়েকটা দিন অতীত হইল তাহা জানি না। কি পাইয়াছিলাম, কি হারাইয়াছি—এতদিন সে অনুভূতিও ছিল না। একটা বিশ্বব্যাপী নাই নাই ভাব আমাকে ঘিরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পরিচিত জগতের পরিচিত দৃশ্যাবলী দৃষ্টিপথ হইতে দূরে কোন সুদূরে যেন সরিয়া গিয়াছিল। আজ আমার জগতের পানে চাহিয়া দেখিলাম--নাই কেন ? সবই আছে ; সেই চিরন্তন ধরণী, সেই রবি, শশী, তারকা, সেই আলোকোজ্জ্বল দিবা, স্নিগ্ধোজ্জ্বল রজনী তেমনিই আছে। মানবের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, শিশুর মধুর হাসি, মলয়ের মৃদু স্পর্শ, আকাশের নীলিমা কিছুই তিরোহিত হয় নাই। যাহা গিয়াছে—সে বাহিরের নয়, তাহা আমার অন্তরের।

সন্ধ্যার প্রাকালে ছাদে বসিয়া কাকাবাবুর কথাই ভাবিতেছিলাম। তাঁহার স্নেহ ভালবাসা আমার স্মৃতির দ্বারে বার বার আঘাত করিয়া যাইতেছিল। হারাণো দিনের শত চিত্র হৃদয় ফলকে ফুটিয়া ফুটিয়া ব্যথিত হৃদয়টাকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বাবার চিঠি পাইয়াছিলাম--কাল ভোরে তাঁহারা আসিতেছেন। বাবার সহিত মা আসিবেন, বেনু আসিবে। কৈবর্ত্ত বৌ কেবলাও বাদ যাইবে না। নীলুকে দেখিতে জ্যেঠাইমাকে লইয়া জিতুদাও আসিতেছে।

সকলেই আসিতেছে—সকলেই আসিবে। কেবল আসিবে না নীহার। মুঙ্গেরের বুকে যে নীহার বিন্দু ঝরিয়া পড়িয়াছে—সে আর আসিবে না। আর আসিবেন না, আমার কাকাবাবু ; সেই জ্ঞানে গরীয়ান, হাস্যে নির্ঝর, সরলতায় শিশু, উদারতায় আকাশ, করুণার সমুদ্র কাকাবাবু আসিবেন না।—সকলকে পাইব, সকলকেই দেখিব—তাহাদের মধ্যে কাকাবাবু থাকিবেন না, মনে করিতেই চোখে জল আসিল। অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া সেই নিভৃত ছাদে লুটাইয়া আমি আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম "কাকাবাবু কাকাবাবু।"

"কাকাবাবুকে ডাকলে তিনি কি আর ফিরে আসবেন, কেন তুমি নিজেকে এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ ? তোমার এমন কষ্ট আমি যে আর সইতে পারি না।"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। তাঁহার সকরুণ স্বর মমতায় বিগলিত হইয়া আমার অন্তস্থল প্লাবিত করিল। আমার জগতের কোথায়ো আর ফাঁক রহিল না। সেই স্বর আকাশে বাতাসে ব্যক্ত হইয়া আমার অন্তরে

বীণায় ঝঙ্কার তুলিল। আমি মুগ্ধ হইয়া চন্দ্রালোক—পুলকিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি আমার অজ্ঞাতে যেমন নিঃশব্দে ছাতে আসিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। আবেগের সহিত আমার হাতখানি হাতের মধ্যে বন্দী করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন "কণা, আজ আমার ভুল ভ্রান্তি মাপ কর। আমায় বিশ্বাস কর, আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি তোমার মত প্রিয় আমার কিছুই নাই। তুমি আমার কাকাবাবুর সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান; আজ তুমি আমায় বিমুখ করো না। তোমার হৃদয়ে আমাকে স্থান দাও, আশ্রয় দাও।"

আমি নীরবে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। আজ চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সকল বাধা অপসারিত হইল—চন্দ্রালোকে চারিটি নয়নে নয়নে মিলিয়া আমাদের যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল। বর্ষার সন্তাপ-হরা একটা দমকা বাতাস কাকাবাবুর স্নেহ আশীর্ব্বাদের মত আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া নীরবে বহিয়া গেল।

সমাপ্ত
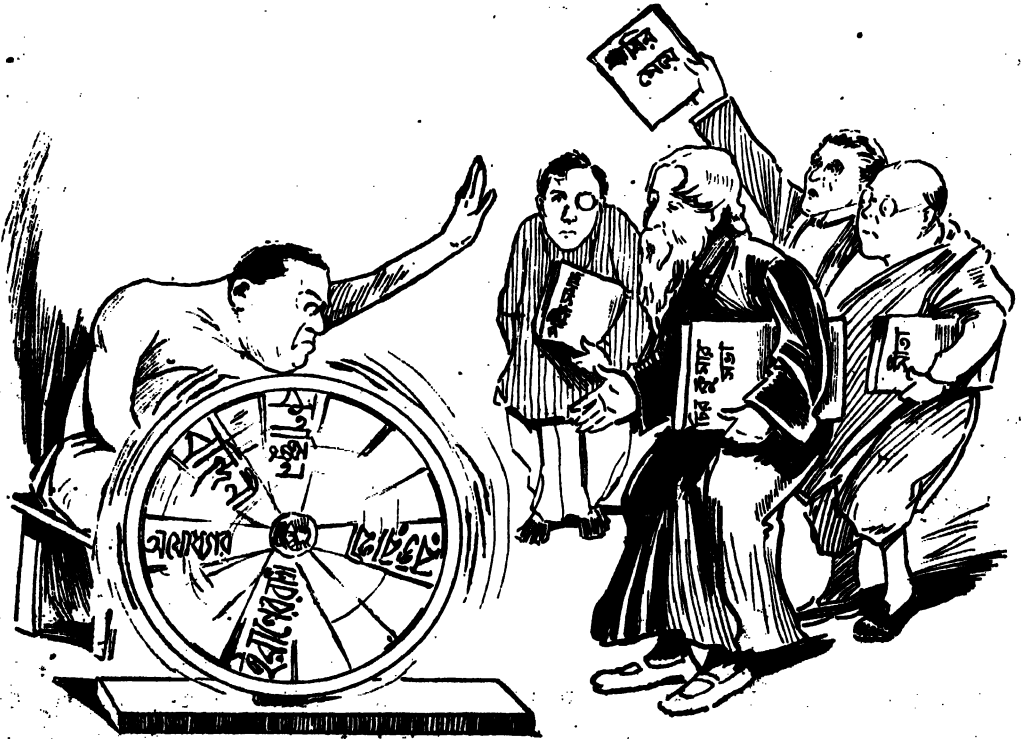
রসো, বাপু!

প্রতীক্ষা

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩২। [২৭শ সপ্তাহ

ল্যাজ ও ল্যাজুড়

[শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন]

ল্যাজ বিধাতার হাতের কারিগরির এক আশ্চর্য্য নমুনা। ওটি যে শুধুই পশুপাখীদের অঙ্গশোভা তা নয়, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির, অন্নমার্জ্জনের এবং মনোভাব-প্রকাশের প্রধান উপকরণ। ঐ ল্যাজের বৈচিত্র্যেই সিংহ পশুরাজ, ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রাচার্য্য, বেড়াল-বেড়ালী বাঘের মেসো এবং মাসী, শেয়াল পণ্ডিতধূর্ত্ত আর পক্ষিকুলে কাক চতুর-চূড়ামণি।

বীরত্ব প্রকাশ করবার সময় মানুষ যেমন তর্জ্জনী তাড়না করে, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, কুকুর-বেড়াল-প্রভৃতি পশুরাও তেমনি লাঙ্গুল বা ল্যাজ আস্ফালন করে অর্থাৎ আছড়ায়। আবার ভয় পেলে মানুষ গুটোয় হাত-পা, পশু গুটোয় ল্যাজ। অবশ্য মানুষের ল্যাজ থাকলে, সেও তাই-ই গুটোত; নেই বলেই তাকে অপর অঙ্গের শরণ

ব্যাঘ্রাচার্য্য

(শিকার ধরবার সময় ল্যাজের ডগাটি এধার-ওধার করে)

নিতে হয়। কেননা,—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—এটা হচ্ছে শাস্ত্রীয় বিধি।

আরও বিশেষ-বিশেষ কাজে ল্যাজ কিরূপ গুরুতর সহায়, ভেবে দেখা উচিত। বেড়াল বাচ্ছাকালে আপনার ল্যাজ নিয়ে শিকার-শিকার খেলা করে, ভবিষ্যতে শিকারী হবে বলে; আর বুড়ো হলে ল্যাজ গুটিয়ে উনানের ধারে বসে তপস্যা করে, মোক্ষ লাভের আশায়। কুকুর ল্যাজে-মাথায় এক ক'রে কুণ্ডলী পাকায়, আয়েসের

ক্যাঙারু

(ইনি ল্যাজের জোরেই চলেন)

সাগরে সাঁতার কাট্‌বার উদ্দেশ্যে; গবাদি পশু ল্যাজ ঝাড়ে, মশা-মাছি তাড়াবার জন্যে; ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করে, আনন্দে নৃত্য করবার ইচ্ছায়; আর কুকুর ল্যাজ নাড়ে প্রভুর ঘাড়ে আরোহণ করবার সাধু অভিপ্রায়ে। সুতরাং ল্যাজ যে ওদের মনোভাব জানবারও দর্পণস্বরূপ, তার সন্দেহ নাই।

এইবার ক্যাঙারুর ল্যাজের কথা চিন্তা করুন। দেখুন, অন্ধের নড়ির সঙ্গে ওর কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! ওরই ওপর ভর করে সে হন্‌-হন্‌ করে ছুটে চলে, ঘোরে-ফেরে, আবার স্থির হয়ে বসে, কাৎ হয়ে শোয়।

কোনো-কোনো জানোয়ারের ল্যাজে অমৃত আছে কি-না, ঠিক জানা নেই; তবে বিষ যে আছে, তা প্রত্যক্ষ। কাঁকড়া-বিছের ল্যাজ, ভিমরুলের ল্যাজ এবং কোনো-কোনো সাপের ল্যাজএর অতি ভীষণ জ্বালাময় জলন্ত সাক্ষী।

আবার শোনা যায়, আমেরিকার জঙ্গলে একপ্রকার সাপের ল্যাজে ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টাকর্ণের ইতিহাস অবশ্য পুরাণ-প্রসিদ্ধ; ওরা কেন যে ঘণ্টাকর্ণের অবতার না হয়ে ঘণ্টালাঙুল হ'ল, সে এক বিষম সমস্যা। বৈজ্ঞানিকরা ওদের সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, ওর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কোনো নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, অনুমান করা যায়।

ব্যাঙের ল্যাজ নেই, কিন্তু ব্যাঙাচির আছে। বর্ষাকালে ব্যাঙেরা খালবিলের ধারে দল বেঁধে কাঁদতে বসে কেন জানেন?—ঐ ল্যাজের বিরহে। কেউ কেউ বলেন, তারা কাঁদে না— গান গায়। ও-কথা সর্ব্বৈব মিথ্যে—অত দুঃখে কেউ কখন গান গাইতে পারে?

টিকটিকির কিন্তু ল্যাজুড়-বিরহ নেই, কেন না তার ল্যাজুড় খসে গেলেই গজায়। যতবার খসে ততবার গজায়। দশাননের মাথারও ঠিক অমনি ধারা গজাবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল! তাঁর মাথার সঙ্গে টিকটিকির ল্যাজের খুব নিকট সম্বন্ধ থাকা সম্ভব।

তারপর, ল্যাজ যে অঙ্গের শোভা, তা বুঝাবার জন্য আমাদের বেশী মাথা ঘামাইবার দরকার নেই। Bird of Paradise আমরা স্বচক্ষে না দেখে থাকলেও তার ছবি আমরা সবাই দেখেছি; ময়ূরের পেখম ধরা দেখা গেছে, আর দেখা গেছে ঘোটকীর ল্যাজ। শুনা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোটকী-বিশেষের পুচ্ছ, অর্থাৎ ল্যাজের শোভা দেখেই 'ক্ষুধিত পাষাণে' অপ্সরীর কেশদামের কল্পনা করেছিলেন; নইলে ও-বস্তু তাঁরও স্বচক্ষে দেখে আসার সম্ভাবনা অল্প।

এইবার বানরের ল্যাজের বিষয় আলোচ্য। বানরের ল্যাজের সঙ্গে-সঙ্গেই অবশ্য হনুমান, বনমানুষ এবং রাক্ষস-খোক্কসের কথা মনে হয়। বানরকুলতিলক হনুমান যে সীতা-উদ্ধারের প্রধান সহায় হতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর ঐ অভ্রভেদী ল্যাজ। ল্যাজের বলেই তিনি সাগর ডিঙিয়ে রাক্ষস রাজকে সর্ষপ-পুষ্প দেখিয়ে, লঙ্কা দগ্ধ করে-ছিলেন। লঙ্কাদহের সময় তাঁর ল্যাজের বহর কিরূপ হয়েছিল, শ্রবণ করুন,—

"কুপিত হইলা বীর পবননন্দন।
বাড়াইয়া দিলা ল্যাজ পঞ্চাশ যোজন।"

পঞ্চাশ যোজন যে ব্যাপারখানা কি, তা আপনারা খড়ি পেতে আঁক না কসলে, ঠিক বুঝতে পারবেন না। তারপর ঐ ল্যাজে ত্রিশ মণ ওজনের কাপড় জড়িয়ে, ঘি ঢেলে আগুন দেওয়া হয়,—

"মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন ল্যাজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়ে পড়ে বীর বড়ঘরের চালে॥"

ল্যাজের বলেই যুবরাজ অঙ্গদ রাজ-সভায় ঢুকে দশাননের সিংহাসনের সমান উঁচু কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে, তারই দশ গালে চুণ আর দশ গালে কালি মাখিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যুবরাজের ল্যাজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এখানে তার একটু বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক;—

"কুণ্ডলী করিয়া ল্যাজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার যেন দিল ঐরাবতে॥
সুমেরুপর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা—বলে বাপ!—এটা এল কেহ॥"

পশ্বাদির ল্যাজের মহিমা শুনে এবং কতক-কতক দেখে আপনাদের দুঃখিত বা ঈর্ষ্যান্বিত হবার কারণ নেই;

Dr. N. C. Dassero L. M. D. S. (America)

কেন না, পণ্ডিতরাজ ডারবীণ বলে গেছেন, ওটা আমাদেরও এককালে ছিল, এবং এখনও যে একেবারে নেই, তা নয়; আছে,—কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হয়ে। এবং তাঁরই হেতুবাদ নিয়ে

চোখ বুজে ভেবে দেখ্‌লে, এটাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাবে যে, দেবতাদেরও ঐ অত্যাবশ্যক বস্তুটি সশরীরে বর্ত্তমান।

কিন্তু আমরা হতভাগ্য মানুষেরা হ্রস্ব ল্যাজ নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নই। তাই নানা রকম বস্তু ও অবস্তুকে ল্যাজ কল্পনা করে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে থাকি। তার মধ্যে খেতাব হচ্ছে একটি। এটি অবস্তু, সুতরাং নিরাকার; কিন্তু প্রকারে বিচিত্র; যেমন—সরকারী-বে-সরকারী, স্বদেশী-বিদেশী, কেনা, দানে পাওয়া, প'ড়ে পাওয়া, চুরি করা, গজিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে সরকারী খেতাব যাঁদের আছে, তাঁরা আছেন কেমন, তাঁদের হাল কি, চাল কিরূপ; এবং যাঁরা তা পাবার প্রয়াসী, তাঁদেরই বা কর্ত্তব্য কিম্বিধ, তা আপনারা অনেকেই জানেন; আর মহাজনেরাও গদ্যে-পদ্যে সবিস্তারে তা লিখে গেছেন, সুতরাং ও-বিষয়ে আর আমার নূতন কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই বাহুল্য। তবে কথাটা যখন তোলা গিয়েছে, তখন এই সরকারী ল্যাজুড় সম্বন্ধে দুই-একটা দৃষ্টান্ত না দিলে বিবরণটী যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব আপনারা অবহিত হ'ন, আমি ল্যাজুড়-মাহাত্ম্যের দুই-একটা নমুনা দিই।

শুনেছি, এবং সত্য ব'লেও বিশ্বাস করি যে, এক মহাত্মা একটা ল্যাজুড়, যে উপায়েই হোক, লাভ করেছিলেন;

R. D. Bosa K. O. B

তাঁকে না কি একজন চিঠি লিখিবার সময়, ভ্রমক্রমে—ইচ্ছা করে নিশ্চয়ই নয়,—সেই ল্যাজুড়ের উল্লেখ করেন নি। এই মহা অপরাধে ল্যাজুড়ধারী মহোদয় ভদ্রলোকের চিঠি-খানি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; খামের উপর লিখে দিয়ে-ছিলেন Refused, insufficiently addressed।

আবার, আর এক জায়গায়, বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি যে,

ব্রাদার তমসুকভূষণ জোয়াদ্দার F. T. S.
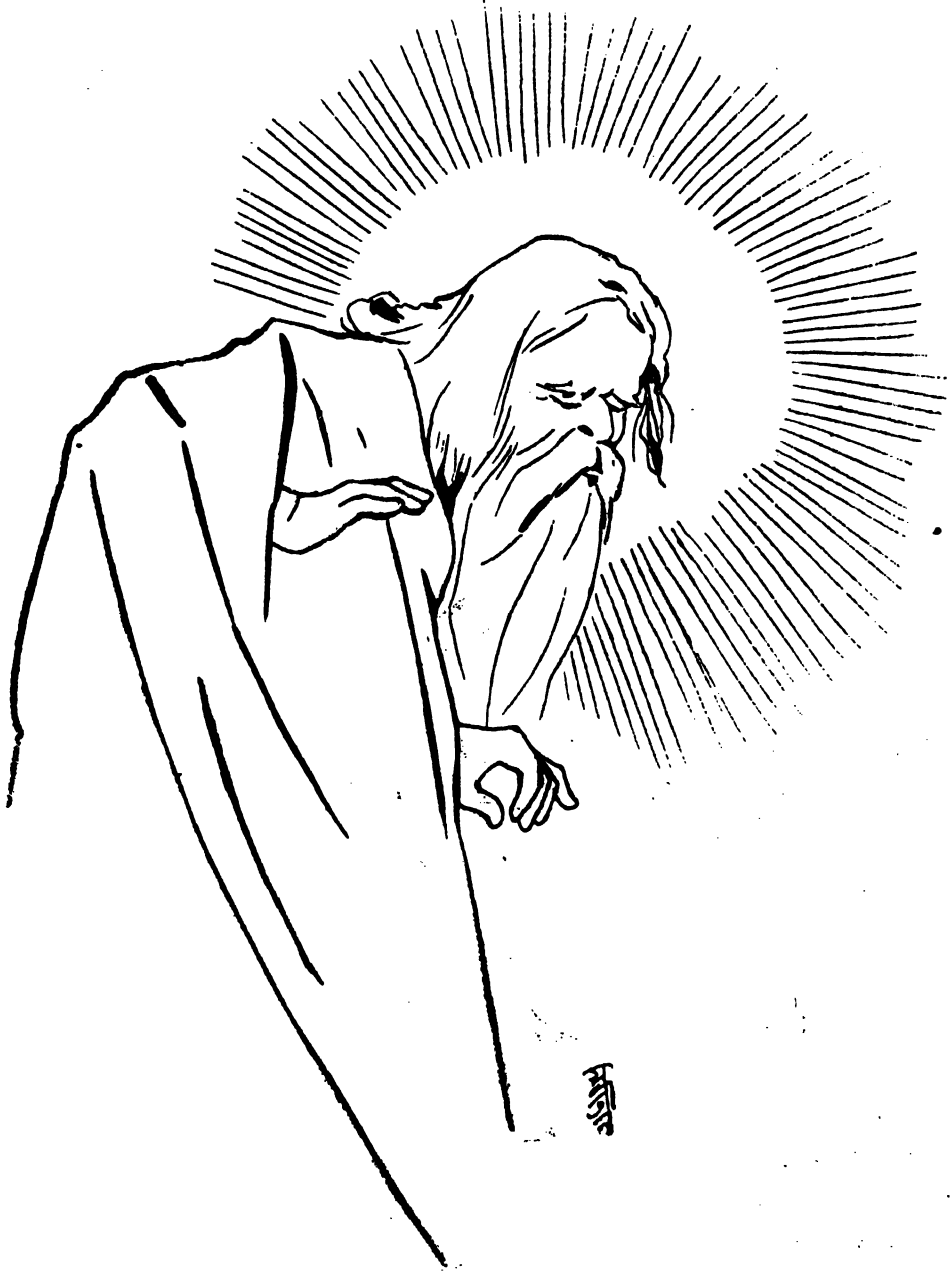
কোন রায়-বাহাদুরণী, যাদের উক্ত বা উহা হইতে দীর্ঘতর ল্যাজুড় নেই, তাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে যেতেন না, পাছে ল্যাজুড়ের সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

আমাদেরই একজন পূজনীয় প্রতিবেশী ছিলেন। সাধনা-বলে তাঁর একটা ল্যাজুড় লাভ হয়েছিল। একবার এক নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর গ্রামে পদার্পন করেন। প্রতিবেশী মহোদয় দেখা করতে গেলে সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কে?" তিনি তখন নিজ মুখে নিজের ল্যাজুড়ের পরিচয় না দিয়ে পকেট থেকে এক কার্ড বের করে সাহেবের

শ্রীমৎ চতুরানন্দ স্বামী

হাতে দেন। সে কার্ডে সরকারী ল্যাজুড়ের উল্লেখ ত ছিলই, আর ছিল, স্বরচিত একটা ল্যাজুড়; সেটা হচ্চে এফ্-এ-এফ্। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটার মানে ত বুঝতে পারছি নে?' লাঙ্গুলধারী সগর্ব্বে বল্লেন, 'ওটার অর্থ হচ্চে, এফ-এ পরীক্ষায় ফেল।' সাহেব সদয়ে গিয়ে সেইবারই তাঁর লাঙ্গুল দীর্ঘতর করে দিয়েছিলেন।

মানুষের এই সব ল্যাজুড় বইবার জন্ত বাহন আছে। তাদের নাম সাধুভাষায় 'সহকারী,' আমাদের চল্তি ভাষায় 'মোসায়েব।' তারা যখন-তখন ল্যাজুড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; কেহ ল্যাজুড়ের উল্লেখ না করে সম্বোধন করলে তখনই সংশোধন করে দেয়। এর জন্ত তারা নাকি কিছু কিছু পেয়েও থাকে।

অন্ত যে সব ল্যাজুড়ের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, তাদের মনোহারিত্বও কম নয়, সুতরাং তার গুণগান আমি একটু বিস্তৃত ভাবে করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

এই শ্রেণীর ল্যাজকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) শাস্ত্রীয়, (২) অশাস্ত্রীয় বা ইঙ্গ-বঙ্গীয়।

শাস্ত্রীয় ল্যাজুড়, যথা,—'জ্ঞানারণ্য-বরেণ্য-শার্দ্দুল,' 'জন-গণ-মন-ধনাধি-নায়ক,' 'চিত্রকলার্ণব-রস-সিন্ধুঘোটক,' 'কাব্য-কোকনদ-বনবিহারী-মধু-মধুপানোন্মত্ত মধুপ' ইত্যাদি।

ইঙ্গ-বঙ্গীয়, যথা,—'Expert,' 'L, M.,' 'D. S.,' 'P. M. C.' 'M. H. F. C.' প্রভৃতি।

উদাহরণ-মালা

একটি সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলের বইয়ে তার সল্যাজুড় নাম দেখা গেল, শ্রীকানাইলাল দত্ত P. M. C, P. M. C'র

মানে, Pre-Matriculation class, অর্থাৎ কি না ছেলেটির তখনো Matric class হয় নি।

ক্রমে সাবালকদের দিকে আসুন।

শ্রীনকুড়চন্দ্র দাস। এঁর নাম ল্যাজুড় সমেত, Dr. N. C. Dassero L. M. D. S. (America অর্থাৎ Licenciate in Medicine, Doctor of Surgery.

শ্রীপদ্মরাগকান্তি তলাপাত্র—P. R. K. Tallapatra Esq ; A. E., M. E., (Gr. Bt.)—(Automobile Engineer and Motor Expert ; Great Britain.)

শ্রীরামধন বোস—R. D Bosa, K. C. B. (কেল্‌নার কোম্পানীর বাবু)।
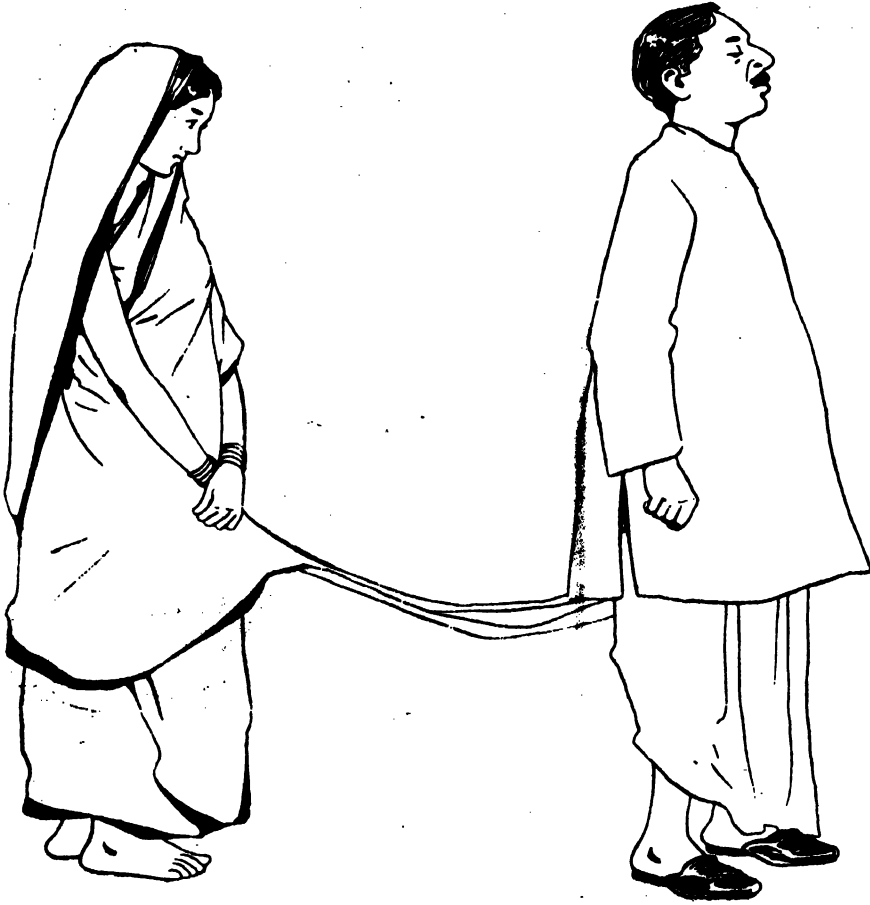
মিঞা বাবুল হুসেন, মালিক-ই-ফটক্

বিবাহিতের সাকার ল্যাজুড়

রায়সাহেব রামসত্য তালুকদার, C. C. (Confidential Clerk,)

ক্ষীণেশচন্দ্র পাকড়াশী—B. C. (Bank Clerk).

ব্রাদার তমসুকভূষণ জোয়ারদার, F. T. S., (Boston Mass)—(Fellow of the Theosophical Society)

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর্ম্মকার—ইনি নাম বদলে ল্যাজুড় লাগিয়ে হয়েছেন—শ্রীমৎ চতুরানন্দ স্বামী।

মির্জ্জা বাবুল হুসেন – মালিক—ই – ফটক্। ইনি একটি কারখানার দ্বাররক্ষী।

এইরূপ ল্যাজুড়ের আদি-অন্ত নেই—কত আর বলবো? ল্যাজযুক্ত প্রাণীরা ল্যাজের সাহায্যে যা-যা করে, ল্যাজুড়ওয়ালা জীবেরাও ল্যাজুড়ের সাহায্যে তাই তাই করে থাকে। এটি তাদের মনোভাব প্রকাশ করবার প্রধান সহায়।

নিরাকার ল্যাজের পরিচয় আপনারা পূর্ব্বেই পেয়েছেন, এইবার মানুষের সাকার ল্যাজুড়েরও একটু পরিচয় নিন, না হলে পরিচয়টী সম্পূর্ণ হবে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বিবাহিত লোকেদের বরাতেই এটি জোটে। প্রকাশ করে বলতে হবে কি, দ্রব্যটি—পত্নী? বিবাহিত লোকের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, মনোভাব আরও বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির বিকাশ—সবের মূলেই এই ল্যাজুড়। ক্যাঙারুর ল্যাজের মতন এটি যে ভর্ত্তাদের একটি বলবান অঙ্গ, তা প্রকাশ করে বলাই বাহুল্য।

এইখানেই পালা শেষ করতে চাই; কারণ স্থানাভাব, এবং নিরীহ পাঠকদেরও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। তবে আমার পক্ষে ভরসার কথা এই যে,—

লাঙুল-মঙ্গল কথা অমৃত সমান।
যারা যারা শোনে তারা মহা পুণ্যবান॥

ময়না

(গল্প)

[শ্রীমতী উমাশশী ঘোষ]

আকাশের গায়ে শ্রাবণের কাল মেঘ স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিয়াছে। আবার বুঝি বৃষ্টি নামিল।

আমি এই কলীয়ারীতে কাজ করিতে আসিয়া অবধি আমার নাম হইয়াছে—কম্পাস্‌বাবু! কম্পাস্‌ লইয়া সাঁওতালী কুলীদের সঙ্গেই আমার প্রবাসের দিনগুলি কোন-রকমে কাটিয়া যায়।

সেদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়িয়াছে, গাছপালা মাটি সবই আর্দ্র, বাতাস সিক্ত, মন্থর। এক কোণে অবিরাম তড়িৎ ঝলকিয়া উঠিতেছে।

সম্মুখে কয়লার খাদ, তাহারই পাশে একটি সরু খাল কাটা, তাহাতে জল জমিয়াছে, সেই জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া কয়টা শূকর বিষম কলরব জুড়িয়া দিয়াছে।

নিকটে একটি কুলিদের ধাওড়া, তাহার চাল ফুড়িয়া ভিতরে জল পড়িতেছে। রাত্রিতে কিরূপে কাটাইবে সেই চেষ্টায় তাহারা ব্যতিব্যস্ত। বিদ্যুৎ চমকাইল। অবিরাম বর্ষণ চলিতেছে।

বৃষ্টির বেগ একটু কমিয়া আসিলে, ধাওড়া হইতে একটি সাঁওতাল রমণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণীর বয়স কাঁচা, সুচিক্কণ কাল কেশে মুখখানি প্রায় ঢাকা। পরিপুষ্ট কাল দেহে যৌবনের সৌন্দর্য্য ঢল ঢল করিতেছে। রমণী আমাদের কয়লা কুঠির ভিখু সর্দ্দারের যুবতী কন্যা ময়না। ময়না পাগল।

কয়লা খাদ চলিতেছে, এত বৃষ্টিতে খাদের কাজ বন্ধ নাই। কয়লা বোঝাই হইয়া পর পর টব্‌ গাড়ী উঠিতেছে। ময়না নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ তাহা দেখিল। পরে সেই খাদের নিকট আসিয়া, তাহার জলে বেশ করিয়া হস্ত পদ ধৌত করিল। এমন সময় তাহার মাতা কুটির হইতে বাহির হইয়া, তাহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনেক কাকুতি করিল। সে অচল অটল। কিছুতেই গৃহে ফিরিল না। নীরব নিস্পন্দ হইয়া পুনরায় কয়লা গাড়ীর উঠা-নাবা দেখিতে লাগিল। বৃষ্টির জলে সিক্ত ছিন্ন মলিন বসনখানি অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার নগ্ন সৌন্দর্য্যে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া কুলি সর্দ্দারেরা কুৎসিত রঙ্গ করিতে লাগিল। তাহাদের দিকে দৃকপাৎ মাত্র না করিয়া সে মাঠের পথে চলিয়া গেল।

পরদিন বৃষ্টি থামিলে দেখিলাম, আকাশ স্বচ্ছ হইয়াছে। সমস্ত মাঠ শ্যামল সৌন্দর্য্যে শোভান্বিত হইয়া অভিনব বেশ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া মন পুলকিত হইয়া উঠিল। বেড়াইতে বাহির হইলাম। মাঠের পথ ধরিয়া চলিয়াছি। চারিদিকে ধসা খাদ, কোনরূপ তারের বেড়া অবধি নাই। সাবধানে চলিলাম। তখন বর্ষাকাল, নানারূপ তৃণ পুষ্পে চারিদিকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। হঠাৎ একস্থানে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলাম, ময়না একটি ধসা খাদে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিতেছে। পাগলের খেয়াল ভাবিয়া আমি তত্‌টা গ্রাহ্য করিলাম না। ময়না পূর্ব্বে পাগল ছিল না। একবার আমাদের কলিয়ারিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, ময়নার ভাবী পতি মোহন তাহাতেই মারা যায়। তখন হইতে ময়না পাগলের প্রায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মোহনের মৃত্যুর পর অনেক যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, সে রাজি হয় নাই। মোহন তরুণ বয়স্ক কর্ম্মপটু সাঁওতাল যুবক। ময়নার খেলার সাথী। বয়সের সঙ্গে তাহাদের বাল্যপ্রীতি প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়। তাহারা বেশীক্ষণ কাছ ছাড়া হইত না। উভয়ের পিতা-মাতা ইহা জানিয়া তাহাদের বিবাহ প্রস্তাব ঠিক করে। হঠাৎ মোহনের পিতা মাতার মৃত্যু হওয়াতে বিবাহ স্থগিত থাকে। পরে মোহন স্থির

করিল, বেশী উপার্জ্জন করিয়া হাতে কিছু পয়সা হইলে, ময়নাকে বিবাহ করিবে, তাহা হইলে তাহারা সুখে থাকিতে পারিবে। দৈব দুর্ব্বিপাকে একদিন কয়লার খাদের অতল গহ্বরে, তাহার সকল সাধ, আশা লুপ্ত হইল।

তাহার শোচনীয় মৃত্যুর জন্য কতকটা আমিও দায়ী, সেজন্য ময়নাকে দেখিলে, অনুশোচনায় আমার হৃদয় দগ্ধ হইত। ইচ্ছা হয় তাহাকে সান্ত্বনা দি, কিন্তু সাহসে কুলায় না।

মোহনের মৃত্যু—সেকথা ভাবিতে গেলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে!

একদিন সকালে আমি খাদে নাবিবার জন্য ডুলিতে উঠিতে যাইব, এমন সময় আমার জুতার ফিতা খুলিয়া গেল—আমি তাহা আঁটিতে লাগিলাম। আমার নাবিবার বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, সেই ডুলিতে মালকাটাদের নাবিতে বলিলাম। ডুলিতে একসঙ্গে বার জন কুলির চড়িবার নিয়ম আছে। তাহারা তের জন ডুলিতে উঠিয়া পড়িল। একজনকে বেশী উঠিতে দেখিয়া ওভারম্যান আসিয়া বকাবকি করিয়া তাহাকে নাবাইল। সেই কুলীর নাবিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষের মধ্যে দড়ি ছিঁড়িয়া বারজন কুলি সমেত ডুলি নীচে পড়িয়া গেল। এবং সেই সঙ্গে তাহাদের ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

মোহনও তাহাদের মধ্যে ছিল।

বারটা জীবন কয়লার নিচে সমাধিস্থ হইল। রসা ছিঁড়িয়া যাওয়াতে পিট্-এর মুখে ডুলি নাবাইয়া তাহাদের মৃত দেহ তুলিবার সুবিধা হইল না। তাহাদের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে না হইতে ভিখুর সহিত ময়নাও সেস্থলে উপস্থিত হইল। এই দুঃসংবাদে সে কেমনতর হইয়া পড়িল। নিচে মোহনের মৃত্যু হইয়াছে সেকথা সে কিছুতেই মানিতে চাহে না। সকলকার হাতে পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল, যে তাহাকে নিচে নাবাইয়া দেওয়া হোক। মোহনা নিশ্চয়ই জীবিত আছে। তাহাকে বোঝান দায় হইল। কখনও সে গর্ত্তের মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িতে যায়। ধরিয়া রাখা অসাধ্য। ইতি মধ্যে কোম্পানীর লোকেরা আসিয়া পড়িল। ম্যানেজার উপস্থিত না থাকায় আমারই উপর সব রোক পড়িল। তবে এই রক্ষে সাহেব কোম্পানীরা কুলিদের মৃত্যু লইয়া বেশী হাঙ্গামা করেন না। কারণ কুলিদের জীবনের কোন মূল্যই তাহাদের নিকট নাই। সুতরাং কোম্পানীর লোকেরা তত ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই চলিয়া গেলেন। আমাকেও অনুতপ্তচিত্তে গৃহে ফিরিতে হইল।

সেই অবধি ময়নাকে প্রায় খাদের নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখি। আমায় দেখিয়া কতদিন সে প্রশ্ন করিয়াছে,—"বাবু মোহনা কি নিচে এখনও খাটুতেছে? তারে ছুটী দিবি নারে বাবু?"

আমি আর সে প্রশ্নের কি জবাব দিব, ধীরে ধীরে আপন কাজে চলিয়া যাইতাম।

আজ তাহাকে ধসা খাদের নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আগে ততটা গ্রাহ্য করি নাই বটে, কিন্তু ফিরিবার পথেও যখন দেখিলাম, সে একই ভাবে ঝুঁকিয়া গর্ত্তের দিকে মন নিবিষ্ট করিয়া কি দেখিতেছে; তখন কৌতূহল বশে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পদশব্দে ময়না বারেক মুখ তুলিয়া চাহিয়াই, পুনরায় মুখ ফিরাইয়া লইল। কি এত মন দিয়া দেখিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম—"ময়না ওখানে কি আছে?"

আমার সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিজে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করিল—"তুই কিছু দেখ্‌তেছিস্?"

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম—"না।"

—"ঐ দেখ, ঐ আঁধারে সে মোকে ডাক্‌তেছে! বল্ দেখি বাবু—মুই একা কেম্‌নে যাই?"

—"হঁারে ময়না, কাল থেকে তুই এখানে বসে আছিস্—এই জলে! ঘরে যাসনি?"

ঝাঁকড়া চুলশুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়া সে কহিল—"নারে না, মুই কাল ঘরে ছিলি। দেখ্ বাবু, তোরা ত মুইকে ডুলি খাদে নাম্‌তে দিস্‌না, মুই এই খাদে নেবে মোহনার ঠেঁয়ে যাইবু; যেতে কি ভর লাগ্‌বে বাবু?"

—"না না ময়না, তুই ওঠ্—"

—"যদি ডর পাই, বাবু তুই পৌঁছায় দিবি।" এই বলিয়া সে তাহার আয়ত নয়ন যুগলে ব্যাকুল আগ্রহ লইয়া আমার পানে চাহিল। সে চোখে কি গভীর প্রণয় রেখা অঙ্কিত। যেন কত যুগ ধরিয়া সে তাহার প্রেমাস্পদের

প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। সে সরলতা মণ্ডিত পবিত্র মুখের প্রতি, আমি দৃষ্টি তুলিতে পারিলাম না।

—"বাবু তুই পৌছায়ে দিবি না?"

হায় অভাগী, কাহাকে এত বিশ্বাস! জানিস নাকি, আমা হইতেই আজ তোর এই দশা?

কিন্তু তার এতটা বিশ্বাস ভাঙ্গিতে পারিলাম না, কহিলাম—"আচ্ছা তা দেব—তুই এখন ঘরে চল।"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সে কহিল—"ঘর কোথায় রে! মোহনাকে ছেড়ে ঘর, সেই ত মোর সবরে!"

—"ময়না বৃষ্টি আসছে, আজ ঘরে যা, কাল তোকে আমি ঠিক পৌছে দেব।"

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে গর্ত্তের দিকে চাহিয়া একটি চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল;

সান্ত্বনার স্বরে তাহাকে কহিলাম—"আমি মিছা বলিনিরে। আজ তুই ঘরে যা, তোর বাপ হয়ত তোকে খুঁজছে।"

সে কুটির অভিমুখে ফিরিলে, আমিও গৃহে ফিরিলাম। সমস্ত দিন এই উন্মাদ বালিকার ব্যগ্র চাহনি ও খাদে পৌছাইয়া দিবার কাতর মিনতি স্মরণ পথে উদিত হইয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে কিসের আকর্ষণে আমায় বাহিরের পানে টানিতে লাগিল। বেড়াইতে বাহির হইব এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেদিন রবিবার খাদের কাজ বন্ধ; এই একটি দিন কুলিরা যথেচ্ছা স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়। তাহাদের বাঁশীর সুর দূর দূরান্ত হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে, সে সুর কাণে আসিতে না আসিতেই শূণ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। নিকটের কোন সাঁওতাল কুটির হইতে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ঘরে বসিয়া তাহাই শুনিতে লাগিলাম।

মনে পড়িল—এইরূপ প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় মোহনের বাঁশী বাজিত! কতদিন বেড়াইতে গিয়া দেখিয়াছি, মাঠের ধারে বসিয়া সে বাঁশী বাজাইতেছে; আর ময়না আকুল প্রাণে শুনিতেছে, তাহার একটি হাত মোহনের কাঁধের উপর; দেখিয়া মনে হইল, তাহারা দুটিতে যেন এ পৃথিবীর জীব নহে। দূর দূরান্তের কোন মায়ালোকে তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে! নিকটের কোন বস্তুর অনুভব শক্তি অবধি লুপ্তপ্রায়। চলিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতাম, দৃষ্টি আমার ফিরিত না। কখনও বা দেখিতাম মোহন একলাই বাঁশী বাজাইয়া মাঠের পথে চলিয়াছে, আমাকে দেখিলেই বাঁশী বন্ধ করিয়া হাসিয়া কহিত "বাবু এ ধারে যে?"

আমিও রহস্য ভরে কহিতাম—"তোর বাঁশীর সুরে এ পথে এলাম। কই ময়নাকে যে আজ দেখছি না?"

কৌতুকের হাসি হাসিয়া, মোহন কহিত,—"উটা আমার সাথে বড় লড়তে লেগেছে বাবু। উয়াকে মুই আর বিয়া কোরবো নারে!"

"তাই নাকি,—ময়না রাজি আছে ত?"

"তা বাবু উটা মেয়েজাত সকলইতে রাজি থাকে!" হাসিয়া সে মুখ বাঁশী তুলিয়া ইসারায় দেখাইত; দূরে তরুগুল্মের ভিতর ময়না বসিয়া আছে! এটাকে শুধু তাহাদের খেলা বুঝিতে পারিয়া আসিয়া আমিও হাসিয়া সরিয়া পড়িতাম। ময়নার কথা স্মরণ হইতে এই সজল মধুর চিত্র নয়ন সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, ময়না যেন আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলিতেছে, "বাবু মোরে পৌছে দিলি নারে? ও যে আমাকে ডাকছে —চলে আয়! চলে আয় রে!"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখনও ময়নার কাতর আহ্বান কাণে লাগিল। উঠিয়া বাহিরের প্রতি দৃষ্টি মেলিলাম, কেবল অসীম অন্ধকার। সত্যই কি এই উন্মাদিনী আমারি অপেক্ষায় থাকিয়া শেষে আমার ছলনা বুঝিয়া কাতর আহ্বান করিতেছে! যদি তাহাই হয়, না জানি সে পাগল, এতক্ষণে কি বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়াছে! শেষে এই বিপদের জন্যও কি আমি দায়ী হইব? স্বেচ্ছাকৃত না হইলেও, মোহনের মৃত্যু জনিত দুঃখে আমার অন্তর ছেয়ে গেছে, এই পাপে আমি অপরাধী। ভগবান! এ অপরাধের বোঝা আর বাড়াইও না। এত রাত্রে অন্ধকারে এখানকার পথে বাহির হওয়া দুরূহ; যুক্ত করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা

করিলাম, ময়নাকে তুমিই রক্ষা কর ঠাকুর! আহা বুড় বাপ মার সে একমাত্র সন্তান। আবার শুইয়া পড়িলাম। শেষ রাত্রে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, আবার স্বপ্ন দেখিলাম। মোহন আর ময়না। মোহনের হাতে বাঁশী, ময়না বনফুল দিয়া সাজিয়াছে। আমাকে দেখাইয়া মোহন যেন বলিল,—"এই সেই বাবু?"

"নারে না, তুই চিনিস নাই। এই বাবুত মোরে তোর ঠেঁয়ে পৌঁছে দিল।"

"তা দিলত কি—উয়ারই লিয়ে মুই খাদে পড়ছিনু।"

এই কথা শুনিবামাত্র ময়না তাহার বিশাল চক্ষু হইতে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"বাবু—!"

আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো আমার গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে, "বাবু—এ কম্পাস বাবু।"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, ভিখু আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। রাতের স্বপ্ন চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল। আমায় দেখিয়া সে কহিল, "বাবু ময়না কি এখানে এসেছে?"

"কই নাত! কখন থেকে তাকে পাসনি?"

"কাল সন্ধ্যা থেকে বাবু সে বাড়ী যায় নি। মজুয়া ছোড়াকে নাকি সে বলেছিল, কম্পাসবাবু তারে খাদের নিচে পৌঁছে দিবে বলেছে। তাই তুহার লেগে এয়েছি, হ্যা বাবু ময়না তবে কোথায় গেল?

"ভয়কি আছে কোথাও!" বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কাল সকালে সে যে ধসাখাদের কাছে বসিয়াছিল; এবং আমার সহিত তাহার কি কি আলাপ হইয়াছিল সব বলিলাম, শুনিয়া ভিখু কহিল "তবে সেই ঠাঁই কোথাও আছে, দেখিগে"—ভিখুর সহিত আমিও ধসাখাদের পরিধায় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোথাও ময়নার চিহ্ন পাওয়া গেল না। হঠাৎ ভিখু হুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতেই নীচে ধসাখাদের দিকে অঙ্গুলী দিয়া ভিখু দেখাইল, গর্ত্তের মুখে গাছ পালায় ছিন্ন কাপড়ের একটু টুকরা; সমস্তই তখন পরিষ্কার হইয়া গেল। ভিখুকে আর কি বলিব—কোন সান্ত্বনার ভাষাই মুখে আসিল না। আর সান্ত্বনা দিবে কে এই অপরাধের গুরুত্ব যাহার উপরে পড়িল সে কোনমুখে সান্ত্বনা দিবে! পূর্ব্বে যদি আমি ভিখুকে জানাইতাম তবে হয়তো এ বিভ্রাট ঘটিত না। পাগলের প্রলাপ ভাবিয়া আমি গ্রাহ্য করি নাই স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইয়া ছিলাম। সে আমার উপর নির্ভর করিয়া, বিশ্বাস করিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছিল। পরে আমার ছলনা বুঝিয়া, আমাকে অবিশ্বাসী জানিয়া একাই দুর্গমপথে বাঞ্ছিতের সন্ধানে আত্মবিসর্জ্জন দিল!

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

একদিন খোকার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল। শরৎকুমার যষ্টি হস্তে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গৃহ প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রমদা, পদস্থ পিতার পুত্রের পদবৈকল্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। জামাতা তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি! তুমি অমন খোঁড়াচ্ছ আর অত রোগা হ'য়ে গেছ কেন?'

শ্বশ্রূকে তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা জানিয়াও, শরৎকুমার তাঁহাকে সত্যকথা বলিতে পারিল না। তেমন পারদর্শী অশ্বারোহী হইয়াও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতনের অসম্ভব কথা সে পুরুষ জামাতা হইয়া, স্ত্রী জাতীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিল না; এবং তাহার পতনের কারণ যে অপারদর্শীতা নহে, সুরাপানই যে তাহার যথার্থ কারণ, সে কথাও তাঁহার ন্যায় মান্যা গুরুজনের কাছে ব্যক্ত করিয়া সে তাঁহার বদ্ধমূল সুধারণা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল না। সে কেবল বলিল, 'আমার বড় কঠিন রোগ হ'য়েছিল, তাতে আমার ডান পা'টা একটু ছোট হ'য়ে গেছে। কিছুদিন ওষুধ মালিশ কর্ত্তে কর্ত্তে ওটা সেরে যাবে।'

বুদ্ধিমতী প্রমদা পল্লীর এক কবিরাজের নিকট হইতে, আট আনা পয়সা ব্যয় করিয়া এক প্রকার মহোপকারী তৈল অর্দ্ধ পোয়া পরিমাণ আনাইয়া দিলেন; এবং 'খঞ্জর সা' পীরের কাছে স' পাঁচ পয়সার সিন্নি ও একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত তুরঙ্গম মানত করিয়া জামাতার বিকল পদটী নিরাময় করিয়া দিবার জন্ত করুণ স্বরে প্রার্থনা করিলেন। ঈশানী কোমল হস্তে স্বামীর খঞ্জপদে অহরহঃ সেই অপূর্ব্ব তৈল ম্রক্ষণ করিয়া দিতে লাগিল। প্রমদা প্রত্যহ প্রাতঃ সন্ধ্যায় পীরকে প্রণাম করিয়া, সিন্নি এবং ঘোটকের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ঈশানীর সুকুমার করে মালিশ করিতে করিতে, বেদনা হইল; তৈল ফুরাইয়া গেল; তৈল নিষিক্ত শয্যা মলিন হইয়া গেল; প্রমদার প্রার্থনা শুনিয়া পীরের অদৃশ্য কর্ণে তালা লাগিল; কিন্তু শরৎকুমারের বক্র ও খর্ব্ব পদ আর কখনও ঋজু বা লম্বা হইল না।

এইরূপে প্রায় দুই মাস কাল অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে শরৎকুমার কিন্তু একবারও তাহাদের বাটী ও সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যাইবার কথার উল্লেখ মাত্র করিল না;—নিঃস্ব হইয়া যাইবার সত্যকথা কি গর্ব্বিত ডেপুটীপুত্র কাহাকেও, বিশেষতঃ শ্বশুরালয়ে বলিতে পারে? সে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীকে তাহার প্রার্থিত অর্থও দিল না;—তোমরা জান তাহা দিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

ঈশানী রুগ্ন স্বামীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিল না। প্রমদাও, একটা বাহ্যিক লজ্জায় পড়িয়া রুগ্ন ও খঞ্জ জামাতাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

———

ত্রয়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাপের আশীর্ব্বাদ।

যদুপতি সিরাজগঞ্জে আপন বাটীতে ফিরিয়া, পত্নী কল্যাণীকে কহিল, 'বরিশালে তোমাদের নূতন বাড়ীতে আমি তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করিতে গিয়েছিলাম। ঈশানী এখন ছেলে নিয়ে সেই খানেই আছে। ছেলেটি বড় সুন্দর হ'য়েছে। আমি ত ছেলের মুখ দেখ্‌বার জন্যে কিছু গহনা টহনা নিয়ে যাই নি; একখানা দশ টাকার নোট দিয়েই মুখ দেখ্‌লাম; আর ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদর করলাম।

কল্যাণী কহিল, 'বেশ করেছ।'

যদুপতি বলিল, 'বেশ কার নি। আমি শেষকালে সেখানে একটা বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।'

কল্যাণী স্বামীকে চিনিত ; জানিত, কোন অন্যায় কাজ যদুপতি করিতে পারে না। অতএব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি আবার অন্যায় কাজ করলে ? কারুর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়নি ত ?'

যদুপতিও হাসিল ;—প্রণয়িনীকে কাঁদিতে দেখিলে কাঁদিতে হয়, হাসিতে দেখিলে, হাসিতে হয়, ইহাই প্রেমের সনাতন বিধান। সে হাসিয়া বলিল, 'না ; এম্নি কপাল করেছি যে, এ কাল রূপ দেখে তুমি ছাড়া আর কেউ মজে না।—এ রূপের কাছে প্রেমিকাদের সমস্ত প্রেম স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রেম না করলেও, আমি অন্য একটা মস্ত অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। তুমি ত জান যে, শরৎদের ঢাকার বাড়ী আর বিষয় আশায় সব বিক্রী হ'য়ে গেছে।

কল্যাণী। হ্যা, সে কথা ত অনেকদিন আগে শুনেছি ; আর সেই বিষয় আর বাড়ী আমাদের সিরাজগঞ্জের গুরুচরণ বাবু কিনেছেন।

যদুপতি। সেখানে আমি সেই কথাটা কথায় কথায় বলে ফেলেছি। এটা কি বড় অন্যায় কাজ হয় নি ?

কল্যাণী। সে আবার অন্যায় কি করে হ'ল ? সেত সত্যি কথাই হ'ল।

যদুপতি। সত্যি কথা হলেও, তা' বলাটা আমার পক্ষে অন্যায় কাজ হয়েছে।

কল্যাণী। কি করে ?

যদুপতি। অন্যায় হ'য়েছে বই কি। আমি যদি বলি যে, তোমার চোখ দু'টা বড্ড ছোট ; সেটা সত্যি কথা হ'বে ; কিন্তু সেটা তোমার মোটে ভাল লাগবে না ; অন্যায় ক'রে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি বলে, হয়ত তুমি কত রাগ করবে।

কল্যাণী। কিন্তু সেটা ত একটুও সত্য কথা হ'বে না ;—যে চোখের কটাক্ষতে, তোমার মত একজন পুরুষকে বেঁধে রাখতে পারা যায়, সে চোখ কখনই ছোট হ'তে পারে না। তা' ছাড়া, তুমি আমাকে যাই বল না কেন, তাই আমার মিষ্টি লাগে ; তোমার উপর আমার রাগ করবার ক্ষমতাই নেই।

যদুপতি। আচ্ছা, আর একজন মেয়েমানুষ যদি তোমায় বলে যে, তোমার স্বামীটি বড় কাল।

কল্যাণী। ইস্! তা আর বলতে হয় না ? তা'হলে নোড়া দিয়ে আমি তার মুখ ভেঙ্গে দিই।

যদুপতি। কেন বেচারার মুখ ভেঙ্গে দাও ? সেত সত্যি কথাই বলে।

কল্যাণী। কেন সে আমার প্রাণে ঘা দিয়ে, অন্যায় করে, আমার স্বামীকে কাল বলবে!

যদুপতি। তা' হ'লেই তুমি বেশ বুঝতে পারছ যে, সত্যি কথা বলে, যদি কারও মনে কষ্ট দেওয়া হয়, তবে সে সত্যি কথাও মিছে কথার মতই অন্যায় কাজ। তাই আমাদের দেশের জ্ঞানী লোকেরা, অপ্রিয় সত্য বলতে নিষেধ করেছেন। শরতের বাড়ী আর জমীদারী বিক্রী হ'য়ে যাওয়ার কথাটা যে তাঁদের অত্যন্ত অপ্রিয় হ'য়েছিল, তা' আমি তাঁদের মুখ দেখেই সে সময় বুঝতে পেরেছিলাম।

কল্যাণী। তা যা করে ফেলেছ তা ত এখন আর ফিরবে না। এরপর ভেবে চিন্তে এই অন্যায়ের একটা কিছু প্রতিকার করলেই হবে। এখন তোমার কাজ কর্ম্মের কি হ'ল বল। কত টাকার নারকেল কিনেছ ?

যদুপতি। যা' পুঁজি-পাতি ছিল, সব টাকারই নারিকেল কিনেছি। আবার কিছু ধারেও কিনেছি।

কল্যাণী। কেন, ধারে কিন্‌লে কেন ?

যদুপতি। ত্রিশ হাজার টাকার নারিকেল কিনে তা বিক্রী করলে যা লাভ হয়, চল্লিশ হাজার টাকার নারিকেলে তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। কিন্তু আমার হাতে ত্রিশ হাজারের বেশী ছিল না। কাজেই চল্লিশ হাজার টাকার নারিকেলের লাভটা পেতে হলে, আমার দশ হাজার টাকা বাকী রাখতে হয়।

কল্যাণী। বাঃ, বেশ মজা ত! একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি গিরি! ধারে তুমি আরও বেশী টাকার নারকেল কিন্‌লে না কেন ? আরও অনেক টাকা লাভ হ'ত।

যদুপতি। কিন্তু লোকে আর আমায় বেশী টাকার জিনিষ ধারে দেবে কেন? যত টাকার জিনিষ আমাকে ধারে বিক্রী করলে, লোকে বুঝবে যে টাকাটা সহজেই আদায় করা যাবে, তত টাকার জিনিষই আমাকে ধারে দেবে। লোকে যতটা আমাকে বিশ্বাস করবে, ততটাই আমাকে ধার দেবে; একেই বলে ব্যবসার পসার। ব্যবসাদারের পসার যত বাড়বে, ততই সে বেশী টাকার জিনিষ ধারে পাবে, আর ততই তার লাভ বেশী হ'বে। দেনা পাওনা সম্বন্ধে, যে ব্যবসাদার কথার ঠিক রাখতে পারে, তারই পসার হয়। আমি যে দশ হাজার টাকার জিনিষ ধারে কিনেছি, ঐ টাকাটা চার মাসের মধ্যে শোধ করবো বলেছি। এখন এই কথাটা যদি ঠিক রাখতে পারি, তবেই আসছে বছরে আমার পসার আরও বেড়ে যাবে, আর আমি বেশী টাকার জিনিষ ধারে পাব।

কল্যাণী। তুমি যে চল্লিশ হাজার টাকার নারকেল কিনেছ, তাতে আমাদের কত লাভ হ'বে?

যদুপতি। এবার নারিকেল বেশী কনেছি বলে, একটু সুবিধা দরেই পাওয়া গেছে। যদি পশ্চিমাঞ্চলে চালান দিতে পারা যায়, তা'হলে অভাব পক্ষে বার হাজার টাকা লাভ পাওয়া যাবে।

কল্যাণী। পশ্চিমে কোথায় কোথায় পাঠাবে?

যদুপতি। আমি মনে করেছি, এবার জলপথে মুর্শীদাবাদ, রাজমহল, কাটীহার, মুঙ্গের, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে চালান দেব। তাতে যেমন একদিকে নৌকা ভাড়া, বহনি খরচ কম পড়বে, তেমনি অন্তদিকে আমাদের লাভও বেশী হওয়ার সম্ভব।

কল্যাণী। কিন্তু তা'হলে ত তোমারও সেই সেই যায়গায় যাওয়া দরকার হবে।

যদুপতি। তা' দরকার হ'বে বৈকি।

কল্যাণী। কিন্তু আমাকে এই অবস্থায় ফেলে তোমার ত কোথায় যাওয়া হ'বে না।

যদুপতি। না, তোমার ছেলে না হওয়া পর্য্যন্ত, আমি কোথাও এক পা নড়বো না। আমি ব্যবসা করে, টাকা রোজগার করতে ভালবাসি বটে, কিন্তু তার চেয়ে, আর সব জিনিষের চেয়ে তুমি বড়। টাকা রোজগার, তোমার সুবিধার জন্য। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, অর্থাৎ আর এক মাস পরে, আমি বাড়ী থেকে বেরুব। এই একমাস বাড়ী বসে বসে, নৌকা বোঝাই করে, সব মাল জলপথে মোকামে মোকামে রওনা করব। নৌকাপথে যেতে তাদের দেরী হবে। পরে আমি রেলপথে গিয়ে, ঠিক সময়ে তাদের ধরতে পারব।

ইহার পর ব্যবসা সম্বন্ধে পতি-পত্নীতে আরও অনেক কথা হইল। কিন্তু তাহা যে আমার প্রেমানুসন্ধানী পাঠক পাঠিকাগণ, তোমাদিগের চিত্তানন্দ দায়ক হইবে না। ইহা অপেক্ষা আমরা যদি একটি চাকুরীর সন্ধান দিতে পারিতাম, তাহা হইলে, তাহা বরং তোমাদিগের অধিকতর চিত্তপ্রসাদ সম্পাদন করিতে পারিত। তাহা হইলে, তুমি প্রেমময়ী পাঠিকা, তোমার প্রেমময় স্বামীর গোলামী গৌরবান্বিত গোলাপী মুখে চুম্বন করিয়া তাহাকে চাকুরী করিতে পাঠাইতে, এবং চাকুরী করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলে, তোমার চাকুরী-জীবি হৃদয়েশ্বরকে তোমার গৌরবান্বিত হৃদয়ে গ্রহণ করিতে।

যদুপতি সিরাজগঞ্জে প্রত্যাগত হইবার সাতদিন পরেই কল্যাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া, ব্যবসায়ী স্বামীর বিদেশ যাত্রার বাধা অপনয়ন করিল।

যদুপতি মহানন্দে পুত্রকে দেখিতে আসিয়া কহিল, 'কল্যাণু, তোমার ছেলেকে আমি কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবো বল। ও কি গহনা চায়, বল।

কল্যাণী মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ও গহনা টহনা কিছু চায় না।'

যদুপতি বলিল, 'তবে এবার আমি নারিকেলের ব্যবসায়ে যা লাভ করবো, সেইটা সবই ওকে দেবো। ও বোধ হয়, তাই চায়।'

কল্যাণী। ও তাও চায় না।

যদুপতি। তবে ও কি চায় কল্যাণু? আমায় বল; আমি আজ তোমার কোনও সাধ অপূর্ণ রাখবো না।

কল্যাণী। আমার বাবা আমাকে যা দিয়েছিলেন, তুমিও ওকে তাই দাও।

যদুপতি। সে কি কল্যাণু?

কল্যাণী। বাপের আশীর্ব্বাদ।

যদুপতি। তা ত পাবেই; কিন্তু তার সঙ্গে আর কিছু?

কল্যাণী। আর কিছু নয়; তোমার আশীর্ব্বাদ পেলেই পৃথিবীর আর স্বর্গের সমস্ত জিনিষ ওর পাওয়া হ'বে।

(ক্রমশঃ)

নীলাম্বরী

(কথিকা)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

(১)

ছোট্ট একটা সরু গলি বহুদূর পর্য্যন্ত এঁকে বেঁকে গিয়ে কোথায় কতদূরে কোন্ বড় রাস্তার বিরাট জন কোলাহলের পায়ের তলায় মিলিয়ে গিয়েছে।

গলিটা যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে ঠিক সেখানেই তা'র এপাশে একখানা লালবাড়ী দোতলা, আর ওপাশে একখানা সাদা বাড়ী একতলা। দোতলা বাড়ীটা ছিল একটা ষ্টুডেণ্টস্ মেস্, আর একতলা বাড়ীটা ছিল এক গৃহস্থ ভদ্রলোকের।

লাল বাড়ীটার উপর উপর-তলায় গলির দিকে ছোট্ট একখানি ঘর। সেই ঘরে একটী ছেলে থাকে—ফরসা ছিপ্ ছিপে গড়ন, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, চোখে তা'র সোনার চশমা। সাদা বাড়ীটায় একটী মেয়ে থাকে—গোলাপের মত রঙ্, ফুলের মত গড়ন, মেঘের মত চুল, আর ডাগর ডাগর টানা তা'র দু'টী চোখ।

রোজ বেলা দশটার সময় ছেলেটী স্নান করে এসে তা'র ঘরের সম্মুখে ছোট বারান্দাটার রেলিংএর উপর তার জরি-পাড় কাপড়খানি পথের দিকে মেলে দিয়ে যায়। রোজ দুপুরে মেয়েটীও স্নান করে এসে তা'র নীলাম্বরী সাড়ীখানি ছাদের আল্‌সের উপর পথের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে যায়।

এপারে ঝুলে ছেলেটীর কাপড়, আর ওপারে দুলে মেয়েটীর নীলাম্বরী;—মাঝখানে শুধু তা'দের এই ছোট্ট সরু গলিটার ব্যবধান। সমস্ত দিন ধরে ছেলেটীর কাপড় চেয়ে থাকে মেয়েটীর কাপড়ের দিকে, আর মেয়েটীর কাপড় চেয়ে থাকে ছেলেটীর কাপড়ের দিকে। দুজনকেই যেন তারা দু'জনে কিছু বলি বলি করে, একটুখানি যেন ধরি-ধরি করে; একটী বারের একটুখানি পরশ, একটি বারের এতটুকু একটু চুম্বন যেন তা'দের তৃষিত অন্তরে সারাদিন ধরেই জাগে, অথচ তারা তা পারে না, কোথায় যেন কেমন একটা সঙ্কোচে বাধে।

(২)

হঠাৎ একদিন অদূরে কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথাটা ফুলে ফুলে ঝাম্‌রে পড়ল, মেয়েটীর পোষা-কোকিলটার কণ্ঠে সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠ্‌ল, কোন্ অজানা ঝোপের বুক থেকে 'পিউ কাঁহা' পাখীটার আকুল আহ্বান আকাশের তটে ভেসে এল।

ফাল্গুনের প্রথম পদার্পণেই বসন্ত জেগে উঠল। অশোকে-কিংশুকে বাসন্তী উৎসবের রাঙা আবীর, প্রকৃতির সারা বুকখানা ভরে যেন এক পুলক স্পন্দন! এ যেন কোন্ চির-হারানোকে ফিরে পাওয়ার মধুর লগ্ন, যেন কোন্ চির না পাওয়াকে বুকে পাওয়ার মিলনবেলা! এমন দিনে বঞ্চিত বুঝি কেউ থাকে না,—থাক্‌তে পারে না!

কাপড় দু'খানি সেদিনেও তেমনি দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়েছিল—যেন তৃষিত অন্তরের দুটী অসহায় ব্যাকুল দুটী চোখ!

বসন্তের পরশ এসে তা'দের বুকে লাগ্‌ল। কি যেন একটা অজানা সুখের আবেগে উভয়েরই তনু কেঁপে উঠল। এতদিন ধরে যে কথাটা তা'রা বলি-বলি করেও বল্‌তে পারে নি, আজ যেন সে কথাটা তা'রা বলতে পারে!

হঠাৎ এক ঝলক ফাগুন হাওয়ায় তা'দের সঙ্কোচের বাঁধ কোথায় ভেসে গেল। মেয়েটীর কাপড় উড়ে এসে পড়ল ছেলেটীর কাপড়ের একেবারে কোলের কাছে, ছেলেটীর কাপড় লাফিয়ে উঠে তা'কে জড়িয়ে ধরলে তা'র বুকের মাঝে। একটুখানি;—সেই একটুখানিই পরশ-পাওয়ার সুখের আবেগে উভয়েই তা'রা কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর

কি যেন এক নেশার আবেশে তনু দু'টী তাদের অবশ হয়ে এল, আলিঙ্গনের নিবিড় বাঁধন শিথিল হয়ে গেল।

তারপর থেকে রোজই এমনি হয়। মেয়েটীর কাপড় উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটীর কাপড়ের বুকের পরে, আর ছেলেটীর কাপড় উড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে মেয়েটীর নীল শাড়ী প্রান্তটীকে। এমনি করেই তাদের নিরালা-থাকার দিনগুলি ভরে ওঠে এক নিবিড় আনন্দে। এক একটী দিন তা'দের মনে হয় যেন একটী মধুর স্বপ্ন, কোথা দিয়ে যে কেটে যায় তা' তা'রা জানতেই পারে না।

তা'দের এ গোপন অভিসারের কথা কিন্তু আর কেহই জানত না; না ছেলেটী,—না মেয়েটী।

(৩)

বছর তিনেক পরের কথা।

সহরের লোকের নাকি তখন বড় অসুবিধা হ'ত, তাই করপোরেশনের লোকেরা সেই ছোট্ট সরু গলিটাকে ভেঙে সেখানে একটা প্রকাণ্ড বড় রাস্তা করে দিলে। লাল বাড়ীটা বেঁচে গেল বটে কিন্তু সেই সাদা বাড়ীটা আর রইল না। সেই মেয়েটীআর তা'র বাড়ীর লোকেরা যে কোথায় উঠে গেল তা' কে জানে ?

লাল বাড়ীটার সেই ছোট্ট ঘরখানিতে সেই ছেলেটী আজও আছে। আজও সে আগেকার মত রোজই বেলা দশটার সময় স্নান করে এসে সেই ছোট্ট বারান্দাটীর রেলিংএর উপর তা'র ভিজে কাপড়খানি মেলে দিয়ে যায়।

আজও বসন্ত তেমনি করেই আসে। আজও কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথাটা তেমনি করেই ফুলে ফুলে ঝামরে পড়ে কিন্তু মেয়েটীর সেই পোষা কোকিলটার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।

ফাগুন হাওয়া আজও আসে, ছেলেটীর কাপড়খানি আজও তেমনি দোলে, তেমনি করেই শিকল বাঁধা পাখীর মত ঝাপটে মরে, কিন্তু মনে হয় যেন বুক-ভাঙা হাহাকারে আর্ত্তনাদ করে সে কাহাকে খুঁজে মরছে !

কোথায় তা'র সেই চিরবাঞ্ছিতা, সেই চির পরিচিতা নীলাম্বরী—কে আজ তাকে বলে দেবে !

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী

[অধ্যাপক শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবতরত্ন]

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ বাঙ্গালীর পুরোভাগে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া শত শত নর নারী অন্তরে শান্তি লাভ করিয়াছেন, বহু ভক্ত আনন্দ পাইয়াছেন ও কতিপয় সাধক বৃন্দারণ্যের সেই প্রেম মধুরিমা জীবনে আস্বাদ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তম ও আচার্য্য শ্রীনিবাসের অসীম ত্যাগ, বিপুল বৈরাগ্য ও শাস্ত্রপ্রচারে ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও রাধা মোহন ঠাকুরের সরস পাণ্ডিত্য সেই ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করিল। শ্রীচৈতন্য দেব বাঙ্গলার জাতীয় সম্পদরূপে পরিণত হইলেন। মনসার ভাসান গাওয়াই হউক, আর চণ্ডীর গুণকীর্ত্তনই হউক, গণেশাদি সিদ্ধিপ্রদ দেবতার সহিত শ্রীচৈতন্য দেবের নাম করা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। তাই প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের পদ্মপুরাণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমাখ্যাপক "ধর্ম্ম মঙ্গলেও" শ্রীচৈতন্য বন্দনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কোন ধর্ম্মের বিস্তৃতি হইলেই যে সে ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি পায় এমন কোন কথা নাই। বৌদ্ধ

ধর্ম্মের হীনযানমতের মধ্যে যে দার্শনিক সূক্ষ্মবিচার ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা শক হূণ বা গ্রীক রোমাণদের ক্ষমতার অতীত ছিল। তাই সেই ধর্ম্মকে সরল করিয়া লওয়া হইল। লোকরঞ্জনের জন্য যে সারল্য ইহাতে প্রবেশ করিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মকে হীন হইতে হীনতর করিয়া তুলিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই সত্য অনেক পরিমাণে খাটে। দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, ত্যাগ সংযমে উজ্জ্বল বৈষ্ণব ধর্ম্ম যতই নিম্নস্তরে পৌঁছাইতে লাগিল, ততই ধর্ম্মের মধ্যে নানাপ্রকার গ্লানি দেখা দিল। এই কথার প্রমাণ স্বরূপে দুইটি বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে মহামূল্য শাস্ত্ররাজী তাহার তাদৃশ প্রচার হয় নাই। বাঙ্গলার বৈষ্ণব বৃন্দ সাধারণতঃ "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর" বলিয়া বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্র পাঠে তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" মাত্র সম্বল করিয়াই "শ্রবণাঙ্গ ভক্তি" সাধন করিতেন—কিন্তু এই দুই গ্রন্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে যে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল, তাহাও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের ছিল না। বাঙ্গলার বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের বহুগবেষণার ফলে যে বেদান্ত দর্শনের অচিন্ত ভেদাভেদ বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা নিতান্তই দুই চারিজন ত্যাগী বৈষ্ণব সাধকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তাঁহারা প্রায়শঃই নির্জ্জন বনে বসিয়া ভজন সাধন করিতেন। ফলে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত ও পূজ্যপাদ আচার্য্য বৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত যে ভক্তিবাদ তাহা অপ্রকাশ্য এমন কি অনাদৃতই রহিল। বাঙ্গলাদেশে যে দার্শনিক আলোচনা হইত, তাহার মধ্যে অচিন্ত ভেদাভেদ বাদ কোনই স্থান লাভ করিল না।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব সমাজের এই মূর্খতার আশ্রয় লইয়া [illegible]স্বার্থ সংসিদ্ধির জন্য বা অন্ধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের [illegible]া প্রেমধর্ম্মের নামে এক অপধর্ম্ম চালাইতে [illegible]এই অপধর্ম্ম বাউল বা সহজিয়া ধর্ম্ম বলিয়া [illegible]। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সুমহান্ আদর্শ প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং নিজের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছোট হরিদাসকে বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের সুবিধাবাদী বৈষ্ণব নামধেয় সহজিয়া বাউলগণ তাঁহার আদর্শের এই কঠিন ব্রত রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনের চিরনবীন কিশোর কিশোরীর ভোগ লালসা বর্জ্জিত প্রেম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মে কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয়ই ছিল। বাউলগণ সেই প্রেমের অভিনয় নিজ নিজ জীবনে করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। কামিনী কাঞ্চন বিবর্জ্জিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম তাঁহাদের হাতে পড়িয়া এমনই বিকৃত হইয়া পরিল যে নারী বাবাজীর সাধনার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। পারলৌকিক সুখলাভের জন্য সহজবাগ্র বা লার নরনারী এই পথের সুবিধা দেখিয়া দলে দলে ইহাতে প্রকাশ্যে বা গোপনে যোগ দিতে লাগিল। যদি দেশের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনের সুপ্রচার থাকিত, তাহা হইলে আর এই সরল প্রাণ নরনারীরা এই ব্যভিচার পঙ্কিলে সংঙ্গে নিমজ্জিত হইত না। অশিক্ষিত সাধারণ লোকেরা কখনই কোনধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দার্শনিকতার বড়বেশী খোঁজখবর রাখে না সত্য, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহারা যেরূপ অল্পদিনের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও ছয় গোস্বামীর ত্যাগকঠোর জীবনী বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহাও বড়ই আশ্চর্য্য জনক। যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ভারতচন্দ্র রাজসভায় বসিয়া বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তখন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের মধ্যেও তাহা অপেক্ষা কোন উচ্চতর ধারণা বা সাধনা প্রকাশ পায় নাই। অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা শ্রবণ করিয়া যে অনুভবের আমোদ পাইত শ্রীবৃন্দাবন লীলা শ্রবণেও তাহারা সেই রসই উপভোগ করিত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যখন ঈদৃশ দুরবস্থা তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্লাবন আসিয়া বাঙ্গলার মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সেই প্লাবনে বাঙ্গালীর সনাতন শিক্ষা ও সাধনা, ভাব ও জাতীয়তা সবই যেন ভাসিয়া যাইবে মনে

। পাশ্চাত্য শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে বাঙ্গালার শাক্ত ও র ধর্ম্ম নব্য যুবক বৃন্দের নিকট নিতান্ত ম্লান ও হীন বলিয়া বিবেচিত হইল। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য নৈতিক র্শের নিকট তদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার র নিতান্ত অশ্লীল বলিয়া মনে হইল। তাই দেখিতে ব্য যুগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা **রাম মোহন** র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর **প্রচারিত** ধর্ম্মের প্রতি হীন কটাক্ষপাত করিলেন। তাহার মাতাঠাকুরাণী প্রত্যহ তুলসী তলায় বসিয়া হরিনাম জপ করিলেও, মোহন তথাপি সেই ধর্ম্মের অযথা অনেক গ্লানি করিয়া ছেন। ইহাতে তাঁহাকে বেশি দোষ না দিয়া বৈষ্ণব কেই দোষ দিব। তাহারা এরূপ কোন ব্যবস্থা করেন যাহাতে রাম মোহনের হাতে সহজে ষট্ সন্দর্ভ দ ভাষ্য বা উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় গ্রন্থ আসিতে অপর দিকে বৈষ্ণবগণের যে আচার ব্যবহার মোহন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধালু হওয়া সহজ সাধ্য হয় নাই।

ম মোহনের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি এই অশ্রদ্ধার ভাব ত হইয়া বাঙ্গলার ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ ছিল। **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ঠাকুর যে র্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও দুর্নীতি একার্থবাচকই ছিল। সে সময়ে ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বেদান্ত উপনিষদ আদি শাস্ত্রও র খানি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সমাজ ঘোরতর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশে উদ্যোগি হইলেন না। বৈষ্ণব মধ্যে যে **কতিপয় মুষ্টিমেয় সাধক** শাস্ত্রকেই প্রদীপ স্বরূপ মনে করিয়া সাধন পথে হইতেছিলেন তাঁহারাও এবিষয়ে উদাসীন। ন রাখিতে হইবে যে তখনও বঙ্গপল্লীর শত সহস্র ী বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিকৃত রূপকেই অন্তরের ধন মানিয়া চলিতেছিল। তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্য র প্রচারিত যথার্থ ধর্ম্মের আলোকদান করিয়া উন্নতির পথে উত্তোলন করিবার কোন চেষ্টাই শিক্ষিত সমাজ করিলেন না। তাহারা পাশ্চাত্য সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহাদিগকে সংস্কার করিতে উদ্যত হইলেন। ফলে দেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ জন সাধারণের সহিত বুদ্ধি জীবী মস্তিস্কের অন্তরের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন ভাগ এই ভাবেই কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে কত আন্দোলন উত্তেজনার স্রোত বহিল, কত বক্তৃতা ও করতালি প্রদত্ত হইল, দেশের উন্নতি করিবার জন্য কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব স্কীমের আমদানী হইল— কিন্তু কেহই ভাবিল না যে বাঙ্গলায় "কানু ছাড়া গীত নাই" ও সেই কানুর পীরিতির একমাত্র ব্যাখ্যাতা শ্রীচৈতন্য দেব। তাহার ধর্ম্ম না বুঝিলেও তাহার নাম করিয়া বাঙ্গলার প্রায় অর্দ্ধেক নর নারী তখনও কীর্ত্তন করে। ধর্ম্মের যোগ সূত্র দ্বারা তাহাদের সহিত বন্ধন স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহা করিবার একমাত্র উপায় তাহাদের ধর্ম্মকে যথার্থ ভাবে আলোচনা করা—একথা বাঙ্গলার সংস্কারকগণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনার মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্ব প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম মহিমা উপলব্ধ হইল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ নাট্যকার গিরীশচন্দ্র সেই ভাব সাধনার প্রেরণা পাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে শ্রীচৈতন্য দেবের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের "জীবন বেদের" মধ্যে ঈশা ও মুষার সহিত শ্রীচৈতন্য দেবকে যখন একই শ্রেণী ভুক্ত করা হইল তখন তাহার অপূর্ব্ব জীবন কথা জানিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ পাইল। মহা কবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার "চৈতন্য লীলা" ও নিমাই সন্ন্যাসের অভিনয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগ ও প্রেমের অপূর্ব্ব জীবন সাধারণের সমক্ষে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। এদিগে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি তাঁহার বংশে ন্যস্ত প্রেমধারায় বিহ্বল হইয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব সাধনার মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে আবার উন্নত আদর্শ দেখা দিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্মের প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব আসিয়া ছিল তাহা ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতে লাগিল।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার মেজ দাদার প্রেম ও সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইতিমধ্যে 'অমিয় নিমাই চরিতে'র অমিয় ধারা প্রবাহিত করিলেন তাহার পুত সলিলে দেশ ও বিদেশের শত সহস্র আস্তিক ও নাস্তিক অভিষিক্ত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে নব অভ্যুত্থান হইয়াছে তাহাতে শিশির কুমারের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়। শিশির কুমারের সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কেদারনাথ দত্ত মহাশয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও দর্শন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়গত নিষ্ঠা আচার অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশে মনোযোগী হইলেন। তাহার ফলে জন সাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশিত হইল। তৎকালে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচার করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শিশিরকুমার ও কেদারনাথ যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের উজ্জ্বল মাধুর্য্য সমাজের মধ্যে প্রচার করিতেছিলেন, তখন হর গোস্বামীর অনুমোদিত প্রাচীন পথাবলম্বী ভক্ত যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে। তবে তাঁহাদের লক্ষ্য প্রচারের দিকে ছিল না—নিজেদের জীবনে অনুভূতির মধ্যেই ছিল। আর তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারাদি দেখিয়া অনেকটা হতাশও হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিষ্ঠা ও সাধনার দ্বারা যে স্রোতকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাহা বিগত শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত উপকারী হইয়াছিল; কেননা যখন লোকের দৃষ্টি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল, তখন তাহারা ঐ ভক্তগণের নিকট হইতেই সাধনার কথা [illegible] উদ্‌গ্রীব হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ [illegible] কৃপা করিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মমত আ[illegible] শতাব্দীতে নব শক্তি লাভ করিয়া প্রচারিত হইতে[illegible]

বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী দুইটী প্রতি[illegible] প্রথমে হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইংরাজী শিক্ষার ফ[illegible] রূপী প্রতিক্রিয়া। আর পরে বিদেশের [illegible] আত্মস্থ হইবার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরু[illegible] পরিমাণ প্রতিক্রিয়া। এই জাতীয় প্রতি[illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রচার যে জাতীয় [illegible] সঞ্চার করিয়াছিল ও জনসাধারণের সহিত শিক্ষিত [illegible] অন্তরের যোগ স্থাপন করিয়াছিল সে বিষয়ে [illegible] নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালী বুঝিয়াছে [illegible] যুগে প্রচারিত বাঙ্গলার ভাব ও সাধনা শ্রীমন্মহাপ্র[illegible] মূর্ত্তি পাইয়াছে তিনি বাঙ্গলার প্রাণের দেবতা। [illegible] ত্যাগসুন্দর প্রেমময় জীবন বাঙ্গালীর আদর্শ স্বরূপ। [illegible] আদর্শকে অবলম্বন না করিলে বাঙ্গালীর জীবনে [illegible] পূর্ণতা আসিতে পারে না।

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনের আদর্শ আজ [illegible] সাধকভক্তের অন্তরের ধন নহে—তাহা বাঙ্গলা[illegible] সম্পত্তিও। সেই আদর্শকে কেহ যদি আজ ভ্রান্তবু[illegible] হউক আর স্বার্থসিদ্ধির বাসনাতেই হউক ম্লান [illegible] প্রয়াসী হয়, তবে তাহাদিগকে বাঙ্গালী শা[illegible] পরাঙ্মুখ হইবে না। আগামীবারে কিরূপে একদ[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনবদ্যসুন্দর চরি[illegible] [illegible]কত [illegible] করিয়া তুলিতেছে তাহার পরিচয় দিব।